শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র



তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে ইতিহাস বর্ণময় হয়ে উঠেছিল, আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে ইতিহাস গল্পময়। ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাসের লেখক হিসেবে শরদিন্দুর নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই উচ্চারিত। 'বহু দূরকালের সামান্য কয়খানা ঘটনার কঙ্কালের মধ্যে তিনি প্রতিভার মন্ত্রবলে প্রাণসঞ্চার' করে যে-কালজয়ী আখ্যানমালা রচনা করেছিলেন তা যেন সর্বকালের 'ঐতিহাসিক' সম্পদ।
ইতিহাস সম্পর্কে শরদিন্দুর আজন্ম আগ্রহ ছিল। তিনি ছিলেন ভারতের অতীত ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক। ফলে, প্রায় লেখকজীবনের গোড়া থেকেই তিনি ইতিহাসের ভেতরে গল্পের অনুসন্ধান করেছেন, ইতিহাসকে গল্পের ভেতরে বন্দি করেছেন অভিনব কৌশলে। সুকুমার সেন দেখিয়েছেন : 'প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত শরদিন্দুবাবুর ঐতিহাসিক গল্পের কালপ্রসার। এর মধ্যে কোথাও গল্পের পরিবেশ গল্পরসের তীক্ষ্ণতার হানি করেনি। দূরের দৃশ্যপটকে নিকটে এনে দূরের মানুষকে কাছের মানুষ করতে পেরেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।' এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সার্থক ও সতর্ক স্রষ্টা। এক সাক্ষাৎকারে শরদিন্দু বলেছিলেন : 'ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো কেবল নিয়েছি ; কিন্তু গল্প আমার নিজের। সর্বদা লক্ষ্য রেখেছি কি করে সেই যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায়। যে সময়ের গল্প তখনকার রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, অস্ত্র, আহার, বাড়িঘর ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব জানা না থাকলে যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। এরপর আছে ভাষা। ঐতিহাসিক গল্পের ভাষাও হবে যুগোপযোগী।'
রহস্যসন্ধানী ব্যোমকেশ বক্সীর অমর স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস-আশ্রিত গল্প-উপন্যাসে কাহিনী ও ইতিহাস যুগপৎ 'জীবন্ত' হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধযুগ, গৌড়বঙ্গ, চৈতন্যযুগ, প্রাক-মুঘল কিংবা মুঘল যুগ অথবা অদূর অতীতের পোর্তুগিজ-ইংরেজ অধিকৃত বাংলার সমকাল দুর্নিবার হয়ে উঠেছে কল্পনা ও বর্ণনার অশেষ গুণে, রচনা ও গল্পরসের অনিবার্য সৃষ্টিতে। তিনি বলতেন : 'ইতিহাসের গল্প লিখেই বেশি তৃপ্তি পেয়েছি।' পরিশ্রমী সম্পাদনায় দুই মলাটের মধ্যে সাজিয়ে দেওয়া শরদিন্দুর সমস্ত ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাস (পাঁচটি) এবং গল্প (সতেরোটি) পাঠকদেরও তৃপ্তি দেবে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি।

ISBN 81-7215-614-6

ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র



ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রকাশকের নিবেদন

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমুদয় ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাস ইতিপূর্বে প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় শরদিন্দু অমনিবাস ষষ্ঠ ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই কাহিনীগুলি একত্রে বর্তমানে 'ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র' নামে প্রকাশিত হল।

শরদিন্দু অমনিবাস ষষ্ঠ খণ্ডে সুকুমার সেন মহাশয়ের লেখা ভূমিকার ঐতিহাসিক গল্প সম্পর্কে মন্তব্য-অংশটি বর্তমান সঙ্কলনের পরিশিষ্ট অংশে পুনর্মুদ্রিত হল।

সূচি

গল্প

উপন্যাস

গল্প



অমিতাভ

যত অসম্ভব কথাই বলি না কেন, যদি একজন বড় পণ্ডিতের নাম সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে পারি, তবে আর কথাটা কেহ অবিশ্বাস করে না। আমি যদি বলি, আজ রাত্রিতে অন্ধকার পথে একেলা আসিতে আসিতে একটা ভূত দেখিয়াছি, সকলে তৎক্ষণাৎ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে; বলিবে—"বেটা গাঁজাখোর, ভেবেছে আমরাও গাঁজা খাই!" কিন্তু স্যর অলিভার লজ যখন কাগজে-কলমে লিখিলেন, একটা নয়, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি ভূত দিবারাত্রি পৃথিবীময় কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে, তখন সকলেই সেটা খুব আগ্রহ সহকারে পড়িল এবং গাঁজার কথাটা একবারও উচ্চারণ করিল না।

এটা অবিশ্বাসের যুগ—অথচ মানুষকে একটা কথা বিশ্বাস করানো কত সহজ! শুধু একটি পণ্ডিতের নাম—একটি বড়সড় আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত,—সেকেলে হইলে চলিবে না এবং দেশী হইলে তো সবই মাটি!

তাই ভাবিতেছি, আমি যে জাতিস্মর এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করাইব? কোন্ বিদেশী বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়া সন্দেহ-দ্বিধা ভঞ্জন করিব? আমি রেলের কেরানী, বিদ্যা এন্ট্রাস্ পর্যন্ত। তের বৎসর একাদিক্রমে চাকরি করিবার পর আজ ছিয়াত্তর টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি—আমি জাতিস্মর! হাসির কথা নয় কি?

রেলের পাস পাইয়া যে বৎসর আমি রাজগীরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে যাই—ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন ইষ্টকস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া সেদিন প্রথম আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে কালের যবনিকা সরিয়া গিয়াছিল। যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা কতদিনের কথা! দু' হাজার বৎসর, না তিন হাজার বৎসর? ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হয়, পৃথিবী তখন আরও তরুণ ছিল, আকাশ আরও নীল ছিল, শষ্প আরও শ্যাম ছিল।

আমি জাতিস্মর! ছিয়াত্তর টাকা মাহিনার রেলের কেরানী—জাতিস্মর! উপহাসের কথা—অবিশ্বাসের কথা! কিন্তু তবু আমি বারবার—বোধ হয় বহু শতবার এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট্ হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি; শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী আমার সেবা করিয়াছে। বিদ্যুৎশিখার মতো, জ্বলন্ত বহ্নির মতো রূপ লইয়া আজ সেই নারীকুল কোথায় গেল? সে রূপ পৃথিবীতে আর নাই—সে নারীজাতিও আর নাই, ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন যাহারা আছে, তাহারা তেলাপোকার মতো অন্ধকারে বাঁচিয়া আছে। তখন নারী ছিল অহির মতো তীব্র দুর্জেয়। আরণ্য অশ্বিনীর মতো তাহাদিগকে বশ করিতে হইত।

আর পুরুষ? আরশিতে নিজের মুখ দেখি আর হাসি পায়। সেই আমি—শূরসেনরাজের দুই কন্যাকে দুই বাহুতে লইয়া দুর্গপ্রাচীর হইতে পরিখার জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণে যমুনা পার

হইয়াছিলাম। তারপর—কিন্তু যাক্ সে কথা। কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেবল হাসিবে। আমিও হাসি—অফিসে কলম পিষিতে পিষিতে হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া উঠি।

কিন্তু কথাটা সত্য। এমন বহুবার ঘটিয়াছে। রাজগীরের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া মনে হইয়াছিল, এ-স্থান আমার চিরপরিচিত ; একবার নহে—শত সহস্রবার আমি এইখানে দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু তখন এ-স্থান জঙ্গল ও ইষ্টকস্তূপে সমাহিত ছিল না। ঠিক যেখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, তাহার বাঁ দিক্ দিয়া এক সংকীর্ণ দীর্ঘ পথ গিয়াছিল। পথের দুই পাশে ব্যবহারীদের গৃহ ছিল ; দূরে ঐ স্থানে মহাধনিক সুবর্ণদত্তের দারু-নির্মিত প্রাসাদ ছিল। যেদিন রাজগৃহে আগুন লাগে, সেদিন সুবর্ণদত্ত আসবপানে বিবশ হইয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার সঙ্গে ছিল চারিজন রূপাজীবা নগরকামিনী। নগর ভস্মীভূত হইবার পর পৌরজন তাহাদের মৃতদেহ কক্ষ হইতে বাহির করিল। দেখা গেল, শ্রেষ্ঠী মরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দেহ দগ্ধ হয় নাই—সুসিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। কিছুকাল পূর্বে সে বলিদ্বীপ হইতে এক অষ্টোত্তর-সহস্রনাল ইন্দ্রচ্ছন্দা মালা আনিয়াছিল। সেরূপ মুক্তাহার মগধে আর ছিল না। সকলে দেখিল, বণিকের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে সেই ইন্দ্রচ্ছন্দার মুক্তাভস্ম।

কিন্তু ক্রমেই আমি অসংযত হইয়া পড়িতেছি। শূরসেনের সহিত মগধ, অগ্নিদাহের সহিত রাজকন্যা-হরণ মিশাইয়া ফেলিতেছি। এমন করিলে তো চলিবে না।

আসল কথাটা আর একবার বলিয়া লই—আমি জাতিস্মর! মিউজিয়ামে রক্ষিত এক শিলাশিল্প দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠে, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া যায়। এ শিল্প তো আমার রচনা! আসমুদ্রকরগ্রাহী সম্রাট্ কণিষ্কের সময় যখন সদ্ধর্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, তখন বিহারের গাত্রশোভার জন্য এ নবপত্রিকা আমি গড়িয়াছিলাম। তখন আমার নাম ছিল পুণ্ডরীক। আমি ছিলাম প্রধান শিল্পী—রাজভাস্কর। সেই পুণ্ডরীক-জীবনের প্রত্যেক ঘটনা যে আমার স্মরণে মুদ্রিত আছে। এই যে নবপত্রিকার মধ্যবর্তী বিনগ্না যক্ষিণী-মূর্তি দেখিতেছেন, তাহার আদর্শ কে ছিল জানেন? সিতাংশুকা—তক্ষশিলার সর্বপ্রধানা রূপোপজীবিনী, বারমুখ্যা। সকলেই জানিত, সিতাংশুকা রাজ-ঔরসজাতা। সেই সিতাংশুকাকে নিরংশুকা করিয়া, সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, বজ্রসূচী দিয়া পাষাণ কাটিয়া কাটিয়া এই যক্ষিণী-মূর্তি গড়িয়াছিলাম। পুণ্ডরীক ভিন্ন এ মূর্তি আর কে গড়িতে পারিত? কিন্তু তবু মনে হয়, সে অপার্থিব লাবণ্য কঠিন প্রস্তরে ফুটে নাই। আজও, এই কেরানী জীবনেও সেই অলৌকিক রূপৈশ্বর্য আমার মস্তিষ্কের মধ্যে অঙ্কিত আছে।

আবার কেমন করিয়া বিষ-ধূম দিয়া সিতাংশুকা আমার প্রাণসংহার করিল, সে কথাও ভুলি নাই। সুরম্য কক্ষ, চতুষ্কোণে স্ফটিক-গোলকের মধ্যে পুন্নাগচম্পক-তৈলের সুগন্ধি দীপ জ্বলিতেছে, কেন্দ্রস্থলে বিচিত্র চীনাংশুকে আবৃত পালঙ্কশয্যা, শিয়রে ধূপ জ্বলিতেছে।—সেই ধূপশলাকার গন্ধে ধীরে ধীরে দেহ অবশ হইয়া আসিতেছে। বহুদূর হইতে বাদ্যের করুণ নিক্বণ ইন্দ্রিয়সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছে ; তারপর মোহনিদ্রা—সে নিদ্রা সে জন্মে আর ভাঙিল না।

এমনই কত জীবনের কত বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কত অসমাপ্ত কাহিনী স্মৃতির মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সেই সুদূর অতীতে এমন অনেক জিনিস ছিল—যাহা সেকালের সম্পূর্ণ নিজস্ব, একালের সহিত তাহার সম্বন্ধমাত্র নাই। অতিকায় হস্তীর মতো তাহারা সব লোপ পাইয়াছে। মনে হয় যেন, তখন মানুষ বেশি নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিল না। অতি তুচ্ছ কারণে একজন আর একজনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধ করি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আবার মানুষের মধ্যে ক্রূরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না।

একালের মানুষ যেন সব দিক্‌ দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়ধর্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তরুণ ছিল, এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আর একটা কথা, একালের মতো স্বাধীনতা কথাটাকে তখন কেহ এত বড় করিয়া দেখিত না। মাছ যেমন জলে বাস করে, মানুষ তেমনই স্বাধীনতার আবহাওয়ায় বাস করিত। স্বাধীনতায় ব্যাঘাত পড়িলে লড়াই করিত, মরিত ; বাঘের মতো পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও পোষ মানিত না। যুগান্তরব্যাপী অধীনতার শৃঙ্খল তখনও মানুষের পায়ে কাটিয়া বসে নাই, মনের দাসবৃত্তি ছিল না। রাজা ও প্রজার মধ্যে প্রভেদও এত বেশি ছিল না। নির্ভয়ে দীন প্রজা চক্রবর্তী সম্রাটের নিকট আপনার নালিশ জানাইত, অধিকার দাবি করিত, ভয় করিত না।

ঘরের কোণে বসিয়া লিখিতেছি, আর ধূম্র-কুণ্ডলীর মতো বর্তমান জগৎ আমার সম্মুখ হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। আর একটি মায়াময় জগৎ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের এক স্বপ্ন দেখিতেছি। এক পুরুষ—ভারত আজ তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে—তাঁহার কোটিচন্দ্রস্নিগ্ধ মুখপ্রভা এই দুই নশ্বর নয়নে দেখিতেছি, আর অন্তরের অন্তস্তল হইতে আপনি উৎসারিত হইতেছে—

"অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়—"

সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে একদিন দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াছিলাম—তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম—আজ সেই কথা জন্মান্তরের স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিব।

উত্তরে মাতুলবংশ লিচ্ছবি ও পশ্চিমে মাতুলবংশ কোশল মগধেশ্বর পরমবৈষ্ণব শ্রীমন্মহারাজ অজাতশত্রুকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্বতন মহারাজ বিম্বিসার শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন, তাই লিচ্ছবি ও কোশলের সহিত বিবাদ না করিয়া তাহাদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু কিন্তু সে ধাতুর লোক নহেন—বিবাহ করা অপেক্ষা যুদ্ধ করাকে তিনি বেশি পছন্দ করেন। তা ছাড়া, ইচ্ছা থাকিলেও মাতুলবংশে বিবাহ করা সম্ভব নহে। তাই অজাতশত্রু পিতার অপঘাত মৃত্যুর পর প্রফুল্ল মনে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিন্তু অসুবিধা এই যে, শত্রু দুই দিকে—উত্তরে এবং পশ্চিমে। উত্তরের শত্রু তাড়াইতে গেলে পশ্চিমের শত্রু রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে ; কোশলকে কাশীর পরপারে খেদাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে দেখেন, লিচ্ছবিরা রাজগৃহে ঢুকিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। মগধরাজ্যের অন্তপাল সামন্ত রাজারা সীমানা রক্ষা করিতে না পারিয়া কেহ রাজধানীতে পলাইয়া আসিতেছে, কেহ বা শত্রুর সহিত মিলিয়া যাইতেছে। রাজ্যে অশান্তির শেষ নাই। প্রজারা কেহই অজাতশত্রুর উপর সন্তুষ্ট নহে ; তাহাদের মতে রাজা বীর বটে, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি অধিক নাই, শীঘ্র ইহাকে সিংহাসন হইতে না সরাইলে রাজ্য ছারেখারে যাইবে।

প্রজারা কিন্তু ভুল বুঝিয়াছিল। অজাতশত্রু নির্বোধ মোটেই ছিলেন না। তাঁহার অসির এবং বুদ্ধির ধার প্রায় সমান তীক্ষ্ণ ছিল।

একদিন, বর্ষাকালের আরম্ভে যুদ্ধ স্থগিত আছে—অজাতশত্রু রাজ্যের মহামাত্য বর্ষকারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। নগরের নির্জন স্থানে বেণুবন নামে এক উদ্যান আছে ; বিম্বিসার ইহা বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু অজাতশত্রু আবার উহা কাড়িয়া লন। সেই উদ্যানে প্রাচীন মন্ত্রী ও নবীন মহারাজের মধ্যে অতি গোপনে কি কথাবার্তা হইল। সে সময় গুপ্তচরের ভয় বড় বেশি ; সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, জ্যোতিষী, বারবনিতা, নট, কুশীলব, ইহাদের মধ্যে কে গুপ্তচর কে নহে,

অনুমান করা অতিশয় কঠিন। সম্প্রতি নগরে বৈশালী হইতে জঘনচপলা নাম্নী এক বারাঙ্গনা আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সমস্ত নাগরিক তো ভুলিয়াছেই, এমন কি স্বয়ং রাজা পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু জঘনচপলা কোশল কিংবা বৃজির গুপ্তচর কি না, নিশ্চিতরূপে না-জানা পর্যন্ত অজাতশত্রু নিজেকে কঠিন শাসনে রাখিয়াছেন। এইরূপ চর সর্বত্রই ঘুরিতেছে ; তাই গূঢ়তম মন্ত্রণা খুব সাবধান হইয়াই করিতে হয়। এমন কি, সকল সময় অন্যান্য অমাত্যদের পর্যন্ত সকল কথা জানানো হয় না।

নিভৃতে বহুক্ষণ আলাপের পর মহামন্ত্রী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। উদ্যানের প্রতিহারী দেখিল, বৃদ্ধের শুষ্ক নীরস মুখে হাসি এবং নির্বাপিত চক্ষুতে জ্যোতি ফুটিয়াছে।

প্রহর রাত্রি অতীত হইবার পর আহারান্তে শয়ন করিয়াছিলাম, ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণও হইয়াছিল। এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "পরিব্রাজিকা সাক্ষাৎ চান।"

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চকিতে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরিব্রাজিকা ? এত রাত্রে ?"

এই রাজ-সম্মানিতা মহাশক্তিশালিনী নারী কি প্রয়োজনে এরূপ সময়ে আমার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী, জানিবার জন্য ত্বরিতপদে দ্বারে উপস্থিত হইলাম। সসম্ভ্রমে তাঁহাকে গৃহের ভিতর আনিয়া আসনে বসাইয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, "দেবী, কি জন্য দাসের প্রতি কৃপা হইয়াছে ?"

পরিব্রাজিকার যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মুখশ্রী এখনও সুন্দর ও সম্ভ্রম-উৎপাদক। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, ললাটে কুঙ্কুমতিলক, হস্তে একটি সনাল পদ্মকোরক। সহাস্যে বলিলেন, "বৎস্য, অদ্য সন্ধ্যার পর কমলকোরক দিয়া কুমারীর পূজা করিতেছিলাম, সহসা এই কোরকটি কুমারীর চরণ হইতে আমার ক্রোড়ে পতিত হইল।"

কথার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি শুধু বলিলাম, "তার পর ?"

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "কুমারীর আদেশ বুঝিতে না পারিয়া ধ্যানস্থ হইলাম। তখন দেবী আমার কর্ণে বলিলেন, 'এই নির্মাল্য শ্রেণিনায়ক কুমারদত্তকে দিবে। ইহার বলে সে সর্বত্র গতিলাভ করিবে।'"

আমি হতবুদ্ধির মতো পরিব্রাজিকার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম।

তিনি কক্ষের চতুর্দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "এই কোরক লও, ইহাতেই উপদেশ আছে। কার্যসিদ্ধি হইলে ইহার বিনাশ করিও। মনে রাখিও, ইহার বলে রাজমন্দিরেও তোমার গতি অব্যাহত হইবে।"

এই বলিয়া পদ্মকলিটি আমার হস্তে দিয়া পরিব্রাজিকা বিদায় লইলেন। আমি নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলাম, তাঁহাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেলাম।

আমি সামান্য ব্যক্তি—কুলি-মজুর খাটাইয়া খাই, রাজগৃহের স্থপতি-সূত্রধার-সম্প্রদায়ের শ্রেণিনায়ক। আমার উপর রাজ-রাজড়ার দৃষ্টি পড়িল কেন ? যদি বা পড়িল, তবে এমন রহস্যময়ভাবে পড়িল কেন ? রাজ-অবরোধের পরিব্রাজিকা আমার মতো দীনের কুটিরে পদধূলি দিলেন কি জন্য ? কুমারী কুমারদত্তের উপর সদয় হইয়া তাহার সর্বত্র গতিবিধির ব্যবস্থাই বা করিয়া দিলেন কেন ? এখন এই পদ্মকলি লইয়া কি করিব ? কার্যসিদ্ধি হইলে ইহাকে বিনষ্ট করিতেই বা হইবে কেন ? আমি পূর্বে কখনও রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত হই নাই, তাই নানা চিন্তায় মন একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিল। দাসী দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার

বোধ করি, আজ কোথাও অভিসার আছে, কারণ বেশভূষায় একটু শিল্প-চাতুর্য রহিয়াছে। কবরীতে জাতিপুষ্পের শোভা, কঞ্চুলী দৃঢ়বদ্ধ ! দাসী দেখিতে মন্দ নহে, চোখ দুটি বড় বড়, মুখে মিষ্ট হাসি, তার উপর ভরা যৌবন। আমি তাহাকে বলিলাম, "বনলতিকে, তুমি গৃহে যাও, রাত্রি অধিক হইয়াছে।" সে হাসিমুখে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

পদ্মকোরক হস্তে শয়ন-মন্দিরে গেলাম ; বর্তিকার সম্মুখে ধরিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলাম। কোরকটি মুদিত হইয়া আছে, ধীরে ধীরে পলাশগুলি উন্মোচন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে নাভির সমীপবর্তী কোমল পল্লবে অস্পষ্ট চিহ্নসকল চোখে পড়িল। সযত্নে পল্লবটি ছিঁড়িয়া দেখিলাম, কজ্জলমসী দিয়া লিখিত লিপি—'অদ্য মধ্যরাত্রে একাকী মহামন্ত্রীর দ্বারে উপস্থিত হইবে। সংকেত-মন্ত্র—কুট্‌মল।' লিপির নিম্নে মগধেশ্বরের মুদ্রা।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইল। পরিব্রাজিকার নিগূঢ় কথাবার্তা, কুমারীর পূজা সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। গোপনে মহামাত্যের নিকট আমার তলব হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ডাকিয়া পাঠাইলেই তো হইত ! আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি একজন অতি সামান্য নাগরিক, আমাকে লইয়া রাজ্যের মহামাত্য কি করিবেন ? বুড়া অত্যন্ত খিট্‌খিটে, কি জানি যদি না-জানিয়া কোনও অপরাধ করিয়া থাকি তবে হয়তো শূলে চড়াইয়া দিবে। কিংবা কে বলিতে পারে, হয়তো গোপনে কোথাও রত্নাগার নির্মাণ করিতে হইবে, তাই এই সতর্ক আহ্বান।

উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং উত্তেজনায় আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু রাজাদেশ উপেক্ষা করিবার উপায় নাই,—স্বেচ্ছায় না যাইলে হয়তো বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। তাই অবশেষে উত্তরীয় লইয়া পথে বাহির হইলাম।

আমার গৃহ নগরের উত্তরে, মহামন্ত্রীর প্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থলে। পথ জনহীন, পথের উভয় পার্শ্বস্থ গৃহগুলিও নির্বাপিতদীপ, নিদ্রিত। দূরে দূরে সংকীর্ণ পথিপার্শ্বে পাষাণ-বনদেবীর হস্তে স্ফটিকের দীপ জ্বলিতেছে। তাহাতে মধ্যরাত্রের গাঢ় অন্ধকার ঈষৎ আলোকিত।

মহামাত্যের বৃহৎ প্রাসাদ-সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাহিরে অন্ধকার, প্রহরীও নাই ; কিন্তু বহির্দ্বার উন্মুক্ত। একটু ইতস্তত করিয়া, সাহসে ভর করিয়া প্রবেশ করিতে গেলাম—অমনি তীক্ষ্ণ ভল্লের অগ্রভাগ কণ্ঠে ফুটিল ; অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিয়া ভল্লের অন্যপ্রান্ত হইতে কে নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, "তুমি কে ?"

অকস্মাৎ এরূপভাবে আক্রান্ত হইয়া বাক্‌রোধ হইয়া গেল। বর্শার ফলা কণ্ঠ স্পর্শ করিয়া আছে, একটু চাপ দিলেই সর্বনাশ ! আমি মূর্তির মতো ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে এই সনাল পদ্মকলি তুলিয়া ধরিয়া দেখাইলাম।

আততায়ী জিজ্ঞাসা করিল, "উহা কি, নাম বল।"

বলিলাম, "সনাল উৎপল।"

সন্দিগ্ধকণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন হইল, "কি নাম বলিলে ?"

বুঝিলাম, এ প্রহরী। লিপিতে যে সংকেত-মন্ত্র ছিল তাহা স্মরণ হইল, বলিলাম, "কুট্‌মল।"

বর্শা কণ্ঠ হইতে অপসৃত হইল। অন্ধকারে প্রহরী আমার হাত ধরিয়া প্রাসাদের মধ্যে লইয়া চলিল।

সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছুদূর পর্যন্ত সে আমাকে লইয়া গেল। তারপর আর একজন আসিয়া হাত ধরিল। সে আরও কিছুদূর লইয়া গিয়া অন্য এক হস্তে সমর্পণ করিল। এইরূপে পাঁচ-ছয় জন দ্বারী, প্রহরী, প্রতিহারীর হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া অবশেষে এক আলোকিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম।

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে অজিনাসনে বসিয়া একস্তূপ ভূর্জপত্র-তালপত্র সম্মুখে লইয়া বৃদ্ধ মহামন্ত্রী নিবিষ্ট-মনে পাঠ করিতেছেন। কক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। মহামাত্য সম্মুখে আসন নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "উপবিষ্ট হও।"

আমি উপবেশন করিলাম।

মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরিব্রাজিকার হস্তে যে লিপি পাইয়াছিলে, উহা কোথায় ?"

পদ্মদল বাহির করিয়া মহামাত্যকে দিলাম। তিনি সেটার উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভক্ষণ কর।"

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের প্রতি মূঢ়বৎ তাকাইয়া রহিলাম। ভক্ষণ করিব আবার কি ?

মহামন্ত্রী আবার বলিলেন, "এই লিপি ভক্ষণ কর।"

মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ডাকাইয়া পাঠাইয়া তারপর অকারণে লিপি ভক্ষণ করিতে বলা, এ কিরূপ ব্যবহার ? হউন না তিনি রাজমন্ত্রী—তাই বলিয়া—

মন্ত্রীর ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা গেল। আবার অনুচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে—তাই এ সতর্কতা। লিপি সুস্বাদু বলিয়া তোমাকে উহা খাইতে বলি নাই।"

তখন ব্যাপার বুঝিয়া সেই কোমল পদ্মপল্লবটি খাইয়া ফেলিলাম।

তারপর কিছুক্ষণ সমস্ত নীরব। মহামাত্যের শীর্ণ মুখ ভাবলেশহীন। প্রদীপের শিখা নিষ্কম্পভাবে জ্বলিতেছে। আমি উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, এবার কি হইবে ?

হঠাৎ প্রশ্ন হইল, "তুমি জঘনচপলার গৃহে যাতায়াত কর ?"

অতর্কিত প্রশ্নে ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। জঘনচপলা বেশ্যা, তাহার গৃহে যাই কি না সে সংবাদে রাজমন্ত্রীর কি প্রয়োজন ? কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই, বুড়া খোঁজ না লইয়া জিজ্ঞাসা করিবার পাত্র নহে। কুণ্ঠিতস্বরে কহিলাম, "একবার মাত্র গিয়াছিলাম। কিন্তু সে স্থান আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির নয়। তাই আর যাই নাই।"

মন্ত্রী বলিলেন, "ভালো করিয়াছ। সে লিচ্ছবির গুপ্তচর।"

আবার কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ। মহামাত্য ধ্যানমগ্নের মতো বসিয়া আছেন ; আমি আর একটি প্রশ্নের বজ্রাঘাত প্রতীক্ষা করিতেছি।

"তোমার অধীনে কত কর্মিক আছে ?"

"সর্বসুদ্ধ প্রায় দশ সহস্র।"

"স্থপতি কত ?"

"ছয় হাজার।"

"সূত্রধার ?"

"তিন হাজারের কিছু উপর।"

"তক্ষক ও ভাস্কর ?"

"তক্ষক-ভাস্করের সংখ্যা কম—পাঁচশতের অধিক নহে।"

দেখিতে দেখিতে মহামন্ত্রীর নির্জীব শুষ্ক দেহ যেন মন্ত্রবলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। নিষ্প্রভ চক্ষুতে যৌবনের জ্যোতি সঞ্চারিত হইল। তিনি আমার দিকে তর্জনী তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "শুন। এখন বর্ষাকাল। শরৎকাল আসিলে পথঘাট শুকাইলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। দুই দিক্ হইতে শত্রুর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এবার যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ভাগীরথী ও হিরণ্যবাহুর সংগমে এক ঔদক দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। এমন দুর্গ

নির্মাণ করিতে হইবে—যাহাতে পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা নিত্য বাস করিতে পারে। মধ্যে মাত্র তিন মাস সময়। এই তিন মাসের মধ্যে দুর্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। এবার শরৎকালে কোশল ও বৃজি যখন নদী পার হইতে আসিবে, তখন সম্মুখে যেন মগধের গগনলেহী দুর্গচূড়া দেখিতে পায়।"

জলের মৎস্য ধীবরের জাল হইতে জলে ফিরিয়া আসিলে যেরূপ আনন্দিত হয়, আমারও সেইরূপ আনন্দ হইল। এই সকল কথা আমি বুঝি। বলিলাম, "দশ হাজার লোক দিয়া তিন মাসের মধ্যে এরূপ দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই বর্ষাকালে পথ অতিশয় দুর্গম; মালমসলা সংগ্রহ হইবে না।"

মন্ত্রী বলিলেন, "সে ভার তোমার নয়। তুমি শুধু দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিবে। উপাদান সংগ্রহ আমি করিব। রাজ্যের সমস্ত রণহস্তী পাষাণাদি বহন করিয়া দিবে। সেজন্য তোমার চিন্তা নাই।"

আমি বলিলাম, "তবে তিন মাসের মধ্যে দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিব।"

মন্ত্রী বলিলেন, "যদি না পার?"

"আমার মুণ্ড শর্ত রহিল। কবে কার্য আরম্ভ করিব?"

মন্ত্রী ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এখনও রবি স্থিররাশিতে আছেন; আজ হইতে চতুর্থ দিবসে গুরুবাসরে চন্দ্রও স্বাতীনক্ষত্রে গমন করিবেন। অতএব সেই দিনই কার্যের পত্তন হওয়া চাই।"

"যথা আজ্ঞা, তাহাই হইবে।"

কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া মহামাত্য বলিতে লাগিলেন, "এখন যাহা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শুন। তোমার উপর অত্যন্ত গূঢ় কার্যের ভার অর্পিত হইতেছে। সর্বদা স্মরণ রাখিও যে শত্রুরাজ্যে দুর্গনির্মাণের সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা কিছুতেই দুর্গ নির্মাণ করিতে দিবে না, পদে পদে বাধা দিবে। চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে, তাহারা যদি একবার মগধের উদ্দেশ্য জানিতে পারে, সপ্তাহকালমধ্যে কোশলের মহারাজ ও লিচ্ছবির কুলপতিগণ এ সংবাদ বিদিত হইবে। সুতরাং নিরতিশয় সতর্কতার প্রয়োজন। তুমি তোমার দশ সহস্র কর্মিক লইয়া কাল গঙ্গা-শোণ-সংগমে যাত্রা করিবে। এমনভাবে যাত্রা করিবে—যাহাতে কাহারও সন্দেহ উদ্রিক্ত না হয়। একবার যথাস্থানে পৌঁছিতে পারিলে আর কোনও ভয় নাই। কারণ, সে স্থান জঙ্গলপূর্ণ, প্রায় জনহীন। কিন্তু তৎপূর্বে পথে যদি কোনও ব্যক্তিকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিতে দ্বিধা করিবে না। কার্যস্থলে উপস্থিত হইয়া মগধের মুদ্রাঙ্কিত পত্রের প্রতীক্ষা করিবে। সেই পত্রে দুর্গনির্মাণের নির্দেশ ও চিত্র লিপিবদ্ধ থাকিবে। যথাসময়ে চিত্রানুরূপ দুর্গের শুভারম্ভ করিবে। স্মরণ রাখিও, তুমি এ কার্যের নিয়ামক, কোনও বিঘ্ন ঘটিলে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার।"

আমি বলিলাম, "যথা আজ্ঞা। কিন্তু এই দশ সহস্র লোকের রসদ কোথায় পাইব?"

মন্ত্রী বলিলেন, "গঙ্গা-শোণ-সংগমের নিকট পাটলি নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এক সন্ধ্যার জন্য সেই গ্রামে আতিথ্য স্বীকার করিবে। দ্বিতীয় দিনে আমি তোমাদের উপযুক্ত আহার্য পাঠাইব।"

তারপর ঊষাকাল সমাগত দেখিয়া মহামাত্য আমাকে বিদায় দিলেন। বিদায়কালে বলিলেন, "শুনিয়া থাকিবে, সম্প্রতি বৌদ্ধ নামে এক নাস্তিক ধর্ম-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধগণ অতি চতুর ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরোধী। শাক্যবংশের এক রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ ইহাদের নায়ক। এই যুবরাজ অতিশয় ধূর্ত, কপটী ও পরস্বলুব্ধ। মায়াজাল বিস্তার করিয়া গতাসু মগধেশ্বর বিম্বিসারকে বশীভূত করিয়া মগধে স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল; অধুনা অজাতশত্রু কর্তৃক মগধ

হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। এই বৌদ্ধদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, ইহারা মগধের ঘোর শত্রু। দুর্গসন্নিধানে যদি ইহাদের দেখিতে পাও, নির্দয়ভাবে হত্যা করিও।"

তাই ভাবি, কালের কি কুটিল গতি! আড়াই হাজার বৎসর পরে আজ পাটলিপুত্র-রচয়িতা মগধের পরাক্রান্ত মহামন্ত্রী বর্ষকারের নাম কেহ শুনিয়াছে কি? কিন্তু শাক্যবংশের সেই রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ? আজ অর্ধেক এশিয়া তাঁহার নাম জপ করিতেছে। সসাগরা পৃথ্বীকে যাহারা বারবনিতার ন্যায় উপভোগ করিয়াছিল, তাহাদের নাম সেই ভুক্তিতা ধরিত্রীর ধূলিকণার সহিত মিশাইয়া গিয়াছে; আর যে নিঃসম্বল রাজ-ভিখারীর একমাত্র সম্পদ ছিল নির্বাণ, সেই শাক্যসিংহের নাম অনির্বাণ শিখার ন্যায় তমসান্ধ মানবকে জ্যোতির পথ নির্দেশ করিতেছে।

বর্ষাকালে স্থপতি-সূত্রধার-সম্প্রদায় প্রায়শঃ বসিয়া থাকে। তাই আমার শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদিগকে সংগ্রহ করিতে বড় বিলম্ব হইল না। যথাসময় আমার দশ হাজার শিল্পী নগরের ভিন্ন ভিন্ন তোরণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কোনও পথে দুই শত, কোনও পথে চারি শত বাহির হইল—যাহাতে নাগরিক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। বেলা প্রায় তিন প্রহরকালে নগরের উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে সকলে সমবেত হইল।

এখান হইতে গঙ্গা-শোণ-সংগম প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ, ন্যূনাধিক এক দিনের পথ। পরামর্শের পর স্থির হইল যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত যতদূর সম্ভব যাইব, তারপর পথিপার্শ্বে রাত্রি কাটাইয়া পরাহে অতিপ্রত্যূষে আবার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিব। তাহা হইলে মধ্যাহ্নের পূর্বে পাটলিগ্রামে পৌঁছিতে পারা যাইবে।

তখন সকলে যুদ্ধগামী পদাতিক সৈন্যের মতো শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। আকাশে প্রবল মেঘাড়ম্বর, শীতল বায়ু খরভাবে বহিতেছে; রাত্রিতে নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। কিন্তু সেজন্য কাহারও উদ্বেগ নাই। আসন্ন কর্মের উল্লাসে সকলে মহানন্দে গান গাহিতে গাহিতে চলিল।

মগধরাজ্যের স্থানীয় বলিয়া তখন রাজগৃহ হইতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চতুর্দিকে বিভিন্ন রাজ্যে যাইবার পথ ছিল। তদ্‌ভিন্ন নগর হইতে নগরান্তরে যাইবার পথও ছিল। রাজকোষ হইতে পথের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করা হইত। আবশ্যক হিসাবে পথের উপর প্রস্তরখণ্ড বিছাইয়া পথ পাকা করা হইত, পথিকের সুবিধার জন্য পথের ধারে কূপ খনন করানো হইত, ছায়া করিবার জন্য দুই ধারে বট, অশ্বত্থ, শাল্মলী বৃক্ষ রোপিত হইত। মধ্যে নদী পড়িলে সেতু বা খেয়ার বন্দোবস্ত থাকিত।

এই সকল পথে দলবদ্ধ বৈদেশিক বণিক্‌গণ অশ্ব, গর্দভ ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে মহার্ঘ পণ্যভার বহন করিয়া নগরে নগরে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বেড়াইত; নট-কুশীলব সম্প্রদায় আপন আপন কলা-নৈপুণ্য দেখাইয়া ফিরিত। রাজদূত দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া বায়ুবেগে গোপনবার্তা বহন করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইত। কদাচ রাত্রিকালে এই সকল পথে দস্যু-তস্করের ভয়ও শুনা যাইত। বন্য আটবিক জাতিরা এইরূপ উৎপাত করিত। কিন্তু তাহা ক্বচিৎ, কালেভদ্রে। পথের পাশে সৈনিকের গুল্ম থাকায় তস্করগণ অধিক অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। রাজপথ যথাসম্ভব নিরাপদ ছিল।

উত্তরে ভাগীরথীতীর পর্যন্ত মগধের সীমা—সেই পর্যন্ত পথ গিয়াছে। আমরা সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, বায়ু স্তব্ধ এবং আকাশে মেঘপুঞ্জ বর্ষণোন্মুখ হইয়া রহিল। আমরা রাত্রির মতো পথসন্নিকটে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আশ্রয় লইলাম।

প্রত্যেকের সহিত এক সন্ধ্যার আহার্য ছিল। কিন্তু বর্ষাকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে রন্ধনের সুবিধা

নাই। কষ্টে যদি বা অগ্নি জ্বালা যায়, বৃষ্টি পড়িলেই নিবিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তথাপি অনেকে একটা মৃত বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যব-গোধূমচূর্ণ ও শক্তু শানিয়া পিষ্টক-পুরোডাশ তৈয়ার করিতে লাগিল। আবার যাহারা অতটা পরিশ্রম স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা চিপিটক জলে সিক্ত করিয়া দধি-শর্করা সহযোগে ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল।

চারিদিক হইতে দশ হাজার লোকের কলরব, গুঞ্জন, গান, চিৎকার, গালিগালাজ আসিতেছে। দূরে দূরে ধুনির ন্যায় অগ্নি জ্বলিতেছে। অন্ধকারে তাহারই আশেপাশে মানুষের ছায়ামূর্তি ঘুরিতেছে। ক্বচিৎ অগ্নিতে তৈল বা ঘৃত প্রদানের ফলে অগ্নি অত্যুজ্জ্বল শিখা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সেই আলোকে চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট মানুষের মুখ ক্ষণকালের জন্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এ যেন সহসা বিজন প্রান্তর-মধ্যে এক ভৌতিক উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

আমার সহিত কদলী, কপিত্থ, রসাল ইত্যাদি ফল, কিঞ্চিৎ মৃগমাংস এবং এক দ্রোণ লোধ্ররেণু চিত্রকাদির দ্বারা সুরভিত হিঙ্গুল-বর্ণ অতি উৎকৃষ্ট আসব ছিল। আমি তদ্দ্বারা আমার নৈশ আহার সুসম্পন্ন করিলাম।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে চলিল। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে মৃত্তিকার উপর আস্তরণ পাতিয়া আমি শয়নের উপক্রম করিতেছি, এমন সময় অন্ধকারে দুই জন লোক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে ?"

একজন উত্তর দিল, "নায়ক, আমি এই ছাউনির রক্ষী। অপরিচিত এক ব্যক্তি কূপের নিকট বসিয়াছিল, তাই আদেশমত ধরিয়া আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "মশাল জ্বাল।"

মশাল জ্বলিলে দেখিলাম, প্রহরীর সঙ্গে এক দীর্ঘাকৃতি নগ্নপ্রায় অতিশয় শ্মশ্রুগুম্ফজটাবহুল পুরুষ। শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্র নাসা, চক্ষু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কূপ-সন্নিকটে কি করিতেছিলে ?"

সে ব্যক্তি স্থিরনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি রাষ্ট্রপতি হইবে ; তোমার ললাটে রাজদণ্ড দেখিতেছি।"

কৈতববাদে ভুলিবার বয়স আমার নাই। উপরন্তু মহামাত্য যে সন্দেহ আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, এই অপরিচিত জটিল সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র তাহা জাগরূক হইয়া উঠিল। বলিলাম, "আপনি দেখিতেছি জ্যোতির্বিদ। আসন পরিগ্রহ করুন।"

আসন গ্রহণ করিয়া জটাধারী কহিলেন, "আমি শৈব সন্ন্যাসী। রুদ্রের কৃপায় আমার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে। ত্রিকাল আমার নখ-দর্পণে প্রকট হয়। আমি দেখিতেছি, তুমি অদূর-ভবিষ্যতে মহালোকপালরূপে রাজদণ্ড ধারণ করিবে। তোমার যশোদীপ্তিতে ভূতপূর্ব রাজন্যগণের কীর্তিপ্রভা ম্লান হইয়া যাইবে।"

সন্ন্যাসীকে বুঝিয়া লইলাম। অত্যন্ত শ্রদ্ধাপ্লুতকণ্ঠে কহিলাম, "আপনি মহাজ্ঞানী। আমি অতি দুষ্কর কার্যে যাইতেছি ; কার্যে সফল হইব কি না, আজ্ঞা করুন।"

ত্রিকালদর্শী ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ নিমীলিতনেত্রে রহিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনিই বলুন।"

সন্ন্যাসী তখন মৃত্তিকার উপর এক খণ্ড প্রস্তর দিয়া রাশিচক্র আঁকিলেন। আমি মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করিলাম, "এ কি, আপনার নখ-দর্পণ কোথায় গেল ?"

সন্ন্যাসী আমার প্রতি সন্দেহপ্রখর এক দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন, "সূক্ষ্ম গণনা নখ-দর্পণে হয় না। তুমি জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, এ সকল বুঝিবে না।"

আমি বিনীতভাবে নীরব রহিলাম। সন্ন্যাসী গভীর মনঃসংযোগে রাশিচক্রে আঁক কষিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অঙ্কপাত করিবার পর মুখ তুলিয়া কহিলেন, "তুমি কোনও গুপ্ত রাজকার্যে পররাজ্যে যাইতেছ। শনি ও মঙ্গল দৃষ্টি-বিনিময় করিতেছে, এজন্য মনে হয় তুমি যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোনও গূঢ় কার্যে ব্যাপৃত আছ।" এই বলিয়া সপ্রশ্ননেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি চমৎকৃত হইয়া বলিলাম, "আপনি সত্যই ভবিষ্যদ্দর্শী, আপনার অগোচর কিছুই নাই। আমি রাজানুজ্ঞায় লিচ্ছবি দেশে যাইতেছি, কি উদ্দেশ্যে যাইতেছি তাহা অবশ্যই আপনার ন্যায় জ্ঞানীর অবিদিত নাই। এখন কৃপা করিয়া আমার এক সুহৃদের ভাগ্যগণনা করিয়া দিতে হইবে। প্রহরী, কুলিক মিহিরমিত্র জম্বু-বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাকে ডাক।"

কুলিক মিহিরমিত্র আমার অধীনে প্রধান শিল্পী এবং আমার প্রাণোপম বন্ধু। ভাস্কর্যে তাহার যেরূপ অধিকার, জ্যোতিষশাস্ত্রেও সেইরূপ পারদর্শিতা। ভৃগু, পরাশর, জৈমিনি তাহার কণ্ঠাগ্রে।

মিহিরমিত্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলে, আমি সন্ন্যাসীকে নির্দেশ করিয়া কহিলাম, "ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, তোমার ভাগ্য গণনা করিবেন।"

মিহিরমিত্র সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া বসিল। তাঁহার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া নিজ করতল প্রসারিত করিয়া বলিল, "কোন্ লগ্নে আমার জন্ম ?"

সন্ন্যাসীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঈষৎ চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠার লক্ষণ দেখা দিল। সে করতলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই বলিল, "তোমার অকালমৃত্যু ঘটিবে।"

মিহিরমিত্র বলিল, "ঘটুক, কোন্ লগ্নে আমার জন্ম ?"

সন্ন্যাসী ইতস্তত করিয়া বলিল, "বৃষ লগ্নে।"

"বৃষ লগ্নে!" মিহিরমিত্র হাসিল, "উত্তম। চন্দ্র কোথায় ?"

"তুলা রাশিতে।"

"তুলা রাশিতে ? ভালো। কোন্ নক্ষত্রে ?"

সন্ন্যাসী নীরব। ব্যাকুলনেত্রে একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু পলায়নের পথ নাই। জ্যোতিষীর নাম শুনিয়া উৎসুক কর্মিকগণ একে একে আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মিহিরমিত্র কঠোরকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল, "চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে ?"

জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠাধর লেহন করিয়া স্খলিতকণ্ঠে সন্ন্যাসী কহিল, "চন্দ্র মৃগশিরা নক্ষত্রে।"

মিহিরমিত্র আমার দিকে ফিরিয়া অল্প হাস্য করিয়া বলিল, "এ ব্যক্তি শঠ। জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছুই জানে না।"

তখন সন্ন্যাসী দ্রুত উঠিয়া সেই শ্রমিক-ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী অসাধারণ বলিষ্ঠ—কিন্তু বিশ জনের বিরুদ্ধে একা কি করিবে ? অল্পকালের মধ্যেই সকলে ধরিয়া তাহাকে ভূমিতে নিপাতিত করিল। রজ্জু দ্বারা তাহার হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিবার পর সন্ন্যাসী বলিল, "মহাশয়, আমাকে বৃথা বন্ধন করিতেছেন। আমি দীন ভিক্ষুক মাত্র, জ্যোতিষীর ভান করিয়া কিছু বেশি উপার্জনের চেষ্টা করিয়াছিলাম ; কিন্তু আপনারা জ্ঞানী—আমার কপটতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। এখন দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমার যথেষ্ট দণ্ডভোগ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "ভণ্ড সন্ন্যাসী, তুমি কোশল অথবা বৃজির গুপ্তচর। আমাকে ভুলাইয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলে।"

সন্ন্যাসী ভয়ে চিৎকার করিতে লাগিল, "কুমারীর শপথ, জয়ন্তের শপথ, আমি গুপ্তচর নহি। আমি ভিক্ষুক। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আর কখনও এমন কাজ করিব না...উঃ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত—একটু জল..." এই পর্যন্ত বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

আমি একজন প্রহরীকে আদেশ করিলাম, "কূপ হইতে এক পাত্র জল আনিয়া ইহাকে দাও।"

জল আনীত হইলে সন্ন্যাসীর মুখের কাছে জলপাত্র ধরা হইল। কিন্তু সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট, জল পানের কোনও আগ্রহ নাই।

প্রহরী বলিল, "জল আনিয়াছি—পান কর।"

সন্ন্যাসী নীরব নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল, কথা কহিল না। আমি তখন তাহার নিকটে গিয়া বলিলাম, "তৃষ্ণার্ত বলিতেছিলে, জল পান করিতেছ না কেন?"

সন্ন্যাসী তখন ক্ষীণস্বরে কহিল, "আমি জল পান করিব না।"

সহসা যে প্রহরী জল আনিয়াছিল, সে জলপাত্র ফেলিয়া দিয়া কাতরোক্তি করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। 'কি হইল, কি হইল'—বলিয়া সকলে তাহাকে ধরিয়া তুলিল। দেখা গেল, এই অল্পকালের মধ্যে তাহার মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মুখ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ক্রমে সৃক্কণী বহিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল। বাক্য একেবারে রোধ হইয়া গিয়াছে। 'কি হইয়াছে?' 'কেন এরূপ করিতেছ?'—এই প্রকার বহু প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল ভূপতিত জলপাত্রটি অঙ্গুলিসংকেতে দেখাইতে লাগিল।

তারপর অর্ধদণ্ডের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণায় হস্তপদ উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে উৎকট মুখভঙ্গি করিয়া প্রহরী ইহলোক ত্যাগ করিল। তাহার বিষ-বিধ্বস্ত দেহ মৃত্যুর করস্পর্শে শান্ত হইলে পর, সমবেত সকলের দৃষ্টি সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর উপর গিয়া পড়িল। ক্রোধান্ধ জনতার সেই জিঘাংসানিষ্ঠুর দৃষ্টির অগ্নিতে সন্ন্যাসী যেন পুড়িয়া কুঁকড়াইয়া গেল।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে বোধ করি সেই ক্ষিপ্ত কর্মিকদল সন্ন্যাসীর দেহ শত খণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিত, কিন্তু সেই মুহূর্তে শ্রমিক-ব্যূহ ঠেলিয়া কর্মিক-জ্যেষ্ঠ বিশালকায় দিঙ্‌নাগ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূশায়িত সন্ন্যাসীর জটা ধরিয়া সকলের দিকে ফিরিয়া পরুষ-কণ্ঠে কহিল, "ভাই সব, এই ভণ্ড তপস্বী শত্রুর চর। আমাদের প্রাণনাশের জন্য কূপের জল বিষ-মিশ্রিত করিয়াছে। ইহার একমাত্র উচিত শাস্তি—মৃত্যু; অতএব সে শাস্তি আমরা ইহাকে দিব। কিন্তু এখন নয়। তোমরা সকলেই জান, যে কার্যে আমরা যাইতেছি, তাহাতে নরবলির প্রয়োজন। ভৈরবের তুষ্টিসাধন না করিলে আমাদের কার্য সুসম্পন্ন হইবে না। সুতরাং এখন কেহ ইহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিও না। যথাসময় গঙ্গার উপকূলে আমরা ইহাকে জীবন্ত সমাধি দিব। এই পাপাত্মার প্রেতমূর্তি অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের দুর্গ পাহারা দিবে।"

দিঙ্‌নাগের কথায় সকলে ক্ষান্ত হইল।

তারপর মৃত প্রহরীর দেহ সকলে মিলিয়া কূপ-সন্নিকটে এক বৃক্ষতলে সমাধিস্থ করিল এবং সন্ন্যাসীকে সেই বৃক্ষশাখায় হস্তপদ বাঁধিয়া ভাণ্ডবৎ ঝুলাইয়া রাখিল।

পরদিন প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া আমরা বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরে পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার উপকূলে জঙ্গল পরিবৃত অতি ক্ষুদ্র একটি জনপদ—সর্বসাকুল্যে বোধ করি পঞ্চাশটি দরিদ্র পরিবারের বাস। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই নিষাদ কিংবা জালিক—বনে পশু শিকার করিয়া এবং নদীতে মৎস্য ধরিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। মাঝে মাঝে বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষাদি কাটিয়া, ক্ষেত্র সমতল করিয়া, যব গোধূম চণক ইত্যাদিও উৎপন্ন করে। আমরা সদলবলে উপস্থিত হইলে গ্রামিকেরা আমাদের আততায়ী মনে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা অনেক আশ্বাস দিলাম, কিন্তু কেহ শুনিল না, কিরাতভীত মৃগযূথের মতো গভীর বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তখন আমরা অনাহূত যেখানে যাহা পাইলাম, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। গ্রামের সম্বৎসরের সঞ্চিত খাদ্য এক সন্ধ্যার আহারে প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল।

সেদিন আর কোনও কাজ হইল না। শ্রান্ত কর্মিকদল যে যেখানে পারিল ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে কাজের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। রণহস্তীর পৃষ্ঠে স্তূপীকৃত খাদ্য বস্ত্রাবাস প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। ছাউনি ফেলিতে, প্রস্তরাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে সমস্ত দিন কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ রহিল না।

দূতহস্তে মহামন্ত্রী দুর্গের নক্সা পাঠাইয়াছেন, তাহা লইয়া মিহিরমিত্র ও দিঙ্‌নাগকে সঙ্গে করিয়া আমি দুর্গের স্থান-নির্ণয়ের জন্য নদীসংগমে গেলাম। বর্ষায় কূলপ্লাবী দুই মহানদী স্ফীত তরঙ্গায়িত হইয়া ঘোররবে ছুটিয়াছে। গঙ্গা ধূসর, শোণ স্বর্ণাভ। দুই স্রোত যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেখানে আবর্তিত জলরাশি ফেন-পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সংগমের দক্ষিণ উপকূলে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে, শোণ এবং সংযুক্ত প্রবাহের সন্ধিস্থলে এক বিশাল দ্বিভুজের সৃষ্টি হইয়াছে—মনে হয় যে, দুই নদী বাহু বিস্তার করিয়া দক্ষিণের তটভূমিকে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস করিতেছে। বহু পর্যবেক্ষণ ও বিচারের পর স্থির করিলাম যে, এই দ্বিভুজের মধ্যেই দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। কারণ, তাহা হইলে দুর্গের দুই দিক্ নদীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিবে, পরিখা-খননের প্রয়োজন হইবে না।

তারপর সেই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কৃত করিবার জন্য লোক লাগিয়া গেল। বড় বড় পুরাতন বৃক্ষ কাটিয়া ভূমি সমতল করা হইতে লাগিল। হস্তীসকল ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ড টানিয়া বাহিরে লইয়া ফেলিতে লাগিল। বৃক্ষপতনের মড়মড় শব্দে, মানুষের কোলাহলে, হস্তী ও অশ্বের নিনাদে দিক্‌প্রান্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। যেন বহু-যুগব্যাপী নিদ্রার পর অরণ্যানী কোন দৈত্যের বিজয়নাদে চমকিয়া উঠিল।

সমস্ত দিন এইরূপ পরিশ্রমের পর রাত্রিতে আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দিঙ্‌নাগ আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "নায়ক, রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত ; আজ দুর্গারম্ভের পূর্বে দৈবকার্য করিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপ দৈবকার্য ?"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন ? সেই ভণ্ড তপস্বী—আজ তাহাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।"

তখন সকল কথা স্মরণ হইল। বলিলাম, "ঠিক কথা, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তা বেশ, তাহাকে যখন বধ করিতেই হইবে, তখন এক কার্যে দুই ফল হউক। শত্রু নিপাত ও দেবতুষ্টি একসঙ্গেই হইবে। কিন্তু এই সকল দৈবকার্যের কি কি অনুষ্ঠান তাহা কি তোমাদের জানা আছে ?"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "অনুষ্ঠান কিছুই নহে। বলিকে সুরাপান করাইয়া যখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, তখন তাহার কানে কানে বলিতে হইবে, 'তুমি চিরদিন প্রেতদেহে এই দুর্গ রক্ষা করিতে থাক।'—এই বলিয়া তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।"

আমি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এত বিধি-ব্যবস্থা জানিলে কোথা হইতে ?"

দিঙ্‌নাগ হাসিয়া বলিল, "এ কার্য আমি পূর্বে করিয়াছি। ধনশ্রী শ্রেষ্ঠী যখন গুপ্ত রত্নাগার মাটির নীচে তৈয়ার করে, তখন আমিই কুলিক ছিলাম। সেই সময় অরণ্য হইতে এক শবর ধরিয়া আনিয়া শ্রেষ্ঠী এই নরযাগ সম্পন্ন করে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

আমি বলিলাম, "তবে এ কার্যও তুমিই কর।"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "করিব। কিন্তু নায়ক, কার্যকালে আপনাকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে। ইহাই বিধি।"

"বেশ থাকিব।"

দিঙ্‌নাগ চলিয়া যাইবার পর নানা চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছি, এমন সময় সে ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "নায়ক, সর্বনাশ! সন্ন্যাসী আমাদের ফাঁকি দিয়াছে!"

"ফাঁকি দিয়াছে?"

"বিষপান করিয়াছে। তাহার কবচের মধ্যে বিষ লুকানো ছিল, জীবন্ত সমাধির ভয়ে তাহাই খাইয়া মরিয়াছে। এখন উপায়?"

"কিসের উপায়?"

"মানস করিয়াছি, বলি না দিলে যে সর্বনাশ হইবে! রুদ্র কুপিত হইবেন।" দিঙ্‌নাগ মাটিতে বসিয়া পড়িল।

চিন্তার কথা বটে। নির্বোধ সন্ন্যাসীটা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিল না। পাছে আমাদের একটু উপকার হয়, তাই তাড়াতাড়ি বিষপান করিয়া বসিল। এদিকে আমন্ত্রিত দেবতা প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অন্য বলি কোথায় পাওয়া যায়?

বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িয়াছি, এরূপ সময় শিবিরের প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, "কতকগুলা মুণ্ডিত-মস্তক ভিখারী ছাউনিতে আশ্রয় খুঁজিতেছিল, ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছি। আজ্ঞা হয় তো লইয়া আসি।"

দিঙ্‌নাগ লাফাইয়া উঠিয়া মহানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, "জয় রুদ্রেশ্বর, জয় ভৈরব!...নায়ক, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন!"

এত সহজে যে বলি-সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে তাহা ভাবি নাই। ভিখারী অপেক্ষা উত্তম বলি আর কোথায় পাওয়া যাইবে? দিঙ্‌নাগ ঠিকই বলিয়াছে, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন।

সর্বসুদ্ধ চারি-পাঁচটি ভিখারী,—পরিধানে কৌপীন, সংঘাটি ও উত্তরীয়, হস্তে ভিক্ষাপাত্র,—আমার সম্মুখে আনীত হইল। ভিক্ষুকগণ সকলেই বয়স্থ;—কেবল একটি বৃদ্ধ,—বয়স বোধ করি সত্তর অতিক্রম করিয়াছে।

বৃদ্ধ স্মিত হাস্যে বলিলেন, "মঙ্গল হউক!"

এই বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। আমি কে, কোথায় আছি, এক মুহূর্তে সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। কেবল বুকের মধ্যে এক অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস আলোড়িত হইয়া উঠিল। কে ইনি? এত সুন্দর, এত মধুর, এত করুণাসিক্ত মুখকান্তি তো মানুষের কখনও দেখি নাই। দেবতার মুখে যে জ্যোতির্মণ্ডল কল্পনা করিয়াছি, আজ এই বৃদ্ধের মুখে তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। এই জ্যোতির স্ফুরণ বাহিরে অতি অল্প, কিন্তু চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, ভিতরে অমিতদ্যুতি স্থির সৌদামিনী জ্বলিতেছে। কিন্তু সে সৌদামিনীতে জ্বালা নাই, তাহা অতি স্নিগ্ধ, অতি শীতল, যেন হিম-নির্ঝরিণীর শীকর-নিষিক্ত।

সে মূর্তির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটি শব্দ কেবল রণিত হইতে লাগিল—'অমিতাভ! অমিতাভ!'

আমি বাক্‌রহিত হইয়া বসিয়া আছি দেখিয়া তিনি আবার হাসিলেন। অপূর্ব প্রভায় সে মুখ আবার সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বৎস, আমরা যাযাবর ভিক্ষু, কুশীনগর যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছি। অদ্য রাত্রির জন্য তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি।"

অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

তাঁহার একজন সহচর উত্তর করিলেন, "শাক্যসিংহ গৌতমের নাম কখনও শুন নাই?"

শাক্যসিংহ? ইনিই তবে সেই শাক্যবংশের রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ! মহামন্ত্রী বর্ষকারের কথা মনে

পড়িল। ইহারই উদ্দেশে তিনি বলিয়াছিলেন,—ধূর্ত, কপটী, পরস্বলুব্ধ! মরি মরি, কে ধূর্ত কপটী? মনে হইল, মানুষ তো অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু আজ এই প্রথম মানুষ দেখিলাম। হায়, মহামন্ত্রী বর্ষকার, তুমি এই পুরুষসিংহকে দেখ নাই, কিংবা দেখিয়াও আত্মাভিমানে অন্ধ ছিলে। নহিলে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতে না।

বুকের মধ্যে প্রবল রোদনের উচ্ছ্বাস সমস্ত দেহকে কম্পিত করিতে লাগিল। আমার অতিবাহিত জীবনের অপরিমেয় শূন্যতা, অশেষ দৈন্য, যেন এককালে মূর্তি ধরিয়া আমার সম্মুখে দেখা দিল, কি পাইয়া এত দিন ভুলিয়া ছিলাম!

আমি উঠিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলাম, "অমিতাভ, আমি অন্ধ, আমাকে চক্ষু দাও, আমাকে আলোকের পথ দেখাইয়া দাও।"

অমিতাভ আমাকে ধরিয়া তুলিলেন। মস্তকে করার্পণ করিয়া বলিলেন, "পুত্র, আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার অন্তরের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইবে, আপনিই আলোকের পথ দেখিতে পাইবে।"

আমি আবার তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলাম, "না, শ্রীমন্, আমার হৃদয় অন্ধকার। আজ প্রথম তোমার মুখে দিব্যজ্যোতি দেখিয়াছি। ঐ জ্যোতির কণামাত্র আমাকে দান কর।"

একজন ভিক্ষু বলিলেন, "শাস্তা, আপনি ইহাকে ত্রিশরণ দান করুন।"

শাক্যসিংহ কহিলেন, "আনন্দ, তাহাই হউক। আমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "পুত্র, তুমি ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়া গৃহস্থের অষ্টশীল পালন কর। আশীর্বাদ করি, যেন বাসনামুক্ত হইতে পার।"

তখন বুদ্ধের চরণতলে বসিয়া তদ্‌গতকণ্ঠে তিনবার ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করিলাম।

অদূরে দাঁড়াইয়া দিঙ্‌নাগ—দুর্ধর্ষ, নিষ্করুণ, অসুরপ্রকৃতি দিঙ্‌নাগ—গলদশ্রু হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার বিকৃত কণ্ঠ হইতে কি কথা বাহির হইতে লাগিল বুঝা গেল না।

এ যেন কয়েক পলের মধ্যে এক মহা ভূমিকম্পে আমাদের অতীত জীবন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কীট ছিলাম, এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম।

পরদিন ঊষাকালে তথাগত কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হিরণ্যবাহুর সুবর্ণ-সৈকতে দাঁড়াইয়া আমার হস্তধারণ করিয়া তিনি কহিলেন, "পুত্র, আমি চলিলাম। হিংসায় হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়—এ কথা স্মরণ রাখিও।"

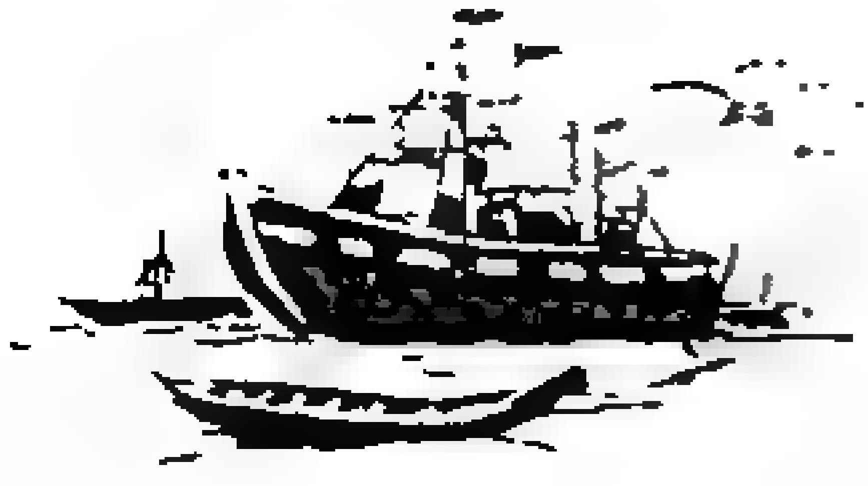
বাষ্পাকুল-স্বরে কহিলাম, "শাস্তা, আবার কত দিনে সাক্ষাৎ পাইব?"

সেই হিমবিদ্যুতের ন্যায় হাসি তাঁহার ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল, বলিলেন, "আমি কুশীনগর যাইতেছি, আর ফিরিব না।"

তারপর বহুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে গঙ্গা-শোণ-সংগমে দুর্গভূমির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। শেষে স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, "আমি দেখিতেছি, তোমার এই কীর্তি বহু সহস্রবর্ষ স্থায়ী হইবে। এই ক্ষুদ্র পাটলিগ্রাম ও তোমার নির্মিত এই দুর্গ এক মহীয়সী নগরীতে পরিণত হইবে। বাণিজ্যে, ঐশ্বর্যে, শিল্পে, কারুকলায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে। সদ্ধর্ম এইস্থানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। তোমার কীর্তি অবিনশ্বর হউক।"

এই বলিয়া, পুনর্বার আমাকে আশীর্বাদ করিয়া, দিব্যদর্শী পরিনির্বাণের পথে যাত্রা করিলেন।

১৯৩০



রক্ত-সন্ধ্যা

মানুষের সহজ সাধারণ বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রার মাঝখানে ভূমিকম্পের মতো এমন এক-একটা ঘটনা ঘটিয়া যায় যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া সেটাকে একটা অসম্ভব অঘটন বলিয়া মনে হয়। যে গল্পটা আজ বলিতে বসিয়াছি, সেটাও একদিন এমনই অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আমার জীবনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। যদিও শুধু দর্শক হিসাবে ছাড়া এ গল্পের সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব নাই, তবু ইহা আমার মনের উপর এমন একটা গভীর দাগ কাটিয়া দিয়াছে—যাহা বোধ করি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুছিবে না।

যে লোকটার কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি, আজ সাত দিন হইল সে হাইকোর্টের রায় মাথায় করিয়া পরলোক যাত্রা করিয়াছে। সুতরাং সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত করিবার আমার আর উপায় নাই। তবে সংবাদপত্রের নথি হইতে এবং আসামীর বিচারের সময় সাক্ষীদের মুখের যে যে কথা এই গল্পে কাজে আসিতে পারে, তাহা প্রয়োজনমত ব্যবহার করিব। বিশ্বাস আমি কাহাকেও করিতে বলি না এবং নিছক গাঁজা বলিয়া যাঁহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও আমার কোনও নালিশ নাই। আমি শুধু এইটুকুই ভাবি যে, সে লোকটা মরিবার পূর্বে নিজের দোষ-ক্ষালনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও এতগুলি অনাবশ্যক মিথ্যা কথা বলিয়া গেল কেন?

এই সময় দৈনিক সংবাদপত্র 'কালকেতু'তে এই ঘটনার যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল, তাহাই সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"গতকল্য বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় কলিকাতার দুর্গাচরণ ব্যানার্জির লেনে এক কসাইয়ের দোকানে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। দোকানের মালিক গোলাম কাদের অন্য দিনের ন্যায় যথারীতি মাংস বিক্রয় করিতেছিল। দোকানে কয়েকজন ফিরিঙ্গী ও মুসলমান খরিদ্দার উপস্থিত ছিল। এমন সময় একজন অপরিচিত ফিরিঙ্গী দোকানে প্রবেশ করিয়া কিছু গোমাংস খরিদ করিতে চাহে। তাহাকে দেখিয়াই দোকানদার গোলাম কাদের ভীষণ চিৎকার করিয়া মাংস-কাটা ছুরি হস্তে তাহার উপর লাফাইয়া পড়ে এবং নৃশংসভাবে তাহার বুকে, পেটে, মুখে ছুরিকাঘাত করিতে থাকে। আক্রান্ত ব্যক্তি মাটিতে পড়িয়া যায়, তখন গোলাম কাদের তাহার বুকের উপর বসিয়া এক একবার ছুরিকাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বলিতে থাকে, "ভাস্কো-ডা-গামা, এই আমার স্ত্রীর জন্যে—এই আমার কন্যার জন্যে—এই আমার বৃদ্ধ পিতার জন্যে।" দোকানে যাহারা ছিল সকলেই এই লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিয়া দ্রুত পলায়ন করিয়া পুলিসে খবর দেয়। পুলিস আসিয়া যখন গোলাম কাদেরকে গ্রেপ্তার করিল, তখনও সে মৃতদেহের উপর ছুরি চালাইতেছে ও পূর্ববৎ বকিতেছে।

"সন্দেহ হয় যে, গোলাম কাদের হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে। কারণ, হত ব্যক্তির সহিত পূর্ব হইতে তাহার পরিচয় ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে না এবং তাহার স্ত্রী, কন্যা বা বৃদ্ধ পিতা কেহই বর্তমান নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গোলাম কাদের প্রায় পনেরো বৎসর পূর্বে বিপত্নীক হইয়াছিল। তাহার স্ত্রী এক মৃত কন্যা প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পর সে আর বিবাহ করে নাই।

"পুলিস-তদন্তে বাহির হইয়াছে যে, হত ব্যক্তি গোয়া হইতে নবাগত একজন পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গী, ব্যবসায় উপলক্ষে কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতায় আসিয়া এক ক্ষুদ্র হোটেলে বাস

করিতেছিল। তাহার নাম গেব্রিয়েল ডিরোজা।

"গোলাম কাদের এখন হাজতে আছে। ডিরোজার লাস পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।"

ঘটনাস্থলের খুব কাছেই আমার বাড়ি এবং অনেকদিন হইতে এই গোলাম কাদের লোকটার সহিত আমার মুখ-চেনাচিনি ছিল বলিয়াই ব্যাপারটা বেশি করিয়া আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহা ছাড়া আর একটি জিনিস আমার কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়াছিল, সেটি ভাস্কো-ডা-গামার নাম। ছেলেবেলা হইতেই আমি ইতিহাসের ভক্ত, তাই হঠাৎ কসাইখানার হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নামটা উঠিয়া পড়ায় আমার মন সচকিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। 'ভাস্কো-ডা-গামা' সাধারণ প্রচলিত নাম নহে; একজন অশিক্ষিত মুসলমান কসাইয়ের মুখে এ নাম এমন অবস্থায় উচ্চারিত হইতে দেখিয়া কোন্ এক গুপ্ত রোমান্সের গন্ধে আমার মনটা ভরিয়া উঠিয়াছিল। কি অদ্ভুত রহস্য এই বিশ্রী হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে? কে এই গেব্রিয়েল ডিরোজা—যাহাকে হত্যাকারী ভাস্কো-ডা-গামা বলিয়া সম্বোধন করিল? সত্যই কি ইহা কেবলমাত্র এক বাতুলের দায়িত্বহীন প্রলাপ?

তা সে যাহাই হউক, কৌতূহল আমার এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, যেদিন এই মোকদ্দমা করোনারের কোর্টে উঠিল, সেদিন আমি একটু সকাল সকাল আদালতে গিয়া হাজির হইলাম। করোনার তখনও উপস্থিত হন নাই, কিন্তু আসামীকে আনা হইয়াছে। চারিদিকে পুলিস গিসগিস করিতেছে। আসামীর হাতে হাতকড়া—একটি টুলের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে চিনিতে পারিল এবং হাত তুলিয়া সেলাম করিল। পাগলের লক্ষণ কিছুই দেখিলাম না, নিতান্ত সহজ মানুষের মতো চেহারা। মুখে ভয় বা উৎকণ্ঠার কোনও চিহ্নই নাই। দেখিয়া কে বলিবে, এই লোকটাই দুই দিন আগে এমন নির্দয়ভাবে আর একটা লোককে হত্যা করিয়াছে।

করোনার আসিয়া পড়িলেন। তখন কাজ আরম্ভ হইল। প্রথমেই ডাক্তার আসিয়া এজাহার দিলেন। তিনি বলিলেন, লাসের গায়ে সর্বসুদ্ধ সাতান্নটি ছুরিকাঘাত পাওয়া গিয়াছে। এই সাতান্নটির মধ্যে কোন্‌টি মৃত্যুর কারণ, বলা শক্ত। কারণ, সবগুলিই সমান সাংঘাতিক।

ডাক্তারের জবানবন্দি শেষ হইলে জর্জ ম্যাথুস নামক একজন দেশী খ্রীস্টানকে সাক্ষী ডাকা হইল। অন্যান্য সওয়াল জবাবের পর সাক্ষী কহিল, 'আমি গত দশ বৎসর প্রায় প্রত্যহ গোলাম কাদেরের দোকানে মাংস কিনিয়াছি; কিন্তু কোনও দিন তাহার এরূপ ভাব দেখি নাই। সে স্বভাবত বেশ শান্তশিষ্ট লোক।'

প্রশ্ন—আপনার কি মনে হয়, সে যে-সময় হত ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, সে সময় সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না?

উত্তর—হত ব্যক্তি দোকানে প্রবেশ করিবার আগে পর্যন্ত সে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল—আমাদের সঙ্গে সহজভাবে কথাবার্তা কহিতেছিল; কিন্তু ডিরোজাকে দেখিয়াই একেবারে যেন পাগল হইয়া গেল।

প্রশ্ন—আপনার কি বোধ হয়, আসামী হত ব্যক্তিকে পূর্ব হইতে চিনিত?

উত্তর—হাঁ। কিন্তু তাহার আসল নাম না বলিয়া ভাস্কো-ডা-গামা বলিয়া ডাকিয়াছিল।

প্রশ্ন—ডিরোজা আক্রান্ত হইয়া কোনও কথা বলিয়াছিল?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—আসামী মদ বা অন্য কোনও নেশা করে, আপনি জানেন?

উত্তর—আমি কখনও তাহাকে নেশা করিতে বা মাতাল হইতে দেখি নাই।

প্রশ্ন—আসামীর ভাবে ইঙ্গিতে কি আপনার বোধ হইয়াছিল যে, সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ

করিবার জন্য ডিরোজাকে খুন করিতেছে ?

উত্তর—হাঁ। তাহার কথায় ও মুখের ভাবে আমার মনে হইয়াছিল যে, ডিরোজা পূর্বে তাহার স্ত্রী, কন্যা ও বৃদ্ধ পিতার উপর কোনও অত্যাচার করিয়া থাকিবে।

জর্জ ম্যাথুসের পরে আরও কয়েকজন সাক্ষী প্রায় ওই মর্মে এজাহার দিবার পর পুলিসের ডেপুটি কমিশনার এজাহার দিতে উঠিলেন। তিনি বলিলেন যে, গোয়া হইতে খবর পাইয়াছেন যে, ডিরোজা সেখানকার একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, জাতিতে ফিরিঙ্গী পোর্তুগীজ—বয়স বিয়াল্লিশ বৎসর। সে পূর্বে কখনও গোয়া ছাড়িয়া অন্যত্র যায় নাই—জীবনে এই প্রথম কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিল। আসামী সম্বন্ধে ডেপুটি কমিশনার বলিলেন, 'আসামীর আত্মীয়-স্বজন স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহ নাই। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। তাহার বয়স অনুমান সাতচল্লিশ বৎসর। সুতরাং ডিরোজার সহিত তাহার যে পূর্বে কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে না।'

আসামী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এবার সে কথা কহিল, বলিল, 'ডা-গামাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি।'

মুহূর্তমধ্যে ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। করোনার ডেপুটি কমিশনারকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া আসামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ডিরোজাকে পূর্ব হইতে জানো ?'

আসামী বলিল, 'ডিরোজাকে আমি কখনও দেখি নাই—আমি ভাস্কো-ডা-গামাকে চিনি। ভাস্কো-ডা-গামা ছদ্মবেশে আমার দোকানে মাংস কিনিতে আসিয়াছিল।'

করোনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আসামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, ভাস্কো-ডা-গামাকে তুমি কোথায় দেখিয়াছ ?'

আসামী কহিল, 'প্রথম দেখি কালিকটের বন্দরে—শেষ দেখি সমুদ্রের বুকের উপর—' এই পর্যন্ত বলিয়া আসামী হঠাৎ থামিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। সে অবরুদ্ধকণ্ঠে একবার 'ইয়া খোদা !'—বলিয়া দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল—আর কোনও কথা বলিল না।

তারপর করোনার যথাসময়ে রায় দিলেন যে, ক্ষণিক উন্মত্ততার বশে গোলাম কাদের ডিরোজাকে খুন করিয়াছে।

কোর্ট হইতে যখন বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমার মাথার ভিতর ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। 'কালিকট', 'সমুদ্রের বুকের উপর'—আসামী এ সব কি বলিল ? আরও কত কথা, না জানি কোন্ অপূর্ব কাহিনী এই মূর্খ নিরক্ষর কসাই গোলাম কাদেরের বুকের মধ্যে লুকানো আছে। কারণ, সে যে পাগলামির ভান করিতেছে না, তাহা নিঃসন্দেহ। কোনও কথা বা কাজই তাহার পাগলের মতো নহে। অথচ দুই-একটা অসংলগ্ন কথার ভিতর দিয়া অতীতের পর্দার একটা কোণ তুলিয়া ধরিয়া এ কি এক আশ্চর্য রূপকথার ইঙ্গিত দিয়া গেল !

ইহার পর গোলাম কাদেরের ভাগ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিস্তারিতভাবে বলিবার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। দায়রা-সোপর্দ হইয়া মামলা হাইকোর্টে উঠিলে হাইকোর্টের জজবাহাদুর গোলাম কাদেরকে এক মাস ডাক্তারের নজরবন্দিতে থাকিবার হুকুম দিলেন। এক মাস পরে ডাক্তারের রিপোর্ট আসিল—গোলাম কাদের সুস্থ সহজ মানুষ, পাগলামির চিহ্নমাত্র তাহার মধ্যে নাই। তারপর বিচার। বিচারে গোলাম কাদের নিজের উকিলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিল, 'আমি খুন করিয়াছি, সে জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা অনুতপ্ত নই। আবার যদি তাহার সহিত দেখা হয়, আবার তাহাকে এমনই ভাবে হত্যা করিব।'

হাইকোর্ট নিরুপায় হইয়া তাহার ফাঁসির হুকুম দিলেন।

আমি শেষ পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত ছিলাম। গোলাম কাদেরের জীবননাট্যে বিচারের অঙ্কটা শেষ হইয়া গেলে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বিচারে তাহার মুক্তির প্রত্যাশা কোন দিনই করি নাই, কিন্তু তবু অকারণে মনটা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। বুকের নিভৃত স্থানে যেন একটা সংশয় লাগিয়াই রহিল যে, এ সুবিচার হইল না, কোথায় যেন কি একটা অত্যন্ত জরুরী প্রমাণ বাদ পড়িয়া গেল।

এইসব নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় কয়েকজন পুলিসের লোক আসামীকে বাহিরে লইয়া আসিল। আমি গোলাম কাদেরের মুখের দিকে চাহিতেই সে ইসারা করিয়া আমাকে কাছে ডাকিল। তারপর গলা নামাইয়া বলিল, 'বাবুজী, আপনি আমার মোকদ্দমার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আছেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। আমি তো চলিলাম, আমার একটি শেষ আর্জি আছে—একবার জেলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, আমার কিছু বলিবার আছে।'

আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় করিব।'

গোলাম কাদের হাতকড়া-বাঁধা দুই হাত তুলিয়া আমাকে সেলাম করিয়া জেলের গাড়িতে চড়িয়া চলিয়া গেল।

তারপর কি করিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া জেলে তাহার সহিত দেখা করিলাম, সে বিবৃতি এখানে অনাবশ্যক। শুধু কন্‌ডেম্‌ড আসামীর কক্ষে বসিয়া মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে সে আমাকে যে গল্প বলিয়াছিল, তাহাই বাংলাভাষায় অনূদিত করিয়া আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করিতেছি।—

গোলাম কাদের বলিল, 'বাবুজী, আমার এই কাহিনী আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমি যে পাগল নই—আমার এই কথাটি আপনি অবিশ্বাস করিবেন না। সত্য কথা বলিতে কি, আমার কাছেও ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি কিতাব পড়ি নাই, আজীবন মাংস বিক্রয় করিয়াছি। গল্প বানাইয়া বলিবার শক্তি আমার নাই। যাহা আজ বলিব, তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই বলিব। অথচ এ সকল ঘটনা আমার—এই গোলাম কাদেরের জীবনে যে ঘটে নাই, তাহাও নিশ্চিত। আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব জানি না, আমি মূর্খ লোক। শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, ইহা আজিকার ঘটনা নয়, বহু বহু যুগের পুরাতন।

'তবে শুরু হইতেই কথাটা বলি। পনের-ষোল বৎসর পূর্বে আমার স্ত্রী এক কন্যা প্রসব করিতে গিয়া মারা যায়, মেয়েটিও মারা গেল। কি করিয়া জানি না, আমার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, কোনও দুশমন আমার স্ত্রী-কন্যাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছে। শোকের অপেক্ষা ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় আমার অন্তঃকরণ অধিক পূর্ণ হইয়া উঠিল ; সর্বদাই মনে হইত, যদি সেই অজ্ঞাত দুশমনটাকে পাই, তাহা হইলে তাহার প্রতি অঙ্গ ছিড়িয়া ছিড়িয়া ইহার প্রতিশোধ লই।

'এইভাবে কিছুদিন কাটিবার পর ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা আমার ভ্রান্তি—সত্যের উপর ইহার কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। তারপর যত দিন কাটিতে লাগিল, আস্তে আস্তে শোক এবং ক্রোধ দুই ভুলিতে লাগিলাম ; কিন্তু আর বিবাহ করিতে পারিলাম না। শেষ পর্যন্ত হয়তো জীবনটা আমার এমনই সহজভাবে কাটিয়া যাইত, যদি না সে-দিন অশুভক্ষণে সেই লোকটা আমার দোকানে পদার্পণ করিত।

'শুনিয়াছি, মানুষ জলে ডুবিলে তাহার বিগত জীবনের সমস্ত ঘটনা ছবির মতো চোখের পর্দার উপর দেখিতে পায়। এই লোকটাকে দেখিবামাত্র আমারও ঠিক তাহাই হইল। এক মুহূর্তের মধ্যে চিনিয়া লইলাম—এই সেই নৃশংস রাক্ষস, যে আমার স্ত্রী-কন্যা এবং পিতাকে হত্যা করিয়াছিল। ছবির মতো সে সকল দৃশ্য আমার চোখের উপর জাগিয়া উঠিল। মজ্জমান

জাহাজের উপর সেই মরণোন্মুখ অসহায় যাত্রীদের হাহাকার কানে বাজিতে লাগিল। ভাস্কো-ডা-গামার সেই ক্রূর হাসি আবার দেখিতে পাইলাম।

'আমার জজসাহেবেরা হত্যার কারণ খুঁজিতেছিলেন, কৈফিয়ৎ চাহিতেছিলেন। বাবুজী, আমি কি কৈফিয়ৎ দিব, আর দিলেই বা তাহা বুঝিত কে?

'আপনি হয়তো বুঝিবেন। আপনার চোখে মুখে আমি তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাই আপনাকে এই কষ্ট দিয়াছি। ইহাতে ফল কিছু হইবে না জানি, কিন্তু আমার হৃদয়ভার লাঘব হইবে : এ ছাড়া আমার অন্য স্বার্থ নাই।

'আমার এই কসাই-জীবনের ইতিহাসটা এখানেই শেষ করিতেছি। এবার যাহার কথা আরম্ভ করিব, তাহার নাম মির্জা দাউদ বিন্ গোলাম সিদ্‌কী। আমিই যে এই মির্জা দাউদ, তাহা এখন ভুলিয়া যান। মনে করুন, ইহা আর কাহারও জীবনের কাহিনী।'—

কালিকটের নাম আপনি শুনিয়া থাকিবেন। মালাবার উপকূলে অতি সুন্দর মহার্ঘ মণিখণ্ডের মতো একটি ক্ষুদ্র নগর। মোরগের ডাক যতদূর শুনা যায়, ততদূর তাহার নগর-সীমানা। নগরের পশ্চাতে ছোট ছোট পাহাড়, উপত্যকা, কঙ্করপূর্ণ সমতল ক্ষেত্র, এবং তাহার পশ্চাতে অভ্রভেদী পশ্চিমঘাট সমস্ত পৃথিবী হইতে যেন এই স্থানটুকুকে পৃথক করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সম্মুখে অপার সমুদ্র ভিন্ন কালিকটে প্রবেশ বা নিষ্ক্রমণের অন্য সুগম পথ নাই। এই সমুদ্রপথে অসংখ্য বাণিজ্যতরণী কালিকটের বন্দরে প্রবেশ করে, আবার পাল তুলিয়া সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়। কালিকট যেন পৃথিবীর সমগ্র বণিক-সমাজের মোসাফিরখানা।

পীতবর্ণ চৈনিক, তাম্রবর্ণ বাঙালী, লোহিতবর্ণ পারসিক, কৃষ্ণবর্ণ মূর—সকলেই কালিকটের পথে সমান দর্পে পা ফেলিয়া চলে, কেহ কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। চীন হইতে লাক্ষা, দারুশিল্প ; ব্রহ্ম হইতে গজদন্ত ; মলয়দ্বীপ হইতে চন্দন ; বঙ্গ হইতে ক্ষৌম পট্টবস্ত্র, মলমল, ব্যাঘ্রচর্ম ; চম্পা ও মগধ হইতে চামর, কস্তুরী, চারু-কেশরার পুষ্পবীজ ; দাক্ষিণাত্য হইতে অগুরু, কর্পূর, দারুচিনি ; লঙ্কা হইতে মুক্তা আসিয়া কালিকটে স্তূপীকৃত হয়। পশ্চিম হইতে তুরস্ক, পারসিক, আরব ও মূর সওদাগর তাহাই স্বর্ণের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া জাহাজে তুলিয়া, কেহ বা পারস্যোপসাগরের ভিতর দিয়া ইউফ্রাটেস নদের মোহনায় উপস্থিত হয়, কেহ বা লোহিত সাগরের উত্তর প্রান্তে নীলনদের সন্নিকটে গিয়া তরণী ভিড়ায়। তথা হইতে প্রাচী-র পণ্য সমগ্র পাশ্চাত্য খণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে। কালিকটের রাজা সামরী বাণিজ্যতরণীর শুল্ক আদায় করিয়া রাজ্যের ব্যয়ভার নির্বাহ করেন। রাজকোষ সর্বদা সুবর্ণ-মণিমাণিক্যে পূর্ণ। রাজ্যে কোথাও দৈন্য নাই, অশান্তি নাই, অসন্তোষ নাই ; ইতর-ভদ্র সকলেই সুখী।

মির্জা দাউদ এই কালিকটের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী। তাঁহার একুশখানি বাণিজ্যতরী আছে,—হোয়াংহো হইতে নীলনদের প্রান্ত পর্যন্ত তাহাদের গতিবিধি। যখন এই তরণী সকল শুভ্র পাল তুলিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে সমুদ্রযাত্রায় বাহিত হয়, তখন মনে হয়, রাজহংসশ্রেণী পক্ষ বিস্তার করিয়া নীল আকাশে ভাসিয়া চলিয়াছে।

মির্জা দাউদ জাতিতে মূর। কালিকটে তাঁহার শ্বেত-প্রস্তরের প্রাসাদ মূর-প্রথায় নির্মিত। সুদূর মরক্কো দেশে এখনও তাঁহার বৃদ্ধ পিতা বর্তমান ; কিন্তু তিনি কালিকটকেই মাতৃভূমিত্বে বরণ করিয়াছেন। অনেক বৈদেশিক সওদাগরই এরূপ করিয়া থাকেন। মির্জা দাউদ ধর্মে মুসলমান হইলেও একপত্নীক। সম্প্রতি চৌত্রিশ বৎসর বয়সে প্রথমে একটি কন্যা জন্মিয়াছে। কন্যার জন্মদিনে মির্জা দাউদ এক সহস্র তোলা সুবর্ণ বিতরণ করিয়াছেন—তারপর তাঁহার গৃহে সপ্তাহব্যাপী উৎসব চলিয়াছিল। নগরে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল।

বস্তুত মির্জা দাউদের মতো সর্বজনপ্রিয় বহু-সম্মানিত ব্যক্তি নগরে আর দ্বিতীয় নাই। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। স্বয়ং রাজা সামরী তাঁহাকে বন্ধুর মধ্যে গণ্য করেন। এদিকে ব্যবসায়ে দিন দিন অধিক অর্থাগম হইতেছে। মানুষ পৃথিবীতে যাহা কিছু পাইলে সুখী হয়, কিছুরই তাঁহার অভাব নাই।

একদিন গ্রীষ্মের সায়াহ্নে পশ্চিম দিগ্বলয় রঞ্জিত করিয়া সূর্যাস্ত হইতেছে। সমুদ্রের জল যতদূর দৃষ্টি যায়, রাঙা হইয়া টলমল করিতেছে। দূর লাক্ষাদ্বীপ হইতে সুগন্ধ বহন করিয়া স্নিগ্ধ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আকাশ মেঘ-নির্মুক্ত।

সমস্ত দিন গরম ভোগ করিয়া নগরের নরনারী শীতল বায়ু সেবন করিবার জন্য এই সময় বন্দরের ঘাটে আসিয়া জমিয়াছে। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অর্ধচন্দ্রাকৃতি ঘাট—বড় বড় চতুষ্কোণ পাথর দিয়া বাঁধানো। পাথরের উপর সারি সারি জাহাজ বাঁধিবার লোহার কড়া। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল ওই ঘাটের কানায় কানায় ভরিয়া উঠে, আবার ভাঁটার সময় সিক্ত বালুকারাশি মধ্যে রাখিয়া দূরে সরিয়া যায়। এই ঘাটই নগরের কর্মকেন্দ্র। ক্রয়-বিক্রয়, দর-দস্তুর, আমোদ-প্রমোদ সমস্তই এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। তাই সকল সময় এখানে মানুষের ভিড়।

সে সময় ঘাটে একটিও নবাগত কিংবা বহির্গামী বাণিজ্যতরী ছিল না। কাজকর্ম কিছু শিথিল। নাগরিকগণ নানা বিচিত্র বেশ পরিধান করিয়া কেহ সস্ত্রীক সপুত্রকন্যা পাদচারণা করিতেছে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিয়াছে। চঞ্চলমতি কিশোরগণ ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে, আবার কেহ বা ঘাট হইতে সমুদ্রের জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণ করিতেছে।

চীনদেশীয় এক বাজিকর নানা প্রকার অদ্ভুত খেলা দেখাইতেছে। জনতার মধ্য হইতে মাঝে মাঝে উচ্চ হাসির রোল উঠিতেছে।

বাজিকর একজন স্থূলকায় প্রৌঢ় সিংহলীকে ধরিয়া তাহার কানের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তোমার মাথার মধ্যে ২৫৬টি পাথরের নুড়ি রহিয়াছে, বল তো বাহির করিয়া দিই।' অমনিই জনতা সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বাহির কর, বাহির কর।' তখন বাজিকর ক্ষিপ্রহস্তে ক্ষুদ্র চিমটা দিয়া তাহার কর্ণ হইতে সুপারীর মতো বড় বড় অসংখ্য পাথর বাহির করিয়া মাটিতে স্তূপীকৃত করিল। প্রৌঢ় সিংহলী বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহা দেখিতে লাগিল। ভারি হাসির একটা ধুম পড়িয়া গেল। একজন পরিহাস করিয়া বলিল, 'শেঠ, তোমার মাথা যে এত নিরেট, তাহা জানিতাম না।'

ক্রমে সূর্য অস্তমিত হইল। সমুদ্রের গায়ে সীসার রং লাগিল। দিগন্তরেখার যে স্থানটায় সূর্য অস্ত গিয়াছিল, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সন্ধ্যার রক্তিমাভা ধীরে ধীরে সংকুচিত হইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় দূর সমুদ্রবক্ষে সেই রক্তিমাভার সম্মুখে তিনটি কৃষ্ণবর্ণের ছায়া আবির্ভূত হইল। সকলে দেখিল, তিনখানি জাহাজ বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

তখন, জাহাজ কোথা হইতে আসিয়াছে, কাহার জাহাজ—ইহা লইয়া ঘাটের দর্শকদিগের মধ্যে তর্ক চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, আরবী জাহাজ, কেহ বলিল, চীনা ; কিন্তু অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল—কোন্ দেশীয় জাহাজ, নিশ্চয়রূপে কিছু বুঝা গেল না।

মির্জা দাউদ ঘাটে ছিলেন। তিনি বহুক্ষণ একদৃষ্টে সেই জাহাজ তিনটির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল। তিনি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, 'পোর্তুগীজ জাহাজ!—কিন্তু ফিরিঙ্গী কোন্ পথে আসিল?'

তারপর গগনপ্রান্তে দিবা-দীপ্তি নিবিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি জীর্ণ সিন্ধুবিধ্বস্ত ক্ষুদ্র পোত ছিন্ন পাল নামাইয়া কালিকটের বন্দরে আসিয়া ভিড়িল।

পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মির্জা দাউদ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কয়েকজন বিদেশীকে ঘিরিয়া ভারি ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ফিরিঙ্গীগণ অপরিচিত ভাষায় কি বলিতেছে, কেহই বুঝিতেছে না এবং প্রত্যুত্তরে নানা দেশীয় ভাষায় তাহাদের প্রশ্ন করিতেছে। মির্জা দাউদ ভিড় ঠেলিয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সকলে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল।

আগন্তুকদিগের মধ্যে একজন বলিল, 'এখানে পোর্তুগীজ ভাষা বুঝে, এমন কেহ কি নাই? আমি জামোরিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই—দোভাষী খুঁজিতেছি।'

মির্জা দাউদ দেখিলেন, বক্তা শালপ্রাংশু বিশালদেহ এক পুরুষ। তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, দীর্ঘ স্বর্ণাভ কেশ এবং হ্রস্ব সূচ্যগ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল। ঊর্ধ্বাঙ্গে সোনার জরির কাজ-করা অতি মূল্যবান মখমলের অঙ্গরক্ষা, কটি হইতে জানু পর্যন্ত ঐ মখমলের জাঙিয়া এবং জানু হইতে নিম্নে পদদ্বয় চর্মনির্মিত খাপে আবৃত। মস্তকে টুপির উপর কঙ্কপত্র বক্রভাবে অবস্থিত; এই পুরুষের সহিত অন্য পাঁচ-ছয় জন যাহারা রহিয়াছে, তাহারাও প্রায় অনুরূপ বেশধারী। সকলের কটিবন্ধে তরবারি।

মির্জা দাউদ এই প্রধান পুরুষের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, 'আমি পোর্তুগীজ ভাষা বুঝি।'

নবাগত কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে মির্জা দাউদের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ অন্ধকার হইল। সে ধীরে ধীরে কহিল, 'তুমি দেখিতেছি মূর!'

এই তিনটি শব্দের অন্তর্নিহিত যে সুতীক্ষ্ণ ঘৃণা, তাহা মীর্জা দাউদকে বিদ্ধ করিল। তিনিও মনোগত বিদ্বেষ গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ, আমি মূর। তোমরা দেখিতেছি পোর্তুগীজ—জলদস্যু; তোমাদের সহিত পরিচয় আমার প্রথম নহে, কিন্তু ফিরিঙ্গীর সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব নাই।'

এতক্ষণে দ্বিতীয় একজন পোর্তুগীজ কথা কহিল। তাহার বয়স অল্প, উদ্ধতকণ্ঠে বলিল, 'মূর-কুক্কুরের সহিত আমরা সদ্ভাব রাখি না—মূরের উচ্ছেদ করাই আমাদের ধর্ম।'

নিমেষমধ্যে মির্জা দাউদের কটি হইতে ছুরিকা বাহির হইয়া আসিল, দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই আগন্তুকদিগের প্রধান ব্যক্তি হাত তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিল। বিনীতস্বরে কহিল, 'মহাশয়, আমার এই স্পর্ধিত সঙ্গীকে ক্ষমা করুন। আপনি মূর এবং আমরা পোর্তুগীজ বটে; কিন্তু আমরা উভয়েই ব্যবসায়ী, জলদস্যু নহি। অন্যত্র যাহাই হোক্, এখানে আমার সহিত আপনাদের বিবাদ নাই। বরঞ্চ আপনার হৃদ্যতা লাভ করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।' তারপর নিজ সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'পেড্রো, আর কখনও যদি তোমার মুখে এরূপ কথা শুনিতে পাই, তোমার প্রত্যেক অস্থি চাকায় ভাঙিয়া তারপর ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াইব।'

ভয়ে পেড্রোর মুখ পীতবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি সে কম্পিত বিদ্রোহের কণ্ঠে কহিল, 'আমি সত্য কথা বলিতে ভয় করি না। মূরমাত্রেই আমাদের ঘৃণার পাত্র। আপনি নিজেও তো মূরকে—'

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই প্রথম ব্যক্তি বিদ্যুতের মতো দুই হাত বাড়াইয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। বজ্রমুষ্টিতে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া থাকিবার পর ছাড়িয়া দিতেই পেড্রো হতজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার প্রতি আর দৃক্‌পাত না করিয়া প্রথম ব্যক্তি মির্জা দাউদের দিকে ফিরিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিল, 'মিথ্যাবাদীর দণ্ডদান ধার্মিকের কর্তব্য। এখন দয়া করিয়া আমার সহিত জামোরিনের নিকট গিয়া আমার নিবেদন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব।'—বলিয়া মাথার টুপি খুলিয়া আভূমি লুণ্ঠিত করিয়া অভিবাদন

করিল। দর্শকবৃন্দ—যাহারা পোর্তুগীজ ভাষা বুঝিল না, তাহারা অবাক্ হইয়া এই দুর্বোধ্য অভিনয় দেখিতে লাগিল।

মির্জা দাউদ আগন্তুকের মিষ্ট বাক্যে ভুলিলেন না, অটল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, 'ফিরিঙ্গী, তুমি অতি ধূর্ত। কি জন্য সামরীর রাজ্যে আসিয়াছ, সত্য বল।'

'বাণিজ্য করিতে।'

'খ্রীস্টান, আমি তোমাদের চিনি। কলহ তোমাদের ব্যবসায়, লোভ তোমাদের ধর্ম, পরশ্রীকাতরতা তোমাদের স্বভাব। এ রাজ্যে কলহ-বিদ্বেষ নাই—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, হিব্রু নির্বিবাদে শান্তিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেছে। সত্য বল, তোমরা কি উদ্দেশ্যে এই হিন্দে পদার্পণ করিয়াছ?'

ফিরিঙ্গীর মুখ রক্তহীন হইয়া গেল। শুধু তাহার চক্ষুযুগল জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো নিষ্ফল ক্রোধ ও হিংসা বিকীর্ণ করিতে লাগিল; কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সংবরণ করিয়া সে কণ্ঠবিলম্বিত সুবর্ণ-ক্রুশ হস্তে তুলিয়া বলিল, 'এই ক্রুশ স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি—সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া বাণিজ্য করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য উদ্দেশ্য নাই।'

ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মির্জা দাউদ কহিলেন, 'তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম। চল, সামরীর প্রাসাদে তোমাদের লইয়া যাই।'

তখন বিদেশীরা মির্জা দাউদের অনুসরণ করিয়া রাজপ্রাসাদ অভিমুখে চলিল। পেড্রোর সংজ্ঞাহীন দেহ ঘাটের পাথরের উপর মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সামরীর সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া পোর্তুগীজ বণিকদিগের অধিনায়ক বলিল, 'আমার নাম ভাস্কো-ডা-গামা—আমি পোর্তুগালের রাজদূত। আপনার নিকট কালিকটে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।' এই বলিয়া পোর্তুগাল-রাজ-প্রেরিত মহার্ঘ উপঢৌকন সকল সামরীর সম্মুখে স্থাপন করিতে সঙ্গীগণকে ইঙ্গিত করিল।

মুখে যাহাই বলুন, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস মির্জা দাউদের অন্তর হইতে দূর হইল না। তিনি ফিরিঙ্গীকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন—মূরমাত্রেই চিনিত। স্বদেশে বহু সংঘর্ষের ভিতর দিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তাহারা জানিত যে, ফিরিঙ্গী অতিশয় অর্থলিপ্সু ও ভোগলুব্ধ। ইহাদের জন্মভূমি অর্থপ্রসূ নহে; তাই অন্নের জন্য ইহাদিগকে দৈহিক ও মানসিক কঠোরতার মধ্যে জীবনযাপন করিতে হয় বটে, কিন্তু এই জন্যই ইহারা অপেক্ষাকৃত ধনী মুসলমানদিগকে অত্যন্ত ঈর্ষা করে। পরের উন্নতি ইহাদের চক্ষুশূল। কোথাও একবার ধনরত্ন-ঐশ্বর্যের সন্ধান পাইলে ইহাদের লালসা ও ক্ষুধা এত উগ্র, নির্মম হইয়া উঠে যে, কোনও মতে সেখানে প্রবেশ লাভ করিয়া নিজেকে একবার ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শত্রুমিত্রনির্বিচারে সকলের উপর দুর্বিনীত বাহুবল, স্পর্ধা ও জুলুম প্রকাশ করিতে থাকে। ইহারা নিরতিশয় কলহপ্রিয় ও যুদ্ধনিপুণ। স্বার্থরক্ষার জন্য এমন কাজ নাই যাহা ইহারা পারে না এবং স্বজাতির স্বার্থবর্ধনের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে ইহারা তিলমাত্র কুণ্ঠিত নহে।

পোর্তুগাল হইতে সমুদ্রপথে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া আজ পর্যন্ত কেহ ভারতবর্ষে আসে নাই, এ পথ এতদিন অজ্ঞাত ছিল। ভাস্কো-ডা-গামা সেই পথ ইউরোপীয়দের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বহু নূতন সম্ভাবনা ও দুর্ভাবনার সৃষ্টি করিল। সম্প্রতি ভাস্কো-ডা-গামার উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ভাবে বুঝা যায় না। অথচ উদ্ধত ও কটুভাষী পেড্রোর কণ্ঠরোধ করিয়া সে যে একটা গূঢ় অভিপ্রায় গোপন করিয়া গেল, তাহাও বুঝিতে মির্জা দাউদের বিলম্ব হইল না। শঙ্কা ও সংশয়ের মেঘে

তাঁহার মন আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

পোর্তুগীজগণ কালিকটে বাস করিতে লাগিল এবং দিন দিন নূতন পণ্যে তরণী পূর্ণ করিতে লাগিল। অতি অপদার্থ পণ্য দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য দিয়া কিনিতে লাগিল। ইহাতে নির্বোধ ব্যবসায়ীরা যতই উৎফুল্ল হউন না কেন, মির্জা দাউদের ন্যায় বহুদর্শী শ্রেষ্ঠীদের মনে সন্দেহ ততই ঘনীভূত হইয়া উঠিল। উচিত মূল্যের অধিক মূল্য দিয়া পণ্য ক্রয় করা ব্যবসায়ীর স্বভাব নহে, অথচ নবাগতরা অব্যবসায়ী বা নির্বোধ নহে। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য ছলমাত্র, অন্য কোনও দুরভিসন্ধি তাহাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে, ইহা অনুমান করিয়া বিচক্ষণ ব্যবসায়ীদের চিন্তা ও উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না।

এইরূপে কিছুকাল বিগত হইল। কালিকটের জীবনপ্রবাহ পূর্ববৎ প্রশান্তভাবে চলিতে লাগিল।

একদিন শরৎকালে মেঘমার্জিত আকাশে শুভ্র পাল উড়াইয়া দুইটি জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, বঙ্গদেশ হইতে প্রভাকর শ্রেষ্ঠীর নৌকা আসিতেছে। প্রভাকর শেঠ অতি প্রসিদ্ধ বণিক—প্রতি বৎসর এই সময় লক্ষাধিক মুদ্রার বস্ত্রাদি পণ্য বহন করিয়া তাহার তরণী কালিকটে উপস্থিত হয়। কাশ্মীরের শাল, বারাণসীর চেলি, কৌশেয় পট্ট, বাংলার মলমল কিনিবার জন্য কালিকটে সওদাগর সমাজে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। এত সুন্দর এবং এত মূল্যবান বস্ত্র কেহই আনিতে পারে না, সেজন্য প্রভাকরের এত খ্যাতি।

প্রভাকরের নৌকা ঘাটে লাগিবার পূর্বেই নগরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা ঘাটে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রভাকর নৌকার উপর দাঁড়াইয়া পরিচিত সকলকে নমস্কার-সম্ভাষণাদি করিতে লাগিল। সে অতিশয় বাক্‌পটু ও রহস্যপ্রিয়, এজন্য সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

হিব্রু মুশা ইব্রাহিম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'প্রভাকর, এবার তোমার দেরি দেখিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আর আসিলে না—পথে তোমাদের সুন্দরবনের কুমীর তোমাকে পেটে পুরিয়াছে।'

প্রভাকর হাসিয়া বলিল, 'মুশা সাহেব, পেটে পুরিলেও কুমীর আমাকে হজম করিতে পারিত না!—এই যে মির্জা সাহেব! আদাব আদাব—শরীর-গতিক সব ভালো তো? এবার আপনার ফরমাশী জিনিস সমস্ত আনিয়াছি, কত লইতে পারেন দেখিব। আপনার কোমরে তলোয়ারখানি নূতন দেখিতেছি, ডামাস্কাসের বুঝি? আমার কিন্তু এক জোড়া চাই—গৌড়েশ্বরের কাছে বাক্যদত্ত হইয়া আছি। ভালো কথা, পথে আসিতে শ্রীখণ্ডের নিকট আপনার যবদ্বীপ-যাত্রী জাহাজের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল—খবর সব ভালো।—হায়দর মুস্তফা যে, ইতিমধ্যে কয়টি সাদি করিলেন? এবার কিন্তু ইস্পাহানী আঙ্গুরের রস না খাওয়াইলে বড়ই অন্যায় হইবে।—জাম্বো, শাঁখালুর মতো দাঁত বাহির করিয়া হাসিস না—দড়িটা ধর্।'

নৌকা বাঁধা হইলে প্রভাকর ঘাটে নামিয়া সকলের সহিত আলিঙ্গনাদি করিল। তখন মির্জা দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভাকর, কি কি সওদা আনিলে?'

প্রভাকর বলিল, 'এবার যে মলমল আনিয়াছি, মির্জা সাহেব, তেমন মলমল আজ পর্যন্ত কখনও চোখে দেখেন নাই। মাকড়শার জালের চেয়েও নরম, কাশফুলের চেয়েও হালকা—মুঠির মধ্যে দেড়শ গজ কাপড় ধরা যায়। কিন্তু এক থান কাপড়ের দাম পাঁচ তোলা সোনা, তার কমে দিতে পারিব না। কোচিনে চার তোলা পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিল—আমি লই নাই। শেষে কি লোকসান দিয়া ঘরে ফিরিব। শেঠনী তাহা হইলে আমার মুখ দেখিবে না।'

মির্জা দাউদ হাসিয়া বলিলেন, 'তা না দেখুক। তোমার মুখ না দেখিলেও শেঠনীর কোনও লোকসান হইবে না।—এখন তোমার সওদা দেখাও।'

প্রভাকর বলিল, 'বলেন কি মির্জা সাহেব, লোকসান হইবে না ? শেঠনীর এখন যৌবনকাল, কাঁচা বয়স ; এখন স্বামীর মুখদর্শন না করিলে জীবন-যৌবন সমস্তই লোকসান হইয়া যাইবে যে !—ভালো কথা, গতবারে শুনিয়াছিলাম, আপনার বিবি-সাহেবা নাকি অসুস্থ। তা কোনও শুভ সংবাদ আছে নাকি ?'

মির্জা দাউদ বলিলেন, 'খোদার দয়ায় একটি মেয়ে হইয়াছে—'

প্রভাকর বলিল, 'এত বড় আনন্দের সংবাদ এতক্ষণ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন ! আমাদের দেশে বলে, মেয়ে হইলে পিতার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে আজ রাত্রে আপনার দৌলতখানায় আমার নিমন্ত্রণ রহিল। দেশে কুক্কুটাদি ভোজনের সুবিধা হয় না—দুষ্প্রাপ্যও বটে, আর ব্রাহ্মণগুলা বড়ই গণ্ডগোল করে।—ও বাবা ! এটি আবার কে, মির্জা সাহেব ? এ রকম পোশাক-পরিচ্ছদ তো কখনও দেখি নাই। ইহারা কোথা হইতে আসিল ?'

মির্জা দাউদ ফিরিয়া দেখিলেন, ভাস্কো-ডা-গামা দুই জন সহচর সঙ্গে সেই দিকে আসিতেছে। ইতিমধ্যে কালিকটের পথে-ঘাটে দুই জনের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন পক্ষেই সৌহার্দ্য বর্ধনের আগ্রহ দেখা যায় নাই। বরঞ্চ উভয়ে উভয়কে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছেন।

প্রভাকরের প্রশ্নের উত্তরে মির্জা দাউদ কহিলেন, 'ইহারা পোর্তুগীজ। ক্রমে পরিচয় পাইবে।'

ইত্যবসরে প্রভাকরের নৌকা হইতে পণ্যসামগ্রী সকল পরিদর্শনের জন্য ঘাটে নামানো হইতেছিল। সওদাগরেরা ভিড় করিয়া তাহাই দেখিতেছিলেন। মির্জা দাউদও সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। অন্য দিক হইতে ভাস্কো-ডা-গামাও আসিয়া মিলিত হইল।

মলমলের নমুনা দেখিয়া মির্জা দাউদ কহিলেন, 'অতি উৎকৃষ্ট মলমল। প্রভাকর, এ জিনিস কত আনিয়াছ ?'

প্রভাকর সগর্বে বলিল, 'পুরা এক জাহাজ।'

দাউদ কহিলেন, 'ভালো, আমি এক জাহাজই লইলাম। দর-দামের কথা আজ রাত্রে স্থির হইবে।'

ভাস্কো-ডা-গামা এরূপ অপূর্ব সূক্ষ্ম মলমল পূর্বে কখনও দেখে নাই। বস্তুত, এত মহার্ঘ মলমল পারস্য দেশ ভিন্ন অন্য কোথাও যাইত না। পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে যাহা যাইত, তাহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মলমল। ডা-গামার অন্তর লুব্ধ হইয়া উঠিল। পোপ এবং রাজা ইম্যানুয়েলকে নজর দিতে হইলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কি আছে ? সে বলিল, 'এ মলমল আমি কিনিব।'

মির্জা দাউদ হাসিয়া বলিলেন, 'আর উপায় নাই। এই মলমল আমি কিনিয়াছি।'

ডা-গামা প্রভাকরের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আমি অধিক মূল্য দিব।'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'অধিক মূল্য দিলেও পাইবে না—এ মলমল এখন আমার।'

ডা গামা সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া প্রভাকরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'আমি দ্বিগুণ মূল্য দিব।'

মির্জা দাউদ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'শতগুণ দিলেও আর পাইবে না।'

ডা গামা বিদ্যুদ্‌বেগে মির্জা দাউদের দিকে ফিরিল। কর্কশকণ্ঠে কহিল, 'মুর, চুপ কর্—আমি মালের মালিকের সহিত কথা কহিতেছি।'

প্রভাকর বুদ্ধিমান, মির্জা দাউদ তাহার পুরাতন খরিদ্দার, অথচ এই ব্যক্তিকে সে চেনেও না। সে বলিল, 'উনিই এখন মালের মালিক, আমি কেহ নই। উনি যদি আপনাকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, করিতে পারেন।'

ডা-গামার অশিষ্ট কথায় কিন্তু মির্জা দাউদের মুখ ক্রোধে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি

তিক্তকণ্ঠে কহিলেন, 'ডা-গামা, পূর্বেও বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু আজ তোর প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িল। ব্যবসায় তোর ভান মাত্র, তুই তস্কর। নচেৎ অনুচিত মূল্য দিয়া বাণিজ্য নষ্ট করিবি কেন ?'

আহত ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা নিজ কটি হইতে তরবারি বাহির করিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ক্রোধকষায়িত নেত্রে কহিল, 'স্পর্ধিত মূর, আজ তোর রক্তে তরবারির কলঙ্ক ধৌত করিব।'

মির্জা দাউদও তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া কহিলেন, 'বর্বর ফিরিঙ্গী, আজ তোকে জাহান্নমে পাঠাইব।'

মুহূর্তমধ্যে ব্যগ্র জনতা চতুর্দিকে সরিয়া গিয়া মধ্যে বৃত্তাকৃতি স্থান যুযুৎসুদের জন্য ছাড়িয়া দিল। শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হইলেও এরূপ ব্যাপার কালিকটে একান্ত বিরল নহে। কলহ যখন তরবারি পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন তাহা ভঞ্জন করিবার প্রয়াস যে শুধু নিষ্ফল নহে, অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। তাই সকলে সরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ত্রদ্বারা উভয়পক্ষকে বিবাদের মীমাংসা করিবার সুবিধা করিয়া দিল।

ভাস্কো-ডা-গামা ও মির্জা দাউদ প্রথম দৃষ্টি-বিনিময়েই পরস্পরকে যে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সেই বিষ উভয়ের অন্তরে সঞ্চিত হইয়া আজ সামান্য সূত্র ধরিয়া দুর্নিবার বিরোধরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এ কলহ যে একজন না মরিলে নিবৃত্ত হইবে না, তাহা উভয়েই মনে মনে বুঝিলেন।

নিস্তব্ধ জনতার কেন্দ্রস্থলে অসিধারী দুই জন দাঁড়াইলেন। ভাস্কো-ডা-গামা বিশালকায়, প্রস্তরের মতো কঠিন, হস্তীর মতো বলশালী। মির্জা দাউদ অপেক্ষাকৃত কৃশ ও খর্ব ; কিন্তু বিষধর কালসর্পের মতো ক্ষিপ্র, তেজস্বী ও প্রাণসার। ভাস্কো-ডা-গামার তরবারি বেত্রবৎ ঋজু, তীক্ষ্ণাগ্র ; মির্জা দাউদের তরবারি ঈষৎ বক্র ও ক্ষুরধার। নগ্ন কৃপাণহস্তে ক্ষণকালের জন্য দুই জন পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। তারপর ঝড়ের মতো তরবারিকে অগ্রবর্তী করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা আক্রমণ করিল।

কিন্তু ডা-গামার তরবারি মির্জা দাউদের অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্বেই তিনি ক্ষিপ্রহস্তে নিজ তরবারি দ্বারা তাহা অপসারিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরক্ষণেই তাঁহার বক্র অসি বিদ্যুতের মতো একবার ডা-গামার জানু দংশন করিয়া ফিরিয়া আসিল। ডা-গামা পিছু হটিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তাহার জানুর চর্মাবরণ ধীরে ধীরে রক্তে ভিজিয়া উঠিল।

ডা-গামা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না ; কিন্তু সাবধান হইল। সংযত ও সতর্কভাবে অসিচালনা করিতে লাগিল। সে বুঝিল যে, বিপক্ষকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। মির্জা দাউদের অসি-কৌশল অসাধারণ, তাঁহার সম্মুখে দ্বিতীয়বার ভুল করিলে আর তাহা সংশোধনের অবকাশ থাকিবে না।

এদিকে মির্জা দাউদও বুঝিলেন যে, ডা-গামা অসি-কৌশলে তাঁহার সমতুল্য, কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা দ্বিগুণ বলশালী। আবার সে তাঁহার মতো ক্ষিপ্রগামী ও লঘুদেহ নয় বটে, কিন্তু তরবারি ঋজু এবং দীর্ঘ—মির্জা দাউদের তরবারি বক্র এবং খর্ব। তাঁহাদের যুদ্ধরীতিও সম্পূর্ণ পৃথক। এ ক্ষেত্রে, মির্জা দাউদ দেখিলেন, ডা-গামার জয়ের সম্ভাবনাই অধিক। মির্জা দাউদ অত্যন্ত সাবধানে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সর্প ও নকুলের যুদ্ধে যেমন উভয়ে উভয়ের চক্ষুতে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে এবং সুযোগ পাইবামাত্র তীরবেগে আক্রমণ করিয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসে, ডা-গামা ও মির্জা দাউদও সেইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অস্ত্রে অস্ত্রে প্রতিরুদ্ধ হইয়া মুহুর্মুহুঃ

ঝনৎকার উঠিতে লাগিল, চঞ্চল অসিফলকে সূর্যকিরণ পড়িয়া তড়িৎরেখার মতো জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। নিস্পন্দ জনব্যূহ সহস্রচক্ষু হইয়া এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে মির্জা দাউদ বাক্যশূলে ডা-গামাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, 'ফিরিঙ্গী দস্যু, চাহিয়া দেখ, তোর রক্ত মানুষের রক্তের মতো লাল নয়, শয়তানের মতো নীল! খ্রীস্টান কুত্তা, এখনও ক্ষমা প্রার্থনা কর্—তোর প্রাণ ভিক্ষা দিব।'

ডা-গামা কোনও উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে যুদ্ধ করিতে লাগিল। শ্লেষ করিয়া মির্জা দাউদ যে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, চতুর ডা-গামা তাহা বুঝিয়াছিল।

যুদ্ধ ক্রমে আরও প্রখর ও তীব্র হইয়া উঠিল। দুই যোদ্ধারই ঘন ঘন শ্বাস বহিল। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতে লাগিল; কিন্তু উভয়েই যেন এক অদৃশ্য বর্মে আচ্ছাদিত। ডা-গামার তরবারি বার বার মির্জা দাউদের কণ্ঠের নিকট হইতে, বক্ষের নিকট হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল, মির্জা দাউদের অসি ডা-গামাকে ঘিরিয়া এক ঝাঁক ক্রুদ্ধ মৌমাছির মতো গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও হুল ফুটাইতে পারিল না।

সহসা এক সময় ডা-গামা সভয়ে দেখিল যে, সে ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে ঘাটের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর এক পা পিছাইলেই সমুদ্রের জলে পড়িয়া যাইবে। মির্জা দাউদ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বিদ্রূপ-বিষাক্ত কণ্ঠে কহিলেন, 'ফিরিঙ্গী, আজ তোকে ঐ সমুদ্রের জলে চুবাইব। তারপর মরা ইঁদুরের মতো তোর রাজা ইম্যানুয়েলের কাছে তোকে বকশিশ পাঠাইয়া দিব।'

এতক্ষণে মির্জা দাউদ যাহা চাহিতেছিলেন তাহাই হইল—ভাস্কো-ডা-গামা ধৈর্য হারাইল। উন্মত্ত বন্যমহিষের মতো গর্জন করিয়া অসি ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া সে মির্জা দাউদকে আক্রমণ করিল। ইচ্ছা করিলে মির্জা দাউদ অনায়াসে ডা-গামাকে বধ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি তরবারির উল্টা পিঠ দিয়া ডা-গামার দক্ষিণ মুষ্টিতে দারুণ আঘাত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার তরবারি হস্তমুক্ত হইয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দূরে গিয়া পড়িল। অকস্মাৎ অস্ত্রহীন হইয়া ডা-গামা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

ডা-গামার দুই জন সহচর এতক্ষণ সকলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতেছিল। প্রভুর অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে তাহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইবার পূর্বেই, অতি বিশাল-কলেবর নিকষকৃষ্ণ হাবসী জাম্বো মাস্তুলের ন্যায় দুই হস্ত বাহির করিয়া তাহাদেব কেশ ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল এবং নিরতিশয় শুভ্র দুইপাটি দন্ত বিনিষ্ক্রান্ত করিয়া যাহা বলিল, তাহার একটি বর্ণও তাহারা বুঝিতে না পারিলেও জাম্বোর মনোগত অভিপ্রায় অনুধাবন করিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র ক্লেশ হইল না।

মির্জা দাউদ তরবারির ধার ডা-গামার কণ্ঠে স্থাপন করিয়া কহিলেন, 'ডা-গামা, নতজানু হ, নহিলে তোকে বধ করিব।'

ডা-গামা নতজানু হইল না—বাহুদ্বয়ে বক্ষ নিবদ্ধ করিয়া বিকৃতমুখে হাস্য করিয়া কহিল, 'মূর, নিরস্ত্রকে হত্যা করা তোদের স্বভাব বটে।'

মির্জা দাউদ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'ভালো, তোকে ছাড়িয়া দিব—কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর্—'

ডা-গামা কহিল, 'আমি কোনও প্রতিজ্ঞা করিব না, তোর যাহা ইচ্ছা কর্।'

মির্জা দাউদ বলিলেন, 'শপথ কর্ যে, আজ হইতে সপ্তাহমধ্যে সদলবলে এ দেশ ছাড়িয়া যাইবি, আর কখনও ফিরিবি না।'

ডা-গামা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, 'মূর, তুই অতি নির্বোধ! আমি শপথ করিব না,

আমাকে বধ কর্। আমার রক্তে কালিকটের মাটি ভিজিলে হিন্দে ইম্যানুয়েলের জয়ধ্বজা সহজে রোপিত হইবে।'

মির্জা দাউদ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'এতদিনে নিজ মুখে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলি ! কিন্তু তাহা হইতে দিব না। ইম্যানুয়েলের জয়ধ্বজা কালিকটে রোপিত হইবে না। কালিকট চিরদিন পৃথিবীর সমস্ত জাতির মিলনক্ষেত্র হইয়া থাকিবে। প্রতিজ্ঞা কর্, নচেৎ—'

ডা-গামা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, 'নচেৎ ?'

'নচেৎ পোর্তুগালে ফিরিয়া যাইতে একটি প্রাণীও জীবিত রাখিব না। তোদের জাহাজ পুড়াইয়া এই একশত ত্রিশ জন লোককে কাটিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিব।'

ডা-গামা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোনও উত্তর দিল না।

মির্জা দাউদ পুনশ্চ কহিলেন, 'ডা-গামা, এখনও শপথ কর্—তোর ধর্মের উপর বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিব।—ভাবিয়া দেখ, তোরা মরিলে কে তোর দেশবাসী ভিক্ষুকদের পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে ?'

ডা-গামা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, 'শপথ করিতেছি—'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'তোদের যেশুর জননী মেরীর নামে শপথ কর্।'

ডা-গামা তখন কম্পিত ক্রোধ-জর্জরিত কণ্ঠে শপথ করিল যে, সপ্তাহমধ্যে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং আর কখনও ভারতভূমির উপর পদার্পণ করিবে না।

ডা-গামাকে ছাড়িয়া দিয়া মির্জা দাউদ ও আরও প্রধান প্রধান নাগরিকগণ সামরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত শুনিয়া সামরী কহিলেন, 'যত দিন উহারা আমার রাজ্যের কোনও প্রকাশ্য অনিষ্ট না করিতেছে, ততদিন শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া আমি উহাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে পারি না। তবে কেহ যদি তোমাদের ব্যক্তিগত অনিষ্ট করিয়া থাকে, তোমরা প্রতিশোধ লইতে পার, আমি বাধা দিব না।'

সকলে সামরীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, ইহারা অত্যন্ত কূটবুদ্ধি ও যুদ্ধনিপুণ, তাহাদের কামান, বন্দুক, গোলাগুলি আছে ; সুযোগ পাইলেই তাহারা বাহুবলে এই সোনার রাজ্য অপূর্ব অমরাবতী গ্রাস করিবে।

সামরী হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আমার সৈন্যবল নাই সত্য, কিন্তু সামরীবংশ পঞ্চদশ শতাব্দী ধরিয়া এই মসলন্দে রাজত্ব করিতেছে—কেহ তাহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করে নাই। আমার সিংহাসন সুশাসন ও জনপ্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহারা আমার কি করিতে পারে ?'

সকলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

সপ্তাহ পরে স্বর্ণপত্রে লিখিত সামরীর সন্ধিলিপি মস্তকে ধারণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা অনুচরসহ জাহাজে উঠিল।

মির্জা দাউদ বন্দর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, 'ডা-গামা, শপথ স্মরণ রাখিও।'

একটা ক্রূর হাস্য ডা-গামার মুখের উপর খেলিয়া গেল, মির্জা দাউদের প্রতি স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, 'মির্জা দাউদ, আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।'

মির্জা দাউদ হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'সম্ভব নয়। আমি মুসলমান—বেহেস্তে যাইব।'

ডা-গামা দুই চক্ষুতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া কহিল, 'ইহজন্মেই আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।'

তারপর ধীরে ধীরে তাহার তিনটি জাহাজ বন্দরের বাহির হইয়া গেল।

চারি বৎসর অতীত হইয়াছে। এই চারি বৎসরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা এই কাহিনীর অন্তর্গত না হইলেও সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ভাস্কো-ডা-গামা কালিকট ত্যাগ করিবার দুই বৎসর

পরে আবার পোর্তুগীজ জাহাজ ভারতবর্ষে আসিল। এবার পোর্তুগীজদের অধিনায়ক আল্‌ভারেজ কেব্‌লার নামক একজন পাদ্রী এবং তাঁহার অধীনে নয়খানি জাহাজ। পাদ্রী আল্‌ভারেজ কালিকট বন্দরে প্রবেশ করিয়াই জাহাজ হইতে নগরের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ফলে বহু নাগরিকের প্রাণনাশ হইল, অনেকে আহত হইল এবং কয়েকটি অট্টালিকা চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে রাজা-প্রজার মনে ভীতি ও কর্তব্যজ্ঞান সঞ্চারিত করিয়া পোর্তুগীজরা আবার ভারতভূমিতে পদার্পণ করিল। রাজা সামরী আগন্তুকদিগকে সম্মান দেখাইলেন ও তাহাদের বাসের জন্য নগরের বাহিরে ভূমিদান করিয়া কুঠি-নির্মাণের অনুমতি দিলেন। কিন্তু পোর্তুগীজদিগের এই অহেতুক জিঘাংসা ও নিষ্ঠুরতায় কালিকটের জনসাধারণের মন তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তারপর কলহ বাধিতে বিলম্ব হইল না। দাম্ভিক বিদেশীদের প্রতি যাহাদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, তাহারা ঝগড়া বাধাইয়া রক্তপাত করিতে লাগিল। পোর্তুগীজরাও জবাব দিল। ক্রমে ভিতরে বাহিরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। একদিন নাগরিকগণ পোর্তুগীজদের কুঠিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া সত্তর জন ফিরিঙ্গীকে হত্যা করিল। অবশিষ্ট পলাইয়া জাহাজে উঠিল এবং জাহাজ হইতে গোলা মারিয়া নগরের এক অংশে আগুন লাগাইয়া দিল। তারপর সেই যে তাহারা কালিকট ছাড়িয়া গেল, দুই বৎসরের মধ্যে আর ফিরিয়া আসিল না।

কালিকটের রাজা-প্রজা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—আপদ দূর হইয়াছে, আর ফিরিবে না।

শেষোক্ত ঘটনার বৎসরেক পরে মির্জা দাউদ স্ত্রী-কন্যা লইয়া তাঁহার জন্মভূমি মরক্কো দেশে গেলেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থানের পর বৃদ্ধ পিতাকে সঙ্গে লইয়া মক্কাশরীফ দর্শন করিলেন। তারপর তীর্থ-দর্শন শেষ করিয়া সকলে মিলিয়া কালিকটে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন।

কথা ছিল, মক্কাশরীফ হইতে মির্জা দাউদ কালিকটে আসিবেন, তাঁহার পিতা মরক্কো দেশে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু পিতা স্থবির ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—অধিক দিন পরমায়ু নাই। পুনরায় মরক্কো যাইবার সুযোগ হয়তো শীঘ্র হইবে না, ততদিন পিতা বাঁচিবেন কি না, এই সকল বিবেচনা করিয়া মির্জা দাউদ তাঁহাকে ছাড়িলেন না, নিজের সঙ্গে কালিকটে লইয়া চলিলেন। বৃদ্ধও ঈদের চাঁদের মতো সুন্দর ক্ষুদ্র নাতিনীটিকে দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন—তিনিও বিশেষ আপত্তি করিলেন না।

মক্কাশরীফ দর্শনের সময় কালিকটের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত মির্জা দাউদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের বলিলেন, 'আপনারাও কালিকটে ফিরিতেছেন—আমার জাহাজেই চলুন।' তাঁহারা আনন্দিত হইয়া সপরিবারে মির্জা দাউদের জাহাজে আশ্রয় লইলেন।

মক্কা হইতে কালিকট তিন মাসের পথ। জাহাজ যথাসময়ে আরব উপকূল ছাড়িয়া লোহিত সাগর পার হইল। ক্রমে পারস্য উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ভারত সমুদ্রে আসিয়া পড়িল।

মহাসাগরের বুকের উপর বায়ু-বর্তুলিত পালের ভরে মির্জা দাউদের তরণী দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে। চারিদিকে অতল জল দুলিতেছে, ফুলিতেছে—লক্ষকোটিখণ্ডে বিচূর্ণিত দর্পণের মতো রবিকরে প্রতিফলিত হইতেছে। পূর্ণ দিগন্তরেখা অখণ্ডভাবে তরণীকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। কেবল বহুদূরে পূর্বচক্রবালে মেঘের মতো কচ্ছভূমির তটবনানী ঈষন্মাত্র দেখা যাইতেছে।

জাহাজে যে অভিজ্ঞ আড়কাঠি আছে, সে বলিয়াছে যে বায়ুর দিক এবং গতি পরিবর্তিত না হইলে অষ্টাহমধ্যে কালিকটে পৌঁছানো যাইবে। আশু যাত্রাশেষ কল্পনা করিয়া আরোহীরা সকলেই হৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

সেদিন শুক্রবার, সূর্য ক্রমে মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। জাহাজের বিস্তৃত ছাদের উপর মির্জা দাউদ, তাঁহার পিতা ও আর আর পুরুষগণ দ্বিপ্রাহরিক নমাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন। জাহাজের নিয়ামক সম্মুখে স্থিরদৃষ্টি করিয়া হালের নিকট নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু তরণীর বেগবিদীর্ণ জলরাশি ফেন-হাস্যে কল্‌কল্ করিতেছে।

এমন সময় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া মেঘগর্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দে সকলে চমকিত হইয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে পাঁচখানা ফিরিঙ্গী জাহাজ সমস্ত পাল তুলিয়া দিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অগণ্য দাঁড় বাহিয়া যেন বহুপদবিশিষ্ট অতিকায় জলজন্তুর মতো ছুটিয়া আসিতেছে। অতর্কিতে এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে যে, জাহাজের মানুষগুলাকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই আকস্মিক দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো সেই দিকে নিষ্পলকভাবে তাকাইয়া রহিলেন।

বিস্মিত হইবার মতো দৃশ্য বটে ! দুই দণ্ড পূর্বেও চতুর্দিকে কোথাও একটা ভেলা পর্যন্ত ছিল না। সহসা সমুদ্রের কোন্ অতল গুহা হইতে এই পাঁচটা ভীষণ দৈত্য বাহির হইয়া আসিল ? মির্জা দাউদের মন বলিল, আজ আর রক্ষা নাই। কামান দাগিয়া ইহারা নিজ আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়াছে—আজ তাহারা দয়ামায়া দেখাইবে না। মূরের রক্তে হিংসা চরিতার্থ করিবার আজ তাহাদের সুযোগ মিলিয়াছে।

এরূপ ঘটনা প্রতীচ্যখণ্ডের সমুদ্রবক্ষে পূর্বে কখনও ঘটে নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে এইপথে শত শত তরণী অবাধে যাতায়াত করিয়াছে। চীন হইতে কাস্পীয় হ্রদ পর্যন্ত কেহ কখনও হিংস্রিকা বা বোম্বেটের নাম পর্যন্ত শুনে নাই। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথ অধিক নিরাপদ ছিল বলিয়াই জলবাণিজ্য এত প্রসার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ যুগযুগান্তরের বাহিতপণ্য অব্যাহত পথে স্বার্থান্ধ ফিরিঙ্গী তাহার অগ্নি-অস্ত্র লইয়া পথরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু যুদ্ধদান করা মির্জা দাউদের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার জাহাজ তীর্থযাত্রীর জাহাজ, তাহাতে বারুদ-গোলা কিছুই নাই। আছে কেবল কতকগুলি অসহায় যুদ্ধানভিজ্ঞ ধর্মপরায়ণ তীর্থযাত্রী এবং তদপেক্ষাও অসহায় কতকগুলি নারী ও শিশু। এরূপ অবস্থায় পাঁচখানা রণপোতের সঙ্গে যুদ্ধ করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক উপায় পলায়ন ; কিন্তু মির্জা দাউদের জাহাজ কেবল পালের ভরে চলে—বিপক্ষের পাল দাঁড় দুই আছে ; এ ক্ষেত্রে পলায়নও সাধ্যাতীত।

মির্জা দাউদ ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে চিন্তা করিলেন। একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিলেন। আকাশ নির্মেঘ—বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। রাত্রি হইতে বিলম্ব আছে। তিনি নাবিককে ডাকিয়া সমস্ত পাল তুলিয়া প্রাণপণে জাহাজ ছুটাইতে আজ্ঞা দিলেন।

কিন্তু এ আজ্ঞা পালিত হইতে না হইতে জলদস্যুদিগের পাঁচখানা জাহাজ হইতে একসঙ্গে কামান ডাকিল। একটা গোলা বড় পালের ভিতর ছিদ্র করিয়া জাহাজের পরপারে গিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল, অন্যগুলা জাহাজের চারিদিকে জলের উপর পড়িল। কোনটাই কিন্তু জাহাজকে গুরুতর জখম করিতে পারিল না।

জাহাজের পুরুষযাত্রীদের মুখ শুকাইল। নিম্ন হইতে ভীত শিশু ও নারীগণের আর্তস্বর ও ক্রন্দন উঠিল। দন্তে দন্ত চাপিয়া মির্জা দাউদ নাবিকদের হুকুম দিলেন, 'যতক্ষণ পার, জাহাজ চালাও, ফিরিঙ্গী দস্যুর হাতে ধরা দিব না।'

এমন সময় মির্জা দাউদের চারি বৎসরের কন্যা হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপরে উঠিয়া আসিয়া পিতার জানু জড়াইয়া ধরিল। বলিল, 'বাবা, মা তোমাকে ডাকছেন।'—বলিয়া পিতার মুখের দিকে চোখ তুলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, 'বাবা, আমার বড় ভয় করছে।'

মির্জা দাউদ কন্যাকে দুই হাতে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার কানে কানে বলিলেন, 'হুস্‌না, কাঁদিস না। তুই মূরের কন্যা—তোর কিসের ভয় ? আজ আমরা সকলে একসঙ্গে

বেহেস্তে যাইব।'

কন্যাকে পিতার ক্রোড়ে দিয়া মির্জা দাউদ নীচে নামিয়া গেলেন। সম্মুখেই আকুলনয়না স্ত্রীঃ সহিত সাক্ষাৎ হইল।

নিজ কটি হইতে ক্ষুদ্র মাণিক্যখচিত ছুরিকা পত্নীর হস্তে দিয়া সংযত কণ্ঠে কহিলেন, 'শালেহা বোধ হয় আজ অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। বোম্বেটে জাহাজ পিছু লইয়াছে। যদি উহারা এ জাহাজে পদার্পণ করে, এ ছুরি নিজের উপর ব্যবহার করিও। তার পূর্বে কিছু করিও না। আর অন্যান্য স্ত্রীলোকদের আশ্বাস দিও, অকারণে ভয় না পায়। চলিলাম।'—এই বলিয়া মুহূর্তকালের জন্য পত্নীর মস্তক বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া মির্জা দাউদ উপরে ফিরিয়া গেলেন।

উপরে উঠিয়া দেখিলেন, এই অল্পকাল মধ্যে দস্যুজাহাজগুলি অর্ধচন্দ্রাকারে তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত স্পষ্ট শুনা যাইতেছে। মির্জা দাউদ দেখিলেন, প্রত্যেক জাহাজ হইতে কামানের মুখ তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে। এত নিকট হইতে এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না।

মির্জা দাউদের পিতা আসিয়া বলিলেন, 'দাউদ, আর উপায় নাই। ধরা না দিলে জাহাজডুবি হইয়া মরিতে হইবে।'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'ধরা দিলেও নিশ্চয় মরিতে হইবে, তাহার অপেক্ষা ডুবিয়া মরাই শ্রেয়ঃ।'

পিতা বলিলেন, 'সে কথা ঠিক। কিন্তু সঙ্গে শিশু ও স্ত্রীলোক রহিয়াছে। তাহাদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে কি?'

মির্জা দাউদ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'কিন্তু দস্যুরা শিশু ও নারীদের দয়া করিবে কি? বরঞ্চ—'

পিতা কহিলেন, 'ফিরিঙ্গী অর্থলোভী, অর্থের বিনিময়ে তাহাদের ছাড়িয়া দিতে পারে।'

অন্যান্য পুরুষগণও বৃদ্ধের বাক্য সমর্থন করিলেন। মির্জা দাউদ তখন কহিলেন, 'ভালো, চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্।'

ঠিক এই সময় একখানা জাহাজ হইতে আবার কামান দাগিল। এবার গোলার আঘাতে প্রকাণ্ড মাস্তুল পালসুদ্ধ মড়মড় শব্দে ভাঙিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তূপীকৃত পালের কাপড়ে আগুন লাগিয়া গেল।

রমণীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আব্রু রক্ষা করিয়া জাহাজের খোলের মধ্যেই ছিল, কিন্তু এবার আর লজ্জার বাধা মানিল না। সন্তানবতীরা সন্তান কোলে লইয়া, যাহাদের সন্তান নাই—তাহারা যে যেমনভাবে ছিল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিয়া আসিল। সকলেই ভয়বিহ্বলা। কেহ ঊর্ধ্বমুখী নতজানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রাণের আকুল আবেদন জানাইতে লাগিল, কেহ শিশু-সন্তানকে দুই হাতে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া জলদস্যুদিগকে দেখাইয়া তাহাদের কৃপা আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

এদিকে পালের আগুন ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া জাহাজময় ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিল। পুরুষগণ তখন সমুদ্র হইতে জল তুলিয়া অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু কষ্টে অনেক জল ঢালিবার পর অগ্নি নির্বাপিত হইল। তখনকার মতো জাহাজ রক্ষা পাইল।

একখানা ফিরিঙ্গী জাহাজ মির্জা দাউদের জাহাজের একেবারে পাশে আসিয়া পড়িয়াছিল। মধ্যে মাত্র একশত গজের ব্যবধান। কামান ঘুরাইয়া তাহারা আবার গোলা ছুঁড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। তখন মির্জা দাউদ উচ্চকণ্ঠে তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, 'গোলা ছুঁড়িও না—আমরা আত্মসমর্পণ করিতেছি।'

কামান ছাড়িয়া তাহারা উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে একজন—বোধ হয়, সেই প্রধান নাবিক—কহিল, 'তোমাদের জাহাজে যত অস্ত্র আছে, জলে ফেলিয়া দাও—নহিলে কামান ছুঁড়িব।'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'আমাদের সঙ্গে কোনও অস্ত্র নাই। ইহা তীর্থযাত্রীর জাহাজ। যাহা কিছু ধনরত্ন সঙ্গে আছে, দিতেছি—আমাদের ছাড়িয়া দাও।'

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় আক্রমণকারী জাহাজের ভিতর হইতে একজন পুরুষ উপরে উঠিয়া আসিল। অতি মহার্ঘ বেশভূষায় সজ্জিত বিশালদেহ এক পুরুষ। তাহাকে দেখিয়া মির্জা দাউদের বুকের রক্ত সহসা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। চিনিলেন—ভাস্কো-ডা-গামা। তাহার মুখের উপর কৃষ্ণ কাল-সর্পের মতো হিংসা যেন কুণ্ডলিত হইয়া আছে। মির্জা দাউদকে দেখিয়া ভাস্কো-ডা-গামা হাসিল। মাথার কঙ্কপত্রযুক্ত টুপি খুলিয়া তাহা আভূমি সঞ্চারিত করিয়া বলিল, 'মির্জা দাউদ, আজ সুপ্রভাত! স্মরণ আছে, বলিয়াছিলাম আবার দেখা হইবে?'

মির্জা দাউদের মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। ভাস্কো-ডা-গামা তখন পূর্বোক্ত প্রধান নাবিকের দিকে ফিরিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, 'কাপ্তেন, কামান নীরব কেন? আমার হুকুম কি ভুলিয়া গিয়াছ?'

ভীত কাপ্তেন বলিল, 'প্রভু, উহারা ধনরত্ন দিয়া পরিত্রাণের আর্জি করিতেছে।'

দুই জাহাজ ক্রমে আরও নিকটবর্তী হইতেছিল। ডা-গামা আবার মির্জা দাউদের দিকে ফিরিয়া শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, 'মূর, ধনরত্ন দিয়া প্রাণভিক্ষা চাও?'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'নিজের প্রাণভিক্ষা চাহি না। আমাদের সর্বস্ব লইয়া বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের ছাড়িয়া দাও।'

ডা-গামা শত্রুর লাঞ্ছনার রস অল্প অল্প করিয়া পান করিতে লাগিল, কহিল, 'বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের ছাড়িয়া দিব? কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ? বরঞ্চ তোমরা যুবতী নারীদের আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া পুরুষগণ প্রাণ বাঁচাইতে পার। আমাদের জাহাজে স্ত্রীলোকের কিছু প্রয়োজন হইয়াছে। আমার নিজের জন্য নয়—খালাসীদের জন্য। আমার নারীতে রুচি নাই।'

ক্রোধে অপমানে মির্জা দাউদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বুঝিলেন, ডা-গামা তাঁহাকে লইয়া খেলা করিতেছে। অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া কহিলেন, 'ডা-গামা, তোমার প্রস্তাবের উত্তর দিতে ঘৃণা হইতেছে। যদি অভিরুচি হয়, আমাদের সহিত যাহা মূল্যবান সামগ্রী ও স্বর্ণ রৌপ্য আছে, তাহা লইয়া আমাদের নিষ্কৃতি দাও। নতুবা কিছুই পাইবে না।'

ডা-গামা ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, 'কিছুই পাইব না, তার অর্থ?'

মির্জা দাউদ কহিলেন, 'তার অর্থ—জোর করিলে আমাদের মারিয়া ফেলিতে পারিবে, কিন্তু কিছু লাভ করিতে পারিবে না। যদি আমার জাহাজে চড়াও করিবার চেষ্টা কর, তক্তা খুলিয়া জাহাজ ডুবাইয়া দিব।'

মির্জা দাউদের কথা শুনিয়া ডা-গামার ভ্রূকুটি গভীরতর হইল, সে নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিল।

এদিকে জাহাজের মাস্তুল ভাঙিয়া যাওয়ায় মির্জা দাউদ পঙ্কে নিবদ্ধ হস্তীর মতো চলচ্ছক্তিহীন। ফিরিঙ্গীর পাঁচখানা জাহাজ ধীরে ধীরে তিন দিক হইতে ঘিরিয়া আরও নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

মির্জা দাউদ অধীর হইয়া কহিলেন, 'ডা-গামা, যাহা করিবে, শীঘ্র কর। আমাদের সহিত বারশত তোলা সোনা আছে—আরও অন্যান্য মহার্ঘ বস্তু আছে; যদি পাইতে ইচ্ছা কর, শীঘ্র বল। অধিক বিলম্ব করিলে সব হারাইবে।'

ডা-গামা বলিল, 'রমণীদের দিবে না ?'

মির্জা দাউদ গর্জিয়া উঠিলেন, 'না, দিব না। আমরা স্ত্রী-কন্যার ব্যবসা করি না।'

ডা-গামা কহিল, 'মূর, এখনও তোর স্পর্ধা কমিল না !—ভালো, অর্থই লইব। তোমার জাহাজে যাহা কিছু আছে, ভেলায় করিয়া আমার জাহাজে পাঠাও।'

'যাহা কিছু আছে, পাইলে ছাড়িয়া দিবে ?'

'দিব।'

'তোমাকে বিশ্বাস কি ?'

'আমি মিথ্যা কথা বলি না।'

'মিথ্যাচারি, শপথ করিয়াছিলে কখনও হিন্দে পদার্পণ করিবে না, তাহার কি হইল ?'

ডা-গামা হাসিয়া বলিল, 'এখনও হিন্দে পদার্পণ করি নাই।'

মির্জা দাউদ তখন অন্যান্য সকলের সহিত পরামর্শ করিলেন। সকলেই কহিলেন, উহাদের কবলে যখন পড়িয়াছি, তখন উহাদের কথায় বিশ্বাস করা ভিন্ন উপায় নাই। অগত্যা মির্জা দাউদ সম্মত হইলেন।

তখন এক ভেলা প্রস্তুত করিয়া তাহারই উপর যাহা কিছু ছিল, এমন কি, নারীগণের অলংকার পর্যন্ত তুলিয়া ডা-গামার জাহাজে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল।

ডা-গামা জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের আর কিছু নাই ?'

'না।'

'আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—নারীদের দিবে না ?'

অসহ্য ক্রোধে মির্জা দাউদের বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল। শুধু তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিশিখার মতো জ্বলিতে লাগিল।

ভাস্কো-ডা-গামা কালকূটের মতো হাসিল। বলিল, 'ভালো, তোমাদের যেরূপ অভিরুচি।' তারপর কাপ্তেনের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'কাপ্তেন, গোলা মারিয়া উহাদের জাহাজে আগুন লাগাইয়া দাও। আজ মুসলমান কুকুরগুলাকে পুড়াইয়া মারিব।'

মির্জা দাউদ চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'শঠ ! বিশ্বাসঘাতক ! মিথ্যাবাদী শয়তান !'

ডা-গামা কহিল, 'মির্জা দাউদ, তোর প্রাণরক্ষা করিতে পারে, এত অর্থ পৃথিবীতে নাই। তবে তুই তোর স্ত্রীর বিনিময়ে এখনও প্রাণরক্ষা করিতে পারিস। তোর স্ত্রীকে আমি বাঁদী করিয়া রাখিব।'

মির্জা দাউদ উন্মত্তের মতো গর্জন করিতে লাগিলেন, 'শয়তান ! শয়তান !'

জাহাজে ভীষণ কোলাহল উঠিল। নর-নারী সকলে পাগলের মতো চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সকলেই যেন এই অভিশপ্ত জাহাজ হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। চতুর্দিক হইতে আর্তরব উঠিল, 'রক্ষা কর ! দয়া কর ! প্রাণ বাঁচাও !'

এই আকুল প্রার্থনার জবাব আসিল। সহসা শিলাবৃষ্টির মতো জাহাজের উপর বন্দুকের গুলি পড়িতে লাগিল। কেহ হত, কেহ আহত হইয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যুর বিভীষিকা যেন ভীষণতর রূপ ধরিয়া দেখা দিল।

মির্জা দাউদের পিতা ক্ষুদ্র হারুণাকে বক্ষে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্খলিত কণ্ঠে একবার শুধু ডাকিলেন, 'দাউদ !'

দুর্দম আবেগে মির্জা দাউদ একসঙ্গে পিতা ও কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন, এমন সময় লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়া শালেহা আসিয়া স্বামীর হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

মির্জা দাউদ বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে একবার তিন জনের মুখের দিকে চাহিলেন। তারপর অবরুদ্ধ

স্বরে কহিলেন, 'পিতা, ঈশ্বর কি নাই ?'

সহসা হারুণা ক্ষুদ্র একটি কাতরোক্তি করিয়া এলাইয়া পড়িল। দ্রুত কন্যাকে নিজের ক্রোড়ে লইয়া মির্জা দাউদ দেখিলেন, তাহার দেহে প্রাণ নাই। নিষ্ঠুর গুলি তাহার বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

তারপর দ্রুত অনুক্রমে স্ত্রী ও পিতা গুলির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া গিয়া মরণ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। ভাস্কো-ডা-গামা তখন স্বয়ং ধূমায়িত বন্দুক হাতে করিয়া পিশাচের মতো উচ্চ হাসি হাসিতেছে।

সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তরেখা স্পর্শ করিয়াছে। আকাশ এবং সমুদ্র তপ্ত রক্তের মতো রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সাগরবক্ষে সূর্যাস্ত হইতেছে।

এইবার পাঁচখানা জাহাজ হইতে এককালে কামান ডাকিল। গোলার সংঘাতে শীতার্ত বৃদ্ধের মতো মির্জা দাউদের জাহাজখানা কাঁপিয়া উঠিল। পালের কামড়ে দপ করিয়া আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে জাহাজ নিমজ্জিত হইতে লাগিল। আবার কামান গর্জিল। এবার জাহাজের সম্মুখ দিকটা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। কল্‌কল্‌ শব্দে জল ঢুকিতে লাগিল।

তারপর নিমেষের মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। আরোহীদের মিলিত কণ্ঠ হইতে এক মহা হাহাকার-ধ্বনি উঠিল। জ্বলন্ত জাহাজ অকস্মাৎ জীবিতবৎ সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল ; তারপর সবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। যাত্রীদের উর্ধ্বোত্থিত কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া গেল। মুহূর্তপূর্বে যেখানে জাহাজ ছিল, সেখানে আবর্তিত তরঙ্গশীর্ষ জলরাশি ক্রীড়া করিতে লাগিল।

ফিরিঙ্গী জাহাজগুলি চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায়ান্ধকারে তাহাদিগকে যেন অন্য জগতের কোনও ভৌতিক তরণীর মতো দেখাইতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে সান্ধ্য নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ হইতে দামামা ও তূর্য বাজিয়া উঠিল।

সূর্য তখন সমুদ্রপারে অস্তমিত হইয়া অন্য কোন্‌ নূতন গগনে উদিত হইয়াছে।

১৯৩০



মৃৎপ্রদীপ

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়িয়া অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক জীবের যে সকল অস্থি-কঙ্কাল বাহির করেন, তাহাতে রক্তমাংস সংযোগ করিয়া তাহার জীবিতকালের বাস্তব মূর্তিটি তৈয়ারি করিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে নিছক কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। ফলে যে মূর্তি সৃষ্টি হয়, সত্যের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে কি না এবং থাকিলেও তাহা কতদূর, সে সম্বন্ধে মতভেদ ও বিবাদ-বিসংবাদ কিছুতেই শেষ হয় না।

আমাদের দেশের ইতিহাসও কতকটা ঐ ভূ-প্রোথিত অতিকায় জন্তুর মতো। যদি বা বহু ক্লেশে সমগ্র কঙ্কালটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হওয়া দূরের কথা, তাহার সজীব চেহারাখানা যে কেমন ছিল তাহা আংশিকভাবে প্রতিপন্ন হইবার পূর্বেই বড় বড় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত তেরিয়া হইয়া এমন মারামারি কাটাকাটি শুরু করিয়া দেন যে, রথি-মহারথী ভিন্ন অন্য লোকের

সে কুরুক্ষেত্রের দিকে চক্ষু ফিরাইবার আর সাহস থাকে না। এবং যুদ্ধের অবসানে শেষ পর্যন্ত সেই কঙ্কালের বিভিন্ন হাড় কয়খানাই রণাঙ্গনে ইতস্তত পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

তাই, যখনই আমাদের জন্মভূমির এই কঙ্কালসার ইতিহাসখানা আমার চোখে পড়ে তখনই মনে হয়, ইহা হইতে আসল বস্তুটির ধারণা করিয়া লওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে কত না দুরূহ ব্যাপার। যে মৃৎপ্রদীপের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, তাহারই কথা ধরি না কেন। প্রাচীন পাটলিপুত্রের যে সামান্য ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহারই চারিপাশে স্বপ্নাবিষ্টের মতো ঘুরিতে ঘুরিতে জঞ্জাল-স্তূপের মধ্যে এই মৃৎপ্রদীপটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। নিতান্ত একেলে সাধারণ মাটির প্রদীপের মতোই তাহার চেহারা, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রায় কাগজের মতো পাতলা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতকাল পরেও তাহার মুখের কাছটিতে একটুখানি পোড়া দাগ লাগিয়া আছে। এই নোনাধরা জীর্ণ বিশেষত্ববর্জিত প্রদীপটি দেখিয়া কে ভাবিতে পারে যে, উহার মুখের ঐ কালির দাগটুকু একদিন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাকে একেবারে কালো করিয়া দিয়াছিল এবং উহারই উর্ধ্বোত্থিত ক্ষুদ্র শিখার বহ্নিতে একটা রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছিল।

অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকেরা বোধ করি অবহেলা করিয়া এই তুচ্ছ প্রদীপটা ফেলিয়া দিয়াছিলেন, মিউজিয়ামে স্থান দেন নাই। আমি সযত্নে কুড়াইয়া আনিয়া সন্ধ্যার পর আমার নির্জন ঘরে মধুমিশ্রিত গব্য ঘৃত দিয়া উহা জ্বালিলাম। কতদিন পরে এ প্রদীপ আবার জ্বলিল ? পুরাবৃত্তের কোন্ মসীলিপ্ত অধ্যায়কে আলোকিত করিল ? বিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহা কোথা হইতে জানিবেন ? উহার অঙ্গে তো তাম্রশাসন-শিলালিপি লটকানো নাই ! সে কেবল আমার,—এই জাতিস্মরের মস্তিষ্কের মধ্যে দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমা দিয়া মুদ্রিত হইয়া আছে।

প্রদীপ জ্বলিলে যখন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বসিলাম, তখন নিমেষমধ্যে এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ঘটিয়া গেল। স্তম্ভিত কাল যেন অতীতের সঙ্গী এই প্রদীপটাকে আবার জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে পিছু ফিরিয়া তাকাইয়া রহিল। এই পাটলিপুত্র নগর মন্ত্রবলে পরিবর্তিত হইয়া কবেকার এক অখ্যাত মগধেশ্বরের মহাস্থানীয় রাজধানীতে পরিণত হইল। আর আমার মাথার মধ্যে যে স্মৃতিপুত্তলিগুলি এতক্ষণ স্বপ্নের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা সজীব হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনা—কত নগণ্য অনাবশ্যক কথা—এই বর্তিকার আলোকে দীপ্তিমান জীবন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সম্মুখ হইতে বর্তমান মুছিয়া একাকার হইয়া গেল, কেবল অতীতের বহুদূর জন্মান্তরের স্মৃতি ভাস্বর হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

সেই প্রদীপ সম্মুখে ধরিয়া তাহারই আলোতে আজ এই কাহিনী লিখিতেছি।

আজ হইতে ষোল শতাব্দী আগেকার কথা।

ক্ষুদ্র ভূস্বামী ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজবংশে বিবাহ করিয়া শ্যালককুলের বাহুবলে পাটলিপুত্র দখল করিয়া রাজা হইলেন। রাজা হইলেন বটে, কিন্তু নামে মাত্র। পট্টমহাদেবী লিচ্ছবিদুহিতা কুমারদেবীর দুর্ধর্ষ প্রতাপে চন্দ্রগুপ্ত মাথা তুলিতে পারিলেন না। রাজমুদ্রায় রাজার মূর্তির সহিত মহাদেবীর মূর্তি ও লিচ্ছবিকুলের নাম উৎকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজার নামে রানী স্বেচ্ছামত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজা একবার নিজ আজ্ঞা প্রচার করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার আজ্ঞা কেহ মানে না। চন্দ্রগুপ্ত বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল ; কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। নিষ্ফল ক্রোধে শক্তিশালী শ্যালককুলের প্রতি বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া তিনি মৃগয়া, সুরা ও দ্যূতক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিলেন।

প্রজাদের তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। রাজা বা রানী যিনিই রাজত্ব করুন, তাহাদের কিছু

আসে যায় না। মহামারী, দুর্ভিক্ষ অথবা যুদ্ধের হাঙ্গামা না থাকিলেই তাহারা সন্তুষ্ট। কাম্ববংশ লুপ্ত হইবার পর বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ অন্তর্বিবাদে দেশ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকাণ্ড মগধ সাম্রাজ্য বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতীদেহের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টিতে দাঁড়াইয়াছিল। ক্ষুদ্র রাজারা ক্ষুদ্র কারণে পরস্পর কলহ করিয়া প্রজার দুর্গতি বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র ও তাহার পারিপার্শ্বিক ভূখণ্ড অধিকার করিয়া কিছু শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পাইয়া প্রজারা তৃপ্ত ছিল, রাজা বা রানী—কে প্রকৃতপক্ষে রাজ্যশাসন করিতেছেন, তাহা দেখিবার তাহাদের প্রয়োজন ছিল না।

যাহা হউক, তরুণী পট্টমহিষী একমাত্র শিশুপুত্র সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে লইয়া রাজ-অবরোধ হইতে প্রজাশাসন করিতেছেন, দেশে নিরুপদ্রব শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে, এমন সময় একদিন শরৎকালের নির্মল প্রভাতে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নগরোপকণ্ঠের বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গেলেন। মহারাজ মৃগয়ায় যাইবেন, সুতরাং পূর্ব হইতে বনমধ্যে বস্ত্রাবাস ছাউনি পড়িল। কারুকার্যখচিত রক্তবর্ণের পট্টাবাস সকল অকালপ্রফুল্ল কিংশুকগুচ্ছের ন্যায় বনস্থলী আলোকিত করিল। কিঙ্করী, নর্তকী, তাম্বূলিক, সংবাহক, সূপকার, নহাপিত প্রভৃতি বহুবিধ দাসদাসী কর্ম-কোলাহলে ও আনন্দ কলরবে কাননলক্ষ্মীর বিশ্রব্ধ শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিল। তারপর যথাসময়ে পারিষদ-পরিবেষ্টিত হইয়া সুরারুণনেত্র মগধেশ্বর মৃগয়াস্থলে উপস্থিত হইলেন।

প্রভাতে দ্যূতক্রীড়া ও তিত্তিরি-যুদ্ধ দর্শন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত আনন্দে কালহরণ করিলেন। দ্বিপ্রহরে পানভোজনের পর অন্য সকলকে শিবিরে রাখিয়া মাত্র চারিজন বয়স্য সঙ্গে মহারাজ অশ্বারোহণে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বয়স্যরা সকলেই মহারাজের সমবয়স্ক যুবা, সকলেই সমান লম্পট ও উচ্ছৃঙ্খল। চাটুমিশ্রিত ব্যঙ্গ-পরিহাস করিতে করিতে তাহারা মহারাজের সঙ্গে চলিল।

মৃগ-অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে প্রায় দিবা তৃতীয় প্রহরে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর কূলে সহসা তাঁহাদের গতিরোধ হইল। সর্বাগ্রে মহারাজ দেখিলেন, তটিনীর উচ্চ তটের উপর ছিন্নমৃণাল কুমুদিনীর মতো এক নারীমূর্তি পড়িয়া আছে। দেহে বস্ত্র কিংবা আভরণ কিছুই নাই—সম্পূর্ণ নগ্ন। কণ্ঠে, প্রকোষ্ঠে, কর্ণে অল্প রক্ত চিহ্ন। দেখিলে বুঝা যায়, দস্যুতে ইহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলাইয়াছে।

রাজা ত্বরিতপদে অশ্ব হইতে নামিয়া রমণীমূর্তির নিকটে গেলেন। নির্নিমেষ নেত্রে তাহার নগ্ন দেহ-লাবণ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নারীর বয়স ষোড়শ কি সপ্তদশের অধিক হইবে না। নবোদ্ভিন্ন যৌবনের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ ; রাজা দুই চক্ষু ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন। তাহার পর নতজানু হইয়া সন্তর্পণে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন—প্রাণ আছে, দ্রুত হৃৎস্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

বয়স্য চারিজন ইতিমধ্যে রাজার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ও লুব্ধদৃষ্টিতে সংজ্ঞাহীনার অনাবৃত সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। সহসা রাজা তাহাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "এ নারী কাহার ?"

রাজার আরক্ত মুখমণ্ডল ও চক্ষুর ভাব দেখিয়া বয়স্যগণ পরিহাস করিতে সাহসী হইল না। একজন কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "রাজ্যের সকল নর-নারীই মহারাজের।"

মহারাজ বোধ করি অন্য কিছু ভাবিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ উত্তর পাইয়া তিনি প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বয়স্যের দিকে ফিরিলেন। পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "এ নারী কাহার ?"

মন বুঝিয়া বয়স্য বলিল, "মহারাজের।"

তৃতীয় বয়স্যের দিকে ফিরিয়া চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলেন।

কিন্তু তৃতীয় বয়স্য—সে অন্তরের দুর্দম লালসা গোপন করিতে পারিল না—ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "দস্যু-উপদ্রুতা নারী শ্রীমৎ মগধেশ্বরের ভোগ্যা নয়। এই নারীদেহটা মহারাজ অধমকে দান করুন।"

বারুণী-কষায়িত নেত্র কিছুক্ষণ তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মহারাজ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বিট, স্বর্গের পারিজাত লইয়া তুই কি করিবি ? এ নারী আমার !"—এই বলিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রজালে রমণীর সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিলেন।

লুব্ধ বয়স্য তখনও আশা ছাড়ে নাই—রূপসীর প্রতি সতৃষ্ণ একটা কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "কিন্তু মহারাজ, এ অনুচিত। পট্টমহাদেবী শুনিলে..."

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় রাজা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "পট্টমহাদেবী ? রে পীঠমর্দ, পট্টমহাদেবী আমার ভর্ত্রী নয়, আমি তার ভর্তা—বুঝিলি ? এ রাজ্য আমার, এ নারী আমার—পট্টমহাদেবীর নয়।"

এই আকস্মিক উগ্র ক্রোধে বয়স্যগণ ভয়ে নিশ্চল বাক্‌শূন্য হইয়া গেল। চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া কহিলেন, "এই নারীকে আমি মহিষীরূপে গ্রহণ করিলাম। বয়স্যগণ, মহাদেবীকে প্রণাম কর।"

যন্ত্রচালিতবৎ বয়স্যগণ প্রণাম করিল।

তখন সেই সংজ্ঞাহীন দেহ সন্তর্পণে বক্ষে তুলিয়া মহারাজ অশ্বারোহণে শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। মূর্ছিতার অবেণীবদ্ধ মুক্ত কুন্তল কৃষ্ণ ধূমকেতুর মতো পশ্চাতে উড়িতে উড়িতে চলিল।

শিবিরে ফিরিয়া সংজ্ঞালাভ করিবার পর রমণী যে পরিচয় দিল তাহা এইরূপ—

তাহার নাম সোমদত্তা। সে শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা, পিতার সহিত চম্পাদেশে যাইতেছিল, পথে আটবিক দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হয়। তাহার পিতাকে দস্যুরা মারিয়া ফেলে। অতঃপর দস্যুপতি তাহার রূপযৌবন দেখিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে মনস্থ করে। অন্য দস্যুগণ তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করিল। ফলে তাহারা পরস্পরের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ আরম্ভ করিল এবং একে অন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া, যাহাকে লইয়া কলহ তাহাকেই অরক্ষিত ফেলিয়া গেল। যাইবার সময় একজন চতুর দস্যু, পাছে সোমদত্তা কোথাও পলায়ন করে, এই ভয়ে তাহার বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া যায়।

যথাকালে চন্দ্রগুপ্ত সোমদত্তাকে দোলায় তুলিয়া নগরে লইয়া গেলেন। শাস্ত্রমত বিবাহ হইল কি না জানা গেল না, যদি বা হইয়া থাকে তাহা গান্ধর্ব কিংবা পৈশাচ-জাতীয়। যাহা হউক, দাসীসহচরীপরিবৃতা সোমদত্তা রাজপুরীর পুরস্ত্রী হইয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার অবস্থানের জন্য মহারাজ একটি স্বতন্ত্র মহল নির্দেশ করিয়া দিলেন।

কুমারদেবী রাজার এই দুষ্মন্ত-উপাখ্যান শুনিলেন, কিন্তু ঘৃণাভরে কোনও কথা বলিলেন না। বিশেষত, সেকালের রাজাদের পক্ষে ইহা এমন কিছু গর্হিত কার্য ছিল না। একাধিক পত্নী ও উপপত্নী সকল রাজ-অন্তঃপুরেই স্থান পাইত। এমন কি, প্রকাশ্য বেশ্যাকে বিবাহ করাও রাজন্যসমাজে অপ্রচলিত ছিল না। কুমারদেবী অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত পুত্রকে সম্মুখে রাখিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মধুভাণ্ডের নিকট ষট্‌পদের মতো সোমদত্তার পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিলেন।

এইরূপে ছয় মাস কাটিল।

তারপর একদিন চূত-মধুক-সুগন্ধি বসন্তকালের প্রারম্ভে জলস্থল অন্ধকার করিয়া পঙ্গপালের মতো এক বিরাট বাহিনী দেশ ছাইয়া ফেলিল। ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখমাত্র আছে।

পুষ্করণা নামক মরুরাজ্যের অধিপতি চন্দ্রবর্মা দিগ্বিজয় যাত্রার পথে মগধ আক্রমণ করিলেন। হীনবীর্য মগধ বিনা যুদ্ধে অধিকৃত হইল। কিন্তু চন্দ্রবর্মা যাহা সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা এত সহজে সিদ্ধ হইল না,—তিনি পাটলিপুত্রে জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিশাল সেনা-সমুদ্রের মধ্যস্থলে পাটলিপুত্র দুর্গ দশ লৌহদ্বারে ইন্দ্রকীলক আঁটিয়া দিয়া ক্ষুদ্র পাষাণদ্বীপের মতো জাগিয়া রহিল।

মগধেশ্বর তখন সোমদত্তার গজদন্ত পালঙ্কে শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন ; প্রহরিণীর মুখে এই বার্তা শুনিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বহুকাললুপ্ত ক্ষাত্রতেজ নিমেষের জন্য জাগ্রত হইয়া উঠিল, কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমার বর্ম ?"—বলিয়াই তাঁহার কুমারদেবীর কথা স্মরণ হইল, মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল। ক্ষীণ শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আক্রমণ করিয়াছে তা আমি কি করিব। পট্টমহাদেবীর কাছে যাও।"—বলিয়া পুনশ্চ শয্যায় শয়ন করিলেন।

সোমদত্তা প্রাসাদচূড়া হইতে দ্রুত চঞ্চলপদে নামিয়া আসিয়া দেখিল, রাজা পূর্ব্ববৎ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন। তাহার শিখরতুল্য দশনে বিদ্যুতের ন্যায় হাসি হাসিয়া গেল। রাজার মস্তকে মৃদু করস্পর্শ করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "ঘুমাও বীরশ্রেষ্ঠ ! ঘুমাও !"

এদিকে প্রহরিণী পট্টমহাদেবীকে গিয়া সংবাদ দিল। কুমারদেবী তখন ষষ্ঠবর্ষীয় কুমার সমুদ্রগুপ্তকে শিক্ষা দিতেছিলেন : "পুত্র, তুমি লিচ্ছবিকুলের দৌহিত্র, এ কথা কখনও ভুলিও না। পাটলিপুত্র তোমার পাদপীঠ মাত্র। ভরতের মতো, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মতো, চণ্ডাশোকের মতো এই সমুদ্রবেষ্টিত বসুন্ধরা তোমার সাম্রাজ্য,—এ কথা স্মরণ রাখিও। তুমি বাহুবলে গুর্জর হইতে সমতট, হিমাদ্রি হইতে অনার্য পাণ্ড্য-দেশ পর্যন্ত পদানত করিবে। তোমার যজ্ঞীয় অশ্ব উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে, আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে সমান অপ্রতিহত হইবে।"

বালক রত্নখচিত ক্রীড়াকন্দুক হস্তে লইয়া গম্ভীরমুখে মাতার কথা শুনিতেছিল।

এমন সময় প্রতিহারিণীর মুখে ভয়ংকর সংবাদ শুনিয়া মহাদেবীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল ; ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করেন, আর্যপুত্র কোথায়। কিন্তু সে ইচ্ছা নিরোধ করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র কঞ্চুকীকে মহামাত্যের কাছে পাঠাও—এখনি তাঁহাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুক। দুর্গের দ্বার সকল রুদ্ধ হউক। বিনা যুদ্ধে মহাস্থানীয় শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিব না।"

মহাদেবীর আদেশের প্রয়োজন ছিল না, মহাসচিব ও সান্ধিবিগ্রহিক পূর্বেই দুর্গদ্বার রোধ করিয়াছিলেন। প্রাকারে প্রাকারে ভল্লহস্তে সতর্ক প্রহরী ঘুরিতেছিল, সিংহদ্বারগুলির উপরে বৃহৎ কটাহে তৈল উত্তপ্ত হইতেছিল। লৌহজালিকে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া স্নায়ুজ্যাযুক্ত ধনুহস্তে ধানুকিগণ ইন্দ্রকোষে লুক্কায়িত থাকিয়া পরিখা-পারস্থিত শত্রুর উপর বিষ-বিদূষিত শর নিক্ষেপ করিতেছিল। প্রাকারের হস্তিনখমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেনানীগণ শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। বুভুক্ষিত কুম্ভীরদল পরিখার কমলবনের মধ্যে খাদ্যান্বেষণে ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। বাহিরে শত্রুসৈন্য মাঝে মাঝে একযোগে দুর্গদ্বার আক্রমণ করিতেছিল। তখন মকরমুখ হইতে প্রচণ্ডবেগে তপ্ত-তৈল বর্ষিত হইতেছিল। আক্রমণকারীরা হতাহত সহচরদিগকে দুর্গদ্বারে ফেলিয়া ভগ্নোদ্যমে ফিরিয়া যাইতেছিল।

পূর্ণ একদিন এইভাবে যুদ্ধ হইল। চন্দ্রবর্মা রণহস্তীর দ্বারা দুর্গদ্বার ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হইল। সর্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ হস্তী মাহুতকে ফেলিয়া দিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিল। চন্দ্রবর্মা দেখিলেন, যুদ্ধ করিয়া দুর্গজয় সহজ নহে।

তখন তাঁহার সৈন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া দুর্গ বেষ্টন করিয়া বসিল। ক্রোশের পর ক্রোশ, যোজনের

পর যোজন ব্যাপ্ত করিয়া তাহাদের শিবির পড়িল। নদীতে কাতারে কাতারে তরণী আসিয়া দুর্গ-প্রাকারের বাহিরে গণ্ডি রচনা করিল। পাটলিপুত্রে পিপীলিকারও আগম নিগমের পথ রহিল না।

ভিতরে মহামাত্য কুমারদেবীকে গিয়া সংবাদ দিলেন, "আশু ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু বর্বর চন্দ্রবর্মা আমাদের অনাহারে শুকাইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখা যাক্‌, কতদূর কি হয়।"

দিগ্বিজয়ী রণপণ্ডিত চন্দ্রবর্মার উদ্দেশ্য কিন্তু দুই প্রকার ছিল। ক্ষুদ্র দুর্বল পাটলিপুত্র অচিরাৎ দখল করিতে তিনি বড় ব্যগ্র ছিলেন না। হইলে ভালো, না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই; আপাতত মগধের অন্যত্র জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেই চলিবে। কিন্তু তাঁহার স্থল-সৈন্য বহুদূর পথ যুদ্ধ করিতে করিতে আসিয়া পরিশ্রান্ত—তাহাদের কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজার দেশে নিরুপদ্রবে ক্লান্তিবিনোদনের জন্য বসিলেন। গঙ্গার স্রোতে তাঁহার নৌবহর নোঙ্গর ফেলিল। দুর্গাবরোধ ও শ্রান্তি অপনোদন একসঙ্গে চলিল।

দুর্গ অবরোধের পঞ্চম দিবসে মহামাত্য আসিয়া রানীকে জানাইলেন যে, দুর্গের খাদ্যভার কমিতে আরম্ভ করিয়াছে—শীঘ্র ইহার কিছু বিধি-ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মন্ত্রীর সহিত কুমারদেবী বহুক্ষণ পরামর্শ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপনে খাদ্য আনিবার কোনও পথ কি নাই?"

সচিব বলিলেন, "হয়তো আছে, কিন্তু আমরা জানি না। নদীপথে খাদ্য আনা যাইতে পারিত, কিন্তু সে পথও বন্ধ। দুর্বৃত্ত চন্দ্রবর্মা নৌকা দিয়া ব্যূহ সাজাইয়া রাখিয়াছে।"

"তবে এখন উপায়?"

"একমাত্র উপায় আছে।"

তারপর আরও অনেকক্ষণ পরামর্শ চলিল।

শেষে মহামাত্য বিদায় লইলে পর কুমারদেবী অলক্ষিতে প্রাসাদশীর্ষে উঠিলেন। অঞ্চলের ভিতর হইতে রক্তচক্ষু ধূম্রবর্ণ দূত-পারাবত বাহির করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিলেন। পারাবত দুইবার প্রাসাদ পরিক্রমণ করিয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইল। যতক্ষণ দেখা যায়, কুমারদেবী আকাশের সেই কৃষ্ণবিন্দুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন।

অতঃপর আরও আট দিন কাটিল। চন্দ্রবর্মা কোনও প্রকার যুদ্ধোদ্যম না করিয়া কেবলমাত্র পথরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে দুর্গে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হইতে আরম্ভ করিল। নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল।

এইরূপে আশায় আশঙ্কায় আরও একপক্ষ অতীত হইল। ফাল্গুন নিঃশেষ হইয়া আসিল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সেই বিট—সেই পীঠমর্দ, যে সোমদত্তার অনাবৃত যৌবনশ্রী দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিল, সে আমি। তখন আমার নাম ছিল, চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা। ঘটোৎকচগুপ্তের ন্যায় আমার পিতাও একজন পরাক্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আমি স্বাধীন হইয়া রাজধানীতে রাজার সাহচর্যে নাগরিক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঐশ্বর্যে বিলাসে কালযাপন করিতেছিলাম।

তীব্র আসবপান করিলে যে বিচারহীন বিবেকহীন মত্ততা জন্মে, সোমদত্তাকে দেখিয়া আমার সেই মত্ততা জন্মিয়াছিল। অবশ্য, বিবেকবুদ্ধি তৎপূর্বেই যে আমার অত্যন্ত অধিক ছিল তাহা নহে। চিরদিন আমার চিত্ত বল্গাশূন্য অশ্বের মতো শাসনে অনভ্যস্ত। কোনও বস্তু আত্মসাৎ করিতে তা সে নারীই হউক বা ধনরত্নই হউক—নিজের ঐহিক সুবিধা ও সামর্থ্য ভিন্ন কোনও

নিষেধ কখনও স্বীকার করি নাই। গুরুলঘুজ্ঞান কদাপি আমার বাসনার সামগ্রীকে দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলে নাই। যখন যাহা অভিলাষ করিয়াছি, ছলে-বলে যেমন করিয়া পারি তাহা গ্রহণ করিয়াছি।

চন্দ্রগুপ্ত যখন সোমদত্তাকে শ্যেনপক্ষীর মতো আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল, তখন বাধাপ্রাপ্ত প্রতিহত বাসনা দুর্বার আক্রোশে আমার বক্ষের মধ্যে গর্জন করিতে লাগিল। চন্দ্রগুপ্ত রাজা, আমি তাহার নর্মসহচর—বয়স্য ; কিন্তু তথাপি কোনও দিন তাহাকে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা যোগ্যতর ভাবিতে পারি নাই। শ্যালকপ্রসাদে সে রাজা হইয়াছে ; সুযোগ ঘটিলে আমিও কি হইতে পারিতাম না ? বাহুবলে, রণশিক্ষায়, নীতিকৌশলে, বংশগরিমায় আমি তাহার অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহি। তবে কোন্ অধিকারে সে আমার ঈপ্সিত বস্তু কাড়িয়া লইল ?

অন্য তিন জন রাজপ্রসাদলোভী চাটুকার, যাহারা সেদিন আমার নিগ্রহ দেখিয়াছিল, তাহারা আমার ক্রোধ ও অন্তর্দাহে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তামাশা-বিদ্রূপ-ইঙ্গিতের গোপন দংশনে আমাকে জর্জরিত করিয়া তুলিল। একদিন, চন্দ্রগুপ্ত তখনও সভায় আগমন করেন নাই, সভাস্থ পারিষদবর্গের মধ্যে নিম্নকণ্ঠে বাক্যালাপ হাস্য-পরিহাস চলিতেছিল, এমন সময় সিদ্ধপাল আমাকে লক্ষ্য করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল, "চক্রায়ুধ, দেখ তো এই রত্নটি কেমন, কোশলের কোনও শ্রেষ্ঠী মহারাজকে উপহার দিয়াছে। মহারাজ বলিয়াছেন, রত্নটি যদি অনাবিদ্ধ হয় তাহা হইলে স্বয়ং রাখিবেন, নচেৎ তোমাকে উহা দান করিবেন। দেখ তো, রত্নটি বজ্রসমুৎকীর্ণ কি না।"—বলিয়া একটি ক্ষুদ্র অতি নিকৃষ্টজাতীয় মণি আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

সভারূঢ় ব্যক্তিগণ এই কদর্য ইঙ্গিতে কেহ দাঁত বাহির করিয়া, কেহ বা নিঃশব্দে হাসিল। সিংহাসনের পার্শ্বে চামরবাহিনী কিঙ্করীগণ মুখে অঞ্চল দিয়া পরস্পরের প্রতি সকৌতুকে কটাক্ষ হানিল। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

ক্রমে আমার কথা পাটলিপুত্র নগরের কাহারও অবিদিত রহিল না। আমি কোনও গোষ্ঠীসমবায় বা সমাপানকে পদার্পণ করিবামাত্র চোখে চোখে কটাক্ষে কটাক্ষে গুপ্ত ইঙ্গিতের স্রোত বহিয়া যাইত। রাজসভায় রাজা আমাকে দেখিয়া ভ্রূকুটি করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমাকে রাজসভা ছাড়িতে হইল, লোক-সমাজও দুঃসহ হইয়া উঠিল। নিজ হর্ম্যতলে একাকী বসিয়া অন্তরের অগ্নিতে অহরহ দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

এই সময় সমুদ্রোচ্ছ্বাসতুল্য অভিযান পাটলিপুত্রের দুর্গতটে আসিয়া প্রহত হইল। আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের সময় আমার ডাক পড়িল। মহাবলাধিকৃত বিরোধবর্মা আমাকে শতরক্ষীর অধিনায়ক করিয়া গোতম-দ্বার নামক দুর্গের পশ্চিম তোরণ রক্ষার ভার দিলেন।

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত্রি। আমি অভ্যাসমত প্রাকারের উপর একাকী পাদচারণ করিতেছিলাম। অবসন্ন বসন্তের শেষ চম্পা চারিদিকে তীব্র বাস বিকীর্ণ করিতেছিল।

বাহিরে শত্রুশিবিরে দীপসকল প্রায় নিবিয়া গিয়াছে—দূরে দূরে দুই একটা জ্বলিতেছে। নিম্নে পরিখার জল স্থির কৃষ্ণদর্পণের মতো পড়িয়া আছে, তাহাতে আকাশস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। নগরের মধ্যে শব্দ নাই, আলোক নাই, গৃহে গৃহে দ্বার রুদ্ধ, দীপ নির্বাপিত। রাজপথও আলোকহীন। তামসী রাত্রির গহন অন্ধকার যেন বিরাট পক্ষ দিয়া চরাচর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

পাটলিপুত্র সুপ্ত, অরাতি-সৈন্যও সুপ্ত। কিন্তু নগরদ্বারের প্রহরীরা জাগ্রত। তোরণের উপর নিঃশব্দে রক্ষীগণ প্রহরা দিতেছে। প্রাকারের উপর স্থানে স্থানে সতর্ক রক্ষী নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। শত্রু পাছে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া অতর্কিতে প্রাকার-লঙ্ঘনের চেষ্টা করে, এইজন্য

রাত্রিতে পাহারা দ্বিগুণ সাবধান থাকে।

রাজপুরী হইতে বেহাগ-রাগিণীতে মধ্যরাত্রি বিজ্ঞাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পাটলিপুত্রের দশ দ্বারের প্রহরী দুন্দুভি বাজাইয়া উচ্চ-কণ্ঠে প্রহর হাঁকিল। নৈশ নীরবতা ক্ষণকালের জন্য বিক্ষুব্ধ করিয়া এই উচ্চরোল ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল ; নগরী যেন শত্রুকে জানাইয়া দিল -"সাবধান ! আমি জাগিয়া আছি !"

একাকী পাদচারণ করিতে করিতে নানা চিন্তা মনে উদয় হইতেছিল। কিসের জন্য এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিশাচরের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ? পাটলিপুত্র দুর্গ রক্ষা করিয়া আমার লাভ কি ? যাহার রাজ্য, সে তো কামিনীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পাটলিপুত্র যদি চন্দ্রবর্মা অধিকার করে, তবে কাহার কি ক্ষতি ? দুর্গের মধ্যে অন্নাভাবের সঙ্গে সঙ্গে রোগ দেখা দিয়াছে, মানুষ না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাহির হইতে খাদ্য আনয়নের উপায় নাই। শুধু রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া জালিকেরা নদী হইতে প্রত্যহ কিছু কিছু মৎস্য সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু তাহাই বা কতটুকু ?—নগরীর ক্ষুধা তাহাতে মিটে না। এভাবে আর কত দিন চলিবে ? অবশেষে একদিন বশ্যতা স্বীকার করিতেই হইবে ; তবে অনর্থক এ ক্লেশভোগ কেন ? সমগ্র দেশ যখন চন্দ্রবর্মার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, তখন পাটলিপুত্র নগর একা কয়দিন টিকিয়া থাকিবে ?

চন্দ্রগুপ্ত যদি রাজ্যাধিকারের যোগ্য হইত, তবে সে নিজে আসিয়া নিজের রাজ্য রক্ষা করিত। আমি কেন এই অপদার্থ রাজার রাজ্যরক্ষায় সাহায্য করিতেছি ? সে আমার কি করিয়াছে ? আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, আমাকে জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করিয়াছে। সোমদত্তা ! সেই দেবভোগ্যা অপ্সরা ! বুঝি পুরুষের লালসা-পরিতৃপ্তির জন্যই তাহার অনুপম দেহ সৃষ্ট হইয়াছিল ! তাহাকে না পাইলে আমার এই অনির্বাণ তৃষ্ণা মিটিবে কি ?—সে এখন চন্দ্রগুপ্তের অঙ্কশায়িনী। চন্দ্রগুপ্ত কি তাহাকে বিবাহ করিয়াছে ? করুক না করুক, সোমদত্তাকে আমার চাই ; যেমন করিয়া পারি, যে উপায়ে পারি, সোমদত্তাকে আমি কাড়িয়া লইব। পারিব না ? নারীর মন কত দিন এক পুরুষে আসক্ত থাকিবে ? তখন চন্দ্রগুপ্ত ! তোমাকে জগতের কাছে হাস্যাস্পদ করিব। সেই আমার লাঞ্ছনার যোগ্য প্রতিশোধ হইবে।

এই সর্বগ্রাসী চিন্তা মনকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, অজ্ঞাতসারে গোতম-দ্বার হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। প্রাকারের এই অংশ রাত্রিকালে স্বভাবতই অতিশয় নির্জন। এই স্থানের দুর্গ-প্রাচীর এতই দুরধিগম্য যে, প্রহরী-স্থাপনেরও প্রয়োজন হয় নাই।

ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ফিরিব ভাবিতেছি, এমন সময় সহসা চোখে পড়িল, সম্মুখে কিছুদূরে প্রাকারের প্রান্তস্থিত এক কণ্টকগুল্মের অন্তরালে দীপ জ্বলিতেছে। পাছে বাহির হইতে শত্রু দুর্গ-প্রাচীরে আরোহণ করে, এজন্য প্রাচীরগাত্রে সর্বত্র কাঁটাগাছ রোপিত থাকিত। কখনও কখনও এই সকল কাঁটাগাছ প্রাকারশীর্ষ ছাড়াইয়া মাথা তুলিত। সেইরূপ দুইটি ঘন-পল্লবিত কণ্টকতরুর মধ্যস্থিত ঝোপের ভিতর প্রদীপ জ্বলিতেছে দেখিলাম। প্রদীপ কখনও উঠিতেছে, কখনও মণ্ডলাকারে আবর্তিত হইতেছে। কেহ যেন একান্তে দাঁড়াইয়া কোনও অদৃশ্য দেবতার আরতি করিতেছে।

পাদুকা খুলিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে কটি হইতে তরবারি বাহির করিয়া হস্তে লইলাম। তারপর অতি সন্তর্পণে সেই সঞ্চরমাণ দীপশিখার দিকে অগ্রসর হইলাম।

কণ্টকগুল্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তন্মধ্যে এক নারী দাঁড়াইয়া পরিখার অপর পারে অনন্য স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে ; এবং প্রদীপ ইতস্তত আন্দোলিত করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে তাহার মুখ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইলাম না, শুধু চোখে পড়িল, তাহার নবমল্লিকাবেষ্টিত কুণ্ডলিত

কবরীভার, তন্মধ্যে দুইটি পদ্মরাগমণি সর্পচক্ষুর মতো জ্বলিতেছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না, এ রমণী গুপ্তচর ; আলোকের ইঙ্গিতে শত্রুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতেছে।

লঘুহস্তে তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিলাম। সশব্দ নিশ্বাস টানিয়া বিদ্যুদ্বেগে রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহারই হস্তধৃত মৃৎপ্রদীপের আলোকে তাহাকে চিনিলাম।

সোমদত্তা !

কম্পিত দীপশিখার আলোক তাহার ত্রাসবিবৃত মুখের উপর পড়িল। চক্ষুর সুবৃহৎ কৃষ্ণতারকা আরও বৃহৎ দেখাইল। মুহূর্তের জন্য আমার মনে সন্দেহ জন্মিল, এ কি সত্যই সোমদত্তা, না আমার দৃষ্টিবিভ্রম ? যে চিন্তা অহরহ আমার অন্তরকে গ্রাস করিয়া আছে, সেই চিন্তার বস্তু কি মূর্তি ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল ? কিন্তু এ ভ্রম অল্পকালের জন্য, আকস্মিক আঘাতে বিপন্ন বুদ্ধি পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, সোমদত্তার হস্তে প্রদীপ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, এখনই পড়িয়া নিবিয়া যাইবে। আমি তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া তাহার হাত হইতে প্রদীপ লইলাম,—তাহার মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া মৃদুহাস্যে বলিলাম, "এ কি ! পরমভট্টারিকা মহাদেবী সোমদত্তা !"

সোমদত্তা ভয়সূচক অস্ফুটধ্বনি করিয়া নিজ বক্ষে হস্তার্পণ করিল। পরক্ষণেই ছুরির একটা ঝলক এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র আমার বস্ত্রাবৃত লৌহজালিকের ব্যবধানপথে বক্ষের চর্ম স্পর্শ করিল। ভিতরে লৌহজালিক না থাকিলে সোমদত্তার হস্তে সেদিন আমার প্রাণ যাইত। আমি ক্ষিপ্রহস্তে ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া নিজ কটিতে রাখিলাম, তারপর সবলে দুই বাহু দিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম। তাহার কর্ণে কহিলাম, "সোমদত্তা, কুহকিনী, আজ তোমাকে পাইয়াছি !"

তৈলপ্রদীপ মাটিতে পড়িয়া নিবিয়া গেল।

জালবদ্ধা ব্যাঘ্রীর মতো সোমদত্তা আমার বাহুমধ্যে যুদ্ধ করিতে লাগিল, নখ দিয়া আমার মুখ ছিঁড়িয়া দিল। আমি আরও জোরে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভালো, ভালো। তোমার নখর-ক্ষত কাল চন্দ্রগুপ্তকে দেখাইব।"

সহসা সোমদত্তার দেহ শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িল ; অন্ধকারে ভাবিলাম, বুঝি মূর্ছা গিয়াছে। তারপর তাহার দ্রুত কম্পনে ও কণ্ঠোত্থিত নিরুদ্ধ শব্দে বুঝিলাম, মূর্ছা নহে—সোমদত্তা কাঁদিতেছে। কাঁদুক—কামিনীর ক্রন্দন আমার জীবনে এই প্রথম নহে। প্রথম প্রথম এমনই কাঁদে বটে। আমি তাহাকে কাঁদিতে দিলাম।

কিছুক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিবার পর সোমদত্তা সোজা হইয়া দাঁড়াইল ; অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে কহিল, "তুমি কে ? কেন আমাকে ধরিয়াছ ? শীঘ্র ছাড়িয়া দাও !"

আমি আলিঙ্গন শিথিল করিলাম না, বলিলাম, "আমি কে শুনিবে ? আমি চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা—তোমার চন্দ্রগুপ্তের বয়স্য, উপস্থিত দুর্গ-তোরণের রক্ষক। আরও অধিক পরিচয় চাও তো বলি, আমি সোমদত্তার রূপের মধুকর। যেদিন তটিনীতটে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলে, ছলনাময়ী, সেইদিন হইতে তোমার রূপযৌবনের আরাধনা করিতেছি !"

অনুভব করিলাম, সোমদত্তা শিহরিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "চিনিয়াছ দেখিতেছি ! হাঁ, আমি সেই বিট, যে স্বর্গের পারিজাত দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছিল।"

সোমদত্তা কহিল, "পাপিষ্ঠ, আমাকে ছাড়িয়া দাও, নচেৎ রাজ-আদেশে তোমার মুণ্ড যাইবে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "পাপিষ্ঠা, তোমাকে ছাড়িব না। ছাড়িয়া দিলে পট্টমহাদেবীর আদেশে আমার মুণ্ড যাইতে পারে। তুমি নিশীথ সময়ে রাজপুরী ছাড়িয়া কি জন্য বাহিরে আসিয়াছ ? প্রাকারের নিভৃত স্থানে প্রদীপ লইয়া কি করিতেছিলে ?"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সোমদত্তা উত্তর করিল, "আমি রাজার অনুমতি লইয়া পুরীর বাহিরে আসিয়াছি।"

ব্যঙ্গ করিয়া বলিলাম, "চন্দ্রগুপ্ত বোধ করি তোমাকে শত্রুর নিকটে সংকেত প্রেরণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছে ?"

সোমদত্তা আবার শিহরিল। বলিল, "আমি বৌদ্ধ সেবাশ্রমে আর্তের চিকিৎসা করিতে প্রত্যহ আসি—রাজার অনুমতি আছে। আজিও আসিয়াছি।"

"প্রাকারের উপর এতক্ষণ কোন্ আর্তের চিকিৎসা করিতেছিলে ?"

"প্রাকারের উপর আহত কেহ আছে কি না দেখিতে আসিয়াছিলাম।"

"ভালো, আজ রাত্রিতে আমার নিকট বন্দিনী থাক, কাল চন্দ্রগুপ্তকে এই কথা বলিও। প্রহরী ডাকি ?"

সোমদত্তা নীরব, মুখে কথা নাই।

আমি পুনরায় কহিলাম, "কি বল ? প্রহরী ডাকি ?"

অবরুদ্ধ কণ্ঠে সোমদত্তা কহিল, "তুমি যাহা চাও দিব—আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

আমি বলিলাম, "যাহা চাই, তাহা এখন জোর করিয়া লইব। তোমার দানের অপেক্ষা রাখি না।"

ভীত অস্পষ্ট কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও ?"

"তোমাকে।"

সোমদত্তা পুনরায় আমার আলিঙ্গন-মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে বিফল হইয়া আমার বক্ষের উপর সবলে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "আমাকে ছাড়িয়া দাও ! ছাড়িয়া দাও ! ছাড়িয়া দাও ! আমি রাজমহিষী, আমার উপর অত্যাচার করিলে তুমি শূলে যাইবে।"

আমি বলিলাম, "তুমি চন্দ্রবর্মার চর,—রাজাকে রূপের কুহকে ভুলাইয়া রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছ। শূল তো দূরের কথা, তোমার উপর অত্যাচার করিলে কুমারদেবী আমাকে পুরস্কৃত করিবেন। মনে রাখিও, তুমি তাঁর সপত্নী।"

সোমদত্তা কাঁদিয়া উঠিল, "দয়া কর, আমি রাজার স্ত্রী।"

"তুমি গুপ্তচর।"

তখন সোমদত্তা আমার বক্ষের উপর নিঃসহায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। এত কাঁদিল যে, বোধ করি পাষাণও দ্রব হইয়া যাইত। কিন্তু আমি লোভে নিষ্ঠুর—তাহার অশ্রু আমাকে দ্রব করিতে পারিল না।

কাঁদিতে কাঁদিতে সোমদত্তা জিজ্ঞাসা করিল, "দয়া করিবে না ?"

আমি বলিলাম, "এইটুক দয়া করিতে পারি, আমি যাহা চাই তাহা স্বেচ্ছায় যদি দাও, তবে চন্দ্রগুপ্ত কিছু জানিবে না।"

ব্যাকুল হইয়া সোমদত্তা কহিল, "আমি সেরূপ স্ত্রীলোক নহি। চন্দ্রগুপ্ত আমার স্বামী, আমি তাঁহাকে ভালবাসি। শুন, আমি চন্দ্রবর্মার গুপ্তচর এ কথা সত্য, তাঁহারই কার্যসিদ্ধির জন্য মগধে আসিয়াছিলাম. কিন্তু তখন জানিতাম না—ভালবাসার স্বাদ পাই নাই। আজ আমি স্বামীর রাজ্য পরের হস্তে তুলিয়া দিবার যত্ন করিতেছি, কেন করিতেছি তাহা তুমি বুঝিবে না। কিন্তু স্বরূপ বলিতেছি, আমি তাঁহাকে ভালবাসি, আমার চোখে তিনি ভিন্ন অন্য পুরুষ নাই। তুমি আমাকে দয়া কর, মুক্তি দাও। আমি শপথ করিতেছি, চন্দ্রবর্মা পাটলিপুত্র অধিকার করিলে আমি তোমাকে কাশী, কোশল, চম্পা, গৌড়—যে রাজ্য চাও তাহার সিংহাসনে বসাইব। চন্দ্রবর্মা আমাকে স্নেহ করেন, আমার যাচ্ঞা কখনো নিষ্ফল হইবে না।"

"কিন্তু চন্দ্রবর্মা যদি পাটলিপুত্র অধিকার করিতে না পারেন ?"

"এমন কখনো হইতে পারে না।"

"বুঝিলাম। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি চন্দ্রগুপ্তকে সত্যই ভালবাস, তবে তাহার সর্বনাশ করিতেছ কেন?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সোমদত্তা বলিল, "চন্দ্রবর্মা আমার পিতা।"

ঘোর বিস্ময়ে কহিলাম, "তুমি চন্দ্রবর্মার কন্যা?"

অধোমুখে সোমদত্তা কহিল, "হাঁ, কিন্তু বারাঙ্গনার গর্ভজাতা।"

"বুঝিয়াছি।"

"তুমি নরাধম, কিছু বুঝ নাই। আমি শৈশব হইতে রাজ-অন্তঃপুরে পালিতা।"

"ভালো, তাহাও বুঝিলাম। বুঝিলাম যে, পিতার জন্য তুমি স্বামীর সর্বনাশ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝিয়া লও। আমি গৌড় চাহি না, চম্পা চাহি না, কাশী-কোশল কিছুই চাহি না—আমি তোমাকে চাই। অস্বীকার করিলে কোনও ফল হইবে না—উপরন্তু চন্দ্রগুপ্ত তোমার এই অভিসার-কথা জানিতে পারিবে।"

সোমদত্তা কম্পিতস্বরে কহিল, "ইচ্ছা হয়, আমাকে হত্যা করিয়া ঐ পরিখার জলে ফেলিয়া দাও, আমি কোনও কথা কহিব না। কিন্তু মহারাজকে এ কথা বলিও না। পুরুষের মন সর্বদা সন্দিগ্ধ, তিনি আমার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিবেন না, আমাকে অবিশ্বাস করিবেন। স্বীকার কর, বলিবে না?"

নারী-চরিত্র কে বুঝিবে? কহিলাম, "উত্তম, বলিব না। কিন্তু আমার পুরস্কার?"

সোমদত্তা নীরব।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার পুরস্কার?"

তথাপি সোমদত্তা মৌন।

আমি তখন ক্ষিপ্ত। নির্মম পীড়নে তাহার দেহলতা বিমথিত করিয়া অধরে চুম্বন করিলাম।

বলিলাম, "সোমদত্তা, তোমার রূপের আগুনে আজ আপনাকে আহুতি দিলাম।"

সোমদত্তা যেন মর্মতন্তু ছিঁড়িয়া কথা কহিল, "শুধু তুমি নহ, তুমি, আমি, চন্দ্রগুপ্ত, মগধ—সব এই আগুনে পুড়িয়া ছাই হইবে!"

নগরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় পাদক্রোশ ভূমির উপর মগধের প্রাচীন রাজপুরী। এই পাদক্রোশ ভূমি উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর বেষ্টিত। পূর্বদিকে প্রশস্ত রাজপথের উপর কারুকার্যশোভিত উচ্চ পাষাণ-তোরণ। এই তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমেই বহুস্তম্ভযুক্ত বিচিত্র দ্বিতল মন্ত্রগৃহ। তাহার পশ্চাতে মহলের পর মহল, প্রাসাদের পর প্রাসাদ,—কোনটি কোষাগার, কোনটি অলংকারগৃহ, কোনটি দেবগৃহ, কোনটি চিত্রভবন। মধ্যে কুঞ্জবেষ্টিত কমল-সরোবর—তাহাতে সারস মরাল প্রভৃতি পক্ষী ও বহুবর্ণের মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে।

সকলের পশ্চাতে শীর্ণ অথচ জলপূর্ণ পরিখার গণ্ডিনিবদ্ধ মগধেশ্বরের অন্তঃপুর। সেতু পার হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হয়। সেতুমুখে কঞ্চুকীসেনা অহোরাত্র পাহারা দিতেছে। ভিতরে সুন্দর কারুশিল্পমণ্ডিত উচ্চশীর্ষ সৌধ সকল পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেন ইন্দ্রভুবন রচনা করিয়াছে। এখানে সকল গৃহই ত্রিতল, প্রথম তল শ্বেত-প্রস্তরে রচিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল দারুনির্মিত।

এই পুরী চন্দ্রগুপ্তের নির্মিত নহে, মৌর্যকালীন প্রাচীন রাজভবন। রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত ইহা অধিকার করিয়াছিলেন। অধিকার করিয়াই রাজপুরীর যাহা সারবস্তু সেই মোহনগৃহ সন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। মোহনগৃহ

রাজভবনের একটি গোপন কক্ষ, দেখিতে অন্যান্য সাধারণ কক্ষের মতোই, কিন্তু ইহার প্রাচীর ও হর্ম্যতলে নানা গুপ্তদ্বার থাকিত। সেই গুপ্তদ্বার দিয়া ভূ-নিম্নস্থ সুড়ঙ্গপথে পুরীর বাহিরে যাওয়া যাইত; এমন কি ঘোর বিপদ-আপদের সময় দুর্গের বাহিরে পলায়ন করাও চলিত। এই মোহনগৃহ প্রত্যেক রাজপুরীর একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; স্বয়ং রাজা এবং পট্টমহিষী ভিন্ন ইহার সন্ধান আর কাহারও জানা থাকিত না। মৃত্যুকালে রাজা পুত্রকে বলিয়া যাইতেন।

এই রাজপ্রাসাদে পূর্ববর্ণিত ঘটনার পরদিন প্রভাতে আমি কিছু গোপন অভিসন্ধি লইয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই মন্ত্রগৃহ,—বহুজনাকীর্ণ। সচিব, সভাসদ্, সেনানী, শ্রেষ্ঠী, বয়স্য, বিদূষক—সকলেই উপস্থিত; সকলের মুখেই দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন। চারিদিক্ হইতে তাহাদের মৃদুজল্পিত গুঞ্জনধ্বনি উঠিতেছে। সভার কেন্দ্রস্থলে রত্নসিংহাসনে বসিয়া কেবল মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নির্লিপ্ত নির্বিকার। আমি সভায় প্রবেশ করিতে চন্দ্রগুপ্ত একবার চক্ষু তুলিয়া আমার দিকে চাহিল—মোহাচ্ছন্ন স্বপ্নাবিষ্ট ভাব—যেন কিছুতেই আসে যায় না। আমি সম্ভ্রম দেখাইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলাম, চন্দ্রগুপ্ত ঈষৎ বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। আমার হাসি আসিল, মনে মনে বলিলাম, "চন্দ্রগুপ্ত! যদি জানিতে!..."

রাজ-সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া ইতস্তত ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্তম্ভের আড়ালে সন্নিধাতার সহিত দেখা হইল। সর্বদা রাজ-সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্যা করা সন্নিধাতার কার্য। নানা কারণে এই সন্নিধাতার সহিত আমার কিছু প্রণয় ছিল; অনেকবার রাজপ্রাসাদের অনেক গূঢ় সংবাদ তাহার নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল্লভ, খবর কি?"

বল্লভ বলিল, "নূতন খবর কিছুই নাই। মহারাজ আজ পত্রচ্ছেদ্যকালে বলিতেছিলেন যে, মোহনগৃহের সন্ধান জানা থাকিলে এ পাপ রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন।"

আমি বলিলাম, "সংসারে এত বৈরাগ্য কেন?"

বল্লভ চোখ টিপিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "সংসারের সকল বস্তুতে নয়!—সে যাক্, তোমায় বহুদিন দেখি নাই, সভায় আস না কেন?"

আমি বলিলাম, "দিনরাত গোতম-দ্বারে পাহারা—সময় পাই না।—বিরোধবর্মা কোথায় বলিতে পার? সভায় তো তাঁহাকে দেখিতেছি না।"

বল্লভ বলিল, "মহাবলাধিকৃত উপরে আছেন, সান্ধিবিগ্রহিকের সঙ্গে কি পরামর্শ হইতেছে।"

"আমারও কিছু পরামর্শ আছে"—বলিয়া সোপান অতিবাহিত করিয়া আমি উপরে গেলাম।

বিরোধবর্মা তখন গুপ্তসদস্যগৃহে বসিয়া সান্ধিবিগ্রহিকের সহিত চুপিচুপি কথা কহিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া উভয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চাহিলেন। আমি কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া বলিলাম, "এরূপভাবে কতদিন চলিবে? দুর্গে খাদ্য নাই, পানীয় নাই; এক দীনারের কমে আঢ়ক পরিমাণ মাধ্বী পাওয়া যায় না। ঘরে ঘরে লোক না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধে মরিত কোনও কথা ছিল না; কিন্তু শত্রুকে বিতাড়িত করিবার কোনও চেষ্টাই নাই। কেবলমাত্র দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি ফল দর্শিবে? নাগরিকগণ নানা কথা বলিতেছে—দুর্গরক্ষীরাও সন্তুষ্ট নয়।"

সান্ধিবিগ্রহিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা কি বলে?"

আমি বলিলাম, "কাল সন্ধ্যায় চণ্ডপালের মদিরাগৃহে গিয়াছিলাম। সেখানে শুনিলাম, অনেকেই বলাবলি করিতেছে—চন্দ্রবর্মার দিগ্বিজয়ী সেনার বিরুদ্ধে শূন্য উদর লইয়া দুর্গরক্ষার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। দুর্গ একদিন তাহারা অধিকার করিবেই, সুতরাং বাধা না দিয়া নির্বিবাদে আসিতে দেওয়াই সুবুদ্ধি—তাহাতে তাহাদের নিকট সদব্যবহার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।"

সান্ধিবিগ্রহিক ও মহাবলাধিকৃত দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। বিরোধবর্মা কহিলেন, "চন্দ্রবর্মা

পাটলিপুত্র অধিকার করিতে পারিবে না, তাহার দিগ্বিজয়যাত্রা এইখানেই শেষ হইবে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু—"

বাধা দিয়া বিরোধবর্মা বলিলেন, "ইহার মধ্যে কিন্তু নাই। জানিয়া রাখ, আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে দিগ্বিজয়ী চন্দ্রবর্মা ল্যাঙ্গুল উচ্চে তুলিয়া মগধ হইতে পলায়ন করিবে। ইচ্ছা হয়, তুমি তার পশ্চাদ্ধাবন করিও।"

ভিতরে কিছু কথা আছে বুঝিলাম। কি কথা জানিবার জন্য পুনশ্চ বলিলাম, "কেমন করিয়া এই অঘটন সম্ভব হইবে জানি না। দশ দিনের মধ্যে নগর শ্মশানে পরিণত হইবে। তখন চন্দ্রবর্মা রহিল কি পলাইল, কে দেখিতে যাইবে ?"

বিরোধবর্মা কহিলেন, "খাদ্যের আয়োজন হইয়াছে, কল্য হইতে সকলে প্রচুর খাদ্য পাইবে।"

আমি বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি, কিভাবে কোথা হইতে খাদ্য আসিবে ! কিন্তু প্রশ্ন করা সুবিবেচনা হইবে না বুঝিয়া বলিলাম, "কিন্তু খাদ্য পাইলেই কি চন্দ্রবর্মাকে বিতাড়িত করা যাইবে ?"

বিরোধবর্মা বলিলেন, "বলিয়াছি, দশ দিনের মধ্যে চন্দ্রবর্মাকে তাড়াইব।"

"কিন্তু এই দশ দিন প্রজাদের কি বলিয়া বুঝাইয়া রাখিবেন ? প্রজা ও রক্ষিসৈন্য মিলিয়া যদি মাৎস্যন্যায় করে ?"

"মাৎস্যন্যায় !"—বিরোধবর্মা গর্জিয়া উঠিলেন, "চক্রায়ুধ, যে যোদ্ধা শত্রুকে দুর্গ-সমর্পণের কথা চিন্তা করিবে তাহাকে শূলে দিব, যে প্রজা মাৎস্যন্যায়ের কথা উচ্চারণ করিবে তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া পরিখার কুম্ভীরের মুখে ফেলিয়া দিব। মাৎস্যন্যায় !—এখনো আমি বাঁচিয়া আছি।" ঈষৎ শান্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি যাও, যে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে বলিও অন্তরীক্ষপথে বার্তা আসিয়াছে, চন্দ্রবর্মার উচ্ছেদ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।"

অন্তরীক্ষ-পথে ! আমি উঠিলাম। উভয়কে প্রণাম করিয়া বাহির হইতেছি, সান্ধিবিগ্রহিক আমাকে ফিরিয়া ডাকিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন, "চক্রায়ুধ ! যাহা শুনিলে, তাহা হইতে যদি কিছু অনুমান করিয়া থাক, তাহা নিজ অন্তরে রাখিও। মন্ত্রভেদে রাজ্যের সর্বনাশ হয়।"

"যথা আজ্ঞা"—বলিয়া মনে মনে হাসিয়া আমি বিদায় লইলাম।

সেই রাত্রিতে মধ্যযাম ঘোষিত হইবার পর সোমদত্তা আবার আসিল। গতরাত্রির সংকেতস্থানে আমি পূর্ব হইতেই উপস্থিত ছিলাম, প্রদীপ হস্তে ধরিয়া ভুবনমোহিনীর ন্যায় আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম। সোমদত্তা ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া আমার আলিঙ্গনে আত্ম-সমর্পণ করিল।

এক রাত্রির মধ্যে কি পরিবর্তন ! নারীর মন এমনই বটে—কাল যে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতেছিল, আজ সে নাগরের প্রেমে পাগল ! আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, তাই বিস্মিত হইলাম না। স্ত্রীজাতি যখন দেখে কুল গিয়াছে, তখন প্রাণপণে নাগরকে ধরিয়া থাকে ; দু'কূল হারাইয়া ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হইতে চাহে না।

আমি বলিলাম, "সোমদত্তা, চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন অন্য পুরুষ পৃথিবীতে আছে কি ?"

সোমদত্তা দুই মৃণালভুজে আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া মুখের অত্যন্ত নিকটে মুখ আনিয়া মৃদু সলজ্জ স্বরে কহিল, "আগে জানিতাম না, এখন বুঝিয়াছি, তুমি ভিন্ন জগতে অন্য পুরুষ নাই।"

সোমদত্তার কথা, তাহার স্পর্শ, তাহার দেহসৌরভ আমার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া হর্ষের প্লাবন আনিয়া দিল। অনির্বচনীয় সুখের মাদকতা মস্তিষ্ককে যেন অবশ করিয়া ফেলিল। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এমনই বুঝি নারী পুরুষকে বশ করিয়া রাখিয়াছে !

আমি বলিলাম, "সোমদত্তা, প্রিয়তমে, তোমাকে আমি সমগ্রভাবে, অনন্যভাবেই চাই। রাত্রিতে চোরের মতো লুকাইয়া এই ক্ষণিকের মিলন—ইহাতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইতেছে না।"

সোমদত্তা আমার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "তাহা কি করিয়া হইবে, প্রাণাধিক ? আমি যে রাজপুরীর পুরন্ধ্রী—চন্দ্রগুপ্তের বনিতা।"

বহুক্ষণ দুইজনে নীরব রহিলাম। সোমদত্তার মতো নারীকে যে পায় নাই, সে জানে না, তাহার জন্য পুরুষের মনে কি তীব্র—কি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে। আমিও যতদিন তাহাকে দূর হইতে কামনা করিয়াছিলাম, ততদিন তাহার এই দুর্নিবার শক্তি অনুভব করি নাই। সোমদত্তাকে লাভ করিবার বাসনা অপেক্ষা তাহাকে একান্তে নিজস্ব করিয়া ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা শতগুণ প্রবল ! তাহার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে, যাহা তাহার অলৌকিক যৌবনশ্রীরও অতীত, যাহা ভোগে অবসাদ আসে না, ঘৃতাহুতির ন্যায় কামনার অগ্নিকে আরও বাড়াইয়া তুলে। সোমদত্তার ন্যায় নারীর জন্য পুরুষ ইহকাল পরকাল অকাতরে বিসর্জন করিতে পারে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, সৃষ্টি রসাতলে পাঠাইতে তিলমাত্র দ্বিধা করে না।

"শত্রুর নিকট কাল কি সংকেত পাঠাইতেছিলে ?"

সোমদত্তা আমার স্কন্ধ হইতে মস্তক তুলিল। আমার মুখের উপর দুই চক্ষু পাতিয়া যেন অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত অন্বেষণ করিয়া লইল। সেখানে কি দেখিল জানি না, বলিল, "দুর্গের দুই একটা কথা জানাইতেছিলাম।"

"তাহা না বলিলেও বুঝিয়াছি। কি কথা ?"

"নগরে খাদ্য নাই, এই সংবাদ দিতেছিলাম।"

আমি বলিলাম, "ভুল সংবাদ দিয়াছ—কাল প্রভাত হইতে নগরে আর অন্নাভাব থাকিবে না।"

সোমদত্তা চমকিত হইয়া বলিল, "সে কি ! কোথা হইতে খাদ্য আসিবে ?"

আমি বলিলাম, "তাহা জানি না। বোধ হয় কোনও সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই পথে বাহির হইতে খাদ্যাদি আসিবে।"

"সুড়ঙ্গ ? কোথায় সুড়ঙ্গ ?"

"তাহা কি করিয়া জানিব ? এ আমার অনুমান মাত্র। কিন্তু নিশ্চিত বলিতেছি, নগরে আর দুর্ভিক্ষ থাকিবে না, সে আয়োজন হইয়াছে। শুধু তাই নয়, শীঘ্রই চন্দ্রবর্মা বাহির হইতে আক্রান্ত হইবেন—বোধ হয় বৈশালী হইতে সৈন্য আসিতেছে।"

"সত্য বলিতেছ ? আমাকে প্রতারণা করিতেছ না ?"

"সত্য বলিতেছি, আজ বিরোধবর্মার মুখে এ কথা শুনিয়াছি।"

সোমদত্তা ললাটে করাঘাত করিল ; বলিল, "হায় ! কাল এ কথা শুনি নাই কেন ? শুনিলে প্রাণ দিতাম, তবু..."

সোমদত্তা বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ দুই চক্ষু আমার দিকে ফিরাইল। দীর্ঘকাল মৌন থাকিয়া শেষে বলিল, "যাহা হইবার হইয়াছে, ললাট-লিখন কে খণ্ডাইবে ? বেশ্যা-কন্যার বুঝি ইহাই প্রাক্তন !"

আমি বাহু দ্বারা তাহার কটিবেষ্টন করিয়া সোহাগে গদ্‌গদ স্বরে বলিলাম, "সোমদত্তা, প্রেয়সী, কেন বৃথা খেদ করিতেছ ? তুমি আমার। চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা তোমার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিবে, জলে ঝাঁপ দিবে। চন্দ্রগুপ্তের কাল পূর্ণ হইয়াছে, তোমার জন্য আমি তার সর্বনাশ করিব।"

"তুমিও চন্দ্রগুপ্তের সর্বনাশ করিবে ?"

"করিব। তুমি পার, আর আমি পারি না ? চন্দ্রগুপ্ত আমার কে ?"

"সখা !"

"সখা নয়। আমি তার প্রমোদের সহচর, স্তাবক সভাসদ, বিট-বিদূষক মাত্র। চন্দ্রগুপ্ত একদিন আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিল, আমিও লইয়াছি। যার অঙ্কলক্ষ্মীকে কাড়িয়া লইয়াছি, তার সঙ্গে আবার সখ্য কিসের ? এখন আমরা দু'জনে মিলিয়া তার উচ্ছেদ করিব।"

কিছুক্ষণ নির্বাক্ থাকিয়া সোমদত্তা প্রশ্ন করিল, "কি করিতে চাও ?"

"শুন বলিতেছি। প্রভাতে বিরোধবর্মার মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা হইতে অনুমান হয় যে, আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে লিচ্ছবিদেশ হইতে পাটলিপুত্রের সাহায্যার্থে সৈন্য আসিবে—পারাবত-মুখে এই সংবাদ আসিয়াছে। চন্দ্রবর্মা যদি পাটলিপুত্র অধিকার করিতে চান, তবে তৎপূর্বেই করিতে হইবে, লিচ্ছবিরা আসিয়া পড়িলে আর তাহা সুসাধ্য হইবে না। তখন নিজের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইবে। এদিকে নগরের খাদ্যাভাবও ঘুচিয়াছে, সুতরাং বাহুবলে এই দশ দিনের মধ্যে দুর্গ জয় করা অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে উপায় কি ?"

"কি উপায় ?"

"বিশ্বাসঘাতকতা।"

"কে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে ?"

"আমি করিব। কিন্তু পরিবর্তে চন্দ্রাবর্মা আমাকে কি দিবেন ?"

"যাহা পাইয়াছ তাহাতে তৃপ্তি নাই ?"

"না। কাল বলিয়াছিলাম বটে, রাজ্য সিংহাসন চাহি না, কিন্তু তাহা ভুল। রাজ্য না পাইলে তোমাকে পাইয়াও আমার অতৃপ্তি থাকিয়া যাইবে। তুমি রাজ-ঐশ্বর্যের স্বাদ পাইয়াছ,—অল্পে কি তোমার মন উঠিবে ?"

"তা বটে, অল্পে আমার ক্ষুধা মিটিবে না !...কৃতঘ্নতার মূল্য কি চাও ?"

"আমি সব স্থির করিয়াছি। তুমি দীপসংকেতে চন্দ্রবর্মাকে সমস্ত সংবাদ দাও,—জানাও যে বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন দুর্গ অধিকার হইবে না। তাঁহাকে এ কথাও বল যে, একজন দ্বারপাল সেনানী দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে মগধের সিংহাসন দিতে হইবে।"

সোমদত্তা প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল ; তারপর হাসিয়া উঠিল। দীপের কম্পমান আলোকে সে হাসি অদ্ভুত দেখাইল। বলিল, "বেশ, বেশ ! আমিও তো ইহাই চাহিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম পিতাকে তুষ্ট করিয়া এক জনের জন্য মগধের সিংহাসন ভিক্ষা মাগিয়া লইব, এক স্পর্ধিতা দুর্বিনীতা নারীর দর্পচূর্ণ করিব। কিন্তু এই ভালো। তোমার ও আমার ষড়যন্ত্রে পিতা দুর্গ অধিকার করিবেন, তারপর তুমি সিংহাসনে বসিবে, আর আমি—আমি তোমার পট্টমহিষী হইব। এই ভালো !"—বলিয়া সোমদত্তা আবার হাসিল।

আমি বলিলাম, "চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিতে হইবে। তাহাকে বাঁচিতে দিয়া কোনও লাভ নাই। পরে গণ্ডগোল বাধিতে পারে। একটা সুবিধা আছে, চন্দ্রগুপ্ত পলাইতে পারিবে না, সে মোহনগৃহের সন্ধান জানে না।"

চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সোমদত্তার মনে কোনও মমতা আছে কি না দেখিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলাম। দেখিলাম, তাহার মুখে করুণার ভাব ফুটিয়া উঠিল না, বরঞ্চ মুখ ও অধরোষ্ঠ আরও কঠিনভাব ধারণ করিল। সে স্থির নিষ্করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মোহনগৃহ কি ?"

মোহনগৃহ কি, বুঝাইয়া দিলে সোমদত্তার মুখে কিছু উৎফুল্লতা দেখা দিল। সে আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিল, "প্রিয়তম, চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবী পুত্র লইয়া পলাইবে, এই কথা ভাবিয়া আমার মনে সুখ ছিল না ; এখন নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিও না, তোমাতে আমাতে নিরাপদে

রাজ্যসুখ ভোগ করিব।"

"আর চন্দ্রগুপ্ত?"

"সে ভার আমার। আমি তার ব্যবস্থা করিব।"

ঊষার সূচনা করিয়া শীতল বায়ু আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া গেল। পূর্বগগনে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়প্রাপ্ত শশিকলা রোগপাণ্ডুর মুখ তুলিয়া চাহিল। আমি বলিলাম, "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, এই বেলা সংকেত পাঠাও।"

সোমদত্তা প্রদীপ লইয়া প্রাকারের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। প্রসারিত-হস্তে কিছুক্ষণ প্রদীপ ধরিয়া থাকিয়া মুখে নিশাচর পক্ষীর মতো একপ্রকার শব্দ করিল। উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম, পরিখার পরপার হইতে অস্পষ্ট উত্তর আসিল। তখন সোমদত্তা প্রদীপ ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। তাপসীর মতো আত্মসমাহিত মুখ, নিশ্চল তন্ময় চক্ষু, সোমদত্তা দীপরশ্মির সাহায্যে সমস্ত সংবাদ বাহিরে প্রেরণ করিল।

সংবাদ শেষ হইলে বাহিরের অন্ধকার হইতে আবার শব্দ আসিল—এবার পাপিয়ার উচ্চতান—শব্দ স্তরে স্তরে উঠিয়া ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে বিলীন হইয়া গেল।

সোমদত্তা প্রদীপ নামাইয়া বলিল, "কল্য উত্তর পাইবে।"

নিশাবসানে পৌরজন নিদ্রাত্যাগ করিয়া দেখিল, নগরের হট্টে রাশি রাশি খাদ্য স্তূপীকৃত হইয়াছে। ঘৃত, তৈল, শালি-তণ্ডুল, গোধূম, চণক, শাক-সব্জী—কোনও বস্তুরই অভাব নাই। কোথা হইতে খাদ্য আসিল, কেহ জানিল না। শুধু দেখা গেল, বুদ্ধ তথাগতের পাষাণময় বিহারের অভ্যন্তর হইতে এই খাদ্য-স্রোত নিঃসৃত হইতেছে। নাগরিকগণ ঊর্ধ্ব কণ্ঠে সৌগতের জয়ঘোষণা করিতে করিতে হট্টের অভিমুখে ছুটিল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তখন মল্লগৃহের সুচিক্কণ শীতল মণি-কুট্টিমের উপর শয়ান ছিলেন, দুই জন নহাপিত সুগন্ধি তৈল দ্বারা তাঁহার হস্তপদাদি মর্দন করিয়া দিতেছিল। নাগরিকদের এই আনন্দনিনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ; তিনি মুদিত চক্ষু ঈষন্মাত্র উন্মীলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্লভ, কিসের চিৎকার ? চন্দ্রবর্মা কি দুর্গপ্রবেশ করিল ?"

সন্নিধাতা বল্লভ সুবর্ণস্থালীর উপর স্ফটিকপাত্রপূর্ণ ফলাম্লরস লইয়া অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল—মহারাজ স্নানান্তে পান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিবেন। সে বলিল, "না অজ্জ, বহুদিন পরে পৌরজন খাদ্য পাইয়াছে, তাই মহারাজের জয়-ধ্বনি করিতেছে।"

চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাদ্য কোথা হইতে আসিল ?"

বল্লভ সবিশেষ জানিত না, তথাপি মহারাজের কথার উত্তর দিতে হইবে ; বলিল, "বিহারমধ্যে খাদ্য সঞ্চিত ছিল, ভিক্ষুগণ তাহাই বিতরণ করিতেছেন।"

মহারাজ আর প্রশ্ন করিলেন না, পুনশ্চ চক্ষু মুদিত করিয়া কহিলেন, "ভাল, মহাদেবীকে সমাচার দাও। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন।"

মহারাজের গূঢ় শ্লেষ বল্লভ অনুধাবন করিল না, মহাদেবী বলিতে প্রেয়সী সোমদত্তাকেই বুঝিল। "যথা আজ্ঞা !" —বলিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়া দেখিল, অসংবৃতকুন্তলা এক তরুণী দাসী দ্রুতপদে বহির্মুখে যাইতেছে। বল্লভ ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল, বলিল, "জয়ন্তী, তোমার কেশবেশ যেরূপ বিস্রস্ত, বাহিরে গেলে লোকে নিন্দা করিবে !"

জয়ন্তী মথিত-কজ্জল চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিল, "কি প্রয়োজন তাই বল না, রসিকতার সময় নাই। আমি কাজে যাইতেছি।"

বল্লভ বলিল, "কাজ পরে করিও, এখন অন্দরে ফিরিয়া যাও।"—বলিয়া তাহার মুখে সংবাদ

পাঠাইয়া দিল্ ।

জয়ন্তী সংবাদ লইতেই আসিতেছিল, ফিরিয়া গিয়া সোমদত্তাকে সকল কথা জানাইল ।

সোমদত্তা তখন শীতল হর্ম্যতলে পড়িয়া দুই বাহুর উপর মুখ রাখিয়া চিন্তা করিতেছিল । কি গহন, কি কুটিল তাহার চিন্তা, তাহা কে বলিবে ? দাসীর কথা শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল । দুই চক্ষু কালিমাবেষ্টিত হইয়া যেন আরও উজ্জ্বল আরও প্রভাময় হইয়াছে, শিশির-কালের প্রস্ফুট হিমচম্পকের ন্যায় কপোল দুইটি পাণ্ডুর । রূপের বুঝি অন্ত নাই । দাসী এই ক্লান্ত-সন্তপ্ত সৌন্দর্যের সম্মুখ হইতে বোধ করি লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল ; সোমদত্তা ডাকিল, "জয়ন্তী !"

দাসী ফিরিয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "অজ্জা !"

অধোমুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সোমদত্তা বলিল, "তুই একবার বাহিরে যা । বৌদ্ধ-বিহারে গিয়া শ্রমণাচার্য ভিক্ষু অকিঞ্চনকে আমার কাছে ডাকিয়া আন্ । বলিবি যে ভিক্ষুণী দীপান্বিতা তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছে । আর কঞ্চুকী যদি তাঁর পুরপ্রবেশে বাধা দেয়, এই মুদ্রা দেখাস্ ।"—বলিয়া আপন কণ্ঠের রত্নহার হইতে সুবর্ণমুদ্রা খুলিয়া দাসীর হস্তে দিল ।

জয়ন্তীর মুখ পাংশু হইয়া গেল, সে ভীতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু অজ্জা, কুমারদেবী জানিতে পারিলে—"

সোমদত্তা কহিল, "ত্যক্ত করিস্ না, যা বলিলাম কর্ ।"

জয়ন্তী প্রস্থান করিল, মনে মনে বলিতে বলিতে গেল, "তোমার আর কি ! অন্দরে বৌদ্ধ ভিক্ষু ডাকিয়াছি শুনিলে পট্টদেবী আমার মাথাটি খাইবেন ।"

ভিক্ষু অকিঞ্চনকে লইয়া যখন জয়ন্তী ফিরিল, তখন সোমদত্তা স্নান করিয়া শুদ্ধশুচি হইয়া বসিয়াছে । ললাটে কুঙ্কুম-তিলক পরিয়াছে, বক্ষে কাঁচুলি বাঁধিয়া উচ্ছল দেহলাবণ্য সংযত করিয়াছে । ভিক্ষু কক্ষে প্রবেশ করিয়া সোমদত্তাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং আসন পরিগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন । সংঘস্থবিরের বয়স হইয়াছে, মস্তক ও মুখ মুণ্ডিত, পরিধানে পীতবস্ত্র, শান্ত সৌম্য মূর্তি । কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে কিছু কৃশ, কিন্তু মুখমণ্ডলে ব্রহ্মচর্যের নির্মল দীপ্তি জাজ্বল্যমান ।

সোমদত্তা জয়ন্তীকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল । জয়ন্তী প্রস্থান করিলে সে ভিক্ষুকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "অর্হৎ, আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়া সংঘারামে গিয়াছিলাম—ক্ষমা করুন !"

অকিঞ্চন কহিলেন, "আত্মগোপন করিয়া যে আর্তের সেবা করে, সিদ্ধার্থ তাহাকে অধিক কৃপা করেন ।"

সোমদত্তা কহিল, "আজ রাত্রে বোধ হয় সংঘারামে যাইবার অবকাশ হইবে না । তাই অজ্জা কুমারদেবীর বৌদ্ধ বিদ্বেষ জানিয়াও আপনাকে এখানে আহ্বান করিয়াছি । আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ।"

অকিঞ্চন কহিলেন, "সময় উপস্থিত হইলে ভগবান শাক্যসিংহ কুমারদেবীকে সুমতি দিবেন । ...তোমার জিজ্ঞাস্য কি ?"

সোমদত্তা কহিল, "শুনিলাম, নগরে খাদ্য আসিয়াছে ; এ কথা সত্য ?"

"সত্য ।"

"কি করিয়া আসিল ?"

ভিক্ষু কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, "তথাগতের কৃপায় ।"

সোমদত্তা ঈষৎ অধীর হইয়া বলিলেন, "তাহা জানি । কিন্তু কোথা হইতে কোন্ পথে

আসিল ?”

অকিঞ্চন মৃদুহাস্যে বলিলেন, “সংঘের পথে।”

শিরঃসঞ্চালন করিয়া সোমদত্তা কহিল, “তাহাও জানি ; খাদ্য সংঘারামে সঞ্চিত ছিল ?”

“না।”

“তবে ?”

“এ অতি গূঢ় বৃত্তান্ত। দীপান্বিতে, তুমি কৌতূহল প্রকাশ করিও না,—আমি বলিব না।”

“তবে আমিই বলিতেছি। সংঘমধ্যে কোনও সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই পথে দুর্গের বাহির হইতে খাদ্য আসিতেছে—সত্য কি না ?”

ইতস্তত করিয়া ভিক্ষু কহিলেন, “সত্য। জান যদি, প্রশ্ন করিতেছ কেন ?”

“জানি না, অনুমান করিয়াছি মাত্র। অর্হৎ, কন্যার প্রতি একটি অনুগ্রহ করুন। কি করিয়া কবে এই সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইল, আমাকে বলুন।”

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সংঘাচার্য বলিলেন, “ভাল, শুন। এই সুড়ঙ্গের সন্ধান একপক্ষ পূর্ব পর্যন্ত আমি অথবা অন্য কেহ জানিত না। আমার পূর্ববর্তী সংঘস্থবির নির্বাণের পূর্বে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই ইহার কথা আমাকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই।”

নির্নিমেষ চক্ষুর্দ্বয় ভিক্ষুর মুখের উপর স্থাপন করিয়া সোমদত্তা শুনিতে লাগিল।

অকিঞ্চন বলিতে লাগিলেন, “সংঘের মধ্যে ভূগর্ভস্থ যে প্রকোষ্ঠে বুদ্ধের অস্থি রক্ষিত আছে, তাহার উপরে আর একটি কক্ষ আছে, তুমি দেখিয়া থাকিবে। কক্ষটি সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, কদাচ আমি মননাদির জন্য উহা ব্যবহার করিয়া থাকি। গত পূর্ণিমা-তিথিতে আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরটি অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়াছে এবং ছাদের মধ্যস্থলে যে প্রস্তরের ধর্মচক্র ক্ষোদিত আছে, তাহার উপর মধুমক্ষিকা চক্রনির্মাণ করিয়াছে। ঘরটিকে মলনির্মুক্ত করিবার মানসে আমি প্রথমে একটি বংশদণ্ডাগ্রে মশাল যোজিত করিয়া ধূম প্রয়োগ দ্বারা মধুমক্ষিকাগুলিকে বিদূরিত করিলাম, তারপর মধুচক্রটি স্থানচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে বংশদণ্ডদ্বারা উহা তাড়িত করিবামাত্র এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ধর্মচক্রের মধ্যস্থলে যে ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, তাহার মধ্যে বংশের অগ্রভাগ প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষপ্রাচীরের এক স্থানে প্রস্তর সরিয়া গিয়া একটা চতুষ্কোণ গহ্বর দেখা দিল। আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়া সেই রন্ধ্রটি পরীক্ষা করিলাম, দেখিলাম, অন্ধকার মধ্যে সোপান নামিয়া গিয়াছে।

“পাছে অন্য কেহ আসিয়া পড়ে, এ জন্য তখন আর কিছু করিলাম না—কক্ষের কবাট বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে, প্রদীপ লইয়া কক্ষের ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রস্তর ও ইষ্টকনির্মিত সুড়ঙ্গ, অতিশয় সংকীর্ণ ও অনুচ্চ, মস্তক অবনত করিয়া চলিতে হয়। অর্ধ ক্রোশান্তরে বায়ুপ্রবাহের জন্য কূপ আছে—সেই কূপ সকল লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। আমি এইভাবে বহুদূর পর্যন্ত গমন করিয়াও সুড়ঙ্গের শেষ পাইলাম না। প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল, সে রাত্রিতে ভগ্নোদ্যমে ফিরিয়া আসিলাম। তারপর উপর্যুপরি পঞ্চরাত্রি চেষ্টার পর ষষ্ঠরাত্রিতে সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে পৌঁছিলাম। কুক্কুটপাদ বিহারের অঙ্গনে গিয়া সুড়ঙ্গ শেষ হইয়াছে...”

সংহত নিশ্বাসে সোমদত্তা বলিল, “তারপর ?”

নিশ্বাস ফেলিয়া অকিঞ্চন কহিলেন, “কুক্কুটপাদ বিহারের পূর্বশ্রী আর নাই, এখন উহা জনহীন ভগ্নপ্রায়, শ্বাপদের বাসভূমি। কিন্তু গোতমের করুণার উৎস এখনো শতমুখে উৎসারিত হইতেছে। তাই ভগবান পথ দেখাইয়া দিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া সান্ধিবিগ্রহিককে সংবাদ দিলাম, বলিলাম, সংঘের পথেই বুভুক্ষিতের ক্ষুধা নিবারণ হউক।”

ভিক্ষু নীরব হইলেন। সোমদত্তা নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর ভিক্ষু আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিলেন। তখন সোমদত্তা যুক্তপাণি হইয়া বলিল, "শ্রীমন্, আর একটি প্রশ্ন আছে। এই রাজপুরী যিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি কি বৌদ্ধ ছিলেন ?"

অকিঞ্চন কহিলেন, "হাঁ, শুনিয়াছি, অশোক প্রিয়দর্শী এই পুরী নির্মাণ করাইয়াছিলেন, সংঘারামও তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।"

সোমদত্তা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ভগবন্, আশীর্বাদ করুন, যেন পূর্ণমনোরথ হইতে পারি।"

হাস্যমুখে অকিঞ্চন কহিলেন, "সুমঙ্গলে, গোতমের ইচ্ছায় তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে—গোতম অন্তর্যামী।"

সংঘস্থবির বিদায় হইলে সোমদত্তা কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল। দীর্ঘকাল গভীর চিন্তা করিল। ধর্মচক্র ! ধর্মচক্র ! কিন্তু পুরীমধ্যে কোথাও তো ধর্মচক্র নাই। বুদ্ধের মূর্তি, ধর্মচক্র প্রভৃতি যাহা ছিল, তাহা অপসারিত করিয়া তৎপরিবর্তে দেবমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু ঊর্ধ্বে নিপতিত হইল। তখন বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভিত বক্ষে সোমদত্তা দেখিল, উচ্চ ছাদের মধ্যস্থলে রক্তপ্রস্তরে উৎকীর্ণ ধর্মচক্র—এবং তাহার কেন্দ্রমধ্যে ক্ষুদ্র সুগোল একটি ছিদ্র !

বহুক্ষণ তদবস্থ থাকিবার পর সোমদত্তা ছুটিয়া গিয়া জয়ন্তীকে ডাকিল। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "জয়ন্তী, শীঘ্র যা—অস্ত্রাগার হইতে ধনুর্বাণ লইয়া আয় ! জিজ্ঞাসা করিলে বলিস্, মহাদেবী সোমদত্তা লক্ষ্যবেধ শিক্ষা করিবেন।"

শব্দতরঙ্গে অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া বাঁশি বাজিতেছিল। সোমদত্তা প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া করতলে চিবুক রাখিয়া এই দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতেছিল। আমি প্রাকার-কুড্য আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।

বাঁশি প্রথমে বসন্ত-রাগ ধরিল ; তারপর কিছুক্ষণ গুর্জরী-রাগ লইয়া ক্রীড়া করিয়া আবার বসন্ত-রাগে ফিরিয়া আসিল। শেষে এই দুই রাগ ছাড়িয়া বাঁশি মালকোষ ধরিল। কত নিপুণ সুরের কৌশল, কত মীড়-গমক-ঝংকার, কত তান-লয়ের পরিবর্তন দেখাইল। তারপর সহসা বাঁশি স্তব্ধ হইল।

"বাঁশি কি বলিল ?"

সোমদত্তা যেন তন্দ্রার ঘোর হইতে জাগিয়া উঠিল। অতি দীর্ঘ এক নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "তুমি যাহা চাও পাইবে। চন্দ্রবর্মা তোমাকে মগধের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিবেন। আগামী অমাবস্যার রাত্রিতে দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হইবার পর আমি এই প্রদীপ দ্বারা রাজপুরীতে অগ্নিসংযোগ করিব। অগ্নি যখন ব্যাপ্ত হইয়া আকাশ লেহন করিবে, সেই সময় তুমি গোতম-দ্বারের অর্গল খুলিয়া দিবে। রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগই সংকেত ; এই সংকেত পাইয়া চন্দ্রবর্মার সেনা দুর্গপ্রবেশের জন্য প্রস্তুত থাকিবে, তুমি দ্বার খুলিয়া দিলেই তাহারা প্রবেশ করিবে। পৌরজন রাজপুরী রক্ষার্থ ব্যস্ত থাকিবে, সেই অবসরে চন্দ্রবর্মা বিনা বাধায় পাটলিপুত্র অধিকার করিবেন।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "অমাবস্যার রাত্রি ? তার তো বিলম্ব নাই—আগামী পরশ্ব !"

"হাঁ। অধিক বিলম্বে ভয় আছে, লিচ্ছবিগণ আসিয়া পড়িতে পারে।"

ইহার পর সোমদত্তা আবার মৌন অবলম্বন করিল, করলগ্নকপোলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দীপশিখার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আমিও সহসা কি কথা বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, মানসিক উত্তেজনা রসনাকে যেন জড় করিয়া দিল। তথাপি চেষ্টা করিয়া কহিলাম, "বাঁশি তো রাগ-রাগিণীর আলাপ করিল, তুমি এত কথা বুঝিলে কি করিয়া ?"

সোমদত্তা অন্যমনে কহিল, "ঐ রাগ-রাগিণীতে সংযুক্ত কথাগুলা আমার জানিত। যিনি বাঁশি বাজাইতেছিলেন, তিনি আমার গীতাচার্য ছিলেন !"

অতঃপর আবার দীর্ঘ নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা নাই। এই সুকঠিন মৌন আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভাবিতেছ ?"

সোমদত্তা মুখ তুলিয়া বলিল, "ভাবিতেছি, কি অপরিমেয় শক্তি এই ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের ! এত তুচ্ছ, ভঙ্গুর—মাটিতে পড়িলে ভাঙিয়া শতখণ্ড হইবে ; অথচ একটা রাজ্য ধ্বংস করিবার শক্তি ইহার আছে। এমনি কতশত ছার মৃৎপ্রদীপ কেবল রূপশিখার অনলে সংসার ভস্মীভূত করিতেছে !"

আমি তাহার বাক্যের মর্ম বুঝিয়া হস্তধারণপূর্বক বলিলাম, "মৃৎপ্রদীপ নয়, সোমদত্তা, তুমি রত্নপ্রদীপ ! তোমার দীপ্তিতে মগধ আলোকিত হইবে।"

সোমদত্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি শ্মশানের আলো !... এখন চলিলাম, সেই অমাবস্যার রাত্রিতে আবার সাক্ষাৎ হইবে। চন্দ্রবর্মাকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে যাইও, আমি মন্ত্রগৃহে প্রতীক্ষায় থাকিব।"

আমি তাহাকে সাদরে নিকটে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "সেই দিন আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে !"

ঈষৎ হাসিয়া সোমদত্তা বলিল, "হাঁ, সেই দিন আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।"

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সোমদত্তার কক্ষে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ তীব্র শ্বাসরোধকর ধূমের গন্ধে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু না খুলিয়াই ডাকিলেন, "সোমদত্তা !" উত্তর পাইলেন না। তখন নিদ্রাকষায়নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, শয্যায় সোমদত্তা নাই। কক্ষের চারিদিকে চাহিলেন, সোমদত্তাকে দেখিতে পাইলেন না।

বাহিরে তখন সমস্ত পুরী জাগিয়া উঠিয়াছে। সদ্যোত্থিত নারীদের ভীত চিৎকার, গৃহপালিত ময়ূর শারিকা প্রভৃতি পক্ষীদের সচকিত আর্তস্বর এবং সর্বোপরি বিস্তারশীল অগ্নির গর্জন নৈশ বায়ুকে বিলোড়িত করিতেছে। দারুপ্রাসাদে আগুন লাগিলে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই, পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করাই একমাত্র পথ। পুরীস্থ সকলে মহাকোলাহল করিয়া নিজ নিজ মূল্যবান দ্রব্য যাহা পাইতেছে, লইয়া পলাইতেছে। কে পড়িয়া রহিল, রাজা-রানী কে মরিল কে বাঁচিল, কাহারও দেখিবার অবসর নাই। নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সকলেরই উগ্র বাহ্যজ্ঞানশূন্য ত্বরা।

অগ্নি ক্রমশ আরও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, এক প্রাসাদ ছাড়িয়া সংলগ্ন প্রাসাদসকল আক্রমণ করিল। বায়ুর বেগ বাড়িয়া গেল। অমাবস্যা রাত্রির মসীতুল্য অন্ধকার এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে যেন বিদীর্ণ শতখণ্ড হইয়া গেল। বহুদূর পর্যন্ত নগর রক্তাভ আলোকে উদ্ভাসিত হইল !

নাগরিকগণ জাগিয়া উঠিয়া কোলাহল করিতে করিতে রাজপুরীর দিকে ছুটিল. উত্তেজিত বিহ্বল নর-নারী স্খলিতবসনে মুক্ত-কেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে জ্বলন্ত রাজ-প্রাসাদের চতুর্দিকে সমবেত হইতে লাগিল।

সহসা বহুদূরে সম্মিলিত সহস্রকণ্ঠে মহাজয়ধ্বনি শ্রুত হইল। রাজপুরীর চারিপাশে সমবেত

নাগরিকগণ ঊর্ধ্বমুখে অনলোল্লাস দেখিতেছিল, তাহার মধ্য হইতে কে একজন চিৎকার করিয়া বলিল, "পালাও ! পালাও ! নগরে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে !"—অমনই বিক্ষুব্ধ জনতা উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কেহ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে পড়িয়া গিয়া জানু ভাঙিল, কেহ জনমর্দের চরণতলে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া গেল। ক্রন্দন, হাহাকার এতক্ষণ রাজপুরীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, এবার নগরময় ছড়াইয়া পড়িল।

সোমদত্তা তখন কোথায় ?

সোমদত্তা তখন আলুলায়িত কুন্তলে, লুণ্ঠিত বসনে পট্টমহাদেবীর প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছে। কুমারদেবীর ভবনে তখনও ভালো করিয়া আগুন লাগে নাই, কিন্তু দাসী, কিঙ্করী, প্রহরিণী—যে যেখানে ছিল সকলে পলাইয়াছে। কুমারদেবীর অরক্ষিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সোমদত্তা দেখিল, বিস্তৃত শয্যার উপর পুত্রকে বুকের কাছে লইয়া তিনি তখনও নিদ্রিতা।

সোমদত্তা সবলে তাঁহার অঙ্গে নাড়া দিয়া বলিল, "দেবী, উঠুন, উঠুন—প্রাসাদে আগুন লাগিয়াছে !"

কুমারদেবী চক্ষু মুছিয়া শয্যায় উঠিয়া বলিলেন, "কে ?"

"আমি, সোমদত্তা। আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র শয্যাত্যাগ করুন"—বলিয়া ঘুমন্ত সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে গেল।

কুমারদেবীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমার পুত্রকে স্পর্শ করিও না। দাসীরা কোথায় ?"

"কেহ নাই, সকলে প্রাণভয়ে পলাইয়াছে।"

"মহলে কি করিয়া আগুন লাগিল ?"

আর গোপন করিবার প্রয়োজন ছিল না। সোমদত্তা স্থিরদৃষ্টিতে কুমারদেবীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "আমি মহলে আগুন দিয়াছি।"

কুমারদেবী চিৎকার করিয়া কহিলেন, "স্বৈরিণী ! তাহা জানি। যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ঘরে আনিয়াছিস্ তখনি তোর অভিসন্ধি বুঝিয়াছি।"

সোমদত্তা কহিল, "অজ্জা, ক্রোধে অন্ধ হইয়া নির্দোষের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রসাদেই আজ আপনাদের প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। এখন আসুন, পুরী এতক্ষণে ভস্মসাৎ হইল। আর বিলম্ব করিলে বুঝি আপনাদের বাঁচাইতে পারিব না।"

"তুই বাঁচাইবি ? কেন, আমি কি আত্মরক্ষা করিতে জানি না ?"

"না অজ্জা, আজ আমি ভিন্ন আর কেহ আপনাদের বাঁচাইতে পারিবে না।"

"তার অর্থ ?"

"তার অর্থ চন্দ্রবর্মার সেনা দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, এতক্ষণে বোধ করি রাজপুরী ঘিরিল।"

কুমারদেবীর চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, "ডাকিনী ! এ তোর কার্য ; তুই মগধরাজ্য ছারখারে দিলি !"

সোমদত্তা স্থিরভাবে বলিল, "স্বীকার করিলাম। কিন্তু আর বিলম্ব করিলে কুমারকে বাঁচাইতে পারিব না। ঐ দেখুন, অগ্নি প্রাসাদ বেষ্টন করিয়াছে।"

এই সময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাতায়নপথে অগ্নির আরক্ত লোলরসনা ও কুণ্ডলিত ধূমোদ্গার কক্ষে প্রবেশ করিল।

সোমদত্তা সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আজ আমার স্বামীর বংশধরকে বাঁচাইব বলিয়া আসিয়াছি, নহিলে আসিতাম না। আপনি থাকিতে হয় থাকুন, আমি চলিলাম"—বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

কুমারদেবী ছুটিয়া আসিয়া তাহার বাহু ধরিলেন, বলিলেন, “রাক্ষসী, ছাড়িয়া দে, আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দে !”

সোমদত্তা প্রজ্বলিত নয়নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “দুর্ভাগিনী, নিজের ইষ্ট বুঝিতে পার না ? আমার স্বামীর পুত্র কি আমার পুত্র নয় ? এ রাজ্যে আগুন আমি জ্বালি নাই, জ্বালিয়াছে তোমার দুরন্ত অন্ধ অভিমান। সেই আগুনে তুমি পুড়িয়া মর !”

কুমারদেবীর হাত ছাড়াইয়া পুত্র বুকে লইয়া সোমদত্তা ধূম্রান্ধকার অলিন্দের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মাদিনীর ন্যায় কুমারদেবী তাহার পশ্চাত চলিলেন।

নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সোমদত্তা দেখিল, রাজা অভিভূতের ন্যায় শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন—চতুর্দিকে কি ঘটিতেছে, তাঁহার যেন কোনও ধারণা নাই। ঘর ধূমাচ্ছন্ন—ঘরের চারিকোণে চারিটি সুবর্ণ-প্রদীপ তখনও ক্ষীণ আলোক বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুত্রকে স্বামীর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিয়া সোমদত্তা ছুটিয়া গিয়া ধনুর্বাণ লইয়া আসিল। ভালো দেখা যায় না, দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে, সোমদত্তা ধর্মচক্রের মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া শরসন্ধান করিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট শর পাথরে লাগিয়া ফিরিয়া আসিল। আবার শরনিক্ষেপ করিল, ব্যর্থ শর আবার প্রতিহত হইয়া ভূমিতে পড়িল। অদম্য ক্রন্দনের আবেগে সোমদত্তার বক্ষ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তবে কি গুপ্তদ্বার খুলিবে না ?

এদিকে ঘরের মধ্যে অগ্নির অসহ্য উত্তাপ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। রাজা এবং কুমারদেবী নির্বাক্‌ নিষ্পলক হইয়া সোমদত্তার এই উন্মত্তবৎ কার্য দেখিতে লাগিলেন। সোমদত্তা অসীম বলে আপনাকে সংযত করিয়া পুনশ্চ ধনুর্বাণ তুলিয়া লইল। লক্ষ্যবস্তু নিকটেই কিন্তু ভালো করিয়া দেখা যায় না, হাত কাঁপে, চক্ষু কূলে কূলে ভরিয়া উঠে। বহুক্ষণ ধরিয়া, অনেকবার চক্ষু মুছিয়া, অতি সাবধানে লক্ষ্য স্থির করিয়া সোমদত্তা তীর ছুঁড়িল। এবার আর তীর ফিরিয়া আসিল না—ধর্মচক্রের মধ্যস্থলে বিঁধিয়া রহিল। সোমদত্তা ধনু ফেলিয়া দিয়া একবার ক্ষণকালের জন্য মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কুমারদেবীর নিকটে গিয়া বলিল, “অজ্জা, এইবার স্বামিপুত্র লইয়া এই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করুন। সুড়ঙ্গ নগর বাহিরে কুক্কুটপাদ বিহারে গিয়া শেষ হইয়াছে। সেখানে শত্রু নাই, সেখান হইতে সহজেই নিরাপদ স্থানে যাইতে পারিবেন।”

চন্দ্রগুপ্ত সুড়ঙ্গমুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন, এতক্ষণে প্রথম কথা কহিলেন, “নগরের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন কি ?”

সোমদত্তা কহিল, “প্রয়োজন আছে। শত্রু নগর অধিকার করিয়াছে।”

তখন পুত্র লইয়া দুইজনে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সোমদত্তা চন্দ্রগুপ্তের চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, “প্রিয়তম ! এইবার বিদায় দাও।”

সহসা চন্দ্রগুপ্ত যেন তাঁহার সমস্ত চেতনা ফিরিয়া পাইলেন ; ভীষণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সোমদত্তা, তুমি আসিবে না ?”

সোমদত্তা দুই হাতে মুখ ঢাকিল ; বলিল, “না প্রিয়তম, আমি আর তোমার সঙ্গে যাইবার যোগ্য নহি। কেন নহি, তাহা দেবীর মুখে শুনিও। চন্দ্রবর্মা আমার পিতা—এই কথা মনে করিয়া যদি পারো, আমাকে ক্ষমা করিও। তোমরা যাও—আমি ভিন্ন পথে যাইব।”

হৃদয়-বিদারক স্বরে চন্দ্রগুপ্ত ডাকিলেন, “সোমদত্তা !” দুই হস্তে কর্ণ আবরণ করিয়া সোমদত্তা কাঁদিয়া উঠিল, “না, না, ডাকিও না—আমি যাইতে পারিব না। আমায় মরিতে হইবে। প্রাণাধিক, আবার জন্মান্তরে দেখা হইবে, তখন তোমার সোমদত্তাকে সঙ্গে লইও।”

এই বলিয়া সবলে টানিয়া সুড়ঙ্গের পাষাণ-দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। চন্দ্রগুপ্তের মুখনিঃসৃত অর্ধোচ্চারিত বাণী পাষাণ-প্রাচীরে লাগিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন সেই উত্তপ্ত হর্ম্যতলে পড়িয়া, বসুধা আলিঙ্গন করিয়া, কেশ বিকীর্ণ করিয়া, ভূতলে ললাট প্রহত করিয়া সোমদত্তা কাঁদিল।

কিন্তু তবু অগ্নি নিবিল না।

এক হস্তে মুক্ত তরবারি, অন্য হস্তে প্রজ্বলিত উল্কা লইয়া দুর্গাবরোধকারী সেনা গোতম-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের পুরোভাগে লৌহবর্মাবৃত ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণধারী ভীষণাকৃতি স্বয়ং চন্দ্রবর্মা। দ্বারের প্রহরীদিগকে পূর্বেই সরাইয়া দিয়াছিলাম, সুতরাং একবিন্দুও রক্তপাত হইল না।

চন্দ্রবর্মা আমাকে দেখিয়া পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই বিশ্বাসঘাতক দ্বারপাল?"

কথার ভাবটা ভালো লাগিল না। যাহার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করিলাম, সে-ই বিশ্বাসঘাতক বলে! যাহা হউক, বিনীত কণ্ঠে বলিলাম, "হাঁ আমিই। সম্রাটের জয় হউক।"

চন্দ্রবর্মা নিষ্করুণ আরক্ত দুই চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মনে মনে কি যেন গবেষণা করিলেন, তারপর বলিলেন, "ভালো, সর্বাগ্রে পথ দেখাইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া চল।"

পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিরাট অনলস্তম্ভের মতো প্রাসাদ তখন জ্বলিতেছে—সমস্ত নগর আলোকিত করিয়াছে। আপনার প্রভায় রাজপুরী স্বয়ংপ্রকাশ।

সেনাদলের অগ্রে অগ্রে আমি চলিলাম। পথে কেহ গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল না, যে সম্মুখে পড়িল চৈত্রের বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের মতো নিমেষমধ্যে বিপরীত মুখে অন্তর্হিত হইল।

প্রাসাদের শূন্য তোরণ পার হইয়া সদলবলে সম্মুখস্থ মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলাম। অগ্নি তখনও মন্ত্রগৃহ পর্যন্ত সংক্রামিত হয় নাই, তবে দীর্ঘ জিহ্বা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে—অচিরাৎ গ্রাস করিবে।

বিশাল বহুস্তম্ভযুক্ত মন্ত্রগৃহ প্রায়ান্ধকার, জনশূন্য। কেবল তাহার মধ্যস্থলে সিংহাসনের বেদীর সম্মুখে সোমদত্তা দাঁড়াইয়া আছে। অশনিপূর্ণ বৈশাখী মেঘের ন্যায় তাহার মূর্তি; বক্ষে পৃষ্ঠে মুক্ত কৃষ্ণ কেশজাল, ললাটে রক্তরেখা, নয়নের কৃষ্ণতারকায় জ্বালাময় বিদ্যুৎ।

বহু মশালের দীপ্তিতে মন্ত্রগৃহ আলোকিত হইল। তখন সোমদত্তা চন্দ্রবর্মাকে দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"বৎসে! কল্যাণী!"—বলিয়া চন্দ্রবর্মা সোমদত্তাকে পদপ্রান্ত হইতে তুলিলেন। ক্ষণকালের জন্য এই ভীষণ দুর্ধর্ষ যোদ্ধার কণ্ঠস্বর যেন প্রসাদগুণ প্রাপ্ত হইল।

সোমদত্তা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "পিতা, আপনার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে।"

চন্দ্রবর্মা বলিলেন, "পুত্রী, সে তোমারই জন্য! তোমার যোগ্য পুরস্কার আমি সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি। এখন এই রত্নহার গ্রহণ কর।"—বলিয়া নিজ বক্ষ হইতে অমূল্য রশ্মিকলাপ মণিহার খুলিয়া সোমদত্তার হস্তে দিলেন।

সোমদত্তা হার দুই হস্তে ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল; বলিল, "আর আমার পুরস্কারের প্রয়োজন নাই। আমার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়াছে।"

চন্দ্রবর্মা বলিলেন, "সে কি! চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?"

সোমদত্তা কহিল, "তা নয়, আমি বিধবা হই নাই। কিন্তু আমার স্বামীকে আর আপনি খুঁজিয়া পাইবেন না। তিনি পুরী ত্যাগ করিয়াছেন।"

"পুরী ত্যাগ করিয়াছেন! কোথায় গেল?"

"তাঁহাকে গুপ্তপথে দুর্গের বাহিরে পাঠাইয়াছি।"

"কন্যা, এ কার্য কেন করিলে ?"

"দেব, এ ভিন্ন আমার আর অন্য পথ ছিল না। তিনি থাকিলে সকল কথা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে মরিয়াও আমার এ নরক-যন্ত্রণা শেষ হইত না। পিতা, আমার কিছুই নাই —সব গিয়াছে। নারীর যাহা কিছু মূল্যবান, যাহা কিছু প্রেয়, এক নরকের পশু তাহা হরণ করিয়াছে।"

অঙ্গারের মতো দুই চক্ষু সোমদত্তা আমার দিকে ফিরাইল। তর্জনী প্রসারিত করিয়া বিকৃতমুখে চিৎকার করিয়া কহিল, "এই নরকের পশু আমার সর্বস্ব হরণ করিয়াছে !"

অল্পকালের জন্য সমস্ত পৃথিবী যেন নীরব হইয়া গেল। আমি আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তপ্রবাহের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তারপর ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করিয়া চন্দ্রবর্মা আসিয়া আমার কেশমুষ্টি ধারণ করিলেন। অন্য হস্তের অঙ্গুলিগুলা আমার চক্ষু উৎপাটিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, ক্রূর হাসি হাসিয়া সোমদত্তা কহিল, "পিতা, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি পুরস্কার লইব। এই পিশাচকে এখনি মারিবেন না, ইহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া মারিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষকণ্টকপূর্ণ অন্ধকূপে যেন এই নরাধম পচিয়া পচিয়া মরে, গলিত ক্রিমিপূর্ণ শূকরমাংস ভিন্ন যেন অন্য খাদ্য না পায় ; মরিবার পূর্বে যেন ইহার প্রত্যেক অঙ্গ গলিয়া খসিয়া পড়ে। আমার আত্মা পরলোক হইতে দেখিয়া সুখী হইবে।"

চন্দ্রবর্মা আমার কেশ ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তাহাই করিব !...ইহাকে বাঁধিয়া রাখ।"

দশ জন মিলিয়া আমাকে বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিল। তখন সোমদত্তা আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আমার প্রতি অগ্নিপূর্ণ দুই চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকিয়া সে আমার মুখে একবার পদাঘাত করিল। তারপর চন্দ্রবর্মার নিকট ফিরিয়া গিয়া স্থির শান্ত স্বরে কহিল, "পিতা, এইবার পিতার কার্য করুন।"

চন্দ্রবর্মার বজ্রের মতো কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, "কি কার্য, বৎসে ?"

সোমদত্তা বলিল, "এ দেহ আপনিই দিয়াছিলেন, আপনিই ইহার নাশ করুন।"

পাষাণ-স্তম্ভের মতো চন্দ্রবর্মা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোমদত্তা পুনরায় কহিল, "আমার মন নিষ্কলুষ, এই দূষিত দেহ হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া পিতার কর্তব্য করুন।"

বহুক্ষণ পরে অস্ফুট কণ্ঠে চন্দ্রবর্মা বলিলেন, "সেই ভালো, সেই ভালো।"

সোমদত্তা তখন দুই হস্তে বক্ষের কঞ্চুলী ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পিতার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিল।

চন্দ্রবর্মা দক্ষিণহস্তে সুতীক্ষ্ণ ভল্ল তুলিয়া লইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া কর্কশভয়ানক কণ্ঠে কহিলেন, "সকলে শুন, আমার কন্যার দেহ অশুচি হইয়াছিল, আমি তাহা ধ্বংস করিলাম।"—বলিয়া দুই পদ পিছু হটিয়া গিয়া ভল্ল ঊর্ধ্বে তুলিলেন। সোমদত্তা উন্মুক্ত বক্ষে নির্ভীক নিষ্পলক দৃষ্টিতে পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আমি সভয়ে চক্ষু মুদিলাম।

পুনরায় যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলাম, তখন দেখিলাম, রক্তচন্দন-চর্চিত শৈবালবেষ্টিত শ্বেত কমলিনীর মতো সোমদত্তার বিগতপ্রাণ দেহ মাটিতে পড়িয়া আছে।

১ বৈশাখ, ১৩৩৮



বাঘের বাচ্চা

পুণা গ্রাম হইতে প্রায় সাত-আট ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উপত্যকা হইতে বহু ঊর্ধ্বে গিরিসংকটের ভিতর দিয়া দুইজন সওয়ার নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতেছিল। চারিদিকেই উচ্চনীচ ছোটবড় পাহাড়ের শ্রেণী—যেন কতকগুলা অতিকায় কুম্ভীর পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া তাল পাকাইয়া এই হেমন্ত অপরাহ্নের সোনালী রৌদ্রে শুইয়া আছে। তাহারি মধ্যে পিপীলিকার মতো দুইটি প্রাণী সূর্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া ক্রমশ দীর্ঘায়মান ছায়া সম্মুখে ফেলিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল।

এখান হইতে উপত্যকা দৃষ্টিগোচর নয়, পথেরও কোনও চিহ্ন কোথাও নাই। চতুর্দিকে কেবল উলঙ্গ কর্কশ পাহাড়, মাঝে মাঝে দুই একটা খর্বাকৃতি কণ্টকগুল্ম। এই সকল চিহ্ন ছাড়া পথিককে বহুদূরস্থ জনপদে পরিচালিত করিবার কোনও নিদর্শন নাই—অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ স্থানে দিক্‌ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

অশ্বারোহী দুইজন যে পথ দিয়া নামিতেছিল তাহাকে পথ বলা চলে না, বর্ষার জল চূড়া হইতে নামিবার সময় পর্বতগাত্রে যে উপলপিচ্ছিল প্রণালী রচনা করে, এ সেইরূপ একটি প্রণালী, পাহাড়ের শীর্ষ হইতে প্রায় ঋজুরেখায় পাদমূল পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

সওয়ার দুইজন ঘোড়ার বল্গা ছাড়িয়া দিয়া পরস্পর বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল, খর্বদেহ রোমশ পাহাড়ী ঘোড়া স্বেচ্ছামত সেই ঢালু বিপজ্জনক পথে সাবধানে অবতরণ করিতেছিল। এই স্থানে পথ এত বেশি ঢালু যে একবার অশ্বের পদস্খলন হইলে আরোহীর মৃত্যু অনিবার্য ; কিন্তু সেদিকে আরোহীদের দৃষ্টি নাই।

আরোহীদের মধ্যে একজন প্রাচীন বয়স্ক ; মাথার চুল ও গোঁফ পাকা, বর্ণ এত বয়সেও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। কপালের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শ্বেতচন্দনের দুইটি রেখা বোধ করি জরাজনিত ললাটরেখাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। মস্তকে শুভ্র কার্পাসবস্ত্রের উষ্ণীষ ; দেহে তুলট্ আংরাখার ফাঁকে বাম স্কন্ধের উপর উপবীতের একাংশ দেখা যাইতেছে। চোখে-মুখে একটি দৃঢ় অচঞ্চল বুদ্ধির প্রভা। দেখিলেই বুঝা যায় ইনি একজন শাস্ত্রাধ্যায়ী অভিজাতবংশীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার হস্তে কোনও অস্ত্র নাই, কিন্তু যেরূপ স্বচ্ছন্দ নিশ্চিন্ততার সহিত অবতরণশীল অশ্বপৃষ্ঠে অটল হইয়া বসিয়া আছেন, তাহাতে মনে হয় কেবল ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিয়াই ইনি জীবন অতিবাহিত করেন নাই।

দ্বিতীয় আরোহীটি ইঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বয়স বোধ করি ষোল বৎসরও অতিক্রম করে নাই ; দেহের বর্ণ শ্যাম, কিন্তু মুখের গঠন অতিশয় ধারালো। মৃদঙ্গসদৃশ মুখের মধ্যস্থলে শ্যেনচঞ্চুর মতো নাসিকা এই অল্প বয়সেই তাহার মুখে শিকারীর মতো একটা শাণিত তীব্রতা আনিয়া দিয়াছে। চক্ষু দু'টি বড় বড়, চক্ষুতারকা নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ; বালকসুলভ চঞ্চলতা সত্ত্বেও দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। ওষ্ঠের উপর ও চিবুকের নিম্নে ঈষন্মাত্র রোমরেখা দেখা দিয়াছে, তাহাও বর্ণের মলিনতার জন্য স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়। ভ্রূ-যুগল সূক্ষ্ম ও দূরপ্রসারিত। সহসা এই বালকের মুখ দেখিলে একটা অপূর্ব বিভ্রম জন্মে, মনে হয় যেন একখানা তীক্ষ্ণধার বাঁকা কৃপাণ সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

মুখ হইতে দৃষ্টি নামাইয়া দেহের প্রতি চাহিলে কিন্তু আরো চমক লাগে। মুখের মতো দেহের সৌষ্ঠব নাই, প্রস্থের তুলনায় দৈর্ঘ্যে দেহ অত্যন্ত খর্ব। প্রথমেই মনে হয়, অতিশয় বলশালী। কটি হইতে পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা জুতা পর্যন্ত প্রাণসার অথচ ক্ষীণ, মৃগচরণের মতো যেন অতি

দ্রুত দৌড়িবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু কটি হইতে উর্ধ্বে দেহ ক্রমশ প্রশস্ত হইয়া বক্ষঃস্থল এরূপ বিশাল আয়তন ধারণ করিয়াছে যে বিস্মিত হইতে হয়। আরো অদ্ভুত তাহার দুই বাহু ; আজানুলম্বিত বলিলেও যথেষ্ট হয় না, সন্দেহ হয় ঘোড়ার পিঠে বসিয়া হাত বাড়াইলে মাটি হইতে উপলখণ্ড তুলিয়া লইতে পারে। তাহার উপর যেমন সুপুষ্ট তেমনি পেশীবহুল ; দুই বাহু দিয়া কাহাকেও সবলে জড়াইয়া ধরিলে তাহার পঞ্জর ভাঙিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

এই বালক হাসিতে হাসিতে চতুর্দিকে চঞ্চল চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নামিতেছিল। ঘোড়ার রেকাব নাই, লাল রেশমের জরিমোড়া লাগামও ছাড়িয়া দিয়াছে, অথচ কম্বলের জিনের উপর এমনভাবে বসিয়া আছে যেন সে আর ঘোড়া পৃথক নয়— কোন ক্রমেই তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না। বাম হস্তে আগাগোড়া লোহার ভারী বল্লমটা এমনি অবহেলাভরে ধরিয়া আছে যেন পাগড়ির উপর খেলাচ্ছলে রোপিত শুকপুচ্ছটার চেয়েও সেটা হালকা।

ঘোড়া দুইটি পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে আর একটা পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে, এবার সেইটাতে চড়িতে হইবে। সূর্য পিছনের উচ্চ পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করিল, শীঘ্রই তাহার আড়ালে ঢাকা পড়িবে।

বালক চতুর্দিকে চাহিয়া যেন প্রাণশক্তির আতিশয্যবশতঃই উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল, "দাদো, প্রতিধ্বনি শুনবে ? হোয়া হো হো হো হো ! চুপ ! এইবার শোনো।"

কয়েক মুহূর্ত পরেই তিন দিক হইতে ভৌতিক শব্দ ফিরিয়া আসিল— হোয়া ! হো হো হো !

বালক অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উত্তর দিকের একটা উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ দেখাইয়া বলিল, "ঐটে সবচেয়ে দূরে ! আওয়াজ ফিরে আসতে কত দেরি হল দেখলে ? চোখে দেখে কিন্তু বোঝা যায় না কোন্‌টা কাছে, কোন্‌টা দূরে। অন্ধকার রাত্রে পথ হারিয়ে গেলে প্রতিধ্বনি ভারী কাজে লাগে— না দাদো ?"

বৃদ্ধ মৃদুহাস্যে উত্তর করিলেন, "তা লাগে ; কিন্তু অন্ধকার রাত্রে এ-রকম জায়গায় পথ হারিয়ে যাবার তোমার কোনও সম্ভাবনা আছে কি ?"

বালক বলিল, "তা নেই। তুমি আমার চোখ বেঁধে দাও, দেখ আমি ঠিক পুণায় ফিরে যেতে পারব।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সে আমি জানি। লেখাপড়ার দিকে তোমার একেবারে মন নেই, কেবল দিবারাত্রি পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পেলেই ভালো থাকো। তোমার বাবা যখন আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবেন, তখন যে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব তা জানি না।"

বালকের মুখে একটা দুষ্টামির হাসি খেলিয়া গেল, সে বৃদ্ধের দিকে আড়চোখে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদো, 'আলিফ' ভালো, না 'অ' ভালো ? বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লেখা সুবিধে, না ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ?"

বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সে তুমি বুঝতে পারবে না। ষোল বছর বয়স হল, এখনো নিজের নাম সই করতে শিখলে না। তোমার লেখাপড়ার চেষ্টা করাই বৃথা !— কিন্তু শিকারের দিকেও তো তোমার মন নেই দেখতে পাই। আজ সারাদিন ঘুরে একটা খরগোসও মারতে পারলে না।"

বালক আক্ষেপে হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল, "খরগোস আমি মারতে পারি না, আমার ভারী মায়া হয়। ঐটুকু জানোয়ার, তার ওপর হিংসার লেশ তার শরীরে নেই— খালি প্রাণপণে পালাতে জানে।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কোন্ জানোয়ার মারতে চাও শুনি— বাঘ !"

উৎসাহ-প্রদীপ্ত চক্ষে কিশোর বলিল, "হ্যাঁ, বাঘ। এ পাহাড়ে বাঘ পাওয়া যায় না, দাদো ?"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, শুনেছি আরো দক্ষিণে পাহাড়ের গুহায় বাঘ আছে ; কিন্তু তুমি বাঘ মারবে কি করে ?"

কিশোর বলিল, "কেন, এই বল্লম দিয়ে মারব। মাটিতে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে মারব।"

"ভয় করবে না ?"

"ভয় !" বালকের উচ্চহাস্য আবার চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলিল। "আচ্ছা দাদো, ভয় জিনিসটা কি আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো ? সকলের মুখেই ওই কথাটা শুনতে পাই, কিন্তু ওটা যে কি পদার্থ তা বুঝতে পারি না। ভয় কি ক্ষুধার মতো একটা প্রবৃত্তি ?"

দাদো বলিলেন, "ভয় কি তা বুঝতে পারবে, যেদিন প্রথম যুদ্ধে নামবে, যেদিন হাতিয়ারবন্দ্ শত্রুকে সামনে দেখতে পাবে।"

বালক কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

দাদো বলিলেন, "আমি বড় বড় বীরের মুখে শুনেছি যে তাঁরাও প্রথমে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে ভয় পেয়েছেন। এতে লজ্জার বিষয় কিছু নেই ; সেই ভয়কে জয় করাই প্রকৃত বীরত্ব।"

সূর্য গিরিশৃঙ্গের অন্তরালে অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিম্নভূমির উপর ছায়ার একটা সূক্ষ্ম যবনিকা পড়িয়া গেল। শুধু ঊর্ধ্বে নগ্ন গিরিকূট এবং আরো ঊর্ধ্বে নীল আকাশে একখণ্ড মেঘ সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

দাদো নিজের অশ্ব সম্মুখে চালিত করিয়া কহিলেন, "আর দেরি নয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখনো দুটো পাহাড় পার হতে বাকি। পুণা পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।"

বালক তাঁহার অনুগামী হইয়া বলিল, "তা হলেই বা ? আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে ঠিক নিয়ে যাব।"

দাদো বলিলেন, "রাত্রে এসব পাহাড়-পর্বত নিরাপদ নয়। শোনোনি, এদিকের গাঁয়ে-বস্তিতে আজকাল প্রায় লুঠ-তরাজ হচ্ছে ?"

বালক ভারী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তাই নাকি ? কৈ, আমি তো শুনিনি। কারা লুঠ-তরাজ করছে ?"

দাদো বলিলেন, "তা কেউ জানে না। বোধ হয় এই দিকের বুনো পাহাড়ী মাওলীরা ডাকাতি করছে। বিজাপুর এলাকার তিনটে বড় বড় গ্রাম গত চার মাসের মধ্যে লুঠ হয়ে গেছে। শুনতে পাই তাদের সর্দার একজন ছোকরা, লোহার সাঁজোয়া আর মুখোস পরে ঘোড়ায় চড়ে লুঠেরাগুলোকে ডাকাতি করতে নিয়ে যায়। ছোঁড়াটা নাকি ভয়ংকর কালো, বেঁটে আর জোয়ান।"

বালক তাহার হাতের বল্লমটা খেলাচ্ছলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই নাকি ? তুমি এত কথা কোথা থেকে জানলে, দাদো ?"

দাদো পাহাড়ে ঘোড়া চড়াইতে চড়াইতে বলিলেন, "ও অঞ্চলের দেশমুখরা দরবারে নালিশ করতে এসেছিল। তাদের বিশ্বাস ডাকাতের সর্দার পুণার লোক।"

দাদোর পশ্চাতে বালকও পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা দরবার থেকে কি ব্যবস্থা করলে ?"

দাদো বলিলেন, "কিছু করা হয়নি। দেশমুখদের তোমার বাবার কাছে বিজাপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

বালক পশ্চাতে থাকিয়া মিটিমিটি হাসিতেছিল, দাদো তাহা দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না।

পাহাড়ের পিঠের উপর উঠিয়া দুইজনে ক্ষণকাল পাশাপাশি দাঁড়াইলেন। এখানে আবার সূর্যকিরণ আসিয়া বালকের বল্লমের ফলায় যেন আগুন ধরাইয়া দিল।

সম্মুখের পাহাড়গুলিতে তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে, নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বালক বলিল, "আচ্ছা দাদো, এখন যদি আমাদের ডাকাতে আক্রমণ করে, তুমি কি করো ?"

দাদো ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার চতুর্দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি আর করি ! তাদের সঙ্গে লড়াই করি।"

"তারা যদি পঞ্চাশজন হয় ?"

"তা হলেও লড়ি।"

বালক বলিল, "কিন্তু সে যে ভারী বোকামি হবে, দাদো। পঞ্চাশজনের সঙ্গে লড়াই করে তুমি পারবে কেন ?"

দাদো বলিলেন, "তাতে কি ! না হয় লড়াই করতে করতে মরব।"

বালক বিস্মিত হইয়া বলিল, "কিন্তু এরকম মরে লাভ কি, দাদো ?" তারপর মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি কিন্তু লড়ি না, তীরের মতো এই ধার বেয়ে পালাই। এত জোরে পালাই যে ডাকাতের বর্শা আমাকে ছুঁতেও পারবে না।"

ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দাদো বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের ছেলে তুমি, দুশমনের সামনে থেকে পালাবে ? এই না বলছিলে, ভয় কাকে বলে জানো না ?"

বালক বলিল, "ভয় ! পালানোর সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক কি ? পালাব, কারণ পালালেই আমার সুবিধে হবে, পরে ডাকাতদের জব্দ করতে পারব। আর লড়ে যদি মরেই যাই, তাহলে তো ডাকাতদের জিত হল।"

দাদো মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না না, এসব শিক্ষা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছ ? না লড়ে পালিয়ে যাওয়া ভয়ংকর কাপুরুষতা। যে বীর, সে কখনো পালায় না। রাজপুত বীরদের গল্প শোনোনি ?"

বালক বলিল, "রাজপুতদের গল্প শুনলে আমার গা জ্বালা করে। তারা শুধু লড়াই করতে পারে, বুদ্ধি এতটুকু নেই। যিনি যতবড় বীর, তিনি ততবড় বোকা।"

দাদো খোঁচা দিয়া বলিলেন, "তুমিও তো রাজপুত ! মায়ের দিকে থেকে তোমার গায়েও তো যদুবংশের রক্ত আছে।"

বালক সবেগে শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিল, "না, আমি রাজপুত হতে চাই না, আমি মারাঠী।" বালকের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদো, তোমার কাছে তো বড় বড় যুদ্ধের গল্প শুনেছি, কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না। সম্মুখ-যুদ্ধ করার মানে কি ?"

দাদো সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন, "সম্মুখ-যুদ্ধ মানে সামনা-সামনি শক্তি পরীক্ষা। যার শক্তি বেশি সেই জিতবে।"

"আর যার শক্তি কম, সে যদি চালাকি করে জিতে যায় ?"

"সে তো আর ধর্মযুদ্ধ হল না।"

"নাই বা হল ! যুদ্ধে হার-জিতই তো আসল— ধর্মযুদ্ধ হল কি না তা দেখে লাভ কি ?"

দাদো অনেকক্ষণ বালকের জিজ্ঞাসু মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শেষে দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া বিড়বিড় করিয়া বলিলেন, "বাপের স্বভাব ষোল আনা পেয়েছে, তেমনি ধূর্ত আর হুঁশিয়ার— সর্বদাই লাভ-লোকসানের দিকে নজর। আর শুধু বাপ কেন, বংশটাই ধূর্ত ! মালোজী ভোঁস্‌লে যদি চালাকি করে যদুবংশের মেয়ে ঘরে না আনতে পারত, তাহলে ভোঁস্‌লে

বংশকে চিনত কে ? আর শাহুই বা এতবড় জায়গীরদার হত কোথা থেকে ?”

পলকের মধ্যে বালকের সংশয়প্রশ্নপূর্ণ মুখভাবের পরিবর্তন হইল। বালকোচিত কৌতূহলে দাদোর নিকটে সরিয়া গিয়া সানুনয়কণ্ঠে বলিল, “দাদো, তুমি যে আমার মা'র বিয়ের গল্প বলবে বলেছিলে, কৈ বললে না ? বলো না দাদো, কি করে ঠাকুর্দা যদুবংশী মেয়ে ঘরে আনলেন।”

এই সময় নিম্নের ছায়াচ্ছন্ন প্রদোষান্ধকার হইতে গাভীর হাম্বারব ভাসিয়া আসিল। বালক সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “ঐ শোনো, দেওরামের গরু ঘরে ফিরে এলো। চলো, চলো দাদো, আর দেরি নয় ; সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ভারী ক্ষিদে পেয়ে গেছে— এতক্ষণ তা লক্ষ্যই করিনি। দেওরামের মেয়ে নুন্নার সঙ্গে সেই যে সকালবেলা তেঁতুলবনের ধারে দেখা হয়েছিল, সে বলেছিল ফেরবার সময় তাজা দুধ খাওয়াবে। জয় ভবানী !”

বালক দুই পা দিয়া ঘোড়ার পেট চাপিয়া ধরিতেই ঘোড়া লাফাইয়া সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পার্বত্য হরিণের মতো পাথর হইতে পাথরের উপর ধাপে ধাপে লাফাইয়া পড়িয়া বিদ্যুদ্বেগে নীচের দিকে অদৃশ্য হইল।

দাদো বালকের উচ্চ কণ্ঠস্বর দূর হইতে শুনিতে পাইলেন, “চলে এসো দাদো, দেওরামের ঘর ঝর্ণাতলার টালের উত্তর দিকে কুলগাছের জঙ্গলের মধ্যে ; যদি খুঁজে না পাও, হাঁক দিও— নুন্না এসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।”

বৃদ্ধ পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া বদরীবনের মধ্যে যখন দেওরামের কুটির অঙ্গনে পৌঁছিলেন, তখন দেখিলেন একটি বারো-তেরো বছরের মাওলী চাষার মেয়ে একটা ক্ষুদ্রকায় গাভীকে দোহনের চেষ্টা করিতেছে এবং বালক ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে সেই দৃশ্য দেখিতেছে। গাভীটা বোধ হয় অপরিচিত ব্যক্তি ও ঘোড়া দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, তাই কিছুতেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দুগ্ধ দোহন করিতে দিতেছে না, চেষ্টা করিবামাত্র সরিয়া সরিয়া যাইতেছে।

মেয়েটি বিব্রত হইয়া বলিল, “তুমি ওর শিং দুটো একবার ধরো না, নইলে বজ্জাত গরু কিছুতেই দুইতে দেবে না।”

বালক গরুর শিং ধরিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া তামাসা করিয়া বলিল, “তুই কেমন মাওলার মেয়ে— গাই দুইতে জানিস না ? দাঁড়া, বিশুয়াকে বলে দেব, সে আর তোকে বিয়ে করবে না।”

ক্ষুব্ধ লজ্জায় নুন্না এতটুকু হইয়া গিয়া বলিল, “তোমার ঘোড়া দেখেই তো আজ ও অমন করছে, নইলে আমিই তো রোজ দুই।”

বালক মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া বলিল, “হ্যাঁ, দুই ! আর বড়াই করতে হবে না। দে আমায় ঘটি, আমি দুয়ে দিচ্ছি।”

নুন্না বলিল, “তুমি পারবে না। আমি আর বাবা ছাড়া কেউ ওকে দুইতে পারে না। তোমাকে ও এখনি ফেলে দেবে।”

বালকের আত্মাভিমানে ভীষণ আঘাত লাগিল, সে তর্জন করিয়া বলিল, “কি ! ফেলে দেবে ! দেখি তো কেমন তোর গরু ? দে ঘটি।”

নুন্নার হাত হইতে জোর করিয়া ঘটি কাড়িয়া লইয়া বালক দুগ্ধ দোহন করিতে বসিল। গরুটা ঘাড় বাঁকাইয়া একবার দোহনকারীকে দেখিয়া লইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বালকও ছাড়িবার পাত্র নয়, ঘটি লইয়া মুখে নানাপ্রকার প্রীতিসূচক শব্দ করিতে করিতে তাহার পশ্চাতে ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে কি মনে করিয়া গাভীটা দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন বালক সন্তর্পণে তাহার দেহে হাত বুলাইয়া দিয়া গাভীর পশ্চাদ্দিকে বসিয়া দুই জানুর মধ্যে ভাণ্ডটি ধরিয়া যেমন গাভীর ঊধসের দিকে হাত বাড়াইয়াছে, অমনি গাভী এক চরণ তুলিয়া তাহাকে এরূপ সবেগে পদাঘাত করিল যে বালক ভাণ্ডসমেত চিৎ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

নুন্না কলকণ্ঠে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। গাভীটা যেন কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রোমন্থন করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ দাদো অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বালকের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেগেছে নাকি ?"

বালক অঙ্গের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "গরু নয়—ঘোড়া। গরু কখনো অমন চাট ছোঁড়ে ? নে নুন্না, তোর ঘটি, আমি ঘোড়ার দুধ খেতে চাই না। বাড়ি চললুম।"

বালক অশ্বপৃষ্ঠে উঠিতে যায় দেখিয়া নুন্না মিনতি করিয়া বলিল, "আর একটু দাঁড়াও না, বাবা এলো বলে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে বলছিলে— ঘরে বাজরার রুটি আছে, এনে দেব ?"

বালক বলিল, "না, তোর রুটি-দুধ—কিছু খেতে চাই না। আমি চললুম।"

এমন সময় কুটিরের পশ্চাতের ঘন ঝোপের ভিতর হইতে দুইটি লোক বাহির হইয়া আসিল। একজন খর্বকায় বৃষস্কন্ধ মধ্যবয়স্ক লোক, অপরটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের দৃঢ়শরীর যুবা। হাতের বল্লম কুটিরের গায়ে হেলাইয়া রাখিয়া মধ্যবয়সী লোকটি দ্রুতপদে আসিয়া বালকের ঘোড়ার রাশ ধরিল। বালক তখন ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিয়াছে, লোকটি সানুনয় নিম্নকণ্ঠে বলিল, "রাজা, ঘোড়া থেকে নামো, দুধ না খেয়ে যেতে পাবে না।"

যুবকটিও এতক্ষণে সসম্ভ্রম হাস্যোদ্ভাসিত মুখে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বালক একলম্ফে ঘোড়া হইতে নামিয়া দৌড়িয়া গিয়া নুন্নার চুলের মুঠি ধরিল, তাহাকে চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে যুবকের সম্মুখে লইয়া গিয়া প্রায় তাহার বুকের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নে বিশুয়া, এটাকে তুই ঘরে নিয়ে যা, তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিলুম। যদি বজ্জাতি করে, খুব পিটবি। আর ওই হতভাগা গরুটাকেও তুই নিয়ে যা, ওটা হল তোর বিয়ের যৌতুক।"

নুন্না বালকের হাত ছাড়াইয়া কুটিরের ভিতর পলাইয়া গেল। বিশুয়া হাসিতে হাসিতে হেঁট হইয়া বালকের পদস্পর্শ করিয়া বলিল, "তুমি যখন দিলে রাজা, তখন আর আমার ভাবনা কি ! এবার ঘোড়ার পিঠে তুলে ওকে ঘরে নিয়ে যাব। কি বলো, দেওরাম ?"

দেওরাম গম্ভীরভাবে একটু হাসিয়া বলিল. "তা যাস্। রাজা যখন তোর হাতে নুন্নাকে দিয়েই দিয়েছে, তখন আর আমি কি বলব ? আর, আমি নুন্নার মন জানি, সেও তোকেই বিয়ে করতে চায়।"

এই সময় নুন্নার হাসিমুখ কুটিরের ভিতর হইতে পলকের জন্য দেখা গেল। সে সশব্দে কুটির-দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দেওরাম ভূপতিত ঘটিটা তুলিয়া লইয়া দুগ্ধ-দোহনে প্রবৃত্ত হইল। গাভীটা এবার আর কোনও আপত্তি করিল না।

বৃদ্ধ দাদো এতক্ষণ অদূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। তাহার মুখে সংশয় ও সন্দেহের ছায়া ঘনীভূত হইতেছিল। এই নির্জন বনের মধ্যে একটিমাত্র কুটির, তাহার অধিবাসী এই ভীমকায় দেওরাম। ইহারা কে এবং বালকের সহিত ইহাদের পরিচয় হইল কিরূপে ?

তিনি অগ্রসর হইয়া বিশুয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এঁকে চিনলে কি করে ?"

নিমেষের জন্য বিশুয়া ও বালকের চোখে চোখে একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। বিশুয়ার মুখ ভাবলেশহীন হইয়া গেল, সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "দরবারে ওঁকে দেখেছি, উনি জাগীরদারের ছেলে।"

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধভাবে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "তোমরা ওঁকে রাজা বলে ডাকছ কেন ?"

বিশুয়া কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, দুগ্ধদোহন করিতে করিতে দেওরাম জবাব দিল,

"জাগীরদারের ছেলে, উনিই একদিন মালিক হবেন, তাই রাজা বলে ডাকি।"

দাদো উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন, "ইনি জায়গীরদারের মেজো ছেলে তাও জানো না? সে যাক—" বালকের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তুমি এদের চিনলে কি করে জিজ্ঞাসা করি?"

বালক অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর করিল, "শিকার করতে এসে এদের সঙ্গে ভাব হয়েছে, দাদো। তুমি তো আর প্রত্যেকবার আমার সঙ্গে আসো না, তাই জানো না। কতবার শিকার করে ফেরবার মুখে দেওরামের জোয়ারী রুটি খেয়েছি— দেওরাম আমাকে ভারী যত্ন করে।"

দাদো বালকের ছলনাহীন মুখের দিকে কিয়ৎকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া শুধু কহিলেন, "হুঁ।" মনে মনে ভাবিলেন,— তোমার গতিবিধির উপর এখন হইতে একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে; ব্যাপার ঠিক বুঝা যাইতেছে না।

ধারোষ্ণ দুগ্ধের পাত্র আনিয়া দেওরাম বালকের হাতে দিল। বালক জিজ্ঞাসা করিল, "দাদো, তুমি খাবে না?"

দাদো কহিলেন, "না, তুমি খাও। আমার এখনো আহ্নিক বাকি।"

দুগ্ধপাত্র দুই হস্তে ধরিয়া বালক অদূরে একটি শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। দেওরামও তাহার অনুবর্তী হইয়া পাশে গিয়া দাঁড়াইল। এক চুমুক দুগ্ধ পান করিয়া বালক অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকাইয়া নিম্নস্বরে বলিল, "পরশু অমাবস্যা।"

দেওরামও অলসভাবে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "হ্যাঁ। লোক সব তৈরি আছে। কোথায় থাকতে হবে?"

"রাক্ষসমুখো গুহার মধ্যে। আমি দেড় পহর রাত্রে আসব। পঁচিশ জনের বেশি লোক যেন না হয়।"

"বেশ। এবার কোন্ দিকে যাওয়া হবে?"

"উত্তর দিকে। দক্ষিণে আর নয়, সেদিকে বড় হৈ চৈ হয়েছে। দরবার পর্যন্ত খবর গেছে।"

দাদো তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া দেওরাম প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা। হরিণ কিন্তু এদিকে পাওয়া যায় না।"

বালক বাকি দুগ্ধটুকু নিঃশেষে পান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজভাবে বলিল, "আজ তাহলে চললুম, দেওরাম। নুন্নার বিয়ের দিন আমাকে খবর দিও—আমি দাদোকে নিয়ে আসব। দাদো একজন ভারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জানো তো? উনিই নুন্নার বিয়ে দেবেন।"

ঘোড়ার পিঠে একলাফে উঠিয়া বালক বলিল, "আর যদি হরিণছানা পাও, পুণায় নিয়ে যেও। আর দেরি করব না, রাত হয়ে এলো। দাদোর আবার ভারী ডাকাতের ভয়!"

বিশুয়া ও দেওরাম দাঁড়াইয়া রহিল, অশ্বারোহী দুইজনে বদরীকানন পার হইয়া ঝরনার সঞ্চিত অগভীর ক্ষুদ্র জলাশয়ের পাশ দিয়া আবার পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। এইটি শেষ পাহাড়— ইহার পরই উপত্যকা। কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না, দুইজনেই স্ব স্ব চিন্তায় মগ্ন। এদিকে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছে। ঘোড়া দু'টি সতর্কভাবে পর্বতগাত্র আরোহণ করিতেছে।

হঠাৎ চমক ভাঙিয়া বালক দাদোর দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল দাদো তাহারই মুখের প্রতি সন্দেহাকুল চক্ষে চাহিয়া আছেন। বালক অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তারপর জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি দেখছো, দাদো? এবার আমার মা'র বিয়ের গল্প বলো।"

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আপনার মনে বলিলেন, "বংশের ধারা বদলানো যায় না; বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়, শৃগাল হয় না - ঈশ্বরের এই বিধান। কে জানে, হয়তো এর মধ্যে মঙ্গলেরই বীজ নিহিত আছে।"

বালক তাঁহাকে দীর্ঘকাল চিন্তা করিবার অবকাশ না দিয়া পুনশ্চ কহিল, "বলো না, দাদো ?"

দাদো আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "গল্প অতি সামান্যই। কিন্তু তোমার ঠাকুর্দা মালোজী ভোঁস্‌লে যে কি রকম চতুর ছিলেন, এই গল্প থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"তোমার মাতুলবংশের মতো এতবড় বিখ্যাত যশস্বী বংশ দাক্ষিণাত্যে খুব অল্পই আছে। আজ থেকে নয়, চারশো বছর আগে আলাউদ্দিন খিল্‌জির আমল থেকে দেবগিরির যদুবংশের নাম দাক্ষিণাত্যের পাথরে পাথরে তলোয়ার দিয়ে খোদাই হয়ে আসছে।

"অতীতের কোন্ যুগে এই যদুবংশ রাজপুতানা থেকে এসে দেবগিরিতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে কাহিনী লুপ্ত হয়ে গেছে। দেবগিরির রাজ্যও আর নেই ; কিন্তু বীরত্বে, ধর্মনিষ্ঠায়, মহানুভবতায় এই বংশ আজ পর্যন্ত হিন্দুমাত্রেরই আদর্শ হয়ে আছে।

"এ-হেন বংশে তোমার দাদামশায় লখুজী যদুরাও একজন পরাক্রমশালী মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন। দশ হাজার সিপাহী নিত্য তাঁর রুটি খেত। বিজাপুর-গোলকুণ্ডা তাঁকে যমের মতো ভয় করত, আমেদনগর রাজ্যের তিনি ছিলেন প্রধান স্তম্ভ। মালিক অম্বর যদি তাঁর সঙ্গে কপটচারিতা না করত— কিন্তু সে অন্য কথা। এখন আসল গল্পটা বলি।

"সে আজ বহুদিনের ঘটনা, তখন আমার বয়স দশ-এগারো বছরের বেশি নয় ; কিন্তু সেদিনকার প্রত্যেক ঘটনাটি স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন ছিল ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী, রাজপুতদের একটা মস্ত উৎসবের দিন। দাক্ষিণাত্যে দোলপূর্ণিমার দিন আবীর খেলার প্রথা এই যদুবংশই প্রচার করেছিলেন। সেদিন দেশের সমস্ত গণ্যমান্য লোক, এমন কি বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আমেদনগর দরবারের বড় বড় হিন্দু আমীর-ওমরা এসে লখুজীর কেল্লার মতো বিশাল ইমারতে জমা হতেন। সমস্ত রাত্রিদিনব্যাপী উৎসব চলত, ফাগ, রং এবং সুরার স্রোত বয়ে যেত।

"সেবার লখুজীর প্রকাণ্ড প্রাসাদের দরবার-ঘরে মজলিস বসেছে। মেঝের ওপর পার্সী গালিচা পাতা, তার ওপর অনেকে বসেছেন ; দরবার লোকে লোকারণ্য। সিপাহী থেকে সর্দার পর্যন্ত সকলের অবাধ যাতায়াত। সামান্য সৈনিক পাঁচহাজারী সর্দারের মুখে আবীর মাখিয়ে দিচ্ছে, মন্‌সবদার সিপাহীকে মাটিতে ফেলে তার মুখে মদ ঢেলে দিচ্ছে। হাসির হর্‌রা ছুটছে। ছোট বড়, উচ্চ নীচ কোনও প্রভেদ নেই, এই একদিনের জন্যে সকলে সমান। সবাই আমোদে মত্ত।

"সভার মাঝখানে মস্তবড় একটা চাঁদির থালায় আবীর স্তূপীকৃত রয়েছে, সেই থালা ঘিরে প্রধান প্রধান অতিথিরা বসেছেন। পানদান, গুলাবপাশ, আতরদান চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। স্বয়ং লখুজী এখানে আসীন ; তোমার ঠাকুর্দা মালোজীও আছেন। মালোজী তখন লখুজীর অনুগৃহীত একজন সামান্য সর্দার মাত্র ; কিন্তু তাঁর কূটবুদ্ধি ও রণনৈপুণ্যের জন্যে লখুজী তাঁকে ভারী স্নেহ করতেন। তাই মালোজীও সাহস করে এই সভায় এসে বসেছেন। সকলের মুখেই আবীরের প্রলেপ, দেহের বস্ত্র এবং মিরজাই রঙে রক্তবর্ণ, চক্ষু ঢুলুঢুলু। এখানে গানের মজলিস বসেছে ; আরো অনেক লোক চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গান শুনছে এবং মজা দেখছে।

"গান গাইছেন আমেদনগরের একজন বুড়ো ওমরা— তাঁর নাম ভুলে গেছি। মস্ত ওস্তাদ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। গড়গড়া টানতে টানতে হঠাৎ তিনি বসন্তরাগের এক তান মারলেন— সুরের ধমকে পাকা গোঁফ থেকে একরাশ আবীর উড়ে গেল। তোমার ঠাকুর্দা মালোজী সারঙ্গী কোলে করে ওস্তাদের পিছনে বসে ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংগত আরম্ভ করলেন। লখুজী নিজে মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন।

"গান থামলে প্রশংসাধ্বনির একটা ঝড় বয়ে গেল, লখুজী পাখোয়াজ ফেলে প্রায় এক তোলা

অম্বুরী আতর পলিতকেশ গায়কের গোঁফে মাখিয়ে দিয়ে দাড়ি ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, 'কৎল্ কিয়া বিবি ! আর একঠো ফর্মাও !'

"বৃদ্ধ দন্তহীন হাসি হেসে চোখ ঠেরে আবার গান ধরলেন, 'চোলিমে ছিপাউ কৈসে যোবনা মোরি'।

"বিরাট হাসির একটা হল্লা পড়ে গেল। লখুজী ওস্তাদকে কোলে তুলে নিয়ে নৃত্য শুরু করে দিলেন। — কি আনন্দের দিনই গিয়েছে ; এখন সব স্বপ্ন বলে মনে হয়।"

দাদো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ঘোড়া দুইটি ইতিমধ্যে পর্বত পার হইয়া উপত্যকায় নামিয়া আসিয়াছে, কিন্তু পথ এখনো শিলা-সংকুল। আশেপাশে মাটি ফাটিয়া বড় বড় খাদ রচনা করিয়াছে। শুষ্ক পয়ঃপ্রণালীর মতো এই খাদগুলি অন্ধকারে বড়ই বিপজ্জনক, ঘোড়া একবার পা ফস্কাইয়া উহার মধ্যে পড়িলে কোথায় অন্তর্হিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এদিকে দিবার দীপ্তিও সম্পূর্ণ নিবিয়া গিয়াছে, কেবল সম্মুখে বহুদূরে পুণার দীপগুলি মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

বালক একাগ্রমনে গল্প শুনিতেছিল, দাদো থামিতেই সাগ্রহে গলা বাড়াইয়া বলিল, "তারপর ?"

দাদো বলিলেন, "হুঁশিয়ার হয়ে পথ চলো, রাস্তা বড় খারাপ।" তারপর গল্প আরম্ভ করিলেন, "দু'টি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এই দরবার ঘরের চারিদিকে খেলা করে বেড়াচ্ছিল, দু'জনেরই লাল বেনারসী চেলির জোড় পরা, কানে কুণ্ডল, হাতে বালা, গলায় হার। ছেলেটির বয়স পাঁচ বছর, আর মেয়েটির তিন।

"এদের দিকে কারো দৃষ্টি ছিল না, এরা নিজের মনে ঘরময় খেলে বেড়াচ্ছিল। কখন এক সময় মেয়েটি দূর থেকে ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল, গম্ভীর মুখে ছেলেটির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আধ-আধ ভাষায় প্রশ্ন করলে, 'তুমি কে ?'

"ছেলেটিও মেয়েটির দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে বললে, 'আমি শাহু। আমি তীর ছুঁড়তে পারি। তুমি কে ?'

"মেয়েটির দুই চক্ষু সম্ভ্রমে ভরে উঠল, সে ফুলের মতো ঠোঁট দু'টি খুলে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললে, 'আমি দিদা।' তারপর একটু ভেবে আবার বললে, 'আমার বাবাও তীর ছুঁড়তে পারে।'

"অতঃপর এই বীর এবং বীরকন্যার মধ্যে ভাব হতে বেশি দেরি হল না। শাহু গিয়ে মেয়েটির গলা জড়িয়ে নিলে, মেয়েটিও শাহুর কোমর জড়িয়ে ধরলে। এইভাবে তারা অনেকক্ষণ দরবার-ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাদের মধ্যে চুপিচুপি কি কথা হল তারাই জানে। খুব সম্ভব শাহু তার অসামান্য শৌর্য-বীর্যের কথা খুব ফলাও করে ব্যাখ্যা করে মেয়েটির ছোট্ট প্রাণটুকু জয় করে নিচ্ছিল। আর মেয়েটিও বোধ হয় নিঃসংশয় সহানুভূতি এবং প্রশংসা দ্বারা শাহুর বীর-হৃদয় সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলছিল।

"এদিকে গানের মজলিস তখন ঢিলে হয়ে এসেছে ; বৃদ্ধ গায়ক তিন পাত্র গুলাবি সরবত খেয়ে কিংখাপের তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছেন,— এমন সময় এই দু'টি ছেলে-মেয়ে গলা-জড়াজড়ি করে তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। এতগুলো লোক চারপাশে বসে আছে, কিন্তু সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, নিজেদের কথাতেই তারা মশগুল। বৈঠকে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি একসঙ্গে তাদের ওপর গিয়ে পড়ল। এ কি অপূর্ব আবির্ভাব ! আজ দোলের দিনে সত্যিই কি বৃন্দাবন-লীলা তাঁদের চোখের সামনে অভিনীত হচ্ছে ? সকলে চোখ মুছে দেখলেন,— তাই তো ! ছেলেটির বর্ণ নবজলধরশ্যাম, আর মেয়েটি বিদ্যুল্লতার মতো গৌরী !

"মেয়েটির হঠাৎ কি খেয়াল হল, সে আতরদানে তার ছোট্ট চাঁপার কলির মতো আঙুল ডুবিয়ে শাহুর নাকের নীচে আঙুলটি বুলিয়ে দিলে। শাহুও আদর-আপ্যায়নে কম যাবার পাত্র নয়, সে চাঁদির থালা থেকে এক মুঠি আবীর তুলে নিয়ে সযত্নে মেয়েটির মুখে কপালে মাখিয়ে দিলে।

"সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলেন, 'রাধা-গোবিন্দজী কি জয়!'

"লখুজী আর মালোজী ছাড়া আর কেউ জানতেন না এ ছেলে-মেয়ে দু'টি কে। লখুজী উচ্চহাস্য করে উঠলেন, তারপর দু'টিকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের কোলে বসিয়ে বললেন, 'রাধা-গোবিন্দজী নয়, এরা আমার মেয়ে আর মালোজীর ছেলে। বন্ধুগণ, এ দু'টির বিয়ে হলে কেমন মানায় বলুন তো?'

"লখুজী পরিহাসচ্ছলেই কথাটা বলেছিলেন, তা ছাড়া গুলাবি সরবতের নেশাও অল্পবিস্তর ছিল। তাঁর কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন, কিন্তু মালোজী ভোঁস্‌লে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে করজোড়ে সকলকে বললেন, 'মহাশয়গণ, আপনারা সাক্ষী থাকুন, লখুজী তাঁর কন্যাকে আমার পুত্রের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা করলেন।'

"সকলে অবাক হয়ে রইলেন, লখুজীর নেশা ছুটে গেল। তাঁর মুখ আবীর-প্রলেপের ভিতর থেকে ক্রোধে কালো হয়ে উঠল। তাঁর মেয়েকে—দেবগিরির রাজবংশের মেয়েকে যে মালোজীর মতো একজন সামান্য প্রাণী নিজের পুত্রবধূ করবার স্পর্ধা করতে পারে, এ তাঁর কল্পনারও অতীত; কিন্তু তবু কথাটা যে তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়ে গেছে এ কথাও অস্বীকার করা চলে না। মালোজীর দিকে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে লখুজী বললেন, 'মালোজী, তুমি পাগলের মতো কথা বলছ। আমার মেয়ে রাজার ঘরে পড়বে।'

"মালোজী পূর্ববৎ জোড়করে বললেন, 'আমার ছেলে আপনার মেয়ের মুখে আবীর দিয়েছে, আপনার মেয়ে আমার ছেলের মুখে আতর দিয়েছে, তারপর আপনি তাদের কোলে নিয়ে যা বলেছেন তা উপস্থিত সকলেই শুনেছেন। ধর্মতঃ, আপনার মেয়ে আমার ছেলের বাগ্‌দত্তা। এখন যদি আপনি সে কথা প্রত্যাহার করতে চান, করুন, আমার আপত্তি নেই।'

"ক্রোধে লখুজী আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কিন্তু তাঁদের মনোভাব বুঝতেও বিলম্ব হল না; সকলেই নীরবে মালোজীর কথার সমর্থন করছেন। লখুজী নিজের মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে ঝড়ের মতো অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

"মালোজীও ছেলে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে লখুজীর মেয়ে প্রকাশ্য দরবারে মালোজীর ছেলের বাগ্‌দত্তা হয়েছে। কথাটা অবশ্য বেশি দিন চাপা থাকত না, প্রকাশ হয়ে পড়তই; কিন্তু এমনি তোমার ঠাকুর্দার উদ্যম আর তৎপরতা যে সপ্তাহ মধ্যে মহারাষ্ট্রের সর্বত্র এই সুসংবাদ প্রচার হয়ে পড়ল, জনপ্রাণীরও জানতে বাকি রইল না।

"লখুজী নিষ্ফল ক্রোধে ফুলতে লাগলেন। মালোজীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়ে গেল, এমন কি মুখ-দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, মালোজীর মতো ধড়িবাজ অকৃতজ্ঞ লোককে আর তিনি কোনও সাহায্য করবেন না, বরং তার যাতে অনিষ্ট হয় সেই চেষ্টাই করবেন।

"তাঁর প্রতিজ্ঞা কিন্তু রইল না। যতই বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল, ততই তিনি বুঝতে পারলেন চতুর মালোজী তাঁকে কি বিষম ফাঁদে ফেলেছে। তিনি বুঝলেন অন্যত্র মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ে সুখী হবে না, যত তার বয়স বাড়ছে শাহু ছাড়া আর কেউ যে তার স্বামী হতে পারে না, এ ধারণা তার মনে ততই দৃঢ় হচ্ছে। তাছাড়া অন্যের বাগ্‌দত্তা মেয়ে কেউ জেনেশুনে বিয়ে করতে চায় না, দু'-চারটে ঘরানা ঘরে সম্বন্ধ করতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে লখুজীকে ফিরে

আসতে হল। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন শাহু ছাড়া জিজার গতি নেই।

"এইভাবে ন'-দশ বছর কেটে গেছে। মালোজী কপালের জোরে এবং বুদ্ধিবলে খুব উন্নতি করেছেন, বিষয়-সম্পত্তিও হয়েছে। লখুজীর বিদ্বেষ ও অনিচ্ছা ক্রমেই কমে আসতে লাগল। তারপর একদিন মালোজীকে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভাই, আমারই ভুল ; জিজাকে তুমি তোমার ছেলের জন্যে নিয়ে যাও।'

"ব্যাস্, আর কি ! এইখানেই গল্প শেষ। মালোজীর মতলব সিদ্ধ হল, মহা ধুমধাম করে তোমার বাপের সঙ্গে তোমার মায়ের বিয়ে হয়ে গেল। তখন তোমার মা'র বয়স তেরো বৎসর, আর শাহুর পনেরো। বিয়ের রাত্রে তোমার মা'র গর্বোজ্জ্বল হাসিভরা মুখ আমার আজও মনে আছে।

"তবে একথা ঠিক যে জন্মান্তরের সম্বন্ধ না হলে এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, এতবড় সামাজিক পার্থক্য লঙ্ঘন করে এ বিয়ে কখনই হতে পারত না। তোমার মা-বাবা পূর্বজন্মেও স্বামী-স্ত্রী ছিলেন।"

বৃদ্ধ দাদো মৌন হইলেন। কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না, দুইজনে নীরবে চলিলেন। অন্ধকার তখন বেশ গাঢ় হইয়াছে, পাশের লোকও স্পষ্ট দেখা যায় না। দাদো লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, বালক দুই কর যুক্ত করিয়া ললাটে ঠেকাইয়া বারংবার কাহার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছে। দাদো কথা কহিলেন না, অপূর্ব আবেগভরে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অর্ধস্ফুটস্বরে বালক বলিল, "কি সুন্দর গল্প ! আমার মা'র মতো এমন মা পৃথিবীর আর কারো নেই—না দাদো ?"

দাদো সংযতকণ্ঠে বলিলেন, "না। তোমার মায়ের মতো এমন অসামান্যা নারী আর কোথাও নেই। সেই তিন বছর বয়স থেকে আজ পর্যন্ত দেখে আসছি, এমনটি আর দেখিনি।"

পূর্ণ হৃদয় লইয়া দুইজনে নীরব রহিলেন। ক্রমে পুণার আলোক নিকটবর্তী হইতে লাগিল, পথ সমতল ও অনুদ্‌ঘাত হইল। অশ্বদ্বয় আশু গৃহে পৌঁছিবার আশায় দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল।

পুণা পৌঁছিতে যখন পাদক্রোশ মাত্র বাকি আছে, তখন কে একজন সম্মুখের অন্ধকার হইতে উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল, "হো শিব্বা হো ! হো দাদোজী !"

বালক শিব্বা চমকিয়া উঠিয়া সানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, "তানা ! তানা !" তারপর তীরবেগে সম্মুখে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

অন্ধকারে তানাজী মালেশ্বর ঘোড়ার উপর বসিয়া ছিল, শিব্বা প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল।

তানাজী তিরস্কারের সুরে বলিল, "আজ কি আর বাড়ি ফিরতে হবে না ? কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? মা কত ভাবছেন, শেষে আর থাকতে না পেরে আমাকে পাঠালেন ?"

শিব্বা ঘোড়ার উপর হইতেই তানাজীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা কোথায় রে, তানা ?"

তানাজী বলিল, "কোথায় আবার—বাড়িতে ! দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পথের পানে চেয়ে আছেন। তোমার এত দেরি হল কেন ?" গলা খাটো করিয়া বলিল, "দেওরামের সঙ্গে দেখা হল নাকি ? ওদিকের কি খবর ? কবে ?"

শিব্বা অন্যমনস্কভাবে বলিল, "খবর ভালো। অমাবস্যার রাত্রে সব ঠিক হয়েছে — চল্ তানা, শীগ্‌গির বাড়ি যাই। মাকে সমস্ত দিন দেখিনি— ভারী মন-কেমন করছে।"

দুই কিশোর বন্ধু তখন নীড়-প্রতিগামী পাখির মতো দ্রুতবেগে গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

বৃদ্ধ দাদোজী কোণ্ডু বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন।

১৩৩৮



রুমাহরণ

চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা নামক জনৈক নাগরিকের ঘৃণিত জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। দিগ্বিজয়ী চন্দ্রবর্মা পাটলিপুত্রের প্রাসাদভূমির এক প্রান্তে এক অর্ধশুষ্ক কূপমধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কূপের মুখ ঘনসন্নিবিষ্ট লৌহজাল দ্বারা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই কূপের দুর্গন্ধ পঙ্কে আ-কটি নিমজ্জিত হইয়া, ভেক-সরীসৃপ-পরিবৃত হইয়া আমার অন্তিম তিন মাস কাটিয়াছিল।

জয়ন্তী নাম্নী পুরীর এক দাসী চণ্ডালহস্তে শূকর মাংস আনিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমার জন্য কূপে ফেলিয়া দিয়া যাইত। এই জয়ন্তীর নিকট আমি রাজ-অবরোধের অনেক কথা শুনিতে পাইতাম। জয়ন্তী সোমদত্তার সহচরী কিঙ্করী ছিল ; সে সোমদত্তার মনের অনেক কথা জানিত, অনেক কথা অনুমান করিয়াছিল। সে কূপমুখে বসিয়া সোমদত্তার কাহিনী বলিত, আমি নিম্নে অন্ধকারে কীটদংশনবিক্ষত অর্ধগলিত দেহে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতাম।

একদিন জয়ন্তীকে বলিয়াছিলাম, "জয়ন্তী, আমাকে উদ্ধার করিবে ? আমার বহু গুপ্তধন মাটিতে প্রোথিত আছে, যদি মুক্তি পাই, তোমাকে দশ হাজার স্বর্ণদীনার দিব। তোমাকে আর চেটীবৃত্তি করিতে হইবে না।"

ভীতা জয়ন্তী আমাকে গালি দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, আর আসে নাই। অনন্তর চণ্ডাল একাকী আসিয়া মাংস দিয়া যাইত।

আমি একাকী এই জীবন্ত নরকে বসিয়া থাকিতাম আর ভাবিতাম। কি ভাবিতাম, তাহা বলিবার এ স্থান নহে। তবে সোমদত্তা আমার চিন্তার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া থাকিত। ভাবিতাম, সোমদত্তার মনে যদি ইহাই ছিল, তবে সে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিল কেন ? যদি চন্দ্রগুপ্তকে এত ভালোবাসিত, তবে সে বিশ্বাসঘাতিনী না হইয়া আত্মঘাতিনী হইল না কেন ? রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে বলিবে ? তখন এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাই নাই।

কিন্তু আজ বহু জীবনের পরপারে বসিয়া মনে হয়, যেন সোমদত্তার চরিত্র কিছু কিছু বুঝিয়াছি। সোমদত্তা গুপ্তচররূপে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে চন্দ্রগুপ্তকে সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া ভালোবাসিয়াছিল। কুমারদেবী চন্দ্রগুপ্তকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। তাই সে সংকল্প করিয়াছিল, চন্দ্রবর্মাকে দুর্গ অধিকারে সাহায্য করিয়া পরে স্বামীর জন্য পাটলিপুত্র ভিক্ষা মাগিয়া লইবে ; কুমারদেবীর প্রভাব অস্তমিত হইবে, চন্দ্রগুপ্ত সত্যই রাজা হইবেন এবং সেই সঙ্গে সোমদত্তাও স্বামীসোহাগিনী হইয়া পট্টমহিষীর আসন গ্রহণ করিবে।

আমার দুরন্ত লালসা যখন তাহার গোপন সংকল্পের উপর খড়্গের মতো পড়িয়া উহা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিল, তখন তাহার মনের কি অবস্থা হইল সহজেই অনুমেয়। নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিণী হীন গুপ্তচর বলিয়া কোন্ রমণী ধরা পড়িতে চাহে ? সোমদত্তা দেখিল, ধরা পড়িলে স্বামীর অতুল ভালোবাসা সে হারাইবে ; সে যে চন্দ্রগুপ্তকেই রাজ্য ফিরিয়া দিবার মানসে চক্রান্ত করিয়াছে, এ কথা চন্দ্রগুপ্ত বুঝিবে না, নীচ বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া ঘৃণাভরে তাহাকে

পরিত্যাগ করিবে। এদিকে চক্রায়ুধের হস্তেও নিস্তার নাই, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, ধর্মনাশ নিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় অসহায়া জালবদ্ধা কুরঙ্গিণী কি করিবে ?

অপরিমেয় ভালোবাসার যূপে সোমদত্তা সতীধর্ম বিসর্জন দিল। ভাবিল, আমার তো চরম সর্বনাশ হইয়াছে, কিন্তু এই মর্মভেদী লজ্জার কাহিনী স্বামীকে জানিতে দিব না। এখন আমার যাহা হয় হউক, তারপর যে জীবন ধ্বংস করিয়াছে, তাহাকে যমালয়ে পাঠাইয়া নিজেও নরকে যাইব। কিন্তু স্বামীকে কিছু জানিতে দিব না।

ইহাই সোমদত্তার আত্মবিসর্জনের অন্তরতম ইতিহাস।

কিন্তু আর না, সোমদত্তার কথা এইখানেই শেষ করিব। এই নারীর কথা স্মরণে ষোল শত বৎসর পরে আজও আমার মন মাতাল হইয়া উঠে। জানি, সোমদত্তার মতো নারীকে বিধাতা আমার জন্য সৃষ্টি করেন না— সে দেবভোগ্যা। জন্মজন্মান্তরের ইতিহাস খুঁজিয়া এমন একটিও নারী দেখিতে পাই নাই, যাহার সহিত সোমদত্তার তুলনা করিব। আর কখনও এমন দেখিব কি না জানি না।

আমি বিশ্বাস করি, জন্মান্তরের পরিচিত লোকের সহিত ইহজন্মে সাক্ষাৎ হয়। সোমদত্তার সহিত যদি আবার আমার সাক্ষাৎ হয়, জানি, তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিব। নূতন দেহের ছদ্মবেশ তাহাকে আমার চক্ষু হইতে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

কিন্তু সে-ও কি আমাকে চিনিতে পারিবে ? ললাটে কি স্মৃতির ভ্রূকুটি দেখা দিবে ? অধরে সেই অন্তিমকালের অপরিসীম ঘৃণা স্ফুরিত হইয়া উঠিবে ? জানি না। জানি না।

পূর্বে বলিয়াছি যে, আমি বিশ্বাস করি, জন্মান্তরের পরিচিত লোকের সঙ্গে ইহজন্মে সাক্ষাৎ হয়। আপনি তাহার মুখের পানে অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকেন, চিনি-চিনি করিয়াও চিনিতে পারেন না। মনে করেন, পূর্বে কোথাও দেখিয়া থাকিবেন। এই পূর্বে যে কোথায় এবং কত দিন আগে, আপনি তাহা জানেন না ; আমি জানি। ভগবান আমাকে এই অদ্ভুত শক্তি দিয়াছেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আমার মনের অন্ধকার চিত্রশালায় চিত্রের ছায়াবাজি আরম্ভ হইয়া যায়। যে কাহিনীর কোনও সাক্ষী নাই, সেই কাহিনীর পুনরভিনয় চলিতে থাকে। আমি তখন আর এই ক্ষুদ্র আমি থাকি না, মহাকালের অনিরুদ্ধ স্রোতঃপথে চিরন্তন যাত্রীর মতো ভাসিয়া চলি। সে যাত্রা কবে আরম্ভ হইয়াছিল জানি না, কত দিন ধরিয়া চলিবে তাহাও ভবিষ্যের কুজ্ঝটিকায় প্রচ্ছন্ন। তবে ইহা জানি যে, এই যাত্রা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন অব্যাহত। মাঝে মাঝে মহাকালের নৃত্যের ছন্দে যতি পড়িয়াছে মাত্র— সমাপ্তির 'সম' কখনও পড়িবে কি না এবং পড়িলেও কবে পড়িবে, তাহা বোধ করি বিধাতারও অজ্ঞেয়।

মহেঞ্জোদাড়োর নগর ও মিশরের পিরামিড যখন মানুষের কল্পনায় আসে নাই, তখনও আমি জীবিত ছিলাম। এই আধুনিক সভ্যতা কয় দিনের ? মানুষ লোহা ব্যবহার করিতে শিখিল কবে ? কে শিখাইল ? প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পরশুমুণ্ড পরীক্ষা করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেছেন, কিন্তু উত্তর পাইতেছেন না। আমি বলিতে পারি, কবে লোহার অস্ত্র ভারতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু সন-তারিখ দিয়া বলিতে পারিব না। সন-তারিখ তখনও তৈয়ার হয় নাই। তখন আমরা কাঁচা মাংস খাইতাম।

চারিদিকে পাহাড়ের গণ্ডি দিয়া ঘেরা একটি দেশ, মাঝখানে গোলাকৃতি সুবৃহৎ উপত্যকা। 'যজ্ঞিবাড়ি'তে কাঠের পরাতের উপর ময়দা স্তূপীকৃত করিয়া ঘি ঢালিবার সময় তাহার মাঝখানে যেমন নামাল করিয়া দেয়, আমাদের পর্বতবলয়িত উপত্যকাটি ছিল তাহারই একটি সুবিরাট সংস্করণ। আবার বিধাতা মাঝে মাঝে আকাশ হইতে প্রচুর ঘৃতও ঢালিয়া দিতেন ; তখন ঘোলাটে রাঙা জলে উপত্যকা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিত। পাহাড়ের অঙ্গ বহিয়া শত নির্ঝরিণী সগর্জনে

নামিয়া আসিয়া সেই হ্রদ পুষ্ট করিত। আবার বর্ষাপগমে জল শুকাইত, কতক গিরিরন্ধ্র পথে বাহির হইয়া যাইত ; তখন অগভীর জলের কিনারায় একপ্রকার দীর্ঘ ঘাস জন্মিত। ঘাসের শীর্ষে ছোট ছোট দানা ফলিয়া ক্রমে সুবর্ণবর্ণ ধারণ করিত। এই গুচ্ছ গুচ্ছ দানা কতক ঝরিয়া জলে পড়িত, কতক উত্তর হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে হংস আসিয়া খাইত। সে সময় জলের উপরিভাগ অসংখ্য পক্ষীতে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিত এবং তাহাদের কলধ্বনিতে দিবা-রাত্রি সমভাবে নিনাদিত হইতে থাকিত। শীতের সময় উচ্চ পাহাড়গুলার শিখরে শিখরে তুলার মতো তুষারপাত হইত। আমরা তখন মৃগ, বানর, ভল্লুকের চর্ম গাত্রাবরণরূপে পরিধান করিতাম। গিরিকন্দরে তুষার-শীতল বাতাস প্রবেশ করিয়া অস্থি পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিত। পাহাড়ে শুষ্ক তরুর ঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অগ্নি তৈয়ার করিতে তখনও শিখি নাই। অগ্নিকে বড় ভয় করিতাম।

আমাদের এই উপত্যকা কোথায়, ভারতের পূর্বে কি পশ্চিমে, উত্তরে কি দক্ষিণে, তাহা আমার ধারণা নাই। ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। উপত্যকার কিনারায় পাহাড়ের গুহাগুলির মধ্যে আমরা একটা জাতি বাস করিতাম ; পর্বতচক্রের বাহিরে কখনও যাই নাই, সেখানে কি আছে তাহাও জানিতাম না। আমাদের জগৎ এই গিরিচক্রের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। পাহাড়ে বানর, ভল্লুক, ছাগ, মৃগ প্রভৃতি নানাবিধ পশু বাস করিত, আমরা তাহাই মারিয়া খাইতাম ; ময়ূরজাতীয় এক প্রকার পক্ষী পাওয়া যাইত, তাহার মাংস অতি কোমল ও সুস্বাদু ছিল। তাহার পুচ্ছ দিয়া আমাদের নারীরা শিরোভূষণ করিত। গাছের ফলমূলও কিছু কিছু পাইতাম, কিন্তু তাহা যৎসামান্য ; পশুমাংসই ছিল আমাদের প্রধান আহার্য।

চেহারাও আহারের অনুরূপ ছিল। মাথায় ও মুখে বড় বড় জটাকৃতি চুল, রোমশ কপিশ-বর্ণ দেহ, বাহু জানু পর্যন্ত লম্বিত। দেহ নিতান্ত খর্ব না হইলেও প্রস্থের দিকেই তাহার প্রসার বেশি। এরূপ আকৃতির মানুষ আজকালও মাঝে মাঝে দু'-একটা চোখে পড়ে, কিন্তু জামা-কাপড়ের আড়ালে স্বরূপ সহসা ধরা পড়ে না। তখন আমাদের জামা-কাপড়ের বালাই ছিল না, প্রসাধনের প্রধান উপকরণ ছিল পশুচর্ম। তাহাও গ্রীষ্মকালে বর্জন করিতাম, সামান্য একটু কটিবাস থাকিত।

আমাদের নারীরা ছিল আমাদের যোগ্য সহচরী— তাম্রবর্ণা, কৃশাঙ্গী, ক্ষীণকটি, কঠিনস্তনী। নখ ও দন্তের সাহায্যে তাহারা অন্য পুরুষের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিত। স্তন্যপায়ী শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অন্যহস্তে প্রস্তরফলকাগ্র বর্শা পঞ্চাশহস্ত দূরস্থ মৃগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে পারিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইহারা যখন গুহাদ্বারে বসিয়া পক্ব লোহিত ফলের কর্ণাভরণ দুলাইয়া মৃদুগুঞ্জনে গান করিত, তখন তাহাদের তীব্রোজ্জ্বল কালো চোখে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিত। আমরা প্রস্তরপিণ্ডের অন্তরালে লুকাইয়া নিস্পন্দবক্ষে শুনিতাম— বুকের মধ্যে নামহীন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত।

এই সব নারীর জন্য আমরা যুদ্ধ করিতাম, হিংস্র শ্বাপদের মতো পরস্পর লড়িতাম। ইহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত। যুদ্ধের অবসানে বিজয়ী আসিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। আমাদের জাতির মধ্যে নারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল...

কিন্তু গোড়া হইতে আরম্ভ করাই ভালো। কি করিয়া এই অর্ধপশু জীবনের স্মৃতি জাগরূক হইল, পূর্বে তাহাই বলিব।

পূজার ছুটিতে হিমাচল অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। রেলের চাকরিতে আর কোনও সুখ না থাক, ঐটুকু আছে— বিনা খরচে সারা ভারতবর্ষটা ঘুরিয়া আসা যায়। আমি হিমালয়ের কোন্ দিকে গিয়াছিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই,— তবে সেটা দার্জিলিং কিংবা সিমলা পাহাড়

নহে। যেখানে গিয়াছিলাম সে স্থান আরও নির্জন ও দুরধিগম্য ; রেলের শেষ সীমা ছাড়াইয়া আরও দশ-বারো মাইল রিক্‌শ কিংবা ঘোড়ায় যাইতে হয়।

হিমালয়ের নৈসর্গিক বর্ণনা করিয়া উত্ত্যক্ত পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইব না ; সচরাচর আশ্বিনমাসে পাহাড়ের অবস্থা যেমন হইয়া থাকে, তাহার অধিক কিছু নহে। গিরিক্রোড়ের এই ক্ষুদ্র জনবিরল শহরটি এমনভাবে তৈয়ারি যে, মানুষের হাতের কাজ খুব কমই চোখে পড়ে। যে পথটি সর্পিল গতিতে কখনও উঁচু কখনও নিচু হইয়া শহরটিকে নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, পাইন্ গাছের শ্রেণীর দ্বারা তাহা এমনই আচ্ছন্ন যে, তাহার শীর্ণ দেহটি সহসা চোখেই পড়ে না। ছোট ছোট পাথরের বাড়িগুলি পাহাড়ের অঙ্গে মিশিয়া আছে। মাঝে মাঝে পাইনের জঙ্গল, তাহার মধ্যে পাথরের টুকরা বসাইয়া মানুষের বিশ্রামের স্থান করা আছে। রাত্রিকালে ক্বচিৎ ফেউয়ের ডাক শুনা যায়। শীত চমৎকার উপভোগ্য।

সেদিন পাইন্ গাছের মাথায় চাঁদ উঠিয়াছিল। আধখানা চাঁদ, কিন্তু তাহারই আলোয় বনস্থলী উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমি একাকী পাইন্ বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। গায়ে ওভারকোট ছিল, মাথায় একটা অদ্ভুত আকৃতির পশমের টুপি পরিয়াছিলাম। এ দেশের পাহাড়ীরা এইরকম টুপি তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করে। চাঁদের আলোয় আমার দেহের যে ছায়াটা মাটিতে পড়িয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমারই হাসি পাইতেছিল। ঠিক একটি জংলী শিকারীর চেহারা,—হাতে একটা ধনুক কিংবা বর্শা থাকিলে আর কোনও তফাত থাকিত না।

এখানে আসিয়া অবধি কোনও বাঙালীর মুখ দেখি নাই, অন্য জাতীয় লোকের সঙ্গেও বিশেষ পরিচয় হয় নাই, তাই একাকী ঘুরিতেছিলাম। বাহিরের শীতশিহরিত তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রকৃতি আমাকে গভীর রাত্রিতে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছিল। এই প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হইতেছিল, এ-দৃশ্য যেন ইহজগতের নহে, কিংবা যেন কোন্ অতীত যুগ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া অর্ধ-ঘুমন্ত দৃশ্যটাকে কেহ এখানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে ইহার কোনও যোগ নাই, চন্দ্রাস্ত হইলেই অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো ইহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

এ বন রাত্রিকালে খুব নিরাপদ নহে জানিতাম, ফেউয়ের ডাকও স্বকর্ণে শুনিয়াছি ; কিন্তু তবু এক অদৃশ্য মায়া আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। কিছুক্ষণ এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইবার পর একটি গাছের ছায়ায় পাথরের বেদীর উপর বসিয়া পড়িলাম। নিস্তব্ধ রাত্রি। মাঝে মাঝে মৃদু বাতাসে গাছের পাতা অল্প নড়িতেছে ; দু'-একটা ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া টুপটাপ করিয়া মাটিতে পড়িতেছে। ইহা ছাড়া জগতে আর শব্দ নাই।

আমি ভিন্ন এ-বনে আরও কেহ আছে। বনভূমির উপর আলো ও ছায়ার যে ছক পাতা রহিয়াছে, তাহার উপর একটি নিঃশব্দে সঞ্চরমাণ শুভ্রমূর্তি মাঝে মাঝে চোখে পড়িতেছে। মূর্তি কখনও তরুচ্ছায়ার অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছিল, কখনও অবাস্তব কল্পনার মতো চন্দ্রালোক-কুহেলি ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ক্রমে একটি ক্ষীণ তন্দ্রামধুর কণ্ঠস্বর কানে আসিতে লাগিল,—ঐ ছায়ামূর্তি গান করিতেছে। গানের কথাগুলি ধরা গেল না, কিন্তু সুরটি পরিচিত, যেন পূর্বে কোথায় শুনিয়াছি। ঘুম-পাড়ানী ছড়ার মতো সুর, কিন্তু প্রাণের সমস্ত তন্ত্রী চির-পরিচয়ের আনন্দে ঝংকৃত করিয়া তুলে।

গান ক্রমশ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। এই গান যতই কাছে আসিতে লাগিল, আমার শরীরের স্নায়ুমণ্ডলেও এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। সে অবস্থা বর্ণনা করি এমন সাধ্য আমার নাই। সে কি তীব্র অনুভূতি ! আনন্দের কোন্ উদ্দামতম অবস্থায় মানুষের শরীরে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে জানি না, কিন্তু মনে হইল, দেহের স্নায়ুগুলা এবার অসহ্য হর্ষবেগে ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া একাকার হইয়া যাইবে।— যে গান গাহিতেছিল, সে নারী এবং যে ভাষায় গান গাহিতেছিল

তাহা বাংলা ; কিন্তু সে জন্য নহে। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অন্য কারণ ছিল। এই গান এই কণ্ঠে গীত হইতে আমি পূর্বে শুনিয়াছি— বহুবার শুনিয়াছি। ইহার প্রত্যেকটি শব্দ আমার কাছে পুরাতন। কিন্তু তফাত এই যে, যে-ভাষায় এ গান পূর্বে শুনিয়াছিলাম, তাহা বাংলাভাষা নহে। সে ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গান ভুলি নাই ! কোথায় অন্তরের কোন্ নির্জন কন্দরে এতকাল লুকাইয়া ছিল, শুনিবামাত্র প্রতিধ্বনির মতো জাগিয়া উঠিল। গানের কথাগুলি বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া অসংযুক্ত ছড়ার মতো প্রতীয়মান হয়, কিন্তু একদিন উহারই ছন্দে আমার বুকের রক্ত নৃত্য করিয়া উঠিত। গানের কথাগুলি এইরূপ :

বনের চিতা মেরেছে মোর স্বামী
ধারালো তীর হেনে !
চামড়া তাহার আমায় দেবে এনে
পরবো গায়ে আমি।
আমার চুলে বিনিয়ে দেব, ওরে,
তার ধনুকের ছিলা,
স্বামী আমার,— নিটোল দেহ তার
কঠিন যেন শিলা !

গায়িকা আরও কাছে আসিতে লাগিল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া রোমাঞ্চিত-দেহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ওঃ, কত কল্পান্ত পরে সে ফিরিয়া আসিল ! আমার প্রিয়া—আমার সঙ্গিনী—আমার রুমা ! এত দিন কি তাহারই প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলাম ?

যে তরুচ্ছায়ার নিম্নে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, সে গাহিতে গাহিতে ঠিক সেই ছায়ার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। আমাকে সে দেখিতে পায় নাই, চাঁদের দিকে চোখ তুলিয়া গাহিল,—

স্বামী আমার,—নিটোল দেহ তার
কঠিন যেন শিলা !

তাহার উন্নমিত মুখের পানে চাহিয়া আর আমার হৃদয় ধৈর্য মানিল না। আমি বাঘের মতো লাফাইয়া গিয়া তাহার হাত ধরিলাম। কথা বলিতে গেলাম, কিন্তু সহসা কিছুই বলিতে পারিলাম না। যে ভাষায় কথা বলিতে চাই, সে ভাষার একটা শব্দও স্মরণ নাই। অবশেষে অতি কষ্টে যেন অর্ধজ্ঞাত বিদেশী ভাষায় কথা কহিতেছি, এমনই ভাবে বাংলায় বলিলাম, "তুমি রুমা—আমার রুমা !"

তাহার গান থামিয়া গিয়াছিল, সে ভয়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "কে ? কে ?"

তাহার মুখের অত্যন্ত কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলাম, "আমি, আমি ! রুমা, চিনতে পারছ না ?"

সভয় ব্যাকুল-কণ্ঠে সে বলিল, "না। কে তুমি ? তোমাকে আমি চিনি না। হাত ছেড়ে দাও !"

জলবিম্ব যেমন তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙিয়া যায়, তেমনই এক মুহূর্তে আমার মোহ-বুদ্বুদ ভাঙিয়া গেল। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাইয়া বর্তমান জগতে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া লজ্জিত অপ্রতিভভাবে বলিলাম, "মাপ করুন। আমার ভুল হয়েছিল।"

রুমা চিত্রার্পিতার মতো স্থির অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমিও তাহার পানে চাহিলাম। এই আমার সেই রুমা! পরিধানে সাদা শালের শাড়ি, আর একটি ত্রিকোণ শুভ্র শাল স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া বুকের উপর ব্রুচ দিয়া আঁটা, পায়ে সাদা চামড়ার জুতা। মস্তক অনাবৃত, কালো কেশের রাশি কুণ্ডলিত আকারে গ্রীবামূলে লুটাইতেছে। মুখখানি কুমুদের মতো ধবধবে সাদা, বয়স বোধ করি আঠারো-উনিশের বেশি নহে— একটি তরুণী রূপসী শিক্ষিতা বাঙালী মেয়ে!

কিন্তু না, এ আমার সেই রুমা! যাহাকে আমি তাহার স্বজাতির ভিতর হইতে কাড়িয়া আনিয়াছিলাম, যে আমার সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, এ সেই রুমা! আজ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে আমার কাছে আসিল? আমাকে সে চিনিতে পারিল না?

আমার গলার পেশীগুলি সংকুচিত হইয়া শ্বাসরোধের উপক্রম করিল। আমি রুদ্ধস্বরে আবার বলিয়া উঠিলাম, "রুমা, চিনতে পারছ না?"

রুমা স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, মোহাবিষ্ট স্বরে কহিল, "আমার নাম রমা।"

"না—না—না, তুমি রুমা! আমার রুমা! মনে নেই, গুহার মধ্যে আমরা থাকতুম, ওপরে পাহাড়, নীচে উপত্যকা? তুমি গান গাইতে— যে গান এখনই গাইছিলে, সেই গান গাইতে, মনে নেই?"

রুমার দুই চক্ষু আরও তন্দ্রাতুর হইয়া আসিল। ঠোঁট দু'টি একটু নড়িল, বলিল, "মনে পড়ে না—কবে—কোথায়..."

মাথার টুপিটি অধীরভাবে খুলিয়া ফেলিয়া আমি ব্যগ্রস্বরে কহিতে লাগিলাম, "মনে পড়ে না? সেই উপত্যকায় তোমরা একদল যাযাবর এসেছিলে, তোমাদের সঙ্গে ঘোড়া উট ছিল, তোমরা আগুন জ্বেলে মাংস সিদ্ধ করে খেতে। হ্রদের জলে যে লম্বা ঘাস জন্মাতো, তার শস্য থেকে চাল তৈরি করতে তুমিই যে আমায় শিখিয়েছিলে! ভেড়ার লোম থেকে কাপড় বোনবার কৌশল যে আমি তোমার কাছ থেকেই শিখেছিলুম! মনে পড়ে না? একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমরা তোমাদের আক্রমণ করলুম! তোমার দলের সব পুরুষ মরে গেল! তোমাকে নিয়ে আমি যখন পালাচ্ছিলুম, তুমি লোহার ছুরি দিয়ে আমার কপালে ঠিক এইখানে মারলে!"

কপালের দিকেই রুমা একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। আমার মনে ছিল না যে, কপালের ঠিক ঐ স্থানটিতেই আমার একটা রক্তবর্ণ জড়ুল আছে। কপালে হাত পড়িতেই স্মরণ হইল, নিজেই চমকিয়া উঠিলাম। বহু পূর্বজন্মে যেখানে রুমার ছুরিকাঘাতে ক্ষত হইয়াছিল, প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় বিধানে ইহজন্মে তাহা রক্তবর্ণ জড়ুলরূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে! রুমা সেই চিহ্নটার দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া আমার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, "গাক্কা! গাক্কা!"

গাক্কা! হাঁ, ঐ বিকট শব্দটাই তখন আমার নাম ছিল। বজ্রকঠিন বন্ধনে তাহাকে বুকের ভিতর চাপিয়া লইলাম, বলিলাম, "হ্যাঁ, গাক্কা—তোমার গাক্কা। চিনতে পেরেছ, রুমা! ওঃ, আমার জন্মজন্মান্তরের রুমা!"

কতক্ষণ এইভাবে কাটিল, বলিতে পারি না। এক সময় সযত্নে তাহার মুখখানি বুকের উপর হইতে তুলিয়া ধরিয়া দেখিলাম,— রুমা মূর্ছা গিয়াছে।

তিত্তিকে লইয়া হুড়ার সহিত আমার যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিত্তিকে আমি ভালোবাসিতাম না, তাহাকে দেখিলে আমার বুকের রক্ত গরম হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে ছিল আমাদের জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠা যুবতী,— সুন্দরী-কুলের রানী। আর আমি ছিলাম যুবকদের মধ্যে

প্রধান, আমার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সুতরাং তিত্তিকে যে আমি গ্রহণ করিব এ বিষয়ে কাহারও মনে কোনও সন্দেহ ছিল না— আমারও ছিল না।

আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে নারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। আমরা জোয়ান ছিলাম প্রায় দুই শত, কিন্তু গ্রহণযোগ্যা যুবতী ছিল মাত্র পঞ্চাশটি। তাই নারী লইয়া যুবকদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের ডাইনী বুড়ি রিক্‌খা তাহার গুহার সম্মুখের উঁচু পাথরের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া সমস্ত দিন গান করিত—

"আমাদের দেশে মেয়ে নেই! আমাদের ছেলেদের সঙ্গিনী নেই! এ জাত মরবে— এ জাত মরবে! হে পাহাড়ের দেবতা, বর্ষার স্রোতে যেমন পোকা ভেসে আসে, তেমনই অসংখ্য মেয়ে পাঠাও। এ জাত মরবে! মেয়ে নেই— মেয়ে নেই!..."

রিক্‌খার দন্তহীন মুখের স্খলিত কথাগুলি গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া অশরীরী দৈববাণীর মতো বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইত।

সঙ্গিনীর জন্য সকলে পরস্পর লড়াই করিত বটে, কিন্তু তিত্তির দেহে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করে নাই। দূর হইতে লোলুপ ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া সকলে সরিয়া যাইত। তিত্তির রূপ দেখিবার মতো বস্তু ছিল। উজ্জ্বল নব-পল্লবের মতো বর্ণ, কালো হরিণের মতো চোখ, কঠিন নিটোল যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ— ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা! তাহার প্রকৃতিও ছিল অতিশয় চপল। সে নির্জন পাহাড়ের মধ্যে গিয়া তরুবেষ্টিত কুঞ্জের মাঝখানে আপন মনে নৃত্য করিত। নৃত্য করিতে করিতে তাহার অজিন শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িত, কিন্তু তাহার নৃত্য থামিত না। বৃক্ষগুল্মের অন্তরাল হইতে অদৃশ্য চক্ষু তাহার নিরাবরণ দেহ বিদ্ধ করিত। কিন্তু তিত্তি দেখিয়াও দেখিত না— শুধু নিজ মনে অল্প অল্প হাসিত। সে ছিল কুহকময়ী চিরন্তনী নারী।

আমার মন ছিল শিকারের দিকে, তাই আমি তিত্তির চপলতা ও স্বৈরাচার গ্রাহ্য করিতাম না। কিন্তু ক্রমে আমারও অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার কারণ হুড়া। হুড়া ছিল আমারই মতো একজন যুবক, কিন্তু সে অন্যান্য যুবকদের মতো আমাকে ভয় করিত না। সে অত্যন্ত হিংস্র ও ক্রূরপ্রকৃতির ছিল, তাই শক্তিতে আমার সমকক্ষ না হইলেও আমি তাহাকে মনে মনে সম্ভ্রম করিয়া চলিতাম। সেও আমাকে ঘাঁটাইত না, যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিত। কিন্তু তিত্তিকে লইয়া সে এমন ব্যবহার আরম্ভ করিল যে, আমার অহংকারে ভীষণ আঘাত লাগিল। সে নিঃসংকোচ তিত্তির পাশে গিয়া বসিত, তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিত, চুল ধরিয়া টানিত, তাহার কান হইতে পাকা বদরী ফলের অবতংস দাঁত দিয়া খুলিয়া খাইয়া ফেলিত। তিত্তিও হাসিত, মারিত, ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত,.কিন্তু সত্যিকার ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হুড়াকে নিরুৎসাহ করিত না।

এইরূপে হুড়ার সহিত আমার লড়াই অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল।

সেদিন প্রকাণ্ড একটা বরাহের পিছনে পিছনে বহু ঊর্ধ্বে পাহাড়ের প্রায় চূড়ার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। হাতে তীরধনুক ছিল। কিন্তু বরাহটাকে মারিতে পারিলাম না। সোজা যাইতে যাইতে সহসা সে একটা বিবরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। হতাশ হইয়া ফিরিতেছি, এমন সময় চোখে পড়িল, নীচে কিছুদূরে একটি সমতল পাথরের উপর দু'টি মানুষ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি বসিয়া আছে। স্থানটি এমনই সুরক্ষিত যে, উপর হইতে ছাড়া অন্য কোন দিক্ হইতে দেখা যায় না। মানুষ দু'টির একটি স্ত্রী, অন্যটি পুরুষ। ইহারা কে, চিনিতে বিলম্ব হইল না— তিত্তি এবং হুড়া! তিত্তির মাথা হুড়ার স্কন্ধের উপর ন্যস্ত, হুড়ার একটা হাত তিত্তির কোমর জড়াইয়া আছে। দুইজনে মৃদুকণ্ঠে হাসিতেছে ও গল্প করিতেছে।

আমি সাবধানে পিঠ হইতে হরিণের শিঙের তীরটি বাছিয়া লইলাম। এটি আমার সবচেয়ে ভালো তীর, আগাগোড়া হরিণের শিং দিয়া তৈয়ারি, যেমন ধারালো তেমনই ঋজু। এ তীরের

লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না। আজ তিত্তি ও হুড়াকে এক তীরে গাঁথিয়া ফেলিব।

ধনুকে তীর সংযোগ করিয়াছি, এমন সময় তিত্তি মুখ ফিরাইয়া উপর দিকে চাহিল। পরক্ষণেই অস্ফুট চিৎকার করিয়া সে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া একটা প্রস্তরখণ্ডের পিছনে লুকাইল. হুড়াও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সে হিংস্র জন্তুর মতো দাঁত বাহির করিল ; গর্জন করিয়া কহিল, "গাক্কা, তুই চলে যা, আমার কাছে আসিস্ না। আমি তোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো!"

আমি ধনুঃশর ফেলিয়া নীচে নামিয়া গেলাম, হুড়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গর্বিতভাবে বলিলাম, "হুড়া, তুই পালিয়ে যা! আর যদি কখনও তিত্তির গায়ে হাত দিবি, তোর হাত-পা মুচড়ে ভেঙে পাহাড়ের ডগা থেকে ফেলে দেব। পাহাড়ের ফাঁকে মরে পড়ে থাকবি, শকুনি তোর পচা মাংস ছিঁড়ে খাবে।"

হুড়ার চোখ দু'টা রক্তবর্ণ হইয়া ঘুরিতে লাগিল, সে দন্ত কড়মড় করিয়া বলিল, "গাক্কা, তিত্তি আমার : সে তোকে চায় না, আমাকে চায়। তুই যদি তার দিকে তাকাস্, তোর চোখ উপড়ে নেব। কেন এখানে এসেছিস্, চলে যা! তিত্তি আমার, তিত্তি আমার।" —বলিয়া ক্রোধান্ধ হুড়া নিজের বক্ষে সজোরে চপেটাঘাত করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "তুই তিত্তিকে আমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছিস্। যদি পারিস্ কেড়ে নে :—আয়, লড়াই কর্!"

হুড়া দ্বিতীয় আহ্বানের অপেক্ষা করিল না, বন্য শূকরের মতো আমাকে আক্রমণ করিল।

তখন সেই চত্বরের ন্যায় সমতল ভূমির উপর ঘোর যুদ্ধ বাধিল। দুইটি ভল্লুক সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া গেলে যেভাবে যুদ্ধ করে, আমরাও সেইভাবে যুদ্ধ করিলাম। সেই আদিম যুদ্ধ, যখন নখ-দন্ত ভিন্ন অন্য অস্ত্র প্রয়োজন হইত না। হুড়া কামড়াইয়া আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল, সর্বাঙ্গ দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, শক্তিতে সে আমার সমকক্ষ ছিল না। আমি ধীরে ধীরে তাহাকে নিস্তেজ করিয়া আনিলাম। তারপর তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিলাম।

নিকটেই একখণ্ড পাথর পড়িয়াছিল। দুই হাতে সেটা তুলিয়া লইয়া হুড়ার মাথা গুঁড়া করিয়া দিবার জন্য ঊর্ধ্বে তুলিয়াছি, হঠাৎ বিকট চিৎকার করিয়া রাক্ষসীর মতো তিত্তি আমার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। দুই হাতের আঙুল আমার চোখের মধ্যে পুরিয়া দিয়া প্রখর দন্তে আমার একটা কান কামড়াইয়া ধরিল।

বিস্ময়ে, যন্ত্রণায় আমি হুড়াকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তিত্তি কিন্তু গিরগিটির মতো আমার পিঠ আঁকড়াইয়া রহিল। চোখ ছাড়িয়া দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু কান ছাড়িল না। ওদিকে হুড়াও ছাড়া পাইয়া সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিল। দুইজনের মধ্যে পড়িয়া আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

তিত্তিকে পিঠ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হাত-পা দিয়া সে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে যে, সে নাগপাশ হইতে মুক্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব। তাহার উপর কান কামড়াইয়া আছে, ছাড়ে না। এদিকে হুড়া আমার পরিত্যক্ত প্রস্তরখণ্ডটা তুলিয়া লইয়া আমারই মস্তক চূর্ণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমার আর সহ্য হইল না, রণে ভঙ্গ দিলাম। রাক্ষসীটাকে পিঠে করিয়াই পলাইতে আরম্ভ করিলাম।

অসমতল পাহাড়ের উপর একটা উলঙ্গ উন্মত্ত ডাকিনীকে পিঠে লইয়া দৌড়ানো সহজ কথা নহে। কিন্তু কিছুদূর গিয়া সে আপনা হইতেই আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমার কর্ণ ত্যাগ করিয়া পিঠ হইতে পিছলাইয়া নামিয়া পড়িল। আমি আর ফিরিয়া তাকাইলাম না। পিছনে তিত্তি

চিৎকার করিয়া হাসিয়া করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল।—

"গাক্কা ভীতু, গাক্কা কাপুরুষ। গাক্কা মরদ নয়! সে কোন্ সাহসে তিত্তিকে পেতে চায়? তিত্তি হুড়ার বৌ! হুড়া তিত্তিকে গাক্কার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, তিত্তির ভয়ে গাক্কা পালিয়েছে। গাক্কা ভীতু! গাক্কাকে দেখে সবাই হাসবে। গাক্কা আর মানুষের কাছে মুখ দেখাবে না। গাক্কা কাপুরুষ! গাক্কা মরদ নয়!"—তিত্তির এই তীব্র শ্লেষ রক্তাক্ত কর্ণে শুনিতে শুনিতে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইলাম।

সেই দিন, সূর্য যখন উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িল, তখন আমি চুপি চুপি নিজের গুহা হইতে পাথরের ফলকযুক্ত বর্শাটি লইয়া গোষ্ঠী পরিত্যাগ করিলাম। তিত্তিকে হারাইয়া আমার দুঃখ হয় নাই, কিন্তু গ্রামের সকলে, যাহারা এত কাল আমাকে ভয় করিয়া চলিত, তাহারা আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উপহাস করিবে, তিত্তি করতালি দিয়া হাসিবে, ইহা সহ্য করা অপেক্ষা গোষ্ঠী ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। উপত্যকার পরপারে ঐ যেখানে সূর্য ঢাকা পড়িল, ওখানে একটি ছোট গুহা আছে, একদিন শিকার করিতে গিয়া উহা আবিষ্কার করিয়াছিলাম। গুহার পাশ দিয়া একটি সরু ঝরনা নামিয়াছে, তাহার জল চাকভাঙা মধুর মতো মিষ্ট। ওদিকে শিকারও বেশি পাওয়া যায়। এদিক হইতে তাড়া খাইয়া প্রায় সকল জন্তুই ওদিকে গিয়া জমা হয়, সুতরাং ঐখানে গিয়া বাস করিব।

গ্রাম ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিতেছি, তখন শুনিতে পাইলাম, বুড়ি ডাইনী রিক্থা তাহার চাতালে বসিয়া গাহিতেছে—

"মেয়ে নেই! মেয়ে নেই! আমাদের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরছে। এ জাত বাঁচবে না। হে পাহাড়ের দেবতা, মেয়ে পাঠাও..."

উপত্যকা পার হইয়া ওদিকের পাহাড়ে পৌঁছিতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল। আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদটা ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতেছে, দুই-তিন দিনের মধ্যেই নিটোল আকার ধারণ করিবে। এখন শরৎকাল, আকাশে মেঘ সাদা ও হাল্কা হইয়াছে, আর বৃষ্টি পড়ে না। উপত্যকার মাঝখানে হ্রদ,—ঠিক মাঝখানে নহে, একটু পশ্চিম দিক্ ঘেঁষিয়া, —তাহার কিনারায় লম্বা লম্বা ঘাস জন্মিয়াছে। ঘাসের আগায় শীষ গজাইয়া হেলিয়া পড়িয়াছে। আর কিছু দিন পরে ঐ শীষ পীতবর্ণ হইলে উত্তর হইতে পাখিরা আসিতে আরম্ভ করিবে।

হ্রদের ধার দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, হরিণের দল জল পান করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের মসৃণ গায়ে চাঁদের আলো চকচক করিয়া উঠিল। ক্রমে যেখানে আমার ক্ষীণা ঝরনাটি হ্রদের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখানে আসিয়া পড়িলাম। এদিকে হ্রদের জল প্রায় পাহাড়ের কোল পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে, মধ্যে ব্যবধান পঞ্চাশ হাতের বেশি নহে। সম্মুখেই পাহাড়ের জঙ্ঘার একটা খাঁজের মধ্যে আমার গুহা। আমি ঝরনার পাশ দিয়া উঠিয়া যখন আমার নূতন গৃহের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন চাঁদের অপরিপুষ্ট চক্রটি গুহার পিছনে উচ্চ পাহাড়ের অন্তরালে লুকাইল।

নূতন গৃহে নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে আমি একাকী মনের আনন্দে বাস করিতে লাগিলাম। কাহারও সহিত দেখা হয় না— হরিণের অন্বেষণেও এদিকে কেহ আসে না। তাহার প্রধান কারণ, পাহাড়-দেবতার করাল মুখের এত কাছে কেহ আসিতে সাহস করে না। আমাদের জাতির মধ্যে এই চক্রাকৃতি পর্বতশ্রেণী একটি অতিকায় অজগর বলিয়া পরিচিত ছিল, এই অজগরই আমাদের পর্বত-দেবতা। পর্বত-দেবতার মুখ ছিল দংষ্ট্রাবহুল অন্ধকার একটা গহ্বর। বস্তুত, দূর হইতে দেখিলে মনে হইত, যেন শল্কাবৃত বিশাল একটা সরীসৃপ কুণ্ডলিত হইয়া তাহার ব্যাদিত

মুখটা মাটির উপর রাখিয়া শুইয়া আছে। প্রাণান্তেও কেহ এই গহ্বরমুখের কাছে আসিত না।

গ্রীষ্মের অবসানে যখন আকাশে মেঘ আসিয়া গর্জন করিত, তখন আমাদের পাহাড়-দেবতাও গর্জন করিতেন। উপত্যকা জলে ভরিয়া উঠিলে তৃষ্ণার্ত দেবতা ঐ মুখ দিয়া জল শুষিয়া লইতেন। আমাদের গোষ্ঠী হইতে বর্ষা-ঋতুর প্রাক্কালে দেবতার প্রীত্যর্থে জীবন্ত জীবজন্তু উৎসর্গ করা হইত। দেবতার মুখের নিকটে কেহ যাইতে সাহসী হইত না— দূর হইতে দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া জন্তুগুলা ছাড়িয়া দিত। জন্তুগুলাও দেবতার ক্ষুধিত নিশ্বাসের আকর্ষণে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার মুখে প্রবেশ করিত। দেবতা প্রীত হইয়া তাহাদিগকে ভোজন করিতেন।

দেবতার এই ভোজনরহস্য কেবল আমি ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম ; কিন্তু কাহাকেও বলি নাই। আমি দেখিয়াছিলাম, জন্তুগুলা কিছুকাল পরে দেবতার মুখ হইতে অক্ষতদেহে বাহির হইয়া আসে এবং স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে করিতে পাহাড়ে ফিরিয়া যায়। পর্বত-দেবতার মুখ যে প্রকৃতপক্ষে একটা বড় গহ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, তাই তাহার নিকট যাইতে আমার ভয় করিত না। একবার কৌতূহলী হইয়া উহার ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু গহ্বরের মুখ প্রশস্ত হইলেও উহার ভিতরটা অত্যন্ত অন্ধকার, এজন্য বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কিন্তু রন্ধ্র যে বহুদূর বিস্তৃত, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

এই পাহাড়-দেবতার মুখ আমার গুহা হইতে প্রায় তিন শত হাত দূরে উত্তরে পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত। এ-প্রান্তে দেবতার ভয়ে কেহ আসে না, অথচ এদিকে শিকারের যত সুবিধা, অন্য দিকে তত নহে। রাত্রিতে ঝরনা ও হ্রদের মোহনায় লুকাইয়া থাকিলে যত ইচ্ছা শিকার পাওয়া যায়— শিকারের জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। আমার গুহাটি এমনই চমৎকার যে, অত্যন্ত কাছে আসিলেও ইহাকে গুহা বলিয়া চেনা যায় না। গুহার মুখটি ছোট— লতাপাতা দিয়া ঢাকা ; কিন্তু ভিতরটি বেশ সুপ্রসর। ছাদ উঁচু— দাঁড়াইলে মাথা ঠেকে না ; মেঝেটি একটি আস্ত সমতল পাথর দিয়া তৈয়ারি। তাহার উপর লম্বাভাবে শুইয়া রন্ধ্রপথে মুখ বাড়াইলে সমস্ত উপত্যকাটি চোখের নীচে বিছাইয়া পড়ে। শীতের সময় একটা পাথর দিয়া স্বচ্ছন্দে গুহামুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া রাত্রিকালে হিংস্র জন্তুর অতর্কিত আক্রমণও এই উপায়ে প্রতিরোধ করা যায়।

এইখানে নিঃসঙ্গ শান্তিতে আমার কয়েকদিন কাটিয়া গেল। আকাশের চাঁদ নিটোল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া আবার ক্ষীণ হইতে হইতে একদিন মিলাইয়া গেল। হ্রদের কিনারায় লম্বা ঘাসের শস্য পাকিয়া রং ধরিতে আরম্ভ করিল। পাখির ঝাঁক একে একে আসিয়া হ্রদের জলে পড়িতে লাগিল ; তাহাদের মিলিত কণ্ঠের কলধ্বনি আমার নিশীথ নিদ্রাকে মধুর করিয়া তুলিল।

একদিন অপরাহ্ণে, আমার গুহার পাশে ঝরনা যেখানে পাহাড়ের এক ধাপ হইতে আর এক ধাপে লাফাইয়া পড়িয়াছে, সেই পৈঠার উপর বসিয়া আমি একটা নূতন ধনুক নির্মাণ করিতেছিলাম। দুই দিন আগে একটা হরিণ মারিয়াছিলাম, তাহারই অন্ত্রে ধনুকের ছিলা করিব বলিয়া জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলাম। পাহাড়ে একপ্রকার মোটা বেত জন্মায়, তাহাতে খুব ভালো ধনুক হয়, সেই বেত একটা ভাঙিয়া আনিয়া শুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। উপস্থিত আমার বর্শার ধারালো পাথরের ফলা দিয়া তাহারই দুই দিকে গুণ লাগাইবার খাঁজ কাটিতেছিলাম। অস্তমান সূর্যের আলো আমার ঝরনার জলে রক্ত মাখাইয়া দিয়াছিল ; নীচে হ্রদের জলে পাখিগুলি ডাকাডাকি করিতেছিল। ঝরনার চূর্ণ জলকণা নীচের ধাপ হইতে বাষ্পাকারে উঠিয়া অত্যন্ত মিঠাভাবে আমার অনাবৃত অঙ্গে লাগিতেছিল। মুখ নত করিয়া আমি আপন মনে ধনুকে গুণ-সংযোগে নিযুক্ত ছিলাম।

হঠাৎ একটা অশ্রুতপূর্ব চিঁহি-চিঁহি শব্দে চোখ তুলিয়া উপত্যকার দিকে চাহিতেই বিস্ময়ে একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গেলাম। এ কি! দেখিলাম, পাহাড়-দেবতার মুখবিবর হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর মতো একজাতীয় অদ্ভুত মানুষ ও ততোধিক অদ্ভুত জন্তু বাহির হইতেছে। এরূপ মানুষ ও এরূপ জন্তু জীবনে কখনও দেখি নাই।

আগন্তুকগণ বহু নিম্নে উপত্যকায় ছিল, অতদূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি আমি সন্তর্পণে বুকে হাঁটিয়া ঝরনার তীর হইতে আমার গুহায় ফিরিয়া আসিয়া লুকাইলাম। গুহার মধ্যে লুকাইয়া দ্বারপথে মুখ বাড়াইয়া নবাগতদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

মানুষ হইলেও ইহারা যে আমার সগোত্র নহে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। বাহিরের কোনও অজ্ঞাত জগৎ হইতে রন্ধ্রপথে আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও অস্পষ্টভাবে অনুভব করিলাম। কিন্তু যেখান হইতেই আসুক, এমন আশ্চর্য চেহারা ও বেশভূষা যে হইতে পারে তাহা কখনও কল্পনা করি নাই। জন্তুদের কথা পরে বলিব, প্রথমে মানুষগুলার কথা বলি। এই মানুষগুলার গায়ের রং আমাদের মতো মধুপিঙ্গল বর্ণ নহে— ধবধবে সাদা। ইহাদের চুল সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটার ন্যায় উজ্জ্বল, দেহ অতিশয় দীর্ঘ ও সুগঠিত। পশুচর্মের পরিবর্তে ইহাদের দেহ একপ্রকার শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত। ইহারা সংখ্যায় সর্বসুদ্ধ প্রায় একশত জন ছিল, তাহার মধ্যে অর্ধেক নারী। নারীগণও পুরুষদের মতো উজ্জ্বল কেশযুক্ত ও দীর্ঘাকৃতি। তাহারা বস্ত্র দ্বারা বক্ষোদেশ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষদের হাতে ধনুর্বাণ ও ভল্ল আছে, ভল্লের ফলা সূর্যের আলোয় ঝকমক করিতেছে। বর্শার ফলা এমন ঝকমক করিতে পূর্বে কখনও দেখি নাই।

ইহাদের সঙ্গে তিন প্রকার জন্তু রহিয়াছে। প্রথমত, একপ্রকার বিশাল অথচ শীর্ণকায় জন্তু— তাহাদের পিঙ্গলবর্ণ দেহ আশ্চর্যভাবে ঢেউখেলানো; দেহের সন্ধিগুলা যেন অত্যন্ত অযত্ন সহকারে সংযুক্ত হইয়াছে, মুখ কদাকার। পিঠের উপর প্রকাণ্ড কুঁজ। ইহাদের পৃষ্ঠে নানাপ্রকার দ্রব্য চাপানো রহিয়াছে। উদ্‌গ্রীবভাবে গলা বাড়াইয়া ইহারা মন্থরগতিতে চলিয়াছে। দ্বিতীয় জাতীয় জন্তু ইহাদের অপেক্ষা অনেক ছোট, তাহাদের দেহ রোমশ ও রক্তবর্ণ, আঁটসাঁট মজবুত গঠন। ইহারা দেখিতে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু পৃষ্ঠে বড় বড় বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে। উপরন্তু বহু মনুষ্য-শিশুও ইহাদের পিঠের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। এই জন্তুগুলাই গুহামুখ হইতে হ্রদ দেখিয়া অদ্ভুত শব্দ করিয়াছিল।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্তু সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, দেখিতে কতকটা পাহাড়ী ছাগের মতো, কিন্তু ইহাদের দেহ ঘন রোমে আবৃত। এমন কি, ইহাদের রোম পেটের নীচে পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ইহারা একসঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে চলিয়াছে ও মাঝে মাঝে 'ব্যা-ব্যা' শব্দ করিতেছে।

এই সকল জন্তুর আচরণে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু এই যে, ইহারা মানুষ দেখিয়া তিলমাত্র ভয় পাইতেছে না, বরং মানুষের সঙ্গে পরম ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া চলিয়াছে। মানুষ ও বন্যপশুর মধ্যে এরূপ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইতে এই প্রথম দেখিলাম।

আগন্তুকের দল গুহাবিবর হইতে বাহির হইয়াই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। মানুষগুলা হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া নানাপ্রকার বিস্ময়সূচক অঙ্গভঙ্গি করিতেছিল ও উত্তেজিতভাবে পরস্পরের সহিত কথা কহিতেছিল। তাহাদের কথা এতদূর হইতে শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু তাহারা এই উপত্যকার সন্ধান পাইয়া যে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। তাহাদের মধ্যে একজন হ্রদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তারস্বরে একটা শব্দ বারংবার উচ্চারণ করিতেছিল, শুধু তাহাই ক্ষীণভাবে কানে আসিল— "বিহি, বিহি!" বোধ হইল যেন হ্রদের ধারে লম্বা ঘাসগুলাকে লক্ষ্য করিয়া সে ঐ কথাটা বলিতেছে।

ইহারা স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া কিছুক্ষণ কি জল্পনা করিল, তারপর সদলবলে আমার ঝরনার মোহানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝিলাম, তাহারা এই স্থানেই ডেরাডাণ্ডা গাড়িবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। দিবাশেষের নির্বাপিতপ্রায় আলোকে ইহারা ঠিক আমার গুহার নিম্নে— ঝরনার জল যেখানে পাহাড় হইতে নামিয়া স্বচ্ছ অগভীর স্রোতে উপত্যকার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া হ্রদের জলে মিশিয়াছে, সেই স্থানে আসিয়া পশুগুলির পৃষ্ঠ হইতে ভার নামাইল। ভারমুক্ত পশুগুলি ঝরনার প্রবাহের পাশে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তৃষ্ণার্তভাবে জল পান করিতে লাগিল।

ইহারা আমার এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, এই প্রদোষালোকেও আমি প্রত্যেকের মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। আমার গুহা হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে বোধ করি তাহাদের মাথায় ফেলিতে পারিতাম। তাহাদের কথাবার্তাও স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু একবর্ণও বোধগম্য হইতেছিল না।

রাত্রি হইল। তখন ইহারা এক আশ্চর্য ব্যাপার করিল। একখণ্ড পাথরের সহিত আর একখণ্ড অজ্ঞাত পদার্থ ঠোকাঠুকি করিয়া স্তূপীকৃত শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিল। অগ্নি জ্বলিয়া অঙ্গারে পরিণত হইলে সেই অঙ্গারে মাংস পুড়াইয়া সকলে আহার করিতে লাগিল। দগ্ধ মাংসের একপ্রকার অপূর্ব গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া জিহ্বাকে লালায়িত করিয়া তুলিল।

রাত্রি গভীর হইলে ইহারা পশুগুলির দ্বারা অগ্নির চারিপাশে একটি বৃহৎ চক্রব্যূহ রচনা করিল, তারপর সেই চক্রের ভিতর অগ্নির পাশে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল একজন লোক ধনুর্বাণ হাতে লইয়া ব্যূহের বাহিরে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

ইহারা ঘুমাইল বটে, কিন্তু বিস্ময়ে উত্তেজনায় আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম। এই বিচিত্র জাতির অতি বিস্ময়কর আচার-ব্যবহার মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে তাহাদের ক্রমশ নির্বাণোন্মুখ অগ্নির দিকে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই আগন্তুকরা কাজে লাগিয়া গেল। ইহারা অসাধারণ উদ্যমী ; একদল পুরুষ উপত্যকার উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথরের টুকরা গড়াইয়া আনিয়া প্রাচীর-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইল, আর একদল ধনুর্বাণ-হস্তে শিকারের অন্বেষণে পাহাড়ে উঠিয়া গেল। অবশিষ্ট অল্পবয়স্ক বালকগণ পশুগুলাকে লইয়া উপত্যকার শষ্পাচ্ছাদিত অংশে চরাইতে লইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরাও অলসভাবে বসিয়া রহিল না, তাহারা হ্রদের জলে নামিয়া লম্বা ঘাসের পাকা শীষগুলি কাটিয়া আনিয়া রৌদ্রে শুকাইতে লাগিল। এইরূপে মৌমাছি-পরিপূর্ণ মধুচক্রের মতো এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কর্ম-প্রেরণায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে আমার দৃষ্টির সম্মুখে চক্রাকৃতি প্রস্তর-প্রাচীর গড়িয়া উঠিল। সন্ধ্যার পূর্বেই প্রাচীর কোমর পর্যন্ত উঁচু হইল। কেবল হ্রদের দিকে দুই হস্ত-পরিমিত স্থান নির্গমনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইল। সন্ধ্যার সময় শিকারীরা একটা বড় হরিণ ও দুটা শূকর মারিয়া বর্শাদণ্ডে ঝুলাইয়া লইয়া আসিল। তখন সকলে আনন্দ-কোলাহল সহকারে অগ্নি জ্বালিয়া সেই মাংস দগ্ধ করিয়া আহারের আয়োজন করিতে লাগিল।

আর একটা অভিনব ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম। নারীগণ একপ্রকার বর্তুলাকৃতি পাত্র কক্ষে লইয়া ঝরনার তীরে আসিতেছে এবং সেই পাত্রে জল ভরিয়া পুনশ্চ কক্ষে করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহারা কেহই ঝরনায় মুখ ডুবাইয়া কিংবা অঞ্জলি করিয়া জল পান করে না, প্রয়োজন হইলে সেই পাত্র হইতে জল ঢালিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে।

আর একটা রাত্রি কাটিয়া গেল, নবাগতগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিল। ভাব দেখিয়া বোধ হইল, এই উপত্যকাটি তাহাদের বড়ই পছন্দ হইয়াছে, সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার আশু অভিপ্রায় তাহাদের নাই। আর একটা মনুষ্য জাতি যে সন্নিকটেই বাস করিতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই ; এবং সেই জাতির এক পলাতক যুবা যে অলক্ষ্যে থাকিয়া অহরহ তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছে, তাহা সন্দেহ করিবারও কোনও উপলক্ষ হয় নাই। দিনের বেলা আলো থাকিতে আমি কদাচ গুহা হইতে বাহির হইতাম না।

এইরূপে আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। বরাহদন্তের মতো বাঁকা চাঁদ আবার পশ্চিম আকাশে দেখা দিল।

ইহাদের মধ্যে যে-সব রমণী ছিল, তাহারা সকলেই সমর্থা ; বৃদ্ধা বা অকর্মণ্যা কেহ ছিল না। নারীগণ অধিকাংশই সন্তানবতী এবং কোনও-না-কোনও পুরুষের বশবর্তিনী ; কিন্তু কয়েকটি আসন্নযৌবনা কিশোরী কুমারীও ছিল। ইহাদের ভিতর হইতে একটি কিশোরী প্রথম হইতেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

এই কিশোরীর নাম আমি জানিতে পারিয়াছিলাম,— রুমা। রুমা বলিয়া ডাকিলেই সে সাড়া দিত। রুমার রূপ কেমন ছিল, তাহা আমি বলিতে পারিব না। যে-চোখে দেখিলে নিরপেক্ষ রূপবিচার সম্ভব হয়, আমি তাহাকে সে-চোখে দেখি নাই। আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম যৌবনের চক্ষু দিয়া—লোভের চক্ষু দিয়া। আমার কাছে সে ছিল আকাশের ঐ আভুগ্ন চন্দ্রকলাটির মতো সুন্দর। তিত্তি তাহার পায়ের নখের কাছে লাগিত না।

এই রুমার চরিত্র অন্যান্য বালিকা হইতে কিছু স্বতন্ত্র ছিল। কৈশোরের গন্ডি অতিক্রম করিয়া সে প্রায় যৌবনের প্রান্তে পদার্পণ করিয়াছিল, তাই তাহার চরিত্রে উভয় অবস্থার বিচিত্র সম্মিলন হইয়াছিল। সে অন্যান্য নারীদের সঙ্গে যথারীতি কাজ করিত বটে, কিন্তু একটু ফাঁক পাইলেই লুকাইয়া খেলা করিয়া লইত। তাহার সঙ্গিনী বা সখী কেহ ছিল না, সে একাকী খেলা করিতে ভালোবাসিত। কখনও হ্রদের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিত, সাঁতার কাটিতে কাটিতে বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া যাইত। তাহাকে আসিতে দেখিয়া জলে ভাসমান পাখিগুলি উড়িয়া আর একস্থানে গিয়া বসিত। সে জলে ডুব দিয়া একেবারে তাহাদের মধ্যে গিয়া মাথা তুলিত, তখন পাখিরা ভয়সূচক শব্দ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।

কিন্তু এ খেলাও তাহার মনঃপূত হইত না। কারণ, তাহার দেখাদেখি অন্যান্য বালক-বালিকারা জলে পড়িয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিত। সে তখন জল হইতে উঠিয়া সিক্ত কেশজাল হইতে জলবিন্দু মোচন করিতে করিতে অন্যত্র প্রস্থান করিত।

কখনও একটু অবসর পাইলে সে চুপি চুপি কোনও পুরুষের পরিত্যক্ত ধনুর্বাণ লইয়া পাহাড়ে উঠিয়া যাইত। আমি কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিতে পাইতাম না, তারপর আবার সে চুপি চুপি ফিরিয়া আসিত। দেখিতাম, চুলে বনফুলের গুচ্ছ পরিয়াছে, কর্ণে পক্ক ফলের দুল দুলাইয়াছে, কটিতে পুষ্পিত লতা জড়াইয়া দেহের অপূর্ব প্রসাধন করিয়াছে। ভীরু হরিণীর মতো এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিত, তারপর ঈষৎ হাসিয়া ত্রস্ত চকিত পদে প্রস্থান করিত। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সকলের অজ্ঞাতে একাকিনী কোনও কাজ করিতে পারিলেই সে খুশি হয়। ইহা যে তাহার বয়ঃসন্ধির একটা স্বভাবধর্ম, তাহা তখনও বুঝি নাই। কিন্তু আমার ব্যগ্র লোলুপ চক্ষু সর্বদাই তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতে থাকিত। এমন কি, রাত্রিকালে প্রস্তরব্যূহের মধ্যে ঠিক কোন্ স্থানটিতে সে শয়ন করিয়া ঘুমায়, তাহা পর্যন্ত আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই !

পাখিরা যেমন খড়কুটা দিয়া গাছের ডালে বাসা তৈয়ার করে, ইহারাও তেমন গাছের ডালপালা

দিয়া ব্যূহের মধ্যে একপ্রকার কোটর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বোধ হয় অধিক শীতের সময় উহার মধ্যে রাত্রিবাস করিবার সংকল্প ছিল। কিন্তু সেগুলির নির্মাণ তখনও শেষ হয় নাই, তাই উপস্থিত মুক্ত আকাশের তলেই শয়ন করিতেছিল।

ইহাদের আগমনের পঞ্চম দিনই বিশেষ স্মরণীয় দিন। আমার মনের মধ্যে যে অভিসন্ধি কয়েকদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, সেইদিন মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে যে তাহা এমন অচিন্তনীয়ভাবে ফলবান হইয়া উঠিবে, তাহা কে কল্পনা করিয়াছিল? আগন্তুকদের নির্ভয় অসন্দিগ্ধচিত্তে কোনও অমঙ্গলের ছায়াপাত পর্যন্ত হয় নাই। এ রাজ্যে যে অন্য মানুষ আছে, এ সন্দেহই তাহাদের মনে উদয় হয় নাই।

সেদিন দ্বিপ্রহরে পুরুষেরা সকলে নানা কার্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিল। এক দল শিকারে বাহির হইয়াছিল, আর এক দল কাষ্ঠ আহরণের জন্য পর্বতপৃষ্ঠস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল। বালকেরা পশুগুলিকে চরাইতে গিয়াছিল। নারীগণ শিশু কোলে লইয়া অর্ধ-নির্মিত দারু কোটরের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। হ্রদের জলে সূর্যকিরণ পড়িয়া চতুর্দিকে প্রতিফলিত হইতেছিল ও জল হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম বাষ্প উত্থিত হইতেছিল।

আমি অভ্যাসমত গুহামুখে শয়ান হইয়া ভাবিতেছিলাম, রুমাকে যদি হাতের কাছে পাই, তাহা হইলে চুরি করি। রাত্রিতে যে-সময় উহারা ঘুমায়, সে-সময় যদি চুরি করিয়া আনিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভালো হইত। কিন্তু একটা লোক সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেয়, তাহার উপর আবার আগুন জ্বলে। লোকটাকে তীর মারিয়া নিঃশব্দে মারিয়া ফেলিতে পারি— কেহ জানিবে না; কিন্তু আগুনের আলোয় চুরি করিতে গেলেই ধরা পড়িয়া যাইব। তার চেয়ে রুমাকে কোনও সময়ে যদি একেলা পাই,— সন্ধ্যার সময় নির্জনে যদি আমার গুহার কাছে আসিয়া পড়ে, তবে তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া পলায়ন করি। এ গুহা ছাড়িয়া তাহাকে লইয়া এমন স্থানে গিয়া লুকাইয়া থাকি যে, তাহার জাতি-গোষ্ঠীর কেহ আমাদের খুঁজিয়া পাইবে না।

সূর্যতাপে গুহার বায়ু উত্তপ্ত হইয়াছিল, আমি তৃষ্ণাবোধ করিতে লাগিলাম। পাশেই নির্ঝরিণী, গুহা হইতে বাহির হইয়া দুই পদ অগ্রসর হইলেই শীতল জল পাওয়া যায়; কিন্তু গুহার বাহিরে যাইলে পাছে নিম্নস্থ কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িয়া যাই, এই ভয়ে ইতস্তত করিতে লাগিলাম। কিন্তু তৃষ্ণা ক্রমে প্রবলতর হইতে লাগিল, তখন সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া বাহির হইলাম। উঠিয়া দাঁড়ানো অসম্ভব, দাঁড়াইলেই এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। আমি সন্তর্পণে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঝরনার দিকে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া দ্রুত নিজের কোটরে ফিরিয়া আসিয়া লুকাইলাম।

ঝরনার ধার দিয়া দিয়া রুমা উপরে উঠিয়া আসিতেছে। গুহামুখের লতাপাতার আড়ালে থাকিয়া আমি স্পন্দিতবক্ষে দেখিতে লাগিলাম। সে ধাপে ধাপে লাফাইয়া যেখানে ঝরনার জল প্রপাতেব মতো নীচে পড়িয়াছে, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

পূর্বে বলিয়াছি, আমার গুহার পাশেই ঝরনার জল প্রপাতের মতো নীচে পড়িয়াছে। যেখানে এই প্রপাত সবেগে উচ্ছলিত হইয়া পতিত হইয়াছে, সেইখানে পাথরের মাঝখানে একটি গোলাকার কুণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিল। এই নাতিগভীর গর্তটি পরিপূর্ণ করিয়া স্বচ্ছ জল আবার নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছিল। রুমা এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার সতর্কভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কক্ষ হইতে বর্তুলাকৃতি জলপাত্রটি নামাইয়া রাখিল, তারপর ধীরে ধীরে দেহের বস্ত্র উন্মোচন করিতে লাগিল।

অসন্দিগ্ধচিত্তা হরিণীর পানে অদূরবর্তী চিতাবাঘ যেরূপ লোলুপ ক্ষুধিতভাবে চাহিয়া থাকে, আমিও সেইভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্যকিরণে তাহার শুভ্র

যৌবনকঠিন দেহ হইতে যেন লাবণ্যের ছটা বিকীর্ণ হইতেছিল। বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া সে অলসভাবে দুই বাহু তুলিয়া তাহার সোমলতার মতো উজ্জ্বল কেশজাল জড়াইতে লাগিল। তারপর শূকরদন্তের মতো বাঁকা তীক্ষ্ণাগ্র একটা ঝকঝকে অস্ত্র পরিত্যক্ত বস্ত্রের ভিতর হইতে তুলিয়া লইয়া চুলের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

এইরূপে কুণ্ডলিত কুন্তলভার সংবরণ করিয়া রুমা শিলাপট্টের উপর হইতে ঝুঁকিয়া বোধ করি জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিবার চেষ্টা করিল। তারপর হর্ষসূচক একটি শব্দ করিয়া জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল।

দুর্নিবার কৌতূহল ও লোভের বশবর্তী হইয়া আমি নিজের অজ্ঞাতসারেই গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। ইহারা যেদিন প্রথম আসে সেদিন আমি যে শিলাপৈঠার উপর বসিয়া ধনুকে গুণ সংযোগ করিতেছিলাম, গিরগিটির মতো গুঁড়ি মারিয়া সেই পৈঠার উপর উপস্থিত হইলাম। ইহার দশ হাত নীচেই জলের কুণ্ড। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম রুমা আবক্ষ জলে ডুবাইয়া বসিয়া আছে এবং নিজের ভাষায় গুনগুন করিয়া গান করিতেছে। স্বচ্ছ নির্মল জলের ভিতর হইতে তাহার দেহখানি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। শীকরকণাস্পৃষ্ট চূর্ণকুন্তল বেষ্টিত মুখটি প্রস্ফুট জলপুষ্পের মতো দেখাইতেছে।

নির্নিমেষ-নয়নে এই নিভৃত স্নানরতার পানে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলাম, বলিতে পারি না। অগ্নিগর্ভ মেঘ আমার বুকের ভিতর গুরুগুরু করিতে লাগিল।

ক্রীড়াচ্ছলে দুই হাতে জল ছিটাইতে ছিটাইতে হঠাৎ এক সময় রুমা চোখ তুলিয়া চাহিল। তাহার গান ও হস্তসঞ্চালন একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। আমার বুভুক্ষু ভীষণ চক্ষুর সহিত তাহার বিস্ফারিত ভীত চক্ষু কিছুক্ষণ আবদ্ধ হইয়া রহিল। তারপর অস্ফুট চিৎকার করিয়া সে জল হইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল।

এই সুযোগ! আমি আর দ্বিধা না করিয়া উপর হইতে জলে লাফাইয়া পড়িলাম। রুমা তখনও জল হইতে উঠিতে পারে নাই, জল-কন্যার মতো তাহার সিক্ত শীতল দেহ আমি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলাম।

কিন্তু সিক্ত পিচ্ছিলতার জন্যই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না, সে তাহার দেহটিকে সংসর্পিত বিভঙ্গিত করিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া লইল, তারপর বিদ্যুদ্বেগে তীরে উঠিয়া এক হস্তে ভূপতিত বস্ত্র তুলিয়া লইয়া পশ্চাদ্দিকে একটা ভয়চকিত দৃষ্টি হানিয়া নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ব্যর্থ-মনোরথে নিজের গুহায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, নিম্নে ভীষণ গোলযোগ বাধিয়া গিয়াছে। অসংবৃতবস্ত্রা রুমা নারীগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া উত্তেজিতভাবে কথা কহিতেছে এবং অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া উপরদিকে দেখাইতেছে। নারীগণ সমস্বরে কলরব করিতেছে। ইতিমধ্যে একদল পুরুষ ফিরিয়া আসিল। তাহারা রুমার বিবৃতি শুনিয়া তীর-ধনুক ও বল্লম হস্তে দলবদ্ধভাবে আমার গুহার দিকে উঠিতে আরম্ভ করিল।

এই স্থানে থাকা আর নিরাপদ নহে দেখিয়া আমি গুহা ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম। গাছপালার আড়ালে লুকাইয়া, পাহাড়ের বন্ধুর পথ ধরিয়া বহুদূর দক্ষিণে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর এতদূর পর্যন্ত কেহ আমার অনুসরণ করিবে না বুঝিয়া এক ঝোপের মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এইখানে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ একটা কথা আমার মনে উদয় হইল। তীর-বিদ্ধের মতো আমি লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম— একথা এতদিন মনে হয় নাই কেন? শিরায় রক্ত নাচিয়া উঠিল, আমি দ্রুতপদে আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম।

আমাদের গ্রামের কিনারায় আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন গোধূলি আগতপ্রায়। দূর হইতে শুনিতে পাইলাম, ডাইনী বুড়ি রিক্‌খা গাহিতেছে—

"রাত্রে পাহাড়-দেবতার মুখে আগুন জ্বলে। কেউ দেখে না, শুধু আমি দেখি। দেবতা কি চায় ? মানুষ চায়— মানুষের তাজা রক্ত চায় ! এ জাত বাঁচবে না, এ জাত মরবে ! দেবতা রক্ত চায়— জোয়ানের তাজা রক্ত ! কে রক্ত দেবে— কে দেবতাকে খুশি করবে ! এ জাত মরবে— মেয়ে নেই ! এ জাত মরবে— দেবতা রক্ত চায় ! হে দেবতা, খুশি হও, তোমার মুখের আগুন নিবিয়ে দাও ! মেয়ে পাঠাও, মেয়ে পাঠাও !..."

রিক্‌খার গুহা গ্রামের এক প্রান্তে। চুপি চুপি পিছন হইতে গিয়া তাহার কানের কাছে বলিলাম, "রিক্‌খা, দেবতা তোর কথা শুনেছে— মেয়ে পাঠিয়েছে !"

রিক্‌খা চমকিয়া ফিরিয়া বলিল, "গাক্কা ! তুই ফিরে এলি ? ভেবেছিলাম, দেবতা তোকে নিয়েছে— কি বললি— আমার কথা দেবতা শুনেছে ?"

"হ্যাঁ, শুনেছে। দেবতা অনেক মেয়ে পাঠিয়েছে।...শোন্ রিক্‌খা, গাঁয়ের ছেলেদের গিয়ে বল্ যে, পাহাড়-দেবতার মুখ থেকে একপাল মানুষ বেরিয়েছে— তাদের মধ্যে অর্ধেক মেয়ে। রাত্রে উপত্যকার ওধারে যেখানে আগুন জ্বলে, সেইখানে ওরা থাকে। মেয়েদের চেহারা ঠিক ঐ চাঁদের মতো,— নীল তাদের চোখ, চুলে আলো ঠিক্‌রে পড়ে। আমি দেখেছি। তুই ছেলেদের বল্, যদি বৌ চায় আমার সঙ্গে আসুক। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। আমাদের গাঁয়ে যত জোয়ান আছে, সবাইকে ডাক। আজ রাত্তিরেই আমরা পুরুষগুলোকে মেরে ফেলে মেয়েদের কেড়ে নেব !"

আকাশে খণ্ডচন্দ্র তখন অস্ত গিয়াছে। আমরা প্রায় দুই শত জোয়ান অন্ধকারে গা ঢাকিয়া নিঃশব্দে আগন্তুকদের গৃহপ্রাচীরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। প্রাচীরের মধ্যে সকলে সুপ্ত— কোথাও শব্দ নাই। ধুনির আগুন জ্বলিয়া সূক্ষ্ম ভস্ম-আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে। তাহারই অস্ফুট আলোকে দেখিলাম, ছায়ামূর্তির মতো চারিজন প্রহরী সশস্ত্রভাবে প্রাচীরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুঝিলাম, আজ দ্বিপ্রহরে আমাকে দেখিবার পর ইহারা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে।

পূর্ব হইতেই স্থির ছিল। আমরা চারিজন তীরন্দাজ এক একটি প্রহরীকে বাছিয়া লইলাম। একসঙ্গে চারিটি ধনুকে টংকারধ্বনি হইল— অন্ধকারে চারিটি তীর ছুটিয়া গেল। আমার তীর প্রহরীর কণ্ঠে প্রবেশ করিয়া অপর দিকে ফুঁড়িয়া বাহির হইল। নিঃশব্দে প্রহরী ভূপতিত হইল।

তারপর বিকট কোলাহল করিয়া সকলে প্রাচীর আক্রমণ করিল। নৈশ নিস্তব্ধতা সহসা শতধা ভিন্ন হইয়া গেল।

আমি জানিতাম ব্যূহের কোন্ দিকে রুমা শয়ন করে। আমি সেই দিকে গিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখিলাম, ভিতরে সকলে জাগিয়া উঠিয়াছে, পুরুষগণ অস্ত্র লইয়া ব্যূহ-প্রাচীরের দিকে ছুটিতেছে। একজন পুরুষ দীর্ঘ বল্লম-আঘাতে অগ্নির ভস্মাচ্ছাদন দূর করিয়া দিল, অমনই লেলিহান আরক্তচ্ছটায় দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার পর রুমাকে যখন দেখিতে পাইলাম, তখন সে সদ্য নিদ্রা হইতে উঠিয়া হতবুদ্ধির মতো ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহার চারিপাশে সদ্যোত্থিতা নারীগণ আর্ত-ক্রন্দন করিতেছে। আমি লাফাইয়া গিয়া রুমার উপর পড়িলাম, তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। কয়েক পদ যাইতে না-যাইতে দেখিলাম, একজন পুরুষ শাণিত দীর্ঘ অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

রুমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আমি ক্ষিপ্রহস্তে মাটি হইতে একখণ্ড পাথর তুলিয়া লইয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া মারিলাম। মস্তকে আঘাত লাগিয়া সে মৃতবৎ পড়িয়া গেল। রুমা চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি আবার তাহাকে কাঁধে ফেলিয়া ছুটিলাম।

আমাদের দলের অন্য সকলে তখন প্রাচীর ডিঙাইয়া ভিতরে ঢুকিতেছে— ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। দুই পক্ষেরই মানুষ পড়িতেছে, মরিতেছে— কেহ আহত হইয়া বিকট কাতরোক্তি করিতেছে। আমি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সেখানে জীবিত কেহ নাই, কয়েকটি রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। দ্বার অতিক্রম করিতে যাইতেছি, এমন সময় রুমা সহসা যেন মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। নিজের কেশের মধ্যে হাত দিয়া সেই উজ্জ্বল বাঁকা অস্ত্রটা বাহির করিল, তারপর ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার করিয়া আমার কপালের পাশে সজোরে বসাইয়া দিল।

কপাল হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আমি আবার তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলাম। তাহার হাত হইতে অস্ত্রটা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নির্দয়ভাবে মাটিতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "তুই আমার বৌ! তুই আমার রুমা! এই রক্ত দিয়ে আমি তোকে আমার করে নিলাম!"— বলিয়া আমার ললাটস্রুত রক্ত হাতে করিয়া তাহার কপালে চুলে মাখাইয়া দিলাম।

ওদিকে তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে— বিপক্ষ দলের একটি পুরুষও জীবিত নাই। আমাদের দলের যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারা রক্তলিপ্ত দেহে উন্মত্ত গর্জন করিয়া নারীদের অভিমুখে ছুটিয়াছে।

৫ শ্রাবণ ১৩৩৯



অষ্টম সর্গ

সেদিন সন্ধ্যার আকাশে দ্রুত সঞ্চরমাণ মেঘের দল শিপ্রার বর্ষাস্ফীত বক্ষে ধূমল ছায়া ফেলিয়া চলিয়াছিল। বৃষ্টি পড়িতেছে না বটে, কিন্তু পশ্চিম হইতে খর আর্দ্র বায়ু বহিতেছে— শীঘ্রই বৃষ্টি নামিবে। ছিন্ন ধাবমান মেঘের আড়ালে পঞ্চমীর চন্দ্রকলা মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে— যেন মহাকালের করচ্যুত বিষাণ খসিয়া পড়িতেছে, এখনই দিগন্তরালে অদৃশ্য হইবে।

শিপ্রার পূর্বতটে উজ্জয়িনীর পাষাণ-নির্মিত বিস্তৃত ঘাট। ঘাটের অসংখ্য সোপান বহু ঊর্ধ্ব হইতে ধাপে ধাপে নামিয়া শিপ্রার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, ক্ষিপ্র জল-ধারা এই পাষাণ প্রতিবন্ধকে আছাড়িয়া পড়িয়া আবর্ত সৃষ্টি করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু শূন্য ঘাটে আজ শিপ্রার আক্ষেপোক্তি শুনিবার কেহ নাই।

ঘাট নির্জন। অন্যদিন এই সময় বহু স্নানার্থিনীর ভিড় লাগিয়া থাকে; তাহাদের কলহাস্য ও কঙ্কণকিঙ্কিণী মুখরভাবে শিপ্রাকে উপহাস করিতে থাকে; তাহাদের ঘটোচ্ছলিত জল মসৃণ সোপানকে পিচ্ছিল করিয়া তোলে। আজ কিন্তু ভিড় নাই। মাঝে মাঝে দুই একটি তরুণী বধূ আকাশের দিকে সশঙ্ক দৃষ্টি হানিয়া ঘট ভরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেছে। ক্বচিৎ এক ঝাঁক কিশোরী বয়স্যা মঞ্জীর বাজাইয়া গাগরী ভরিতে আসিতেছে; তাহারাও অল্পকাল জলক্রীড়া করিয়া পূর্ণঘট-কক্ষে চঞ্চল-চরণে সোপান আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিতেছে। নির্জন ঘাটে সন্ধ্যার ছায়া আরও ঘনীভূত হইতেছে।

ঘাট নির্জন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ জনশূন্য নহে। একটি পুরুষ নিম্নতর সোপানের এক প্রান্তে চিন্তামগ্নভাবে নীরবে বসিয়া আছেন। পুরুষের বয়স বোধ হয় পঁয়ত্রিশ কিংবা ছত্রিশ বৎসর হইবে। -যৌবনের মধ্যাহ্ন। দেহের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, মস্তক মুণ্ডিত, স্কন্ধে উপবীত, ললাটে শ্বেত চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। মেঘাচ্ছন্ন প্রাবৃট-সন্ধ্যার স্বল্পালোকেও তাঁহার খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ নাসা ও আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তিনি কখনও আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কখনও উদ্বেল-যৌবনা নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছেন, কখনও ক্রীড়া-চপলা তরুণীদের রহস্যালাপ শ্রবণ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার মুখ চিন্তাক্রান্ত। গত দুইদিন হইতে একটি দুরূহ সমস্যা কিছুতেই তিনি ভঞ্জন করিতে পারিতেছেন না। অলঙ্কারশাস্ত্র ঘাঁটিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর কোথাও পাওয়া যায় নাই। এদিকে মহারাজ অবন্তীপতি ও সভাস্থ রসিক-মণ্ডলী সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ঘরে গৃহিণী তাঁহার ঔদাস্য ও অন্যমনস্কতায় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিতেছেন। নানা দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় এই মধুর আষাঢ় মাসেও রাত্রিতে নিদ্রা নাই।

কয়েকটি যুবতী এই সময় মঞ্জীর-ঝঙ্কারে অমৃতবৃষ্টি করিয়া সোপানশীর্ষ হইতে জলের ধারে নামিয়া আসিল। পুরুষকে কেহ লক্ষ্য করিল না— উত্তরীয় কলস নামাইয়া রাখিয়া জলে অবতরণ করিল; কৌতুক-সরস আলাপ করিতে করিতে পরস্পরের দেহে জল ছিটাইতে লাগিল। পুরুষ একবার সচকিতে তাহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া নতমুখে তাহাদের আলাপের ছিন্নাংশ শুনিতে লাগিলেন।

'কাল তোর বর দেশে ফিরিয়াছে— না? তাই—'

সমুচ্চ কলহাস্যে বাকি কথাগুলি চাপা পড়িয়া গেল।

'কি ভাই? কি হইয়াছে ভাই?'

'তুই আইবুড় মেয়ে—আমাদের সঙ্গে মিশবি কেন লা? তোকে কিছু বলিব না।'

'আহা বল্ বল্— ওর তো এই মাসেই বর আসিবে— ও এখন আমাদের দলে।...'

'মধু, মোম, কুঙ্কুম আর ইঙ্গুদী-তৈল মিশাইয়া ঠোঁটে লাগাস্— আর কোনও ভয় থাকিবে না। সেই সঙ্গে একটু কেয়ার রেণুও দিতে পারিস্, কিন্তু খুব সামান্য...'

'ওলো দ্যাখ্ দ্যাখ্, কপোতিকার কি দশা হইয়াছে...'

পুরুষ আড়নয়নে দেখিলেন, কপোতিকা তাড়াতাড়ি আবক্ষ জলে ডুবাইয়া বসিল।

'...লোলার কি দুঃখ ভাই! তাহার স্বামী আজিও ফিরিল না— কে জানে হয়তো— যবদ্বীপ কতদূর ভাই?'

'সিংহল পার হইয়া যাইতে হয়— ছয় মাসের পথ—লোলার জন্য বড় দুঃখ হয়— আমাদের সঙ্গে আসে না—'

'—দ্যাখ, মেঘগুলা আজ পূর্বমুখে ছুটিয়াছে—'

'—হ্যাঁ। এ মেঘ অলকায় যাইবে না।'

পুরুষ কর্ণ উদ্যত করিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আর অধিক শুনিতে পাইলেন না। যুবতীরা গাত্র মার্জনা সমাপন করিয়া তীরে উঠিল।

এই যুবতীযূথের মধ্যে একটিকে পুরুষ চিনিতেন। তাহারা বস্ত্র-পরিবর্তন সমাপ্ত করিলে তিনি ডাকিলেন— 'ময়ূরিকে, তোমরা একবার এদিকে শুনিয়া যাও।'

চমকিত হইয়া সকলে মুখ ফিরাইল। বোধ করি একটু লজ্জাও হইল। তাই উত্তরীয় দ্বারা তাড়াতাড়ি অঙ্গ আবৃত করিয়া ফেলিল।

ময়ূরিকা নিম্নকণ্ঠে পুরুষের নাম উচ্চারণ করিল, নিমেষের মধ্যে চোখে চোখে একটা উত্তেজিত

ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। তারপর সকলে সংযতভাবে পুরুষের সমীপবর্তী হইয়া দাঁড়াইল।

ময়ূরিকা যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিল— 'ভট্ট, আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।'

ভট্ট স্মিতমুখে আশীর্বাদ করিলেন— 'আয়ুষ্মতী হও। তোমরা এতক্ষণ কি কথা কহিতেছিলে ?'

সকলে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। যে সকল কথা হইতেছিল, তাহা পুরুষকে, বিশেষত ভট্টকে কি করিয়া বলা যাইতে পারে ?

মঞ্জরিকা ইহাদের মধ্যে ঈষৎ প্রগল্‌ভা, সে-ই উত্তর দিল। কৌতুক-চঞ্চল-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল— 'ভট্ট, আজ আকাশের মেঘদল পূর্বদিকে চলিয়াছে। উত্তরে অলকাপুরীতে পৌঁছিতে পারিবে না, তাই আমরা আক্ষেপ করিতেছিলাম।'

ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন— 'সে জন্য আক্ষেপ কেন ?'

মঞ্জরিকা বলিল— 'যক্ষপত্নী বিরহ-বেদনায় কালযাপন করিতেছেন, যক্ষের সংবাদ পাইবেন না,—এই জন্য আক্ষেপ।'

এতক্ষণে যেন বুঝিতে পারিয়াছেন এমনিভাবে ভট্ট বলিলেন— 'বুঝিয়াছি। তোমরা মেঘদূত কাব্যের কথা বলিতেছ। ভাল, তোমরা দেখিতেছি কাব্যশাস্ত্রে সুচতুরা। আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার ?'

সকলে যুক্তকরে বলিল—'আজ্ঞা করুন।'

ভট্ট চিন্তা করিলেন ; পরে শিরঃসঞ্চালন করিয়া কহিলেন—'না, সে বড় কঠিন প্রশ্ন, তোমরা পারিবে না।'

মঞ্জরিকা অনুনয় করিয়া বলিল— 'তবু আজ্ঞা করুন আর্য।'

ভট্ট সকলের চক্ষে অধীর কৌতূহল লক্ষ্য করিয়া বলিলেন— 'উত্তম, বলিতেছি শুন। —তোমরা বলিতে পার, কাব্যে নায়ক-নায়িকার বিবাহ সম্পাদিত হইবার পর কবির আর কিছু বক্তব্য থাকে কি না ?'

সকলে বিস্মিতভাবে নীরব রহিল ; ভট্ট যে তাহাদের মতো অপরিণত-বুদ্ধি যুবতীদের নিকট কাব্যশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এরূপ প্রশ্ন করিবেন, তাহা যেন সহসা ধারণা করিতেই পারিল না।

শেষে ময়ূরিকা বলিল— 'আর্য, নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিলেই তো কাব্য শেষ হইল ! তাহার পর কবির আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে ?'

ভট্ট বলিলেন—'ময়ূরিকে, আমি মিলনের কথা বলি নাই, বিবাহের কথা বলিয়াছি।'

বিস্মিতা মঞ্জরিকা বলিল— 'উভয়ই এক নহে কি ?'

ভট্ট গূঢ় হাসিয়া বলিলেন— 'উহাই তো প্রশ্ন।'

ভট্টের কথার মর্ম কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, সকলে নির্বাক্ হইয়া রহিল। ভট্ট ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিতভাবে রহিলেন।

অবশেষে অরুণিকা কথা কহিল। সে ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চতুরা, এতক্ষণ কথা বলে নাই, এবার মুখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিল— 'ভট্ট, এ প্রশ্নটি কখনও ভট্টিনীর নিকট করিয়াছিলেন কি ?'

ভট্ট চমকিয়া মুখ তুলিলেন। দেখিলেন অরুণিকার অরুণ ওষ্ঠপ্রান্তে একটু চাপা হাসি খেলা করিতেছে। তিনি ঈষৎ বিব্রতভাবে বলিলেন— 'না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, স্মরণ ছিল না। আজ গৃহে ফিরিয়াই জিজ্ঞাসা করিব। — কিন্তু তোমরা আর বিলম্ব করিও না, এবার গৃহে যাও। রাত্রি আগতপ্রায়।'

বক্রোক্তিটা সকলের কানে পৌঁছিল না ; শুধু অরুণিকা বুঝিল, ভট্ট মৃদু রকমের প্রতিশোধ লইলেন। সকলে যুক্তহস্তা হইয়া বলিল— 'আর্য, আমাদের আশীর্বাদ করুন।'

ভট্ট হাসিলেন – 'তোমাদের আমি আর কি আশীর্বাদ করিব ? আমি শঙ্করের দাস — অথচ স্বয়ং শঙ্করারি তোমাদের সহায়। ভাল, আশীর্বাদ করিতেছি—' মুহূর্ত-কাল নীরব থাকিয়া জলদগম্ভীর-কণ্ঠে কহিলেন, 'মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে স্বামিনা বিপ্রয়োগঃ।'

সকলে কপোতহস্তে আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া শিরোধার্য করিল। তারপর প্রফুল্ল মনে প্রীতিবিম্বিতমুখে শ্রোণি-কলস-ভার-মন্থর পদে প্রস্থান করিল।

ভট্ট বসিয়া রহিলেন। যুবতীদের নূপুরনিক্কণ ক্রমে শ্রুতি-বহির্ভূত হইয়া গেল। তখন আবার তাঁহার মুখ চিন্তাচ্ছন্ন হইল। কি করা যায় ? এ প্রশ্নের কি সমাধান নাই ? তীরে আসিয়া শেষে তরী ডুবিবে ? অবশ্য এ কথা সত্য যে, নায়ক-নায়িকার বিবাহ দিবার পর কবির কর্তব্য শেষ হয়। কিন্তু তবু তাঁহার মন সন্তোষ মানিতেছে না কেন ? কাব্য তো শেষ হইয়াছে ;— আর এক পদ অগ্রসর হইলে প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন হইবে, যাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহার অতিরিক্ত কথা বলা হইবে। তাহা করিবার প্রয়োজন কি ? নায়িকার মুখে সলজ্জ হাসি ফুটাইয়া বিদায় লওয়াই তো কবির উচিত ; আর সেখানে থাকিলে যে রসভঙ্গ হইবে। সবই ভট্ট বুঝিতেছেন, তবু তাঁহার মন উঠিতেছে না। কেবলি মনে হইতেছে— এ হইল না, কাব্য শেষ হইল না, চরম কথাটি বলা হইল না।

এদিকে রাত্রি মেঘের ধূসর পক্ষে আশ্রয় করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা-আহ্নিকও হয় নাই— মন বিক্ষিপ্ত! ভট্ট উঠিবার চেষ্টা করিয়া চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, কলস-কক্ষে একটি তরুণী নিঃশব্দে নামিয়া আসিতেছে। তাহার গতিভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল— যাহা দেখিয়া ভট্ট উঠিতে পারিলেন না, আবার বসিয়া পড়িলেন।

তরুণী ধীরে ধীরে কলস নামাইয়া সোপানের শেষ পৈঠায় আসিয়া বসিল। কোনও দিকে লক্ষ্য করিল না, বিষণ্ণ ব্যথিত চক্ষু দুটি তুলিয়া যেখানে শিপ্রার স্রোত দূরে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ভট্ট দেখিলেন— রমণীর দেহে সৌভাগ্যের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোনও অলঙ্কার নাই। রুক্ষকেশের রাশি একটা-মাত্র বেণীতে আবদ্ধ হইয়া অংসের উপর পড়িয়া আছে, শুষ্ক অশ্রুহীন চোখে কজ্জল নাই।

এই নীরব শোকপরায়ণা একবেণীধরা যুবতীকে ভট্ট বালিকা-বয়সে চিনিতেন। সম্প্রতি বহুদিন দেখেন নাই। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, কিন্তু বক্ষে আনন্দের ক্ষণপ্রভাও খেলিয়া গেল। তিনি ডাকিলেন— 'লোলা!'

তন্দ্রাহতের ন্যায় যুবতী ফিরিয়া চাহিল। ভট্টকে দেখিয়া সলজ্জে উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া সঙ্কোচ-জড়িত-পদে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভট্টের চক্ষু বড় তীক্ষ্ণ, বস্ত্র ভেদ করিয়া দেহ ও দেহ ভেদ করিয়া মনের অন্তরতম কথাটি দেখিয়া লয়। লোলা কুণ্ঠিত নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন— 'তুমি রৈবতক নাবিকের বধূ ?'

লোলা হেঁটমুখে রহিল, উত্তর করিল না। তাহার অধর কাঁপিতে লাগিল।

ভট্ট পুনরায় বলিলেন—'তোমার স্বামী শ্রেষ্ঠী বরুণমিত্রকে লইয়া গত বৎসর যবদ্বীপে গিয়াছে— আজিও ফিরে নাই ?'

লোলার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে কেবল মাথা নাড়িল।

ভট্ট সুস্মিত মুখে বলিলেন— 'তুমি ভয় করিও না, রৈবতক কুশলে আছে।'

ব্যাকুল নয়নে লোলা ভট্টের মুখের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টির কাতর-বিহ্বল প্রশ্ন ভট্টের বক্ষে সূচীবেধবৎ বিঁধিল। তিনি লজ্জিত হইলেন—ছি, ছি, এতক্ষণ এই বালিকার আকুল আশঙ্কা লইয়া

তিনি খেলা করিতেছিলেন!

অনুতপ্তস্বরে বলিলেন— 'আজ রাজসভায় সংবাদ আসিয়াছে— রৈবতক সমস্ত নৌকা লইয়া সমুদ্র-সঙ্গমে ফিরিয়াছে! দুই-এক দিনের মধ্যেই গৃহে ফিরিবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও।'

থরথর কাঁপিয়া লোলা সেইখানেই বসিয়া পড়িল। তারপর গলদশ্রুনেত্রে গলবস্ত্র হইয়া ভট্টকে প্রণাম করিল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল— 'দেব, আপনি আজ অভাগিনীর প্রাণ দিলেন। মহাকাল আপনাকে জয়যুক্ত করুন।' উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আজ সংবাদ আসিয়াছে?'

'হ্যাঁ।'

'সকলে নিরাপদে আছেন?'

'হ্যাঁ, সকলেই নিরাপদে আছেন।—লোলা, তুমি অনুপমা। রৈবতক আসিলে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও, তাহাকে তোমার কথা বলিব।'

অশ্রু মার্জনা করিয়া লোলা সিক্ত হাসি হাসিল, অস্ফুটস্বরে বলিল— 'যে আজ্ঞা।'

এতক্ষণে শীকরকণার ন্যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, বায়ুতাড়িত জলকণা তির্যক্‌ভাবে ভট্টের মুখে পড়িতে লাগিল। তিনি উঠিলেন, সস্নেহস্বরে লোলাকে বলিলেন— 'লোলা, দুঃখের অন্তেই মিলন মধুর হয়। আমার উমাকে আমি যে দুঃখ দিয়াছি তাহা স্মরণ করিলেও বক্ষ বিদীর্ণ হয়; কিন্তু চরমে সে ঈপ্সিত বর লাভ করিয়াছে। মদন পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে।—তুমিও আমার গৌরীর ন্যায় সুভগা। তোমার জীবনেও মদন পুনরুজ্জীবিত হইবেন। কল্য তাঁহার মন্দিরে পূজা পাঠাইও।'

লোলা কৃতাঞ্জলি হইয়া বসিয়া রহিল, ভট্টের সকল কথা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু অপরিমিত সুখাবেশে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ভট্ট সহাস্যে তাহার মস্তকে একবার হস্তার্পণ করিয়া ত্বরিত পদে সোপান অতিবাহিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ঘাট হইতে পথে অবতীর্ণ হইয়া তিনি দেখিলেন, পথ পিচ্ছিল, কর্দমপূর্ণ। সম্মুখেই মহাকালের কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত গগনভেদী মন্দির মেঘলোকে চূড়া তুলিয়া আছে। ভট্ট সেইদিকে অগ্রসর হইতেই মন্দির-অভ্যন্তর হইতে ঘোর রবে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সন্ধ্যারতির কাল উপস্থিত। মন্দিরের অঙ্গনে বহু লোক আরতি দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। ভট্ট ভিতরে প্রবেশ করিলেন না, বাহির হইতে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ইষ্টদেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। শঙ্খ-ঘণ্টার রোল চলিতে লাগিল; কালাগুরু ধূপ ও গুগ্‌গুলের গন্ধ চারিদিকের বায়ুকে সৌরভে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

আরতি শেষ হইলে ভট্ট আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। অন্ধকার আকাশ হইতে সূক্ষ্ম বারিপতন হইতেছে— রাজপথে লোক নাই। এখন রাত্রি হইয়াছে, অথচ পাষাণ-বনদেবীর হস্তে পথদীপ জ্বলে নাই; মধ্যরাত্রির পূর্বে বনদেবীগণ প্রদীপহস্তা হইবেন না। পথিপার্শ্বের সুবৃহৎ অট্টালিকা-সমূহে বর্তিকা জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু তাহা অভ্যন্তর মাত্র আলোকিত করিয়াছে; ক্বচিৎ নাগরিকদিগের বিলাস কক্ষের মুক্ত গবাক্ষপথে আলোক-রশ্মি ও জাতী কদম্ব কেতকী যূথীর মিশ্র গন্ধ নির্গত হইয়া পথচারীকে গৃহের জন্য উন্মনা করিয়া তুলিতেছে। ভট্ট এই ঈষদালোকিত কর্দম-পিচ্ছিল পুষ্প সুবাসিত পথ দিয়া সাবধানে চলিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীর পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ, কোনওমতে দুইটি রথ বা প্রবহন পাশাপাশি চলিতে পারে। পথ ঋজু নহে, সংসর্পিত হইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ভট্ট হেঁটমুণ্ডে গৃহাভিমুখে চলিতে চলিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন— কোনও দিকে লক্ষ্য ছিল না; সহসা একটা মোড় ঘুরিয়া সম্মুখে দীপোদ্ভাসিত প্রাসাদ-তোরণ দেখিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল।

তোরণের পশ্চাতে প্রাসাদ, সেখানেও দীপোৎসব। তোরণ-সম্মুখে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রথ, দোলা, যানবাহন যাতায়াত করিতেছে। প্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে সঙ্গীতের সুমিষ্ট ধ্বনি কানে আসিতেছে। ভট্টের স্মরণ হইল, আজ প্রিয়দর্শিকার গৃহে সমাপানক। স্বয়ং মহামাণ্ডলিক অবন্তীপতি এই সমাপানকে যোগদান করিবেন বলিয়াছেন। ভট্টেরও নিমন্ত্রণ আছে।

ভট্টের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য! এ কথাটা তাঁহার এতক্ষণ মনে হয় নাই কেন? তাঁহার নিদারুণ সমস্যার যদি কেহ সমাধান করিতে পারে তো সে ঐ মহাবিদুষী চতুঃষষ্টিকলার পারংগতা অলোকসামান্যা বারবধূ প্রিয়দর্শিকা। তাহার মতো সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা অবন্তীরাজ্যে অন্য কে আছে? সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার কাব্যের নিগূঢ় রস ব্যঙ্গোক্তি প্রিয়দর্শিকা যতটা বুঝিবে, এত আর কেহ বুঝিবে না। সে সামান্যা রূপোপজীবিনী নহে—রাজ্যের বারমুখ্যা। স্বয়ং আর্যাবর্তের অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে পদার্পণ করিয়াই প্রিয়দর্শিকাকে স্মরণ করেন; শুধু তাহার অলৌকিক রূপযৌবনের জন্য নহে, তাহার অশেষ গুণাবলীর জন্য তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন। সেই প্রিয়দর্শিকার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াও তিনি এতক্ষণ ভুলিয়া ছিলেন? ভট্ট সহর্ষে তোরণ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু তোরণের সমীপবর্তী হইয়া ভট্টের মুখে ঈষৎ উদ্বেগের ছায়া পড়িল। গৃহে ভট্টিনী প্রতীক্ষা করিয়া আছেন; তিনি এসব পছন্দ করেন না। বিশেষত প্রিয়দর্শিকাকে তিনি ঘোর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। দেশে নিন্দুকের অভাব নাই, ভট্টের সহিত প্রিয়দর্শিকার গুপ্ত প্রণয়ের একটা জনশ্রুতি ভট্টিনীর কানে উঠিয়াছে। তদবধি প্রিয়দর্শিকার নাম শুনিলেই তিনি জ্বলিয়া যান। সুতরাং গণ্ডের উপর পিণ্ডের ন্যায় আজ যদি ভট্ট প্রিয়দর্শিকার গৃহে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত যাপন করেন, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না।

তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভট্ট ইতস্তত করিতেছেন দেখিয়া তোরণপালিকা কিঙ্করীগণ কলকণ্ঠে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল— 'আসুন কবীন্দ্র। স্বাগত! আসুন পণ্ডিতবর, আর্যা প্রিয়দর্শিকা আপনার জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আসুন মহাভাগ, আপনার অভাবে নবরত্নমালিকা আজ মধ্যমণিহীন। স্বাগত! শুভাগত!'

দাসীগণ সকলেই যৌবনবতী, রসিকা ও সুন্দরী। তাহাদের কাহারও হস্তে পুষ্পমালা, কাহারও হস্তে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার, কেহ বা সুগন্ধি দ্রব্যপূর্ণ স্থালী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা সকল অতিথিকেই মহা সম্মানপূর্বক স্বাগত-সম্ভাষণ করিতেছে; কিন্তু কবিকে দেখিয়া তাহারা যেরূপ সমস্বরে সাহ্লাদে আহ্বান করিল, তাহাতে কবি আর দ্বিধা করিতে পারিলেন না। গৃহের চিন্তা মন হইতে অপসারিত করিয়া হাস্যমুখে তোরণ-পথে প্রবেশ করিলেন।

মর্মর-পট্টের উপর পদার্পণ করিবামাত্র একটি দাসী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল, অন্য একজন নতজানু হইয়া বসিয়া পদ প্রক্ষালন করিয়া দিল। তৃতীয় দাসী শুভ্র কার্পাস বস্ত্র দিয়া পা মুছাইয়া দিল। কবিকে উজ্জয়িনীর নাগরিক-নাগরিকা যেরূপ ভালবাসিত, এরূপ আর কাহাকেও বাসিত না। তাই তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্যের জন্য দাসীদের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল।

গন্ধদ্রব্যের স্থালী হস্তে দাসী কবির সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি অঙ্গুলির প্রান্ত চন্দনে ডুবাইয়া সকৌতুকে তাহার ভ্রূমধ্যে তিলক পরাইয়া দিলেন। সকলে আহ্লাদে হাস্য করিয়া উঠিল। যাহার হাতে পুষ্পমাল্য ছিল, সে আসিয়া তাড়াতাড়ি কবির গলায় যূথীর একটি স্থূল মালা পরাইয়া দিল। কবি তাহাকে ধরিয়া বলিলেন— 'সুলোচনে, এ কি করিলে? তুমি আমার গলায় মালা দিলে?'

সুলোচনাও বাক্যবিন্যাসে কম নহে, সে কুটিল হাসিয়া উত্তর করিল— 'কবিবর, এখানে আমরা

সকলেই আর্যা প্রিয়দর্শিকার প্রতিনিধি।'

মুখের মতো উত্তর পাইয়া কবি হাসিতে হাসিতে প্রাসাদ অভিমুখে চলিলেন। উদ্যানের মধ্য দিয়া শ্বেত প্রস্তরের পথ, তাহার দুইধারে ধ্যানাসীন মহাদেবের মূর্তি। মূর্তির শীর্ষস্থ জটাজাল হইতে সুগন্ধি বারি উৎসের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

প্রথম মহল নৃত্যশালা। সেখানে প্রবেশ করিয়া কবি দেখিলেন তরুণ নাগরিকদের সভা বসিয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে নর্তকী বাহুবল্লরী বিলোলিত করিয়া অপাঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়া কেয়ূর-কিঙ্কিণী মঞ্জীর-শিঞ্জনে অপূর্ব সম্মোহন সৃষ্টি করিয়া রাগ-দীপক নৃত্যে অপ্সরালোকের ভ্রান্তি বহিয়া আনিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ চরণনিক্ষেপের তালে তালে মৃদঙ্গ ও সপ্তস্বরা বাজিতেছে। মৃদঙ্গীর চক্ষু নর্তকীর চরণে নিবদ্ধ ; বীণা-বাদকের ললাটে ভ্রূকুটি, চক্ষু মুদিত। অন্য সকলে নর্তকীর অপরূপ লীলা-বিভ্রম দেখিতেছে। সকলেই গুণী রসজ্ঞ— কলা-সঙ্গত বিশুদ্ধ নৃত্য দেখিতে দেখিতে তাহাদের চক্ষু ভাবাতুর। কেহ নড়িতেছে না, মূর্তির মতো বসিয়া দেখিতেছে।

কবি কিছুক্ষণ বসিয়া দেখিলেন, তারপর নিঃশব্দে কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন। দ্বিতীয় প্রাসাদ নৃত্যশালার সংলগ্ন, মধ্যে একটি অলিন্দের ব্যবধান। সেখানে গিয়া কবি দেখিলেন, কথা-কাহিনীর আসর বসিয়াছে। বক্তা স্বয়ং বেতালভট্ট। তিনি মণিকুট্টিমের মধ্যস্থলে শঙ্খরচিত কমলাসনে বসিয়াছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া বহু নাগরিক-নাগরিকা করতলে চিবুক রাখিয়া অবহিত হইয়া শুনিতেছে। চষকহস্তা কিঙ্করীগণ পূর্ণ পানপাত্র সম্মুখে ধরিতেছে, কিন্তু কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। কিঙ্করীরাও পাত্র হস্তে চিত্রার্পিতার ন্যায় গল্প শুনিতেছে।

বেতালভট্ট গম্ভীর কণ্ঠে কহিতেছেন— 'পিশাচ অট্ট অট্ট হাস্য করিল ; কহিল, মহারাজ, এই শ্মশানভূমির উপর আপনার কোনও অধিকার নাই, ইহা আমার রাজ্য। ঐ যে নরমেদঃ-শোণিতলিপ্ত মহাশূল মশানের মধ্যস্থলে প্রোথিত দেখিতেছেন, উহাই আমার রাজদণ্ড।'

কবি আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, হাস্য গোপন করিয়া চুপিচুপি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইবার পূর্বে সকলের মুখ একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন, কিন্তু প্রিয়দর্শিকাকে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে দেখিতে পাইলেন না।

তৃতীয় প্রাসাদটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুরম্য। সভার ন্যায় সুবিশাল কক্ষ, তাহার চারিদিকে বহুবিধ আসন ও শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে, কেন্দ্রস্থলের মর্মর-কুট্টিম অনাবৃত ; তাহার উপর মণিময় অক্ষবাট অঙ্কিত রহিয়াছে। ছাদ হইতে সুবর্ণ শৃঙ্খলে অগণিত দীপ দুলিতেছে, কক্ষ-প্রাচীরে সারি সারি দীপ, উপরন্তু হর্ম্যতলে স্থানে স্থানে স্বর্ণদণ্ডের শীর্ষে সুগন্ধি বর্তিকা জ্বলিতেছে। কক্ষের কোথাও লেশমাত্র অন্ধকার নাই। এই কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া কবির মনে হইল, কক্ষে বুঝি কেহ নাই— এত বিশাল এই কক্ষ যে সেখানে প্রায় ত্রিশজন লোক থাকা সত্ত্বেও উহা শূন্য মনে হইতেছে। সখী ও পরিচারিকাগণ ছায়ার মতো গমনাগমন করিতেছে ; তাহাদের নূপুরগুঞ্জনও যেন মৃদু ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঘরের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া কবি দেখিলেন, মহারাজা অবন্তীশ্বর বররুচির সহিত অক্ষ-ক্রীড়ায় বসিয়াছেন। তাঁহাদের একপার্শ্বে রত্নখচিত সুরাভৃঙ্গার ও চষক, অন্যপার্শ্বে তাম্বূল-করঙ্ক। দুইজনেই খেলায় নিমগ্ন। কবি গিয়া দাঁড়াইতেই মহারাজ অন্যমনস্কভাবে চক্ষু তুলিয়া পাৰ্শি ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন— 'কালিদাস ? এস বন্ধু, আমার সহায় হও। বররুচি আমার অঙ্গদ জিতিয়া লইয়াছে— এবার কঙ্কণ পণ—' বলিয়া পাৰ্শি ফেলিলেন। গজদন্তের পাৰ্শিতে মরকতের অক্ষি আলোকসম্পাতে ঝলসিয়া উঠিল।

রাজার আহ্বানে কালিদাস বসিলেন। অন্যদিন হইলে নিমেষমধ্যে তিনিও খেলায় মাতিয়া উঠিতেন ; কিন্তু আজ তাঁহার মন লাগিল না। বিশেষ ইঁহারা দুইজনেই খেলায় এত একাগ্র যে,

মাঝে মাঝে সুরাপাত্র নিঃশেষ করা ব্যতীত আর কোনও দিকে মন দিতে পারিতেছেন না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কালিদাস উঠিলেন ; ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিলেন, দূরে নীল পক্ষ্মল চীনাংশুকের আস্তরণের উপর প্রিয়দর্শিকা বসিয়া আছে— যেন সরোবরের মাঝখানে একটি মাত্র কমল ফুটিয়াছে। তাহার সম্মুখে বসিয়া একজন পুরুষ হাত নাড়িয়া কি কথা বলিতেছে, পশ্চাৎ হইতে কালিদাস তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। প্রিয়দর্শিকা কপোলে হস্ত রাখিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। কালিদাস সেইদিকে ফিরিতেই দুইজনের চোখাচোখি হইল। প্রিয়দর্শিকা স্মিত হাসিয়া চোখের ইঙ্গিতে কবিকে ডাকিল।

কবি বুঝিলেন, প্রিয়দর্শিকা বিপদে পড়িয়াছে। তিনি মন্দমন্থর পদে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন, যে ব্যক্তি প্রিয়দর্শিকার সহিত কথা কহিতেছে, সে অত্যন্ত পরিচিত—তাহার মুখ শূকরের ন্যায় কদাকার, দেহ রোমশ, মস্তকের কেশ কণ্টকবৎ ঋজু ও উদ্ধত। কবি মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন— 'কে ও ? বরাহ— না না—মিহিরভট্ট যে ! প্রিয়দর্শিকে, জ্যোতির্বিশারদ কি তোমার ভাগ্য-গণনা করিতেছেন ?'

বাধাপ্রাপ্ত বরাহমিহির ক্রুদ্ধমুখে কবির দিকে ফিরিলেন। প্রিয়দর্শিকা যেন ইতিপূর্বে কবিকে দেখে নাই, এমনিভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া করজোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহার কর্ণে নীলকান্তমণির অবতংস দুলিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বলিল— 'কবিবর, স্বাগতোঽসি। আপনার পদার্পণে আজ আমার গৃহে পরমোৎসব। আসন গ্রহণ করুন আর্য। —হলা বকুলে, শীঘ্র কবিবরের জন্য পানীয় লইয়া আয়।'

কালিদাস বসিলেন, বলিলেন—'আচার্য মিহির, কিসের আলোচনা হইতেছিল ? ফলিত জ্যোতিষ ? উত্তম কথা, আমার ভাগ্যটা একবার গণনা করিয়া দেখুন তো। সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছি।'

বরাহমিহির মুখে হাসির একটা অনুকৃতি করিয়া বলিলেন— 'কবি, তুমি এখন বিনাইয়া বিনাইয়া একটা বর্ষা-সংহার কাব্য লেখ গিয়া। এসব কথা তুমি বুঝিবে না।'

পরিচারিকা স্ফটিকপাত্রে আসব লইয়া আসিল, প্রিয়দর্শিকা তাহা স্বহস্তে লইয়া কবিকে দিল। কবি পান করিয়া পাত্র দাসীকে ফিরাইয়া দিলেন, তারপর প্রিয়দর্শিকার হস্ত হইতে তাম্বূল লইয়া বলিলেন— 'কেন বুঝিব না ? জ্যোতিষশাস্ত্রে শক্ত কি আছে ? দ্বাদশ রাশি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র আর নবগ্রহ— এই লইয়া তো ব্যাপার। ইহাও যদি বুঝিতে না পারি—'

বরাহমিহির কবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রিয়দর্শিকার দিকে ফিরিয়া অসমাপ্ত বক্তৃতা আবার আরম্ভ করিলেন। বলিলেন— 'একবার ভাবিয়া দেখ, আমাদের অপৌরুষেয় শাস্ত্রের উপর এই অবচীন যাবনিক বিদ্যা বলাৎকারপূর্বক বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফল কিরূপ বিষময় হইয়াছে তাহা জান কি ? অশ্বিন্যাদি বিন্দু পুরা তিন অংশ সরিয়া গিয়াছে।'

বরাহমিহির ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ নেত্রে প্রিয়দর্শিকাকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিলেন, যেন এই অপরাধের পরিপূর্ণ দায়িত্ব তাহারই— 'তিন অংশ ! কল্পনা কর— তিন অংশ ! ইহার ফলে সমগ্র ভ-চক্র তিন অংশ সরিয়া গিয়াছে ! সর্বনাশ হইতে আর বাকি কি ? যে সকল গর্ভদাস এই কুকার্য করিয়াছে, তাহারা জানে না যে, আকাশচক্র রথচক্র নয়— উহা চিরস্থির চির-নিরয়ন। এই গ্রহতারামণ্ডিত ব্যোম নিরন্তর ঘূর্ণমান হইয়াও অচল গতিহীন—'

কালিদাস হাসিয়া উঠিলেন ; দেখিলেন, বরাহ আজ যেরূপ ক্ষেপিয়াছে, সহজে উহার কবল হইতে প্রিয়দর্শিকাকে উদ্ধার করা যাইবে না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন— 'মিহিরভট্ট, ওটা আপনার ভুল। আকাশচক্র সত্যই রথচক্র— মহাকালের নিঃশব্দ ঘর্ঘরহীন রথচক্র। উহা নিরন্তর ঘুরিতেছে এবং সেই সঙ্গে আমরাও ঘুরিতেছি।'

বরাহ কবির দিকে কেবল একটা কষায়িত নেত্রপাত করিয়া আবার কহিতে লাগিলেন— "শুধু কি তাই : এই দ্বাদশ রাশির অভিযানের ফলে ফলিত জ্যোতিষ একেবারে লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছে ! অভিজিৎ আজ কোথায় ? অভিজিৎকে ছাগমুণ্ড করিয়া তাহার গলা কাটিয়া তাহাকে নক্ষত্রলোক হইতে নির্বাসিত করা হইয়াছে ! দ্বাদশ রাশিকে সুতন্ত্রিত করিবার জন্য অষ্টবিংশতি নক্ষত্র এখন সপ্তবিংশতি হইয়াছে। দু'দিন পরে অভিজিতের নাম পর্যন্ত লোকে ভুলিয়া যাইবে— জ্যোতিঃশাস্ত্র মূর্খের দ্বারা লাঞ্ছিত অবজ্ঞাত হইবে—'

শুনিতে শুনিতে কবি অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। প্রিয়দর্শিকা তাঁহার প্রতি একবার করুণ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল : কিন্তু উপায় নাই। দৈত্য কর্তৃক আক্রান্ত উর্বশীকে পুরুরবা উদ্ধার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এ দৈত্য অবধ্য। বিমর্ষভাবে চিন্তা করিতে করিতে কবি কক্ষে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাত্রিও ক্রমে গভীর হইতেছে ; কবি ভাবিলেন, আজ আর কিছু হইল না, গৃহে ফিরি। এই সময় তাঁহার দৃষ্টি পড়িল কক্ষের দূর কোণ হইতে একব্যক্তি হস্ত-সঙ্কেতে তাঁহাকে ডাকিতেছে। লোকটি বোধ হয় কিছু অধিক মাত্রায় মাদক-সেবা করিয়াছে, কারণ সে আসন হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না এবং যতই উঠিতে অসমর্থ হইতেছে, ততই আর এক চষক পান করিয়া শক্তি সংগ্রহে যত্নবান হইতেছে। তিনজন গূঢ়হাস্যমুখী দাসী তাহার আসব যোগাইতেছে।

লোকটি বৃদ্ধ, কিন্তু বেশভূষা নবীন নাগরিকের ন্যায়। দেহটি স্থূল, মুখ বর্তুলাকার ও লোলমাংস ; কিন্তু অতি যত্ন সহকারে অঙ্গ-সংস্কার করা হইয়াছে। চক্ষে কজ্জল, কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তাহার, রোমশ দেহে পত্রচ্ছেদ্য— নব যুবক সাজিবার কোনও কৌশলই পরিত্যক্ত হয় নাই। কালিদাস তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি চক্ষু তুলিয়াই সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন। দাসীরা মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

কালিদাস বৃদ্ধের পাশে বসিয়া উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিলেন— 'বটু, কি হইয়াছে ? এত কাতর কেন ?'

চক্ষু মার্জনা করিয়া বৃদ্ধ স্খলিত বচনে কহিলেন— 'বরাহমিহির একটা ষণ্ড !'

সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়ে কালিদাস বলিলেন— 'সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু কি হইয়াছে ?'

বৃদ্ধ পুনশ্চ বলিলেন— 'বরাহমিহির একটা বৃষ !'

কবি বলিলেন— 'বটু, এ বিষয়ে আমি তোমার সহিত একমত। কিন্তু ব্যাপার কি— বৃষটা করিয়াছে কি ?'

ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ আবার আরম্ভ করিলেন— 'বরাহমিহির একটা—'

'বলীবর্দ !' কবি বৃদ্ধের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিলেন— "উক্ষা ভদ্রো বলীবর্দঃ ঋষভো বৃষভো বৃষঃ' আমার কণ্ঠস্থ আছে— সুতরাং আবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। এখন বলীবর্দটার দুষ্কৃতি সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারি।'

বৃদ্ধ আর এক চষক মদ্য পান করিলেন, তারপর কহিলেন— 'কালিদাস, তুমি আমার প্রাণাধিক বয়স্য, তোমার সঙ্গে শৈশবে একসঙ্গে খেলা করিয়াছি, তোমার কাছে আমার গোপনীয় কিছুই নাই। আমি প্রিয়দর্শিকার প্রেমে মজিয়াছি।'— এইখানে বৃদ্ধ আর এক চষক পান করিলেন— 'তাহাকে যে কতবার কত মদনালঙ্কার উপহার দিয়াছি, কত সঙ্কেত জানাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু দুষ্টা আমাকে দেখিলেই 'তাত' বলিয়া সম্বোধন করে— এমন ছলনা দেখায় যেন আমার মনের ভাব বুঝিতেই পারে নাই !— আজ আমি সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলাম যে, প্রিয়দর্শিকার চরণে আত্মনিবেদন করিব— কোনও ছল-চাতুরী শুনিব না। কিন্তু আসিয়াই

দেখিলাম, ঐ বরাহটা উহাকে কর-কবলিত করিয়াছে। সেই অবধি কেবলই সুযোগ খুঁজিতেছি, কিন্তু শূকরটা কিছুতেই উহার সঙ্গ ছাড়িতেছে না।' বলিয়া সুরাবিহ্বল নেত্রে যতদূর সম্ভব বিদ্বেষ-সঞ্চার করিয়া যেখানে বরাহমিহির বসিয়া ছিলেন, সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাস দমন করিয়া কালিদাস কহিলেন— 'বটু, তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে— প্রিয়দর্শিকার প্রতি প্রেমসঞ্চার তোমার পক্ষে অতীব গর্হিত। তুমি বালকমাত্র— প্রিয়দর্শিকা বর্ষীয়সী,—তাহার সহিত তোমার প্রণয় কদাপি যুক্তিযুক্ত নয়। তুমি বরঞ্চ তোমার বয়সোপযোগিনী কোনও কুমারী কন্যার প্রতি আসক্ত হও।'

বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া বলিলেন— 'সে কথা যথার্থ। কিন্তু আমি প্রিয়দর্শিকাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি, এখন আর ফিরাইয়া লইতে পারি না।' তারপর কালিদাসের হস্ত ধারণ করিয়া কাতরভাবে বলিলেন— 'কালিদাস, তুমি আমার সখা, আজ সখার কার্য কর, ঐ শূকরটাকে প্রিয়দর্শিকার নিকট হইতে খেদাইয়া দাও। নতুবা বন্ধুহত্যার পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে।'

অকস্মাৎ একটা কূটবুদ্ধি কালিদাসের মাথায় খেলিয়া গেল। ঠিক হইয়াছে— কণ্টকেনৈব কণ্টকম্! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন— 'শুধু প্রিয়দর্শিকার নিকট হইতে খেদাইয়া দিলেই হইবে? আর কিছু চাহ না?'

'আর কিছু চাহি না।'

'ভাল, চেষ্টা করিয়া দেখি।' কালিদাস উঠিলেন। কিছু দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন— 'একটা কথা। বটু, পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে, এ কথা তুমি বিশ্বাস কর?'

বৃদ্ধ বলিলেন—'পৃথিবীর আহ্নিক গতি থাক্ বা না থাক্—'

কালিদাস বলিলেন—'না না, ওটা একান্ত আবশ্যক! বরাহমিহির আহ্নিক গতিতে বিশ্বাস করেন না।'

নিজের উরুর উপর প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বটুক বলিলেন— 'তবে আমি বিশ্বাস করি। মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি—'

কবি হাসিয়া বলিলেন— 'থাক, উহাতেই হইবে। একেবারে মিথ্যা বলিতে চাহি না।'

বরাহমিহির তখন নিজের বাগ্মিতায় মাতিয়া উঠিয়াছেন; কালিদাস তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুঃখিতভাবে মস্তক আন্দোলন করিয়া কহিলেন— 'আর্য মিহিরভট্ট, বড়ই দুঃসংবাদ শুনিতেছি।'

বরাহমিহির বাক্যস্রোত সম্বরণ করিয়া কহিলেন— 'কি হইয়াছে?'

কালিদাস উপবেশন করিয়া বলিলেন— 'এতক্ষণ তাত অমরসিংহের সহিত কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, আর্যভট্টের মীমাংসাই সত্য; পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে।'

মিহিরভট্ট শূকর-দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া সক্রোধে বলিলেন—'অমরসিংহ একটা নখদন্তহীন বৃদ্ধ ভল্লুক, তাহার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে।'

কালিদাস কহিলেন— 'তিনি বলিতেছেন যে, 'আহ্নিক' নামে একটি নূতন শব্দ শীঘ্রই অমরকোষে সংযোজিত করিবেন। তাহাতে আর্যভট্টের মীমাংসাই—'

মিহিরভট্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অর্ধরুদ্ধ একটি গর্জন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর— 'জড়বুদ্ধি জরদ্গব!' 'শৌণ্ড!' 'উন্মাদ' ইত্যাদি কটূক্তি করিতে করিতে অমরসিংহের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

প্রিয়দর্শিকা ও কালিদাস পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। এই বারাঙ্গনা ও কবির মধ্যে এমন একটি অন্তর্গূঢ় পরিচয় ছিল যে, একে অন্যের মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার মনের অন্তরতম কথাটি জানিতে পারিতেন। আজ কবির চিত্ত কোনও কারণে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রিয়দর্শিকা বুঝিয়াছিল। কিন্তু সে সে-কথা না বলিয়া শ্রদ্ধাবিগলিত অস্ফুট কাকলিতে কহিল—

'কবি, অবলার দুঃখমোচনে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্য আপনার।— কিন্তু ওদিকে যে গজকূর্মের যুদ্ধ বাধিল বলিয়া।'

কবি প্রাণে এক অপরূপ শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র এই নারীর সাহচর্যই যেন তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া তুলিল। তিনি শয্যার উপর অর্ধশায়িত হইয়া প্রিয়দর্শিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রিয়দর্শিকা তাঁহার বাহুর নিম্নে সযত্নে একটি উপাধান ন্যস্ত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া রহিলেন। কবির চোখে প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ শান্তি,—প্রিয়দর্শিকা কিছু বিচলিতা।

তারপর প্রিয়দর্শিকা চক্ষু নত করিল ; তাম্বূল-করঙ্ক কবির সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল— 'ভট্টিনীর সংবাদ কি ?'

কবি ঈষৎ চমকিত হইয়া তাম্বূল লইলেন, ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হইল, বলিলেন— 'ভট্টিনী ? সংবাদ কিছু নাই, তিনি গৃহে আছেন।'

একটা দুঃসহ ক্ষোভের ছায়া প্রিয়দর্শিকার মুখের উপর দিয়া বহিয়া গেল। কিন্তু তাহা নিমেষকালের জন্য। সে হাস্যমুখেই বলিল— 'হায় কবি, এই সপ্তসাগরা পৃথিবী তোমার গুণে পাগল, কিন্তু তোমার গৃহিণী তোমাকে চিনিলেন না।'

বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া কালিদাস বলিলেন— 'চিনিলেন না ! কিন্তু তিনি তো আমাকে—'

প্রিয়দর্শিকা পূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথা-বিদ্ধ কণ্ঠে কহিল— 'আমি সব জানি কবি, আমার কাছে কোনও কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিও না।' তারপর মুহূর্তমধ্যে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করিয়া চটুল স্বরে বলিল— 'কিন্তু থাক্ ও কথা ! আজ কবির ললাটে চিন্তারেখা দেখিতেছি কেন ? যে কাব্য শেষ হইতে আর দেরি নাই বলিয়া সকলকে আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কি এখনও শেষ হয় নাই ?'

কালিদাস উঠিয়া বলিলেন— 'প্রিয়দর্শিকে, বড়ই বিপদে পড়িয়াছি,—গত তিন রাত্রি হইতে আমার নিদ্রা নাই। তোমার পরামর্শ চাহি।'

বিস্মিতা প্রিয়দর্শিকা বলিল— 'কি ঘটিয়াছে ?'

কালিদাস বলিলেন— 'আমি যে কাব্য লিখিতেছি, তাহারই সংক্রান্ত ব্যাপার— অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। তোমাকে উপদেশ দিতে হইবে।'

আনন্দে প্রিয়দর্শিকার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, বাষ্পাচ্ছন্ন নেত্রে সে বলিল— 'কবি, আপনি রসের অমরাবতীতে বিজয়ী বাসব, কল্পনার ধ্যানলোকে আপনি শূলপাণি, আমি আপনাকে উপদেশ দিব ? আমাকে লজ্জা দিবেন না।'

প্রিয়দর্শিকার জানুতে করাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া কবি কহিলেন— 'প্রিয়দর্শিকে, অবন্তীরাজ্যে যদি প্রকৃত রসের বোদ্ধা কেহ থাকে তো সে তুমি— এ কথা অকপটে কহিলাম। আর সকলে পল্লবগ্রাহী, মধুর শব্দে মুগ্ধ, বাহ্য সৌন্দর্যে আকৃষ্ট ; রসের অতলে কেবল তুমিই ডুবিতে পারিয়াছ। তুমি ভাগ্যবতী।'

সজলনেত্রে যুক্তপাণি হইয়া প্রিয়দর্শিকা বলিল— 'কবিবর, আমি সত্যই ভাগ্যবতী। কিন্তু কি আপনার সমস্যা, শুনি। কাব্য কি শেষ হয় নাই ?'

কবি বলিলেন— 'কাব্য শেষ হইয়াছে কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।'

বিস্ময়-কৌতূহল-মিশ্রিত স্বরে প্রিয়দর্শিকা বলিল— 'কাব্য শেষ হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছেন না ? এ তো বড় অদ্ভুত কথা !'

কালিদাস আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া আগ্রহে বলিতে লাগিলেন—'এ পর্যন্ত অন্য কাহাকেও বলি নাই, তোমাকে প্রথম বলিতেছি, শুন। আমার কাব্যের নাম কুমারসম্ভব। স্বয়ং মহেশ্বর এই

কাব্যের নায়ক— পার্বতী নায়িকা। কাব্যের বিষয় এইরূপ—তারকাসুরের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, মহাদেবের ঔরসে স্কন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া তারকাসুরকে সংহার করিবেন। সতীর দেহত্যাগের পর শঙ্কর তখন ধ্যানমগ্ন ; ও-দিকে সতী হিমালয় গৃহে উমা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উমা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া হরের পরিচর্যার জন্য তাঁহার তপোভূমিতে উপস্থিত হইলেন। হরের তপস্যা কিন্তু ভাঙ্গে না। তখন দেবগণ মদনকে তপস্যা ভঙ্গের জন্য পাঠাইলেন। মদন তপোভঙ্গ করিলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং হরনেত্রজন্মা বহ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন। মহাদেব তপোভূমি ত্যাগ করিয়া গেলেন। ভগ্নহৃদয়া উমা তখন পতিলাভার্থে কঠোর তপশ্চর্যা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মহেশ্বর প্রীত হইয়া উমার নিকট ফিরিয়া আসিলেন ; তারপর উভয়ের বিবাহ হইল।'

এই পর্যন্ত বলিয়া কবি থামিলেন। প্রিয়দর্শিকা তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল।

কবি বলিলেন— 'সপ্তম সর্গে আমি হরপার্বতীর বিবাহ দিয়াছি। বধূর সলজ্জ মুখে হাসি ফুটিয়াছে— কন্দর্প পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। কুমারসম্ভব কাব্যের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং কাব্যকলা-সঙ্গত ন্যায়ে কাব্য শেষ হইয়াছে— যথার্থ কি না ?'

প্রিয়দর্শিকা উত্তর করিল না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কবির প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কবি বলিলেন— 'আমিও বুঝিতেছি যে শাস্ত্রমতে কাব্য এইখানেই সমাপ্ত হওয়া উচিত। তথাপি মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জাগিয়াছে।'

'কিসের সন্দেহ ?'

'মনে হইতেছে যেন কাব্য সম্পূর্ণ হইল না। উমা-মহেশ্বরের পূর্বরাগ ও বিবাহ বর্ণনা করিলাম বটে, কিন্তু তবু কাব্যের মূল কথাটি অকথিত রহিয়া গেল। প্রিয়দর্শিকে, তোমার কি মনে হয় ? দেবদম্পতির বিবাহোত্তর জীবন চিত্রিত করা কি কাব্যকলা-সঙ্গত হইবে ?'

প্রিয়দর্শিকা বলিল— 'অলঙ্কার-শাস্ত্রমতে হইবে না। প্রথমত বিষয়াতিরিক্ত বর্ণনা বাগ্‌বাহুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয়ত জগৎপিতা ও জগন্মাতার দাম্পত্যজীবন-বর্ণনা অতিশয় গর্হিত বলিয়া নিন্দিত হইবে।'

কবি জিজ্ঞাসা করিলেন— 'তবে তোমার মতে বিবাহ দিয়াই কাব্য শেষ করা কর্তব্য ?'

প্রিয়দর্শিকা দীর্ঘকাল করতলে কপোল রাখিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে বলিল— 'কবি, কাব্যশাস্ত্রের চেয়ে সত্য বড়। সত্যের অনুজ্ঞায় সকলেই শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে পারে, তাহাতে বাধা নাই।'

কবি বলিলেন— 'কিন্তু এ ক্ষেত্রে সত্য কাহাকে বলিতেছ ?'

প্রিয়দর্শিকা বলিল— 'হরপার্বতীর মিলনই সত্য।'

কবি বলিলেন— 'তাহাই যদি হয় তবে সে সত্য তো পালিত হইয়াছে।'

'হইয়াছে কি ?'

'হয় নাই ?'

'তাহা আমি বলিতে পারিব না ; উহা কবির অন্তরের কথা।'

কবি কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন— 'আমার অন্তরের কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না—তাই এই সংশয়। তোমার অভিমত কি বল।'

প্রিয়দর্শিকা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল— 'আমার অভিমত শুনিবেনই ?'

'হ্যাঁ।'

'না শুনিয়া নিরস্ত হইবেন না ?'

'না।'

'ভাল। আজ আপনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন— রাত্রি গভীর হইয়াছে। কাল প্রাতে যদি আপনার মনে কোনও সংশয় থাকে, আমার অভিমত জানাইব।' —বলিয়া প্রিয়দর্শিকা উঠিয়া দাঁড়াইল।

কবি ঈষৎ নিরাশ হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। প্রিয়দর্শিকা তোরণদ্বার পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিল। বিদায়কালে কবি বলিলেন— 'চলিলাম। মিহিরভট্ট ও অমরসিংহ হইতে দূরে দূরে থাকিও। আর কথাটা চিন্তা করিয়া দেখিও।' দুইজনের চোখে চোখে স্মিতহাস্য বিনিময় হইল।

প্রিয়দর্শিকা বলিল— 'দেখিব।'

কবি যখন নিজ গৃহদ্বারে পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ—অন্ধকার। কবি উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও শব্দ পাইলেন না। বোধ হয় সকলে নিদ্রিত।

তিনি কবাটে করাঘাত করিলেন।

ভিতর হইতে কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'কে ?'

কবি কুণ্ঠিতস্বরে উত্তর করিলেন—'আমি—কালিদাস।'

গৃহের কবাট খুলিল— কবি সভয়ে দেখিলেন প্রদীপ হস্তে স্বয়ং গৃহিণী !

গৃহিণী কহিলেন— 'আসিয়াছ ? এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলে ?'

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কবি ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন— 'প্রিয়ে, তুমি এতক্ষণ জাগিয়া আছ কেন ? দাসীকে বলিলেই তো—'

কবিপত্নী কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলে ?'

সঙ্কুচিত হইয়া কবি কহিলেন— 'সমাপানকে গিয়াছিলাম—'

কবিপত্নীর অবরুদ্ধ ক্রোধ এতক্ষণে ফাটিয়া পড়িল, তিনি প্রজ্বলিত নেত্রে কহিলেন— 'প্রিয়দর্শিকার গৃহে গিয়াছিলে ! বল বল, লজ্জা কি ? কেহ নিন্দা করিবে না। তুমি মহাপণ্ডিত, তুমি সভাকবি, তুমি ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ— বেশ্যালয়ে রাত্রিযাপন করিয়াছ, তাহাতে আর লজ্জা কি ?'

'প্রিয়ে—'

'ধিক্ ! আমাকে প্রিয়সম্বোধন করিতে তোমার কুণ্ঠা হয় না ? কে তোমার প্রিয়া ? আমি— না ঐ সহস্রভোগ্যা পথকুক্কুরী প্রিয়দর্শিকা ?'

কবি নিরুত্তর দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার নীরবতা কবিপত্নীর ক্রোধে ঘৃতাহুতি দিল— 'ধিক্ মিথ্যাচারী ! ধিক্ লম্পট ! কি জন্য রাত্রিশেষে গৃহে আসিয়াছ ? বেশ্যার উচ্ছিষ্টভোগীকে স্পর্শ করিলে কুলাঙ্গনাকে স্নান করিয়া শুচি হইতে হয় ! যাও— গৃহে তোমার কি প্রয়োজন ? যেখানে এতক্ষণ ছিলে, সেইখানেই ফিরিয়া যাও !'— এই বলিয়া কবিপত্নী শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অন্ধকারে কবি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই তাঁহার গৃহ ! এই তাঁহার ভার্যা ! গৃহিণী সচিব সখী প্রিয়শিষ্যা ! গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কবি ফিরিলেন। যে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া কাব্য-রচনা করিতেন সেই প্রকোষ্ঠে গিয়া দীপ জ্বালিলেন।

মৃগচর্ম বিছাইয়া উপবেশন করিতেই অদূরে কাষ্ঠাসনে রক্ষিত কুমারসম্ভবের বৃহৎ পুঁথির উপর দৃষ্টি পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় আকস্মিক প্রভা তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে খেলিয়া গেল। প্রিয়দর্শিকা ঠিক বুঝিয়াছিল। সে বলিয়াছিল— 'কাল প্রাতে যদি কোনও সংশয় থাকে— ।' না, তাঁহার মনে আর লেশমাত্র সংশয় নাই। পত্নীর সহিত সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ের অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে।

কালিদাস উঠিলেন। প্রদীপদণ্ড আনিয়া আসনপার্শ্বে রাখিলেন, কাষ্ঠাসন-সমেত পুঁথি সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মসীপাত্র, লেখনী ও তালপত্র পাড়িয়া আবার আসিয়া বসিলেন।

ক্রমে তাঁহার মুখের ভাব স্বপ্নাচ্ছন্ন হইল। লেখনী মুষ্টিতে লইয়া তালপত্রের উপর পরীক্ষা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে লিখিলেন— 'অষ্টমঃ সর্গঃ।'

এই পর্যন্ত লিখিয়া অতি দীর্ঘকাল দৃষ্টিহীন নয়নে গবাক্ষের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাহিরে তামসী রাত্রি, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। কিন্তু কবির মানসপটে যে চিত্রগুলি একে একে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, তাহা বসন্তের গন্ধে বর্ণে কাকলিতে সমাকুল— বর্ষা রজনীর শ্যামসজল ছায়া তাহার অম্লান দীপ্তিকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

সহসা অবনত হইয়া কবি লিখিতে আরম্ভ করিলেন, শরের লেখনী তালপত্রের উপর শব্দ করিয়া চলিতে লাগিল—'পাণিপীড়নবিধেরনন্তরম্—'

৩০ আষাঢ় ১৩৪০



চুয়াচন্দন

একদিন গ্রীষ্মের শেষভাগে, সূর্য মধ্যাকাশে আরোহণ করিতে তখনও দণ্ড তিন-চার বাকি আছে, এমন সময় নবদ্বীপের স্নানঘাটে এক কৌতুকপ্রদ অভিনয় চলিতেছিল।

ভাগীরথীর পূর্বতটে নবদ্বীপ। স্নানের ঘাটও অতি বিস্তৃত— এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে। ঘাটের সারি সারি পৈঠাগুলি যেমন উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত, তেমনি প্রত্যেকটি পৈঠা প্রায় সেকালের সাধারণ রাজপথের মতো চওড়া। গ্রীষ্মের প্রখরতায় জল শুকাইয়া প্রায় সব পৈঠাই বাহির হইয়া পড়িয়াছে— দু'-এক ধাপ নামিলেই নদীর কাদা পায়ে ঠেকে। স্নানের ঘাট যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে বাঁধানো খেয়াঘাট আরম্ভ। তথায় খেয়ার নৌকা, জেলে-ডিঙ্গি, দুই-একটা হাজারমনী মহাজনী ভড় বাঁধা আছে। নৌকাগুলির ভিতরে দৈনিক রন্ধনকার্য চলিতেছে,—ছই ভেদ করিয়া মৃদু মৃদু ধূম উত্থিত হইতেছে।

বহুজনাকীর্ণ স্নান-ঘাটে ব্যস্ততার অন্ত নাই। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। ঘাটের জনতাকে সমগ্রভাবে দর্শন করিলে মনে হয়, মুণ্ডিতশীর্ষ উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ও প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা নারীর সংখ্যাই বেশি। ছেলে-ছোকরার দলও নেহাৎ কম নয়; তাহারা সাঁতার কাটিতেছে, জল তোলপাড় করিতেছে। নারীদের স্নানের জন্য কোনও পৃথক ব্যবস্থা নাই, যে যেখানে পাইতেছে সেখানেই স্নান করিতেছে। তরুণী বধূরা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া টুপ্ টুপ্ ডুব দিতেছে। পর্দাপ্রথা বলিয়া কিছু নাই বটে, তবু অবগুণ্ঠন দ্বারা শালীনতারক্ষার একটা চেষ্টা আছে; যদিও সে চেষ্টা তনু-সংলগ্ন সিক্তবস্ত্রে বিশেষ মর্যাদা পাইতেছে না। সেকালে বাঙালী মেয়েদের দেহলাবণ্য গোপন করিবার সংস্কার বড় বেশি প্রবল ছিল না; গৃহস্থ-কন্যাদের কাঁচুলি পরিবার রীতিও প্রচলিত হয় নাই।

যে যুগের কথা বলিতেছি, তাহা আজ হইতে চারি শতাব্দীরও অধিককাল হইল অতীত হইয়াছে। সম্ভবত আমাদের ঊর্ধ্বতন পঞ্চদশ পুরুষ সে সময় জীবিত ছিলেন। তখন বাংলার ঘোর দুর্দিন যাইতেছিল। রাজশক্তি পাঠানের হাতে; ধর্ম ও সমাজের বন্ধন বহু যুগের অবহেলায় গলিত রজ্জু-বন্ধনের ন্যায় খসিয়া পড়িতেছে। দেশও যেমন অরাজক, সমাজও তেমনি

বহুরাজক। কেহ কাহারও শাসন মানে না। মৃত বৌদ্ধধর্মের শবনির্গলিত তন্ত্রবাদের সহিত শাক্ত ও শৈব মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বীভৎস বামাচার উত্থিত হইয়াছে— তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঙালী অন্ধ-মত্ততায় অধঃপথের পানে স্খলিতপদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সহজিয়া সাধনার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল অজাচার চলিয়াছে, তাহার কোনও নিষেধ নাই। কে কাহাকে নিষেধ করিবে? যাহারা শক্তিমান, তাহারাই উচ্ছৃঙ্খলতায় অগ্রবর্তী। মাতৃকাসাধন, পঞ্চ-মকার উদ্দাম নৃত্যে আসর দখল করিয়া আছে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের চর্চা দেশ হইতে যেন উঠিয়া গিয়াছে।

তখনও স্মার্ত রঘুনন্দন আচারকে ধর্মের নিগূঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া সমাজের শোধন-সংস্কার আরম্ভ করেন নাই। কাণভট্ট রঘুনাথ মিথিলা জয় করিয়া ফিরিয়াছেন বটে, কিন্তু নবদ্বীপে সরস্বতীর পীঠ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নদের নিমাই তখনও ব্যাকরণের টোলে ছাত্র পড়াইতেছেন ও নানাপ্রকার ছেলেমানুষি করিতেছেন। তখনও সেই হরিচরণস্রুত প্রেমের বন্যা আসে নাই— বাঙালীর ক্লেদকলুষিত চিত্তের বহু শতাব্দী সঞ্চিত মলামাটি সেই পূত প্রবাহে ধৌত হইয়া যায় নাই।

১৪২৬ শকাব্দের প্রারম্ভে এক কৃষ্ণা চতুর্দশীর পূর্বাহ্ণে বাংলার কেন্দ্র নবদ্বীপের ঘাটে কি হইতেছিল, তাহাই লইয়া এই আখ্যায়িকার আরম্ভ।

ঘাটে যে সকলেই স্নান করিতেছে, তাহা নয়। এক পাশে সারি সারি নাপিত বসিয়া গিয়াছে; বহু ভট্টাচার্য গোঁসাই গলা বাড়াইয়া ক্ষৌরী হইতেছেন। বুরুজের গোলাকৃতি চাতালে একদল উলঙ্গপ্রায় পণ্ডিত দেহে সবেগে তৈলমর্দন করিতে করিতে ততোধিক বেগে তর্ক করিতেছেন। বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা হইতে সর্ববিদ্যায় পারংগম হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর হইতে নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যা তখনও হৃদয়ে আসন স্থাপন করেন নাই; তাই বাঙালী পণ্ডিতের মুখের দাপট কিছু বেশি ছিল। শাস্ত্রীয় তর্ক অনেক সময় আঁচড়া-কামড়িতে পরিসমাপ্তি লাভ করিত।

তৈল-মসৃণ পণ্ডিতদের তর্কও ন্যায়শাস্ত্রের সীমানা ছাড়াইয়া অরাজকতার দেশে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিল। একজন অতি গৌরকান্তি যুবা— বয়স বিশ বছরের বেশি নয়— তর্ক বাধাইয়া দিয়া, পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের বিতণ্ডা শুনিতেছিল ও মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। তাহার ঈষদরুণ আয়ত চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের অভিমান ও কৌতুক একসঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতেছিল।

জলের কিনারায় বসিয়া কেহ কেহ পায়ে ঝামা ঘষিতেছিল। নারীরা বস্ত্রাবরণের মধ্যে ক্ষার-খৈল দিয়া গাত্র মার্জনা করিতেছিল। কয়েকজন বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণ আবক্ষ জলে নামিয়া পূর্বমুখ হইয়া আহ্নিক করিতেছিলেন।

এই সময় দক্ষিণ দিকে গঙ্গার বাঁকের উপর দুইখানি বড় সামুদ্রিক নৌকা পালের ভরে উজান ঠেলিয়া ধীরে ধীরে নবদ্বীপের ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল—অধিকাংশ স্নানার্থীর দৃষ্টি সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল। সমুদ্রযাত্রী বাণিজ্যতরীদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; প্রতি সপ্তাহেই দুটি একটি করিয়া ফিরিতেছিল।

ক্রমে নৌকা দুইটি খেয়ার ঘাটে গিয়া ভিড়িল। মধুকর ডিঙ্গার ছাদের উপর একজন যুবা দাঁড়াইয়া পরম আগ্রহের সহিত ঘাটের দৃশ্য দেখিতেছিল; পাল নামাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেও তীরে অবতরণ করিবার জন্য ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

বড় নৌকা ঘাটের নিকট দিয়া যাইবার ফলে জলে ঢেউ উঠিয়া ঘাটে আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অনেক ছেলে-ছোকরা কোমরে গামছা বাঁধিয়া ঢেউ খাইবার জন্য জলে নামিয়াছিল। ঢেউয়ের মধ্যে বহু সন্তরণকারী বালকের হস্তপদসঞ্চালনে ঘাট আলোড়িত হইয়া

উঠিয়াছিল।

হঠাৎ তীর হইতে একটা 'গেল গেল' রব উঠিল। যে গৌরকান্তি যুবাটি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তর্করত পণ্ডিতদের রঙ্গ দেখিতেছিল, সে দুই লাফে জলের কিনারায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ?"

কয়েকজন সমস্বরে উত্তর দিল, "কানা-গোঁসাই এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করছিলেন, হঠাৎ তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। ভাবে-ভোলা মানুষ, হয়তো নৌকোর ঢেউ লেগে তলিয়ে গেছেন।"

যুবা কোমরে গামছা বাঁধিতে বাঁধিতে শুনিতেছিল, আদেশের স্বরে কহিল, "তোমরা কেউ জলে নেমো না, তাহলে গণ্ডগোল হবে। আমি দেখছি।" —বলিয়া সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মকালে ঘাটে স্নান করা ভাবে-ভোলা মানুষদের পক্ষে সর্বদা নিরাপদ নয়। কারণ, জলের মধ্যে দুই ধাপ সিঁড়ি নামিয়াই শেষ হইয়াছে— তারপর কাদা। এখানে বুক পর্যন্ত জলে বেশ যাওয়া যায়, কিন্তু আর এক পা অগ্রসর হইলেই একেবারে ডুবজল। যুবক জলে ঝাঁপ দিয়া কয়েক হাত সাঁতার কাটিয়া গেল, তারপর অথৈ জলে গিয়া ডুব দিল।

কিছুক্ষণ তাহার আর কোনও চিহ্ন নাই। ঘাটের ধারে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। সকলের মুখেই উদ্বেগ ও আশঙ্কার ছায়া। কয়েকজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ক্রন্দন-করুণ সুরে হা-হুতাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

পঞ্চাশ গুণিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ পরে যুবকের মাথা জলের উপর জাগিয়া উঠিল। সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল— কিন্তু পরক্ষণেই আবার নীরব হইল। যুবক নিমজ্জিত ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, সে বার-কয়েক সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া আবার ডুব দিল।

এবারও সমধিক কাল ডুবিয়া থাকিয়া সে আবার উঠিল ; একবার সজোরে মস্তক সঞ্চালন করিয়া এক হাতে সাঁতার কাটিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইল।

সকলে সচিৎকারে প্রশ্ন করিল, "পেয়েছ ? পেয়েছ ?"

যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "বলতে পারি না। তবে এক মুঠো টিকি পেয়েছি।"

যুবক যখন তীরে আসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার বামমুষ্টি এক গুচ্ছ পরিপুষ্ট শিখা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে এবং নিমজ্জিত পণ্ডিতের দেহসমেত মুণ্ড উক্ত শিখার সহিত সংলগ্ন হইয়া আছে।

কিয়ৎকাল শুশ্রূষার পর পণ্ডিতের চৈতন্য হইল। তিনি কিছু জল পান করিয়াছিলেন, তাহা উৎক্ষিপ্ত হইবার পর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। যুবক সহাস্যকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "শিরোমণি মশায়, বলুন দেখি বেঁচে আছেন, না মরে গেছেন ? আপনার নব্য ন্যায়শাস্ত্র কি বলে ?"

শিরোমণি এক চক্ষু দ্বারা কিছুক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "কে—নিপাতনে সিদ্ধ ? ডুবে গিয়েছিলুম—না ? তুমি বাঁচালে ?" যুবককে শিরোমণি মহাশয় 'নিপাতনে সিদ্ধ' বলিয়া ডাকিতেন। একটু ব্যাকরণের খোঁচাও ছিল ; কূটতর্কে অপরাজেয় শক্তির জন্য সমাদরমিশ্রিত স্নেহও ছিল।

নিপাতনে সিদ্ধ হাসিয়া বলিল, "বাঁচাতে পেরেছি কি না, সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি। যদি বেঁচে থাকেন, ন্যায়ের প্রমাণ দিন।"

কাণভট্ট ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। এইমাত্র মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন— শরীরে বল নাই ; কিন্তু তাঁহার এক চক্ষুতে প্রাণময় হাসি ফুটিয়া উঠিল ; তিনি বলিলেন, "প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। আমি বেঁচে আছি— এ কথা স্বয়ংসিদ্ধ। আমি বেঁচে নেই, এ কথা যে বলে, সে তৎক্ষণাৎ প্রমাণ করে দেয় যে, সে বেঁচে আছে। বাজিকর যত কৌশলী হোক, নিজের স্কন্ধে

আরোহণ করতে অক্ষম : মানুষ তেমনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারে না।"

নৈয়ায়িকের কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল। নিপাতনে সিদ্ধ বলিল, "যাক, তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। — এখন উঠতে পারবেন কি ?"

শিরোমণি তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "হঠাৎ হাতে পায়ে কেমন খিল ধরে গিয়েছিল। নিপাতন, তুমিই জল থেকে টেনে তুলেছ, না ?"

নিপাতন বলিল, "উহু। আপনাকে টেনে তুলেছে আপনার প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের বিজয়নিশান।"

"সে কি ?"

"আপনার নধর শিখাটিই আপনার প্রাণদাতা ! ওটি না থাকলে কিছুতেই টেনে তুলতে পারতাম না।"

"জ্যাঠা ছেলে।"

"আপনার পৈতে ছুঁয়ে বলছি— সত্যি কথা। — কিন্তু সে যা হোক, একলা বাড়ি ফিরতে পারবেন তো ?"

"পারব, এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি।" তারপর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "বিশ্বম্ভর, এত দিন জানতাম তুমি নিপাতনেই সিদ্ধ, কিন্তু এখন দেখছি প্রাণদানেও তুমি কম পটু নও। আশীর্বাদ করি, এমনি ভাবে মজ্জমানকে উদ্ধার করেই যেন তোমার জীবন সার্থক হয়।"

নিপাতন হাসিয়া বলিল, "কি সর্বনাশ ! শিরোমণি মশায়, ও আশীর্বাদ করবেন না। তাহলে আমার ব্যাকরণ-টোলের কি দশা হবে ?"

ও-দিকে নৌকার মালিক যুবকটি এ-সব ব্যাপার কিছুই জানিতে পারে নাই। সে নগর-ভ্রমণের উপযুক্ত সাজসজ্জা করিয়া ঘাটে নামিল। স্নান-ঘাটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল, এক অতি গৌরকান্তি সুপুরুষ যুবা একজন মধ্যবয়স্ক একচক্ষু ব্যক্তির সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। এই গৌরাঙ্গ যুবকের অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সে পৃথিবীর অনেক দেশ দেখিয়াছে ; সিংহল কোচিন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ— কোথাও যাইতে তাহার বাকি নাই। কিন্তু এমন অপরূপ তেজোদীপ্ত পুরুষমূর্তি আর কখনও দেখে নাই।

একজন জেলে-মাঝি নিজের ক্ষুদ্র ডিঙ্গিতে বসিয়া জাল বুনিতেছিল, যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাপু, ঐ লোকটি কে জানো ?"

জেলে একবার চোখ তুলিয়া বলিল, "ঐ উনি ? উনি নিমাই পণ্ডিত।"

যুবক ভাবিল— পণ্ডিত ! এত অল্প বয়সে পণ্ডিত ! যুবকের নিজের পাণ্ডিত্যের সহিত কোনও সুবাদ ছিল না। সে বেনের ছেলে, বুদ্ধির বলেই সাত সাগর চষিয়া সোনাদানা আহরণ করিয়া আনিয়াছে। সে আর একবার নিমাই পণ্ডিতের অনিন্দ্য দেহকান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হৃষ্টচিত্তে নগর পরিদর্শনে বাহির হইল।

বেনের ছেলের নাম চন্দনদাস। বেশ সুশ্রী চোখে-লাগা চেহারা ; বয়স একুশ-বাইশ। বুদ্ধিমান, বাক্‌পটু, বিনয়ী— বেনের ছেলের যত প্রকার গুণ থাকা দরকার, সবই আছে ; বরং দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া নানাজাতীয় লোকের সহিত মিশিয়া আরও পরিমার্জিত হইয়াছে। বেশভূষাও ঘরবাসী বাঙালী হইতে পৃথক। পায়ে সিংহলী চটি, পরিধানে চাঁপা রঙের রেশমী ধুতি মালসাট করিয়া পরা ; স্কন্ধে উত্তরীয়। দুই কানে হীরার লবঙ্গ ; মাথার কোঁকড়া চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে— মাঝখানে সিঁথি। গলায় সোনার হার বণিক্‌পুত্রের জাতি-পরিচয় দিতেছে।

চন্দনদাস অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ সওদাগর রূপচাঁদ সাধুর পুত্র। রূপচাঁদ সাধুর বয়স হইয়াছে, তাই এবার নিজে না গিয়া উপযুক্ত পুত্রকে বাণিজ্যে পাঠাইয়াছিলেন। এক বৎসর নয় মাস পরে ছেলে

বিলক্ষণ দু-পয়সা লাভ করিয়া দেশে ফিরিতেছে। বহুদিন একাদিক্রমে নৌকা চালাইয়া মাঝি-মাল্লারা ক্লান্ত ; তাই একদিনের জন্য চন্দনদাস নবদ্বীপে নৌকা বাঁধিয়াছে। কাল প্রভাতেই আবার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবে।

চন্দনদাস হরষিত-মনে গঙ্গাঘাটের পথ ধরিয়া নগর দর্শনে চলিল। সে সময় নবদ্বীপের সমৃদ্ধির বিশেষ খ্যাতি ছিল। পথে পথে নাটশালা, পাঠশালা, চূর্ণ বিলেপিত দেউল, প্রতি গৃহচূড়ায় বিচিত্র ধাতু-কলস, প্রতি দ্বারে কারু-খচিত কপাট ; বাজারের এক বিপণিতে লক্ষ তঙ্কার সওদা কেনা যায়। পথগুলি সংকীর্ণ বটে, কিন্তু তাহাতে নগরশ্রী আরও ঘনীভূত হইয়াছে। রাজপথে বহু লোকের ব্যস্ত যাতায়াত নগরকে সজীব ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

অনায়াস-মন্থরপদে চন্দনদাস চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছিল ; কিছুদূর যাইবার পর একটি জিনিস দেখিয়া হঠাৎ তাহার বাইশ বছরের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল ; সে পথের মাঝখানেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। বেচারা চন্দনদাস সাত সাগর পাড়ি দিয়াছে ; কিন্তু সে বিদ্যাপতির কাব্য পড়ে নাই— 'মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল'— এরূপ ব্যাপার যে সম্ভবপর, তাহা সে জানিত না। বিদ্যাপতি জানা থাকিলে হয়তো ভাবিতে পারিত—

অপরূপ পেখলুঁ রামা
কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা।

কিন্তু চন্দনদাস কাব্যরসবঞ্চিত বেনের ছেলে, আত্মবিস্মৃতভাবে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। প্রভাতে সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল কে জানে, কিন্তু আজ তাহার সুন্দর মুখ দেখিবার পালা।

যাহাকে দেখিয়া চন্দনদাসের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল, সে মেয়েটি একজন বয়স্কা সহচরীর সঙ্গে ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছিল। পূর্ণযৌবনা ষোড়শী— তাহার রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া হতাশ হইতে হয়। বৈষ্ণব-রসসাহিত্য নিঙড়াইয়া এই রূপের একটা কাঠামো খাড়া করা যাইতে পারে ; হয়তো এমনই কোনও গোরোচনা গোরী নবীনার নববিকশিত রূপ দেখিয়া প্রেমিক বৈষ্ণব কবি তাঁহার রাই-কমলিনীকে গড়িয়াছিলেন, কে বলিতে পারে ? মেয়েটির প্রতি পদক্ষেপে দর্শকের হৃৎকমল দুলিয়া দুলিয়া উঠে, যেন হৃৎকমলের উপর পা ফেলিয়া সে চলিয়াছে। তাহার মদির নয়নের অপাঙ্গদৃষ্টিতে মনের মধ্যে মধুর মাদকতা উন্মথিত হইয়া উঠে।

কিন্তু এত রূপ সত্ত্বেও মেয়েটির মুখখানি ম্লান, যেন তাহার উপর কালো মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। চোখ দুটি অবনত করিয়া ধীরপদে সে চলিয়াছে ; তৈলসিক্ত চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো ; পরণে আটপৌরে রাঙাপাড় শাড়ি। দেহে একখানিও গহনা নাই, এমন কি, নাকে বেসর, কানে দুল পর্যন্ত নাই। কেবল দুই হাতে দু'গাছি শঙ্খ।

মেয়েটির সঙ্গে যে সহচরী রহিয়াছে, তাহাকে সহচরী না বলিয়া প্রতিহারী বলিলেই ভালো হয়। সে যেন চারিদিক হইতে তাহাকে আগলাইয়া চলিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায়, বিগতযৌবনা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক। আঁটসাঁট দোহারা গঠন, গোলাকৃতি মুখ, কলহপ্রিয় বড় বড় দুইটা চোখ যেন সর্বদাই ঘুরিতেছে।

চন্দনদাস হাঁ করিয়া পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রহিল, মেয়েটি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। পাশ দিয়া যাইবার সময় একবার চকিতের ন্যায় চোখ তুলিল, আবার তৎক্ষণাৎ মাথা হেঁট করিল। সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটা কটমট করিয়া চন্দনদাসের পানে তাকাইল, তাহার আত্মবিস্মৃত বিহ্বলতার জন্য যেন কিছু বলিবে মনে করিল। কিন্তু চন্দনদাসের বিদেশীর মতো সাজ-সজ্জা দেখিয়া কিছু না বলিয়া সমস্ত দেহের একটা স্বৈরিণীসুলভ ভঙ্গি করিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনদাসও অমনি ফিরিল। তাহার নগর ভ্রমণের কথা আর মনে ছিল না, সে একদৃষ্টে মেয়েটিব দিকে তাকাইয়া রহিল। মেয়েটিও কয়েক পা গিয়া একবার ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিল। 'গেলি কামিনী, গজহু গামিনী, বিহসি পালটি নেহারি'—চন্দনদাসের যেটুকু সর্বনাশ হইতে বাকি ছিল, তাহাও এবার হইয়া গেল।

সেও গঙ্গাঘাটের দিকে ফিরিল, অগ্রবর্তিনী স্নানার্থিনীদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইতে না দিয়া তাহাদের পিছু পিছু চলিল।

ক্রমে তাহারা ঘাটের সম্মুখে পৌঁছিল। এখানে চন্দনদাস আবার নিমাই পণ্ডিতকে দেখিতে পাইল। তিনি স্নান শেষ করিয়া বোধ হয় গৃহে ফিরিতেছিলেন ; ভিজা গামছা গায়ে জড়ানো। চন্দনদাস লক্ষ্য করিল, মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই নিমাই পণ্ডিতের মুখে একটা ক্ষুব্ধ কারুণ্যের ভাব দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর স্ত্রীলোক দুইটি ঘাটে গিয়া স্নান করিল। চন্দনদাস একটু আড়ালে থাকিয়া চোরা চাহনিতে দেখিল। চন্দনদাস দুষ্মন্ত নয়,—"অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা" তাহার মনে আসিল না ; কিন্তু নানা ক্ষুদ্র কারণে তাহার ধারণা জন্মিল যে, মেয়েটি বেনের মেয়ে, তাহার স্বজাতি। কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, এত বয়স পর্যন্ত মেয়েটি অনূঢ়া কেন ? বিধবা নয়, হাতের শঙ্খ ও রাঙাপাড় শাড়ি তাহার প্রমাণ। তবে ষোল-সতের বছরের মেয়ে বাংলাদেশে অবিবাহিতা থাকে কি করিয়া ?

কিন্তু সে যাহা হউক, স্নান সারিয়া তাহারা যখন ফিরিয়া চলিল, তখন সেও তাহাদের পিছু লইল।

চন্দনদাসের ব্যবহারটা বর্তমানকালে কিছু বর্বরোচিত বোধ হইতে পারে ; কিন্তু একালের রুচি দিয়া সেকালের শিষ্টাচার বিচার করা সর্বদা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে শিষ্টাচারের সূক্ষ্ম অনুশাসন মানিয়া চলিবার মতো হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা চন্দনদাসের ছিল না। তাঁহার কাঁচা হৃদ্‌যন্ত্রটা একেবারেই অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া সেকালের ঠাকুর-দেবতারাও কিরূপ বিহ্বল বে-এক্তিয়ার হইয়া পড়িতেন, তাহা তো ভক্ত কবিগণ লিপিবদ্ধ করিয়াই গিয়াছেন। — "এ ধনি কে কহ বটে !"

মোট কথা, চন্দনদাস তাহার মন-চোরা মেয়েটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এ-পথ হইতে ও-পথে কয়েকটা মোড় ফিরিয়া প্রায় একপোয়া পথ অতিক্রম করিবার পর মেয়েটি এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দনদাস দেখিল, পাড়াটা অপেক্ষাকৃত গরিব বেনেপাড়া। অধিকাংশ বাড়ির খড়ের বা খোলার চাল।

গলির মধ্যে কিছুদুর গিয়া মেয়েটি এক ক্ষুদ্র পাকা বাড়ির দালানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বাড়িটা পাকা বটে, কিন্তু অতিশয় জীর্ণ ও শ্রীহীন। বাড়ির সম্মুখীন হইয়া চন্দনদাস দেখিল, দালানের উপর একটি ক্ষুদ্র বেনের দোকান। আদা, মরিচ, হলুদ, চই ছোট ছোট ধামাতে সাজানো আছে ; একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বেসাতি করিতেছে। দালানের পশ্চাদ্ভাগে একটি দ্বার, উহাই অন্দরে প্রবেশ করিবার পথ। চন্দনদাস বুঝিল, ঐ পথেই মেয়েটি ও তাহার সঙ্গিনী অন্দরে প্রবেশ করিয়াছে।

চন্দনদাস বড় সমস্যায় পড়িল। সে কোনও মতলব স্থির করিয়া ইহাদের অনুসরণ করে নাই, গুণের নৌকার ন্যায় অদৃশ্য রজ্জুবন্ধন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু এখন সে কি করিবে ? কেবলমাত্র মেয়েটির বাড়ি দেখিয়া ফিরিয়া যাইবে ? চন্দনদাস বাড়ির সম্মুখ দিয়া কয়েকবার অলসভাবে যাতায়াত করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, তাহার মা তাহাকে নবদ্বীপ হইতে ভালো চুয়া কিনিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। সে-কথা সে ভুলে নাই,

আজ নগর-ভ্রমণের সময় কিনিয়া লইবে স্থির করিয়াছিল ; কিন্তু চুয়া কিনিবার অছিলা এমনভাবে সদ্ব্যবহার করিবার কথা এতক্ষণ তাহার মনেই আসে নাই।

সে দৃঢ়পদে দোকানের সম্মুখীন হইল ; মিঠা হাসিয়া বুড়িকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগো ভালোমানুষের মেয়ে, তোমার দোকানে ভালো চুয়া আছে ?"

যে বৃদ্ধা বেসাতি করিতেছিল, তাহার দেহ-যষ্টিতে বিন্দুমাত্র রস না থাকিলেও, প্রাণটা তাজা ও সরস ছিল। চন্দনদাসকে বাড়ির সম্মুখে অকারণ ঘুর্‌ঘুর্ করিতে দেখিয়া বুড়ি এই অনিশ্চিত ঘোরাঘুরির গূঢ় কারণটি ধরিয়া ফেলিয়াছিল এবং মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করিতেছিল। পাড়ার কোনও চ্যাংড়া ছোঁড়া হইলে বুড়ি মুখ ছাড়িত ; কিন্তু এই কান্তিমান সুদর্শন ছেলেটির বিদেশীর মতো সাজ-পোশাক দেখিয়া সে একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল।

চন্দনদাসের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "আছে বইকি বাছা। এসো, বসো।"

চন্দনদাসও তাই চায়, সে দালানে উঠিয়া জলচৌকির উপর চাপিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, তোমাদের বাড়িতে কি পুরুষমানুষ নেই ? তুমি নিজে বেসাতি করছ যে ?"

বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে কথা আর বলো না বাছা ; একটা ব্যাটাছেলে ঘরে থাকলে কি আজ আমাদের এমন খোয়ার হয় ?" তারপর কথা পাল্টাইয়া বলিল, "তা হ্যাঁ বাছা, তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি, ন'দের লোক নও বুঝি ?"

চন্দনদাস বলিল, "না, আমার বাড়ি অগ্রদ্বীপ।"

বুড়ি বলিল, "ও—তাই। কথায়-বার্তায় যেন বেনের ছেলে বলে মনে হচ্ছে।"

চন্দনদাস তখন জাতি-পরিচয় দিল, নিজের ও পিতার নাম উল্লেখ করিল। বুড়ি দু'দণ্ড বসিয়া গল্প করিবার লোক পায় না, সে আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া বলিল, "ও মা, তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে গো— স্বজাত ! আহা, যেমন সোনার কার্তিকের মতো চেহারা, তেমনি মা'র কোল জুড়ে বেঁচে থাকো। — কোথায় বিয়ে-থা করেছ ?"

চন্দনদাস কহিল, "তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আয়ি, এক বছর পরেই বৌ মরে যায়। তারপর আর বিয়ে করিনি।"

বুড়ি একটু বিমনা হইল ; তারপর উৎসুকভাবে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

চন্দনদাস কথাপ্রসঙ্গে বলিল, "সমুদ্রে গিয়েছিলাম আয়ি, দু'বছর পরে দেশে ফিরছি। তা ভাবলাম, ন'দেয় একদিন থেকে যাই ; মা'র বরাত আছে চুয়া কেনবার, চুয়া কেনাও হবে, একটু জিরেন দেওয়াও হবে।"

বুড়ি বলিল, "তা বেশ করেছ বাছা, ভাগ্যিস এসেছিলে তাই তো অমন চাঁদমুখখানি দেখতে পেলাম।" বুড়ি একটা নিশ্বাস ফেলিল। তাহার প্রাণের ভিতরটা হায় হায় করিয়া উঠিল। আহা, যদি সম্ভব হইত।

চন্দনদাস এতক্ষণ ফাঁক খুঁজিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "আয়ি, তোমার আপনার জন কি আর কেউ নেই ?"

"একটি নাতনী আছে, আর সব মরে হেজে গেছে। পোড়াকপালী ছুঁড়ির কপাল !" — বলিয়া বুড়ি আঁচলে চোখ মুছিল।

"নাতনী !"—চন্দনদাস সচকিত হইয়া উঠিল ; তবে বুড়ির নাতনীকেই সে দেখিয়াছে। —"তবে তুমি বুড়োমানুষ দোকান দেখ কেন ? সে দেখতে পারে না ?"

বুড়ি উদাস আশাহীন সুরে বলিল, "সে অনেক কথা, বাছা। আমাদের দুঃখের কাহিনী কাউকে বলবার নয়। সমাজ আমাদের বিনা দোষে জাতে ঠেলেছে, মুখ তুলে চাইবার কেউ নেই। আর কাকেই বা দোষ দেব, সব দোষ ঐ হতভাগীর কপালের। এমন রূপ নিয়ে

জন্মেছিল, ঐ রূপই ওর শত্তুর।"

চন্দনদাসের কৌতূহল ও উত্তেজনা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "কি ব্যাপার আয়ি ? সব কথা খুলেই বলো না।"

বুড়ি কিন্তু রাজী হইল না, বলিল, "কি হবে বাবা, আমাদের লজ্জার কথা শুনে ? কিছু তো করতে পারবে না, কেবল মনে দুঃখ পাবে।"

"কে বললে, কিছু পারব না ?"

"না বাবা, সে কেউ পারবে না।— আহা ! সোনার প্রতিমা আমার কালই জলে ভাসিয়ে দিতে হবে রে !"—বলিয়া বুড়ি হঠাৎ মুখে কাপড় চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চন্দনদাস বুড়ির হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আয়ি, আমি বেনের ছেলে, তোর গা ছুঁয়ে বলছি, মানুষের যা সাধ্য আমি তা করব। তোর নাতনীর কি বিপদ বল্।"

বুড়ি উত্তর দিবার পূর্বেই, বোধ করি তাহার ক্রন্দনের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সেই বিগতযৌবনা প্রহরিণী বাহির হইয়া আসিল, কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছিস কেন রে, বুড়ি ? কি হয়েছে ?"

বুড়ি বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী, তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, "কিছু নয় রে চাঁপা— অমনি। এই ছেলেটি দূর-সম্পর্কে আমার নাতি হয়, অনেক দিন পরে দেখলুম— তাই—"

চাঁপা চন্দনদাসের দিকে ফিরিল, বৃহৎ সুবর্তুল চক্ষু তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বুড়ির উদ্দেশে বলিল, "হুঁ— নাতি !— তোর নাতি আছে, আগে কখনও বলিসনি তো ?"

বুড়ি কম্পিতস্বরে বলিল, "বললুম না, দূর-সম্পর্কে। আমার পিসতুত বোনের—"

চাঁপা বলিল, "বুঝেছি।" —তারপর চন্দনদাসকে প্রশ্ন করিল, "তোমাকে আজ পথে দেখেছি না ?"

চন্দনদাস সটান মিথ্যা কথা বলিল, "কই, না ! আমার তো মনে পড়ছে না !"

চাঁপা তীক্ষ্ণ-চক্ষে আরও কিছুক্ষণ চন্দনদাসকে নিরীক্ষণ করিল, শেষে মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিল, "তবে আমারই ভুল। বুড়ি, তুই তাহলে তোর নাতির সঙ্গে কথা ক'— আমি একটু পাড়া বেড়িয়ে আসি। তোর নাতি আজ এখানে থাকবে তো ? দেখিস, ছেড়ে দিসনি যেন, এমন রসের নাতি কালেভদ্রে পাওয়া যায়।"—বলিয়া চোখ ঘুরাইয়া বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল।

চাঁপা দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেলে চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কে ?"

বুড়ির তখনও হৃদ্‌কম্প দূর হয় নাই, সে বলিল, "ও মাগী যমের দূত। বাবা, এমন ভয় হয়েছিল— এখনি টুঁটি টিপে ধরত। তুই যা দাদা, আর এখানে থাকিসনি। ওরে, তুই আমাদের কি ভালো করবি ? ভগবান আমাদের ভুলে গেছেন। তুই এখান থেকে পালা, শেষে কি মায়ের নিধি বেঘোরে প্রাণ দিবি ?"

চন্দনদাস বলিল, "সে কি ঠান্‌দি, নাতিকে কি এমনি করেই তাড়াতে হয় ? একটা পান পর্যন্ত দিতে নেই ? তা ছাড়া চুয়া কিনতে এসেছি, চুয়া না দিয়েই তাড়িয়ে দিচ্ছিস ? তুই কেমন বেনের মেয়ে ?"

বুড়ি এবার হাসিয়া ফেলিল। এই ছেলেটির মুখের কথা যতই সে শুনিতেছিল, ততই তাহার মন ভিজিতেছিল। তাহার প্রাণের একান্তে বিদলিত মুহ্যমান আশা একটু মাথা তুলিল। তবে কি এই শেষ সময়ে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন ?

বুড়ি মনে ভাবিল,— যা হয় তা হয়, একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিব। কে বলিতে পারে, হয়তো অভাগিনীর ভাগ্যে চরম দুর্গতি বিধাতা লেখেন নাই ; নচেৎ নিরাশার গাঢ় অন্ধকারের

মধ্যে এই অপরিচিত বন্ধু কোথা হইতে আসিয়া জুটিল ?

তখন বুড়ি সংকল্প স্থির করিয়া বলিল, "ও মা, সত্যি তো ! চুয়ার কথা মনে ছিল না। তা দেব, দাদা— কিন্তু বড় দামী জিনিস, দাম দিতে পারবে তো ?"

"দাম কত ?"

"জীবন-যৌবন-মন-প্রাণ সব দিলেও সে জিনিসের দাম হয় না।"

চন্দনদাস একটু অবাক হইল, কিন্তু হারিবার পাত্র সে নয়, বলিল, "আচ্ছা, আগে জিনিস দেখি।"

"এই যে, দেখাই। ওলো ও চুয়া, একবার এদিকে আয় তো, দিদি।"

চন্দনদাস তড়িৎস্পৃষ্টের মতো চমকিয়া উঠিল। তবে মেয়েটির নাম চুয়া ! আর সে চুয়া কিনিতে এখানে আসিয়াছে ! এ কি দৈব যোগাযোগ !

"কি বলছ ঠান্‌দি ?"—বলিতে বলিতে চুয়া অন্দরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দনদাসকে দেখিয়া সে চমকিয়া বুকের উপর হাত রাখিল। চন্দনদাস সেই দিকেই তাকাইয়া ছিল, দেখিল, চুয়ার কুমুদের মতো গাল দুটিতে কে যেন কাঁচা সিঁদুর ছড়াইয়া দিল। তারপর ম্রিয়মাণ লজ্জায় তাহার চোখ দুটি ধীরে ধীরে নত হইয়া পড়িল। চন্দনদাস বুঝিল, চুয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে ; পথের ক্ষণিক-দেখা মুগ্ধ পান্থকে ভুলে নাই।

বুড়ি বলিল, "চুয়া, অতিথি এসেছে ; একটু মিষ্টিমুখ করা, পান দে।"

চুয়া মুখ তুলিল না, আস্তে আস্তে চন্দনদাসের সতৃষ্ণ চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। চন্দনদাস দ্বারের দিকেই তাকাইয়া রহিল। শেষে বুড়ি বলিল, "আমার চুয়াকে দেখলে ?"

"দেখলাম।"—আগেও যে দেখিয়াছে, তাহা আর চন্দনদাস ভাঙিল না। বুড়িও সে দিক দিয়া গেল না, বলিল, "কেমন মনে হল ?"

"মনে হল—" সহসা চন্দনদাস বুড়ির দিকে ঝুঁকিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঠান্‌দি, চুয়ার কি বিপদ আমায় বলো। কেন তোমাদের সবাই জাতে ঠেলেছে ? ওর এখনও বিয়ে হয়নি কেন ?"

দ্বারের নিকট হইতে জবাব আসিল, "কি হবে তোমার শুনে ?"

এক হাতে ফুল-কাঁসার ছোট রেকাবির উপর চারিখানি বাতাসা ও দুটি পান, অন্য হাতে জলের ঘটি লইয়া চুয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। চন্দনদাসের শেষ কথাগুলি সে শুনিতে পাইয়াছিল ; শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। কেন এই অপরিচিত যুবকের এত কৌতূহল ? তাহাকে বলিয়াই বা লাভ কি ? চুয়া রেকাবি ও ঘটি চন্দনদাসের সম্মুখে নামাইয়া আরক্ত-মুখে তীব্র অধীর স্বরে বলিল, "কে তুমি ? কোথা থেকে এসেছ ? কি হবে তোমার আমাদের কথা শুনে ?"

ক্ষণকালের জন্য চন্দনদাস বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া রহিল ; তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চুয়ার মুখের উপর চোখ রাখিয়া শান্ত সংযত স্বরে বলিল, "চুয়া, আমি তোমার স্বজাতি ; আমার বাড়ি অগ্রদ্বীপ। নবদ্বীপের ঘাটে আমার ডিঙ্গা বাঁধা আছে। তোমার কি বিপদ আমি জানি না ; কিন্তু আমি যদি তোমায় সাহায্য করতে চাই, আমার সাহায্য কি নেবে না ?"

চুয়ার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানা সাদা হইয়া গেল। তাহার চোখে পরিত্রাণের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষণ-বিস্ফারিত আশার আলো ফুটিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তারপর সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, "কেন আমাকে মিছে আশা দিচ্ছ ?"—বলিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

চন্দনদাস বসিয়া পড়িল। কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিয়া অন্যমনস্কভাবে একখানা বাতাসা তুলিয়া লইয়া মুখে দিল ; তারপর আলগোছে ঘটির জল গলায় ঢালিয়া জলপান করিল। শেষে পান দুটি মুখে পুরিয়া বুড়ির দিকে তাকাইয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "ঠান্‌দি, এবার তোমার গল্প বলো।"

"বলব, কিন্তু তুমি আগে একটা কথা দাও।"

"কি ?"

"তুমি ওকে উদ্ধার করবে ?"

"করব। অন্তত প্রাণপণে চেষ্টা করব।"

"বেশ, উদ্ধার করা মানে ওকে এ দেশ থেকে নিয়ে পালাতে হবে। পারবে ?"

"পারব—খুব পারব।"

"ভালো, কিন্তু তারপর ?"

"তারপর কি ?"

বুড়ি একটু দ্বিধা করিল ; শেষে বলিল, "কিছু মনে করো না, সব কথা স্পষ্ট করে বলাই ভালো। তুমি জোয়ান ছেলে, চুয়াও যুবতী মেয়ে, তুমি ওকে চুরি করে নিয়ে যাবে। তারপর ?"

চন্দনদাস জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।

বুড়ি তখন স্পষ্ট করিয়া বলিল, "ওকে বিয়ে করতে পারবে ?"

চন্দনদাসের চোখের সম্মুখে যেন একটা নূতন আলো জ্বলিয়া উঠিল ; সে উদ্ভাসিত মুখে বলিল, "পারব।"

"তোমার বাপ-মা—"

"তাঁরা আমার কথায় অমত করবেন না।"

বৃদ্ধা কম্পিত স্বরে বলিল, "বেঁচে থাকো দাদা, তুমি বড় ভালো ছেলে। কিন্তু ছুঁড়ির যা কপাল—"

বুড়ি তখন চুয়ার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। চন্দনদাস করতলে কপোল রাখিয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে সে টের পাইল, চুয়া কখন চুপি চুপি আসিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াছে।

চুয়ার বাপের নাম কাঞ্চনদাস। বেনেদের মধ্যে সে বেশ সংগতিপন্ন গৃহস্থ ছিল ; চুয়ার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন কাঞ্চনদাস বাণিজ্যের জন্য নৌকা সাজাইয়া সমুদ্রযাত্রা করিল। কাঞ্চনদাসের নৌকা গঙ্গার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল— আর ফিরিল না। সংবাদ আসিল, নৌকাডুবি হইয়া কাঞ্চনদাস মারা গিয়াছে।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে চুয়ার মাও মরিল। তখন বুড়ি ছাড়া চুয়াকে দেখিবার আর কেহ রহিল না। বুড়ি কাঞ্চনদাসের মাসী— আট বছর বয়স হইতে সে হাতে করিয়া চুয়াকে মানুষ করিয়াছে।

নৌকাডুবিতে কাঞ্চনদাসের সমস্ত সম্পত্তিই ভরাডুবি হইয়াছিল, কেবল এই ভদ্রাসনটি বাঁচিয়াছিল। বুড়ি দোকান করিয়া কষ্টে সংসার চালাইতে লাগিল।

এইভাবে বৎসরাধিক কাল কাটিল। চুয়ার বয়স যখন দশ বছর, তখন এক গৃহস্থের ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইল।

এই সময় একদিন জমিদারের ভ্রাতুষ্পুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া এই পথ দিয়া যাইতেছিল। চুয়াকে বাড়ির সম্মুখে খেলা করিতে দেখিয়া সে ঘোড়া হইতে নামিল। দুর্দান্ত জমিদারের মহাপাষণ্ড ভাইপো মাধবের নাম শুনিয়া দেশের লোক তো দূরের কথা, কাজি সাহেব পর্যন্ত থরথর করিয়া কাঁপে। রাজার শাসন— সমাজের শাসন কিছুই সে মানে না। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়,

স্বভাব তার চণ্ডালের মতো। সে দশ বছরের চুয়াকে চিবুক তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, তারপর বাড়িতে আসিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বুড়ি ভয়ে ভয়ে পরিচয় দিল। শুনিয়া মাধব বলিল, এ মেয়ের বিবাহ দেওয়া হইবে না, ইহাকে দৈবকার্যের জন্য মানত করিতে হইবে। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত কুমারী থাকিবে, তারপর মাধব আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে। তান্ত্রিক সাধনায় উত্তরসাধিকার স্থান অধিকার করিয়া কন্যার ষোল বছরের কৌমার্য সার্থক হইবে। সাধক—স্বয়ং মাধব।

এই হুকুম জারি করিয়া মাধব প্রস্থান করিল। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল ; তান্ত্রিক সাধনার গূঢ় মর্মার্থ বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। বণিক-সমাজ মাধবের বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস করিল না, তাহারা চুয়াকে জাতিচ্যুত করিল। বিবাহও ভাঙিয়া গেল।

ক্রমে চুয়ার বয়স বাড়িতে লাগিল— বারো বছর বয়স হইল। বুড়ি দেশে কাহারও নিকট সাহায্য না পাইয়া শেষে চুয়াকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইবার মতলব করিল। কিন্তু বুড়ির হাতে পয়সা কম, আত্মীয়বন্ধুরও একান্ত অভাব। তাহার মতলব সিদ্ধ হইল না ; মাধবের কানে সংবাদ গেল।

মাধব আসিয়া বুড়িকে পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা শাসন করিল ; তারপর চুয়াকে পাহারা দিবার জন্য চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। নাপিত-কন্যা চাঁপা চুয়ার অভিভাবিকাপদে অধিষ্ঠিত হইল। চাঁপা বয়সকালে তান্ত্রিক সাধন-ভজন করিয়াছিল, এখন যৌবনান্তে ধর্মকর্ম ত্যাগ করিয়াছে। সে চুয়া ও বুড়ির উপর কড়া নজর রাখিতে লাগিল।

এইভাবে চারি বৎসর কাটিয়াছে। কয়েক দিন আগে মাধব আসিয়াছিল। সে চুয়াকে দেখিয়া গিয়াছে এবং বলিয়া গিয়াছে যে, আগামী অমাবস্যার রাত্রিতেই চুয়াকে দৈবকার্যে উৎসর্গ করিতে হইবে— সেজন্য যেন সে প্রস্তুত থাকে। অনুষ্ঠানের যাহাতে কোনও ত্রুটি না হয়, এজন্য মাধব নিজেই সমস্ত বিধান দিয়া গিয়াছে। অমাবস্যার সন্ধ্যার সময় চুয়া গঙ্গার ঘাটে গিয়া স্নান করিবে ; স্নানান্তে রক্তবস্ত্র, জবামাল্য ও রক্তচন্দনের ফোঁটা পরিয়া ঘাট হইতে একেবারে সাধনস্থলে অর্থাৎ উদ্যানবাটিকায় উপস্থিত হইবে। সঙ্গে ঢাক-ঢোল ইত্যাদি বাজিতে বাজিতে যাইবে। মাধব এইরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া যাইবার পর পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী— কাল অমাবস্যা।

গল্প শেষ করিয়া বুড়ি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দাদা, সব কথা তোমায় বললুম। এখন দেখ, যদি মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারো। তুমি ছাড়া ওর আর গতি নেই।"

গল্প শুনিতে শুনিতে চন্দনদাসের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতেছিল, ঐ দানবপ্রকৃতি লোকটার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও আক্রোশ অগ্নিশিখার মতো তাহার দেহকে দাহ করিতেছিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি যদি চুয়াকে বিয়ে করে কাল আমার নৌকোয় তুলে নিয়ে দেশে নিয়ে যাই— কে কি করতে পারে ?"

দ্বারের আড়ালে চুয়ার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। কিন্তু বুড়ি মাথা নাড়িয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তা হয় না দাদা। চাঁপা রাক্ষুসী আছে— সে কখনই হতে দেবে না।"

চন্দনদাস বলিল, "চাঁপাকে সোনায় মুড়ে দেব। তাতে রাজী না হয়, মুখে কাপড় বেঁধে ঘরে বন্ধ করে রাখব।"

বুড়ি কাঁপিতে লাগিল, এতখানি দুঃসাহস তাহার পক্ষে কল্পনা করাও দুষ্কর ; কিন্তু বুড়ির প্রাণে আশা জাগিয়াছিল, আশা একবার জাগিলে সহজে মরিতে চায় না। তবু বুড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "সে যেন হল, কিন্তু বিয়ে হবে কি করে ? বিয়ে দেবে কে ?"

"কেন—ন'দেয় কি পুরুত নেই ?"

বৃদ্ধা মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি মাধবকে জানো না। তার ভয়ে কোনও বামুন রাজী হবে না।"

চন্দনদাস আশ্চর্য হইয়া বলিল, "এখানকার বামুনরা এত ভীরু ?"

"কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে দাদা, যে জমিদারের ভাইপোর শত্রুতা করবে ? তা— শুনেছি, জগন্নাথ ঠাকুরের ছেলে নিমাই পণ্ডিত বড় ডাকাবুকো ছেলে, কাউকে ভয় করেন না। বয়স কম কিনা।— কিন্তু তিনি কি রাজী হবেন ?"

চন্দনদাস মহা উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ভালো মনে করিয়ে দিয়েছ, ঠান্‌দি,—নিমাই পণ্ডিতই উপযুক্ত লোক। তাঁকে আমি আজ গঙ্গাঘাটে দেখেছি ; ঠিক দেবতার মতো চেহারা— তিনি নিশ্চয় রাজী হবেন।—ঠান্‌দি, আমি এখন তাঁর খোঁজে চললাম, ওবেলা সব ঠিক করে আবার আসব। তখন—"

"কিন্তু তিনি যদি রাজী না হন ?"

চন্দনদাস চিন্তা করিল, "যদি রাজী না হন— তিনি রাজী হোন বা না হোন, রাত্রিতে কোনও সময় আমি আসবই।—নাই বা হল বিয়ে ? আজ রাত্রিতে চুয়াকে চুরি করে নিয়ে যাব। তারপর দেশে গিয়ে বিয়ে করব— কি বলো ?"

বুড়ির মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল। চন্দনদাসের যে কোনও দুরভিসন্ধি নাই, তাহা সে অন্তরে বুঝিতেছিল ; কিন্তু তবু— চন্দনদাস একেবারে অপরিচিত। সেও যে একজন ধূর্ত প্রবঞ্চক নয়, তাহা বুড়ি কি করিয়া জানিবে ? বারবার দাগা পাইয়া বুড়ির মন বড় সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ইতস্তত করিতে লাগিল।

এই সময় চুয়া দরজার আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। সংশয়-সংকোচ করিবার তাহার আর সময় ছিল না। এক দিকে অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ, অন্য দিকে সম্ভাবনা। চুয়া সজল চক্ষু চন্দনদাসের মুখের উপর রাখিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "তুমি আজ রাত্তিরে এসো। নিমাই পণ্ডিত যদি রাজী না হন, তবু, তোমার ধর্মের ওপর বিশ্বাস করে আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

চন্দনদাসের বুক নাচিয়া উঠিল। সে আনন্দের উচ্ছ্বাসে কি বলিতে যাইতেছিল— এমন সময় বাধা পড়িল।

গলির মধ্যে দ্রুত অশ্বক্ষুর-ধ্বনি শুনা গেল। চুয়া একটা আর্ত চিৎকার গলার মধ্যে রোধ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বুড়ি থরথর করিয়া কাঁপিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল।

পরক্ষণেই একজন অশ্বারূঢ় ব্যক্তি বাড়ির সম্মুখে আসিয়া ঘোড়া থামাইল। লোকটার গায়ে লাল রঙের কোর্তা, কোমরে তরবারি, মাথায় পাগ নাই, ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে ; কপালে প্রকাণ্ড একটা সিন্দূরের ফোঁটা। ফোঁটার নিচে বিশাল ভাঁটার মতো চোখ দুটাও প্রায় অনুরূপ রক্তবর্ণ। মুখে ঘনকৃষ্ণ গোঁফ এবং গালে গালপাট্টা। বয়স বোধ করি পঁয়তাল্লিশ।

এই ভীষণাকৃতি লোকটার মুখের প্রতি অবয়বে যেন জীবনব্যাপী দুষ্কৃতি ও পাপ পঙ্কিল রেখায় অঙ্কিত হইয়া আছে। এমন দুষ্কার্য নাই— যাহা সে করে নাই ; এমন মহাপাতক নাই— যাহা সে করিতে পারে না। একটা ঘৃণার শিহরণ চন্দনদাসের দেহের উপর দিয়া বহিয়া গেল ; সে চিনিল, ইনিই জমিদারের দুর্দান্ত ভ্রাতুষ্পুত্র মাধব।

মাধব একলাফে ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া দালানের উপর উঠিল। সম্মুখেই চন্দনদাস ; রক্তচক্ষু দ্বারা আপাদমস্তক তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বভাবকর্কশ ভয়ংকর সুরে মাধব প্রশ্ন করিল, "তুই কে ?"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, মাধবের দন্তস্ফীত মুখে একটা লাথি পারে ; কিন্তু সে তাহা করিল না। তাহার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো চিন্তাকার্য চলিতেছিল। মাধবের অভাবনীয় আবির্ভাবে তাহার সমস্ত মতলব পণ্ড হইয়া গিয়াছিল ; সে ভাবিতেছিল, এ অবস্থায় কি করিলে সব দিক রক্ষা হয় ? মাধবের সঙ্গে একটা গণ্ডগোল বাধাইলে লাভ হইবে না, বরং অনিষ্টের সম্ভাবনা। উপস্থিত ক্ষেত্রে কোনও হাঙ্গামা না করিয়া অপসৃত হওয়াই সুবিবেচনার কাজ। অথচ এই পাষণ্ডটার মুখ দেখিলে ও কথা শুনিলে মেজাজ ঠিক রাখা দুষ্কর। চুয়ার সর্বনাশ করিবার জন্যই এই নরপশু তাহাকে ছয় বৎসর জিয়াইয়া রাখিয়াছে, ভাবিতে চন্দনদাসের চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত রক্তাভ হইয়া উঠিল।

তবু সে যথাসাধ্য আত্মদমন করিয়া মাধবের কথার উত্তর দিল, বলিল, "সে খোঁজে তোমার দরকার কি ?"

মাধব একটা অকথ্য গালি দিয়া বলিল, "তুই এখানে কি চাস ?"

চন্দনদাস আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিল না, তাহার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। সে প্রত্যুত্তরে মাধবের নাসিকায় বজ্রসম কিল বসাইয়া দিয়া বলিল, "এই চাই।"

এই নিরীহ-দর্শন যুবকের নিকট হইতে মাধব এত বড় দুঃসাহসিক কার্য একেবারে প্রত্যাশা করে নাই, সে চক্ষে সরিষার ফুল দেখিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

চন্দনদাস দেখিল, আর বিলম্ব করা সমীচীন নয় ; সে নিরস্ত্র, মাধবের কোমরে তরবারি রহিয়াছে। ঘোড়াটা সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল, সে দালান হইতে লাফ দিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। এই সময় মাধব যণ্ডের মতো গর্জন করিয়া কোমর হইতে তরবারি বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার নাগালে পৌঁছিবার পূর্বেই চন্দনদাস তেজী ঘোড়ার পেট দুই পায়ে চাপিয়া ধরিয়া সবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

কেহ কেহ লুকাইয়া পাপাচরণ করে। কিন্তু ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া পাশবিক বলে প্রকাশ্যভাবে পাপানুষ্ঠান করিতে যাহারা অভ্যস্ত, তাহাদের অপরাধ-ক্লান্ত জীবনে এমন অবস্থা আসে, যখন কেবলমাত্র রমণীর সর্বনাশ করিয়া আর তাহারা তৃপ্তি পায় না। তখন তাহারা পাপাচারের সহিত ধর্মের ভণ্ডামি মিশাইয়া তাহাদের দুষ্কার্যের মধ্যে এক প্রকার নূতন রস ও বিলাসিতা সঞ্চারের চেষ্টা করে। মাধব এই শ্রেণীর পাপী।

চন্দনদাস তাহারই ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিবার পর মাধব নিষ্ফল আক্রোশে আর কাহাকেও সম্মুখে না পাইয়া বুড়িকে ধরিল ; বুড়ির চুলের মুঠি ধরিয়া তলোয়ার দিয়া তাহাকে কাটিতে উদ্যত হইল। কিন্তু কাটিতে গিয়া তাহার মনে হইল, বুড়িকে মারিলে হয়তো সেই ধৃষ্ট যুবকের পরিচয় অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে। কিল খাইয়া কিল চুরি করিবার লোক মাধব নয় ; তখনও তাহার নাকের রক্তে গোঁফ ভাসিয়া যাইতেছিল। সে বুড়ির চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে ভিতরে লইয়া চলিল।

আঙ্গিনার মাঝখানে বুড়িকে আছড়াইয়া ফেলিয়া তাহার শীর্ণ হাতে একটা মোচড় দিয়া মাধব বলিল, "হারামজাদী বুড়ি, ও ছোঁড়া তোর কে বল্।"

পূর্বেই বলিয়াছি, বুড়ি বুদ্ধিমতী ; তাই ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেলেও তাহার চিন্তা করিবার শক্তি ছিল। সে বুঝিয়াছিল, কোনও কথা না বলিলেও প্রাণ যাইবে এবং ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া ফেলিলেও প্রাণ যাইবে ; সুতরাং মধ্যপথ অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত। সর্বনাশ উপস্থিত হইলে পণ্ডিতগণ অর্ধেক ত্যাগ করেন, বুড়িও তেমনই ষড়যন্ত্রের অংশটা বাদ দিয়া আর সব সত্য কথা বলিবে স্থির করিল। তাহাতে আর কিছু না হউক, মাধবের হাতে প্রাণটা বাঁচিয়া যাইতে পারে।

বুড়ি তখন অকপটে চন্দনদাসের যতটা পরিচয় জানিতে পারিয়াছিল, তাহা মাধবের গোচর করিল। চাঁপা পাছে অনর্থক হাঙ্গামা করে, এই ভয়ে মিছামিছি চন্দনদাসকে নাতি বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, অনেক মাথার দিব্য, চোখের দিব্য দিয়া বলিল যে, চন্দনদাসকে সে পূর্বে কখনও দেখে নাই, আজ প্রথম সে তাহার দোকানে আসিয়া মিষ্ট কথায় তাহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করে। তাহার কোনও দুরভিসন্ধি ছিল কি না, তাহাও বুড়ির অজ্ঞাত।

চাঁপা মাধবের বাড়িতে খবর দিতে গিয়াছিল, এতক্ষণে এক ঝাঁক পাইক সঙ্গে লইয়া পদব্রজে ফিরিল। পাইকদের হাতে সড়কি, ঢাল ; জাতিতে তেঁতুলে বাগ্‌দী। ইহাদেরই বাহুবলে মাধব দেশটাকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রভু ও ভৃত্যে অবস্থাভেদ ছাড়া প্রকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ ছিল না।

বুড়িকে নানা প্রশ্ন করিয়া শেষে বোধ হয় মাধব তাহার গল্প বিশ্বাস করিল। চাঁপা যাহা বলিল, তাহাতে বুড়ির কথা সমর্থিত হইল। তা ছাড়া মাধবের রক্তচক্ষুর সম্মুখে বুড়ি মিথ্যা কথা বলিবে, ইহাও দাম্ভিক মাধব বিশ্বাস করিতে পারে না। সে এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, "তোর নাতনী কোথায় ?"

বুড়ি বলিল, "ঘরেই আছে, বাবা।"

মাধব চাঁপাকে হুকুম করিল, "দেখে আয়।"

চাঁপা দেখিয়া আসিয়া বলিল, চুয়া ঘরেই আছে বটে।

মাধবের তখন বিশ্বাস জন্মিল, চুয়া সম্বন্ধে ভয়ের কোনও কারণ নাই। তবু সে দুইজন পাইককে বুড়ির বাড়ি পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত করিল, বলিল, "কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এ বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দিবিনে। যদি কেউ ঢুকতে চায়, তার গলায় সড়কি দিবি।"

এইরূপে বাড়ির সুব্যবস্থা করিয়া মাধব বাহিরে আসিল। এই সময় একবার তাহার মনে হইল, আর বৃথা দেরি না করিয়া আজই চুয়াকে নিজের প্রমোদ-উদ্যানে টানিয়া লইয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলে এত বৎসর ধরিয়া যে চরম বিলাসিতার আয়োজন করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মাধব নিরস্ত হইল। তৎপরিবর্তে যে স্পর্ধিত বেনের ছেলেটা তাহার গায়ে হাত তুলিতে সাহস করিয়াছে, তাহার নৌকা লুঠ করিয়া তাহাকে নিজের চক্ষুর সম্মুখে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইবার আয়োজনে দিনটা সদ্ব্যয় করিতে মনস্থ করিল। এটাও একটা মন্দ বিলাসিতা নয়।

বাহিরে আসিয়া মাধব তাহার সর্দার-পাইককে বলিল, "বদন, তুই দশ জন পাইক নিয়ে গঙ্গাঘাটে যা। সেখানে চন্দনদাস বেনের নৌকো আটক কর্। আমি যাচ্ছি।"— বলিয়া আর একজন পাইককে ঘোড়া আনিতে পাঠাইল।

বদন সর্দার প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া যখন ঘাটে পৌঁছিল, তখন চন্দনদাসের নৌকা দু'খানি ভাগীরথীর বক্ষে শুভ্র পাল উড়াইয়া উজান বাহিয়া চলিয়াছে ; বহুপদবিশিষ্ট বিরাট জল-পতঙ্গের মতো তাহাদের দাঁড়গুলি যেন গঙ্গার উপর তালে তালে পা ফেলিতেছে।

ওদিকে চন্দনদাস তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিল। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, পথে লোকজন কম। চন্দনদাস ধাবমান ঘোড়ার পিঠে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল— এখন কর্তব্য কি ? প্রথমত, চুয়াকে রক্ষা করিতে হইবে। মাধবের নাকে কিল মারার ফলে তাহার ক্রোধ কোন্ পথ লইবে, অনুমান করা কঠিন ; মাধব চুয়ার কথা ভুলিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইতে পারে ; তাহাতে চুয়া কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা পাইবে। দ্বিতীয়ত, তাহার নৌকা বাঁচাইতে হইবে। ক্রোধান্ধ

মাধব প্রথমে তাহাকেই ধরিতে আসিবে ; তখন তাহার অমূল্য পণ্য ও সোনাদানায় বোঝাই নৌকা লুণ্ঠিত হইবে। মাধব রেয়াৎ করিবে না।

ঘাটে পৌঁছিবার পূর্বেই চন্দনদাস কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। অশ্বত্থ-শাখায় ঘোড়া বাঁধিয়া সে দ্রুতপদে নৌকায় গিয়া উঠিল ; দেখিল, মাঝি-মাল্লারা আহার করিতে বসিয়াছে। চন্দনদাস সর্দার-মাঝিকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, "এখনি নৌকো খুলতে হবে।"

হতবুদ্ধি মাঝি বলিল, "এখনি ? কিন্তু—"

"শোনো, তর্ক করবার সময় নেই। এই দণ্ডে নৌকো খোলো— পাল আর দাঁড় দুই লাগাও। আজ সন্ধ্যে পর্যন্ত যতদূর সম্ভব উজান বেয়ে যাবে, তারপর গাঙের মাঝখানে নোঙর ফেলবে। আমি যতদিন না ফিরি সেইখানে অপেক্ষা করবে। বুঝলে ?"

"আপনি সঙ্গে যাবেন না ?"

"না। এখন যাও, আর দেরি করো না। যতদিন আমি না ফিরি সাবধানে নৌকো পাহারা দিও।"

"যে আজ্ঞা।"— বলিয়া প্রাচীন মাঝি চলিয়া গেল। মুহূর্ত পরে দুই নৌকার মাঝি-মাল্লার হাঁকডাক ও পাল তোলার হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। এই অবকাশে চন্দনদাস নৌকার পশ্চাতে মাণিকভাণ্ডারে গিয়া কিছু জিনিস সংগ্রহ করিয়া লইল। প্রথমে সিন্দুক হইতে মোহর-ভরা একটা সর্পাকৃতি লম্বা থলি বাহির করিয়া কোমরে জড়াইয়া লইল। যে-কার্যে যাইতেছে, তাহাতে কত অর্থের প্রয়োজন কিছুই স্থিরতা নাই ; অথচ বোঝা বাড়াইলে চলিবে না। চন্দনদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া একছড়া মহামূল্য সিংহলী মুক্তার হার গলায় পরিয়া লইল। যদি মোহরে না কুলায়, হার বিক্রয় করিলে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যাইবে।

এ ছাড়া আরও দুইটি জিনিস চন্দনদাস সঙ্গে লইল। একটি ইস্পাতের উপর সোনার কাজ করা ছোট ছোরা ; এটি সে কোচিনে এক আরব বণিকের নিকট কিনিয়াছিল। দ্বিতীয়, এক কাফ্রির উপহার একটি লোহার কাঁটা। কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ লোহার কাঁটা, সেকালে শৌখীন স্ত্রী-পুরুষ এইরূপ কাঁটা চুলে পরিত। এই কাঁটার বিশেষত্ব এই যে, ইহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ শরীরের কোনও অংশে ফুটিলে তিনবার নিশ্বাস ফেলিতে যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণের মধ্যে মৃত্যু হইবে। চন্দনদাস কাঁটার সূক্ষ্মাগ্র সোনার খাপে ঢাকিয়া সাবধানে নিজের চুলের মধ্যে গুঁজিয়া লইল।

নৌকা হইতে নামিয়া চন্দনদাস নগরের ভিতর দিয়া আবার হাঁটিয়া চলিল। ঝাঁ-ঝাঁ দ্বিপ্রহর, আশেপাশে দোকানের মধ্যে দোকানী নিদ্রালু ; মধ্যাকাশ হইতে সূর্যদেব প্রখর রৌদ্র ঢালিয়া দিতেছেন। গাছ-পালা পর্যন্ত নিঝুম হইয়া পড়িয়াছে ; মানুষ গৃহতলের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে।

কিছুদূর যাইবার পর একটা মোড়ের মাথায় পৌঁছিয়া চন্দনদাস এবার কোন্ পথে যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার চোখে পড়িল, একটা নয়-দশ বছরের কটিবাসপরিহিত শীর্ণকায় বালক প্রচণ্ড মার্তণ্ড-ময়ূখ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া পথের মধ্যে একাকী ডাণ্ডাগুলি খেলিতেছে। চন্দনদাস হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল। বালক ক্রীড়ায় বিরাম না দিয়া, যষ্টির আঘাতে ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডটিকে চন্দনদাসের দিকে তাড়িত করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর প্রবীণের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দনদাসের বেশভূষা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "সওদাগর ! সমুদ্দুর থেকে আসছ— ন্যাঃ ?"

বালকের ভাষা ও বাক্প্রণালী অতি অদ্ভুত— আমরা তাহা সরল ও সহজবোধ্য করিয়া দিলাম।

চন্দনদাস বলিল, "হ্যাঁ। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ি কোথায় জানিস ?"

বালক বলিল, "হিঃ—জানি।"

"আমাকে সেখানে নিয়ে চল্।"

বালকের ধূর্ত মুখে একটু হাসি দেখা দিল, সে এক চক্ষু মুদিত করিয়া বলিল, "ডাংগুলি খেলছি যে।"

"পয়সা দেব।"

আকর্ণ দন্তবিকাশ করিয়া বালক হাত পাতিল, "আগে দাও।"

চন্দনদাস তাহাকে একটা কপর্দক দিল, তখন সে আবার ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

বেশি দূর যাইতে হইল না; নিম্ববৃক্ষচিহ্নিত একটা বাড়ি যষ্টি-নির্দেশে দেখাইয়া দিয়া বালক প্রস্থান করিতেছিল, চন্দনদাস তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল, বলিল, "তুই যদি আর একটা কাজ করতে পারিস, তোকে চারটে পয়সা দেব।"

"কি ?"

"কাঞ্চন বেনের বাড়ি জানিস ?"

বালকের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, "চুয়া ? মাধায়ের কইমাছ ? জানি। — হি হি !"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, অকালপক্ক ছোঁড়ার গালে একটা চপেটাঘাত করে; কিন্তু সে কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, চুয়া। শোন্, তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাবি, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবি না, কেবল দেখে আসবি, সেখানে কি হচ্ছে। পারবি ?"

বালক বলিল, "হিঃ— পয়সা দাও।"

চন্দনদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আগে খবর নিয়ে আসবি, তবে পয়সা পাবি। আমি এইখানেই থাকব।"

বালক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে গবেষণা করিল, চন্দনদাসকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না ? শেষে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া পূর্ববৎ ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে প্রস্থান করিল।

চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই টোলের আটচালা; ছাত্ররা কেহ নাই, নিমাই পণ্ডিত একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার কোলে তুলটের একখানি নূতন পুঁথি; পাশে লেখনী ও মসীপাত্র। চন্দনদাসের পদশব্দে নিমাই পণ্ডিত মুখ তুলিলেন; প্রশান্ত বিশাল চক্ষু হইতে শাস্ত্র-চিন্তাজনিত স্বপ্নাচ্ছন্নতা দূর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকে চান ?"

চন্দনদাস বলিল, "নিমাই পণ্ডিতকে।"

"আমিই নিমাই পণ্ডিত।"

পাদুকা খুলিয়া চন্দনদাস গিয়া নিমাই পণ্ডিতকে প্রণাম করিল। নিমাই পণ্ডিত বয়সে তাহার অপেক্ষা ছোট হইলেও ব্রাহ্মণ। তুলসীপাতার ছোট বড় নাই।

নিমাই পণ্ডিত প্রণাম গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দেখেছি বলে মনে হচ্ছে— আপনিই কি আজ দুখানি নৌকা নিয়ে সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরেছেন ?"

চন্দনদাস বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আমিই।"

নিমাই পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "আজ আপনার নৌকার ঢেউয়ে নবদ্বীপের একটি অমূল্য রত্ন ভেসে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে রক্ষা করা গিয়েছে। যা হোক, আপনি— ?"

চন্দনদাস নিজের পরিচয় দিয়া শেষে করজোড়ে বলিল, "আপনি ব্রাহ্মণ এবং মহাপণ্ডিত, আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করলে আমার অপরাধ হয়।"

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "বেশ, কি ব্যাপার বলো তো ?"

চন্দনদাস বলিল, "একটা কাজে আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি। নবদ্বীপে কাউকে আমি চিনি না, কেবল আপনার নাম শুনেছি। শুনেছি, আপনি শুধু অপরাজেয় পণ্ডিত নন, সৎকার্য

করবার সাহসও আপনার অদ্বিতীয়। আমাকে সাহায্য করবেন কি ?"

নিমাই পণ্ডিত বুঝিলেন, বণিকতনয় আজ গুরুতর কোনও কাজ আদায় করিতে আসিয়াছে, মৃদুহাস্যে বলিলেন, "তোমার নম্রতা আর বিনয় দেখে ভয় হচ্ছে। যা হোক্, প্রস্তাবটা কি শুনি ?"

চন্দনদাসও হাসিল ; বুঝিল, নিমাই পণ্ডিতকে মিষ্ট চাটুকথায় বিগলিত করা চলিবে না, তাঁহার সহিত অকপট ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনি কাঞ্চন বেনের মেয়ে চুয়াকে জানেন ?"

নিমাই পণ্ডিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দনদাসের মুখের পানে চাহিলেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল, বলিলেন, "জানি। চুয়ার কথা নবদ্বীপে সকলেই জানে।"

চন্দনদাস বলিয়া উঠিল, "তবু তাকে উদ্ধারের চেষ্টা কেউ করে না ?"

নিমাই পণ্ডিত স্থির হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

চন্দনদাস তখন বলিল, "আমি চুয়াকে বিয়ে করতে চাই। আপনি সহায় হবেন কি ?"

নিমাই পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কোল হইতে পুঁথি নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু চুয়া সম্বন্ধে সব কথা তুমি জানো কি ?"

"যা জানি, আপনাকে বলছি।"— এই বলিয়া আজ নৌকা হইতে নামিবার পর এ পর্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিল ; শেষে কহিল, "এই নির্বান্ধব পুরীতে চুয়া যেমন একা, আমিও তেমনি একা। এখন আপনি যদি সাহায্য করেন, তবেই কিছু করিতে পারি। নচেৎ একটি বালিকার সর্বনাশ হয়।"

নিমাই পণ্ডিত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।

এই সময় সেই বালক ডাংগুলি হস্তে ফিরিয়া আসিল। চন্দনদাস সাগ্রহে তাহাকে কাছে ডাকিতেই সে বলিল, "চুয়ার বাড়ির সামনে দুটো পাক্ বসে আছে ; যে যাচ্ছে তারে হুমকি দিচ্ছে।"

"আর কি দেখলি ?"

"চুয়া আর তার ঠান্দি ঘরে আছে। চাঁপা নাপতিনী বুড়ির সঙ্গে কোঁদল করছে।"

"আর কিছু ?"

"আর মাধাই চন্নন বেনের ডিঙ্গি লুঠ করতে গেছে। পয়সা দাও।"

খুশি হইয়া চন্দনদাস বালককে চার পয়সার স্থলে দু'গণ্ডা দিল। হৃষ্ট বালক তীক্ষ্ণস্বরে একবার "উ—" বলিয়া উল্লাস জ্ঞাপনপূর্বক ডাংগুলি খেলিতে খেলিতে প্রস্থান করিল।

বালককে বিদায় করিয়া চন্দনদাস নিমাই পণ্ডিতের দিকে ফিরিতেই তিনি উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার উদ্যম প্রশংসনীয় ; আমরা গাঁয়ের লোক যা করিনি, তুমি বিদেশী তাই করতে চাও। তোমার স্বার্থ আছে জানি, কিন্তু তাতে তোমার মহত্ত্বের কিছু মাত্র হানি হয় না ; আমি কি করতে পারি বলো।"

চন্দনদাস বলিল, "তা আমিও জানি না। আপাতত পরামর্শ দিতে পারেন।"

"বেশ, এসো, পরামর্শ করা যাক। মাধব যে রকম দুর্ধর্ষ পাষণ্ড, তার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে কোনও ফল হবে না। আমার মনে হয়—"

চন্দনদাস বলিল, "একটি নিবেদন আছে। আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে ; ব্রাহ্মণবাড়ি একটু পাদোদক পেতে পারি ?"

নিমাই সচকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখনও আহার করোনি ?"

চন্দনদাস হাসিয়া বলিল, "না, কেবল চুয়ার দেওয়া একখানি বাতাসা খেয়েছি।"

"কি আশ্চর্য ! এতক্ষণ বলোনি কেন ? দাঁড়াও, আমি দেখি।"— বলিয়া খড়ম পরিয়া ত্বরিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

বেলা তখন তৃতীয় প্রহর। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভৃত্য-পরিজন সকলকে খাওয়াইয়া নিজে আহারে বসিতে যাইতেছিলেন, নিমাই গিয়া বলিলেন, "একজন অতিথি এসেছে। খেতে দিতে পারবে ?"

বিষ্ণুপ্রিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "পারব।' তারপর ক্ষিপ্রহস্তে দালানে জল-ছড়া দিয়া পিঁড়ি পাতিয়া নিজের অন্নব্যঞ্জন অতিথির জন্য ধরিয়া দিয়া স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন।

নিমাই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, স্মিতমুখে চন্দনদাসকে ডাকিতে গেলেন। এই নীরব কর্মপরায়ণা অনাদৃতা বধূটি ক্ষণকালের জন্য নিমাই পণ্ডিতের মন হইতে লক্ষ্মীদেবীর স্মৃতি মুছিয়া দিল।

অতঃপর চন্দনদাস পরিতোষপূর্বক ব্রাহ্মণগৃহে প্রসাদ পাইল।

পরামর্শ স্থির করিতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল। যে সকল ছাত্র টোলে পড়িতে আসিল, নিমাই পণ্ডিত তাহাদের ফিরাইয়া দিলেন।

সংকল্প স্থির করিয়া নিমাই বলিলেন, "এ ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখি না। তৃতীয় ব্যক্তিকে দলে টানতে ভয় করে ; কথাটা জানাজানি হয়ে যদি মাধবের কানে ওঠে, তাহলে আর কোনও ভরসা থাকবে না।"

চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, "এ দেশের মাঝি-মাল্লাদের বিশ্বাস করা যেতে পারে ?"

"অন্য ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু যে ব্যাপারে মাধব আছে, তাতে কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। ঘুণাক্ষরে আমাদের মতলব টের পেলে তারা আমাদেরই মাধবের হাতে ধরিয়ে দেবে।"

"তাহলে—"

নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মাঝি-মাল্লার কাজ আমাকেই করতে হবে। কাণভট্টের আশীর্বাদ দেখছি এরি মধ্যে ফলতে আরম্ভ করেছে।"

চন্দনদাস বলিল, "চুয়াকে আমি খবর দেব। শেষ রাত্রির দিকে পাইকরা ঘুমিয়ে পড়বে— সেই উপযুক্ত সময়। কি বলেন ?"

"হ্যাঁ। তুমি তোমার নৌকা পাঠিয়ে দিয়ে বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। মাধব নিশ্চিন্ত থাকবে, হয়তো রাত্রিতে চুয়ার বাড়িতে পাহারা না থাকতে পারে।"

"অতটা ভরসা করি না। যা হোক, দেখা যাক।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই জন বাহির হইলেন। ব্রাহ্মণপল্লী হইতে অনেকটা উত্তরে গঙ্গাতীরে নৌ-কর সূত্রধরদের বাস। সেখানে উপস্থিত হইয়া দুই জনে দেখিলেন, রাশি রাশি স্তূপীকৃত শাল, পিয়াল, সেগুন, জারুল কাষ্ঠের প্রাকারের মধ্যে ছোট বড় নানাবিধ নৌকা তৈয়ার হইতেছে। কোনটির কংকালমাত্র গঠিত হইয়াছে, কোনটি পাটাতনে শোভিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিতেছে। বড় বড় বজরা— পঞ্চাশ দাঁড়ের নৌকা— কাহারও হাঙ্গর-মুখ, কেহ বা ময়ূরপঙ্ক্ষী, কেহ বা হংসমুখী। আবার ক্ষুদ্রকায় ডিঙ্গি, সংকীর্ণ-দেহ ছিপও আছে। কোনটি সম্পূর্ণ হইয়াছে, কোনটি এখনও অসম্পূর্ণ।

দুই জনে অনেক নৌকা দেখিয়া শেষে একটি ছোট ডিঙ্গি পছন্দ করিলেন। ডিঙ্গির সুন্দর গঠন, আড়াই হাত চওড়া, আট হাত লম্বা— শোলার মতো হালকা। মাত্র চারি জন লোক তাহাতে বসিতে পারে।

নিমাই পণ্ডিত ছুতারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাম কত ?"

ছুতার কিন্তু ডিঙ্গি বেচিতে রাজী হইল না, বলিল, 'ফরমাশী ডিঙ্গি।"

চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিল, "এ ডিঙ্গির জন্যে কত দাম পাবে ?"

ছুতার একটু বাড়াইয়া বলিল, "তিন তঙ্কা।"

চন্দনদাস নিঃশব্দে তাহার হাতে এক মোহর দিল। ছুতার স্বপ্নেও এত মূল্য কল্পনা করে নাই, সে কিছুক্ষণ হতবাক্ থাকিয়া মহানন্দে ডিঙ্গির মালিকত্ব চন্দনদাসকে সমর্পণ করিল।

ডিঙ্গি তৎক্ষণাৎ গঙ্গার জলে ভাসানো হইল। নিমাই পণ্ডিত ও চন্দনদাস তাহাতে আরোহণ করিয়া দুই জোড়া দাঁড় হাতে লইলেন। দাঁড়ের আঘাতে ডিঙ্গি জ্যা-মুক্ত তীরের মতো জলের উপর ছুটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ গঙ্গাবক্ষে দাঁড় টানিয়া উভয়ে দেখিলেন, ডিঙ্গি নির্দোষ ও অতি সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য। দুই জনে সন্তুষ্ট হইয়া তীরে ফিরিলেন। তারপর নৌকা ছুতারের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "কাল বৈকালে আমি এসে ডিঙ্গি নিয়ে যাব।"

ছুতার সাহ্লাদে এক দিনের জন্য নৌকা রাখিতে সম্মত হইল।

অতঃপর নিমাই পণ্ডিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চন্দনদাসের তখনও কাজ শেষ হয় নাই, সে গঙ্গার ধার দিয়া ঘাটের দিকে চলিল।

যে ঘাটে দ্বিপ্রহরে নৌকা বাঁধিয়াছিল, সেই ঘাটে যখন উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। ঘাটে কয়েকটি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁধা ছিল ; চন্দনদাস কয়েকজন মাঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাপু, তোমরা জেলে তো ?"

"আজ্ঞে, কর্তা।"

"তোমাদের মোড়ল কে ?"

একজন বৃদ্ধ-গোছের জেলে বলিল, "আজ্ঞে কর্তা, আমি মোড়ল। আমার নাম শিবদাস।"

"বেশ। তোমার সঙ্গে আমি কিছু কারবার করতে চাই। এখানে যত জেলে আছে, সবাই তোমার অধীন তো ?"

"আজ্ঞে।"

"কত জেলে-ডিঙ্গি তোমাদের আছে ?"

"তা—ত্রিশ-চল্লিশখানা হবে।"

"বেশ। শোনো ; তোমাদের যত জেলে-ডিঙ্গি আছে, সব আমি ভাড়া করলাম। তোমরা জেলে-মাঝির দল কাল বেলা তিন পহরের সময় বেরুবে ; বেরিয়ে সটান স্রোতের মুখে দক্ষিণে গিয়ে শান্তিপুরের ঘাটে নৌকো বাঁধবে। তারপর সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। সন্ধ্যে পর্যন্ত আমি যদি না যাই, তাহলে আবার ফিরে আসবে। — বুঝলে ?"

"বুঝলাম কর্তা। কিন্তু কাজটা কি, তা তো এখনও জানতে পারিনি।"

"কাজের কথা শান্তিপুরের ঘাটে জানতে পারবে। কেমন, রাজী আছ ?"

"আজ্ঞে, গররাজী নই। কিন্তু ধরুন, শান্তিপুরের ঘাটে যদি আপনার দেখা না পাই ?"

"বলেছি তো, তাহলে ফিরে আসবে।"

"কিন্তু আমাদের যাওয়া-আসা যে তাহলে না-হক হয়রানি হয়, কর্তা। আপনাকে তখন পাব কোথায় ? আপনাকে তো চিনি না।"

চন্দনদাস হাসিয়া বলিল, "তা হলেও তোমাদের লোকসান হবে না। তোমাদের অর্ধেক ভাড়া আমি আগাম দিয়ে যাব। সব নৌকো শান্তিপুরে যাওয়া-আসার জন্যে কত ভাড়া লাগবে ?"

শিবদাস মোড়ল বিবেচনা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, দশটি তঙ্কার কমে হবে না।"

চন্দনদাস একটু ব্যবসাদারি করিল। কারণ, এক কথায় রাজী হইয়া গেলে জেলেরা কিছু সন্দেহ করিতে পারে। কিছুক্ষণ কষা-মাজার পর নয় তঙ্কা ভাড়া ধার্য হইল। চন্দনদাস পাঁচ তঙ্কা শিবদাস মোড়লের হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও। কিন্তু কথার নড়চড় যেন না হয়।"

"আজ্ঞে"— শিবদাস মুদ্রা গনিয়া লইল, "আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন কর্তা, ঠিক সময়ে আমরা শান্তিপুরের ঘাটে হাজির থাকব—"

"সব ডিঙ্গি নিয়ে যাবে, একখানাও বাদ না পড়ে।"

"আজ্ঞে, একখানাও বাদ পড়বে না।"

এইরূপে নবদ্বীপ হইতে সমস্ত ডিঙ্গি তফাৎ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া চন্দনদাস কতকটা নিশ্চিন্তমনে নিমাই পণ্ডিতের গৃহে ফিরিল। সেইখানেই তাহার রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

রাত্রি তিন প্রহরে, চুয়ার বাড়ির দালানে পাইক দুই জন বসিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একজন দেয়ালে ঠেস দিয়া পদযুগল প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে কখন কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল ; তাহার নাসারন্ধ্র হইতে কামারের হাপরের মতো একপ্রকার শব্দ নির্গত হইতেছিল।

চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার ; কিন্তু অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইলে কিছু কিছু দেখা যায়। চন্দনদাস নিঃশব্দে ছায়ার মতো দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বাঁ হাতে সেই ক্ষুদ্র ছোরা। কিয়ৎকাল মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া সে পাইকের নাসিকাধ্বনি শুনিল তারপর দালানের গাঢ়তর অন্ধকারের ভিতর তাহার চক্ষু বস্তু নির্বাচন করিতে আরম্ভ করিল।

যে পাইকটা বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার পদদ্বয় ঠিক দরজার সম্মুখে প্রসারিত ; ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হইবে। তা ছাড়া দরজার কবাট ভেজানো রহিয়াছে, ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ কি না, বুঝা যাইতেছে না। চন্দনদাস ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে হাত বাড়াইয়া কবাট একটু ঠেলিল। মরিচাধরা হাঁসকলে ছুঁচার ডাকের মতো শব্দ হইল। দরজা ঈষৎ খুলিল।

হাঁসকলের শব্দে পাইকের হাপর হঠাৎ বন্ধ হইল। চন্দনদাস স্পন্দিত-বক্ষে ছোরা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু পাইক জাগিল না, আবার তাহার নাক ডাকিয়া উঠিল।

চন্দনদাস তখন আবার কবাট একটু ঠেলিল, কবাট খুলিয়া গেল। এবারও একটু শব্দ হইল বটে, কিন্তু কেহ জাগিল না। তখন চন্দনদাস ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে পাইকের পদযুগল লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া চন্দনদাস চারিদিকে চাহিল। সম্মুখে কয়েকটা ঘর অস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে। কিন্তু কোন্ ঘরে চুয়া ঘুমাইতেছে ? চাঁপাও বাড়িতে আছে ; চুয়াকে খুঁজিতে গিয়া যদি চাঁপা জাগিয়া উঠে, তবেই সর্বনাশ। চন্দনদাস কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার হাতে মৃদু স্পর্শ হইল।

চন্দনদাস চমকিয়া উঠিয়া অজ্ঞাতসারেই ছোরা তুলিল। এই সময় তাহার কানের কাছে মৃদু শব্দ হইল, "এসেছ ?"

"চুয়া !" কোমরে ছোরা রাখিয়া চন্দনদাস দুই হাতে চুয়ার হাত ধরিল, বলিল, "চুয়া ! এসেছি।"

চুয়ার নিশ্বাসের মতো মৃদু চাপা স্বর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; সে বলিল, "তুমি আসবে বলেছিলে, তাই আমি তোমার জন্যে সারা রাত জেগে আছি।"

অন্য সময় কথাগুলি অভিসারিকার প্রণয়বাণীর মতো শুনাইত ; কিন্তু বিপদের মাঝখানে দাঁড়াইয়াও চন্দনদাসের মনে হইল, এত মধুর শব্দসমষ্টি সে আর কখনও শুনে নাই। চুয়ার মুখখানি দেখিবার জন্য তাহার প্রাণে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। অথচ অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। চন্দনদাস চুয়ার কানে কানে বলিল, "চুয়া, একটা আলো জ্বালতে পারো না ? তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

দু'জনে অন্ধকারে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, চুয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, এসো।"—বলিয়া হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। চন্দনদাস তেমনই মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "চাঁপা কোথায় ?"

"ঘুমুচ্ছে।"

"ঠান্‌দি ?"

"ঠান্‌দিও ঘুমিয়ে পড়েছে।"

গোহালের মতো একটা পরিত্যক্ত ঘরে লইয়া গিয়া চুয়া চকমকি ঠুকিয়া আলো জ্বালিল। তখন প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে চুয়ার মুখ দেখিয়া চন্দনদাস চমকিয়া উঠিল— চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে ; আশা, আশঙ্কা ও তীব্রোৎকণ্ঠার দ্বন্দ্বে চুয়ার অনুপম রূপ যেন ছিঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

চন্দনদাসের বুকে বেদনার শূল বিঁধিল, সে বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "চুয়া !"

চুয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল ; রোদনরুদ্ধ স্বরে বলিল, "তোমার নৌকো চলে গেছে শুনে এত ভয় হয়েছিল !"

চন্দনদাস চুয়ার পাশে বসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "চুয়া, আর ভয় নেই। তোমার উদ্ধারের সমস্ত ব্যবস্থা করেছি।"

চুয়া চোখ মুছিয়া মুখ তুলিল, "কি ?"

চন্দনদাস বলিল, "বলছি। আগে বলো দেখি, তুমি সাঁতার কাটতে জানো ?"

অবসাদ-ভরা সুরে চুয়া বলিল, "জানি। তাই তো ডুবে মরতে পারিনি। কতবার সে চেষ্টা করেছি।"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইল, চুয়াকে বুকে জড়াইয়া লইয়া সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সে লোভ সংবরণ করিল, বলিল, "ও কথা ভুলে যাও, চুয়া, বুকে সাহস আনো। আমি এসেছি দেখেও তোমার সাহস হয় না ?"

চুয়া কেবল তাহার কালিমালিপ্ত চোখ দুটি তুলিয়া চন্দনদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল ; হয়তো নিজের একান্ত নির্ভরশীলতার কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। চন্দনদাস তখন সংক্ষেপে প্রাঞ্জলভাবে উদ্ধারের উপায় বিবৃত করিয়া বলিল ; চুয়া ব্যগ্র বিস্ফারিতনয়নে শুনিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

চন্দনদাসের বিবৃতি শেষ হইলে চুয়া কিছুক্ষণ হেঁটমুখে নীরব হইয়া রহিল। লজ্জা করিবার সে অবকাশ পায় নাই,— হৃদয়ের তুমুল আন্দোলনের মধ্যে এই তরুণ উদ্ধারকর্তাটিকে সে যে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, তাহা নিজেই জানিতে পারে নাই। তাই উদ্ধারের আশা যখন তাহার সংশয়ময় চিত্তে আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, চন্দনদাসের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল। দুই হাতে পা জড়াইয়া কাঁদিয়া কহিল, "একটা কথা বলো।"

চন্দনদাস চুয়ার মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "চুয়া, চুয়া, কি কথা ?"

"বলো, আমায় বিয়ে করবে ? তুমি আমায় প্রবঞ্চনা করছ না ?"

চন্দনদাস জোর করিয়া চুয়ার মুখ তুলিয়া তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল, "চুয়া,

আমার মায়ের নামে শপথ করছি, তোমাকে যদি বিয়ে না করি, যদি আমার মনে অন্য কোনও অভিসন্ধি থাকে, তবে আমি কুলাঙ্গার।"

চুয়ার মাথা আবার মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তারপর সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, "তবে আমাকে এখনই নিয়ে যাচ্ছ না কেন ?"

চন্দনদাসের ইচ্ছা হইতেছিল, এখনই এই কারাগার হইতে চুয়াকে মুক্ত করিয়া লইয়া পলায়ন করে ; কিন্তু সুবুদ্ধি নিষেধ করিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বড় বেশি। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না—এখন ভরসা হয় না। বাড়ির দোরে পাহারা— যদি ওরা জেগে ওঠে। —কিন্তু আমার এখানে আর থাকা বোধ হয় নিরাপদ নয়— চাঁপার ঘুম ভাঙতে পারে।"— বলিয়া চন্দনদাস অনিচ্ছাভরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চুয়ার মনে আবার ভয় প্রবেশ করিল। সম্মুখে সমস্ত দিন পড়িয়া আছে ; কি জানি কি হয় ! সে ভয়-কাতর চক্ষু দুইটি তুলিয়া বলিল, "যাচ্ছ ?—কিন্তু—"

"কোনও ভয় নেই, চুয়া।"

"কিন্তু— যদি বিঘ্ন হয়— যদি— একটা জিনিস দিতে পারবে ?"

"কি ?"

"একটু বিষ। যদি কিছু বিঘ্ন হয়—"

চন্দনদাস কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে নিজের চুল হইতে সেই কাঁটা বাহির করিয়া দিল। গাঢ়স্বরে বলিল, "চুয়া, যদি দেখ কোনও আশা নেই তবেই ব্যবহার করো, তার আগে নয়।"—বলিয়া কাঁটার ভয়ংকর কার্যকারিতা বুঝাইয়া দিল।

এতক্ষণে চুয়ার মুখে হাসি দেখা দিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রোজ্জ্বল চক্ষে বলিল, "আর আমি ভয় করি না।"

চন্দনদাসের মুখে কিন্তু হাসির প্রতিবিম্ব পড়িল না। সে চুয়ার দুই হাত লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল, "চুয়া—"

বাক্‌পটু চন্দনদাস ইহার অধিক আর কথা খুঁজিয়া পাইল না।

চুয়া অশ্রু-আর্দ্র হাসিমুখ একবার চন্দনদাসের বুকের উপর রাখিল, অস্ফুটস্বরে কহিল, "চুয়া নয়—চুয়া-বউ। এই আমাদের বিয়ে।"

ঘরের বাহিরে আসিবার পর একটা কথা চন্দনদাসের মনে পড়িল, সে বলিল, "ঠান্‌দির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাকে ব'লো— কাল সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে পালিয়ে যেন নিমাই পণ্ডিতের বাড়িতে যায়। সেখানে দু'-এক দিন লুকিয়ে থাকবে, তারপর আমি তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।"

গ্রীষ্মের হ্রস্ব রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিতেছে। কাক-কোকিল ডাকে নাই, কিন্তু বাতাসে আসন্ন প্রভাতের স্পর্শ লাগিয়াছে। পূর্বাকাশে শুকতারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া চন্দনদাস আর একবার চুয়ার দুই হাত নিজের বুকে চাপিয়া লইল। তারপর যে ভাবে আসিয়াছিল, সেই ভাবে ছায়ামূর্তির মতো বাহির হইয়া গেল।

পাইক দুই জন শেষ রাত্রির গভীর ঘুম ঘুমাইতে লাগিল।

অমাবস্যার সংশয়পূর্ণ দিবস ধীরে ধীরে ক্ষয় হইয়া আসিল। অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটিল না। কেবল দ্বিপ্রহরে মাধব চুয়ার গৃহে আসিয়া তদারক করিয়া গেল ও জানাইয়া গেল যে, তাহার প্রদত্ত শাস্ত্রীয়-বিধান যেন যথাযথ পালিত হয়।

এখানে চাঁপার কাজ শেষ হইয়াছিল ; মাধবের অনুমতি পাইয়া সে প্রমোদ-উদ্যানে পূজার

আয়োজন করিতে গেল।

সায়াহ্নে নবদ্বীপের ঘাটে স্নানার্থীর বিশেষ ভিড় ছিল না। দুই-চারি জন নারী গা ধুইয়া যাইতেছিল, কেহ কেহ কলসে ভরিয়া গঙ্গাজল লইয়া যাইতেছিল। পুরুষের সংখ্যা অল্প। কেবল একজন পুরুষ অধীরভাবে সোপানের উপর পদচারণ করিতেছিল ও মাঝে মাঝে স্থির হইয়া উৎকর্ণভাবে কি শুনিতেছিল। তাহার গলায় মুক্তাহার বিলম্বিত—অন্যথা সাধারণ বাঙালীর বেশ। বলা বাহুল্য, সে চন্দনদাস।

ক্রমে সূর্য নদীর পরপারে অস্তমিত হইল। নিদাঘকালের দ্রুত সন্ধ্যা যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া আসিয়া ভাগীরথীর জলে ধূসর ছায়া বিছাইয়া দিল। পাশে নৌকাঘাট নির্জন ও নিস্তব্ধ। জেলে-ডিঙ্গি একটিও নাই। দুই-একখানি স্থূলকলেবর মহাজনী কিস্তি নিঃসঙ্গ অসহায়ভাবে বিস্তীর্ণ ঘাটে লাগিয়া আছে।

গঙ্গাবক্ষেও নৌকা নাই। কেবল দূরে উত্তরে একটি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসিতেছে। অস্পষ্ট আলোকে মনে হয়, একটি লোক দাঁড় ধরিয়া তাহাতে বসিয়া আছে।

ক্রমে ডিঙ্গি মাঝগঙ্গা দিয়া ঘাটের সম্মুখীন হইল ; কিন্তু ঘাটের নিকটে আসিল না, গঙ্গাবক্ষে স্থির হইয়া রহিল। নৌকারূঢ় ব্যক্তি মাঝে মাঝে দাঁড় টানিয়া নৌকা ভাসিয়া যাইতে দিল না।

চন্দনদাস চিন্তিতমুখে অধীরপদে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—ঐ আসিতেছে। পথে দূরাগত বাদ্যোদ্যম শুনা গেল। চন্দনদাস একবার গঙ্গাবক্ষস্থ ডিঙ্গির দিকে তাকাইল, তারপর স্পন্দিতবক্ষে একটা গোলাকার বুরুজের উপর গিয়া বসিল।

বাদ্যধ্বনি ক্রমশ কাছে আসিতে লাগিল। মহারোলে কাঁসর-ঘণ্টা শিঙা-ঢোল বাজিতেছে। তামাসা দেখিবার জন্য বহু স্ত্রী-পুরুষ-বালক জুটিয়াছিল, তাহাদের কলরব সেই সঙ্গে মিশিয়া কোলাহল তুমুল হইয়া উঠিয়াছে।

ঘাটের শীর্ষে আসিয়া কোলাহল থামিল ; বাজনা বন্ধ হইল। চন্দনদাস দেখিল, কৌতূহলী জনতাকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দুই সারি ঢাল-সড়কিধারী পাইক নামিয়া আসিতেছে। তাহাদের দুই সারির মধ্যস্থলে মুক্তকেশী জবামাল্য-পরিহিতা চুয়া। চন্দনদাসও কৌতূহলী দর্শকের মতো দাঁড়াইয়া এই বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল।

পাইকগণ সদম্ভে অস্ত্র আস্ফালন করিয়া দর্শকদের ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া ঘাটের দিকে নামিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যবর্তিনী চুয়া মন্থরপদে এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে সোপান অবরোহণ করিতে লাগিল।

তারপর চন্দনদাসের সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইল। নিমেষের দৃষ্টি-বিনিময়ে যে ইঙ্গিত খেলিয়া গেল, আর কেহ তাহা দেখিল না।

বুরুজের পাশ দিয়া যাইবার সময় চন্দনদাস অগ্রগামী পাইককে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ সর্দার, এ তোমাদের কিসের মিছিল ?"

বদন সর্দার প্রশ্নকারীর দিকে ভ্রূকুটি করিয়া তাকাইল, তাহার গলায় দোদুল্যমান মুক্তার হার দেখিল, তারপর রূঢ়স্বরে কহিল, "তোর অত খবরে দরকার কি ?"

চন্দনদাস মুখে বিনীতভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, "না না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।" মনে মনে বলিল, "মালিক আর চাকরের রা দেখি একই রকম। দাঁড়াও, তোমার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করছি !"

পরবর্তী পাইকগণ সকলেই চোখ পাকাইয়া চন্দনদাসের দিকে তাকাইল ; তাহার গলায় লোভনীয় মুক্তাহার কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। দুর্দান্ত প্রভুর উচ্ছৃঙ্খল ভৃত্য—হারছড়া কাড়িয়া লইবার জন্য সকলেরই হাত নিশপিশ করিতে লাগিল।

জলের কিনারায় গিয়া পাইকের দল থামিল। চুয়া সোপান হইতে ঝুঁকিয়া গঙ্গাজল মাথায় দিল ; তাহার ঠোঁট দুটি অব্যক্ত প্রার্থনায় একটু নড়িল। তারপর সে ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিল। প্রথমে এক হাঁটু, ক্রমে এক কোমর, শেষে বুক পর্যন্ত জলে গিয়া দাঁড়াইল। গলার মালা জলে ভাসাইয়া দিয়া ডুব দিল।

পাইকেরা কিনারায় কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া গল্প করিতে করিতে গোঁফে মোচড় দিতে লাগিল।

এই সময় একটি ক্ষুদ্র ব্যাপার ঘটিল। চন্দনদাস ইতিমধ্যে বুরুজ হইতে নামিয়া পাইকদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল, "ঐ যাঃ!"

একজন পাইক ফিরিয়া দেখিল, চন্দনদাসের গলার মুক্তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং মুক্তাগুলি সুতা হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঘাটের শানের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। সে লাফাইয়া আসিয়া মুক্তা কুড়াইতে লাগিল। তাহাকে মুক্তা কুড়াইতে দেখিয়া বাকি কয়জন পাইক হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়িল। মুক্তার হরির লুট—এমন সুযোগ বড় ঘটে না। সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া মুক্তা চুনিতে লাগিল, ঠেলা খাইয়া চন্দনদাস বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িল।

পাইকেরা মুক্তা কুড়াইতেছে, দর্শকেরা তাহাদের ঘিরিয়া লুব্ধচক্ষে দেখিতেছে। কেহ লক্ষ্য করিল না যে, এই অবকাশে চন্দনদাস গঙ্গায় নামিল। চুয়া তখন সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চুয়া ও চন্দনদাস পাশাপাশি সাঁতার কাটিয়া চলিল। অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে ; তাহাদের কালো মাথা দুটি কেবল জলের উপর দেখা যাইতেছে। চুয়া চন্দনদাসের পানে তাকাইল, তাহার সিক্ত মুখের উচ্ছলিত হাসি চন্দনদাসকে পুরস্কৃত করিল।

তাহারা যখন ঘাট হইতে প্রায় চল্লিশ হাত গিয়াছে, তখন ঘাটে একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠিল। তারপর "ধর্ ধর্, পালাল, পালাল—" বলিয়া কয়েক জন পাইক জলে লাফাইয়া পড়িল, কয়েক জন নৌকার সন্ধানে ছুটিল। কিন্তু নৌকা কোথায়? বদন সর্দার ষাঁড়ের মতো চেঁচাইতে লাগিল।

গঙ্গার বুকে যে ছোট্ট ডিঙ্গি ভাসিতেছিল, তাহা ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল। চন্দনদাস বলিল, "চুয়া, যদি হাঁপিয়ে পড়ে থাকো, আমার কাঁধ ধরো।"

চুয়া বলিল, "না, আমি পারব।"

চন্দনদাস পিছু ফিরিয়া দেখিল, যে পাইকগুলা জলে ঝাঁপ দিয়াছিল, তাহারা সজোরে সাঁতারিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা এখনও অনেক দূরে, নৌকা সম্মুখেই। কয়েক মুহূর্ত পরে দুই জনে একসঙ্গে গিয়া নৌকার কানা ধরিল।

নিমাই পণ্ডিত দাঁড় ছাড়িয়া চুয়াকে ধরিয়া নৌকায় তুলিলেন। চন্দনদাস তাহার পরে উঠিল।

যে পাইকটা সর্বাগ্রে আসিতেছিল, সে প্রায় বিশ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে হাত তুলিয়া ভাঙা গলায় চিৎকার করিয়া কি একটা বলিল। প্রত্যুত্তরে চন্দনদাস উচ্চ হাসিয়া দু'খানা দাঁড় হাতে তুলিয়া লইল। নিমাই পণ্ডিতও দাঁড় হাতে লইলেন।

দুই জনে একসঙ্গে দাঁড় জলে ডুবাইয়া টানিলেন। প্রদোষের ছায়ালোকে ক্ষুদ্র ডিঙ্গি পাখির মতো উড়িয়া চলিল।

নবদ্বীপ হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গাবক্ষে চন্দনদাসের দুই সমুদ্রতরী নোঙর করা ছিল। অন্ধকারে তাহাদের একচাপ গাঢ়তর অন্ধকারের মতো দেখাইতেছিল।

রাত্রি এক প্রহরকালে ক্ষুদ্র নৌকা গিয়া চন্দনদাসের মধুকর ডিঙ্গার গায়ে ভিড়িল। মাঝিরা সজাগ ও সতর্ক ছিল ; মুহূর্তমধ্যে সকলে বড় নৌকায় উঠিলেন।

নিমাই পণ্ডিত বলিলেন, "আমার কাজ তো শেষ হল, আমি এবার ফিরি।"

চন্দনদাস হাত জোড় করিয়া বলিল, "ঠাকুর, এত দয়া করলেন, একটু বিশ্রাম করে যান।"

নৌকায় দুইটি কুঠুরি —একটি মাণিকভাণ্ডার, অপরটি চন্দনদাসের শয়নকক্ষ। শয়নকক্ষের মেঝেয় রঙীন পক্ষ্মল সুতির আস্তরণ। ঘরে দীপ জ্বলিতেছিল; সকলে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। চুয়া এক কোণে জড়সড় হইয়া অর্ধশুষ্ক বসন গায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইল। চন্দনদাস তাড়াতাড়ি পেটারি হইতে নিজের একখানা ক্ষৌমবস্ত্র বাহির করিয়া চুয়ার গায়ে ফেলিয়া দিল। চুয়া কাপড় লইয়া পাশের ঘরে গেল।

নিমাই পণ্ডিত আস্তরণের উপর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; চুয়া প্রস্থান করিলে চন্দনদাস চুপি চুপি বলিল, "ঠাকুর, বিয়েটা আজ রাতেই দিয়ে দিলে ভাল হয়।"

নিমাই হাসিয়া বলিলেন, "এত তাড়া কিসের? বাড়ি গিয়ে বিয়ে করো।"

চন্দনদাস ভারি ভালমানুষের মতো বলিল, "না ঠাকুর, চুয়া যদি কিছু মনে করে?—তা ছাড়া, নৌকোয় একটি বই শোবার ঘর নেই।"

নিমাই বলিলেন, "কিন্তু বিয়ে দিই কি করে? উপকরণ কই?"

"ঠাকুর, আপনি পণ্ডিতমানুষ, সামান্য পুরুত তো নন। আপনি ইচ্ছে করলে শুধু হাতেই বিয়ে দিতে পারেন।"

নিমাই স্মিতমুখে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "মন্দ কথা নয়। তুমি কন্যাকে হরণ করে এনেছ, সুতরাং তোমাদের রাক্ষস-বিবাহ হতে পারে। রাক্ষস-বিবাহে কোনও অনুষ্ঠানের দরকার নেই।"

চন্দনদাস মহা উল্লাসে উঠিয়া গিয়া চুয়ার হাত ধরিয়া লইয়া আসিল; বলিল, "চুয়া, ঠাকুর এখনই আমাদের বিয়ে দেবেন।"

পট্টাম্বরপরিহিতা চুয়া নত-নয়নে রহিল। নিমাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চন্দনদাস নাছোড়বান্দা, আজই বিয়ে করে তবে ছাড়বে।" চুয়ার মুখে অরুণরাগ দেখিয়া বুঝিলেন তাহার অমত নাই। বলিলেন, "বেশ। ফুলের মালা তো হবে না, দু'ছড়া হার যোগাড় করো।"

পুলকিত চন্দনদাস মাণিকভাণ্ডার হইতে দু'গাছা মুক্তার মালা বাহির করিয়া দিল। তখন বিবাহ-ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

নিমাই একটি হার চুয়ার হাতে দিয়া বলিলেন, "দু'জনে দু'জনের গলায় দাও।"

উভয়ে মালা-বদল করিল।

নিমাই বলিলেন, "ঈশ্বর সাক্ষী করে গঙ্গার বুকের উপর ব্রাহ্মণ-সাক্ষাতে আজ তোমরা স্বামী-স্ত্রী হলে। আশীর্বাদ করি, তোমাদের মঙ্গল হোক।"

উভয়ে নতজানু হইয়া ভক্তিপূত-চিত্তে এই দেবকল্প তরুণ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইল।

তারপর উঠিয়া চন্দনদাস বলিল, "ঠাকুর, এ বিয়ে লোকে মানবে তো?"

নিমাই পণ্ডিতের নাসা স্ফুরিত হইল, তিনি গর্বিতস্বরে বলিলেন, "নিমাই পণ্ডিত যে-বিয়ের পুরুত, সে-বিয়ে অমান্য করে কে?"

চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের পদতলে এক মুঠি মোহর রাখিয়া বলিল, "দেবতা, আপনার দক্ষিণা।"

নিমাই এইবার হাসিয়া উঠিলেন, "ঐটি পারব না। —যাক্, আজ উঠলাম। বুড়িকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা শীগ্গির করো। আর, বাড়ি গিয়ে যথারীতি লৌকিক বিবাহ করো। অধিকন্তু ন দোষায়।"

"তা করব। কিন্তু ঠাকুর, আপনি ক্লান্ত, পাঁচ-ছ' ক্রোশ দাঁড় টেনে এসেছেন, আজ রাত্রিটা নৌকোয় কাটিয়ে গেলে হত না?"

"না—আজই আমায় ফিরতে হবে। রাত্রিতে না ফিরলে মা চিন্তিত হবেন। তা ছাড়া, তোমার নৌকায় তো একটি বই ঘর নেই।"—বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

চন্দনদাস একটু লজ্জিত হইল।

তারপর সেই মসীকৃষ্ণ অমাবস্যার মধ্যযামে নিমাই পণ্ডিত ডিঙ্গিতে উঠিয়া একাকী নবদ্বীপের পানে ফিরিয়া চলিলেন। যতক্ষণ তাঁহার দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল, চুয়া ও চন্দন জোড়হস্তে তদ্গতচিত্তে নৌকার পাশে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪১



বিষকন্যা

১

যে কালের উপর চিরবিস্মরণের পর্দা পড়িয়া গিয়াছে, সেকাল মিলনোৎকণ্ঠিতা নবযৌবনা নাগরী যখন সন্ধ্যাসমাগমে ভবনশীর্ষে উঠিয়া কেশপ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহার স্বর্ণমুকুরে যে উৎফুল্ল-উৎসুক স্মিত-সলজ্জ মুখের প্রতিবিম্ব পড়িত, তাহা এ কালেও আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি। চিরন্তনী নারীর ঐ মূর্তিটিই শুধু শাশ্বত—যুগে যুগান্তরে অচপল হইয়া আছে। কেবলমাত্র ঐ নিদর্শন দ্বারাই তাঁহাকে সেই নারী বলিয়া চিনিয়া লইতে পারি।

কিন্তু অন্য বিষয়ে— ?

সে যাক। প্রসাধনরতা সুন্দরীর দ্রুত অধীর হস্তে গজদন্ত-কঙ্কতিকা কেশ কর্ষণ করিয়া চলিতে থাকে। ক্রমে দুটি একটি উন্মূলিত কেশ কঙ্কতিকায় জড়াইয়া যায়; প্রসাধনশেষে সুন্দরী কঙ্কতিকা হইতে বিচ্ছিন্ন কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া অন্যমনে দুই চম্পক-অঙ্গুলীর দ্বারা গ্রন্থি পাকাইয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। ক্ষুদ্র কেশগ্রন্থি অবহেলার লক্ষ্যহীন বায়ুভরে উড়িয়া কোন্ বিস্মৃতির উপকূলে বিলীন হইয়া যায়, কে তাহার সন্ধান রাখে ?

তেমনই, বহু বহু শতাব্দী পূর্বে একদা কয়েকটি মানুষের জীবন-সূত্র যেভাবে গ্রন্থি পাকাইয়া গিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সন্ধান রাখে না। মহাকালভুজগের যে বক্ষচিহ্ন একদিন ধরিত্রীর উপর অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। মৃন্ময়ী চিরনবীনা, বৃদ্ধ অতীতের ভোগ-লাঞ্ছন সে চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতে ভালবাসে না। নিত্য নব নব নাগরের গৃহে তাহার অভিসার। হায় বহুভর্তৃকা, তোমার প্রেম এত চপল বলিয়াই কি তুমি চিরযৌবনময়ী ?

দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল হইল, যে কয়টি স্বল্পায়ু নর-নারীর জীবনসূত্র সুন্দরীর কুটিল কেশকুণ্ডলীর মতো জড়াইয়া গিয়াছিল, তাহাদের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি। লিখিতে বসিয়া একটা বড় বিস্ময় জাগিতেছে। জন্মজন্মান্তরের জীবন তো আমার নখদর্পণে, সহস্র জন্মের ব্যথা-বেদনা আনন্দের ইতিহাস তো এই জাতিস্মরের মস্তিষ্কের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তবু যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার বিগত জীবনের আলোচনা করি না কেন, দেখিতে পাই, কোনও না কোনও নারীকে কেন্দ্র করিয়া আমার জীবন আবর্তিত হইয়াছে; জীবনে যখনই কোনও বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়াছে, তখনই তাহা এক নারীর জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। নারীদ্বেষক হইয়া জন্মিয়াছি, কিন্তু তবু নারীকে এড়াইতে পারি নাই। বিস্ময়ের সহিত মনে প্রশ্ন

জাগিতেছে—পৃথিবীর শত কোটি মানুষের জীবন কি আমারই মতো ? ইহাই কি জীবনের অমোঘ অলঙ্ঘনীয় রীতি ? কিংবা —আমি একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যতিক্রম ?

ন্যূনাধিক চব্বিশ শতাব্দী পূর্বের কথা। বুদ্ধ তথাগত প্রায় শতাধিক বর্ষ হইল নির্বাণ লাভ করিয়াছেন। উত্তর ভারতে চারিটি রাজ্য—কাশী কোশল লিচ্ছবি ও মগধ। চারিটি রাজ্যের মধ্যে বংশানুক্রমে অহি-নকুলের সম্বন্ধ স্থায়িভাব ধারণ করিয়াছে। পাটলিপুত্রের সিংহাসনে শিশুনাগবংশীয় এক অশ্রুতকীর্তি রাজা অধিরূঢ়।

শিশুনাগবংশের ইতিবৃত্ত পুরাণে আদ্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পায় নাই, অজাতশত্রুর পর হইতে কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। তাহার কারণ, অমিতবিক্রম অজাতশত্রুর পর হইতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় পর্যন্ত মগধে এক প্রকার রাষ্ট্রীয় বিপ্লব চলিয়াছিল। পিতাকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকার করা শিশুনাগরাজবংশের একটা বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিপুল রাজপরিবারের মধ্যে সিংহাসনের জন্য হানাহানি অন্তর্বিবাদ সহজ ও প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। বংশের একজন শক্তিশালী ব্যক্তি রাজাকে বিতাড়িত করিয়া নিজে সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, ইহার কিছুকাল পরে পূর্ববর্তী রাজা শক্তি সংগ্রহ করিয়া আবার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিলেন—এইভাবে ধারাবাহিক শাসন-পারম্পর্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, প্রজারাও সুখে ছিল না। তাহারা মাঝে মাঝে মাৎস্যন্যায় করিয়া রাজাকে মারিয়া আর একজনকে তাহার স্থানে বসাইয়া দিত। সেকালে প্রকৃতিপুঞ্জের সহিষ্ণুতা আধুনিক কালের মতো এমন সর্বংসহা হইয়া উঠিতে পারে নাই, প্রয়োজন হইলে ধৈর্যের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইত। তখন শ্রীমন্মহারাজের শোণিতে পথের ধূলি নিবারিত হইত, তাঁহার জঠর-নিষ্কাশিত অন্ত্র দ্বারা রাজপুরী পরিবেষ্টিত করিয়া জিঘাংসু বিদ্রোহীর দল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিত।

সে যাক। পুরাণে শিশুনাগবংশীয় মহারাজ চণ্ডের নাম পাওয়া যায় না। চণ্ডের প্রকৃত নাম কি ছিল তাহাও লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। মহিষের মতো আকৃতির মধ্যে রাক্ষসের মতো প্রকৃতি লইয়া ইনি কয়েক বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তার পর—কিন্তু সে পরের কথা।

রাজ-অবরোধে এক দাসী একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিল। অবশ্য মহারাজ চণ্ডই কন্যার পিতা ; সুতরাং সভাপণ্ডিত নবজাতা কন্যার কোষ্ঠী তৈয়ার করিলেন।

কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিত বলিলেন—'শ্রীমন্, এই কন্যা অতিশয় কুলক্ষণা, প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী—সাক্ষাৎ বিষকন্যা। ইহাকে বর্জন করুন।'

সিংহাসনে আসীন মহারাজের বন্ধুর ললাটে ভীষণ ভ্রূকুটি দেখা দিল ; পণ্ডিত অন্তরে কম্পিত হইলেন। স্পষ্ট কথা মহারাজ ভালবাসেন না ; স্পষ্ট কথা বলিয়া অদ্যই সচিব শিবমিশ্রের যে দশা হইয়াছে, তাহা সকলেই জানে। পণ্ডিত স্খলিত বচনে বলিলেন—'মহারাজ, আপনার কল্যাণের জন্যই বলিতেছি, এ কন্যা বর্জনীয়া।'

কিন্তু মহারাজের ভ্রূকুটি শিথিল হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন্ প্রিয়জনের অধিক অনিষ্ট হওয়া সম্ভব ?'

পণ্ডিত পুনরায় কোষ্ঠী দেখিলেন, তারপরে ভয়ে ভয়ে বলিলেন—'উপস্থিত পিতা মাতা সকলেরই অনিষ্ট-সম্ভাবনা রহিয়াছে। মঙ্গল সপ্তমে ও শনি অষ্টমে থাকিয়া পিতৃস্থানে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে।'

কে কোথায় দৃষ্টি করিতেছে তাহা জানিবার কৌতূহল মহারাজের ছিল না। তাঁহার মুখে স্ফুরিত বিদ্যুৎ বৈশাখী মেঘ ঘনাইয়া আসিল। মহারাজের সাম্যদৃষ্টির সম্মুখে অপরাধী ও

নিরপরাধের প্রভেদ নাই—অশুভ বা অপ্রীতিকর কথা যে উচ্চারণ করে সেই দণ্ডার্হ। এ ক্ষেত্রে শনি-মঙ্গলের পাপদৃষ্টির ফল যে জ্যোতিষাচার্যের শিরে বর্ষিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? পণ্ডিত প্রমাদ গণিলেন।

সভা-বিদূষক বটুকভট্ট সিংহাসনের পাশে বসিয়াছিল। সে খর্বকায় বামন, মস্তকটি বৃহদাকার, কণ্ঠস্বর এরূপ তীক্ষ্ণ যে, মনে হয় কর্ণের পটহ ভেদ করিয়া যাইবে। পণ্ডিতের দুরবস্থা দেখিয়া সে সূচ্যগ্রসূক্ষ্ম কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল—'বিষকন্যা! তবে তো ভালই হইয়াছে, মহারাজ! এই দাসীপুত্রীকে সযত্নে পালন করুন। কালে যৌবনবতী হইলে ইহাকে নগর-নটির পদে অভিষিক্ত করিবেন। আপনার দুষ্ট প্রজারা অচিরাৎ যম-মন্দিরে প্রস্থান করিবে।'

বটুকভট্টকে রাজ-পার্ষদ সকলেই ভালবাসিত, শুধু তাহার বিদূষণ-চাতুর্যের জন্য নয়, বহুবার বহু বিপন্ন সভাসদ্‌কে সে রাজরোষ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।

তাহার কথায় মহারাজের ভ্রূগ্রন্থি ঈষৎ উন্মোচিত হইল, তিনি বামহস্তে বটুকের কেশমুষ্টি ধরিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া ধরিলেন। সূত্রাগ্রে ব্যাদিত-মুখ মৎস্যের ন্যায় বটুক ঝুলিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন—'বটু, তোর জিহ্বা উৎপাটিত করিব।'

বটুক তৎক্ষণাৎ দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া দিল। রাজা হাস্য করিয়া তাহাকে মাটিতে নামাইলেন। পণ্ডিতের ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

ভৃঙ্গারে মাধ্বী ছিল। রাজার কটাক্ষমাত্রে কিঙ্করী চষক ভরিয়া তাঁহার হস্তে দিল। চষক নিঃশেষ করিয়া রাজা বলিলেন—'এখন এই বিষকন্যাটাকে লইয়া কি করা যায়?'

গণদেব নামক একজন চাটুকার পার্ষদ বলিল—'মহারাজ, উহাকেও শিবমিশ্রের পথে প্রেরণ করুন—রাজ্যের সমস্ত অনিষ্ট দূর হউক।'

মহারাজ চণ্ডের রক্ত-নেত্রে একটা ক্রূর কৌতুক নৃত্য করিয়া উঠিল, তিনি স্বভাবস্ফীত অধর প্রসারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাসচিব শিবমিশ্র মহাশয় এখন কি করিতেছেন, কেহ বলিতে পার?'

গণদেব মুণ্ড আন্দোলিত করিয়া মুখভঙ্গি সহকারে বলিল—'এইমাত্র দেখিয়া আসিতেছি, তিনি শ্মশানভূমিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া শ্মশান-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণভোজন করাইব বলিয়া কিছু মোদক লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নে রুচি নাই।' বলিয়া নিজ রসিকতায় অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া চারিদিকে তাকাইল।

মহারাজ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন—'ভাল। অদ্য নিশাকালে শিবাদল আসিয়া শিবমিশ্রের মুণ্ড ভক্ষণ করিবে।' তারপর ভীষণ দৃষ্টিতে চতুর্দিকে চাহিয়া বলিলেন—'শিবমিশ্র আমার আজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়াছিল, তাই আজ তাহাকে শৃগালে ছিঁড়িয়া খাইবে।—তোমরা এ কথা স্মরণ রাখিও।'

সভা স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেহ বাক্য উচ্চারণ করিতে সাহসী হইল না।

রাজা তখন সভা-জ্যোতিষীকে বলিলেন—'পণ্ডিতরাজ, আপনার অভিমত রাজ্যের কল্যাণে এ কন্যা বর্জিত হউক। ভাল, তাহাই হইবে। কন্যা ও কন্যার মাতা উভয়েই অদ্য রাত্রিতে শ্মশানে প্রেরিত হইবে। সেখানে কন্যার মাতা স্বহস্তে কন্যাকে শ্মশানে প্রোথিত করিবে। তাহা হইলে দৈব আপদ দূর হইবে তো?'

পণ্ডিত শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—'মহারাজ, এরূপ কঠোরতা নিষ্প্রয়োজন। কন্যাকে ভাগীরথীর জলে বিসর্জন করুন, কিন্তু কন্যার মাতা নিরপরাধিনী—তাহাকে—'

রাজা গর্জিয়া উঠিলেন—'নিরপরাধিনী! সে এরূপ কন্যা প্রসব করে কেন?—যাক, আপনার বাগ্‌বিস্তারেতে প্রয়োজন নাই, যাহা করিবার আমি স্বহস্তে করিব।' বলিয়া মহারাজ সিংহাসন

হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

যাহার দুর্দম দানবপ্রকৃতি মর্ত্যলোকে কোনও বস্তুকে ভয় করিত না, দৈব আপদের আশঙ্কা তাহাকে এমনই অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল যে, নিজ ঔরসজাত কন্যার প্রতি তাহার চিত্তে তিলমাত্র মমতার অবকাশ ছিল না।

পাটলিপুত্র নগরের চৌষট্টি দ্বার, তন্মধ্যে দশটি প্রধান ও প্রকাশ্য। বাকিগুলি অধিকাংশই গুপ্তপথ।

এই গুপ্তপথের একটি রাজপ্রাসাদসংলগ্ন ; রাজা বা রাজপরিবারস্থ যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই দ্বারপথে নগর-প্রাকারের বাহিরে যাইতে পারিতেন। তাল-কাণ্ডের একটি শীর্ণ সেতু ছিল, তাহার সাহায্যে পরিখা পার হইতে হইত। এই স্থানে গঙ্গাপ্রবাহের সহিত খনিত পরিখা মিলিত হইয়াছিল।

পরিখার পরপারে কিছু দূর যাইবার পর গঙ্গাতটে পাটলিপুত্রের মহাশ্মশান আরম্ভ হইয়াছে ;—যত দূর দৃষ্টি যায়, তরুগুল্মহীন ধু ধু বালুকা। বালুকার উপর অগণিত লৌহশূল প্রোথিত রহিয়াছে ; শূলগাত্রে কোথাও অর্ধপথে বীভৎস উলঙ্গ মনুষ্যদেহ বিদ্ধ হইয়া আছে, কোথাও শুষ্ক নরকঙ্কাল শূলমূলে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। চারিদিকে শত শত নরকপাল বিক্ষিপ্ত। দিবাভাগেই এই মহাশ্মশানের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর ; অপিচ, রাত্রিকালে নগরীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেলে এই মনুষ্যহীন মৃত্যুবাসরে যে পিশাচ-পিশাচীর নৃত্য আরম্ভ হয়, তাহা কল্পনা করিয়াই পাটলিপুত্রের নাগরিকরা শিহরিয়া উঠিত। দণ্ডিত অপরাধী ভিন্ন রাত্রিকালে মহাশ্মশানে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল—চণ্ডালরাও মহাশ্মশানের অনির্বাণ চুল্লীতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রতিগমন করিত।

সে-রাত্রে আকাশে সপ্তমীর খণ্ড চন্দ্র উদিত হইয়াছিল। অপরিস্ফুট আলোক শ্মশানের বিস্তীর্ণ বালুকারাশির উপর যেন একটা শ্বেতাভ কুজ্ঝটিকা প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল। তটলেহী গঙ্গার ধূসর প্রবাহ চন্দ্রালোকে কৃষ্ণবর্ণ প্রতিভাত হইতেছিল। শ্মশান ও নদীর সন্ধিরেখার উপর দূরে অনির্বাণ চুল্লীর আরক্ত অঙ্গার জ্বলিতেছিল।

প্রথম প্রহর রাত্রি—প্রাকাররুদ্ধ পাটলিপুত্রে এখনও নগরগুঞ্জন শান্ত হয় নাই ; কিন্তু শ্মশানে ইহারই মধ্যে যেন প্রেতলোকের অশরীরী উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। চক্ষে কিছু দেখা যায় না, তবু মনে হয়, সূক্ষ্মদেহ পিশাচী-ডাকিনীরা চক্ষু-খদ্যোত জ্বালিয়া লুব্ধ লালায়িত রসনায় গলিত শবমাংস অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। আকাশে নিশাচর পক্ষীর পক্ষশব্দ যেন তাহাদেরই আগমনবার্তা ঘোষণা করিতেছে।

এই সময়, যে দিকে রাজপ্রাসাদের গুপ্তদ্বার, সেই দিক হইতে এক নারী ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে যাইতেছিল। রমণীর এক হস্তে একটি লৌহখনিত্র, অন্য হস্তে বক্ষের কাছে একটি ক্ষুদ্র বস্ত্রপিণ্ড ধরিয়া আছে। ক্ষীণ চন্দ্রের অস্পষ্ট আলোকে রমণীর আকৃতি ভাল দেখা যায় না ; সে যে যুবতী ও এক সময় সুন্দরী ছিল, তাহা তাহার রক্তহীন মুখ ও শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ দেখিয়া অনুমান করাও দুরূহ। অতি কষ্টে দুর্ভর দেহ ও লৌহখনিত্র বহন করিয়া জরাজীর্ণ বৃদ্ধার মতো সে চলিয়াছে। রুক্ষ কেশজাল মুখে বক্ষে ও পৃষ্ঠে বিপর্যস্তভাবে পড়িয়া আছে। রমণী মাঝে মাঝে দাঁড়াইতেছে, ত্রাস-বিমূঢ় চক্ষে পিছু ফিরিয়া চাহিতেছে, আবার চলিতেছে।

শ্মশানের সীমান্তে পৌঁছিয়া সে জানু ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। তাহার কণ্ঠ হইতে একটি কাতর আর্তস্বর বাহির হইল ; সেই সঙ্গে বক্ষের বস্ত্রপিণ্ডের ভিতর হইতেও ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল।

কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিবার পর রমণী আবার উঠিয়া চলিতে লাগিল। ক্রমে সে শ্মশানের বীভৎস দৃশ্যাবলীর মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একবার সে চক্ষু তুলিয়া দেখিল, সম্মুখে দীর্ঘ শূল প্রোথিত রহিয়াছে; শূলশীর্ষে বিকট ভঙ্গিমায় এক নরমূর্তি বিদ্ধ হইয়া আছে, শূলনিম্নে দুইটা শৃগাল ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সেই দুষ্প্রাপ্য ভক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া আছে। চন্দ্রালোকে তাহাদের চক্ষু জ্বলিতেছে।

রমণী চিৎকার করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিল না, কয়েক পদ গিয়া আবার বালুর উপর পড়িয়া গেল।

এবার দীর্ঘকাল পরে রমণী উঠিয়া বসিল। বোধ হয় সংজ্ঞা হারাইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। বক্ষের বস্ত্রপিণ্ড ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে উন্মত্তের মতো উঠিয়া খনিত্র দিয়া বালু খনন করিতে আরম্ভ করিল।

অল্পকালমধ্যে একটি নাতিগভীর গর্ত হইল। তখন রমণী সেই বস্ত্রপিণ্ড তুলিয়া লইয়া গর্তে নিক্ষেপ করিল—অমনই ক্ষীণ নির্জীব ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। রমণী দুই হাতে কান চাপিয়া কিয়ৎকাল বসিয়া রহিল, তারপর বালু দিয়া গর্ত পূরণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। সহসা দুই বাহু বাড়াইয়া বস্ত্রকুণ্ডলী গর্ত হইতে তুলিয়া লইয়া সজোরে নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিল। একটা ধাবমান শৃগাল তাহার অতি নিকট দিয়া তাহার দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া চাহিতে চাহিতে ছুটিয়া গেল; বাহ্য-চেতনাহীন রমণী তাহা লক্ষ্য করিল না।

অতঃপর মৃগতৃষ্ণিকাভ্রান্ত মৃগীর মতো নারী আবার এক দিকে ছুটিতে লাগিল। তখন তাহার আর ইষ্টানিষ্ট-জ্ঞান নাই—কোন্ দিকে ছুটিয়াছে তাহাও জানে না; শুধু পূর্ববৎ এক হস্তে খনিত্র ধরিয়া আছে, আর অপর হস্তে সেই বস্ত্রাবৃত জীবনকণিকাটুকু বক্ষে আঁকড়িয়া আছে।

কিছু দূর গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; সম্মুখে দূরে গঙ্গার শ্যামরেখা বোধ করি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল-বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, যেন সহসা উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এমনই ভাবে সে হাসিয়া উঠিল। তারপর অসীমবলে অবসন্ন দেহ সেই দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

মানব-মানবীর জীবনে এরূপ অবস্থা কখনও কখনও আসে—যখন তাহারা মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য হাহাকার করিয়া ছুটিয়া যায়।

জাহ্নবীর শীতল বক্ষে পৌঁছিতে আর বিলম্ব নাই, মধ্যে মাত্র ছয়-সাত দণ্ড বালুভূমির ব্যবধান, এই সময় রমণীর মুহ্যমান চেতনা পার্শ্বের দিকে এক প্রকার শব্দ শুনিয়া আকৃষ্ট হইল। শব্দটা যেন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর—অর্ধব্যক্ত তর্জনের মতো শুনাইল। রমণীর গতি এই শব্দে আপনিই রুদ্ধ হইয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, চন্দ্রালোকে শুভ্র বালুকার উপর একপাল শৃগাল কোনও অদৃশ্য কেন্দ্রের চারিধারে ব্যূহ রচনা করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের লাঙ্গুল বহির্দিকে প্রসারিত। ঐ শৃগালচক্রের মধ্য হইতে মনুষ্যকণ্ঠের তর্জন মাঝে মাঝে ফুঁসিয়া উঠিতেছে, অমনি শৃগালের দল পিছু হটিয়া যাইতেছে। আবার ধীরে ধীরে অলক্ষিতে তাহাদের চক্র সঙ্কুচিত হইতেছে।

রমণী যন্ত্রচালিতের মতো কয়েক পদ সেই দিকে অগ্রসর হইল। শৃগালেরা একজন জীবন্ত মনুষ্যকে আসিতে দেখিয়া দংষ্ট্রাবিকাশ করিয়া দূরে সরিয়া গেল। তখন মধ্যস্থিত বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হইল।

মাটির উপর কেবল একটি দেহহীন মুণ্ড রহিয়াছে। মুণ্ডের দুই বিক্ষত গণ্ড হইতে রক্ত ঝরিতেছে, চক্ষে উন্মত্ত দৃষ্টি। মুণ্ড রমণীর দিকেই তাকাইয়া আছে।

রমণী এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া অস্ফুট চিৎকার করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মুণ্ড তখন বিকৃত স্বরে বলিল—'তুমি প্রেত পিশাচ নিশাচর যে হও, আমাকে উদ্ধার কর।'

মানুষের কণ্ঠস্বরে রমণীর সাহস ফিরিয়া আসিল। সে আরও কয়েক পদ নিকটে আসিল; রুদ্ধ শুষ্ক কণ্ঠ হইতে অতি কষ্টে শব্দ বাহির করিল—'কে তুমি ?'

মুণ্ড বলিল—'আমি মানুষ, ভয় নাই। আমার দেহ মাটিতে প্রোথিত আছে—উদ্ধার কর।'

রমণী তখন কাছে আসিয়া ভাল করিয়া তাহার মুখ দেখিল, দেখিয়া সংহত অস্ফুট স্বরে বলিল—'মন্ত্রী শিবমিশ্র !'—তারপর খনিত্র দিয়া প্রাণপণে মাটি খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া শিবমিত্র কিয়ৎকাল মৃতবৎ মাটিতে শুইয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে দুই হস্তে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলেন। রমণীর ক্ষীণ অবসন্ন দেহ তখন ভূমিশয্যায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।

শিবমিশ্রের শৃগালদ্রষ্ট গণ্ড হইতে রক্ত ঝরিতেছিল, তিনি সন্তর্পণে তাহা মুছিলেন। রমণীর রক্তলেশহীন পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'দুর্ভাগিনি, তুমি কোন্ অপরাধে রাত্রিকালে মহাশ্মশানে আসিয়াছ ?'

রমণী নীরবে পার্শ্বস্থ বস্ত্রপিণ্ড দেখাইয়া দিল. শিবমিশ্র দেখিলেন—একটি শিশু। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার পরিচয় কি ? তুমি আমার প্রাণদাত্রী, তোমার নাম স্মরণ করিয়া রাখিতে চাহি।'

রমণী নির্জীব কণ্ঠে বলিল—'আমার নাম মোরিকা—আমি রাজপুরীর দাসী।'

শিবমিশ্র সচকিত হইলেন, বলিলেন—'বুঝিয়াছি। তুমি কবে এই সন্তান প্রসব করিলে ?'

'আজ প্রভাতে !'

শিবমিশ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন।

'হতভাগিনি ! কিন্তু তুমি শ্মশানে প্রেরিত হইলে কেন ? পরমভট্টারকের সন্তান গর্ভে ধারণ করা কি এতই অপরাধ ?'

মোরিকা বলিল—'সভাপণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন, আমার কন্যা রাজ্যের অনিষ্টকারিণী বিষকন্যা—তাই—'

'বিষকন্যা !' শিবমিশ্রের চক্ষু সহসা জ্বলিয়া উঠিল—'বিষকন্যা ! দেখি !'

শিবমিশ্র ব্যগ্রহস্তে শিশুকে তুলিয়া লইলেন। তখন চন্দ্র অস্ত যাইতেছে, ভাল দেখিতে পাইলেন না। তিনি শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া দূরে চুল্লীর দিকে দ্রুতপদে চলিলেন।

চুল্লীর অঙ্গারের উপর ভস্মের প্রচ্ছদ পড়িয়াছে। শিবমিশ্র একখণ্ড অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ তাহাতে নিক্ষেপ করিলেন—অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল।

তখন সেই শ্মশান-চুল্লীর আলোকে শিবমিশ্র নবজাত কন্যার দেহলক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিতে করিতে তাঁহার রক্তলিপ্ত মুখে এক পৈশাচিক হাস্য দেখা দিল।

তিনি মোরিকার নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন—'হাঁ, বিষকন্যা বটে।'

মোরিকা পূর্ববৎ ভূশয্যায় পড়িয়া ছিল, প্রত্যুত্তরে একবার গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শিবমিশ্র আগ্রহকম্পিত স্বরে বলিলেন—'বৎসে, তুমি তোমার কন্যা আমাকে দান কর, আমি উহাকে পালন করি। কেহ জানিবে না।'

মোরিকা পুনরায় অতি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শিবমিশ্র বলিলেন—'তুমি ফিরিয়া গিয়া বলিও কন্যাকে বিনষ্ট করিয়াছ। আমি অদ্যই উহাকে লইয়া গঙ্গার পরপারে লিচ্ছবিদেশে পলায়ন করিব। তারপর—'

মোরিকা উত্তর দিল না। তখন শিবমিশ্র নতজানু হইয়া তাহার মুখ দেখিলেন। তারপর করাগ্রে শীর্ণ মণিবন্ধ ধরিয়া নাড়ি পরীক্ষা করিলেন।

ক্ষণেক পরে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুই হস্তে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উদ্দীপ্ত চোখে দূরে অর্ধদৃষ্ট রাজপ্রাসাদশীর্ষের দিকে চাহিলেন। কহিলেন—'এই ভাল।'

এই সময় আকাশের নিকষে অগ্নির রেখা টানিয়া রক্তবর্ণ উল্কা রাজপুরীর ঊর্ধ্বে পিণ্ডাকারে জ্বলিয়া উঠিল,—তারপর ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

সেই আলোকে শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া শিবমিশ্র বলিলেন—"এ নিয়তির ইঙ্গিত। তোমার নাম রাখিলাম—উল্কা!"

তারপর মগ্নচন্দ্রা রাত্রির অন্ধকারে জাহ্নবীর তীররেখা ধরিয়া শিবমিশ্র পাটলিপুত্রের বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

মোরিকার প্রাণহীন শব মহাশ্মশানে পড়িয়া রহিল। যে শিবাকুল তাহার আগমনে সরিয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার চারিদিক হইতে ফিরিয়া আসিল।

২

অতঃপর ষোল বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

কালপুরুষের পলকপাতে শতাব্দী অতীত হয়; কিন্তু ক্ষুদ্রায়ু মানুষের জীবনে ষোল বৎসর অকিঞ্চিৎকর নয়।

মগধে এই সময়ের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। পূর্বাধ্যায়বর্ণিত ঘটনার পর পাটলিপুত্রের নাগরিকবৃন্দ ত্রয়োদশ বর্ষ মহারাজ চণ্ডের দোর্দণ্ড শাসন সহ্য করিয়াছিল; তাহার পর একদিন তাহারা সদলবলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। জনগণ যখন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, তখন তাহারা বিবেচনা করিয়া কাজ করে না—এ ক্ষেত্রেও তাহারা বিবেচনা করিল না। ক্রোধান্ধ মৌমাছির পাল যদি একটা মহিষকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে দৃশ্যটা যেরূপ হয়, এই মাৎস্যন্যায়ের ব্যাপারটাও প্রায় তদ্রূপ হইল।

গর্জমান চণ্ডকে সিংহাসন হইতে টানিয়া নামাইয়া বিদ্রোহ-নায়কেরা প্রথমে তাহার মণিবন্ধ পর্যন্ত হস্ত কাটিয়া ফেলিল। মহারাজ চণ্ডকে এক কোপে শেষ করিয়া ফেলিলে চলিবে না, অন্য বিবেচনা না থাকিলেও এ বিবেচনা বিদ্রোহীদের ছিল। মহারাজ এত দিন ধরিয়া যাহা অগণিত প্রজাপুঞ্জকে দুই হস্তে বিতরণ করিয়াছেন, তাহাই তাহারা প্রত্যর্পণ করিতে আসিয়াছে। এই প্রত্যর্পণক্রিয়া এক মুহূর্তে হয় না।

অতঃপর চণ্ডের পদদ্বয় জঙ্ঘাগ্রন্থি হইতে কাটিয়া লওয়া হইল। কিন্তু তাহাতেও প্রতিহিংসাপিপাসু জনতার তৃপ্তি হইল না। এভাবে চলিলে বড় শীঘ্র মৃত্যু উপস্থিত হইবে—তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। মৃত্যু তো নিষ্কৃতি। সুতরাং জননায়করা মহারাজের বিখণ্ডিত রক্তাপ্লুত দেহ ঘিরিয়া মন্ত্রণা করিতে বসিল। হিংসা-পরিচালিত জনতা চিরদিনই নিষ্ঠুর, সেকালে বুঝি তাহাদের নিষ্ঠুরতার অন্ত ছিল না।

একজন নাসিকাহীন শৌণ্ডিক উত্তম পরামর্শ দিল। চণ্ডকে হত্যা করিয়া কাজ নাই, বরঞ্চ তাহাকে জীবিত রাখিবার চেষ্টাই করা হউক। তারপর এই অবস্থায় তাহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্য সর্বজনগম্য স্থানে বাঁধিয়া রাখা হউক। নাগরিকরা প্রত্যহ ইহাকে দেখিবে, ইহার গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে। চণ্ডের এই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভবিষ্যৎ রাজারাও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

সকলে মহোল্লাসে এই প্রস্তাব সমর্থন করিল। প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতেও বিলম্ব হইল না।

তারপর মগধবাসীর রক্ত কথঞ্চিৎ কবোষ্ণ হইলে তাহারা নূতন রাজা নির্বাচন করিতে বসিল। শিশুনাগবংশেরই দূর-সম্পর্কিত সৌম্যকান্তি এক যুবা—নাম সেনজিৎ—মৃগয়া পক্ষিপালন ও সুরা আস্বাদন করিয়া সুখে ও তৃপ্তিতে কালযাপন করিতেছিল, রাজা হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল না—সকলে তাহাকে ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিল। সেনজিৎ অতিশয় নিরহঙ্কার সরলচিত্ত ও ক্রীড়াকৌতুকপ্রিয় যুবা ; নারীজাতি ভিন্ন জগতে তাহার শত্রু ছিল না ; তাই নাগরিকগণ সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। সেনজিৎ প্রথমটা রাজা হইতে আপত্তি করিল ; কিন্তু তাহার বন্ধুমণ্ডলীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া সে দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্বক সিংহাসনে গিয়া বসিল। একজন ভীমকান্তি কৃষ্ণকায় নাগরিক স্বহস্তে নিজ অঙ্গুলি কাটিয়া তাহার ললাটে রক্ত-তিলক পরাইয়া দিল।

সেনজিৎ করুণবচনে বলিল—'যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিব, কিন্তু আমাকে রাজ্য শাসন বা বংশরক্ষা করিতে বলিও না।'

তাহাই হইল। কয়েকজন বিচক্ষণ মন্ত্রী রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন ; মহারাজ সেনজিৎ পূর্ববৎ মৃগয়াদির চর্চা করিয়া ও বটুকভট্টের সহিত রসালাপ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। নানা কারণে কাশী কোশল লিচ্ছবি তখন যুদ্ধ করিতে উৎসুক ছিল না ; ভিতরে যাহাই থাকুক, বাহিরে একটা মৌখিক মৈত্রী দেখা যাইতেছিল,—তাই মহারাজকে বর্ম-চর্ম পরিধান করিয়া শৌর্য প্রদর্শন করিতে হইল না। ওদিকে রাজ-অবরোধও শূন্য পড়িয়া রহিল। কঞ্চুকী মহাশয় ছাড়া রাজ্যে আর কাহারও মনে খেদ রহিল না।

মগধের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন লিচ্ছবি রাজ্যের রাজধানী বৈশালীতেও ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু ঘটিতেছিল। মহামনীষী কৌটিল্য তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কূটনীতির অভাব ছিল না। বৈশালীতে বাহ্য মিত্রতার অন্তরালে গোপনে গোপনে মগধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল।

শিবমিশ্র বৈশালীতে সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। লিচ্ছবিদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত—রাজা নাই। রাজার পরিবর্তে নির্বাচিত নায়কগণ রাজ্য শাসন করেন। শিবমিশ্রের কাহিনী শুনিয়া তাঁহারা তাঁহাকে সসম্মানে মন্ত্রণাদাতা সচিবের পদ প্রদান করিলেন।

কেবল শিবমিশ্রের নামটি ঈষৎ পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাঁহার গণ্ডের শৃগালদংশনক্ষত শুকাইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্ষত শুকাইলেও দাগ থাকিয়া যায়। তাঁহার মুখখানা শৃগালের মতো হইয়া গিয়াছিল। জনসাধারণ তাঁহাকে শিবামিশ্র বলিয়া ডাকিতে লাগিল। শিবমিশ্র তিক্ত হাসিলেন, কিন্তু আপত্তি করিলেন না। শৃগালের সহিত তুলনায় যে ধূর্ততার ইঙ্গিত আছে, তাহা তাঁহার অরুচিকর হইল না। ঐ নামই প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

দিনে দিনে বৈশালীতে শিবামিশ্রের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। ওদিকে তাঁহার গৃহে সেই শ্মশানলব্ধ অগ্নিকণা সাগ্নিকের যত্নে বর্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চণ্ড ও মোরিকার কন্যা উল্কাকে একমাত্র অগ্নির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যতই তাহার বয়স বাড়িতে লাগিল, জ্বলন্ত বহ্নির মতো রূপের সঙ্গে সঙ্গে ততই তাহার দুর্জয় দুর্বশ প্রকৃতি পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিল। শিবামিশ্র তাহাকে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, কিন্তু তাহার প্রকৃতির উগ্রতা প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন—'শিশুনাগবংশের এই বিষকণ্টক দিয়াই শিশুনাগবংশের উচ্ছেদ করিব।'

তীক্ষ্ণ-মেধাবিনী উল্কা চতুঃষষ্টি কলা হইতে আরম্ভ করিয়া ধনুর্বিদ্যা, অসিবিদ্যা পর্যন্ত সমস্ত অবলীলাক্রমে শিখিয়া ফেলিল। কেবল নিজ উদ্দাম প্রকৃতি সংযত করিতে শিখিল না।

মগধের প্রজাবিদ্রোহের সংবাদ যেদিন বৈশালীতে পৌঁছিল, সেদিন শিবামিশ্র গূঢ় হাস্য

করিলেন। এই বিদ্রোহে তাঁহার কতখানি হাত ছিল, কেহ জানিত না। কিন্তু কিছু দিন পরে যখন আবার সংবাদ আসিল যে, শিশুনাগবংশেরই আর একজন যুবা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার মুখ অন্ধকার হইল। এই শিশুনাগবংশ যেন সর্পবংশেরই মতো—কিছুতেই নিঃশেষ হইতে চায় না।

তারপর আরও কয়েক বৎসর কাটিল ; শিবামিশ্র উল্কার দিকে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যেদিন উল্কার বয়স ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইল, সেই দিন শিবামিশ্র তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—'বৎসে, তুমি আমার কন্যা নহ। তোমার জীবন-বৃত্তান্ত বলিতে চাহি, উপবেশন কর।'

ভাবলেশহীন কণ্ঠে শিবামিশ্র বলিতে লাগিলেন, উল্কা করলগ্নকপোলে বসিয়া সম্পূর্ণ কাহিনী শুনিল ; তাহার স্থির চক্ষু নিমেষের জন্য শিবামিশ্রের মুখ হইতে নড়িল না। কাহিনী সমাপ্ত করিয়া শিবামিশ্র বলিলেন—'প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য তোমায় ষোড়শ বর্ষ পালন করিয়াছি। চণ্ড নাই, কিন্তু শিশুনাগবংশ অদ্যাপি সদর্পে বিরাজ করিতেছে। সময় উপস্থিত—তোমার মাতা মোরিকা ও পালক পিতা শিবামিশ্রের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।'

'কি করিতে হইবে।'

'শিশুনাগবংশকে উচ্ছেদ করিতে হইবে।'

'পন্থা নির্দেশ করিয়া দিন।'

'শুন, পূর্বেই বলিয়াছি, তুমি বিষকন্যা ; তোমার উগ্র অলোকসামান্য রূপ তাহার নিদর্শন। পুরুষ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখার দিকে আকৃষ্ট হয়। তুমি যে পুরুষের কণ্ঠলগ্না হইবে তাহাকেই মরিতে হইবে। এখন তোমার কর্তব্য বুঝিয়াছ ? মগধের সহিত বর্তমানে লিচ্ছবিদেশের মিত্রভাব চলিতেছে, এ সময়ে অকারণে যুদ্ধঘোষণা করিলে রাষ্ট্রীয় ধনক্ষয় জনক্ষয় হইবে, বিশেষত যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত। মগধবাসীরা নূতন রাজার শাসনে সুখে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আছে—রাজ্যে অসন্তোষ নাই। এরূপ সময় রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ বাধানো সমীচীন নয়। কিন্তু শিশুনাগবংশকে মগধ হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে, তাই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। বর্তমান রাজা সেনজিৎ ব্যসনপ্রিয় যুবা, শুনিয়াছি রাজকার্যে তাহার মতি নাই,—সর্বপ্রথম তাহাকে অপসারিত করিতে হইবে। —পারিবে ?'

উল্কা হাসিল। যাবক-রক্ত অধরে দশনদ্যুতি সৌদামিনীর মতো ঝলসিয়া উঠিল। তাহার সেই হাসি দেখিয়া শিবামিশ্রের মনে আর কোনও সংশয় রহিল না।

তিনি বলিলেন—'এখন সভায় কি স্থির হইয়াছে, বলিতেছি। মগধে কিছু দিন যাবৎ বৈশালীর প্রতিভূ কেহ নাই. কিন্তু মিত্ররাজ্যে প্রতিনিধি থাকাই বিধি, না থাকিলে সৌহার্দ্যের অভাব সূচনা করে। এজন্য সঙ্কল্প হইয়াছে, তুমি লিচ্ছবি-রাষ্ট্রের প্রতিভূস্বরূপ পাটলিপুত্রে গিয়া বাস করিবে। প্রতিভূকে সর্বদা রাজ-সন্নিধানে যাইতে হয়, সুতরাং রাজার সহিত দেখা-সাক্ষাতে কোনও বাধা থাকিবে না। অতঃপর তোমার সুযোগ !'

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'ভাল। কিন্তু আমি নারী, এজন্য কোনও বাধা হইবে না ?'

শিবামিশ্র বলিলেন—'বৃজির গণরাজ্যে নারী-পুরুষে প্রভেদ নাই, সকলের কক্ষা সমান।'

'কবে যাইতে হইবে ?'

'আগামী কল্য তোমার যাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছে। তোমার সঙ্গে দশ জন পুরুষ পার্শ্বচর থাকিবে, এতদ্ব্যতীত সখী পরিচারিকা তোমার অভিরুচিমত লইতে পার।'

উল্কা শিবামিশ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল. অকম্পিত স্বরে বলিল—'পিতা, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ

করিব। যে দুর্গ্রহের অভিসম্পাত লইয়া আমি জন্মিয়াছি, তাহা আমার জননীর নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ লইয়া সার্থক হইবে। আপনি যে আমাকে কন্যার ন্যায় পালন করিয়াছেন, সে ঋণও এই অভিশপ্ত দেহ দিয়া প্রতিশোধ করিব।'

শিবামিশ্রের কণ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'কন্যা, আশীর্বাদ করিতেছি, লব্ধকামা হইয়া আমার ক্রোড়ে প্রত্যাগমন কর। দধীচির মতো তোমার কীর্তি পুরাণে অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে।'

পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে রাজার মৃগয়া-কানন। উল্কা ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, এই বহু যোজনব্যাপী অটবীর ভিতর দিয়া অশ্বারোহণে চলিয়াছিল। তাহার সঙ্গী কেহ ছিল না, সঙ্গী সহচরদিগকে সে রাজপথ দিয়া প্রেরণ করিয়া দিয়া একাকী বনপথ অবলম্বন করিয়াছিল, পুরুষ রক্ষীরা ইহাতে সসম্ভ্রমে ঈষৎ আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু উল্কা তীব্র অধীর স্বরে নিজ আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিল—'আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। তোমরা নগরতোরণে পৌঁছিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। আমি একাকী চিন্তা করিতে চাই।'

স্থির অচপল দৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া উল্কা অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া ছিল, অশ্বও তাড়নার অভাবে ময়ূরসঞ্চারী গতিতে চলিয়াছিল ; পাছে আরোহিণীর চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া যায় এই ভয়ে যেন গতিছন্দ অটুট রাখিয়া চলিতেছিল! শষ্পের উপর অশ্বের খুরধ্বনিও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

ছায়া-চিত্রিত বনের ভিতর দিয়া কৃষ্ণ বাহনের পৃষ্ঠে যেন সঞ্চারিণী আলোকলতা চলিয়াছে—বনের ছায়ান্ধকার ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। উল্কার বক্ষে লৌহজালিক, পার্শ্বে তরবারি, কটিতে ছুরিকা, পৃষ্ঠে সংসর্পিত কৃষ্ণ বেণী ; কর্ণে মাণিক্যের অবতংস অঙ্গারবৎ জ্বলিতেছে। এই অপূর্ব বেশে উল্কার রূপ যেন আরও উন্মাদকর হইয়া উঠিয়াছে।

কাননপথ অর্ধেক অতিক্রান্ত হইবার পর সহসা পশ্চাতে দ্রুত-অস্পষ্ট অশ্বখুরধ্বনি শুনিয়া উল্কার চমক ভাঙ্গিল। সে পিছু ফিরিয়া দেখিল, একজন শূলধারী অশ্বারোহী সবেগে অশ্ব চালাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে ; তাহার কেশের মধ্যে কঙ্কপত্র, পরিধানে শবরের বেশ। উল্কাকে ফিরিতে দেখিয়া সে ভল্ল উত্তোলন করিয়া সগর্জনে হাঁকিল—'দাঁড়াও।'

উল্কা দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরে অশ্বারোহী তাহার পার্শ্বে আসিয়া কর্কশ স্বরে বলিল—'কে তুই?—রাজার মৃগয়া-কাননের ভিতর দিয়া বিনা অনুমতিতে চলিয়াছিস্? তোর কি প্রাণের ভয় নাই?' এই পর্যন্ত বলিয়া পুরুষ সবিস্ময়ে থামিয়া গিয়া বলিল—'এ কী! এ যে নারী!'

উল্কা অধরোষ্ঠ ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া বলিল—'নারীই বটে! তুমি কে?'

পুরুষ ভল্ল নামাইল। তাহার কৃষ্ণবর্ণ মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিয়া উঠিল, চোখে লালসার তীক্ষ্ণ আলোক দেখা দিল। সে কণ্ঠস্বর মধুর করিয়া বলিল—'আমি এই বনের রক্ষী। সুন্দরি, এই পথহীন বনে একাকিনী চলিয়াছ, তোমার কি দিগ্‌ভ্রান্ত হইবার ভয় নাই?'

উল্কা উত্তর দিল না ; বল্গার ইঙ্গিতে অশ্বকে পুনর্বার সম্মুখদিকে চালিত করিল।

রক্ষী সনির্বন্ধ স্বরে বলিল—'তুমি কি পাটলিপুত্র যাইবে? চল, আমি তোমাকে কানন পার করিয়া দিয়া আসি!' বলিয়া সে নিজ অশ্ব চালিত করিল।

উল্কা এবারও উত্তর দিল না, অবজ্ঞাস্ফুরিত-নেত্রে একবার তাহার দিকে চাহিল মাত্র। কিন্তু রক্ষী কেবল নেত্রাঘাতে প্রতিহত হইবার পাত্র নয়, সে লুব্ধ নয়নে উল্কার সর্বাঙ্গ দেখিতে দেখিতে তাহার পাশে পাশে চলিল।

ক্রমে দুই অশ্বের ব্যবধান কমিয়া আসিতে লাগিল। উল্কা অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

রক্ষী আবার মধু-ঢালা সুরে বলিল—'সুন্দরি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ? তোমার এরূপ কন্দর্প-বিজয়ী বেশ কেন ?'

উল্কা বিরস-স্বরে বলিল—'সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন নাই।'

রক্ষী অধর দংশন করিল ; এ নারী যেমন রূপসী, তেমনই মদগর্বিতা ! ভাল, তাহার মদগর্ব লাঘব করিতে হইবে ; এ বনের অধীশ্বর কে তাহা জানাইয়া দিতে হইবে।

রক্ষী আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া হস্তপ্রসারণপূর্বক উল্কার হাত ধরিল। উল্কার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সে হাত ছাড়াইয়া লইয়া সর্প-তর্জনের মতো শীৎকার করিয়া বলিল—'আমাকে স্পর্শ করিও না—অনার্য !'

রক্ষীর মুখ আরও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। সম্পূর্ণ অনার্য না হইলেও সে আর্য-অনার্যের মিশ্রণজাত অম্বষ্ঠ বটে, তাই এই হীনতা-জ্ঞাপক সম্বোধন তাহাকে অঙ্কুশের মতো বিদ্ধ করিল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে বলিল—'অনার্য ! ভাল, আজ এই অনার্যের হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করে দেখি !'—বলিয়া বাহু দ্বারা কটি বেষ্টন করিয়া উল্কাকে আকর্ষণ করিল।

উল্কার মুখে বিষ-তীক্ষ্ণ হাসি ক্ষণেকের জন্য দেখা দিল।

'আমি বিষকন্যা—আমাকে স্পর্শ করিলে মরিতে হয়।' বলিয়া সে রক্ষীর পঞ্জরে ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল, তারপর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে বায়ুবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

পাটলিপুত্রের দুর্গতোরণে যখন উল্কা পৌঁছিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। শান্তির সময় দিবাভাগে তোরণে প্রহরী থাকে না, নাগরিকগণও মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রতাপে স্ব স্ব গৃহচ্ছায়ায় আশ্রয় করিয়াছে ; তাই তোরণ জনশূন্য। কেবল উল্কার পথশ্রান্ত সহচরগণ উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে।

উল্কা উন্নত তোরণ-সম্মুখে ক্ষণেক দাঁড়াইল। একবার উত্তরে দূর-প্রসারিত শূল-কণ্টকিত শ্মশানভূমির দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, তারপর নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে তোরণ-প্রবেশ করিল।

কিন্তু তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক পদ যাইতে না যাইতে আবার তাহার গতি রুদ্ধ হইল। সহসা পার্শ্ব হইতে বিকৃতকণ্ঠে কে চিৎকার করিয়া উঠিল—'জল ! জল ! জল দাও !'

রুক্ষ উগ্রকণ্ঠের এই প্রার্থনা কানে যাইতেই উল্কা অশ্বের মুখ ফিরাইল। দেখিল, তোরণপার্শ্বস্থ প্রাচীরগাত্র হইতে লৌহবলয়-সংলগ্ন স্থূল শৃঙ্খল ঝুলিতেছে, শৃঙ্খলের প্রান্ত এক নরাকার বীভৎস মূর্তির কটিতে আবদ্ধ। মূর্তির করপত্র নাই, পদদ্বয়ও জঙ্ঘাসন্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন—জটাবদ্ধ দীর্ঘ কেশে মুখ প্রায় আবৃত। সে তপ্ত পাষাণ-চত্বরের উপর কৃষ্ণকায় কুম্ভীরের মতো পড়িয়া আছে এবং লেলিহ রসনায় অদূরস্থ জলকুণ্ডের দিকে তাকাইয়া মাঝে মাঝে চিৎকার করিয়া উঠিতেছে—'জল ! জল !' মাধ্যন্দিন সূর্যতাপে তাহার রোমশ দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইয়া চত্বর সিক্ত করিয়া দিতেছে।

উল্কা উদাসীনভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মনে করুণার উদ্রেক হইল না। শুধু সে মনে মনে ভাবিল—এই মগধবাসীরা দেখিতেছি নিষ্ঠুরতায় অতিশয় নিপুণ।

শৃঙ্খলিত ব্যক্তি জন-সমাগম দেখিয়া জানুতে ভর দিয়া উঠিল, রক্তিম চক্ষে চাহিয়া বন্য জন্তুর মতো গর্জন করিল—'জল ! জল দাও !'

উল্কা একজন সহচরকে ইঙ্গিত করিল ; সে জলকুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাহাকে পান করাইল। শৃঙ্খলিত ব্যক্তি উত্তপ্ত মরুভূমির মতো জল শুষিয়া লইল। তারপর তৃষ্ণা নিবারিত হইলে অবশিষ্ট জল সর্বাঙ্গে মাখিয়া লইল।

উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—'কোন্ অপরাধে তোমার এরূপ দণ্ড হইয়াছে ?'

গত তিন বৎসর ধরিয়া বন্দী প্রতিনিয়ত বিদ্রূপকারী নাগরিকদের নিকট এই একই প্রশ্ন শুনিয়া

আসিতেছে। সে উত্তর দিল না—হিংস্রদৃষ্টিতে উল্কার দিকে তাকাইয়া পিছু ফিরিয়া বসিল।

উল্কা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—'কে তোমার এরূপ অবস্থা করিয়াছে? শিশুনাগবংশের রাজা?'

শ্বাপদের মতো তীক্ষ্ণ দন্ত বাহির করিয়া বন্দী ফিরিয়া চাহিল। তাহার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, একবার মুক্তি পাইলে সে উল্কাকে দুই বাহুতে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবে। উল্কা যে তাহাকে এইমাত্র পিপাসার পানীয় দিয়াছে, সে জন্য তাহার কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা নাই।

সে বিকৃত মুখে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল—'পথের কুক্কুর সব, দূর হইয়া যা। লজ্জা নাই? একদিন আমি তোদের পদতলে পিষ্ট করিয়াছি, আবার যেদিন এই শৃঙ্খল ছিঁড়িব, সেদিন আবার পদদলিত করিব। এখন পলায়ন কর—আমার সম্মুখ হইতে দূর হ।'

উল্কার চোখের দৃষ্টি সহসা তীব্র হইয়া উঠিল; সে অশ্বপৃষ্ঠে ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কে তুমি? তোমার নাম কি?'

ক্ষিপ্তপ্রায় বন্দী দুই বাহু দ্বারা নিজ বক্ষে আঘাত করিতে করিতে বলিল—'কে আমি? কে আমি? তুই জানিস্ না? মিথ্যাবাদিনি, আমাকে কে না জানে? আমি চণ্ড—আমি মহারাজ চণ্ড! তোর প্রভু। তোর দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর! বুঝিলি? আমি মগধের ন্যায্য অধিপতি মহারাজ চণ্ড।'

উল্কা ক্ষণকালের জন্য যেন পাষাণে পরিণত হইয়া গেল। তারপর তাহার সমস্ত দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল, নাসা স্ফুরিত হইতে লাগিল। তাহার এই পরিবর্তন বন্দীরও লক্ষ্যগোচর হইল, উন্মত্ত প্রলাপ বকিতে বকিতে সে সহসা থামিয়া গিয়া নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

উল্কা কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া সহচরদের দিকে ফিরিল, ধীরস্বরে কহিল—'তোমরা ঐ পিপ্পলীবৃক্ষতলে গিয়া আমার প্রতীক্ষা কর, আমি এখনই যাইতেছি।'

সহচরগণ প্রস্থান করিল।

তখন উল্কা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বন্দীর সম্মুখীন হইল। চত্বরের উপর উঠিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে বন্দীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল—'তুমিই ভূতপূর্ব রাজা চণ্ড।'

চণ্ড সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল—'ভূতপূর্ব নয়—আমিই রাজা। আমি যত দিন আছি, তত দিন মগধে অন্য রাজা নাই।'

'তোমাকে তবে প্রজারা হত্যা করে নাই?'

'আমাকে হত্যা করিতে পারে, এত শক্তি কাহার?'

রক্তহীন অধরে উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ চণ্ড, মোরিকা নাম্নী জনৈকা দাসীর কথা মনে পড়ে?'

চণ্ডের জীবনে বহুশত মোরিকা ক্রীড়াপুত্তলীর মতো যাতায়াত করিয়াছে, দাসী মোরিকার কথা তাহার মনে পড়িল না।

উল্কা তখন জিজ্ঞাসা করিল—'মোরিকার এক বিষকন্যা জন্মিয়াছিল, মনে পড়ে?'

এবার চণ্ডের চক্ষুতে স্মৃতির আলো ফুটিল, সে হিংস্রহাস্যে দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল—'মনে পড়ে, সেই বিষকন্যাকে শ্মশানে প্রোথিত করাইয়াছিলাম। শিবমিশ্রকেও শ্মশানের শৃগালে ভক্ষণ করিয়াছিল।' অতীত নৃশংসতার স্মৃতির মধ্যেই এখন চণ্ডের একমাত্র আনন্দ ছিল।

উল্কা অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—'সে বিষকন্যা মরে নাই, শিবমিশ্রকেও শৃগালে ভক্ষণ করে নাই। মহারাজ, নিজের কন্যাকে চিনিতে পারিতেছেন না?'

চণ্ড চমকিত হইয়া মুণ্ড ফিরাইল।

উল্কা তাহার কাছে গিয়া কর্ণকুহরে বলিল—'আমিই সেই বিষকন্যা। মহারাজ, শিশুনাগবংশের চিরন্তন রীতি স্মরণ আছে কি ? এ বংশের রক্ত যাহার দেহে আছে, সেই পিতৃহন্তা হইবে। —তাই বহুদূর হইতে বংশের প্রথা পালন করিতে আসিয়াছি।'

চণ্ড কথা কহিবার অবকাশ পাইল না। উদ্যতফণা সর্প যেমন বিদ্যুদ্বেগে দংশন করে, তেমনই উল্কার ছুরিকা চণ্ডের কণ্ঠে প্রবেশ করিল। সে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া পড়িয়া গেল, তাহার প্রকাণ্ড দেহ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ধড়ফড় করিতে লাগিল। দুইবার সে বাক্য-নিঃসরণের চেষ্টা করিল কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না—মুখ দিয়া গাঢ় রক্ত নির্গলিত হইয়া পড়িল। শেষে কয়েকবার পদপ্রক্ষেপ করিয়া চণ্ডের দেহ স্থির হইল।

উল্কা কটিলগ্ন হস্তে দাঁড়াইয়া দেখিল। তারপর ধীরপদে গিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করিল, আর পিছু ফিরিয়া তাকাইল না। তাহার ছুরিকা চণ্ডের কণ্ঠে আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিল। নির্জন তোরণপার্শ্বে মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ষোল বৎসরের পুরাতন নাট্যের শেষ অঙ্কে যে দ্রুত অভিনয় হইয়া গেল, জনপূর্ণ পাটলিপুত্রের কেহ তাহা দেখিল না।

এইরূপে শোণিতপঙ্কে দুই হস্ত রঞ্জিত করিয়া মগধের বিষকন্যা আবার মগধের মহাস্থানীয়ে পদার্পণ করিল।

৩

মদন-মহোৎসবের পূর্বেই এবার গ্রীষ্মের আবির্ভাব হইয়াছে। বিজিগীষু নিদাঘের জয়পতাকা বহিয়া যেন অশোক, কিংশুক, কৃষ্ণচূড়া দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তবু, কুসুম্ভ ও রঙ্গনের শোণিমা প্রত্যাসন্ন বসন্তোৎসবের বর্ণ-বিলাস বক্ষে ধারণ করিয়া উৎসুক নাগরিকাদিগকে যেন জানাইতেছে—'ভয় নাই ! মাধবের অরুণ নেত্র দেখিয়া শঙ্কা করিও না, এখনও মধুমাস শেষ হয় নাই।' তাহাদের সমর্থন করিয়াই যেন চূতমুকুল-লোভী মদারুণিত-চক্ষু কোকিল বারম্বার কুহরিয়া উঠিতেছে—'কুহকের কাল সমাগত, কুহকিনীরা প্রস্তুত হও।'

মগধের রাজপ্রাসাদেও এই নব-বসন্তজাত মদালসতা অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। প্রধান তোরণের প্রতীহার-ভূমিতে লৌহ-শিরস্ত্রাণ পরিহিত শূলহস্ত দ্বারী উন্মনভাবে এক প্রফুল্ল কর্ণিকার-বৃক্ষের পানে তাকাইয়া ছিল ; বোধ করি, নির্জন কর্মহীন দ্বিপ্রহরে ঐ বৃক্ষের দিকে চাহিয়া কোনও তপ্তকাঞ্চনবর্ণা যবনী প্রতীহারীর নীলাব্জ-নয়নের কথা ভাবিতেছিল। তোরণের অভ্যন্তরে ভবনে ভবনে নারী-সৈন্যের পাহারা। মহারাজের অবরোধে মহাদেবী নাই বটে, কিন্তু চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ধনুষ্পাণি যবনী সেনা পূর্ববৎ আছে। প্রাসাদের বিভিন্ন মহলে—মন্ত্রগৃহে, মল্লাগারে, কলাভবনে, কোষাগারে—সর্বত্র দ্বারে দ্বারে যবনী প্রহরিণী দ্বার রক্ষা করিতেছে। তাহাদের বক্ষে অতিপিনদ্ধ বর্ম, হস্তে ধনু, পৃষ্ঠে তূণীর। শ্রোণিভারমন্থর-গতিতে তাহারা দ্বারসম্মুখে পাদচারণ করিতেছে, কখনও অলস উৎসুক নেত্রে অলিন্দের বাহিরে সুদূর-দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে। হয়তো তাহাদের মনেও দূরদূরান্তস্থিত জন্মভূমির দ্রাক্ষারস-মদির স্বপ্ন জাগিতেছে।

এই তন্দ্রালস ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরে মন্ত্রগৃহের এক শীতলকক্ষে মহারাজ সেনজিৎ কয়েকজন বয়স্যের সহিত বিরাজ করিতেছিলেন। বিদূষক বটুকভট্টও ছিল, নিরুৎসুকভাবে রাজা ও বিদূষকে অক্ষক্রীড়া চলিতেছিল। প্রতি দ্বারে ও বাতায়নে জলসিক্ত উশীরগুচ্ছ ঝুলিতেছে, বাহিরের আতপ্ত বায়ু তাহার স্পর্শে স্নিগ্ধ-সুগন্ধি হইয়া মহারাজের চন্দনপঙ্কচর্চিত দেহ অবলেহন করিতেছিল। একজন বয়স্য অদূরে বসিয়া সপ্তস্বরার তন্ত্রী হইতে অতি মৃদুভাবে বসন্তরাগের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

কিয়ৎকাল ক্রীড়া চলিবার পর মহারাজের চঞ্চল চিত্ত আর অক্ষবাটে নিবদ্ধ থাকিতে চাহিল না ; তিনি এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলেন। বাদ্যরত বয়স্য বসন্তের সহিত পঞ্চম মিশাইয়া ফেলিতেছিল, রাজা তাহার ভ্রম-সংশোধন করিয়া দিলেন। শেষে অক্ষ ফেলিয়া, পার্শ্বস্থিত কপিত্থ-সুরভিত তক্রের পাত্র নিঃশেষপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—'বসন্তোৎসবের আর বিলম্ব কত ?'

বটুকভট্টের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর পূর্ববৎ আছে, শুধু মস্তকশীর্ষে গ্রন্থিধৃত কেশগুচ্ছ একটু পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে অক্ষক্রীড়ায় জিতিতেছিল ; মহারাজের পেশল দেহকান্তির দিকে এক ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'মদনের সহিত যাহার মৌখিক পরিচয় পর্যন্ত নাই, সে বসন্তোৎসবের সংবাদ জানিয়া কি করিবে ? বিল্বফল পাকিল কি না জানিয়া পরভৃতের কি লাভ ?'

মহারাজ হাসিলেন। হাসিলে মহারাজকে বড় সুন্দর দেখাইত। তাঁহার তরুণ মুখের সদা-স্ফূর্ত হাসিতে যেন অন্তরের নিরভিমান অনাড়ম্বর সরলতা প্রতিবিম্বিত হইত।

তিনি সকৌতুকে বলিলেন—'বটুক, আমাকে কাক বলিলে না কোকিল বলিলে ?'

বটুকভট্ট বলিল—'মহারাজের যেটা অভিরুচি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন।'

মহারাজ বলিলেন—'তবে কোকিলই স্বীকার করিলাম। কোকিল অতি গুণবান পক্ষী ; দোষের মধ্যে সে কাকের নীড়ে ডিম্ব প্রসব করে।'

বটুক বলিল—'এ বিষয়ে মহারাজ অপেক্ষা কোকিল শ্রেষ্ঠ।

স্মিতমুখে সেনজিৎ প্রশ্ন করিলেন—'কিসে ?'

'কোকিল তো তবু পরগৃহে বংশরক্ষা করে, মহারাজ যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।'

মহারাজের মুখ ঈষৎ বিষণ্ণভাব ধারণ করিল, তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—'দেখ বটুক, তোমাকে একটি গোপনীয় কথা বলি। নারীজাতিকে আমি বড় ভয় করি—এই জন্যই বসন্তোৎসবের সময় আমার প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। নারীজাতি এই সময় অত্যন্ত দুর্দমনীয় হইয়া উঠে।'

বটুকভট্টও বিষণ্ণভাবে শির নাড়িয়া বলিল—'সে কথা সত্য। এই সময় স্ত্রীজাতি তাহাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করিয়া পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়। আমার গৃহিণীর সাতটি সন্তান, বয়সেরও ইয়ত্তা নাই ; কিন্তু কয়েক দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, তিনি আমার প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন।'

হাস্য গোপন করিয়া মহারাজ বলিলেন—'বড় ভয়ানক কথা বটুক, তবে আর তোমার গৃহে গিয়া কাজ নাই। আমার অন্তঃপুর শূন্য আছে, তুমি এইখানেই এ কয় দিন নিরাপদে যাপন কর। এ বয়সে গৃহিণীর কটাক্ষবাণ খাইলে আর প্রাণে বাঁচিবে না।'

বটুকভট্টের মুখ অধিকতর বিষণ্ণ হইল, সে বলিল—'তাহা হয় না, মহারাজ। এই বসন্তকালে দেশসুদ্ধ কোকিল পরগৃহে ডিম্ব উৎপাদন করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এখন গৃহত্যাগ করিলে আবার অন্য বিপদ আসিয়া পড়িবে।'

বয়স্যেরা সকৌতুকে উভয়ের রসোক্তি-বিনিময় শুনিতেছিল, বটুকের কথার ভঙ্গিতে সকলে হাসিয়া উঠিল। একজন বয়স্য বলিল—'মহারাজ, বটুকভট্ট অকারণে আপনাকে নারীজাতি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিতেছে। আমি অপরোক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, নারীজাতি—বিশেষত সুন্দরী ও যৌবনবতী নারী—অবহেলার বস্তু নয়, পুরুষমাত্রেরই সাধনযোগ্যা। কণ্টকীফলের মতো বাহিরে দুষ্প্রধর্ষা হইলেও অন্তরে তাহারা অতি কোমল ও সুস্বাদু।'

মহারাজ বলিলেন—'নারীজাতি তাহা হইলে কণ্টকীফলের সহিত তুলনীয়! ইহাই তোমার মত ?'

'হাঁ মহারাজ। একমাত্র ভোক্তাই এই ফলের রসজ্ঞ, দূর হইতে যে ব্যক্তি কেবল নিরীক্ষণ

করিয়াছে, তাহার কাছে ইহার রস অব্যক্ত।'

'বটুক, তোমার কি অভিমত ?'

বটুক গম্ভীরভাবে বলিল—'আমার অভিমত, নারীজাতি একমাত্র বিল্বফলের সহিত তুলনীয়। যে ক্ষৌরিত-চিকুর হতভাগ্য একবার বিল্বতলে গিয়াছে, সে আর দ্বিতীয়বার যাইবে না।'

এইরূপ রঙ্গপরিহাসে কিছুকাল অতীত হইবার পর একজন বয়স্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ, সত্য বলুন স্ত্রীজাতির প্রতি আপনার বিরাগ কি জন্য ? বিশেষ কোনও কারণ আছে কি ?'

মহারাজ ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'রুচির অভাবই প্রধান কারণ। যদি এ কারণ যথেষ্ট মনে না কর, তবে বলিতে পারি, এই নারীজাতিই পুরুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের হন্তারক। ভাবিয়া দেখ শ্রীরামচন্দ্রের কথা, স্মরণ কর কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী। যে ব্যক্তি সুখের অভিলাষী, সে এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া নারীজাতিকে দূরে রাখিবে।'

বয়স্য বলিল—'কিন্তু মহারাজ—বংশধর ?'

সেনজিৎ সহসা শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ হইতে পরিহাসের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হইল। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন—'বংশধর ! ভানুমিত্র, শিশুনাগবংশে বংশধরের কথা চিন্তা করিতে তোমার ভয় হয় না ? শুনিয়াছি, শিশুনাগবংশে আর কেহ জীবিত নাই, আমার ঐকান্তিক কামনা, আমার সঙ্গে যেন এই অভিশপ্ত বংশ লুপ্ত হয়।'

বয়স্য সকলে অধোমুখে নীরব রহিল ; একটা প্রতিবাদ বাক্যও কাহারও মুখে যোগাইল না।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিল। তারপর সহসা এই কুণ্ঠিত নীরবতা ভেদ করিয়া মন্ত্রগৃহের প্রতীহার-ভূমিতে দ্রুতছন্দে পটহ বাজিয়া উঠিল।

বিস্মিতভাবে ভ্রূ তুলিয়া রাজা বলিলেন—'এ সময় পটহ কেন ? বটুক, কে আসিল দেখ। বলিও, এখন আমি বিশ্রাম করিতেছি, কল্য প্রভাতে সভায় সাক্ষাৎ হইবে।'

মহারাজ সাধারণত কোনও দর্শনপ্রার্থীকে ফিরাইতেন না, কিন্তু আজ উল্লিখিত আলোচনার পর তাঁহার মনের প্রসন্নতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

বটুকভট্ট প্রস্থান করিল। সেনজিৎ ঈষৎ কুঞ্চিত ললাটে বাতায়নের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বটুকভট্ট সবেগে প্রায় মুক্তকচ্ছ অবস্থায় কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিয়া একেবারে মহারাজের পদমূলে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। মহারাজ বলিলেন—'বটুক, কি হইল ?'

বটুক উন্মুক্ত বক্তুপথে ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিল—'মহারাজ, জঙ্ঘাবল প্রদর্শন করিয়াছি !'

'তাহা তো দেখিতেছি। কিন্তু পলাইয়া আসিলে কেন ? কে আসিয়াছে ?'

'ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় দিব্যাঙ্গনা।'

'সে কি ! স্ত্রীলোক ?'

'কদাচ নয়। উর্বশী হইলেও হইতে পারে, নচেৎ নিশ্চয় তিলোত্তমা। কিন্তু বক্ষে কঞ্চুলী নাই, তৎপরিবর্তে লৌহজালিক—মহারাজ, পলায়ন করুন।'

মহারাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বয়স্যদের দিকে চাহিলেন ; তাঁহার তিন বৎসরব্যাপী রাজ্যকালে এরূপ কাণ্ড কখনও ঘটে নাই। তিনি বলিলেন—'নারী—আমার নিকট কি চায় ?'

এই সময় যবনী প্রতিহারী প্রবেশ করিয়া জানাইল যে, বৈশালী হইতে এক নারী রাজকার্য উপলক্ষে মহারাজের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী। মহারাজ ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—'লইয়া এস।'

প্রতীহারী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। পরক্ষণেই চারিদিকে রূপলাবণ্যের স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিয়া উল্কা কক্ষে প্রবেশ করিল।

মহারাজ সেনজিৎ দ্বারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, উল্কা প্রবেশ করিতেই উভয়ের চোখাচোখি হইল। পাঁচ গণিতে যতক্ষণ সময় লাগে, উল্কা ও সেনজিৎ ততক্ষণ পরস্পর চোখের ভিতর চাহিয়া রহিলেন। উল্কার চোখে গোপন উৎকণ্ঠা, মহারাজের নয়নে প্রচ্ছন্ন বিস্ময়! তারপর দু'জনেই চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন।

মহারাজ সেনজিৎ ভূমির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—'ভদ্রে, শুনিলাম তুমি বৈশালী হইতে আসিতেছ; তোমার কি প্রয়োজন?'

উল্কার ওষ্ঠাধর বিভক্ত হইয়া দশনপংক্তি ঈষৎ দেখা গেল। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া মহারাজের দিকে একটু অধীরভাবে তাকাইল, বলিল—'আমি পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ সেনজিতের দর্শনপ্রার্থিনী—তাঁহার নিকটেই আমার প্রয়োজন নিবেদন করিব।'

'আমিই সেনজিৎ।'

'মহারাজ! ক্ষমা করুন'—উল্কার বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্র ক্ষণেকের জন্য অর্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল। তারপর সে দুই পদ অগ্রসর হইয়া মহারাজের পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া বসিল; যুক্ত করপুট ললাটে স্পর্শ করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল।

মহারাজ অস্ফুটভাবে কালোচিত সম্ভাষণ করিলেন। তখন উল্কা নিজ অঙ্গত্রাণের ভিতর হইতে জতুমুদ্রালাঞ্ছিত পত্র বাহির করিয়া মহারাজের হস্তে দিল।

জতুমুদ্রা ভাঙ্গিয়া সেনজিৎ পত্র পড়িতে লাগিলেন। উল্কা নতজানু থাকিয়াই আর একবার মহারাজকে নয়নকোণে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার মুখের ভাব বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হইল না, কিন্তু সে মনে মনে ভাবিল—'ইনিই মগধের মহাপরাক্রান্ত প্রজাপূজিত সেনজিৎ! ইঁহার চন্দন-চর্চিত সুকুমার দেহে বলবীর্যের তো কোনও লক্ষণই দেখিতেছি না। এই সুখলালিত পৌরুষহীন বিলাসীকে জয় করিতে কতক্ষণ সময় লাগিবে?' উল্কা মনে মনে অবজ্ঞার হাসি হাসিল।

পত্রপাঠ শেষ করিয়া সেনজিৎ চক্ষু তুলিলেন, দেখিলেন, উল্কা তখনও নতজানু হইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছে। তিনি শুষ্কস্বরে বলিলেন—'ভদ্রে, আসন পরিগ্রহ কর। দেখিতেছি, তুমি মিত্ররাজ্য লিচ্ছবির প্রতিনিধি—সুতরাং আমরা তোমাকে সাদরে সম্ভাষণ করিতেছি। বৈশালীর প্রজানায়কগণ যে একটি পুরাঙ্গনাকে প্রতিভূরূপে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা তাঁহাদের প্রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন বটে, অপিচ কিছু বিস্ময়করও বটে।'

উল্কা আস্তরণের উপর আসন গ্রহণ করিয়া ঈষৎ হাস্যে মহারাজের দিকে মুখ তুলিল, কিন্তু সে প্রত্যুত্তর দিবার পূর্বেই বটুকভট্ট তাহার অতি ক্ষীণ অথচ কর্ণবিদারী কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? বৈশালীতে নিশ্চয় পুরুষের অভাব ঘটিয়াছে, তাই তাহারা এই সুন্দরীকে পুরুষবেশে সাজাইয়া প্রেরণ করিয়াছে। মহারাজ, বৈশালী যখন আপনার মিত্ররাজ্য তখন মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ আপনিও কিছু পুরুষ বৈশালীতে প্রেরণ করুন। এইভাবে মিত্রতার বন্ধন অতিশয় দৃঢ় হইয়া উঠিবে।'

উল্কা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। এতক্ষণ সে রাজা ভিন্ন অন্য কোনও দিকে দৃক্‌পাত করে নাই, এখন খর্বকায় বংশীকণ্ঠ বটুকভট্টকে দেখিয়া তাহার অধরে বিদ্রূপের হাসি ফুটিল। সে অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল—'মগধে পুরুষ প্রতিনিধির প্রয়োজন নাই বুঝিয়াই বোধ হয় মহামান্য কুলপতিগণ এই পুরকন্যাকে প্রেরণ করিয়াছেন। নচেৎ লিচ্ছবিদেশে প্রকৃত পুরুষের অভাব নাই।'

ছদ্ম গাম্ভীর্যে শিরঃসঞ্চালন করিয়া বটুকভট্ট বলিল—'বৈশালিকে, লিচ্ছবিদেশে যদি প্রকৃত পুরুষ থাকিত, তবে তাহারা কখনই তোমাকে মগধে আসিতে দিত না।'

উল্কার গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে চকিতে রাজার দিকে ফিরিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিল—'মহারাজ, এই বিট কি আপনার বাক্-প্রতিভূ ?'

সেনজিৎ উত্ত্যক্তভাবে বিদূষকের দিকে চাহিলেন, কহিলেন—'বটুক, চপলতা সংবরণ কর, এ চপলতার সময় নয়।'

বটুক ভীতভাব প্রদর্শন করিয়া জানু-সাহায্যে হাঁটিয়া একজন বয়স্যের পিছনে লুকাইল।

সেনজিৎ তখন বলিলেন—'ভদ্রে—'

উল্কার মুখ আবার প্রসন্ন হইল, সে হাস্য-মুকুলিত অধরে বলিল—'দেব, আমার নাম উল্কা।'

বটুকভট্ট অন্তরাল হইতে আতঙ্কের অভিনয় করিয়া মৃদু স্বরে বলিল—'উঃ !'

সেনজিৎ একবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—'ভাল। উল্কা, পুনর্বার তোমাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতেছি। বৈশালী রাষ্ট্রের মিত্রতার চিহ্ন নারী বা পুরুষ যে মূর্তিতেই আগমন করুক, আমাদের সমাদরের সামগ্রী। কল্য হইতে সভায় অন্যান্য মিত্রগণের মধ্যে তোমার আসন নির্দিষ্ট হইবে।'

উল্কা অকপট-নেত্রে চাহিয়া বলিল—'সভায় নিত্য নিয়ত উপস্থিত থাকা কি আমার অবশ্য-কর্তব্য ? রাজকীয় সভার শিষ্টতা আমি কিছুই জানি না—এই আমার প্রথম দৌত্য।' বলিয়া একটু লজ্জিতভাবে হাসিল।

সেনজিৎ বলিলেন—'সভায় উপস্থিত থাকা না থাকা পাত্রমিত্রের প্রয়োজন ও অভিরুচির উপর নির্ভর করে। তুমি ইচ্ছা করিলে না আসিতে পার।'

উল্কা শুধু বলিল—'ভাল মহারাজ !'

উক্তরূপ কথোপকথন হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, মহারাজ সেনজিৎ রাজকার্য অমাত্যদের হস্তে অর্পণ করিলেও নিজে একান্ত অপটু ছিলেন না।

অতঃপর তিনি বলিলেন—'বহু দূর পথ অতিক্রম করিয়া তুমি ও তোমার পরিজন নিশ্চয় ক্লান্ত ; সুতরাং সর্বাগ্রে তোমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বাহ্ণে সময় না থাকায় তোমার সমুচিত আবাসগৃহের ব্যবস্থা হইতে পায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে—'

বটুকভট্ট উঁকি মারিয়া বলিল—'কেন, মহারাজের অন্তঃপুর তো শূন্য আছে—সেইখানেই অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হউক না।'

মহারাজ রুষ্টমুখে তাকাইলেন।

কিন্তু উল্কার চোখে গোপনে বিজলি খেলিয়া গেল ; সে ভ্রূভঙ্গ করিয়া মহারাজের দিকে মুখ তুলিল—'মহারাজের অন্তঃপুর শূন্য ! তবে কি মহারাজ অকৃতদার !'

অপ্রসন্ন ললাটে সেনজিৎ নীরব রহিলেন ; কেবল বটুকভট্ট সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল।

উল্কা তখন বলিল—'মহারাজ, সত্যই আমরা পথশ্রান্ত। যদি আপনার অপ্রীতিকর না হয়, তবে অবরোধেই আশ্রয় লইতে পারি। আমি নারী, সুতরাং অবরোধে মহারাজের আশ্রয়াধীনে থাকাই আমার পক্ষে সুষ্ঠু হইবে।'

ভ্রূবদ্ধ ললাটে মহারাজ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তারপর বিরস স্বরে বলিলেন—'ভাল। আপাতত অন্তঃপুরেই বাস কর, আমি সেখানে পদার্পণ করি না।' তারপর প্রধানা যবনীকে ডাকিয়া তাহাকে যথোচিত উপদেশ দিয়া বলিলেন—'ইহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। পরে আমি অন্য ব্যবস্থা করিতেছি।'

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল। 'জয়োস্তু মহারাজ !' বলিয়া সে যবনী সমভিব্যাহারে রাজসকাশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল, এমন সময় বটুকের মুণ্ড আর একবার উঁচু হইয়া উঠিল। সে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল—'বৈশালিকে, রাজকার্য তো সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল, এখন একটি প্রশ্ন করিতে পারি ?

বৈশালীর সকল সীমন্তিনীই কি সদাসর্বদা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া থাকে ? ভ্রূকুটির ভল্ল ও বক্ষের লৌহজালিক কি তাহারা উন্মোচন করে না ?'

প্রস্থানোদ্যতা উল্কা ফিরিয়া দাঁড়াইল। অনুচ্চস্বরে বলিল—'তোমার মতো কিম্পুরুষ দেখিলে বৈশালীর নারীরা অস্ত্র ত্যাগ করে।' বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে যবনীর তূণীর হইতে একটি তীর তুলিয়া লইয়া নিক্ষেপ করিল। বটুকভট্ট আর্তনাদ করিয়া উঠিল ; তীর তাহার মস্তকশীর্ষস্থ কুণ্ডলীকৃত কেশকলাপের মধ্যে প্রবেশ করিল।

উল্কা চকিতচপল নেত্রে একবার সেনজিতের মুখের দিকে চাহিয়া হাস্যবিম্বিত রক্তাধরে কৌতুক বিচ্ছুরিত করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

তীর জটা হইতে বাহির করিবার জন্য বটুক টানাটানি করিতে লাগিল। মহারাজ তাহার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন—'তোমার প্রগল্‌ভতার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে—বৈশালিকার লক্ষ্যবেধ অব্যর্থ। তুমি আর উহার সহিত রসিকতা করিতে যাইও না।'

বটুক তীরফলক অতিকষ্টে কেশ হইতে মুক্ত করিয়া করুণ স্বরে বলিল—'না মহারাজ, আর করিব না। একাদশ রুদ্রের কোপ ও দ্বাদশ সূর্যের তাপ সহ্য করিতে পারি ; কিন্তু আগুন লইয়া খেলা এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আর সহ্য হইবে না।'

মহারাজ বলিলেন—'এখন যাও, কঞ্চুকীকে ডাকিয়া আনো, তিনি আসিয়া অন্তঃপুরের সুব্যবস্থা করুন।'

বটুকভট্ট অমনই উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল, বলিল—'তাহাই করি। তবু যদি দেবী আমার প্রতি প্রসন্না হন।'

'দেবী' শব্দের মধ্যে হয়তো একটা ব্যঙ্গার্থ ছিল, মহারাজের কর্ণে সেটা বিঁধিল ; কিন্তু তিনি কোনও প্রকার প্রতিবাদ করিবার পূর্বেই ধূর্ত বটুকভট্ট কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

৪

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। উল্কা সখীপরিজনবেষ্টিতা হইয়া অন্তঃপুরেই বাস করিতে লাগিল। পুরী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কোনও আগ্রহ সে প্রকাশ করিল না—মহারাজও অন্য বাসভবনের উল্লেখ করিলেন না। বৃদ্ধ কঞ্চুকী বহুদিন পরে নিজ কার্য ফিরিয়া পাইয়া মহা উৎসাহে উল্কার তত্ত্বাবধানে লাগিয়া গেলেন। কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটির ছিদ্র রহিল না।

রাজসভাতেও উল্কা কয়েক দিন নিজ আসনে গিয়া বসিল। সূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণের ভিতর উল্কার অলোকসামান্য রূপ যেন শারদ মেঘাচ্ছন্ন শশিকলার প্রভা বিকিরণ করিতে লাগিল। রাজসভা এই নবচন্দ্রোদয়ে কুমুদ্বতীর মতো উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ভিতরে ভিতরে সভাসদ্‌গণের মধ্যে নানা উৎসুক জল্পনা চলিতে লাগিল।

মহারাজ সেনজিৎ কিন্তু তাঁহার নিরুৎসুক নিস্পৃহতার মধ্যে অটল হইয়া রহিলেন। উল্কাকে তিনি পদোচিত মর্যাদা ও সমাদর প্রদর্শন করিতেন ; কিন্তু তাহার বেশি কিছু নয়। উল্কা বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিল, মহারাজের আচরণে নারীজাতি সম্বন্ধে একটা নীরস ঔদাসীন্যের ভাব রহিয়াছে—রাজন্যবর্গের পক্ষে ইহা যেমন অসাধারণ, তেমনই বিস্ময়কর। উল্কা হতাশ হইল না, বরঞ্চ মহারাজকে কুহকমন্ত্রে পদানত করিবার সঙ্কল্প তাহার কুলিশ-কঠিন হৃদয়ে আরও দৃঢ় হইল।

কিন্তু একদিন রাজসভায় একটি ঘটনা দেখিয়া উল্কা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইল। মহারাজের ব্যবহারে অনাড়ম্বর মৃদুতা দর্শনে উল্কার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সেনজিৎ স্বভাবত দুর্বলপ্রকৃতি—চিত্তের দৃঢ়তা বা পুরুষোচিত সাহস তাঁহার নাই। এই ভ্রান্তি তাহার সহসা ভাঙ্গিয়া গেল।

মহারাজ সেনজিৎ সেদিন যথারীতি সিংহাসনে আসীন ছিলেন। সভামধ্যে চণ্ডের রহস্যময়

মৃত্যু সম্বন্ধে নানা জল্পনা ও কৌতুকের অনুমান চলিতেছিল. উল্কা আকুঞ্চিত অধরে অর্ধ নিমীলিত নেত্রে শুনিতেছিল. এরূপ সময় রাজ-মহামাত্র দৌড়িতে দৌড়িতে সভায় প্রবেশ করিয়া বলিল—'আয়ুষ্মন্, সর্বনাশ উপস্থিত, পুষ্কর ক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া এই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে।'

'পুষ্কর' রাজার পট্ট হস্তীর নাম। এই সংবাদ শুনিয়া সভামধ্যে বিষম চাঞ্চল্য ও গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কিন্তু সেনজিৎ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—'তোমরা শান্ত হও, ভয় নাই—আমি দেখিতেছি।' বলিয়া তিনি বাহিরের দিকে চলিলেন।

মহামাত্র সভয়ে বলিল—'আয়ুষ্মন্, পুষ্কর তাহার রক্ষককে শুণ্ডাঘাতে বধ করিয়াছে, আমিও তাহাকে শাসন করিতে পারি নাই। এ অবস্থায় আপনি তাহার সম্মুখীন হইলে—'

মহারাজ তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, বহু স্তম্ভযুক্ত উন্মুক্ত সভামণ্ডপের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে উদ্যতশুণ্ড প্রকাণ্ড উন্মত্ত হস্তী বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। হস্তীর গণ্ড হইতে মদবারি ক্ষরিত হইতেছে, চরণে ছিন্ন শৃঙ্খল, ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় কষায়বর্ণ ধারণ করিয়া ঘূর্ণিত হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া সভাসদ্‌গণ কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় হতগতি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উল্কাও নিজ আসনে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বিস্ফারিত-নয়নে স্পন্দিতবক্ষে চাহিয়া রহিল। কাহারও মুখে বাক্য সরিল না।

সেনজিৎ সভাচত্বর হইতে অবতরণ করিয়া হস্তীর আরও নিকটবর্তী হইলেন। মদস্রাবী মাতঙ্গ প্রহার-উদ্যমে শুণ্ড ঊর্ধ্বে তুলিল। তখন সেই রুদ্ধশ্বাস নীরবতার মধ্যে সেনজিৎ মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—'পুষ্কর! পুষ্কর!'

পুষ্করের শুণ্ড ঘোরবেগে অবতরণ করিতে করিতে অর্ধ-পথে থামিয়া গেল। মত্ত হস্তী রক্তনেত্রে মহারাজের দিকে চাহিয়া যেন বিদ্রোহ করিতে চাহিল, একবার দ্বিধাভরে তাহার করদণ্ড ঈষৎ আন্দোলিত হইল—তারপর ধীরে ধীরে শুণ্ড অবনমিত করিয়া সে নম্রভাবে দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্তমধ্যে ধ্বংসের মূর্তিমান বিগ্রহ যেন শান্তিময় তপোবনমৃগে পরিণত হইল।

মহারাজ সস্নেহে তাহার শুণ্ডে হাত বুলাইয়া তাহার কানে কানে কি বলিলেন ; পুষ্করের প্রকাণ্ড দেহ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল, সে অধোবদনে ধীরে ধীরে পশুশালা অভিমুখে ফিরিয়া চলিল। মহারাজ তাহার সঙ্গে চলিলেন। এতক্ষণে হস্তিপক সাহস পাইয়া মহারাজের অনুবর্তী হইল।

এই ঘটনা উল্কার মনে গভীর রেখাপাত করিল। শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে অন্ধ থাকিতে নাই ; উল্কাও মহারাজ সম্বন্ধে সতর্ক ও অবহিত হইয়া তাঁহাকে জালবদ্ধ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

ওদিকে মহারাজ সেনজিৎ বর্মাচ্ছাদিত যোদ্ধার ন্যায় অক্ষতদেহে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে কন্দর্পজনিত কোনও বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে কি না কেহ অনুমান করিতে পারিল না।

একদা প্রাতঃকালে মহারাজ যথাবিহিত স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া পক্ষিভবনে গমন করিলেন। পক্ষিপালন মহারাজের অতি প্রিয় ব্যসন ; বহুজাতীয় বিহঙ্গ তাঁহার পক্ষিশালায় নিরন্তর কলরব করিত, তিনি প্রত্যহ প্রাতে স্বহস্তে তাহাদিগকে আহার করাইতেন।

একটি শুক স্বর্ণদণ্ডের উপর বসিয়া ছিল, সেনজিৎ তাহার নিকটে যাইতেই সে ডানা ঝটপট করিয়া উড়িয়া গেল। তাহার চরণের সুবর্ণশৃঙ্খল কোনও উপায়ে কাটিয়া গিয়াছিল ; মহারাজ দেখিলেন, শুক উড়িয়া অন্তঃপুরসংলগ্ন উপবনের এক আমলকীবৃক্ষের শাখায় গিয়া বসিল।

এই শুক মহারাজের অতি আদরের পক্ষী, বহুকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিয়া ভাল উড়িতেও পারে না। তাহাকে ধরিবার জন্য কি করা যায়, মহারাজ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তিলক-পুণ্ড্রক-চিত্রিত ললাটে বটুকভট্ট আসিয়া স্বস্তিবাচন করিল। তাহাকে দেখিয়া মহারাজ

বলিলেন —'ভালই হইল। বটুক, আমার শুকপাখিটা উড়িয়া গিয়া অন্তঃপুরের ঐ আমলকীবৃক্ষে বসিয়াছে। তুমি যাও, উহাকে ধরিয়া আন। উদ্যানপালিকাকে বলিলেই সে ধরিয়া দিবে।'

বটুকভট্টের চক্ষু গোলাকৃতি হইল, সে বলিল—'রাজার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু অনাহূতভাবে রাজ অবরোধে প্রবেশ করা কি উচিত হইবে ? লোকে যদি নিন্দা করে ?'

'নিন্দা করিবে না—তুমি যাও।'

বটুক অতিশয় গম্ভীরমুখে বলিল—'অকলঙ্ক-চরিত্র ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সর্বদাই সাবধানে থাকিতে হয়—

মহারাজ শ্লেষ করিয়া বলিলেন—'এত ভয় কিসের ?'

তখন সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িল, বটুক কম্পিতস্বরে কহিল—'যদি আবার তীর ছোঁড়ে ?'

মহারাজ হাসিয়া উঠিলেন—'ভয় নাই। রসিকতার চেষ্টা করিও না, তাহা হইলে আর কোনও বিপদ ঘটিবে না।'

ক্ষুব্ধস্বরে বটুক বলিল—'যাইতেই হইবে ?'

তাহার কাতরভাব দেখিয়া মহারাজ স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—'হাঁ।'

সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস মোচনপূর্বক বটুক অনিচ্ছা-মন্থরপদে অন্তঃপুরের দিকে চলিল, মহারাজকে শুনাইতে শুনাইতে গেল—'এই জন্যই প্রজারা মাৎস্যন্যায় করে। সামান্য একটা পক্ষীর জন্য—'

কয়েক পদ গিয়া বটুক আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল—'মহারাজ, আমি বলি, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন না, দু'জন থাকিলে বিপদে আপদে পরস্পরকে রক্ষা করিতে পারিব।'

মহারাজ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—'মূর্খ, আমিই যদি যাইব, তবে তোমাকে পাঠাইতেছি কেন ?'

বটুকভট্ট তখন জোড়করে করুণবচনে বলিল—'মহারাজ, রক্ষা করুন, আমাকে একাকী পাঠাইবেন না। ঐ বিদেশিনী যুবতীটাকে আমি বড় ভয় করি।'

মহারাজের স্মিতমুখে ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ ভাবান্তর দৃষ্ট হইল ; তিনি যেন বিমনা হইয়া কি ভাবিলেন। তারপর বাহিরে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া বলিলেন—'না, তুমি একাকী যাও, আমি যাইব না।'

এবার বটুকভট্ট প্রতিশোধ লইল, রাজার বাক্য ফিরাইয়া দিয়া বলিল—'কেন, আপনার এত ভয় কিসের ?'

রুষ্ট বিস্ময়ে মহারাজ বলিলেন—'ভয় ? আমি কি তোমার মতো শিখা-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ !' বটুক উত্তর দিল না, শুধু মিটিমিটি চাহিতে লাগিল। তখন মহারাজ অধীরভাবে বলিলেন—'ভাল, একাকী যাইতে ভয় পাও, চল, আমি রক্ষক হিসাবে যাইতেছি। নারীভয়ে ভীত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করাও সম্ভবত রাজধর্ম।'

রাজা অগ্রবর্তী হইয়া অন্তঃপুর অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বটুকভট্টের কণ্ঠ হইতে একবার একটা অবরুদ্ধ হাসির শব্দ বাহির হইল। রাজা সন্দিগ্ধভাবে তাহার দিকে ফিরিলেন ; কিন্তু বটুকভট্টের মুখে দুর্জয় গাম্ভীর্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

সঙ্কীর্ণ পরিখার ভিতর হইতে অনুচ্চ প্রাকার বেষ্টনী—তন্মধ্যে রাজ-অবরোধের চক্রাকৃতি বিস্তীর্ণ ভূমি। ভূমির কেন্দ্রস্থলে সৌধ—চতুর্দিকে নানা বৃক্ষ-লতা-শোভিত উপবন।

উদ্যানে প্রবেশপূর্বক কয়েক পদ গমন করিবার পর মহারাজ সেনজিতের গতি ক্রমশ শ্লথ হইয়া শেষে থামিয়া গেল। যে আমলকীবৃক্ষটা তাঁহার লক্ষ্য ছিল, তাহার অনতিদূরে এক পুষ্পিত রক্ত-কুরুবকের ছায়ায় তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, সদ্যস্নাতা উল্কা একাকিনী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া কর্ণে কুরুবক-কোরকের অবতংস পরিতেছে ! তাহার কটিতটে চম্পকবর্ণ সূক্ষ্ম

কার্পাসবস্ত্র, বক্ষে কাশ্মীর-রঞ্জিত নিচোল—উত্তরীয় নাই। দর্পণের ন্যায় ললাটে কুঙ্কুম-তিলক, চরণপ্রান্তে লাক্ষারাগ, সিক্ত অবেণীবদ্ধ কুন্তলভার পৃষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া যেন এই সম্মোহিনী প্রতিমার পটভূমিকা রচনা করিয়াছে।

মহারাজের উত্তরীয় আকর্ষণ করিয়া উত্তেজিত নিম্নস্বরে বটুকভট্ট বলিল—'মহারাজ, দেখুন, দেখুন, সাক্ষাৎ কন্দর্পের জয়শ্রী বৃক্ষতলে আবির্ভূতা হইয়াছে। হে কন্দপারি, এই দুরন্ত বসন্তকালে তুমি আমাদের রক্ষা কর।'

পরিপূর্ণ নারীবেশে মহারাজ ইতিপূর্বে উল্কাকে দেখেন নাই—আজ প্রথম দেখিলেন। উল্কা যখনই প্রকাশ্যে বাহির হইয়াছে, নারীসুলভ প্রসাধন বর্জন করিয়া দৃপ্ত যোদ্ধবেশে দেখা দিয়াছে। তাই আজ তাহার সুকুমার নারীমূর্তি যেন দর্শকের চিত্তে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া দিল।

উল্কাও দূর হইতে মহারাজকে দেখিতে পাইয়াছিল; সে রিমঝিম মঞ্জীর বাজাইয়া, অঙ্গসঞ্চালনে লাবণ্যের তরঙ্গ তুলিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। জঘনভারমন্থর মদালস গতি, যেন প্রতি পদক্ষেপে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। উত্তরীয়ের অভাবে ব্যক্ত দেহভাগ সুমধুর নির্লজ্জতায় নিজ গৌরব-গর্ব ঘোষণা করিতেছে। মন্ত্ররুদ্ধবীর্য সর্পের ন্যায় মহারাজ স্থির হইয়া রহিলেন।

উল্কা মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুখে একটু ভঙ্গুর হাসি, আয়ত চক্ষুপল্লবে শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া। উল্কা মহারাজের পদপ্রান্তে জানু নত করিয়া বসিল, কূজন-মধুর স্বরে বলিল—'প্রভাতে উঠিয়া রাজদর্শন করিলাম, আজ আমার সুপ্রভাত। দেবপ্রিয়, দাসীর অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।' বলিয়া কপোতহস্তে কয়েকটি কুরুবক-কলি তুলিয়া ধরিল।

মহারাজ মূক হইয়া রহিলেন।

বটুকভট্ট উল্কার আগমনে মহারাজের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া বহু অলঙ্কারযুক্ত ভাষায় সাড়ম্বরে আশীর্বচন করিতে লাগিল। তাহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে মহারাজের চমক ভাঙ্গিল।

আত্মবিস্মৃতির তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াই মহারাজ মুখভাব কঠিন করিলেন, ললাটে ভ্রূকুঞ্চন দেখা দিল। তিনি ধীর-হস্তে উল্কার অঞ্জলি হইতে একটি পুষ্প তুলিয়া লইয়া সংক্ষিপ্ত স্বরে বলিলেন—'স্বস্তি!'

উল্কা চপলনেত্রে আনন্দ বিকীর্ণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কর্ণভূষণ দুলাইয়া পরিহাস-তরল-কণ্ঠে বলিল—'মহারাজ, এতদিনে বিদেশিনীকে স্মরণ হইল? রাজকার্য কি এতই গুরু?'

উল্কাকে এত হাস্যরহস্যময়ী মহারাজ পূর্বে দেখেন নাই; কিন্তু তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন—'আমার একটা শুকপক্ষী উড়িয়া ঐ আমলকীবৃক্ষে বসিয়াছে, তাহাকে ধরিতে আসিয়াছি।'

কলকণ্ঠে হাসিয়া উল্কা বলিল—'সত্য? কই, আসুন তো দেখি।'

ক্রীড়াচঞ্চলা বালিকা যেন নূতন খেলার উপাদান পাইয়াছে, এমনই ভাবে চটুলপদে উল্কা আগে আগে চলিল, মহারাজ তাহার অনুবর্তী হইলেন। যাইতে যাইতে গ্রীবা বাঁকাইয়া উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ, আপনার শুকের নাম কি?'

মহারাজ গম্ভীরমুখে বলিলেন—'বিম্বোষ্ঠ।'

'বিম্বোষ্ঠ! কি সুন্দর নাম!—কঞ্চুকী মহাশয় আমাকেও একটা শুকপক্ষী দিয়াছেন—সে ইহারই মধ্যে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার নামকরণ হয় নাই। কি নাম রাখি বলুন তো?'

মহারাজ ললাটের উপর দিয়া একবার হস্তচালনা করিলেন, উল্কার পক্ষীর নামকরণ সহসা

করিতে পারিলেন না।

ক্রমে উভয়ে আমলকীবৃক্ষতলে উপনীত হইলেন। রাজা পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, সাবধানী বটুক তাঁহার সঙ্গে আসে নাই, বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া আছে। তিনি মনে মনে ভীরু ব্রাহ্মণকে কটূক্তি করিলেন।

আমলকীবৃক্ষ বসন্ত ঋতুর সমাগমে নবপত্রে শোভিত হইয়াছে, তাহার ভিতরে হরিদ্বর্ণ পক্ষী সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। উল্কা ও মহারাজ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সহসা উল্কা সেনজিতের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিয়া উঠিল—'ঐ দেখুন মহারাজ, ঐ দেখুন, আপনার ধূর্ত বিম্বোষ্ঠ পত্রান্তরালে বসিয়া ফল ভক্ষণ করিতেছে।'

মহারাজ ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইলেন, তারপর রুক্ষস্বরে কহিলেন—'বিম্বোষ্ঠ, নামিয়া আয়!'

মহারাজের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র বিম্বোষ্ঠ নখধৃত ফল ফেলিয়া দিয়া সতর্কভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া নীচের দিকে তাকাইল, কিন্তু নামিয়া আসিবার জন্য কোনও ব্যস্ততা প্রদর্শন করিল না।

মহারাজ আবার তর্জন করিলেন—'বিম্বোষ্ঠ, শীঘ্র নামিয়া আয়!'

কোনও ফল হইল না; বিম্বোষ্ঠ পাশের দিকে সরিয়া গিয়া এক শাখার আড়ালে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

উল্কা বিভক্ত ওষ্ঠাধরে দেখিতেছিল, এবার সে পলাতক মুক্তিবিলাসী পক্ষীকে আহ্বান করিল; ভ্রূবিলাস করিয়া কপট ক্রোধমিশ্রিত কৌতুকের স্বরে বলিল—'ধৃষ্ট পাখি, মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে তোর সাহস হয়? এখনও নামিয়া আয়, নচেৎ তোর দুই পায়ে শিকল দিয়া পিঞ্জরে বাঁধিয়া রাখিব।'

এত বড় শাসনবাক্যেও বিদ্রোহী পাখি অটল রহিল। তখন উভয়ে বহুপ্রকারে তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন, উল্কা আরক্ত বিম্বাধর স্ফুরিত করিয়া, করকঙ্কণ ক্বণিত করিয়া তাহাকে তর্জন অনুনয় করিল; কিন্তু বিম্বোষ্ঠ গ্রাহ্য করিল না।

তখন সেনজিৎ হতাশ হইয়া বলিলেন—'এখন উপায়?'

উল্কা গণ্ডে তর্জনী রাখিয়া চিন্তা করিল। তারপর সহসা মুখ তুলিয়া বলিল—'উপায় আছে, মহারাজ! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি।' বলিয়া রহস্যময় হাসিয়া দ্রুতশিঞ্জিত-চরণে ভবন অভিমুখে প্রস্থান করিল। সেনজিৎ তাঁহার চঞ্চল নিতম্বলুণ্ঠিত কেশজালের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন।

কিয়ৎকাল পরে উল্কা ফিরিয়া আসিল। মহারাজ দেখিলেন, তাহার মণিবন্ধে একটি দীর্ঘপুচ্ছ শুক পক্ষী।

মহারাজ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন—'পাখি দিয়া পাখি ধরিবে?'

উল্কা পূর্ণ-দৃষ্টিতে মহারাজের দিকে তাকাইল, বলিল—'হাঁ। কেন, তাহা কি অসম্ভব?'

মহারাজের গণ্ড ঈষৎ উত্তপ্ত হইল, তিনি পুনর্বার কণ্ঠস্বর নীরস করিয়া বলিলেন—'বলিতে পারি না। চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।'

উল্কা তখন মৃদুহাস্যে বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া কুহক-মধুর স্বরে ডাকিল—'আয়, আয় বিম্বোষ্ঠ! এই দ্যাখ, তোর সাথী তোর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। আয়!'

বিম্বোষ্ঠ কৌতূহলীভাবে নীচের দিকে তাকাইল, ঘাড় বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া নিরীক্ষণ করিল। তারপর উড়িয়া আসিয়া উল্কার অংসের উপর বসিল।

বিজয়োজ্জ্বল দৃষ্টিতে উল্কা বলিল—'দেখিলেন, মহারাজ?'

'দেখিলাম।'

দুই পক্ষী কিছুক্ষণ নীরবে পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করিল। তারপর বিম্বোষ্ঠ অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করিয়া উল্কার কর্ণবিলম্বী রক্তবর্ণ কুরুবক-মুকুলে চঞ্চু বসাইয়া টান দিল।

উল্কা বিপন্নভাবের বিভ্রম করিয়া বলিয়া উঠিল —'মহারাজ, রক্ষা করুন, আপনার দস্যু পক্ষী আমার কর্ণভূষা হরণ করিতে চায়।'

সেনজিৎ পক্ষীকে ধরিতে গেলেন। পাখি ঝটপট করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু মহারাজ তাহার চরণবিলম্বিত স্বর্ণশৃঙ্খলের অংশ ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। পাখি পলাইতে পারিল না—মহারাজের উন্মুক্ত বক্ষের উপর গিয়া পড়িল। ভীত পক্ষীর তীক্ষ্ণ নখ তাঁহার বক্ষে অবলম্বন অন্বেষণ করিতে গিয়া কয়েকটা আঁচড় কাটিয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে নখচিহ্ন রক্তিম হইয়া উঠিল ; তারপর দুই বিন্দু রক্ত ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া গড়াইয়া পড়িল।

উল্কা সত্রাসে বলিয়া উঠিল—'সর্বনাশ! মহারাজ, এ কি হইল!—ওরে কে আছিস্, শীঘ্র আয়! বান্ধুলি! বিপাশা!—শীঘ্র অনুলেপন লইয়া আয়! মহারাজ আহত হইয়াছেন।'

মহারাজের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, তিনি প্রায় রূঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন—'এ কিছু নয়, সামান্য নখক্ষত মাত্র।'

'সামান্য নখক্ষত! মহারাজ কি জানেন না, পশু-পক্ষীর নখে বিষ থাকে?' ব্যাকুলভাবে গৃহের দিকে তাকাইয়া বলিল—'কই, কেহ আসে না কেন? বিলম্বে বিষ যে দেহে প্রবেশ করিবে। বান্ধুলি! সুজাতা!'

মহারাজ আবার আরক্তমুখে আপত্তি করিলেন। তখন উল্কা হঠাৎ যেন পথ খুঁজিয়া পাইয়া বলিয়া উঠিল—'মহারাজ, আপনি স্থির হইয়া দাঁড়ান, আমি বিষ নিষ্কাশন করিয়া লইতেছি!'

উল্কার উদ্দেশ্য মহারাজ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই সে মহারাজের একেবারে নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, তারপর দুই হাত তাঁহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া ক্ষরণশীল ক্ষতের উপর তাহার কোমল অধরপল্লব স্থাপন করিল। মহারাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত অভিভূত হইয়া রহিলেন, তারপর সবলে নিজেকে উল্কার আশ্লেষমুক্ত করিয়া লইয়া পিছু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

উল্কার অধরে মহারাজের বক্ষ-শোণিত। সে অর্ধস্ফুট বিস্ময়ে বলিল—'কি হইল!'

তিক্ত ঘৃণাজর্জরিতস্বরে সেনজিৎ বলিলেন—'নারীর পুরুষভাব আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু নির্লজ্জতা অসহ্য!' বলিয়া উল্কার দিকে আর দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ মহারাজকে দেখা গেল, উল্কা স্থিরনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখে ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলিতে লাগিল। তারপর সে সজোরে দন্ত দিয়া অধর দংশন করিল। মহারাজের বক্ষোরুধিরে উল্কার রুধির মিশিল।

প্রত্যাখ্যাতা খণ্ডিতা নারীর চিত্ত-গহনে কে প্রবেশ করিবে? শিকার-বঞ্চিতা ব্যাঘ্রীর ক্ষুধিত জিঘাংসাই বা কে পরিমাপ করিতে পারে? উল্কার নয়নে যে বহ্নি জ্বলিতে লাগিল তাহার অন্তর্গূঢ় রহস্য নির্ণয় করা মানুষের সাধ্য নয়। বোধ করি দেবতারও অসাধ্য।

৫

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেনজিৎ রাজোদ্যানে একাকী বিচরণ করিতেছিলেন। মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মন্দীভূত হইয়া অগ্নিকোণ হইতে মৃদু শীতল মলয়ানিল বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সুদূর চম্পারণ্যের চাঁপার বন হইতে সুগন্ধ আহরণ করিয়া মহারাজের আতপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করিবার চেষ্টা

করিতেছিল।

মহারাজের চক্ষের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তাঁহার অশান্ত চিত্তের প্রতিচ্ছবি বহন করিতেছিল। পাদচারণ করিতে করিতে তিনি অন্যমনে যূথীগুল্ম হইতে পুষ্প তুলিয়া নখে ছিন্ন করিতেছিলেন, কখনও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আকাশে যেখানে সূর্যাস্তের বর্ণ-বিলাস চলিতেছিল সেই দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন।

এই সময় রাজ্যের মহামাত্য ধীরপদে আসিয়া মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া দাঁড়াইলেন। অপ্রসন্ন সপ্রশ্ন মুখে মহারাজ তাঁহার প্রতি চাহিলেন। কোনও কথা হইল না; মন্ত্রী নীরবে একটি ক্ষুদ্র লিপি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন।

ভূর্জপত্রে লিখিত লিপি; তাহাতে এই কয়টি কথা ছিল—

'বৈশালিকা নারী সম্বন্ধে সাবধান। কোনও কুটিল উদ্দেশ্যে সে মগধে প্রেরিত হইয়াছে। সম্ভবত মহারাজকে রূপমোহে বশীভূত করিয়া লিচ্ছবির কার্যসিদ্ধি করা তাহার অভিপ্রায়।'

পত্র পাঠ করিয়া মহারাজ আরক্ত মুখ তুলিলেন; মন্ত্রী অন্য দিকে চাহিয়া ধীরস্বরে বলিলেন—'বৈশালী হইতে আমাদের গুপ্তচর অদ্য এই পত্র পাঠাইয়াছে।'

মহারাজ কথা কহিলেন না, লিপির দিকে কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া ভূর্জপত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া বাতাসে উড়াইয়া দিলেন। মন্ত্রী অবিচলিত মুখচ্ছবি লইয়া পুনর্বার মহারাজকে আশীর্বাদপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল, আকাশের আভুগ্ন চন্দ্রকলা এতক্ষণ মলিন-মুখে ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বীর তিরোভাবে এখন যেন বাঁকা হাসি হাসিয়া উঠিল। মহারাজের সন্নিধাতা স্বর্ণপাত্রে স্নিগ্ধ আসব লইয়া উপস্থিত হইলে মহারাজ একনিশ্বাসে সুরা পান করিয়া পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

তারপর একে একে বয়স্যরা আসিল। কিন্তু মহারাজের মুখে প্রকট বিরক্তি ও নির্জনবাসের স্পৃহা লক্ষ্য করিয়া তাহারা সঙ্কুচিতভাবে অপসৃত হইয়া গেল। বটুকভট্ট আসিয়া মহারাজের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিল, তাহার চটুলতা কিয়ৎকাল ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করিয়া মহারাজ তাঁহার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, বলিলেন—'বটুক, তোমাকে শূলে দিবার ইচ্ছা হইতেছে।'

বটুক দ্রুত পলায়ন করিতে করিতে বলিল—'মহারাজ, ও ইচ্ছা দমন করুন, আমি শয্যায় শুইয়া শুইয়া মরিতে চাই।'

রাত্রি ক্রমশ গভীর হইতে লাগিল। উৎকণ্ঠিত সন্নিধাতা মহারাজের আশেপাশে ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু কাছে আসিতে সাহস করিল না। সদা-প্রসন্ন মহারাজের এরূপ ভাবান্তর পূর্বে কেহ দেখে নাই, সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। রাজপুরীর সূপকার হইতে সম্বাহক পর্যন্ত সকলের মধ্যেই কানে কানে বার্তা প্রচারিত হইয়া গেল—দেবপ্রিয় মহারাজের আজ চিত্ত সুস্থ নাই। যবনী প্রতীহারীরা ঊর্ধ্ব-চোখে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; তাহাদের বর্মাচ্ছাদিত বক্ষও মহারাজের জন্য ব্যথিত হইয়া উঠিল।

সেনজিৎকে রাজ্যের আপামর সাধারণ সকলেই ভালবাসিত। বিশেষত পুরপরিজন তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত, তাঁহার অল্পমাত্র ক্লেশ দূর করিবার জন্য বোধ করি প্রাণ দিতেও কেহ পরাঙ্মুখ হইত না। রাজা যেখানে প্রজার বন্ধু সেখানে এমনই হয়। কিন্তু তবু আজিকার এই মধুর বসন্ত-রজনীতে মহারাজ বক্ষে অজ্ঞাত সন্তাপের অগ্নি জ্বালিয়া একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, পাত্রমিত্র বয়স্য পরিজন কেহ সান্ত্বনা দিবার জন্যও তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে যখন আর বিলম্ব নাই তখন মহারাজ দ্রুত পাদচারণ করিতে করিতে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নিস্তব্ধ বাতাসে সুমধুর বীণা-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

ধ্বনি অন্তঃপুরের দিক হইতে আসিতেছে। অতি মৃদু ধ্বনি, কিন্তু যেন প্রাণের দুরন্ত আক্ষেপভরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ব্যাধ-বংশী-আকৃষ্ট মৃগের মতো মহারাজের পদদ্বয় অজ্ঞাতসারে ঐ বীণা-ধ্বনির দিকে অগ্রসর হইল, তিনি পরিখার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পরিখার পরপারে প্রাচীরের অন্তরালে বসিয়া কে বীণা বাজাইতেছে। ক্রমে বীণাধ্বনির সহিত একটি কণ্ঠস্বর মিশিল। তরল খেদ-বিগলিত কণ্ঠস্বর—মনে হয় যেন জ্যোৎস্না কুহেলির সহিত মিশিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। মহারাজ তন্ময় একাগ্র হইয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রথমে দুই-একটি কথা, তারপর সম্পূর্ণ সঙ্গীত তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল।

আধ-আধ প্রাকৃত ভাষায় গ্রথিত সঙ্গীত, তাহার মর্ম—

হায় ধিক্ কন্দর্পদর্পাহিতা!
মন্মথ তোমার মন মথন করিল,
প্রিয়জনকে নিকটে পাইয়া তুমি লজ্জা বিসর্জন দিলে।
হায়, কেন লজ্জা বিসর্জন দিলে?
প্রিয়জনের ঘৃণা তোমার অঙ্গ দহন করিল,
মদন তোমার অন্তর দহন করিল—
তুমি অন্তরে বাহিরে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইলে!
হায় ধিক্ কন্দর্পদর্পাহিতা!

বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে সঙ্গীত মিলাইয়া গেল। মহারাজ কয়েক মুহূর্ত পাষাণমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে সে স্থান ছাড়িয়া উদ্যান উত্তীর্ণ হইয়া নিজ শয়নভবনে প্রবেশ করিলেন।

শুষ্ক ইন্ধনে অগ্নি অধিক জ্বলে। সে রাত্রে মহারাজের নয়নে নিদ্রা আসিল না।

একে একে ফাল্গুনের মদোচ্ছ্বাসিত দিনগুলি কাটিতে লাগিল। মহারাজের চিত্তে সুখ নাই, মুখে হাসি নাই—তিনি দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন।

মহারাজের প্রকৃতি যেন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। অকারণ ক্রোধ—যাহা পূর্বে কেহ দেখে নাই—তাঁহার প্রতি কার্যে প্রতি সম্ভাষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষের সাহচর্য বিষবৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উদ্যানে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বিচরণ করা তাঁহার নিত্যকার্য হইয়া দাঁড়াইল।

একমাত্র বটুকভট্টই বোধ হয় মহারাজের চিত্তবিক্ষোভের যথার্থ কারণ অনুমান করিয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ বাহিরে মূর্খতার ভান করিলেও ভিতরে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন—সে ঘুণাক্ষরে কাহারও কাছে কোনও কথা প্রকাশ করিল না। নারীবিদ্বেষী মহারাজের এত দিনে চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে, এ কথা তিনি স্বয়ং যখন গোপন করিতে চান তখন তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে তাঁহার লজ্জা বৃদ্ধি পাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে আপাতত এ কথা প্রচ্ছন্ন রাখাই শ্রেয়। মহারাজ যখন কন্দর্পের নিকট পরাভব স্বীকার করিবেন, তখন আপনিই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

কিন্তু মহারাজের চিত্তে প্রফুল্লতা আনয়ন করিবার চেষ্টাও বটুকভট্টের সফল হইল না। সে সহজভাবে ইহাই বুঝিয়াছিল যে, মহারাজ যখন উল্কার প্রতি মনে মনে অনুরক্ত হইয়াছেন, তখন উভয়ের মিলন ঘটাইতে পারিলেই সব গণ্ডগোল চুকিয়া যাইবে। মহারাজের নারীবিদ্বেষ ও বিবাহে অনিচ্ছা যদি এইভাবে পরিসমাপ্তি লাভ করে, তবে তো সব দিক দিয়াই মঙ্গল। মগধের পট্টমহাদেবী হইতে উল্কার সমকক্ষ আর কে আছে?—এই ভাবিয়া বটুক তাহার সমস্ত ছলা-কলা

ও রঙ্গভঙ্গ ঐ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করিয়াছিল। কিন্তু হায়, মহারাজের হৃদয় মন্থন করিয়া যে একই কালে অমৃত ও গরল উঠিয়াছে, তাহা অনুগত বটুক জানিতে পারে নাই।

এমনই ভাবে দিনগুলি ক্ষয় হইতে লাগিল. ওদিকে আকাশে চন্দ্রদেব পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। শেষে একদিন বসন্তোৎসবের মধুরাকা আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেশসুদ্ধ নরনারী উৎসবে মাতিল। সকলের মুখেই আনন্দের—তথা আসবের মদবিহ্বলতা। এমন কি যবনী প্রতীহারীরাও মাধ্বী পান করিয়া অরুণায়িত-নেত্রে পরস্পরের অঙ্গে কুঙ্কুম-পরাগ নিক্ষেপ করিয়া, বীণ বাজাইয়া, দ্রাক্ষাবনের গীত গাহিয়া উৎসবে মগ্ন হইল।

কেবল মহারাজ সেনজিৎ ভ্রূকুটি-ভয়াল মুখে সহচরহীন নিঃসঙ্গতার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে তিনি ক্লান্তদেহে উদ্যানে গিয়া একটি মর্মরবেদীর উপর উপবেশন করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিলেন। অমনি সম্মুখে পরিখার পরপারে অন্তঃপুর-ভবনের শুভ্রচূড়া চোখে পড়িল। মহারাজ সেদিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিলেন। উদ্যানে কেহ নাই, উদ্যান-পালিকারাও আজ উৎসবে গা ঢালিয়া দিয়াছে ; মহারাজকে কেহ বিরক্ত করিল না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। পূর্ব-দিগন্তে পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি মারিল। দিনের আলো সম্পূর্ণ নিভিয়া যায় নাই, অথচ চাঁদের কিরণ পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিয়াছে—দিবা-রাত্রির এই সন্ধিক্ষণে মহারাজের চিত্তও কোন্ ধূসর বর্ণপ্রলেপহীন অবসন্নতায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল, এমন সময় অকস্মাৎ একটি তীর আসিয়া তাঁহার পাশে পড়িল। চকিতে মহারাজ তীরটি তুলিয়া লইলেন ; তীরের অগ্রভাগে ধাতু-ফলকের পরিবর্তে অশোকপুষ্প গ্রথিত, তীরগাত্রে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে। কম্পিত হস্তে লিপি খুলিয়া মহারাজ পড়িলেন—লাক্ষারাগ দিয়া লিখিত লিপি—

'আজ বসন্ত-পূর্ণিমার রাত্রে নির্লজ্জা উল্কা প্রার্থনা জানাইতেছে, মহারাজ একবার দর্শন দিবেন কি ?'

মহারাজ পত্রখানি দুই হাতে ধরিয়া দুরন্ত আবেগে মুখের উপর চাপিয়া ধরিলেন। রুদ্ধ অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'উল্কা মায়াবিনি—'

বাসনা প্রতিরোধেরও সীমা আছে ! মহারাজ সেনজিতের অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ হইল।

সেদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিবার পর হইতেই উল্কা মনে মনে মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ কয় দিন মহারাজ তাহাকে দেখেন নাই, কিন্তু সে সৌধশীর্ষ হইতে লুকাইয়া মহারাজকে দেখিয়াছিল। তাই মদনোৎসবের প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইয়াছিল—আজ তিনি আসিবেন। পুরুষের মন এত কঠিন হইতে পারে না, আজ মহারাজ নিশ্চয় ধরা দিবেন।

কর্পূর-সুবাসিত জলে স্নান করিয়া সে প্রসাধন করিতে বসিয়াছিল। সখীরা তাহাকে অপরূপ সাজে সাজাইয়া দিয়াছিল ; কিন্তু তবু তাহার মনঃপূত হয় নাই। বার বার কবরী খুলিয়া নূতন করিয়া কবরী বাঁধিয়াছিল—অঙ্গের পুষ্পাভরণ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, চন্দনের পত্রলেখা মুছিয়া বক্ষে কুঙ্কুমের পত্রলেখা আঁকিয়াছিল, আবার তাহা মুছিয়া চন্দনের চিত্র লিখিয়াছিল। শেষে রাগ করিয়া সখীদের বলিয়াছিল—'তোরা কিছু জানিস্ না। আজ আমার জীবনের মহা সন্ধিক্ষণ, এমন করিয়া আমাকে সাজাইয়া দে—যাহাতে মহেশ্বরের মনও জন্য করিতে পারি।'

সখীরা হাসিয়া বলিয়াছিল—'সেজন্য সাজিবার প্রয়োজন কি ?'

কিন্তু প্রভাত বহিয়া গেল, মহারাজ আসিলেন না।

উল্কার পুষ্পাভরণ অঙ্গ-তাপে শুকাইয়া গেল, সে আবার নূতন পুষ্পভূষা পরিল। দ্বিপ্রহর

অতীত হইল, অপরাহ্ণ ক্রমে সায়াহ্নে গড়াইয়া গেল, তবু মহারাজ দর্শন দিলেন না। সখীরা উল্কার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া ভীত হইল।

সন্ধ্যার সময় প্রাসাদ চূড়ে উঠিয়া উল্কা দেখিল—মহারাজ উদ্যানে বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখ বিপরীত দিকে। তিক্ত অন্তঃকরণে উল্কা ভাবিল —'ধিক্ আমাকে!'

তারপর মহারাজের সমীপে তীব্র নিক্ষেপ করিয়া, বসন-ভূষণ ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া উল্কা শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। উল্কার চোখে বোধ করি জীবনে এই প্রথম অশ্রু দেখা দিল।

রাত্রি হইল। নগরীর প্রমোদ-কলরব ক্রমশ মৌন রসনিমগ্ন হইয়া আসিতে লাগিল। চন্দ্র মধ্যগগনে আরোহণ করিলেন।

উল্কার সখীরা সপ্তপর্ণ-বৃক্ষের শাখায় হিন্দোলা বাঁধিয়াছিল। উল্কা যখন দেখিল মহারাজ সত্যই আসিলেন না, তখন সে বুকের কঞ্চুকী কবরীর মালা ফেলিয়া দিয়া কেশ এলাইয়া সেই হিন্দোলায় গিয়া বসিল। তারপর শুষ্ক চোখে চাঁদের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—'ব্যর্থ! ব্যর্থ! পারিলাম না! এত ছলনা চাতুরী সব মিথ্যা হইল। কোন্ দর্পে তবে মগধে আসিয়াছিলাম? এখন এ লজ্জা কোথায় রাখিব? উঃ—এত নীরস পুরুষের মন? ধিক্ আমার জীবন? আমার মৃত্যু ভাল!'

'উল্কা!'

কে ডাকিল? কণ্ঠস্বর শুনিয়া চেনা যায় না। উল্কা গ্রীবা ফেরাইয়া দেখিল, বৃক্ষচ্ছায়ায় এক পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'উল্কা! রাক্ষসি! আমি আসিয়াছি।'

উল্কা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তরুপত্রের ছায়ান্ধকারে ঐ মূর্তি দেখিয়া সে প্রতিহিংসা ভুলিয়া গেল, মগধ ভুলিয়া গেল, বৈশালী ভুলিয়া গেল। দুর্দমনীয় অভিমানের বন্যা তাহার বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেল। এমন করিয়াই কি আসিতে হয়? সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করিয়া, অভিমান-দর্প ধূলায় মিশাইয়া দিয়া কি আসিতে হয়? নির্লজ্জার প্রগল্ভ লজ্জাহীনতার কি ইহার বেশি মূল্য নাই?

মহারাজ উল্কার অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দুই হস্ত তাহার শ্লথবাস স্কন্ধের উপর রাখিয়া ক্ষুধিত নয়নে তাহার চক্ষের ভিতর চাহিয়া বলিলেন—'উল্কা, আর পারিলাম না। আমি তোমায় চাই। আমার রক্তের সঙ্গে তুমি মিশিয়া গিয়াছ, আমার হৃৎস্পন্দনে তোমার নাম ধ্বনিত হইতেছে—শুনিতে পাইতেছ না? এই শুন।' বলিয়া তিনি উল্কার মুখ নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

অভিমানও ভাসিয়া গেল। এই থরথর ব্যাকুলতার সম্মুখে মান-অভিমান বিলাস-বিভ্রম কিছুই রহিল না; শুধু রহিল চিরন্তন প্রেমলিপ্সু নারীপ্রকৃতি। উল্কা স্ফুরিত অধরোষ্ঠ সেনজিতের দিকে তুলিয়া ধরিয়া স্বপ্ন-বিজড়িত দৃষ্টিতে চাহিল, পাখির তন্দ্রাকূজনের ন্যায় অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—'প্রিয়! প্রিয়তম—!'

মহারাজের তপ্ত অধর বারম্বার তাহার অধরপাত্রে মধু পান করিল। তবু পিপাসা যেন মিটিতে চায় না! শেষে মহারাজ উল্কার কানে কানে বলিলেন—'উল্কা, সত্য বল, আমাকে ভালবাস? এ তোমার ছলনা নয়?'

উল্কার শিথিল দেহ সুখ-তন্দ্রায় ডুবিয়া গিয়াছিল, মহারাজের এই কথায় সে ধীরে ধীরে সেই তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। তাহার মুকুলিত নেত্র উন্মীলিত হইয়া ক্রমে বিস্ফারিত হইল; তারপর মহারাজের বাহুবন্ধনমধ্যে তাহার দেহ সহসা কঠিন হইয়া উঠিল।

অভিনয় করিতে করিতে নটীর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে ; ছলনা কখন সত্যে পরিণত হইয়াছে হতভাগিনী জানিতে পারে নাই।

কিন্তু এখন ? কর্ণমধ্যে সে বজ্রনির্ঘোষ শুনিতে পাইল—তুমি বিষকন্যা !

সবলে নিজ দেহ মহারাজের বাহুমুক্ত করিয়া লইয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল, ত্রাস-বিবৃত চক্ষে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না ; শুধু তাহার কণ্ঠের শিরা দপ্ দপ্ করিয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল।

মহারাজ দুই বাহু বাড়াইয়া অগ্রসর হইলেন—'প্রাণাধিকে—'

'না না রাজাধিরাজ, আমার কাছে আসিও না—।' উল্কা আবার সরিয়া দাঁড়াইল।

মৃদু ভর্ৎসনার সুরে মহারাজ বলিলেন—'ছি উল্কা ! এই কি ছলনার সময় ?'

উল্কা স্খলিতস্বরে বলিল—'মহারাজ ভুল বুঝিয়াছেন, আমি মহারাজকে ভালবাসি না।'

সেনজিৎ হাসিলেন—'আর মিথ্যা কথায় ভুলাইতে পারিবে না। —এস—কাছে এস।'

ব্যাকুল হৃদয়-ভেদী স্বরে উল্কা কাঁদিয়া উঠিল—'না না—প্রিয়তম, তুমি জানো না—তুমি জানো না—'

সেনজিতের মুখ ম্লান হইল, তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—'বোধ হয় জানি। তুমি বৈশালীর কুহকিনী, আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছিলে ; কিন্তু এখন আর তাহাতে কি আসে যায় উল্কা ?'

'কিছু জানো না ; মহারাজ, আমাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। তুমি ফিরিয়া যাও, আর আমার মুখ দেখিও না। মিনতি করিতেছি, তুমি ফিরিয়া যাও।'

তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া মহারাজ বিস্ময়ে তাহার দিকে আবার অগ্রসর হইলেন। তখন উল্কা ব্যাধ-ভীতা হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া পলাইতে লাগিল ; তাহার কণ্ঠ হইতে কেবল উচ্চারিত হইল—'না না না—'

সেনজিৎ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না। উল্কা গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

অধীর ক্রোধে মহারাজ দ্বারে সবেগে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্বার খুলিল না।

দ্বারের অপরদিক হইতে উল্কা বলিল—'রাজাধিরাজ, বিস্তীর্ণ ধরণীতে আপনার যোগ্যা নারীর অভাব হইবে না। আপনি উল্কাকে ভুলিয়া যান।'

তিক্ত বিকৃতকণ্ঠে মহারাজ বলিলেন—'হৃদয়হীনা, তবে কেন আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলে ?'

মিনতি-কাতরস্বরে উল্কা বলিল—'আর্য, বুদ্ধিহীনা নারীর প্রগল্ভতা ক্ষমা করুন। আপনি ফিরিয়া যান—দয়া করুন। আমাদের মিলন অসম্ভব।'

'কিন্তু কেন—কেন ? কিসের বাধা ?'

দ্বারের অপর পার্শ্বে উল্কার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুর বন্যা নামিয়াছে, তাহা মহারাজ দেখিতে পাইলেন না ; শুধু শুনিতে পাইলেন, অর্ধব্যক্ত স্বরে উল্কা কহিল—'সে কথা বলিবার নয়।'

দন্তে দন্ত চাপিয়া মহারাজ বলিলেন—'কেন বলিবার নয় ? তোমাকে বলিতে হইবে, আমি শুনিতে চাই !'

'ক্ষমা করুন।'

'না, আমি শুনিব।'

দীর্ঘ নীরবতার পর উল্কা বলিল—'ভাল, কল্য প্রাতে বলিব।'

মহারাজ দ্বারে মুখ রাখিয়া কহিলেন—'উল্কা, আজিকার এই মধুযামিনী বিফল হইবে ?'

'হাঁ মহারাজ।'

যেন বক্ষে আহত হইয়া মহারাজ ফিরিয়া আসিলেন। ক্লান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'ভাল। কল্য প্রভাতেই বলিবে ?'

'বলিব।'

'তারপর তুমি আমার হইবে ?'

উল্কা নীরব।

মহারাজ বলিলেন—'উল্কা, তুমি কি ? তুমি কি নারী নও ? আমাকে এমন করিয়া দগ্ধ করিতে তোমার দয়া হয় না ?'

উল্কা এবারও নীরব।

অশান্ত হৃদয় লইয়া মহারাজ চলিয়া গেলেন। উল্কা তখন দ্বারসম্মুখে ভূমিতলে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, আর নিজ মনে বলিতে লাগিল—'ফিরিয়া গেলেন, মহারাজ ফিরিয়া গেলেন। প্রিয়তম, কেন তোমাকে ভালবাসিলাম ? কখন বাসিলাম ? যদি বাসিলাম তো আগে জানিতে পারিলাম না কেন ? শ্মশানের অগ্নিশিখা আমি, কেমন করিয়া এই অভিশপ্ত দেহ তোমাকে দিব ?'

শ্মশানের প্রেত-পিশাচরা বোধ করি শ্মশান-কন্যার এই অরুন্তুদ ক্রন্দন শুনিয়া অলক্ষ্যে অট্টহাস্য করিয়া নিঃশব্দে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল।

হায় উল্কা, তোমার পাষাণ-হৃদয় পাষাণই থাকিল না কেন ? কেন তুমি ভালবাসিলে ?

৬

বিনিদ্র রজনীর গ্লানি-অরুণিত-নেত্রে উল্কা শয্যায় উঠিয়া বসিতেই একজন সখী আসিয়া বলিল—'বৈশালী হইতে পত্র আসিয়াছে'—বলিয়া লিপি হস্তে দিল।

জতুমুদ্রা ভাঙ্গিয়া ক্লান্ত চক্ষে উল্কা লিপি পড়িল। শিবামিশ্র লিখিয়াছেন—

'কন্যা, চণ্ডের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছি, তোমার মাতৃঋণ শোধ হইল। কিন্তু শিশুনাগবংশ এখনও নিঃশেষ হয় নাই। স্মরণ রাখিও।'

অন্যমনে পত্র ছিন্ন করিতে করিতে উল্কা পাংশু হাসিয়া বলিল—'সখি, জানিস, পিতা একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমার দেহেও যে শিশুনাগবংশের রক্ত প্রবাহিত, এ কথা তাঁহার স্মরণ নাই।'

সকলে উল্কাকে শিবামিশ্রের কন্যা বলিয়া জানিত, এই রহস্যময় কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সখী অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

উল্কা শয্যা ত্যাগ করিয়া বলিল—'ভাল, তাহাই হইবে। শেষ করিতে না পারি, শিশুনাগবংশকে ক্ষীণ করিয়া যাইব।' কল্য রজনী যে সঙ্কল্প তাহার মনে ছায়ার মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, শিবামিশ্রের পত্রে তাহা দৃঢ় হইল।

স্নান সমাপন করিয়া উল্কা যথারীতি বেশভূষা পরিধান করিল। কিন্তু আজ তাহার প্রসাধনে উৎকণ্ঠা নাই, সখীরা যেমন সাজাইয়া দিল তেমনই সাজিল। একবার দর্পণে মুখ দেখিল—দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিয়াছিল, তাহার বুকের মধ্যে যে অগ্নি সারা রাত্রি জ্বলিয়াছে, তাহাতে তাহার রূপও পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কই—দেহে তো তাহার একবিন্দু আঁচ লাগে নাই। বরং নয়নের অলস অরুণ চাহনিতে, গণ্ডের হিমশুভ্র পাণ্ডুরতায়, সর্বাঙ্গের ঈষৎক্লান্ত শিথিলতায় যেন রূপ আরও অলৌকিক হইয়া উঠিয়াছে। বিষকন্যাদের বুঝি

এমনই হয়, ভিতরের আগুনে রূপের বর্তিকা আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

প্রসাধন শেষ হইলে উল্কা একজন সখীকে দুইখানি তরবারি আনিতে আদেশ করিল। সখী বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না, নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

তরবারি আসিলে উল্কা তাহাদের কোষমুক্ত করিয়া পরীক্ষা করিল। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল খরধার অস্ত্র—উল্কা বাহুবল্লরী বিলোলিত করিয়া তাহাদের ঊর্ধ্বে তুলিল ; মনে হইল, যেন কক্ষের ভিতর এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

এতক্ষণে একজন সখী সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'প্রিয় সখি, আমাদের বড় ভয় হইতেছে, তরবারি লইয়া কি করিবে ?'

উল্কা অল্প হাসিল—'মহারাজের অস্ত্র-কৌশল পরীক্ষা করিব।' তারপর গম্ভীর মুখে বলিল—'আমি উদ্যানে যাইতেছি, তোমরা কেহ সেখানে যাইও না। যদি মহারাজ আসেন, তাঁহাকে বলিও আমি মাধবীকুঞ্জে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।' বলিয়া তরবারি হস্তে উদ্যান অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সখীরা ভীতনির্বাক্ কাষ্ঠপুত্তলির মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

মহারাজ সেনজিৎ মাধবীকুঞ্জের লতাবিতানতলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দুই হস্তে স্থির বিদ্যুতের মতো দুইখানি তরবারি লইয়া উল্কা দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চোখে নবীন আষাঢ়ের দলিতাঞ্জন মেঘ, আসন্ন মহাদুর্যোগের প্রতীক্ষায় দেহ স্থির।

তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন ; উত্তপ্ত আরক্ত চক্ষু তরবারির প্রতি নিবদ্ধ হইল। বলিলেন—'উল্কা, এ কি ?'

উল্কা রক্তাধরে ক্ষীণ হাসিল, বলিল—'এই আমার উত্তর।'

'কিসের উত্তর ?'

'কাল যে কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার উত্তর।'

সেনজিৎ অধীরপদে উল্কার দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বজ্রগর্ভকণ্ঠে বলিলেন—'উল্কা, আজ আবার এ কি নূতন ছলনা ? হৃদয় লইয়া বার বার ক্রীড়া পরিহাস ভাল লাগে না—বল, কাল কেন আমাকে বঞ্চনা করিলে ? আমাদের মিলনে কিসের বাধা ?'

'তাহাই তো বলিতেছি মহারাজ। আমাদের দু'জনের মধ্যে এই তরবারি ব্যবধান।'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ আমাকে অসিযুদ্ধে পরাজিত না করিলে লাভ করিতে পারিবেন না।'

মহারাজ যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, বলিলেন—'সে কি ?'

উল্কা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—'ইহাই আমার বংশের চিরাচরিত প্রথা।'

এইবার মহারাজের মুখে এক অপূর্ব পরিবর্তন হইল ; মুহূর্তমধ্যে ক্লেশ-চিহ্নিত রেখা অন্তর্হিত হইয়া মুখ আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'এই বাধা !—কিন্তু তুমি নারী, তোমার সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিব কিরূপে ?'

উল্কা গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া চাহিল—'মহারাজ কি আমাকে অস্ত্রবিদ্যায় সমকক্ষ মনে করেন না ?'

সেনজিৎ হাসিলেন, বলিলেন—'তাহা নয়। তোমার অস্ত্রবিদ্যার পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছি, এখনও এ বক্ষ তোমার অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত। কিন্তু যদি আমি যুদ্ধ না করি ?'

'তাহা হইলে আমাকে পাইবেন না।'

'যদি বলপূর্বক গ্রহণ করি ?'

'তাহাও পারিবেন না, এই তরবারি বাধা দিবে।'

'ভাল—বাধা দিক'—বলিয়া মহারাজ সহাস্যমুখে বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইলেন।

কম্পিত স্বরে উল্কা বলিল—'মহারাজ, কাছে আসিবেন না—নচেৎ—' বলিয়া তরবারি তুলিল।

'নচেৎ— ?' মহারাজ অগ্রসর হইয়া চলিলেন। তরবারির অগ্রভাগ তাঁহার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিল, তথাপি তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল না। তখন উল্কা ক্ষিপ্রপদে সরিয়া গিয়া তরবারি নিজ বক্ষে স্থাপন করিয়া বলিল—'আর অধিক আছে আসিলে এই অসি নিজ বক্ষে বিঁধিয়া দিব।'

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—'আমি জানিতাম, তুমি আমার বক্ষে অসি হানিতে পারিবে না—সেজন্য অন্য অস্ত্র আছে—' বলিতে বলিতে বিদ্যুদ্বেগে তিনি উল্কার হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইলেন, তাহার বাহু ধরিয়া কপট কঠোর স্বরে বলিলেন—'আজ তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব।'

উল্কা কাঁদিয়া বলিল—'নিষ্ঠুর ! অত্যাচারী ! তোমার কি কলঙ্কের ভয় নাই ? অসহায়া নারীর উপর পীড়ন করিতে তোমার লজ্জা হয় না ?'

মহারাজ পরিতৃপ্ত হাস্যে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—'না—হয় না। এবার এস, যুদ্ধ করি।' বলিয়া একখানি তরবারি তুলিয়া লইয়া তাহার হাতে দিলেন।

এইবার উল্কা বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো সজল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। সেনজিৎ কহিলেন—'পাছে তুমি মনে কর, নারীর সহিত যুদ্ধ করিতেও আমি ভয় পাই—তাই অসি ধরিলাম।—এস।' দ্বিতীয় তরবারি তুলিয়া লইয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন—'কিন্তু উল্কা, যদি সত্যই তোমার হাতে পরাজিত হই ? তবে আর তুমি আমার হইবে না ?'

উল্কার অধর কাঁপিতে লাগিল, সে উত্তর দিতে পারিল না। মনে মনে বলিল—'আর না, আর না। এত লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিব না। আমাকে মরিতে হইবে—মরিতে হইবে।—কিংবা যদি পরাজিত করিতে পারি—পারিব কি ?'

অসংযত কণ্ঠস্বর সবলে দৃঢ় করিয়া উল্কা বলিল—'প্রতিজ্ঞা করুন, পরাজিত হইলে আর আমাকে স্পর্শ করিবেন না ?'

ঈষৎ গর্বের সহিত সেনজিৎ বলিলেন—'প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি পরাজিত হই কখনও স্ত্রীজাতির মুখ দেখিব না।'

তারপর সেই মাধবীবিতানতলে দুই প্রেমোন্মাদ নরনারীর অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পুরুষ যুদ্ধ করিল নারীকে লাভ করিবার জন্য, আর নারী যুদ্ধ করিল তাহাকে দূরে রাখিবার জন্য। উভয়ের হৃদয়েই দুর্দম ভালবাসা, উভয়েই জয়ী হইতে চায়। এরূপ যুদ্ধ জগতে বোধ করি আর কখনও হয় নাই।

অসিযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সেনজিৎ দেখিলেন, উল্কার অসি-শিক্ষা অতুলনীয়। তাহার হস্তে ঐ অসিফলক যেন জীবন্ত বিষধরের মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সেনজিৎ সাবধানে সতর্কভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শুধু বিজয়ী হইলে চলিবে না, উল্কার বরতনু অনাহত অক্ষত রাখিয়া তাহাকে পরাস্ত করিতে হইবে।

কিন্তু উল্কার হাত হইতে ঐ বিদ্যুৎশিখাটাকে কাড়িয়া লওয়াও অসম্ভব। তিনি লক্ষ্য করিলেন, উল্কাও অপূর্ব নিপুণতার সহিত তাঁহার দেহে আঘাত না করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে ; আঘাত করিবার সুযোগ পাইয়াও আঘাত করিতেছে না। বায়ু-কম্পিত পুষ্পের চারিপাশে লুব্ধ ভ্রমরের মতো উল্কার অসি তাঁহার দেহের চতুর্দিকে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে।

এইভাবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। সেনজিৎ বুঝিলেন, সহজ পন্থায় উল্কাকে পরাজিত করিতে সময় লাগিবে। তাহার দেহে এখনও ক্লান্তির চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না, নিশ্বাস স্বাভাবিকভাবে বহিতেছে ; কেবল নাসাপুট অল্প স্ফুরিত হইতেছে মাত্র। তখন তিনি মনে মনে হাসিয়া এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

সহসা যেন অসাবধানতাবশতঃই তাঁহার একটু পদস্খলন হইল। উল্কার অসির নখ তাঁহার বক্ষের নিকট আসিয়াছিল, পদস্খলনের ফলে পঞ্জরে একটা আঁচড় লাগিল। উল্কা সত্রাসে নিশ্বাস টানিল, তাহার তরবারির বিদ্যুৎগতি সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইল। সেই মুহূর্তে মহারাজ সেনজিৎ এক অপূর্ব কৌশল দেখাইলেন, তাঁহার অসি উল্কার অসির সঙ্গে জড়াইয়া গেল, তারপর তিনি ঊর্ধ্বদিকে একটু চাপ দিলেন। অমনি উল্কার হস্তমুক্ত অসি উড়িয়া গিয়া দূরে পড়িল।

মহারাজ বলিলেন—'কেমন, হইয়াছে ?'

বিস্ময়-বিমূঢ় মুখে সভয়ে দ্রুত-স্পন্দিতবক্ষে উল্কা চাহিয়া রহিল ; তারপর থরথর-দেহে কাঁপিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। এক দিকে নিজ দেহ-মন প্রিয়তমের বুকের উপর নিঃশেষে বিসর্জন করিবার দুর্নিবার ইচ্ছা, অপর দিকে প্রিয়তমের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিবার বাসনা—অন্তরের মধ্যে এই সুরাসুর দ্বন্দ্ব যখন চলিতে থাকে, তখন নারীর কাঁদিবার শক্তিও আর থাকে না। তখন গর্ব ও দীনতা, আকাঙ্ক্ষা ও নৈরাশ্য, চরম ব্যর্থতা ও পরম সিদ্ধি একসঙ্গে মিশিয়া প্রেম-নির্মথিত নারীচিত্তে যে হলাহল উত্থিত হয়, তাহা বোধ করি এ জগতের বিষকন্যারাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

উল্কা দুই বাহুতে ভর দিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। সেনজিৎ তরবারি ফেলিয়া তাহার পাশে নতজানু হইয়া বসিলেন, পৃষ্ঠে হস্ত রাখিয়া স্নেহ-ক্ষরিত কণ্ঠে বলিলেন—'উল্কা, আর তো বাধা নাই।'

শুষ্ক চক্ষু তুলিয়া উল্কা বলিল—'না, আর বাধা নাই।'

দীর্ঘকাল সে অপলক দৃষ্টিতে মহারাজের মুখ নিরীক্ষণ করিল, যেন রাক্ষসীর মতো তাঁহার প্রতি অবয়ব দুই চক্ষু দিয়া গিলিতে লাগিল। মহারাজও মুগ্ধ তন্ময় হইয়া উল্কাকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল—বক্ষে রোমাঞ্চ। তিনি ভাবিলেন—'প্রেম এত মধুর। এত দিন জানিতাম না, উল্কা, তুমি আমাকে ভালবাসিতে শিখাইলে ! উল্কা—প্রেয়সী !'

উল্কার চোখের দৃষ্টিতে যে কত কি ছিল, মহারাজ তাহা দেখিতে পাইলেন না। উল্কা তখন ভাবিতেছিল—পাইলাম না—পাইলাম না ! প্রিয়তম, তোমাকে পাইয়াও পাইলাম না !

কুঞ্জ-বাহিরে উৎকণ্ঠিতা সখীর কঙ্কণধ্বনি শুনিয়া দু'জনের বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল। উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল ; চোখ দুটি মহারাজের মুখের উপর পাতিয়া একটু হাসিল। তারপর অনুচ্চ অতি অস্ফুট স্বরে বলিল—'আজ নিশীথে বাসকগৃহে আমি মহারাজের প্রতীক্ষা করিব।'

দীপের তৈল ফুরাইয়া আসিতেছে ; আকাশে চন্দ্রও ক্ষয়িষ্ণু। বিষকন্যা উল্কার বিষদগ্ধ কাহিনী শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

নিশীথ প্রহরে মহারাজ আসিলেন। উল্কা পুষ্প-বিকীর্ণ বাসকগৃহের মধ্যস্থলে একাকী দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার হস্তে এক গুচ্ছ কমল-কোরক।

সেনজিৎ তাহাকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া লইলেন। কমল-কোরকের গুচ্ছ উভয়ে বক্ষের মাঝখানে রহিল।

'উল্কা—প্রাণময়ি—' বিপুল আবেগে উল্কার বরতনু মহারাজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার বক্ষে ঈষৎ বেদনা অনুভূত হইল। ভাবিলেন—আনন্দ-বেদনা !

উল্কা তাঁহার বক্ষে এলাইয়া পড়িল, মধুর হাসিয়া বলিল—'প্রিয়তম, তোমার বাহুবন্ধন শিথিল করিও না। এমনিভাবে আমায় মরিতে দাও।'

সেনজিৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন ; পূর্ণ মিলনের অন্তরায় কমল-কোরকগুলি ঝরিয়া পড়িল। তখন মহারাজ দেখিলেন, সূচীবৎ তীক্ষ্ণ ছুরিকা উল্কার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহারই বক্ষ-নিষ্পেষণে ছুরিকা বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সেনজিৎ উন্মত্তের মতো চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'উল্কা ! সর্বনাশী ! এ কি করিলি ?'

উল্কা তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া অনির্বচনীয় হাসি হাসিল, বলিল—'এখন অন্য কথা নয়, শুধু ভালবাসা। প্রিয়তম, আরও কাছে এস, তোমাকে ভাল দেখিতে পাইতেছি না।'

সেনজিৎ তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—'কিন্তু কেন—কেন উল্কা ? কেন এমন করিলে ?'

উল্কার মুখের হাসি ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া আসিল, চোখ দিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল :—সে অতি ক্ষীণ নির্বাপিত স্বরে বলিল—'প্রাণাধিক, আমি বিষকন্যা—'

সেবারে শিবামিশ্রের প্রতিহিংসা পূর্ণ সফলতা লাভ করিল না। সার্ধ শত বৎসর পরে একজন কুটিল ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

বহুদূর অতীতের এই বিয়োগান্ত নাটিকায় আমি—এই জাতিস্মর—কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করি নাই ; করিবার প্রয়োজনও নাই। হয়তো বিদূষক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, হয়তো রাজটীকা ললাটে ধারণ করিয়াছিলাম, কিংবা হয়তো শৃগালের দংষ্ট্রাক্ষত গণ্ডে বহন করিয়াছিলাম। পাঠক যেরূপ ইচ্ছা অনুমান করুন, আমি আপত্তি করিব না।

শুধু একটা প্রশ্ন এই সংস্কার-বর্জিত বিংশ শতাব্দীতে বসিয়া মাঝে মাঝে মনে উদয় হয়। উল্কা যদি প্রিয়প্রাণহন্ত্রী বিষকন্যাই ছিল, তবে সেনজিৎ না মরিয়া সে নিজে মরিল কেন।

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২



চন্দন-মূর্তি

১

বৌদ্ধ ভিক্ষু বলিতে যে-চিত্রটি আমাদের মনে উদয় হয়, একালের সাধারণ বাঙালীর চেহারার সঙ্গে সে-চিত্রের মোটেই মিল নাই। অথচ, যাঁহার কথা আজ লিখিতে বসিয়াছি সেই ভিক্ষু অভিরাম যে কেবল জাতিতে বাঙালী ছিলেন তাহাই নয়, তাঁহার চেহারাও ছিল নিতান্তই বাঙালীর মতো।

আরম্ভেই বলিয়া রাখা ভাল যে ভিক্ষু অভিরামের আগাগোড়া জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা আমার অভিপ্রায় নয়, থাকিলেও তাহা সম্ভব হইত না। তাঁহার বংশ বা জাতি-পরিচয় কখনও শুনি নাই, তিনি বাঙালী হইয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে কি করিয়া গিয়া পড়িলেন সে ইতিহাসও আমার কাছে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। কেবল এক বৎসরের আলাপে তাঁহার চরিত্রের যে-পরিচয়টি আমি পাইয়াছিলাম এবং একদিন অচিন্তনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া কিরূপে সেই পরিচয়ের বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া গেল, তাহাই সংক্ষেপে বাহুল্য বর্জন করিয়া পাঠকের

সম্মুখে স্থাপন করিব। আমাদের দেশ ধর্মোন্মত্ততার মল্লভূমি, ধর্মের নামে মাথা ফাটাফাটি অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষু অভিরামের হৃদয়ে এই ধর্মানুরাগ যে বিচিত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই এবং পরে যে আর দেখিব সে সম্ভাবনাও অল্প।

ভিক্ষু অভিরামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে। বছর-চারেক আগেকার কথা, তখন আমি সবেমাত্র বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিয়াছি। একখানা দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধ পুস্তক খুঁজিতে গিয়া দেখিলাম তিনি পূর্ব হইতে সেখানা দখল করিয়া বসিয়া আছেন।

ক্রমে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। শীর্ণকায় মুণ্ডিতশির লোকটি, দেহের বস্ত্রাদি ঈষৎ পীতবর্ণ, বয়স বোধ করি চল্লিশের নীচেই। কথাবার্তা খুব মিষ্ট, হাসিটি শীর্ণ মুখে লাগিয়াই আছে; আমাদের দেশের সাধারণ উদাসী সম্প্রদায়ের মতো একটি নির্লিপ্ত অনাসক্ত ভাব। তবু তাঁহাকে সাধারণ বলিয়া অবহেলা করা যায় না। চোখের মধ্যে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, একটা প্রবল দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা সদাসর্বদা সেখানে জ্বলিতেছে। জটা কৌপীন কিছুই নাই; তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের 'পরশপাথরে'র সেই ক্ষ্যাপাকে মনে পড়িয়া যায়—

ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত-হেন
উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।

বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু বর্তমান কালে থাকিতে পারে এ কল্পনা পূর্বে মনে স্থান পায় নাই, তাই প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। ক্রমশ আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। তিনি সময়ে অসময়ে আমার বাড়িতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান যেরূপ গভীর ছিল, বৌদ্ধ ইতিহাসে ততটা ছিল না। তাই বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে কোনও নূতন কথা জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ আমাকে আসিয়া জানাইতেন। আমার ঐতিহাসিক গবেষণা সম্বন্ধেও তাঁহার ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না; ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থির হইয়া বসিয়া আমার বক্তৃতা শুনিয়া যাইতেন, আর তাঁহার চোখে সেই খদ্যোত-আলোক জ্বলিতে থাকিত।

খাদ্যাদি বিষয়ে তাঁহার কোনও বিচার ছিল না। আমার বাড়িতে আসিলে গৃহিণী প্রায় ভক্তিভরে তাঁহাকে খাওয়াইতেন; তিনি নির্বিবাদে মাছ মাংস সবই গ্রহণ করিতেন। আমি একদিন প্রশ্ন করায় তিনি ক্ষীণ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ভিক্ষু, ভিক্ষাপাত্রে যে যা দেবে তাই আমাকে খেতে হবে, বাছ-বিচার করবার তো আমার অধিকার নেই। তথাগতের পাতে একদিন তাঁর এক শিষ্য শূকর-মাংস দিয়েছিল, তিনি তাও খেয়েছিলেন।' ভিক্ষুর দুই চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া গিয়াছিল।

প্রায় ছয়-সাত মাস কাটিয়া যাইবার পর একদিন তাঁহার প্রাণের অন্তরতম কথাটি জানিতে পারিলাম। আমার বাড়িতে বসিয়া বৌদ্ধ শিল্প আলোচনা হইতেছিল। ভিক্ষু অভিরাম বলিতেছিলেন, 'ভারতে এবং ভারতের বাইরে কোটি কোটি বুদ্ধমূর্তি আছে। কিন্তু সবগুলিই তাঁর ভাব-মূর্তি। ভক্ত-শিল্পী যে ভাবে ভগবান তথাগতকে কল্পনা করেছে, পাথর কেটে তাঁর সেই মূর্তিই গড়েছে। বুদ্ধের সত্যিকার আকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না।'

আমি বলিলাম, 'আমার তো মনে হয়, ছিল। আপনি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় যে, সব বুদ্ধমূর্তিরই ছাঁচ প্রায় এক রকম। অবশ্য অল্পবিস্তর তফাৎ আছে, কিন্তু মোটের উপর একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়—কান বড়, মাথায় কোঁকড়া চুল, ভারী গড়ন—এগুলো সব মূর্তিতেই আছে। এর কারণ কি ? নিশ্চয় তাঁর প্রকৃত চেহারা সম্বন্ধে শিল্পীদের জ্ঞান ছিল, নইলে কেবল কাল্পনিক

মূর্তি হলে এতটা সাদৃশ্য আসতে পারত না। একটা বাস্তব মডেল তাদের ছিলই।'

গভীর মনঃসংযোগে আমার কথা শুনিয়া ভিক্ষু অভিরাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'কি জানি। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে তাঁর মূর্তি গঠিত হয়নি, তখন ভাস্কর্যের প্রচলন ছিল না। বুদ্ধমূর্তির বহুল প্রচলন হয়েছে গুপ্ত-যুগ থেকে, খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, অর্থাৎ বুদ্ধ-নির্বাণের প্রায় সাত-শ' বছর পরে। এই সাত-শ' বছর ধরে তাঁর আকৃতির স্মৃতি মানুষ কি করে সঞ্জীবিত রেখেছিল ? বৌদ্ধ শাস্ত্রেও তাঁর চেহারার এমন কোনও বর্ণনা নেই যা থেকে তাঁর একটা স্পষ্ট চিত্র আঁকা যেতে পারে। আপনি যে সাদৃশ্যের কথা বলছেন, সেটা সম্ভবত শিল্পের একটা কনভেনশ্যন—প্রথমে একজন প্রতিভাবান্ শিল্পী তাঁর ভাব-মূর্তি গড়েছিলেন, তারপর যুগপরম্পরায় সেই মূর্তিরই অনুকরণ হয়ে আসছে।' ভিক্ষু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, 'না—তাঁর সত্যিকার চেহারা মানুষ ভুলে গেছে।—টুটেনখামেন আমেন-হোটেপের শিলা-মূর্তি আছে, কিন্তু বোধিসত্ত্বের দিব্য দেহের প্রতিমূর্তি নেই।'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, মানুষের স্মৃতির উপর যাদের কোনও দাবি নেই তারাই পাথরে নিজেদের প্রতিমূর্তি খোদাই করিয়ে রেখে গেছে, আর যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কেবল মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমর হয়ে আছেন। এই দেখুন না, যীশুখ্রীস্টের প্রকৃত চেহারা যে কি রকম ছিল তা কেউ জানে না।'

তিনি বলিলেন, 'ঠিক। অথচ কত হাজার হাজার লোক তাঁর গায়ের একটা জামা দেখবার জন্য প্রতি বৎসর তীর্থযাত্রা করছে। তারা যদি তাঁর প্রকৃত প্রতিমূর্তির সন্ধান পেত, কি করত বলুন দেখি। বোধ হয় আনন্দে পাগল হয়ে যেত।'

এই সময় তাঁহার চোখের দিকে আমার নজর পড়িল। ইংরাজীতে যাহাকে ফ্যানাটিক বলে, এ সেই তাহারই দৃষ্টি। যে উগ্র একাগ্রতা মানুষকে শহীদ করিয়া তোলে, তাঁহার চোখে সেই সর্বগ্রাসী তন্ময়তার আগুন জ্বলিতেছে। চক্ষু দুটি আমার পানে চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু তাঁহার মন যেন আড়াই হাজার বৎসরের ঘন কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া এক দিব্য পুরুষের জ্যোতির্ময় মূর্তি সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

তিনি হঠাৎ বলিতে লাগিলেন, 'ভগবান বুদ্ধের দন্ত কেশ নখ দেখেছি ; কিছু দিনের জন্য এক অপরূপ আনন্দের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলুম। কিন্তু তবু তাতে মন ভরল না। কেমন ছিল তাঁর পূর্ণাবয়ব দেহ ? কেমন ছিল তাঁর চোখের দৃষ্টি ? তাঁর কণ্ঠের বাণী—যা শুনে একদিন রাজা সিংহাসন ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, গৃহস্থ-বধূ স্বামী-পুত্র ছেড়ে ভিক্ষুণী হয়েছিল—সেই কণ্ঠের অমৃতময় বাণী যদি একবার শুনতে পেতুম—'

দুর্দম আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দেখিলাম, তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, অজ্ঞাতে দুই শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম ; এত অল্প কারণে এতখানি ভাবাবেশ কখনও সম্ভব মনে করি নাই। শুনিয়াছিলাম বটে, কৃষ্ণনাম শুনিবামাত্র কোনও কোনও বৈষ্ণবের দশা উপস্থিত হয়, বিশ্বাস করিতাম না ; কিন্তু ভিক্ষুর এই অপূর্ব ভাবোন্মাদনা দেখিয়া আর তাহা অসম্ভব বোধ হইল না। ধর্মের এ-দিকটা কোনও দিন প্রত্যক্ষ করি নাই ; আজ যেন হঠাৎ চোখ খুলিয়া গেল।

ভিক্ষু বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে বলিতে লাগিলেন, 'গৌতম ! তথাগত ! আমি অর্হত্ত্ব চাই না, নির্বাণ চাই না,—একবার তোমার স্বরূপ আমাকে দেখাও। যে-দেহে তুমি এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে সেই দেব-দেহ আমাকে দেখাও। বুদ্ধ, তথাগত—'

বুঝিলাম বৌদ্ধ ধর্ম নয়, স্বয়ং সেই কালজয়ী মহাপুরুষ ভিক্ষু অভিরামকে উন্মাদ করিয়াছেন।

পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির আসিলাম। এই আত্মহারা ব্যাকুলতা বসিয়া দেখিতে পারিলাম না, মনে হইতে লাগিল যেন অপরাধ করিতেছি।

২

ধর্মোন্মত্ততা বস্তুটা সংক্রামক। আমার মধ্যেও বোধ হয় অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই, উল্লিখিত ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ এক জায়গায় আসিয়া দৃষ্টি আটকাইয়া গেল; আনন্দ ও উত্তেজনায় একেবারে লাফাইয়া উঠিলাম। ফা-হিয়ান পূর্বেও পড়িয়াছি, কিন্তু এ-জিনিস চোখে ঠেকে নাই কেন?

সেইদিন অপরাহ্নে ভিক্ষু অভিরাম আসিলেন। উত্তেজনা দমন করিয়া বইখানা তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি উৎসুকভাবে বলিলেন, 'কি এ?'

'পড়ে দেখুন' বলিয়া একটা পাতা নির্দেশ করিয়া দিলাম। ভিক্ষু পড়িতে লাগিলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"বৈশালী হইতে দ্বাদশ শত পদ দক্ষিণে বৈশ্যাধিপতি সুদত্ত দক্ষিণাভিমুখী একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিহারের বামে ও দক্ষিণে স্বচ্ছ বারিপূর্ণ পুষ্করিণী বহু বৃক্ষ ও নানাবর্ণ পুষ্পে অপূর্ব শোভা ধারণ করে। ইহাই জেতবন-বিহার।

"বুদ্ধদেব যখন ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর হিতার্থে নব্বই দিবস ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তখন প্রসেনজিৎ তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠে তাঁহার এক মূর্তি প্রস্তুত করিয়া যে-স্থানে তিনি সাধারণত উপবেশন করিতেন তথায় স্থাপন করিলেন. বুদ্ধদেব স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন করিলে এই মূর্তি বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য স্বস্থান পরিত্যাগ করিল। বুদ্ধদেব তখন মূর্তিকে কহিলেন, 'তুমি স্বস্থানে প্রতিগমন কর; আমার নির্বাণ লাভ হইলে তুমি আমার চতুর্বর্গ শিষ্যের নিকটে আদর্শ হইবে।' এই বলিলে মূর্তি প্রত্যাবর্তন করিল। এই মূর্তিই বুদ্ধদেবের সর্বাপেক্ষা প্রথম মূর্তি এবং ইহা দৃষ্টেই পরে অন্যান্য মূর্তি নির্মিত হইয়াছে।

"বুদ্ধ-নির্বাণের পরে এক সময় আগুন লাগিয়া জেতবন-বিহার ভস্মীভূত হয়। নরপতিগণ ও তাঁহাদের প্রজাবর্গ চন্দন-মূর্তি ধ্বংস হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হন; কিন্তু চারি-পাঁচ দিন পরে পূর্বপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র বিহারের দ্বার উন্মুক্ত হইলে চন্দন-মূর্তি দৃষ্ট হইল। সকলে উৎফুল্ল হৃদয়ে একত্র হইয়া বিহার পুনর্নির্মাণে ব্রতী হইল। দ্বিতল নির্মিত হইলে তাহারা প্রতিমূর্তিকে পূর্বস্থানে স্থাপন করিল।..."

তন্দ্রামূঢ়ের ন্যায় চক্ষু পুস্তক হইতে তুলিয়া ভিক্ষু আমার পানে চাহিলেন, অস্পষ্ট স্খলিতস্বরে বলিলেন, 'কোথায় সে মূর্তি?'

আমি বলিলাম, 'জানি না। চন্দন-মূর্তির উল্লেখ আর কোথাও দেখেছি বলে তো স্মরণ হয় না।'

অতঃপর দীর্ঘকাল আবার দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এই ক্ষুদ্র তথ্যটি ভিক্ষুর অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত নাড়া দিয়া আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে তাহা অনুমানে বুঝিতে পারিলাম। আমি বোধ হয় মনে মনে তাঁহার নিকট হইতে আনন্দের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস প্রত্যাশা করিয়াছিলাম: এইভাবে অভাবিতের সম্মুখীন হইয়া তিনি কি বলিবেন কি করিবেন তাহা প্রত্যক্ষ করিবার কৌতূহলও ছিল। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না; প্রায় আধ ঘণ্টা নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষে সেই সদ্যনিদ্রোত্থিতের অভিভূত দৃষ্টি—কোনও দিকে

দৃক্‌পাত করিলেন না, নিশির ডাক শুনিয়া ঘুমন্ত মানুষ যেমন শয্যা ছাড়িয়া একান্ত অবশে চলিয়া যায়, তেমনি ভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তারপর তিন মাস আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না।

হঠাৎ পৌষের মাঝামাঝি একদিন তিনি মূর্তিমান ভূমিকম্পের মতো আসিয়া আমার স্থাবরতার পাকা ভিত এমনভাবে নাড়া দিয়া আল্‌গা করিয়া দিলেন যে তাহা পূর্বাহ্ণে অনুমান করাও কঠিন। অন্তত আমি যে কোনও দিন এমন একটা দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হইয়া পড়িব তাহা সন্দেহ করিতেও আমার কুণ্ঠা বোধ হয়।

তিনি বলিলেন, 'সন্ধান পেয়েছি।'

আমি সানন্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম, 'আসুন—বসুন।'

তিনি বসিলেন না, উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'পেয়েছি বিভূতিবাবু, সে মূর্তি হারায়নি, এখনও আছে।'

'সে কি, কোথায় পেলেন?'

'পাইনি এখনও। প্রাচীন বৈশালীর ভগ্নাবশেষ যেখানে পড়ে আছে সেই 'বেসাড়ে' গিয়েছিলুম। জেতবন-বিহারের কিছুই নেই, কেবল ইট আর পাথরের স্তূপ। তবু তারই ভেতর থেকে আমি সন্ধান পেয়েছি—সে মূর্তি আছে।'

'কি করে সন্ধান পেলেন?'

'এক শিলালিপি থেকে। একটা ভাঙা মন্দির থেকে একটা পাথর খসে পড়েছিল—তারই উল্টো পিঠে এই লিপি খোদাই করা ছিল।' এক খণ্ড কাগজ আমাকে দিয়া উত্তেজনা-অবরুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'জেতবন-বিহার ধ্বংস হয়ে যাবার পর বোধ হয় তারই পাথর দিয়ে ঐ মন্দির তৈরি হয়েছিল; মন্দিরটাও পাঁচ-ছ-শ' বছরের পুরনো, এখন তাতে কোনও বিগ্রহ নেই।—একটা বিরাট অশথ্ গাছ তাকে অজগরের মতো জড়িয়ে তার হাড়-পাঁজর গুঁড়ো করে দিচ্ছে—পাথরগুলো খসে খসে পড়ছে। তারই একটা পাথরে এই লিপি খোদাই করা ছিল।'

কাগজখানা তাঁর হাত হইতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম; অনুমান দশম কি একাদশ শতাব্দীর প্রাকৃত ভাষায় লিখিত লিপি, ভিক্ষু অবিকল নকল করিয়া আনিয়াছেন।

পাঠোদ্ধার করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। শিলালেখের অর্থ এইরূপ—

"হায় তথাগত! সদ্ধর্মের আজ মহা দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। যে জেতবন-বিহারে তুমি পঞ্চবিংশ বর্ষ যাপন করিয়াছ তাহার আজ কি শোচনীয় দুর্দশা! গৃহিগণ আর তোমার শ্রমণদিগকে ভিক্ষা দান করে না; রাজগণ বিহারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। পৃথিবীর প্রান্ত হইতে শিক্ষার্থিগণ আর বিনয় ধর্ম-সূত্ত অধ্যয়নের জন্য বিহারে আগমন করে না। তথাগতের ধর্মের গৌরব-মহিমা অস্তমিত হইয়াছে।

"তদুপরি সম্প্রতি দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। কিছুকাল যাবৎ চারিদিক হইতে জনশ্রুতি আসিতেছে, তুরুস্ক নামক এক অতি বর্বর জাতি রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহারা বিধর্মী ও অতিশয় নিষ্ঠুর; ভিক্ষু-শ্রমণ দেখিলেই নৃশংসভাবে হত্যা করিতেছে এবং বিহার-সঙ্ঘাদি লুণ্ঠন করিতেছে।

"এই সকল জনরব শুনিয়া ও তুরুস্কগণ কর্তৃক আক্রান্ত কয়েক জন মুমূর্ষু পলাতক শ্রমণকে দেখিয়া জেতবন-বিহারের মহাথের বুদ্ধরক্ষিত মহাশয় অতিশয় বিচলিত হইয়াছেন। তুরুস্কগণ এই দিকেই আসিতেছে, অবশ্যই বিহার আক্রমণ করিবে। বিহারের অধিবাসিগণ অহিংসধর্মী, অস্ত্রচালনায় অপারগ। বিহারে বহু অমূল্য রত্নাদি সঞ্চিত আছে; সর্বাপেক্ষা অমূল্য রত্ন আছে,

গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠে নির্মিত বুদ্ধমূর্তি—যাহা ভগবান তথাগতের জীবিতকালে প্রসেনজিৎ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তুরুস্কের আক্রমণ হইতে এ সকল কে রক্ষা করিবে?

"মহাথের বুদ্ধরক্ষিত তিন দিবস অহোরাত্র চিন্তা করিয়া উপায় স্থির করিয়াছেন। আগামী অমাবস্যার মধ্যযামে দশ জন শ্রমণ বিহারস্থ মণিরত্ন ও অমূল্য গ্রন্থ সকল সহ ভগবানের চন্দন-মূর্তি লইয়া প্রস্থান করিবে। বিহার হইতে বিংশ যোজন উত্তর হিমালয়ের সানু-নিষ্ঠ্যুত উপলা নদীর প্রস্রবণ মুখে এক দৈত্য-নির্মিত পাষাণ-স্তম্ভ আছে; এই গগনলেহী স্তম্ভের শীর্ষদেশে এক গোপন ভাণ্ডার আছে। কথিত আছে যে, অসুর-দেশীয় দৈত্যগণ দেবপ্রিয় ধর্মাশোকের কালে হিমালয়ের স্পন্দনশীল জঙ্ঘাপ্রদেশে ইহা নির্মাণ করিয়াছিল। শ্রমণগণ চন্দন-মূর্তি ও অন্যান্য মহার্ঘ বস্তু এই গুপ্ত স্থানে লইয়া গিয়া রক্ষা করিবে। পরে তুরুস্কের উৎপাত দূর হইলে তাহারা আবার উহা ফিরাইয়া আনিবে।

"যদি তুরুস্কের আক্রমণে বিহার ধ্বংস হয়, বিহারবাসী সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় মহাথের মহাশয়ের আজ্ঞাক্রমে পরবর্তীদিগের অবগতির জন্য অদ্য কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর দিবসে এই লিপি উৎকীর্ণ হইল। ভগবান বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

এইখানে লিপি শেষ হইয়াছে। লিপি পড়িতে পড়িতে আমার মনটাও অতীতের আবর্তে গিয়া পড়িয়াছিল; আট শত বৎসর পূর্বে জেতবন-বিহারের নিরীহ ভিক্ষুদের বিপদ-ছায়াচ্ছন্ন ত্রস্ত চঞ্চলতা যেন অস্পষ্টভাবে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিলাম; বিচক্ষণ প্রবীণ মহাস্থবির বুদ্ধরক্ষিতের গম্ভীর বিষণ্ণ মুখচ্ছবিও চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছিল। ভারতের ভাগ্যবিপর্যয়ের একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ যেন ঐ লিপির সাহায্যে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য চলচ্ছায়ার মতো প্রত্যক্ষ করিয়া লইলাম। দেশব্যাপী সন্ত্রাস! শান্তিপ্রিয় নির্বীর্য জাতির উপর সহসা দুরন্ত দুর্মদ বিদেশীর অভিযান! 'তুরুস্ক! তুরুস্ক! ঐ তুরুস্ক আসিতেছে!' ভীত কণ্ঠের সহস্র সমবেত আর্তনাদ আমার কর্ণে বাজিতে লাগিল।

তারপর চমক ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম ভিক্ষু অভিরামের চোখে ক্ষুধিত উল্লাস। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, 'মহাস্থবির বুদ্ধরক্ষিতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—কিন্তু কত বিলম্বে!'

তিনি প্রদীপ্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'হোক বিলম্ব। তবু এখনও সময় অতীত হয়নি। আমি যাব বিভূতিবাবু। সেই অসুর-নির্মিত পাষাণ-স্তম্ভ খুঁজে বার করব। কিছু সন্ধানও পেয়েছি—উপলা নদীর বর্তমান নাম জানতে পেরেছি।—বিভূতিবাবু, দেড় হাজার বছর আগে চৈনিক পরিব্রাজক কোরিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে গোবি মরুভূমি পার হয়ে দুস্তর হিমালয় লঙ্ঘন করে পদব্রজে ভারতভূমিতে আসতেন। কি জন্যে? কেবল বুদ্ধ তথাগতের জন্মভূমি দেখবার জন্যে! আর, আমাদের বিশ যোজনের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের স্বরূপ-মূর্তি রয়েছে, জানতে পেরেও আমরা তা খুঁজে বার করতে পারব না?'

আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় পারবেন।'

ভিক্ষু তাঁহার বিদ্যুদ্বহ্নিপূর্ণ চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া এক প্রচণ্ড প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'বিভূতিবাবু, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না?'

ক্ষণকালের জন্য হতবাক্ হইয়া গেলাম। আমি যাইব! কাজকর্ম ফেলিয়া পাহাড়ে-জঙ্গলে এই মায়ামৃগের অন্বেষণে আমি কোথায় যাইব!

ভিক্ষু স্পন্দিতস্বরে বলিলেন, 'আট-শ' বছরের মধ্যে সে দিব্যমূর্তি কেউ দেখেনি। ভগবান শাক্যসিংহ আট শতাব্দী ধরে সেই স্তম্ভশীর্ষে আমাদেরই প্রতীক্ষা করেছেন—আপনি যাবেন না?'

ভিক্ষুর কথার মধ্যে কি ছিল জানি না, কিন্তু মজ্জাগত বহির্বিমুখতা ও বাঙালী-সুলভ ঘরের টান যেন সঙ্গীতযন্ত্রের উচ্চ সপ্তকের তারের মতো সুরের অসহ্য স্পন্দনে ছিঁড়িয়া গেল। আমি উঠিয়া ভিক্ষুকের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'আমি যাব।'

৩

এই আখ্যায়িকা যদি আমাদের হিমাচল-অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী হইত তাহা হইলে বোধ করি নানা বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা করিয়া পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু এ-গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে অবান্তর কথার স্থান নাই। দৈত্য-নির্মিত স্তম্ভ অন্বেষণের পরিসমাপ্তিটুকু বর্ণনা করিয়াই আমাকে নিবৃত্ত হইতে হইবে।

কলিকাতা হইতে যাত্রা শুরু করিবার দুই সপ্তাহ পরে একদিন অপরাহ্ণে যে ক্ষুদ্র জনপদটিতে পৌঁছিলাম তাহা মনুষ্য-লোকালয় হইতে এত উর্ধ্বে ও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত যে হিমালয়-কুক্ষিস্থিত ঈগল পাখির বাসা বলিয়া ভ্রম হয়। তখনও বরফের এলাকায় আসিয়া পৌঁছাই নাই; কিন্তু সম্মুখেই হিমাদ্রির তুষারশুভ্র দেহ আকাশের একটা দিক্ আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। আশেপাশে পিছনে চারিদিকেই নগ্ন পাহাড়, পায়ের তলায় পাহাড়ী কাঁকর ও উপলখণ্ড। এই উপলাকীর্ণ কঠিন ভূমি চিরিয়া তন্বী উপলা নদী খরধারে নিম্নাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে বাতাসে একটা জমাট শীতলতা।

আমরা তিন জন—আমি, ভিক্ষু অভিরাম ও একজন ভুটিয়া পদপ্রদর্শক—গ্রামের নিকটবর্তী হইতেই গ্রামের সমস্ত স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বহির্জগতের মানুষ এখানে কখনও আসে না; ইহারা সুবর্তুল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

চেহারা দেখিয়া মনে হইল—ইহারা লেপ্চা কিংবা ভুটানী। আর্য রক্তের সংমিশ্রণও সামান্য আছে: দুই-একটা খড়্গের মতো তীক্ষ্ণ নাক চোখে পড়িল।

এইরূপ খড়্গ-নাসিক একজন প্রৌঢ়গোছের লোক আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিজ ভাষায় কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের ভুটানী সহচর বুঝাইয়া দিল, ইনি গ্রামের মোড়ল, আমরা কি জন্য আসিয়াছি জানিতে চাহেন।

আমরা সরলভাবে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া লোকটির চোখে মুখে প্রথমে বিস্ময়, তারপর প্রবল কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। সে আমাদের আহ্বান করিয়া গ্রামে লইয়া চলিল।

মিছিল করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। অগ্রে মোড়ল, তাহার পিছনে আমরা তিন জন ও সর্বশেষে গ্রামের আবালবৃদ্ধ নরনারী।

একটি কুটিরের মধ্যে লইয়া গিয়া মোড়ল আমাদের বসাইল, আমরা ক্লান্ত ও ক্ষুৎপীড়িত দেখিয়া আহার্য দ্রব্য আনিয়া অতিথিসৎকার করিল। অতঃপর তৃপ্ত ও বিশ্রান্ত হইয়া দোভাষী ভুটিয়া মারফৎ বাক্যালাপ আরম্ভ করিলাম। সূর্য তখন পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে; হিমালয়ের সুদীর্ঘ সন্ধ্যা যেন স্বচ্ছ বাতাসে অলক্ষিত কুঙ্কুমবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে।

মোড়ল বলিল, গ্রাম হইতে চার ক্রোশ উত্তরে উপলা নদীর প্রপাত—ঐ প্রপাত হইতেই নদী আরম্ভ। ঐ স্থান অতিশয় দুর্গম ও দুরারোহ; উপলার অপর পারে প্রপাতের ঠিক মুখের উপর একটি স্তম্ভের মতো পর্বতশৃঙ্গ আছে, উহাই বুদ্ধস্তম্ভ নামে খ্যাত। গ্রামবাসীরা প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে

বুদ্ধস্তম্ভকে উদ্দেশ করিয়া পূজা দিয়া থাকে। কিন্তু সে স্থান দুরধিগম্য বলিয়া সেখানে কেহ যায় না, গ্রামের নিকটে উপলা নদীর স্রোতে পূজা ভাসাইয়া দেয়।

ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন, উপলা পার হইয়া স্তম্ভের নিকটবর্তী হইবার পথ কোথায় ? মোড়ল মাথা নাড়িয়া জানাইল, পথ আছে বটে, কিন্তু তাহা এত বিপজ্জনক যে সে-পথে কেহ পার হইতে সাহস করে না। উপলার প্রপাতের নীচেই একটি প্রাচীন লৌহ-শৃঙ্খলের ঝোলা বা দোদুল্যমান সেতু দুই তীরকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহা কালক্রমে এত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার উপর দিয়া মানুষ যাইতে পারে না। অথচ উহাই একমাত্র পথ।

আমাদের গন্তব্য স্থানে যে পৌঁছিয়াছি তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তবু নিঃসংশয় হইবার অভিপ্রায়ে মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওই স্তম্ভে কি আছে তাহা কেহ বলিতে পারে কি না। মোড়ল বলিল, কি আছে তাহা কেহ চোখে দেখে নাই, কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে বুদ্ধদেব স্বয়ং সশরীরে এই স্তম্ভে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার দেহ হইতে নিরন্তর চন্দনের গন্ধ নির্গত হয় ;—পাঁচ হাজার বৎসর পরে আবার মৈত্রেয়-রূপ ধারণ করিয়া তিনি এই স্থান হইতে বাহির হইবেন।

ভিক্ষু আমার পানে প্রোজ্জ্বল চক্ষু চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বুদ্ধদেব সশরীরে এই স্তম্ভে আছেন, তাহার দেহ থেকে চন্দনের গন্ধ নির্গত হয়—প্রবাদের মানে বুঝতে পারছেন ? যে-শ্রমণরা বুদ্ধমূর্তি এনেছিল, তারা সম্ভবত ফিরে যেতে পারেনি—এই গ্রামেই হয়তো থেকে গিয়েছিল—'

ভিক্ষুর কথা শেষ হইতে পাইল না। এই সময় আমাদের কুটির হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া মড়মড় করিয়া উঠিল। আমরা মেঝের উপর বসিয়া ছিলাম, আমাদের নিম্নে মাটির ভিতর দিয়াও একটা কম্পন শিহরিয়া উঠিল। আমিও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম—'ভূমিকম্প !'

আমরা উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে ভূমিকম্পের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছিল। মোড়ল নিশ্চিন্তমনে মেঝেয় বসিয়া ছিল, আমাদের ত্রাস দেখিয়া সে মৃদুহাস্যে জানাইল যে ভয়ের কোনও কারণ নাই ; এরূপ ভূমিকম্প এখানে প্রত্যহ চার-পাঁচ বার হইয়া থাকে, এ দেশের নামই ভূমিকম্পের জন্মভূমি।

আমরা অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ভূমিকম্পের জন্মভূমি ! এমন কথা তো কখনও শুনি নাই। —তখনও জানিতাম না কি ভীষণ দুর্দান্ত সন্তান প্রসব করিবার জন্য সে উদ্যত হইয়া আছে।

ভিক্ষু অভিরাম কিন্তু উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক ! ঠিক ! শিলালিপিতে যে এ কথার উল্লেখ আছে—মনে নেই ?'

শিলালিপিতে ভূমিকম্পের উল্লেখ কোথায় আছে স্মরণ করিতে পারিলাম না। ভিক্ষু তখন ঝোলা হইতে শিলালেখের অনুলিপি বাহির করিয়া উল্লসিত স্বরে কহিলেন, 'আর সন্দেহ নেই বিভূতিবাবু, আমরা ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছি। —এই শুনুন।' বলিয়া তিনি মূল প্রাকৃতে লিপির সেই অংশ পড়িয়া শুনাইলেন—কথিত আছে যে, অসুর-দেশীয় দৈত্যগণ দেবপ্রিয় ধর্মাশোকের কালে হিমালয়ের স্পন্দনশীল জঙ্ঘাপ্রদেশে ইহা নির্মাণ করিয়াছিল।

মনে পড়িয়া গেল। স্পন্দনশীল জঙ্ঘাপ্রদেশ কথাটাকে আমি নিরর্থক বাগাড়ম্বর মনে করিয়াছিলাম, উহার মধ্যে যে ভূমিকম্পের ইঙ্গিত নিহিত আছে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন, ও-কথাগুলো আমি ভাল করে লক্ষ্য করিনি। এ জায়গাটা বোধ হয় শিলঙের মতো ভূমিকম্পের রাজ্য—'

এই সময় মোড়লের দিকে নজর পড়িল। সে হঠাৎ ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষুদ্র

তির্যক চক্ষু জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, ঠোঁট দুইটা যেন কি একটা বলিবার জন্য বিভক্ত হইয়া আছে। তারপর সে আমাদের ধাঁধা লাগাইয়া পরিষ্কার প্রাকৃত ভাষায় বলিয়া উঠিল, 'শ্রবণ কর। সূর্য যে-সময় উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে পদার্পণ করিবেন সেই সময় বুদ্ধস্তম্ভের রন্ধ্রপথে সূর্যালোক প্রবেশ করিয়া তথাগতের দিব্যদেহ আলোকিত করিবে, মন্ত্রবলে স্তম্ভের দ্বার খুলিয়া যাইবে। উপর্যুপরি তিন দিন এইরূপ হইবে, তারপর এক বৎসরের জন্য দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। হে ভক্ত শ্রমণ, যদি বুদ্ধের অলৌকিক মুখচ্ছবি দেখিয়া নির্বাণের পথ সুগম করিতে চাও, এ কথা স্মরণ রাখিও।' এক নিশ্বাসে এতখানি বলিয়া মোড়ল হাঁপাইতে লাগিল।

তীব্র বিস্ময়ে ভিক্ষু বলিলেন, 'তুমি—তুমি প্রাকৃত ভাষা জান?'

মোড়ল বুঝিতে না পারিয়া মাথা নাড়িল।

তখন ভুটানী সহচরের সাহায্য লইতে হইল। দোভাষী-প্রমুখাৎ মোড়ল জানাইল, ইহা তাহাদের কৌলিক মন্ত্র : পুরুষপরম্পরায় ইহা তাহাদের কণ্ঠস্থ করিতে হয়, কিন্তু মন্ত্রের অর্থ কি তাহা সে জানে না। আজ ভিক্ষুকে ঐ ভাষায় কথা কহিতে শুনিয়া সে উত্তেজিত হইয়া উহা উচ্চারণ করিয়াছে।

আমরা পরস্পরের মুখের পানে তাকাইলাম।

ভিক্ষু মোড়লকে বলিলেন, 'তোমার মন্ত্র আর একবার বল।'

মোড়ল দ্বিতীয় বার ধীরে ধীরে মন্ত্র আবৃত্তি করিল। ব্যাপারটা সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। এ মন্ত্র নয়—বুদ্ধস্তম্ভে প্রবেশ করিবার নির্দেশ। বৎসরের মধ্যে তিন দিন সূর্যালোকের উত্তাপ রন্ধ্রপথে স্তম্ভের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সম্ভবত কোনও যন্ত্রকে উত্তপ্ত করে, ফলে যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত দ্বার খুলিয়া যায়। প্রাচীন মিশর ও আসীরিয়ায় এইরূপ কলকব্জার সাহায্যে মন্দিরদ্বার খুলিয়া মন্দিরের ভণ্ড পূজারিগণ অনেক বুজরুকি দেখাইত—পুস্তকে পড়িয়াছি স্মরণ হইল। এই স্তম্ভের নির্মাতাও অসুর—অর্থাৎ আসীরীয় শিল্পী ; সুতরাং অনুরূপ কলকব্জার দ্বারা উহার প্রবেশদ্বারের নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব নয়। যে-শ্রমণগণ বুদ্ধমূর্তি লইয়া এখানে আসিয়াছিল তাহারা নিশ্চয় এ রহস্য জানিত ; পাছে ভবিষ্য বংশ ইহা ভুলিয়া যায় তাই এ মন্ত্র রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

কিন্তু মোড়ল এ মন্ত্র জানিল কিরূপে?

তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিলাম। মুখের আদল প্রধানত মঙ্গোলীয় ছাঁদের হইলেও নাসিকা, ভ্রূ ও চিবুকের গঠন আর্য-লক্ষণযুক্ত। শ্রমণগণ ফিরিয়া যাইতে পারে নাই ; তাহাদের দশ জনের মধ্যে কাহারও হয়তো পদস্খলন হইয়াছিল। এই মোড়ল সেই ধর্মচ্যুত শ্রমণের অধস্তন পুরুষ—পূর্বপুরুষের ইতিহাস সব ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল শূন্যগর্ভ কবচের মতো কৌলিক মন্ত্রটি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে।

চমক ভাঙিয়া স্মরণ হইল বৎসরের মধ্যে মাত্র তিনটি দিন স্তম্ভের দ্বার খোলা থাকে, তারপর বন্ধ হইয়া যায়। সে তিন দিন কবে? কতদিন দ্বার খোলার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে হইবে?

ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে সূর্য কবে পদার্পণ করবেন?'

ভিক্ষু ঝোলা হইতে পাঁজি বাহির করিলেন। প্রায় পনর মিনিট গভীর তন্ময়তার সহিত পাঁজি দেখিয়া মুখ তুলিলেন। দেখিলাম তাঁহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছে, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। তিনি বলিলেন, 'কাল পয়লা মাঘ ; সূর্য উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে পদার্পণ করবেন—। কি অলৌকিক সংঘটন! যদি তিন দিন পরে এসে পৌঁছতুম—' তাঁহার কণ্ঠস্বর থরথর করিয়া কাঁপিয়া গেল, অস্ফুট বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'তথাগত!'

কী সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতার উপান্তে আসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, ভাবিয়া আমার দেহও কাঁটা দিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম, 'তথাগত, তোমার ভিক্ষুর মনস্কাম যেন ব্যর্থ না হয়।'

৪

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা স্তম্ভ-অভিমুখে যাত্রা করিলাম, মোড়ল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সঙ্গে চলিল।

গ্রামের সীমানা পার হইয়াই পাহাড় ধাপে ধাপে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্থানে স্থানে চড়াই এত দুরূহ যে হস্তপদের সাহায্যে অতি কষ্টে আরোহণ করিতে হয়। পদে পদে পা ফস্কাইয়া নিম্নে গড়াইয়া পড়িবার ভয়।

ভিক্ষুর মুখে কথা নাই; তাঁহার ক্ষীণ শরীরে শক্তিরও যেন সীমা নাই। সর্বাগ্রে তিনি চলিয়াছেন, আমরা তাঁহার পশ্চাতে কোনওক্রমে উঠিতেছি। তিনি যেন তাঁহার অদম্য উৎসাহের রজ্জু দিয়া আমাদের টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

তবু পথে দু'-বার বিশ্রাম করিতে হইল। আমার সঙ্গে একটা বাইনোকুলার ছিল, তাহারই সাহায্যে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। বহু নিম্নে ক্ষুদ্র গ্রামটি খেলাঘরের মতো দেখা যাইতেছে, আর চারিদিকে প্রাণহীন নিঃসঙ্গ পাহাড়।

অবশেষে পাঁচ ঘণ্টারও অধিক কাল হাড়ভাঙা চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। কিছুপূর্ব হইতেই একটা চাপা গম্ গম্ শব্দ কানে আসিতেছিল—যেন বহুদূরে দুন্দুভি বাজিতেছে। মোড়ল বলিল, 'উহাই উপলা নদীর প্রপাতের শব্দ।'

প্রপাতের কিনারায় গিয়া যখন দাঁড়াইলাম তখন সম্মুখের অপরূপ দৃশ্য যেন ক্ষণকালের জন্য আমাদের নিস্পন্দ করিয়া দিল। আমরা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম তাহার প্রায় পঞ্চাশ হাত ঊর্ধ্বে সংকীর্ণ প্রণালী-পথে উপলার ফেনকেশর জলরাশি উগ্র আবেগভরে শূন্যে লাফাইয়া পড়িয়াছে; তারপর রামধনুর মতো বঙ্কিম রেখায় দুই শত হাত নীচে পতিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনায় তীব্র একটা আবর্ত সৃষ্টি করিয়া বহিয়া গিয়াছে। ফুটন্ত কটাহ হইতে যেমন বাষ্প উত্থিত হয়, তেমনই তাহার শিলাহত চূর্ণ শীকরকণা উঠিয়া আসিয়া আমাদের মুখে লাগিতেছে।

এখানে দুই তীরের মধ্যস্থিত খাদ প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া—মনে হয় যেন পাহাড় এই স্থানে বিদীর্ণ হইয়া অবরুদ্ধ উপলার বহির্গমনের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এই দুর্লঙ্ঘ খাদ পার হইবার জন্য বহুযুগ পূর্বে দুর্বল মানুষ যে ক্ষীণ সেতু নির্মাণ করিয়াছিল তাহা দেখিলে ভয় হয়। দুইটি লোহার শিকল—একটি উপরে, অন্যটি নীচে—সমান্তরালভাবে এ-তীর হইতে ও-তীরে চলিয়া গিয়াছে। ইহাই সেতু। গর্জমান প্রপাতের পটভূমিকার সম্মুখে এই শীর্ণ মরিচা-ধরা শিকল দুটি দেখিয়া মনে হয় যেন মাকড়সার তন্তুর চেয়েও ইহারা ভঙ্গুর, একটু জোরে বাতাস লাগিলেই ছিঁড়িয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইবে।

কিন্তু ওপারের কথা এখনও বলি নাই। ওপারের দৃশ্যের প্রকৃতি এপার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এই ধাতুগত বিভিন্নতার জন্যই বোধ করি প্রকৃতিদেবী ইহাদের পৃথক করিয়া দিয়াছেন। ওপারে দৃষ্টি পড়িলে সহসা মনে হয় যেন অসংখ্য মর্মর-নির্মিত গম্বুজে স্থানটি পরিপূর্ণ। ছোট-বড়-মাঝারি বর্তুলাকৃতি শ্বেতপাথরের ঢিবি যত দূর দৃষ্টি যায় ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে। যাঁহারা সারনাথের ধামেক স্তূপ দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহাদের আকৃতি কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন। এই প্রকৃতি-নির্মিত স্তূপগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া গভীর খাদের ঠিক কিনারায় একটি নিটোল সুন্দর স্তম্ভ মিনারের মতো ঋজুরেখায় ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরের সূর্যকিরণে তাহার পাষাণ গাত্র ঝকমক করিতেছে। দেখিয়া সন্দেহ হয়, ময়দানবের মতো কোন মায়াশিল্পীই বুঝি অতি যত্নে এই অভ্রভেদী দেব-স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর শৈশবকালে প্রকৃতি যখন আপন মনে খেলাঘর তৈয়ার করিত, ইহা সেই সময়ের

সৃষ্টি। হয়তো মানুষ-শিল্পীর হাতও ইহাতে কিছু আছে। বাইনোকুলার চোখে দিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম, কিন্তু ইহার বহিরঙ্গে মানুষের হাতের চিহ্ন কিছু চোখে পড়িল না। স্তম্ভটা যে ফাঁপা তাহাও বাহির হইতে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই; কেবল স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র চোখে পড়িল—রন্ধ্রটি চতুষ্কোণ, বোধ করি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক হাতের বেশি হইবে না। সূর্যকিরণ সেই পথে ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। ইহাই নিশ্চয় মন্ত্রোক্ত রন্ধ্র।

মগ্ন হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম। এতক্ষণে পাশে দৃষ্টি পড়িতে দেখিলাম, ভিক্ষু ভূমির উপর সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া বুদ্ধস্তম্ভকে প্রণাম করিতেছেন।

ভিক্ষু অভিরাম আমাদের নিষেধ শুনিলেন না, একাকী সেই শিকলের সেতু ধরিয়া ওপারে গেলেন। আমরা তিন জন এপারে রহিলাম। পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, এবার বুঝি শিকল ছিঁড়িয়া গেল, কিন্তু ভিক্ষুর শরীর কৃশ ও লঘু, শিকল ছিঁড়িল না।

ওপারে পৌঁছিয়া ভিক্ষু হাত নাড়িয়া আমাদের আশ্বাস জানাইলেন, তারপর স্তম্ভের দিকে চলিলেন। স্তম্ভ একবার পরিক্রমণ করিয়া আবার হাত তুলিয়া চিৎকার করিয়া কি বলিলেন, প্রপাতের গর্জনে শুনিতে পাইলাম না। মনে হইল তিনি স্তম্ভের দ্বার খোলা পাইয়াছেন।

তারপর তিনি স্তম্ভের অন্তরালে চলিয়া গেলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। চোখে বাইনোকুলার লাগাইয়া বসিয়া রহিলাম। মানসচক্ষে দেখিতে লাগিলাম, ভিক্ষু চক্রাকৃতি অন্ধকার সোপান বাহিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছেন; কম্পিত অধর হইতে হয়তো অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারিত হইতেছে—তথাগত, তমসো মা জ্যোতির্গময়—

সেই গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠের মূর্তি কি এখনও আছে? ভিক্ষু তাহা দেখিতে পাইবেন? আমি দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সেজন্য ক্ষোভ নাই। যদি সে-মূর্তি থাকে পরে লোকজন আনিয়া উহা উদ্ধার করিতে পারিব। দেশময় একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে।

এইরূপ চিন্তায় দশ মিনিট কাটিল।

তারপর সব ওলট-পালট হইয়া গেল। হিমালয় যেন সহসা পাগল হইয়া গেল। মাটি টলিতে লাগিল; ভূগর্ভ হইতে একটা অবরুদ্ধ গোঙানি যেন মরণাহত দৈত্যের আর্তনাদের মতো বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। শিকলের সেতু ছিঁড়িয়া গিয়া চাবুকের মতো দুই তীরে আছড়াইয়া পড়িল।

১লা মাঘের ভূমিকম্পের বর্ণনা আর দিব না। কেবল এইটুকুই জানাইব যে ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে যাঁহারা এই ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই ভূমিকম্পের জন্মকেন্দ্রের অবস্থা কল্পনা করিতেও পারিবেন না।

আমরা মরি নাই কেন জানি না। বোধ করি পরমায়ু ছিল বলিয়াই মরি নাই। নৃত্যোন্মাদ মাটি—তাহারই উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিলাম। চোখের সম্মুখে বুদ্ধস্তম্ভ বাত্যাবিপন্ন জাহাজের মাস্তুলের মতো দুলিতেছিল। চিন্তাহীন জড়বৎ মন লইয়া সেই দিকে তাকাইয়া ছিলাম।

মনের উপর সহসা চিন্তার ছায়া পড়িল—

ভিক্ষু! ভিক্ষুর কি হইবে?

ভূমিকম্পের বেগ একটু মন্দীভূত হইল। বোধ হইল যেন থামিয়া আসিতেছে। বাইনোকুলারটা হাতেই মুষ্টিবদ্ধ ছিল, তুলিয়া চোখে দিলাম। পলায়নের চেষ্টা বৃথা, তাই সে-চেষ্টা করিলাম না।

আবার দ্বিগুণ বেগে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল; যেন ক্ষণিক শিথিলতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া

শতগুণ হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে, এবার পৃথিবী ধ্বংস না করিয়া ছাড়িবে না।

কিন্তু ভিক্ষু— ?

স্তম্ভ এতক্ষণ মাস্তুলের মতো দুলিতেছিল, আর সহ্য করিতে পারিল না ; মূলের নিকট হইতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। অতল খাদের প্রান্তে ক্ষণকালের জন্য টলমল করিল, তারপর মরণোন্মত্তের মতো খাদের মধ্যে ঝাঁপ দিল। গভীর নিম্নে একটা প্রকাণ্ড বাষ্পোচ্ছ্বাস উঠিয়া স্তম্ভকে আমার চক্ষু হইতে আড়াল করিয়া দিল।

স্তম্ভ যখন খাদের কিনারায় দ্বিধাভরে টলমল করিতেছিল, সেই সময় চকিতের ন্যায় ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলাম। বাইনোকুলারটা অবশে চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। দেখিলাম, ভিক্ষু রন্ধ্রপথে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার মুখে রৌদ্র পড়িয়াছে। অনির্বচনীয় আনন্দে সে মুখ উদ্ভাসিত। চারিদিকে যে প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার চলিয়াছে সেদিকে তাঁহার চেতনা নাই।

আর তাঁহাকে দেখিলাম না ; মরণোন্মত্ত স্তম্ভ খাদে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

একাকী গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি।

তারপর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ কাহিনী কাহাকেও বলিতে পারি নাই। ভিক্ষুর কথা স্মরণ হইলেই মনটা অপরিসীম বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠে।

তবু এই ভাবিয়া মনে সান্ত্বনা পাই যে, তাঁহার জীবনের চরম অভীপ্সা অপূর্ণ নাই। সেই স্তম্ভশীর্ষে তিনি তথাগতের কিরূপ নয়নাভিরাম মূর্তি দেখিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী অনুসন্ধান সফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৃত্যুমুহূর্তে তাঁহার মুখের উদ্ভাসিত আনন্দ আজও আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

২৮ আষাঢ় ১৩৪৩



সেতু

হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল...পাশের ঘর হইতে কে যেন জলদমন্দ্র স্বরে বলিল, 'লিখে রাখ, ৩রা চৈত্র ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম...'

রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না ; এত স্পষ্ট, এত অদ্ভুত। আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অহিদত্ত রঞ্জুল, বৃদ্ধ অসিধাবক তণ্ডু, লালসাময়ী রল্লা—

এ কি স্বপ্ন ? না আমারই মগ্নচৈতন্যের স্মৃতিকন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিল আমার পূর্বতন জীবনের ইতিবৃত্ত ! পূর্বতন জীবন বলিয়া কিছু কি আছে ? মৃত্যু জানি, কিন্তু সেইখানেই তো সব শেষ। আবার সেই শেষটাকে শুরু ধরিয়া নূতন কোনও জীবন আরম্ভ হয় নাকি ?

আমার স্বপ্নটা যেন তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেল। একটা মানুষের জীবন—সে মানুষটা কি আমি ?—উল্টা দিক দিয়া দেখিতে পাইলাম ; এক মৃত্যু হইতে অন্য জন্ম পর্যন্ত। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে ফুল ফল আবার বীজ—ইহাই জীব-জগতের পূর্ণ চক্র। কিন্তু এই চক্র পরিপূর্ণভাবে আমাদের দৃশ্যমান নয়, মাঝখানে চক্রাংশ খানিকটা অব্যক্ত। মৃত্যুর পর আবার **জন্ম**—মাঝ দিয়া বিস্মরণের বৈতরণী বহিয়া গিয়াছে। আমার স্বপ্ন যেন এই বৈতরণীর উপর

সেতু বাঁধিয়া দিল।

সত্যই কি সেতু আছে ? আমি বৈজ্ঞানিক, অলীক কল্পনার ধার ধারি না। আলোকরশ্মি ঋজু রেখায় চলে কি না, এই বিষয় লইয়া গত তিন বৎসর গবেষণা করিতেছি। কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কাল আমার কাজ শেষ হইয়াছে। হালকা মন ও হালকা মস্তিষ্ক লইয়া শয়ন করিতে গিয়াছিলাম। তারপর ঐ স্বপ্ন ! ভাবিতেছি, এ-স্বপ্ন যদি অলীক কল্পনাই হয়, তবে সে এই সকল অদ্ভুত উপাদান সংগ্রহ করিল কোথা হইতে ? আমার জাগ্রত চেতনার মধ্যে তো এ-সকল অভিজ্ঞতা ছিল না ! কল্পনা কি কেবল শূন্যকে আশ্রয় করিয়া পল্লবিত হয় ? রক্তের মধ্যে সামান্য একটু কার্বন-ডায়ক্সাইডের আধিক্য কি নিরবয়ব 'নাস্তি'কে মূর্ত বাস্তব করিয়া তুলিতে পারে ?

জানি না। আমার যুক্তি-বিধিবদ্ধ বুদ্ধি এই স্বপ্নের আঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

যে-শিশু কাঁদিয়া উঠিল, সে কে ? আমি ? আর সেই জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বর !—পুরাতন ডায়েরি খুলিয়া দেখিতেছি, ৩৫ বৎসর পূর্বে ৩রা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে আমার জন্ম হইয়াছিল।

দেখিতেছি, আমার সম্মুখে অত্যুজ্জ্বল অঙ্গার-পিণ্ড জ্বলিতেছে। বৃহৎ অঙ্গার-চুল্লী, ভস্ত্রার ফুৎকারে উগ্র নির্ধূম প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, আবার ভস্ত্রার বিরামকালে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিতেছে। এই অগ্নির মধ্যস্থলে প্রোথিত রহিয়াছে আমার অসি-ফলক।

কক্ষ ঈষদন্ধকার ; চারিদিকে নানা আকৃতির লৌহ-ফলক বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোনটি খড়্গের আকার ধারণ করিতে করিতে সহসা থামিয়া গিয়াছে ; কোনটি দণ্ডের আকারে শূল অথবা মুদ্গরে পরিণত হইবার আশায় অপেক্ষা করিতেছে। প্রাচীরগাত্রে সুসম্পূর্ণ ভল্ল অসি লৌহজালিক সজ্জিত রহিয়াছে। অঙ্গার-পিণ্ডের আলোকে ইহারা ঝলসিয়া উঠিতেছে, পুনরায় ম্লান অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে স্বপ্নলোকে জাগিয়া উঠিলাম। জ্বলন্ত চুল্লীর অদূরে বেত্রাসনে বসিয়া আমি করলগ্ন-কপোলে দেখিতেছি, আর অসিধাবক তণ্ডু অগ্নির সম্মুখে বসিয়া ভস্ত্রা চালাইতেছে।

এই দৃশ্য আমার কাছে একান্ত পরিচিত, তাই বিস্মিত হইতেছি না। চেতনার মধ্যে ইহার সমস্ত পূর্ব-সংযোগ নিষ্ক্রিয়ভাবে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই ছায়ান্ধকার কক্ষটি উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ শস্ত্র-শিল্পী তণ্ডুর যন্ত্রাগার। আমি দক্ষিণ মণ্ডলে উপনিবিষ্ট শক-বাহিনীর একজন পত্তিনায়ক—আমার নাম অহিদত্ত রঞ্জুল। আমি তণ্ডুর যন্ত্রাগারে বসিয়া আছি কেন ? অসি সংস্কার করিবার জন্য ? তণ্ডুর মতো এত বড় অসি-শিল্পী শুনিয়াছি শক-মণ্ডলে আর নাই, সে অসিতে এমন ধার দিতে পারে যে, নিপুণ শস্ত্রী তাহার দ্বারা আকাশে ভাসমান কাশ-পুষ্পকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে ! কিন্তু এই জন্যই কি গত বসন্তোৎসবের পর হইতে বারবার তাহার গৃহে আসিতেছি ?

চুল্লীর আলোকে তণ্ডুর মুখের প্রত্যেক রেখাটি দেখিতে পাইতেছি। শীর্ণ, রক্তহীন মুখ ; গুম্ফ ও ভ্রূর রোম চুল্লীর দাহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, গণ্ডের চর্ম কুঞ্চিত হইয়া হনু-অস্থিকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। ললাটের দুই প্রান্ত নিম্ন। অস্থিসার বক্র নাসিকা এই জরাবিধ্বস্ত মুখের চর্মাবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবার প্রয়াস করিতেছে। মুখখানা দেখিলে মনে হয় মৃতের মুখ, শুধু সেই মৃত মুখের মধ্যে কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু দুটা অস্বাভাবিক রকম জীবিত,—ভগ্নমেরু মুমূর্ষু সর্পের চক্ষুর মতো যেন একটা বিষাক্ত জিঘাংসা বিকীর্ণ করিতেছে।

তণ্ডু যন্ত্রচালিতের মতো কাজ করিতেছে। আমার অসি-ফলক অঙ্গার হইতে বাহির করিয়া

রসায়ন-মিশ্র জলে ডুবাইতেছে, সন্তর্পণে ফলকের ধার পরীক্ষা করিতেছে, আবার তাহা অঙ্গারমধ্যে প্রোথিত করিতেছে। তাহার মুখে কথা নাই, কখনও সে সর্পচক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া অতর্কিতে আমাকে দেখিয়া লইতেছে, তাহার পীত-দন্ত মুখ ঈষৎ বিভক্ত হইয়া যাইতেছে, অধরোষ্ঠ একটু নড়িতেছে—যেন সে নিজ মনে কথা কহিল—তারপর আবার কর্মে মন দিতেছে।

আমিও তাহার পানে চাহিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু আমার মন তাহাকে দেখিতেছে না। মন দেখিতেছে—কাহাকে ?—রল্লা। লালসাময়ী কুহকিনী রল্লা ! আমার ঐ উত্তপ্ত অসি-ফলকের ন্যায় কামনার শিখারূপিণী রল্লা !

একটা তীক্ষ্ণ বেদনা সূচীর মতো হৃদয়যন্ত্রকে বিদ্ধ করিল। তণ্ডুর দেহ ভাল করিয়া আপাদমস্তক দেখিলাম। এই জরাগলিত দেহ বৃদ্ধ রল্লার ভর্তা। রল্লা আর তণ্ডু ! বুকের মধ্যে একটা ঈর্ষা-ফেনিল হাসি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল—ইহাদের দাম্পত্য জীবন কি রূপ। নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। বক্ষে বাহুতে উদ্ধত পেশী আস্ফালন করিতেছে—পঁচিশ বৎসরের দর্পিত যৌবন ! তপ্ত শক-রক্ত যেন শুভ্র চর্ম ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। —আমি লোলুপ চোরের মতো নানা ছলে তণ্ডুর গৃহে যাতায়াত করিতেছি, আর তণ্ডু—রল্লার স্বামী !

রল্লা কি কুহক জানে ? নারী তো অনেক দেখিয়াছি,—তীব্রনয়না গর্বিতা শক-দুহিতা, মদালসনেত্রা স্ফুরিতাধরা অবন্তিকা, বিলাসভঙ্গিমগতি. রতিকুশলা হাস্যময়ী লাট-ললনা। কিন্তু রল্লা—রল্লার জাতি নাই। তাহার তাম্র-কাঞ্চন দেহে নারীত্ব ছাড়া আর কিছু নাই। সে নারী। আমার সমস্ত সত্তাকে সে তাহার নারীত্বের কুহকে জয় করিয়াছে।

একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছি, মদনোৎসবের কুঙ্কুম-অরুণিত সায়াহ্নে। উজ্জয়িনীর নগর-উদ্যানে মদনোৎসবে যোগ দিয়াছিলাম। এক দিনের জন্য প্রবীণতার শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুণ্ঠন নাই—লজ্জা নাই। যৌবনের মহোৎসব। উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুলচরণা নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে, আসব-অরুণ নেত্র ঢুলুঢুলু হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কলহাস্য করিয়া কুঙ্কুমপ্রলিপ্তদেহা নাগরী এক তরুগুল্ম হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে, মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া চাহিতেছে, আবার পলাইতেছে। পশ্চাতে পুষ্পের ক্রীড়াধনু হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অনুসরণ করিতেছে। নিভৃত লতানিকুঞ্জে প্রণয়ী মিথুন কানে কানে কথা কহিতেছে। কোনও মৃগনয়না বিভ্রমচ্ছলে নিজ চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিতেছে—তুমি আমার চক্ষে কুঙ্কুম দিয়াছ ! প্রণয়ী তরুণ সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অরুণাভ নয়নের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে, তারপর ফুৎকার দিবার ছলে গূঢ়-হাস্য-মুকুলিত রক্তাধর সহসা চুম্বন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠের বিগলিত হাস্য লতামণ্ডপের সুগন্ধি বায়ুতে শিহরণ তুলিতেছে।

শত শত নাগর-নাগরিকা এইরূপ প্রমোদে মত্ত—নিজের সুখে সকলেই নিমজ্জিত, অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর নাই। যৌবন চঞ্চল—বসন্ত ক্ষণস্থায়ী ; এই স্বল্পকাল-মধ্যে বৎসরের আনন্দ ভরিয়া লইতে হইবে। বৃহৎ কিংশুক বৃক্ষমূলে বেদীর উপর স্নিগ্ধ সুরভিত আসব বিক্রয় হইতেছে—পৈষ্টী গৌড়ী মাধুক—নাগরিক-নাগরিকা নির্বিচারে তাহা পান করিতেছে ; অবসন্ন উদ্দীপনাকে প্রজ্বলিত করিয়া আবার উৎসবে মাতিতেছে। কঙ্কণ, নূপুর, কেয়ূরের ঝনৎকার, মাদলের নিক্কণ, লাস্য-আবর্তিত নিচোলের বর্ণচ্ছটা, স্খলিত কণ্ঠের হাস্য-বিজড়িত সঙ্গীত :—নির্লজ্জ উন্মুক্তভাবে কন্দর্পের পূজা চলিয়াছে।

নগর-উপবনের বীথিপথে আমি একাকী ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। মনের মধ্যে একটা

নির্লিপ্ত সুখাবেশ ক্রীড়া করিতেছিল। এই সব রসোন্মত্ত নরনারী—ইহারা যেন নট-নটী ; আমি দর্শক। সুরাপান করিয়াছিলাম, কিন্তু অধিক নয়। বসন্তের লঘু আতপ্ত বাতাসের স্পর্শে বারুণী-জনিত উল্লাস যেন আমার চিত্তকে আত্মসুখলিপ্সার ঊর্ধ্বে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। চারিদিকে অধীর আনন্দ-বিহ্বলতা দেখিতেছিলাম ; মনে আনন্দের স্পর্শ লাগিতেছিল, আপনা আপনি উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছিলাম, কিন্তু তবু এই ফেনোচ্ছল নর্ম-স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেছিলাম না। আমি সৈনিক, নাগরিক সাধারণ আমাকে কেহ চিনে না ; তাই অপরিচয়ের সঙ্কোচও ছিল ; উপরন্তু এই অপরূপ মধু-বাসরে বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই গাঢ়তর রসোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম।

উপবনের মধ্যস্থলে কন্দর্পের মর্মর-দেউল। স্মরবীথিকারা দেউল ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে, বাহুতে বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া লীলায়িত ভঙ্গিমায় উপাস্য দেবতার অর্চনা করিতেছে। তাহাদের স্বল্পবাস দেহের মদালস গতির সঙ্গে সঙ্গে বেণীবিসর্পিত কুন্তল দুলিতেছে, চপল মেখলা নাচিতেছে। চোখে চোখে মদসিক্ত হাসির গূঢ় ইঙ্গিত, বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় অতর্কিত ভ্রূবিলাস, যেন মদনপূজার উপচাররূপে উৎসৃষ্ট হইতেছে।

আমি তাহাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুষ্পধন্বা মদনবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া মদনের কিঙ্করীদের প্রতি সহাস্য দৃষ্টি ফিরাইলাম। আমাকে দেখিয়া তাহাদের নৃত্য বন্ধ হইল, তাহারা পুষ্প-শৃঙ্খলের মতো আমাকে আবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তারপর তাহাদের মধ্যে একটি বিম্বাধরা যুবতী দ্বিধা-মন্থর পদে আমার সম্মুখে আসিল। আমার মুখের পানে চাহিয়া সে চক্ষু নত করিল, তারপর আবার চক্ষু তুলিয়া একটি চম্পক-অঙ্গুলি দিয়া আমার উন্মুক্ত বক্ষ স্পর্শ করিল। দেখিলাম, তাহার কালো নয়নে কোনও অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষার ছায়া পড়িয়াছে।

আমি কৌতুকভরে আমার কুঞ্চিত কেশ-বন্ধন হইতে একটি অশোক-পুষ্প লইয়া তাহার চূড়া-পাশে পরাইয়া দিলাম,—তারপর হাসিতে হাসিতে নগরবধূদের বাহুরচিত নিগড় ভিন্ন করিয়া প্রস্থান করিলাম।

ক্ষণকালের জন্য সকলেই মূক হইয়া রহিল। তারপর আমার পশ্চাতে বহু কলকণ্ঠের হাস্য বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল। আমিও হাসিলাম, কিন্তু পিছু ফিরিয়া দেখিলাম না।

ক্রমে দিবা নিঃশেষ হইয়া আসিল। পশ্চিম গগনে আবীর-কুঙ্কুমের খেলা আরম্ভ হইল। দিগ্বধূরাও যেন মদনমহোৎসবে মাতিয়াছে।

উদ্যানের এক প্রান্তে একটি মাধবীবিতানতলে প্রস্তরবেদীর উপর গিয়া বসিলাম। স্থান নির্জন ; অদূরে একটি কৃত্রিম প্রস্রবণ হইতে বৃত্তাকার আধারে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। মণি-মেখলাধৃত জলরাশি সায়াহ্নের স্বর্ণাভ আলোকে টলমল করিতেছে, কখনও রবিরশ্মিবিদ্ধ চূর্ণ জলকণা ইন্দ্রধনুর বর্ণ বিকীর্ণ করিতেছে। যেন সুন্দরী রমণীর অধীর চঞ্চল যৌবন।

আলস্যস্তিমিত অন্যমনে আলোকের এই জলক্রীড়া দেখিতেছি, এমন সময় সহসা একটি কুঙ্কুম-গোলক আমার বক্ষে আসিয়া লাগিল ; অভ্র-আবরণ ফাটিয়া সুগন্ধিচূর্ণ দেহে লিপ্ত হইল। সচকিতে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, একটি নারী লতাবিতানের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য রুদ্ধবাক্ হইয়া গেলাম, বোধ করি হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনও কয়েক মুহূর্তের জন্য থামিয়া গেল। তারপর হৃদয় উন্মত্তবেগে আবার স্পন্দিত হইতে লাগিল। চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিস্ফারিত নেত্র তাহার দেহের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার সম্মুখীন হইলাম।

তাম্রকাঞ্চনবর্ণা লোলযৌবনা তন্বী ; কবরীতে মল্লীমুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ মনঃশিলার প্রলেপ, কিংশুক-ফুল্ল ওষ্ঠাধর হইতে যেন রতি-মাদকতার মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণে কর্ণিকার কলি গণ্ডের উত্তাপে ম্লান হইয়া গিয়াছে। পত্রলেখা-চিত্রিত উরসে লূতাজালের ন্যায় সূক্ষ্ম

কঞ্চুকী, তদুপরি স্বচ্ছতর উত্তরীয় যেন কাশ্মীরবর্ণ কুহেলী দ্বারা অপূর্ণ চন্দ্রকলাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। নাভিতটে আকুঞ্চিত নিচোল ; চরণ দুটি লাক্ষারস-নিষিক্ত।

এই বিমোহিনী মূর্তি কুটিল অপাঙ্গে চাহিয়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহাকে আপাদমস্তক দেখিয়া আমার বুকের মধ্যে ভয়ের মতো একটা অনুভূতি গুরু গুরু করিতে লাগিল। সহসা আমার এ কি হইল ? এই তো কিছুকাল পূর্বে মদন-পূজারিণীদের নীরব সঙ্কেত হাসিমুখে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি ! কিন্তু এখন !

অবরুদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কে ?'

তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিভক্ত হইল, দশনপংক্তিতে বিজলী খেলিয়া গেল। বঙ্কিম কটাক্ষে ভ্রূ-ধনু বিলসিত করিয়া সে বলিল, 'আমি রল্লা।'

রল্লা ! তাহার কণ্ঠস্বর ও নামোচ্চারণের ভঙ্গিতে আমার দেহে তীব্র বেদনার মতো একটা নিপীড়ন অনুভব করিলাম। আমি তাহার দিকে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া গেলাম। ইচ্ছা হইল—কি ইচ্ছা হইল জানি না। হাসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হাসি আসিল না।

মদনোৎসবে অপরিচিত তরুণ-তরুণীর সাক্ষাৎকার ঘটিলে তাহারা কি করে ? হাসিয়া পরস্পরের দেহে কুঙ্কুম নিক্ষেপ করে, দুই-চারিটা রঙ্গ-কৌতুকের কথা বলে, তারপর নিজ পথে চলিয়া যায়। কিন্তু আমি—মূঢ় গ্রামিকের মতো তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেষে আবার প্রশ্ন করিলাম, 'কে তুমি ?'

এবার সে ভঙ্গুর কণ্ঠে কৌতুক ভরিয়া হাসিল, হাসিতে হাসিতে বেদীর উপর আসিয়া বসিল, অধর নয়ন এবং ভ্রূর একটি অপূর্ব চটুল ভঙ্গিমা করিয়া বলিল, 'দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না ? আমি নারী।'

কথাগুলি যেন দৈহিক আঘাতের মতো আমার বুকে আসিয়া লাগিল। নারী—হাঁ, নারীই বটে। ইহা ভিন্ন তাহার অন্য পরিচয় নাই। পুরুষের অন্তর-গুহায় যে অনির্বাণ নারী-ক্ষুধা জ্বলিতেছে, এই নারীই বুঝি তাহাতে পূর্ণাহুতি দান করিতে পারে।

তারপর কতক্ষণ এই লতাবিতানতলে কাটিয়া গেল জানি না। রল্লার লালসাময় যৌবনশ্রী, তাহার মাদক দেহসৌরভ অগ্নিময় সুরার মতো আমার রক্তে সঞ্চারিত হইল। আমি উন্মত্ত হইয়া গেলাম। কিন্তু তবু—তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। ধনুকের গুণ যেমন বাণকে নিজ বক্ষে টানিয়া লইয়াই দূরে নিক্ষেপ করে, রল্লা তেমনই তাহার দেহের কুহকে বারবার আমাকে কাছে টানিয়া আবার দূরে ঠেলিয়া দিল। আমি তাহাকে স্পর্শ করিতে গেলাম, সে চপল চরণে সরিয়া গেল—

বলিল, 'তুমি বুঝি ব্যাধ ? কিন্তু সুন্দর ব্যাধ, বল—হরিণীকে কি এত শীঘ্র ধরা যায় ?'

তপ্তস্বরে বলিলাম, 'আমি ব্যাধ নই, তুমি নিষ্ঠুরা শবরী—আমাকে বধ করিয়াছ। তবু কাছে আসিতেছ না কেন ?'

এবারে সে কাছে আসিল। আমার স্পন্দমান বক্ষের উপর একটি উষ্ণ রক্তিম করতল রাখিয়া ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলিল, 'দেখি।' তারপর যেন ত্রস্তভাবে দ্রুত সরিয়া গিয়া কহিল, 'কই, বধ করিতে তো পারি নাই ! বোধ হয় সামান্য আহত হইয়াছ মাত্র। তোমার কাছে যাইব না, শুনিয়াছি আহত ব্যাঘ্রের নিকট যাইতে নাই।'

এই চটুলতার সম্মুখে আমি ব্যর্থ হইয়া রহিলাম।

তখন সে আবার আমার কাছে আসিল। কজ্জল-দূষিত চক্ষে আমার সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া একটি অর্ধ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। অস্ফুট স্বরে কহিল, 'তুমি বোধ হয় ছদ্মবেশী কন্দর্প।'

আমি তাহার দুই বাহু চাপিয়া ধরিলাম ; শরীরের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল। তাহাকে

নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া গাঢ় স্বরে বলিলাম, 'রল্লা—'

এই সময় যেন আমার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া লতাবিতানের বাহিরে কিয়দ্দূরে কর্কশ কণ্ঠে আহ্বান আসিল, 'রল্লা! রল্লা— !'

উৎকণ্ঠ হইয়া রল্লা শুনিল ; তারপর হাত ছাড়াইয়া লইল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া এক অদ্ভুত হাসি তাহার কিংশুক-ফুল্ল অধরে খেলিয়া গেল। সে বলিল, 'আমার মদনোৎসব শেষ হইয়াছে। আমি গৃহে চলিলাম।'

'গৃহে চলিলে। —যে ডাকিল সে কে ?'

রল্লা আবার নিদাঘ-বিদ্যুতের মতো হাসিল, 'আমার—ভর্তা।'

অকস্মাৎ মুদ্গরাঘাতের মতো প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া যেন বিমূঢ় হইয়া গেলাম—'ভর্তা !'

রল্লা লতাবিতানের দ্বারের দিকে চলিল। যাইতে যাইতে গ্রীবা ফিরাইয়া বলিল, 'আমার ভর্তাকে দেখিবে ? লতার অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতে পার।' তীক্ষ্ণ বঙ্কিম হাসিয়া রল্লা সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল।

মূঢ়বৎ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর লতামণ্ডপের পত্রান্তরাল সরাইয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম।

রল্লা আর তণ্ডু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধ তণ্ডুর সর্পচক্ষু সন্দেহে প্রখর ; রল্লার রক্তাধরে বিচিত্র হাসি।

তণ্ডু কর্কশ কণ্ঠে বলিল, 'উৎসব শেষ হইয়াছে, গৃহে চল।'

রল্লা ক্লান্তিবিজড়িত ভঙ্গিতে দুই বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেহের আলস্য দূর করিল, তারপর বৃদ্ধকে বলিল, 'চল।'

তণ্ডু একবার লতাবিতানের দিকে কুটিল দৃষ্টিপাত করিল, একবার যেন একটু দ্বিধা করিল, তারপর বৃদ্ধ ভল্লুকের মতো বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিল। রল্লা মন্থর পদে তাহার পশ্চাতে চলিল।

যাইতে যাইতে রল্লা একবার নিজের কবরীতে হাত দিল ; কবরী হইতে একটি রক্ত কুরুবক খসিয়া মাটিতে পড়িল।

আমি বাহিরে আসিয়া কুরুবকটি তুলিয়া লইলাম। রল্লা তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে, দূর হইতে ফিরিয়া চাহিল। প্রদোষের ছায়াম্লান আলোকে যেন তাহার সর্বাঙ্গ নিঃশব্দ সঙ্কেত করিয়া আমাকে ডাকিল।

আমি দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। জনাকীর্ণ নগরীর বহু সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে রল্লা নগরপ্রান্তের এক দীন গৃহের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিলাম, গৃহের প্রাচীরে দুইটি অসি চিত্রিত রহিয়াছে।

তারপর নানা ছুতা করিয়া অসিধাবক তণ্ডুর গৃহে আসিয়াছি। অধীর দুর্নিবার অন্তরে স্থির হইয়া বসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়াছি। তণ্ডুর যন্ত্রাগারের পশ্চাতে তাহার বাসগৃহ ; সেখানে রল্লা আছে, দূর হইতে ক্বচিৎ তাহার নূপুরশিঞ্জন শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি ; চোখে মুখে উগ্র কামনা হয়তো প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তণ্ডু কুটিল বক্র কটাক্ষে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়াছে। কিন্তু রল্লাকে দেখিতে পাই নাই—একটা তুচ্ছ সঙ্কেত পর্যন্ত না।

তণ্ডুর কর্কশ নীরস কণ্ঠস্বরে স্মৃতিতন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। সচেতন হইয়া দেখিলাম, সে শীর্ণ অঙ্গুলির প্রান্তে আমার অসির ধার পরীক্ষা করিতেছে, আর কেশহীন ভ্রূ উত্থিত করিয়া শুষ্ক স্বরে কহিতেছে, 'অসির ধার আর বনিতার লজ্জা পরের জন্য, কি বলেন পত্তিনায়ক ?'

বলিলাম, 'অসির ধার বটে। বনিতার লজ্জার কথা বলিতে পারি না, আমি অনূঢ়।'

'আমি বলিতে পারি, আমি অনূঢ় নহি—হা হা—' তণ্ডুর ওষ্ঠাধর তৃষ্ণার্ত বায়সের মতো বিভক্ত হইয়া গেল—'কিন্তু আপনি যদি অনূঢ়, তবে এত তন্ময় হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছিলেন ? পরস্ত্রীর ?'

আকস্মিক প্রশ্নে নির্বাক্‌ হইয়া গেলাম, সহসা উত্তর যোগাইল না। তণ্ডু কি সত্যই আমার মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে ? আত্মসংবরণ করিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিলাম, 'কাহারও ধ্যান করি নাই, তোমার শিল্প-নৈপুণ্য দেখিতেছিলাম।'

বিকৃত হাস্য করিয়া তণ্ডু পুনশ্চ অসি অঙ্গার মধ্যে প্রোথিত করিল, বলিল, 'অহিদত্ত রঞ্জুল, আপনি সুন্দর যুবাপুরুষ, এই দীন অসিধাবকের কারু-নৈপুণ্য দেখিয়া আপনার কি লাভ হইবে ? বরং নগর-উদ্যানে গমন করুন, সেখানে বহু রসিকা নগর-নায়িকার কলা-নৈপুণ্য উপভোগ করিতে পারিবেন।'

আমার মনে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল। এই হীনজাত বৃদ্ধ আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলিলাম, 'আমি কোথায় যাইব না-যাইব তাহা আমার ইচ্ছাধীন। তুমি সেজন্য ব্যস্ত হইও না।'

তণ্ডু আমার পানে একটা চকিত-গুপ্ত চাহনি হানিয়া আবার কার্যে মন দিল।

কিয়ৎকাল পরে বলিল, 'ভাল কথা, পত্তিনায়ক, আপনি তো যোদ্ধা ; শত্রুর উপর অসির ধার নিশ্চয় পরীক্ষা করিয়াছেন ?'

গম্ভীর হাসিয়া বলিলাম, 'তা করিয়াছি। দুই বৎসর পূর্বে দেবপাদ কণিষ্ক যখন তোমাদের এই উজ্জয়িনী নগরী অধিকার করেন, তখন নাগরিকের কণ্ঠে আমার অসির ধার পরীক্ষা করিয়াছি।'

তণ্ডুর চক্ষু দুটা ক্ষণেক আমার মুখের উপর নিষ্পলক হইয়া রহিল ; তারপর শীৎকারের মতো স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, 'পত্তিনায়ক, আপনি বীর বটে। কিন্তু সেজন্য কৃতিত্ব কাহার ?'

'কাহার ?'

'আমার—এই হীনজন্মা অসিধাবকের। কে আপনার অসিতে ধার দিয়াছে ? আমারই মার্জিত অস্ত্রের সাহায্যে আপনারা আমার ভ্রাতা-পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন, স্ত্রী-কন্যাকে অপহরণ করিয়াছেন।'

আমার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলাম, 'শকজাতি বর্বর নয়। তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে কিন্তু নারীহরণ কদাপি করে নাই।'

তণ্ডু কণ্ঠে খলতার বিষ মিশাইয়া বলিল, 'বটে ! তবে বোধ হয় শকজাতি পরস্ত্রীকে চুরি করিতেই পটু।'

ক্রোধের শিখা আমার মাথায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তণ্ডুর অভিপ্রায়ও বুঝিতে পারিলাম ; সে আমার সহিত কলহ করিতে চাহে—যাহাতে আমি আর তাহার গৃহে না আসি। রল্লার লালসায় আমি তাহার গৃহে আসি—ইহা সে বুঝিয়াছে। কিন্তু বুঝিল কি করিয়া ?

কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া বলিলাম, 'তণ্ডু, তুমি বৃদ্ধ, তোমার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে চাহি না। আমার অসি যদি তৈয়ার হইয়া থাকে, দাও।'

সে অসি জলে ডুবাইয়া আবার অঙ্গুলির সাহায্যে ধার পরীক্ষা করিল। বলিল, 'অসি তৈয়ার হইয়াছে।'

তণ্ডুর সহিত কলহ করিয়া আমার লাভ নাই। তাহাকে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমি পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, 'এই লও পঞ্চ নাণক—তোমার পুরস্কার।'

তণ্ডুর চক্ষু সহসা তাহার অঙ্গারকুণ্ডের মতোই জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল। সে চেষ্টাকৃত ধীর স্বরে বলিল, 'আমার পরিশ্রমের মূল্য এক নাণক মাত্র। বাকি চার নাণক আপনি রাখুন, অন্যত্র প্রমোদ ক্রয় করিতে পারিবেন। —কিন্তু অসির ধার পরীক্ষা করিবেন না ?'

উদ্‌গত ক্রোধ গলাধঃকরণ করিয়া আমি বলিলাম, 'করিব, দাও।' বলিয়া হাত বাড়াইলাম।

তণ্ডু কিন্তু অসি দিবার কোনও চেষ্টাই করিল না, তির্যক চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'পত্তিনায়ক, নিজের উপর কখনও নিজের অসির ধার পরখ করিয়াছেন ? করেন নাই ! তবে এইবার করুন।'

বৃদ্ধের হস্তে আমার অসি একবার বিদ্যুতের মতো ঝলসিয়া উঠিল। আমার শিরস্ত্রাণের উপর একটি শিখিপুচ্ছ রোপিত ছিল, দ্বিখণ্ডিত হইয়া তাহা ভূতলে পড়িল।

এইবার আমার অবরুদ্ধ ক্রোধ একেবারে ফাটিয়া পড়িল। এক লম্ফে প্রাচীর হইতে খড়্গ তুলিয়া লইয়া বলিলাম, 'তণ্ডু, বৃদ্ধ শৃগাল, আজ তোর কর্ণচ্ছেদন করিব।' জ্বলন্ত ক্রোধের মধ্যে একটা চিন্তা অকস্মাৎ সূক্ষ্ম সূচীর মতো মস্তিষ্ককে বিদ্ধ করিল—তণ্ডুকে যদি হত্যা করি তাহাতেই বা দোষ কি ? বরং আমার পথ পরিষ্কার হইবে।

কিন্তু তাহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া দেখিলাম—কঠিন ব্যাপার। বিস্ময়ে আমার ক্রোধ ডুবিয়া গেল। জরা-শীর্ণ তণ্ডুর হস্তে অসি ঘুরিতেছে রথ-নেমির মতো, অসি দেখা যাইতেছে না, কেবল একটা ঘূর্ণ্যমান প্রভা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আমি হটিয়া গেলাম।

গরলভরা সুরে তণ্ডু বলিল, 'পত্তিনায়ক অহিদত্ত রঞ্জুল, লতামণ্ডপে লুকাইয়া চপলা পরস্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করা সহজ, পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করা তত সহজ নয়।'

আবার তাহাকে আক্রমণ করিলাম। বুঝিতে বাকি রহিল না, তণ্ডু আরম্ভ হইতেই আমার অভিপ্রায় জানে। লতাবিতানে চুরি করিয়া আমাদের দেখিয়াছিল। কিন্তু এতদিন প্রকাশ করে নাই কেন ? আমাকে লইয়া খেলা করিতেছিল ?

অসিতে অসি লাগিয়া স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য বৃদ্ধের কৌশল, সে একপদ হটিল না। আমি যোদ্ধা, অসিচালনাই আমার জীবন, আমি তাহার অসি-নৈপুণ্যের সম্মুখে বিষহীন উরগের ন্যায় নির্বীর্য হইয়া পড়িলাম। অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় আমাকে আরও অভিভূত করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ বজ্র-নির্ঘোষের মতো তণ্ডুর স্বর আমার কর্ণে আসিল, 'অহিদত্ত রঞ্জুল, শক-লম্পট, এইবার নিজ অসির ধার নিজবক্ষে পরীক্ষা কর—'

তারপর—কি যেন একটা ঘটিয়া গেল।

অবাক হইয়া নিজের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, অসির শাণিত ফলক আমার বক্ষপঞ্জরে প্রোথিত হইয়া আছে !

তণ্ডু আমার পঞ্জর হইতে অসি টানিয়া বাহির করিয়া লইল। আমি মাটিতে পড়িয়া গেলাম। একটা তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা যেন আমার চেতনাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। আর কোনও ক্লেশ অনুভব করিলাম না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো অনুভব করিলাম, তণ্ডু কর্কশ উল্লাসে বলিতেছে, 'অহিদত্ত রঞ্জুল, রল্লা তোমাকে বধ করে নাই,—বধ করিয়াছে তণ্ডু—তণ্ডু—তণ্ডু—'

-

আমার দেহটার সহিত আমার যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সে আমাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি বায়ুহীন কারা-কূপে আবদ্ধ বন্দীর মতো প্রাণপণে মুক্ত হইবার জন্য ছটফট করিতেছি। এই টানাটানি ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। তারপর হঠাৎ মুক্তিলাভ করিলাম।

প্রথমটা কিছুই ধারণা করিতে পারিলাম না। তণ্ডুর যন্ত্রগৃহে আমি দাঁড়াইয়া আছি, আমার পায়ের কাছে একটা বলিষ্ঠ রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। আর, তণ্ডু ঘরের কোণে খনিত্র দিয়া

গর্ত খুঁড়িতেছে এবং ভয়ার্ত চোখে বারবার মৃতদেহটার পানে ফিরিয়া তাকাইতেছে।

ক্রমে মনন-শক্তি ফিরিয়া আসিল। বুঝিলাম, তণ্ডু আমাকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য! আমি তো মরি নাই! ঠিক পূর্বের মতোই বাঁচিয়া আছি। অনির্বচনীয় বিস্ময় ও হর্ষে মন ভরিয়া উঠিল।

অনুভব করিলাম, আরও কয়েকজন ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহাকেও চিনিলাম, কাহাকেও বা চিনিতে পারিলাম না। একজন আমার কাছে আসিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'চল, এখানে থাকিয়া আর লাভ নাই।'

রল্লার কথা মনে পড়িয়া গেল। মুহূর্তমধ্যে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। একটি বদ্ধ কক্ষে ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে সে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে; শুষ্ক চোখে ছুরির ঝলক, ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ দশনে অধর দংশন করিতেছে। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া, তাহার অত্যন্ত কাছে দাঁড়াইয়াও আমার লেশমাত্র বিকার জন্মিল না। সেই তপ্ত লালসা-ফেনিল উন্মত্ততা আর নাই। দেহের সঙ্গে দেহ-জাত আবিলতাও যেন ঝরিয়া গিয়াছে।

অতঃপর আমার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পার্থিব সময়ের প্রায় দুই সহস্র বর্ষব্যাপী এই জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা সহজ নয়। আমার স্বপ্নে আমি এই দুই হাজার বৎসরের জীবন বোধ হয় দুই ঘণ্টা বা আরও অল্প সময়ের মধ্যে যাপন করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা বর্ণনা করিতে গেলে দুই হাজার পৃষ্ঠাতেও কুলাইবে না।

জীবিত মানুষ স্থান এবং কালের আশ্রয়ে নিজের সত্তাকে প্রকট করে। কিন্তু প্রেতলোকে আত্মার স্থিতি কেবল কালের মধ্যে। নিরবয়ব বলিয়া বোধ করি তাহার স্থানের প্রয়োজন হয় না।

শরীর নাই; তাই রোগ কামনা ক্ষুধা তৃষ্ণাও নাই। দেহ-বোধ প্রথম কিছুদিন থাকে, ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। গতির অবাধ স্বচ্ছন্দতা আছে, অভিলাষমাত্রেই যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়। সূর্যের জ্বলন্ত অগ্নি-বাষ্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, লেশমাত্র তাপ অনুভব করি নাই। শৈত্য-উত্তাপের একান্ত অভাবই এ রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা।

এখানকার কালের গতিও পার্থিব কালের গতি হইতে পৃথক। পৃথিবীর এক অহোরাত্রে এখানে এক অহোরাত্র হয় না; পার্থিব এক চান্দ্র মাসে আমাদের অহোরাত্র। এই কালের বিভিন্নতার জন্য পার্থিব ঘটনা আমাদের নিকট অতিশয় দ্রুত বলিয়া বোধ হয়।

অবাধ স্বচ্ছন্দতায় আমার সময় কাটিতে লাগিল। কোটি কোটি বিদেহ আত্মা এখানে আমারই মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নারী আছে, পুরুষ আছে; সকলেই স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতেছে! আপাতদৃষ্টিতে কোনও প্রকার বিধি নিষেধ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তবু, কোথায় যেন একটা অদৃশ্য শক্তি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সেই শক্তির আধার কে, জানি না; কিন্তু তাহার নিঃশব্দ অনুশাসন লঙ্ঘন করা অসাধ্য।

সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। এখানে জ্ঞানের পথে বাধা নাই; যাহার মন স্বভাবত জ্ঞানলিপ্সু সে যথেচ্ছ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। মর্তলোকে যে-জ্ঞান বহু সাধনায় অর্জন করিতে পারা যায় না, এখানে তাহা সহজে অবলীলাক্রমে আসে। আমি আমার ক্ষুদ্র মানবজীবনে যে-সকল মানসিক সংস্কার ও সংকীর্ণতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইয়া গেল। অকলঙ্ক জ্ঞান ও প্রীতির এক আনন্দময় অবস্থার মধ্যে উপনীত হইলাম।

রবি চন্দ্র গ্রহ তারা ঘুরিতেছে, কাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। শনৈশ্চর শনিগ্রহ বোধ করি ষাট বারেরও অধিক সূর্যমণ্ডলকে পরিক্রমণ করিল। তারপর একদিন আদেশ আসিল—ফিরিতে হইবে।

অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে সূক্ষ্ম চন্দ্রকর অবলম্বন করিয়া আলোকের বেগে ছুটিয়া চলিলাম।

পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলাম। হরিৎবর্ণ বিপুল শস্য-প্রান্তর চন্দ্রকরে দুলিতেছে; পরমানন্দে তাহারই অঙ্গে মিলাইয়া গেলাম।

আমার সচেতন আত্মা কিন্তু অস্তিত্ব হারাইল না—একটি আনন্দের কণিকার মতো জাগিয়া রহিল।

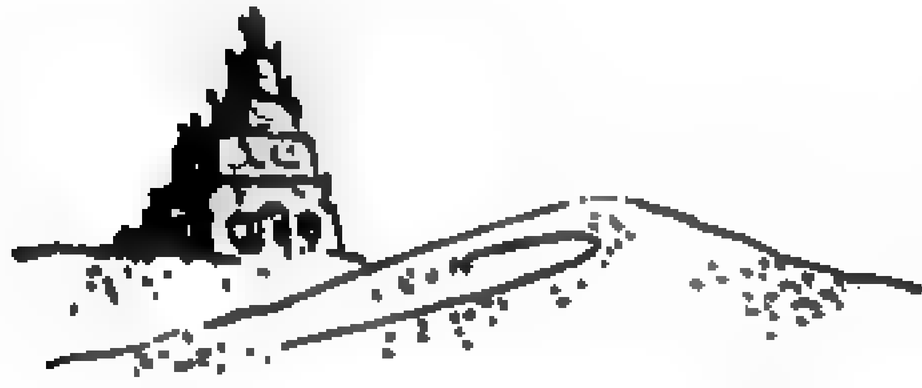
তারপর এক অন্ধকারলোকে প্রবেশ করিলাম। স্থাণুর মতো নিশ্চল, আত্মস্থ—কিন্তু আনন্দময়।

সহসা একদিন এই যোগনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ব্যথা অনুভব করিলাম; দেহানুভূতির যে যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহাই নূতন করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিল!

যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল; সেই শ্বাসরোধকর কারাকূপের ব্যাকুল যন্ত্রণা! তারপর আমার কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া এই যন্ত্রণা অভিব্যক্তি লাভ করিল—তীক্ষ্ণ ক্রন্দনের সুরে।

পাশের ঘর হইতে জলদমন্দ্র শব্দ শুনিলাম, 'লিখে রাখ, ৩রা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম।'

১৭ চৈত্র ১৩৪৩



মরু ও সঙ্ঘ

মধ্য-এশিয়ার দিক্‌সীমাহীন মরুভূমির মাঝখানে বালু ও বাতাসের খেলা। বিরামহীন অস্থির চঞ্চল খেলা। রাত্রি নাই, দিন নাই, সমগ্র মরুপ্রান্তর ব্যাপিয়া এই খেলা চলিতেছে।

খেলা বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর খেলা; অবোধ শিশুর খেলার মতো প্রাণের প্রতি মমতাহীন ক্রূর খেলা। ক্ষুদ্র মানুষের সৃষ্ট ক্ষুদ্র নিয়মের এখানে মূল্য নাই; জীবনের কোনও মূল্য নাই। দয়া করুণা এখানে আপন শক্তিহীন ক্ষুদ্রতায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় কোনও বিধি-বিধান নাই। কখনও পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বায়ু ও বালুর দুর্লক্ষ্য ষড়যন্ত্রে একটি তৃণশ্যামল নির্ঝর-নিষিক্ত ওয়েসিস ধীরে ধীরে মরুভূমির জঠরস্থ হইতেছে; আবার কখনও একটি দিনের প্রচণ্ড বালু-ঝটিকায় তেমনই শ্যামল লোকালয়পূর্ণ ওয়েসিস বালুস্তূপের গর্ভে সমাহিত হইতেছে। দূরে বহু দূরে হয়তো আর একটি নূতন ওয়েসিসের সূচনা হইতেছে। এমনই অর্থহীন প্রয়োজনহীন ধ্বংস ও সৃজনের লীলা নিরন্তর চলিতেছে।

এই মরু-সমুদ্রের মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি হরিদ্বর্ণ দ্বীপ—একটি ওয়েসিস। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, তৃষ্ণাদীর্ণ ধূসর বালুপ্রান্তরের উপর এক বিন্দু নিবিড় শ্যামলতা আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। কাছে আসিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শতহস্তব্যাসবিশিষ্ট একটি শষ্পাঞ্চিত স্থান কয়েকটি খর্জুর বৃক্ষের ধ্বজা উড়াইয়া এখনও মরুভূমির নির্দয় অবরোধ প্রত্যাহত করিতেছে। খর্জুর-ছায়ার অন্তরাল দিয়া একটি প্রস্তরনির্মিত সঙ্ঘারামের অর্ধপ্রোথিত ঊর্ধ্বাঙ্গ দেখা যায়। মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে প্রাকৃতিক নির্মমতার কেন্দ্রস্থলে মহাকারুণিক বুদ্ধ তথাগতের সঙ্ঘারাম মাথা জাগাইয়া আছে।

একদিন এই স্থান জনকোলাহলমুখরিত সমৃদ্ধ জনপদ ছিল—দশ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া নগর হাট উদ্যান চৈত্য বিরাজিত ছিল। শত ক্রোশ দূর হইতে সার্থবাহ বণিক উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্য লইয়া মরুবালুকার উপর কঙ্কাল-চিহ্নিত পথ ধরিয়া এখানে উপস্থিত হইত। ক্ষুদ্র রাজ্যে একজন ক্ষুদ্র শাসনকর্তাও ছিল ; কিন্তু এখন আর কিছু নাই। এমন কি, যে কঙ্কালশ্রেণী মরুপথে বহির্জগতের সহিত সংযোগ রক্ষা করিত, তাহাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিঞ্চিদূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বালু ও বাতাস এই স্থানটিকে লইয়া নৃশংস খেয়ালের খেলা আরম্ভ করিয়াছিল। মরু এবং ওয়েসিসের সীমান্ত চিহ্নিত করিয়া খর্জুর বৃক্ষের সারি চক্রাকার প্রাকারের মতো ওয়েসিসকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে ; এই সীমান্তভূমির উপর সূক্ষ্ম বালুকার পলি পড়িতে লাগিল। কেহ লক্ষ্য করিল না। দুই-তিন বৎসর কাটিল। সহসা একদিন একটি উৎসের জলধারা শুকাইয়া গেল। লক্ষ্য করিলেও কেহ গ্রাহ্য করিল না। আরও অনেক উৎস আছে।

দশ বৎসর কাটিল। তারপর একদিন সকলে সত্রাসে হৃদয়ঙ্গম করিল—ওয়েসিস সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে ; অলক্ষিতে মরুভূমি অনেকখানি সীমানা গ্রাস করিয়া লইয়াছে।

অতঃপর ফাঁসির দড়ি যে-ভাবে ধীরে ধীরে কণ্ঠ চাপিয়া প্রাণবায়ু রোধ করিয়া ধরে, তেমনই ভাবে মরুভূমি ওয়েসিসকে চারিদিক হইতে চাপিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া আনিতে লাগিল। প্রথমে আহার্য-পানীয়ের অপ্রতুলতা, তারপর বসবাসের স্থানাভাব হইল। যাহারা পারিল পলায়ন করিল ; উষ্ট্র-গর্দভপৃষ্ঠে যথাসম্ভব ধনসম্পত্তি লইয়া অন্য বাসস্থানের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। যাহারা তাহা পারিল না, তাহারা শঙ্কাকুলচিত্তে মরুর পানে তাকাইয়া অনিবার্য পরিসমাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। জনপদের জনসংখ্যা অর্ধেকের অধিক কমিয়া গেল।

মরুভূমির ত্বরা নাই, ব্যস্ততা নাই। নাগ-কবলিত ভেকের ন্যায় ওয়েসিস অল্পে অল্পে মরুর জঠরস্থ হইতে লাগিল।

এক পুরুষ কাটিয়া গেল। যাহারা যুবক ছিল তাহারা এই অনির্বাণ আতঙ্ক বুকে লইয়া বৃদ্ধ হইল। কিন্তু সৃষ্টির বিরতি নাই ; ধ্বংসের করাল ছায়ার তলে নবতর সৃষ্টি জন্মগ্রহণ করিয়া বর্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন গ্রীষ্মের তাম্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে দিগন্তরাল হইতে কৃষ্ণবর্ণ আঁধি উঠিয়া আসিল। মরুভূমির এই আঁধির সহিত তুলনা করিতে পারি পৃথিবীতে এমন কিছু নাই। মহাপ্রলয়ের দিনে শুষ্ক জীর্ণ পৃথিবী বোধ হয় এমনই উন্মত্ত বালু-ঝটিকার আবর্তে চূর্ণ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইবে।

দুই দিন পরে আকাশ পরিষ্কার হইয়া প্রখর সূর্য দেখা দিল। বিজয়িনী প্রকৃতির সগর্ব হাসির আলোয় ওয়েসিস উদ্ভাসিত হইল। দেখা গেল ওয়েসিস আর নাই, পর্বতপ্রমাণ বালুকার তলায় চাপা পড়িয়াছে ; কেবল উচ্চ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘারামের অর্ধনিমজ্জিত চূড়া ঘিরিয়া কয়েকটি খর্জুর বৃক্ষ শোকার্তভাবে দাঁড়াইয়া এই সমাধিস্থল পাহারা দিতেছে। মানুষের চিহ্নমাত্র কোথাও নাই।

দ্বিপ্রহরে সঙ্ঘের উপরিতলের একটি বালু-সমাহিত গবাক্ষ হইতে অতি কষ্টে বালুকা সরাইয়া বিবরবাসী সরীসৃপের ন্যায় দুইটি প্রাণী বাহির হইল। মানুষই বটে ; একজন বৃদ্ধ, দ্বিতীয়টি বলিষ্ঠদেহ যুবা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যুবা বৃদ্ধকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। তারপরে উভয়ে বহুক্ষণ গবাক্ষের বাহিরে বালুর উপর পড়িয়া দীর্ঘ শিহরিত প্রশ্বাসে মুক্ত আকাশের প্রাণদায়ী বায়ু গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের তৃষ্ণা-বিদীর্ণ অধরোষ্ঠে কালিমালিপ্ত মুখে মানুষী ভাব ফিরিয়া আসিল। চিনিবার মতো কেহ থাকিলে চিনিতে পারিত, একজন সঙ্ঘ-স্থবির

পিথুমিত্ত, দ্বিতীয় ভিক্ষু উচণ্ড। বালু-ঝটিকা আরম্ভ হইবার সময় সঙ্ঘের অন্যান্য সকলেই ভীত হইয়া বাহিরে আসিয়াছিল, তাহারা কেহ বাঁচে নাই ; কেবল এই দুই জন সঙ্ঘের দ্বিতলস্থ পরিবেণে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছেন।

বালুকার স্তূপ ঢালু হইয়া সঙ্ঘের গাত্র হইতে নামিয়া গিয়াছে। উভয়ের বায়ুক্ষুধা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তাঁহারা টলিতে টলিতে নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতে লাগিলেন। বাঁচিতে হইলে জল চাই। সঙ্ঘের পাদমূলে খর্জুরকুঞ্জের মধ্যে একটি প্রস্তর-গুহা হইতে প্রস্রবণ নির্গত হইত, সেখানে দুই জনে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, প্রস্রবণের মুখ বুজিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বালুবন্ধ উৎসের স্বতঃপ্রবাহ রোধ করিতে পারে নাই ; গুহামুখের বালুকা সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিলেন, সেই সিক্ত সিকতার উপর—দুইটি মানবশিশু। প্রথমটি পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক, নিদ্রিত অথবা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে ; তাহার মেরুসংলগ্ন জঠর ধীরে ধীরে উঠিতেছে পড়িতেছে। দ্বিতীয়টি অনুমান দেড় বৎসরের একটি বালিকা। শুভ্র নগ্নদেহে একাকিনী খেলা করিতেছে, খর্জুর বৃক্ষের চ্যুত পক্ব ফল কুড়াইয়া খাইতেছে, আর নীল নেত্র মেলিয়া আপন মনে কলস্বরে হাসিতেছে। মৃত বা জীবিত আর কেহ কোথাও নাই। প্রকৃতির দুরবগাহ রহস্য। প্রভঞ্জনের ধ্বংস-তাণ্ডবের মধ্যে এই দুইটি সুকুমার জীবন-কণিকা কি করিয়া রক্ষা পাইল ?

দুই ভিক্ষু প্রথমে বালু খনন করিয়া জল বাহির করিলেন। একদণ্ড কাল অঙ্গুলি সাহায্যে গুহামুখ খনন করিবার পর উৎসের পথ মুক্ত হইল—উভয়ে অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিলেন।

প্রচণ্ড সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে—খর্জুর বৃক্ষের ছায়া পূর্ব দিগন্তের দিকে দীর্ঘতর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কোন্ অনাদি রহস্যের ইঙ্গিত জানাইতেছে। সঙ্ঘ-স্থবির পিথুমিত্ত একবার এই সমাধিস্তূপের চারিদিকে চাহিলেন ; ঊর্ধ্বে সঙ্ঘের বালু-মগ্ন শিখর, নিম্নে তরঙ্গায়িত বালুকারাশি দিক্‌প্রান্তে মিশিয়াছে। তাঁহার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর দুইটি ধারা গড়াইয়া পড়িল। শিশু দুটিকে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন, 'তথাগত !'

অতঃপর মরুভূমির একান্ত নির্জনতার মাঝখানে, বুদ্ধ তথাগতের সঙ্ঘ-ছায়ায় এই চারিটি মানবজীবনের ক্রিয়া আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। স্থবির পিথুমিত্ত বালকের নাম রাখিলেন নির্বাণ। বালিকার নাম হইল—ইতি।

মাধবী পৌর্ণমাসীর প্রভাতে স্থবির পিথুমিত্ত সঙ্ঘের এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া পাতিমোক্ষ পাঠ করিতেছিলেন। সঙ্ঘের একমাত্র শ্রমণ, ভিক্ষু উচণ্ড তাঁহার সম্মুখে মেরু-যষ্টি ঋজু করিয়া স্থিরভাবে বসিয়াছিলেন। শ্রোতা কেবল তিনিই।

দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর উভয়ের দেহেই কাল-করাঙ্ক চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। সঙ্ঘ-স্থবিরের বয়স এখন ন্যূনকল্পে সত্তর বৎসর। মুণ্ডিত মস্তকে মেদহীন চর্মের আবরণতলে করোটির আকৃতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, দেখিয়া শুষ্ক দাড়িম্বফলের ন্যায় মনে হয়। চক্ষুতারকা বর্ণহীন, দৃষ্টি নিষ্প্রভ—যেন মরুভূমির উষ্ণ নিশ্বাসে চোখের জ্যোতি নির্বাপিত হইয়াছে। তবু, এই জরা-বিশীর্ণ মূর্তির চারি পাশে জীবনব্যাপী সচ্চিন্তা ও শুচিতার মাধুর্য একটি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শ্রী রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ত্রিতাপ তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ভিক্ষু উচণ্ডেরও যৌবন আর নাই ; বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়তাল্লিশ বৎসর। কিন্তু দেহ এখনও সবল ও দৃঢ়। সমান্তরালরেখা-চিহ্নিত ললাট-তটে ঘন রোমশ ভ্রূ দুই-একটি পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। চোখের দৃষ্টি কঠোর ও বৈরাগ্যব্যঞ্জক। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, প্রকৃতির সহিত নিরন্তর যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও তিনি পরাভব স্বীকার করেন নাই ; বিদ্রোহীর সদা-জাগ্রত যুযুৎসা তাঁহার ছিন্ন গলিত চীবর ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে।

পাতিমোক্ষ পাঠ শেষ হইল। নিদান হইতে অধিকরণ শমথ পর্যন্ত বিবৃত করিয়া পরিশেষে স্থবির বলিলেন, 'হে মাননীয় ভিক্ষু, আপনার নিকট পারাজিক সংঙ্ঘাদিশেষ প্রভৃতি ধর্ম আবৃত্তি করিলাম। শেষবার প্রশ্ন করিতেছি, যদি কোনও পাপ করিয়া থাকেন খ্যাপন করুন, আর যদি পাপ না করিয়া থাকেন, নীরব থাকুন।'

দীর্ঘ পাতিমোক্ষ পাঠ শুনিতে শুনিতে ভিক্ষু উচণ্ড বোধ করি আত্মস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, অথবা বিষয়ান্তরে তাঁহার মন সংক্রামিত হইয়াছিল ; স্থবিরের শেষ জিজ্ঞাসা কর্ণে যাইতেই তিনি চকিত হইয়া একবার নিজের উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার ললাটের ভ্রূকুটি যেন ঈষৎ গভীরতর হইল। ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তিনি মৌন হইয়া রহিলেন।

স্থবির তখন কহিলেন, 'হে মাননীয় ভিক্ষু, আপনার মৌনভাব দেখিয়া জানিলাম আপনি পরিশুদ্ধ আছেন।' মনে হইল এই বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হইল।

দিবা তখনও প্রথম প্রহর অতীত হয় নাই। অলিন্দপথে তির্যক সূর্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া কক্ষের ম্লান ছায়াচ্ছন্নতা দূর করিয়াছে। উভয়ে এই তরুণ রবিকর অনুসরণ করিয়া বাহিরের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। স্বর্ণাভ সিকতার পটভূমিকায় কয়েকটি আন্দোলিত খর্জুরশীর্ষ চোখে পড়িল।

উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন।

সহসা উচণ্ড কহিলেন, 'থের, একটি কথা আপনাকে বলিবার অভিলাষ করিয়াছি। নির্বাণকে উপসম্পদা দান করা কর্তব্য ; তাহার বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে।'

স্থবির উচণ্ডের মুখের পানে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'নির্বাণের যথার্থ বয়ঃক্রম বিংশ বর্ষ কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।'

উচণ্ডের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ অধীরতা প্রকাশ পাইল, তিনি কহিলেন, 'এস্থলে অনুমানই যথেষ্ট।'

স্থবির ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'নির্বাণ কি উপসম্পদা লইতে ইচ্ছুক ?'

উচণ্ড কহিলেন, 'অবশ্য ইচ্ছুক। সঙ্ঘের উপাসকরূপে সে এত কাল আমার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। সঙ্ঘেই সে পালিত ও বর্ধিত, সঙ্ঘ ভিন্ন তাহার স্থান কোথায় ?'

স্থবির আবার রবিকরোজ্জ্বল বহিঃপ্রকৃতির পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন, 'ভাল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক।' আবার মনে হইল একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

উচণ্ড তীক্ষ্ণ চক্ষে স্থবিরের পানে চাহিলেন ; একবার যেন কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বাক্ সংযত করিয়া বলিলেন, 'উত্তম। তাহাকে আপনার নিকট ডাকিয়া আনিতেছি।' বলিয়া তিনি সঙ্ঘের বাহিরে চলিলেন।

গত পঞ্চদশ বৎসরে বিহারের বহিরাকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় নাই, বালুঝটিকার পর যেমন অর্ধপ্রোথিত ছিল তেমনই আছে। যে বিরাট বালুস্তূপ তাহাকে আবৃত করিয়াছিল তাহা হইতে মুক্ত করা দুই জন মানুষের সাধ্য নয়। উপরিতলের কয়েকটি প্রকোষ্ঠ কোনক্রমে পরিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতেই ভিক্ষুদ্বয় শিশু দুইটিকে লইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। সঙ্ঘের নিম্নতল চিরতরে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সঙ্ঘ হইতে অবতরণ করিয়া উচণ্ড খর্জুরকুঞ্জের দিকে চলিলেন।

খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় গুহানিঃসৃত প্রস্রবণের মন্দ স্রোত স্বচ্ছ ধারায় বহিয়া গিয়াছে। কাকচক্ষু জল, মাত্র বিতস্তিপ্রমাণ গভীর, নিম্নে বালুকার আকুঞ্চিত স্তর দেখা যাইতেছে।

গুহামুখের সন্নিকটে নির্বাণ অধোমুখে শয়ান হইয়া মৃদুপ্রবাহিত জলধারার প্রতি চাহিয়া ছিল, দুই বাহুর উপর চিবুক ন্যস্ত করিয়া অন্যমনে কি জানি চিন্তা করিতেছিল। খর্জুরশাখার রন্ধ্রচ্যুত এক ঝলক রৌদ্র তাহার পৃষ্ঠের উপর পড়িয়া তাহার স্বর্ণাভ দেহবর্ণকে মার্জিত ধাতুফলকের ন্যায়

উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল। ঋজু নাতিমাংসল দেহে কেবল একটি শুভ্র বহির্বাস, কটি হইতে জানু পর্যন্ত আবৃত। উন্মুক্ত স্কন্ধ বাহু ও বক্ষ দৃঢ় পেশীবদ্ধ। মস্তকের কৃষ্ণ কেশ সর্পশিশুর মতো মুখমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া আছে। যৌবনের নবারুণ ঊষালোকে নির্বাণের দেহকান্তি দেখিয়া গ্রীক ভাস্করের রচিত ভাস্কর-দেবতার মূর্তি মনে পড়ে। কিন্তু তাহার মুখে ভাস্কর-দেবতার বিজয়দৃপ্ত গর্বের ব্যঞ্জনা নাই ; নবযৌবনের স্বাভাবিক পৌরুষের সহিত চিৎ-শক্তির এক অপরূপ করুণ মাধুর্য মিশিয়াছিল, গ্রীক ভাস্কর এই অপূর্ব সংমিশ্রণ পরিকল্পনা করিতে পারিতেন না।

প্রস্রবণের দিকে চাহিয়া নির্বাণ চিন্তা করিতেছিল। কি গহন দুরবগাহ তাহার চিন্তা সে নিজেই জানে না। নিষ্পলক দৃষ্টি অগভীর জলের স্তর ভেদ করিয়া নিম্নে, আরও নিম্নে, পৃথিবীর কেন্দ্রগুহায় যেখানে কেবল নিরাসক্ত প্রাণধর্মের ক্রিয়া চলিতেছে—বোধ করি সেইখানেই উপনীত হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির প্রতি তাহার মন ছিল না। কিন্তু তথাপি, এই অন্তর্মুখী তন্ময়তার মধ্যেও তাহার চক্ষু এবং শ্রবণেন্দ্রিয় অলক্ষিতে সতর্ক উৎকর্ণ হইয়া ছিল।

সহসা তাহার বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া একটি গভীর নিশ্বাস নির্গত হইল।

কিছু দিন যাবৎ নির্বাণের মনে এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা শিশুকাল হইতে একসঙ্গে বর্ধিত হয়, তাহাদের মনে পরস্পর সম্বন্ধে প্রায় কোনও মোহ থাকে না ; নির্বাণের মনেও ইতি সম্বন্ধে মোহ ছিল না। বরং ইতি স্ত্রীসুলভ নমনীয়তায় নির্বাণকে পুরুষত্ব ও বয়োজ্যেষ্ঠতার মর্যাদা দিয়া সসম্ভ্রমে তাহার পিছন পিছন ঘুরিয়াছে। দু'জনে কলহ করিয়াছে, আবার গলা জড়াজড়ি করিয়া খেলা করিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইতির দেহে যৌবনের মুকুলোদ্গম হইয়াছে, আয়ত নীল চোখে সৃষ্টির অনাদি কুহক ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু নির্বাণের মনে ভাবান্তর আসে নাই। ইতি যে নারী এ অনুভূতি তাহার অন্তরকে স্পর্শ করে নাই। এইভাবে পঞ্চদশ বর্ষ কাটিয়াছে। তারপর সহসা একদিন নির্বাণের মনের কৌমার্য পরিণত ফলের প্রান্ত হইতে শীর্ণ পুষ্পদলের মতো খসিয়া গেল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে নির্বাণ একাকী খর্জুরকুঞ্জে দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে একটা ভ্রমরের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল। ভ্রমরটা প্রতি বৎসর এই সময় কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, বহু দূরান্তর হইতে বোধ হয় বাতাসের মুখে বার্তা পায়—মরুর খর্জুরশাখায় ফুল ধরিয়াছে। কৃষ্ণকায় ভ্রমর, পাখায় রামধনুর বর্ণ ; সে গভীর গুঞ্জন করিয়া এক পুষ্পমঞ্জরী হইতে অন্য পুষ্পমঞ্জরীতে উড়িয়া যাইতেছে, নিঃশব্দে পুষ্পপাত্রে সঞ্চিত রস পান করিতেছে, আবার উড়িয়া যাইতেছে। নির্বাণ উজ্জ্বল কৌতূহলী চক্ষে মুগ্ধ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

সহসা ইতি পিছন হইতে আসিয়া দুই বাহু দ্বারা নির্বাণের গলা জড়াইয়া ধরিল ; উত্তেজনা সংহত স্বরে তাহার কর্ণে বলিল, 'নির্বাণ, একটা জিনিস দেখিবে ?'

ইতি স্বচ্ছন্দচারিণী, মরুভূমির যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায় ; কোথায় বালুর তলে শাখাপত্রহীন মূল বা কন্দ লুক্কায়িত আছে, আহরণ করিয়া আনে। মরুর নিষ্প্রাণ বক্ষে যাহা কাহারও চক্ষে পড়ে না, তাহা ইতির চক্ষে পড়ে।

নির্বাণ ভ্রমরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, 'কি ?'

ইতি দুই হস্তে সবলে তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইল, বলিল, 'এস, দেখিবে এস।' বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া শবরীর মতো নিঃশব্দ পদে লইয়া চলিল। নির্বাণ দেখিল, আনন্দ-উদ্দীপনায় তাহার দুই চক্ষু নৃত্য করিতেছে।

ওয়েসিসের সীমান্ত পার হইয়া তাহারা মরুভূমির উপর বহুদূর গমন করিল। মধ্যাকাশে জ্বলন্ত সূর্য, চারিদিকে কোটি কোটি বালুকণায় তাহার তেজ প্রতিফলিত হইতেছে। দু'জনে নীরবে চলিয়াছে, মাঝে মাঝে ইতি নির্বাণের মুখের পানে প্রোজ্জ্বল চক্ষু তুলিয়া চুপি চুপি দু'-একটি কথা

বলিতেছে—যেন জোরে কথা বলিলেই তাহার রহস্যময় দ্রষ্টব্য বস্তু মায়ামৃগের ন্যায় মুহূর্তে অন্তর্হিত হইবে।

প্রায় এক ক্রোশেরও অধিক পথ চলিবার পর সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বালিয়াড়ি পড়িল। সেই বালিয়াড়ির কূর্মপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ইতি দিগন্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ঐ দেখ।'

অঙ্গুলির নির্দেশ অনুসরণ করিয়া নির্বাণ সহসা বিস্ময়ে নিস্পন্দ হইয়া গেল। দূরে দিগন্তরেখা যেখানে আকাশে মিশিয়াছে সেইখানে একটি হরিদ্বর্ণ উদ্যান—শ্যামল তরুশ্রেণী বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে, তৃণপূর্ণ প্রান্তরে মেষ-ছাগ চরিতেছে ; এমন কি, আকাশে নানা আকৃতির পাখি উড়িতেছে, তাহাদের ক্ষুদ্র দেহ সঞ্চরমাণ বিন্দুর মতো দেখা যাইতেছে। একটি নদী এই নয়নাভিরাম শ্যামলতার বুক চিরিয়া খরধার তরবারির মতো পড়িয়া আছে।

বিস্ময়ের প্রথম অভিভূতির পর প্রতিক্রিয়া আসিল, নির্বাণ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। ইতি অপেক্ষা তাহার জ্ঞান বেশি।

ইতি কিন্তু উত্তেজনার আতিশয্যে নির্বাণের গলা বাহুবেষ্টিত করিয়া প্রায় ঝুলিয়া পড়িল, মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, 'দেখিতেছ ? নির্বাণ, দেখিতেছ ? কি সুন্দর ! চল, আমরা দুইজনে ঐখানে চলিয়া যাই। আর কেহ থাকিবে না, শুধু তুমি আর আমি।—চল, চল নির্বাণ !'

স্মিতমুখে নির্বাণ তাহার পানে চাহিল। ইতির পলাশরক্ত অধর নির্বাণের এত নিকটে আসিয়াছিল যে, কিছু না বুঝিয়াই সে নিজ অধর দিয়া তাহা স্পর্শ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। দেহের অভ্যন্তর হইতে স্নায়ুর সীমান্ত পর্যন্ত একটা অনির্বচনীয় তীক্ষ্ণ অনুভূতি অসহ্য হর্ষ-বেদনায় তাহাকে নিপীড়িত করিয়া তুলিল। সে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

প্রথম চুম্বনের স্পর্শে ইতি দংশনোদ্যতা সর্পিণীর মতো গ্রীবা পশ্চাতে আকর্ষণ করিয়া নির্বাণের মুখের পানে চাহিল। মনে হইল তাহার নীল নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ হইতেছে। ক্ষণকাল এইভাবে থাকিয়া সে দুরন্ত ঝড়ের মতো আবার নির্বাণের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। একবার দুইবার, অগণিত বার নির্বাণের অধর চুম্বন করিতে করিতে অবশেষে যেন নিজের দুর্জয় আবেগের নিকট পরাজিত হইয়া শিথিল দেহে অবনত মুখে বালুর উপর বসিয়া পড়িল। শ্রান্ত ঝড়ের অবসন্ন আক্ষেপের মতো তাহার বক্ষ হইতে এক প্রকার অবরুদ্ধ আর্তশ্বাস বাহির হইতে লাগিল।

নির্বাণও জানু মুড়িয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল। অকস্মাৎ এ কি হইয়া গেল। এই অজ্ঞাতপূর্ব অচিন্তনীয় আবির্ভাবের সম্মুখে উভয়ে যেন বিমূঢ় হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ দুইজনে এইভাবে অগ্নিবর্ষী আকাশের তলে বসিয়া রহিল। তারপর শুষ্ক তপ্ত চক্ষু তুলিয়া দিগন্তের পানে চাহিল। শ্যামল উপবন তখন অদৃশ্য হইয়াছে।

অস্ফুট স্বরে নির্বাণ বলিল, 'মরীচিকা।'

সেই দিন হইতে নির্বাণের সহিত ইতির সহজ সরল সখ্যের অবসান হইল ; নির্বাণ যেন ইতিকে ভয় করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, তাহার সহিত কথা বলিতে রসনা জড়িত হয়, মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠে ; অথচ অন্তরের অন্তস্থল হইতে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তাহাকে ইতির দিকে টানিতে থাকে। ইতির তপ্ত কোমল অধর স্পর্শের স্মৃতি মাদক সুরার মতো তাহার চিত্তকে বিশৃঙ্খল করিয়া তোলে। সে এই সর্বগ্রাসী মোহের আক্রমণ হইতে দূরে নির্জনে পলায়ন করিতে চায়।

ইতির মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ; এত দিন সে নির্বাণের খেলার সাথী ছিল, অনুজা সখী

ছিল, আজ বিপুল নারীত্বের সঙ্গে সঙ্গে সে নির্বাণকেও যেন সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে পাইয়াছে। নির্বাণ তাহারই, আর কাহারও নয়—নিজ অধর, দেহ, নারীত্বের নিষ্ক্রয়ে সে নির্বাণকে আপন করিয়া লইয়াছে। এই চূড়ান্ত দাবির কাছে পৃথিবীর অন্য সমস্ত দাবি মাথা নীচু করিয়া থাকিবে।

তাহার আচরণে, এমন কি চাহনিতে ও দেহভঙ্গিমায় এই অবিসম্বাদী অধিকারের গর্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। নারী ও পুরুষের প্রভেদ বোধ করি এইখানে।

ইহাদের অন্তরের এই বিপ্লব অন্য দুইজনের কাছেও গোপন রহিল না। মনুষ্যসমাজে যাহা লজ্জা নামে পরিচিত তাহা ইতি কোনও দিন শিখে নাই, তাই তাহার মনের কথাটি কুণ্ঠাহীন অলজ্জিত আনন্দে প্রকাশ পাইল। পিথুমিত্ত ও উচণ্ড সব দেখিলেন, বুঝিলেন। স্থবিরের বর্ণহীন চক্ষু করুণায় নিষিক্ত হইয়া উঠিল : এত দিন যাহা আশঙ্কিত সম্ভাবনা ছিল, আজ তাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে। হায় তথাগত, সঙ্ঘের বৈরাগ্যভস্মের মাঝখানে এ কোন ভঙ্গুর সুকুমার পুষ্প ফুটাইয়া তুলিলে! ভিক্ষু উচণ্ডের কঠোর ললাটে কিন্তু আঁধির অন্ধকার পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি অন্তরমধ্যে গর্জন করিতে লাগিলেন, 'মার প্রবেশ করিয়াছে! সঙ্ঘে মার প্রবেশ করিয়াছে!'

প্রথম দিন হইতেই ক্ষুদ্র মানবিকা ইতির প্রতি ভিক্ষু উচণ্ডের মনে একটা বিমুখতা জন্মিয়াছিল। ভিক্ষুর মনে ভেদজ্ঞান থাকিতে নাই; কিন্তু ভিক্ষু উচণ্ড নির্বাণকে কাছে টানিয়া লইলেন, ইতিকে দূরে দূরে রাখিলেন। নির্বাণ ধর্ম-বিষয়ে শিক্ষা পাইতে লাগিল, ইতি মরুবিহারিণী প্রকৃতিকন্যা হইয়া রহিল। ইতির দেহে যখন প্রথম যৌবন-লক্ষণ প্রকাশ পাইল, সর্বাগ্রে উচণ্ডই তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার বিমুখতা গভীর আক্রোশে পরিণত হইল; ভিক্ষুর নিপীড়িত ব্যর্থ যৌবন যেন ইতির মূর্তি ধরিয়া নিরন্তর তাঁহাকে কশাঘাত করিতে লাগিল। জর্জরিত উচণ্ডের মস্তিষ্কে সঙ্গীতের ধ্রুবপদের ন্যায় কেবল ধ্বনিত হইতে লাগিল—মার প্রবেশ করিয়াছে! মার প্রবেশ করিয়াছে!

নির্বাণের প্রতিও তাঁহার আচরণ কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, ইতি সর্বদা নির্বাণের সঙ্গে ঘুরিতেছে, এক দণ্ড উভয়ে পৃথক থাকে না। তাঁহার বক্ষে অগ্নিশলাকা বিদ্ধ হইতে লাগিল। মার প্রবেশ করিয়াছে—ইতি নির্বাণকে প্রলুব্ধ করিবে! তার পর? বুদ্ধের সঙ্ঘ ব্যভিচারের আগার হইয়া উঠিবে! কখনও না—কখনও না! উচণ্ড নির্বাণকে সুকঠিন ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। মনে হইতে লাগিল তিনি নির্বাণকে উপলক্ষ করিয়া ভিক্ষু-জীবনের পরুষ নির্মমতা নূতন করিয়া সঙ্ঘে প্রবর্তন করিতেছেন।

নিগৃহীত নিপীড়িত আকাঙ্ক্ষা যখন বিকলাঙ্গ মূর্তিতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার স্বরূপ সকলে চিনিতে পারে না। সঙ্ঘে সত্যই মার প্রবেশ করিয়াছিল—কিন্তু কাহার দুর্বলতার ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা ভিক্ষু উচণ্ড জানিতে পারেন নাই।

মরুভূমির স্বল্পায়ু বসন্ত এইভাবে নিঃশেষ হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে নির্বাণ ও ইতির মনোভাব প্রকট হইয়া পড়িল। তখন একদিন মাধবী পূর্ণিমার প্রভাতে উচণ্ড নির্বাণকে উপসম্পদা দান করিয়া পরিপূর্ণ রূপে সঙ্ঘের নিয়মাধীন করিবার প্রস্তাব করিলেন।

প্রস্রবণের মুকুরোজ্জ্বল জলে একটি চঞ্চল ছায়া পড়িল। দিবাস্বপ্ন ভাঙিয়া নির্বাণ উঠিয়া বসিল; ইতি আসিতেছে।

ইতির দেহে একটি মাত্র শ্বেতবস্ত্র। পঞ্চ হস্ত পরিমিত একটি দুকূলপট্ট কটি ও নিতম্ব বেষ্টন করিয়া সম্মুখে বক্ষ আবরণপূর্বক গ্রীবার পশ্চাতে গ্রন্থিবদ্ধ রহিয়াছে; স্কন্ধ ও বাহুমূল উন্মুক্ত। তাহার রুক্ষ কেশভার সুকৃষ্ণ নহে, রৌদ্ররশ্মি পড়িয়া অঙ্গারাবৃত অগ্নিশিখার ন্যায় আরক্ত প্রভা বিকীর্ণ করিতেছে।

লঘুপদে সঙ্কীর্ণ পয়োধারা উল্লঙ্ঘন করিয়া ইতি নির্বাণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; মুষ্টিবদ্ধ হস্ত পশ্চাতে রাখিয়া বলিল, 'চক্ষু মুদিত কর।'

নির্বাণ চক্ষু মুদিত করিল।

'হাঁ কর।'

নির্বাণ মুদিত চক্ষে মুখ ব্যাদান করিল।

ইতি তাহার মুখে মুষ্টিধৃত গুবাক ফলের মতো একটি ক্ষুদ্র দ্রব্য পুরিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার পাশে বসিয়া পড়িল, বলিল, 'এখন বল দেখি, কি খাইতেছ ?'

নির্বাণ চিবাইতে চিবাইতে চক্ষু মেলিয়া বলিল, 'শর্করা-কন্দ। কোথায় পাইলে ?'

ইতি তখন নির্বাণের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া কোথায় শর্করা-কন্দ পাইল তাহা বলিতে আরম্ভ করিল। বালুর নিম্নে মাটি আছে, নানা জাতীয় বিচিত্র বীজকণা সেখানে গিয়া সঞ্চিত হয়। তারপর একদিন প্রকৃতির মন্ত্র-কুহকে অঙ্কুরিত হইয়া আলোকের সন্ধানে উর্ধ্বে উঠিতে আরম্ভ করে। কেহ বালু ভেদ করিয়া উঠিতে পারে, কেহ পারে না। বালুকার গর্ভে তাহাদের ফল-কন্দ বর্ধিত হইয়া প্রচ্ছন্ন জীবন যাপন করে। কিন্তু ইতির চক্ষে আবরণ পড়ে নাই। সে দেখিতে পায়। বালু খুঁড়িয়া এই সব রস-পরিপুষ্ট স্বাদু উদ্ভিজ হরণ করিয়া আনে। খর্জুর ভিন্ন যাহাদের অন্য খাদ্য নাই, তাহাদের মুখে ইহা অমৃততুল্য বোধ হয়।

সানন্দে চর্বণ করিতে করিতে নির্বাণ বলিল, 'তুমি খাও নাই ?'

ইতির চক্ষু অর্ধনিমীলিত হইয়া আসিল, সে অধরোষ্ঠের একটি বিমর্ষ ভঙ্গিমা করিয়া বলিল, 'আর কোথায় পাইব ? একটিমাত্র পাইয়াছিলাম।'

নির্বাণের চর্বণক্রিয়া বন্ধ হইল ; সে ইতির প্রতি বিস্মিত চক্ষু ফিরাইল। ইতিও চক্ষু পাতিয়া পরম তৃপ্তিভরে নির্বাণের বিস্ময়বিমূঢ় মুখ ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া লইল, তারপর কৌতুকবিগলিত কলহাস্য করিয়া তাহার কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

নির্বাণ এতক্ষণ যেন আত্মবিস্মৃত ছিল, এখন বিদ্যুদাহতের মতো চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল। ঠিক এই সময় পশ্চাৎ হইতে বজ্রগম্ভীর আহ্বান আসিল—'নির্বাণ!'

প্রথমে নির্বাণের মনে হইল, এই ধ্বনি যেন তাহার মস্তিষ্কের মধ্যেই মন্দ্রিত হইয়াছে। তারপর সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মূর্তিমান তিরস্কারের ন্যায় ভিক্ষু উচণ্ড বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন।

সভয়ে অপরাধ-কুণ্ঠিত দেহে নির্বাণ উঠিয়া দাঁড়াইল। উচণ্ড অঙ্গারগর্ভ চক্ষু তাহার উপর স্থাপন করিয়া গভীর কণ্ঠে একবার বলিলেন, 'ধিক্!'

নির্বাণের মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখ মৃতের মতো পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

উচণ্ড সঙ্ঘের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'যাও! স্থবির তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন।'

যন্ত্রচালিতের ন্যায় নির্বাণ প্রস্থান করিল।

ইতি এতক্ষণ নির্বাক্ বিভিন্ন-ওষ্ঠাধরে ভূমির উপর বসিয়া ছিল, এখন বিস্ফারিত নেত্র উচণ্ডের মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নির্বাণ সঙ্ঘমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলে উচণ্ড প্রজ্বলিত চক্ষু ইতির দিকে ফিরাইলেন, তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, 'স্কন্ধ আবৃত কর।'

ইতি চকিতে নিজ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইল, তারপর আবার উচণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে কণ্ঠলগ্ন বস্ত্র স্কন্ধের উপর প্রসারিত করিয়া দিল।

ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া উচণ্ড প্রশ্ন করিলেন, 'সঙ্ঘের অলিন্দ পরিষ্কৃত করিয়াছ ?'

'হাঁ অজ্জ, করিয়াছি।'

'জল সঞ্চয় করিয়াছ ?'

'হাঁ অজ্জ, করিয়াছি।'

'ফল সংগ্রহ করিয়াছ ?'

'হাঁ অজ্জ, করিয়াছি।'

উচণ্ড অধর দংশন করিলেন। ইতিকে শাসনাধীনে আনা অসম্ভব—সে নারী, ভিক্ষুসঙ্ঘে ভিক্ষুণীর স্থান নাই। উচণ্ড তাহার সর্বাঙ্গে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুত সঙ্ঘের অভিমুখে চলিলেন। ইতি দুই চক্ষে দুর্জ্ঞেয় দৃষ্টি লইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ওদিকে নির্বাণ স্থবিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল, 'বন্দে।'

স্থবির তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে আশীর্বচন করিলেন—'আরোগ্য।'

নির্বাণের অপরাধ-সঙ্কুচিত চিত্ত বোধ হয় স্থবিরের নিকট তীব্র র্ভৎসনা প্রত্যাশা করিতেছিল, তাই তাঁহার স্নেহসিক্ত বচনে তাহার হৃদয় সহসা দ্রবীভূত হইয়া গেল, চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সে স্থবিরের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

স্থবির তখন ধীরে ধীরে বলিলেন, 'নির্বাণ, তোমার উপাধ্যায়ের নিকট জানিতে পারিলাম তুমি উপসম্পদা গ্রহণে অভিলাষী। ইহা সত্য ?'

নির্বাণ যেন কূল পাইল, অবরুদ্ধ স্বরে বলিল, 'হাঁ ভদন্ত, আমাকে উপসম্পদা দান করিয়া সঙ্ঘে গ্রহণ করুন।'

স্থবির কিছুকাল নীরব রহিলেন ; তারপর বলিলেন, 'নির্বাণ, তুমি সদ্ধর্মে শিক্ষা লাভ করিয়াছ ; সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে হইলে নশ্বর আসক্তি কামনা ত্যাগ করিয়া আসিতে হয়, ইহা নিশ্চয় তোমার অপরিজ্ঞাত নহে। সঙ্ঘের বিধি-বিধান অতি কঠোর, তুমি পালন করিতে পারিবে ?'

এই সময় উচণ্ড প্রবেশ করিয়া নীরবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন ; নির্বাণ অবনত মস্তকে বলিল, 'হাঁ ভদন্ত, পারিব।'

'না পারিলে পাতিমোক্ষ দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে—বিনয়পাঠে অবশ্য তাহা অবগত আছ ?'

'আছি, ভদন্ত।'

স্থবির তখন করুণ বচনে বলিলেন, 'বৎস, ব্যাধতাড়িত পশু গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, ত্রিতাপক্লিষ্ট মানব নিষ্কৃতির কামনায় ধর্মের অনুরাগী হয়। বুদ্ধের সঙ্ঘ সেরূপ স্থান নহে। যাহার অন্তরে বৈরাগ্য এবং নির্বাণ-তৃষ্ণা জন্মিয়াছে, সে-ই সঙ্ঘের অধিকারী। তুমি এই সকল বিচার করিয়া উত্তর দাও।'

গলদশ্রু নির্বাণ যুক্তকরে বলিল, 'আমি সঙ্ঘের আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। আমাকে উপসম্পদা দান করুন।'

গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্থবির বলিলেন, 'বুদ্ধের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।'

জলদগম্ভীর স্বরে উচণ্ড প্রতিধ্বনি করিলেন, 'বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

অতঃপর বিধিমত প্রশ্নোত্তরদানপূর্বক ভিক্ষাপাত্র ও ত্রি-চীবর ধারণ করিয়া কেশ মুণ্ডিত করিয়া নির্বাণ ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করিল। সংসারে আর তাহার অধিকার রহিল না।

ভিক্ষু উচণ্ডই নির্বাণের আচার্য রহিলেন ; নাম পরিবর্তন প্রয়োজন হইল না। ছায়া পরিমাপ ইত্যাদি বিধি সমাপ্ত হইবার পর উচণ্ড বিজয়োদ্ধত কণ্ঠে কহিলেন, 'বুদ্ধ জয়ী হইয়াছেন, মার পরাভূত হইয়াছে। ভিক্ষু, নিজ পরিবেণে গমন কর। অদ্য হইতে নারীর মুখদর্শন তোমার নিষিদ্ধ।'

নতনেত্রে নির্বাণ নিজ পরিবেণে প্রবেশ করিল।

স্থবির নিজ মনে বলিতে লাগিলেন, 'হে শাক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, আমাদের ভ্রান্তি অপনোদন কর, অজ্ঞানমসী দূর কর, সম্যক্ দৃষ্টি দান কর—'

তিন দিন নির্বাণ নিজ পরিবেণ হইতে বাহির হইল না। আর ইতি! দেহবিচ্ছিন্ন ছায়ার মতো সে সঙ্ঘভূমির উপর দিবারাত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সঙ্ঘের প্রত্যেক অধিবাসীর পরিবেণ স্বতন্ত্র। সঙ্ঘারামের উপরিতলে যে-কয়টি প্রকোষ্ঠ ছিল তাহার একটিতে ইতি রাত্রিযাপন করিত; অলিন্দের অন্য প্রান্তে তিনটি বিভিন্ন কক্ষে নির্বাণ উচণ্ড ও স্থবির বাস করিতেন। স্থবিরের অনুমতি ব্যতীত একের প্রকোষ্ঠে অন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল

নির্বাণের সহিত ইতির আর সাক্ষাৎ হয় না। ইতি সঙ্ঘের কাজ করে, আর নানা অছিলায় নির্বাণের পরিবেণের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে। কখনও দেখে, নির্বাণ পুঁথি লইয়া নিমগ্নচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছে; কখনও বা দেখিতে পায়, উচণ্ড তাহাকে উপদেশ দিতেছেন। কদাচিৎ নির্বাণ গবাক্ষের বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চিন্তায় নিমজ্জিত হইয়া থাকে। ইতির পদশব্দে তাহার চেতনা হয় না। ইতি নিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া যায়।

ভিক্ষু উচণ্ডের মন কিন্তু শান্ত হইতেছে না; কোথাও যেন একটা মস্ত ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। নির্বাণ যতই কঠোরভাবে নিজেকে নিগৃহীত করিয়া সঙ্ঘ-ধর্মে আত্মনিয়োগ করিতেছে, তাঁহার অন্তরে সংশয় ও দ্বন্দ্ব ততই মাথা তুলিতেছে। নির্বাণকে সঙ্ঘের শাসনে আবদ্ধ করিয়াও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না—ইতি ও নির্বাণের মধ্যস্থিত আকর্ষণ-রজ্জু দূরত্বের ফলে দৃঢ়তর হইল মাত্র। কুশাগ্রবৎ সূক্ষ্ম ঈর্ষা ক্রমশ কণ্টক হইয়া উচণ্ডকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিল। আপন অজ্ঞাতে নির্বাণকে তিনি নিবিড়ভাবে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন মধ্যরাত্রে চন্দ্রের আলোক গবাক্ষপথে নির্বাণের পরিবেণে প্রবেশ করিয়াছিল; অন্ধকার কক্ষে শুভ্র সূক্ষ্ম চীনাংশুকের মতো এক খণ্ড জ্যোৎস্না যেন আকাশ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। নির্বাণের চোখে নিদ্রা নাই, সে ঐ গবাক্ষের দিকে চাহিয়া ভূ-শয্যায় শয়ান ছিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি; সঙ্ঘের কোথাও একটি শব্দ নাই। নির্বাণ নিঃশব্দে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর ছায়ামূর্তির মতো অলিন্দ উত্তীর্ণ হইয়া সঙ্ঘের বাহিরে উপস্থিত হইল।

খর্জুরকুঞ্জতলে জ্যোৎস্না-তরলিত স্বল্পান্ধকার যেন ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ঊর্ধ্বে খর্জুরশাখা ক্বচিৎ তন্দ্রালস মর্মরধ্বনি করিতেছে, নিম্নে প্রস্রবণের উৎসমুখে উদ্গত জলের মৃদু কলশব্দ। চারি দিকে অপার মরুভূমির উপর চন্দ্ররশ্মির শীতল প্রলেপ। নির্বাণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। এই দৃশ্য তাহার চিরপরিচিত; কিন্তু আজ আর ইহার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই—সে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।

'নির্বাণ!'

প্রস্রবণের কলধ্বনির মতোই মৃদু কণ্ঠস্বর। চমকিয়া নির্বাণ ফিরিয়া চাহিল। শুভ্র বালুকার উপর বায়ুতাড়িত কাশপুষ্পের ন্যায় ইতি তাহার পানে ছুটিয়া আসিতেছে! তাহার চরণ যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে না; চন্দ্রকরকুহেলির ভিতর দিয়া স্মিতক্ষুধিত মুখখানি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

'না—না—না' দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া নির্বাণ পলায়ন করিল। ঊর্ধ্বশ্বাসে নিজ পরিবেণে প্রবেশ করিয়া অধোমুখে ভূতলে পড়িয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

ফিরিবার সময় নির্বাণের পদপাত সম্পূর্ণ নিঃশব্দ হয় নাই; অন্য পরিবেণে আর একজনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল।

পরদিন মধ্যরাত্রে আবার চন্দ্ররশ্মি নির্বাণের গবাক্ষ-পথে প্রবেশ করিয়া দুর্নিবার শক্তিতে

বাহিরের পানে টানিতে লাগিল। নির্বাণ অনেকক্ষণ নিজের সহিত যুদ্ধ করিল—কিন্তু পারিল না। মোহগ্রস্তের মতো খর্জুরছায়াতলে গিয়া দাঁড়াইল।

'নির্বাণ!'

ইতি তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আজ আর নির্বাণ পলাইল না ; সমস্ত দেহের স্নায়ুপেশী কঠিন করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'নির্বাণ, আর তুমি আমার সহিত কথা কহিবে না?'

নির্বাণ উত্তর দিল না ; কে যেন তাহার কণ্ঠ দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছে।

ইতি সশঙ্ক লঘু হস্তে তাহার বাহু স্পর্শ করিল।

'নির্বাণ, আর তুমি আমার মুখ দেখিবে না?'

ইতির কণ্ঠস্বরে শক্তি নাই—ভাঙা ভাঙা অর্ধোচ্চারিত উক্তি। নির্বাণের স্নায়ু-কঠিন দেহ অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল।

'নির্বাণ, একবার আমার পানে চাও'—ইতি চিবুক ধরিয়া নির্বাণের মুখ ফিরাইবার চেষ্টা করিল।

স্নায়ুপেশীর নিরুদ্ধ বন্ধন সহসা যেন ছিঁড়িয়া গেল ; জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় নির্বাণের উৎক্ষিপ্ত একটা বাহু ইতির মুখে গিয়া লাগিল। ইতি অস্ফুট একটা কাতরোক্তি করিয়া অধরের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

নির্বাণ ব্যাকুল চক্ষে একবার তাহার পানে চাহিল। তারপর—'না না—আমি ভিক্ষু—আমি ভিক্ষু—আমি ভিক্ষু—'

অন্ধের মতো, উন্মাদের মতো নির্বাণ সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

একজন অলক্ষিতে থাকিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন। কিন্তু তাঁহার অশান্ত চিত্ত আশ্বস্ত না হইয়া আরও দুর্বার ক্রোধে আলোড়িত হইয়া উঠিল। মার পরাভূত হয় নাই। সঙ্ঘ অশুচি হইয়াছে। এ-পাপ দূর করিতে হইবে—নচেৎ বুদ্ধের ক্রোধানলে সঙ্ঘ ভস্মীভূত হইবে।

কৃষ্ণাপঞ্চমীর ক্ষীয়মাণ চন্দ্র প্রায় মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

রাত্রি শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

সঙ্ঘ নিস্তব্ধ, কোথাও কোনও শব্দ নাই ; বুঝি ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতীক্ষায় নির্বাণ-সমাধিতে নিমগ্ন।

ভিক্ষু উচণ্ড স্থবিরের পরিবেণে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে গাত্রস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন সর্পশ্বাসবৎ স্বরে তাঁহার কর্ণে বলিলেন, 'আমার সঙ্গে আসুন।'

নিঃশব্দে দুইজনে ইতির প্রকোষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ম্লান তির্যক কাক-জ্যোৎস্না কক্ষের মসৃণ ভূমির উপর প্রতিফলিত হইতেছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে স্থবির দেখিলেন, ইতি একটি উচ্চ পীঠিকার উপর বসিয়া আছে ; আর, বেদীমূলে প্রণতি-রত উপাসকের ন্যায় নির্বাণ নতদেহে তাহার জানুর উপর মস্তক রাখিয়া স্থির হইয়া আছে। ইতির কটি হইতে ঊর্ধ্বাঙ্গ কেবল বিস্রস্ত কেশজাল দিয়া আবৃত ; শুভ্র মর্মরে রচিত মূর্তির ন্যায় তাহার যৌবন-কঠিন দেহ সগর্বে উন্নত হইয়া আছে ; আর দুই চক্ষু হইতে বিজয়িনীর নির্বোধ উল্লাস ও অশ্রু একসঙ্গে ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে।

স্থবির ডাকিলেন, 'নির্বাণ!'

নির্বাণ ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বার-সম্মুখে পিথুমিত্তকে দেখিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত

হইয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, 'থের, আমি সঙ্ঘের ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। আমার যথোপযুক্ত দণ্ড বিধান করুন।'

স্থবির কম্পিত স্বরে কহিলেন, 'নির্বাণ, তোমার অপরাধ গুরু। কিন্তু আমার অপরাধ তোমার অপেক্ষাও অধিক। আমি সব জানিয়া-বুঝিয়া তোমাকে সঙ্ঘে গ্রহণ করিয়াছিলাম বৎস!'

উচণ্ডের উগ্র কণ্ঠস্বরে স্থবিরের করুণাবাণী ডুবিয়া গেল, তিনি কহিলেন, 'থের, এই পতিত ভিক্ষু নিজমুখে পাপ খ্যাপন করিয়াছে, আমরাও স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন পাতিমোক্ষ অনুসারে উহার দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করুন।'

স্থবির কোনও কথাই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, অপরিসীম করুণায় তাঁহার অধর থর থর কাঁপিতে লাগিল।

উচণ্ড তখন কহিলেন, 'উত্তম, আমি এই ভিক্ষুর উপাধ্যায় ছিলাম, আমিই তাহার দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিতেছি। ভিক্ষু, তুমি পারাজিক ও সঙ্ঘাদিশেষ পাপে অপরাধী হইয়াছ, এই জন্য তুমি সঙ্ঘ হইতে বিচ্যুত হইলে। অদ্য হইতে সঙ্ঘের সীমাভুক্ত ভূমির উপর বাস করিবার অধিকার তোমার রহিল না; সঙ্ঘাধিকৃত খাদ্য বা পানীয়ে তোমার অধিকার রহিল না। ইহাই তোমার দণ্ড—বহিষ্কার! তুমি এবং তোমার পাপের অংশভাগিনী বুদ্ধের পবিত্র সঙ্ঘভুক্তি হইতে নির্বাসিত হইলে।'

এই দণ্ডাদেশের ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা ধীরে ধীরে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইল। ইহা মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু তবু কেহ কোনও কথা কহিল না। নির্বাণ নতমস্তকে সঙ্ঘের অমোঘ দণ্ডাজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইল। স্থবিরও মৌন রহিলেন। শুধু, পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে নির্বাণ ও ইতিকে কোলে টানিয়া লইয়া তাঁহার শীর্ণ গণ্ডে যে অশ্রুর ধারা নামিয়াছিল, এতদিন পরে আবার তাহা প্রবাহিত হইল।

উষালোক ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে ইতি ও নির্বাণ সঙ্ঘ হইতে বিদায় লইল। সঙ্ঘের পাদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইয়া পড়িল। কোথায় যাইতেছে তাহারা জানে না; এ যাত্রা কিভাবে শেষ হইবে তাহাও অজ্ঞাত। কেবল, উভয়ের বাহু পরস্পর দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া আছে, দুস্তর মরু-পথের ইহাই একমাত্র পাথেয়।

যত দূর দেখা গেল, প্রাচীন নির্বাপিত চোখে স্থবির সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে সূর্য উঠিল, দূরে দুইটি কৃষ্ণ বিন্দু আলোকের ধাঁধায় মিলাইয়া গেল। স্থবির ভাবিতে লাগিলেন, এই সূর্য মধ্যকাশে উঠিবে; তৃষ্ণা-রাক্ষসী প্রতীক্ষা করিয়া আছে—

উচণ্ড আসিয়া স্থবিরের পাশে দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'থের, আপনাকে উপদেশ দিবার স্পর্ধা আমার নাই। কিন্তু গৃহীজনোচিত মমত্ব কি নির্বাণ-লিপ্সু ভিক্ষুর সমুচিত?'

স্থবির কহিলেন, 'উচণ্ড, অদৃষ্টবিড়ম্বিতের প্রতি করুণা ভিক্ষুর পক্ষে নিন্দনীয় নহে। শাক্য সকল জীবের প্রতি করুণা করিতে বলিয়াছেন।'

'সত্য। কিন্তু সেই মহাভিক্ষু শাক্যই পাপীর দণ্ডবিধান পাতিমোক্ষ সৃজন করিয়াছেন। দণ্ডবিধির মধ্যে করুণার স্থান কোথায়? থের, এই সঙ্ঘ কেবল বাস্তব পাষাণ দিয়া গঠিত নয়, ভিক্ষুগণের নির্মমত্বের কঠিনতর মর্মর পাযাণে নির্মিত। তাই সংসারের শত ক্লেদ-পঙ্কিলতার মধ্যে প্রকৃতির রুদ্র বিক্ষোভ উপেক্ষা করিয়া সঙ্ঘ আজিও অটল হইয়া আছে। সঙ্ঘের ভিত্তিমূল যদি করুণার অশ্রুপঙ্কে আর্দ্র হইয়া পড়ে, তবে ধর্ম কয় দিন থাকিবে? করুণার যূপকাষ্ঠে নীতির বলিদান কদাপি মহাভিক্ষুর অভিপ্রেত ছিল না।'

স্থবির দীর্ঘকাল উত্তর দিলেন না; তারপর ক্লিষ্টস্বরে কহিলেন, 'উচণ্ড, মহাভিক্ষুর অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়। আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; কর্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।'

উচণ্ড প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি মনে করেন, পাতিমোক্ষ-মতে ভিক্ষুর দণ্ডদান অনুচিত হইয়াছে !'

'জানি না। বুদ্ধের ইচ্ছা দুরধিগম্য।'

'পাতিমোক্ষ কি বুদ্ধের ইচ্ছা নয় !'

'তাহাও জানি না।'

উচণ্ড তখন দুই হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া আকাশ লক্ষ্য করিয়া গভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'তবে বুদ্ধ নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করুন। গোতম, তুমি আমাদের সংশয় নিরসন কর। তোমার অলৌকিক শক্তির বজ্রালোকে সত্য পথ দেখাইয়া দাও।'

সেইদিন মধ্যাহ্নেবাতাস সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল ; কেবল প্রজ্বলিত বালুকার উপর হইতে এক প্রকার শিখাহীন অগ্নিবাষ্প নির্গত হইতে লাগিল। পঞ্চাগ্নি-পরিবেষ্টিত সঙ্ঘ যেন উগ্র তপস্যারত বিভূতিধূসর কাপালিকের ন্যায় এই বহ্নিশ্মশানে বসিয়া আছে। আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও একটি পক্ষী উড়িতেছে না। শব্দ নাই। চতুর্দিকে যেন একটা রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা।

মধ্যাহ্ন বিগত হইল ; খর্জুর বৃক্ষের ছায়া সভয়ে মূল ছাড়িয়া নির্গত হইবার উপক্রম করিল।

'থের !'

স্থবির অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উচণ্ড নীরবে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া দিক্‌প্রান্ত দেখাইলেন।

তাম্রতপ্ত আকাশের এক প্রান্তে চক্রবালরেখার উপর মুষ্টিপ্রমাণ কজ্জলমসী দেখা দিয়াছে। চিনিতে বিলম্ব হইল না। পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে এমনই মসী-চিহ্ন আকাশের ললাটে দেখা গিয়াছিল।

ভয়ার্ত কণ্ঠে উচণ্ড কহিলেন, 'থের, আঁধি আসিতেছে !'

স্থবিরের অধর একটু নড়িল, 'বুদ্ধের ইচ্ছা ! বুদ্ধের ইচ্ছা !'

উন্মত্তের ন্যায় স্থবিরের জানু আলিঙ্গন করিয়া উচণ্ড কহিলেন, 'থের, তবে কি আমি কি ভুল করিয়াছি ? তবে কি আমার পাপেই আজ সঙ্ঘ ধ্বংস হইবে ? ইহাই কি বুদ্ধের অলৌকিক ইঙ্গিত !'

দেখিতে দেখিতে আঁধি আসিয়া পড়িল। মরুভূমি ঝঞ্ঝাবিমথিত সমুদ্রের ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল ; গাঢ় অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে স্থবিরের কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল—'তমসো মা জ্যোতির্গময় ! তমসো মা জ্যোতির্গময় !'

উচণ্ড চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'আমি যাইব। তাহাদের ফিরাইয়া আনিব—তাহাদের ফিরাইয়া আনিব—' ক্ষিপ্তের মতো তিনি অলিন্দ হইতে নিম্নে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ; ঝড়ের হাহারবে তাঁহার চিৎকার ডুবিয়া গেল।

বালু ও বাতাসের দুর্মদ দুরন্ত খেলা চলিতে লাগিল। পৃথিবী প্রলয়ান্ত অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সঙ্ঘ নিমজ্জিত হইল।

স্থবিরের শীর্ণ প্রাচীন কণ্ঠ হইতে তখনও আকুল প্রার্থনা উচ্চারিত হইতেছে ; 'হে শাক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, হে গোতম, অন্তিমকালে আমাকে চক্ষু দাও ! তমসো মা জ্যোতির্গময়—তমসো মা জ্যোতির্গময়—'

মানবজাতির শমন-ধৃত কণ্ঠ হইতে আজিও ঐ আর্ত বাণীই নিঃসৃত হইতেছে।

১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৪



প্রাগ্‌জ্যোতিষ

১

আর্য দ্রাবিড় হূণ মোঙ্গল—প্রত্যেক মৌলিক জাতির জীবনেই একটা সময় আসে যেটাকে তাহার নবীন যৌবন বলা চলে ; যখন তপ্ত যৌবনের দুর্দমনীয় অপরিণামদর্শিতায় তাহারা বহু অসম্ভব ও হাস্যকর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে এবং শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ছাড়ে ।

যাহাদের আমরা আর্যজাতি বলিয়া জানি, তাহাদের জীবনে এই নবীন যৌবন আসিয়াছিল বোধ হয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধেরও আগে। পাঁজিপুঁথি তখনও জন্মগ্রহণ করে নাই ; আকাশের গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য স্বেচ্ছামত নিশ্চিন্ত মনে স্ব-স্ব কক্ষায় পরিভ্রমণ করিত—মানুষ তাহাদের গতিবিধি ও কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিতে আরম্ভ করে নাই ।

আর্য বীরপুরুষগণ ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়া আদিম অনার্যদিগকে বিন্ধ্যাচলের পরপারে খেদাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উপরন্তু তাহাদের রাক্ষস পিশাচ দস্যু প্রভৃতি নাম দিয়া কটূক্তি করিতেছিলেন। মনে হয়, সে-যুগেও শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাইবার প্রথা পুরাদস্তুর প্রচলিত ছিল ।

তারপর একদা অগস্ত্য মুনি কতিপয় সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া দক্ষিণাপথে অগস্ত্যযাত্রা করিলেন, আর ফিরিলেন না। রাক্ষস ও পিশাচগণ তাঁহাকে কাঁচা ভক্ষণ করিল কি না পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। যা হোক, তদবধি অন্যান্য আর্য বীরগণও বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ দিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিলেন ।

দুইজন নবীন আর্য যোদ্ধা সৈন্যসামন্ত লইয়া দক্ষিণাপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন এবং দেখিয়া-শুনিয়া খানিকটা উর্বর ভূভাগ হইতে কৃষ্ণকায় দস্যু-তস্করদের তাড়াইয়া স্বরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আর্য বীরপুরুষ দু'টির নাম—প্রদ্যুম্ন এবং মঘবা। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বন্ধুত্ব ।

আজকাল বন্ধুত্ব বস্তুটার তেমন তেজ নাই ; ইয়ারকি দিবার জন্যই বন্ধুকে প্রয়োজন হয়। সেকালে দস্যু ও রাক্ষস দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বন্ধুত্ব পুরামাত্রায় বিস্ফুরিত হইবার অবকাশ পাইত ।

দুই বন্ধুর যৌথ বাহুবলে রাজ্য স্থাপিত হইল। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল—রাজা হইবে কে ?

প্রদ্যুম্ন কহিলেন, 'মঘবা, তুই রাজা হ, আমি সেনাপতি হইব।'

মঘবা কহিলেন, 'উঁহু, তুই রাজা হ—আমি সেনাপতি।'

সমস্যার সমাধান হইল না ; বন্ধুকে বঞ্চিত করিয়া রাজা হইতে কেহই ব্যগ্র নয়। এদিকে নবলব্ধ রাজ্যটি এতই ক্ষুদ্র যে ভাগাভাগি করিতে গেলে কিছুই থাকে না, চটকস্য মাংসং হইয়া যায়। প্রজা ভাগাভাগি করিলেও শক্তিক্ষয় অনিবার্য—চারিদিকে শত্রু ওৎ পাতিয়া আছে। বন্ধুযুগল বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন ।

একদিন রাত্রিকালে আকাশে গোলাকৃতি চন্দ্র শোভা পাইতেছিল—অর্থাৎ পূর্ণিমার রাত্রি। প্রস্তরনির্মিত উচ্চ দুর্গের চূড়ায় দুই বন্ধু চিন্তাকুঞ্চিত ললাটে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্গটা অবশ্য বিতাড়িত অনার্য দস্যুদের নির্মিত ; আর্যেরা আদৌ দুর্গ নির্মাণ করিতে জানিতেন না। রামচন্দ্র লঙ্কায় রাবণের দুর্গ দেখিয়া একেবারে নির্বাক্‌ হইয়া গিয়াছিলেন ।

মঘবা তাঁহার পিঙ্গলবর্ণ দাড়ির মধ্যে ঘন ঘন অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মুক্ত ছাদে পায়চারি করিতেছিলেন। প্রকাণ্ড ষণ্ডা চেহারা, নীল চক্ষু ; মুদ্গরের মতো দৃঢ় ও নিরেট দেহ। চিন্তা করার অভ্যাস তাঁহার বিশেষ ছিল না, তাই দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইলেই তিনি নিজের দাড়ি ধরিয়া টানাটানি করিতেন।

প্রদ্যুম্নের চেহারাখানা অপেক্ষাকৃত লঘু কিন্তু সমধিক নিরেট ও দৃঢ় । মাথায় সোনালী চুল, চোখের মণি গাঢ় নীল। দাড়ি নাই ; গলা চুলকাইত বলিয়া তিনি তরবারির অগ্রভাগ দিয়া দাড়ি কামাইয়া ফেলিতেন। কেবল এক জোড়া সূক্ষ্ম গোঁফ ছিল। এই গোঁফে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে প্রদ্যুম্ন প্রাচীর-বেষ্টনীতে ঠেস দিয়া চাঁদের পানে ভ্রূকুটি করিতেছিলেন।

চাঁদ কিন্তু হাসিতেছিল। তাহার যে গুরুতর বিপদ আসন্ন হইয়াছে, পঞ্জিকা না থাকায় সে তার পূর্বাভাস পায় নাই।

সহসা মঘবা বলিলেন, 'একটা মতলব মাথায় আসিয়াছে। প্রদ্যুম্ন, আয় পাঞ্জা লড়ি—যে হারিবে তাহাকেই রাজা হইতে হইবে।'

প্রদ্যুম্ন গোঁফের আড়ালে শ্লেষ হাস্য করিলেন, 'জুচ্চুরির মতলব। গত যুদ্ধে আমার কব্জি মচকাইয়া গিয়াছে জানিস কি না!'

ব্যর্থ হইয়া মঘবা আবার দাড়ি টানিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, 'দু'জনে রাজা হইলে দোষ কি ?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'দু'জনে রাজা হইলে কে কাহার হুকুম মানিবে ? কে প্রজাদের হুকুম দিবে ?'

'তা বটে।'

'তবে দু'জনে রাজা হওয়া যায়। পর পর।'

'সে কি রকম ?'

'তুই কিছুদিন রাজা হইলি, আমি সেনাপতি। তারপর আমি রাজা হইলাম। এই আর কি।'

মঘবা ভাবিয়া বলিলেন, 'মন্দ কথা নয়। একদিন তুই রাজা, একদিন আমি।'

'উঁহু, অত তাড়াতাড়ি রাজা বদল করিলে গণ্ডগোল বাধিবে।'

'গণ্ডগোল কিসের ?'

'মনে কর, আমি রাজা হইয়া তোকে হুকুম দিলাম—সেনাপতি, শুনিয়াছি দক্ষিণে লম্বোদর নামক রাক্ষসদের রাজ্যে রসাল নামক এক প্রকার অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়, তুমি দ্রুত গিয়া ঐ ফল আহরণ করিয়া আন—আমার খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।—তুই ফল লইয়া ফিরিতে দিন কাবার হইয়া গেল, তুই রাজা হইলি আমি সেনাপতি বনিয়া গেলাম। তখন কে ফল খাইবে ?'

মঘবা বলিলেন, 'তাই তো। বড়ই ফ্যাসাদ দেখিতেছি।'

মনে রাখিতে হইবে, আর্যগণ তখনও স্থির হইয়া বসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা আরম্ভ করেন নাই ; দু'-একজন ঋষি হঠাৎ মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়া চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ এক-আধটা সূত্র উচ্চারণ করিয়া ফেলিতেন, এই পর্যন্ত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—এইরূপ ঋতু পরিবর্তনের কথা মোটামুটি জানা থাকিলেও, সময়কে সপ্তাহ মাস বৎসরে বিভাজিত করিবার বুদ্ধি তখনও গজায় নাই।

সুতরাং প্রদ্যুম্ন ও মঘবা বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন।

ওদিকে আকাশে চন্দ্রও ফাঁপরে পড়িয়াছিল। প্রদ্যুম্ন তাহার প্রতি ভ্রূকুটি করিবার জন্য চোখ তুলিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'আরে আরে, একি !'

মঘবাও দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত করিলেন। দেখিলেন, আকাশ নির্মেঘ, কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের

উপর ধূম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে ; করাল ছায়া ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।

দুই বন্ধুর মনে সশঙ্ক উত্তেজনার উৎপত্তি হইল। ব্যাপারটা পূর্বে কয়েক বার দেখা থাকিলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা প্রাকৃতিক ঘটনা বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই, ভূকম্পের মতো অপ্রত্যাশিত একটা মহাদুর্যোগ বলিয়াই বিবেচিত হইত। মঘবা দ্রুত আসিয়া প্রদ্যুম্নের হাত চাপিয়া ধরিলেন, গাঢ় স্বরে ফিসফিস করিয়া বলিলেন, 'চন্দ্রগ্রহণ !'

প্রদ্যুম্ন পাংশুমুখে বন্ধুকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'হাঁ, কিন্তু ভয় নাই। চাঁদ আবার মুক্ত হইবে। —ছেলেবেলায় বুড়া অঙ্গিরা ঋষির কাছে বিদ্যা শিখিতে কয়েক বার গিয়াছিলাম, বুড়া একদিন বলিয়াছিল আকাশে রাহু নামে একটা অদৃশ্য রাক্ষস আছে, সে মাঝে মাঝে চন্দ্র-সূর্যকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। কিন্তু বেশিক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারে না।'

'হাঁ, আমিও চার-পাঁচ বার দেখিয়াছি।'

'আমিও। মাঝে মাঝে এরূপ ঘটিয়া থাকে।'

দুই বন্ধু হাত-ধরাধরি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, বিপন্ন ম্রিয়মাণ চন্দ্র যেন একটা তাম্রবর্ণ অর্ধস্বচ্ছ অজগরের পেটের ভিতর দিয়া পশ্চাদভিমুখে চলিয়াছে। দুর্গের নিম্নে ভয়ার্ত জনগণ সমবেত হইয়া চিৎকার ও নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। দুষ্ট রাক্ষসগণ নাকি এইরূপ বিকট শব্দ শুনিলে ভয় পাইয়া পলায়ন করে।

দীর্ঘকাল পরে চাঁদের একটি চক্‌চকে কোণ বাহির হইয়া পড়িল। তারপর দেখিতে দেখিতে চন্দ্র সম্পূর্ণ অক্ষত দেহে সহাস্য মুখে রাক্ষসের কবল হইতে নির্গত হইয়া আসিলেন।

সকলে ঊর্ধ্বস্বরে মহা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। মঘবা প্রদ্যুম্নের হাত ছাড়িয়া দিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'যাক বাঁচা গেল।'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'শুধু তাই নয়, আমাদের সমস্যারও সমাধান হইয়াছে।'

'কিরূপ ?'

'শুন। আজ হইতে তুমি রাজা হইলে। আবার যখন চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে তখন তোমার রাজত্বকাল শেষ হইবে, আমি রাজা হইব। এইভাবে চলিতে থাকিবে।'

মঘবা ভাবিয়া বলিলেন, 'মন্দ কথা নয়। —কিন্তু প্রথমেই আমি রাজা হইব কেন ?'

'যেহেতু বুদ্ধিটা আমি বাহির করিয়াছি। এখন চলিলাম, কাল সকালে সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিব—সেনাপতির আর কাজ কি ? মহারাজ ইতিমধ্যে অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে থাকুন। মহারাজের জয় হোক।'

মুচকি হাসিয়া প্রদ্যুম্ন দুর্গশিখর হইতে নামিবার উপক্রম করিলেন। মঘবা অত্যন্ত মুষড়িয়া পড়িয়া দাড়ি টানিতে লাগিলেন।

মঘবার মাথায় বড় বেশি বুদ্ধি খেলে না, কিন্তু এখন সহসা তাহার মস্তিষ্করন্ধ্রে রাজবুদ্ধির উদয় হইল। তিনি গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, 'সেনাপতি প্রদ্যুম্ন !'

প্রদ্যুম্ন ফিরিয়া আসিয়া জোড়করে দাঁড়াইলেন।

'আজ্ঞা করুন মহারাজ।'

মহারাজ মঘবা মেঘমন্দ্র স্বরে বলিলেন, 'আজ্ঞা করিতেছি, কল্য প্রাতে আমি সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিব। যত দিন না ফিরি, তুমি অপত্যনির্বিশেষে প্রজা পালন করিতে থাক। রাত্রি গভীর হইয়াছে, এবার আমি রাজশয্যায় শয়ন করিতে চলিলাম।'

মুচকি হাসি হাসিতে মঘবা অভ্যস্ত নহেন, প্রদ্যুম্নের প্রতি একবার চোখ টিপিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

বোকা বনিয়া গিয়া প্রদ্যুম্ন বাম কর্ণের পশ্চাদ্ভাগ চুলকাইতে লাগিলেন।

২

নবযৌবনের প্রধান ধর্ম এই যে, সে জীবনটাকে গাম্ভীর্যের চশমার ভিতর দিয়া দেখে না ; জগৎ তাহার কাছে খেলার মাঠ ; যুদ্ধ একটা সরস কৌতুক, প্রেম একটা মাদক উত্তেজনা।

মহারাজ মঘবা মহানন্দে অর্ধেক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেলেন। রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে কোদণ্ড নামে এক অনার্য জাতি আছে, উদ্দেশ্য—তাহাদের উৎপীড়ন করা।

আধুনিক গণনায় যে-সময়টাকে তিন মাস বলা চলে, অনুমান তত দিন পরে মঘবা যুদ্ধযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিঙ্গল কেশ রুক্ষ, দেহে পশুচর্মের আবরণ ছিন্নভিন্ন, মুখে পরিতৃপ্ত বাসনার হাসি।

আসিয়াই তিনি প্রদ্যুম্নের পৃষ্ঠে বজ্রসম চপেটাঘাত করিলেন। বলিলেন, 'কি রে, কেমন আছিস ?'

দুই বন্ধু নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'রোগা হইয়া গিয়াছিস দেখিতেছি ; রাক্ষসদের মুল্লুকে কিছু খাইতে পাস নাই বুঝি ?' তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজের জয় হোক। আর্যের সমস্ত সংবাদ শুভ ?'

মঘবা বলিলেন, 'মন্দ নয়। কোদণ্ড ব্যাটাদের খুব ঠুকিয়াছি। শুধু তাই নয়, একটা মজার জিনিস আনিয়াছি, দেখাইব চল।'

বিজিত জাতির নিকট হইতে অপহৃত বহু বিচিত্র বস্তু এক দল সৈনিকের রক্ষণায় ছিল, মঘবা তাহাদের ইঙ্গিত করিয়া রাজভবন অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তারপর, রাজ্য কেমন চলিতেছে ? প্রজারা আনন্দে আছে ?'

'প্রজাদের আনন্দ সম্প্রতি বিলক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে।'

'কিরূপ ?'

'আর্য যোদ্ধৃগণের প্রাণে রসের সঞ্চার হইয়াছে। তাহারা অনার্য মেয়ে ধরিয়া আনিয়া পটাপট বিবাহ করিয়া ফেলিতেছে।'

মঘবা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, 'তাই নাকি ?—রোগ ছোঁয়াচে দেখিতেছি।'

প্রদ্যুম্ন মঘবার প্রতি বক্র কটাক্ষ করিলেন। মঘবা বলিলেন, 'কিন্তু উপায় কি ? এই দেশেই যখন বসবাস করিতে হইবে, তখন আর্য রক্ত নিষ্কলুষ রাখা অসম্ভব। আর্যাবর্ত হইতে এত মেয়ে আমদানি করা চলে না, অথচ বংশরক্ষাও না করিলে নয়। এই যে রাজ্য জয় করিলাম—কাহাদের জন্য ?'

প্রদ্যুম্ন শুধু বলিলেন, 'হুঁ।'

রাজা ও সেনাপতি মন্ত্রগৃহে গিয়া বসিলেন। সামন্ত সচিব শ্রেষ্ঠী বিদূষক কিছুই নাই, সুতরাং মন্ত্রণাগৃহ শূন্য। চার জন সৈনিক একটা বৃহৎ বেত্র-নির্মিত পেটারি ধরাধরি করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিল। পেটারির মুখ ঢাকা, ভিতরে গুরুভার কোনও দ্রব্য আছে মনে হয়।

বিস্মিত প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'কি আছে ইহার মধ্যে ? অজগর সাপ নাকি ?'

মঘবা হস্তসঞ্চালনে সৈনিকদের বিদায় করিয়া হাসিতে হাসিতে পেটারির ঢাকা খুলিয়া দিলেন।

সাপুড়ের ঝাঁপি খোলা পাইয়া কৃষ্ণকায় সর্পী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনই একটি নারী পেটারির মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নীলাঞ্জন চোখে ধিকি ধিকি বিদ্যুৎ।

প্রদ্যুম্ন হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহার ব্যাদিত মুখ হইতে বাহির হইল, 'আরে একি ! এ যে একটি মেয়ে।'

মঘবা অট্টহাস্য করিলেন ; তারপর বলিলেন, 'কেমন মেয়ে ? সুন্দর নয় ?'

প্রদ্যুম্ন নীরবে বন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন। মার্জিত তাম্রফলকের ন্যায় দেহের বর্ণ ; দলিতাঞ্জন দু'টি চোখ, দলিতাঞ্জন চুল। বস্ত্র-অলঙ্কারের বাহুল্য নাই ; গলায় একটি বীজের মালা, বাহুতে শঙ্খের অঙ্গদ ; কবরী ও কর্ণে পুষ্পভূষা শুকাইয়া গিয়াছে। কটি হইতে জানু পর্যন্ত একটি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত পট্টাংশু। কৃশাঙ্গী যুবতীর যৌবনমেদুর দেহের অভ্যন্তর হইতে যেন কৃশানুর দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

মঘবা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি মনে হয় ? সুন্দর নয় ?'

প্রদ্যুম্ন চমকিয়া মঘবার দিকে ফিরিলেন, তারপর ভর্ৎসনাপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'তুই একটা আস্ত গোঁয়ার। যুদ্ধ করিতে গিয়া মেয়ে ধরিয়া আনিলি। এখন ইহাকে লইয়া কি করিবি ?'

ইহাকে দিয়া যে দাসীকিঙ্করীর কাজ চলিবে না, তাহা একবার দৃষ্টি করিয়াই আর সংশয় থাকে না।

মঘবা বলিলেন, 'ঠিক করিয়াছি বিবাহ করিব।'

প্রদ্যুম্ন সচকিতে বলিলেন, 'বিবাহ !'

'হাঁ। ও কে জানিস ? কোদণ্ডরাজার মেয়ে।'

প্রদ্যুম্নের মুখ সহসা গম্ভীর হইল। মঘবা বলিতে লাগিলেন, 'কোদণ্ডদের রাজপুরী দখল করিয়া দেখিলাম সকলে পলাইয়াছে, কেবল মেয়েটা একা দাঁড়াইয়া আছে। ভারি ভাল লাগিল। ওকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না। তাই পেটারি বন্ধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছি। আর্য রাজার মহিষী হইবার যোগ্য মেয়ে বটে ; কিন্তু উহাকে আগে আর্যভাষা শিখাইতে হইবে। তারপর আমার পট্টমহিষী করিব।'

প্রদ্যুম্ন আর একবার যুবতীর পানে ফিরিয়া দেখিলেন। সে তাহাদের কথাবার্তার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই ; কেবল তাহার চোখ দু'টি একের মুখ হইতে অন্যের মুখে যাতায়াত করিতেছে। তাহার মুখে ভয় বা আশঙ্কার চিহ্ন কিছুই নাই ; আছে কেবল এই বর্বরদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ঘৃণাপূর্ণ গর্বিত জিজ্ঞাসা।

ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া প্রদ্যুম্ন মঘবার দিকে ফিরিলেন, 'অন্যায় করিয়াছ মঘবা। হাজার হোক রাজার মেয়ে, তাহাকে এভাবে ধরিয়া আনা আর্য শিষ্টতা হয় নাই।'

মঘবা বলিলেন, 'বিবাহ করিবার জন্য কন্যা হরণ করিলে আর্য শিষ্টতা লঙ্ঘন হয় না।'

'হয় ! অরক্ষিতা মেয়েকে ধরিয়া আনা তস্করের কাজ ! এই দণ্ডে এই কন্যাকে ফেরত পাঠানো উচিত !'

তপ্তকণ্ঠে মঘবা বলিলেন, 'কখনই না— !' তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিলেন, 'আমি মহারাজ মঘবা, তোমাকে আদেশ করিতেছি, সেনাপতি প্রদ্যুম্ন, তুমি এই কন্যার যোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা কর—যাহাতে সুখে থাকে অথচ পলাইতে না পারে।—মনে থাকে যেন, কন্যা পলাইলে দায়িত্ব তোমার।'

প্রদ্যুম্ন একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর যুক্তকরে মস্তক অবনত করিয়া শুষ্কস্বরে কহিলেন, 'মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।'

দুর্গচূড়ার কূটকক্ষে ভাবী রাজমহিষীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। কোদণ্ড-কন্যা দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে অকম্পিত পদে দুর্গ-শীর্ষের কারাগারে প্রবেশ করিলেন। কার্যত কারাগার হইলেও স্থানটি প্রশস্ত অলিন্দযুক্ত একটি মহল। সকল সুবিধাই আছে, শুধু পলাইবার অসুবিধা।

মঘবা সহর্ষে প্রদ্যুম্নের পৃষ্ঠে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, 'রানীর মতো রানী পাওয়া গিয়াছে—কি বলিস ?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'হুঁ।'

৩

পরদিন প্রাতঃকালে কিন্তু গুরুতর সংবাদ আসিল। কোদণ্ডদেশ হইতে সদ্যপ্রত্যাগত নিরতিশয় নির্জীব একটি ভগ্নদূত জানাইল যে, রাজকন্যা-হরণের কথা জানিতে পারিয়া পলাতক কোদণ্ড জাতি আবার কাতারে কাতারে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। মঘবা যে অল্পসংখ্যক আর্যকটক থানা দিবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন, শত্রুর অতর্কিত ক্ষিপ্রতায় তাহারা কচুকাটা হইয়াছে—কেবল ভগ্নদূত পদদ্বয়ের অসাধারণ ক্ষিপ্রতাবশত প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে। পরিস্থিতি অতিশয় ভয়াবহ।

শুনিয়া প্রদ্যুম্ন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, 'মহারাজ, অনুমতি দিন শ্যালকদের টিট করিয়া আসি।'

মঘবা কিন্তু রাজী হইলেন না, বলিলেন, 'তাহা হয় না। টিট করিতে হয় আমি করিব।'

সৈন্য সাজাইয়া আবার মঘবা বাহির হইলেন। কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রদ্যুম্নকে বলিলেন, 'ইতিমধ্যে মেয়েটাকে তুই আর্যভাষা শেখাস্।'

মনের ক্ষুব্ধতা গোপন করিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আচ্ছা।'

দু'-এক দিনের মধ্যেই প্রদ্যুম্ন বুঝিতে পারিলেন, অনার্য মেয়েটি অতিশয় মেধাবিনী। অষ্টাহমধ্যে সে ভাঙা ভাঙা কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

তাহার নাম এলা। অনার্য নাম বটে, কিন্তু শুনিতে ও বলিতে বড় মিষ্ট। প্রদ্যুম্ন কয়েক বার উচ্চারণ করিলেন, 'এলা ! এলা ! বাঃ ! বেশ তো।'

কথা কহিতে শিখিয়াই এলা প্রথম প্রশ্ন করিল, 'ও লোকটা কে ? যে আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে ?'

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আমার বন্ধু।'

বন্ধু শব্দের ভাবার্থ বুঝিতে এলার কিছু বিলম্ব হইল। অবশেষে বুঝিতে পারিয়া সে নাক সিঁটকাইল ; তীব্র অবজ্ঞার কণ্ঠে বলিল, 'তোমরা বর্বর।'

প্রদ্যুম্ন অবাক হইয়া গেলেন ; ভাবিলেন, কি আশ্চর্য ! আমরা বর্বর !

ক্রমশ এলা আর্যভাষায় কথা কহিতে লাগিল—কোনও কথা বলিতে বা বুঝিতে তাহার বাধে না। একদিন জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে এখানে ধরিয়া রাখিয়াছ কেন ?'

প্রদ্যুম্ন ঢোক গিলিয়া বলিলেন, 'আর্যভাষা শিখাইবার জন্য।'

এলা বলিল 'ছাই ভাষা। ইহা শিখিয়া কি হইবে ?'

প্রদ্যুম্ন একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন, 'প্রেমালাপ করিবার সুবিধা হইবে। মহারাজ মঘবা তোমাকে বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন।'

এলা বসিয়া ছিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুক্ষণ অপলক নেত্রে প্রদ্যুম্নের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর আবার বসিয়া পড়িয়া নিশ্চিন্ত স্বরে বলিল, 'উহাকে আমি বিবাহ করিব না। বর্বর !'

প্রদ্যুম্ন স্তোক দিবার জন্য বলিলেন, 'মঘবা দাড়ি রাখে বটে, কিন্তু লোক খারাপ নয়—'

এলা শুধু বলিল, 'বর্বর !'

এমনি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু মঘবার দেখা নাই—তিনি কোদণ্ডদের টিট করিলেন অথবা কোদণ্ডেরা তাঁহাকে টিট করিল, কোনও সংবাদ নাই ! প্রদ্যুম্ন উতলা হইয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে তিন মাস অতীত হইয়া গেল।

একদিন প্রাতঃকালে প্রদ্যুম্ন এলার কূটগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এলা বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বেণী উন্মোচন করিতেছে। প্রদ্যুম্নকে দেখিয়া সে একবার ঘাড় ফিরাইল, তারপর আবার বাহিরের দূর দৃশ্যের পানে তাকাইয়া বেণীর বিসর্পিল বয়ন মোচন করিতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন গলা ঝাড়া দিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। তখন তিনি বাতায়ন-সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ; আকাশের দিকে তাকাইলেন, নিম্নে উঁকিঝুঁকি মারিলেন, তারপর পুনশ্চ গলাখাঁকারি দিয়া বলিলেন, 'শীত আর নাই ; দিব্য গরম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।'

এলা বলিল, 'হুঁ।'

উৎসাহ পাইয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'আজকাল দক্ষিণ হইতে যে হাওয়া বহিতেছে, তাহাকেই বুঝি তোমরা মলয় সমীরণ বলিয়া থাক ? আর্যাবর্তে এ হাওয়া নাই।'

এলা তাঁহার দিকে গম্ভীর চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল, 'দু-দিন আসা হয় নাই কেন ?'

প্রদ্যুম্ন থতমত খাইয়া বলিলেন, 'ব্যস্ত ছিলাম',—একটু থামিয়া—'তোমার তো আর আর্যভাষা শিখিবার প্রয়োজন নাই। যাহা শিখিয়াছ তাহাতেই আমাদের সকলের কান কাটিয়া লইতে পার।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না ; এলা নতনেত্রে মুক্ত বেণী আবার বিনাইতে লাগিল। শেষে প্রদ্যুম্ন পূর্ব কথার জের টানিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মঘবা আসিয়া পড়িলে বাঁচা যায়। অনেক দিন হইয়া গেল, এখনও তাহার কোন খবর নাই।—দুর্ভাবনা হইতেছে।'

এলা তিলমাত্র সহানুভূতি না দেখাইয়া নির্দয়ভাবে হাসিল, বলিল, 'তোমার মঘবা আর ফিরিবে না, আমার স্বজাতিরা তাহাকে শেষ করিয়াছে।'

ক্রুদ্ধ চক্ষে চাহিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'মঘবাকে শেষ করিতে পারে এমন মানুষ দাক্ষিণাত্যে নাই। সে মহাবীর !'

তাচ্ছিল্যভরে এলা বলিল, 'বর্বর।'

অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'ঐ বর্বরকেই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে।'

ভ্রূভঙ্গি করিয়া এলা বলিল, 'তাই নাকি ! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ?'

'তুমি তো বন্দিনী। তোমার আবার ইচ্ছা কি ?'

প্রত্যেকটি শব্দ কাটিয়া কাটিয়া এলা উত্তর দিল, 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে বিবাহ করিতে পারে এমন পুরুষ তোমাদের আর্যাবর্তে জন্মে নাই—এই বীজের মালা দেখিতেছ ?' এলা দুই আঙুলে নিজ কণ্ঠের বীজমালা তুলিয়া দেখাইল, 'একটি বীজ দাঁতে চিবাইতে যেটুকু দেরি—আর আমাকে পাইবে না।'

প্রদ্যুম্ন সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, 'কি সর্বনাশ—বিষ !—দাও, শীঘ্র মালা আমায় দাও।'

এলা দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, 'এত দিন তোমাদের বন্দিনী হইয়া আছি, ভাবিয়াছ আমি অসহায়া ? তোমাদের খেলার পুতুল ? তাহা নহে। যখন ইচ্ছা আমি মুক্তি লইতে পারি।'

প্রদ্যুম্ন মূঢ়ের মতো তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তবে লও নাই কেন ?'

এলা ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল ; তারপর গর্বিত স্বরে বলিল, 'সে আমার ইচ্ছা।'

এই সময় বাতায়নের বাহিরে দূর উপত্যকায় শঙ্খের গভীর নির্ঘোষ হইল। চমকিয়া প্রদ্যুম্ন

সেই দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সীমান্তের বনানীর ভিতর হইতে ধ্বজকেতনধারী আর্যসেনা ফিরিয়া আসিতেছে। ললাটের উপর করতলের আচ্ছাদন দিয়া প্রদ্যুম্ন সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, 'যাক, বাঁচা গেল—মঘবা ফিরিয়াছে !'

প্রদ্যুম্ন তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। পিছন হইতে এলার শান্ত কণ্ঠস্বর আসিল, 'আমিও বাঁচিলাম, মুক্তির আর দেরি নাই।'

প্রদ্যুম্ন চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এলা তেমনি দাঁড়াইয়া বেণী বয়ন করিতেছে, তাহার মুখে সূচীবিদ্ধ মৃত প্রজাপতির মতো একটুখানি হাসি।

প্রদ্যুম্ন তাহার কাছে ফিরিয়া গিয়া অনুনয়ের কণ্ঠে বলিলেন, 'এলা, ছেলেমানুষি করিও না। মঘবাকে বুঝিতে সময় লাগে, বিবাহের পর বুঝিতে পারিবে তাহার মতো মানুষ হয় না—মিনতি করিতেছি, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ একটা কিছু করিয়া বসিও না।'

এলা বলিল, 'হঠাৎ কোনও কাজ করা আমার অভ্যাস নয় ; আমি কোদণ্ড-কন্যা, বর্বর নহি। যদি মঘবা বলপূর্বক আমাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করে, বিবাহের সভায় আমি মুক্তি লইব।'

৪

মঘবা বলিলেন, 'কোদণ্ডদের ভাল রকম কাবু করিতে পারিলাম না। ক্ষেপিয়া গেলে ব্যাটারা ভীষণ লড়ে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত সন্ধি করিয়াছে।'

প্রদ্যুম্ন প্রশ্ন করিলেন, 'সন্ধির শর্ত কিরূপ ?'

মঘবা উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন, 'চমৎকার। অদ্ভুত জাত এই কোদণ্ড, আশ্চর্য তাহাদের রীতিনীতি।—জানিস, ওদের জাতে মেয়ে বাপের উত্তরাধিকারিণী হয়, ছেলে মামার সম্পত্তি পায় ! শুনিয়াছিস কখনও ?'

মাথা নাড়িয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'না। কিন্তু সন্ধির শর্ত কিরূপ ?'

'শর্ত এই—কোদণ্ডের রাজকন্যা অপহরণ করাতে তাহাদের মর্যাদায় বড় আঘাত লাগিয়াছে ; এই কলঙ্ক-মোচনের একমাত্র উপায় কন্যাকে বিবাহ করা। বিবাহ না করিলে তাহারা যুদ্ধ করিবে, কিছুতেই শুনিবে না। আর যদি বিবাহ করি, তবে উত্তরাধিকারসূত্রে কোদণ্ডদের রাজা হইব। গুরুতর শর্ত নয় ?' বলিয়া মঘবা গলা ছাড়িয়া হাসিতে লাগিলেন।

প্রদ্যুম্ন কিয়ৎকাল হেঁটমুখে রহিলেন, তারপর ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'গুরুতর বটে।'

মঘবা বলিলেন, 'সুতরাং আর বিলম্ব নয়, তাড়াতাড়ি কোদণ্ড-কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলা দরকার।—মেয়েটা ঠিক আছে তো ?'

'ঠিক আছে।'

'আর্যভাষা কেমন শিখিল ?'

'বেশ।'

'তবে কালই বিবাহ করিব।'

কিছু কাল নীরব থাকিয়া প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'কন্যার মতামত জানিবার প্রয়োজন নাই ?'

'কিছুমাত্র না। এ রাজকীয় ব্যাপার, কথার নড়চড় চলিবে না। সন্ধির শর্ত পালন করিতেই হইবে।'

সেই দিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন চোরের মতো এলার মহলে প্রবেশ করিলেন। আকাশে প্রায় পূর্ণাবয়ব চন্দ্র গবাক্ষপথে কিরণস্রোত ঢালিয়া দিতেছে; সেই জ্যোৎস্নার তলে মাটিতে পড়িয়া এলা ঘুমাইতেছে। ঘরে প্রদীপ নাই।

নিঃশব্দে প্রদ্যুম্ন তাহার কাছে গেলেন; হাঁটু গাড়িয়া তাহার পাশে বসিলেন; নিশ্বাস রোধ করিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন।

এলা ঘুমাইতেছে, কিন্তু তাহার চক্ষের কোণ বাহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। স্বপ্নে এলা গদগদ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছে—'প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন! আমি মরিতে চাহি না...তুমি কেমন মানুষ...কিছু বুঝিতে পার না?...বর্বর!...আমাকে উদ্ধার কর...প্রদ্যুম্ন! প্রদ্যুম্ন...'

যে-কার্য করিতে আসিয়াছিলেন তাহা করা হইল না, বীজের মালা এলার কণ্ঠেই রহিল। প্রদ্যুম্ন চোরের মতো নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইল। মঘবা রাত্রির জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, বলিলেন, 'প্রদ্যুম্ন, এবার বিবাহের আয়োজন কর।'

রাজভবনের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ধুনির মতো অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ হইবে। হোমাগ্নির পুরোভাগে বরবধূর কাষ্ঠাসন-পীঠিকা সন্নিবেশিত হইল।

বিবাহের সংবাদ পূর্বাহ্নেই প্রচারিত হইয়াছিল; উৎসুক জনমণ্ডলী প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিল।

বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া প্রদ্যুম্ন একদৃষ্টে অগ্নির পানে তাকাইয়া আছেন; একবার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

মঘবা আসিয়া স্কন্ধে হাত রাখিতে তাহার চমক ভাঙ্গিল, অগ্নি হইতে চক্ষু তুলিয়া সম্মুখে চাহিলেন। সম্মুখেই চন্দ্র; বৃক্ষশাখার অন্তরাল ছাড়াইয়া এইমাত্র ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। প্রদ্যুম্ন সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মঘবা বলিলেন, 'রাত্রি হইয়াছে, বিবাহের সময় উপস্থিত। তুই এবার গিয়া বধূকে লইয়া আয়।'

প্রদ্যুম্ন ধীরে ধীরে মঘবার দিকে ফিরিলেন; গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, 'সেনাপতি মঘবা!'

মঘবা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন। রাজা হওয়ার অভ্যাস তাঁর প্রাণে এমনই বসিয়া গিয়াছিল যে প্রথমটা কিছু বুঝিতেই পারিলেন না। তারপর প্রদ্যুম্নের দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই চাঁদের প্রতি চক্ষু পড়িল।

আকাশ নির্মেঘ কিন্তু চন্দ্রের শুভ্র মুখের উপর ধূম্রবর্ণ ছায়া পড়িয়াছে; করাল ছায়া ধীরে ধীরে চন্দ্রকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে।

প্রদ্যুম্ন বলিলেন, 'সেনাপতি মঘবা, আমি বধূকে আনিতে যাইতেছি; সন্ধির শর্ত রক্ষার জন্য আমিই তাহাকে বিবাহ করিব। ইতিমধ্যে তুমি প্রজামণ্ডলকে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দাও।'

মঘবা কিয়ৎকাল স্তম্ভের মতো নিশ্চল হইয়া রহিলেন। তারপর তাঁহার প্রচণ্ড অট্টহাস্যে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল।

সহসা হাস্য থামাইয়া মঘবা করজোড়ে বলিলেন, 'যে আজ্ঞা মহারাজ।'

এলা বাতায়নের পাশে বসিয়া ছিল, প্রদ্যুম্ন প্রবেশ করিতেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

'আমাকে লইতে আসিয়াছ?'

'হাঁ রাজকুমারী। কোদণ্ডদের সহিত আমাদের সন্ধি হইয়াছে; তাহার শর্ত এই যে, আর্যরাজা

কোদণ্ড-কন্যাকে বিবাহ করিবেন। আমরা ধর্মত এই শর্ত পালন করিতে বাধ্য।'

'আর কিছু বলিবার আছে ?'

'সামান্য। ঘটনাক্রমে আমি এখন আর্যরাজা, মঘবা আমার সেনাপতি। সুতরাং বিবাহ করিতে হইলে আমাকেই বিবাহ করিতে হইবে।'

এলা দীর্ঘকাল বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল ; শেষে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, 'কি বলিলে ?'

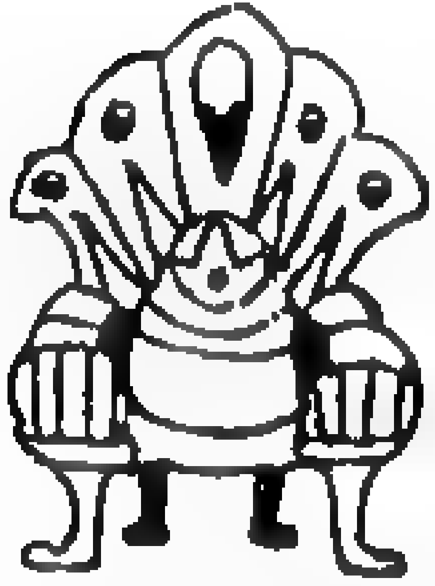
প্রদ্যুম্ন রাজকীয় গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, 'আমাকে বিবাহ করিতে হইবে। এখন চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেল, বিবাহ করিবে, না বীজ ভক্ষণ করিবে।'

স্বপ্নের অবরুদ্ধ আকুলতা এতক্ষণে বন্যার মতো নামিয়া আসিল, দলিতাঞ্জন চক্ষু দুইটি ছাপাইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন বাতায়নের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'গ্রহণ ছাড়িতে এখনও বিলম্ব আছে। ততক্ষণ তোমাকে বিবেচনা করিবার সময় দিলাম।'

বর্ষণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-চমকের মতো হাসি হাসিয়া এলা বলিল, 'বর্বর !'

৯ আষাঢ় ১৩৪৬



তক্ত্ মোবারক

১

মুরশিদাবাদের প্রাচীন রাজপ্রাসাদের অনাবৃত চত্বরে বহুদিন ধরিয়া একখানি রাজসিংহাসন পড়িয়া থাকিত। ইহার নাম তক্ত্ মোবারক—মঙ্গলময় সিংহাসন। অতি সাধারণ প্রস্তরে নির্মিত অনতিবৃহৎ সিংহাসন, বোধ করি দেড় শত বৎসর এমনি অনাদরে অবহেলায় পড়িয়াছিল। যে বণিক-সম্প্রদায়ের তুলাদণ্ড সহসা একদিন রাজদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহারা সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে আপন সিংহাসন লইয়া আসিয়াছিলেন, এই পুরাতন সিংহাসন ব্যবহার করেন নাই। তক্ত্ মোবারকে শেষ উপবেশন করিয়াছিলেন প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর।

পরবর্তী কালে লর্ড কার্জন প্রত্নরক্ষায় তৎপর হইয়া এই সিংহাসন কলিকাতায় আনয়ন করেন, পরে উহা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রক্ষিত হয়।

তক্ত্ মোবারক—মঙ্গলময় সিংহাসন ! কথিত আছে, এখনও গ্রীষ্মকালে এই সিংহাসনের পাষাণগাত্র বহিয়া রক্তবর্ণ স্বেদ ঝরিতে থাকে, যেন বিন্দু বিন্দু রক্ত ক্ষরিত হইতেছে। সেকালে মুরশিদাবাদের মুসলমানদের মধ্যে বিশ্বাস ছিল, বাদশাহীর অতীত গৌরবগরিমা স্মরণ করিয়া তক্ত্ মোবারক শোণিতাশ্রু বিসর্জন করে। কিন্তু তাহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। তক্ত্ মোবারকের শোণিত-ক্ষরণের ইতিকথা আরও নিগূঢ়, আরও মর্মান্তিক।

তক্ত্ মোবারকের মতো এমন অভিশপ্ত সিংহাসন বোধ করি পৃথিবীতে আর নাই। সুবা বিহারের অন্তর্ভুক্ত মুঙ্গের শহরে এই সিংহাসন নির্মিত হইয়াছিল, সম্রাট সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা আদেশ দিয়া উহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। জন্মক্ষণ হইতেই অভিশাপের কালকূট যে এই সিংহাসনের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডটি নিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে সুজা তাহা জানিতেন না, বোধ

হয় শেষ পর্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই ; এই বিশেষত্বহীন স্থূল কারুকার্য-খচিত সিংহাসনটির প্রতি তাঁহার অহেতুক মোহ জন্মিয়াছিল।

তখন সাজাহানের রাজত্বশেষে ভ্রাতৃযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ঔরংজেবের নিকট পরাভূত হইয়া সুলতান সুজা পলায়নের পথে কিছুকাল মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়াছিলেন ; তারপর ঔরংজেবের সেনাপতি মীরজুম্‌লার তাড়া খাইয়া সেখান হইতে রাজমহলে পলায়ন করেন। তক্ত্ মোবারক তাঁহার সঙ্গে ছিল। কিন্তু রাজমহলেও বেশি দিন থাকা চলিল না, তিনি সিংহাসন লইয়া ঢাকায় গেলেন।

মীরজুম্‌লা যখন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন তখন সুজার শোচনীয় অবস্থা ; তিনি তক্ত্ মোবারক ঢাকায় ফেলিয়া আরাকানে পলায়ন করিলেন। অতঃপর যে রক্ত-কলুষিত স্বখাত-সলিলে তাঁহার সমাধি হইল তাহার বহু কিম্বদন্তী আছে, কিন্তু জীবিতলোকে আর তাঁহাকে দেখা যায় নাই। শাহেনশা বাদশার পুত্র এবং ময়ূর সিংহাসনের উমেদার সুজার ইতিবৃত্ত এইখানেই শেষ। অভিশাপ কিন্তু এখনই শেষ হইল না।

পরিত্যক্ত সিংহাসন মীরজুম্‌লার কবলে আসিল। মীরজুম্‌লা অন্তরে অন্তরে দুরন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন ; সুবা বাংলার সিংহাসনের উপর তাঁহার লোভ ছিল। তক্ত্ মোবারক হাতে পাইয়া তাঁহার লোভ আরও বাড়িল। কিন্তু ঔরংজেবকে তিনি যমের মতো ভয় করিতেন। একদিন গোপনে তিনি নিজ শিবিরে তক্ত্ মোবারকের উপর মসলন্দ পাতিয়া বসিলেন এবং আলবোলায় অম্বুরী তামাকু সেবন করিতে করিতে প্রভু-দ্রোহিতার স্বপ্ন দেখিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

অতঃপর তক্ত্ মোবারক কি করিয়া ঢাকা হইতে আবার পশ্চিম বঙ্গে ফিরিয়া আসিল তাহার কোনও ইতিহাস নাই। নবাবী আমলে মুরশিদকুলি খাঁর জামাতা সুজা খাঁ এই সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হইল।

তাঁহার পুত্র সরফরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। সরফরাজকেও বেশি দিন রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। গিরিয়ার প্রান্তরে বিদ্রোহী ভৃত্য আলিবর্দির সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। আলিবর্দি শূন্য সিংহাসন দখল করিলেন।

আলিবর্দির পালা শেষ হইলে আসিলেন সিরাজদ্দৌলা। তাঁহার পর মীরজাফরও এই সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তারপর যবনিকা পড়িল।

তক্ত্ মোবারকের রক্তক্ষরণ শোকাশ্রু নয়! ইহার মূল উৎস অন্বেষণ করিতে হইলে তক্ত্ মোবারকের রচয়িতা মুঙ্গের নিবাসী খ্বাজা নজর বোখারী নামক জনৈক প্রস্তর-শিল্পীর জীবন কাহিনী অনুসন্ধান করিতে হয়। কে ছিল এই খ্বাজা নজর বোখারী ?

তক্ত্ মোবারকের গায়ে পারস্য ভাষায় নিম্নোক্ত কথাগুলি খোদিত আছে—'এই পরম মঙ্গলময় তক্ত্ মোবারক সুবা বিহারের মুঙ্গের শহরে ১০৫২ সালের ২৭ শাবান তারিখে দাসানুদাস খ্বাজা নজর বোখারী কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।'

এই পরম মঙ্গলাস্পদ তক্ত্ মোবারকের প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডে শিল্পী খ্বাজা নজর বোখারী তাহার পিতৃহৃদয়ের জ্বলন্ত রক্তাক্ত অভিশাপ ঢালিয়া দিয়াছিল। যতদিন সিংহাসনের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন এই অভিশাপের বিষক্রিয়া শান্ত হইবে না। শুধু সুলতান সুজার বিরুদ্ধেই নয়, এ অভিশাপ গর্বান্ধ উচ্ছৃঙ্খল রাজশক্তির বিরুদ্ধে, মানুষের মনুষ্যত্বকে যাহারা শক্তির দর্পে অপমান করে তাহাদের বিরুদ্ধে। তাই বোধ হয় ইহার ক্রিয়া এখনও শেষ হয় নাই।

২

মুঙ্গেরে উত্তরবাহিনী গঙ্গা প্রাচীন কেল্লার কোল দিয়া বহিয়া গিয়াছে। আজ হইতে তিন শত বছর আগেকার কথা ; কিন্তু তখনই মুঙ্গেরের কেল্লা পুরাতন বলিয়া পরিগণিত হইত। তাহারও শতাধিক বর্ষ পূর্বে লোদি বংশের এক নরপতি বিহার পুনরধিকার করিতে আসিয়া মুঙ্গেরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখনও এই কেল্লা দণ্ডায়মান ছিল। কোন্ স্মরণাতীত যুগে কাহার দ্বারা এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল কেহ জানে না। হিন্দুরা বলিত, জরাসন্ধের দুর্গ।

মুঘল বাদশাহীর আমলে মুঙ্গের শহরের বিশেষ প্রাধান্য ছিল না ; ইতিহাসের পাকা সড়ক হইতে শহরটি দূরে পড়িয়া গিয়াছিল। যে সময়ের কথা, সে সময় একজন মুঘল ফৌজদার কিছু সৈন্য সিপাহী লইয়া এই দুর্গে বাস করিতেন বটে কিন্তু দীর্ঘ শান্তির যুগে দুর্গটিকে যত্নে রাখিবার কোনও সামরিক প্রয়োজন কেহ অনুভব করে নাই ; প্রাকারের পাথর খসিয়া পড়িতেছিল, চারিদিকের পরিখা প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছিল।

দুর্গের পূর্ব দক্ষিণ ও উত্তরে তিনটি দ্বার ; তিনটি সেতু পরিখার উপর দিয়া বহির্ভূমির সহিত দুর্গের সংযোগ রক্ষা করিয়াছে। পরিখা পরপারের দুর্গকে বেষ্টন করিয়া অর্ধচন্দ্রাকার শহর। শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের বাস। হিন্দুরা প্রাতঃকালে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিত, তারপর ঘৃত, তিসি ও তেজারতির ব্যবসা করিত ; মুসলমানেরা প্রতি শুক্রবারে দুর্গমধ্যস্থ 'পীর শাণফা' নামক পীরের দরগায় শিরনি চড়াইত। তাহাদের জীবনযাত্রায় অধিক বৈচিত্র্য ছিল না।

একদিন ফাল্গুন মাসের মধ্যাহ্নে কেল্লার দক্ষিণ দরজার বাহিরে, পরিখার অগভীর খাত যেখানে গঙ্গার স্রোতের সহিত মিলিয়াছে সেইখানে বসিয়া একটি যুবক মাছ ধরিতেছিল। অনেকগুলি নামগোত্রহীন গাছ হলুদবর্ণ ফুলের ঝালর ঝুলাইয়া স্থানটিকে আলো করিয়া রাখিয়াছে ; সম্মুখে বিপুলবিস্তার গঙ্গার বুকে দুই-একটি চর জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময় প্রায় প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে পশ্চিম হইতে বাতাস ওঠে, চরের বালু উড়িয়া আকাশ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া যায়। গৃহবাসী মানুষ ঝরোখা বন্ধ করিয়া ঘরের অন্ধকারে আশ্রয় লয়, কেবল বহিঃপ্রকৃতির রুদ্ধশ্বাস শূন্যতায় বসন্তের বিদায়বার্তাবহ পাখি গাছের বিরল পত্রান্তরাল হইতে ক্লান্ত-স্তিমিত কণ্ঠে ডাকিয়া ওঠে—পিউ বহুৎ দূর ! আজও পাখি থাকিয়া থাকিয়া ডাকিতেছিল—পিউ বহুৎ দূর।

হলুদবর্ণ ফুলের ভারে অবনম্র একটি নামহীন গাছ গঙ্গার স্রোতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া যেন দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল। চারিদিক নির্জন, আকাশে বালু উড়িতেছে, পিছনে ভীমকান্তি দুর্গের উত্তুঙ্গ প্রাকার বহু ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে—এইরূপ পরিবেশের মধ্যে ঐ পীত-পুষ্পিত গাছের ছায়ায় বসিয়া যুবকটি নিবিষ্টমনে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছিল।

যুবকের নাম মোবারক। সে কান্তিমান পুরুষ, বলিষ্ঠ চেহারায় একটি উচ্চ আভিজাত্যের ছাপ আছে। তাহার বয়স বড় জোর কুড়ি-একুশ, গায়ের বর্ণ পাকা খরমুজার মতো, ঈষৎ গোঁফের রেখা ও চিবুকের উপর কুঞ্চিত শ্মশ্রুর আভাস তাহার মুখে একটি তীক্ষ্ণ মাধুর্য আনিয়া দিয়াছিল। তাহার উপর চোখে সুর্মা, পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও ঢিলা আস্তিনের ফেন-শুভ্র মল্‌মলী কুর্তা। মেয়েদের তো কথাই নাই, পুরুষেরাও মোবারককে একবার দেখিলে ঘাড় ফিরাইয়া আবার তাকাইত।

মোবারক মাছ ধরিতে ভালবাসে, মাছ ধরা তাহার নেশা ; তবু আজ যে এই বালুবিকীর্ণ মধ্যাহ্নে সে ঘরের আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া মাছ ধরিতে আসিয়াছে তাহার অন্য কারণও ছিল। পরীবানুর সহিত তাহার বাজি লাগিয়াছিল। পরীবানু মোবারকের বধূ, নববধূও বলা চলে, কারণ বিবাহ যদিও কয়েক বছর আগে হইয়াছে, মিলন হইয়াছে সম্প্রতি। পরীর বয়স সতেরো বছর,

রূপে সে মোবারকের যোগ্যা বধূ—অনিন্দ্যসুন্দরী ; বাদশাহের হারেমেও এমন সুন্দরী দেখা যায় না। মাত্র ছয় মাস তাহারা একত্র ঘর করিতেছে ; নব অনুরাগের মদবিহ্বলতায় দু'জনেই ডুবিয়া আছে।

পরী তামাসা করিয়া বলিয়াছিল, 'ভারী তো রোজ রোজ তালাওয়ে মাছ ধরো। দরিয়ায় মাছ ধরতে পারো তবে বুঝি বাহাদুরী।'

মোবারক বলিয়াছিল, 'কেন, দরিয়ায় মাছ ধরা এমন কি শক্ত কাজ ?'

'শক্ত নয় ? ধরেছ কোনও দিন ?'

'যখন ইচ্ছে ধরতে পারি।'

'ধরো না দেখি। পুকুরের পোষা মাছ সবাই ধরতে পারে। গঙ্গার মাছ ধরা অত সোজা নয়।'

'বেশ, রাখো বাজি।'

'রাখো বাজি।'

মোবারক ওড়না ধরিয়া পরীকে কাছে টানিয়া লইয়াছিল ; কানে কানে বাজির শর্ত স্থির হইয়াছিল। শর্ত বড় মধুর। অতঃপর মোবারক ছিপ এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ লইয়া মহোৎসাহে দরিয়ায় মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছিল।

মাছ কিন্তু ধরা দেয় নাই, একটি পুঁটিমাছও না। যবের ছাতু, পিঁপড়ার ডিম, পনির প্রভৃতি মুখরোচক টোপ দিয়াও গঙ্গার মাছকে প্রলুব্ধ করা যায় নাই। দীর্ঘকাল ছিপ হাতে বসিয়া থাকিয়া মোবারক বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে গাছের ছায়া গাছের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে। অন্য দিন হইলে মোবারক বাড়ি ফিরিয়া যাইত, কিন্তু আজ এত শীঘ্র শূন্য হাতে বাড়ি ফিরিলে পরী হাসিবে। সে বড় লজ্জা। মোবারক বঁড়শির টোপ বদলাইয়া বঁড়শি জলে ফেলিল এবং দৃঢ় মনোযোগের সহিত ফাৎনার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাছের উপর হইতে একটা পাখি বিরস স্বরে বলিল, 'পিউ বহুৎ দূর।'

মোবারকের অধর কোণে চকিত হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে উপর দিকে চোখ তুলিয়া মনে মনে বলিল, 'সাবাস পাখি ! তুই জান্‌লি কি করে ?'

এই সময় গঙ্গার দিক হইতে দূরাগত তূর্য ও নাকাড়ার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেই মোবারক চমকিয়া সেই দিকে চাহিল। গঙ্গার কুঞ্চিত জলের উপর সূর্যের আলো ঝলমল করিতেছে। দূরে দক্ষিণদিকে অসংখ্য নৌকার পাল দেখা দিয়াছে, বোধ হয় দুই শত রণতরী। ঐ তরণীপুঞ্জের ভিতর হইতে গভীর রণবাদ্য নিঃস্বনিত হইতেছে।

স্রোতের মুখে অনুকূল পবনে তরণীগুলি রাজহংসের মতো ভাসিয়া আসিতেছে। মোবারক লক্ষ্য করিল, তরণীব্যূহের মাঝখানে চক্রবাকের মতো স্বর্ণবর্ণ একটি পাল রহিয়াছে। সেকালে সম্রাট ভিন্ন আর কেহ রক্তবর্ণ শিবির কিম্বা নৌকার পাল ব্যবহার করিবার অধিকারী ছিলেন না ; কিন্তু সম্রাট-পদ লিপ্সুরা নিজ নিজ গৌরব গরিমা বাড়াইবার জন্য পূর্বাহ্ণেই এই রাজকীয় প্রতীক ধারণ করিতেন। মোবারকের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কে আসিতেছে। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, 'ঐ রে সুলতান সুজা ফিরে এল।'

কয়েক মাস পূর্বে সাজাহানের মৃত্যুর জনরব শুনিয়া সুলতান সুজা এই মুঙ্গের শহর হইতেই মহা ধুমধামের সহিত পাল উড়াইয়া আগ্রা যাত্রা করিয়াছিলেন। যে ঘাটে নৌবহর সাজাইয়া তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন সুজাই ঘাট*। এখন খাজুয়ার যুদ্ধে কনিষ্ঠ ভ্রাতা

* অদ্যাপি এই ঘাট 'সুজি ঘাট' নামে পরিচিত।

ঔরংজেবের হাতে পরাজিত হইয়া তিনি আবার সুজাই ঘাটে ফিরিয়া আসিতেছেন।

মোবারক অবশ্য যুদ্ধে পরাজয়েব খবর জানিত না। কিন্তু মুঙ্গেরের মতো ক্ষুদ্র শহরে সাম্রাজ্যগৃধ্নু যুবরাজ ও বিপুল সৈন্যবাহিনীর শুভাগমন হইলে সাধারণ নাগরিকের মনে সুখ থাকে না। সৈন্যদল যতই শান্ত সুবোধ হোক, অসামরিক জনমণ্ডলীর নিগ্রহ ঘটিয়া থাকে। গতবারে ঘটিয়াছিল, এবারও নিশ্চয় ঘটিবে। তাই মোবারক মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

দুর্গমধ্যেও নৌবহরের আগমন লক্ষিত হইয়াছিল। ফৌজদার মহাশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি শান্তিপ্রিয় প্রৌঢ় ব্যক্তি; সাজাহানের নিরুপদ্রব দীর্ঘ রাজত্বকালে নিশ্চিন্তে ফৌজদারী ভোগ করিয়া তিনি কিছু অলস ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ-দরবারের সমস্ত খবরও তাঁহার কাছে পৌঁছিত না; ভায়ে ভায়ে সিংহাসন লইয়া লড়াই বাধিয়াছে এইটুকুই তিনি জানিতেন। কয়েক মাস পূর্বে সুজা আগ্রার পথে যাত্রা করিলে তিনি বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন; হয়তো আশা করিয়াছিলেন তক্ত্ তাউস্ সুজারই কবলে আসিবে। তাই তাঁহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। যা হোক, সুলতান সুজাকে অমান্য করা চলে না, সিংহাসন পান বা না পান তিনি শাহজাদা। উপরন্তু তাঁহার সঙ্গে অনেক সৈন্য সিপাহী রহিয়াছে।

দুর্গের দক্ষিণ দ্বার হইতে সুজাই ঘাট মাত্র দুইশত গজ দূরে। ফৌজদার মহাশয় কয়েকজন ঘোড়সওয়ার লইয়া ঘাটে সুজার অভ্যর্থনা করিতে গেলেন।

দেখিতে দেখিতে নৌবহর আসিয়া পড়িল। মোবারক যেখানে মাছ ধরিতে বসিয়াছিল সেখান হইতে বাঁদিকে ঘাড় ফিরাইলেই সুজাই ঘাট দেখা যায়। ঘাটটি আয়তনে ছোট; সব নৌকা ঘাটে ভিড়িতে পারিল না, ঘাটের দুইপাশে কিনারায় নঙ্গর ফেলিতে লাগিল। চারিদিকে চেঁচামেচি হুড়াহুড়ি, মাঝিমাল্লার গালাগালি; গঙ্গার তীর দুর্গের কোল পর্যন্ত তোলপাড় হইয়া উঠিল। মোবারক দেখিল এখানে মাছ ধরার চেষ্টা বৃথা! সে ছিপ গুটাইয়া বাড়ি ফিরিয়া চলিল। বিরক্তির মধ্যেও তাহার মনে এইটুকু সান্ত্বনা জাগিতে লাগিল, পরীবানুর কাছে কৈফিয়ৎ দিবার মতো একটা ছুতা পাওয়া গিয়াছে।



কেল্লার পূর্বদ্বার হইতে যে রাজপথ আরম্ভ হইয়াছে তাহা শহরকে দুই সমানভাগে বিভক্ত করিয়া বাংলার রাজধানী রাজমহলের দিকে গিয়াছে। এই পথের দুই পার্শ্ব, দুর্গমুখ হইতে প্রায় অর্ধক্রোশ পর্যন্ত গিয়া, ক্রমে গৃহবিরল হইতে হইতে অবশেষে নিরবচ্ছিন্ন মাঠ-ময়দানে পরিণত হইয়াছে। এইখানে নগর-সীমান্তে একটি ক্ষুদ্র চটি আছে—চটির নাম পূরব সরাই। পূর্ব হইতে সমাগত যাত্রীদল এই চটিতে রাত্রির মতো আশ্রয় পায়, পরদিন শহরে প্রবেশ করে।

চটি হইতে কিছুদূরে একটি পাকাবাড়ি, ইহা মোবারকের পিতৃভবন। কাছাকাছি অন্য কোনও গৃহ নাই, বাড়িটি রাজপথের ধারে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে; আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার যেন একটু আভিজাত্যের অভিমান আছে। পূরব সরাই চটি ও তাহার আশেপাশে যে দু'-চারিটি দীনমূর্তি গৃহ দেখা যায় সেগুলি যেন ঐ বাড়িখানি হইতে সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চুনকাম-করা সুশ্রী বাড়ি; সম্মুখের বারান্দা জাফ্‌রিকাটা পাথরের অনুচ্চ আলিসা দিয়া ঘেরা। বাড়ি এবং পথের মধ্যস্থলে খানিকটা মুক্ত অঙ্গন, সেখানে নানা আকৃতির ছোটবড় পাথরের পাটা পড়িয়া আছে—পাশে একটি খাপরা-ছাওয়া ক্ষুদ্র চালা। চালার ভিতরেও নানা আকৃতির পাথর

রহিয়াছে, কিন্তু সেগুলি বাটালির ঘায়ে রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, গৃহস্বামী একজন প্রস্তর-শিল্পী।

প্রস্তর-শিল্পী গৃহস্বামীর নাম খ্বাজা নজর বোখারী। ইনিই মোবারকের পিতা। বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয় নাই, দেহ এখনও দৃঢ় ও কর্মপটু ; কিন্তু এই বয়সেই ইঁহার মুখমণ্ডল হইতে যৌবনের উন্মাদনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। সুন্দর পৌরুষ-বলিষ্ঠ অবয়বে জরার চিহ্নমাত্র নাই, তবু মনে হয় তিনি বৃদ্ধত্বের নিষ্কাম তৃপ্তিলোকের সন্ধান পাইয়াছেন। মুখে একটি শান্ত দীপ্তি। যাহারা স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ ও ভোগলিপ্সা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে তাহাদের মুখেই এমন সৌম্য জ্যোতি দেখিতে পাওয়া যায়।

খ্বাজা নজর বোখারী ধনী ব্যক্তি নহেন, প্রস্তর-শিল্প তাঁহার জীবিকা। যাহারা নূতন গৃহ নির্মাণ করায় তাহারা তাঁহাকে দিয়া পাথরের স্তম্ভ খিলান জাফ্‌রি প্রভৃতি তৈয়ার করাইয়া লয়। তবু শহরের ইতর ভদ্র সকলেই তাঁহার চরিত্রগুণে এবং পূর্ব-ইতিহাস স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভ্রম করিয়া চলে। সাধারণের নিকট তিনি মিঞা সাহেব নামে পরিচিত।

এইখানে খ্বাজা নজরের পূর্বকথা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা প্রয়োজন।

খ্বাজা নজরের পিতা বোখারা হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন। সে-সময় দিল্লীর দরবারে গুণের আদর ছিল, দেশদেশান্তর হইতে জ্ঞানী গুণী আসিয়া বাদশাহের অনুগ্রহ লাভ করিতেন। বোখারা একে পর্বত-বন্ধুর দরিদ্র দেশ, উপরন্তু তখন পারস্যের অধীন। সেখানে ভাগ্যোন্নতির আশা নাই দেখিয়া খ্বাজা নজরের পিতা বালকপুত্র সমভিব্যাহারে দিল্লী উপনীত হইলেন।

তিনি পরম সুপুরুষ ছিলেন, উত্তম যোদ্ধা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। শীঘ্রই তিনি সাজাহানের নজরে পড়িলেন। তারপর একদিন মুঙ্গেরের ফৌজদার পদের সনদ পাইয়া বিহার-প্রান্তের এই প্রাচীন দুর্গে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহা সাজাহানের রাজত্বকালের গোড়ার দিকের কথা।

তারপর দশ বৎসর নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। বিশাল সাম্রাজ্যের এপ্রান্তে যুদ্ধ-বিগ্রহের হাঙ্গামা নাই তাই ফৌজদার নিজের শৌর্যবীর্য দেখাইয়া আরও অধিক পদোন্নতির সুযোগ পাইলেন না, তিনি ফৌজদারই রহিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে এক সৈয়দবংশীয়া কন্যার সহিত খ্বাজা নজরের বিবাহ হইল।

খ্বাজা নজর তখন ভাবপ্রবণ কল্পনাবিলাসী যুবক। তিনি পারসীক ভাষায় শয়ের লিখিতেন ; ভাস্কর্য এবং স্থপতি-শিল্পের উপরও তাঁহার গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। পিতৃসৌভাগ্যের ছায়াতলে বসিয়া তিনি পরম নিশ্চিন্ত মনে শিল্পকলার চর্চা করিতে লাগিলেন। যোদ্ধার তরবারির পরিবর্তে ভাস্করের ছেনি ও বাটালি তাঁহার অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু এই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা তাঁহার রহিল না। মোবারক জন্মিবার কিছুদিন পরে সহসা একদিন খ্বাজা নজরের জীবনযাত্রা ওলট-পালট হইয়া গেল। ফৌজদার অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। খ্বাজা নজরের সুখের দিন ফুরাইল।

হিন্দুস্থানের অধীশ্বর শাহেনশাহ বাদশাহ সাজাহান বাহ্যত বিলাসী ও বহুব্যয়ী প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে কৃপণ ছিলেন। এই জন্যই বোধ করি তিনি বহু ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়া তাজমহল এবং ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে নিয়ম ছিল, কোনও ওমরাহ বা রাজকর্মচারীর মৃত্যু হইলে মৃতের সঞ্চিত ধনসম্পত্তি তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত হইত। আমীর-ওমরাহেরা এই ব্যবস্থায় মনে মনে সন্তুষ্ট ছিলেন না ; সকলেই ধনরত্ন লুকাইয়া রাখিতেন কিম্বা মৃত্যুর পূর্বেই ওয়ারিশদের মধ্যে চুপি চুপি বণ্টন করিয়া দিতেন। গল্প আছে, এক

ওমরাহ* দীর্ঘকাল রাজসরকারে কার্য করিয়া বহু ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ ওমরাহের মৃত্যু হইলে সাজাহান তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য রাজপুরুষদের পাঠাইলেন। ওমরাহের বাড়িতে কিন্তু একটি তালাবন্ধ সিন্দুক ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না ; রাজপুরুষেরা সিন্দুক সাজাহানের সম্মুখে উপস্থিত করিল। সাজাহান তালা ভাঙ্গিয়া দেখিলেন সিন্দুকের মধ্যে কেবল ছেঁড়া জুতা ভরা রহিয়াছে। সম্রাট লজ্জা পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার স্বভাব পরিবর্তিত হয় নাই।

ফৌজদারের বেলায় নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। তিনি যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন পাটনা হইতে সুবেদারের লোক আসিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। দুর্গে নূতন ফৌজদার আসিল। খ্বাজা নজর রিক্তহস্তে পথে দাঁড়াইলেন।

যাহার রণশিক্ষা নাই সে কোন্ কাজ করিবে ? শেষ পর্যন্ত শিল্পবিদ্যাই তাঁহার জীবিকা হইয়া দাঁড়াইল। ঘরানা ঘরের সন্তান, অবস্থা বিপাকে দুর্দশায় পতিত হইয়াছেন—তাই শহরের গণ্যমান্য সকলেই তাঁহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিল।

গত বিশ বছরে খ্বাজা নজরের অবস্থা কিছু সচ্ছল হইয়াছে। তিনি এখন সাধারণ গৃহস্থ, শহরের প্রান্তে ক্ষুদ্র বাড়ি করিয়াছেন। সুখে দুঃখে জীবন চলিতেছে। পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে, মোবারকের বিবাহ হইয়াছে। খ্বাজা নজরের জীবনে বড় বেশি উচ্চাশা নাই, কেবল একটি আকাঙ্ক্ষা অহরহ তাঁহার অন্তরে জাগিয়া থাকে। মোবারক বড় হইয়া উঠিয়াছে, এইবার একদিন তাহাকে দিল্লী পাঠাইবেন। মোবারক বাদশাহের নিকট হইতে আবার ফৌজদারীর সনদ লইয়া আসিবে।

মোবারকের বালককাল হইতে খ্বাজা নজর তাহাকে সৎশিক্ষা দিয়াছেন, কুসঙ্গ হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়াছেন। আরবী ও পারসী ভাষায় সে পারদর্শী হইয়াছে। যুদ্ধবিদ্যায় যদিও তাহার বিশেষ রুচি নাই—সেও তাহার পিতার মতো কল্পনাপ্রবণ—তবু তাহাকে যথারীতি অস্ত্রবিদ্যা শিখানো হইয়াছে। তাহার উপর অমন সুন্দর চেহারা ! সে যদি একবার বাদশাহের সিংহাসনতলে গিয়া দাঁড়াইতে পারে, বাদশাহ্ তাহার আশা পূর্ণ না করিয়া পারিবেন ?

এই আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া খ্বাজা নজর পুত্রকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন—ইহা ভিন্ন তাঁহার জীবনে অন্য কামনা নাই। মোবারকের কুড়ি বছর বয়স পূর্ণ হইবার পর তিনি তাহার দিল্লী গমনের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা বাদশাহের পীড়া ও ভ্রাতৃযুদ্ধের সংবাদ আসিয়া চারিদিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মোবারকের দিল্লী গমন আপাতত স্থগিত আছে।

সেদিন অপরাহ্ণে মোবারক রিক্তহস্তে গঙ্গাতীর হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, তাহার পিতা কারখানার চালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন। শহরের ধনী বেনিয়া দুনীচন্দের পুত্রের বড় অসুখ, সে মিঞাসাহেবের কাছে মন্ত্রপড়া জল লইতে আসিয়াছে। মিঞাসাহেবের জলপড়ার ভারি গুণ, কখনও ব্যর্থ হয় না। তিনি মন্ত্রপূত জলের বাটি দুনীচন্দের হাতে দিয়া বলিলেন, 'যাও। ছেলে আরাম হলে পীর শাণফার দরগায় শিরনি চড়িও।' বলিয়া দুনীচন্দকে বিদায় দিলেন।

মোবারক এই ফাঁকে অলক্ষিতে গৃহে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল, খ্বাজা নজর ডাকিলেন, 'মোবারক !'

মোবারক ফিরিয়া আসিয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইল। তিনি স্নিগ্ধচক্ষে একবার তাহার মুখের পানে চাহিলেন ; রৌদ্রে ধূলায় মোবারকের মুখখানি আরক্ত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেও

নেকনাম খাঁ। (বার্ণিয়ার)

সে-কথার উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, 'কিছু খবর শুনলে ? শহরে নাকি আবার ফৌজ এসেছে ?'

মোবারক বলিল, 'হ্যাঁ, সুলতান সুজা ফিরে এসেছে।'

খ্বাজা নজর একটু বিমনাভাবে আকাশের পানে চাহিলেন, ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। কিন্তু তিনি আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া কারখানার চালার ভিতর প্রবেশ করিলেন। চালার ভিতর হইতে তাঁহার অন্যমনস্ক কণ্ঠস্বর আসিল, 'যাও, তুমি স্নান কর গিয়ে।'

মোবারক তখন বাড়িতে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার পূর্বেই দেখিতে পাইল, দ্বারের আড়ালে পরী দাঁড়াইয়া আছে এবং অপূর্ব সুন্দর চোখ দু'টিতে দুষ্টামি ভরিয়া হাসিতেছে। মোবারকও হাসিয়া ফেলিল। পরী আজ কোনও ছলছুতা মানিবে না, বাজির পণ পুরামাত্রায় আদায় করিয়া লইবে।

৪

সুলতান সুজার নৌবহর গঙ্গার স্রোত বাহিয়া আসিয়াছিল ; তাঁহার স্থলসৈন্য—পিয়াদা ও সওয়ার গঙ্গার তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। নৌকায় স্বয়ং সুজা ছিলেন, তাঁহার অগণিত নারীপূর্ণ হারেম ছিল, আর ছিল বড় বড় কামান গোলা বারুদ। যে কয়জন আমীর এখনও তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করেন নাই তাঁহারাও নৌকায় ছিলেন।

মুঙ্গেরে অবতীর্ণ হইয়া সুজা কেল্লার মধ্যে ফৌজদারের বাসভবনে অধিষ্ঠিত হইলেন। দুর্গের পশ্চিমভাগে উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত দুইটি বড় বড় মহল ; একটিতে সুজার হারেম রহিল, অপরটি তাঁহার দরবার ও মন্ত্রণাগৃহে পরিণত হইল। সুজার প্রধান উজির আলিবর্দি খাঁর জন্যও উৎকৃষ্ট বাসভবন নির্দিষ্ট হইল। আলিবর্দি খাঁ সুজার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন, সুজা আদর করিয়া তাঁহাকে 'খান্ ভাই' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি 'করণ-চূড়া' নামক কেল্লার উত্তরভাগের একটি সুন্দর শৈলগৃহ অধিকার করিলেন। সৈন্যদল মাঠে ময়দানে তাম্বু ফেলিল ; কতক নৌকায় রহিল।

মুঙ্গেরে পৌঁছিয়া সুলতান সুজা একদণ্ডও বৃথা কালক্ষয় করিলেন না, প্রবল উৎসাহে দুর্গসংস্কার আরম্ভ করিয়া দিলেন। পাটনা হইতে আসিবার পথে তিনি স্থির করিয়াছিলেন, মুঙ্গেরের দুর্ধর্ষ দুর্গেই তাঁহার শক্তির কেন্দ্র রচনা করিবেন। যদিও রাজমহল তাঁহার রাজধানী, তবু রাজমহল আগ্রা হইতে অনেক দূর ; মুঙ্গের অপেক্ষাকৃত নিকট। যাঁহার দৃষ্টি ময়ূর সিংহাসনের উপর নিবদ্ধ তাঁহার পক্ষে রাজমহল বা ঢাকা অপেক্ষা মুঙ্গেরে ঘাঁটি তৈয়ার করিবার ইচ্ছাই স্বাভাবিক। সুজার আদেশে ও তত্ত্বাবধানে কেল্লার প্রাকার মেরামত হইতে লাগিল, পরিখা আরও গভীরভাবে খনন করিয়া গঙ্গার ধারার সহিত তাহার নিত্যসংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। দুর্গপ্রাকারের বুরুজের উপর বড় বড় কামান বসিল। সুজা অশ্বপৃষ্ঠে চারিদিকের বিপুল কর্মতৎপরতা তদারক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুজার সঙ্গী-সাথীরা তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত কর্মোৎসাহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইল, সুজা কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঔরংজেবকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

একচল্লিশ বছর বয়সে সুজার চরিত্র সংশোধনের আর উপায় ছিল না। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী ব্যসনাসক্তি তাঁহার বুদ্ধি ও দেহের উপর জড়তার প্রলেপ মাখাইয়া দিয়াছিল। তৈমুরবংশের রক্তে তিনটি প্রধান উপাদান—বিবেকহীন উচ্চাশা, অদম্য ভোগলিপ্সা এবং কুটিল নৃশংসতা। সকল মোগল সম্রাটের মধ্যেই এই প্রবৃত্তিগুলি অল্পাধিক অনুপাতে বিদ্যমান ছিল। সুজার জীবনে ভোগলিপ্সাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চাশাও তাঁহার কম ছিল না। মাঝে মাঝে তাহা খড়ের আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিত ; তীব্র সর্পিল বুদ্ধি জড়ত্বের খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিত। কিন্তু তাহা ক্ষণিক। ঔরংজেবের ন্যায় লৌহদৃঢ় চিত্তবল তাঁহার ছিল না। আবার তিনি আলস্যে বিলাসে গা ভাসাইয়া দিতেন।

কিন্তু মুঙ্গেরে পৌঁছিয়া তিনি এমন বিপুল উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন যে সাতদিনের মধ্যে জীর্ণ দুর্গের সংস্কার শেষ হইল। কেবল দুর্গ মেরামত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, শত্রু যাহাতে দুর্গের কাছে না আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করিলেন। জলপথে অবশ্য সুজার কোনও ভয় ছিল না, কারণ সে-সময় বাংলার অধীশ্বর সুজা ভিন্ন আর কাহারও নৌবহর ছিল না। স্থলপথে মুঙ্গের আক্রমণের পথ পূর্ব ও দক্ষিণ হইতে ; তাহাও গিরিশ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু গিরিশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে সৈন্য চালনার উপযোগী রন্ধ্র আছে। সুজা এই রন্ধ্রগুলি বড় বড় বাঁধ তুলিয়া বন্ধ করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। সুজা সত্যই রণপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং মুঙ্গের কেল্লা ও পারিপার্শ্বিক ভূমি সংরক্ষণের কোনই ত্রুটি রহিল না।

হাজার হাজার মজুর লাগিয়া গেল। পাহাড়ের ব্যবধানস্থলে উচ্চ জাঙ্গাল খাড়া হইল, তাহার মাথার উপর কামান বসিল। সুজা ঘোড়ার পিঠে সমস্ত পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্ধু এবং উজির খান্ ভাই আলিবর্দি খাঁ সর্বদা তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় সুজার মহলে দরবার বসিত। দরবার অবশ্য পাকা দরবার নয়, আদব কায়দার কড়াকড়ি ছিল না ; অনেকটা মজলিসের মতো আসর বসিত, আলিবর্দি খাঁ, মির্জা জান বেগ প্রমুখ কয়েকজন অন্তরঙ্গ পারিষদ আসিয়া বসিতেন। মখমল বিছানো বৃহৎ কক্ষে বহু তৈলদীপের আলোতে শিরাজি চলিত, হাস্য পরিহাস চলিত, ক্বচিৎ মন্ত্রণা পরামর্শও হইত। রাত্রি যত গভীর হইত সুজা ততই মাতাল হইয়া পড়িতেন, কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে আবার তিনি অশ্বপৃষ্ঠে বাহির হইতেন। পারিষদেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া ভাবিতেন, এভাবে আর কতদিন চলিবে।

এইভাবে একপক্ষ কাটিল।

একদিন সন্ধ্যার পর মজলিস বসিয়াছিল। সুজার হাতে শিরাজির পাত্র ছিল, তিনি ফৌজদারের পানে চাহিয়া বলিলেন, 'পীর পাহাড়ের দিকে কাজ কেমন চলছে ?'

ওদিকের কার্য-তত্ত্বাবধানের ভার ফৌজদার মহাশয়ের উপর ছিল, তিনি বলিলেন, 'ভালই চলছে জাঁহাপনা, ঘাঁটি প্রায় তৈরি হয়ে গেছে।'

সুজা বলিলেন, 'বেশ. কাল ওদিকে তদারক করতে যাব।'

স্ফটিকেব পানপাত্র নিঃশেষ করিয়া তিনি বাঁদীর হাতে ফেরৎ দিলেন। কয়েকজন যুবতী বাঁদী শরাবের পাত্র, তাম্বূলের পেটি ও গোলাপজল ভরা গুলাবপাশ লইয়া মজলিসের পরিচর্যা করিতেছিল। সুজার ইঙ্গিতে একটি বাঁদী ফৌজদারের সম্মুখে পানের বাটা ধরিল। সম্মানিত ফৌজদার তস্‌লিম করিয়া একটি তবক্-মোড়া পান তুলিয়া লইলেন।

শরাবের আর একটি পাত্র হাতে লইয়া সুজা বলিলেন, 'আমার শরাবের পুঁজি তো প্রায় ফুরিয়ে এল ফৌজদার সাহেব, আপনাদের দেশে মদ পাওয়া যায় না ?'

ঈষৎ হাসিয়া ফৌজদার বলিলেন, 'পাওয়া যায় হজরৎ—তাড়ি।'

সুজা প্রশ্ন করিলেন, 'তাড়ি ? সে কি রকম জিনিস ?'

ফৌজদার বলিলেন, 'মন্দ জিনিস নয়। গ্রীষ্মকালে এদেশের ইতর-ভদ্র সকলেই খায়। স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ ভাল। কিন্তু বড় দুর্গন্ধ।'

সুজা হাসিয়া বলিলেন, 'আন্দাজ হচ্ছে ফৌজদার সাহেব তাড়ি চেখে দেখেছেন !'

ফৌজদার কহিলেন, 'জী। পুদিনার আরক একটু মিশিয়ে দিলে গন্ধ চাপা পড়ে তখন মন্দ লাগে না।'

ক্রমে রাত্রি হইল। সুজা কিংখাপের তাকিয়ার উপর এলাইয়া পড়িলেন, তাহার কথা জড়াইয়া আসিতে লাগিল। বাঁদীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

আলিবর্দি খাঁ বুঝিলেন, আজ রাত্রে সুজা হারেমে ফিরিবেন না। তিনি অন্য পারিষদবর্গকে চোখের ইশারা করিলেন, সকলে কুরনিশ করিয়া বিদায় হইলেন।

দরবারকক্ষের পর্দা-ঢাকা দ্বারের বাহিরে হাব্‌সী খোজারা নাঙ্গা তলোয়ার লইয়া পাহারা দিতেছে। তাহারা আমীরগণকে এত শীঘ্র বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া নিঃশব্দে দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। তাহারা পুরাতন ভৃত্য, প্রভুর স্বভাব-চরিত্র ভাল করিয়াই জানে।

৫

পরদিন আমাদের আখ্যায়িকার একটি স্মরণীয় দিন ; যদিও ইতিহাস উহা স্মরণ করিয়া রাখে নাই।

পূর্বাহ্ণে সুজা আলিবর্দি খাঁকে সঙ্গে লইয়া ঘোড়ার পিঠে পীর পাহাড় পরিদর্শনে বাহির হইলেন। পরিদর্শন কার্যে সুজা সাধারণ বেশবাস পরিয়াই বাহির হইতেন, সঙ্গে রক্ষী থাকিত না। কেবল খান্‌ ভাই আলিবর্দি খাঁ এই সকল অভিযানে তাঁহার নিত্যসঙ্গী ছিলেন।

আলিবর্দি খাঁ একজন অতি মিষ্টভাষী চাটুকার ছিলেন ; তাঁহার চাটুকথার বিশেষ গুণ এই ছিল যে উহা সহসা চাটুকথা বলিয়া চেনা যাইত না। সুজা আখেরে দিল্লীর সম্রাট্‌ হইবেন এই আশায় তিনি সুজার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে যখন সে আশা আর রহিল না তখন তিনি সুজার সৈন্য ভাঙাইয়া লইয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুজা তাঁহাকে ধৃত করিয়া প্রকাশ্যে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা আরও কিছুদিন পরের কথা।

দ্বিপ্রহরে পীর পাহাড়ে পৌঁছিয়া সুজা কার্যাদি তদারক করিলেন। পীর পাহাড় শহরের পূর্বদিকে গঙ্গার সন্নিকটে গম্বুজাকৃতি একটি টিলা ; স্বভাবতই সুরক্ষিত। তাহার শীর্ষদেশ সমতল করিয়া তাহার উপর আর একটি গম্বুজের মতো মহল উঠিতেছে। ইহা সুজার আতিস্‌-খানা হইবে—গোলাবারুদ প্রভৃতি এখানে সঞ্চিত থাকিবে। টিলার চূড়া হইতে একটি কূপও খনিত হইতেছে ; গঙ্গার স্রোতের সহিত তাহার যোগ থাকিবে।

আত্মরক্ষার বিপুল আয়োজন। শত শত মজুর রাজমিস্ত্রি ছুতার কাজ করিতেছে।

পরিদর্শন শেষ করিতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। সুজা ও আলিবর্দি খাঁ ফিরিয়া চলিলেন। ভাগ্যক্রমে আজ বালি উড়িতেছে না, খর রৌদ্রতাপে বাতাস স্তব্ধ হইয়া আছে।

অর্ধেক পথ অতিক্রম করিতে সুজা ঘর্মাক্ত কলেবর হইলেন, সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়াছে, মুখের উপর রৌদ্র পড়িয়া মুখ রক্তবর্ণ হইল। শহরের উপকণ্ঠে যখন পৌঁছিলেন তখন তৃষ্ণায় তাঁহার গলা শুকাইয়া গিয়াছে।

একটি নিম্নশ্রেণীর লোক অপর্যাপ্ত তাড়ি সেবন করিয়া মনের আনন্দে পথের এধার হইতে ওধার পরিভ্রমণ করিতে করিতে চলিয়াছিল। সুজা ঘোড়া থামাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে কোথায় পানীয় পাওয়া যায় বলতে পার ?'

পথিক হাস্যবিম্বিত মুখে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ঐ যে পূরব সরাই, ঐখানে ঢুকে পড়ুন, দেদার তাড়ি পাবেন।' বলিয়া প্রসন্ন একটি হিক্কা তুলিয়া প্রস্থান করিল।

আলিবর্দি খাঁ ও সুজা দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। সুজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন খান্ ভাই, এদেশের খাঁটি জিনিস চেখে দেখা যাক।'

পূরব সরাই নেহাৎ নিম্নশ্রেণীর পানশালা নয় ; তবে গ্রীষ্মকালে এখানে তাড়ি বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। স্বত্বাধিকারী একজন মুসলমান ; দুইজন ফৌজী সওয়ারকে পাইয়া সে সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিল। সুজা পুদিনার আরক-সুরভিত তাড়ি ফরমাস দিলেন।

নূতন মাটির ভাঁড়ে শুভ্রবর্ণ পানীয় আসিল। উভয়ে পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। শুষ্ককণ্ঠে নূতনতর পানীয় মন্দ লাগিল না। তারপর সরাইওয়ালা যখন এক রেকাবি ঝাল-মটর আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন সুজা আবার পানীয় ফরমাস করিলেন।

ঝাল-মটর সুজার বড়ই মুখরোচক লাগিল। এরূপ প্রাকৃতজনোচিত আহার্য পানীয়ের আস্বাদ সুজা পূর্বে কখনও গ্রহণ করেন নাই, তিনি খুব আমোদ অনুভব করিলেন। পানীয়ের দ্বিতীয় পাত্রও ঝাল-মটর সহযোগে শীঘ্রই নিঃশেষিত হইল।

কোমরবন্ধের তরবারি আল্‌গা করিয়া দিয়া সুজা তৃতীয় কিস্তি পানীয় হুকুম করিলেন। আলিবর্দি খাঁর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, 'কী খান্ ভাই, কেমন লাগছে ?'

খান্ ভাই মাথা নাড়িয়া মোলায়েম ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন, 'হজরৎ, আপনি গরিবের ফুর্তির দাম বাড়িয়ে দিলেন।'

এক ঘড়ি সময় কাটিবার পর সুজা ও আলিবর্দি যখন সরাইখানা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন তাঁহাদের মনের বেশ আনন্দঘন অবস্থা। উভয়ে আবার ঘোড়ার উপরে উঠিয়া যাত্রা করিলেন।

কিন্তু বেশি দূর যাইবার আগেই তাঁহাদের গতি ভিন্নমুখী হইল। আরোহীদ্বয়ের তৃষ্ণা নিবারণ হইয়াছিল বটে কিন্তু ঘোড়া দু'টি তৃষ্ণার্তই ছিল ; তাই চলিতে চলিতে পথের অনতিদূরে একটি জলাশয় দেখিতে পাইয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল এবং বল্‌গার শাসন উপেক্ষা করিয়া সেই দিকে চলিল। সুজা ঘোড়ার মুখ ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঘোড়া বাগ মানিল না। তখন তিনি আর চেষ্টা না করিয়া লাগাম আল্‌গা করিয়া ধরিলেন।

কিন্তু দীঘির তীরে পৌঁছিয়া আবার তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে রাশ টানিতে হইল। দীঘির পাড় বড় বেশি ঢালু, ঘোড়া নামিবার সুবিধা নাই ; একটি সঙ্কীর্ণ ঘাট আছে বটে কিন্তু তাহার ধাপগুলি এতই সরু এবং উঁচু যে ঘোড়া সেপথে অতিকষ্টে নামিতে পারিলেও উঠিতে পারিবে না। সুজা ও আলিবর্দি খাঁ দ্বিধায় পড়িলেন। ঘোড়া দু'টি জলের সান্নিধ্যে আসিয়া আরও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব।

একটি লোক জলের কিনারায় বসিয়া নিবিষ্টমনে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেছিল ; ঘাটে বা দীঘির আশেপাশে আর কেহ ছিল না। তাহার পিছনে পাড়ের উপর সুজা ও আলিবর্দি খাঁ উপস্থিত হইলে সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া আবার মাছ ধরায় মন দিয়াছিল ; ফৌজী সওয়ার সম্বন্ধে তাহার মনে কৌতূহল ছিল না।

এদিকে সুজার মনের প্রসন্নতাও আর ছিল না। ঘোড়ার ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন ; পুকুর পাড়ে ঘোড়ার জলপানের কোনও সুবিধাই নাই দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইতেছিল। তার উপর ঐ লোকটা নির্বিকারচিত্তে বসিয়া মাছ ধরিতেছে, তাঁহাকে সাহায্য করিবার কোনও চেষ্টাই করিতেছে না। দিল্লীর ভবিষ্যৎ বাদশাহ্ শাহজাদা আলমের ধৈর্য আর কতক্ষণ থাকে ? তিনি কর্কশকণ্ঠে মৎস্যশিকাররত লোকটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'এই বান্দা, পুকুরে ঘোড়াকে জল খাওয়াবার কোনও রাস্তা আছে ?'

মৎস্যশিকারী মোবারক। সম্বোধন শুনিয়া তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অশিষ্ট

দায়িত্বহীন সিপাহীগুলার সহিত কলহ করিয়া লাভ নাই, তাহাতে নিগ্রহ বাড়িবে বৈ কমিবে না। বিশেষত মোবারক নিরস্ত্র। সে আর-একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া আবার ফাৎনার উপর চোখ রাখিল।

সুজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। অবহেলায় তিনি অভ্যস্ত নন ; তাই তিনি যে ছদ্মবেশে আছেন সেকথা ভুলিয়া গিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'আরে বাঁদীর বাচ্চা ! তুই কানে শুনতে পাস না ? বদ্‌তমিজ, এদিকে আয়।'

ইহার পর আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। মোবারক আরক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, ছিপটা হাতে তুলিয়া পাড় বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ঘোড়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সুজার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর অর্ধবরুদ্ধ ক্রোধের স্বরে বলিল, 'বাঁদীর বাচ্চা তুমি। তোমার শরীরে ভদ্র-রক্ত থাকলে ভদ্রভাবে কথা বলতে।'

আলিবর্দি একেবারে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন, 'বেয়াদব যুবক ! তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ জানো ? উনি সুলতান সুজা।'

নাম শুনিয়া মোবারকের বুকে মুগুরের ঘা পড়িল। সে বুঝিল তাহার জীবনে এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তবু এখন ভয়ে পিছাইয়া যাইতে সে ঘৃণাবোধ করিল। অকারণ লাঞ্ছনার গ্লানি তাহার আরও বাড়িয়া গেল ; নীচ শ্রেণীর লোকের মুখে ইতর ভাষা বরং সহ্য হয় কিন্তু বড়'র মুখে ছোট কথা দ্বিগুণ পীড়াদায়ক। মোবারকের মুখে একটা ব্যঙ্গ-বঙ্কিম বিকৃতি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, 'সুলতান সুজা ছোট ভাইয়ের কাছে যুদ্ধে মার খেয়ে এখন নিরস্ত্রের ওপর বাহাদুরী দেখাচ্ছেন !'

সুজার অন্তরে যে-গ্লানি প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহার ইঙ্গিত পর্যন্ত করিতে ওমরাহেরা সাহস করিতেন না, তাহাই যেন শ্লেষের চাবুক হইয়া তাঁহার মুখে পড়িল। আর তাঁহার দিগ্‌বিদিক জ্ঞান রহিল না, উন্মত্ত রোষে তরবারি বাহির করিয়া তিনি মোবারকের পানে ঘোড়া চালাইলেন।

'গোস্তাক্। বদ্‌বখ্‌ত—।'

ইতিমধ্যে ভোজবাজির মতো কোথা হইতে অনেকগুলি লোক আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহারা সমস্বরে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। কেহ বা মোবারককে পলায়ন করিবার উপদেশ দিল ; মোবারক কিন্তু এক পা পিছু হটিল না। ঘোড়া যখন প্রায় তাহার বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে তখন সে একবার সজোরে ছিপ চালাইল। ছিপের আঘাত শপাৎ করিয়া সুজার গালে লাগিল।

সুজাও বেগে তরবারি চালাইলেন। মোবারকের গলদেশে তরবারির ফলা বসিয়া গেল। সে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া মাটিতে পড়িল।

কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যাহা চিন্তার অতীত ছিল, অতি তুচ্ছ কারণে অকস্মাৎ তাহাই ঘটিয়া গেল।

৬

দিন শেষ হইয়া আসিতেছে।

খ্বাজা নজর বোখারী তাঁহার কারখানা ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুনীচন্দ্ বেনিয়ার সহিত হাসিমুখে কথা বলিতেছিলেন। দুনীচন্দের পুত্র আরোগ্যলাভ করিয়াছে, তাই সে মিঞা সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছে।

সহসা রাজপথের উপর অনেকগুলি মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। খ্বাজা নজর চোখ তুলিয়া দেখিলেন একদল লোক একটি মৃতদেহ বহন করিয়া আনিতেছে, তাহাদের পশ্চাতে দুইজন

সওয়ার। খ্বাজা নজর শঙ্কিত হইয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিলেন।

মৃতদেহ বাহকগণ খ্বাজা নজরের অঙ্গনে প্রবেশ করিল। খ্বাজা নজর নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বাহকেরা মোবারকের রক্তাক্ত মৃতদেহ আনিয়া খ্বাজা নজরের সম্মুখে একটি পাথরের পাটার উপর শোয়াইয়া দিল। কেহ কথা কহিল না। খ্বাজা নজর নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিলেন ; তাঁহার রক্তহীন অধর একটু নড়িল, 'মোবারক—'

যাহারা বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহারা নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করিয়া সরিয়া গেল। কেবল অশ্বারোহী দুইজন গেল না। সুজার মুখে ক্রোধের অন্ধকার এখনও দূর হয় নাই, চোখে জিঘাংসা ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল। তাঁহার গালে ছিপের আঘাত চিহ্নটা ক্রমে বেগুনী বর্ণ ধারণ করিতেছে। তিনি মাঝে মাঝে তাহাতে হাত বুলাইতেছেন এবং তাঁহার চক্ষু হিংস্রভাবে জ্বলিয়া উঠিতেছে।

সহসা সুজা খ্বাজা নজরকে উদ্দেশ করিয়া কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, 'তুমি এর বাপ ?'

খ্বাজা নজর সুজার দিকে শূন্য দৃষ্টি তুলিলেন, কথা কহিলেন না। মোবারক তো বন্‌সী তালাওয়ে মাছ ধরিতে গিয়াছিল... !

উত্তর না পাইয়া আলিবর্দি খাঁ বলিলেন, 'ইনি মালিক উল্‌মুল্‌ক সুলতান সুজা। তোমার ছেলে এর অমর্যাদা করেছিল তাই তার এই দশা হয়েছে।'

খ্বাজা নজর এবারও উত্তর দিলেন না, ভাবহীন নিস্তেজ চক্ষু অশ্বারোহীদের উপর হইতে সরাইয়া মোবারকের উপর ন্যস্ত করিলেন। দেখিলেন পাথরের পাটা মোবারকের কণ্ঠ-ক্ষরিত রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে। মোবারক বাঁচিয়া নাই....ইহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে—

সুজা মুখের একটা বিকৃত ভঙ্গি করিলেন। এই সামান্য প্রস্তর-শিল্পীর পুত্রকে হত্যা করিবার পর ইহার অধিক কৈফিয়ৎ বা দুঃখ প্রকাশের প্রয়োজন নাই। সুজা আলিবর্দিকে ইঙ্গিত করিলেন ; উভয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

এই সময় বাড়ির ভিতর হইতে তীব্র আর্তোক্তি আসিল, সঙ্গে সঙ্গে পরীবানু ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার কেশ বিস্রস্ত, বোধকরি ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিবার সময় সে কেশ প্রসাধন করিতেছিল ; অঙ্গে ওড়্‌নি নাই, কেবল চোলি ও ঘাঘ্‌রি। সে ছুটিয়া আসিয়া মোবারকের মৃতদেহের পাশে ক্ষণেক দাঁড়াইল, ব্যাকুল বিস্ফারিত নেত্রে মোবারকের মৃত্যুস্থির মুখের পানে চাহিল, তারপর ছিন্নলতার মতো তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িল। খ্বাজা নজর মোহগ্রস্ত মূকের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুজা ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে ঘাড় ফিরাইয়া এই দৃশ্য দেখিলেন ; কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে পরীবানুর পানে চাহিয়া রহিলেন। সামান্য মানুষের গৃহেও এমন স্ত্রীলোক পাওয়া যায় ? পানাপুকুরে মরালী বাস করে ?

সুজার সমসাময়িক ইতিকার লিখিয়াছেন, চামেলির মতো ক্ষুদ্র বস্তু সুজার চোখে পড়িত না। আজ কিন্তু এই শিশির-সিক্ত চামেলি ফুলটি ভাল করিয়াই তাঁহার চোখে পড়িল। সন্ধ্যার ছায়ালোকে তিনি যখন দুর্গের দিকে ফিরিয়া চলিলেন, তখনও ঐ শোক-নিপীড়িতার যৌবনোচ্ছল লাবণ্য তাঁহার চিত্তপটে ফুটিয়া রহিল।

দুর্গের সিংহদ্বারে প্রবেশ করিতে সুজা বলিলেন, 'বুড়ো বান্দাটা পাথরের কারিগর মনে হল।'

আলিবর্দি বলিলেন, 'হাঁ হজরৎ, আমারও তাই মনে হল।' বলিয়া সুজার পানে অপাঙ্গে চাহিলেন।

সুজা চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া গণ্ডের স্ফীত কৃষ্ণবর্ণ আঘাত চিহ্নটার উপর অঙ্গুলি বুলাইলেন। তাঁহার দৃষ্টি ছুরির নখাগ্রের মতো ঝিলিক দিয়া উঠিল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে খ্বাজা নজরের গৃহে অনৈসর্গিক নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। অন্তঃপুরে শব্দমাত্র নাই, যেন সেখানে মানুষ বাস করে না ; পরীবানু শোকের কোন্ নিগূঢ় গর্ভগৃহে আশ্রয় লইয়াছে। বাহিরের অঙ্গনও শূন্য নিস্তব্ধ ; কেবল মোবারকের রক্তচর্চিত প্রস্তরপট্টের পানে চাহিয়া খ্বাজা নজর একাকী বসিয়া আছেন।

মোবারকের কফন দফন আজ প্রভাতেই হইয়া গিয়াছে। খ্বাজা নজর ভাবিতেছেন মোবারক নাই...কাল যে সুস্থ প্রাণপূর্ণ ছিল আজ সে নাই। বর্ষ কাটিবে, যুগ কাটিবে, পৃথিবী জীর্ণ হইয়া যাইবে, সূর্য ম্লান হইবে, চন্দ্র ধূলা হইয়া খসিয়া পড়িবে তবু মোবারক ফিরিয়া আসিবে না। এমন নিশ্চিহ্ন হইয়া কোথায় গেল সে ? না, একেবারে নিশ্চিহ্ন নয়, ঐ যে পাথরের উপর তাহার শেষ মোহর-ছেপ্‌ৎ রাখিয়া গিয়াছে...শুষ্ক রক্ত...পাথরে রক্তের দাগ কতদিন থাকে ? ঘোড়ার খুরের শব্দে চোখ তুলিয়া খ্বাজা নজর দেখিলেন, কল্যকার একজন অশ্বারোহী আসিতেছে। তিনি ভাবিলেন, এ কে ? সুলতান সুজা ? মোবারক তাঁহার সহিত ধৃষ্টতা করিয়াছিল, সে ধৃষ্টতার ঋণ এখনও শোধ হয় নাই ? তবে তিনি আবার কেন আসিলেন ?

অশ্বারোহী কিন্তু সুজা নয়, আলিবর্দি খাঁ। আলিবর্দি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া খ্বাজা নজরের পাশে আসিয়া বসিলেন এবং এমনভাবে তাহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন যেন তিনি খ্বাজা নজরকে নিজের সমকক্ষ মনে করেন। সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া তিনি জানাইলেন, সুলতান সুজা কল্যকার ঘটনায় বড়ই মর্মাহত হইয়াছেন। অবশ্য তিনি যেভাবে অপমানিত হইয়াছিলেন তাহাতে অপরাধীকে সবংশে বধ করিয়া তাহাদের দেহ কুকুর দিয়া খাওয়াইলেও অন্যায় হইত না ; কিন্তু সুজার হৃদয় বড় কোমল, তিনি অন্যায় করেন নাই জানিয়াও কিছুতেই মনে শান্তি পাইতেছেন না। শোক-তপ্ত পরিবারের দুঃখ মোচন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার বুকের দরদও দূর হইবে না। সুলতান সুজা খবর পাইয়াছেন যে খ্বাজা নজর একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী। সুজার ইচ্ছা সম্রাট হইবার পর নূতন সিংহাসনে বসেন ; তাই তিনি অনুরোধ জানাইয়াছেন, খ্বাজা নজর যদি একটি মঙ্গলময় সিংহাসন তৈয়ারের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে সুজা নিরতিশয় প্রীত হইবেন। পরম পরিমার্জিত ভাষায় এই কথাগুলি বলিয়া আলিবর্দি খাঁ এক মুঠি মোহর খ্বাজা নজরের পাশে রাখিলেন।

খ্বাজা নজরের মন তিক্ত হইয়া উঠিল ; তিনি ভাবিলেন, ইহারা কি মানুষ ! মোবারকের অভাব একমুঠি সোনা দিয়া পূর্ণ করিতে চায় ! মুখে বলিলেন, 'শাহজাদার ইচ্ছাই আদেশ, সিংহাসন তৈরি করে দেব।'

অতঃপর আরও কিছুক্ষণ মিষ্টালাপ করিয়া, তখ্‌ত যত শীঘ্র তৈয়ারি হয় ততই ভাল, এই অনুজ্ঞা জানাইয়া আলিবর্দি খাঁ প্রস্থান করিলেন।

আসন্ন রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারে খ্বাজা নজর একাকী বসিয়া রহিলেন। কী নিষ্ঠুর ইহারা। অথচ ইহারাই শক্তিমান, ইহারাই সিংহাসনে বসে। ঈশ্বর ইহাদের এত শক্তি দিয়াছেন কেন ? মোবারকের রক্তে যাহার হাত রাঙ্গা হইয়াছে আমি তাহারই জন্য মঙ্গলময় সিংহাসন তৈয়ার করিব ! মঙ্গলময় সিংহাসন—তক্ত্ মোবারক— !

ভাবিতে ভাবিতে খ্বাজা নজর রক্তলিপ্ত পাথরের দিকে চাহিলেন। মনে হইল, শ্বেত পাথরের উপর গাঢ় রক্তের দাগ যেন প্রায়ান্ধকারে জ্বলিতেছে। খ্বাজা নজরের দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, সূক্ষ্ম নাসাপুট ঘন ঘন স্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করিলেন, 'তক্ত্ মোবারক—তক্ত্ মোবারক—তক্ত্ মোবারক—'

ইহাই তক্ত্ মোবারকের ইতিহাস। কিন্তু আর একটু আছে। শুধুই রক্তমাখা পাথর এবং

পিতার অভিশাপ লইয়া তক্ত্ মোবারক জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহার উপর আরও গাঢ় পাপের প্রলেপ পড়িয়াছিল।

৭

তিন দিন পরে আলিবর্দি খাঁ আবার আসিলেন। খ্বাজা নজর অপরাহ্ণে কারখানায় চালার নীচে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন; সিংহাসন প্রায় তৈয়ার হইয়াছে দেখিয়া আলিবর্দি খুশি হইলেন। কিন্তু আজ তিনি অন্য কাজে আসিয়াছিলেন, দুই চারিটি অবান্তর কথার পর কাজের কথা আরম্ভ করিলেন।

সুজার মনস্তাপ এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। বস্তুত মোবারকের বিধবা কবিলার কথা স্মরণ করিয়া তিনি মনে বড় কষ্ট পাইতেছেন; বিধবার মনে সুখ শান্তি ফিরাইয়া আনা তিনি অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু প্রজাকে সুখী করাই রাজার ধর্ম। সুজা সদয় মনে ইচ্ছা করিয়াছেন যে মোবারকের কবিলা তাঁহার হারেমে আসিয়া বাস করুক; আরাম ও ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকিয়া সে শীঘ্রই শোক ভুলিতে পারিবে। ইহাতে খ্বাজা নজরের আনন্দ হওয়া উচিত, এরূপ সম্মান অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। ইত্যাদি।

খ্বাজা নজরের বুকে বিষের প্রদাহ জ্বলিতে লাগিল। রাক্ষস—রাক্ষস এরা। মোবারককে লইয়াছে, এখন আমার ইজ্জত লইতে চায়। আমি কি করিতে পারি? 'না' বলিলে জোর করিয়া লইয়া যাইবে। যাক—পরীকে লইয়া যাক। পরী আমার ঘরে কতদিনই বা থাকিবে? সে যুবতী, দু'মাসে হোক ছ'মাসে হোক আর কাহাকেও নিকা করিয়া চলিয়া যাইবে। তার চেয়ে এখনই যাক—

মুখে বলিলেন, 'আমি দাসানুদাস—রাজার যা ইচ্ছা তাই হোক।'

আলিবর্দি অশ্বারোহণে ফিরিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর তিনটি ডুলি আসিয়া খ্বাজা নজরের বাড়ির সদরে থামিল। সঙ্গে কয়েকজন বরকন্দাজ। দুইটি ডুলি হইতে চারিজন বাঁদী নামিয়া খ্বাজা নজরের অন্দরে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে পরীবানু কাঁদিতে কাঁদিতে, চোখ মুছিতে মুছিতে বাঁদীদের সহিত বাহির হইয়া আসিল এবং ডুলিতে গিয়া বসিল। কানাৎ-ঢাকা তিনটি ডুলি বরকন্দাজ পরিবেষ্টিত হইয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি হইল। খ্বাজা নজর কারখানা ঘরে আলো জ্বালিয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহার দেহ নুইয়া পড়িয়াছে। বাটালি দিয়া সিংহাসনের গায়ে নাম খোদাই করিতেছেন আর মনে মনে চিন্তার অবশ ক্রিয়া চলিয়াছে—

মোবারকের বিবাহ...কতদিনের কথা? এইতো সেদিন...মুঙ্গের শহরে ১০৫২ সালের ২৭ শাবান তারিখে...দাসানুদাস খ্বাজা নজর বোখারী কর্তৃক...

ঠক্ ঠক্ করিয়া বাটালির উপর হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে; খ্বাজা নজরের মন কখনও অতীতের স্মৃতিতে ডুবিয়া যাইতেছে, কখনও কঠিন নির্মম বর্তমানে ফিরিয়া আসিতেছে—মোবারকের বিবাহের তারিখের সহিত তাহার মৃত্যুর তারিখ মিশিয়া যাইতেছে—

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খ্বাজা নজর এইভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। যেমন করিয়া হোক আজই এই অভিশপ্ত সিংহাসন শেষ করিয়া দিতে হইবে। আর সহ্য হয় না—আর শক্তি নাই—

সিংহাসন দেখিয়া সুজা প্রীত হইলেন। দেখিতে খুব সুশ্রী নয়, কিন্তু কি যেন একটা

অনৈসর্গিক আকর্ষণ উহাতে আছে। সুজা সিংহাসন লইয়া গিয়া দরবার কক্ষে বসাইলেন।

সন্ধ্যার সময় সভা বসিল। সুজা সিংহাসনের উপর মসলন্দ বিছাইয়া দুইপাশে মখমলের তাকিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। সভাসদেরা সহর্ষে কেরামৎ করিলেন। বাঁদীদের হাতে হাতে শরাবের পেয়ালা চলিতে লাগিল।

হাস্য পরিহাস রসালাপ চলিতেছে এমন সময় গুরুতর সংবাদ আসিল। পাটনা হইতে জলপথে দূত আসিয়াছে; সে সংবাদ দিল, মীরজুম্‌লা ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া স্থলপথে আসিতেছেন, শীঘ্রই মুঙ্গের অবরোধ করিবেন।

শরাবের পাত্র হাতে লইয়া সুজা দীর্ঘকাল নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'আমি রাজমহলে ফিরে যাব। এখানে যুদ্ধ দেব না।'

সকলে বিস্ময়াহত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এত আয়োজন এত পরিশ্রম করিয়া এ দুর্গ অজেয় করিয়া তোলা হইয়াছে, তাহা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে?

সুজা কহিলেন, 'আমার মন বলছে বাংলা দেশে ফিরে যেতে। আপনারা বাড়ি যান, আজ রাত্রিটা বিশ্রাম করুন। কাল সকাল থেকেই রাজমহল যাত্রার আয়োজন শুরু করতে হবে।'

সকলে অন্তরে ধিক্কার বহন করিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন। যাঁহারা সুজার বুলন্দ্ ইক্‌বালের উপর এখনও আস্থাবান ছিলেন তাঁহারাও বুঝিলেন সুজার পুরুষকার মহত্তর পুরুষকারের নিকট পরাস্ত হইয়াছে।

সুজাও অবসাদগ্রস্ত মনে আবার সিংহাসনে বসিলেন। কক্ষে বাঁদীর দল ছাড়া আর কেহ ছিল না; তাহারা কেহ তাঁহার সম্মুখে পানপাত্র ধরিল, কেহ ময়ূরপঙ্খী পাখা দিয়া ব্যজন করিল, কেহ বা পদমূলে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিল।

সুজা ভাবিতে লাগিলেন, ঔরংজেব আর মীরজুম্‌লা! এই দু'টা মানুষ তাঁহার জীবনের দুর্গ্রহ। ইহাদের নাম শুনিলেই তাঁহার মন সঙ্কুচিত হয়, নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়, শক্তি অবসন্ন হয়। মীরজুম্‌লার বিশ মণ হীরা আছে, সে যুদ্ধ করিতে আসে কেন? ঔরংজেব তাঁহার ছোট ভাই হইয়াও তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার করে কেন?

সুজার মনের আত্মগ্লানি ক্রমে জিঘাংসায় পরিণত হইতে লাগিল। কাহাকেও আঘাত হানিতে পারিলে গ্লানি কতকটা দূর হয়। চিন্তা-কুঞ্চিত মুখে বসিয়া তিনি নিজ গণ্ডস্থল অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করিলেন। গণ্ডের আঘাত চিহ্নটা প্রায় মিলাইয়া গিয়াছে, তবু একটু কালো দাগ এখনও আছে। মোবারকের ছিপের দাগ। বাঁদীর বাচ্চা! বদ্‌জাৎ কুত্তা! তাহার প্রতি সুজার আক্রোশ এখনও সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় নাই—প্রতিহিংসার আগুনে পূর্ণাহুতি পড়ে নাই।

সুজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাল যে নূতন বাঁদীটা এসেছে তার কান্না থেমেছে?'

একটি বাঁদী বলিল, 'এখনও থামেনি হজরৎ, তেম্‌নি কেঁদে চলেছে।'

নিরানন্দ হাস্যে সুজার দন্তপংক্তি প্রকট হইল। তিনি বলিলেন, 'তার কান্না আমি থামিয়ে দিচ্চি। তোরা যা, তাকে এখানে পাঠিয়ে দে।'

বাঁদীরা চলিয়া গেল। তক্ত্ মোবারকের উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়া সুজা অর্ধশয়ান হইলেন, গালের চিহ্নটার উপর অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে নূতন বাঁদী পরীবানুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখে কুটিল আনন্দ নৃত্য করিতে লাগিল।

পরীবানু সামান্যা নারী, খ্বাজা নজর বোখারী সাধারণ মানুষ, মোবারক হতভাগ্য স্বল্পায়ু যুবক; তাহাদের জীবন-মৃত্যু নিগ্রহ-নিপীড়ন হাসি-অশ্রুর মূল্য কতটুকু? কেহ কি তাহা মনে করিয়া রাখে?

হে অতীত, তুমি মনে করিয়া রাখিয়াছ। যাহাদের কথা সকলে ভুলিয়াছে তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই, তোমার ভাণ্ডারে মানুষের সব কথা সঞ্চিত হইয়া আছে। তাই বুঝি বর্তমানের ললাটে তোমার অভিশাপের ভস্মটিকা দেখিতে পাইতেছি।

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪



ইন্দ্রতূলক

ইতিহাসের পণ্ডিত বলিলেন, 'গল্প শোনো। কাল রাত্রে প্রাচীন ইতিহাসের এক পুঁথি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—'

খুবই স্বাভাবিক। ইতিহাসের পুঁথি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ে না এমন মানুষ আমি দেখি নাই।

পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, 'ঘুমিয়ে এক স্বপ্ন দেখলুম। আশ্চর্য স্বপ্ন। আমি যেন ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, আর আমার চোখের সামনে যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। আট হাজার বছরের পুরানো ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পেলুম।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাল রাত্রে কি খেয়েছিলেন ?'

পণ্ডিত বলিলেন, 'মনে নেই। গিন্নি বলতে পারেন।'

গৃহিণী বলিলেন, 'কাঁকড়ার ঝোল আর ভাত।'

বলিলাম, 'বুঝেছি, ইংরেজিতে যাকে বলে নাইট্ মেয়ার আপনি তাই দেখেছেন। আমি এবার উঠি।'

পণ্ডিত বলিলেন, 'আরে বোসো, চা খেয়ে যাও।—ভূগোল পড়েছ ?'

বলিলাম, 'ভূগোল ? ইতিহাসের স্বপ্ন দেখলেন, তার মধ্যে ভূগোল। ইস্কুলে পড়েছিলুম বটে।'

পণ্ডিত বলিলেন, 'বেশ, এখন একটা দেশ মনে মনে কল্পনা কর, বেলুচিস্থান থেকে ইরানের দক্ষিণভাগ পর্যন্ত। কল্পনায় দেখতে পাও ?'

মনের মধ্যে ম্যাপ আঁকিবার চেষ্টা করিলাম ; পূর্বদিকে সিন্ধু নদ, পশ্চিমে পারস্য উপসাগরের মুখ, দক্ষিণে সমুদ্র, মাঝখানে পাহাড় ও মরুভূমিতে ভরা একটা দেশ।

পণ্ডিত বলিলেন, 'আট হাজার বছর আগে সিন্ধু নদ ছিল না। বর্তমানে যে দেশটা পাঞ্জাব নামে পরিচিত সেটা ছিল ধূ ধূ মরুভূমি। আর কাশ্মীর ছিল প্রকাণ্ড একটা মিঠে জলের হ্রদ। এখন কল্পনা কর, পূর্বদিকে দুস্তর মরুভূমি, উত্তরে দুর্ভেদ্য পাহাড়, দক্ষিণে সমুদ্র—মাঝখানে সরু এক ফালি দেশ। কোনও দিক দিয়েই বেরুবার রাস্তা নেই। আট হাজার বছর আগে এই দেশে একটা জাতি বাস করত।

'বর্বর জাতি ; কিন্তু গায়ের চামড়া কটা, চোখের মণি নীল, চুল সোনালী। পরবর্তী কালে যারা আর্য বলে পরিচিত হয়েছিল এরা তারাই। এই দেশই তাদের আদিম বাসভূমি। পাহাড় এবং মরুভূমির পরপারে কালো মেটে পাঁশুটে নানা রঙের মানুষ বাস করত বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে এই আর্যদের মেলামেশার কোনও উপায় ছিল না। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গভাবে এই জাতি বহুকাল বাস করেছিল। নিঃসঙ্গতার মধ্যেই তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হয়েছিল।

'শুকনো দেশ, তার ওপর ওরা তখন চাষবাস করতেও জানত না। গরু, ছাগল পুষতে

শিখেছিল, কিন্তু ঘোড়া কি জন্তু তা কখনও চোখে দেখেনি। দেশের পূর্বসীমায় বেলুচিস্থানের পাহাড়ে একরকম ঘাস জন্মাত, তার বীজ তারা গুঁড়ো করে খেত। এই পাহাড়ী ঘাসের বীজ আধুনিক গমের পূর্বপুরুষ। কিন্তু তাতে তাদের পেট ভরত না; এই জাতির প্রধান জীবিকা ছিল সমুদ্রে মাছ ধরা।

'ছোট ছোট নৌকায় চড়ে তারা সমুদ্রের কিনারে কিনারে মাছ ধরে বেড়াত। মাছ তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, তাই মাছকেই তারা দেবতা মনে করত। মৎস্য ছিল তাদের অবতার।

'তাদের অবশ্য একজন রাজা ছিল। রাজার নাম মনু। তখনকার বর্বরতার যুগে সকল জাতিরই একটা totem থাকত; এই জাতির totem ছিল সূর্য। মনু দাবি করতেন সাক্ষাৎ বিবস্বান তাঁর আদি পুরুষ।

'সমুদ্রে পুরুষানুক্রমে মাছ ধরার ফলে এই জাতি নৌ-বিদ্যা বেশ আয়ত্ত করেছিল। মনুর কয়েকটা বড় বড় নৌকা ছিল, তিনি তাইতে চড়ে মাছ ধরে বেড়াতেন। তিনি ভারি বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, সমুদ্রের জল-বাতাস লক্ষ্য করে আসন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বুঝতে পারতেন।

'একদিন মনু সমুদ্রে মাছ ধরছেন, তাঁর জালে এক অদ্ভুত চেহারার মাছ উঠল। মাছের নাকের কাছে এক শিং। মনু পঞ্চাশ বছর এই সমুদ্রে মাছ ধরছেন, কিন্তু এমন মাছ কখনও চোখে দেখেননি। মাছটা ধড়ফড় করল না, নির্জীব হয়ে পড়ে রইল। মনু বুঝলেন, এ মাছ অজানা কোনও সমুদ্র থেকে এসেছে। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, মনে হল আকাশ বাতাস যেন এক মহা দুর্যোগের প্রতীক্ষায় থমথম করছে।

'মনু তাড়াতাড়ি তীরে ফিরে এলেন, প্রজাদের জড়ো করে বললেন, "আমি জানতে পেরেছি এক মহাপ্লাবন আসছে, পৃথিবী ডুবে যাবে। তোমরা যদি বাঁচতে চাও যে-যার নৌকায় ওঠো।"

'মনুর কথায় অনেকেই নৌকায় গিয়ে উঠল। মনু তাঁর স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-পরিজন গরু ছাগল নিয়ে নিজের বড় বড় নৌকা ভরতি করলেন। যারা মনুর কথা বিশ্বাস করল না কিংবা যাদের নৌকা ছিল না তারা মাটিতেই রইল।

'সন্ধ্যাবেলা সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে, সমুদ্র থেকে হুহুঙ্কার শব্দ শোনা গেল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে তালগাছের মতো উঁচু ঢেউ ছুটে আসছে, তার সঙ্গে ঝড়-তুফান। দেখতে দেখতে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

'পরদিন সকালবেলা দেখা গেল চারিদিক জলে জলময়, কোথাও মাটির চিহ্নমাত্র নেই। ছোট নৌকাগুলো ঢেউয়ের ঝাপটে সব ডুবে গেছে, কেবল মনুর কয়েকটা বড় নৌকা প্রলয়পয়োধি জলে বটপত্রের মতো ভাসছে।'

পণ্ডিতকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এরকম একটা রসাতল কাণ্ড কেন হল আপনি জানতে পেরেছিলেন?'

'পেরেছিলাম। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?'

'বলুন, চেষ্টা করে দেখি।'

'পারস্য উপসাগর তখন হ্রদ ছিল, সমুদ্রের সঙ্গে যোগ ছিল না। ম্যাপ দেখলে তার কতকটা আন্দাজ পাবে। হ্রদের উত্তর দিকে দুটো বড় বড় নদী—টাইগ্রিস আর য়ুফ্রেটিস—ক্রমাগত হ্রদের মধ্যে জল ঢালছিল, হ্রদের জল বেড়ে বেড়ে তীর ছাপিয়ে যেতে লাগল। তারপর একদিন জলের চাপে সমুদ্রের দিকের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, হ্রদ সমুদ্রে মিশল। হু হু শব্দে জল বেরিয়ে সমুদ্র তোলপাড় করে ছুটতে লাগল। সেই তোড়ে আশপাশের তীরভূমি ডুবে গেল। এই হচ্ছে মহাপ্লাবনের কারণ। মহাপ্লাবনের যত প্রাচীন গল্প আছে সব ঐ পারস্য উপসাগরকে কেন্দ্র করে। ঘটনাটা ঐখানেই ঘটেছিল কি না।'

আমি গুম হইয়া গেলাম। কিন্তু তর্ক করা বৃথা, স্বপ্নের বিরুদ্ধে তর্ক নিষ্ফল। বলিলাম, 'বুঝেছি। তারপর মনুর কথা বলুন।'

পণ্ডিত বলিলেন, 'সাত দিন সাত রাত মনু নৌকায় ভাসতে লাগলেন। রাজ্যের উত্তর সীমানা ঘিরে যে পাহাড় ছিল তার নাম সুমেরু, মনুর নৌকা ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে সেইদিকে ভেসে চল্‌ল।

'সাত দিন পরে জল নামতে আরম্ভ করল; বানের জল যেমন জোরে আসে তেমনি জোরে নেমে যায়। মনু তখন সুমেরুর গায়ে গিয়ে ঠেকেছেন, একটা চূড়ায় নৌকা বেঁধে ফেললেন।

'ক্রমে সমুদ্রের জল সমুদ্রে ফিরে গেল, আবার ডাঙ্গা জেগে উঠল। দেশ যেমন ছিল প্রায় তেমনি আছে, কিন্তু মানুষ সব শেষ হয়ে গেছে। বেঁচে আছেন শুধু মনু আর তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠী। আর কয়েকটি ছাগল গরু।

'মনু তাই নিয়ে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করলেন—যাকে বলে কেঁচে গণ্ডূষ।'

এই সময় চা আসিয়া পড়িল। পণ্ডিত পেয়ালা তুলিয়া লইয়া চুমুক দিলেন।

বলিলাম, 'আপনার স্বপ্ন এইখানেই শেষ তো?'

পণ্ডিত বলিলেন, 'আরে রামঃ, আরো অনেক আছে। তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, সংক্ষেপে বলছি। মনুর পর আন্দাজ পাঁচশ' বছর কেটে গেল। মনু দেহরক্ষা করলেন, কিন্তু তাঁর বংশধরেরা আবার দলে ভারী হয়ে উঠল।'

প্রশ্ন করিলাম, 'পাঁচশ' বছর কেটে গেল বলছেন, তার মানে সাড়ে সাত হাজার বছর আগেকার কথা?'

পণ্ডিত বলিলেন, 'মোটামুটি। তখন আকাশে ধ্রুবতারা ছিল না। ধ্রুবতারা এসেছিল আরও দু'হাজার বছর পরে। কিন্তু সে অন্য ধ্রুবতারা, জ্যোতিষে তার নাম Alpha Draconis। বেদে তার উল্লেখ আছে। আজকাল যাকে আমরা ধ্রুবতারা বলি সে অন্য তারা।'

'সর্বনাশ! ধ্রুবতারা আবার ক'টা আছে?'

'অনেক। কিন্তু জ্যোতিষের জটিল তত্ত্ব তুমি বুঝবে না, সে যাক। মহাপ্লাবনের পর দেশের আবহাওয়া কিছু বদলেছিল, মাটির ওপর পলি পড়েছিল। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের দু'-একটা রাস্তাও খুলে গিয়েছিল।

'মহাপ্লাবনের পর আর্যদের নতুন দেবতা হলেন—বরুণ। তিনি জলের দেবতা, রাখলে রাখতে পারেন, মারলে মারতে পারেন, সুতরাং তাঁকে তুষ্ট করা আগে দরকার। এই বরুণকে কেন্দ্র করে আর্যদের আদিম দেবতা-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। আর্যদের ভাষা তখন বেশ দানা বেঁধেছে কিন্তু তারা লিখতে জানে না। সবই কানে শোনা কথা—শ্রুতি।

'আর্যরা সংখ্যায় বেশ বেড়ে উঠল। তাদের মধ্যে তুক-তাক মারণ উচাটন প্রভৃতি দৈবক্রিয়ার উদ্ভব হল: তারা রোজা হয়ে ভূত ঝাড়ে, ওঝা হয়ে সাপের বিষ নামায়। এটা অথর্ববেদের প্রথম যুগ। অথর্ববেদ নামেও অথর্ব কাজেও অথর্ব, সবচেয়ে পুরোনো; আর্যদের প্রাচীনতম শ্রুতি ওতে ধরা আছে।

'সে যাক। বাইরে যাবার রাস্তা খোলা পেয়ে দু'চার জন উৎসাহী লোক দেশের বাইরে যেতে আরম্ভ করেছিল। বেশির ভাগই যেত উত্তরদিকে, কারণ পূর্বদিকে পাঞ্জাবের মরুভূমি তখনও শত যোজন জুড়ে পড়ে আছে, তাকে অতিক্রম করা অসাধ্য। যা হোক, বহির্জগতের সঙ্গে আর্যদের অল্প-স্বল্প মেলামেশা আরম্ভ হল; সুমেরু পর্বতের ওপারে কৃষ্ণচক্ষু কৃষ্ণকেশ একজাতীয় মানবের সঙ্গে আলাপ হল।

'এইভাবে আরও কয়েক শতাব্দী কেটে গেল। ইতিমধ্যে আর্যরা কৃষিকার্য শিখে ফেলেছিল,

বুনো গমের বীজ বুনে শস্য ফলাতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তবু দেশে খাদ্যের অনুপাতে মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, খাদ্যের অনটন দেখা দিল। মৎস্য এবং গোধূম পর্যাপ্ত নয়।

'কিন্তু পুরুষানুক্রমে মৎস্যভোজনের ফলে আর্যদের বুদ্ধি খুব ধারালো হয়েছিল ; তারা দলে দলে খাদ্য অন্বেষণে বিদেশে যেতে লাগল। কিন্তু বিদেশে যাবার দু'টি মাত্র পথ ; এক সমুদ্র, দ্বিতীয় উত্তর দিক। আর্যদের মধ্যে যারা মৎস্যজীবী, তারা নৌকা নিয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ল। এরাই পরে পাণি বা ফিনিশিয়ান নামে পরিচিত হয়েছিল, দক্ষিণে লঙ্কা এবং উত্তরে ইংলন্ড পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

'দ্বিতীয় দল গেল সুমেরুর গিরিসঙ্কট পার হয়ে মাটির পথে। আর্যদের উত্তরাভিযান আরম্ভ হল। এই অভিযান তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে পারস্য গ্রীস রাশিয়া পার হয়ে স্কান্ডিনেভিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ আপনি স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলছেন, না ইতিহাস বলছেন ?'

পণ্ডিত বলিলেন, 'ইতিহাসে অন্য কথা আছে, আমি যা স্বপ্ন দেখেছি তাই বলছি। কিন্তু সাহেবের লেখা ইতিহাসই সত্য আর আমার স্বপ্ন মিথ্যা, তার প্রমাণ কি ?'

পণ্ডিতকে ঘাঁটাইয়া লাভ নাই, বলিলাম, 'কোনও প্রমাণ নেই। তারপর বলুন।'

'তারপর আমার স্বপ্নের ক্লাইম্যাক্স।'

'যাক, স্বপ্ন তাহলে শেষ হয়ে আসছে ? কিন্তু কই, আর্যরা ভারতবর্ষে তো এল না ?'

'এইবার আসছে। সেইখানেই ক্লাইম্যাক্স।'

পণ্ডিত আবার আরম্ভ করিলেন, 'উত্তরদিকে যারা অভিযান করল তার অধিকাংশই ফিরে এল না, দু'চার জন ফিরে এল। যারা ফিরে এল তাদের মধ্যে একজনের নাম—ইন্দ্র।

'ইন্দ্র গোড়ায় মানুষ ছিলেন ; সাধারণ মানুষ, একজন যোদ্ধা। কিন্তু অসাধারণ তাঁর বুদ্ধি, দুর্দম সাহস। যুগে যুগে যে-সব মানুষ জাতিকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে, ইন্দ্র তাদেরই একজন। যুগাবতার বলতে পার। ইন্দ্র দলবল নিয়ে উত্তরদিকে গিয়েছিলেন, অনেক বছর পরে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর সঙ্গে একপাল ঘোড়া! দেশের লোক আগে কখনও ঘোড়া দেখেনি, ঘোড়া দেখে চমৎকৃত হয়ে গেল। উচ্চৈঃশ্রবার নাম শুনেছ বোধ হয়। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের কেবল ঘোড়া ছিল আর কারুর ছিল না।

'ইন্দ্র ঘোড়া নিয়ে দেশে ফিরে এলেন, কিন্তু বেশি দিন চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। চুপ করে বসে থাকার লোক তিনি নন। আবার সদলবলে অভিযানে বেরুলেন। এবার পূর্বদিকে। ইন্দ্র স্থির করলেন, কতদূর যাওয়া যায় তিনি পরীক্ষা করে দেখবেন। মরুভূমির পরপারে কী আছে ? মরুভূমি কি পার হওয়া যায় না ?

'ইন্দ্রের অশ্বারোহীর দল পূর্বদিকে চলল। বেলুচিস্থানের পূর্ব সীমানা থেকে মরুভূমি আরম্ভ হয়েছে। ইন্দ্র বারবার মরুভূমি উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। মরুভূমি তো নয়, জ্বলন্ত দাবানল। ব্যর্থ হয়ে ইন্দ্র মরুভূমির কিনারা ধরে উত্তর মুখে চললেন। হয়তো উত্তরে মরু পার হবার পথ আছে।

'কুটিল কর্কশ পথ ; জলের বড় কষ্ট। তবু ইন্দ্র নিরস্ত হলেন না। মাসের পর মাস কেটে গেল, বছর কেটে গেল, ইন্দ্র পাহাড়-মরুর সন্ধিরেখা ভেদ করে চলেছেন। ঘোড়া ছিল বলেই পেরেছিলেন, পদব্রজে পারতেন না।

'কিন্তু পথ যত দুর্গমই হোক, কোথাও তার শেষ আছে। একদিন ইন্দ্র কাশ্মীর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলেন। কাশ্মীর তখন ভূস্বর্গ নয়, প্রকাণ্ড একটি হ্রদ। ইন্দ্র দেখলেন হ্রদের জল কানায়

কানায় টলমল করছে, তাকে সাপের মতো বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে কৃষ্ণবর্ণ পাহাড়ের শ্রেণী। ইন্দ্র অঞ্জলি ভরে জল পান করলেন ; দেখলেন মিষ্টি জল।

'হ্রদের দিকে চেয়ে চেয়ে ইন্দ্রের মস্তিষ্কে একটা প্রচণ্ড আইডিয়া খেলে গেল। আজকালকার দিনেও কোনও আমেরিকান বা রুশ ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় এতবড় দুঃসাহসিক আইডিয়া সহজে আসে না। ইন্দ্র ভাবলেন, সিন্ধুকে অর্থাৎ সমুদ্রকে যদি কোনও মতে পর্বতরূপী বৃত্রাসুরের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে পারি, তাহলে এই সিন্ধু নিম্নাভিমুখে মরুভূমির উপর দিয়ে ধাবিত হবে, যা এখন ঊষর মরুভূমি আছে তা জলসিক্ত হয়ে শ্যামল ভূমি হবে, মরুর উপর পথ তৈরি হবে...

'ইন্দ্র শুধু ভাবুক নয়, কর্মীপুরুষ ! তিনি তাঁর ভাবনাকে কার্যে পরিণত করবার জন্যে মহা উদ্যমে লেগে গেলেন।

'কাজটি কিন্তু সহজ নয়, অনেক দিন লাগল। হ্রদের কিনারে কিনারে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর ইন্দ্র একটা জায়গা পেলেন যেখানে পাহাড়ের বাঁধ কিছু দুর্বল, দু'-চারটি বড় বড় পাথরের চাঁই সরাতে পারলেই জল নিকাশের একটা রাস্তা হয়। একবার একটা রাস্তা পেলে জল নিজের জোরেই রাস্তা প্রশস্ত করে নেয়, তখন আর তাকে ঠেকাবে কে ?

'ইন্দ্র ঐ পাথরগুলো সরাবার উদ্যোগ করলেন।

'কিন্তু মানুষের দৈহিক শক্তিতে ও পাথর সরানো সম্ভব নয়। ইন্দ্র ঘোড়া লাগালেন ; চর্মরজ্জু দিয়ে পাথর বেঁধে ঘোড়ারা টানতে লাগল। প্রথমে পাথর কিছুতেই নড়ে না, তারপর অনেক টানাটানির পর হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

'সঙ্গে সঙ্গে প্রবল তোড়ে জল বেরুতে লাগল। এত তোড়ে ইন্দ্রও আশা করেননি, রন্ধ্র পথে জলের উত্তাল ধারা সগর্জনে ছুটল। অন্য ঘোড়াগুলো রক্ষা পেল বটে কিন্তু ইন্দ্রের নিজস্ব ঘোড়াটা এই দুর্বার স্রোতের আঘাতে চূর্ণ হয়ে ভেসে গেল। ইন্দ্রের ঘোড়ার নাম ছিল—দধীচি।'

পণ্ডিত চুপ করিলেন। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, 'তারপর ?'

পণ্ডিত বলিলেন, 'এইখানেই আমার স্বপ্ন শেষ। কিন্তু মন থেকে আরও কিছু জুড়ে দিতে পারি। সিন্ধুকে প্রবাহিত করার ফলে একদিকে যেমন পাঞ্জাব থেকে সিন্ধু পর্যন্ত সঞ্জীবিত হয়ে উঠল, অন্যদিকে তেমনি কাশ্মীর জলের তলা থেকে উঠে এল। ভারতবর্ষের পশ্চিত প্রান্তে যে অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক ব্যবধান ছিল তা ভেঙে পড়ল। স্থলপথে বহির্জগতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হল। ইন্দ্র এই কীর্তির কর্তা ; তাই ইন্দ্র দেবরাজ।'

আমি বলিলাম, 'একটা কথা। আপনার হিসেবে এই ব্যাপার ঘটেছিল আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে। কিন্তু ইন্দ্র কি অত পুরোনো দেবতা ?'

পণ্ডিত বলিলেন, 'ইন্দ্র মানুষটা সাত হাজার বছরের পুরোনো বটে কিন্তু দেবত্ব লাভ করতে তাঁর আরও দু'হাজার বছর লেগেছিল। আজকাল মানুষের দেবত্ব লাভ যত সহজ, তখন তত সহজ ছিল না। সিন্ধু নদ এবং আরও অনেকগুলি নদী বেরিয়ে পাঞ্জাবকে শস্যশ্যামল করে তোলবার পর আর্যরা অনেকে এসে সপ্তসিন্ধুর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করলেন। নূতন দেশের সতেজ জল-হাওয়ায় আর্যদের এক নূতন সংস্কৃতি জন্মলাভ করল। পাঞ্জাবের এই নূতন আর্যরাই বরুণ দেবতাকে সরিয়ে ইন্দ্রকে প্রধান দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ইন্দ্রপূজার প্রথম দেশ হল সেই দেশ, যাকে ইন্দ্র মরুভূমির বুক থেকে টেনে তুলেছিলেন।

'দেশটা ইন্দ্রের দেশ বলে পরিচিত হল ; প্রাচীন দেশ অবশ্য বরুণের দেশই রইল। ইন্দ্রের দেশে যারা বাস করতে লাগল, তাদের নাম হল ইন্দ্র। কালক্রমে ইন্দ্র অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়াল হিন্দু। এখনও সেই নাম চলে আসছে। আমরা হিন্দু, অর্থাৎ ইন্দ্রপূজক।'

'তারপর ?'

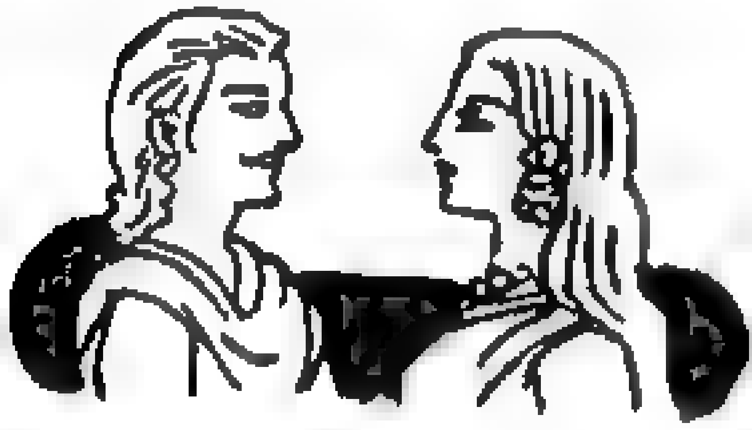
'তারপর ইতিহাস পড়। সূর্যবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন শুনেছ বোধ হয়। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের লোক নন, সুমেরু দেশের রাজা প্রথম সারগণ, খ্রীস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দের কথা। আর্যরা তখন সুমেরু পর্বতের উত্তরে অনেক রাজ্য স্থাপন করেছেন, আবার ভারতবর্ষেও তাঁদের উপনিবেশ পূর্বদিকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। সারগণ বা সগর রাজার এক পুত্র যাট হাজার প্রজা নিয়ে কোনও কারণে আদিম জন্মভূমি ছেড়ে ভারতবর্ষে অভিযান করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা অযোধ্যায় এসে রাজ্য স্থাপন করেছিল।

'সেই থেকে সূর্যবংশের একটা শাখা ভারতবর্ষেই আছে। রামচন্দ্র হলেন সগর রাজার অধস্তন নবম পুরুষ ; তিনি ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন। এসব নেহাত হালের কথা।'

পণ্ডিত বোধ করি আরও কিছুক্ষণ তাঁহার স্বপ্নাদ্য ইতিহাস শুনাইতেন, কিন্তু এই সময় পণ্ডিতগৃহিণী আসিয়া বলিলেন, 'রবিবার বলে কি আজ নাওয়া খাওয়ারও ছুটি ? যাও, স্নান করগে।'

পণ্ডিত স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। আমি পণ্ডিতগৃহিণীকে বলিলাম, 'বৌদি, আপনার কর্তার পেট গরম হয়েছে। ওঁকে আর কাঁকড়া খাওয়াবেন না। বরং রাত্রে শোবার সময় একটু ত্রিফলার জল দেবেন।'

১৮ আষাঢ় ১৩৫৫



আদিম

এই কাহিনীতে আদৌ স্থান কাল পাত্র-পাত্রীর প্রকৃত নাম বদল করিয়া লিখিতেছি।—

মহারাজ সূর্যশেখর শত্রু জয় করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়াছেন। মরুভূমির পরপারে নির্জিত শত্রু মাথা নত করিয়াছে। মহারাজ সূর্যশেখর সহস্র বন্দী ও সহস্র বন্দিনী সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে সাধারণ মানুষও আছে, আবার অভিজাত বংশের যুবক-যুবতীও আছে। বড় সুন্দর আকৃতি এই বন্দী-বন্দিনীদের ; রজতশুভ্র দেহবর্ণ, স্বর্ণাভ কেশ। যুবতীদের দিকে একবার চাহিলে চোখ ফেরানো যায় না।

মহারাজ ঘোষণা করিয়াছেন, একশত বন্দী ও একশত বন্দিনী তিনি স্বয়ং বাছিয়া লইবেন ; বাকি যাহা থাকিবে, প্রধান সেনাপতি হইতে নিম্নতম নায়ক পর্যন্ত সকলে পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাগ করিয়া লইবে। উপরন্তু লুণ্ঠিত ধনরত্ন যাহা সঙ্গে আসিয়াছে তাহাও ভাগ-বাঁটোয়ারা হইবে।

একদিন অপরাহ্নে উত্তরায়ণের সূর্য মরুপ্রান্তর প্রজ্বলিত করিয়া অস্তোন্মুখ হইয়াছে এমন সময় বিজয় বাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। পুরোভাগে মহারাজ সূর্যশেখরের চিত্রবিচিত্র শ্যেনলাঞ্ছন চতুর্দোলা, তাহার পশ্চাতে শিবিকা ও দোলিকায় সেনাপতির দল, তারপর বন্দী-বন্দিনীর শ্রেণী এবং লুণ্ঠিত ধনরত্নবাহী যানবাহন। সর্বশেষে বিপুল সৈন্যবাহিনী।

কিন্তু আজ আর সদলবলে পুরপ্রবেশের সময় নাই ; মহারাজ স্বনির্বাচিত বন্দী-বন্দিনীদের লইয়া ডঙ্কা বাজাইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। সেনাপতিরাও নগরে যাইতেছেন ; তাঁহারা কাল প্রাতে আসিয়া বন্দী-বন্দিনী বাছাই করিয়া লইয়া যাইবেন। কেবল সৈন্যদল ধনরত্ন ও বন্দী-বন্দিনীদের রক্ষকরূপে রহিল। কাল প্রাতে ধনরত্ন ভাগ হইবে, সৈনিকেরা যে-যার অংশ

লইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিবে।

একজন কনিষ্ঠ সেনানীর নাম সোমভদ্র। বয়স একুশ বাইশ, বলিষ্ঠ দেহ, তাম্রফলকের ন্যায় দেহবর্ণ ; সুন্দর আকৃতি। রাজধানীতেই তাহার গৃহ, তাহার পিতা একজন মধ্যশ্রেণীর ভদ্র গৃহস্থ। সোমভদ্র এই প্রথম যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল ; যুদ্ধে সে অসীম পরাক্রম দেখাইয়াছে, প্রধান সেনানায়কদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে, মহারাজের ভীমকান্ত মুখের প্রসন্ন হাস্য তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু আজ গৃহের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া যখন সকলের মন গৃহের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে তখনও তাহার প্রাণে শান্তি নাই। গৃহের কথা স্মরণ হইলেই তাহার মন শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। গৃহে পিতামাতা আছেন, কনিষ্ঠা ভগিনী শফরী এবং বালক-ভ্রাতা শ্যেনভদ্র আছে ; ক্ষুদ্র সংসার। কিন্তু সোমভদ্রের সবচেয়ে ভয় শফরীকে। শফরী শুধুই তাহার অনুজা নয়—

উদ্‌ভ্রান্তভাবে সৈন্য সমাবেশের প্রান্তভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে সোমভদ্র গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল ; সৈন্যদল শত্রু বিজয় করিয়া ফিরিয়াছে, তাহাদের মনে চিন্তা নাই ; তাহারা উচ্চকণ্ঠে গান গাহিতেছে, নিজেদের মধ্যে হুড়াহুড়ি করিতেছে। কাল প্রাতে তাহারা বেতন পাইবে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাইবে ; হয়তো দুই একটি দাস-দাসী পাইবে, তারপর মহানন্দে গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু সোমভদ্রের অবস্থা অন্যরূপ ; তাহার মন দুইদিকে টানিতেছে। সম্মুখে নীয়মান পতাকার ন্যায় তাহার মন পিছনদিকে তাকাইয়া আছে।

শত্রু বিজয় করিয়া ফিরিবার পথে সহস্র বন্দিনীর মধ্যে একটি বন্দিনীর কাছে সোমভদ্র হৃদয় হারাইয়াছে। ইহা কেবলমাত্র দৈহিক আকর্ষণ নয়, গভীরতর বস্তু। বন্দিনীর নাম মেরুকা ; শুভ্রশিখা দীপবর্তিকার ন্যায় তার রূপ, বন্দিনীর ছিন্ন-গলিত বস্ত্রাবরণ ভেদ করিয়া রূপশিখা স্ফুরিত হইতেছে। নীল চোখে কঠিন সহিষ্ণুতা। সে উচ্চবংশের কন্যা, দৈবনিগ্রহে বিজাতীয় শত্রুর কবলিত হইয়া স্বজন হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত, পৃথিবীতে আপন বলিতে তাহার কেহ নাই ; সে এখন নির্মম শত্রুর পণ্যবস্তু। কিন্তু এই মহা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াও মেরুকা মনের স্থৈর্য হারায় নাই।

বন্দিনীদের মধ্যে সুন্দরী অনেক আছে, সকলেই সুন্দরী ও যুবতী ; কারণ বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী যুবতীদেরই হরণ করিয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু সোমভদ্র একমাত্র মেরুকাকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছে। প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে করিতে দু'জনে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়াছে ; চেনাশোনা হইয়াছে, দুই চারিটি সংক্ষিপ্ত কথার বিনিময় হইয়াছে, দু'জনে পরস্পরের নাম জানিয়াছে, অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত জানিয়াছে। সোমভদ্র কিন্তু নিজের মনের কথা মেরুকাকে বলে নাই ; বলিবার প্রয়োজন হয় নাই, সোমভদ্রের চোখের ভাষা মেরুকা বুঝিয়াছে।

কিন্তু আজ যাত্রাপথের প্রান্তে পৌঁছিয়া আর নীরব থাকা চলে না, মনের কথা মুখের ভাষায় প্রকাশ করা প্রয়োজন। তাই সোমভদ্রের মন এত বিভ্রান্ত। হৃদয়ে আবেগ আছে, শান্তি নাই। পথের প্রান্তে নয়, সে যেন দ্বিভুজ পথের কোণবিন্দুতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সেনাপতিরা সকলে চলিয়া গিয়াছেন। সূর্য অস্তগামী ; সৈনিকেরা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া রাত্রির আহারের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে। সোমভদ্রের প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। সে সহসা মনস্থির করিয়া বন্দিনীদের সাময়িক উপনিবেশের দিকে চলিল।

বন্দী ও বন্দিনীদের পৃথক অবরোধ। সৈন্যযূথের বিশ্রাম কালে দোলা-শকটাদি বাহনগুলিকে পর পর সাজাইয়া দুইটি পরিবেষ্টন নির্মিত হয়, একটিতে বন্দিগণ ও অপরটিতে বন্দিনীগণ থাকে। এই শকট-ব্যূহের মধ্যে রাজা ও দুই তিনজন প্রধান সেনাপতি ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সোমভদ্র শকট-ব্যূহের বহির্দেশ ঘিরিয়া ধীর পদে পরিক্রমণ আরম্ভ করিল।

আবেষ্টনীর মধ্যে বন্দিনী মেয়েরা দাঁড়াইয়া আছে ; তাহাদের দৃষ্টি বাহিরের দিকে। কাহারও চোখে আতঙ্ক, কাহারও চোখে নীরব অশ্রুর ধারা। কেহ বা নিয়তির ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিয়া উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও দৃষ্টি সম্মুখে ভীম নগর-তোরণের উপর নিবদ্ধ, কাহারও চক্ষু পশ্চাতে অদৃশ্য মাতৃভূমির দিকে প্রসারিত। তাহাদের সম্মিলিত মনের নিপীড়িত আকাঙ্ক্ষা কে নির্ণয় করিবে ?

আবেষ্টনীর পশ্চাদ্ভাগে মেরুকা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার চোখের দৃষ্টি সম্মুখেও নয়, পশ্চাতেও নয় ; মনে হয় আপন মনের গহন জটিলতার মধ্যে তাহার চক্ষু দুটি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সোমভদ্র তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল ; মাঝখানে একটি শকটের ব্যবধান। কিন্তু মেরুকা তাহাকে দেখিতে পাইল না। সোমভদ্র কিয়ৎকাল একাগ্র চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া অবরুদ্ধ স্বরে ডাকিল—'মেরুকা !'

চকিতে মেরুকার চক্ষু বহির্মুখী হইল। সে ক্ষণকাল স্তিমিত নেত্রে সোমভদ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—'সেনানী সোমভদ্র !'

শকটের উপর ঝুঁকিয়া সোমভদ্র প্রশ্ন করিল—'মেরুকা, তুমি কি ভাবছিলে ?'

মেরুকা আকাশের পানে চাহিল। এক ঝাঁক পাখি কলকূজন করিয়া বাসায় ফিরিতেছে। মেরুকা ধীরে ধীরে বলিল—'কি ভাবছিলাম জানি না। বোধ হয় নিজের নিয়তির কথা ভাবছিলাম।'

উদ্গত আবেগ দমন করিয়া সোমভদ্র কহিল—'মেরুকা, তুমি আশা হারিও না।'

মেরুকা বলিল—'যেদিন বন্দিনী হয়েছি সেদিন থেকে আশা-আকাঙ্ক্ষা দুই-ই ত্যাগ করেছি। শুধু ভাবি, আমার নিয়তি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ঝড়ের মুখে মরুভূমির বালুকণা কোন্ সমুদ্রের জলে ডুবে যাবে।'

তাহার নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে যে অপরিসীম হতাশা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা সোমভদ্রের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল ; সে মেরুকার পানে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আবেগ-স্খলিত স্বরে বলিল—'মেরুকা, তুমি আমার ভগিনী ! আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া মেরুকা বলিল—'ভগিনী ! তোমাদের দেশে ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহ হয় ! আমাদের দেশে হয় না। কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতা নও, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, আমি স্বর্গ হাতে পাব।'

মেরুকার শুষ্ক চক্ষু সহসা বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, সে সোমভদ্রের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। শকটের দুই পার হইতে আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হইল।

সোমভদ্র বলিল—'আমি কাল প্রত্যূষে আসব। একটি বন্দিনী আমার প্রাপ্য। আমি তোমাকে বেছে নেব, তারপরে বাড়ি গিয়ে তোমাকে বিয়ে করব।'

মেরুকার অধর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে কথা বলিতে পারিল না, কেবল দুর্দম আকাঙ্ক্ষা ভরা চোখে সোমভদ্রের পানে চাহিয়া রহিল।

সোমভদ্র যখন নিজ গৃহের সম্মুখীন হইল সূর্য অস্ত গিয়াছে, অদূরস্থ নদীর নিস্তরঙ্গ নীল জলে অস্তরাগের খেলা চলিতেছে। গৃহ-প্রাঙ্গণের দ্বারে তাহার পিতা মাতা, ভগিনী শফরী ও বালক-ভ্রাতা শ্যেনভদ্র দাঁড়াইয়া ; সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে সোমভদ্রের উপর পড়িল। মায়ের মুখে হাসি, চোখে জল ; পিতার মুখ তৃপ্তি-গম্ভীর। শ্যেনভদ্র ছুটিয়া দাদার কাছে যাইবার উপক্রম করিলে পিতা তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিলেন। কেবল শফরীকে কেহ আটকাইল না। সোমভদ্রকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার অগ্রাধিকার তাহারই।

শফরীর বয়স সতেরো। রূপ ও যৌবন মিলিয়া সাবলীল স্বর্ণাভ শফরীর মতোই তাহার দেহ। সে লঘুপদে ছুটিয়া গিয়া সোমভদ্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, গ্রীবার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া গদ্‌গদ স্বরে ডাকিল—'ভাই!'

ক্ষণকালের জন্য সোমভদ্রের মনে হইল, তাহার সন্তাপ শান্ত হইয়াছে, অঙ্গ জুড়াইয়া গিয়াছে, দেহমন ভরিয়া একটি পরিতৃপ্ত আনন্দ সুগন্ধি ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে শফরীর স্কন্ধ জড়াইয়া লইল।

শফরী মুখ তুলিল। দুই চক্ষে আনন্দ বিকীর্ণ করিয়া সোমভদ্রের অধরের কাছে অধর ধরিল। বলিল—'চুমু খাও।'

সোমভদ্রের মন আবার অশান্ত হইয়া উঠিল। শফরীকে বলিতে হইবে, মেরুকার কথা বলিতে হইবে। সে শফরীর অধরে অধর স্পর্শ করিয়া বলিল—'শফরি, তুমি ভাল আছ?'

শফরী বলিল—'উঃ, কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে!'

সোমভদ্র লঘু হাসিয়া বলিল—'যদি না ফিরে আসতাম? যদি যুদ্ধে মরে যেতাম!'

শফরীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে বুভুক্ষু চক্ষে কিছুক্ষণ সোমভদ্রের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'তাহলে—তাহলে—তাহলে আমিও মরে যেতাম।'

না, আর নয়, এ প্রসঙ্গ আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। সোমভদ্র নিজেকে শফরীর বাহুমুক্ত করিয়া বলিল—'না, তুমি মরে যেতে কেন? কিছুদিন হয়তো আমার জন্য দুঃখ করতে, তারপর অন্য কারুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হত। শফরী—'

তাহার কথা শেষ হইল না, শ্যেনভদ্র পিতার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়া বনবিড়ালের মতো তাহার পৃষ্ঠে লাফাইয়া পড়িল, হাঁচোড় পাঁচোড় করিয়া তাহার স্কন্ধে উঠিয়া বসিল। শ্যেনভদ্রের বয়স দশ বছর।

তিনজনে হাসিতে হাসিতে মাতাপিতার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সোমভদ্র নতজানু হইয়া মাতাপিতাকে অভিবাদন করিল। শফরীর চক্ষু সারাক্ষণ সোমভদ্রের মুখের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। সোমভদ্রের আচরণে কোথায় যেন বিকলতা রহিয়াছে, সে তাহাকে ভগিনী বলিয়া ডাকে নাই, শফরী বলিয়া ডাকিয়াছে। কেন?—

বাড়িতে অনাড়ম্বর উৎসবের হাওয়া। প্রাঙ্গণে বাঁধা শ্বেত গর্দভটি ঘন ঘন কর্ণ আন্দোলিত করিয়া কোমল চক্ষে চাহিয়া সোমভদ্রকে সম্ভাষণ জানাইয়াছে, গরু ছাগল ও মেষ নিজ নিজ ভাষায় সংবর্ধনা করিয়াছে। মা রন্ধনশালাতে গিয়াছেন, শফরী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। পিতা প্রীতিবিম্বিত মুখে প্রাঙ্গণ-বেদীর উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। কেবল শ্যেনভদ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গ ছাড়ে নাই, ছায়ার মতো তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে এবং নানা প্রশ্ন করিয়া তাহার মন আরও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সন্ধ্যার পর আহারের সময় সকলে সমবেত হইলে সোমভদ্র তাহার যুদ্ধযাত্রার অনেক বিচিত্র কাহিনী বলিল। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিল। তারপর মাতা ক্লান্ত সোমভদ্রকে শয়ন করিতে পাঠাইলেন। শ্যেনভদ্র শফরীর কোলে মাথা রাখিয়া নিদ্রালু হইয়াছিল, সে তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল পিতামাতা ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়া বিবাহের আলোচনা করিতেছেন। সোমভদ্র ও শফরী বড় হইয়াছে : সোমভদ্র যুদ্ধে কীর্তি অর্জন করিয়া ফিরিয়াছে, এখন আর বিলম্ব করিয়া লাভ নাই, যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন। কালই পিতা মন্দিরে গিয়া পুরোহিতের সহিত দিনক্ষণ স্থির করিয়া আসিবেন।

শফরী দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিল। তাঁহাদের স্বর ক্রমশ গাঢ় ও স্মৃতিমধুর হইয়া আসিল ; তখন শফরী শয়ন করিতে গেল। নিজের শয়নকক্ষে যাইবার আগে

একবার সোমভদ্রের কক্ষে উঁকি মারিল।

ঘরের কোণে প্রদীপের নিষ্কম্প শিখা মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে। সোমভদ্র শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার একটি বাহু চোখের উপর ন্যস্ত ; নিশ্চয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শফরী চাহিয়া চাহিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল। তাহার হৃদয়ে একটি প্রশ্ন বারংবার কাঁটার মতো ফুটিতে লাগিল। কেন ? কেন সোমভদ্র তাহাকে ভগিনী বলিয়া ডাকিল না ? তবে কি সে আর তাহাকে ভালবাসে না। তবে কি ?—

শফরী নিজ কক্ষে গিয়া শয়ন করিল, কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। গৃহ নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে, বাহিরে নদীতীরে ক্বচিৎ হংস বা সারসের উচ্চকিত ধ্বনি শুনা যাইতেছে। নগর সুপ্ত, গৃহ সুপ্ত ; কেবল শফরী জাগিয়া আছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে শফরী উঠিল। অন্ধকারে ধীরে ধীরে সোমভদ্রের কক্ষের দিকে চলিল। ঘরের কোণে দীপশিখাটি ক্ষুদ্র হইয়া আসিয়াছে, সোমভদ্র পূর্ব্ববৎ চক্ষের উপর বাহু রাখিয়া শুইয়া আছে। শফরী নিঃশব্দে তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকে দুরন্ত ব্যাকুলতা আলোড়িত হইয়া উঠিল। আমার প্রিয়তম ! আমার ভাই ! এক রক্ত, এক দেহ ; আমরা পরস্পরের হয়ে জন্মেছি, পরস্পরের জন্যে বড় হয়েছি, আমাদের মাঝখানে ব্যবধান নেই। আমরা কি কখনো আলাদা হতে পারি !

শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া শফরী সোমভদ্রের বুকের মাঝখানে অতি সন্তর্পণে চুম্বন করিল।

সোমভদ্র তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে শয্যায় পড়িয়া ছিল, চমকিয়া জাগিয়া উঠিল।

আজ গৃহে ফিরিবার পর হইতে সে সকলের কাছে মেরুকার কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই ; মেরুকার নাম কণ্ঠ পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। মনে হইয়াছে, মেরুকার নাম উচ্চারণ করিলেই গৃহের এই শান্ত আনন্দময় পরিমণ্ডল চূর্ণ হইয়া যাইবে। সতেরো বছর পূর্বে শফরী যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেইদিন হইতে স্থির হইয়া আছে তাহারা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী। দু'জনে একসঙ্গে বড় হইয়াছে, কেহ অন্য কথা ভাবিতেও পারে নাই। তারপর যুদ্ধযাত্রা। কোথা হইতে বন্দিনী মেরুকা আসিয়া তাহার হৃদয় হরণ করিয়া লইল। সোমভদ্র প্রাণমন দিয়া মেরুকাকে ভালবাসিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। কিন্তু গৃহে ফিরিবার পর পিতামাতার মুখের পানে চাহিয়া, শফরীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মনে অপরাধের গ্লানি আসিয়াছে, মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিতে পারে নাই। গৃহে ফিরিয়াই সকলের মনে আঘাত দিতে তাহার মন সরে নাই।

কিন্তু একথা বেশিক্ষণ লুকাইয়া রাখা চলিবে না। কাল প্রাতেই সে মেরুকাকে আনিতে যাইবে ; মেরুকাকে লইয়া গৃহে ফিরিবার পর কিছুই আর অজ্ঞাত থাকিবে না। পিতামাতা তখন কি করিবেন, শফরী কি করিবে কিছুই অনুমান করা যায় না। তার চেয়ে আগেই কথাটা জানাইয়া রাখা ভাল। পিতামাতা যদি অমত করেন তখন মেরুকাকে লইয়া সে অন্যত্র ঘর বাঁধিবে। তাহার অর্থের অভাব নাই ; সে যোদ্ধা, যুদ্ধে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে, অর্থও প্রচুর অর্জন করিবে—

তবু সে বলিতে পারে নাই। বিক্ষুব্ধ মন লইয়া সে শয়ন করিতে গিয়াছিল। তারপর তন্দ্রার ঘোরে সে পিতামাতা ও শফরীর সঙ্গে তর্ক করিয়াছে, স্বপ্নে মেরুকাকে ভগিনী বলিয়া চুম্বন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে—এইভাবে অর্ধেক রাত্রি কাটিয়াছে।

শফরীর চুম্বনে ঘুম ভাঙিয়া সে উঠিয়া বসিল। চোখের জড়িমা দূর হইলে দেখিল, মেরুকা নয়, শফরী। তাহার মন অপ্রত্যাশিতভাবে স্বস্থ ও নিরুদ্বেগ হইল। শফরী একাকিনী, তাহাকে সে সব কথা বলিতে পারিবে। শফরীর সহিত তাহার মনের একটি সংযোগ আছে, নাড়ির যোগ,

শফরী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারে। তাহাকে মেরুকার কথা বলিলে সে বুঝিবে।

সোমভদ্র শফরীর হাত ধরিয়া তাহাকে শয্যার পাশে বসাইল, চুপি চুপি বলিল—'শফরি, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

শফরী তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—'কি কথা?'

প্রায় আলিঙ্গনবদ্ধভাবে বসিয়া দু'জনের মধ্যে হ্রস্বকণ্ঠে কথা হইতে লাগিল। জোরে কথা বলিলে মা-বাবার ঘুম ভাঙিয়া যাইতে পারে।

সোমভদ্র বলিল—'আমি একটা মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি। কী সুন্দর মেয়ে, একবার দেখলে তুইও ভালবেসে ফেলবি।'

সোমভদ্রের বাহুবেষ্টনের মধ্যে শফরীর দেহ শক্ত হইয়া উঠিল—'কে সে?'

সোমভদ্র বলিল—'তার নাম মেরুকা, যাদের আমরা যুদ্ধে বন্দিনী করে এনেছি তাদেরই একজন। বন্দিনী হলেও উঁচু ঘরের মেয়ে। আমি তাকে বোন বলে ডেকেছি, তাকেই বিয়ে করব।'

শফরীর মেরুযষ্টি লৌহশঙ্কুর ন্যায় ঋজু হইয়া রহিল, সে ধীরে ধীরে বলিল—'তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু সে তো তোমার সত্যিকারের বোন নয়।'

সোমভদ্র বলিল—'নাই বা হল সত্যিকারের বোন। যার সঙ্গে ভালবাসা হয় সেই তো বোন। ভেবে দ্যাখ, যার সত্যিকার বোন নেই তার কী হয়? সে তো বাইরের মেয়েকে বিয়ে করে। আমিও তেমনি বাইরের মেয়েকে বিয়ে করব।'

শফরীর জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল—'কিন্তু ওর তো ঘর নেই। ওকে নিয়ে তুমি যাবে কোথায়?'

'অবশ্য স্ত্রীর ঘরেই স্বামীকে যেতে হয়। কিন্তু ওর যখন ঘর নেই তখন বাবাকে বলব এই বাড়িতেই আমাদের স্থান দিতে। তা যদি তিনি না দেন তখন আলাদা ঘর বাঁধব।'

'আর আমি? আমার কি হবে?' কথাগুলি শফরী অতিকষ্টে কণ্ঠ হইতে বাহির করিল।

সোমভদ্র তাহার কণ্ঠস্বরের মর্মান্তিক শুষ্কতা লক্ষ্য করিল না, সাগ্রহে বলিল—'তুইও আমার মতো বাইরে বিয়ে করবি। শাস্ত্রে বলেছে মাঝে মাঝে বাইরে বিয়ে করতে হয়, নইলে বংশের অধোগতি হয়। কিন্তু তুই যদি নিতান্তই বাইরের মানুষকে ঘরে না আনতে চাস—তাহলে শ্যেনভদ্র তো রয়েছে! দু'চার বছরের মধ্যে ও জোয়ান হয়ে উঠবে—'

শফরী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল—'আমি যদি বিয়ে না করি তাতেই বা ক্ষতি কি? তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই কর।—আচ্ছা, এবার ঘুমোও।'

সোমভদ্র তাহার হাত টানিয়া বলিল—'আমি ভোর না হতেই চলে যাব মেরুকাকে আনতে। মা-বাবাকে তুই কথাটা শুনিয়ে রাখিস।'

'আচ্ছা—' শফরী তাহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। সোমভদ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে আবার শয়ন করিল। এ ভালই হইল। পিতামাতাকে নিজের মুখে কিছু বলিতে হইবে না।

শফরী নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেল, অনেকক্ষণ শয্যায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। মন বুদ্ধি অবশ হইয়া গিয়াছিল, আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল; তখন সে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

তাহার হৃদয় হিংসায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কোথাকার একটা ঘৃণ্য বিজাতীয়া বন্দিনী রূপের লোভ দেখাইয়া তাহার ভাইকে ভুলাইয়া লইবে। না না, আমি দিব না। আমার ধন দিব না, তার চেয়ে—

শয্যা হইতে উঠিয়া শফরী দেওয়ালের কুলঙ্গি হইতে একটি শল্য তুলিয়া লইল। পিত্তল

নির্মিত তীক্ষ্ণধার শল্য। শফরীর পিতা একজন অতি নিপুণ ধাতুশিল্পী, তিনি এই শল্যটি স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া কন্যাকে উপহার দিয়াছিলেন। শফরী শল্যটির সূক্ষ্ম অণি নিজের বুকের মাঝখানে ফুটাইয়া পরখ করিল, তারপর আবার শয্যায় আসিয়া বসিল।

সোমভদ্র নিজ শয্যায় ঘুমাইতেছে। তাহার মন ওই মায়াবিনী রাক্ষসীর রূপে নিমজ্জিত হইয়া আছে; হয়তো ঘুমাইয়া তাহাকে স্বপ্ন দেখিতেছে। কাল সকালেই সে রাক্ষসীকে আনিতে যাইবে। না না, তার পূর্বেই—। সোমভদ্রের বুকের মাঝখানে, যেখানে সে চুম্বন করিয়াছিল, ঠিক সেইখানে এই শল্য বসাইয়া দিবে; তারপর শল্য নিজের বুকে বিঁধিয়া দিয়া দু'জনে একসঙ্গে পরলোকে যাইবে। জন্মাবধি যে বন্ধন আরম্ভ হইয়াছিল, মৃত্যুর পরও তাহা ছিন্ন হইবে না। একই তরণীতে হাত ধরাধরি করিয়া তাহারা মৃত্যু-নদীর খরস্রোত পার হইবে।

শফরী দৃঢ়মুষ্টিতে শল্য ধরিয়া সোমভদ্রের শয্যাপাশে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার নিশ্চিন্ত নিদ্রিত মুখের পানে চাহিল। সহসা অদম্য রোদনের বেগ তাহার বক্ষ হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। অতি কষ্টে বাষ্পোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া সে ফিরিয়া গেল, নিজের শয্যায় পড়িয়া অশ্রুর উৎস মুক্ত করিয়া দিল। না, সোমভদ্রের বুকে সে শল্য বিঁধিতে পারিবে না।

শুইয়া শুইয়া অসহায়ভাবে সে মেরুকাকে গালি দিতে লাগিল— রাক্ষসী! পিশাচী! ডাকিনী!— পিশাচী! রাক্ষসী! ডাকিনী!

নদীতীর হইতে একটা সারসের কেংকার ভাসিয়া আসিল। শফরীর মনে হইল, সারস বলিল— ডাকিনী!

ডাকিনী! এতক্ষণ শফরীর স্মরণ ছিল না, নদীতীরে শর-কাণ্ডের কুটিরে এক ডাকিনী বাস করে। ডাকিনী তন্ত্রমন্ত্র জানে, মারণ বশীকরণ জানে। শফরী নদীতীরে তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছে, দু'-একবার কথাও বলিয়াছে, শীর্ণ কৃষ্ণকায়া বিকট-দশনা বৃদ্ধা, প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় বাস করে। কিন্তু রাত্রে তাহার কাছে লোক আসে, যাহারা মন্ত্রৌষধির বলে গোপন অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চায় তাহারা অন্ধকারে গা ঢাকিয়া চুপি চুপি ডাকিনীর কাছে আসে।

শফরী ক্ষণকাল নিশ্চল বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া নিঃশব্দে গৃহের বাহির হইল। তীক্ষ্ণ শল্যটি বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া লইল। সে ডাকিনীর কাছে যাইবে, ডাকিনীর মন্ত্রবলে শত্রু নিপাত করিবে।

গৃহ হইতে অল্প দূরে শরবনের মধ্যে ডাকিনীর কুটির; কুটিরের মাঝখানে মাটির উপর অঙ্গার-কুণ্ড। কিন্তু অঙ্গারের রক্তাভ আলোকে কুটিরের মধ্যে মানুষ দেখা যাইতেছে না।

শফরী শঙ্কিত বক্ষে দ্বারের বাহিরে কিয়দ্দূরে আসিয়া দাঁড়াইল; বেশি কাছে যাইতে ভয় করে। সে কম্পিত কণ্ঠে ডাকিল—'ডাকিনি।'

যেন মন্ত্রবলে ডাকিনী তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল; বিকট হাসিয়া বলিল— 'বিদেশিনী তোর ভাই-এর মন কেড়ে নিয়েছে, তাই এসেছিস?'

শফরী ভয় ভুলিয়া গেল, ডাকিনীর হাত ধরিয়া আবেগভরে বলিল—'হ্যাঁ ডাকিনি, তুই আমার ভাইকে ফিরিয়ে দে।'

ডাকিনীর আঙুলে দীর্ঘ নখ, সে নখযুক্ত আঙুল শফরীর মুখে বুলাইয়া বলিল—'ভাই ওমনি পাওয়া যায় না। কি দিবি?'

শফরী বলিল—'তুই যা বলবি তাই দেব।'

'বুকের রক্ত দিতে পারবি?'

'পারব।'

'তবে তাই দে।' বলিয়া ডাকিনী শফরীর বুকের সামনে নিজ করতল গণ্ডূষ করিয়া ধরিল।

শফরী শল্য বাহির করিয়া নিজের বুকে আঁচড় কাটিল, দরদর করিয়া রক্ত ডাকিনীর গণ্ডূষে পড়িতে লাগিল। গণ্ডূষ পূর্ণ হইলে ডাকিনী বলিল—'এতেই হবে। তুই দাঁড়া, আমি আসছি।'

সে কুটিরে প্রবেশ করিল। শফরী রক্তক্ষরিত বক্ষে বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, অঙ্গার-কুণ্ডের সম্মুখে নতজানু হইয়া ডাকিনী পূর্ণ করতল আগুনের উপর উপুড় করিয়া দিল। অগ্নি ক্ষণকাল স্তিমিত হইয়া রহিল, তারপর দপ্ করিয়া শিখা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ডাকিনী তখন মন্ত্র পড়িতে পড়িতে বামাবর্তে অগ্নি পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শফরী কম্প্রবক্ষে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

অগ্নিশিখা প্রশমিত হইলে ডাকিনী ধুনী হইতে এক টিপ ভস্ম লইয়া শফরীর কাছে ফিরিয়া আসিল, বলিল—'ভয় নেই, ভাইকে ফিরে পাবি। বিদেশিনী তোর ভাইকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

রুদ্ধশ্বাসে শফরী বলিল—'পারবে না?'

'না, আমার মন্তর মিথ্যে হয় না!—এই ভস্ম বুকের কাটায় লাগিয়ে দে, কাটা জুড়ে যাবে।'

ভস্ম লইয়া শফরী বুকে মাখিল; মনে হইল ভস্ম নয়, চন্দন। ডাকিনী তখন বলিল—'এবার আমায় কি দিবি বল।'

'তোমায় কী দেব?' ডাকিনীকে শফরীর অদেয় কিছুই ছিল না, কিন্তু সঙ্গে যে কিছুই নাই। সে অমূল্য শল্যটি ডাকিনীর হাতে দিয়া বলিল—'এই নাও। আমার বাবা আমার জন্যে নিজের হাতে গড়ে দিয়েছেন, সারা দেশে এর জোড়া নেই।'

'দে দে—' শল্য লইয়া ডাকিনী কুটিরে ফিরিয়া গেল। শফরী দেখিল, সে শল্যটি আগুনের কাছে ধরিয়া লোলুপ চক্ষে দেখিতেছে এবং শিশুর মতো খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

টলমল উদ্বেল হৃদয়ে শফরী গৃহে ফিরিয়া গেল। আশার উৎকণ্ঠায় সারা রাত্রি শয্যায় পড়িয়া জাগিয়া রহিল।

বন্দিনীদের অবরোধে মেরুকাও সারা রাত্রি ঘুমায় নাই। উষার উদয়ে সোমভদ্র আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় জাগিয়া আছে। গৃহহীনা বন্দিনী গৃহ পাইবে, স্বামী পাইবে, মেষ-ছাগের মতো দাসীহাটে বিক্রীত হইতে হইবে না। তাই আশার উৎকণ্ঠায় তাহার চোখে ঘুম নাই।

ঊর্ধ্বে নক্ষত্রগুলি ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিল, আকাশের অগ্নিকোণে যে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি সূর্যোদয়ের পূর্বে উদিত হইলে নদীতে জল বাড়ে, সেই নক্ষত্রটি দপদপ করিতে লাগিল। ক্রমে সে নক্ষত্রটিও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল; প্রত্যূষের ধূসর আলো অলক্ষিতে পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

সোমভদ্র কিন্তু আসিল না। মেরুকার ব্যাকুল চক্ষু নগর-দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে—ঐ বুঝি সে আসিতেছে। ঐ বুঝি সোমভদ্র!

কিন্তু না, যাহারা আসিতেছে তাহাদের মধ্যে সোমভদ্র নাই। অন্যান্য সেনাপতিরা আসিতেছেন, তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়া বাছাই করিয়া নির্ধারিত সংখ্যক বন্দী বন্দিনী লইয়া যাইবেন। সকলের সঙ্গে বহু সশস্ত্র রক্ষী।

সূর্যোদয় হইলে সেনাপতিরা বন্দিনীদের অবরোধে প্রবেশ করিলেন। আর আশা নাই। মেরুকার বুক ফাটিয়া নিশ্বাস বাহির হইল। যুদ্ধে বন্দিনী ক্রীতদাসীর ভাগ্য এত শীঘ্র সুপ্রসন্ন হইবে, ইহা সে কেমন করিয়া আশা করিয়াছিল? ছিন্নমূল লতায় কি ফুল ফোটে!

মেরুকা মনে মনে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা করিল। একজন মাংসলোলুপ সেনাপতি তাহাকে লইয়া যাইবেন। কিছুদিন পরে তাহার ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ হইলে তিনি তাহাকে দাসীহাটে বিক্রয় করিবেন। কোনও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি তাহার ক্লান্ত-যৌবন দেহটা ক্রয় করিবে।

আবার কিছুকাল পরে সেও তাহাকে কোনও দরিদ্র কৃষকের কাছে বিক্রয় করিবে। তারপর একদিন তাহার ভগ্ন জীর্ণ দেহটা নদীর গর্ভে সমাধি লাভ করিবে। ইহাই তাহার জীবনের সুনিশ্চিত পরিণাম।

অমোঘভল্ল নামক এক সেনাপতি মেরুকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বয়স অনুমান চল্লিশ, দৃঢ় গঠন, মাংসল দেহ, ললাটে গভীর অস্ত্রক্ষত চিহ্ন, চক্ষে কর্তৃত্বের অভিমান। আঠারো বছর হইতে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, জীবনে সারবস্তু কেবল দুইটি আছে : শত্রুর শোণিত এবং নারীর যৌবন। মেরুকার দেহ নিরাবরণ করিয়া তিনি ভোগপ্রবীণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন, চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ তুলিয়া চোখের উপর চোখ রাখিয়া সহজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'নাম কি ?'

তুষারশীতল কণ্ঠে মেরুকা নাম বলিল।

অমোঘভল্ল প্রশ্ন করিলেন—'হাসতে জানো ?'

অন্তরে বিদ্বেষের তুষানল জ্বালিয়া মেরুকা দশনপ্রান্ত উন্মোচিত করিয়া মুখে হাসির ভঙ্গিমা করিল।

সেনাপতি অমোঘভল্ল সন্তুষ্ট হইলেন। মেরুকার কণ্ঠস্বর মিষ্ট, দন্তপংক্তি সুন্দর। তিনি দুইজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—'একে আমার প্রমোদ-বাটিকায় নিয়ে যাও।'

মেরুকা একবার চোখ তুলিয়া মহানায়ক অমোঘভল্লের পানে চাহিল, তারপর নিঃশব্দে দুই ভৃত্যের মধ্যবর্তিনী হইয়া দাঁড়াইল। ভৃত্যেরা তাহার দেহে একখণ্ড লঘু উত্তরীয় জড়াইয়া দিল।

সোমভদ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

শফরীর সহিত কথা বলিবার পর তাহার মন নিরুদ্বেগ হইয়াছিল, সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। একেবারে ঘুম ভাঙ্গিল যখন সূর্যোদয় হইতেছে। সে কিছুক্ষণ জড়বৎ বসিয়া রহিল, তারপর স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসিলে মুখে অব্যক্ত শব্দ করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

সেনাপতি অমোঘভল্লের ভৃত্যদ্বয় মেরুকাকে দোলায় তুলিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় সোমভদ্র সৈন্যব্যূহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

'মেরুকা !'

মেরুকা উচ্চকিত হইয়া দেখিল সোমভদ্র ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। তাহার অন্তরের সমস্ত হতাশা কঠিন-তিক্ত বিদ্বেষে পরিণত হইল, চক্ষু হিমশীতল উপলখণ্ডের ন্যায় নিষ্প্রাণ হইয়া গেল। সে সোমভদ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া দোলায় আরোহণের উপক্রম করিল।

সোমভদ্র ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—'মেরুকা ! তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

সেনাপতি অমোঘভল্লের ভৃত্যেরা সোমভদ্রকে চিনিত না, একজন রূঢ়হস্তে তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল—'সাবধান ! দূরে থাকো।'

সোমভদ্র ক্রোধ-দীপ্ত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া বলিল—'আমি সেনানায়ক সোমভদ্র। তোমরা কে ? একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?'

নাম শুনিয়া ভৃত্যেরা নরম হইল, বলিল—'আমরা মহানায়ক অমোঘভল্ল মহাশয়ের ভৃত্য। মহানায়ক এই বন্দিনীকে নির্বাচন করেছেন। তাই ওকে তাঁর প্রমোদ-বাটিকায় নিয়ে যাচ্ছি।'

মেরুকা তখন দোলায় উঠিয়া বসিয়াছে, দারুগঠিত মূর্তির ন্যায় দেহ কঠিন করিয়া বসিয়া আছে। সোমভদ্র একবার তাহার পানে চাহিল, একবার ভৃত্যদের পানে চাহিল। তারপর দৃঢ় আদেশের সুরে বলিল—'তোমরা দাঁড়াও, চলে যেও না। আমি মহানায়ক অমোঘভল্লের সঙ্গে

কথা বলতে যাচ্ছি।'

সোমভদ্র দ্রুত ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যদ্বয় ফাঁপরে পড়িয়া কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণা করিল, তারপর দোলা তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। তাহাদের কাছে প্রভুর আদেশই **গরিষ্ঠ।**

দোলার মধ্যে মেরুকা দারু-পুত্তলীর ন্যায় বসিয়া রহিল। নিয়তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নাই, তাহাতে নিয়তি আরও নিষ্ঠুর হইয়া ওঠে। হয়তো এই বৃষস্কন্ধ প্রবীণ যোদ্ধার অন্তরে দয়া-মায়া আছে, হয়তো সে চিরদিনের জন্য তাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইবে, হয়তো—হয়তো—

দূর্বাঘাসের মতো আশা মরিয়াও মরে না। বুদ্ধির দর্পণে অনিবার্য ভবিষ্যৎ দেখিয়াও মরিতে চায় না—

সোমভদ্র বন্দিনীদের আবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মহানায়ক অমোঘভল্ল একটি বন্দিনীর বস্ত্র মোচন করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেছেন। তিনি পাঁচটি বন্দিনী পাইবেন, এটি দ্বিতীয়। সোমভদ্রকে আসিতে দেখিয়া অমোঘভল্ল পরম সমাদরের সহিত তাহাকে সম্বোধন করিলেন—'দেখ তো সোমভদ্র, এই বন্দিনীটাকে বেশ শক্ত-সমর্থ মনে হচ্ছে। আমার বিহার-নৌকার দাঁড় টানতে পারবে ?'

সোমভদ্র একবার বন্দিনীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া নিরুৎসুক কণ্ঠে বলিল—'পারবে।' তারপর ব্যগ্রস্বরে কহিল—'মহানায়ক, আপনার সঙ্গে আমার আড়ালে একটা কথা আছে।'

মহানায়ক অমোঘভল্ল ঈষৎ বিস্ময়ে একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন—'কি কথা ?'

সোমভদ্র অধর লেহন করিয়া বলিল—'মহানায়ক, যে-বন্দিনীকে আপনার ভৃত্যেরা নিয়ে যাচ্ছে, সে—সে—'

অমোঘভল্ল বলিলেন—'যে বন্দিনীটার নাম মেরুকা তার কথা বলছ ?'

'হ্যাঁ মহানায়ক। মেরুকা—আমি—আমি তাকে নিতে চাই। তাকে—'

অমোঘভল্ল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, 'এখন আর হয় না বন্ধু। আমি তাকে হস্তগত করেছি। জানো তো, যে আগে আসে সে আগে পায়।'

সোমভদ্র বলিল, 'কিন্তু—আপনি আমাকে এই অনুগ্রহ করুন ভদ্র। আমি মেরুকাকে বিবাহ করতে চাই।'

অমোঘভল্লের হাস্যমুখ সহসা গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন—'বিবাহ ! তুমি একটা বিদেশিনী বন্দিনীকে বিবাহ করতে চাও !'

সোমভদ্র অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—'হ্যাঁ মহানায়ক, আমার হৃদয় মেরুকাকে চায়। আমি তাকে বিয়ে করে সংসার পাততে চাই।'

অমোঘভল্ল ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—'তোমার গৃহে ভগিনী নাই ?'

সোমভদ্র চক্ষু নত করিয়া বলিল—'আছে ভদ্র।'

'যুবতী ভগিনী ? বিবাহযোগ্যা ?'

'হ্যাঁ ভদ্র।'

অমোঘভল্ল তখন গভীর ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—'ধিক সোমভদ্র। গৃহে বিবাহযোগ্যা যুবতী ভগিনী থাকতে তুমি একটা অজ্ঞাতকুলশীলা অজ্ঞাতচরিত্রা বন্দিনীকে বিবাহ করতে চাও। ওরা তো দু'দিনের সম্ভোগের সামগ্রী, ওরা কি ভগিনীর পদ অধিকার করার যোগ্য ? তুমি সদ্বংশজাত, তুমি রাজ্যের একজন সেনানায়ক ; তুমি যদি এমন কুদৃষ্টান্ত স্থাপন কর, তাহলে সামান্য লোকে কী করবে ? জাতির সংস্কৃতি বিজাতীয় ভাবের বন্যায় ভেসে যাবে। তাছাড়া তুমিও সুখী হতে পারবে না। যার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ নেই, সে কি কখনও হৃদয়ের আত্মীয় হতে পারে ? সে কি

গৃহের গৃহিণী হতে পারে ?'

কিন্তু উপদেশ বাক্যে সোমভদ্রের রুচি নাই। সে ত্বরান্বিত কণ্ঠে বলিল—'মহানায়ক, অনুগ্রহ করুন, মেরুকাকে দান করুন।'

অমোঘভল্ল দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'কখনই না। তুমি উন্মত্ত, জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়েছ ; তোমাকে প্রশ্রয় দিলে তোমারই সর্বনাশ হবে। যাও, গৃহে ফিরে যাও, আপন ভগিনীকে বিবাহ কর।'

সোমভদ্র কিছুক্ষণ বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অন্তর বিদ্রোহ করিতে চাহিল ; কিন্তু সে যোদ্ধা, আদেশ লঙ্ঘনে অনভ্যস্ত। সে টলিতে টলিতে ফিরিয়া চলিল।

অমোঘভল্ল সদয়কণ্ঠে তাহাকে ডাকিলেন—'শোনো সোমভদ্র।'

সোমভদ্র আবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমোঘভল্ল সস্নেহে তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—'হতাশ হয়ো না। চুপি চুপি একটা কথা বলি শোনো। দু' মাস পরে হোক ছ'মাস পরে হোক মেরুকাকে আমি বিক্রি করব। তখন যদি তুমি ওকে চাও, তাহলে তোমার হাতেই ওকে বিক্রি করব, অন্য কাউকে দেব না। ইতিমধ্যে তুমি তোমার ভগিনীকে বিবাহ করে সংসারী হও। কেমন ?'

সোমভদ্র আর সেখানে দাঁড়াইল না।

অদূরে শক্ত-সমর্থ বন্দিনীটা এতক্ষণ নগ্নদেহে অপেক্ষা করিতেছিল, মহানায়ক অমোঘভল্ল হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে ফিরিয়া গেলেন।

ওদিকে শুষ্ক চক্ষু মেলিয়া শফরী শয্যায় পড়িয়া ছিল। সূর্যোদয় কালে সোমভদ্র যখন ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন সে দুঃস্বপ্নময় চিন্তার জাল সরাইয়া শয্যা হইতে উঠিল। ইতিমধ্যে পিতামাতাও জাগিয়াছেন। শফরী তাঁহাদের কাছে গিয়া সোমভদ্রের সঙ্কল্পের কথা জানাইল, তারপর সহসা মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাতাপিতা প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তারপর মাতা শফরীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সান্ত্বনা দিতে গিয়া নিজেই অসংবৃত হইয়া পড়িলেন। পিতার মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে দুশ্চিন্তা আসিয়া জুটিল। সোমভদ্র বয়ঃপ্রাপ্ত এবং স্বাধীন, তাহাকে শাসন করা যায় না....বিজাতীয়া নারীকে বিবাহ করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে...এরূপ বিবাহ কখনো সুখের হয় না ; মিশ্র রক্তের সন্তানসন্ততি কখনো ভাল হয় না, উন্মার্গগামী হয়...এদিকে শফরীর কি হইবে...শ্যেনভদ্র নিতান্ত বালক ; অগ্রজার সহিত অনুজের বিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও বাঞ্ছনীয় নয়...বাহিরের পাত্র ঘরে ডাকিয়া আনিতে হইবে ; ধাতুপ্রকৃতির বিষময়তায় সংসারের সুখশান্তি নষ্ট হইবে, খাল কাটিয়া কুমীর আনা এবং বাহিরের জামাতা ঘরে আনা একই কথা...সোমভদ্র এ কী করিল ! অন্ধমোহের বশে সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিল !

সকলের মনে বিষণ্ণ ব্যাকুলতা, সকলের দৃষ্টি বাহিরের দিকে। ঐ বুঝি বধূর হাত ধরিয়া সোমভদ্র আসিতেছে ! শফরী ভাবিতেছে, বধূকে দেখিয়া সে কী করিবে ? সংযম হারাইবে না তো ?

কিন্তু প্রভাত বহিয়া গেল, সোমভদ্র ফিরিল না। সকলের মন উৎকণ্ঠিত ; শফরীর মনে ক্ষীণ আশা ঝিকমিক করিতে লাগিল—তবে কি ডাকিনীর মন্ত্রতন্ত্র ফলিয়াছে। তবে কি— ?

দ্বিপ্রহরেও যখন সোমভদ্র ফিরিল না, তখন পিতা চিন্তিত মুখে তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। মাতা শঙ্কা-ভরা বুকে রন্ধনশালায় গেলেন। শফরী অঙ্গনে ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর হঠাৎ তাহার বুক সন্ত্রাসে চমকিয়া উঠিল। বাল্যকাল হইতে সোমভদ্রের অভ্যাস ছিল, যখনই কোনও কারণে তাহার মন খারাপ হইত, তখনই সে নদীর ধারে গিয়া বসিয়া

থাকিত। একবার শফরীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল—বড় শান্ত শীতল ওই নদীর জল। যেদিন এ পৃথিবী আর ভাল লাগবে না, সেদিন ওর তলায় গিয়ে শুয়ে থাকব।

আতঙ্ক-শরবিদ্ধ হৃদয় লইয়া শফরী হরিণীর মতো নদীতীরে ছুটিল।

জলের কিনারে একটি বালিয়াড়ির আড়ালে সোমভদ্র পাশ ফিরিয়া শয়ান রহিয়াছে, অলস হস্তে নুড়ি কুড়াইয়া একটি একটি করিয়া জলে ফেলিতেছে। শফরী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, সে দেখিতে পাইল না। অন্তরের অতল গুহায় ডুবিয়া আছে।

শফরী মৃদু গদ্‌গদ স্বরে ডাকিল—'ভাই!'

সোমভদ্রের নিরুৎসুক চক্ষু শফরীর দিকে ফিরিল। শফরীর বুকের মাঝখানে কাটা দাগের উপর দৃষ্টি পড়িল। সে বলিল—'কি করে কেটে গেল?'

শফরী ভঙ্গুর হাসিয়া বলিল—'কাটেনি। ঘুমের ঘোরে নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলেছি। চল, বাড়ি চল।'

সোমভদ্রের চোখে একটু সচেতনতা দেখা দিল, সে বলিল—'বাড়ি? কেন?'

'সারাদিন খাওনি। এস।' শফরী সোমভদ্রকে কোনও প্রশ্ন করিল না, শুধু হাত বাড়াইয়া দিল। সোমভদ্র হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আর কোনও কথা না বলিয়া শফরীর পাশে পাশে বাড়ির দিকে চলিল।

কয়েক মাস পরে একদিন অপরাহ্ণে শফরী অঙ্গনের দ্বারের কাছে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। প্রাতঃকালে সোমভদ্র কয়েকজন বন্ধুর সহিত নদীর পরপারে মৃগয়ায় গিয়াছে, এখনও ফিরিয়া আসে নাই।

দূরে সোমভদ্রকে আসিতে দেখা গেল। তাহার স্কন্ধে ধনু, পৃষ্ঠে মৃত হরিণ-শিশু, মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। শফরী হর্ষসূচক শব্দ করিয়া তীরের মতো তাহার দিকে ছুটিল। পিতামাতা অঙ্গনের বেদিকার উপর বসিয়া ছিলেন, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। সোমভদ্র আসিতেছে।

শফরীকে আসিতে দেখিয়া সোমভদ্র দাঁড়াইল; ধনু ও হরিণ মাটিতে নামাইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিল। শফরী নীড়প্রত্যাশী পাখির মতো তাহার বাহুবেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বহুদিন পরে সে সোমভদ্রের মুখে সেই পুরাতন অকুণ্ঠ হাসি দেখিয়াছে। এতদিন পরে বিদেশিনী কুহকিনীর মোহজাল ছিঁড়িয়া সোমভদ্র তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে।

শফরী মুখ তুলিয়া ক্ষুধিত চক্ষে সোমভদ্রের পানে চাহিল। সোমভদ্র তাহার অধরে চক্ষে ললাটে চুম্বন করিল। শফরী দ্রুত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল—'বলো ভগিনী—বলো বহিন—বলো বোন।'

সোমভদ্র বলিল—'ভগিনী—বহিন—বোন।'

অতঃপর মন শান্ত হইলে শফরী ধনু ও হরিণ তুলিয়া লইল। দু'জনে গৃহে প্রবেশ করিল।

সোমভদ্র পিতার সম্মুখে গিয়া সলজ্জ অনুযোগের স্বরে বলিল—'বাবা, আমাদের বিয়ে দেবে কবে?'

পিতা সচকিতে পুত্র ও কন্যার মুখের পানে চাহিলেন, তারপর কোমল গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—'এখনি পুরোহিতের কাছে যাচ্ছি।'

সোমভদ্র ও শফরী গৃহের অভ্যন্তরে চলিয়া গেল। পিতামাতা পরস্পরের পানে চাহিয়া হাসিলেন। মাতার চক্ষু আনন্দে বাষ্পাচ্ছন্ন হইল।

তাঁহারাও ভ্রাতা-ভগিনী।

এইবার কাহিনীর স্থান কাল বলা যাইতে পারে। ঘটনাস্থল প্রাচীন মিশর ; ঘটনাকাল আজ হইতে অনুমান পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। মিশরবাসীরা তখন চক্রযানের ব্যবহার জানিত না, লৌহ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, অশ্বের সহিত মনুষ্য জাতির পরিচয় ছিল না। যে মানুষগুলির কাহিনী লিখিলাম, তাহারা কিন্তু আমাদের মতোই মানুষ ছিল।

৮ শ্রাবণ ১৩৬৮



শঙ্খ-কঙ্কণ

প্রথম আবর্ত

এক

দিল্লী দখল করিবার পর মুসলমান সুলতানেরা দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই। বিন্ধ্য গিরিমালা এবং নর্মদা নদী যেন প্রাকার-পরিখা রচনা করিয়া তাঁহাদের নিরস্ত করিয়াছিল

প্রথম প্রাকার-পরিখা লঙ্ঘন করিলেন আলাউদ্দিন খিল্‌জি। তিনি পরে অন্নদাতা পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রণপাণ্ডিত্য ছিল, আর ছিল অনির্বাণ নারীতৃষ্ণা। এই দুই মিলিয়া তাঁহার চরিত্র পিশাচতুল্য করিয়া তুলিয়াছিল ভারতের অন্ধকার মধ্যযুগেও তাঁহার সমান বিশ্বাসঘাতক নৃশংস ইন্দ্রিয়পরায়ণ সুলতান বোধহয় বেশি ছিল না।

দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া আলাউদ্দিন বেশিদূর অগ্রসর হন নাই, দেবগিরির রাজ্য ছলনার দ্বারা জয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠনপূর্বক স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন ; তারপর পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে সুন্দরী যুবতীর অভাব ছিল না, তবু তিনি গুজরাতের রানী কমলাকে কাড়িয়া আনিয়া নিজের অঙ্কশায়িনী করিয়াছিলেন।

সুন্দরী নারী, রাজরানী হোক বা পথের ভিখারিনী হোক, আলাউদ্দিনের চোখে পড়িলে আর তার নিস্তার নাই। তিনি একবার চিতোরের পদ্মিনীর দিকেও হাত বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সেই জ্বলন্ত অনলশিখাকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। নারী-বিজয়-ক্ষেত্রে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিনের ইহাই একমাত্র ব্যর্থতা।

কিন্তু দিল্লী বহুত দূর। দিল্লী হইতে দুই শত ক্রোশ দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরির ক্রোড়ে সাতপুরা শৈলমালার জটিল আবর্তের মধ্যে এই কাহিনীর সূত্রপাত।

দুই

সাতপুরা শৈলমালার জটিল আবর্তের মধ্যে এই সময় সাতটি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। হয়তো সাতপুরা পর্বতের নাম এই সাতটি রাজ্য হইতে আসিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ; কবে তাহাদের জন্ম হইয়াছিল এবং কবে তাহারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ইতিহাস তাহা লক্ষ্য করে নাই।

কিন্তু সুলতান আলাউদ্দিনের কালে তাহারা জীবিত ছিল এবং পরস্পরের সহিত কলহ না করিয়া পরম শান্তিতে বাস করিতেছিল। রাজ্যগুলির মাঝখানে পর্বতের ব্যবধান থাকায় লড়াই ঝগড়ার উপলক্ষ ছিল না।

একদিন ভাদ্রমাসের দ্বিপ্রহরে এক পথভ্রান্ত পথিক এই জটিলকুটিল গিরিসঙ্কটের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আকাশে মেঘ নাই। এখানে অল্পই বৃষ্টি হয়, যেটুকু হয় পাহাড় তাহা গায়ে মাখে না; বৃষ্টির জল সহস্র প্রণালীপথে নামিয়া উপত্যকাগুলিতে সঞ্চিত হয়। এই উপত্যকাগুলিতে মানুষের বাস।

পথিক এক গুহায় রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে লোকালয়ের সন্ধানে বাহির হইয়াছে, কিন্তু এখনও লোকালয় খুঁজিয়া পায় নাই। সে এ অঞ্চলের মানুষ নয়, দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়াছে। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্যতাপ চারিদিকের উলঙ্গ পর্বতে প্রতিফলিত হইয়া বহ্নিকলাপের মতো জ্বলিতেছে। কিন্তু সেদিকে পথিকের ভ্রূক্ষেপ নাই।

পথিকের বয়স অনুমান বাইশ-তেইশ বছর। সুঠাম বেত্রবৎ দেহ, দেহের বর্ণও বেত্রবৎ। মুখের গঠন খড়্গের ন্যায় শাণিত, কিন্তু মুখের ভাব শান্ত ও সহিষ্ণু। চোখের দৃষ্টি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সুদূরপ্রসারী, কিন্তু তাহাতে শ্যেনপক্ষীর হিংস্রতা নাই। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে; ঠোঁটের উপর অল্প গোঁফ। পরিধানে একখণ্ড বস্ত্র কটি হইতে জঙ্ঘা পর্যন্ত আবৃত করিয়াছে, দ্বিতীয় একখণ্ড বস্ত্র উত্তরীয়ের আকারে স্কন্ধের উপর ন্যস্ত। হাতে ধনু এবং তিনটি বাণ।

পথিক দুইটি শৈলের মধ্যবর্তী লম্বা খাঁজের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল; কোথাও জনবসতির চিহ্ন নাই, যেদিকে সে চলিয়াছে সেদিকে কোথাও নির্গমনের পথ আছে কি না তাহাও দেখা যায় না। সে তখন আকাশের দিকে চোখ তুলিল।

আকাশ শূন্য, কেবল বহু ঊর্ধ্বে বায়ু-কোণে এক জোড়া নিরালম্ব গুম্ফ উড়িতেছে। চিল কিংবা শকুন; পথিক অনুমান করিল, ঐদিকে চিল যেখানে উড়িতেছে তাহার নিম্নে লোকালয় থাকিতে পারে। সে অগ্রসর হইয়া চলিল।

ক্রোশেক পথ চলিবার পর হঠাৎ পাশের দিকে পাহাড়ের গায়ে একটি সংকীর্ণ ফাটল মিলিল। উপলবিকীর্ণ নিম্নাভিমুখী রন্ধ্র, এই পথে জল বাহির হইয়া নিম্নতর স্তরে গিয়াছে। দেখা যাক। পথিক রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ করিল।

আঁকাবাঁকা রন্ধ্রপথে কিছু দূর চলিবার পর এক ঝলক হরিদাভা পথিকের চোখের উপর দিয়া খেলিয়া গেল। তারপর সে রন্ধ্রমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে ঈষৎ নিম্নভূমিতে ক্ষুদ্র একটি উপত্যকা; তাহার মাঝখানে শষ্পশয্যার উপর দর্পণের মতো জল সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করিতেছে। এই তড়াগের চারিপাশে কয়েকটি তালবৃক্ষ শীর্ণ প্রহরীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে; কিছু ঝোপঝাড়ও আছে। মানুষ দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু অদূরে কয়েকটি ভগ্নপ্রায় শিলাকুটির দৃষ্টিগোচর হয়।

পথিক দ্রুত জলের কিনারায় গেল, নতজানু হইয়া গণ্ডূষ ভরিয়া জল পান করিল। জলপানে শরীর স্নিগ্ধ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এবার কিছু খাদ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তাহার সঙ্গে যে সামান্য খাদ্য ছিল তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রামবাসীরা অতিথিবৎসল হইয়া থাকে, খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

সে এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া পাড়ের উপর নিকটতম শৈল-কুটিরের দিকে পা বাড়াইল। কুটিরের তালপাতার ছাউনি অদৃশ্য হইয়াছে, কেবল দেওয়ালগুলা দাঁড়াইয়া আছে। তবু ভিতরে নিশ্চয় মানুষ পাওয়া যাইবে।

দুই পা অগ্রসর হইয়া পথিক সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল; দেখিল, একটি ঝোপের অভ্যন্তর হইতে

জনৈক শীর্ণকায় ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইতেছে। চোখাচোখি হইতেই লোকটি বলিয়া উঠিল—'ওহে, তোমার কাছে খাদ্যদ্রব্য কিছু আছে ?'

পথিক নিকটে গেল, শীর্ণকায় লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। পথিক দেখিল, লোকটির বয়স অনুমান পঞ্চাশ, বেশভূষা ভদ্র, পায়ে পাদুকা, মাথায় উষ্ণীষ। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল 'আমার সঙ্গে তো খাদ্যদ্রব্য নেই, কেবল তীরধনুক আছে।'

'তীরধনুক তো খাওয়া যাবে না। হা হতোস্মি! এখন উপায় ?' বলিয়া শীর্ণ ব্যক্তি বুক চাপড়াইল। তাহার ভাবভঙ্গি ও বাচনশৈলীতে হতাশার সহিত ঈষৎ হাস্যরস মিশ্রিত আছে।

ধনুর্ধর যুবক একটু কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল—'আপনি কে ?'

প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন—'আমার নাম ভট্ট নাগেশ্বর, আমি পঞ্চমপুরের রাজা শ্রীমৎ ভূপ সিংহের বয়স্য। রাজা আমাকে গোপনীয় দূতকার্যে সপ্তমপুরে পাঠিয়েছিলেন, একাই গিয়েছিলাম। সপ্তমপুরে কাজ সেরে ফেরার পথে এখানে দুপুর হয়ে গেল; ভাবলাম, মধ্যাহ্নভোজনটা এখানে সেরে নিয়ে ঝোপঝাড়ের ছায়ায় একটু বিশ্রাম করে বেলা তৃতীয় প্রহরে আবার যাত্রা করব; তাহলে সন্ধ্যার আগেই গৃহে ফিরতে পারব। জলের ধারে গিয়ে খাবারের পুঁটুলি খুলে বসেছি, মাত্র এক গ্রাস মুখে দিয়েছি, এমন সময়—হা হতোস্মি! কোথাকার এক ম্লেচ্ছপুত্র চিল ছোঁ মেরে খাবারের পুঁটুলি নিয়ে উড়ে গেল। সেই থেকে ঝোপের ছায়ায় বসে আছি, ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে।'

যুবক বলিল—'কিন্তু গ্রামে লোক আছে, তাদের কাছে খাদ্য সংগ্রহ করা কি সম্ভব নয় ?'

ভট্ট নাগেশ্বর চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—'গ্রাম! গ্রাম কোথায় ? হা হতোস্মি, বহু বৎসর আগে গ্রাম ছিল বটে, কিন্তু ম্লেচ্ছপুত্র আলাউদ্দিন সব শেষ করে দিয়ে গিয়েছে। এখানে আর মানুষের বাস নেই।'

আলাউদ্দিনের নাম শুনিয়া যুবক একটু চকিত হইল। নামটা তাহার অপরিচিত নয়। সে বলিল—'ম্লেচ্ছপুত্র আলাউদ্দিন!'

নাগেশ্বর বলিলেন—'নাম শোনোনি ? দিল্লীর ম্লেচ্ছ রাজা। সতেরো বছর আগে সে এই পথে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেছিল, তার সেনা-বাহিনীর পথে যেসব নগর জনপদ পড়েছিল সব শূন্য হয়ে গিয়েছে। পঞ্চমপুরেও এই মহাপিশুন পদার্পণ করেছিল—। কিন্তু যাক, শূন্য উদরে ম্লেচ্ছ-প্রসঙ্গ ভাল লাগে না। এস, ঝোপের ছায়ায় বসা যাক।'

যুবক বলিল—'কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের কী হবে ?'

নাগেশ্বর বলিলেন—'কি আর হবে। আপাতত পেটে মুষ্ট্যাঘাত করে ক্ষুধা নিবারণ করা ছাড়া গতি নেই।—এখন তোমার পরিচয় দাও। কে তুমি, কোথায় যাচ্ছ ?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়া যুবক ঊর্ধ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। একটি তালগাছের শীর্ষে কিছুক্ষণ চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল—'তাল পেকেছে মনে হচ্ছে।'

নাগেশ্বর বলিলেন—'তা পেকেছে, আমি দেখেছি। কিন্তু তাল পাকলে আমার কী ? আমি তালগাছে চড়তে জানি না, তালগাছও আমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে ফল বিসর্জন দেবে না। আমি সবগুলা তালগাছের গোড়া খুঁজে দেখেছি, একটিও তাল নেই।'

যুবক তালগাছের নিকটে গিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিল—'তালগাছের ডগা ষাট হাতের বেশি হবে না। তাল পাড়া যেতে পারে।'

নাগেশ্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—'পাড়া যেতে পারে! বল কি! তুমি তালগাছে উঠতে পারো নাকি ?'

যুবক বলিল—'না, তীরধনুক দিয়ে তাল পাড়ব।'

যুবক একটি তীর বাছিয়া লইয়া বাকি দুইটি তীর মাটিতে রাখিল, ধনুকে শরযোজনা করিয়া সাবধানে লক্ষ্য স্থির করিল, আকর্ণ ধনুর্গুণ টানিয়া ঊর্ধ্বদিকে তীর ছাড়িয়া দিল। টঙ্কার শব্দে তীর ছুটিয়া গেল, মুহূর্তমধ্যে তীরবিদ্ধ পাকা তাল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িল।

নাগেশ্বর ছুটিয়া গিয়া বৃহৎ তালটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন. উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন –'চমৎকার! তুমি দেখছি অর্জুনের চেয়ে বড় ধনুর্ধর। অর্জুন মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করে পেয়েছিলেন এক নারী, আর তুমি আকাশ থেকে আহরণ করে এনেছ সুপক্ক তালফল। ক্ষুধার সময় নারীর চেয়ে তালফল অনেক বেশি মুখরোচক।—এস এস, আর দেরি নয়, বসে যাওয়া যাক।'

দুইজনে এক গুল্মের ছায়াতলে গিয়া বসিলেন। তাল হইতে শর বাহির করিয়া তালটি ভাগাভাগি করা হইল। উভয়ে আহার আরম্ভ করিলেন।

পেট কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইলে নাগেশ্বর বলিলেন—'তোমার পরিচয় তো বললে না!'

যুবক বলিল—'আমার নাম ময়ূর।'

'ময়ূর! ময়ূর সিংহ, না ময়ূর বর্মা, না ময়ূর ভট্ট?'

'শুধু ময়ূর।'

'তা ভাল। ময়ূর যখন, তখন নামের পিছনে পুচ্ছের কী প্রয়োজন।—তোমার দেশ কোথায়?'

'তাপ্তি নদীর দক্ষিণে।'

'কোথায় চলেছ?'

'শুনেছিলাম ওদিকে সাতটি রাজ্য আছে। তাই এসেছিলাম যদি কাজ পাই।'

'ভাল ভাল। বৎস ময়ূর, তুমি ঠিকই শুনেছ, এই পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সাতটি রাজ্য আছে; প্রথমপুর থেকে আরম্ভ করে সপ্তমপুর পর্যন্ত। কিন্তু এই গোলকধাঁধার মধ্যে তুমি খুঁজে পাবে না। খোঁজাখুঁজির প্রয়োজনও নেই। তুমি আমার সঙ্গে চল, কাজ পাবে! তুমি যে-রকম অব্যর্থ তীরন্দাজ, মহারাজ নিশ্চয়ই তোমাকে অনুগ্রহ করবেন।'

ময়ূর শান্তস্বরে বলিল—'ভাল।'

তালফল যখন শেষ হইল তখন দেখা গেল দুইটি ক্ষুধিত মানুষের পেট ভরিয়াছে। তাঁহারা জলাশয়ে গিয়া হাত-মুখ ধুইলেন। ইতিমধ্যে সূর্য অনেকখানি পশ্চিমে ঢলিয়াছে, রৌদ্রের তেজ কমিয়াছে। ভট্ট নাগেশ্বর ময়ূরকে লইয়া পঞ্চমপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি গোলকধাঁধার পথ চেনেন, কুটিল গিরি-বর্ত্ম ধরিয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন।

ভট্ট নাগেশ্বর অতি সহৃদয় ব্যক্তি; কিন্তু তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপরন্তু রাজবয়স্য; তাই বাক্-বাহুল্যের দিকে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। সুবিধা পাইলেই তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিতেন, একটি শ্রোতা থাকিলেই হইল।

চলিতে চলিতে তিনি হা হতোস্মি করিয়া আরম্ভ করিলেন—'সপ্তপুরের আর বেশিদিন নয়। রক্তপিপাসু ম্লেচ্ছ জাতি দাক্ষিণাত্যের স্বাদ পেয়েছে, তারা আবার এই পথে আসবে। তখন সপ্তপুর ধুলো হয়ে উড়ে যাবে। এতদিন তারা আসেনি কেন এই আশ্চর্য। প্রথমবার ম্লেচ্ছ এসেছিল ঘূর্ণিবাত্যার মতো; এবার আসবে মহাপ্লাবনের মতো, সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'

ময়ূর জিজ্ঞাসা করিল—'প্রথমবার কী হয়েছিল?'

ভট্ট নাগেশ্বর তখন মহা উৎসাহে গল্প বলিতে লাগিলেন—

সপ্তদশ বৎসর আগে নর্মদা ও তাপ্তি নদীর মধ্যবর্তী এই ভূখণ্ডে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল। সাতটি রাজ্যের সাত রাজা পরম সুখে প্রজাদের শাসন-পালন করেন, তাঁহাদের

পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই, বরং কুটুম্বিতা আছে। বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক নামমাত্র ; জিগীষু রাজারা এই শুষ্ক দেশের দিকে লুব্ধ কটাক্ষপাত করেন না। সাতটি রাজ্যের নামকরণেও অভিমানের চিহ্ন নাই ; প্রথমপুর, দ্বিতীয়পুর ইত্যাদি নামেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। যেন সাতটি কপোত-মিথুন পর্বতের খোপেখোপে সাতটি নিভৃত নীড় রচনা করিয়াছে।

হঠাৎ একদিন ঈশান কোণে মেঘ দেখা দিল। ম্লেচ্ছ সেনাপতি আলাউদ্দিন দক্ষিণবিজয়ে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে বহু সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য। আলাউদ্দিন সসৈন্যে বিন্ধ্যগিরি উত্তীর্ণ হইলেন, নর্মদার উত্তাল তরঙ্গমালা তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। তিনি দাক্ষিণাত্যের দ্বারমুখে উপস্থিত হইলেন।

আলাউদ্দিনের যাত্রাপথ পূর্ব হইতে নির্ণীত ছিল ; তিনি পঞ্চমপুরের উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া শিবির ফেলিলেন। এখানে কিছুদিন সৈন্যদলকে বিশ্রাম দিয়া আবার অগ্রসর হইলেন।

পঞ্চমপুর আলাউদ্দিনের যাত্রাপথে পড়িয়াছিল, ইহা পঞ্চমপুরের দুর্ভাগ্য। অন্য ছয়টি রাজ্য বাঁচিয়া গিয়াছিল। আলাউদ্দিনকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি পঞ্চমপুরের রাজা ভূপ সিংহের ছিল না ; এমনকি সাত জন রাজা একজোট হইলেও আলাউদ্দিনের কোনও ক্ষতি করিতে পারিতেন না। তাই ভূপ সিংহ নতমস্তকে আলাউদ্দিনের দুরভিযান সহ্য করিলেন।

পঞ্চমপুর রাজ্য একটি বিস্তীর্ণ উপত্যকায় অবস্থিত ; উপত্যকার মাঝখান দিয়া ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র রাজধানী, ক্ষুদ্র রাজপুরী, আশেপাশে গ্রাম জনপদ শস্যক্ষেত্র। আলাউদ্দিন পঞ্চমপুর জয় করিতে আসেন নাই, ইহা তাঁহার পথি-পার্শ্বস্থ পান্থশালা মাত্র। ভূপ সিংহ নিরুপায়ভাবে দিন গণিতে লাগিলেন, কতদিনে আপদ দূর হইবে।

ম্লেচ্ছ সৈন্যদল অবাধে গৃহলুণ্ঠন করিল, নারীধর্ষণ করিল, অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিল। এদেশের লোক পূর্বে কোনও ম্লেচ্ছ দেখে নাই, তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। মানুষ যে এমন হইতে পারে তাহা তাহাদের ধারণার অতীত।

তারপর একদিন আলাউদ্দিনের শিবিরে ভূপ সিংহের তলব হইল। না যাইলে গলায় দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে ; ভূপ সিংহ ম্লেচ্ছের দরবারে গেলেন। আলাউদ্দিন বলিলেন, তিনি জানিতে পারিয়াছেন রাজার একটি সুন্দরী কন্যা আছে, সেই কন্যাকে সেনাপতির কাছে সওগাত পাঠাইতে হইবে।

বক্ষে তুষানল জ্বালিয়া রাজা ফিরিয়া আসিলেন। রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা এক চাতুরী অবলম্বন করিলেন ; রাজপুরীতে সীমন্তিনী নামে এক নবযৌবনা রূপসী দাসী ছিল, তাহাকে রাজকন্যা সাজাইয়া দোলায় তুলিয়া শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। আসল রাজকন্যাকে পুরীর এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে লুকাইয়া রাখা হইল।

কিন্তু আলাউদ্দিনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা সহজ নয়। সপ্তাহকাল পরে তিনি দাসী সীমন্তিনীকে ফেরত দিলেন এবং রাজপুরী তল্লাস করিয়া রাজকন্যাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। রাজকন্যার নাম ছিল শিলাবতী।

অতঃপর যবন সৈন্য বিশ্রাম শেষ করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেল। শিলাবতীকে আলাউদ্দিন সঙ্গে লইয়া গেলেন। তিনি আর এ পথে আসেন নাই, অন্য পথে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন ; পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া সুলতান হইয়াছিলেন। শিলাবতীর কি হইল কেহ জানে না। হয়তো তিনি বিষপান করিয়াছিলেন, হয়তো বা দিল্লীর হারেমে আলাউদ্দিনের অসংখ্য উপপত্নীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া এখনও বাঁচিয়া আছেন।

সে-সময় ভূপ সিংহের পরিবারে ছিলেন তাঁহার রানী উষাবতী, ষোড়শী কন্যা শিলাবতী, দ্বাদশ বর্ষীয় বালকপুত্র রামরুদ্র এবং সদ্যোজাত কন্যা সোমশুক্লা। আলাউদ্দিন যখন শিলাবতীকে হরণ

করিয়া লইয়া যান তখন রানী উষাবতী সূতিকাগৃহে ছিলেন। তিনি এই দারুণ আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না, প্রসূতিগৃহেই তাঁহার মৃত্যু হইল। দাসী সীমন্তিনী শিশু সোমশুক্লাকে নিজের বুকে তুলিয়া লইল।

সীমন্তিনীর গর্ভাধান হইয়াছিল ; যথাকালে সে একটি কন্যা প্রসব করিল। সে নুন খাওয়াইয়া কন্যাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ভূপ সিংহ নিষেধ করিলেন—'না, আলাউদ্দিনের কন্যাকে বাঁচিয়ে রাখো, হয়তো পরে প্রয়োজন হবে।'

আলাউদ্দিনের কন্যা বাঁচিয়া রহিল, মাতার বিষদৃষ্টির সম্মুখে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তার নাম হইল—চঞ্চরী।

ভূপ সিংহের বুকে যে শেল বিঁধিয়াছিল তাহা বিঁধিয়া রহিল। তিনি উদার ও মহৎ চরিত্রের পুরুষ ছিলেন, এখন তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্তি ধারণ করিল। অপমান ও লাঞ্ছনায় জর্জরিত হৃদয়ে তিনি কেবল প্রতিহিংসা সাধনের জন্য জীবিত রহিলেন। কিন্তু দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা সাধন সামান্য ভূস্বামীর পক্ষে সহজ নয়। দিন কাটিতে লাগিল।

আট বৎসর পরে ভূপ সিংহ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—'রামরুদ্র, তোমার বয়স বিশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। কলঙ্কমোচনের সময় উপস্থিত।'

রামরুদ্র বলিলেন—'আমি প্রস্তুত আছি।'

ভূপ সিংহ পুত্রের হস্তে ছুরিকা দিয়া বলিলেন—'দিল্লী যাও, এই ছুরি দিয়ে নর-পিশাচকে গুপ্তহত্যা কর।'

পরদিন রামরুদ্র পাঁচজন সঙ্গী লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। দীর্ঘ পথ ; ভূপ সিংহের দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরম্ভ হইল।

এক বৎসর পরে দুইজন সঙ্গী ফিরিয়া আসিল। জল্লাদের হাতে রামরুদ্রের মৃত্যু হইয়াছে। একদিন আলাউদ্দিন রক্ষীপরিবৃত হইয়া অশ্বারোহণে দিল্লীর রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, রামরুদ্র ছুরিকা-হস্তে তাঁহার দিকে ধাবিত হন ; কিন্তু আলাউদ্দিনের কাছে পৌঁছিবার পূর্বেই ধরা পড়েন। তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ হয়।—

এইবার ভূপ সিংহের চরিত্রে এক বিচিত্র পরিবর্তন দেখা দিল। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া তিনি শোক করিলেন না। তাঁহার প্রকৃতি যেন দ্বিধাভিন্ন হইয়া গেল ; একদিকে শুষ্ক কঠিন কুটিলতা, অন্য দিকে নির্বিকার ঔদাসীন্য। রানী উষাবতীর মৃত্যুর পর তিনি দারান্তর গ্রহণ করেন নাই, এখনও করিলেন না ; কিন্তু কন্যা সোমশুক্লাকে তিনি জন্মাবধি অবহেলা করিয়াছিলেন, এখন তাহার প্রতি নির্লিপ্তভাবে ঈষৎ স্নেহশীল হইলেন। সপ্তপুরীর বাকি ছয়জন রাজার সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়াছিল, এখন তিনি দূত পাঠাইয়া পূর্বতন প্রীতির সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন করিলেন। মন্ত্রীর সহিত বসিয়া কখনও মন্ত্রণা করেন, কখনও বা বয়স্যদের সঙ্গে চতুরঙ্গ খেলেন। সপ্তমপুরের অধিপতি সূর্যবর্মা ভূপ সিংহের সমবয়স্ক মিত্র, তাঁহার সহিত দূর হইতে চতুরঙ্গের চাল চালেন। কখনও তিনি গম্ভীর কুটিল সন্দিগ্ধ, কখনও দায়িত্বহীন ক্রীড়াচটুল প্রগল্‌ভ। সকলে তাঁহার কাছে সশঙ্ক হইয়া থাকে, কখন তাঁহার কোন্ রূপ প্রকাশ পাইবে কেহই বলিতে পারে না।

এইভাবে আরও নয় বৎসর কাটিয়াছে। কুমারী সোমশুক্লা এখন সপ্তদশী যুবতী। প্রথমপুরের যুবরাজ হিরণ্যবর্মার সঙ্গে তাঁহার বিবাহের একটা প্রসঙ্গ উঠিয়াছে ; কিন্তু কোনও পক্ষেই ত্বরা নাই। হিরণ্যবর্মার দুইটি পত্নী বর্তমান, তাঁহারা পুরাতন না হওয়া পর্যন্ত যুবরাজ নূতন বিবাহ সম্বন্ধে নিরুৎসুক।

সীমন্তিনীর কন্যা চঞ্চরী এখন ষোড়শী। তাহার বুদ্ধি বেশি নাই, কিন্তু রূপের ছটায় চোখে

ধাঁধা লাগে। সে রাজপুরীতে কুমারী সোমশুক্লার কিঙ্করীর কাজ করে। তাহার মা তাহার পানে মুখ ফিরাইয়া চাহে না, কিন্তু ভূপ সিংহ আলাউদ্দিনের কন্যার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন নয়। কেবল, কদাচিৎ যখন চঞ্চরীর উপর রাজার দৃষ্টি পড়ে তখন তাঁহার চোখে একটা ক্রূর অভিসন্ধি খেলা করিয়া যায়। তিনি যেন প্রতীক্ষা করিয়া আছেন ; কিন্তু কিসের প্রতীক্ষা তাহা কেহ জানে না।—

ভট্ট নাগেশ্বরের মুখে রাজকাহিনী শুনিতে শুনিতে ময়ূর যেন আচ্ছন্নের মতো হইয়া পড়িয়াছিল, মনে হইয়াছিল সেও এই কাহিনীর সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। সুলতান আলাউদ্দিনের নামটাই সে জানিত, এখন একটা বিকৃত মনুষ্যমূর্তি চোখের সামনে দেখিতে পাইল। রাজা ভূপ সিংহের নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয় তাহার অন্তরে অঙ্গারের মতো জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার প্রকৃতি স্বভাবতই অন্তর্মুখী, বাহিরে তাহার মনের উষ্মা প্রকাশ পাইল না।

কাহিনী শেষ করিয়া ভট্ট নাগেশ্বরও নীরবে চলিলেন। আর কোনও কথা হইল না। সূর্যাস্তের সময় তাঁহারা রাজধানীতে উপনীত হইলেন। নাগেশ্বর বলিলেন—'আজ আর রাজার সঙ্গে দেখা হবে না। তুমি চল, রাত্রে আমার গৃহে থাকবে। কাল প্রাতঃকালে তোমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাব।'

তিন

ভট্ট নাগেশ্বরের গৃহ ক্ষুদ্র কিন্তু পাষাণনির্মিত। মাত্র দুইটি ঘর, তৈজসপত্র বেশি নাই। ব্রাহ্মণ অকৃতদার, গৃহ গৃহিণীহীন ; নিজেই গৃহকর্ম করেন, নিজেই রন্ধন করেন। তাঁহার গৃহদ্বার সর্বদাই খোলা থাকে ; দেশে চোর বেশি নাই, যাহারা আছে তাহারা নাগেশ্বরের শূন্য গৃহে চুরি করিতে আসে না।

হস্তমুখ প্রক্ষালনের পর নাগেশ্বর রন্ধনকার্যে লাগিয়া গেলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাক্যস্রোত আবার প্রবাহিত হইল। তিনি রাজ্য ও রাজপুরীর বহু কৌতুককর ঘটনা বিবৃত করিলেন। ময়ূর তাঁহার বিবৃতি হইতে অনেক কথা জানিতে পারিল।

নৈশাহার সমাধা হইলে নাগেশ্বর ঘরের কোণ হইতে গোল-করা শয্যা আনিয়া দুই ভাগ করিয়া মাটিতে পাতিলেন ; তারপর প্রদীপ নিভাইয়া শয়ন করিলেন। উভয়েই ক্লান্ত ছিলেন, অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রভাতে নাগেশ্বর ময়ূরকে লইয়া রাজভবনে উপনীত হইলেন। প্রতীহার ময়ূরের হাতে ধনুর্বাণ দেখিয়া ভ্রূ তুলিল, কিন্তু রাজবয়স্যের সঙ্গীকে বাধা দিল না, হাস্যমুখে পথ ছাড়িয়া দিল।

প্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে ভূপ সিংহ মসৃণ পাষাণকুট্টিমের উপর একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে পাষাণে ক্ষোদিত চতুরঙ্গ খেলার চতুষ্কোণ ছক পাতা রহিয়াছে। বলগুলির বিন্যাস দেখিয়া মনে হয় খেলা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু খেলার প্রতিপক্ষ উপস্থিত নাই।

ভট্ট নাগেশ্বর স্বস্তিবাচন করিলেন 'বয়স্যের জয় হোক। সপ্তমপুর থেকে একটি শুক্তি এনেছি, গ্রহণ করুন আর্য।' বলিয়া কটিবস্ত্র হইতে একটি শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র বস্তু বাহির করিলেন।

রাজা ভূপ সিংহ খেলার ছক হইতে অন্যমনস্ক চক্ষু তুলিলেন। শীর্ণ দীর্ঘ অগ্নিদগ্ধ আকৃতি, মুখমণ্ডল বলিরেখাঙ্কিত ; মাথার আস্কন্ধ কেশ পক্ব, ভ্রূ ও গুম্ফ পক্ব, কেবল চক্ষুতারকা ঘন কৃষ্ণবর্ণ। তিনি ময়ূরকে দেখিতে পাইলেন না, নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—'শুক্তি !'

'হাঁ মহারাজ। সপ্তমপুরে এক যাযাবর সমুদ্রবণিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার কাছ থেকে এই শুক্তি কিনেছি। দেখুন মহারাজ, কী অপূর্ব শুক্তি!' বলিয়া নাগেশ্বর করতলে শুক্তিটি লইয়া রাজার সম্মুখে ধরিলেন।

ভূপ সিংহ নির্লিপ্তভাবে শুক্তি তুলিয়া লইলেন, নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন—'একটি ক্ষুদ্র শঙ্খ। এর অপূর্বত্ব কোথায়?'

সত্যই শম্বুকের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি শঙ্খ। নাগেশ্বর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—'হা হতোস্মি, দেখছেন না মহারাজ, দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। মহাভাগ্যদাতা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ। এ শঙ্খ যার কাছে থাকে তার কখনো অমঙ্গল হয় না।'

ভূপ সিংহ কিয়ৎকাল শূন্যে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—'আমার একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ ছিল। একদিন রানীর হাত থেকে স্খলিত হয়ে মণিকুট্টিমে পড়ল, শত খণ্ডে চূর্ণ হয়ে গেল। আজ থেকে সতেরো বছর আগে।' তিনি ক্ষুদ্র শঙ্খটি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'হাঁ, দক্ষিণাবর্তই বটে। কিন্তু এ নিয়ে আমি কি করব বয়স্য? আমার আর সৌভাগ্যের কী প্রয়োজন।'

নাগেশ্বর কুণ্ঠিত মুখে নীরব রহিলেন। রাজা শঙ্খটিকে কিছুক্ষণ মুষ্টিতে আবদ্ধ রাখিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন—'সোমশুক্লাকে ডেকে পাঠাও। সে এই শঙ্খ ধারণ করুক, হয়তো তার মঙ্গল হতে পারে।'

'সেই ভাল, সেই ভাল মহারাজ। আমি নিজেই কুমারী শুক্লাকে ডেকে আনছি।' বলিয়া নাগেশ্বর দ্রুত অন্তঃপুর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এতক্ষণে ময়ূরের প্রতি ভূপ সিংহের দৃষ্টি পড়িল। সে ধনুর্বাণ-হস্তে দ্বারের নিকট নিশ্চল দাঁড়াইয়া ছিল, রাজা মৃদু বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—'তুমি কে?'

ময়ূর সসম্ভ্রমে শির নত করিয়া বলিল—'ভট্ট নাগেশ্বর আমাকে সঙ্গে এনেছেন। আমি বিদেশী, আমার নাম ময়ূর।'

রাজা বলিলেন—'তোমার হাতে আটবিক জাতির ধনুর্বাণ, কিন্তু আকৃতি দেখে আর্য মনে হয়।'

ময়ূর বলিল—'মহারাজ, আমি আটবিক নাগ জাতির মধ্যে পালিত হয়েছি, কিন্তু জাতিতে ক্ষত্রিয়।'

'তোমার বংশপরিচয় কি?'

'বংশপরিচয় জানি না আর্য।'

ময়ূরের পানে চাহিয়া চাহিয়া রাজার মুখ-ভাব পরিবর্তিত হইল, মেরুদণ্ড ঋজু হইল। মনে হইল, একটা মানুষ অন্তর্হিত হইয়া অন্য একটি মানুষ আবির্ভূত হইতেছে। তিনি দৃঢ় আদেশের স্বরে বলিলেন, 'কাছে এস। উপবিষ্ট হও। তোমার ইতিহাস শুনতে চাই।'

ময়ূর আসিয়া রাজার সম্মুখে জানু মুড়িয়া বসিল; মাঝখানে দাবার ছকের ব্যবধান রহিল।

তারপর ময়ূর নিজ জীবনের ইতিহাস বলিল।

তাপ্তি নদীর দক্ষিণে দেবগিরি রাজ্যে তাহার বাস ছিল, তাহার পিতা দেবগিরি রাজ্যের একজন যোদ্ধা ছিলেন। রাজ্যের উত্তর সীমান্তে একটি সেনা-গুল্মে তাহারা থাকিত। ময়ূরের বয়স যখন পাঁচ ছয় বছর তখন উত্তরাপথ হইতে আলাউদ্দিন নামে এক যবন সেনাপতি দেবগিরি আক্রমণ করেন। সীমান্ত রক্ষা করিতে গিয়া এক খণ্ডযুদ্ধে ময়ূরের পিতা হত হন। তাহার মাতা তাহার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাহাকে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করেন। জঙ্গল ও পর্বতের ভিতর দিয়া বহুদূর পথ অতিক্রম করিবার পর তাহারা এক বন্য জাতির গ্রামে আশ্রয় পায়। মাতা কিন্তু

বেশিদিন বাঁচিলেন না. দু'-চার দিনের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ময়ূরের গোত্র-পরিচয় দিয়া যান নাই, কেবল বলিয়াছিলেন—'তুমি ক্ষত্রিয়।'

অতীতের কাহিনী শেষ করিয়া ময়ূর বলিল—'তারপর আমার জীবনের ষোল বছর নাগজাতির গ্রামে কেটেছে ; তারা আমাকে স্নেহ করেছে, আমি তাদের ভালবেসেছি। কিন্তু কয়েকমাস আগে গ্রামবৃদ্ধেরা আমাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দিলেন। তাই আমি গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছি ; অনেক নদী-পর্বত পার হয়ে এখানে এসেছি।'

রাজা ময়ূরের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া শুনিতেছিলেন, প্রশ্ন করিলেন—'গ্রামবৃদ্ধেরা তোমাকে তাড়িয়ে দিল কেন ?'

ময়ূর অধোবদন হইল, তাহার মুখ ধীরে ধীরে অরুণাভ হইয়া উঠিল। রাজা বলিলেন, 'কোনও দুষ্কৃতি করেছিলে ?'

ময়ূর আহত মুখ তুলিল—'আমার কোনও দোষ ছিল না মহারাজ।' সে লজ্জাজড়িত স্বরে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—'গ্রামের যুবতী মেয়েরা সকলে—কেবল আমার পিছনেই ঘুরে বেড়াতো—আমার জন্যে নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি করত—যুবকেরাও আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না—আমি মেয়েদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতাম, তবু যুবকেরা আমাকে ঈর্ষা করত—একজন তীর ছুঁড়ে আমাকে মারবার চেষ্টা করেছিল—তাই গ্রামবৃদ্ধেরা বললেন, তোমার জন্যে গ্রামের শান্তিভঙ্গ হচ্ছে, তুমি চলে যাও।'

রাজার মুখে শুষ্ক হাসির রেখাঙ্ক পড়িল, কিন্তু চক্ষু ময়ূরের মুখ হইতে অপসৃত হইল না। তিনি বলিলেন—'তুমি মেয়েদের ভয় কর ?'

ময়ূর বলিল—'ভয় করি না মহারাজ, কিন্তু—ওদের এড়িয়ে চলতে চাই।'

এই সময় কুমারী সোমশুক্লা কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে ভট্ট নাগেশ্বর।

সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী সোমশুক্লাকে দেখিলে দর্শকের মন স্নিগ্ধ আনন্দে পূর্ণ হইয়া ওঠে। দীর্ঘাঙ্গী কন্যা, দেহবর্ণের শুচিশুভ্রতা সোমশুক্লা নাম সার্থক করিয়াছে ; মুখখানি লাবণ্যে টলমল। তিনি কক্ষে আসিলেন, তাঁহার গতিভঙ্গিতে পাল-তোলা তরণীর অবলীলা। পিতার পাশে নতজানু হইয়া তিনি স্মিতমুখে বলিলেন—'আর্য ! আমাকে ডেকেছেন ?'

রাজার মন কোন্ গভীরতর স্তরে নিমজ্জিত ছিল, তিনি শূন্যদৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিলেন—'ডেকেছি !'

ভট্ট নাগেশ্বর কুমারীর পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন, বলিয়া উঠিলেন—'হা হতোস্মি ! দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের কথা ভুলে গেলেন মহারাজ !'

'ও—হাঁ'—মহারাজ মুষ্টি খুলিয়া শঙ্খটি দেখিলেন, কন্যার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—'বয়স্য আমার জন্য শঙ্খটি এনেছিল। সুলক্ষণ শঙ্খ, তুমি এটি নাও। স্বর্ণকারকে ডেকে পাঠাও, এই শঙ্খ দিয়ে অলঙ্কার গড়িয়ে নাও। সর্বদা অঙ্গে রেখো, মঙ্গল হবে।'

কুমারী সোমশুক্লার শান্ত চোখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। তিনি শঙ্খটি কপোতহস্তে লইয়া কপালে স্পর্শ করিলেন, বলিলেন—'ধন্য পিতা। আমি এখনি স্বর্ণকারকে ডেকে পাঠাচ্ছি।—অনুমতি করুন আর্য।'

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বলিলেন—'এস কন্যা।'

প্রস্থান করিবার সময় কুমারী সোমশুক্লার দৃষ্টি ময়ূরের উপর পড়িল, ক্ষণকালের জন্য ময়ূরের মুখের উপর সংলগ্ন হইয়া রহিল। তারপর তিনি পাল-তোলা তরণীর ন্যায় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

চার

ময়ূর এতক্ষণ চতুরঙ্গ বলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া ছিল, ভট্ট নাগেশ্বর তাহার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—'মহারাজ, এই যুবককে আমি আপনার কাছে এনেছিলাম—'

ভূপ সিংহ বলিলেন—'জানি।' নাগেশ্বরের বাগ্‌বিস্তার থামাইয়া তিনি ময়ূরের উপর চক্ষু নিবদ্ধ করিলেন—'তুমি আমার অধীনে কর্ম চাও ?'

ময়ূর বলিল—'হ্যাঁ মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'তোমার হাতে ধনুঃশর দেখে অনুমান করছি তুমি ধনুর্বিদ্যা জানো।'

ময়ূর সবিনয়ে বলিল—'সামান্য জানি। নাগজাতির কাছে শিখেছি।'

নাগেশ্বর মুখ খুলিয়া আবার বন্ধ করিলেন। রাজা ময়ূরকে প্রশ্ন করিলেন—'তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানো ?'

ময়ূর বলিলেন—'না মহারাজ।'

'অসি চালনা ?'

'না মহারাজ।'

'শুধুই তীর ছুঁড়তে জানো ?'

নাগেশ্বর আর নীরব থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন—'শুধুই কি তীর ছুঁড়তে জানে বয়স্য ! এই যুবক অতি ধুরন্ধর তীরন্দাজ, একটি তীর ছুঁড়ে তালগাছের ডগা থেকে পাকা তাল পেড়ে আনতে পারে। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন।'

'অবশ্য পরীক্ষা করে দেখব। এস আমার সঙ্গে।' রাজা উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন।

রাজপুরী দ্বি-ভূমক হইলেও আকারে ক্ষুদ্র এবং ঘন-সম্বদ্ধ ; তাহার পশ্চাৎভাগ অন্তঃপুর, স্বতন্ত্র অবরোধ নাই। অন্তঃপুরের পশ্চাতে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বিস্তীর্ণ বিহারভূমি ; দুই-চারিটি বৃক্ষ ও লতামণ্ডপশোভিত শষ্পাকীর্ণ অঙ্গন। ভূপ সিংহ এই অঙ্গনের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'এবার তোমার ধনুর্বিদ্যা দেখাও।'

ভট্ট নাগেশ্বর ময়ূরকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন—'দেখাও, দেখাও।'

ময়ূর ঊর্ধ্ব আকাশের পানে চোখ তুলিল, সযত্নে ধনুকে গুণ পরাইল ; তিনটি শরের মধ্যে একটি হাতে রাখিয়া বাকি দুইটি মাটিতে ফেলিল, তারপর ধীরে ধীরে ধনুকে শরযোজন করিয়া ধনু ঊর্ধ্বে তুলিল।

প্রাসাদের দ্বিতলে বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইয়া কুমারী সোমশুক্লা চম্পাকলির ন্যায় ক্ষুদ্র শঙ্খটি দেখিতেছিলেন ; পাশের অন্য একটি বাতায়নে চঞ্চরী বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া ছিল। সে হঠাৎ কলস্বরে বলিয়া উঠিল—'দেখ, দেখ, রাজকুমারি, অঙ্গনে কী হচ্ছে !'

সোমশুক্লা চকিতে চক্ষু তুলিলেন। প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সেই যুবক, যাহাকে তিনি ক্ষণেকের জন্য পিতার সম্মুখে দেখিয়াছিলেন। যুবক ঊর্ধ্বদিকে ধনু তুলিয়া গুণ আকর্ষণ করিল ; ধনু হইতে বাণ ছুটিয়া গেল, আকাশের ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়া প্রায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ইতিমধ্যে যুবক ক্ষিপ্র হস্তে মাটি হইতে অন্য একটি বাণ তুলিয়া লইয়া ধনুতে জুড়িয়াছে। প্রথম বাণটি, বেগ নিঃশেষিত হইলে, পাক খাইয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিল। যুবক তখন দ্বিতীয় বাণ মোচন করিল। দুই বাণ মধ্যপথে ফলকে ফলকে চুম্বন করিয়া একসঙ্গে মাটিতে পড়িল।

ভট্ট নাগেশ্বর দুই বাহু আস্ফালন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন—'সাধু, সাধু !'

রাজা কিছু বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার কুঞ্চিত চক্ষে গোপন অভিসন্ধি ক্ষণেকের জন্য ফুটিয়া উঠিল। তিনি হস্তের ইঙ্গিতে ময়ূরকে ডাকিয়া পুরীর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। নাগেশ্বর উচ্ছ্বসিত

স্বরে 'অদ্ভুত অদ্ভুত' বলিতে বলিতে তাঁহার অনুগামী হইলেন।

দ্বিতলের বাতায়নে চঞ্চরী ছুটিয়া গিয়া সোমশুক্লার নিকটে দাঁড়াইল, তাঁহার অঞ্চল টানিয়া দীপ্ত চক্ষে বলিল—'রাজকুমারি ! কী সুন্দর যুবাপুরুষ !'

রাজকুমারীও চমৎকৃত হইয়াছিলেন, উৎফুল্ল মুখে বলিলেন—'অপূর্ব শরসন্ধান।'

বিহ্বলা চঞ্চরী তাঁহার হস্ত আকর্ষণ করিয়া বলিল—'ও কে রাজকুমারী !'

সোমশুক্লা চঞ্চরীর মুখে উত্তপ্ত অভীপ্সা দেখিলেন ; চঞ্চরীর বহ্নিশিখার মতো রূপ যেন আরও তীব্র-সুন্দর দেখাইতেছে। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরস কণ্ঠে বলিলেন—'জানি না।'

এই সময় সীমন্তিনী প্রবেশ করিল।

সীমন্তিনীর বয়স এখন পঁয়ত্রিশ বছর। শীর্ণ তপঃকৃশ আকৃতি, মুখের উপর দুরপনেয় তিক্ততা স্থায়ী আসন পাতিয়াছে ; তবু তাহার মুখাবয়ব হইতে বিগত লাবণ্যের চিহ্ন সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

চঞ্চরীকে সোমশুক্লার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সীমন্তিনীর দুই চক্ষু প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সে কাছে আসিয়া কঠিন স্বরে কন্যাকে বলিল—'চঞ্চরি ! কুমারীর অঙ্গ স্পর্শ করেছিস্ কোন স্পর্ধায় ! যা—চলে যা এখান থেকে।'

চঞ্চরী মাতাকে যমের মতো ভয় করিত, সে কুমারীর হাত ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল। সীমন্তিনী তখন শান্ত স্বরে বলিল—'নন্দিনি, স্বর্ণকার এসেছে, নীচে অপেক্ষা করছে।'

সীমন্তিনী কুমারীকে নন্দিনী বলিয়া ডাকে, সে তাঁহার ধাত্রীমাতা। সোমশুক্লা তাহাকে জিজি বলেন ; শৈশবকালের আদরের ডাক।

সোমশুক্লা বলিলেন—'তুমিও আমার সঙ্গে এস জিজি।'

সীমন্তিনীর তিক্ত মুখ ক্ষণেকের জন্য কোমল হইল ; দুইজনে নীচে নামিয়া গেলেন।

নারী-চরিত্রের জটিলতা কে উন্মোচন করিবে ? সীমন্তিনীর জীবনে যে মহাদুর্যোগ আসিয়াছিল তাহার জন্য রাজা ভূপ সিংহের দায়িত্ব কম নয়। অথচ রাজার কন্যাকেই সে নিজের কন্যা বলিয়া বুকে টানিয়া লইয়াছে, নিজের গর্ভজাতা কন্যাকে সহ্য করিতে পারে না।

রাজা ফিরিয়া গিয়া নিভৃত কক্ষে বসিয়াছিলেন ; ময়ূর ও নাগেশ্বরকে উপবেশন করিতে বলিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে রাজা ময়ূরকে বলিলেন—'তোমাকে আমি কর্ম দেব। তুমি রাজভবনেই অন্যান্য পরিচরের ন্যায় থাকবে। তোমাকে অশ্বারোহণ শিখতে হবে, অসিবিদ্যা শিখতে হবে।'

ময়ূর বলিল—'শিখব মহারাজ। আমাকে কোন্ কর্ম করতে হবে ?'

রাজা বলিলেন—'এখন তোমার কোনো কর্ম নেই। যখন সময় হবে আমি তোমার কর্মনির্দেশ করব। আজ থেকে তুমি আমার আজ্ঞাধীন, আমি যা আদেশ করব তাই করবে।'

ময়ূর যুক্তকরে বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

রাজার অধরপ্রান্তে হাসির মতো একটা ব্যঞ্জনা দেখা দিল, তিনি কতকটা নিজ মনেই বলিলেন—'অনেকদিন থেকে প্রতীক্ষা করছি।'

তারপর তাঁহার মধ্যে অন্য মানুষের আবির্ভাব হইল, তিনি নাগেশ্বরের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'তোমার দূতকর্মের কী হল ?'

নাগেশ্বর বলিলেন—'দূতকর্ম সম্পন্ন হয়েছে বয়স্য। মহারাজ সূর্যবর্মাকে আপনার বলক্ষেপ জানিয়েছি।'

রাজা বলিলেন—'কী জানিয়েছ আমার কাছে পুনরাবৃত্তি কর। তোমাকে বিশ্বাস নেই, আগের

বার তুমি ভুল বলক্ষেপ জানিয়ে অনর্থ ঘটিয়েছিলে।'

নাগেশ্বর ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন—'হা হতোস্মি! একবার ভুল করেছি বলে কি বার বার ভুল করব। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে আপনি বাম দিকের নৌবলকে সম্মুখের তৃতীয় কোষ্ঠে সঞ্চারিত করেছেন! ঠিক বলেছি কি না?'

রাজা সম্মুখে চতুরঙ্গ ছকের দিকে দৃষ্টি নমিত করিলেন। ময়ূর এতক্ষণ ইঁহাদের কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারে নাই, এখন বুঝিল ভট্ট নাগেশ্বর কিরূপ গোপনীয় দূতকার্যে সপ্তমপুরে গিয়াছিলেন। দুই রাজা নিজ নিজ রাজ্যে বসিয়া দাবার চাল দিয়া দূতমুখে বার্তা পাঠাইতেছেন। এই খেলাটি বোধ হয় দুই বছর আগে আরম্ভ হইয়াছিল, আরও দুই বছর চলিবে।

ভূপ সিংহ মুখ তুলিয়া বলিলেন—'ঠিকই বলেছ। সূর্যবর্মা কি বললেন?'

'তিনি আপনার চাল নিজের ছকে বসিয়েছেন। বললেন, মাসেক কালের মধ্যে পাল্টা চাল দূতমুখে জানাবেন।'

'ভাল। বন্ধু সূর্যবর্মা কুশলে আছেন তো?'

'শারীরিক কুশলেই আছেন, কিন্তু মনের কুশল কোথায়? অনেক খেদ প্রকাশ করলেন, বললেন—আমি অপুত্রক, আমার বন্ধু ভূপ সিংহ ভাগ্যদোষে পুত্রহীন; আমাদের মৃত্যুর পর রাজ্যের কী দশা হবে কে জানে! হয়তো শৃগালের বাসভূমি হবে।'

ভূপ সিংহ উদ্গত নিশ্বাস চাপিয়া বলিলেন—'ওকথা থাক, আমাদের মৃত্যুর পর যা হবার হবে। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি—' তারপর সন্নিহিত ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—'বজ্রবাহু, এর নাম ময়ূর। আজ থেকে আমি একে আমার দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছি। একে সঙ্গে নিয়ে যাও, রাজভবনে যথাযোগ্য স্থান এবং অশন-বসনের নির্দেশ কর।'

বজ্রবাহু ময়ূরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। রাজা গাত্রোত্থান করিলেন, ভট্ট নাগেশ্বরকে বলিলেন—'বয়স্য, চল তোমাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাই।'

সে-রাত্রে ভূপ সিংহের চক্ষে নিদ্রা আসিতেছিল না। যথাকালে আহার করিয়া তিনি দ্বিতলে শয়নকক্ষে শয্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, ভৃত্য বজ্রবাহু পদ-সংবাহন করিয়া দিয়াছিল। অভ্যাসমত তাঁহার একটু তন্দ্রাকর্ষণও হইয়াছিল। কিন্তু বজ্রবাহু চলিয়া যাইবার পর তিনি আবার জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, চিন্তাতপ্ত মস্তিষ্ক তাঁহাকে ঘুমাইতে দেয় নাই।

শয্যায় শুইয়া তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, তারপর উঠিয়া কক্ষে পাদচারণ আরম্ভ করিলেন। আজ পূর্বাহ্ণে যে কয়টি ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাই তাঁহার চিন্তার বস্তু।—সতেরো বছর পূর্বে রানীর হস্তচ্যুত দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তারপরেই আসিল সর্বনাশা বিপর্যয়। আজ আবার অযাচিতভাবে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে আসিয়াছে এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবক; অদ্ভুত তীরন্দাজ, অথচ শান্ত নিরভিমান দৃঢ়চরিত্র। দীর্ঘকাল তিনি এমনি একটি মানুষের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; চঞ্চরীর যৌবনপ্রাপ্তির সন্ধিক্ষণে সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ এক অপূর্ব যোগাযোগ। এ কি নিয়তির ইঙ্গিত? তবে কি সত্যই শুভকাল ফিরিয়া আসিয়াছে? তাঁহার জীবনে অন্য শুভ নাই, একমাত্র শুভ প্রতিহিংসাসাধন। তাহা কি সফল হইবে? মহাপাপিষ্ঠ আলাউদ্দিনকে যুদ্ধে পরাভূত করার সামর্থ্য তাঁহার নাই, গুপ্তহত্যার আশাও তিনি ত্যাগ করিয়াছেন। এখন কেবল একটি মাত্র প্রতিহিংসার অস্ত্র তাঁহার হাতে আছে। বৃহতের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রের প্রতিহিংসা; ক্ষুদ্র বৃশ্চিক হস্তীকে দংশন করিয়া বিষে জর্জরিত করিতে পারে। তিনি তাহাই করিবেন। আলাউদ্দিন তাঁহার কুমারী কন্যাকে অপহরণ করিয়া তাঁহার মুখ কালিমালিপ্ত করিয়াছিল, তিনি সেই কালিমা চতুর্গুণ ফিরাইয়া দিবেন। কামকুক্কুর আলাউদ্দিন

জানিতে পারিবে না, তারপর তিনি তাহাকে জানাইয়া দিবেন। সমস্ত যবনরাজ্য জানিতে পরিবে।...এই কার্যের জন্য ময়ূরের ন্যায় যুবক চাই, যে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, যে চঞ্চরীর রূপের মোহে ভুলিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে চাহিবে না। ময়ূর উত্তম উপাদান, কিন্তু তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই চিন্তাগুলি বারংবার ভূপ সিংহের মস্তিষ্কে আবর্তিত হইয়া বিষাক্ত পতঙ্গের ন্যায় তাঁহার চেতনাকে দংশন করিতেছিল। রত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল, তবু চোখে নিদ্রা নাই—নিদ্রার ইচ্ছাও নাই—

'আর্য!'

ভূপ সিংহ চমকিয়া দ্বারের পানে চাহিলেন। ম্লান দীপালোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না, দ্রুত আসিয়া দেখিলেন, দ্বারের কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন কুমারী সোমশুক্লা। রাজা বলিলেন, 'শুক্লা!'

সোমশুক্লা হ্রস্বস্বরে বলিলেন—'পিতা, আপনার কি নিদ্রা আসছে না?'

ভূপ সিংহ কন্যার প্রতি স্নেহশীল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই। এখন রাজা যেন কন্যাকে অত্যন্ত নিকটে পাইলেন। তিনি বলিলেন—'না বৎসে, ঘুম আসছে না। কিন্তু রাত্রি অনেক হয়েছে, তোমার চোখে ঘুম নেই কেন?'

সোমশুক্লা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—'আমি ঘুমিয়েছিলাম পিতা, কিন্তু ঘুম ভেঙে গেল। তারপর পাশের ঘরে আপনার পদশব্দ শুনে উঠে এলাম।'

রাজা বলিলেন—'তুমি আবার শয়ন কর গিয়ে। আমার ঘুম কখন আসবে ঠিক নেই।'

সোমশুক্লা বলিলেন—'না পিতা, আপনি শয়ন করুন, আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। এখনি ঘুম আসবে।'

রাজা শয্যায় শয়ন করিলেন, সোমশুক্লা শিয়রে দাঁড়াইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অপরিসীম প্রশান্তিতে রাজার দেহমন ভরিয়া উঠিল। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পাঁচ

রাজভবনে ময়ূরের প্রথম রাত্রিটা সুখনিদ্রায় কাটিল। যে ঘরটি তাহার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা রাজভবনের নিম্নতলে পশ্চাদ্দিকের এক কোণে। অঙ্গনের দিকে তাহার দ্বার, রাজভবনে প্রবেশ না করিয়াও ঘরে প্রবেশ করা যায়। ঘরের মধ্যে একটি খট্টাঙ্গ পাতা হইয়াছে, তদুপরি নব শয্যা। নূতন বস্ত্রাদিও উপস্থিত। রাজার রন্ধনশালা হইতে সুপক্ক খাদ্য আসিয়াছে, তাহাই সেবন করিয়া দ্বার-গবাক্ষ খোলা রাখিয়া ময়ূর শয়ন করিয়াছিল, একেবারে ঘুম ভাঙিল পাখির ডাকে। পঞ্চমপুরে তাহার কর্মজীবন আরম্ভ হইল।

কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায় প্রায় দুই মাসব্যাপী।

অশ্বারোহণ বিদ্যা শিখিতে ময়ূরের তিনদিন লাগিল। তাহার শোণিতে অশ্ববিদ্যার বীজ নিহিত ছিল, অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া সে অপূর্ব হর্ষ অনুভব করিল। রাজভবনের পশ্চাৎভাগে বিহারভূমির প্রাচীরের পাশ দিয়া অশ্ব ছুটাইয়া দিয়া সে দেখিতে পাইত কুমারী সোমশুক্লা দ্বিতলের বাতায়ন হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন। আনন্দের আতিশয্যে সে এক হাত তুলিয়া হাসিত, দেখিতে পাইত কুমারীর সুন্দর মুখেও স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়াছে।

অশ্ববিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার পরও ময়ূর রাজ-মন্দুরা হইতে প্রত্যহ নূতন অশ্ব লইয়া

অভ্যাস করিত। একদিন সায়াহ্নে বিহারভূমির একপ্রান্তে রাজকন্যার সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। বিহারভূমিতে এক জোড়া ক্ষুদ্রাকৃতি হরিণ ও কয়েকটি শশক ছিল ; কুমারী মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের খাইতে দিতেন। কুমারীকে বিহারভূমিতে দেখিলেই তাহারা ছুটিয়া আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইত।

সেদিনও তাহারা কুমারীকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। কুমারী চারিদিকে শস্য ছড়াইয়া দিতেছিলেন, তাহারা কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেছিল। সহসা অদূরে অশ্বের দড়বড় শব্দ শুনিয়া তাহারা ভয় পাইয়া পলায়ন করিল।

ময়ূর লতাবিতানের অন্তরালে সোমশুক্লাকে দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পাইয়া ত্বরিতে অশ্ব থামাইয়া তাঁহার কাছে আসিল, জোড়হস্তে বলিল—'রাজনন্দিনি, আমাকে ক্ষমা করুন।'

সোমশুক্লা একটু হাসিলেন, শুচিস্মিত মুখের উপর একটু অরুণাভা দেখা দিল। তিনি বলিলেন—'ওরা বনের প্রাণী, বড় ভীরু। কিন্তু আপনি বিব্রত হবেন না, ওরা এখনি ফিরে আসবে।'

ময়ূর লক্ষ্য করিল, রাজকুমারী তাহাকে সমকক্ষের ন্যায় সম্বোধন করিলেন, ভৃত্য-পরিজনের মতো নয়। তাহার আর কিছু বলিবার ছিল না, তবু সে একটু ইতস্তত করিল। তাহাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখিয়া সোমশুক্লা বলিলেন—'আপনি তো অশ্ববিদ্যা শীঘ্র অধিগত করেছেন।'

ময়ূর একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল, বলিল—'কি জানি। সত্যই কি শীঘ্র? আমার ধারণা ছিল সকলেই অতি সহজে ঘোড়ায় চড়া শিখতে পারে।'

রাজকুমারী শুধু হাসিলেন, তারপর অন্য কথা বলিলেন—'আপনার অসিশিক্ষা কতদূর?'

ময়ূর অবাক হইয়া চাহিল, রাজকুমারী তাহার সব খবর রাখেন। একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—'অসিশিক্ষা এখনো চলছে। অস্ত্রগুরু বলেছেন আরও দুই-তিন সপ্তাহ লাগবে।'

ইতিমধ্যে হরিণ মিথুন আবার গুটিগুটি কুমারীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাই দেখিয়া ময়ূর আর সেখানে দাঁড়াইল না, ঘোড়ার রাশ ধরিয়া মন্দুরার দিকে চলিয়া গেল।

তারপর আরও কয়েকবার রাজকুমারীর সহিত দেখা হইল ; দুই-চারিটি সামান্য বাক্যালাপ হইল। একদিন সে দেখিল কুমারীর মণিবন্ধে একটি নূতন কঙ্কণ শোভা পাইতেছে। চম্পাকলির ন্যায় সুন্দর ক্ষুদ্র শঙ্খটি এই কঙ্কণের মধ্যমণি। ময়ূর উৎসুক নেত্রে সেই দিকে চাহিল।

কুমারী বলিলেন—'শঙ্খটি আপনার চেনা, আপনার সামনেই পিতা এটি আমাকে দিয়েছিলেন। —অলঙ্কার কেমন হয়েছে?' বলিয়া তিনি মৃণালবাহু তুলিয়া দেখাইলেন।

'ভাল।' ময়ূর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আরও অনেক কথা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া বাক্য সরিল না। রাজকুমারী মৃদু হাসিলেন।

দিন কাটিতেছে। অশ্বারোহণ ও অসিবিদ্যা অভ্যাস করা ছাড়াও ময়ূর রাজার কাছে যাতায়াত করে, রাজা যে কক্ষে থাকেন সেই কক্ষদ্বারে ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া থাকে। রাজা মাঝে মাঝে তাহার প্রতি দীর্ঘ দৃষ্টিপাত করেন, যেন চক্ষু দিয়া তাহার যোগ্যতার পরিমাপ করেন। ভট্ট নাগেশ্বরের সঙ্গেও প্রত্যহ দেখা হয় ; ব্রাহ্মণ দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ ও রঙ্গ-রসিকতা করেন।

এই তো গেল দিনচর্যা। রাত্রিকালেও ময়ূরের কক্ষে কিছু ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল ; কিন্তু শঙ্কা ও সংকোচে সে কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেছিল না।

রাত্রিকালে সে ঘরের দ্বার-গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া শয়ন করিত, আবদ্ধ ঘরে শয়ন করা তাহার অভ্যাস নাই। প্রথম কয়েক রাত্রি নির্বিঘ্নে কাটিয়াছিল, তারপর একদা গভীর রাত্রে তাহার ঘুম

ভাঙিয়া গেল। সে দীপ নিভাইয়া শুইয়াছিল, সুতরাং ঘর অন্ধকার ; কিন্তু ঘরের বাহিরে মুক্ত দ্বারপথে নক্ষত্রের আলোকবিদ্ধ তমিস্রা ঈষৎ তরল। জাগিয়া উঠিয়া ময়ূর পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ করিয়া শুইয়া রহিল। ঘরের অভ্যন্তরে অতি লঘু পদপাতের শব্দ আসিতেছে। সে সহসা উঠিয়া বসিয়া তীব্র স্বরে বলিল—'কে ?'

প্রশ্নের উত্তর আসিল না। কে যেন ভয় পাইয়া দ্রুত চরণে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

ময়ূর ভাবিল, হয়তো বিড়াল। তারপর সে অনুভব করিল, ঘরের বাতাসে কেশতৈলের মৃদু গন্ধ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সে বিস্মিত হইয়া ভাবিল, স্ত্রীলোক তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল ! কে সে ? রাজপুরীতে দাসী-কিঙ্করী আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ ? কিন্তু কেন ?

সে-রাত্রে ময়ূর অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল, কিন্তু আর কিছু ঘটিল না। কয়েকদিন কাটিয়া গেল, কৃষ্ণপক্ষ গিয়া শুক্লপক্ষের তিথি আসিল। একদিন ময়ূর দ্বার খুলিয়া ঘুমাইতেছিল, ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল । চাঁদ তখনও অস্ত যায় নাই, ঘরের বাহিরে আবছায়া আলো। ময়ূর চক্ষু মেলিয়া অস্পষ্টভাবে দেখিল, তাহার শিয়রে কেহ তাহার পানে চাহিয়া আছে। মুখ দেখা গেল না, কিন্তু কেশতৈলের গন্ধ নাকে আসিল। ময়ূর গম্ভীর স্বরে কহিল—'কে তুমি ?'

শীৎকারের ন্যায় নিশ্বাস টানার শব্দ হইল, তারপর ছায়ামূর্তি দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। পলকের জন্য একটা আকৃতির ছায়াচিত্র বাহিরের স্বল্পালোকে দেখা দিয়াই অন্তর্হিত হইল। আগে যদি বা সন্দেহ ছিল এখন আর সন্দেহ রহিল না। তাহার অদৃশ্য অভিসারিকা নারীই বটে।

ময়ূর শয্যা হইতে নামিল না, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। নারীর হাত হইতে তাহার নিস্তার নাই। নারীর জন্য তাহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইয়াছে, এখন কি রাজ-আশ্রয় ছাড়িতে হইবে ! কিন্তু কে এই নারী ? রাজপুরীর দাসী-কিঙ্করীদের সকলকেই সে দেখিয়াছে ; তাহাদের মধ্যে কয়েকটি নববয়স্কা যুবতী আছে। তাহারা তাহার পানে সাভিলাষ কটাক্ষ হানিয়াছে, কিন্তু সে দূরে সরিয়া গিয়া তাহাদের এড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদেরই মধ্যে কেহ কি ? কিন্তু যদি দাসী-কিঙ্করী না হয়। যদি—ময়ূর শিহরিয়া উঠিল—যদি রাজকুমারী হয় !

এখন সে কী করিবে ! রাজাকে বলিবে ? কিন্তু তিনি যদি বিশ্বাস না করেন ! ভট্ট নাগেশ্বরকে বলিবে ? না, বাচাল ব্রাহ্মণ এই কথা সর্বত্র রাষ্ট্র করিবেন ; তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিক ফলিতে পারে। অনেক চিন্তা করিয়া ময়ূর স্থির করিল, অভিসারিণী যদি আবার আসে তাহাকে ধরিতে হইবে, তারপর অবস্থা বুঝিয়া কার্য করিতে হইবে।

তৃতীয়বার অভিসারিকা আসিল আরও চার-পাঁচ দিন পরে। এবার ময়ূর প্রস্তুত ছিল। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফে উন্মুক্ত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইল। নারী হঠাৎ ভয় পাইয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহার পাশ কাটাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। ময়ূর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। পুষ্টাঙ্গ চাঁদের আলোয় চিনিতে কষ্ট হইল না, কুমারী সোমশুক্লার পরিচারিকা চঞ্চরী।

ময়ূর চঞ্চরীকে আগে কয়েকবার দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার উগ্র রূপ ময়ূরকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই, বরং প্রতিহত করিয়াছে। বিশেষত সে ভট্ট নাগেশ্বরের মুখে চঞ্চরীর জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়াছিল, দুর্বৃত্ত ম্লেচ্ছ রাজার জারজ কন্যা। ইহাতে তাহার মন আরও বিমুখ হইয়াছিল।

ময়ূর চাপা তর্জন করিয়া বলিল—'তুমি কেন আমার ঘরে এসেছিলে ?'

চঞ্চরী উত্তর দিল না, আঁকিয়া-বাঁকিয়া ময়ূরের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল। সে কেন ময়ূরের ঘরে আসিয়াছিল নিজেই বোধ হয় জানে না ; সে অনূঢ়া অনভিজ্ঞা, কেবল অন্ধ প্রকৃতির তাড়নায় ময়ূরের সংসর্গ কামনা করিয়াছিল। তাহার বুদ্ধি বেশি নাই, কিন্তু যৌবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে।

ময়ূর বলিল—'চল, তোমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাই।'

এই সময় পিছন হইতে কণ্ঠস্বর আসিল—'ময়ূরভদ্র !'

ময়ূর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল অচ্ছাভ চাঁদের আলোয় দু'টি নারীমূর্তি অদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একজন রাজকন্যা সোমশুক্লা, অন্যজন দাসী সীমন্তিনী। ময়ূর চঞ্চরীর হাত ছাড়িয়া দিল, চঞ্চরী অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

চঞ্চরী রাত্রে তাহার মাতার কক্ষে শয়ন করে। আজ রাত্রে সীমন্তিনী হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখিল চঞ্চরী শয্যায় নাই। সে ছুটিয়া রাজকুমারীর কক্ষে গিয়াছিল, রাজকুমারীও জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু চঞ্চরী সেখানে নাই। তখন দুইজনে চুপি চুপি চঞ্চরীকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

সীমন্তিনী অগ্রসর হইয়া আসিয়া চঞ্চরীর চুলের মুঠি ধরিল, অনুচ্চস্বরে ময়ূরকে বলিল—'ভদ্র, এবার চঞ্চরীকে ক্ষমা করুন। ও আমার কন্যা। আমি ওকে শাসন করব। আর কখনো ও আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

ময়ূর স্থির দৃষ্টিতে রাজকন্যার পানে চাহিয়া ছিল, সেইভাবে থাকিয়াই বিরসকণ্ঠে বলিল—'ভাল।'

সীমন্তিনী চঞ্চরীর চুলের মুঠি ধরিয়া নির্মমভাবে টানিয়া লইয়া গেল। সোমশুক্লা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ময়ূর মুখ তুলিয়া চাঁদের পানে চাহিল। চাঁদ হাসিতেছে, চারিদিকে শারদ রাত্রির স্নিগ্ধ শীতলতা। একটি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ময়ূর মুখ নামাইল, দেখিল কুমারী তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার উন্নমিত মুখে বিচিত্র হাসি। তিনি লঘু স্বরে বলিলেন—'ময়ূরভদ্র, আপনার জীবনে এরূপ অভিজ্ঞতা বোধ হয় নূতন নয়।'

ময়ূর চকিত হইয়া বলিল—'না। আমার জীবনকথা আপনি জানেন ?'

শুক্লা বলিলেন—'ভট্ট নাগেশ্বরের মুখে শুনেছি।'

ময়ূর প্রশ্ন করিল—'সব কথা শুনেছেন ? আমি অজ্ঞাতকুলশীল তা জানেন ?'

শুক্লা বলিলেন—'জানি। আপনি স্ত্রীজাতির প্রতি বিরূপ, তাও জানি।'

ময়ূর ব্যস্ত স্বরে বলিল—'বিরূপ নয় দেবি ! আমি—আমি—'

'স্ত্রীজাতিকে এড়িয়ে চলেন। তা চলুন, কিন্তু কাজটি সহজ নয়।' কুমারীর কণ্ঠে অতি মৃদু হাসির মূর্ছনা উত্থিত হইয়াই মিলাইয়া গেল। তাঁহার দেহটিও যেন চন্দ্রকিরণে গলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

ময়ূর অনিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল।

ছয়

পঞ্চমপুরের রাজসংসারে আশ্রয়লাভ করিবার পর ময়ূরের জীবনযাত্রায় একটি মন্দমন্থর ছন্দ আসিয়াছিল, দুই মাস পরে সেই ছন্দের যতিভঙ্গ হইল। রাজা ভূপ সিংহ তাহাকে নিভৃত কক্ষে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'উপবেশন কর। তোমার প্রকৃত কর্মের সময় উপস্থিত।'

ময়ূর রাজার সম্মুখে বসিল। ভূপ সিংহ কিয়ৎকাল গম্ভীর দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া ধীরস্বরে বলিলেন—'ময়ূর, গত দুই মাস ধরে আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করেছি। আমার বিশ্বাস জন্মেছে, যে-কাজের ভার আমি তোমাকে দেব তা তুমি পারবে।'

ময়ূর জোড়হস্তে বলিল—'আজ্ঞা করুন আর্য।'

রাজা বলিলেন—'তোমাকে দিল্লী যেতে হবে। কিন্তু একা নয়, তোমার সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক থাকবে।'

রাজা সপ্রশ্ন নেত্রে ময়ূরের পানে চাহিলেন, ময়ূর তিলমাত্র বিচলিত না হইয়া নিষ্পলকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'তারপর আজ্ঞা করুন আর্য।'

রাজা সন্তোষের নিশ্বাস ফেলিলেন—'দিল্লী এখান থেকে বহুদূর, পথও অতি দুর্গম। দিল্লী ম্লেচ্ছ জাতির রাজধানী, সেখানকার ম্লেচ্ছগণ ঘোর দুর্বৃত্ত এবং দুর্নীতিপরায়ণ, সেখানে হিন্দুর জীবনের কোনো মূল্য নেই। তোমাকে এই শত্রুপুরীতে যেতে হবে একটি সুন্দরী নারীকে নিয়ে। তোমার দায়িত্ব কতখানি বুঝতে পারছ?'

'পারছি মহারাজ। তারপর আদেশ করুন।'

'তুমি যাকে নিয়ে যাবে তার নাম চঞ্চরী। তাকে বোধ হয় দেখেছ, সে সুন্দরী। কোনো বিশেষ কারণে আমি তাকে আলাউদ্দিনের কাছে উপঢৌকন পাঠাতে চাই।'

রাজা ক্ষণেকের জন্য নীরব হইলেন, ময়ূরও চুপ করিয়া রহিল ; সে যে ভট্ট নাগেশ্বরের মুখে চঞ্চরীর জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়াছে তাহার আভাসমাত্র দিল না।

রাজা আবার আরম্ভ করিলেন—'কেন আমি চঞ্চরীকে আলাউদ্দিনের কাছে পাঠাচ্ছি তা জানতে চেয়ো না, গূঢ় রাজনৈতিক কারণ আছে। তুমি কেবল চঞ্চরীকে দিল্লীতে নিয়ে যাবে, সেখানে পৌঁছে চেষ্টা করবে চঞ্চরী যাতে আলাউদ্দিনের দৃষ্টিপথে পড়ে, সুন্দরী নারী দেখলেই সে তাকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে। তুমি প্রতিরোধ করবে না, আলাউদ্দিনকে মারবার চেষ্টা করবে না। তারপর সাতদিন অতীত হলে এই পত্রটি কোনো উপায়ে তার কাছে পৌঁছে দেবে।'

জতুমুদ্রানিবদ্ধ একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পত্র তিনি ময়ূরের হাতে দিলেন। সে দেখিল রাজার কপালের শিরা-উপশিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় রক্তাভ। কিন্তু তিনি ধীরভাবে বলিলেন—'এই তোমার কাজ। তুমি অশ্বপৃষ্ঠে যাবে, চঞ্চরী দোলায় থাকবে। দশজন সশস্ত্র বাহক তোমাদের সঙ্গে থাকবে, তারা দোলা বহন করবে, যদি পথে দস্যু-তস্কর আক্রমণ করে তারা লড়াই করবে। দস্যু-তস্কর সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে অপহরণের চেষ্টা করতে পারে, তুমি সর্বদা সতর্ক থাকবে।'

রাজা বক্তব্য শেষ করিলে ময়ূর জিজ্ঞাসা করিল—'কবে যাত্রা করতে হবে?'

রাজা বলিলেন—'কাল প্রত্যূষে। সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন প্রস্তুত আছে। তুমি আমার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করবে।'

ময়ূর শুধু বলিল—'হাঁ মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'বৎসরাবধি কাল আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষা করব। যদি কার্যসিদ্ধি করে ফিরে আসতে পারো, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই থাকবে না। আশীর্বাদ লও বৎস।'

সে-রাত্রে ময়ূর ঘুমাইতে পারিল না, শয্যায় শুইয়া আসন্ন যাত্রা সম্বন্ধে নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কি করিয়া কোন্ কার্য করিবে, বিপদে পড়িলে কিভাবে আচরণ করিবে, তাহার ধনুর্বিদ্যা কোন্ কাজে লাগিবে, এইসব চিন্তা। চঞ্চরীর ভাগ্যের কথা সে অধিক চিন্তা করিল না, চঞ্চরী এই চতুরঙ্গ খেলার ক্রীড়নক, অদৃষ্ট তাহাকে নিয়ন্ত্রিত পথে লইয়া যাইতেছে। ময়ূর নিমিত্ত মাত্র।

এইসব ভাবনার মধ্যে রাত্রি তিন প্রহর কাটিয়া গেল। ঘরের বাহিরে অনিমেষ জ্যোৎস্না, যেন প্রকৃতির অঙ্গে রূপালী তবক মুড়িয়া দিয়াছে। ময়ূর শয্যায় উঠিয়া বসিল। রাত্রি শেষ হইতে

বেশি বিলম্ব নাই।

দ্বারের বাহিরে একটি নিঃশব্দ মূর্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চন্দ্রালোকে মুখাবয়ব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ময়ূরের হৃদ্‌যন্ত্র দুন্দুভির ন্যায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে ত্বরিতে উঠিয়া মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইল।

'রাজনন্দিনি।'

সোমশুক্লা স্থিরায়ত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর ময়ূর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'ভেবেছিলাম যাত্রার আগে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না।'

সোমশুক্লা এবার কথা বলিলেন, তাঁহার কণ্ঠ একটু কাঁপিয়া গেল,—'ময়ূরভদ্র, আমার এই শঙ্খ-কঙ্কণ আপনি গ্রহণ করুন। এটি সঙ্গে রাখবেন, আপনার কল্যাণ হবে।'

ক্ষণকাল নিশ্চল থাকিয়া ময়ূর সোমশুক্লার সম্মুখে নতজানু হইল, অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত তাঁহার দিকে প্রসারিত করিল। সোমশুক্লা মণিবন্ধ হইতে কঙ্কণ খুলিয়া তাহার অঞ্জলিতে রাখিলেন। ময়ূর রুদ্ধ স্বরে বলিল—'দেবি, আমি আর কী বলব? আমি—আমি—'

সোমশুক্লা অঙ্গুলি দিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন—'এখন কিছু বলবেন না। আপনি ফিরে আসুন, তারপর আপনার কথা আপনি বলবেন, আমার কথা আমি বলব।'

উদ্বেল হৃদয়ে ময়ূর মস্তক নত করিল।

সোমশুক্লা প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। নিজ কক্ষে গেলেন না, ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া সীমন্তিনীর কক্ষের বাহিরে দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। চঞ্চরী উত্তেজিত হাসিমুখে মায়ের সম্মুখে বসিয়া আছে, সীমন্তিনী তাহাকে বস্ত্র-অলঙ্কারে সাজাইয়া দিতেছে। সীমন্তিনীর মুখ কঠিন কিন্তু তাহার দুই চক্ষু দিয়া অবশে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। রাজকুমারী ছায়ার মতো দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া গেলেন।—

ঊষাকালে ক্ষুদ্র যাত্রীদলের দুরদুর্গম যাত্রা আরম্ভ হইল।

দ্বিতীয় আবর্ত

এক

দুই মাস পরে একটি শীতের অপরাহ্নে ময়ূর চঞ্চরীকে লইয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে পৌঁছিল।

পথে কোনও বিপদ আপদ ঘটে নাই। ভাগ্যক্রমে তাহারা মথুরাযাত্রী একদল হিন্দু বণিকের সঙ্গ পাইয়াছিল; বণিকদের সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষী ছিল। তিনদিন পূর্বে বণিকদল মথুরায় নামিয়া গেল; বাকি পথটুকু ময়ূর নিঃসঙ্গভাবেই অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু কোনও উপদ্রব হয় নাই। চঞ্চরীও কোনও প্রকার গণ্ডগোল করে নাই। সেই রাত্রে ধরা পড়িবার পর হইতে সে মনে মনে ময়ূরকে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, প্রগল্‌ভতা করিবার সাহস আর নাই। ময়ূর যখন যে আদেশ করে সে নির্বিচারে তাহা পালন করে।

দিল্লীর দক্ষিণ তোরণদ্বার হইতে অর্ধ-ক্রোশ দূরে একটি হিন্দু পান্থশালা পাইয়া ময়ূর এখানেই যাত্রা স্থগিত করিল। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নগরদ্বার বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং আজ রাত্রিটা পান্থশালায় কাটাইয়া কাল প্রভাতে নগরে প্রবেশ করাই ভাল।

পান্থশালাটি সুপরিসর: মাঝখানে পট্টাবৃত উঠান, চারিদিক ঘিরিয়া ছোট ছোট কুঠুরি। ময়ূর একটি কুঠুরি ভাড়া লইল। তাহাতে চঞ্চরী থাকিবে, অন্য সকলে কুঠুরির দ্বার ঘিরিয়া উঠানে

শয়ন করিবে।

হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া ময়ূর পান্থপালকে ডাকিল, রাত্রির আহারের নির্দেশ দিয়া পান্থশালার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। কাল দিল্লী প্রবেশ করিতে হইবে, কিছুক্ষণ নির্জনে চিন্তা করা প্রয়োজন।

সূর্যাস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যা এখনও নির্বাপিত হয় নাই। পান্থশালার সম্মুখের পথটি জনশূন্য, আশেপাশে বেশি লোকালয় নাই, ইতস্তত দুই-একটি কুটির দেখা যায়। উত্তর দিকে অর্ধ-ক্রোশ দূরে দিল্লীর কৃষ্ণবর্ণ প্রাকার ঘনায়মান অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে; যেন একটা বিপুলকায় হস্তী ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া শুণ্ড ঊর্ধ্বে তুলিয়া আছে। ময়ূর জানে না যে ওই ঊর্ধ্বোত্থিত শুণ্ডই জগৎবিখ্যাত কুতবমিনার।

চিন্তাক্রান্ত মুখে পান্থশালার সম্মুখে পাদচারণ করিতে করিতে ময়ূরের চোখে পড়িল, পান্থশালার প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন একটি অতি ক্ষুদ্র বিপণি রহিয়াছে। ফলের ও শাকসব্‌জির দোকান। একটি স্ত্রীলোক মঞ্চের উপর বসিয়া আছে। পান্থশালায় যাহারা আসে তাহাদের মধ্যে স্বপাকভোজী কেহ থাকিলে বোধ করি এই দোকান হইতে ফলমূল শাকপত্র ক্রয় করে।

নিতান্ত কৌতূহলবশেই ময়ূর দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মঞ্চের উপর শুষ্ক এবং তাজা দুই প্রকার ফলই সাজানো রহিয়াছে; ডালিম, দ্রাক্ষা, খেজুর এবং আরও অনেক জাতের অপরিচিত ফল। সে একটি সুপক্ক ডালিম তুলিয়া লইয়া পসারিনীর মুখের পানে চোখ তুলিল।

রমণীর মুখের উপর হইতে ময়ূরের দৃষ্টি যেন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। মুখখানা অস্বাভাবিক রকম কৃষ্ণবর্ণ; বরং কৃষ্ণবর্ণ না বলিয়া নীলবর্ণ বলিলেই ভাল হয়। ময়ূর ক্ষণিক বিস্ময় সংবরণ করিয়া বলিল—'এই ডালিমের দাম কত?'

রমণীও একদৃষ্টে ময়ূরের পানে চাহিয়া ছিল। তাহার মুখ দেখিয়া বয়স অনুমান করা যায় না, তবে বৃদ্ধা নয়। সে বলিল—'ফলের দাম এক দ্রম্ম। তুমি দক্ষিণ থেকে আসছ, তোমার দেশ কোথায়?'

নবাগত যাত্রীকে এরূপ প্রশ্ন করা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু ময়ূর সতর্ক হইল; রমণীকে এক দ্রম্ম দিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিল—'নর্মদার পরপারে।' তারপর সুন্দর পাকা ফলটি দুই হাতে লোফালুফি করিতে করিতে পাদচারণ করিতে লাগিল।...সোমশুক্লা যে শঙ্খ-কঙ্কণ দিয়াছিলেন তাহা সে সুতা দিয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, আঙরাখার তলায় কঙ্কণ দেখা যায় না; কিন্তু ময়ূর বক্ষের উপর তাহার স্পর্শ অনুভব করে। কুমারী সোমশুক্লা—

সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল। পসারিনী রমণী দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, ময়ূর পান্থশালার কোণ পর্যন্ত গিয়া ফিরিবার উপক্রম করিল। বাহিরে বেশ ঠাণ্ডা, এবার পান্থশালার মধ্যে আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। এই সময় সে লক্ষ্য করিল, উত্তর দিক হইতে একটি লোক আসিতেছে। ছায়ান্ধকারে লোকটির অবয়ব ভাল দেখা গেল না; কিন্তু সে খঞ্জ, লাঠিতে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছে। আরও কাছে আসিলে ময়ূর দেখিল লোকটির মুখে প্রচুর দাড়িগোঁফ রহিয়াছে, সম্ভবত মুসলমান। সে ফিরিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে আহ্বান আসিল—'দয়ালু শ্রেষ্ঠি, বিকলাঙ্গ অক্ষমকে দয়া কর।'

ময়ূর আবার ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জ ভিক্ষুকটা লাঠি হাতে লইয়া দুই পায়ে দাঁড়াইল এবং ক্ষিপ্রহস্তে লাঠি তুলিয়া ময়ূরের মস্তকে সজোরে আঘাত করিল। ময়ূর আত্মরক্ষার সময় পাইল না; জ্ঞান হারাইবার পূর্বে সে রমণীকণ্ঠের একটি তীব্র চিৎকার শব্দ শুনিতে পাইল। তারপর আর কিছু তাহার মনে রহিল না।

জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া ময়ূর দেখিল সে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শুইয়া আছে, ঘরের কোণে দীপ জ্বলিতেছে। একটি স্ত্রীলোক তাহার পাশে বসিয়া মাথায় ও কপালে জলের প্রলেপ দিতেছে। সে

চিনিল, ফলের দোকানের পসারিনী।

প্রথমেই ময়ূর বুকে হাত দিয়া দেখিল, কঙ্কণ যথাস্থানে আছে। তখন সে বলিল—'খঞ্জ লোকটা কে?'

পসারিনী দ্বারের দিকে চাহিল। পান্থপাল সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল 'ওর নাম মামুদ, দিল্লীর দস্যু। ও সত্যই খঞ্জ নয়, খঞ্জের ভান করেছিল। দিল্লীর বাইরে পান্থশালার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। নূতন মুসাফিরকে একলা পেলে মাথায় লাঠি মেরে যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পালায়। দিল্লীতে এরকম ঠক্ রাহাজান অনেক আছে।'

পসারিনী বলিল—'ভাগ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, কাটারি নিয়ে ছুটে গেলাম। আমাকে দেখে মামুদ পালালো, নইলে তোমার সর্বস্ব কেড়ে নিত।'

ময়ূর শয্যায় উঠিয়া বসিল। মাথাটা টন্‌টন্ করিতেছে বটে, কিন্তু গুরুতর কিছু নয়। সে মুখ তুলিয়া দেখিল দ্বারের কাছে তাহার সঙ্গীরাও উৎকণ্ঠিত মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সে হাসিমুখে হাত নাড়িয়া বলিল—'ভয় নেই, আমি অক্ষত আছি।' তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেল।

ময়ূর পসারিনীকে বলিল—'এটি কি তোমার ঘর?'

পসারিনী বলিল—'হাঁ, আমি এই পান্থশালায় থাকি।' ময়ূর উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিলে সে বলিল,—'উঠো না উঠো না, আরও খানিক শুয়ে থাকো, শরীর সুস্থ হবে।'

ময়ূর বসিল, কৃতজ্ঞ স্বরে বলিল—'তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

পসারিনী বলিল—'তুমি হিন্দু, আমার দেশের লোক। তোমার প্রাণ বাঁচাব না?'

ময়ূর কিছুক্ষণ পসারিনীর নীলবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল—'তুমি দক্ষিণ দেশের মানুষ?'

পসারিনী যেন একটু বিচলিত হইয়া পড়িল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল—'হাঁ। অনেক দিন দেশছাড়া। এই পান্থশালায় দোকান করেছি, দক্ষিণ দেশ থেকে যারা আসে তাদের কাছে দেশের খবর পাই—'

এই সময় পান্থপাল এক পাত্র গরম দুধ আনিল; পসারিনী বলিল—'গরম দুধটুকু খাও, শরীর সুস্থ হবে।'

ময়ূর দুগ্ধ পান করিয়া শরীরে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল। পান্থপাল শূন্য পাত্র লইয়া যাইবার পর পসারিনী বলিল—'তুমি নর্মদার ওপার থেকে আসছ, কিন্তু রাজ্যের নাম তো বললে না।'

ময়ূর একটু ইতস্তত করিল। কিন্তু প্রাণদাত্রীর কাছে মিথ্যা বলা চলে না, সে বলিল—'পঞ্চমপুরের নাম শুনেছ?'

পসারিনীর চক্ষু ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ময়ূর এবার পসারিনীর মুখ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। মুখের বর্ণ নীল বটে, কিন্তু গঠন অতি সুন্দর, আভিজাত্যব্যঞ্জক। এই গঠনের মুখ সে যেন কোথায় দেখিয়াছে।

পসারিনী যখন কথা বলিল তখন তাহার কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন উত্তেজনার ঝঙ্কার শোনা গেল—'পঞ্চমপুরের নাম শুনেছি। তুমি পঞ্চমপুর থেকে আসছ?'

ময়ূর বলিল—'হাঁ।'

'পঞ্চমপুরের সকলকে চেনো?'

'সকলকে চিনি না। ভট্ট নাগেশ্বরকে চিনি।'

'ভট্ট নাগেশ্বর!' নামটি পসারিনী পরম স্নেহভরে আস্বাদন করিয়া উচ্চারণ করিল—'আর কাকে চেনো?'

ময়ূর বলিল—'আমার অন্তরাত্মা বলছে তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি।—আমি রাজপুরীর সকলকে চিনি, রাজা ভূপ সিংহ আমার প্রভু।'

পসারিনীর চক্ষু দুইটি অন্তর্বাষ্পে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অতঃপর ময়ূর সসম্ভ্রমে বলিল—'আপনাকে সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা মনে হচ্ছে। কিন্তু—আপনার—'

'মুখ কালো?' পসারিনী হাসিল! সুন্দর দন্তপংক্তির রেখা ঈষৎ দেখা গেল।

ময়ূর বিস্ফারিত চক্ষে কিয়ৎকাল চাহিয়া থাকিয়া করজোড়ে বলিল—'আপনাকে চিনেছি।'

পসারিনী বলিল—'চিনেছ! কি করে চিনলে?'

ময়ূর বলিল—'আপনার হাসি দেখে। রাজকন্যা সোমশুক্লার হাসি ঠিক আপনার মতো।'

'সোমশুক্লা! ওঃ, তার বয়স এখন সতেরো বছর।' পসারিনী সহসা দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ কাটিবার পর ময়ূর স্খলিত স্বরে বলিল—'কিন্তু দেবি, আপনি এখানে—এভাবে—'

চক্ষু মুছিয়া পসারিনী বলিল—'আমার কথা পরে হবে। আগে তুমি সব কথা বল। কুমার রামরুদ্র ভাল আছেন?'

ময়ূর হেঁটমুখে বলিল—'কুমার রামরুদ্র বেঁচে নেই। নয় বছর আগে রাজা তাঁকে দিল্লী পাঠিয়েছিলেন বংশের কলঙ্কমোচনের জন্য, আলাউদ্দিনের জল্লাদের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

পসারিনী কপালে করাঘাত করিয়া আবার কাঁদিল। শেষে অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিল—'হায়, রামরুদ্রের সঙ্গে যদি আমার দেখা হত। নয় বছর আগে আমি এখানেই ছিলাম। সবই বিধিলিপি। কিন্তু এখন রাজা তোমাকে কি জন্য পাঠিয়েছেন তাই বল।'

আর গোপনতার প্রয়োজন ছিল না, ময়ূর যাহা যাহা জানিত সব বলিল। পসারিনী সর্বগ্রাসী চক্ষু মেলিয়া শুনিতে লাগিল; শুনিতে শুনিতে কখনও তাহার চক্ষু উদ্দীপনায় স্ফুরিত হইল, কখনও হিংসায় প্রখর হইল। বিবৃতির অন্তে সে দীর্ঘকাল করলগ্ন কপোলে বসিয়া থাকিয়া শেষে বলিল—'পিতা প্রতিহিংসার উত্তম উপায় উদ্ভাবন করেছেন। ম্লেচ্ছ রাক্ষস ভোগের জন্য পাগল, কিন্তু তার মনে একটিমাত্র বাধা আছে; নিজের কন্যা—। এখনো আলাউদ্দিনের ভোগক্ষুধা মেটেনি।—যাক্, দৈব অনুকূল, তাই আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। তুমি একা এ কার্য সাধন করতে পারতে না।'

ময়ূর নিজ বক্ষস্থিত শঙ্খ-কঙ্কণটি একবার স্পর্শ করিল, মনে মনে বলিল—সত্যই দৈব অনুকূল, এই শঙ্খ আমার ভাগ্যদাতা। মুখে বলিল—'দেবি, ভাগ্যবশে আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু এবার আপনার কথা বলুন।'

শিলাবতী তখন ভূমিসংলগ্ন নেত্রে ধীরে ধীরে নিজের মর্মন্তুদ কাহিনী বলিলেন—

আলাউদ্দিনের সঙ্গে সাত-আট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং দশ-বারোটা হাতি ছিল। শিলাবতীকে হাতির পিঠে তুলিয়া সে সসৈন্যে দক্ষিণ দিকে চলিল। দেবগিরির উত্তুঙ্গ দুর্গের সম্মুখে দুইবার ভীষণ যুদ্ধ হইল; হাতির পিঠে বসিয়া শিলাবতী যুদ্ধ দেখিলেন। এমন বীভৎস দৃশ্য পৃথিবীতে আর নাই। তারপর বহু ধনরত্ন হাতির পিঠে তুলিয়া ম্লেচ্ছরা ফিরিয়া চলিল। প্রথমে তাহারা গেল প্রয়াগের নিকট কারা-মানিকপুর নামক স্থানে। সেখানে আলাউদ্দিনের প্রধানা বেগম এবং অন্যান্য বহু স্ত্রীলোক ছিল; শিলাবতীও হারেমে স্থান পাইলেন।

এই কারা-মানিকপুরেই আলাউদ্দিন বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা তাহার পিতৃব্য সুলতান জালালউদ্দিনকে হত্যা করে, তারপর পিতৃব্যের মুণ্ড বর্শাফলকে তুলিয়া দিল্লী যাত্রা করে এবং সিংহাসন অধিকার করে।

শিলাবতীও আসিয়া দিল্লীর হারেমে রহিলেন। সেখানে নিত্য নবযৌবনা সুন্দরীর আবির্ভাব।

যাহারা পুরাতন হইয়াছে তাহারা সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে কেহ জানে না। হারেমে ক্ষুন্নযৌবনার স্থান নাই।

হারেমে একটি দাসী ছিল, তাহার নাম ছিল কপোতী। সে অনেক শিল্পবিদ্যা জানিত—পান সাজা, মালা গাঁথা, অলকা-তিলক আঁকা, আরও কত কি। সে আদৌ হিন্দু ছিল, তাহাকে গো-মাংস খাওয়াইয়া মুসলমান করা হইয়াছিল। কিন্তু মনে মনে সে হিন্দু ছিল। হারেমের মেয়েরা তাহাকে কবুতর বিবি বলিয়া ডাকিত। এই কবুতর বিবি প্রথম হইতেই শিলাবতীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, সুযোগ পাইলেই আসিয়া দু'দণ্ড গল্প করিত ; শিলাবতীর দুঃসহ জীবন এই বিগতযৌবনা দাসীর সাহচর্যে কিঞ্চিৎ সহনীয় হইয়াছিল।

দুই বৎসর কাটিবার পর হারেমে প্রবেশ করিলেন গুর্জরের রানী কমলা। তিনি অলৌকিক রূপবতী এবং রতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন ; অল্পকাল মধ্যেই তিনি আলাউদ্দিনকে বশীভূত করিলেন। তারপর কমলার কটাক্ষ ইঙ্গিতে হারেম হইতে উপপত্নীরা একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। একদিন কবুতর বিবি চুপি চুপি আসিয়া শিলাবতীকে জানাইল—'খবর পেয়েছি তোমাকে সরাবার চেষ্টা হচ্ছে। ঘোড়াশালের সর্দার-সহিসের ওপর সুলতান খুশি হয়েছেন, তোমাকে তার হাতে দান করবেন।'

শুনিয়া ঘৃণায় শিলাবতীর দেহ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কবুতর বিবির পদতলে পড়িয়া বলিলেন—'আমাকে বাঁচাও। আমি হারেম থেকে পালিয়ে যেতে চাই।'

কবুতর বিবি বলিল—'পালানো কি সহজ ? হারেমের ফটকে কড়া পাহারা।'

শিলাবতী বলিলেন—'তুমি উপায় কর, আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।'

কবুতর বিবি তখন বলিল—'আমি এক বিদ্যা জানি, তার জোরে তুমি পালাতে পারবে, রক্ষীরা তোমাকে হাবসি দাসী ভেবে পথ ছেড়ে দেবে।'

সেই রাত্রে কবুতর বিবি শিলাবতীর মুখে ও হাতে সূচী ফুটাইয়া ফুটাইয়া উলকি কাটিয়া দিল, অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া শিলাবতী উলকি পরিলেন, তাঁহার মুখ ও হাতের শুভ্রতা উলকির নীলবর্ণে ঢাকা পড়িল।

পরদিন তিনি মাথায় জলের কলস লইয়া হারেম হইতে বাহির হইলেন। হারেমের হাবসি দাসীরা অন্দরে-বাহিরে নিত্য যাতায়াত করে ; শিলাবতীর স্ফীত কৃষ্ণবর্ণ মুখের পানে রক্ষীরা তাকাইল না, পথ ছাড়িয়া দিল।

হারেমের বাহিরে কিয়দ্দূর আসিয়া তিনি কলস ফেলিয়া দিয়া নগরের দক্ষিণ দ্বারের দিকে চলিলেন ; তোরণ পার হইয়া সিধা পথ ধরিয়া চলিলেন। কোথায় যাইতে হইবে তাহা জানেন না, কেবল দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন।

এই পান্থশালা পর্যন্ত আসিয়া তাঁহার আর চলৎশক্তি রহিল না। পান্থপাল তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেল। তদবধি শিলাবতী এই পান্থশালায় আছেন। পান্থপাল পঞ্চমপুরের লোক, সে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানে। সে তাঁহাকে পঞ্চমপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য নির্বন্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি যান নাই। কোন্ মুখ লইয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইবেন ?

অনন্তর চৌদ্দ বৎসর এই পান্থশালায় ফল বিক্রয় করিয়া কাটিয়াছে। কেহ তাহাকে চিনিতে পারে নাই। শিলাবতী নাম্নী হতভাগিনী রাজকন্যা মরিয়া গিয়াছে।

তারপর আজ—

আত্মকাহিনী শেষ করিয়া শিলাবতী অঙ্গারের ন্যায় চক্ষু তুলিলেন, বলিলেন—'না, শিলাবতী এখনো মরেনি।'

তারপর তিনি উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেলেন। অল্পকাল পরে তিনি ও পান্থপাল ময়ূরের রাত্রির

আহার লইয়া উপস্থিত হইলেন। শিলাবতী বলিলেন—'তুমি আহার কর। তোমার সঙ্গীরা নৈশাহার শেষ করে শয়ন করেছে, চঞ্চরীও ঘুমিয়েছে। তুমি আহার করে নাও, তারপর পরামর্শ হবে।'

ময়ূর বলিল—'আপনি আহার করবেন না?'

শিলাবতী বলিলেন—'না, ময়ূর ভাই, আজ আমার গলা দিয়ে অন্ন নামবে না।'

পান্থপাল আসন পাতিয়া, জলের ঘটি রাখিয়া চলিয়া গেল। পান্থপালটি অতি স্বল্পবাক্ মানুষ, নীরবে কাজ করিয়া যায়। ময়ূর আহারে বসিল।

আহারান্তে মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত মন্ত্রণা চলিল।

দুই

পরদিন প্রাতঃকালে ময়ূর, চঞ্চরী ও শিলাবতী সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইলেন। অদ্ভুত তাঁহাদের পরিচ্ছদ; ময়ূরের পরিধানে পায়জামা, মাথায় টোপ, হাতে ধনুর্বাণ; শিলাবতী কৃষ্ণবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া মাথায় ফলের ঝুড়ি লইয়াছে; চঞ্চরীর শরীর আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা। তিনজনে পদব্রজে দিল্লীর দিকে চলিলেন। সঙ্গীরা পান্থশালায় রহিল; তাহাদের কাজ আপাতত শেষ হইয়াছে।

দিল্লীর দক্ষিণ দ্বারে মানুষ গরু গাধা উটের ভিড়। অধিকাংশ প্রবেশ করিতেছে, কিছু বাহিরে আসিতেছে। দিল্লীর প্রাকারচক্রের বাহিরে মানুষের বসতি কম নয়।

দিল্লী নগরী প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল, কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে মুসলমানেরা তাহা অধিকার করিয়াছে। স্থাপত্য শিল্পে দুই জাতীয় শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। বড় বড় অট্টালিকা ও মসজিদ আছে, কিন্তু পথগুলি সংকীর্ণ। নগরের আনাচে-কানাচে নিম্নতন শ্রেণীর মানুষের বাস। কোনোটি হিন্দুপল্লী, কোনোটি মুসলমান-মহল্লা। রাজভবনের চারিপাশে অনেকখানি উন্মুক্ত স্থান, এখানে অহোরাত্র অশ্বারোহী রক্ষীর দল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সর্বোপরি কুতবমিনারের অভ্রংলিহ শিখর নগরীর শিয়রে দাঁড়াইয়া ইসলামের জয় ঘোষণা করিতেছে।

তিনজনে নগরে প্রবেশ করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল; দূর হইতে রাজপ্রাসাদ দেখিল। প্রাসাদের শীর্ষে বহু পারাবত উড়িতেছে। সুলতান আলাউদ্দিনের পায়রা পোষার শখ আছে, বিশেষত দূত-পারাবত। শত ক্রোশ দূরে ছাড়িয়া দিলেও তাহারা স্বস্থানে ফিরিয়া আসে।

নগরদর্শন শেষ করিতে দ্বিপ্রহর হইল। তখন ময়ূর দরিদ্র হিন্দুপল্লীতে গিয়া বাসা ভাড়া লইল। দুইটি ক্ষুদ্র ঘর, সম্মুখে সংকীর্ণ দালান; দুইটি ঘরের একটিতে ময়ূর থাকিবে, অন্যটিতে থাকিবে শিলাবতী ও চঞ্চরী। চাল-ডাল, হাঁড়ি-কলসি কিনিয়া তিনজনে সংসার পাতিয়া বসিল। কতদিন থাকিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই।

আজ সকালে শিলাবতীর কালো মুখ দেখিয়া চঞ্চরী ভয় পাইয়াছিল, ক্রমে ভয় কাটিয়াছে। সে ঘরে আসিয়া বোরকা খুলিয়া ফেলিল। উচ্ছলিত কণ্ঠে বলিল—'কী সুন্দর নগর! কত মানুষ, কত বাড়ি। কী উঁচু স্তম্ভ! আমি আর ফিরে যাব না, এখানেই থাকব।'

শিলাবতী শুষ্ক স্বরে বলিলেন—'সেই চেষ্টাই হচ্ছে।'

অপরাহ্ণে তাঁহারা আবার বাহির হইলেন। ময়ূর রাস্তার একটা চৌমাথায় তীর-ধনুকের খেলা দেখাইল। শূন্যে তীর ছুঁড়িয়া দ্বিতীয় তীর দিয়া ফিরাইয়া আনিল। চঞ্চরীর বোরকা-ঢাকা মাথায়

ডালিম রাখিয়া তীর দিয়া ডালিম বিদ্ধ করিল। অনেকগুলি দর্শক জুটিয়া গিয়াছিল, ময়ূর কিছু পয়সা পাইল।

পরদিন সকালে তাহারা আবার বাহির হইল। এবার ময়ূর নগরের অন্যদিকে গিয়া খেলা দেখাইল। ধীরে ধীরে তাহারা রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

অপরাহ্নে তাহারা প্রাসাদের আরও নিকটস্থ হইল। এখানে সিপাহী দর্শকের সংখ্যাই বেশি, কিছু সাধারণ নাগরিকও আছে। দুই-একটি প্রৌঢ়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছে।

খেলা দেখাইতে দেখাইতে ময়ূর লক্ষ্য করিল, ভিড়ের মধ্যে একজন লোক আছে যাহাকে সে পূর্বে দেখিয়াছে; খঞ্জ সাজিয়া যে তাহার মাথায় লাঠি মারিয়াছিল সেই মামুদ। মামুদকে সে চিনিতে পারিলেও মামুদ তাহাকে নূতন বেশভূষায় চিনিতে পারে নাই; শিলাবতীর গুণ্ঠন-ঢাকা মুখও দেখিতে পায় নাই। মামুদের খঞ্জভাব এখন আর নাই, সে একাগ্র চক্ষে খেলা দেখিতেছে। ময়ূর নির্বিকার মুখে খেলা দেখাইয়া চলিল।

ভিড়ের মধ্যে একটি স্থূলকায়া প্রৌঢ়া রমণী নিষ্পলক নেত্রে শিলাবতীর অর্ধাবগুণ্ঠিত মুখ দেখিতেছিল; ক্রমে শিলাবতীর দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। দুইজনের চক্ষু অনেকক্ষণ পরস্পরের মুখে সম্বদ্ধ হইয়া রহিল।

তীর-ধনুকের খেলা শেষ হইলে দর্শকের দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ময়ূর মাটি হইতে পয়সা কুড়াইতেছে এমন সময় মামুদ আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। মামুদের আকৃতি সরীসৃপের ন্যায়, চিবুকের নীচে চুটকি দাড়ি; পান চিবাইতে চিবাইতে দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল—'খাসা খেলা দেখিয়েছ। তুমি তো দিল্লীর লোক নও, মুলুক কোথায়?'

ময়ূর উত্তর দিল না, পয়সা কুড়াইয়া কোমরে রাখিল। মামুদ বলিল—'তা তুমি পাঠান মোগল উজবুক যে হও, আমার কি। কাছেই শরাবখানা আছে, চল না সেখানে খেলা দেখাবে। অনেক পয়সা পাবে।'

ময়ূর এবারও কথা বলিল না, শিলাবতীর দিকে তাকাইল। দেখিল, তিনি সেই স্থূলকায়া প্রৌঢ়া রমণীর সহিত কথা কহিতেছেন। দুই-চারিটি কথা বলিয়াই তিনি মুখ ফিরাইলেন, রমণী চলিয়া গেল।

মামুদ কিন্তু দমিবার পাত্র নয়, সে চঞ্চরীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'বোরকা-ঢাকা ওটি বুঝি তোমার বিবি? বিবি নিয়ে দিল্লীতে এসেছ, খুব সাবধান। এখানে খুবসুরৎ বিবি বেবাক চুরি যায়। তবে যদি ভাল মুসাফিরখানায় থাকো তাহলে ভয় নেই। আমি একটি ভাল মুসাফিরখানা জানি—'

ময়ূর ধনুতে শর-যোজনার ভান করিয়া বলিল—'বেশি কথা বললে পেট ফুটো করে দেব।'

মামুদ লাফাইয়া পশ্চাৎপদ হইল এবং দূরে দাঁড়াইয়া গলার মধ্যে গজগজ করিয়া বোধ করি তুর্কী ভাষায় খিস্তিখেউড় গাহিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, শিলাবতী ও চঞ্চরীকে লইয়া ময়ূর ফিরিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া ময়ূর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল মামুদ দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। সে একটু বিমনা হইল। মামুদ অতি নিম্নশ্রেণীর দুর্বৃত্ত, দিল্লীতে নবাগত ব্যক্তিদের ঠকাইয়া কিংবা সুবিধামত রাহাজানি করিয়া উদরপূর্তি করে; সে ময়ূরকে চিনিতে পারে নাই তাহা নিঃসন্দেহ, চিনিতে পারিলে তাহার কাছে ঘেঁষিত না। কিন্তু মামুদ ক্ষুদ্রপ্রাণী হইলেও তাহার সম্বন্ধে সাবধান থাকা আবশ্যক। ক্ষুদ্র প্রাণী অনেক সময় বৃহৎ কার্য ভ্রষ্ট করিয়া দিতে পারে।

গৃহে ফিরিয়া চঞ্চরী বোরকা খুলিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিলে ময়ূর চুপিচুপি শিলাবতীকে জিজ্ঞাসা করিল—'যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন সে কে?'

শিলাবতী মুখ টিপিয়া হাসিলেন—'কবুতর বিবি।'

রাত্রির আহারের পর চঞ্চরী ঘুমাইয়া পড়িলে শিলাবতী নিঃশব্দে ময়ূরের ঘরে আসিলেন, বলিলেন—'ময়ূর ভাই, আমি আবার বেরুব, কবুতর বিবির সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজ তুমি যেখানে খেলা দেখিয়েছিলে সেখানে সে আসবে।'

ময়ূর বলিল—'যাওয়া প্রয়োজন?'

শিলাবতী বলিলেন—'নিতান্ত প্রয়োজন।'

ময়ূর উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল—'কিন্তু আপনি একা যাবেন, চলুন, আমি সঙ্গে যাই।'

শিলাবতী বলিলেন—'না, চঞ্চরীকে একা রেখে যাওয়া নিরাপদ নয়। তুমি চিন্তা করো না, চাঁদের আলো আছে, আমি পথ চিনে যেতে পারব।'

শিলাবতী কৃষ্ণ বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকিয়া চলিয়া গেলেন। কবুতর বিবি হারেমের পুরাতন দাসী, যখন ইচ্ছা অন্দরে-বাহিরে যাতায়াত করে, কেহ তাহাকে বাধা দেয় না। শিলাবতী নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিলেন এক দেবদারু বৃক্ষের ছায়ায় কবুতর বিবি অপেক্ষা করিতেছে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শিলাবতী ফিরিলেন। ময়ূর ধনুর্বাণ লইয়া দালানে বসিয়া ছিল; হ্রস্বস্বরে দুইজনের কথা হইল। তারপর উভয়ে আশান্বিত মনে নিজ নিজ কক্ষে শয়ন করিতে গেলেন।

তিন

পরদিন সকালে ময়ূর খেলা দেখাইতে বাহির হইল না। বিকালে সাজসজ্জা করিয়া চঞ্চরী ও শিলাবতীকে লইয়া রাজপ্রাসাদের অভিমুখে চলিল। চঞ্চরীর দেহ বোরকায় ঢাকা, শিলাবতীর মাথায় ফলের ঝুড়ি।

প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে হারেম, প্রাকারবেষ্টিত মহলের কোলে প্রশস্ত অঙ্গন। অঙ্গনের দ্বারে কয়েকজন রক্ষী দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের কোমরে তরবারি, হাতে বল্লম। ময়ূরকে দেখিয়া একজন রক্ষী চিনিতে পারিল, সে পূর্বে ময়ূরের খেলা দেখিয়াছে। ময়ূর অগ্রবর্তী হইয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং নত হইয়া সেলাম করিল। সর্দার-রক্ষী বলিল—'কি চাও?'

ময়ূর সবিনয়ে বলিল—'যদি অনুমতি হয়, বেগম সাহেবাদের তীর-ধনুকের খেলা দেখাব।'

রক্ষীরা মুখ তাকাতাকি করিল, তারপর নিম্ন স্বরে পরামর্শ করিতে লাগিল। তীর-ধনুকের খেলা দেখিবার ঔৎসুক্য তাহাদের নিজেদেরই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এই বাজিকরকে অঙ্গনে আসিতে দেওয়া উচিত হইবে কি না, এই লইয়া তাহাদের মধ্যে তর্ক উঠিল। শেষে সর্দার-রক্ষী ময়ূরকে বলিল—'ভিতরে আসার হুকুম নেই, তুমি ফটকের সামনে খেলা দেখাও।'

ময়ূর মনে মনে একটু নিরাশ হইল, কিন্তু দ্বিরুক্তি না করিয়া ধনুকে গুণ পরাইতে প্রবৃত্ত হইল।

এই সময় এক অতি সুন্দরকান্তি যুবাপুরুষ রক্ষীদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষীরা সসম্ভ্রমে তসলিম্ করিল, একজন অস্ফুট স্বরে বলিল—'হজরৎ মালিক কাফুর।'

মালিক কাফুরকে আলাউদ্দিন বহু বর্ষ পূর্বে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিয়াছিলেন; এক হাজার স্বর্ণদীনার দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে কাফুরকে হাজারদীনারী খোজা বলিত। তারপর যুদ্ধে রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়া তিনি সুলতানের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন; আলাউদ্দিনের শেষ বয়সে কাফুর তাঁহার দক্ষিণহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁহার বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে, কিন্তু দেখিলে যুবক বলিয়া মনে হয়।

ময়ূরও মালিক কাফুরকে তস্‌লিম্ করিল, তারপর খেলা দেখাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে সে শূন্যে তীর ছুড়িয়া দ্বিতীয় তীর দিয়া প্রথম তীর ফিরাইয়া আনিল। মালিক কাফুর খেলা দেখিয়া বলিলেন—'এই খেলা আবার দেখাও।'

ময়ূর আবার খেলা দেখাইল। কাফুর তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'তোমরা অঙ্গনে এস, বেগম সাহেবারা খেলা দেখবেন।'

তখন চঞ্চরী ও শিলাবতীকে সঙ্গে লইয়া ময়ূর হারেমের প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইল। মালিক কাফুর অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। তিনি খোজা, অন্দরে তাঁহার অবাধ গতিবিধি।

ময়ূর দ্বিতীয় খেলা দেখাইল, চঞ্চরীকে বিশ হাত দূরে দাঁড় করাইয়া তাহার মাথায় ডালিম রাখিয়া তীর দিয়া ডালিম বিদ্ধ করিল। এই সময় হারেমের দ্বিতলের অলিন্দে বাতায়নে সূক্ষ্ম মলমলে ঢাকা রমণীমুখের আবির্ভাব হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে রূপের হাট বসিয়া গেল; নির্মেঘ আকাশে বিদ্যুৎ-বিলাস।

দ্বিতীয় খেলা শেষ করিয়া ময়ূর গুপ্ত কটাক্ষে দেখিল, একটি গবাক্ষে দুইজন পুরুষ দাঁড়াইয়াছে—একজন মালিক কাফুর, অন্যজন নিশ্চয় সুলতান আলাউদ্দিন। গবাক্ষপথে তাঁহাকে আবক্ষ দেখা যাইতেছে; বৃদ্ধ ছাগের মতো একটা মুখ, কিন্তু চক্ষে লালসার ধূমকলুষিত অগ্নি।

এইবার সময় উপস্থিত। ময়ূর শিলাবতীকে ইঙ্গিত করিল, শিলাবতী চঞ্চরীর বোরকা খুলিয়া লইলেন। চঞ্চরীর দেহে সূক্ষ্ম মলমলের বস্ত্র, সে রূপের পসরা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দাঁড়াইল। দর্শকেরা নিশ্বাস ফেলিতে ভুলিয়া গেল।

ময়ূর নির্লিপ্ত মুখে আরও দুই-একটা খেলা দেখাইল। শিলাবতীর ঝুড়ি হইতে তিনটি ডালিম লইয়া সে চঞ্চরীর মাথায় ও দুই হাতে রাখিল, তারপর তাহাকে হারেমের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড় করাইল। চঞ্চরী দুই হাত স্কন্ধের দুই পাশে রাখিয়া দাঁড়াইল; ময়ূর তাহার পিছনে বিশ হাত দূরে গিয়া ধনুতে তিনটি শর একসঙ্গে যোজনা করিল। একসঙ্গে তিনটি শরই ছুটিয়া গেল, তিনটি ডালিম একসঙ্গে তীরবিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িল।

দ্বিতলের অলিন্দে বাতায়ন হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বৃষ্টি হইল। ময়ূর সেলাম করিতে করিতে মুদ্রাগুলি কুড়াইতেছে এমন সময় মালিক কাফুর নামিয়া আসিলেন। ময়ূরের পানে অবহেলাভরে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'এই বিবিকে সুলতান দেখতে চান। তুমি অপেক্ষা কর।' চঞ্চরীর হাত ধরিয়া কাফুর হারেমে লইয়া চলিলেন। চঞ্চরী আপত্তি করিল না, কাফুরের সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া তাহার অধরে হাসির বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে লাগিল।

ময়ূর যেন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে এমনিভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর শিলাবতীর পাশে গিয়া বসিল। শিলাবতীর মুখ অর্ধাবগুণ্ঠিত, তিনি খর্বকণ্ঠে বলিলেন—'ওষুধ ধরেছে।'

ময়ূর জিজ্ঞাসা করিল—'ওই বৃদ্ধই আলাউদ্দিন?'

শিলাবতী বলিলেন—'হাঁ।'

ময়ূর আর-একবার আলাউদ্দিনের দিকে তাকাইল। ইচ্ছা করিলেই সে আলাউদ্দিনকে হত্যা করিতে পারে, বিদ্যুদ্বেগে তীর-ধনুক লইয়া লক্ষ্যবেধ করা, কেবল একটি টঙ্কার শব্দ। আলাউদ্দিন নড়িবার সময় পাইবে না—

খেলা শেষ হইয়াছে দেখিয়া বাতায়ন হইতে সুন্দর মুখগুলি অপসৃত হইল, রক্ষীরা স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। দ্বারের বাহিরে রাস্তার উপর কিছু নাগরিক তামাসা দেখিবার জন্য জমা হইয়াছিল, তাহারা অধিকাংশ ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িল; দুই-চারি জন নিষ্কর্মা লোক আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শিলাবতী বলিলেন—'তুমি থাকো, আমি ফিরে যাই। আজ রাত্রে কবুতর বিবির সঙ্গে আবার

দেখা করতে হবে।' ফলের ঝুড়ি মাথায় লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ময়ূর আরও কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর মালিক কাফুর ফিরিয়া আসিলেন, ময়ূরের হাতে এক মুঠি মোহর দিয়া সদয় কণ্ঠে বলিলেন—'এই নাও তোমার বক্‌শিস্। বিবির জন্যে ভেবো না, সে সুলতানের কাছে সুখে থাকবে।'

মালিক কাফুর চলিয়া গেলেন। ময়ূর মোহরগুলির পানে তাকাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর সেগুলি কোমরে রাখিয়া ধনুর্বাণ হাতে নতমুখে হারেমের দেউড়ি পার হইয়া গেল।

সে পথে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে, পিছন হইতে কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল—'কী দোস্ত। বলেছিলাম কিনা, দিল্লীতে বৌ চুরি যায়।' মামুদ পিছন হইতে আসিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, সহানুভূতিসিক্ত কণ্ঠে বলিল—'দুঃখ কোরো না, যা বক্‌শিস্ পেয়েছ তাতে চারটে বিবি কিনতে পারবে। এখন চল শরাবখানায়, দু' পেয়ালা টানলেই মেজাজ দুরস্ত হয়ে যাবে।'

ময়ূরের একবার ইচ্ছা হইল চঞ্চরীর দেহের মূল্য মোহরগুলা মামুদের হাতে দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেয়। সে তো এইজন্যই পিছনে লাগিয়া আছে। কিন্তু তাহা করিলে দুর্জনকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ময়ূর রুখিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'আমার মেজাজ ভাল নেই। বিরক্ত কোরো না, বিপদে পড়বে।'

মামুদ অমনি পিছাইয়া গেল। সে অত্যন্ত ভীরু, ময়ূরের মতো তীরন্দাজকে বেশি ঘাঁটাইতে সাহস করে না। কিন্তু সে ময়ূরের হাতে সোনা দেখিয়াছে, সহজে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াও মামুদের পক্ষে অসম্ভব।

রাত্রে আহারাদি সমাপ্ত হইলে শিলাবতী বলিলেন—'অর্ধেক কাজ শেষ হয়েছে, এখনো অর্ধেক কাজ বাকি।'

ময়ূর প্রশ্ন করিল—'কবুতর বিবি পায়রা ধরতে পারবে তো?'

'প্রাসাদের ছাদে পায়রার খোপ, রাত্রে সহজেই ধরা যাবে।'

রাত্রি গভীর হইলে শিলাবতী বাহির হইলেন। আজ আর ময়ূরের গৃহে থাকিয়া পাহারা দিবার প্রয়োজন নাই, সেও তীর-ধনুক লইয়া শিলাবতীর সঙ্গে চলিল। চঞ্চরীর কথা ভাবিয়া তাহার একটা নিশ্বাস পড়িল। চঞ্চরীর ভাগ্যে কি আছে কে জানে। তাহার বুদ্ধি বেশি নাই, হয়তো বেশি দুঃখ পাইবে না।

পথ জনহীন, আকাশে আধখানা চাঁদ। দুইজনে পথ চলিতে চলিতে অনুভব করিলেন, কেহ দূরে থাকিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে। ময়ূরের মুখে ক্রোধের ভ্রূকুটি দেখা দিল, সে চাপা গলায় বলিল—'হতভাগা মামুদ।'

শিলাবতী বলিলেন—'ও যদি জানতে পারে হারেমের দাসীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে, কবুতর বিবি বিপদে পড়তে পারে।'

ময়ূর বলিল—'আমি ব্যবস্থা করছি।'

সে পিছনে ফিরিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না; কিন্তু নিস্তব্ধ বাতাসে সন্তর্পণে পদশব্দ শুনিতে পাইল। তখন সে শিলাবতীর হাত ধরিয়া টানিয়া একটি গৃহের ছায়াতলে লুকাইল। চাঁদের আলোয় ছায়া বড় গাঢ় হয়; ময়ূর ধনুকে শরসংযোগ করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে দূরে একটি মানুষ আসিতেছে দেখা গেল। আরও কাছে আসিলে ময়ূর দেখিল মামুদই বটে। তখন সে আকর্ণ ধনু টানিয়া শর নিক্ষেপ করিল।

মরণাহত কুক্কুরের মতো একটা বিকট চিৎকার। মামুদ রাস্তায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

শিলাবতী বলিলেন—'মরে গেল নাকি ?'

ময়ূর বলিল—'না, উরুতে মেরেছি। ওকে সত্যসত্যই খোঁড়া করে দিলাম। কিন্তু এখানে আর নয়, হয়তো লোকজন এসে পড়বে।'

কিন্তু দিল্লীর অধিবাসীরা বুদ্ধিমান, দ্বিপ্রহর রাত্রে অতিবড় বিকট শব্দ শুনিলেও ঘরের বাহির হয় না। ময়ূর ও শিলাবতী মামুদের বিলীয়মান কাতরোক্তি শুনিতে শুনিতে চলিলেন। দেবদারু বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কবুতর বিবি দাঁড়াইয়া আছে।

চুপিচুপি কথা হইল। কবুতর বিবি কোঁচড় হইতে একটি ধূম্রবর্ণ কপোত বাহির করিয়া দিল। একটু পাখার ঝটপট শব্দ, শিলাবতী কপোতটিকে নিজ বস্ত্রমধ্যে লুকাইলেন। ময়ূর মালিক কাফুরের নিকট যত স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিল সমস্ত কবুতর বিবির হাতে দিল। শিলাবতী কবুতর বিবির গণ্ডে চুম্বন করিলেন, উভয়ের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। তারপর কবুতর বিবি ছায়ার মতো হারেমের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বৃক্ষচ্ছায়াতলে দাঁড়াইয়া ময়ূর বলিল—'আর বাসায় ফিরে গিয়ে কাজ নেই। চলুন, নগরের দক্ষিণ দরজার কাছে লুকিয়ে থাকি, দরজা খুললে বেরিয়ে যাব। দিল্লীতে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে।'

পরদিন পান্থশালায় ফিরিয়া গিয়া ময়ূর আরও সাতদিন সেখানে রহিল ; তারপর কপোতের পায়ে জতুনিবদ্ধ পত্র বাঁধিয়া কপোতকে উড়াইয়া দিল। অভ্রান্ত কপোত একবার চক্রাকারে ঘুরিয়া দিল্লীর দিকে উড়িয়া চলিল। ময়ূর মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইল, কপোত রাজপ্রাসাদের চূড়ায় গিয়া বসিয়াছে, কোনও পরিচারিকা তাহার পায়ে পত্র বাঁধা আছে দেখিয়া সুলতানকে খবর দিল। তারপর সুলতান আলাউদ্দিনই সেই পত্র পড়িলেন।

দুরাচারীর পাপজর্জরিত জীবনের চরম পরিণাম।

ইহার পর আলাউদ্দিন বিকৃত মস্তিষ্ক ও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিন বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য।

চার

চৈত্র মাসের শেষে একদা রাত্রিকালে রাজা ভূপ সিংহ প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া একাকী পাদচারণ করিতেছিলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি চন্দ্রহীন ; পঞ্চমী তিথির চাঁদ বিলম্বে উঠিবে। নক্ষত্র-বিকীর্ণ স্বল্পান্ধকারে পরিক্রমণ করিতে করিতে রাজা চিন্তা করিতেছিলেন।

মাত্র কয়েক মাস পূর্বে চঞ্চরীকে লইয়া ময়ূর দিল্লী গিয়াছে, এখনও তাহার ফিরিবার সময় হয় নাই। কিন্তু সকলের মনেই উদ্বেগপূর্ণ প্রতীক্ষা, সকলেই যেন অন্যমনস্ক। রাজসংসারের ভৃত্যপরিজন নিঃশব্দে কাজ করিয়া যায়, কাহারও মুখে হাসি নাই। সীমন্তিনীর মুখে শীর্ণ কঠিনতা ; রাজকুমারী সোমশুক্লা দিন দিন যেন শুকাইয়া যাইতেছেন। রাজা মনে মনে ভাবিতেছেন—এই তাহার শেষ চেষ্টা, এ চেষ্টা যদি নিষ্ফল হয়, আর কিছু করিবার নাই। ময়ূর কি পারিবে ? যদি না পারে—

সম্প্রতি রাজার মনে একটু নির্বেদের ভাব আসিয়াছে। প্রতিহিংসা কি এতই বড় ! যদি তাঁহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ না হয় তাহাতেই বা কি ? সূর্য-চন্দ্রের গতি রুদ্ধ হইবে না। তিনি একদিন মরিবেন, মহাপাপী আলাউদ্দিনও মরিবে ; তখন প্রতিহিংসা কোথায় থাকিবে ? জীবন অনিত্য, হিংসাদ্বেষ অনিত্য ; মৃত্যুই পরম অবসান।

পূর্বাকাশে পীতাভ খণ্ডচন্দ্র উদয় হইল। রাজপুরী সুপ্ত, নগর সুপ্ত, পৃথিবীও সুপ্ত। এই সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে মহাপ্রকৃতি যেন দীপ জ্বালিয়া দিয়াছে। এই পরম মুহূর্তেও কি মানুষের মনে হিংসাদ্বেষ আছে ! হায়, সংসারে যদি হিংসাদ্বেষ না থাকিত !

ময়ূর কি ফিরিয়া আসিবে ? তাহার প্রতি ভূপ সিংহের স্নেহ জন্মিয়াছিল, বিশ্বাস জন্মিয়াছিল ; সে যদি ফিরিয়া না আসে, যদি রামরুদ্রের মতো সেও ঘাতকের হস্তে হত হয়—

নিস্তব্ধ বাতাসে অশ্বের ক্ষীণ হ্রেষাধ্বনি শুনিয়া রাজা সেই দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। রাজপুরীর সম্মুখ পথ দিয়া একদল লোক আসিতেছে। রাজার চোখের দৃষ্টি এখনও তীক্ষ্ণ আছে, তিনি দেখিলেন যাহারা আসিতেছে তাহাদের মধ্যে একটা দোলা এবং একজন অশ্বারোহী রহিয়াছে। রাজা রুদ্ধশ্বাসে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর দ্রুত ছাদ হইতে নামিতে লাগিলেন। নিশ্চয় ময়ূর ফিরিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে দোলা কেন ? তবে কি চঞ্চরীকে ফিরাইয়া আনিয়াছে !

দ্বিতলে অবতরণ করিলে কুমারী সোমশুক্লা পিছন হইতে চকিতস্বরে ডাকিলেন—'পিতা !' কিন্তু রাজা শুনিতে পাইলেন না।

ময়ূর প্রাসাদ সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। রাজা একাকী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া বলিল—'আর্য, আমি ফিরে এসেছি। কার্যসিদ্ধি হয়েছে।'

কার্যসিদ্ধির কথা রাজার কানে পৌঁছিল কিনা সন্দেহ ; তিনি কম্পিত স্বরে বলিলেন—'দোলায় কে ?'

ময়ূর বলিল—'একটি স্ত্রীলোক আপনার দর্শন চায়, তাকে সঙ্গে এনেছি। মহারাজ, আপনি নিজ কক্ষে গিয়ে বসুন, আমি এখনি দর্শনপ্রার্থিনীকে নিয়ে আসছি।'

রাজা কক্ষে গিয়া স্বয়ং দীপ জ্বালিলেন, তারপর ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহমনের সমস্ত শক্তি যেন ফুরাইয়া গিয়াছে, স্নায়ুমণ্ডল আলোড়িত হইতেছে। ময়ূর কাহাকে সঙ্গে আনিয়াছে ? কে তাঁহার দর্শনপ্রার্থিনী ?

ময়ূর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে কৃষ্ণাননা একটি স্ত্রীলোক। দ্বারের কাছে ক্ষণকাল ন যযৌ ন তস্থৌ থাকিয়া স্ত্রীলোকটি ছুটিয়া আসিয়া রাজার পদপ্রান্তে পড়িল, অবরুদ্ধস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—'পিতা, আমাকে কি গৃহে স্থান দেবেন ? আমি দাসী হয়ে থাকব, আমার পরিচয় কেউ জানবে না—'

রাজা পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় ক্ষণেক নিশ্চল রহিলেন, তারপর উন্মত্তবৎ চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'শিলা ! শিলা !'

ময়ূর দ্বারের কাছে প্রহরীর ন্যায় ঋজুদেহে দাঁড়াইয়া রহিল। শিলাবতী প্রথমে ময়ূরের সঙ্গে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিতে চাহেন নাই, বলিয়াছিলেন—'আমি ভ্রষ্টা ধর্মচ্যুতা, আমাকে গৃহে স্থান দিলে পিতার কলঙ্ক হবে। তিনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন ?' ময়ূর বলিয়াছিল—'যদি গ্রহণ না করেন আমরা দুই ভাই-বোন অন্য কোথাও চলে যাব। বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে কি দু'টি মানুষের স্থান হবে না ?' তখন শিলাবতী সম্মত হইয়াছিলেন।

ময়ূর চাহিয়া দেখিল, রাজার বাহ্যজ্ঞান নাই, তিনি কন্যাকে শিশুর মতো আদর করিতেছেন—'মা আমার ! মা আমার ! কন্যা ! কন্যা ! কন্যা !'

ময়ূর একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। এই হৃদয়াবেগ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়াই ভাল। সে দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, আবার ইতস্তত করিতেছে, এমন সময় কেহ তাহার হস্ত স্পর্শ করিল। ময়ূর ফিরিয়া দেখিল, সোমশুক্লা !

সোমশুক্লার মুখ ঈষৎ কৃশ, চোখের কোলে ছায়া, কিন্তু তাঁহার হাসি দেখিয়া ময়ূরের মনে হইল ইহার অধিক পুরস্কার বুঝি পৃথিবীতে আর নাই। সে কুমারীর হাত ধরিয়া উদ্যানে লইয়া গেল।

চাঁদ আর একটু উপরে উঠিয়াছে, আর একটু উজ্জ্বল হইয়াছে। চন্দ্রালোকে দুইজনে পরস্পরের মুখ দেখিলেন, তারপর সোমশুক্লা ভঙ্গুর কণ্ঠে বলিলেন—'ভাল ছিলে ?'

এই কয়েক মাসের অদর্শন যেন তাঁহাদের মনের ব্যবধান সরাইয়া দিয়াছে, প্রকৃত সম্বন্ধ জানাইয়া দিয়াছে। ময়ূর বলিল—'তোমার শঙ্খ আমার সমস্ত বিঘ্ন দূর করেছে, অতি সহজে কার্যসিদ্ধি হয়েছে। এবার তোমার শঙ্খ তুমি ফিরিয়ে নাও।'

ময়ূর বক্ষ হইতে শঙ্খ লইয়া শুক্লার সম্মুখে ধরিল। শুক্লা হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—'তুমি পরিয়ে দাও।'

তারপর কতক্ষণ কাটিয়া গেল কেহ জানিল না। একটি বৃক্ষশাখায় একদল পাখি সমস্বরে কলকূজন করিয়া আবার নীরব হইল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে।

ময়ূর বলিল—'আমি যাই।'

শুক্লা জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় যাবে ?'

ময়ূর বলিল—'রাজার কাছে। তিনি বলেছিলেন যদি কার্যসিদ্ধি হয়, আমাকে অদেয় তাঁর কিছুই থাকবে না। তাই পুরস্কার চাইতে যাচ্ছি।'

রাজা আপন কক্ষে ঋজু দেহে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার মুখ প্রফুল্ল, মনে হয় দশ বছর বয়স কমিয়া গিয়াছে। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র শান্ত হইয়াছে। ময়ূর প্রবেশ করিতেই তিনি অধরে অঙ্গুলি রাখিয়া ইঙ্গিত করিলেন, পাশের দীপহীন কক্ষে ভূমিশয্যায় পড়িয়া শিলাবতী ঘুমাইতেছেন, যেন সতেরো বছরের পুঞ্জীভূত গ্লানি নিদ্রার কোলে নামাইয়া দিয়াছেন।

রাজা চুপিচুপি বলিলেন—'শিলা ঘুমিয়ে পড়েছে। ও আমার কাছে এই রাজভবনেই থাকবে। সাবধান, ওর প্রকৃত পরিচয় যেন কেউ জানতে না পারে। তুমি ওকে দিল্লী থেকে এনেছ এই ওর একমাত্র পরিচয়।'

ময়ূর বলিল—'তাই হবে আর্য। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরা।'

রাজা তখন ময়ূরের স্কন্ধে হাত রাখিয়া গভীর প্রীতিভরে বলিলেন—'বৎস, তুমি আমার পুত্রের তুল্য। তোমাকে যে কাজ দিয়েছিলাম তার শতগুণ কাজ তুমি করেছ। কি পুরস্কার চাও বল।'

ময়ূর ধীরে ধীরে বলিল—'মহারাজ, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে আমি আপনার কাছে কুমারী সোমশুক্লার পাণি প্রার্থনা করি।'

রাজা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন—'সোমশুক্লা, কিন্তু—কিন্তু—'

ময়ূর বলিল—'তিনি আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জানেন। তাঁর অমত নেই।'

রাজা বলিলেন—'কিন্তু—তুমি অজ্ঞাতকুলশীল। তোমার সঙ্গে শুক্লার বিবাহ দিলে সপ্তমপুরের রাজাদের কাছে তোমার কী পরিচয় দেব ?'

ময়ূর নীরব রহিল। রাজা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর জামাতাই রাজ্য পাইবে। ময়ূরের মতো যোগ্য উত্তরাধিকারী কোথায় পাওয়া যাইবে ? কিন্তু তবু—অজ্ঞাতকুলশীল—। শীল রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। উচ্চকুলশীল দুরাচার লম্পটের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইলে কেহ নিন্দা করে না—কিন্তু—

রাজা বলিলেন—'অন্য কোনো পুরস্কার চাও না ?'

'না আর্য।'

রাজা গুম্ফ আকর্ষণ করিতে করিতে আবার চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

কক্ষের বাহিরে তখন প্রভাত হইয়াছে। ঘরের প্রদীপ ম্লান হইয়াছে, রাজপুরী যে জাগিয়া উঠিতেছে তাহার শব্দ আসিতেছে।

সহসা ভট্ট নাগেশ্বর দ্বারের কাছে আবির্ভূত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'হা হতোস্মি। একি

বয়সা, রাত্রে কি নিদ্রা যাননি ?' বলিয়াই ময়ূরকে দেখিয়া থামিয়া গেলেন। পাশের ঘরে সুপ্তা শিলাবতীকে তিনি দেখিতে পাইলেন না।

রাজা যেন অকূলে কূল পাইলেন, হাত বাড়াইয়া বলিলেন 'এস বয়স্য।—ময়ূর, যাও বৎস, তুমি নাগেশ্বরের গৃহে গিয়ে বিশ্রাম কর। সন্ধ্যার পর এস।'

ময়ূর প্রস্থান করিলে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া ভট্ট নাগেশ্বরকে বলিলেন—'চল বয়স্য, ছাদে যাওয়া যাক, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। তুমি অবশ্য ঘোর মূর্খ, তোমার পরামর্শের কোনো মূল্য নেই, কিন্তু মূর্খের মুখ থেকে কদাচ জ্ঞানের কথা বাহির হতে পারে।' বলিয়া তিনি উচ্চহাস্য করিলেন।

দুই দিন পরে ভূপ সিংহ সাজসজ্জা করিয়া বিদেশ যাত্রা করিলেন। তাঁহার গন্তব্যস্থান সপ্তমপুর।

বয়স্যকে লইয়া রাজা চতুর্দোলায় উঠিলেন। সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে ময়ূর ও দশজন রক্ষী।

সপ্তমপুরের অপুত্রক রাজা সূর্যবর্মা বন্ধুকে পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। ভূপ সিংহ তাঁহার আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া বলিলেন—'ভাই, আমার কন্যা সোমশুক্লার সঙ্গে একটি যুবকের বিবাহ স্থির করেছি। যুবকটি অতি সৎপাত্র, কিন্তু নামগোত্রহীন ; তুমি তাকে দত্তক নেবে এই প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। চল, অন্তরালে তোমাকে সব কথা বলি।'—

দু'মাস পরে সপ্তমপুরের যুবরাজ ময়ূরবর্মার সহিত পঞ্চমপুরের রাজকন্যা সোমশুক্লার বিবাহ হইল।

৪ জুলাই ১৯৬২



রেবা রোধসি

শেষ পর্যন্ত রাজপুত্র তূণীরবর্মাকে রাজ্য হইতে নির্বাসন দিতে হইল। রাজা শিববর্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ইন্দ্রবর্মাকে ডাকিয়া বলিলেন—'তূণীর যে অপরাধ করেছে তাতে মৃত্যুই তার একমাত্র দণ্ড। কিন্তু সে আমার পুত্র, তাকে চরম দণ্ড দিতে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে। তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো। তাকে বলে দিও, আমি তার মুখদর্শন করতে চাই না, সে যেন আর কখনও এ রাজ্যে পদার্পণ না করে।'

যুবরাজ ইন্দ্রবর্মা বিষণ্ণ মুখে বলিলেন—'যথা আজ্ঞা আর্য।'

ন্যূনাধিক সাত শত বছর পূর্বে নর্মদার উত্তর তীরে মহেশগড় নামে এক রাজ্য ছিল। রাজ্য আকারে বৃহৎ নয়, কিন্তু সমৃদ্ধিশালী। কয়েক বছর আগে আলাউদ্দিন খিল্‌জি যখন দেবগিরি রাজ্য লুণ্ঠনের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তখন তিনি মহেশগড় রাজ্যের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, রাজ্যে প্রবেশ করেন নাই ; কিন্তু তদবধি নর্মদা অববাহিকার রাজ্যগুলিতে শঙ্কা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছিল। যবন জাতি অতি কপট ও নিষ্ঠুর ; তাহারা বিশ্বাসঘাতক, বন্ধুত্বের ভান করিয়া সদ্ভাবপ্রতিপন্নকে হত্যা করে। যবন সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

মহেশগড় রাজ্যেও এই সন্ত্রাসের ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। রাজশক্তি সৈন্যদল গঠন করিয়া

আততায়ীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু বছরের পর বছর কাটিয়া গেল, যবনেরা ফিরিয়া আসিল না। ধীরে ধীরে অলক্ষিতে সতর্কতাও শিথিল হইতে লাগিল। সৈন্যদল হ্রাস পাইল, রাজপুরুষেরা বাহিরের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র কূটনৈতিক খেলায় মনোনিবেশ করিলেন।

ভারতের ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বারংবার ঘটিয়াছে। শত্রু চোখের আড়াল হইলেই মনের আড়াল হইয়া যায়। আবার যখন শত্রু আচম্বিতে ফিরিয়া আসে তখন তাহা অপ্রত্যাশিত উৎপাত বলিয়া মনে হয়। আমরা অতীতকে বড় সহজে ভুলিয়া যাই, তাই বোধহয় আমাদের ইতিহাসের প্রতি আসক্তি নাই।

মহেশগড়ের রাজা শিববর্মার বয়স হইয়াছে। সেকালে রাজাদের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, যিনি যতগুলি রাজকন্যা ঘরে আনিলেন তাঁহার মর্যাদা তত বেশি। শিববর্মার সাতটি মহিষী, পুত্রসংখ্যা ত্রিশের ঊর্ধ্বে। তন্মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, অন্য রাজকুমারদের কোনও কর্ম নাই। তাঁহারা আহার বিহার মৃগয়া এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়া জীবনযাপন করেন। পুরুষানুক্রমে এই উদ্বৃত্ত রাজপুত্রেরা এবং তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রেরা রাজপুত জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহজাত ক্ষাত্রতেজ ছিল; তাই অদ্যাপি রাজপুত পুরুষের শৌর্যবীর্য বাহুবল ভুবনবিখ্যাত এবং রাজপুত রমণীর গতিছন্দে রাজরানীর গর্ব সুপরিস্ফুট।

তূণীরবর্মা রাজা শিববর্মার তৃতীয় মহিষীর গর্ভজাত চতুর্থ পুত্র। তিনি কোনোকালে রাজা হইবেন সে সম্ভাবনা নাই। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বভাব দুরন্ত ও দুঃশীল, কেহ তাঁহাকে শাসন করিতে পারিত না। তারপর তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন তাহার স্বভাব আরও প্রচণ্ড ও দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর, দেহ তেমনই বলশালী, তাঁহার প্রতিকূলতা করিতে কেহ সাহস করে না; উৎসর্গীকৃত বৃষের ন্যায় তিনি স্বচ্ছন্দচারী হইয়া উঠিলেন। ভোগব্যসনে তাঁহার রুচি রাজকবি ভর্তৃহরির পন্থা অবলম্বন করিল। জীবনে ভোগ্যবস্তু যদি কিছু থাকে তবে তাহা মৃগয়া এবং নারীর যৌবন। যৌবনং বা বনং বা।

রাজপুত্রেরা কেহই শান্তশিষ্ট মিতাচারী হন না; কিন্তু তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্রা অতিক্রম করিলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়। তূণীরবর্মার আচার-আচরণ লইয়া রাজার নিকট নিত্য অনুযোগ অভিযোগ আসিতে লাগিল। রাজা পুত্রকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। অবশেষে তূণীরবর্মা এক অমার্জনীয় অপরাধ করিয়া বসিলেন; এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তরুণী ভার্যাকে অপহরণ করিলেন।

মহাপাতকের মার্জনা নাই। রাজা পুত্রকে কারারুদ্ধ করিলেন, তারপর তাহার নির্বাসনের আদেশ দিলেন।

কারাগার হইতে তূণীরবর্মাকে মুক্ত করিয়া যুবরাজ তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন, স্বয়ং অন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া নগরদ্বারের অভিমুখে চলিলেন। আগে পিছে দুই দল ধনুর্ধর রক্ষী চলিল।

রাজপথের দুই পাশে নাগরিকের ভিড় জমিয়াছে। অধিকাংশই নীরব, ক্বচিৎ কেহ ধিক্ ধিক্ বলিয়া তিরস্কার জানাইতেছে। তূণীরবর্মার মুখে কখনও হিংস্র ভ্রূকুটি, কখনও খরশান ব্যঙ্গহাস্য। তিনি পাশে মুখ ফিরাইয়া যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ— বধ্যভূমিতে?'

ইন্দ্রবর্মা ধীর স্বরে বলিলেন—'না। মহারাজ তোমাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছেন।'

তূণীরবর্মার অধর বিদ্রূপে বঙ্কিম হইয়া উঠিল, তিনি বিকৃত হাস্য করিয়া বলিলেন—'অসীম করুণা মহারাজের। তোমার যদি অধিকার থাকত তুমি বোধহয় আমার প্রাণদণ্ড দিতে।'

ইন্দ্রবর্মা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিলেন, উত্তর দিলেন না।

নগর হইতে রাজ্যের সীমান্ত বহু দূরে। নগর ছাড়াইয়া তাঁহারা নর্মদার তীর ধরিয়া পূর্বমুখে চলিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরে রাজ্যের সীমান্তস্তম্ভ দেখা গেল। সীমান্তস্তম্ভের নিকট আসিয়া ইন্দ্রবর্মা অশ্ব স্থগিত করিলেন, একটি কোষবদ্ধ তরবারি তূণীরবর্মার হাতে দিলেন, স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন—'ভাই, এই অশ্ব এবং এই তরবারিমাত্র এখন তোমার সম্পত্তি। রাজার আদেশে তুমি নির্বাসিত হয়েছ ; কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার ভুজবলই তোমার ভাগ্য। যাও, আর কখনও এ রাজ্যে ফিরে এসো না। কিন্তু মাঝে মাঝে মাতৃভূমিকে স্মরণ কোরো।'

তূণীরবর্মা তীব্রতিক্ত ব্যঙ্গহাস্য করিয়া বলিলেন—'মাতৃভূমি ! মহেশগড় আমার মাতৃভূমি নয়, বিমাতৃভূমি। এখানে সবাই আমার শত্রু। যদি কোনও দিন ফিরে আসি, একা ফিরব না, এই তরবারি হাতে নিয়ে ফিরে আসব।'

ইন্দ্রবর্মা জানিতেন, ইহা ক্রোধের আস্ফালন মাত্র, তিনি দুর্মদ সাহসী ও হঠকারী, কিন্তু সৈন্যদল গঠন করিয়া তাহার নেতৃত্ব করা তূণীরবর্মার সাধ্যাতীত। ইন্দ্রবর্মা শান্ত ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—'ছিঃ তূণীর ভাই, তুমি রাজপুত্র, নিজের বংশে কলঙ্কারোপ কোরো না।'

তূণীরবর্মা চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'আমার বংশ নাই, মাতৃভূমি নাই। পৃথিবীতে আমি একা।' বলিয়া তিনি ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া পূর্বদিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

সে-রাত্রি তূণীরবর্মা নর্মদাতীরের এক বৃক্ষতলে কাটাইলেন, পরদিন আবার পূর্বমুখে চলিলেন। নর্মদার তীর কখনও সমতল, কখনও শৈলবন্ধুর। কদাচিৎ দুই-একটি আরণ্যক জাতির গ্রাম। গ্রাম হইতে খাদ্য মিলিল।

দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তূণীরবর্মা একটি গ্রামের নিকটবর্তী হইলেন ; দেখিলেন, নদীসৈকতে কয়েকটি আটবিক জাতীয়া যুবতী গান গাহিয়া গাহিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নিরাবরণ বক্ষে বনজ ফুলের মালা, কেশকুণ্ডলিতে শিখিচূড়া।

তূণীরবর্মা অশ্ব দাঁড় করাইয়া দেখিতে লাগিলেন, তারপর অশ্ব হইতে নামিয়া যুবতীদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। যুবতীরা ভয় পাইল না, খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একটি যুবতী হাসিল না, কাছে আসিয়া তূণীরবর্মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর নিজের গলার মালা খুলিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিল।

অন্য যুবতীরা কলহাস্য করিতে করিতে ছুটিয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

তূণীরবর্মা যুবতীকে হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইলেন, স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নাম কি ?'

যুবতী স্নিগ্ধ চক্ষু দুটি তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—'রেবা।'

কিছুক্ষণ পরে একদল আটবিক পুরুষ ভল্ল লইয়া উপস্থিত হইল, তূণীরবর্মাকে নিরীক্ষণ করিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল—'এ কে ?'

যুবতী বলিল—'ওর গলায় আমি মালা দিয়েছি, ও আমার পুরুষ।'

পুরুষেরা তখন তূণীরবর্মাকে প্রশ্ন করিল—'তুমি কে ?'

তূণীরবর্মা তরবারির মুষ্টিতে হাত রাখিয়া বলিলেন—'আমি রাজপুত্র।'

পুরুষদের মধ্যে যে সর্বাধিক বয়স্ক সে বলিল—'রাজপুত্র ! এখানে এসেছ কেন ?'

তূণীরবর্মা বলিলেন—'আমাকে কেউ ভালবাসে না, তাই রাজ্য ছেড়ে এসেছি।'

পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি আমাদের গ্রামে থাকবে ?'

তূণীরবর্মা বলিলেন—'থাকব।'

গ্রামের একান্তে নর্মদার তীরে কুটির বাঁধিয়া তূণীরবর্মা রহিলেন। রেবা এই নূতন ঘরের ঘরনী।

রেবার শ্যামল দেহটি যেমন পরম কমনীয়, তাহার মনও তেমনি শান্ত-স্নিগ্ধ প্রসন্ন। তূণীরবর্মা এমন রমণী পূর্বে দেখেন নাই ; নাগরিকা রমণীদের অন্তরে ক্ষুধা অধিক, তৃপ্তি কম। তূণীরবর্মা রেবাকে লইয়া সুখের সলিলে নিমজ্জিত হইলেন।

আটবিকদের জীবনে অধিক বৈচিত্র্য নাই ; তাহারা অল্প চাষবাস করে, নদীতে মাছ ধরে, ধনুর্বাণ লইয়া বনে শিকার করে। মহুয়া এবং বনমধু হইতে আসব প্রস্তুত করিয়া তাহারা পান করে, নেশায় মত্ত হইয়া নৃত্যগীতে মাতামাতি করিতে করিতে কে কাহার স্ত্রী, কে কাহার পুরুষ ভুলিয়া যায়। আদিম অনিরুদ্ধ তাহাদের জীবন, সংস্কারের বন্ধনে তাহাদের মন পঙ্গু হইয়া যায় নাই।

তূণীরবর্মার মনে চিন্তা নাই ; তিনি যখন ইচ্ছা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটেন, তাঁহার বলিষ্ঠ বাহুক্ষেপে নর্মদার জল তোলপাড় হয়। কখনও তিনি তীরে বসিয়া অলসভাবে মাছ ধরেন। কখনও বা গ্রামের যুবকদের সঙ্গে বনে গিয়া ময়ূর হরিণ বরাহ শিকার করিয়া আনেন। আটবিকদের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহারাও রাজপুতকে আপন করিয়া লইয়াছে। তূণীরবর্মা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, অন্তরে তিনি বন্য আটবিক মানুষ, এই জীবনই তাঁহার প্রকৃত জীবন ; এতদিনে তিনি স্বক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন। নাগরিক জীবনযাত্রার জন্য তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্র পিপাসা নাই।

ক্বচিৎ সূর্যাস্তকালে নর্মদাসৈকতে একাকী বসিয়া নানা জল্পনা তাঁহার মনে উদয় হয়। নদীর স্রোত পশ্চিমদিকে বহিয়া চলিয়াছে ; এখন যে-জল এখানে বহিতেছে সেই জল হয়তো কাল প্রাতঃকালে মহেশগড় নগরের পাশ দিয়া বহিয়া যাইবে। মহেশগড়ের কথা স্মরণ হইলেই তাঁহার মন বিমুখ হয়। তিনি ভাবেন, মহেশগড় আমার জন্মভূমি নয়, মহেশগড়ের মানুষ আমার আপনজন নয়। এই নদীতীরস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম তাঁহার আপন স্থান, এই বন্য অর্ধনগ্ন মানুষগুলি তাঁহার পরমাত্মীয়, রেবা নাম্নী ওই শ্যামলী মেয়েটি তাঁহার অন্তরতমা। জীবনে তিনি আর কিছু চাহেন না।

এইভাবে দিন কাটিতে থাকে। বৎসরাধিক কাল অতীত হইয়া যায়।

একদিন হেমন্তের দ্বিপ্রহরে তূণীরবর্মা রেবাকে বলিলেন—'চল্ রেবা, বনে শিকার করতে যাই।'

রেবা উল্লসিত হইয়া বলিল—'আমাকে নিয়ে যাবে ?'

তূণীরবর্মা বলিলেন—'হ্যাঁ, আজ আর কেউ নয়, শুধু তুই আর আমি।'

'বেশ, চল !' বলিয়া রেবার মুখে একটু শঙ্কার ছায়া পড়িল—'ফিরতে যদি রাত হয়ে যায় ? বনে নেকড়ে বাঘ, বুনো কুকুর আছে।'

তূণীরবর্মা বলিলেন—'যদি রাত হয়ে যায়, দু'জনে গাছের ডালে উঠে রাত কাটিয়ে দেব। আয়।'

নদীর ধারে অশ্বটি চরিতেছিল, তূণীরবর্মা তাহার মুখে রজ্জুর বল্‌গা পরাইলেন, লাফাইয়া তাহার পিঠে উঠিয়া বসিলেন, রেবাকে টানিয়া নিজের সম্মুখে বসাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

গ্রাম হইতে ক্রোশেক দূর পশ্চিমে শাল পিয়াল মধুক তিন্তিড়ির বন। বনের কিনারে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া তূণীরবর্মা রেবার সহিত বনে প্রবেশ করিলেন। তূণীরবর্মার হাতে ধনুর্বাণ আছে বটে, কিন্তু মৃগয়ার দিকে মন নাই। ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলা ; বালক-বালিকার কৌতুক-কৌতূহলের সহিত যুবক-যুবতীর রতিরঙ্গ মিশিয়া বনবিহার পরম রমণীয় হইয়া উঠিল।

তূণীরবর্মা যখন সময় সম্বন্ধে সচেতন হইলেন তখন প্রণয়িযুগল বনের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছিয়াছেন এবং সূর্যাস্ত হইতেও বিলম্ব নাই।

তূণীরবর্মা বলিলেন—'চল্ চল্, এখনও বেলা আছে, অন্ধকার হবার আগে বন পেরিয়ে যেতে পারব।' তিনি রেবার হাত ধরিয়া আবার বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু কয়েক পদ যাইবার পর তাঁহাদের গতিরোধ হইল। উত্তর দিক হইতে গম্ভীর শব্দ শুনিয়া তূণীরবর্মা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। দূরে যেন দুন্দুভি বাজিতেছে, তাহার সহিত শৃঙ্গনিনাদ। এ শব্দ তূণীরবর্মার অপরিচিত নয়—রণবাদ্য। তাঁহার নাসাপুট স্ফুরিত হইল, তিনি শ্যেনচক্ষু ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিলেন।

দূরে এক সারি ভল্লের ফলক দেখা গেল ; তারপর দেখা গেল অসংখ্য অশ্বারোহীর দল। তাহারা এই বনের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

রেবা ভীতভাবে তূণীরবর্মার হাত টানিয়া বলিল—'ওরা কারা ? আমার ভয় করছে, চল পালিয়ে যাই।'

তূণীরবর্মা বলিলেন—'সৈন্যদল আসছে, বোধ হয় এই বনে রাত্রি যাপন করবে।—কিন্তু পালাব না। দেখতে হবে ওরা কারা।' তিনি একবার চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া একটি বৃহৎ পত্রবহুল শালবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, বলিলেন—'চল্, ওই গাছে উঠে লুকিয়ে থাকি।'

দুইজনে শালবৃক্ষের উচ্চ শাখায় উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঘন পত্রের অন্তরাল হইতে তূণীরবর্মা দেখিতে লাগিলেন, সৈনদল বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিচিত্র তাহাদের লৌহ শিরস্ত্রাণ, মুখমণ্ডল শ্মশ্রুমণ্ডিত। তিনি অস্ফুট স্বরে রেবাকে বলিলেন—'ম্লেচ্ছ সৈন্য !'

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমি তমসাচ্ছন্ন হইল। ম্লেচ্ছ সৈন্যদল বনের মধ্যে রাত্রি যাপনের আয়োজন করিতেছে। কয়েক স্থানে আগুনের চুল্লী জ্বলিয়া উঠিল। যে বৃক্ষে তূণীরবর্মা রেবাকে লইয়া লুকাইয়া ছিলেন সেই বৃক্ষতলে একদল নিম্নতন সেনানী আগুন জ্বালিয়া আহার্য্যদ্রব্য সিদ্ধপক্ব করিতে লাগিল। তাহাদের শূলপক্ব মাংসের পোড়া গন্ধ তূণীরবর্মার নাকে আসিতেছে। তাহারা বাক্যালাপ করিতেছে ; তাহাদের ভাষা অধিকাংশ দুর্বোধ্য, তূণীরবর্মা কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে যাহা বুঝিলেন তাহার মর্মার্থ এই : মালিক কাফুর নামক এক সেনাপতি এই ম্লেচ্ছ বাহিনীর অধিনায়ক ; তাহারা দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়াছে, কিন্তু নর্মদা নদী পার হইবার পূর্বে নর্মদার উত্তর তীরে যত হিন্দু রাজ্য আছে, সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়া যাইবে, যাহাতে পশ্চাৎ হইতে শত্রু আক্রমণ করিতে না পারে।

রাত্রি গভীর হইল। সৈন্যদল আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ভূমিশয্যায় ঘুমাইয়া পড়িল, আগুন নিভিয়া গেল, বন আবার নিস্তব্ধ হইল। বৃক্ষশাখায় তূণীরবর্মা বৃক্ষের কাণ্ডে পৃষ্ঠার্পণ করিয়া নিঃশব্দে রেবাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। রেবা যদি ঘুমের ঘোরে বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায় কিংবা চিৎকার করিয়া ওঠে, তবেই সর্বনাশ।

রাত্রি শেষ হইল। দুন্দুভি ও শিঙা বাজিয়া উঠিল। ম্লেচ্ছ সৈন্যদল ঘোড়ায় চড়িয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গেল।

তূণীরবর্মা বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার মুখে নিদ্রাহীন রাত্রির ক্লান্তিরেখা, কিন্তু আরক্ত নেত্রে চিন্তার আলোড়ন চলিতেছে। রেবা তাঁহার হাত ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া পূর্বদিকে লইয়া চলিল। রেবার চক্ষু সতর্কভাবে চারিদিকে ফিরিতেছে, তূণীরবর্মা চিন্তায় আচ্ছন্ন। বন হইতে নির্গত হইয়া রেবা বলিয়া উঠিল—'কই, আমাদের ঘোড়া কোথায় ?'

তূণীরবর্মা চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলেন—'ঘোড়া নেই ! বনের মধ্যেও নেই ?'

রেবা বলিল—'না ! থাকলে দেখতে পেতাম।'

তূণীরবর্মার মুখ কঠিন হইল, তিনি বলিলেন—'ম্লেচ্ছ তস্করগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে।'

কুটিরে ফিরিয়া তূণীরবর্মা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলেন। তারপর নর্মদার তীরে গিয়া বসিলেন। রেবা তাঁহার সঙ্গে আসিয়া পাশে বসিল।

নর্মদার স্রোত কলকল শব্দ করিয়া চলিয়াছে; যেদিকে তূণীরবর্মার মাতৃভূমি সেইদিকে চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তূণীরবর্মার চক্ষু বাষ্পাকুল হইল, হৃদয়ে অসহ্য আবেগ উন্মথিত হইয়া উঠিল। তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গভীর স্বরে বলিলেন—'রেবা!'

রেবা তাঁহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল—'কি?'

তূণীরবর্মা বলিলেন—'আমি চললাম। মহেশগড়ে সংবাদ দিতে হবে, শত্রু আসছে।'

রেবা কাঁদিয়া উঠিল—'তুমি চলে যাবে!'

তূণীরবর্মা বলিলেন—'আমাকে যেতেই হবে। আমার শরীরের সমস্ত নাড়ি আমাকে টানছে, না গিয়ে উপায় নেই।'

রেবা গলদশ্রুনেত্রে চাহিয়া বলিল—'কিন্তু তুমি যাবে কি করে? তোমার ঘোড়া নেই, শত্রু অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। তুমি কি ওদের আগে পৌঁছুতে পারবে?'

'পারব।' তূণীরবর্মা নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—'ওই নদী আমাকে পৌঁছে দেবে। রেবা, কেঁদো না, যদি বেঁচে থাকি, আবার আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।'

তিনি রেবাকে একবার দৃঢ়ভাবে বুকে চাপিয়া লইলেন, তারপর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া হাসিমুখে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সেদিন সূর্যাস্ত কালে ম্লেচ্ছবাহিনী নর্মদার তীরে একটি অটবিতে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন নদীতে জল আনিতে গিয়া দেখিল, স্রোতের মাঝখান দিয়া একটা মানুষ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারা নিরুৎসুক চক্ষে দেখিল, গ্রাহ্য করিল না। একটা কাফের যদি ডুবিয়া মরে, মন্দ কি?

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে মহেশগড় রাজপুরীর পশ্চাতে বাঁধানো ঘাটে একটি মানুষ জল হইতে বাহির হইয়া আসিল। চাঁদের আলোয় তাহার সিক্ত দেহ ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠিল। ঘাটে প্রহরী নাই, রাজপ্রাসাদ দ্বার বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছে।

কিন্তু তূণীরবর্মা জানিতেন কী করিয়া রুদ্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করা যায়; তিনি গুপ্ত পথে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর যুবরাজ ইন্দ্রবর্মার মহলে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন—'দ্বার খোলো—দ্বার খোলো—'

ইন্দ্রবর্মা নিদ্রাকষায় নেত্রে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, তূণীরবর্মাকে দেখিয়া বলিলেন—'একি! তূণীর—তুমি!'

তূণীরবর্মার দেহ এতক্ষণে অবশ হইয়া আসিতেছিল, তিনি বলিলেন—'শত্রু আসছে—ম্লেচ্ছ শত্রু মহেশগড় আক্রমণ করতে আসছে—তোমরা প্রস্তুত হও'—এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি জ্ঞান হারাইয়া সহসা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

সেবার মালিক কাফুরের সৈন্যদল মহেশগড় রাজ্য জয় করিতে পারে নাই।

২৮ জুলাই ১৯৬২

উপন্যাস



কালের মন্দিরা

প্রথম পরিচ্ছেদ
মোঙের বিলাপ

বৃদ্ধ হূণ-যোদ্ধা মোঙ্ গল্প বলিতেছিল। নির্জন বনপথের পাশে ক্ষুদ্র একটি জলসত্র ; এই সত্রের প্রপাপালিকা যুবতী অদূরে বসিয়া করলগ্নকপোলে মোঙের গল্প শুনিতেছিল।

চারিদিকে প্রস্তরাকীর্ণ অসমতল ভূমির উপর দেবদারু, পিয়াল ও মধুকের বন। পথের ধারে বন তত ঘন নয়, যত দূরে গিয়াছে ততই নিবিড় হইয়াছে। অনুচ্চ পর্বতের শ্রেণী দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে শল্কাবৃত সরীসৃপের ন্যায় নিদ্রালুভাবে পড়িয়া আছে। নবাগত গ্রীষ্মের আলস্য ও পক্ক মধুক-ফলের গুরু সুগন্ধ মিশিয়া আতপ্ত বাতাসকে মদমন্থর করিয়া তুলিয়াছে।

এই পর্বত-কান্তার-তরঙ্গিত বিচিত্র দৃশ্যের ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ কুটিল পথটি যেন অতি যত্নে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গিয়াছে। দ্বিপ্রহরেও পথ জনহীন ; এই পার্বত্য রাজ্যের কেন্দ্রপুরী কপোতকূট এখান হইতে প্রায় ক্রোশেক পথ দক্ষিণে। পথের পাশে রুক্ষ প্রস্তরে নির্মিত একটি কুটির—ইহাই জলসত্র ; তাহার দুই পাশে দুইটি দীর্ঘ ঋজু দেবদারু বৃক্ষ ঘন কুঞ্চিত পত্রভারে স্থানটিকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধ হূণ মোঙ্ একটি দেবদারু কাণ্ডে পৃষ্ঠ-ভার অর্পণ করিয়া জানুদ্বয় বাহু দ্বারা আবেষ্টনপূর্বক নিজ স্মৃতিকথা বলিতেছিল।

মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক মগধেশ্বর স্কন্দের ষোড়শ রাজ্যাঙ্কে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শৈলবন্ধুর অধিত্যকার একপ্রান্তে, বিটঙ্ক নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী কপোতকূট হইতে অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র জলসত্রের তরুচ্ছায়ামূলে আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

বৃদ্ধ মোঙ্ নিজের বিলাপপূর্ণ স্মৃতিকথা শুনাইতে ভালবাসিত। তাহার যোদ্ধৃ জীবন শেষ হইয়াছে, দেহে আর শক্তি নাই ; যে দুর্ধর্ষ প্রকৃতি লইয়া পঁচিশ বৎসর পূর্বে মুক্ত কৃপাণ হস্তে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও বোধকরি নিভিয়া গিয়াছে। তাই, উত্তর মেরুর সুদীর্ঘ রাত্রে তুষার সঙ্কটের মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া মেরুবাসী যেমন সূর্যের স্বপ্ন দেখে, জরাগ্রস্ত মোঙ্ তেমনই হূণ জাতির অতীত বীর্য গৌরবের স্বপ্ন দেখিত। তাহার দেহ খর্ব, মাংসপেশী ক্ষয় হইয়া দেহের-চর্ম লোল করিয়া দিয়াছে ; তথাপি সে যে এককালে অতিশয় বলশালী ছিল তাহা তাহার শিথিল-চর্মাবৃত দেহ-কঙ্কালের সুবিপুল প্রস্থ হইতে অনুমান হয়। কেশলেশহীন মুখমণ্ডল অগণিত কুঞ্চন-চিহ্নে শুষ্ক নারিকেল ফলের আকৃতি ধারণ করিয়াছে ; উচ্চ হনু ও ভ্রূ-অস্থির মাঝখানে ক্ষুদ্র চক্ষু দু'টি কিন্তু সুকৃষ্ণ। মাথার উপরে কয়েক গুচ্ছ পাংশুবর্ণ কেশ আপন বিরলতার ফাঁকে ফাঁকে করোটির গঠন প্রকট করিতেছে।

মোঙের কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর নয়। হূণ জাতির কণ্ঠস্বর স্বভাবতই প্রসাদগুণবর্জিত ; মোঙ্ কথা কহিলে মনে হইত, গুরুভারবাহী গো-শকটের তৈলহীন চক্র হইতে আর্ত আপত্তি উত্থিত হইতেছে। নগরের পানশালায় মোঙ্ গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেই শ্রোতারা উঠিয়া অন্যত্র প্রস্থান

করিত। কিন্তু তথাপি মোঙ্ নিরাশ হইত না; কোনওক্রমে একটি শ্রোতা সংগ্রহ করিতে পারিলেই সে অতীতের কাহিনী আরম্ভ করিয়া দিত।

বর্তমানে মোঙের একটি শ্রোত্রী জুটিয়াছিল—সে এই জলসত্রের প্রপাপালিকা সুগোপা। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা তন্বী, বয়স অনুমান কুড়ি বাইশ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুত পঁচিশ বৎসর। অধর প্রান্তে একটু চটুলতার আভাস, চক্ষু দু'টি নীলাঞ্জন মেঘের স্নিগ্ধতায় সরস। সুগোপা কপোতকূটের রাজ-উদ্যানের মালাকরের বনিতা, তাহার হাতের মালা নহিলে রাজকুমারী—

কিন্তু সুগোপার পূর্ণ পরিচয় পরে প্রকাশ পাইবে।

মোঙ্ দন্তধাবন কাষ্ঠের অন্বেষণে প্রায় নগর বাহিরে জঙ্গলের মধ্যে আসে, করঞ্জবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ অন্যত্র পাওয়া যায় না। তখন দু'দণ্ড সুগোপার কাছে বসিয়া সে নিজের প্রিয় কাহিনী বলিয়া যায়; সুগোপাও আপত্তি করে না। সারাদিন তাহাকে একাকিনী এই প্রপায় থাকিতে হয়, ক্বচিৎ দুই চারিজন দূরাগত পথিক জলপান করিবার জন্য ক্ষণেক দাঁড়ায়, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া যায়; এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে মোঙের গল্প তাহার মন্দ লাগে না। সুদূর বক্ষু নদীর তীরে হূণেরা কি করিয়া জীবনযাপন করিত; তারপর একদিন যাযাবর জাতির স্বভাবজ অস্থিরতা কেমন করিয়া তাহাদের বিশাল গোষ্ঠীকে গান্ধারের সীমান্তে আনিয়া উপনীত করিল; তারপর পঞ্চনদ-ধৌত শ্যামল উপত্যকার লোভে তাহারা কিভাবে পঙ্গপালের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, স্কন্দের সহিত হূণদের যুদ্ধ, হূণগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; তারপর দ্বাদশ সহস্র হূণ এই বিটঙ্ক রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল, কপোতকূটে প্রবেশ করিয়া রাজপুরী আক্রমণ করিল—

মোঙ্ গল্প বলিতেছিল, সুগোপা অদূরে পীঠিকার ন্যায় একটি উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া করলগ্নকপোলে শুনিতেছিল—

দর্দূরধ্বনিবৎ একটি শব্দ মোঙের কণ্ঠ হইতে বাহির হইল; ইহা তাহার হাস্য। ক্ষণিক কৌতুক অপনোদিত হইলে মোঙ্ বলিল—'মেষ! গড্ডলিকা। হূণ জাতি আর নাই, ভেড়া বনিয়া গিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে যাহারা সিংহ ছিল, তাহারা আজ ভেড়া। কাহাকে দোষ দিব? আমাদের যিনি রাজা, যিনি একদিন স্বহস্তে এদেশের বীর্যহীন অধিপতির মাথা কাটিয়া শূলশীর্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি আজ অহিংসা ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বরাহ পর্যন্ত আহার করেন না। ধর্ম! তরবারি যাহার একমাত্র দেবতা, সে চৈত্য নির্মাণ করিয়া কোন্ এক মৃত ভিক্ষুকের অস্থি পূজা করিতেছে। হ হ হ—' মোঙের কণ্ঠ হইতে আবার শ্লেষপূর্ণ দর্দূরধ্বনি বাহির হইল।

সুগোপা করতল হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—'মহারাজ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।'

মোঙ্ও বৃক্ষকাণ্ডের অবলম্বন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল, তালপত্রের পুত্তলীর ন্যায় সহসা দুই হস্ত আস্ফালিত করিয়া বলিল—'সেই কথাই তো বলিতেছি। কিন্তু কেন এমন হইল? দ্বাদশ সহস্র শোণিত-লোলুপ মরু-সিংহ পঁচিশ বৎসর পূর্বে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা আজ কোথায়? ভেড়া—সব ভেড়া।'

সুগোপার অধর কোণে একটু হাসি দেখা দিল; সে বলিল—'মোঙ্, তবে তো তুমিও ভেড়া।'

মোঙ্ ও কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনশ্চ ঠেস দিয়া বসিল, ক্ষুদ্র চক্ষুযুগল কিছুক্ষণ সুগোপার মুখের উপর স্থাপন করিয়া রহিল; তারপর কতকটা যেন নিজ মনেই বলিল—'অসির নখ, ঘোড়ার পিছনের পা এবং স্ত্রীলোকের কটাক্ষ—মানুষের সমস্ত বিপদের মূলে এই তিনটি। হূণ শিশুকাল হইতেই প্রথম দুইটি এড়াইয়া চলিতে শিখে কিন্তু ঐ তৃতীয় বিপদই তার সর্বনাশ করিয়াছে। বেশ ছিলাম আমরা মরুর কোলে; আমাদের বলিষ্ঠ রূপহীনা নারীরা অশ্ব উষ্ট্রের

সহিত একসঙ্গে কাজ করিত, দুর্দম হূণশিশু প্রসব করিত—এদেশের কুহকিনীদের মত পুরুষকে মেষশাবকে পরিণত করিতে পারিত না। প্রবাদবাক্য মিথ্যা নয়, অসির নখ, ঘোড়ার পা আর স্ত্রীলোকের কটাক্ষ—' মোঙ্ অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে সুগোপার সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া শুষ্ক নারিকেলের মত মাথাটি নাড়িতে লাগিল।

মৃদু হাসিয়া সুগোপা বলিল—'মোঙ্, তোমার নাগসেনার কটাক্ষ কি এখনও খুব তীক্ষ্ণ আছে?'

মোঙ্ দুই হাত নাড়িয়া সুগোপার পরিহাস দূরে সরাইয়া দিয়া বলিল—'এক পুরুষের মধ্যে একটা জাতি নির্বীর্য হইয়া গেল! আমরা না হয় বুড়া হইয়াছি—যৌবন ও অশ্বিনীদুগ্ধজাত মদ্যের মাদকতা চিরদিন থাকে না, কিন্তু আমাদের সন্তানেরাই বা কী? তাহারা হূণের পুত্র বটে, তবু তাহারা হূণ নয়। মরু-সিংহের ঔরসে একপাল ভেড়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

ভেড়ার উপমাটা বৃদ্ধকে চাপিয়া ধরিয়াছে, তদুপরি সে উত্তরোত্তর উষ্ণতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সুগোপা বলিল—'সেজন্য বিলাপ করিয়া লাভ নাই। এ দেশের নারীরা তোমাদের সাধিয়া বিবাহ করে নাই, তোমরাই বলপূর্বক তাহাদের বিবাহ করিয়াছিলে—এখন কাঁদিলে চলিবে কেন? আর, ফলও নিতান্ত মন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তোমাদের বংশধরেরা—আর কিছু না হোক তোমাদের চেয়ে সুশ্রী। তাহাদের কুল না থাক, শীল আছে।'

'শীল আছে!' মোঙের স্বর ক্রোধে আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—'কী প্রয়োজন শীলের? শিষ্টতার দ্বারা শত্রুর মুণ্ড কাটিয়া লওয়া যায়? কশার পরিবর্তে সৌজন্য প্রয়োগ করিলে ঘোড়া অধিক দৌড়ায়? আমরা যেদিন রাজধানী অধিকার করি সেদিন কি শিষ্টতা দেখাইয়াছিলাম? বাজপাখির মত আমরা কপোতকূটের উপর পড়িয়াছিলাম—নগরের পয়োনালক পথে রক্তের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল। রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা আমাদের বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল—হ হ হ—' মোঙ্ আবার হাসিল—'রাজপ্রাসাদের বিজয়ের কথা স্মরণ হইলে এখনও আমার রক্ত নৃত্য করিয়া ওঠে—'

সুগোপা বলিল—'রক্তপিপাসু হূণ, তবে সেই গল্পই বল, তোমার আক্ষেপ শুনিবার আগ্রহ আমার নাই।'

দূরস্থ শিকারের প্রতি চলচ্ছক্তিহীন স্থবির ব্যাঘ্র যেভাবে তাকাইয়া থাকে, মোঙ্ সেইভাবে শূন্যে তাকাইয়া রহিল, লালায়িত রসনায় বলিতে লাগিল—'সেদিন দুই মুঠি ভরিয়া সোনা লুঠ করিয়াছিলাম। প্রাসাদের নিম্নে অন্ধকূপ কক্ষে সোনার দীনার স্তূপীকৃত ছিল—আটজন রক্ষী সেই গর্ভগৃহ পাহারা দিতেছিল—তুষ্‌ফাণ প্রথমে সেই গুপ্ত কোষাগারের সন্ধান পায়; আমরা ত্রিশজন হূণ গিয়া রক্ষীদের কাটিয়া ফেলিলাম। তারপর সকলে মিলিয়া সেই দীনার স্তূপ...এত সোনা আর কখনও দেখিব না। তুষ্‌ফাণ ছিল আমাদের নায়ক, অধিকাংশ দীনার তাহার ভাগে পড়িল। যুদ্ধ শেষ হইবার পর সেই সোনা আমাদের রাজাকে উপহার দিয়া তুষ্‌ফাণ চষ্টন দুর্গের অধিপতি হইয়া বসিল—'

সুগোপা বলিল—'তা জানি। তারপর আর কি করিলে?'

মোঙ্ বলিয়া চলিল—'রত্নাগার হইতে উপরে আসিয়া আমরা রাজ-অবরোধের দিকে ছুটিলাম। আমাদের পূর্বেই সেখানে বহু হূণ পৌঁছিয়াছিল; চারিদিক হইতে নারীকণ্ঠের চিৎকার, ক্রন্দন, আর্তনাদ উঠিতেছিল। আমরা অবরোধের অলিন্দে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে এক পরম কৌতুককর খেলা চলিতেছে। ছয় সাতজন হূণ যোদ্ধা একটা ক্ষুদ্র বালকের দেহ লইয়া মুক্ত কৃপাণের উপর লোফালুফি করিতেছে। বালকটা রাজপুত্র—এক বৎসর বয়ঃক্রম হইবে—মাংসের একটা উলঙ্গ পিণ্ড বলিলেই হয়। একজন তাহাকে তরবারির ফলার উপর লইয়া আর একজনের দিকে ছুঁড়িয়া দিতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে তরবারির ফলার উপর গ্রহণ

করিতেছে, মাটিতে পড়িতে দিতেছে না। শূন্যে শূন্যে খেলা চলিতেছে। শিশুটা মরে নাই, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কাতরোক্তি করিতেছে। পাছে তরবারির আঘাতে কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় এইজন্য সকলেই তাহাকে ফলার পার্শ্বদেশে গ্রহণ করিতেছে ; তবু শিশুটার সর্বাঙ্গ কাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

'আমরাও গিয়া খেলায় যোগ দিলাম ; মাঝে মাঝে হাসির অট্টরোল উঠিতে লাগিল। একটা যুবতী দ্বার পথে উঁকি মারিয়া সহসা চিৎকার করিয়া পলায়ন করিল, আমাদের মধ্যে দুই চারিজন খেলা ছাড়িয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

'এই সময় কে একজন আসিয়া সংবাদ দিল, রাজা ধরা পড়িয়াছে। রক্তপাগল হূণের দল শিশুকে সেইখানে ফেলিয়া চলিয়া গেল। আমি কিন্তু তাহাদের সঙ্গে গেলাম না। শুধু হত্যা আর লুণ্ঠনে হূণের তৃপ্তি হয় না, নগ্ন তরবারি হস্তে আমি অবরোধের ভিতর প্রবেশ করিলাম।'

এতক্ষণ গল্প বলিতে বলিতে মোঙের ক্ষুদ্র চক্ষুযুগল হিংস্র উল্লাসে জ্বলিতেছিল, এখন সহসা যেন চক্ষুর জ্যোতি নিভিয়া গেল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বিষণ্ণ স্বরে বলিল—'এই অবরোধের একটা কক্ষে প্রথম নাগসেনার সাক্ষাৎ পাই। পালঙ্কের নীচে লুকাইয়াছিল ; তাহাকে টানিয়া বাহির করিলাম। সে কঙ্কণ দিয়া আমার কপালে আঘাত করিল। আমি তরবারি ফেলিয়া তাহাকে সাপটাইয়া ধরিলাম ; সে আমার বক্ষে কামড়াইয়া দিল। কামড়ের দাগ এখনও আমার বুকে আছে। সেই অবধি—' মোঙের স্বর অত্যন্ত করুণ হইয়া ক্রমে থামিয়া গেল।

সুগোপা করতলে কপোল রাখিয়া নিঃশব্দে শুনিতেছিল, এই নৃশংস কাহিনী তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দেশব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে যাহার জন্ম, অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বহু চিত্র যাহার শৈশব স্মৃতির মূল উপাদান, যাহার নিজের জননী ও বহু পরিজন এই শোণিতস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে—মোঙের কাহিনী শুনিয়া তাহার বিচলিত হইবার কথা নয়। শুধু রাজপুরী অধিকারের এই পুরাবৃত্ত তাহার অজ্ঞাত ছিল বলিয়াই সে মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিবার পর সুগোপা মুখ তুলিয়া বলিল—'সেই শিশুর কি হইল ?'

'শিশুর— ?' মোঙ্ স্মৃতির জলে পুনরায় ডুব দিয়া বলিল—'শিশুটা সেই অলিন্দে রক্ত-কর্দমের মধ্যে পড়িয়া ছিল—তারপর— ? হাঁ ঠিক, মনে পড়িয়াছে। চু-ফাঙ্ ! পাগলা চু-ফাঙ্ ! অবরোধ হইতে নাগসেনাকে লইয়া যখন বাহির হইতেছি, দেখি আমাদের পাগল চু-ফাঙ্ শিশুটাকে নিজের ঝোলার মধ্যে পুরিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এটাকে লইয়া কী করিবে—শূল্য মাংস তৈয়ার করিয়া খাইবে ?' চু-ফাঙ্ ভাঙ্গা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল—' মোঙ্ আবার চিন্তামজ্জিত হইয়া পড়িল—'আশ্চর্য, চু-ফাঙ্‌কে সেদিনের পর আর দেখি নাই, হয়তো মরিয়া গিয়াছে। হূণের আয়ু আর মরীচিকার মায়া কখন শেষ হইবে কেহ জানে না। চু-ফাঙ্ পাগল ছিল বটে কিন্তু অনেক তন্ত্র-মন্ত্র জানিত, গাছের পাতা ও শিকড়ের রস দিয়া দেহের অস্ত্রক্ষত অবিকল জুড়িয়া দিতে পারিত—'

সুগোপা জিজ্ঞাসা করিল—'আর সেই যুবতী ? তাহার কি হইল ?'

'কোন্ যুবতী ? নাগসেনা ?'

সুগোপার অধর একটু প্রসারিত হইল, সে বলিল—'না, নাগসেনার কী হইল তাহা আমরা জানি ; নাগসেনা এখন নাগিনী হইয়া তোমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে। আমি অন্য যুবতীর কথা বলিতেছি। যে তোমাদের খেলা দেখিয়া চিৎকার করিয়া পলাইয়াছিল—'

মোঙ্ তাচ্ছিল্যভরে বলিল—'কে তাহার সংবাদ রাখে। দুই তিনজন তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছিল—তারপর কি হইল জানি না। রাজপুরীতে বহু কিঙ্করী পরিচারিকা ছিল, হূণেরা যে যাহাকে পাইল দখল করিল। কয়েকটা যুবতী আত্মহত্যা করিয়াছিল—'

সুগোপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—'বোধহয় সেই যুবতীই আমার মাতা। তিনি রাজপুত্রের ধাত্রী ছিলেন, আমরা একই স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছিলাম।'

মোঙ্ বিস্ময় প্রকাশ করিল না, নিরুৎসুকভাবে সুগোপার পানে চাহিয়া বলিল—'হইতেও পারে। তাহার বয়স তোমারই মতন ছিল।'

ভূমির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সুগোপা বলিল—'জানি না আমার মায়ের কি দশা হইয়াছিল। তিনি আর রাজপুরী হইতে গৃহে ফিরেন নাই। হয়তো আত্মহত্যাই করিয়াছিলেন—'

এই সময় তাহাদের বিশ্রম্ভালাপে বাধা পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
অশ্বচোর

ভূমিনিবদ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া সুগোপা চমকিয়া দেখিল, এক পুরুষ দেবদারু ছায়ার তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কখন এই অপরিচিত আগন্তুক নিঃশব্দ পদে তাহাদের অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহারা জানিতে পারে নাই।

সুগোপা বলিয়া উঠিল—'কে তুমি?'

আগন্তুক উত্তর করিল—'পথিক। তুমি প্রপাপালিকা? জল দাও।'

সুগোপা পথিককে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। আগন্তুক যে বিদেশী তাহা তাহার বেশভূষা দেখিয়া সন্দেহ থাকে না। একটি জীর্ণ লৌহজালিকে উর্ধ্বাঙ্গ আবৃত, মস্তকেও অনুরূপ লৌহজালিকের শিরস্ত্রাণ। কটিতে চর্ম-কোষবদ্ধ তরবারি, পদদ্বয় স্থূল বৃষচর্মের পাদুকায় চর্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। দেহে কোথাও মাংসের বাহুল্য নাই, বরং দৈর্ঘ্যের অনুপাতে ঈষৎ কৃশ। সমস্ত মিলাইয়া ছিলাহীন ধনু-দণ্ডের মত দেহ ঋজু ও নমনীয়; কিন্তু মনে হয়, প্রয়োজন হইলে মুহূর্তমধ্যে গুণসংযুক্ত হইয়া প্রাণঘাতী আকার ধারণ করিতে পারে।

আগন্তুকের বয়ঃক্রম অনুমান করা কঠিন, তবে ত্রিশ বৎসরের অধিক নয়। মুখাবয়বের মধ্যে চক্ষু ও নাসা অতিশয় তীক্ষ্ণ। ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষুর দৃষ্টিতে একটা সতর্ক দুঃসাহসিকতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাহুবল ও কূটবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যাহাদের জীবনধারণ করিতে হয়, তাহাদের চক্ষে এরূপ দৃষ্টি বোধকরি স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

ফলত আগন্তুক যে একজন যুদ্ধজীবী তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহার মুখে ও বাহুতে অগণিত সূক্ষ্ম ক্ষতরেখা দেখিয়া এই অনুমান দৃঢ় হয়। ছিন্ন লৌহজালিকের ফাঁকে বক্ষের উপরেও বহু রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয় গৌরবর্ণ ত্বকের উপর কজ্জল দিয়া কেহ রেখাগুলি আঁকিয়া দিয়াছে। উপরন্তু ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি তিলকের ন্যায় একটি তাম্রবর্ণ চিহ্ন আছে। ইহা ক্ষতচিহ্ন অথবা সহজাত জটুল তাহা নির্ণয় করা যায় না।

সুগোপা ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখিয়া লইয়া জল আনিবার জন্য কুটির অভিমুখে প্রস্থান করিল। আগন্তুক মন্থরপদে আসিয়া তাহার পরিত্যক্ত শিলাপট্টের উপর বসিল। তাহার বসিবার ভঙ্গিতে একটু ক্লান্তভাব প্রকাশ পাইল।

মোঙ্ এতক্ষণ কৌতূহল সহকারে নবাগতকে দেখিতেছিল, এখন বলিল—'তুমি দেখিতেছি বিদেশী। তোমার দেশ কোথায়?'

বিদেশী উত্তর না দিয়া এমনভাবে হস্ত সঞ্চালন করিল, যাহাতে গান্ধার হইতে পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত যে-কোনও দেশ হইতে পারে।

মোঙ্ আবার প্রশ্ন করিল—'তুমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী ?'

বিদেশী সতর্ক দৃষ্টি তাহার দিকে ফিরাইয়া তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

মোঙের ভেকধ্বনিবৎ ব্যঙ্গহাস্য আবার উত্থিত হইল—'ভাগ্যদেবতা দেখিতেছি তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন নয় ; অস্ত্রক্ষত ছাড়া যুদ্ধ ব্যবসায়ে আর কিছু লাভ করিতে পার নাই। কোন্ রাজ্যের সেনাভুক্ত ছিলে ?'

বিদেশী এবারও উত্তর দিল না, উর্ধ্বদিকে তাকাইয়া যেন অন্যমনস্ক রহিল। মোঙের কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, সে অতঃপর গাম্ভীর্য অবলম্বনপূর্বক পৌরুষ সহকারে বলিল—'যুবক, তুমি এ রাজ্যে নূতন আসিয়াছ, বোধহয় জান না ইহা হূণ অধিকৃত। মহাপরাক্রান্ত হূণ কেশরী রোট্ট ধর্মাদিত্য এই বিটঙ্ক রাজ্যের অধীশ্বর। আমিও হূণ। হূণগণ বিজাতীয়ের স্পর্ধা সহ্য করে না। তোমার নাম কি ?'

যুবকের স্বল্প গুম্ফের অন্তরালে একটু হাসি দেখা দিল ; সে বলিল—'আমার নাম চিত্রক।'

'চিত্রক ! চিতা বাঘ।' মোঙের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—'তোমার নাম সার্থক বটে, তোমার সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়া তোমাকে চিতা বাঘ বলিয়াই মনে হয়। এরূপ নাম কেবল হূণদের মধ্যেই ছিল—সিংহ শূকর নাগ বৃষ—যাহার যেরূপ আকৃতি প্রকৃতি সে সেইরূপ নাম গ্রহণ করিত। এখন আর কিছু নাই—' সখেদ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আগ্রহভরে মোঙ্ বলিল—'তুমি বয়সে নবীন, কিন্তু নিশ্চয় অনেক যুদ্ধ করিয়াছ। বহু নগর লুণ্ঠন করিয়াছ। এই বিটঙ্ক রাজ্য একদিন আমরা—কিন্তু এদেশে যুদ্ধবিগ্রহ আর হয় না। মেষপাল কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে ? পঁচিশ বৎসর পূর্বে একদিন ছিল—'

যুবক জিজ্ঞাসা করিল—'কপোতকূট এখান হইতে কত দূর ?'

মোঙ্ বলিল—'তুমি কপোতকূট যাইবে ? অধিক দূর নয়, দু'দণ্ডের পথ। এক প্রহর এখানে বিশ্রাম করিয়া যাত্রা করিলেও সন্ধ্যার পূর্বে রাজধানী পৌঁছিতে পারিবে। তোমার অশ্ব নাই দেখিতেছি, হূণ যোদ্ধা কিন্তু অশ্ব বিনা এক পা চলে না। উষ্ট্র রোমের শিবির এবং অশ্বের পৃষ্ঠ—হূণের ইহাই বাসস্থান। পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমরা দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী—'

সুগোপা মৃৎপাত্রে জল লইয়া ফিরিয়া আসিল, সুতরাং মোঙের গল্পে বাধা পড়িয়া গেল। পথিক সত্যই তৃষ্ণার্ত ছিল, সে সাগ্রহে উঠিয়া আসিয়া প্রথমে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিল, তারপর গণ্ডূষ ভরিয়া তৃপ্তিসহকারে জল পান করিল। সুগোপা তাহার অঞ্জলিতে জল ঢালিয়া দিতে দিতে মোঙের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—'মোঙ্, আর বিলম্ব করিও না, দাঁতন লইয়া গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইলে তোমার নাগসেনা দাঁতনের পরিবর্তে তোমার মুণ্ডটি চিবাইবে।'

মোঙ্ চকিতভাবে উর্ধ্বে চাহিল, সূর্যদেব মধ্য গগন অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মোঙ্ শঙ্কিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল ; জঙ্গলের মধ্যে করঞ্জ কাষ্ঠ অন্বেষণ করিতে সময় লাগিবে, তারপর গৃহে ফিরিবার পথও অনেকখানি। বৃদ্ধ বয়সে দ্রুত চলিবার শক্তি নাই, নাগসেনার সম্মুখে ফিরিয়া যাইতে হয়তো সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। সেটা মোঙের পক্ষে সুখকর হইবে না। পারিবারিক ব্যাপারে যুদ্ধবিগ্রহ মোঙ্ ভালবাসে না।

পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার বীরত্ব কাহিনীটা আগন্তুককে শুনাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। মোঙ্ গাত্রোত্থান করিল ; কাহাকেও কোনও সম্ভাষণ না করিয়া ক্ষুব্ধ অস্পষ্ট স্বরে তরবারির নখ, ঘোড়ার ক্ষুর ও স্ত্রীজাতির কটাক্ষ সম্বন্ধীয় প্রবাদবাক্যটি আবৃত্তি করিতে করিতে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্রক আবার শিলাপীঠের উপর বসিয়া ছিল। সুগোপা দেখিল,

সে দুই জানুর উপর কফোনি রাখিয়া মুষ্টিবদ্ধ হাতের শীর্ষে চিবুক ন্যস্ত করিয়া স্থিরনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছে। হঠাৎ সুগোপা একটু অস্বস্তি অনুভব করিল। সে মাসের পর মাস একাকিনী এই জলসত্রে দিন কাটায়, কত পথিক আসে যায়, কেহ নবীনা প্রপাপালিকাকে দেখিয়া দু'টা রঙ্গ পরিহাসের কথা বলে, সুগোপা চটুলকণ্ঠে তাহার উত্তর দেয় ; কেহ বা প্রগল্‌ভতার সীমা অতিক্রম করিলে দুই চারিটি কঠিন বাক্যবাণে জর্জরিত করিয়া তাহাকে অধোবদনে বিদায় করে। কোনও অবস্থাতেই সুগোপার আত্মপ্রত্যয় বিচলিত হয় না। কিন্তু আজ এই জীর্ণবেশ বিদেশী যুবকের নিষ্পলক চাহনি তাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল।

স্খলিত নিচোলপ্রান্ত বুকের উপর টানিয়া দিয়া সুগোপা বলিল—'তুমি তো কপোতকূটে যাইবে, তবে বিলম্ব করিতেছ কেন ?'

চিত্রক তেমনিভাবে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"শ্রান্তি দূর করিতেছি। আমার ত্বরা নাই।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল ; চিত্রকের অচঞ্চল দৃষ্টি সুগোপার উপর বিন্যস্ত হইয়া আছে। সুগোপা ক্রমে অধীর হইয়া উঠিল, ঈষৎ রুক্ষস্বরে কহিল—'তুমি কোন্ বর্বর দেশের মানুষ—স্ত্রীলোক কখনও দেখ নাই ?'

এইবার চিত্রক সুগোপার মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া সাবধানে চারিদিকে চাহিল। তাহার অধরোষ্ঠ একবার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইল। তারপর আবার মুষ্টির উপর চিবুক রাখিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল—'স্থানটি বেশ নির্জন।'

এই অসংলগ্ন উত্তরে সুগোপা রুষ্টভাবে অধর দংশন করিল, তারপর ভূমি হইতে জলপাত্র তুলিয়া লইয়া কুটিরের দিকে চলিল।

'তুমি সুন্দরী এবং যুবতী।'

সুগোপা চকিতে গ্রীবা বাঁকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। চিত্রকের কণ্ঠস্বরের সমতা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, সে পুনশ্চ বলিল—'তুমি সুন্দরী এবং যুবতী। এই জনহীন স্থানে একাকিনী থাকিতে তোমার ভয় করে না ?'

ভ্রূভঙ্গ করিয়া সুগোপা বলিল—'ভয়। কিসের ভয় ?'

'বনে হিংস্র জন্তু আছে।'

'হিংস্র জন্তুকে আমি ভয় করি না।'

'আর—মানুষকে ?'

'মানুষ ধৃষ্টতা করিলে আমার অস্ত্র আছে।'

'কী অস্ত্র ?'

সুগোপা তর্জনী তুলিয়া কুটিরের প্রাঙ্গণ দেখাইল। চিত্রক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে একটি সম্মার্জনী রহিয়াছে। তাহার কণ্ঠে একটু নীরস হাস্যধ্বনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে বলিল—'তুমি সাহসিকা বটে। কিন্তু ঐ অস্ত্রের দ্বারা লোলুপ পুরুষকে নিবারণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় ?'

'হয়।' অস্পষ্টস্বরে এই কথাটি বলিয়া সুগোপা আবার কুটিরের দিকে পা বাড়াইল। কিন্তু তাহাকে এক পদের অধিক অগ্রসর হইতে হইল না।

চিত্রক এতক্ষণ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ভঙ্গিতে বসিয়া ছিল, এখন সহসা বন্য বিড়ালের মত লম্ফ দিয়া সুগোপার সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার মুখের অত্যন্ত নিকটে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—'সাহসিনি, এখন কোন্ অস্ত্র ব্যবহার করিবে ?' তাহার কণ্ঠস্বরে গভীর ব্যঙ্গের সহিত গভীরতর একটা উত্তেজনার আভাস স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

সত্রাস চক্ষু তুলিয়া সুগোপা দেখিল, চিত্রকের দুই চক্ষু হীরকখণ্ডের মত জ্বলিতেছে, তাহার ললাটস্থ তাম্রবর্ণ চিহ্নটা রক্ত তিলকের মত লাল হইয়া উঠিতেছে। সুগোপা ক্ষণকাল স্তম্ভিতবৎ থাকিয়া বলিল—'পথ ছাড়, বর্বর।'

'যদি না ছাড়ি ?'

সুগোপা অসহায় নেত্রে চারিদিকে চাহিল। এই সময়, যেন তাহার বিভ্রান্ত উৎকণ্ঠার সাক্ষাৎ প্রত্যুত্তর স্বরূপ শিলাকঙ্করপূর্ণ পথের উপর দ্রুত অশ্বের আস্কন্দিত ধ্বনি শুনা গেল। পরক্ষণেই একটি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে উচ্চ আহ্বান আসিল—

'সুগোপা ! সুগোপা !'

চিত্রক সুগোপার পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরে অশ্বারোহীকে দেখা গেল ; বিদ্যুতের মত দ্রুতগতি অশ্ব পথ হইতে দেবদারু বৃক্ষের তলে আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহী এক লম্ফে ভূমিতে অবতরণ করিতেই সুগোপা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া ধরিল।

অশ্বারোহীর বয়স অধিক নয়, কিশোর বলিলেই হয় ; মুখে শ্মশ্রুগুম্ফের চিহ্নমাত্র নাই। মস্তকে উজ্জ্বল ধাতুনির্মিত উষ্ণীষ, বক্ষে বর্ম, পৃষ্ঠে ধনু ও তূণীর। অপরূপ সুন্দর আকৃতি, দেখিয়া মনে হয় দেবসেনাপতি কিশোর কার্তিকেয় শত্রু বিজয়ে বাহির হইয়াছেন।

তরুণ বীর প্রফুল্ল রক্তাধরে হাসিয়া বলিল—'সুগোপা, কী হইয়াছে সখি ?'

সুগোপার মন হইতে ক্ষণিক বিপন্নতার সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছিল, সে গদগদ আনন্দের স্বরে বলিল—'কিছু না—ঐ বিদেশী গ্রামীণটা প্রগল্‌ভতা করিয়াছিল মাত্র। এস—ঘরে এস। শিকারে বাহির হইয়াছিলে বুঝি ? গাল দু'টি যে রৌদ্রে রাঙা হইয়া গিয়াছে।'

চিত্রক ইতিমধ্যে নিঃশব্দে সরিয়া গিয়া দেবদারু বৃক্ষের কাণ্ডে এক হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অন্য হস্তটি অবহেলাভরে তরবারির উপর ন্যস্ত ছিল। তরুণ ঈষৎ বিস্ময়ে তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ক্ষণিকের জন্য উভয়ের চক্ষু মিলিত হইল। তারপর অবজ্ঞাপূর্ণ তাচ্ছিল্যের সহিত অশ্বের বল্‌গা চিত্রকের দিকে নিক্ষেপ করিয়া সুকুমারকান্তি তরুণ বলিল—'আমার অশ্ব রক্ষা কর—পারিতোষিক পাইবে।' বলিয়া সুগোপার কটি বাহুবেষ্টিত করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে কুটিরের দিকে চলিল।

সুগোপা সোহাগ-বিগলিত কণ্ঠে বলিল—'তুমি যে এই নিভৃত স্থানে আমাকে দেখা দিতে আসিবে তাহা আমার সকল দুরাকাঙ্ক্ষার অতীত।' তরল হাসিয়া তরুণ বলিল—'প্রপাপালিকা কিরূপ কর্তব্য পালন করিতেছে রাজপক্ষ হইতে তাহাই পরিদর্শন করিতে আসিলাম।'

তাহারা কুটির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলে চিত্রক ধীরে ধীরে অশ্বের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দর কম্বোজীয় অশ্ব, প্রস্তর মূর্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মধুপিঙ্গলবর্ণ ত্বকে চীনাংশুকের মসৃণতা, গ্রীবার চামর মুক্তামালায় মণ্ডিত, পৃষ্ঠে কোমল রোমাবলি নির্মিত আসন, বল্‌গার রজ্জু স্বর্ণালঙ্কৃত।

চিত্রক অশ্বের গ্রীবায় একবার লঘু স্পর্শে হাত বুলাইল, অশ্ব আপ্যায়িত হইয়া নাসা মধ্যে ঈষৎ হর্ষসূচক শব্দ করিল। চিত্রক তখন সঙ্কুচিত সতর্ক চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নিস্তব্ধ অপরাহ্ণ ; কেবল কুটিরের অভ্যন্তর হইতে মাঝে মাঝে কলহাস্যের ধ্বনি প্রকৃতির বৈকালী তন্দ্রালসতা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। পথে জনমানব নাই।

চিত্রকের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল ; কুটিল তিক্ত হাসি, তাহাতে আনন্দ বা কৌতুকের স্পর্শ নাই। তাহার ললাটের তিলকচিহ্ন আবার ধীরে ধীরে আরক্ত হইয়া উঠিল।

অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া চিত্রক সন্তর্পণে তাহাকে পথের দিকে লইয়া চলিল ; শষ্পাকীর্ণ ভূমির

উপর শব্দ হইল না। তারপর একবার পিছনে কুটিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক লম্ফে সে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। আসনের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া জঙ্ঘা দ্বারা তাহার পঞ্জর চাপিয়া ধরিতেই অশ্ব তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় লাফাইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তরময় পথের উপর তাহার ক্ষিপ্র ক্ষুরধ্বনি কয়েকবার শব্দিত হইয়াই আবার পরপারের তৃণভূমির উপর নীরব হইয়া গেল।

নিমেষমধ্যে অশ্ব ও আরোহী পথিপার্শ্বস্থ গভীর বনের মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
মগধের দূত

মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনাচ্ছলে যে অমিত-বিক্রম মগধেশ্বরের বিজয়গাথা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সমুদ্রগুপ্ত। এক হিসাবে সমুদ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডার অপেক্ষাও শক্তিধর ছিলেন ; আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর পরেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার সমুদ্রমেখলাধৃত বিশাল সাম্রাজ্যকে এমন সুকঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশধরগণ তিন পুরুষ পর্যন্ত প্রায় নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিয়াছিলেন, শত বর্ষ মধ্যে সে বন্ধন শিথিল হয় নাই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিল সমুদ্রগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্তের সময়। তখনও সাম্রাজ্য কপিশা হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত বিস্তৃত ; কিন্তু বহিরাকৃতি অটুট থাকিলেও গজভুক্ত কপিত্থবৎ অন্তঃশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যে দুর্দম জীবনশক্তি এই বিরাট ভূখণ্ডকে একত্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিল, কালক্রমে জরার প্রভাবে তাহা শ্লথ হইয়া গিয়াছে।

কুমারগুপ্তের দীর্ঘ রাজত্বকালের শেষভাগে উন্মত্ত ঝঞ্ঝাবর্তের মত হূণ অভিযান সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আঘাত করিল। এই প্রচণ্ড আঘাতে জীর্ণ সাম্রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল। কুমারগুপ্ত ভোগী ছিলেন, বীর ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার ঔরসে এক মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—গুপ্তবংশের শেষ বীর স্কন্দ। তরুণ স্কন্দগুপ্ত তখন যুবরাজ-ভট্টারক পদে আসীন ; রাজবংশের চঞ্চলা লক্ষ্মীকে স্থির করিবার জন্য স্কন্দ তিন রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন। সেই দিন হইতে ক্ষয়গ্রস্ত পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে অটুট রাখিবার অক্লান্ত চেষ্টায় দীর্ঘ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ও সৈন্য শিবিরে যাপন করাই এই ভাগ্যহীন বীরকেশরীর পূর্ণ ইতিহাস।

যুবরাজ স্কন্দ পঞ্চনদ প্রদেশে হূণ অক্ষৌহিণীর সম্মুখীন হইলেন। হিংস্র বর্বর হূণগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিল, কিন্তু অসামান্য রণপণ্ডিত স্কন্দের সহিত আঁটিয়া উঠিল না। তথাপি আশ্চর্য এই যে, তাহারা নিঃশেষে দূরীভূত হইল না। পঞ্চনদ প্রদেশ নদনদী ও পর্বত দ্বারা বহুধা খণ্ডিত ; চক্রবর্তী গুপ্তসম্রাটের অধীনে প্রায় পঞ্চাশটি ক্ষুদ্রবৃহৎ সামন্তরাজা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য রচনা করিয়া এই দেশ শাসন করিতেন। হূণদের আক্রমণে সমস্তই লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল, কূলপ্লাবী বন্যায় খড়কুটার সহিত মহীরুহও ভাসিয়া গিয়াছিল। অতঃপর স্কন্দের আবির্ভাবে বন্যার জল নামিল বটে কিন্তু নানা স্থানে আবদ্ধ জলাশয় রাখিয়া গেল। পরাজিত হূণ অনীকিনীর অধিকাংশ দেশ ছাড়িয়া গেল, কতক প্রকৃতি-সুরক্ষিত দুর্গম ভূমি আশ্রয় করিয়া রহিয়া গেল।

কুটিল রোগ যেমন তীব্র ঔষধের দ্বারা বিদূরিত না হইয়া দেহের দুর্লক্ষ্য দুরধিগম্য স্থানে আশ্রয় লয়, কয়েকটা হূণ গোষ্ঠীও তেমনি ইতস্তত সানুসঙ্কট-বন্ধুর স্থানে অধিষ্ঠিত হইল। হয়তো স্কন্দ আরও কিছুকাল এই প্রান্তে থাকিতে পারিলে সম্পূর্ণরূপে হূণ উৎপাত উন্মূলিত করিতে পারিতেন,

কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, সাম্রাজ্যের অপর প্রান্তে গুরুতর অশান্তির সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইল। পঞ্চনদ প্রদেশ বাহ্যত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রহিল বটে, কিন্তু ধর্ষিতা নারীর ন্যায় তাহার প্রাক্তন অনন্যপরতা আর রহিল না।

বিটঙ্ক নামক ক্ষুদ্র গিরিরাজ্য এই সময় একদল হূণের করতলগত হইয়াছিল। এই হূণদের প্রধান পুরুষ রোট্ট রাজ্যের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ধারা দেবী নাম্নী এক কুমারীকে অঙ্কশায়িনী করিয়া নূতন রাজবংশের সূচনা করিয়াছিলেন।

প্রথম সংঘর্ষের বিস্ফুরিত অগ্ন্যুদ্‌গার নিভিয়া যাইবার পর বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব হ্রাস পাইতে লাগিল। উগ্র হূণ প্রকৃতি পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ফলে শান্ত হইয়া আসিল। সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন হইল স্বয়ং মহারাজ রোট্টের। ধারা দেবীর কোমল এবং সহিষ্ণু অন্তরে না জানি কোন অপরিমেয় শক্তি ছিল, তিনি এই দুর্ধর্ষ বর্বরকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিলেন। রোট্ট ক্রমশ বুদ্ধের করুণাবাণীর শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহার নামের পশ্চাতে ধর্মাদিত্য উপাধি যোজিত হইল। কপোতকূটের যে চৈত্য হূণদের আগমনে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা পুনর্গঠিত হইল।

রোট্ট ধর্মাদিত্যের রাজত্বকালের সপ্তম বর্ষে মহাদেবী ধারা একটি কন্যা প্রসব করিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার পরম সহিষ্ণু কোমল চক্ষু দু'টি মুদিত করিলেন। কিন্তু রোট্ট আর নূতন মহাদেবী গ্রহণ করিলেন না—একটিমাত্র কন্যার নাম রাখিলেন রট্টা যশোধরা।

প্রথম হূণ অভিযানের পর শতাব্দীর একপদ ক্ষয় হইয়া গেল। ওদিকে স্কন্দগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পর সম্রাট হইয়াছেন। সাম্রাজ্যের চতুঃসীমা ঘিরিয়া বিদ্রোহ এবং অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে; ধীরে ধীরে মগধকে কেন্দ্র করিয়া বহ্নিচক্র সঙ্কুচিত হইতেছে। রাজ্যের অভ্যন্তরেও পুষ্য মিত্রীয়গণ গোপনে মাৎস্যন্যায় ও চক্রান্তের বিষ ছড়াইতেছে। এই বিষবহ্নির মধ্যে স্কন্দ ক্লান্তিহীন নিদ্রাহীনভাবে যুদ্ধ করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহার বিপুল বাহিনী কখনও লৌহিত্যের উপকূলে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীর অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছে, আবার পরদণ্ডেই সেতুবন্ধ অভিমুখে যাত্রা করিয়া শান্তি-সেতু বন্ধনের প্রয়াস পাইতেছে। বর্ষান্তে মহারাজ তাঁহার মহাস্থানীয়ে পদার্পণ করিবার অবকাশ পান না। সচিবগণ পাটলিপুত্রে থাকিয়া যথাসাধ্য রাজকার্য চালাইতেছেন।

সাম্রাজ্যব্যাপী এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাজকার্য যে সুচারুরূপে চলিতেছিল না তাহা বলা বাহুল্য। ভূমিকম্পে যখন মাথার উপর গৃহ ভাঙিয়া পড়িতেছে তখন গৃহকোণে রক্ষিত ক্ষুদ্র তৈজস কেহ লক্ষ্য করে না। তুচ্ছ বিটঙ্ক রাজ্যের কথা পাটলিপুত্রের সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল; পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কেহ তাহার খোঁজ লয় নাই।

রাজ্যের প্রাচীন পুস্তপাল মহাশয়ের মৃত্যু হওয়াতে এক নবীন কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবীনতার উদ্যমে তিনি একদিন অক্ষপটল-গৃহের পুরাতন নিবন্ধ পুস্তকাদি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিটঙ্ক রাজ্যের নাম আবিষ্কার করিলেন। পঁচিশ বৎসর এই রাজ্য হইতে রাজস্ব আসে নাই। রাজ্যটা গেল কোথায়?

বহু নথিপত্র অনুসন্ধানের পর প্রকৃত তথ্য জানা গেল। চিন্তান্বিত নবীন পুস্তপাল মহাশয় দুঃসংবাদটা মহামন্ত্রীর কানে তুলিলেন।

স্কন্দ তখন পাটলিপুত্রে উপস্থিত। সুদূর কেরল দেশে যুদ্ধ করিতে করিতে একটা গুরুতর দুর্যোগের জনশ্রুতি শুনিয়া তিনি ত্বরিতে রাজধানী ফিরিয়াছেন। আবার নাকি হূণ আসিতেছে; লক্ষ লক্ষ শ্বেত হূণ বক্ষু নদী পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। দুইজন চৈনিক শ্রমণ এই সংবাদ লইয়া কপিশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেখান হইতে রাজদূত দিবারাত্র অশ্বচালনা করিয়া স্কন্দের নিকট বার্তা আনিয়াছে। কেরল যুদ্ধের ভার কয়েকজন প্রাচীন সেনাপতির উপর অর্পণ

করিয়া স্কন্দ পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

মহামন্ত্রী বিটঙ্ক রাজ্যের সংবাদ লইয়া রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন—'একটা বড় ভুল হইয়াছে। বিটঙ্ক নামক পঞ্চনদ প্রদেশের একটা রাজ্য আমাদের হিসাব হইতে হারাইয়া গিয়াছিল। দেখা যাইতেছে হূণেরা সেটা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পঁচিশ বৎসর তাহারা রাজস্ব দেয় নাই।'

স্কন্দ তখন প্রাসাদের এক বিশ্রাম-কক্ষে একাকী ছিলেন, মণি কুট্টিমের উপর বসিয়া অক্ষবাটের সম্মুখে পার্ষ্টি ফেলিতেছিলেন ; মন্ত্রীর কথায় স্বপ্নাতুর চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন। স্কন্দের বয়ঃক্রম এই সময় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু বলদৃপ্ত দেহে কোথাও জরার চিহ্নমাত্র নাই ; রমণীর ন্যায় কোমল চক্ষু দু'টি যেন সর্বদাই স্বপ্ন দেখিতেছে। তাঁহার সুঠাম দেহ ও লাবণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া তাঁহাকে পরাক্রান্ত যোদ্ধা বলিয়া মনে হয় না, কবি ও ভাবুক বলিয়া ভ্রম হয়।

স্কন্দ দুই হাতে পার্ষ্টি ঘষিতে ঘষিতে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'পাশা বলিতেছে এবার হূণকে তাড়াইতে পারিব না। তিনবার পাশা ফেলিলাম, তিনবারই পাশা ঐ কথা বলিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য টলিতেছে, ভাঙিয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই।'—তারপর চকিতে সচেতন হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—'আসন গ্রহণ করুন আর্য।'

মহাসচিব পৃথিবীসেন রাজার সম্মুখস্থ আসনে বসিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, শুষ্ক দেহ বংশযষ্টির ন্যায় ঋজু ও গ্রন্থিযুক্ত ; ইনি একাধারে এই বৃহৎ রাজ্যের মহাসচিব ও মহাবলাধিকৃত ; স্কন্দের পিতা কুমারগুপ্তের সময় হইতে অনন্যমনে রাজ্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

পৃথিবীসেন নীরসকণ্ঠে বলিলেন—'কবি কালিদাস একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন—পাশার ভবিষ্যদ্বাণী, মদ্যপের প্রতিজ্ঞা ও শত্রুর হাসি যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা বিচারমূঢ়।—হায় কালিদাস!' দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্বক স্বর্গত কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া মন্ত্রী কহিলেন—'এখন এই বিটঙ্ক রাজ্যটা লইয়া কি করা যায় ?'

ঈষৎ হাসিয়া স্কন্দ বলিলেন—'রাজ্যটা হারাইয়া গিয়াছিল ? বিচিত্র নয়। কেরল যুদ্ধে আমার অঙ্গুরীয় হইতে একটি নীলকান্ত মণি কখন খসিয়া গিয়াছিল জানিতে পারি নাই। আজ প্রথম লক্ষ্য করিলাম। এই দেখুন।' বলিয়া অঙ্গুরীয় দেখাইলেন।

অতঃপর রাজা ও মন্ত্রী মিলিয়া দীর্ঘকাল মন্ত্রণা করিলেন। বিটঙ্ক রাজ্য অবশ্য তাঁহাদের চিন্তার অতি ক্ষুদ্রাংশই অধিকার করিল। অবশেষে স্থির হইল যে হূণ যখন আবার আসিতেছে তখন চতুরঙ্গ বাহিনী লইয়া স্কন্দ তাহাদের আগমপথ রোধ করিবার জন্য এক মাসের মধ্যে পুরুষপুর যাত্রা করিবেন। উপরন্তু পঞ্চনদ প্রদেশের যত সামন্তরাজা আছেন সকলের নিকট অচিরাৎ দূত প্রেরিত হইবে, যাহাতে এই সম্মিলিত সামন্তচক্র হূণদের বিরুদ্ধে ব্যূহরচনা করিয়া স্বরাজ্য রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকেন। বিটঙ্ক রাজ্যেও মগধের দূত যাইবে ; তত্রত্য হূণ রাজাকে মগধের আনুগত্য স্বীকার করিবার আদেশ প্রেরিত হইবে। হূণ যদি স্বীকৃত না হয় তখন স্কন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

সচিব রাজ সন্নিধান হইতে বিদায় লইবার কিয়ৎকাল পরে বিদূষক পিপ্পলী মিশ্র আসিয়া দেখা দিলেন। অতি স্থূলকায় ব্রাহ্মণ, হস্তে একটি বৃহৎ কুষ্মাণ্ড। রাজা দেখিয়া বলিলেন—'পিপুল, একি! কুষ্মাণ্ড কেন ?'

কুষ্মাণ্ড মহারাজের পদপ্রান্তে রাখিয়া বিদূষক মন্ত্রীর পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—'মহারাজ, রিক্তপাণি হইয়া রাজ সমীপে আসিতে নাই, ইহাই শিষ্ট নীতি।'

রাজা বলিলেন—'ঠিকই হইয়াছে, তোমার বুদ্ধি ও কলেবর দুই-ই কুষ্মাণ্ডবৎ। এটি কোথায় সংগ্রহ করিলে ?'

পিপ্পলী বলিলেন—'চালে ফলিয়াছিল। ব্রাহ্মণীকে অনেক স্তোক দিয়া বয়স্যের জন্য আনিয়াছি।'

'ব্রাহ্মণীকে কী স্তোক দিয়াছ?'

'বয়স্য, ব্রাহ্মণীর একটি অকালকুষ্মাণ্ড ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, তাহার বড়ই দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা। এখন মহারাজ যদি তাহাকে কোনও দূর দেশে দূতরূপে প্রেরণ করেন তবেই তাহার সাধ পূর্ণ হয়। আমি মহারাজের নিকট নিবেদন করিব এই স্তোক দিয়া গৃহিণীর কুষ্মাণ্ডটি হস্তগত করিয়াছি।'

রাজা সহাস্যে বলিলেন—'ধন্য পিপুল, তোমার বয়স্য প্রীতি অতুলনীয়। তাহাই হইবে; তোমার ব্রাহ্মণীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেশ ভ্রমণে পাঠাইব। এখন এই কুষ্মাণ্ড রন্ধনশালায় প্রেরণ কর।'

কুষ্মাণ্ড স্থানান্তরিত হইলে স্কন্দ বলিলেন—'পিপুল, এস পাশা খেলি। আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিব। তুমি যদি আমাকে পরাজিত করিতে পার, বুঝিব নিয়তির বিধান অলঙ্ঘনীয়।'

পিপ্পলী মিশ্র বলিলেন—'বয়স্য, পরাজিত করিতে পারি বা না পারি, নিয়তির বিধান চিরদিনই অলঙ্ঘনীয়। কারণ নিয়তি স্ত্রীজাতি।'

'দেখা যাক' বলিয়া স্কন্দ পার্ষ্টি ফেলিলেন।

ইহা আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইবার প্রায় তিন মাস পূর্বের ঘটনা।

অশ্বচোর চিত্রক যে বনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, প্রায় ছয় ক্রোশ ভূমির উপর প্রসারিত। বড় বড় গাছ ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে, তাহাদের শাখায় শাখায় জড়াজড়ি, নিম্নে রবিকরবিদ্ধ ছায়ান্ধকার। বনভূমি সর্বত্র সমতল নয়, স্থানে স্থানে উচ্চ হইয়া রুক্ষ উপলাকীর্ণ অঙ্গ প্রকট করিতেছে। কোথাও তরু পরিবেষ্টিত শষ্পাচ্ছাদিত উন্মুক্ত স্থান, কোথাও বা কঠিন রসহীন মৃত্তিকার উপর শুষ্ক কণ্টকগুল্ম; ক্বচিৎ দুই একটি ক্ষীণধারা প্রস্রবণ। এই বনে মৃগ শূকর শশক ময়ূর নানাবিধ শিকার আছে। প্রধান নগরীর উপকণ্ঠে রাজন্যবর্গের মৃগয়ার জন্য এইরূপ ক্রীড়াকানন সযত্নে রক্ষা করিবার রীতি ছিল।

এই বনের মধ্যে প্রায় তিন ক্রোশ পথ তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইবার পর চিত্রক বল্গার ইঙ্গিতে অশ্বের গতি হ্রাস করিল। বহুদিন চিত্রক ঘোড়ায় চড়ে নাই, তাই ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বায়ুর খর প্রবাহে তাহার রক্তে গতির হর্ষোন্মাদনা জাগিয়াছিল। সে সহসা মস্তক উৎক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই সে থামিয়া গেল; দূর হইতে যেন মনুষ্য কণ্ঠের আহ্বান আসিল। অশ্ব একটি নিষ্পাদপ মুক্ত স্থানের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিল, চকিতে তাহার গতি রোধ করিয়া চিত্রক চারিদিকে চাহিল। দেখিল, মুক্ত ভূমির কিনারায় এক বৃহৎ মধুক বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পাশে একটি ঘোটক।

এতক্ষণ এই বনে একটি মানুষের সঙ্গেও চিত্রকের সাক্ষাৎ হয় নাই, সে সন্দিগ্ধচক্ষে এই ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিল। দূর হইতে ভাল দেখা গেল না, তবু বেশভূষা হইতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। চিত্রক চক্ষুর উপর হস্তাচ্ছাদন দিয়া ভাল করিয়া দেখিল, লোকটি যেই হোক সে একাকী, কাছাকাছি অন্য কেহ নাই। তথাপি চিত্রক ইতস্তত করিল; ভাবিল, পলায়ন করি। কিন্তু ঐ ব্যক্তির সঙ্গেও অশ্ব রহিয়াছে, পলাইলে পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া চিত্রক ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিল।

এইবার অন্য ব্যক্তি অশ্বের বল্গা ধরিয়া তরুমূল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখন চিত্রক দেখিল, অশ্বটি খঞ্জ, তিন পায়ে ভর দিয়া খোঁড়াইয়া চলিতেছে।

ব্যাপার বুঝিয়া চিত্রক অগ্রসর হইয়া গেল। অন্য ব্যক্তি তাহাকে আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, মধুক বৃক্ষের নিকটে উভয়ে মুখোমুখি হইল। কিছুক্ষণ দুইজনে পরস্পর পর্যবেক্ষণ করিল।

চিত্রক দেখিল লোকটির দেহ মেদ-সুকুমার, মুখমণ্ডল গোলাকৃতি, চক্ষুও তদ্রূপ। এক জোড়া সুপুষ্ট গুম্ফ মুখের শোভা বর্ধন করিতেছে বটে, কিন্তু গুম্ফের সুচারু প্রসাধন আর নাই, নানা দুর্যোগের মধ্যে পড়িয়া বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ, পরিধানে হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র ও অঙ্গাবরণ ; উত্তরীয়টি তুম্বের ন্যায় উদর বেষ্টন করিয়া পাশে গ্রন্থিবদ্ধ। কটি হইতে একটি বৃহৎ তরবারি ঝুলিতেছে।

অপরপক্ষে সে ব্যক্তি দেখিল, মহামূল্য সজ্জায় অলঙ্কৃত একটি তেজস্বী অশ্ব, তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া আছে দীনবেশী সৈনিক। অশ্ব ও অশ্বারোহীর বেশভূষা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার ধারণা জন্মিল, অশ্বটি কোনও ধনীব্যক্তির সম্পত্তি এবং আরোহী এই অশ্বের রক্ষক।

সে বলিল—'বাপু, বলিতে পার তোমাদের এই বন্য দেশে কোথাও লোকালয় আছে কিনা ?'

চিত্রক বুঝিল লোকটি তাহারই মত এদেশে নবাগত। সে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল—'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?'

লোকটি ঈষৎ রুষ্ট হইল। এই কিঙ্করটা তাহার সহিত সমকক্ষের মত কথা বলে। এ দেশের লোকগুলা কি একেবারেই গ্রাম্য, সম্মানার্হ বিশিষ্ট পুরুষ দেখিলে চিনিতে পারে না ? সে গুম্ফ ফুলাইয়া বলিল—'কোথা হইতে আসিতেছি সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন নাই। এই বন্য রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অবধি কেবল পাহাড় পর্বতে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ; মানুষগুলাও এমন অসভ্য যে মাগধী অবহট্‌ঠ ভাষা পর্যন্ত ভাল করিয়া বুঝে না। সাতদিন ধরিয়া যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এখনও রাজধানী কপোতকূটে পৌঁছিতে পারিলাম না। কাল রাত্রে এক গ্রামে গৃহস্থের কুটিরে আশ্রয় লইয়াছিলাম ; প্রাতে উঠিয়া দাসীপুত্রটা কপোতকূটের সিধা পথ দেখাইয়া দিল। সেই অবধি পাঁচটা পাহাড় পার হইয়াছি, কিন্তু এখনও কপোতকূটের দেখা নাই। তারপর গণ্ডের উপর পিণ্ড, এই বনে প্রবেশ করিয়া ঘোড়াটা এক গর্তে পা দিল—' লোকটি সশব্দ নিশ্বাস ত্যাগ করিল—'ঘোড়ার পা ভাঙিয়াছে, সমস্ত দিন পেটে অন্ন নাই ; যদি গুরুতর রাজকার্য না থাকিত কোন্ কালে এই দেববর্জিত দেশ ছাড়িয়া যাইতাম।'

চিত্রক প্রশ্ন করিল—'তুমি কপোতকূটে যাইতে চাও ? রাজকার্যে ?'

লোকটি গম্ভীরভাবে বলিল—'হাঁ, গুরুতর রাজকার্যে। আমার নাম শশিশেখর শর্মা, মগধের রাজ-বয়স্য আমার—, কিন্তু সে যাক। কপোতকূট কি এখান হইতে অনেকদূর ?'

পাঠক বুঝিয়াছেন, শশিশেখর শর্মা আর কেহ নয়, বিদূষক পিপ্পলী মিশ্রের ব্রাহ্মণীর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাহার প্রশ্নের উত্তরে চিত্রক বলিল—'কপোতকূট অনেকদূর, আজ রাত্রে পৌঁছিতে পারিবে না। ঘোড়া থাকিলে পৌঁছিতে পারিতে।'

মগধের রাজদূত চিত্রকের ঘোড়ার পানে লুব্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিল, বলিল—'এটি কি তোমার ঘোড়া ?'

'হাঁ।'

শশিশেখর পুরা বিশ্বাস করিল না, কিন্তু অবিশ্বাস করিয়াও কোনও লাভ নাই। সে উৎসুক স্বরে বলিল—'তোমার ঘোড়া বিক্রয় করিবে ?'

চিত্রক কুঞ্চিত নেত্রে তাহার পানে চাহিল—'কত মূল্য দিবে ?'

শশিশেখর অশ্বের প্রতি তাকাইয়া গুম্ফের একপ্রান্ত অঙ্গুলি দ্বারা আকর্ষণ করিতে করিতে বিবেচনা করিল, তারপর বলিল—'সসজ্জ অশ্বের জন্য পাঁচ কার্ষাপণ দিব।'

চিত্রক ভাবিল, পরের দ্রব্য পরকে বিক্রয় করিয়া যদি পাঁচ কার্ষাপণ পাওয়া যায় মন্দ কি ? অপহৃত অশ্ব নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয়, ধরা পড়িবার ভয় আছে। কিন্তু চিত্রক দেখিল, রাজদূত মহাশয়ের প্রয়োজনের গুরুত্ব বড় বেশি ; প্রয়োজনের অনুপাতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। চিত্রক অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিল—"কার্ষাপণ ! এই অশ্বের সজ্জার মূল্যই পাঁচ দীনার। তোমাদের মগধ দেশে সম্ভবত তোমরা গর্দভে আরোহণ করিয়া থাক, তাই অশ্বের মূল্য জান না।' বলিয়া অশ্বের মুখ ফিরাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

শশিশেখর মনে মনে বড়ই ক্রুদ্ধ হইল ; কিন্তু এদিকে অশ্বারোহী চলিয়া যায়। শশিশেখর ক্রোধ গলাধঃকরণ করিয়া ডাকিল—'শুন শুন। তুমি আমার অসহায় অবস্থা দেখিয়া অনুচিত মূল্য দাবি করিতেছ। পাটলিপুত্রে এরূপ করিলে দুই শত পণ দণ্ড দিতে হইত। কিন্তু অসভ্য বন্য দেশে—, যাক, পাঁচ দীনারই দিব।'

চিত্রক ফিরিয়া বলিল—'পাঁচ দীনার তো সজ্জার মূল্য। অশ্বটি কি বিনা শুল্কে চাও ?'

শশিশেখর বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে অর্থ সম্বন্ধে বিলক্ষণ হিসাবী, অকারণে অর্থব্যয় করিতে তাহার বড়ই অরুচি। অথচ এই অর্থগৃধ্নু রাক্ষসটা সুবিধা পাইয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতে চায়। সে অস্থির হইয়া বলিল—'আবার অশ্বের মূল্য। পাঁচটি দীনারেও যথেষ্ট হইল না ? এটা কি দস্যুর রাজ্য ?'

চিত্রক হাসিল—'দস্যুর রাজ্যই বটে।—ভাবিয়া দেখ, অশ্বের জন্য আরও পাঁচটি দীনার দিতে পারিবে ? না পার—চলিলাম।'

আবার অশ্বারোহী চলিয়া যায়। তখন শশিশেখর বিষণ্ণ স্বরে বলিল—'আমি—আমি ছয়টি দীনার এবং এই অশ্বটি তোমাকে দিব, পরিবর্তে তোমার ঘোড়া আমাকে দাও। ইহার অধিক আর আমি দিতে পারিব না।'

'তোমার অশ্ব লইয়া আমি কি করিব ? মৃত গর্দভের মূল্য কি ?'

'মৃত গর্দভ ! উহার সামান্য আঘাত লাগিয়াছে মাত্র, দুই দিনেই সারিয়া যাইবে। তখন উহাকে অনেক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে।'

চিত্রক দেখিল, মগধের দূত আর বেশি উঠিবে না। তাহার ঘোড়াটি নিতান্ত মন্দ নয়, পায়ের আঘাত অল্প শুশ্রূষাতেই আরোগ্য হইবে। চিত্রকের একটি ঘোড়া থাকিলে ভাল হয়, যোদ্ধার অশ্বই সম্পদ। সে সম্মত হইল।

তখন শশিশেখর কটি হইতে উত্তরীয় খুলিয়া তদভ্যন্তর হইতে একটি থলি বাহির করিল। থলিটি বেশ পরিপুষ্ট। শশিশেখর সঞ্চয়ী ব্যক্তি, বিদেশ যাত্রার পূর্বে নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু এই থলিতে ভরিয়া লইয়াছিল। রাজকোষ হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণরৌপ্য তো ছিলই, উপরন্তু কড়ি ছিল, প্রসাধনের জন্য চন্দন তিলক ছিল, কঙ্কতিকা ছিল, মুখশুদ্ধির জন্য এলাচ লবঙ্গ হরীতকী ছিল—আরও কত কি ! আড়চক্ষে চিত্রকের পানে চাহিয়া শশিশেখর থলির মুখ খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

থলি হইতে দীনার বাহির করিতে গিয়া অসাবধানে কয়েকটি শলাকার ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তু মাটিতে পড়িল। চিত্রক সেই দিকেই তাকাইয়া ছিল, এখন দ্রুত অশ্ব হইতে নামিয়া সেগুলি কুড়াইয়া লইল। হাতে তুলিয়া দেখিল, গজদন্তের পার্ষ্টি !

দ্যূতক্রীড়ার দুর্নিবার মোহ আছে। চিত্রক উৎসুক বিস্ময়ে বলিল—'দূত মহাশয়, আপনার থলিতে পাশা খেলার পার্ষ্টি দেখিতেছি !'

শশিশেখর কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল—'অক্ষক্রীড়া চতুঃষষ্টি কলার অঙ্গ, পাটলিপুত্রের সজ্জন নাগরিক মাত্রেই পাশা খেলিয়া থাকেন। স্বয়ং পরমভট্টারক—'

চিত্রক বলিল—'তুমি আমার সহিত পাশা খেলিবে ? ঘোড়া বাজি রহিল, যদি জিতিতে পার, বিনা মূল্যে আমার ঘোড়া পাইবে ; আর যদি আমি জিতি, তোমার ঐ খঞ্জ অশ্ব লইব।'

মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া শশিশেখর দেখিল, হারিলে তাহার কোনও ক্ষতি নাই, জিতিলে বিশেষ লাভ—ছয়টি স্বর্ণ দীনার বাঁচিয়া যাইবে। সে বলিল—'উত্তম, খেলিব। আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ হইলেও দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা দ্যূতক্রীড়ায় কেহ আহ্বান করিলে পশ্চাৎপদ হই না।'

তখন দুইজনে, অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া, বৃক্ষতলে তৃণের উপর বসিয়া খেলিতে আরম্ভ করিল। অল্পকাল মধ্যেই উভয়ে খেলায় মাতিয়া উঠিল, ক্ষুধা তৃষ্ণা আর রহিল না।

কিন্তু উত্তেজনা মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে। খেলা যখন শেষ হইল তখন দেখা গেল শশিশেখরের অশ্বটির স্বত্বাধিকার হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ক্ষোভে গুম্ফের প্রান্ত টানিতে টানিতে শশিশেখর বলিল—'তুমি নিপুণ ক্রীড়ক বটে। ভাগ্যবলে আমাকে পরাজিত করিয়াছ। আবার খেলিবে ?'

চিত্রক বলিল—'খেলিব। এবার কি পণ রাখিবে ?'

'এবার তরবারি পণ।' বলিয়া শশিশেখর কটি হইতে তরবারি খুলিয়া পাশে রাখিল।

চিত্রক বলিল—'ভাল, আমি দুটি অশ্বই পণ রাখিলাম।'

শশিশেখর হৃষ্ট হইয়া খেলিতে বসিল। কিন্তু এবারও ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি বিমুখ হইলেন। তরবারি তুলিয়া লইয়া চিত্রক বলিল—'আর খেলিবে ?'

যে পরাজিত হয় তাহার খেলিবার ঝোঁক আরও বাড়িয়া যায় ; কৃপণও তখন দুঃসাহসী হইয়া উঠে। শশিশেখর আরক্ত নেত্রে চাহিয়া বলিল—'খেলিব। তুমি দুইবার জিতিয়াছ বলিয়া কি বার বার জিতিবে ?'

'উত্তম। আমি দুইটি অশ্ব ও তরবারি পণ রাখিলাম। তোমার পণ ?'

'আমার পণ—' শশিশেখর সহসা থমকিয়া গেল ; তাহার মস্তিষ্ক কোটরে ঈষৎ সুবুদ্ধির উদয় হইল। ঘোড়া ও তরবারি তো গিয়াছে, এইভাবে যদি সব যায় ?

তাহাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া চিত্রক ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—'ভয় পাইতেছ ?'

সুবুদ্ধিটুকু ভাসিয়া গেল। শশিশেখর ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল—'ভয়! কোন্ অর্বাচীন এমন কথা বলে ? আমি যথাসর্বস্ব পণ রাখিয়া খেলিতে পারি। তুমি খেলিবে ?'

'আপত্তি নাই। কিন্তু আপাতত ঐ অঙ্গুরীয় পণ রাখিতে পার।'

শশিশেখর নিজ অঙ্গুরীয়ের পানে চাহিল। মগধের রাজকীয় মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়, ইহাই বিটঙ্ক রাজসভায় তাহার প্রবেশপত্র। কিন্তু শশিশেখর তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। সে অঙ্গুরীয় খুলিয়া সবেগে ভূমির উপর স্থাপন করিয়া বলিল—'তাহাই হোক। এস—এবার দেখিব।'

আবার খেলা আরম্ভ হইল। খেলার ফল কিন্তু ভিন্নরূপ হইল না। খেলার শেষে চিত্রক অঙ্গুরীয়টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া নিজ তর্জনীতে পরিধান করিল, বলিল—'দূত মহাশয়, এবার চলিলাম। আজ সারাদিন আহার হয় নাই, ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। আমাকেও অনেক দূর যাইতে হইবে।'

এতক্ষণে শশিশেখর একেবারে ফাটিয়া পড়িল ; লাফাইয়া উঠিয়া গর্জন করিল—'তুই কিতব! হস্তলাঘব করিয়া আমার পণ জিতিয়া লইয়াছিস।'

চিত্রকও বিদ্যুতের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। কিতব শব্দটা অক্ষক্রীড়কের পক্ষে অত্যন্ত দূষণীয়। তাহার ললাটের তিলক-চিহ্ন আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার ক্ষিপ্র রোষ অন্তর্হিত হইল। শশিশেখরের মেদ-মসৃণ দেহের উগ্র ভঙ্গিমা দেখিয়া ক্রুদ্ধ শজারুর শল্লকাবৃত বিক্রমের চিত্র স্মরণ হইয়া গেল। সে তাহার স্ফীত-গুম্ফ

মুখের পানে চাহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, বলিল—'পার্ষ্টি তোমার, আমি হস্তলাঘব করিলাম কিরূপে ?'

কথাটা সঙ্গত। যাহার পাশা সে পার্ষ্টির মধ্যে ধাতু প্রবিষ্ট করাইয়া কৈতব করিতে পারে। শকুনি ও পুষ্কর তাহাই করিয়াছিল। কিন্তু শশিশেখরের তাহা বুঝিবার মত মনের অবস্থা ছিল না, সে চিৎকার করিতে লাগিল—'তুই ধূর্ত কিতব, কিতবের অসাধ্য কাজ নাই।'

চিত্রক বলিল—'ও শব্দ আর ব্যবহার করিও না, বিপদ ঘটিবে। ভাগ্যদেবী তোমার প্রতি বিমুখ তাই তুমি হারিয়াছ। শুন, আর একবার তোমাকে সুযোগ দিতেছি। তুমি এখনি বলিয়াছ যে সর্বস্ব পণ রাখিয়া খেলিতে পার। এস, সর্বস্ব পণ করিয়া খেল, আমিও সর্বস্ব পণ করিতেছি। যদি জিতিতে পার, যাহা কিছু হারিয়াছ সমস্তই ফিরিয়া পাইবে ; আমার ঘোড়াও পাইবে। সম্মত আছ ?'

শশিশেখর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া চিন্তা করিল। তাহার সর্বস্বই গিয়াছে, আছে কেবল থলিটি। থলিতে গুটিকয় স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা আছে সত্য, কিন্তু এই নির্জন অরণ্যে সেগুলি কোন্ কাজে লাগিবে ? ঘোড়া ফিরিয়া পাইলে আশা আছে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে, নচেৎ বনে রাত্রিবাস সুনিশ্চিত। বনে নিশ্চয় ব্যাঘ্র তরক্ষু আছে—। আসন্ন রাত্রির কথা ভাবিয়া সহসা তাহার হৃৎকম্প হইল। ইহা যে মৃগয়া-কানন তাহা সে জানিত না।

শশিশেখর আর দ্বিধা করিল না, আবার খেলিতে বসিল। কিন্তু ভাগ্যদেবী সত্যই তাহার উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন, সে জিতিতে পারিল না। ক্ষোভে হতাশায় পার্ষ্টি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চিত্রক সযত্নে পার্ষ্টিগুলি তুলিয়া লইয়া বলিল—'এ পার্ষ্টি এখন আমার। মনে রাখিও তুমি সর্বস্ব হারিয়াছ।'

শশিশেখর উন্মত্ত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল—'তুই চোর তস্কর, কৈতব করিয়া আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিস।'

চিত্রকের চক্ষু অসি ফলকের ন্যায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—'আর যাহা বল আপত্তি নাই, কিন্তু কিতব শব্দ আর উচ্চারণ করিও না। একবার নিষেধ করিয়াছি।'

উন্মত্ত শশিশেখর গর্জন করিয়া বলিল—'কিতব ! কিতব ! কিতব ! সহস্রবার বলিব। আমার হাতে যদি তরবারি থাকিত—'

চিত্রকের নাসা স্ফুরিত হইয়া উঠিল, সে শশিশেখরের তরবারি তাহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'এই নাও তোমার তরবারি। কি করিবে ? যুদ্ধ ?'

শশিশেখর তরবারি তুলিয়া লইল। সে বোধহয় কিছু অসিবিদ্যা জানিত, কিন্তু বর্তমান মানসিক অবস্থায় তাহাও বিস্মরণ হইয়াছিল। সে তরবারি ঊর্ধ্বে তুলিয়া চিত্রককে আক্রমণ করিল।

দুইবার অসিতে অসিতে ঠোকাঠুকি হইল, তারপর শশিশেখরের অস্ত্র ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িল।

চিত্রক বলিল—'ভাবিয়াছিলাম তোমাকে দয়া করিব, সর্বস্ব লইব না। কিন্তু তুমি অপাত্র। থলি দাও।'

ক্রন্দনোন্মুখ শশিশেখর ফুলিতে ফুলিতে থলি ফেলিয়া দিল।

'এবার তোমার উষ্ণীষ বস্ত্র ও অঙ্গাবরণ দাও।'

শশিশেখর হতভম্ব হইয়া গেল।

'অ্যাঁ—তবে কি আমি উলঙ্গ থাকিব ?'

চিত্রক হাসিল। 'সে তুমি জান। আমার সম্পত্তি আমি লইব।'

'তুই চোর দস্যু তস্কর।'

'শীঘ্র দাও—নচেৎ কাড়িয়া লইব।'

হতভাগ্য শশিশেখর তখন নিরুপায় হইয়া মধুক বৃক্ষের অন্তরালে গেল, বস্ত্রাদি খুলিয়া চিত্রকের দিকে ফেলিয়া দিল। নিষ্ফল ক্রোধের তপ্ত অশ্রুজল তাহার গুম্ফ ভিজাইয়া দিতে লাগিল।

নিজের সমস্ত সম্পত্তি লইয়া চিত্রক অশ্বে চড়িয়া বসিল। শশিশেখরের ঘোড়ার পৃষ্ঠে তরবারির কোষ দ্বারা সবেগে আঘাত করিতেই সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পলায়ন করিল। চিত্রক তখন বৃক্ষের কাণ্ড লক্ষ্য করিয়া বলিল—'তোমাকে তবু একটা দয়া করিলাম, তোমার তরবারিটা ফেলিয়া গেলাম। যদি নকুল অথবা শশক তাড়া করে, আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।'

বেলা তখন পড়িয়া আসিতেছে, সূর্য তরুচূড়া স্পর্শ করিয়াছে। দিক্‌নির্ণয় করিয়া লইয়া চিত্রক সূর্যকে দক্ষিণে রাখিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইল।

শশিশেখর বনের মধ্যেই পড়িয়া রহিল। তাহার বর্তমান অবস্থায় তাহাকে আর পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত হইবে না।

প্রাকার-বেষ্টিত কপোতকূট নগরের উত্তর তোরণের নিকট চিত্রক যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়াছে। তোরণের অনতিদূর পর্যন্ত গিয়া বন শেষ হইয়াছে; এইখানে আসিয়া চিত্রক অশ্ব ছাড়িয়া দিল। তারপর শশিশেখরের বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, মস্তকে লৌহজালিকের উপর উষ্ণীষ বাঁধিয়া স্বচ্ছন্দ অনুদ্বেগ পদক্ষেপে নগরে প্রবেশ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
প্রাসাদ শিখরে

আকাশে প্রায় পূর্ণাবয়ব চন্দ্র। চন্দ্রালোকে কপোতকূট নগর অতি সুন্দর দেখাইতেছিল।

বিটঙ্ক রাজ্যটি পারিপার্শ্বিক ভূখণ্ড হইতে উচ্চে মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। মালভূমিও সমতল নয়, তরঙ্গায়িত হইয়া প্রান্ত হইতে যতই কেন্দ্রের দিকে গিয়াছে ততই উচ্চ হইয়াছে। কেন্দ্রস্থলে কপোতকূট নগর। রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখরের উপর অধিষ্ঠিত বলিয়াই বোধহয় ইহার নাম কপোতকূট।

নগরটি রাজ্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ; কোথাও সমভূমি নয়, চারিদিকে উচ্চ প্রাকারের দৃঢ় পরিবেষ্টনী; তন্মধ্যে মহেশ্বরের জটাজালবদ্ধ চন্দ্রকলার ন্যায় অপূর্ব সুন্দর নগর শোভা পাইতেছে।

বসন্ত রজনীতে চন্দ্রবাষ্পাচ্ছন্ন দীপালোকিত নগরের সৌন্দর্য শতগুণ বর্ধিত হইয়াছিল। পথগুলি আঁকাবাঁকা, দুই পার্শ্বে পাষাণনির্মিত হর্ম্য। মাঝে মাঝে প্রমোদ-বন; পথের সন্ধিস্থলে জলাধারের মধ্যবর্তী গোমুখ হইতে প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতেছে। উল্কাধারিণী পাষাণ বনদেবীর মূর্তি রাজপথে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। বহু নাগরিক-নাগরিকা বিচিত্র বেশ প্রসাধনে সজ্জিত হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতেছে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-নিষিক্ত বায়ু সেবন করিয়া দিবসের তাপ-গ্লানি দূর করিতেছে। প্রমোদ-বন হইতে কখনও বংশীরব উঠিতেছে; কোথাও লতানিকুঞ্জ হইতে মৃদুজল্পিত প্রণয়কূজন ও অস্ফুট কলহাস্য উত্থিত হইতেছে; কঙ্কণ মঞ্জীরের ঝঙ্কার কখনও কৌতুকে উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে, কখনও আবেশে মদালস হইয়া পড়িতেছে। কপোতকূটে কপোত-মিথুনের অভাব নাই।

নগরীর একটি পথ দীপমালায় উজ্জ্বল। বিলাসিনী নাগরিকার ন্যায় রাত্রিকালেই এই পথের

শোভা অধিক, কারণ প্রধানত ইহা বিলাসের কেন্দ্র। পথের দুই পাশে অগণিত বিপণি ; কোনও বিপণিতে কেশর সুরভিত তাম্বূল বিক্রয় হইতেছে, বিক্রেত্রী রক্তাধরা চঞ্চলাক্ষী যুবতী। ক্রেতার অপ্রতুল নাই, রূপশিখাকৃষ্ট নাগরিকগণ চারিদিকে ভিড় করিয়া আছে ; চপল পরিহাস, সরস ইঙ্গিত, লোল কটাক্ষের বিনিময় চলিতেছে। যে পসারিণী যত সুন্দরী ও রসিকা, তাহার পণ্য তত অধিক বিক্রয় হইতেছে।

বিপণির ফাঁকে ফাঁকে মদিরাগৃহ। পিপাসু নাগরিকগণ সেখানে গিয়া নিজ নিজ রুচি অনুসারে গৌড়ী মাধ্বী পান করিতেছে। আসবে যাহাদের রুচি নাই তাহারা কপিত্থ সুবাসিত তক্র বা ফলাম্লরস সেবন করিয়া শরীর শীতল করিতেছে। মদিরাগৃহের অভ্যন্তরে বহু কক্ষ ; কক্ষগুলি সুসজ্জিত, তাহাতে আস্তরণের উপর বসিয়া ধনী বণিকপুত্রগণ দ্যূতক্রীড়া করিতেছে। কোনও কক্ষে মৃদঙ্গ সপ্তস্বরা সহযোগে সঙ্গীতের চর্চা হইতেছে। মদিরাগৃহের কিঙ্করীগণ চষক ও ভৃঙ্গার হস্তে সকলকে আসব যোগাইতেছে।

নগর-নারীদের গৃহদ্বারে পুষ্পমালা দুলিতেছে ; অভ্যন্তর হইতে মৃদু রক্তাভ আলোক-রশ্মি ও যন্ত্রের স্বপ্নমদির নিক্কণ পথচারীকে উন্মন করিয়া তুলিতেছে। পথে সুখান্বেষী নাগরিকের মন্থর যাতায়াত, কুসুমের মদমোহিত গন্ধ, প্রসাধন ও ভূষণাদির বৈচিত্র্য, ক্বচিৎ কৌতুক-বিগলিতা নারীর কণ্ঠ হইতে বিচ্ছুরিত হাস্য, ক্বচিৎ কলহের কর্কশ রূঢ়স্বর—এই সব মিলিয়া এক অপূর্ব সম্মোহন সৃষ্টি করিয়াছে।

বিলাস বিহ্বলতার আবর্ত হইতে দূরে নগরের আর একটি কেন্দ্র রাজপুরী। পূর্বেই বলিয়াছি—নগর সর্বত্র সমভূমি নয়, কোথাও উচ্চ কোথাও নীচ। যে ভূমির উপর রাজপুরী অবস্থিত তাহা নগরীর মধ্যে সর্বোচ্চ, নগরীতে প্রবেশ করিয়া চক্ষু তুলিলেই সর্বাগ্রে রাজপুরীর ভীমকান্তি আয়তন চোখে পড়ে, মনে হয় কপোতকূট দুর্গের মধ্যস্থলে আর একটি দুর্গ সগর্বে মাথা তুলিয়া আছে।

প্রথমে প্রাকার বেষ্টন ; স্থূল চতুষ্কোণ প্রস্তরে নির্মিত—প্রস্থে দ্বাদশ হস্ত, দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্ধ ক্রোশ—বলয়ের ন্যায় চক্রাকারে পুরভূমিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাকারের অভ্যন্তরে সুড়ঙ্গ আছে ; কিন্তু সে কথা পরে হইবে। নগরীর প্রধান পথ যেখানে আসিয়া প্রাকার স্পর্শ করিয়াছে সেইখানে উচ্চ তোরণদ্বার। ইহাই রাজপুরী হইতে আগম নিগমের একমাত্র পথ। শলাকা কণ্টকিত লৌহের বিশাল কবাট ; দুই পাশে স্থূল বর্তুল তোরণ-স্তম্ভ ; তোরণ-স্তম্ভের অভ্যন্তরে প্রতীহার-গৃহ। শূলহস্ত প্রতীহার দিবারাত্র তোরণ পাহারা দিতেছে।

তোরণ অতিক্রম করিয়া সম্মুখেই সভাগৃহ। তাহার পশ্চাতে মন্ত্রগৃহ। অতঃপর দক্ষিণে বামে বহু ভবন—কোষাগার আয়ুধগৃহ যন্ত্রভবন—কাছাকাছি হইলেও প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দণ্ডায়মান। মধ্যস্থলে রাজ-অবরোধের মর্মরনির্মিত ত্রি-ভূমক প্রাসাদ—সাত কৌটার মধ্যস্থিত মৌক্তিক, সাত শত রাক্ষসীর বিনিদ্র সতর্কতা যেন নিরন্তর তাহাকে ঘিরিয়া আছে। দ্বারে দ্বারে যবনী প্রতিহারীর পাহারা।

এই ত্রি-ভূমক প্রাসাদের উন্মুক্ত ছাদে পুষ্পাকীর্ণ কোমল পক্ষ্মল আস্তরণের উপর অর্ধশয়ান হইয়া রাজকুমারী রট্টা যশোধরা প্রিয়সখী সুগোপার সহিত কথা কহিতেছিলেন। কথা এমন কিছু নয়, আকাশের দিকে চাহিয়া অলসকণ্ঠে দু'একটি তুচ্ছ উক্তি, তারপর নীরবতা, আবার দু'একটি তুচ্ছ কথা। এমনিভাবে আলাপ চলিতেছিল। যেখানে মনের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই, সেখানে অবিচ্ছেদ কথা বলার প্রয়োজন হয় না।

প্রপাপালিকা সুগোপার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে। কুমারী রট্টা যশোধরাকেও তিনি দেখিয়াছেন, হয়তো চিনিতে পারেন নাই। যে কিশোর কার্তিকেয় বিদ্যুতের মত সুগোপার

জলসত্রে দেখা দিয়াছিলেন, যাঁহার অশ্ব চুরি করিয়া চিত্রক পলায়ন করিয়াছিল, তিনি আর কেহ নহেন, মৃগয়াবেশধারিণী রাজনন্দিনী রট্টা। হূণদুহিতা পুরুষবেশে মৃগয়া করিতে ভালবাসিতেন।

কবি কালিদাস বলিয়াছেন, বল্কল পরিধান করিলে সুন্দরী তন্বীকে অধিক সুন্দর দেখায়। হয়তো দেখায়, আমরা কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। কিন্তু যোদ্ধৃবেশ ধারণ করিলে রূপসীর রূপ বর্ধিত হয় একথা স্বীকার করিতে পারিব না। ভাল দেখাইতে পারে, কিন্তু অধিক সুন্দর দেখায় না। আমরা বলিব, কুমারী রট্টার মত যিনি তন্বী ও সুন্দরী, যাঁহার বয়স আঠার বৎসর—তিনি অলকগুচ্ছ কুন্দকলি দ্বারা অনুবিদ্ধ করুন, লোধ্ররেণু দিয়া মুখের পাণ্ডুশ্রী আনয়ন করুন, চূড়াপাশে নব কুরুবক ধারণ করুন, কর্ণে শিরীষ পুষ্পের অবতংস দুলাইয়া দিন, হৃৎস্পন্দনের তালে যূথীকঞ্চুক নৃত্য করিতে থাকুক, নীবিবন্ধে কর্ণিকার কাঞ্চী মূর্ছিত হইয়া থাক—লোভী পুরুষ তো দূরের কথা, অনসূয়া সখীরাও ফিরিয়া ফিরিয়া সে রূপ দেখিবে।

তেমনই, পুষ্পাভরণভূষিতা রট্টার পানে সখী সুগোপাও থাকিয়া থাকিয়া বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিতেছিল। দুই সখীর মধ্যে গভীর ভালবাসা। রাজকন্যাও যখন সুগোপার পানে তাঁহার অলস নেত্র ফিরাইতেছিলেন, তখন তাঁহার হিমকরস্নিগ্ধ দৃষ্টি অকারণেই সখীকে প্রীতির রসে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছিল। দুইজনে আশৈশব খেলার সাথী ; যৌবনে এই প্রীতি আরও গাঢ় হইয়াছিল। সুগোপার স্বামী সংসার সবই ছিল, কিন্তু তাহার জীবন আবর্তিত হইত রট্টাকে কেন্দ্র করিয়া। আর, বিশাল রাজ-অবরোধের মধ্যে একাকিনী কুমারী রট্টা—তিনিও এই বাল্যসখীকে একান্ত আপনার জানিয়া বুকে টানিয়া লইয়াছিলেন।

তবু, রাজকন্যার সহিত প্রপাপালিকার ভালবাসা বিস্ময়কর মনে হইতে পারে। কিন্তু এতই কি বিস্ময়কর ? রাজায় রাজায় কি প্রণয় হয় ? রাজকুমারীর সহিত রাজকুমারীর প্রণয় হয় ? হয়তো হয়, কিন্তু তাহা বড় দুর্লভ। যেখানে অবস্থার তারতম্য আছে সেইখানেই প্রকৃত ভালবাসা জন্মে। নির্ঝরের জল পর্বত শিখর হইতে গভীর খাদে ঝাঁপাইয়া পড়ে, উচ্চাভিলাষী ধূম নিম্ন হইতে ঊর্ধ্বে আকাশে উত্থিত হয়। ইহাই স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া রট্টার ধমনীতে হূণ রক্ত আভিজাত্যের প্রভেদ স্বীকার করিত না। হূণ বর্বর হোক, সে আভিজাত্যের উপাসক নয়, শক্তির উপাসক।

রট্টা একমুঠি মল্লিকা ফুল আস্তরণ হইতে তুলিয়া লইয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন, তারপর চাঁদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'মধুঋতু তো শেষ হইতে চলিল ; এবার ফুলও ফুরাইবে। সুগোপা, তখন তুই কি করিবি ?'

রট্টার বাম কর্ণ হইতে শিরীষ পুষ্পের ঝুমকা খুলিয়া গিয়াছিল, সুগোপা উঠিয়া সযত্নে সেটি পরাইয়া দিল। মুকুরের মত ললাট হইতে দু'একটি চূর্ণ কুন্তল সরাইয়া দিয়া বলিল—'ফুল যখন ফুরাইবে, তখন চন্দন দিয়া তোমাকে সাজাইব। চুলে স্নিগ্ধ স্নানকষায় মাখিয়া কর্পূর সুবাসিত জলে ধারাযন্ত্রে তুমি স্নান করিবে, আমি তোমার মুখে চন্দনের তিলক, বুকে চন্দনের পত্রলেখা আঁকিয়া দিব ; সিক্ত উশীরের পাখা দিয়া তোমাকে ব্যজন করিব। সখি, তবু কি তোমার দেহের তাপ জুড়াইবে না ?' সুগোপার মুখে একটু চাপা হাসি।

হাসির গূঢ় ইঙ্গিত রট্টা বুঝিলেন, পুষ্পমুষ্টি সুগোপার গায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন—'তোর পাখার বাতাসে আমার দেহের তাপ জুড়াইবে কেন ?'

সুগোপা বলিল—'যাঁহার পাখার বাতাসে অঙ্গ শীতল হইত, তিনি তো আসিয়াছিলেন, তুমি যে হাসিয়াই তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলে।'

রট্টা ক্ষণকাল নীরব রহিলেন, তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—'সুগোপা, সত্য বল দেখি, গুর্জরের রাজকুমারের গলায় বরমাল্য দিলে তুই সুখী হইতিস ?'

এইখানে পূর্বতন প্রসঙ্গ কিছু বলা প্রয়োজন।

ইদানীং মহারাজ রোট্ট ধর্মাদিত্য ঐহিক বিষয়ে কিছু অধিক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজকার্যে তিনি বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না; কিন্তু কয়েক মাস পূর্বে একান্তমনে ধর্মচর্চা করিতে করিতে তিনি সহসা উদ্বিগ্ন হইয়া লক্ষ্য করিলেন যে তাঁহার কন্যার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ লক্ষ্য করিবার কারণ ঘটিয়াছিল।

রোট্ট যখন পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই রাজ্য বিজয় করেন তখন তাঁহার এক সহকারী যোদ্ধা ছিল—তাহার নাম তুষ্‌ফাণ। তুষ্‌ফাণ তাহার বীর্য এবং বাহুবল দ্বারা রোট্টকে বহুপ্রকার সাহায্য করিয়াছিল; এমন কি ভূতপূর্ব রাজাকে ধৃত করিয়া সে-ই স্বহস্তে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছিল। তাই, রাজ্য কবলীকৃত হইলে রোট্ট তুষ্ট হইয়া রাজ্যের সীমান্তস্থিত চষ্টন নামক প্রধান গিরিদুর্গ তাহাকে অর্পণ করেন। পদমর্যাদায় রাজার পরেই তাহার স্থান নির্দিষ্ট হয়।

তাহার পর বহু বর্ষ অতীত হইয়াছে, তুষ্‌ফাণের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পুত্র কিরাত এখন চষ্টন দুর্গের অধিপতি। কিরাত সুদর্শন যুবা—কিন্তু কুটিল ও নিষ্ঠুর বলিয়া তাহার কুখ্যাতি ছিল। লোকে বলিত, হূণ রক্তই তাহার দেহে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

এই কিরাত একদা নবযৌবনা তেজস্বিনী রট্টাকে দেখিয়া মজিল। অন্য কেহ হইলে হয়তো নিজ স্পর্ধায় ভীত হইয়া পলায়ন করিত, কিন্তু কিরাত নিজ দুর্গ ছাড়িয়া কপোতকূটে আসিয়া বসিল। রাজসভায় নিত্য যাতায়াতে কুমারীর সহিত প্রত্যহই তাহার সাক্ষাৎ হয়। সুমিষ্ট ভাষণে কিরাত যেমন পটু, আবার মৃগয়াদি পুরুষোচিত ক্রীড়ায় তেমনই দক্ষ। মৃগয়ায় সে রাজকুমারীর নিত্য পার্শ্বচর হইয়া উঠিল।

তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে রাজকুমারীর বাকি রহিল না। হূণকন্যা শিশুকাল হইতে অন্তঃপুরের নীড় ছাড়িয়া মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত, তাই তাঁহার বুদ্ধিও একটি অনবগুণ্ঠিত স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছিল। মৃগয়াকালে তিনি কিরাতের অব্যর্থ লক্ষ্যের প্রশংসা করিলেন, উদ্যান বাটিকায় তাহার সরস চাটু বচনে হাস্য করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রশংসাদৃষ্টি মোহমুক্ত হইয়াই রহিল, হাসিতে অধররাগ ভিন্ন অন্য কোনও রাগ-রক্তিমা ফুটিল না। কিরাত অনুভব করিল, রাজকন্যা সর্বদাই তাহাকে মনে মনে বিচার করিতেছেন, তুলাদণ্ডে ওজন করিতেছেন। তাহার দুর্দম অভীপ্সা আরও প্রবল ও ব্যক্ত হইয়া উঠিল।

নগরে এই কথা লইয়া লোফালুফি আরম্ভ হইল। সচিব ও সভাসদগণ পূর্বেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সর্বশেষে রাজাও লক্ষ্য করিলেন।

রাজা প্রথমে বিস্মিত হইলেন; তারপর সচিবদের ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। উদ্ধতপ্রকৃতির কিরাতের প্রতি কেহই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁহারা মত দিলেন, একজন সামন্তপুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইতে পারে না; বিশেষত যখন কুমারীই রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী। তাহাতে রাজবংশের মর্যাদার হানি হইবে। বরং নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্যান্য রাজবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা কর্তব্য। মিত্র যদি সম্বন্ধী হয়, তাহা হইলে বিপৎকালে সাহায্যপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না।

সচিবদের মন্ত্রণাই মহারাজের মনঃপূত হইল। তিনি রাজসভায় কিরাতকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া জানাইলেন যে, নিজ দুর্গাধিকার ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল রাজধানীতে বিলাস ব্যসনে কালক্ষেপ করা তাহার পক্ষে অশোভন। কিরাত কিছুক্ষণ স্থিরনেত্রে মহারাজের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সভা ত্যাগ করিল। অব্যবহিত পরে সে অশ্বপৃষ্ঠে কপোতকূট ছাড়িয়া নিজ দুর্গে ফিরিয়া গেল।

কিরাতকে বিদায় করিয়া মহারাজ প্রাপ্তযৌবন কন্যার বিবাহের কথা চিন্তা করিতে বসিলেন।

জীবন অনিত্য ; তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে রট্টার বিবাহ না হইলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া নিশ্চয় গণ্ডগোল বাধিবে। মন্ত্রীদের সহিত আলোচনার পর স্থির হইল, মিত্র গুর্জররাজের দ্বিতীয় পুত্র কুমার-ভট্টারক বারণ বর্মা মহাখ্যাতিমান বীরপুরুষ, তাঁহার নামে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হোক, তিনি আসিয়া কিছুকাল বিটঙ্ক রাজ্যে অবস্থান করুন। তারপর রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে উভয়ের মনোভাব বুঝিয়া যথাকর্তব্য নিরূপণ করা যাইবে।

সাড়ম্বর নিমন্ত্রণ লিপি যথাকালে প্রেরিত হইল। অবশ্য তাহাতে বিবাহের কোনও উল্লেখ রহিল না ; কিন্তু মনোগত অভিপ্রায় গুর্জররাজ বুঝিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিষ্কার করিয়া কথা বলিবার রীতি কোনও কালেই ছিল না।

অনতিকাল পরে গুর্জরের বারণ বর্মা মহাসমারোহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রট্টার সহিত রাজসভায় তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। প্রথম দর্শনে রট্টা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কুমার-ভট্টারক বারণ বর্মার মূর্তি বীরোচিত বটে, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় সমান ; সম্মুখে উদর ও পশ্চাতে নিতম্ব রণভেরীর ন্যায় উচ্চ, মুখমণ্ডলে বিশাল গুম্ফ ও ভ্রূযুগল প্রায় তুল্য রোমশ। তাঁহাকে দেখিয়া গুর্জরদেশীয় খ্যাতনামা হস্তীর কথা স্মরণ হয়। রট্টা ক্ষণকাল বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া ছিন্ন বল্লরীর মত সভাস্থলেই হাসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন।

বিবাহের প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইল। ক্ষুণ্ণ বারণ বর্মা পরদিনই স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

সুগোপা সখীসুলভ চপলতায় রট্টাকে এই ঘটনার ইঙ্গিত করিয়া পরিহাস করিয়াছিল। এখন রট্টার প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল—'আমার কথা ছাড়িয়া দাও, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের গলায় মালা দিলেও আমি সুখী হইব না। কিন্তু আমার কথা ভাবিলে তো চলিবে না।'

রট্টা বলিলেন—'তবে কাহার কথা ভাবিব ?'

'নিজের কথা। এই যে দেবভোগ্য যৌবন, এ কি ফুলচন্দন দিয়া সাজাইয়া শুধু আমিই দেখিব ? দেবতার ভোগে লাগিবে না ?'

'আমার যৌবন আমি সঞ্চয় করিয়া রাখিব, কাহাকেও ভোগ করিতে দিব কেন ?'

সুগোপা হাসিল।

'সখি, বিধি-প্রেরিত ভোক্তা যেদিন আসিবে, সেদিন কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিবে না, তনু-মন সমস্তই তাঁর পায়ে সমর্পণ করিবে।'

'তুই না হয় মালাকরের পায়ে তনু-মন সমর্পণ করিয়াছিস, তাই বলিয়া কি সকলেরই একটি মালাকর চাই ?'

'চাই বৈকি সখি, মালাকর নহিলে নারীর যৌবন নিকুঞ্জে ফুল ফুটাইবে কে ?'

রট্টা আর কোনও কথা না বলিয়া স্মিতমুখে আকাশের পানে চাহিলেন, চক্ষু দু'টি তন্দ্রাচ্ছন্ন, যেন কোন্ অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেছে। সুগোপা কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'মহারাজ যে কী করিতেছেন তিনিই জানেন। হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চষ্টন দুর্গে গিয়া বসিয়া আছেন। এদিকে বসন্তঋতু নিঃশেষ হইয়া আসিল। কি জন্য গিয়াছেন তুমি কিছু জানো ?'

রট্টা বলিলেন—'চষ্টনের দুর্গাধিপ কিরাত পত্র লিখিয়াছিল, কয়েকটি চৈনিক শ্রমণ বুদ্ধের পবিত্র বিহারভূমি দর্শন করিবার মানসে ভারতে আসিয়াছেন, তাঁহারা পাটলিপুত্র যাইবেন ; পথে কয়েকদিনের জন্য চষ্টন দুর্গে বিশ্রাম করিতেছেন। তাই শুনিয়া মহারাজ অর্হৎ সন্দর্শনে গিয়াছেন।'

সুগোপা মাথা নাড়িয়া বলিল—'বিশ্বাস হয় না, কিরাতটা মহা ধূর্ত, ছল করিয়া মহারাজকে নিজ দুর্গে লইয়া গিয়াছে—নিশ্চয় কোনও দুরভিসন্ধি আছে। হয়তো নিভৃতে পাইয়া চাটুবাক্যে

মহারাজকে দ্রবীভূত করিয়া তোমার পাণিপ্রার্থনা করিবে।'

'তুই কিরাতকে দেখিতে পারিস না।'

'তা পারি না। শুনিয়াছি এই বয়সেই সে ঘোর অত্যাচারী—অতিশয় দুর্জন।'

'শিকারে কিন্তু তার অব্যর্থ লক্ষ্য।'

'অব্যর্থ লক্ষ্য হইলেই সজ্জন হয় না। বাজপাখি কি সজ্জন ?'

'কিরাত চমৎকার মিষ্ট কথা বলিতে পারে।'

'যে পুরুষ মিষ্ট কথা বলে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই।'

'তোর মালাকর বুঝি তোকে কেবলই গালি দেয় ?'

সুগোপা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—'পরিহাস নয়। কিরাত তোমার পায়ের দিকে তাকাইবার যোগ্য নয়, কিন্তু সে তোমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আমি জানি, তোমার জন্যে সে পাগল।'

রট্টা অল্প হাসিলেন, তারপর গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'শুধু আমার জন্য নয় সুগোপা, এই বিটঙ্ক রাজ্যটার জন্যও সে পাগল। কিন্তু ও কথা যাক। রাত্রি গভীর হইয়াছে, তুই এবার গৃহে যা।'

'তাই যাই, তুমিও ক্লান্ত হইয়াছ। একে সারাদিন বনে বনে মৃগয়া, তার উপর চোরের উৎপাত—জলসত্র হইতে এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে হইয়াছে। মানুষ ঘোড়া চুরি করে এমন কথা জন্মে শুনি নাই। আর কী স্পর্ধা—রাজকন্যার ঘোড়া চুরি! দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম লোকটা ভাল নয়।' নিজের লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়া সুগোপার রাগ একটু বাড়িল—'দুর্বৃত্ত বিদেশী তস্কর। এখন যদি তাহাকে একবার পাই—'

'কি করিস ?'

'শূলে দিই।'

'আমিও। এখন যা, চোরের উপর রাগ করিয়া পতি-দেবতাকে আর কষ্ট দিস না। সে হয়তো হাঁ করিয়া তোর পথ চাহিয়া আছে, ভাবিতেছে তোকেও চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।'

'মালাকরের সে ভয় নাই, তিনি জানেন আমাকে চুরি করিতে পারে এমন চোর জন্মায় নাই। তিনি এখন কোন শৌণ্ডিকালয়ে পড়িয়া অপ্সরী কিন্নরীর স্বপ্ন দেখিতেছেন। যাই, তাঁহাকে খুঁজিয়া লইয়া গৃহে ফিরিতে হইবে তো।'

'প্রত্যহই বুঝি তাই করিতে হয় ?'

'হাঁ।' সুগোপা মৃদু হাসিল—'মালাকর লোকটি মন্দ নয়, আমাকে ভালও বাসে। কিন্তু মদিরা-সুন্দরীর প্রতি প্রেম কিছু অধিক। যাই, সপত্নীগৃহ হইতে পতি-দেবতাকে উদ্ধার করিয়া নিজ গৃহে আনি গিয়া।'

হাসিতে হাসিতে সুগোপা বিদায় লইল। তখন মধ্যরাত্রি হইতে অধিক বিলম্ব নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
মদিরা ভবন

রাজপুরী হইতে বাহির হইতে গিয়া সুগোপা দেখিল তোরণদ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন প্রায়ই ঘটে, সেজন্য সুগোপার গতিবিধি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সে প্রতীহারকে গুপ্তদ্বার খুলিয়া দিতে বলিল।

কোনও অজ্ঞাত কারণে প্রতীহারের মনে তখন কিঞ্চিৎ রস-সঞ্চার হইয়াছিল। সে নিজের দ্বিধা বিভক্ত চাপদাড়িতে মোচড় দিয়া একটা আদিরসাশ্রিত রসিকতা করিয়া ফেলিল। সুগোপাও ঝাঁঝালো উত্তর দিল। সেকালে আদিরসটা গোরক্ত ব্রহ্মরক্তের মত অমেধ্য বিবেচিত হইত না।

তোরণের কবাটে একটি চতুষ্কোণ দ্বার ছিল, বাহির হইতে চোখে পড়িত না। সুগোপার ধমক খাইয়া প্রতীহার তাহা খুলিয়া দিল, বলিল—'ভাল কথা, দেবদুহিতার ঘোড়াটা মন্দুরায় ফিরিয়া আসিয়াছে।'

সবিস্ময়ে সুগোপা বলিল—'সে কি! আর চোর?'

মুণ্ড নাড়িয়া প্রতীহার বলিল—'চোর ফিরিয়া আসে নাই।'

'তুমি নিপাত যাও।—দেবদুহিতাকে সংবাদ পাঠাইয়াছ?'

'যবনীর মুখে দেবদুহিতার নিকট সংবাদ গিয়াছে, এতক্ষণে তিনি পাইয়া থাকিবেন।'

সুগোপা অনিশ্চিত মনে ক্ষণেক চিন্তা করিল, তারপর সন্তর্পণে ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। প্রতীহার কৌতুকসহকারে বলিল—'এত রাত্রে কি চোরের সন্ধানে চলিলে?'

'হাঁ।'

প্রতীহার নিশ্বাস ফেলিল—'ভাগ্যবান চোর! দেখা হইলে তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও।'

'তাই দিব। চোরের সংসর্গে রাত্রিবাস করিলে তোমার রস কমিতে পারে।' সুগোপা দ্বার উত্তীর্ণ হইল।

প্রতীহার ছাড়িবার পাত্র নয়, সে উত্তর দিবার জন্য দ্বারপথে মুখ বাড়াইল। কিন্তু সুগোপা তাহার মুখের উপর সজোরে কবাট ঠেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে নগরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

সুগোপা যতক্ষণ মদিরাগৃহে পতি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, সেই অবকাশে আমরা চিত্রকের নিকট ফিরিয়া যাই।

কপোতকূটে প্রবেশ করিয়া চিত্রক উৎসুক নেত্রে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিল। নগরীর শোভা দেখিবার আগ্রহ তাহার বিশেষ ছিল না। প্রথমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে, প্রায় এক অহোরাত্র কিছু আহার হয় নাই। কটিবন্ধন দৃঢ় করিয়া জঠরাগ্নিকে দীর্ঘকাল ঠেকাইয়া রাখা যায় না, ক্লেশ যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু দ্যূত প্রসাদাৎ এখন আর ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই।

পথে চলিতে চলিতে শীঘ্রই একটি মোদক ভাণ্ডার তাহার চোখে পড়িল। থরে থরে বহুবিধ পক্কান্ন সজ্জিত রহিয়াছে—পিষ্টক লড্ডু ক্ষীর দধি কোনও বস্তুরই অভাব নাই। মেদমসৃণ-দেহ মোদক বসিয়া দীর্ঘ খর্জুর শাখা দ্বারা মক্ষিকা তাড়াইতেছে।

মোদকালয়ে বসিয়া চিত্রক উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিল। একটি বালক পথে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিষ্টান্ন নিরীক্ষণ করিতেছিল, চিত্রক তাহাকে ডাকিয়া একটি লড্ডু দিল। উৎফুল্ল বালক লড্ডু খাইতে খাইতে প্রস্থান করিলে পর, সে জল পান করিয়া গাত্রোত্থান করিল, ভোজ্যের মূল্যস্বরূপ শশিশেখরের থলি হইতে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা লইয়া মোদককে দিল, তারপর তৃপ্তি-মন্থর পদে আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৃহদ্বারে তখন দুই একটি বর্তিকা জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে; গৃহস্থের শুদ্ধান্তঃপুর হইতে ধূপ কালাগুরুর গন্ধ বাতাসে ভাসিতেছে, প্রদীপ-হস্তা পুরনারীগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া গৃহদেবতার অর্চনা করিতেছে। ক্বচিৎ দেবমন্দির হইতে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইতেছে। দিবাবসানের

বৈরাগ্যমুহূর্তে নগরী যেন ক্ষণকালের জন্য যোগিনীমূর্তি ধারণ করিয়াছে।

অপরিচিত নগরীর পথে বিপথে চিত্রক অনায়াস চরণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হাতে কোনও কাজ নাই, উদর পরিপূর্ণ—সুতরাং মনও নিরুদ্বেগ। যে ব্যক্তি রাজপুরুষের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল তাহাকে মাত্র তিনজন দেখিয়াছে, তাহারা চিত্রককে এই জনাকীর্ণ পুরীতে দেখিতে পাইবে সে সম্ভাবনা কম। দেখিতে পাইলেও তাহার নূতন বেশে চিনিতে পারিবে না। অতএব নগর পরিদর্শনে বাধা নাই।

নগর পরিভ্রমণ করিয়া চিত্রক দেখিল, উজ্জয়িনী বা পাটলিপুত্রের ন্যায় বৃহদায়তন না হইলেও কপোতকূট বেশ পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য নগর। সে তাহার যাযাবর যোদ্ধজীবনে বহু স্থানীয় মহাস্থানীয় দেখিয়াছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র অসমতল পাষাণ নগরটি তাহার বড় ভাল লাগিল। সে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিল, এখানে দীর্ঘকাল থাকা চলিবে না, বেশিদিন থাকিলেই ধরা পড়িবার ভয়। এদিকে তিনজন তো আছেই, তাহা ছাড়া শশিশেখর যে বন হইতে বাহির হইয়া আসিবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ?

ক্রমে রাত্রি হইল ; আকাশে চন্দ্র ও নিম্নে বহু দীপের জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাজভবন শীর্ষে দীপাবলি মণিমুকুটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে চিত্রক একটি উদ্যানের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কয়েকজন ভদ্র নাগরিক দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে। সে একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—'মহাশয়, ওটা কি ?'

নাগরিক বলিল—'ওটা রাজপুরী।'

সপ্রশংস নেত্রে রাজপুরী নিরীক্ষণ করিয়া চিত্রক বলিল—'অপূর্ব প্রাসাদ। মগধের রাজপুরীও এমন সুরক্ষিত নয়। রাজা ঐ পুরীতে থাকেন ?'

নাগরিক বলিল—'থাকেন বটে, কিন্তু বর্তমানে তিনি রাজপুরীতে নাই। তাই তো ঐরূপ অঘটন সম্ভব হইয়াছে।'

'অঘটন ?'

'শুনেন নাই ? রাজকুমারীর অশ্ব চুরি করিয়া এক গর্ভদাস তস্কর পলায়ন করিয়াছে।'

'রাজকুমারীর অশ্ব—?' প্রশ্নটা অনবধানে চিত্রকের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

'হাঁ। কুমারী মৃগয়ায় গিয়াছিলেন, জলসত্রে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে।—আপনি কি বিদেশী ?' বলিয়া নাগরিক সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে চিত্রকের মূল্যবান বেশভূষার পানে চাহিল।

'হাঁ। আমি মগধের অধিবাসী, কর্মসূত্রে আসিয়াছি।'

চিত্রক আর সেখানে দাঁড়াইল না।

আকস্মিক সংবাদে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইবে চিত্রকের প্রকৃতি সেরূপ নয়। কিন্তু এই সংবাদ পরিগ্রহ করিবার পর প্রায় প্রহরকাল সে বিক্ষিপ্ত চিত্তে ইতস্তত বিচরণ করিয়া বেড়াইল। সংবাদটা নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। কে জানিত যে ঐ অশ্বারোহীটা রাজকন্যা ! রাজকন্যা পুরুষবেশে ঘোড়ায় চড়িয়া মৃগয়া করিয়া বেড়ায় ! আশ্চর্য বটে। চিত্রক রাজকন্যার মুখাবয়ব স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বিশেষ কিছু উদ্ধার করিতে পারিল না ; তাহাকে দেখিয়া গর্বিত ও কিশোরবয়স্ক মনে হইয়াছিল এইটুকুই শুধু স্মরণ হইল।

রমণীর সম্পত্তি সে অপহরণ করিয়াছে, মনে হইতেই চিত্রক লজ্জা অনুভব করিল। সে ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা, পরদ্রব্য সম্বন্ধে তাহার মনে তিলমাত্র কুণ্ঠা নাই ; সে জানে, এই বসুন্ধরা এবং ইহার যাবতীয় লোভনীয় বস্তু বীরভোগ্য। তবু, রমণী সম্বন্ধে তাহার মনে একটু দুর্বলতা ছিল। জীবনে সে কখনও নারীর নিকট হইতে কোনও দ্রব্য কাড়িয়া লয় নাই, স্বেচ্ছায় তাহারা যাহা দিয়াছে তাহাই হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছে, তদতিরিক্ত নয়।

হইতেছে। প্রাচীরগাত্রে সমুদ্রমন্থনের চিত্র ; সুধাভাণ্ড লইয়া সুরাসুরের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে।

চিত্রক উপবিষ্ট হইলে কিঙ্করী নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতার সহিত মদিরা-ভৃঙ্গার, চষক ও সুচিত্রিত স্থালীতে মৎস্যাণ্ড আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল, তারপর আদেশ প্রত্যাশায় কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইল। চিত্রক এক চষক মদিরা ঢালিয়া এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল, তারপর তৃপ্তির সহিত সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'সেবিকে, তুমি যাও, আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই।'

মধুশ্রী সাবধানে কবাট ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। একাকী বসিয়া চিত্রক স্বাদু মৎস্যাণ্ড সহযোগে আরও কয়েক পাত্র মদিরা পান করিল। ক্রমে তাহার চক্ষু ঢুলু ঢুলু হইয়া আসিল, মস্তিষ্কের মধ্যে স্বপ্নসুন্দরীর মঞ্জীর বাজিতে লাগিল। সে উপাধানের উপর আলস্যভরে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল।

মদিরাজনিত মৃদু বিহ্বলতার মধ্যে চিন্তার ধারা আবছায়া হইয়া যায় ; একটা অহেতুক স্ফূর্তি আলস্যের সহিত মিলিয়া মনকে হিন্দোলার মত দোল দিতে থাকে। চিত্রকের অবস্থা তখন সেইরূপ। সে নিজের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ের উপর দৃষ্টিপাত করিল, তারপর অঙ্গুরীয় চোখের কাছে আনিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। তখন বনের মধ্যে শশিশেখরের সহিত আলাপের কথা তাহার নূতন করিয়া মনে পড়িয়া গেল।

নিজ মনে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া বসিল ; কটি হইতে থলিটি বাহির করিয়া তাহার মুখোদ্‌ঘাটনপূর্বক একটি একটি সামগ্রী বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। স্বর্ণপ্রসূ থলির সমস্ত বৈভব এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই।

তিলক চন্দন দেখিয়া তাহার মুখের হাস্য প্রসার লাভ করিল ; কঙ্কতিকাটি তুলিয়া ধরিয়া সে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। এলাচ লবঙ্গ মুখে দিয়া সকৌতুকে চিবাইল, সব শেষে জতুমুদ্রালাঞ্ছিত কুণ্ডলাকৃতি লিপি খুলিয়া গম্ভীরমুখে পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। মগধের লিপি, বিটঙ্করাজের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। পাঠ করিতে করিতে চিত্রক তাহাতে নিমগ্ন হইয়া গেল।

এই সময় দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া কে একজন ঘরের মধ্যে উঁকি মারিল ; কাজলপরা একটি চোখ ও মুখের কিয়দংশ দেখা গেল মাত্র। চিত্রককে দেখিয়া কাজলপরা চোখ ক্রমশ বিস্ফারিত হইল, তারপর ধীরে ধীরে কবাট আবার বন্ধ হইয়া গেল। চিত্রক পত্রপাঠে নিবিষ্ট ছিল, কিছু দেখিল না ; দেখিলেও বোধ করি চিনিতে পারিত না।

বলা বাহুল্য যে উঁকি মারিয়াছিল সে সুগোপা। পতি অন্বেষণে কয়েকটি মদিরাগৃহে ঘুরিয়া শেষে সে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই শৌণ্ডিক হাসিমুখে বলিয়াছিল —'প্রপাপালিকে, তোমার মানুষটি তো আজ এখানে নাই।'

সুগোপা বলিয়াছিল —'তোমার কথায় বিশ্বাস নাই, আমি খুঁজিয়া দেখিব।'

'ভাল, তাই দেখ।'

তখন এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিতে খুঁজিতে একটি ঘরে উঁকি মারিয়া সহসা তাহার চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল। বেশভূষা অন্য প্রকার, কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত অশ্বচোরই বটে।

কিছুক্ষণ সুগোপা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর পা টিপিয়া শৌণ্ডিকের নিকট ফিরিয়া গেল। চুপি চুপি বলিল—'মণ্ডুক, নগরপালকে সংবাদ দাও।'

বিস্মিত মণ্ডুক বলিল—'সে কি ! কি হইয়াছে ?'

'চোর। যে চোর আজ কুমারী রট্টার অশ্ব চুরি করিয়াছিল সে ঐ প্রকোষ্ঠে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে।'

মণ্ডুকের মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল। দুষ্কৃতকারীকে মদিরাগৃহে আশ্রয় দিলে শৌণ্ডিককে কঠিন রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়। সে বলিল—'সর্বনাশ, আমি তো কিছু জানি না।'

'তাই বলিতেছি, যদি নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চাও শীঘ্র নগরপালকে ডাকিয়া আন।'

'নগরপালকে এত রাত্রে কোথা পাইব ? তিনি নিশ্চয় গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহার কাঁচা ঘুম ভাঙাইয়া কি নিজের পায়ে দড়ি দিব ?'

সুগোপা চিন্তা করিল।

'তবে এক কাজ কর। দুইজন যামিক নগররক্ষী ডাকিয়া আন, তাহারা আজ রাত্রে চোরকে বাঁধিয়া রাখুক, কাল প্রাতে মহাপ্রতীহারের হস্তে সমর্পণ করিবে।'

'সে কথা ভাল' বলিয়া ব্যস্তসমস্ত মণ্ডুক বাহির হইয়া গেল।

অধিক দূর যাইতে হইল না। রাত্রিকালে যামিক-রক্ষীরা পথে পথে বিচরণ করিয়া নগর পাহারা দিয়া থাকে। একটা তাম্বূল বিপণির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুইজন যামিক-রক্ষী বোধ করি রাত্রিতে পাথেয় সংগ্রহ করিতেছিল, মণ্ডুকের কথায় উত্তেজিত হইয়া তাহার সঙ্গে চলিল।

সুগোপা অল্প কথায় ব্যাপার বুঝাইয়া দিল ; তখন চারিজনে চিত্রকের প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। চিত্রক তখন লিপি পাঠ শেষ করিয়া থলি কোমরে বাঁধিয়াছে, ভৃঙ্গার হইতে শেষ মদিরাটুকু ঢালিয়া পান করিতেছে। অস্ত্রধারী দুইজন পুরুষকে সম্মুখে দেখিয়া সে বলিল—'কি চাও ?'

সুগোপা পিছন হইতে বলিল—'তোমাকে চাই।'

চিত্রক ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তরবারি বাহির করিবার পূর্বেই রক্ষীরা তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল।

সুগোপা তখন সম্মুখে আসিয়া বলিল—'অশ্বচোর, আমাকে চিনিতে পার ?'

চক্ষু সঙ্কুচিত করিয়া চিত্রক তাহার পানে চাহিল। অদৃষ্টের জাল গুটাইয়া আসিতেছে। সে অধরোষ্ঠ চাপিয়া বলিল—'প্রপাপালিকা !'

সুগোপা রক্ষীদের দিকে ফিরিয়া বলিল—'ইহাকে সাবধানে পাহারা দিও। অতি ধূর্ত চোর, সুবিধা পাইলেই পালাইবে।'

একজন রক্ষী বলিল—'সাবধানে কোথায় রাখিব ? রাত্রে কারাগার তো বন্ধ আছে।'

হঠাৎ সুগোপার মনে পড়িয়া গেল। উদ্বেলিত হাসি চাপিয়া সে বলিল—'রাজপুরীর তোরণ-প্রহরীর কাছে লইয়া যাও। আমার নাম করিয়া বলিও, সে সমস্ত রাত্রি চোরকে পাহারা দিবে।'

সুগোপাকে নগরের সকলেই চিনিত। প্রপাপালিকা হইলে কি হয়, রাজকুমারীর সখী। রক্ষীরা দ্বিরুক্তি না করিয়া চোরকে বাঁধিয়া রাজপুরীর দিকে লইয়া চলিল।

ভাগ্যক্রমে চিত্রকের থলিটি রক্ষীরা কাড়িয়া লইল না। তাহারা সাধুচরিত্র বলিয়াই হোক, অথবা যে চোর রাজকন্যার ঘোড়া চুরি করিয়াছে তাহার উপর বাট্‌পাড়ি করিলে গোলযোগ হইতে পারে এই জন্যই হোক চিত্রকের থলিতে তাহারা হস্তক্ষেপ করিল না।

হয়তো ঐ পুরুষবেশীর রূপ ও ঐশ্বর্য তাহার মনে ঈর্ষার সঞ্চার করিয়াছিল, হয়তো প্রপাপালিকার সহিত যুবকের ঘনিষ্ঠতা তাহার পৌরুষকে আঘাত করিয়াছিল ;—সুগোপার সহিত নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়াও তাহার মন সবিস্ময় ক্ষোভে ভরিয়া উঠিল। অবশ্য তাহার আচরণে অনেকখানি কৌতুক মিশ্রিত ছিল ; তথাপি, কৌতুক কখন নিজ সীমা অতিক্রম করিয়া নিগ্রহে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। বুভুক্ষিত শ্রান্তিভগ্ন দেহে আশাহত অবস্থায় মানুষ যে কর্ম করে, পরিপূর্ণ উদরে সুস্থ দেহে সে নিজেই তাহার কারণ খুঁজিয়া পায় না।

আকাশের পানে চাহিয়া চিত্রক হাসিল। জীবনকে সে বহুরূপে বহু অবস্থায় দেখিয়াছে, তাই পশ্চাত্তাপ ও অনুশোচনাকে সে নিরর্থক বলিয়া জানে। নিয়তির গতি অনুশোচনার দ্বারা লেশমাত্র ব্যতিক্রান্ত হয় না, অদৃষ্টই নিয়ন্তা। চিত্রকের মনে হইল, ভাগ্যদেবী তাহার চারিপাশে সূক্ষ্ম ভবিতব্যতার জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছেন—এই জালে ক্ষুদ্র মীনের মত আবদ্ধ হইয়া সে কোন্ অদৃষ্টতটে উৎক্ষিপ্ত হইবে কে জানে ?

চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি পড়িতে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। মধ্যগগনে চন্দ্র, রাত্রি গভীর হইতেছে। সচকিতে সে চারিদিকে চাহিল ; দেখিল বৌদ্ধ চৈত্যের নিকটস্থ উচ্চ ভূমির উপর সে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। এখানে পথ গৃহ-বিরল, লোক চলাচলও কম। দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, একটি স্থান আলোকমালায় ঝলমল করিতেছে। বহু নাগরিকের মিলিত স্বরগুঞ্জন তাহার কর্ণে আসিল।

চিত্রক কিছুকাল যাবৎ ঈষৎ তৃষ্ণা অনুভব করিতেছিল, ঐ আলোকদীপ্ত পথের দিকে চাহিয়া তাহার তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া গেল। নগরে অবশ্য মদিরাগৃহ আছে, এ কথাটা এতক্ষণ তাহার মনে হয় নাই। রাত্রির জন্য একটা আশ্রয়ও খুঁজিয়া লইতে হইবে। সে আলোকলিপ্সু পতঙ্গের মত দ্রুত সেই দিকে চলিল।

রজনীর আনন্দধারা তখন অন্তঃস্রোতা হইয়া আসিয়াছে। পুষ্প বিপণিতে পুষ্পসম্ভার প্রায় শূন্য, পসারিণীদের চক্ষে আলস্য ; রাজপথে নাগরিকদের গতায়াত ও ব্যস্ত আগ্রহ মন্দীভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নবীনা রাত্রির নবযৌবনসুলভ প্রগল্‌ভতা প্রগাঢ়যৌবনার রসঘন নিবিড় মাধুর্যে পরিণত হইয়াছে।

পুষ্পাসব গন্ধে আকৃষ্ট মধুমক্ষিকা যেমন কেবলমাত্র ঘ্রাণশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রচ্ছন্ন ফুলকলিকার সন্নিধানে উপস্থিত হয়, চিত্রকও তেমনই পিপাসা-প্রণোদিত হইয়া একটি মদিরাগৃহের দ্বারে উপনীত হইল। মদিরাগৃহের ভিতরে উচ্চ চত্বরের উপর বসিয়া মুণ্ডিতশীর্ষ শৌণ্ডিক স্তূপীকৃত রজতমুদ্রা গণনা করিতেছিল, চিত্রক প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে একটি স্বর্ণদীনার অবহেলাভরে ফেলিয়া দিল, বলিল—'পানীয় দাও।'

চমকিত শৌণ্ডিক যুক্তকরে সম্ভাষণ করিল—'আসুন মহাভাগ ! কোন্ পানীয় দিয়া মহোদয়ের তৃপ্তিসাধন করিব ? আসব সুরা বারুণী মদিরা—যে পানীয় ইচ্ছা আদেশ করুন।'

'তোমার শ্রেষ্ঠ মদিরা আনয়ন কর।'

'যথা আজ্ঞা।—মধুশ্রী !'

শৌণ্ডিক কিঙ্করীকে ডাক দিল। নূপুর কাঞ্চী বাজাইয়া একটি তন্দ্রালসা কিঙ্করী আসিয়া দাঁড়াইল। শৌণ্ডিক বলিল—'আর্যকে সুঘট্টিত কক্ষে বসাও, শ্রেষ্ঠ মদিরা দিয়া তাঁহার সেবা কর।'

কিঙ্করী চিত্রককে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া বসাইল। কক্ষটি সুচারুরূপে সজ্জিত ; কুট্টিমের উপর শুভ্র আস্তরণ ; তদুপরি স্থূল উপাধান তাম্বূলকরঙ্ক প্রভৃতি রহিয়াছে। চারি কোণে পিত্তলের দীপদণ্ডে বর্তিকা জ্বলিতেছে। ধূপশলা হইতে চন্দনগন্ধী সূক্ষ্ম ধূম ক্ষীণ রেখায় উত্থিত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
বন্দিনী

তোরণ-প্রতীহারের নাসিকায় বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়াছিল। সুগোপার প্রতি রসে-ভরা প্রীতির ভাব আর তাহার ছিল না। তদুপরি দুইটা বিকশিতদন্ত যামিক-রক্ষী যখন একটা চোরকে তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া চলিয়া গেল তখন শুধু সুগোপা নয়, সমস্ত নারী-জাতির উপর তাহার মন বিরক্ত হইয়া উঠিল। দেবদুহিতার সখী না হইয়া অন্য কোনও লোক হইলে কখনই সে চোরকে সারা রাত্রি আগুলিয়া থাকিবার ভার লইত না। শান্তির সময়, দেশে কোনও প্রকার উপদ্রব নাই। এ সময়ে রাজপুরীর তোরণ পাহারা দিতে হইলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবার প্রয়োজন হয় না ; দ্বারে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিত করিলেই প্রভাত হইয়া যায়। কিন্তু এখন এই অশ্বচোরটাকে লইয়া সে চক্ষু মুদিবে কি প্রকারে ? চোর যদি পালায় তবে আর রক্ষা নাই। এখন চতুঃপ্রহর রাত্রি জাগিয়া এই বন্ধ্যাপুত্র চোরকে পাহারা দিতে হইবে। অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতীহার বলিল—'বাপু অশ্বচোর, তোমার সাজসজ্জা দেখিয়া তোমাকে শিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি এমন কুকর্ম করিতে গেলে কেন ? রাজকুমারীর ঘোড়া চুরি করিলে কি জন্য ?'

চোর উত্তর না দিয়া নির্বিকার মুখে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। প্রতীহার পুনরায় বলিল—'আর যদি করিলেই, ধরা পড়িলে কেন ? ধরা যদি পড়িলে, কল্য প্রাতে পড়িলে কি দোষ হইত ?'

চোর এবারও কোনও উত্তর করিল না।

'তুমি তো কল্য প্রাতে নির্ঘাত শূলে চড়িবে। তবে আজ রাত্রে আমাকে কষ্ট দিয়া কী লাভ হইল ?'

প্রতীহারের বিরক্তি ক্রমশ হতাশায় পর্যবসিত হইতেছিল, এমন সময় তাহার পাশে একটি কৃষ্ণ ছায়া পড়িল। চমকিয়া প্রতীহার দেখিল, পুরভূমির জীবন্ত প্রেত গুহ নিঃশব্দে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ আখ্যায়িকায় গুহের স্থান অতি অল্পই ; তবু তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক। সে হূণ, হূণ অভিযানের সময় আসিয়াছিল। রাজপুরীর যুদ্ধে তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগে, কপালের বাম ভাগে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ফলে, গুহের স্মৃতি ও বাক্‌শক্তি চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায়। তদবধি সে রাজপুরীর প্রাকারবেষ্টনীর মধ্যে আছে, কেহ তাহাকে কিছু বলে না। দিবা ভাগে সে কোথায় থাকে কেহ দেখিতে পায় না ; রাত্রে পুরভূমির উপর শীর্ণ খর্ব ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়ায়। রাত্রির প্রহরীরা কদাচিৎ তাহাকে দেখিতে পায়, সে তোরণ-স্তম্ভের পাশে বসিয়া আপন মনে হাসিতেছে, অথবা অতৃপ্ত প্রেতযোনির মত অন্ধকার প্রাকারের উপর সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রহরীরা সাগ্রহে তাহার সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করে কিন্তু গুহ নীরব থাকে ; তাহার লুপ্ত স্মৃতির মধ্যে কোন্ বিচিত্র রহস্য লুক্কায়িত আছে কেহ অনুমান করিতে পারে না।

গুহ আসিয়া কয়েকবার সন্তর্পণে চিত্রককে প্রদক্ষিণ করিল ; মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যেন আঘ্রাণ গ্রহণ করিল ; পশ্চাতে গিয়া কি যেন দেখিল—তারপরে নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে প্রতীহারকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিল।

চিত্রকের হস্তদ্বয় পশ্চাতে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ছিল ; প্রতীহার গিয়া দেখিল কোন্ অজ্ঞাত উপায়ে রজ্জুবন্ধন ঢিলা হইয়া গিয়াছে, টানিলেই হাত বাহির হইয়া আসিবে। প্রতীহার ক্রুদ্ধ হইয়া

বলিল—'আরে শৃগালপুত্র চোর, তুই আমাকে ফাঁকি দিয়া পালাইতে চাস ?' সে দৃঢ়ভাবে রজ্জু বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

গুহের গলার মধ্যে অব্যক্ত হাসির মত একটা শব্দ হইল। প্রতীহার তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—'গুহ, বড় রক্ষা করিয়াছ। এ চোর পালাইলে আমাকেই শূলে যাইতে হইত। এখন এই গর্ভ-কুষ্মাণ্ডটাকে বাঁধিয়া সারারাত্রি বসিয়া থাকি। আর বিশ্বাস নাই। একটা কূটকক্ষও যদি থাকিত, এই নষ্টবুদ্ধি তস্করটাকে তাহার মধ্যে বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম।'

গুহের চোখে যেন একটা ছায়া পড়িল ; সে দাঁড়াইয়া নিজ অঙ্গুষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল।

প্রতীহারের মনে বহু অশান্তি সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে গুহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—'গুহ, তোমাকে বলিতেছি, স্ত্রীজাতিকে কদাপি বিশ্বাস করিতে নাই। তাহাদের মত অবিশ্বাসিনী ক্লেশদায়িনী দুষ্টপ্রকৃতি—' উপযুক্ত বেগবান বিশেষণের অভাবে প্রতীহার থামিয়া গেল।

হয়তো নারীজাতির সম্বন্ধে প্রতীহারের উক্তিতে কিছু সত্য ছিল, গুহের চক্ষুর্দ্বয় সহসা অর্থপূর্ণ উত্তেজনায় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে সবেগে মস্তক আন্দোলন করিয়া প্রতীহারকে তাহার অনুসরণ করিবার সঙ্কেত করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল।

দুই তোরণ-স্তম্ভে দুইটি প্রতিহার-কক্ষ আছে পূর্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ প্রাকারের সর্বত্র সম-ব্যবধানে স্তম্ভগৃহ ছিল। এগুলির প্রবেশদ্বারে কবাট নাই, তাই প্রাকার-রক্ষীদের বিশ্রামের উপযোগী হইলেও বন্দীকে বন্ধ করিয়া রাখিবার সুবিধা নাই। ইহাদের মধ্যে তোরণের দুই পাশের কক্ষ দুইটি সর্বদা ব্যবহৃত হইত, অন্যগুলি প্রয়োজনের অভাবে শূন্য পড়িয়া থাকিত। বহুকাল পড়িয়া থাকার ফলে সেগুলি আবর্জনায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, প্রবেশপথে কণ্টকগুল্ম জন্মিয়াছিল। গুহ এইরূপ একটি অব্যবহৃত কক্ষের মুখ পর্যন্ত গিয়া আবার হাতছানি দিয়া প্রতীহারকে ডাকিল।

প্রতীহারের কৌতূহল হইল। কিন্তু চোরকে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারে না। সে ক্ষণেক চিন্তা করিয়া চিত্রকের হস্তরজ্জু ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিল।

স্তম্ভগৃহের মুখে উপস্থিত হইয়া প্রতীহার দেখিল, গুহ চক্‌মকি ঠুকিয়া একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়াছে। চক্‌মকি প্রদীপ কোথা হইতে পাইল সেই জানে, হয়তো পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতীহার বুঝিল এই পরিত্যক্ত কক্ষটিতে গুহের যাতায়াত আছে।

দীর্ঘ অব্যবহারে ঘরটি অপরিচ্ছন্ন, কোণে ঊর্ণনাভের জাল। একটা চর্মচটিকা আলোকের আবির্ভাবে ত্রস্ত হইয়া মাথার উপর চক্রাকারে উড়িতে লাগিল।

প্রদীপ ধরিয়া গুহ কক্ষপ্রাচীরের কাছে গেল। অমসৃণ পাথরের দেয়াল, পাথরের উপর পাথরে যেখানে জোড় লাগিয়াছে সেখানে কমঠপৃষ্ঠের ন্যায় চিহ্ন। গুহ প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে লাগিল, তারপর একটি স্থান অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে দেয়াল হইতে চতুষ্কোণ একটা অংশ সরিয়া গেল।

মহাবিস্ময়ে প্রতীহার দেখিল, একটি সুড়ঙ্গ পথ। ক্ষীণালোকে সুড়ঙ্গের বেশি দূর দেখা গেল না ; কিন্তু সুড়ঙ্গ যে প্রাকারের ভিতর দিয়া বল্মীক-বিবরের ন্যায় বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। হূণেরা পুরী দখল করিয়াছিল বটে কিন্তু এই গুপ্ত সুড়ঙ্গের কথা জানিতে পারে নাই।

মিটিমিটি হাসিতে হাসিতে গুহ রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতীহারকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। সুড়ঙ্গ অপরিসর নয়, দুইজন লোক পাশাপাশি চলিতে পারে। প্রতীহার চিত্রককে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রায় ত্রিশ হস্ত যাইবার পর সম্মুখে গহ্বরের ন্যায় অন্ধকার একটা স্থান দেখা গেল ; কয়েক ধাপ সোপান এই অন্ধকূপের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে, আর কিছু দেখা যায় না।

উত্তেজিত প্রতীহার বলিল—'এ তো দেখিতেছি একটা কূটকক্ষ ! আশ্চর্য ! কেহ ইহার সন্ধান জানিত না। গুহ, তুমি কি প্রকারে জানিলে ?'

গুহ ললাটের ক্ষত চিহ্নটার উপর হাত বুলাইয়া যেন স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু স্মৃতির দ্বার খুলিল না।

প্রতীহার বলিল—'ভালই হইল। আজ রাত্রে চোরটা এইখানেই থাক, কাল প্রাতে আবার বাহির করিয়া লইয়া যাইব।—কে ভাবিয়াছিল প্রাকারের ভিতরটা ফাঁপা ! তাহার ভিতর সুড়ঙ্গ আছে, কূটকক্ষ আছে ! যা হোক, গুহ, একথা তুমি জান আর আমি জানিলাম—আর কেহ জানিতে না পারে—'

প্রতীহারের মস্তকে নানাপ্রকার কল্পনা খেলা করিতেছিল ; কে বলিতে পারে, ভূগর্ভস্থ গুপ্তকক্ষে হয়তো পূর্ববর্তী রাজাদের কত রত্ন-ঐশ্বর্য লুক্কায়িত আছে। 'চোরটা জানিতে পারিল বটে কিন্তু কাল ও শূলে যাইবে, সুতরাং একপ্রকার নিশ্চিন্ত—' মনে মনে এই কথা ভাবিয়া প্রতীহার চিত্রককে সেই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল, তারপর কবাটে অর্গল লাগাইয়া গুহের সহিত বাহিরে ফিরিয়া আসিল। মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণপূর্বক প্রতীহার গুহের দিকে ফিরিয়া দেখিল, অশরীরী ছায়ার ন্যায় গুহ কখন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

কূটকক্ষের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গেলে চিত্রক দেখিল রন্ধ্রহীন অন্ধকারের মধ্যে সে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু কূটকক্ষের বায়ু সম্পূর্ণ নিশ্চল ও বদ্ধ নহে, কোনও অদৃশ্য পথে বায়ু চলাচল হইতেছে—শ্বাস রোধ হইয়া মরিবার ভয় নাই।

চিত্রকের হস্তদ্বয় রজ্জুদ্বারা পশ্চাতে আবদ্ধ ছিল, প্রতীহার খুব দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছিল। কিছুক্ষণ চেষ্টা করিবার পর সে বন্ধনের ভিতর হইতে হাত বাহির করিয়া লইল। সৈনিকের বিচিত্র জীবনে এই কৌশলটি সে আয়ত্ত করিয়াছিল।

তারপর অন্ধকারে অতি ধীরে সে সোপান অবতরণ করিতে লাগিল। পাঁচ ছয়টি ধাপ নামিবার পর পদদ্বারা অনুভব করিয়া বুঝিল সোপান শেষ হইয়া চত্বর আরম্ভ হইয়াছে।

এই চত্বর কতখানি বিস্তৃত তাহা জানিবার কৌতূহল চিত্রকের ছিল না, কূটকক্ষ হইতে পলায়নের পথ থাকা সম্ভব নয়, থাকিলেও এই অন্ধকারে তাহা আবিষ্কার করা অসাধ্য। চিত্রক শেষ সোপানের উপর বসিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। তাহার মনে হইল সে জীবনের শেষ সোপানে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। তাহার হাসি আসিল। নিয়তির জালে সে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য ! তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনকে সমাপ্তির উপকূলে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য নিয়তির এত উদ্যোগ আয়োজন, এত ষড়যন্ত্র ? সে যোদ্ধা, মৃত্যুর সহিত তাহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তবে আজ মৃত্যু সিধা পথে তীরের মুখে বা অসির ফলায় না আসিয়া এমন কুটিল পথে আসিল কেন ? জ্ঞানের উন্মেষ হইতে নিজের জীবনের কাহিনী তাহার মনে পড়িল। মৃত্যু বহুবার তাহার সম্মুখে আসিয়াছে, আবার হাসিয়া অবজ্ঞাভরে ফিরিয়া গিয়াছে ; কিন্তু এত আড়ম্বর করিয়া তো কখনও আসে নাই !

শৈশবের কথা তাহার ভাল করিয়া মনে পড়ে না। যখন তাহার অনুমান পাঁচ বৎসর বয়স তখন কোন্ এক নগরে একটা বিকলাঙ্গ লোকের সহিত সে বাস করিত। লোকটা বোধহয় অর্ধ-উন্মাদ ছিল, কখনও তাহাকে প্রহার করিত, কখনও বা আদর করিত। তাহার একটা শাণিত ছুরি ছিল, সেই ছুরি দিয়া সে চিত্রকের দেহ কাটিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত, আবার জঙ্গল হইতে

লতাপাতা আনিয়া সযত্নে বাঁধিয়া সেই ক্ষত আরোগ্য করিত। একদিন হঠাৎ পাগলটা কোথায় চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না।

অতঃপর কিছুদিনের ঘটনা চিত্রকের মনে নাই, কি করিয়া কোথায় কাহার আশ্রয়ে কৈশোরের সীমান্তে উপনীত হইল তাহা তাহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

যৌবনের প্রারম্ভে সে এক যাযাবর বণিক সম্প্রদায়ের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের সংসর্গে কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল। সার্থবাহ বণিকেরা উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্য লইয়া দেশ দেশান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, এক নগর হইতে অন্য নগরে যাইত। চিত্রক তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া বহু সমৃদ্ধ নগর দেখিয়াছিল। পুরুষপুর মথুরা বারাণসী পাটলিপুত্র তাম্রলিপ্ত উজ্জয়িনী কাঞ্চী—উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের বিচিত্র শোভাশালিনী নানা নগরীর সহিত চিত্রকের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়াছিল।

বণিক সম্প্রদায় ধর্মে জৈন ছিল, তাহারা আমিষ আহার করিত না। অথচ মৎস্য মাংসের প্রতি চিত্রকের একটা প্রকৃতিগত আকর্ষণ ছিল, সে সুযোগ পাইলেই লুকাইয়া পশুমাংস আহার করিত। একদিন সে ধরা পড়িয়া গেল।

বণিক সম্প্রদায় তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। চিত্রকের দেশ নাই, আত্মীয় নাই—জগতে সে সম্পূর্ণ একাকী। এই সময় হইতে তাহার যোদ্ধৃজীবনের আরম্ভ। তাহার দেহ স্বভাবতই বলিষ্ঠ, সে সহজে অস্ত্রচালনা করিতে শিখিল। জগতে যাহার কেহ নাই সে আত্মনির্ভর হইতে শেখে, চিত্রক বুদ্ধি ও বাহুবল সম্বল করিয়া জীবনযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আর্যাবর্তে তখন সর্বত্রই যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে। চিত্রক যখন যে পক্ষে পাইল যুদ্ধ করিল ; কোনও রাষ্ট্রের প্রতি তাহার মমত্ব নাই, যেখানে অর্থলাভের সম্ভাবনা দেখিল সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। এক পক্ষের পরাজয়ে যুদ্ধ থামিয়া গেলে আবার নূতন যুদ্ধের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এইভাবে তাহার জীবনের শেষ দশ বর্ষ কাটিয়াছে। সৌবীর দেশে একটা অন্তঃকলহজাত ক্ষুদ্র যুদ্ধ মিটিয়া গেলে সে আবার ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল। সৌবীর যুদ্ধে সে বিশেষ লাভবান হইতে পারে নাই, উপরন্তু তাহার অশ্বটি মরিয়াছিল। সেখান হইতে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গান্ধার অঞ্চলে সমরসম্ভাবনার জনশ্রুতি শুনিয়া সেই পথে যাত্রা করিয়াছিল। গান্ধারের পথ কিন্তু সরল নয় ; গিরি-সঙ্কটকুটিল অজ্ঞাত দেশের পাকচক্রে পথ হারাইয়া অবশেষে নিঃস্ব অবস্থায় সে বিটঙ্ক রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তারপর সুগোপার জলসত্র হইতে আজিকার এই ঘটনাবহুল দিবসটি বিসর্পিল গতিতে অগ্রসর হইয়া শেষে এই অন্ধকার কূটকক্ষে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

মুদিত চক্ষে চিত্রক নিজ জীবন-কথা চিন্তা করিতেছিল ; চিন্তার সূত্র মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল, আবার যুক্ত হইয়া আপন পথে চলিতেছিল। ক্লান্ত দেহ যতই নিদ্রার অতলে ডুবিয়া যাইতে চাহিতেছিল, আজিকার বহু ঘটনাবিদ্ধ মন ততই সচেতন থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল।

নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, এমন সময় চিত্রকের চেতনা সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল কে যেন অতি লঘু করস্পর্শে তাহার মুখে হাত বুলাইয়া দিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না ; প্রথমে মনে হইল হয়তো চর্মচটিকার পাখার স্পর্শ ; ইহারা সূচীভেদ্য অন্ধকারে নিঃশব্দে উড়িয়া বেড়ায়, স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাধাবন্ধ অনুভব করিয়া গতি পরিবর্তন করিতে পারে। হয়তো চর্মচটিকাই হইবে।

কিন্তু যদি চর্মচটিকা না হয় ? যদি জীবন্ত কোনও প্রাণীই না হয় ? চিত্রকের মেরুযষ্টির ভিতর দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সে অন্ধকারে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সতর্কভাবে বসিয়া রহিল।

আবার তাহার মুখের উপর লঘু করাঙ্গুলির স্পর্শ হইল, যেন কেহ অঙ্গুলির দ্বারা তাহার মুখাবয়ব অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছে ; তাহার গণ্ডে তীক্ষ্ণ নখের আঁচড় লাগিল। চিত্রক প্রস্তুত ছিল, সে ক্ষিপ্র হস্ত সঞ্চালনে অদৃশ্য স্পর্শকারীকে ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুই ধরিতে পারিল না। যে স্পর্শ করিয়াছিল সে সরিয়া গিয়াছে। চিত্রক তখন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'কে ? কে তুমি ?'

কয়েক মুহূর্ত পরে তাহার সম্মুখের অন্ধকারে গভীর নিশ্বাস পতনের শব্দ হইল। চিত্রকের সর্বাঙ্গের রোম কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কম্পিতস্বরে বলিল—'কে তুমি ? যদি মানুষ হও উত্তর দাও।' কিছুক্ষণ নীরব। তারপর অদূরে অস্ফুট শব্দ হইতে লাগিল। চিত্রক উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। মানুষের কণ্ঠস্বরই বটে, কিন্তু শব্দগুলির কোনও অর্থ হয় না। যেন স্বপ্নের ঘোরে কেহ অস্পষ্ট অর্থহীন আকুতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মনুষ্য বুঝিয়া চিত্রক আবার স্বস্থ হইল। সে বলিল—'শব্দ শুনিয়া মনে হইতেছে তুমি মানুষ। স্পষ্ট করিয়া বল, কে তুমি ?'

দীর্ঘকাল আর কোনও শব্দ নাই। চিত্রকের মনে হইল, সে বুঝি কল্পনায় শব্দ শুনিয়াছিল, সমস্তই এই কুহকময় অন্ধকারের ছলনা। তাহার স্নায়ুপেশী আবার শক্ত হইতে লাগিল। এ কিরূপ মায়া ? অলৌকিক মায়া ?

'আমি বন্দিনী....বন্দিনী....'

না, মানুষের কণ্ঠস্বর—ছলনা নয়। কথাগুলি অতি দ্বিধাভরে কথিত হইলেও স্পষ্ট। বক্তা যেন আরও নিকটে আসিয়াছে।

চিত্রক বলিল—'বন্দিনী ? তুমি নারী ?'

'হাঁ।'

'নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিয়াছিলাম তুমি প্রেতযোনি।'

'তুমি কে ?'

চিত্রক হাসিল—'আমিও বন্দী। তুমি কত দিন বন্দী আছ ?'

'কতদিন—জানি না। এখানে দিন রাত্রি নাই, মাস বর্ষ নাই—' কণ্ঠস্বর মিলাইয়া গেল।

চিত্রক বলিল—'তুমি আমার কাছে এস। ভয় নাই, আমি তোমার অনিষ্ট করিব না।'

কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন হইল—'তুমি কি হূণ ?'

'না, আমি আর্য।'

তখন অদৃশ্য রমণী কাছে আসিয়া চিত্রকের জানুর উপর হাত রাখিল, চিত্রক তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখিল, কঙ্কালসার হস্ত, শীর্ণ অঙ্গুলির প্রান্তে দীর্ঘ নখ। তাহার জানুর উপর হস্তটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। চিত্রক বলিল—'উপবিষ্ট হও। আমাকে ভয় করিও না, আমিও তোমারই মত অসহায়। মনে হয় দীর্ঘকাল বন্দিনী আছ। তুমি অন্ধকারে দেখিতে পাও ?'

'অল্প।'

'তোমার বয়স কত ?'

এতক্ষণে রমণী যেন অনেকটা সাহস পাইয়াছে, সে সোপানের উপর উপবেশন করিল। যখন কথা কহিল তখন তাহার কথা আরও স্পষ্ট ও সুসংলগ্ন শুনাইল। যেন সে দীর্ঘকাল কথা না বলিয়া কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, আবার ক্রমশ সুসঙ্গত বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইতেছে।

রমণী বলিল—'আমার বয়স কত জানি না। যখন বন্দিনী হই তখন কুড়ি বছর বয়স ছিল।'

'কে তোমাকে বন্দিনী করিয়াছিল ?'

'হূণ।'

'হূণ ? কোন্ হূণ ?'

রমণী থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—'একটা কদাকার খর্বকায় হূণ। রাজপুরী হূণেরা আক্রমণ করিয়াছিল। আমি ছিলাম রাজপুত্রের ধাত্রী...আমি রাজপুত্রকে স্তন্যদান করিতেছিলাম এমন সময় হূণেরা রাজ-অবরোধে প্রবেশ করিল...তাহারা রাজপুত্রকে আমার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া তলোয়ারের উপর লোফালুফি করিতে লাগিল, একটা কদাকার হূণ আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিল—'

'সর্বনাশ। এ যে পঁচিশ বছর আগের কথা! তুমি পঁচিশ বছর বন্দিনী আছ ?'

'পঁচিশ বছর ?...তা জানি না। ...কদাকার হূণটা আমাকে টানিতে টানিতে স্তম্ভগৃহে লইয়া আসিল...নির্জন স্তম্ভগৃহে আমি তাহার হাত ছাড়াইবার অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু...স্তম্ভগৃহের দেয়ালে একটা গুপ্তদ্বার ছিল, কেমন করিয়া খুলিয়া গিয়াছিল...হূণটা আমাকে এই অন্ধকারে ঠেলিয়া দিয়া গুপ্তদ্বার বন্ধ করিয়া দিল—'

'তারপর ?'

'তারপর আর জানি না...সেই অবধি এই রন্ধ্রের মধ্যে আছি। রন্ধ্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু বাহির হইবার পথ নাই...সেই হূণটা মাঝে মাঝে খাদ্য ফেলিয়া দিয়া যায়, তাহাই খাই...হূণটা আমাকে অন্ধকারে দেখিতে পায় না তাই ধরিবার চেষ্টা করে না—'

চিত্রক পূর্বে মোঙের কাহিনীর কিছু অংশ শুনিয়াছিল, এখন রমণীর বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে পঁচিশ বৎসর পূর্বের হূণ উৎপাতের চিত্র যেন অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইল। রমণীর জন্য তাহার অন্তরে সমবেদনার উদয় হইল, সে অন্ধকারে তাহার হস্তে হস্ত রাখিয়া বলিল—'হতভাগিনি! তোমার স্বজন কি কেহ ছিল ?'

রমণী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

'স্বামী ছিল—একটি কন্যা ছিল—'

'হয়তো তাহারা বাঁচিয়া আছে। কাল প্রাতে আমি বাহির হইব। যদি প্রাণে বাঁচি তোমার উদ্ধারের চেষ্টা করিব। তোমার নাম কি ?'

'পৃথা।'

'ভাল, পৃথা, আমি এবার একটু নিদ্রা দিব, রাত্রি বোধহয় প্রভাত হইতে চলিল। কাল প্রাতে সম্ভবত শূলেই চড়িতে হইবে। কিন্তু একটা উপায় চিন্তা করিয়াছি, হয়তো রক্ষা পাইতেও পারি।'

'তুমি কে, তাহা তো বলিলে না।'

'আমি চোর। তুমি কি রাত্রে ঘুমাও না ?'

'কখন ঘুমাই কখন জাগিয়া থাকি বুঝিতে পারি না। তুমি ঘুমাও, আমি জাগিয়া থাকিব।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ
মুক্তি

চোর ধরার উত্তেজনায় সুগোপার রাত্রে ঘুম হয় নাই। ভোর হইতে না হইতে সে রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজকুমারী রট্টা তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নাই; শয়ন মন্দিরের দ্বারে যবনী প্রতিহারীর পাহারা। সুগোপা কিন্তু যবনীর নিষেধ মানিল না, শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—'সখি, ওঠ ওঠ, অশ্বচোর ধরা পড়িয়াছে।'

রাজকুমারীর চক্ষু দু'টি খুলিয়া গেল ; যেন দুইটি খঞ্জন একসঙ্গে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'দূর হ' প্রেতিনী ! কী সুন্দর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তুই ভাঙ্গিয়া দিলি।'

সুগোপা পালঙ্কের পাশে বসিয়া বলিল—'ওমা, কি স্বপ্ন দেখিলে ? ভোরের স্বপ্ন সত্য হয়। বল বল শুনি।'

রট্টা বলিলেন—'কমল সরোবরে এক হস্তী ক্রীড়া করিতেছিল ; আমি তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে হস্তী আমাকে দেখিতে পাইল ; তখন সরোবরের মধ্যস্থল হইতে একটি রক্তকমল শুণ্ডে তুলিয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমি অঞ্জলি বাঁধিয়া হাত বাড়াইলাম। হস্তী তীরের নিকটে আসিয়া কমলটি আমার হাতে দিতে যাইবে, এমন সময় তুই ঘুম ভাঙ্গিয়া দিলি।'

সুগোপা বলিল—'ভাল স্বপ্ন। গ্রহাচার্য ঠাকুরের নিকট ইহার অর্থ জানিয়া লইতে হইবে। এখন ওঠ, চোর দেখিবে না ?'

আলস্য ত্যাগের ভঙ্গিমায় দেহটি লীলায়িত করিয়া রট্টা উঠিলেন। চোর দেখিবার কৌতূহল নাই এমন মানুষ বিরল, তা তিনি রাজকন্যাই হোন আর মালাকর-বধূই হোন। তবু রট্টা পরিহাসচ্ছলে বলিলেন—'তোর চোর তুই দেখ না, আমি দেখিয়া কি করিব ?'

সুগোপা বলিল—'ধন্য ! চোর তোমার ঘোড়া চুরি করিল, তবে সে আমার চোর হইল কিরূপে ?'

রট্টা বলিলেন—'তুই চোরের চিন্তায় রাত্রে ঘুমাইতে পারিস নাই, সাত সকালে আসিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গাইলি। নিশ্চয় তোর চোর।'

সহাস্য মুখে রট্টা স্নানাগারের অভিমুখে চলিলেন। সুগোপাও রঙ্গ পরিহাস করিতে করিতে, গত রাত্রির চোর ধরার কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে তাঁহার সঙ্গিনী হইল।

সূর্যোদয়ের দণ্ড দুই পরে রাজকীয় সভাগৃহে কিছু জনসমাগম হইয়াছিল। রাজার অনুপস্থিতিতে রাজসভায় অধিবেশন হয় না, মন্ত্রিগণ স্ব স্ব গৃহে থাকিয়া রাজকার্য পরিচালনা করেন, তাই রাজসভা শূন্যই থাকে। কিন্তু আজ কোট্টপাল মহাশয় প্রাতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ; তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি সশস্ত্র অনুচর। তদ্ব্যতীত পুরীর কয়েকজন দৌবারিক ও প্রতীহার আছে। অবরোধের কঞ্চুকীও চোরের খবর পাইয়া আসিয়া জুটিয়াছে। মন্ত্রীরা বোধকরি চোর ধৃত হওয়ার সংবাদ এখনও পান নাই, তাই আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই।

রাজকুমারী রট্টা সভায় আসিলেন ; সঙ্গে সখী সুগোপা। রট্টার পরিধানে হরিতালবর্ণ ক্ষৌমবস্ত্র, বক্ষে দূর্বাহরিৎ কঞ্চুলী, কেশ-কুণ্ডলীর মধ্যে শ্বেত কুরুবকের নবমুকুল চন্দ্রকলার ন্যায় জাগিয়া আছে—যেন সাক্ষাৎ বসন্তের জয়শ্রী। রট্টা আসিয়া সিংহাসনের পাদপীঠে বসিলেন। সুগোপা তাঁর পায়ের কাছে বসিল।

অভিবাদন শেষ হইলে রট্টা চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন—'চোর কোথায় ?'

কোট্টপালের ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহার দুইজন অনুচর বাহিরে গেল ; অল্পকাল পরে বদ্ধহস্ত চোরকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাদের পিছনে গত রাত্রির তোরণ-প্রতীহার ও যামিক-রক্ষিদ্বয়ও আসিল।

চোরকে সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড় করানো হইল।

রট্টা স্থিরদৃষ্টিতে চোরকে নিরীক্ষণ করিলেন। সুগোপা তাঁহার কানে কানে প্রশ্ন করিল—'চিনিতে পারিয়াছ ?'

রট্টা বলিলেন—'হাঁ, চিনিয়াছি। কল্য জলসত্রে এই ব্যক্তিই আমার অশ্ব চুরি করিয়া পলাইয়াছিল! অশ্বচোর, তোমার কিছু বলিবার আছে?'

চিত্রক এতক্ষণ সংযতভাবে দাঁড়াইয়া রাজকন্যার পানে চাহিয়া ছিল। রাত্রে অন্ধকূপ-বাসের ফলে তাহার বস্ত্রাদি কিছু বিস্রস্ত ও মলিন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার হাবভাব দেখিয়া তাহাকে তস্কর বলিয়া মনে হয় না। বরং কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অকারণে অপদস্থ হইলে যেরূপ ভর্ৎসনাপূর্ণ গাম্ভীর্যের ভাব ধারণ করেন, তাহার মুখভাব সেইরূপ। সে একবার শান্ত অথচ অপ্রসন্ননেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—'এ আমি কোথায় আনীত হইয়াছি জানিতে পারি কি?'

কোট্টপাল চোরের ভাবভঙ্গি দেখিয়া উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, কঠোরকণ্ঠে বলিলেন—'রাজসভায় আনীত হইয়াছ। তুমি রাজকন্যার অশ্ব চুরি করিয়াছিলে সেজন্য তোমার দণ্ড হইবে। এখন কুমারীর কথার উত্তর দাও; তোমার কিছু বলিবার আছে?'

চিত্রক তেমনই ধীরস্বরে বলিল—'আছে। ইহা কি দণ্ডাধিকরণ? বিচারগৃহ?'

কোট্টপাল বলিলেন—'না। তোমার বিচার যথাসময়ে হইবে। এখন প্রশ্নের উত্তর দাও—কী জন্য অশ্ব চুরি করিয়াছিলে?'

চিত্রক কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে রট্টার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর গম্ভীরস্বরে বলিল—'আমি অশ্ব চুরি করি নাই, রাজকার্যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলাম মাত্র।'

সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। চোর বলে কি? কোট্টপাল মহাশয়ের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; চোরের এমন ধৃষ্টতা? রট্টার চোখেও সবিস্ময় রোষের বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল; তিনি ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন—'তুমি বিদেশী মনে হইতেছে। তোমার পরিচয় কি?'

চিত্রক রাজকুমারীর রোষদৃষ্টির সম্মুখে কিছুমাত্র অবনমিত না হইয়া অকম্পিতস্বরে বলিল—'আমি মগধের দূত, পরমভট্টারক পরমেশ্বর শ্রীমন্মহারাজ স্কন্দগুপ্তের সন্দেশবহ।'

সভাস্থ কাহারও মুখে আর কথা রহিল না; সকলে ফ্যালফ্যাল করিয়া ইতিউতি চাহিতে লাগিল। মগধের দূত! স্কন্দগুপ্তের বার্তাবাহক! স্কন্দগুপ্তের নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত না এমন মানুষ তখন আর্যাবর্তে অল্পই ছিল। সেই স্কন্দগুপ্তের দূতকে চোর বলিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে!

কোট্টপাল মহাশয় হতভম্ব। রাজকুমারী রট্টার চোখে চকিত জিজ্ঞাসা। সুগোপার মুখ শুষ্ক। সকলে চিত্রার্পিতবৎ নিশ্চল।

এই চিত্রার্পিত অবস্থা কতক্ষণ চলিত বলা যায় না; কিন্তু ভাগ্যক্রমে এই সময় রাজ্যের মহাসচিব চতুরানন ভট্ট দেখা দিলেন। চতুরানন বর্ণে ব্রাহ্মণ: চতুর স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি। তৎকালে ভারতভূমিতে বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বহু জাতীয় এবং বহু ধর্মীয় রাজা রাজত্ব করিতেন; উত্তরে শক হূণ ছিল, দক্ষিণে দ্রাবিড় গুর্জর ছিল। কিন্তু মন্ত্রিত্ব করার বেলায় দেখা যাইত একটি ক্ষীণকায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর আসনটি অধিকার করিয়া আছেন।

সচিব চতুরানন সভায় প্রবেশ করিয়া কঞ্চুকী মহাশয়কে সংক্ষেপে দুই চারি প্রশ্ন করিয়া ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। তারপর সভার মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রথমে হস্ত তুলিয়া রাজকুমারীকে আশীর্বাদপূর্বক তিনি বন্দীর দিকে ফিরিলেন। চতুরানন ভট্টের চোখের দৃষ্টি ক্ষিপ্র এবং মসৃণ; কোথাও বাধা পায় না। চিত্রকের আপাদমস্তক নিমেষমধ্যে দেখিয়া লইয়া তিনি আদেশ দিলেন—'হস্তবন্ধন খুলিয়া দাও।'

এতক্ষণ কে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না, এখন যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কোট্টপাল মহাশয় স্বয়ং চিত্রকের বন্ধন খুলিয়া দিলেন।

চতুরানন ভট্ট তখন স্মিতমুখে সুমিষ্ট স্বরে চিত্রককে সম্বোধন করিলেন—'আপনি মগধের

রাজদূত ?'

চিত্রক এই মসৃণ চক্ষু মৃদুবাক্ প্রৌঢ়কে দেখিয়া মনে মনে সতর্ক হইয়াছিল, বলিল —'হাঁ। আপনি ?'

চতুরানন বলিলেন—'আমি এ রাজ্যের সচিব। মহাশয়ের নাম ? মহাশয়ের অভিজ্ঞান ?'

মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী তর্জনী হইতে উন্মোচন করিতে করিতে চিত্রক তড়িৎবৎ চিন্তা করিল, রাজলিপিতে দূতের নাম কোথাও আছে কি ? যতদূর স্মরণ হয়—নাই। সে বলিল —'আমার নাম চিত্রক বর্মা।'

চতুরানন একটু ভ্রূ তুলিলেন—'আপনি ক্ষত্রিয় ? দৌত্যকার্যে সাধারণত ব্রাহ্মণ নিয়োগই বিধি।'

চিত্রক বলিল—'হাঁ। এই দেখুন আমার অভিজ্ঞান মুদ্রা।'

অভিজ্ঞান দেখিয়া চতুরাননের চক্ষে সম্ভ্রম ফুটিয়া উঠিল। তিনি হস্তদ্বয় পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন—'দূত মহাশয়, আপনি স্বাগত। দেখিতেছি উভয় পক্ষেই একটু ভুল হইয়া গিয়াছে। আপনি না বলিয়া অশ্বটি গ্রহণ না করিলেই পারিতেন—রাজকুমারীর অশ্ব—'

চিত্রক স্মিত হাস্য করিয়া রট্টার পানে আয়ত নয়ন ফিরাইল, বলিল—'রাজকুমারীর অশ্ব তাহা আমি অনুমান করিতে পারি নাই।'

এই বাক্যের মধ্যে কতখানি প্রগল্‌ভতা এবং কতখানি আত্মসমর্থন ছিল তা ঠিক ধরা গেল না, কিন্তু রট্টা চিত্রকের চক্ষু হইতে চক্ষু সরাইয়া লইয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই দূতের বাক্‌পটিমা আছে বটে, অল্প কথা বলিয়া অনেক কথার ইঙ্গিত করিতে পারে।

চতুরানন বলিলেন—'অবশ্য অবশ্য। তারপর গত রাত্রেও যদি আপনি নিজ পরিচয় দিতেন—'

চিত্রক বলিল—'কাহার কাছে পরিচয় দিব ? যামিক-রক্ষীর কাছে ? তোরণ-প্রতীহারের কাছে ?'

চতুরানন চিত্রকের মুখের উপর পিচ্ছিল দৃষ্টি বুলাইয়া একটি নিশ্বাস ফেলিলেন—'যাক, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে—নির্বাণ দীপে কিমু তৈলদানম্। এখন আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু তৎপূর্বে, আপনি যে রাজবার্তার বাহক তাহা কোথায় ?'

চিত্রক বলিল—'সম্ভবত আমার থলিতে আছে, যদি না আপনার যামিক-রক্ষীরা ইতিপূর্বে উহা আত্মসাৎ করিয়া থাকে—'

যামিক-রক্ষীরা সভার পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত ছিল, তাহারা সবেগে মস্তক আন্দোলন করিয়া এরূপ অবৈধ তস্করবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করিল। চিত্রক তখন থলি খুলিয়া দেখিল, লিপি আছে। সে সযত্নে লিপি-কুণ্ডলী বাহির করিয়া একটু ইতস্তত করিল—'রাজলিপি কিন্তু রাজার হস্তে দেওয়াই বিধি।'

মন্ত্রী বলিলেন—'সে কথা যথার্থ। কিন্তু মহারাজ এখন রাজধানীতে উপস্থিত নাই—রাজকন্যাই তাঁহার প্রতিভূ। আপনি দেবদুহিতার হস্তে পত্র দিতে পারেন।'

চিত্রক তখন দুই পদ অগ্রসর হইয়া যুক্তহস্তে লিপি রাজকুমারীর হস্তে অর্পণ করিল।

পত্র লইয়া রট্টা ক্ষণকাল দ্বিধাভরে রহিলেন, তারপর ঈষৎ হাসিয়া লিপি-কুণ্ডলী মন্ত্রীর হাতে দিলেন। হাসির অর্থ—রাজনীতির বিধি তো পালিত হইয়াছে, এখন যাহার কর্ম সে করুক।

লিপি হস্তে লইয়া মন্ত্রী চতুরানন কিন্তু চমকিয়া উঠিলেন—'একি! লিপির জতুমুদ্রা ভগ্ন দেখিতেছি!' তিনি তীক্ষ্ণ সন্দেহে চিত্রকের পানে চাহিলেন।

চিত্রক তরল কৌতুকের কণ্ঠে বলিল—'কাল রাত্রে আপনার যামিক-রক্ষীরা আমার সহিত

কিঞ্চিৎ মল্লযুদ্ধ করিয়াছিল, হয়তো সেই সময় জতুমুদ্রা ভাঙ্গিয়া থাকিবে।'

কথাটা অসম্ভব নয়, কিন্তু মন্ত্রীর সংশয় দূর হইল না। তিনি যামিক-রক্ষীদের পানে চাহিলেন, যামিক-রক্ষীরা মস্তক অবনত করিয়া স্বীকার করিল, মল্লযুদ্ধ একটা হইয়াছিল বটে।

চিত্রক মুখ টিপিয়া হাসিল ; বলিল—'আমার দৌত্য শেষ হইয়াছে। এবার অনুমতি করুন আমি বিদায় হই।'

চতুরানন বলিলেন—'সে কি কথা। আপনি মগধের রাজদূত ; এতদূর আসিয়াছেন, এখনি ফিরিয়া যাইবেন ? ভাল কথা, আপনার সঙ্গী-সাথী কি কেহই নাই ?'

চিত্রক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'যখন যাত্রা করিয়াছিলাম তখন তিনজন সঙ্গী ছিল, পথে নানা দুর্ঘটনায় তাহাদের হারাইয়াছি—অশ্বও গিয়াছে। এদিকে পথ বড় জটিল ও বিপদসঙ্কুল। —যাক, এবার আজ্ঞা দিন।' বলিয়া রট্টার দিকে চক্ষু ফিরাইল।

রট্টা কিছু বলিবার পূর্বেই মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন—'কিন্তু এখনি আপনার দৌত্য শেষ হয় নাই, আপনি যাইবেন কি প্রকারে ? পত্রের উত্তর—'

চিত্রক দৃঢ়স্বরে বলিল—'পত্রের উত্তর সম্বন্ধে আমার কোনও কর্তব্য নাই। আমি শ্রীমন্মহারাজের পত্র আপনাদের অর্পণ করিয়াছি, আমার দায়িত্ব শেষ হইয়াছে।' বলিয়া অনুমতির অপেক্ষায় আবার রট্টার পানে চাহিল।

এবার রট্টা কথা বলিলেন, ধীর প্রশান্ত স্বরে কহিলেন—'দূত মহাশয়, বিটঙ্ক রাজ্যে আসিয়া আপনার কিছু নিগ্রহ ভোগ হইয়াছে। নিগ্রহ অনিচ্ছাকৃত হইলেও আপনি ক্লেশ পাইয়াছেন। কিন্তু অতিথি-নিগ্রহ বিটঙ্ক দেশের স্বভাব নয়। আপনি কিছুদিন রাজ-আতিথ্য স্বীকার করিলে আমরা তৃপ্ত হইব।'

চিত্রক এতক্ষণ পলায়নের একটা ছিদ্র খুঁজিতেছিল। বিটঙ্ক রাজ্য তাহার পক্ষে নিরাপদ নয়। সে বুঝিয়াছিল, কূটবুদ্ধি মন্ত্রী তাহার দৌত্য সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। উপরন্তু শশিশেখর যে-কোনও মুহূর্তে আসিয়া হাজির হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় যত শীঘ্র এ রাজ্য ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল। এতক্ষণ চিত্রক সেই চেষ্টাই করিতেছিল। কিন্তু এখন রাজকুমারী রট্টার কথা শুনিয়া সহসা তাহার মনের পরিবর্তন হইল। কুমারী রট্টার দিক্-আলোকরা রূপের ছটায়, তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর বাচনভঙ্গিমায় এমন কিছু ছিল যে চিত্রকের মন হইতে পলায়ন-স্পৃহা তিরোহিত হইয়া পৌরুষপূর্ণ হঠকারিতা জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিল, বিপদের মুখে পলাইব কেন ? দেখাই যাক না, চপলা ভাগ্যদূতী কোন্ পথে লইয়া যায়। জীবনের সকল পথের শেষেই তো মৃত্যু, তবে ভীরুর মত পলাইব কেন ?

সে যুক্তকরে শির নমিত করিয়া বলিল—'দেবদুহিতার যেরূপ আদেশ।'

রট্টার মুখের প্রসন্নতা আরও পরিস্ফুট হইল ; তিনি মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আর্য চতুর ভট্ট, দূত মহাশয়ের স্থান ব্যবস্থা করুন।'

চতুর ভট্ট এবার একটু বিপন্ন হইলেন। গত পঁচিশ বৎসরে বিটঙ্ক রাজ্যে পররাষ্ট্রের কোনও দূত আসে নাই, তাই রাজ্যে দূতাবাসের কোনও পাকা ব্যবস্থা নাই। কদাচিৎ মিত্ররাজ্য হইতে রাজকীয় অতিথি আসিলে রাজপুরীর মধ্যে কোনও এক ভবনে তাঁহার স্থান হইয়াছে। কিন্তু এই দূতটিকে কোথায় রাখা যায় ? মগধের দূতকে ভালভাবেই রাখিতে হয় ; নগরের পান্থশালায় স্থান নির্দেশ করা চলে না।...স্কন্দগুপ্তের পত্রে কী আছে তাহা এখনও দেখা হয় নাই ; এতদিন পরে মগধ কি বিটঙ্ক রাজ্যের উপর একরাট্ অধিকার দাবি করিতে চায় নাকি ?...সে যাহোক পরে দেখা যাইবে, এখন দূতটাকে কোথায় রাখা যায় ? দূতের দূতীয়ালিতে কোথায় যেন একটা গলদ রহিয়াছে—বিদায় লইবার জন্য এত ব্যগ্র কেন ? উহাকে সহজে দৃষ্টিবহির্ভূত করা হইবে না—

চক্ষু অর্ধ-মুদিত করিয়া চতুর ভট্ট চিন্তা করিলেন ; তারপর নিম্নস্বরে কঞ্চুকীর সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগলের বক্রতা অপনীত হইল। তিনি বলিলেন—'মগধের রাজদূতের জন্য যথোচিত সম্মানের স্থান নির্দিষ্ট হইবে ; রাজপুরীর মধ্যেই তিনি অবস্থান করিবেন। সুবিধা হইয়াছে, মহারাজের সন্নিধাতা হর্ষ মহারাজের সঙ্গে চষ্টন দুর্গে গিয়াছে ; হর্ষের স্থান শূন্য আছে। দূত মহোদয় সেইস্থানেই থাকিবেন।'

এই ব্যবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। রাজপুরীতে স্থান দিয়া মগধদূতকে সম্মান দেখানো হইল, অপিচ সন্নিধাতার অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পর্যায়ে স্থান দিয়া অধিক সম্মান দেখানো হইল না। চতুর ভট্ট সুখী হইলেন ; দূত রাজপুরীর প্রাকার মধ্যে রহিল, ইচ্ছা করিলেও পলাইতে পারিবে না।

কঞ্চুকীর দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন—'লক্ষ্মণ, তোমার উপর দূত-প্রবরের সেবার ভার রহিল। এখন তাঁহাকে বিশ্রাম মন্দিরে লইয়া যাও।' বলিয়া অর্থপূর্ণভাবে কঞ্চুকীর পানে চাহিলেন।

লক্ষ্মণ কঞ্চুকী চতুর ভট্টের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়াছিল। সে চিত্রকের নিকটে আসিয়া বহু সমাদর সহকারে তাহাকে বিশ্রাম মন্দিরে আহ্বান করিল।

চিত্রক রাজকুমারীকে যুক্তকরে অভিবাদন করিয়া কঞ্চুকীর অনুবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সহসা একটা কথা স্মরণ হওয়ায় সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'দেবদুহিতাকে একটি সংবাদ জানাইতে ইচ্ছা করি। গত রাত্রে আমি যে অন্ধকূপে বন্দী ছিলাম সেখানে একটি স্ত্রীলোক বন্দিনী আছে।'

রট্টা নেত্র বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন—'স্ত্রীলোক !'

'হাঁ। বন্দিনীর নাম পৃথা।'

সুগোপা রট্টার পদমূলে বসিয়া শুনিতেছিল, সে চমকিয়া উঠিল—'পৃথা !'

চিত্রক বলিল—'হতভাগিনী পঁচিশ বৎসর ঐ কারাকূপে বন্দিনী আছে। যখন প্রথম হূণ অভিযান হয় তখন পৃথা পূর্বতন রাজপুত্রের ধাত্রী ছিল—এক হূণ যোদ্ধা তাহাকে বলাৎকারপূর্বক ঐ স্থানে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল—'

সুগোপা ছিন্নজ্যা ধনুর ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—'আমার মা ! আমার মা— !'

অষ্টম পরিচ্ছেদ
রাজপুরীতে

রাজপুরীর প্রাকার-বেষ্টনীর মধ্যে অনেকগুলি প্রাসাদ আছে ; কোনটি সভাগৃহ, কোনটি কোষাগার, কোনটি মন্ত্রণাভবন ; একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। রাজকন্যা যে প্রাসাদে বাস করেন তাহা অবরোধ ; তাহার পাশে রাজার জন্য পৃথক ভবন। উভয় প্রাসাদের মধ্যে অলিন্দের সংযোগ ; উভয় প্রাসাদ ত্রিভূমক।

রাজপ্রাসাদের নিম্নতলে এক পাশের কয়েকটি কক্ষ লইয়া সন্নিধাতা হর্ষের বাসস্থান। রাজ-বৈভবের তুলনায় ইহা অপকৃষ্ট হইলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐশ্বর্যের চূড়ান্ত। কঞ্চুকী লক্ষ্মণ চিত্রককে এইস্থানে আনিয়া অধিষ্ঠিত করিল।

চিত্রক হৃষ্ট মনে আসন গ্রহণ করিতে না করিতে কঞ্চুকীর ইঙ্গিতে কয়েকটা অসুরাকৃতি সম্বাহক

আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া সবেগে তৈল মর্দন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ইহা রাজকীয় সমাদরের প্রথম প্রবন্ধ।

অতঃপর চিত্রক শীতল জলে স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিল ; অঙ্গে চন্দন প্রলেপ দিয়া আহারে বসিল। প্রচুর পিষ্টক পৌলিক মোদক পরমান্নের আয়োজন, তদুপরি কঞ্চুকীর সবিনয় নির্বন্ধ। চিত্রক আকণ্ঠ ভরিয়া ভোজন করিল।

তারপর শরতের মেঘশুভ্র শয্যায় শয়ন। দুইজন নহাপিত আসিয়া অতি আরামদায়কভাবে হস্তপদ টিপিয়া দিতে লাগিল। এই আলস্যসুখ মুদিতচক্ষে উপভোগ করিতে করিতে, পুরুষভাগোর বিচিত্র ভুজঙ্গ-গতির কথা চিন্তা করিতে করিতে চিত্রক ঘুমাইয়া পড়িল।

ওদিকে সচিব চতুরানন ভট্ট মগধের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা মিথ্যা হয় নাই, রাষ্ট্রনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন না করিয়া যতখানি রূঢ়তা প্রকাশ করা যাইতে পারে ততখানি রূঢ়তার সহিত লিপিতে বিটঙ্ক রাজ্যের উপর নির্দেশ প্রেরিত হইয়াছে—বিটঙ্করাজ অচিরাৎ মগধের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া বক্রী রাজস্ব অর্পণ করুন ; নচেৎ হূণহরিণকেশরী সম্রাট স্কন্দগুপ্ত স্বয়ং সসৈন্যে গান্ধার অভিমুখে যাইতেছেন, ইত্যাদি।

পত্র পাঠ করিয়া চতুর ভট্ট দীর্ঘকাল গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিলেন ; তারপর অন্য সচিবদের ডাকিয়া মন্ত্রণায় বসিলেন। শ্যেনপক্ষীর সহিত চটকের প্রতিস্পর্ধিতা সম্ভব নয় ; চটকের পক্ষে হিতকরও নয়। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে বাহুবলই সর্বস্ব নয়, কূটনীতিও আছে। স্কন্দগুপ্ত নূতন হূণ অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য গান্ধারে আসিতেছেন ; ঘোর যুদ্ধ বাধিবে ; দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিবে ; শেষ পর্যন্ত ফলাফল কিরূপ দাঁড়াইবে কিছুই বলা যায় না। সুতরাং অবিলম্বে মগধের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া ছলছুতা দ্বারা যদি কালহরণ করা যায়, হয়তো অন্তে সুফল ফলিতে পারে। একদিকে হূণ, অন্যদিকে স্কন্দগুপ্ত ; এ অবস্থায় যথাসাধ্য নিরপেক্ষতা অবলম্বনই যুক্তি।

সচিবগণ একমত হইয়া মনস্থ করিলেন, পত্রের উত্তর দানে যথাসম্ভব বিলম্ব করা হোক ; দূতটাকে বলা যাক, মহারাজ কপোতকূটে যতদিন না ফিরেন ততদিন পত্রের উত্তর দান সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে মহারাজ রোট্টকে সব কথা জানাইয়া বার্তা প্রেরণ করা আবশ্যক। তিনি এখন চষ্টন দুর্গেই থাকুন, রাজধানীতে ফিরিবার কোনও তাড়া নাই। কিন্তু এত বড় গুরুতর সংবাদ তাঁহার গোচর করা সর্বাগ্রে কর্তব্য।

এইরূপ মনোনীত হইলে পর ত্বরিতগতি তুরঙ্গপৃষ্ঠে চষ্টন দুর্গে বার্তাবহ প্রেরিত হইল।

মন্ত্রগৃহে যখন এই সকল রাজকার্য চলিতেছিল, কুমারী রট্টা তখন নিজ ভবনে ছিলেন। আজ নানা কারণে তাঁহার মন কিছু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল। প্রথমেই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগরণ ; তারপর চৌর ঘটিত ব্যাপারের অদ্ভুত পরিসমাপ্তি। মগধের দূত...মগধ...বিশ্ববিশ্রুত পাটলিপুত্র নগর...দিগ্বিজয়ী বীর স্কন্দগুপ্ত...দূত নিজের কী নাম বলিয়াছিল ? চিত্রক বর্মা ! চিত্রক...চিত্র ব্যাঘ্র...ব্যাঘ্রের সহিত কোথাও যেন সাদৃশ্য আছে...চোখের দৃষ্টি বড় নির্ভীক...

সর্বশেষে সুগোপার মাতার উদ্ধার। সুগোপার মাতা প্রাক্তন রাজপুত্রের ধাত্রী ছিল, কুমারী রট্টা তাহা জানিতেন। অভাগিনীর এই দুর্দশা হইয়াছিল ? সকলের অজ্ঞাতে পঁচিশ বৎসর বন্দিনী ছিল ! কেমন করিয়া বাঁচিয়া ছিল ; কে তাহাকে আহার দিত ? পৃথার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া রট্টার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িল। উঃ, পঁচিশ বৎসর পূর্বে হূণেরা কি বর্বরতাই না করিয়াছিল। রট্টা হূণদুহিতা, তবু—

সুগোপা মাতাকে উদ্ধার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে লইয়া গিয়াছিল। সুগোপা বড় কান্না কাঁদিয়াছিল, স্মরণ করিয়া রট্টার চোখেও জল আসিল। তাঁহার ইচ্ছা হইল সুগোপার গৃহে গিয়া

তাহাকে দেখিয়া আসেন। সুগোপার গৃহে তিনি বহুবার গিয়াছেন, যখন ইচ্ছা গিয়াছেন। কিন্তু আজ যাইতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইল। প্রিয়সখি সুগোপা মৃতকল্পা মাতাকে পাইয়া তুমুল হৃদয়াবেগের আবর্তে নিমজ্জিত হইয়াছে, এখন রট্টা তাহার কাছে যাইলে সে বিভ্রান্ত হইবে, বিব্রত হইবে।

মধ্যাহ্ন অতীত হইবার পর রট্টা গ্রহাচার্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। গ্রহাচার্য আসিলেন ; স্বপ্ন-কথা শুনিয়া তিনি প্রশ্নগণনার আঁক কষিলেন, দিক্‌নির্ণয় করিলেন, লগ্ন নির্ধারণ করিলেন। তারপর ফলাদেশ করিলেন—'কল্যাণি, তোমার জীবনের এক মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু শঙ্কিত হইও না ; অন্তে ফল শুভ হইবে। এক দিঙ্‌নাগসদৃশ মহাতেজস্বী পুরুষের সহিত তোমার পরিচয় ঘটিবে ; এই পুরুষসিংহ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তোমার বিবাহের কালও আসন্ন। শুভমস্তু।' গ্রহবিপ্রের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল তিনি সব কথা খুলিয়া বলিলেন না, কিছু চাপিয়া গেলেন।

তিনি বিদায় হইলে রট্টা দীর্ঘকাল করলগ্নকপোলে বসিয়া রহিলেন, শেষে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন—নিয়তির বিধান যখন অখণ্ডনীয় তখন চিন্তা করিয়া লাভ কি ?

ক্রমে অপরাহ্ণ হইল।

ওদিকে চিত্রক দীর্ঘ দিবানিদ্রার পর জাগিয়া উঠিয়াছে। শরীর বেশ স্বচ্ছন্দ ; গত কয়েকদিনের নানা ক্লেশজনিত গ্লানি আর নাই। তাহার মনেরও শরীরের অনুপাতে প্রফুল্ল হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু চিত্রক অনুভব করিল, তাহার মন প্রফুল্ল না হইয়া বরং ক্রমশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে।

রাজপুরীর আদর আপ্যায়নে সে অভ্যস্ত নয় ; উপরন্তু কঞ্চুকী লক্ষ্মণ যেন একটু অধিক পরিচর্যা করিতেছে। সে দণ্ডে দণ্ডে আসিয়া চিত্রকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সন্দেশ লইতেছে ; তদুপরি তাহার কয়েকটা অনুচর সর্বদাই চিত্রককে বেষ্টন করিয়া আছে। কেহ ব্যজন করিতেছে, কেহ শীতল তক্র বা ফলাম্লরস আনিয়া সম্মুখে ধরিতেছে, কেহ বা তাম্বূল দিতেছে। মুহূর্তের জন্যও সে একাকী থাকিতে পাইতেছে না। তাহার সন্দেহ হইল, এই সাড়ম্বর আপ্যায়নের অন্তরালে অদৃশ্য জাল তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সে মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। হঠতাবশে রাজকুমারী রট্টার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিলেই বোধহয় ভাল হইত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চিত্রক মনে মনে একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়া গাত্রোত্থান করিল। উত্তরীয় স্কন্ধে লইতেই এক কিঙ্কর জোড়হস্তে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল—'কি প্রয়োজন আদেশ করুন আর্য—আণবেদু।'

চিত্রক বলিল—'বহির্ভাগে পরিভ্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। বায়ু সেবনের প্রয়োজন।'

কিঙ্কর পশ্চাৎপদ হইয়া অন্তর্হিত হইল।

চিত্রক রাজভবনের বাহিরে পদার্পণ করিয়াছে, কোথা হইতে কঞ্চুকী আসিয়া হাসিমুখে তাহার সহিত যোগ দিল। 'সায়ংকালে বায়ু সেবনের ইচ্ছা হইয়াছে ? ভাল ভাল, চলুন আপনাকে রাজপুরী দেখাই।' বলিয়া লক্ষ্মণ কঞ্চুকী লক্ষ্মণ ভ্রাতার মতই তাহার সহগামী হইল।

দুইজনে পুরভূমির যত্রতত্র বিচরণ করিতে লাগিল। চিত্রক বুঝিল পুরীর বাহিরে যাইবার চেষ্টা বৃথা, সে পুরপ্রাকারের বাহিরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কঞ্চুকী হয়তো বাধা দিবে না, কিন্তু নিজে সঙ্গে থাকিবে। সুতরাং বাহিরে যাইবার আগ্রহ প্রকাশ না করাই ভাল।

বিস্তৃত পুরভূমির স্থানে স্থানে বৃক্ষ-বাটিকা, লতা-মণ্ডপ। মানুষ বেশি নাই ; যাহারা আছে তাহারা অধিকাংশই সশস্ত্র প্রতীহার কিম্বা রক্ষী, দুই চারিজন উদ্যানপালও আছে। তাহারা সকলে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত।

ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে চিত্রক অনুভব করিল, কঞ্চুকী ছাড়াও অন্য কেহ তাহার উপর

লক্ষ্য রাখিয়াছে, নিজে অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতেছে। চিত্রক চকিতে কয়েকবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কিন্তু সন্ধ্যার মন্দালোকে বিশেষ কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

তারপর এক বৃক্ষ-বাটিকার নিকটে চিত্রক তাহার অদৃশ্য অনুসরণকারীকে মুখোমুখি দেখিতে পাইল। এক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একজোড়া ভয়ঙ্কর চক্ষু তাহার দিকে চাহিয়া আছে, হিংসাবিকৃত মুখে জ্বলন্ত দু'টা চক্ষু। চিত্রক চমকিয়া বলিয়া উঠিল—'ও কে ?' সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া গেল।

কঞ্চুকী বলিল—'ও গুহ। আপনাকে নূতন মানুষ দেখিয়া বোধহয় কৌতূহলী হইয়াছে।'

চিত্রকের গত রাত্রির কথা মনে পড়িল ; হাঁ, সেই বটে। কিন্তু গত রাত্রে গুহর চোখে এমন তীব্র দৃষ্টি ছিল না। চিত্রক কঞ্চুকীকে প্রশ্ন করিলে কঞ্চুকী সংক্ষেপে পাগল গুহর বৃত্তান্ত বলিল। তখন চিত্রক অন্ধকূপে পৃথার নিকট যে কাহিনী শুনিয়াছিল তাহার সহিত মিলাইয়া প্রকৃত ঘটনা অনেকটা অনুমান করিয়া লইল। গুহই পৃথাকে হরণ করিয়া কূটরন্ধ্রে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, ইচ্ছা ছিল যুদ্ধ শেষ হইলে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দখল করিবে, কিন্তু মস্তকে আঘাত পাইয়া তাহার স্মৃতিভ্রংশ হয়। তবু সে সব কথা ভোলে নাই ; কোন অর্ধ-বিভ্রান্ত বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া গোপনে পৃথাকে খাদ্য দিয়া যাইত। শতাব্দীর একপাদ ধরিয়া সে এই কাজ করিয়াছে। আশ্চর্য মস্তিষ্কের ক্রিয়া, আশ্চর্য জীবনের সহজাত সংস্কার !

ক্রমে দিবালোক মুছিয়া গিয়া চাঁদের আলো ফুটিয়া উঠিল। রাজপুরীর ভবনে ভবনে দীপমালা জ্বলিল।

প্রদোষের এই সন্ধিক্ষণে চারিদিকে চাহিয়া চিত্রকের মনে হইল সে এই নির্বান্ধব পুরীতে একান্ত একাকী, নিতান্ত অসহায়। কাল বন্দী হইবার পর অন্ধকার কারাকূপের মধ্যে তাহার যে অবস্থা হইয়াছিল, আজ রাজপুরীর দীপোদ্ভাসিত প্রাঙ্গণে সে অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই।

সহসা তাহার অন্তর অসহ্য অধীরতায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিল ; সে যেন জল হইতে তীরে নিক্ষিপ্ত মীন। কিন্তু সে তাহার মনের অবস্থা সযত্নে গোপন করিয়া কঞ্চুকী সমভিব্যাহারে নিজ বাসভবনের দিকে ফিরিয়া চলিল।

রাত্রির মধ্যযামে রাজপুরীর আলোকমালা নির্বাপিত হইয়াছিল ; শুক্লা চতুর্দশীর চন্দ্র পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে লঘু মেঘখণ্ড আসিয়া স্বচ্ছ আবরণে চন্দ্রকে ঢাকিয়া দিতেছিল।

রাজভবন সুপ্ত ; কোথাও শব্দ নাই। চিত্রক আপন শয়নকক্ষে শয্যায় লম্বমান ছিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। সে ঘুমায় নাই, কেবল চক্ষু মুদিত করিয়া শয্যায় পড়িয়া ছিল।

ঘরের এক কোণে স্তিমিত বর্তিকা অস্পষ্ট আলোক বিকীর্ণ করিতেছে ; মুক্ত বাতায়ন পথে মৃদু বায়ুর সহিত জ্যোৎস্নার প্রতিভাস কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। চিত্রক নিঃশব্দে পালঙ্ক হইতে নামিয়া বাতায়নের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কোনও জনমানব নাই ; চন্দ্রিকালিপ্ত পুরী নিথর দাঁড়াইয়া আছে।

চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ মেঘে ঢাকা পড়িল ; বহির্দৃশ্য আবছায়া হইয়া গেল। চিত্রক তখন বাতায়ন হইতে সরিয়া আসিয়া দ্বারপথে উঁকি মারিল। দ্বারের বাহিরে একটা কিঙ্কর বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে ; অন্য কেহ নাই। চিত্রক নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল। প্রাচীর-গাত্রে তাহার সকোষ অসি ঝুলিতেছিল, সে তাহা কোমরে বাঁধিল।

তারপর লঘু পদে বাতায়ন লঙ্ঘন করিয়া সে পুরভূমিতে উত্তীর্ণ হইল। দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়া ভাবিল, একটা বাধা উত্তীর্ণ হইয়াছি, আর একটা বাকি—পুরপ্রাকার। ইহা পার হইলেই মুক্তি।

অদূরে একটি লতা-মণ্ডপের অন্তরাল হইতে দুইটি তীক্ষ্ণ চক্ষু যে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা সে জানিতে পারিল না।

চন্দ্রের মুখে আবার মেঘের আচ্ছাদন পড়িল। এই সুযোগে চিত্রক ত্বরিত পদে প্রাকারের দিকে চলিল। প্রাকারের ভিতর দিকে স্থানে স্থানে প্রাকারশীর্ষে উঠিবার সঙ্কীর্ণ সোপান আছে, তাহা সে সায়ংকালে লক্ষ্য করিয়াছিল।

প্রাকারশীর্ষে উঠিয়া চিত্রক বাহিরের দিকে উঁকি মারিল। প্রাকার বহির্ভূমি হইতে প্রায় পঞ্চদশ হস্ত উচ্চ; তাহার মসৃণ পাষাণ-গাত্র বাহিয়া নামিবার বা উঠিবার উপায় নাই। এক উপায়, বজ্রাঙ্গবলী পবনপুত্রকে স্মরণ করিয়া নিম্নে লাফাইয়া পড়া; কিন্তু তাহাতে যদি বা প্রাণ বাঁচে, হস্ত পদ রক্ষা পাইবে না; অস্থি ভাঙ্গিবে। তখন পলায়নের চেষ্টা হাস্যকর প্রহসনে পরিণত হইবে।

তবে এখন কী কর্তব্য? আবার চুপি চুপি গিয়া শয্যায় শুইয়া থাকা? না, আরও চেষ্টা করিতে হইবে। বাহির হইবার একমাত্র পথ তোরণ-দ্বার। তোরণ-দ্বারে প্রতীহার আছে —তাহার চোখে ধূলা দিয়া বাহির হওয়া কি অসম্ভব? কে বলিতে পারে, প্রতীহার হয়তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। —

চিত্রক প্রাকারের উপর দিয়া তোরণ-দ্বারের অভিমুখে চলিল। সাবধানে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল পশ্চাতে কেহ আসিতেছে। সে চকিতে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

তোরণ-স্তম্ভের কাছে পৌঁছিয়া চিত্রক সন্তর্পণে নিম্নে দৃষ্টি প্রেরণ করিল; দেখিল প্রতীহার দ্বারের লৌহ কবাটে পৃষ্ঠ রাখিয়া পদদ্বয় প্রসারণপূর্বক ভূমিতে বসিয়া আছে, তাহার চিবুক বক্ষের উপর নত হইয়া পড়িয়াছে, ভল্লটি জানুর উপর স্থাপিত। প্রতীহার যে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহাকে দেখিতে দেখিতে চিত্রকের নাসাপুট স্ফুরিত হইতে লাগিল, ললাটের টীকা ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। দেহের স্নায়ুপেশী কঠিন করিয়া সে ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর নিঃশব্দে কোষ হইতে তরবারি বাহির করিল। ইহাই এখন একমাত্র উপায়। তোরণ-দ্বারের গাত্রে যে ক্ষুদ্র কবাট আছে তাহা খুলিয়া সে বাহির হইবার চেষ্টা করিবে। প্রতীহারকে না জাগাইয়া যদি বাহির হইতে পারে ভাল, আর যদি প্রতীহার জাগিয়া ওঠে, তখন—

নিকটেই শীর্ণ সোপানশ্রেণী; চিত্রক নীচে নামিল। তোরণ-স্তম্ভের গা ঘেঁষিয়া অতি সতর্ক পদসঞ্চারে নিদ্রিত প্রতীহারের দিকে অগ্রসর হইল। এতক্ষণে সে প্রতীহারের মুখ দেখিতে পাইল; দেখিল গত রাত্রির সেই প্রতীহার।

ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া চিত্রক আর এক পদ অগ্রসর হইল। কিন্তু আর তাহাকে অগ্রসর হইতে হইল না। এই সময়ে পশ্চাতে একটা গভীর গর্জনধ্বনি হইল; সঙ্গে সঙ্গে ভল্লুকের মত একটা জীব তাহার স্কন্ধে লাফাইয়া পড়িয়া দুই বজ্রবাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

অতর্কিত আক্রমণে চিত্রক সম্মুখ দিকে পড়িয়া গেল। আক্রমকও সঙ্গে সঙ্গে পড়িল, কিন্তু তাহার বাহুবন্ধন শ্লথ হইল না। চিত্রকের শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। শত্রু পৃষ্ঠের উপর—চিত্রক তাহাকে দেখিতে পাইল না। অন্ধভাবে মাটিতে পড়িয়া সে অদৃশ্য আততায়ীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; তাহার মুষ্টি হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। দুই হাতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কিন্তু সে আততায়ীর নাগপাশ হইতে নিজ কণ্ঠ মুক্ত করিতে পারিল না।

এদিকে প্রতীহার আচম্বিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল সম্মুখে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। কিছু না বুঝিয়াই সে লাফাইয়া উঠিল এবং কটি হইতে একটা তূরী বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার দিতে লাগিল। তূর্যের তারধ্বনিতে চারিদিক সচকিত হইয়া উঠিল।

চিত্রকের অবস্থা ততক্ষণে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে; তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

কণ্ঠ মুক্ত করিবার চেষ্টা বৃথা। অন্ধভাবে চিত্রক মাটিতে হাত রাখিল ; তরবারিটা তাহার হাতে ঠেকিল। মোহগ্রস্তভাবে তরবারি মুষ্টিতে লইয়া চিত্রক কোনও ক্রমে জানুর উপর উঠিল, তারপর তরবারি পিছন দিকে ফিরাইল ; আততায়ী যেখানে তাহার পৃষ্ঠের উপর জড়াইয়া ধরিয়াছে সেইখানে তরবারির অগ্রভাগ রাখিয়া দুই হাতে আকর্ষণ করিল। তরবারি ধীরে ধীরে আততায়ীর পঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ আততায়ী তদবস্থ রহিল ; তারপর তাহার বাহুবন্ধন সহসা শিথিল হইল। সে চিত্রকের পৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ফুস্‌ফুস্ ভরিয়া শ্বাসগ্রহণপূর্বক চিত্রক টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে তূরীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন পুরবাসী ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং দণ্ডাদির দ্বারা চিত্রককে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল ; কিন্তু চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইলে তাহার মুখ দেখিয়া তাহারা নিরস্ত হইল।

তোরণ-প্রতীহার ভল্ল অগ্রবর্তী করিয়া কাছে আসিয়া মহা বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—'আরে এ কি! এ যে কাল রাত্রির চোর—না না—মগধের দূত মহাশয়! এত রাত্রে এখানে কি করিতেছেন ? ওটা কে ?'

চিত্রক ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল—'জানি না। আমাকে পিছন হইতে আচম্বিতে আক্রমণ করিয়াছিল—'

আততায়ীর অসিবিদ্ধ দেহটা অধোমুখ হইয়া পড়িয়া ছিল, একজন গিয়া তাহাকে উল্টাইয়া দিল। তখন চন্দ্রালোকে তাহার মুখ দেখিয়া সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল—গুহ।

গুহ মরিয়াছে ; তাহার দেহটা শিথিল জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

প্রতীহার বিস্ময়-সংহত কণ্ঠে বলিল—'কি আশ্চর্য—গুহ! গুহ আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিল! কিন্তু সে বড় নিরীহ—কখনও কাহাকেও আক্রমণ করে নাই। আজ সহসা আপনাকে আক্রমণ করিল কেন ?'

চিত্রক উত্তর দিল না, একদৃষ্টে গুহর মৃত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। গুহর মুখ শান্ত ; যেন দীর্ঘ জাগরণের পর সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এই মানুষটাই ক্ষণেক পূর্বে হিংস্র ঋক্ষের ন্যায় তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এই খর্ব ক্ষুদ্র দেহে এমন পাশবিক শক্তি ছিল তাহাও অনুমান করা যায় না।

প্রতীহার ওদিকে প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছে—'কিন্তু গুহ আপনার প্রতি এমন মারাত্মক আক্রমণ করিল কেন ? সে অবশ্য পাগল ছিল, কিন্তু কাহাকেও অকারণে আক্রমণ করা—'

চিত্রক বলিল—'অকারণ নয়। আমার প্রতি তাহার বিদ্বেষের কারণ বুঝিয়াছি। পৃথার মুক্তি। গুহ ভাবিয়াছিল, আমিই তাহার গুপ্তধন চুরি করিয়াছি।'

গুহর পাশে নতজানু হইয়া চিত্রক ধীরে ধীরে তাহার পঞ্জর হইতে তরবারি বাহির করিয়া লইল। মৃত্যুর পরপারে গুহ আবার তাহার লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছে কিনা কে জানে!

নবম পরিচ্ছেদ
তিলক বর্মা

পরদিন প্রাতঃকালে সচিব চতুর ভট্ট রাজভবনে চিত্রকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। স্বস্তিবাচন করিয়া বলিলেন—'কাল রাত্রে আপনি পুরভূমিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আপনার দেখিতেছি মন্দ দশা চলিয়াছে, পদে পদে বিপন্ন হইতেছেন। গভীর

রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় বাহির হওয়া নিরাপদ নয়, রাজপুরীর মধ্যেও বিপদ ঘটিতে পারে।'

কঞ্চুকী উপস্থিত ছিল ; সে বলিল—'সেই কথাই তো আমিও বলিতেছি। কিন্তু দূত-প্রবরের বয়স অল্প, মন চঞ্চল—' বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

চতুর ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাত্রে কি নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল ?' প্রশ্নের অন্তর্নিহিত প্রকৃত প্রশ্নটি চিত্রক বুঝিতে পারিল ; সচিব জানিতে চান কি জন্য রাত্রির মধ্যযামে সে একাকী বাহিরে গিয়াছিল। এই প্রশ্নের জন্য চিত্রক প্রস্তুত ছিল, সে মনে মনে একটি কাহিনী রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তাহাই সচিবকে শুনাইল।

—গভীর রাত্রে চিত্রকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ঘুম ভাঙ্গিয়া সে দেখে একটা লোক বাতায়ন পথে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন চিত্রক তরবারি লইয়া দূরভীষ্ট ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হয়। চোর তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া পলায়ন করে ; চিত্রকও বাতায়ন উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। কিছুদূর পশ্চাদ্ধাবন করিবার পর সে আর চোরকে দেখিতে পায় না। তখন ইতস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে তোরণ সন্নিকটে উপস্থিত হইলে গুহ তাহাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে—ইত্যাদি।

কাহিনী অবিশ্বাস্য নয়। চতুর ভট্ট মন দিয়া শুনিলেন ; মনে মনে ভাবিলেন, ইহা যদি মিথ্যা গল্প হয় তবে দূত মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তি আছে বটে। মুখে বলিলেন—'যা হোক, আপনি যে উন্মাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন ইহাই ভাগ্য। আপনি মগধের মহামান্য দূত ; আপনার কোনও অনিষ্ট হইলে আমাদের সান্ত্বনা থাকিত না।' কঞ্চুকীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'লক্ষ্মণ, দিবারাত্র দূত মহাশয়ের রক্ষার ব্যবস্থা কর। তিনি এখন কিছুদিন রাজ-অতিথিরূপে থাকিবেন ; তাঁহার অনিষ্ট হইলে দায়িত্ব তোমার, স্মরণ রাখিও।'

চিত্রক উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—'কিন্তু আমি শীঘ্রই চলিয়া যাইতে চাই। আতিথ্য রক্ষা তো হইয়াছে, এবার আমাকে বিদায় দিন।'

সচিব দৃঢ়ভাবে বলিলেন—'এত শীঘ্র যাওয়া অসম্ভব। চষ্টন দুর্গে মহারাজের নিকট মগধের লিপি প্রেরিত হইয়াছে, মহারাজ সম্ভবত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়া আপনি চলিয়া যাইতে পারেন না।'—গাত্রোত্থান করিয়া চতুর ভট্ট নরম সুরে বলিলেন—'আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন ? রাজকার্য একদিনে হয় না। কিছুদিন বিশ্রাম করুন, আরাম উপভোগ করুন ; তারপর বিটঙ্ক রাজ্যের দূত যখন পত্রের উত্তর লইয়া পাটলিপুত্রে যাইবে তখন আপনিও তার সঙ্গে ফিরিতে পারিবেন। সকল দিক দিয়া সুবিধা হইবে।'

সচিব প্রস্থান করিলেন। চিত্রক হতাশা-পূর্ণ হৃদয়ে বসিয়া রহিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবলই শশিশেখরের সগুম্ফ মুখ ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

দিনটা প্রায় নিষ্ক্রিয়ভাবেই কাটিল। কঞ্চুকী লক্ষ্মণ যদি বা এ পর্যন্ত চিত্রককে কদাচিৎ চক্ষের অন্তরাল করিতেছিল, এখন একেবারে জলৌকার ন্যায় তাহার অঙ্গে জুড়িয়া গেল ; স্নানে আহারে নিদ্রায় পলকের তরে তাহার সঙ্গ ছাড়িল না।

অপরাহ্ণের দিকে উভয়ে অক্ষক্রীড়ায় কাল হরণ করিতেছিল। বিনা পণের খেলা, তাই চিত্রকের বিশেষ মন লাগিতেছিল না ; এমন সময় অবরোধ হইতে রাজকুমারীর স্বকীয়া এক দাসী আসিল। দাসী কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইতেই কঞ্চুকী ঈষৎ বিস্ময়ে বলিল—'বিপাশা, তুমি এখানে কি চাও ?'

বিপাশা বলিল—'আর্য, দেবদুহিতার আদেশে আসিয়াছি।'

কঞ্চুকী ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'দেবদুহিতার কী আদেশ ?'

বিপাশা বলিল—'দেবদুহিতা উশীর-গৃহে অবস্থান করিতেছেন, সঙ্গে সখী সুগোপা আছেন।

দেবদুহিতা ইচ্ছা করিয়াছেন মগধের দূত মহোদয়ের সহিত কিছু বাক্যালাপ করিবেন। অনুমতি হইলে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারি।'

কঞ্চুকী বিপদে পড়িল। কোনও রাজদূতের সহিত অবরোধের মধ্যে সাক্ষাৎ করা রাজকন্যার পক্ষে শোভন নয়, নিয়মানুগও নয়। কিন্তু রাজকুমারী একে স্ত্রীজাতি, তায় হূণকন্যা ; অবরোধের শাসন তিনি কোনও কালেই মানেন না। উপরন্তু, গণ্ডের উপর পিণ্ড, ঐ সুগোপা সখীটা আছে। সুগোপাকে কঞ্চুকী স্নেহের চক্ষে দেখে না। সুগোপার সহিত মিশিয়াই রাজকন্যার মর্যাদাজ্ঞান শিথিল হইয়াছে। কিন্তু উপায় কি ? এদিকে অবরোধের শালীনতা রক্ষা করিতে হইবে ; নহিলে কঞ্চুকীর কর্তব্যে ত্রুটি হয়। আবার দূত প্রবরকেও একাকী ছাড়িয়া দেওয়া যায় না—

লক্ষ্মণ কঞ্চুকী চট্ করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল ; বিপাশাকে বলিল—'তুমি অগ্রবর্তিনী হও, আমি দূত মহাশয়কে লইয়া স্বয়ং যাইতেছি।'

কঞ্চুকী সঙ্গে থাকিলে অবরোধে পুরুষ প্রবেশের দোষ অনেকটা ক্ষালন হইবে, অধিকন্তু দূত মহাশয়ও চোখে চোখে থাকিবেন।

অবরোধের পশ্চিম প্রান্তে উশীর-গৃহ। সারি সারি কয়েকটি কক্ষ ; দ্বারে গবাক্ষে সিক্ত উশীরের জাল। গ্রীষ্মের তাপ বর্ধিত হইলে পুরস্ত্রীরা এই সকল শীতল কক্ষে আশ্রয় লইয়া থাকেন।

একটি কক্ষে শুভ্র মর্মর পট্টের উপর কুমারী রট্টা উপবিষ্টা ছিলেন ; সুগোপা তাঁহার কাছে কুট্টিমের উপর তালবৃন্ত হাতে লইয়া বসিয়া ছিল। কঞ্চুকী ও চিত্রক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে সুগোপা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটি গৌড়দেশীয় মসৃণ পট্টিকা পাতিয়া দিল।

উভয়ে উপবিষ্ট হইলে রট্টা মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। কঞ্চুকীকে চিত্রকের সঙ্গে দেখিয়া তিনি ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন, কৌতুক-তরল কণ্ঠে বলিলেন—'এই অবরোধের প্রতি আর্য লক্ষ্মণের যেমন সতর্ক স্নেহ-মমতা, শিশু সন্তানের প্রতি মাতারও এমন দেখা যায় না।'

লক্ষ্মণ অতিশয় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। চিত্রক রাজকুমারীর বাক্যে ফোটন দিয়া বলিল —'কঞ্চুকী মহাশয় আমার প্রতিও বড় স্নেহশীল, তিলার্ধের জন্যও চোখের আড়াল করেন না।'

বিড়ম্বিত কঞ্চুকী নতমুখে হেঁ হেঁ করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার উভয় সঙ্কট ; কর্তব্য করিলে বাক্য যন্ত্রণা, না করিলে মুণ্ড লইয়া টানাটানি।

যা হোক, অতঃপর কুমারী রট্টা চিত্রককে বলিলেন—'দূত মহাশয়, আমার সখী আপনাকে কিছু কথা বলিতে চায়, তাই আপনাকে কষ্ট দিয়াছি। সুগোপা, এবার তোর কথা তুই বল্।'

সুগোপা কোলের উপর দুই যুক্ত হস্ত রাখিয়া নতচক্ষে বসিয়া ছিল, এখন ধীরে ধীরে বলিল—'আর্য, আমি আপনার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, প্রতিদানে আপনি আমার ইষ্ট করিয়াছেন। আপনার প্রসাদে আমার মাতাকে ফিরিয়া পাইয়াছি।'

চিত্রক অবহেলাভরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া এমন ভাব প্রকাশ করিল যে মনে হয় এই সব ইষ্টানিষ্ট চেষ্টা তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর। সুগোপা তখন বলিল—'আপনি উদার চরিত্র। তাই সাহস করিয়া আপনার নিকট একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছি। আমার অভাগিনী জননী—' সুগোপার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল—'উদ্ধার পাইবার পর শয্যা লইয়াছেন। তাঁহার শরীর অতি দুর্বল, যে-কোনও মুহূর্তে প্রাণবায়ু বাহির হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। তাঁহার বড় সাধ আপনাকে একবার দেখিবেন, নিজমুখে কৃতজ্ঞতা জানাইবেন—'

চিত্রক বলিল—'কৃতজ্ঞতা জানাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি যদি আমাকে দেখিলে সুখী হন আমি নিশ্চয় দেখা করিব। কোথায় আছেন তিনি ?'

সুগোপা বলিল—'আমার গৃহে। আমার কুটির রাজপুরীর বাহিরে কিছু দূরে। যদি অনুগ্রহ

করেন, এখনি লইয়া যাইতে পারি।'

চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইল—'চলুন। আমি প্রস্তুত।'

কঞ্চুকী ত্রস্তভাবে লাফাইয়া উঠিল—'অ্যাঁ—রাজপুরীর বাহিরে! তা—তা—আমি সঙ্গে দুইজন রক্ষী দিতেছি—'

চিত্রক বলিল—'নিষ্প্রয়োজন। আমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ।'

বিব্রত কঞ্চুকী বলিল—'কিন্তু তাহা কি করিয়া হইতে পারে! আর্য চতুর ভট্ট—অর্থাৎ—আপনার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর—'

চিত্রক রট্টার দিকে চাহিয়া করুণ হাসিল—'আমার উপর কঞ্চুকী মহাশয়ের বিশ্বাস নাই। তিনি বোধহয় এখনও আমাকে চোর বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার সন্দেহ, ছাড়া পাইলেই আমি আবার ঘোড়া চুরি করিব।'

রট্টা ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন করিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ, রক্ষীর প্রয়োজন নাই। সুগোপা দূত মহাশয়কে লইয়া যাইবে, আবার পৌঁছাইয়া দিবে।'

পিণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া কঞ্চুকী বলিল—'তা—তা—দেবদুহিতার যদি তাহাই অভিরুচি—'

চিত্রক মনে মনে ভাবিল—এই সুযোগ! সে আর রাজকুমারীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিল না; রট্টার চোখে কি জানি কী সম্মোহন আছে, চোখাচোখি হইলে আবার হয়তো তাহার মনের গতি পরিবর্তিত হইবে। সে সুগোপার অনুসরণ করিয়া উশীর-গৃহ হইতে বাহির হইল।

রাজপুরীর তোরণ-দ্বারের সম্মুখ দিয়া যে পথ গিয়াছে তাহা দক্ষিণ দিকে কিছুদূর গিয়া নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিয়াছে, তারপর আরও খানিকদূর গিয়া একটি বাঁকের মুখে আসিয়া আবার নীচে নামিয়াছে। এই বাঁকের উপর সুগোপার কুটির; ইহার পর হইতে রাজপুরুষ ও নাগরিক সাধারণের গৃহাদি আরম্ভ হইয়াছে।

সুগোপার কুটির ক্ষুদ্র হইলেও সুদৃশ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন: চারিদিকে ফুলের বাগান। সুগোপার মালাকর স্বামী গৃহেই ছিল; সুগোপাকে আসিতে দেখিয়া সে ফুল-মাল্যাদি লইয়া বাহির হইল। বাজারে ফুল-মাল্য বিক্রয় করিয়া যাহা পাইবে তাহা লইয়া সে মদিরালয়ে প্রবেশ করিবে। লোকটি অতিশয় নীরব প্রকৃতির; আপন মনে উদ্যানের পরিচর্যা করে, মালা গাঁথে, বিক্রয় করে, আর মদিরা সেবা করে। কাহারও সাতে পাঁচে নাই।

সুগোপা চিত্রককে মাতার নিকট লইয়া গেল। একটি ঈষদন্ধকার কক্ষে খট্টার উপর সযত্নবিন্যস্ত শয্যায় পৃথা শুইয়া আছে। তাহার দেহ যথাসম্ভব পরিষ্কৃত হইয়াছে; নখ কাটিয়া মাথায় তৈল সেক করা হইয়াছে। কিন্তু কেশের গ্রন্থিযুক্ত তাম্রাভ বর্ণ দূর হয় নাই। মুখের ও দেহের ত্বক দীর্ঘকাল আলোকের স্পর্শাভাবে হরিদ্রাভ বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

পৃথা শয্যার সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছিল; কোটরগত চক্ষু ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ ছিল; চিত্রক নিঃশব্দে তাহার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলে সে ধীরে ধীরে চক্ষু নামাইল। অনেকক্ষণ চিত্রকের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—'তুমিই সেই?'

সুগোপা শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া মাতার কপালে হস্ত রাখিল, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল—'হাঁ মা, ইনিই সেই।'

আরও কিছুক্ষণ চিত্রককে দেখিয়া পৃথা বলিল—'তুমি হূণ নও—আর্য।'

চিত্রক হাসিয়া বলিল—'হাঁ আমি আর্য। যে হূণ তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল সে মরিয়াছে।' বলিয়া সংক্ষেপে গুহের মৃত্যু বিবরণ বলিল।

শুনিয়া পৃথা বলিল—'এখন আর কী আসে যায়—আমার জীবন শেষ হইয়াছে।'

চিত্রক শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সান্ত্বনার কণ্ঠে বলিল—'এরূপ কেন মনে করিতেছ? তোমার শরীর

আবার সুস্থ হইবে। তোমার কন্যা আছে ; তাহাকে লইয়া আবার তুমি সুখী হইবে। যাহা অতীত তাহা ভুলিয়া যাও।'

পৃথার মুখে আশা বা আনন্দের রেখাপাত হইল না। সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'আমার কথা থাক। তোমার কথা বল। তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ, তোমার কথা শুনিতে চাই।—তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে তুমি অপরিচিত নও—পূর্বে যেন দেখিয়াছি।'

চিত্রক লঘু হাস্যে বলিল— 'তুমি তো অন্ধকারে দেখিতে পাও। সে-রাত্রে কূটকক্ষে দেখিয়াছিলে— হয়তো সেই স্মৃতি মনে জাগিতেছে।'

'তাহাই হইবে। তোমার নাম কি ?'

'চিত্রক বর্মা।'

পৃথা নীরবে তাহার ক্ষতরেখাচিহ্নিত অঙ্গে চক্ষু বুলাইল।

'মাতা পিতা জীবিত আছেন ?'

মাতা পিতা! চিত্রক মনে মনে হাসিল ; তাহার মাতা পিতা থাকিতে পারে ইহাই যেন অসম্ভব মনে হয়। বলিল—'না, জীবিত নাই।'

'তোমার বয়স অল্প মনে হয়—'

'নিতান্ত অল্প নয়, পঁচিশ ছাব্বিশ বছর।'

পৃথা কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল ; শেষে ধীরে ধীরে বলিল—'আমার তিলক বাঁচিয়া থাকিলে তোমার সমবয়স্ক হইত।'

'তিলক কে ?'

'কুমার তিলক বর্মা। আমি তাহার ধাত্রী ছিলাম। সে আর সুগোপা এক দিনে জন্মিয়াছিল ; আমার দুগ্ধ দু'জনকে ভাগ করিয়া দিতাম।'

সুগোপা নিম্নস্বরে বলিল—'মা, ও কথা আর মনে আনিও না।'

পৃথা চক্ষু নিমীলিত করিয়া বলিল—'তাহার কথা ভুলিতে পারি না। নবনীতের ন্যায় সুকুমার শিশু—সেই শিশুকে হূণেরা আমার বুক হইতে ছিঁড়িয়া লইল—তারপর—তারপর—'

অকালবৃদ্ধা পৃথার পাণ্ডুর গণ্ড বহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ক্ষরিত হইতে লাগিল। সুগোপা চিত্রকের সহিত বিষণ্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিল।

চিত্রক বলিল—'ক্ষত্রিয় শিশু যদি তরবারির আঘাতে মরিয়া থাকে তাহাতে আক্ষেপ করিবার কী আছে ? ক্রীতদাস হইয়া বাঁচিয়া থাকার অপেক্ষা সে ভাল।'

পৃথা নিস্তেজ স্বরে বলিল—'রাজার ছেলে ক্রীতদাস হয় নাই সে ভাল। কিন্তু রাজজ্যোতিষী বলিয়াছিলেন, এ শিশু রাজটীকা লইয়া জন্মিয়াছে, রাজচক্রবর্তী হইবে। কই, তাহা তো হইল না! রাজজ্যোতিষীর কথা মিথ্যা হইল—'

চিত্রক মৃদুহাস্যে বলিল—'রাজজ্যোতিষীর কথা অমন মিথ্যা হয়। কিন্তু রাজটীকা লইয়া জন্মিয়াছে ইহার অর্থ কি ?'

পৃথা ধীরে ধীরে বলিল—'আমি যেন চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি। তাহার ভ্রূর মধ্যস্থলে জটুল ছিল ; অন্য সময় দেখা যাইত না, কিন্তু সে কাঁদিলে বা ক্রুদ্ধ হইলে ঐ জটুল রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়া' উঠিত। মনে হইত যেন রক্ত-চন্দনের তিলক। তাই তাহার নামকরণ হইয়াছিল—তিলক বর্মা।'

বাতাসের ফুৎকারে ভস্মাবৃত অঙ্গার যেমন স্ফুরিত হইয়া উঠে, চিত্রকের ভ্রূমধ্যে তেমনি রক্তটীকা জ্বলিয়া উঠিল। সে ব্যায়ত চক্ষে চাহিয়া অর্ধনিরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—'কী বলিলে ?'

পৃথা চক্ষু মেলিল। সম্মুখেই চিত্রকের মুখ তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া আছে ; সেই মুখে

ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রবালের ন্যায় তিলক জ্বলিতেছে। পৃথার চক্ষু ক্রমে বিস্ফারিত হইতে লাগিল ; তারপর সে চিৎকার করিয়া উঠিল—'তিলক ! আমার তিলক বর্মা ! পুত্র ! পুত্র !'

পৃথা দুই কঙ্কালসার হস্তে চিত্রককে টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিতে চাহিল ; কিন্তু এই প্রবল উত্তেজনায় তাহার দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল ; সহসা তাহার হস্ত শিথিল হইয়া চিত্রকের স্কন্ধ হইতে খসিয়া পড়িল। সে চক্ষু মুদিত করিয়া মৃতবৎ স্থির হইয়া রহিল।

সুগোপা কাঁদিয়া উঠিল। চিত্রক পৃথার বক্ষের উপর করতল রাখিয়া দেখিল অতি ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে। সে সুগোপাকে বলিল—'এখনও বাঁচিয়া আছেন। যদি সম্ভব হয় শীঘ্র চিকিৎসক ডাকো।'

সুগোপা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। রাজবৈদ্য রট্টার আদেশে পৃথার চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন। রাজবৈদ্যের বাসভবন নিকটেই ; অল্পক্ষণের মধ্যে সুগোপা বৈদ্যকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

নাড়ি পরীক্ষা করিয়া বৈদ্যরাজ ঈষৎ মুখ বিকৃত করিলেন, তারপর সূচিকাভরণ প্রয়োগ করিলেন।

সে-রাত্রে চিত্রক রাজপুরীতে ফিরিয়া গেল না।

সন্দিগ্ধ কঞ্চুকী অলক্ষিতে দুইটি গুপ্ত-রক্ষী পাঠাইয়াছিল, তাহারা সারা রাত্রি সুগোপার কুটিরের বাহিরে পাহারা দিল।

গভীর রাত্রে পৃথা মোহাচ্ছন্নভাবে পড়িয়া ছিল। চিত্রক তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুগোপার স্কন্ধের উপর হাত রাখিল—'সুগোপা, তুমি আমার ভগিনী ; আমরা একই স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছি।'

সুগোপা শুধু সজল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

চিত্রক বলিল—'যে কথা আজ শুনিয়াছ তাহা কাহাকেও বলিও না। বলিলে আমার জীবন সংশয় হইতে পারে।'

সুগোপা ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'এখন তুমি কী করিবে ?'

চিত্রকের অধরে ম্রিয়মাণ হাসি দেখা দিল—'ভাবিয়াছিলাম পলায়ন করিব। কিন্তু এখন —কি করিব জানি না। তুমি একথা কাহাকেও বলিও না। হয়তো তোমার মাতা ভুল করিয়াছেন ; রুগ্‌ণ দেহে এরূপ ভ্রান্তি অসম্ভব নয়—'

সুগোপা বলিল—'ভ্রান্তি নয়। আমার অন্তর্যামী বলিতেছেন, তুমি তিলক বর্মা।'

'তিলক বর্মা। শুনিতে বড় অদ্ভুত লাগে। কিন্তু সত্য হোক মিথ্যা হোক, তুমি শপথ কর একথা গোপন রাখিবে।'

'ভাল, গোপন রাখিব।'

'কাহাকেও বলিবে না ?'

'না।'

পৃথার আর জ্ঞান হইল না। রাত্রি শেষে তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ
নূতন পথে

সত্য যখন অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হয়, তখন তাহার রূপ যতই অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় হোক, তাহাকে সত্য বলিয়া চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে নিজেকে সহজে স্বাভাবিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার এমন একটি অসন্দিগ্ধ ভঙ্গি সত্যের আছে যে তাহাকে অস্বীকার করা একেবারেই অসম্ভব।

পৃথার মুখে চিত্রক যখন নিজের পরিচয় শুনিল তখন ক্ষণেকের তরেও তাহার মনে সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মিল না। বরং তাহার অতীত জীবনের সমস্ত পূর্বসংযোগ, তাহার সর্বাঙ্গে অসি-রেখাঙ্ক, সমস্তই যেন এই নূতন পরিচয়ের সমর্থন করিল। কিন্তু তথাপি, চিরাভ্যস্ত দর্পণে নিজের মুখ দেখিতে গিয়া কেহ যদি একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ দেখিতে পায় তাহা হইলে সে যেমন চমকিয়া উঠে, চিত্রকও আদৌ নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা ক্ষণেকের জন্য ; পরক্ষণেই সে দৃঢ়বলে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার মস্তিষ্ক রন্ধ্রে অযুত উন্মত্ত চিন্তা ঝাঁক বাঁধিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি যোদ্ধার সবল সতর্কতার দ্বারা সে তাহার প্রতিরোধ করিয়াছিল। সঙ্কটকালে বুদ্ধিভ্রংশ হইলে সর্বনাশ।

উপরন্তু এই বাহ্য সংযমের তলে তলে তাহার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শৈশব হইতে যে বিচিত্র বাতাবরণের মধ্যে সে বর্ধিত হইয়াছে, বাঁচিয়া থাকার জৈব চেষ্টায় যে নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা তাহাকে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র দান করিয়াছিল ; এই চরিত্র কঠিন, স্বার্থপরায়ণ, নীতি-বিমুখ ও সুযোগসন্ধী—ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এখন নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিবার পর তাহার নিগূঢ় অন্তর্লোকে ধীরে ধীরে একটি পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল ; সে নিজেও জানিল না যে তাহার রক্তের প্রভাব—যাহা এতদিন আত্মপরিচয়ের অভাবে সুপ্ত ছিল—তাহা তাহার অর্জিত চরিত্রকে অলক্ষিতে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পৃথার মৃত্যুর পরদিন প্রাতঃকালে চিত্রক যখন রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার মুখের ভাব ক্লান্ত, ঈষৎ গম্ভীর : তাহার অন্তরে যে শীততন্দ্রাচ্ছন্ন বুভুক্ষু নাগ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা কেহ জানিতে পারিল না। চারিদিকে সূর্যকরোজ্জ্বল পুরভূমি, চূর্ণবিলেপিত ভবনগুলি ইতস্তত শুভ্র বুদ্বুদ-বিম্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্রক ভাবিতে লাগিল—আমার ! আমার ! এ সকলই আমার !

কিন্তু—একথা কাহাকেও বলিবার নয়। বলিলে লোকে হাসিবে, উন্মাদ বলিয়া ব্যঙ্গ করিবে। একজন সাক্ষী ছিল, সে মরিয়া গিয়াছে। সে যদি বাঁচিয়া থাকিত তাহাতেই বা কি হইত ? তাহার কথাও কেহ বিশ্বাস করিত না, অসম্ভব প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কিম্বা যদি বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে পরিস্থিতি আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত : চিত্রককে বেশি দিন বাঁচিয়া থাকিতে হইত না। বরং এই ভাল। শুধু সুগোপা জানিল, তাহাতে ক্ষতি নাই ; সুগোপা-ভগিনী শপথ করিয়াছে কাহাকেও বলিবে না। কিছুদিন নিভৃতে চিন্তা করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। তারপর—

এদিকে লক্ষ্মণ কঞ্চুকী গত রাত্রে দুশ্চিন্তায় নিদ্রা যায় নাই। কিন্তু আজ প্রভাতে চিত্রক যখন পলায়নের কোনও চেষ্টা না করিয়া স্বেচ্ছায় রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল ; তাহার মনে হইল চতুর ভট্ট বৃথাই চিত্রককে সন্দেহ করিয়াছিলেন। সে

দ্বিগুণ সমাদরের সহিত চিত্রকের সেবা করিতে লাগিল।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর চিত্রক বিশ্রামের জন্য শয্যাশ্রয় করিলে কঞ্চুকী লক্ষ্মণ বলিল—'আজ আপনাকে কিছু অধিক বিমনা দেখিতেছি। চিন্তার কোনও কারণ ঘটিয়াছে কি ?'

চিত্রক বলিল—'জীবন-মৃত্যুর অচিন্তনীয় সম্ভাব্যতার কথা ভাবিতেছি। পৃথা পঁচিশ বৎসর অন্ধকূপে বন্দিনী থাকিয়াও মরিল না ; যেমনি মুক্তি পাইল, সেবা-যত্ন পাইল, অমনি মরিয়া গেল। বিচিত্র নয় ?'

লক্ষ্মণ বলিল—'সত্যই বিচিত্র। মানুষের ভাগ্যে কখন কী আছে কেহই বলিতে পারে না ; আজ যে রাজা, কাল সে ভিক্ষুক। এই পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে কতই যে দেখিলাম !' বলিয়া সে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

চিত্রক কঞ্চুকীকে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'কঞ্চুকী মহাশয়, আপনি কতকাল এই কার্য করিতেছেন ?'

'কঞ্চুকীর কার্য ? তা প্রায় বিশ বছর হইল। আমার পিতা আমার পূর্বে কঞ্চুকী ছিলেন—' লক্ষ্মণের স্বর নিম্ন হইল—'রাষ্ট্রবিপ্লবে তিনি হত হন। তারপর নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে কয়েক বছর গেল ; ক্রমে বর্তমান মহারাজ আর্যভাবাপন্ন হইলেন। তদবধি আমি আছি।'

'পূর্বতন রাজার কি হইল ?'

'শুনিয়াছি বর্তমান মহারাজ তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন।'

'আর রানী ?'

'রানী বিষ ভক্ষণে দেহত্যাগ করেন। তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই।'

উদ্‌গত নিশ্বাস চাপিয়া চিত্রক অবহেলাভরে প্রশ্ন করিল—'রাজপুত্রটাও নিশ্চয় মরিয়াছিল ?'

'সম্ভবত মরিয়াছিল। কিন্তু তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই।'

চিত্রক আর অধিক প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না, তন্দ্রার ছলে জৃম্ভণ ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

দিনটা বিরস শূন্যতার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চিত্রক উত্তরীয় স্কন্ধে ফেলিয়া ভবন হইতে বাহির হইল। কঞ্চুকী আজ আর তাহার সঙ্গ লইবার চেষ্টা করিল না, শুধু জিজ্ঞাসা করিল—'পুরীর বাহিরে যাইবেন নাকি ?'

চিত্রক বলিল—'না, ভিতরেই একটু ঘুরিয়া বেড়াইব।'

সূর্য অস্ত গিয়াছে। প্রাসাদের বলভিতে কপোতগণ কলহ-কূজন করিয়া রাত্রির জন্য নিজ নিজ বিশ্রামস্থল সংগ্রহ করিতেছে। ক্রমে পূর্বদিগন্ত জ্যোতির্মণ্ডিত করিয়া চন্দ্রোদয় হইল।

পুরভূমি প্রায় জনশূন্য, কদাচিৎ দুই একজন কিঙ্কর-কিঙ্করী এক ভবন হইতে অন্য ভবনে যাতায়াত করিতেছে। চিত্রক অনায়াস-পদে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে একটি শীর্ণ সোপান অতিবাহিত করিয়া প্রাকারে উঠিল।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রাকারচক্র রৌপ্যনির্মিত অংসুলির ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার উপর উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া চিত্রক সহসা থামিয়া গেল।

অদূরে প্রাকার কুড়োর উপর একটি নারী বসিয়া আছে। জ্যোৎস্নাকুহেলির মধ্যে শুভ্রবসনা রমণীকে তুষারীভূত জ্যোৎস্নার মতই দেখাইতেছে। চিত্রকের চিনিতে বিলম্ব হইল না—কুমারী রট্টা যশোধরা।

রট্টা অন্য মনে চন্দ্রের পানে চাহিয়া আছেন। কোন্ বহির্মুখী বৃত্তির আকর্ষণে তিনি আজ প্রাসাদ-শীর্ষের ছাদে না গিয়া একাকিনী এই প্রাকারে আসিয়া বসিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন,

কিম্বা হয়তো তিনিও জানেন না। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া তিনি কী ভাবিতেছেন তাহাও বোধকরি তাঁহার সচেতন মনের অগোচর।

নিশ্বাস রোধ করিয়া চিত্রক ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ললাটে ধীরে ধীরে তিলক ফুটিয়া উঠিল; তপ্ত সূচির ন্যায় জ্বালাময় অসূয়া হৃদয় বিদ্ধ করিল। ইনি রাজনন্দিনী রট্টা—এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বরী! আর আমি— ? এক ভাগ্যান্বেষী অসিজীবী সৈনিক—

অধর দংশন করিয়া চিত্রক নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে মৃদু কণ্ঠে আহ্বান আসিল—'আর্য চিত্রক বর্মা!'

চিত্রক ফিরিল। রাজকুমারীর কাছে গিয়া যুক্তকরে অভিবাদন করিল, গম্ভীর মুখে বলিল—'দেবদুহিতা এখানে আছেন আমি জানিতাম না। জানিলে আসিতাম না।'

রট্টা ঈষৎ হাসিলেন; বলিলেন—'কোনও হানি হয় নাই, বরং ভালই হইয়াছে। অবরোধে একাকিনী অতিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তাই এখানে আসিয়া বসিয়াছি। আপনিও বসুন।'

চিত্রক বসিল না; কুড্যে বসিলে রাজকন্যার সহিত সমান আসনে বসা হয়; ভূমিতে বসিলে অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করা হয়। সে কুড্যের উপর বাহু রাখিয়া দাঁড়াইল; বলিল —'আপনার সুগোপা সখী বোধ করি আজ আসিতে পারেন নাই।'

'সুগোপা আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না—প্রভাতে একবার মুহূর্তের জন্য আসিয়াছিল। আপনার কত কথা বলিল। সারারাত্রি জাগিয়া আপনি তাহাকে সাহায্য ও সাহচর্য দান করিয়াছিলেন। এমন কেহ করে না।'

'সুগোপা আর কিছু বলে নাই?'

রট্টা ঈষৎ বিস্ময়ে চক্ষু ফিরাইলেন—'আর কী বলিবে?'

'না, কিছু না—' প্রসঙ্গান্তর উত্থাপনের জন্য চিত্রক চন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিল—'আজ বোধহয় পৌর্ণমাসী।'

'হাঁ।' রট্টাও কিয়ৎকাল চাঁদের পানে চক্ষু তুলিয়া রহিলেন—'শুনিয়াছি আর্যাবর্তের অন্যত্র আজিকার দিনে উৎসব হয়—বসন্ত ঋতুর পূজা হয়। এখানে কিছু হয় না।'

'হয় না কেন?'

'ঠিক জানি না। পূর্বে বোধহয় হইত, এখন হূণ অধিকারের পর বন্ধ হইয়াছে। হূণদের মধ্যে বসন্ত উৎসবের প্রথা নাই। তবে বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন উৎসবের প্রথা মহারাজ পুনঃ-প্রবর্তিত করিয়াছেন।'

এই সকল অলস কথাবার্তার মধ্যে চিত্রক দেখিল, রট্টা প্রাকারের কুড্যের উপর এমনভাবে বসিয়া আছেন যে তাঁহাকে একটু ঠেলিয়া দিলে কিম্বা আপনা হইতে ভারকেন্দ্র বিচলিত হইলে তিনি প্রাকারের বাহিরে বিশ হাত নীচে পড়িবেন; মৃত্যু অনিবার্য। চিত্রকের বুকের ভিতর দুষ্ট বাষ্পের মত একটা অশান্ত উদ্বেগ পাক খাইতে লাগিল। তৃতীয় ব্যক্তি এখানে নাই; রট্টা যদি পড়িয়া যান কেহ কিছু সন্দেহ করিতে পারিবে না। যে বর্বর হূণ তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, যাহার হস্তে তাহার পিতা নৃশংসভাবে হত হইয়াছিলেন, এই যুবতী তাহারই কন্যা—

চিত্রকের চোখে জ্যোৎস্নার শুভ্রতা লোহিতাভ হইয়া উঠিল।

রট্টার কিন্তু নিজের সঙ্কটময় অবিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য নাই; তিনি স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে কুড্যের উপর বসিয়া আছেন। চিত্রক সহসা যেন নিজেকে ব্যঙ্গ করিয়াই হাসিয়া উঠিল। বলিল—'রাজকুমারি, আপনি কুড্য হইতে নামিয়া বসুন। ওখান হইতে নিম্নে পড়িলে প্রাণহানির সম্ভাবনা।'

রট্টা একবার অবহেলাভরে নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন—'ভয় নাই, আমি পড়িব না। কিন্তু আপনি হাসিতেছেন কেন?'

ক্ষোভে অধর দংশন করিয়া চিত্রক বলিল—'ক্ষমা করুন, আমি কৌতুকবশে হাসি নাই। আপনার নির্ভীক অপরিণামদর্শিতা—কিন্তু যাক। রাজনন্দিনি, যদি ধৃষ্টতা না হয়, একটি প্রশ্ন করিতে পারি ?'

'কি প্রশ্ন ?'

'আপনি হূণদুহিতা। আর্য জাতি অপেক্ষা হূণ জাতির প্রতি আপনার মনে নিশ্চয় পক্ষপাত আছে ?'

কিছুক্ষণ নীরবে মনন করিয়া রট্টা ধীরে ধীরে বলিলেন—'আর্য— ! হূণ— ! আমার মাতা আর্য ছিলেন, পিতা হূণ। আমি তবে কোন্ জাতি ? জানি না। সম্ভবত মনুষ্য জাতি।' রট্টা একটু হাসিলেন,—'আর পক্ষপাত ? দূত মহাশয়, এই আর্যভূমিতে যাহারা বাস করে তাহাদের সকলের প্রতি আমার পক্ষপাত আছে। কারণ তাহাদের ছাড়া অন্য মানুষ আমি দেখি নাই।'

'সকলকে আপনি সমান বিশ্বাস করিতে পারেন ?'

'পারি। যে বিশ্বাসের যোগ্য সে আর্যই হোক আর হূণই হোক, বিশ্বাস করিতে পারি।' রট্টা লঘুপদে কুড্য হইতে অবতরণ করিলেন—'এবার আমি অন্তঃপুরে ফিরিব ; নহিলে আর্য লক্ষ্মণ রুষ্ট হইবেন।'

চিত্রক বলিল—'চলুন, আমি আপনার রক্ষী হইয়া যাইতেছি।'

'আসুন—' বলিয়া রট্টা যেন কোন্ গোপন কৌতুকে সুন্দর মুখ উদ্ভাসিত করিয়া হাসিলেন ; চন্দ্রালোকে সেই হাসি তরঙ্গের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

চিত্রক ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে বলিল—'হাসিলেন কেন ?'

রট্টা এবার বঙ্কিম দৃষ্টিতে চটুলতা ভরিয়া তাহার পানে চাহিলেন ; মুখ টিপিয়া বলিলেন—'ও কিছু নয়। স্ত্রীলোকের হাসি-কান্নার কি কোনও অর্থ আছে ?—চলুন।'

গভীর রাত্রে রট্টা শয্যা হইতে উঠিলেন। তাঁহার শয্যার শিয়রে প্রাচীরগাত্রে একটি কুটঙ্গক ছিল, তন্মধ্যে একটি মণিময় ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি থাকিত। সিংহল দ্বীপে রচিত নীলকান্তমণির অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এই বুদ্ধমূর্তি মহারাজ রোট্ট ধর্মাদিত্য কন্যাকে উপহার দিয়াছিলেন।

শয্যা হইতে উঠিয়া রট্টা একটি দীপ জ্বালিলেন। ধ্যানাসীন বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে দীপ রাখিয়া তিনি যুক্তকরে তদ্গতচিত্তে দীর্ঘকাল ঐ দিব্যমূর্তির পানে চাহিয়া রহিলেন ; —বান্ধুলি পুষ্পতুল্য অধর অল্প অল্প নড়িতে লাগিল। তাঁহার কুমারী হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রার্থনা তথাগতের চরণে নিবেদিত হইল তাহা কেবল তথাগত জানিলেন।

তারপর দীপ নিভাইয়া রট্টা আবার শয়ন করিলেন।

পরদিন অপরাহ্ণে চষ্টন দুর্গ হইতে বার্তাবহ ফিরিয়া আসিল। মহারাজ রোট্ট ধর্মাদিত্য পত্র দিয়াছেন। পত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রী চতুরানন ভট্ট চিন্তিত মনে রট্টার কাছে গেলেন।

'মহারাজের শরীর ভাল নয়, তিনি আরও কিছুকাল চষ্টন দুর্গে থাকিবেন। কিন্তু কন্যাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন বড় উতলা হইয়াছে।'

রট্টা বলিলেন—'আমি পিতার কাছে যাইব।'

চতুরানন বলিলেন—'কিন্তু—যাওয়া উচিত কিনা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।'

'যাওয়া অনুচিত কেন ?'

ইতস্তত করিয়া চতুরানন বলিলেন—'কিরাত লোক ভাল নয়। সে চষ্টন দুর্গের সর্বময় কর্তা ; তাহার যদি কোনও কুবুদ্ধি থাকে—'

রট্টার মুখ রক্তবর্ণ হইল—'কিরূপ কুবুদ্ধি ? আপনি কি সন্দেহ করেন, কিরাত পিতাকে নিজের কবলে পাইয়া এখন ছলনা দ্বারা আমাকেও কবলে আনিতে চায় ?'

'কে বলিতে পারে ? সাবধানের মার নাই।'

রট্টা সদর্পে বলিলেন—'আমি বিশ্বাস করি না। মহারাজের সহিত এরূপ ধৃষ্টতা করিবে কিরাতের এত সাহস নাই। আপনি ব্যবস্থা করুন, কাল প্রাতেই আমি চষ্টন দুর্গে যাইব। পিতৃদেবকে দেখিবার জন্য আমারও মন অস্থির হইয়াছে।'

'উত্তম। —মহারাজ মগধের দূতকেও চষ্টন দুর্গে আহ্বান করিয়াছেন।'

রট্টার চোখের উপর অদৃশ্য আবরণ নামিয়া আসিল। তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'ভাল। তিনিও আমার সঙ্গে যাইবেন। তাঁহাকে সংবাদ দিন।'

চতুর ভট্ট বলিলেন—'সঙ্গে একদল শরীর-রক্ষীও থাকিবে। —ভাল কথা, চষ্টন দুর্গের পথ দীর্ঘ ও ক্লেশদায়ক ; পৌঁছিতে দুই দিন লাগিবে। মধ্যে এক রাত্রি পান্থশালায় কাটাইতে হইবে। দেবদুহিতার জন্য দোলার ব্যবস্থা করি ?'

'না, আমি অশ্বপৃষ্ঠে যাইব।'

'দাসী কিঙ্করী কেহ সঙ্গে যাইবে না ?'

'না।'

রট্টার নিকট হইতে চতুরানন চিত্রকের কাছে গেলেন। চিত্রক সমস্ত কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া রহিল। তাহার বক্ষে যে অদৃশ্য তুষানল জ্বলিতেছিল তাহা সহসা লেলিহ শিখায় আলোড়িত হইয়া উঠিল ; কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া উদাস নিস্পৃহ স্বরে বলিল—'আমি এখন আপনাদের অধীন ; যাহা বলিবেন তাহাই করিব।'

পর দিবস প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রট্টা এবং চিত্রক অশ্বারোহণে রাজপুরী হইতে বাহির হইলেন। এক সেনানী পাঁচজন সশস্ত্র আরোহী লইয়া সঙ্গে চলিল।

কপোতকূট নগর তখন জাগিয়া উঠিয়াছে। পথে পথে গৃহ ও বিপণির দ্বার খুলিয়াছে, নাগরিকগণ ইতস্তত যাতায়াত করিতেছে ; নাগরিকারা কলসী কক্ষে জল ভরিতে যাইতেছে ; কেহ বা পূজার অর্ঘ্য লইয়া দেবায়তন অভিমুখে চলিয়াছে। পথের উপর বালকবৃন্দ দল বাঁধিয়া ক্রীড়া করিতেছে। বৈদেহক স্কন্ধে পণ্য লইয়া হাঁকিতেছে—'অয়ে লাজা— !'

পুরুষবেশা রট্টা যখন অশ্বক্ষুরধ্বনিতে চারিদিক সচকিত করিয়া রক্ষীসহ রাজপথ দিয়া চলিলেন, তখন জনগণ সকলে পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সগর্বে উৎফুল্ল নেত্রে দেখিল।

পণ্য পাটকের ভিতর দিয়া যাইবার সময় রট্টা দেখিলেন, চতুষ্পথের উপর একটা কিম্ভূতকিমাকার মানুষকে ঘিরিয়া ভিড় জমিয়াছে। লোকটা রোমশ রুক্ষকেশ স্থূলকায় ; অঙ্গে বস্ত্রাদি আছে কিনা ভিড়ের মধ্যে বুঝা যায় না। সে উচ্চকণ্ঠে সকলকে কী একটা কথা বলিতেছে ; শুনিয়া সকলে হাসিতেছে ও রঙ্গ তামাসা করিতেছে।

রট্টা অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ও কে ? কী বলিতেছে ?'

পথচারী রাজকন্যার সম্বোধনে কৃতার্থ হইয়া হাস্যমুখে বলিল—'ও একটা গড্ডল্—বলিতেছে ও নাকি কোথাকার রাজদূত !'

চিত্রক একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই চিনিয়াছিল—শশিশেখর ! সে আর সেদিকে মুখ ফিরাইল না।

রট্টা আবার অশ্বচালনা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা নগরের উত্তর দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

এইখানে শশিশেখরের কথা শেষ করা যাক। সেইদিন সন্ধ্যাকালে নগরের কোট্টপাল মন্ত্রী

চতুর ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; বলিলেন—'একটা বিকৃতবুদ্ধি বিদেশী নগরে প্রবেশ করিয়াছে। সে বলে সে মগধের রাজদূত ; কোনও এক তস্কর নাকি তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া তাহাকে দিগম্বর করিয়া মৃগয়া-কাননে ছাড়িয়া দিয়াছিল।—লোকটা লতাপাতা দিয়া কোনও ক্রমে লজ্জা নিবারণ করিয়াছে।'

চতুরানন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শুনিলেন।

'তারপর ?'

'নগররক্ষীরা তাহাকে আমার কাছে ধরিয়া আনিয়াছিল। দেখিলাম, লোকটার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। কখনও এক কথা বলে, কখনও অন্য কথা বলে, কখনও বুদবুদাক্ষ হইয়া ক্রন্দন করে। তাহাকে লইয়া কি করিব বুঝিতে না পারিয়া কোৎঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি।'

চতুর ভট্ট বলিলেন—'বেশ করিয়াছ। গর্ভদাসটা একদিন আগে আসিতে পারিল না! এখন আর উপায় নাই। আপাতত কিছুদিন লপ্সিকা ভক্ষণ করুক, তারপর দেখা যাইবে।'

অতঃপর এ কাহিনীর সহিত শশিশেখরের আর কোনও সম্বন্ধ নাই। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই আখ্যায়িকা শেষ হইবার পূর্বেই সে মুক্তি পাইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে আর কখনও দেশ পর্যটনে বাহির হইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ
বন্ধনহীন গ্রন্থি

উত্তরাস্য নগরদ্বার অতিক্রম করিয়া রট্টা দলবলসহ বাহিরে আসিলেন। এখান হইতে রাজপথ মৃগয়া-কানন বেষ্টন করিয়া ভূজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে আঁকিয়া বাঁকিয়া, কখনও উচ্চে উঠিয়া কখনও নিম্নে নামিয়া যেন নিরুদ্দেশের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। প্রভাতের নবীন সূর্যালোকে এই দৃশ্য চিত্রাঙ্কিতবৎ মনোরম দেখাইতেছে।

এই নৈসর্গিক দৃশ্যের উপর ক্ষণেক দৃষ্টি বুলাইয়া রট্টা অশ্ব স্থগিত করিলেন ; সেনানীকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—'নকুল, তুমি রক্ষীদের লইয়া আগে যাও ; আমরা মন্থর গমনে তোমাদের পশ্চাতে যাইব।'

নকুল ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—'কিন্তু—' রট্টা বলিলেন—'সঙ্গে আর্য চিত্রক বর্মা থাকিবেন, আমার অন্য রক্ষীর প্রয়োজন নাই। তোমরা যাও, দ্রুত অশ্ব চালাইলে দ্বিপ্রহরের মধ্যে পান্থশালায় পৌঁছিতে পারিবে। সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়া চষ্টন দুর্গের পথে যাত্রা করিও।'

এখানে নকুল আবার বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রট্টা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়া চলিলেন—'রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে চষ্টন দুর্গে পৌঁছিবে। মহারাজকে বলিও আমি কাল আসিব। মহারাজ অসুস্থ, আমি আসিতেছি জানিলে সুখী হইবেন।'

ইহার পরও নকুল আপত্তি করিতে যাইতেছিল কিন্তু রট্টা তাহার মুখের পানে চাহিয়া এমন মধুর হাস্য করিলেন যে নকুলের জ্ঞান বুদ্ধি স্তম্ভিত হইল। সে সম্মোহিতের ন্যায় 'দেবদুহিতার যেরূপ আজ্ঞা' বলিয়া সঙ্গীদের লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া দিল। মন্ত্রী চতুর ভট্টের আদেশ যদি বা উপেক্ষা করা যায়, রাজনন্দিনীর সহাস্য নির্বন্ধের প্রতিবাদ অসম্ভব।

রক্ষীর দল ও তাহাদের অশ্বক্ষুরধ্বনি ক্রমশ দূর হইতে আরও দূরে মিলাইয়া গেল। রট্টাও আয়াসহীন মন্দগতিতে অশ্বচালনা করিলেন। চিত্রক তাঁহার পাশে রহিল।

রট্টার মুখ উৎফুল্ল, চক্ষু চঞ্চল। তিনি কখনও উজ্জ্বল নিষ্কলুষ আকাশের পানে চক্ষু উৎক্ষিপ্ত

করিতেছেন, কখনও মৃগয়া-কাননের অভ্যন্তরে কৌতূহলী দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন ; অশ্বের কণ্ঠ-কিঙ্কিণী পদক্ষেপের তালে তালে শিঞ্জনধ্বনি করিয়া তাহার কর্ণে অমৃত-বৃষ্টি করিতেছে।

চিত্রকের মুখ কিন্তু গম্ভীর, ভ্রূ কুঞ্চিত। সে তার অশ্বের নিভৃতোর্ধ্ব কর্ণের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে। ভাবিতেছে, নিয়তি বারবার তাহাকে প্রতিহিংসার সুযোগ দিতেছে। অদৃষ্টের এ কোন্ ইঙ্গিত ? প্রতিশোধের সুযোগ হাতে পাইয়া সে ছাড়িয়া দিবে ? হিংসার উত্তরে প্রতিহিংসা লওয়া ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। তবে কেন সে লইবে না ?

চারিদিক নির্জন ; কোথাও জনমানব নাই। কদাচিৎ দুই একটা শশক পথপার্শ্ব হইতে সন্তর্পণে উঠিয়া আসিতেছে, আবার অশ্বক্ষুরশব্দে ভীত হইয়া প্লুত গতিতে পলায়ন করিতেছে। পথের উপর দীর্ঘ প্রলম্বিত তরুচ্ছায়া ক্রমে হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে।

দুইটি অশ্ব পাশাপাশি চলিয়াছে। সুগোপার জলসত্র পিছনে পড়িয়া রহিল। সুগোপা আজ আসে নাই। প্রপা শূন্য।

রট্টা এতক্ষণ চিত্রকের পানে পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করেন নাই ; মনের মধ্যে ঈষৎ সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিলেন। আশা করিয়াছিলেন চিত্রক নিজেই বাক্যালাপ করিবে। কিন্তু চিত্রক যখন কথা কহিল না তখন তিনি মনকে সম্বৃত করিয়া চিত্রকের পানে স্মিতমুখ ফিরাইলেন। বলিলেন—'আর্য চিত্রক, আপনি নীরব কেন ? সুন্দরী প্রকৃতির এই নবীন শোভা কি আপনাকে আনন্দ দিতে পারিতেছে না ?'

চিত্রক রট্টার পানে চক্ষু ফিরাইল। ক্ষণেকের জন্য তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। কী অপূর্ব রূপবতী এই রাজকন্যা ! একটি দেহের মধ্যে কাঠিন্য ও কোমলতা, দৃঢ়তা ও সরসতার কি অপরূপ সমাবেশ ! চিত্রক পূর্বেও একবার রাজকন্যাকে পুরুষবেশে দেখিয়াছিল ; কিন্তু আজিকার পুরুষবেশ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেশভূষার পৌরুষ দেহের অনবদ্য নারীত্বকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, আবৃত করিতে পারে নাই। পুষ্পবৃন্তের ন্যায় কটিদেশ ঊর্ধ্বে ক্রমশ পরিসর হইয়া যেন কেশর কুসুমের শোভায় বিকশিত হইয়াছে ; আপীন বক্ষের উপর দৃঢ়পিনদ্ধ সুবর্ণ জালিক যৌবনের উন্মাদনাকে স্বর্ণ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সর্বোপরি তীক্ষ্ন-মধুর মুখখানি ! এ মুখ কেবল রক্ত মাংসের সমাবেশে সুন্দর নয়, শুধুই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু সমর্পণ নয় ; মনে হয় মুখের অন্তরালে মানুষটিও বড় সুন্দর, তাই তাহার সৌন্দর্যের নিরুদ্ধ ছটা মুখেও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

চিত্রকের অশান্ত মন কিন্তু শান্ত হইল না ; বরং আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কেন এই রাজকন্যা তাহার সহিত এত মিষ্ট এত সদয় ব্যবহার করিতেছে ? ইহা অপেক্ষা যদি নিজ পদগৌরবে গর্বিত হইয়া তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিত সেও ভাল হইত। রাজকন্যা তাহার সত্য পরিচয় জানে না বলিয়াই এমন স্নিগ্ধ ব্যবহার করিতেছে। যদি জানিত তাহা হইলে কী করিত ?

চিত্রক যখন কথা কহিল তখন তাহার কণ্ঠে এই প্রশ্নেরই প্রচ্ছন্ন প্রতিধ্বনি হইল ; সে রট্টার দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া ধাবমান অশ্বের নিষ্কম্প চামর শিখার উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল—'রক্ষীদের আগে যাইতে দিয়া আপনি ভাল করেন নাই।'

ভ্রূ বঙ্কিম করিয়া রট্টা বলিলেন—'তাহাতে কী দোষ হইয়াছে ?'

চিত্রক বলিয়া উঠিল—'আপনি আমার কতটুকু জানেন ? আমি যদি তস্কর দুর্বৃত্ত হই, আপনার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করি, কে আপনাকে রক্ষা করিবে ? জানি, দেবদুহিতা বীর্যবতী, আত্মরক্ষায় সমর্থা ; তবু তিনি নারী। অজ্ঞাতকুলশীলকে অধিক বিশ্বাস করিতে নাই।'

অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া রট্টা সম্মুখ দিকে চাহিলেন ; তাঁহার মুকুলিত মুখের হাসিটি ফুটি ফুটি করিয়া ফুটিল না। ক্ষণেক পরে চিত্রকের পানে দৃষ্টি না ফিরাইয়াই তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—'আপনি কি অজ্ঞাতকুলশীল ?'

চিত্রক চকিতে তাঁহার পানে চাহিল।

রট্টা বলিয়া চলিলেন—'আসমুদ্র আর্যভূমির একচ্ছত্র অধীশ্বর স্কন্দগুপ্তের দূতকে অজ্ঞাতকুলশীল বলিলে স্কন্দগুপ্তের অবমাননা করা হয় না ? কিন্তু এ সকল বৃথা তর্ক। আপনি যদি তস্কর দুর্বৃত্ত হইতেন তাহা হইলে এখনি যে কথা বলিলেন তাহা বলিতে পারিতেন কি ? তস্কর কি নিজের বিরুদ্ধে অন্যকে সাবধান করিয়া দেয় ?'

বলিয়া রট্টা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। চিত্রকের ইচ্ছা হইল, সে রট্টাকে নিজের পূর্ণ পরিচয় জানাইয়া দিয়া তাহার মুখভাব নিরীক্ষণ করে। ঐ হাসিটি তখন কি অগ্নিদগ্ধ ফুলের মতই শুকাইয়া যাইবে না ? অকুণ্ঠ বিশ্বাস-ভরা চোখে ত্রাস ফুটিয়া উঠিবে না ?

কিন্তু চিত্রকের মনের ইচ্ছা বাক্যে পরিণত হইল না। তৎপরিবর্তে অধরপ্রান্তে একটি ক্ষীণ নিপীড়িত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রট্টা বলিলেন—'ও কথা থাক।—আর্য চিত্রক, আপনি নিশ্চয় অনেক দেশ দেখিয়াছেন ? অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন ?'

চিত্রক সতর্কভাবে বলিল—'হাঁ। দূতীয়ালী আমার জীবনে এই প্রথম।'

রট্টা বলিলেন—'আপনি গল্প বলুন, আমার বড় শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে।'

'কী গল্প বলিব ?'

'আপনার যাহা ইচ্ছা। যুদ্ধের গল্প, দেশবিদেশের গল্প। পাটলিপুত্র কি খুব সুন্দর নগর ?'

'অতি সুন্দর নগর। এমন নগর আর্যাবর্তে নাই।'

'কপোতকূট অপেক্ষাও সুন্দর ?'

চিত্রক হাসিল ; রট্টার এই বালিকাসুলভ সরলতা তাহার বড় মিষ্ট লাগিল। সে একটু ঘুরাইয়া বলিল—'কপোতকূটও সুন্দর নগর। কিন্তু কপোতকূট আকারে ক্ষুদ্র, পাটলিপুত্র বৃহৎ ; ময়ূরের সঙ্গে কি পারাবতের তুলনা হয় ?'

'আর স্কন্দগুপ্ত ? তিনি কিরূপ মানুষ ?'

'আমি সামান্য দূত, স্কন্দগুপ্তের নিকটে কখনও যাই নাই। দূর হইতে দেখিয়াছি, অতি সুন্দর পুরুষ। আর শুনিয়াছি, তিনি ভাবুক—অদৃষ্টবাদী—'

রট্টা রমণীসুলভ প্রশ্ন করিলেন—'তাঁহার কয়টি মহিষী ?'

চিত্রক বলিল—'স্কন্দ কুমারব্রতধারী, বিবাহ করেন নাই।'

রট্টা বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন—'আশ্চর্য !'

চিত্রক নিজের কথা ভাবিতে ভাবিতে বলিল—'আশ্চর্য বটে ! কিন্তু এরূপ আশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটিয়া থাকে। আমার যোদ্ধৃজীবনে অনেক দেখিয়াছি।'

'তবে সেই সব কাহিনী বলুন। আমি শুনিব।'

রট্টার আগ্রহ দেখিয়া চিত্রক একটু হাসিল। অজানিতভাবে তাহার মনের তিক্ততা দূর হইতেছিল। মনের মধ্যে অনেক বিরুদ্ধ ভাবনা জমা হইলে মানুষ হৃদয়ভার লাঘব করিতে চাহে, আত্মকথা বলিবার সুযোগ পাইলে সুখী হয়। চিত্রক ধীরে ধীরে নিজ জীবনের অনেক কাহিনী বলিতে লাগিল। কেবল আত্ম-পরিচয়টি গোপন করিয়া আর সব সত্য কথা বলিল। যুদ্ধের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নানা দেশের নানা মানুষের অদ্ভুত আচার ব্যবহার, তাহাদের বেশবাস কথাবার্তা—

এদিকে ঘোড়া দুইটি চলিয়াছে ; পথেরও বিরাম নাই। উপত্যকায় ছায়াশীতল হইয়া, অধিত্যকায় রবিতপ্ত হইয়া, কদাচিৎ গিরি নির্ঝরিণীর জলে অঙ্গ ডুবাইয়া পথ চলিয়াছে। কিন্তু পথের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই ! রট্টা তন্ময় হইয়া গল্প শুনিতেছেন।

যে গল্প বলে এবং যে গল্প শোনে তাহাদের মধ্যে ক্রমশ মনোগত ঐক্য স্থাপিত হয়, দুইটি মন এক সুরে বাঁধা হইয়া যায়। চিত্রক গল্প বলিতে বলিতে কদাচিৎ সচেতন হইয়া ভাবিতেছিল—কী আশ্চর্য, মনে হইতেছে আমি একান্ত আপনার জনকে আপনার জীবন-কথা শুনাইতেছি! আর রট্টা তিনি বোধহয় কিছুই ভাবিতেছিলেন না, শুধু এই জল্পকের সত্তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল নানা কাহিনী বলিবার পর চিত্রক যেন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, অপ্রতিভভাবে বলিল—'আর না, নিজের কথা অনেক বলিয়াছি।'

রট্টা বলিলেন—'আরও বলুন।'

চিত্রক হাসিল ; একটু পরিহাস করিয়া বলিল—'রাজকন্যাদের কি ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই নাই ? ওদিকে বেলা কত হইয়াছে তাহার সংবাদ রাখেন কি ?'

রট্টা চকিতে ঊর্ধ্বে চাহিলেন। সূর্য মধ্য গগনে। কখন কোন দিক দিয়া সময় কাটিয়া গিয়াছে তিনি জানিতে পারেন নাই।

রট্টা বলিলেন—'ছি ছি, এত গল্প বলিয়া নিশ্চয় আপনার ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে।'

চিত্রক বলিল—'তা হইয়াছে। আপনার ?'

রট্টা সলজ্জে হাসিলেন—'আমারও। এতক্ষণ জানিতে পারি নাই। কিন্তু উপায় কি ? সঙ্গে তো খাদ্যদ্রব্য নাই।'

'উপায় আছে। ঐ দেখুন—' বলিয়া চিত্রক পার্শ্বের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া দেখাইল।

পাশাপাশি দুই শ্রেণী পাহাড়ের মাঝখানে অপরিসর উপত্যকা, পথটি তাহার উপর দিয়া গিয়াছে। বাম পার্শ্বের পাহাড়ে কিছু উচ্চে পাষাণগাত্রে সারি সারি কয়েকটি চতুষ্কোণ রন্ধ্র দেখা যায় ; পাথর কাটিয়া মানুষের বাসস্থান রচিত হইয়াছে। চিত্রকের অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসরণ করিয়া রট্টা দেখিলেন—একটি দেবায়তন ; সম্ভবত বুদ্ধের সংঘ। এখানে যে মনুষ্য বাস করে তাহার প্রমাণ, একটি গবাক্ষ হইতে পীতবর্ণ বস্ত্র লম্বিত হইয়া অলস বাতাসে দুলিতেছে।

চিত্রক বলিল—'যখন বস্ত্র আছে তখন মানুষ অবশ্য আছে ; মানুষ থাকিলেই খাদ্য থাকিবে। সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া ঐ দিকে যাওয়াই কর্তব্য।'

রট্টা হাসিয়া সম্মতি দিলেন। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে ওখানে ওঠা যাইবে না। ঘোড়া দু'টিকে একটি শষ্পাকীর্ণ স্থানে ছাড়িয়া দিয়া উভয়ে পাহাড়ের চড়াই ধরিলেন।

স্থানটি উচ্চ হইলেও দুরধিগম্য নয় ; উপরন্তু মনুষ্যপদচিহ্নিত একটি ক্ষীণ পথরেখা আছে। শিলাবন্ধুর অসমতল পর্বতগাত্র বাহিয়া চিত্রক অগ্রে চলিল ; রট্টা তাহার পশ্চাতে রহিলেন।

অর্ধদণ্ড পরে উপরে উঠিয়া রট্টা দেখিলেন, সংঘই বটে ; পাষাণে উৎকীর্ণ কয়েকটি কক্ষ, সম্মুখে সমতল চত্বর। চত্বরের মধ্যস্থলে তথাগতের শিলামূর্তি। উপত্যকা হইতে যে গবাক্ষগুলি দেখা গিয়াছিল তাহা সংঘের পশ্চাৎভাগ।

রট্টা প্রথমে বুদ্ধের ধ্যানাসীন মূর্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। চিত্রকও পাশে দাঁড়াইল।

রট্টা জোড়হস্তে ভক্তিনম্র কণ্ঠে বলিলেন—'নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স।' যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া রট্টা চিত্রককে বলিলেন—'আপনিও ভগবানকে প্রণাম করুন। বলুন, নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স—'

রট্টার অনুসরণ করিয়া চিত্রক ভগবান তথাগতকে প্রণতি জানাইল ; তারপর ঈষৎ বিস্ময়ে রট্টার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—'আপনি এ মন্ত্র কোথায় শিখিলেন ?'

রট্টা বলিলেন—'আমার পিতার কাছে।'

প্রাঙ্গণে এতক্ষণ অন্য কেহ ছিল না ; এখন প্রকোষ্ঠের ভিতর হইতে একটি পীতবেশধারী

শ্রমণ বাহির হইয়া আসিলেন। মুণ্ডিত মস্তক, শীর্ণ কলেবর, মুখে প্রসন্ন বৈরাগ্য। সহাস্যে দুই হস্ত তুলিয়া বলিলেন—'আরোগ্য।'

রট্টা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—'আর্য, আমরা দুইজনে ক্ষুধার্ত পান্থ ; বুদ্ধের প্রসাদ ভিক্ষা করি।'

ভিক্ষু বলিলেন—'রট্টা যশোধরা, বুদ্ধ তোমার প্রতি প্রসন্ন। এস, তোমরা ভিতরে এস।'

ভিক্ষু তাহাকে চিনিয়াছেন দেখিয়া রট্টার মুখ আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'আর্য, আমাকে চিনিলেন কি করিয়া ? পূর্বে কি দেখিয়াছেন ?'

ভিক্ষু বলিলেন—'দেখি নাই, তোমার বেশভূষা হইতে অনুমান করিয়াছি। মহারাজ ধর্মাদিত্যের কাছে যাইতেছ ?'

'আজ্ঞা। ইনি আমার সহচর, মগধের রাজদূত।'

ভিক্ষু একবার চিত্রকের প্রতি স্মিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ; কিছু বলিলেন না।

অতঃপর সংঘচ্ছায়ায় প্রবেশ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালনপূর্বক পথিক দুইজন একটি প্রকোষ্ঠে বসিলেন। ভিক্ষু তাহাদের জন্য খাদ্য আনিয়া দিলেন ; কিছু দ্বিদল সিদ্ধ, কিছু সিক্ত চিপিটক, কয়েকটি শুষ্ক দ্রাক্ষাফল ও খর্জুর। ক্ষুধার সময় ; উভয়ে পরম তৃপ্তির সহিত তাহাই অমৃতজ্ঞানে আহার করিতে লাগিলেন।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কথোপকথন হইতে লাগিল।

রট্টা জিজ্ঞাসা করিলেন—'দেব, এখানে আপনারা কয়জন আছেন ? আর কাহাকেও দেখিতেছি না।'

ভিক্ষু বলিলেন—'আমরা চারিজন আছি। দুইজন রন্ধ্রে জল ভরিতে গিয়াছেন। একজন পীড়িত।'

রট্টা মুখ তুলিলেন—'পীড়িত ? কী পীড়া ?'

ভিক্ষু ঈষৎ হাসিলেন—'সংসার-পীড়া। সংঘে থাকিলেও মারের হস্ত হইতে নিস্তার নাই।'

চিত্রক প্রশ্ন করিল—'আপনারা এখানে নিঃসঙ্গ থাকেন ? দিবারাত্র কি করেন ?'

ভিক্ষু বলিলেন—'সংসার ভুলিবার চেষ্টা করি।'

আহারান্তে আচমন করিয়া রট্টা আবার আসিয়া বসিলেন, বলিলেন—'আর্য, কিছু উপদেশ দিন।'

ভিক্ষু হাসিলেন—'আমি আর কী উপদেশ দিব ? সহস্র বৎসর পূর্বে শাক্যমুনির শ্রীমুখ হইতে যে বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল তাহাই শুন।—'মন হইতে প্রবৃত্তির উৎপত্তি ; মন যদি নিষ্কলুষ থাকে, সুখ ছায়ার মত তোমার পিছনে থাকিবে।''

রট্টা প্রণাম করিয়া বলিলেন—'আমি ধন্য।'—ভিক্ষুর পদপ্রান্তে একটি স্বর্ণদীনার রাখিয়া বলিলেন—'সংঘের অর্ঘ্য।'

ভিক্ষু বলিলেন—'স্বর্ণের প্রয়োজন নাই। কল্যাণি, যদি সংঘকে দান করিতে ইচ্ছা কর, এক আঢ়ক গোধূম দিও। দীর্ঘকাল আমরা গোধূম দেখি নাই। যে শ্রমণটি অসুস্থ তিনি গোধূমের জন্য কিছু কাতর হইয়াছেন।' বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

'সত্বর পাঠাইব'—বলিয়া রট্টা গাত্রোত্থান করিলেন।

চিত্রক দণ্ডায়মান ছিল ; সে শুষ্কস্বরে বলিল—'মহাশয়, আমাকেও কিছু উপদেশ করুন।'

ভিক্ষু প্রশান্ত চক্ষু তাহার পানে তুলিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—'শাক্যমুনির উপদেশ শ্রবণ কর : 'সে আমাকে গালি দিয়াছে, আমাকে প্রহার করিয়াছে, নিঃস্ব করিয়াছে'—এই কথা যে চিন্তা করে

তাহার ক্রোধ কখনও শান্ত হয় না। বৈরভাব কেবল অবৈরভাব দ্বারা শান্ত হয় ইহাই চিরন্তন ধর্ম।'

দুই অশ্বারোহী আবার চলিয়াছেন। সূর্য তাঁহাদের বামে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তির্যক অংশু তেমন তীক্ষ্ম নয়।

দুই অশ্বারোহী নিজ নিজ অন্তরে নিমগ্ন; বাক্যালাপ অধিক হইতেছে না। চিত্রক গল্প বলিবার কালে রট্টার প্রতি যে অন্তরঙ্গতা অনুভব করিয়াছিল, তাহা আবার সংশয়ের কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভিক্ষু যে-কথা বলিলেন তাহার অর্থ কি? বৈরভাবের পরিবর্তে বৈরভাব পোষণ করাই স্বাভাবিক, অবৈরভাব কি করিয়া পোষণ করা যায়? ইহা ভিক্ষুর ধর্ম হইতে পারে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম কদাচ নয়। প্রতিহিংসা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। শুধু তাহাই নয়, ইহা চিত্রকের প্রকৃতিগত স্বধর্ম। ইহা তাহার ধাতু।

অথচ— এত সুযোগ পাইয়াও সে রট্টার উপর প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারিতেছে না কেন? রট্টা সুন্দরী যৌবনবতী নারী—এই জন্য? সুন্দরী নারীর মোহে সে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বিস্মৃত হইবে? পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবে না?

সহসা মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় একটি চিন্তা চিত্রকের মনে খেলিয়া গেল। সে উচ্চকিত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে আকাশের পানে চাহিল। কোন্ মূঢ়তার জালে তাহার মন এতক্ষণ জড়াইয়া ছিল? একথা তাহার মনে উদয় হয় নাই কেন?

সে মনে মনে বলিল—আমি ক্ষত্রিয়, বৈরতা আমার স্বধর্ম; কিন্তু রট্টার সহিত বৈরতা করিব কেন? সে আমার অনিষ্ট করে নাই। তাহার পিতার অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম নয়। যদি প্রতিশোধ লইতে হয় তাহার পিতার উপর লইব।

দারুণ সমস্যার সমাধান হইলে হৃদয় লঘু হয়। মুহূর্তে চিত্রকের অন্তরের কুজ্‌ঝটিকা কাটিয়া গিয়া আনন্দের দিব্য জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে উৎফুল্ল নেত্রে রট্টার পানে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

চকিতে স্মিত নেত্র তুলিয়া রট্টা বলিলেন—'কি হইল?'

চিত্রক বলিল—'ভিক্ষু বলিয়াছিলেন, সুখ ছায়ার মত আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। ঐ দেখুন সেই ছায়া!'

রট্টা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, সঞ্চরমাণ অশ্বারূঢ় ছায়া নাচিতে নাচিতে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছে।

উভয়ে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

চারিদিকে বিস্তীর্ণ তরঙ্গায়িত উপত্যকা। পাহাড় দূরে সরিয়া গিয়াছে। দূর হইতে তাঁহাদের হাসির গদ্‌গদ প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল। যেন মিলন মুহূর্তের সলজ্জ চুপিচুপি হাসি। কানে কানে হাসি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পান্থশালা

চিত্রক ও রাজকুমারী রট্টা যখন পান্থশালায় উপনীত হইলেন, তখন সূর্যাস্ত হইতে আর দণ্ড দুই বাকি আছে।

দুইটি পথের সন্ধিস্থলে পান্থশালাটি অবস্থিত। যে পথ চষ্টন দুর্গের সহিত কপোতকূটের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে, এই স্থানে সেই পথ হইতে একটি শাখা বাহির হইয়া অগ্নিকোণে আর্যাবর্তের দিকে চলিয়া গিয়াছে, দ্বিধা-ভিন্ন পথের মধ্যস্থলে প্রস্তর-প্রাকার-বেষ্টিত এই পান্থশালা।

স্থানটি মনোরম। উত্তর ও পূর্বদিকে ঘন পর্বতের শ্রেণী ; পশ্চিমদিকে বহুদূর পর্যন্ত উন্মুক্ত উপত্যকা। এই উপত্যকার মধ্য দিয়া একটি উপল-কুটিলা ক্ষুদ্র নদী বহিয়া গিয়াছে ; মনে হয় পূর্বদিকে পর্বতকন্দর হইতে নির্গত এক রজতবর্ণ নাগ শ্লথগতিতে অস্তাচলের পানে কোনও নূতন বিবরের সন্ধানে চলিয়াছে।

পান্থশালাটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও দুর্গের আকারে নির্মিত, উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। জনালয় হইতে দূরে অরক্ষিত পথপার্শ্বে পান্থশালা নির্মাণ করিতে হইলে বেশ দৃঢ় করিয়া নির্মাণ করিতে হয়। একে তো এ অঞ্চলে খণ্ড যুদ্ধাদি লাগিয়াই আছে, তদুপরি উত্তর-পশ্চিমের গিরিসঙ্কট মধ্যে যে সকল বন্য জাতি বাস করে তাহারা বড়ই দুর্দম প্রকৃতি। তাহারা মেষ পালনের অবকাশকালে দল বাঁধিয়া দস্যুতা করে। পথে অরক্ষিত যাত্রিদল পাইলে লুটপাট করে ; সুযোগ পাইলে পান্থশালাকেও অব্যাহতি দেয় না। তাই দিবাভাগে পান্থশালার লৌহ-কণ্টকযুক্ত দ্বার খোলা থাকিলেও সূর্যাস্তের সঙ্গে উহা বন্ধ হইয়া যায়। তখন আর কাহারও প্রবেশাধিকার থাকে না ; চিরাগত যাত্রীরা দ্বারের বাহিরে রাত্রি যাপন করে।

চিত্রক ও রট্টা পান্থশালার তোরণমুখে উপস্থিত হইলে পান্থপাল ছুটিয়া আসিয়া জোড়হস্তে অভ্যর্থনা করিল—'আসুন, কুমার-ভট্টারিকা, আপনার পদার্পণে আমার স্থান পবিত্র হইল। —দূত মহাশয়, আপনিও স্বাগত। আমি ভাগ্যবান, তাই আজ—' বলা বাহুল্য, পান্থপাল পূর্বেই নকুল প্রমুখাৎ সংবাদ পাইয়াছিল যে ইঁহারা আসিতেছেন।

চিত্রক ও রট্টা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। পান্থপাল ব্যস্ত হইয়া ডাকিল—'ওরে কে আছিস—কঙ্ক ডুণ্ডুভ—শীঘ্র কম্বোজ দু'টিকে মন্দুরায় লইয়া যা, যব-শক্তু শালি-প্রিয়ঙ্গু দিয়া সেবা কর।'

দুইজন কিঙ্কর আসিয়া অশ্ব দু'টির বল্গা ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। রট্টা জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমার রক্ষীরা কি চলিয়া গিয়াছে ?'

পান্থপাল বলিল—'আজ্ঞা হাঁ। নকুল মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু কুমার-ভট্টারিকার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তাঁহারা দ্বিপ্রহরেই চলিয়া গিয়াছেন।'

পান্থপাল মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি ; স্থূলকায় কিন্তু নিরেট। বচনবিন্যাসে বেশ পটু। চিত্রক তাহাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'এখানে দেবদুহিতা রাত্রিযাপন করিলে ভয়ের কোনও কারণ নাই ?'

'ভয় ! আমার পান্থশালার দ্বার বন্ধ হইলে মূষিকেরও সাধ্য নাই ভিতরে প্রবেশ করে।' পান্থপাল কণ্ঠস্বর হ্রস্ব করিয়া বলিল—'তবে ভিতরে কয়েকটি পান্থ আছে। তাহারা বিদেশী বণিক, পারস্যদেশ হইতে আসিতেছে ; মগধে যাইবে—'

'তাহারা কি বিশ্বাসযোগ্য নয় ?'

'বিশ্বাসের অযোগ্য বলিতে পারি না। ইহারা বহু বৎসর ধরিয়া এই পথে গতায়াত করিতেছে। মেষরোমের আস্তরণ গাত্রাবরণ প্রভৃতি লইয়া আর্যাবর্তের বিভিন্ন প্রান্তে বাণিজ্য করিয়া বেড়ায়। তবে উহারা অগ্নি-উপাসক, ম্লেচ্ছ। সাবধানের নাশ নাই।'

'কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন কর্তব্য ?'

পান্থপাল বলিলেন -'ইনি দেবদুহিতা একথা প্রকাশ না করিলেই চলিবে। ইনি আসিতেছেন তাহা আমি ভিন্ন আর কেহ জানে না।'

চিত্রক দেখিল পান্থপাল লোকটি চতুর ও প্রত্যুৎপন্নমতি ; সে বলিল—'ভাল। —পান্থপাল, তোমার নাম কি ?'

পান্থপাল সবিনয়ে বলিল—'দেবদ্বিজের কৃপায় এ দাসের নাম জয়কম্বু। কিন্তু আর্যভাষা সকলের মুখে উচ্চারণ হয় না, কেহ কেহ জম্বুক বলিয়া ডাকে ।'

চিত্রক হাসিয়া বলিল—'ভাল। জম্বুক, আমাদের ভিতরে লইয়া চল। আমরা শ্রান্ত হইয়াছি।'

জম্বুক বলিল—'আসুন, মহাভাগ, আসুন দেবি—। আপনাদের জন্য শ্রেষ্ঠ দু'টি কক্ষ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। এদিকে স্নিগ্ধ অম্লসীধু প্রস্তুত আছে, অনুমতি হইলেই—'

চিত্রক ও রট্টা প্রাকারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সূর্য তখনও অস্তাচল স্পর্শ করে নাই, কিন্তু জম্বুকের আদেশে দুইজন দ্বারী দ্বার বন্ধ করিয়া ইন্দ্রকীলক আঁটিয়া দিল। কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না।

রট্টা পূর্বে কখনও পান্থশালা দেখেন নাই, তিনি পরম কৌতূহলের সহিত চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে চলিলেন। প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত স্থানটি চতুষ্কোণ ; তিনটি প্রাচীরের গাত্রে সারি সারি প্রকোষ্ঠ ; প্রকোষ্ঠগুলির সম্মুখে একটানা অপ্রশস্ত অলিন্দ। মধ্যস্থলে শিলাপট্টাবৃত সুপরিসর উন্মুক্ত অঙ্গন। অঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে চক্রাকৃতি বৃহৎ জলকুণ্ড।

অঙ্গনের এক কোণে কয়েকটি উষ্ট্র ও গর্দভ রহিয়াছে ; তাহারা পারসিক পণ্যবাহক। পারসিকেরা নিকটেই আস্তরণ বিছাইয়া বসিয়া আছে এবং নিজেদের মধ্যে রহস্যালাপ করিতেছে। তাহাদের মুখমণ্ডল শ্মশ্রু-মণ্ডিত ; বর্ণ পক্ক দাড়িম্বের ন্যায় ; চক্ষু ও কেশ ঘনকৃষ্ণ।

রট্টা যখন চিত্রক ও জম্বুকের সহিত তাহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন তখন তাহারা একবার চক্ষু তুলিয়া দেখিল, তারপর আবার পরস্পর বাক্যালাপ করিতে লাগিল। ইহারা নিতান্ত নিরীহ বণিক, ছদ্মবেশী দস্যু তস্কর নয় ; কিন্তু চিত্রকের মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। নারী লইয়া পথ চলা যে কিরূপ উদ্বেগজনক কাজ এ অভিজ্ঞতা পূর্বে তাহার ছিল না।

চিত্রক নিম্নস্বরে জম্বুককে প্রশ্ন করিল—'ইহারা কয়জন ?'

জম্বুক বলিল—'পাঁচজন।'

'সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে ?'

'আছে। অস্ত্র না লইয়া এদেশে কেহ পথ চলে না।'

'তোমার ভৃত্য অনুচর কয়জন ?'

'আমরা পুরুষ আটজন আছি।'

'স্ত্রীলোকও আছে নাকি ?'

জম্বুক প্রাঙ্গণের বিপরীত প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'আমাদের চারিজন অন্তঃপুরিকা আছে।'

চিত্রক অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

অঙ্গনের অন্য প্রান্তে চারিজন নারী বসিয়া গৃহকর্ম করিতেছিল। রট্টা সেখানে গিয়া স্মিতমুখে

দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। চত্বরের কিয়দংশ পরিষ্কৃত করিয়া নারীগণ নৈশ ভোজনের আয়োজন করিতেছে। একজন ঘরট্ট ঘুরাইয়া গোধূম চূর্ণ করিতেছে; নবচূর্ণিত গোধূম হইতে রোটিকা প্রস্তুত হইবে। দ্বিতীয়া শাক বাছিতেছে; তৃতীয়া প্রস্তরের উদূখলে সুগন্ধি বেশার কুট্টন করিতেছে; চতুর্থী মেষমাংস ছুরিকা দিয়া কাটিয়া কাটিয়া পৃথক করিয়া রাখিতেছে। তাহারা মাঝে মাঝে সম্ভ্রম-কৌতূহলপূর্ণ চক্ষু তুলিয়া এই পুরুষবেশিনী সুন্দরীকে দেখিল, কিন্তু তাহাদের ক্ষিপ্র নিপুণ হস্তের কার্য শিথিল হইল না।

রট্টা কিছুক্ষণ ইহাদের মসৃণ কর্মদক্ষতা নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া জম্বুকের দিকে ফিরিলেন—'জম্বুক, তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে।'

জম্বুক তৎক্ষণাৎ যুক্তপাণি হইল—'আজ্ঞা করুন।'

'কপোতকূটের পথে পর্বতের উপর একটি বৌদ্ধবিহার আছে জান কি?'

'আজ্ঞা জানি। চিল্লকূট বিহার।'

'সেখানে ভিক্ষুদের জন্য দুই আঢ়ক উত্তম গোধূম পাঠাইতে হইবে।'

'আজ্ঞা পাঠাইব। কল্য প্রাতেই গর্দভপৃষ্ঠে গোধূম পাঠাইয়া দিব। ভিক্ষুরা সূর্যাস্তের পূর্বেই পাইবেন।'

'ভাল। আমি মূল্য দিব।'

চিত্রক ও রট্টার জন্য যে দুইটি কক্ষ নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা আকার ও আয়তনে অন্যান্য কক্ষের মতই, কিন্তু কক্ষের কুট্টিমে উষ্ট্ররোমের আস্তরণ বিস্তৃত হইয়াছিল, তদুপরি কোমল শয্যা। কোণে পিত্তলের দীপদণ্ডে বর্তি জ্বলিতেছে। রাজকুমারীর পক্ষে ইহা তুচ্ছ আয়োজন; কিন্তু দেখিয়া রট্টা প্রীত হইলেন।

অম্লসীধু সহযোগে কিছু ক্ষীরের মণ্ড ভক্ষণ করিয়া উভয়ে আপাতত ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিলেন। রাত্রির আহার বাকি রহিল।

আহারান্তে চিত্রক গাত্রোত্থান করিয়া রট্টাকে বলিল—'আপনি এখন কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন।' বলিয়া রট্টার কক্ষের দ্বার ভেজাইয়া দিয়া বাহিরে আসিল।

আকাশে তখন নক্ষত্র ফুটিয়াছে; রাত্রি অন্ধকার, এখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই। পান্থশালার প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে। ওদিকে পারসিকেরা অঙ্গার কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া শূল্য মাংস রন্ধন করিতেছে; দগ্ধ মাংসের বেশার-মিশ্র সুগন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে লুব্ধ করিয়া তুলিতেছে।

চিত্রক বলিল—'হিঙ্গু-পলাণ্ডু-ভোজী ম্লেচ্ছগুলা রাঁধে ভাল। জম্বুক, রাত্রে আমাদের ভোজনের কি ব্যবস্থা?'

জম্বুক ভোজ্য বস্তুর দীর্ঘ তালিকা দিল। প্রথমেই মিষ্টান্ন: মধু পিষ্টক লড্ডু ও ক্ষীর; তারপর শাক ঘৃত-তণ্ডুল মুদ্গ-সূপ, ময়ূর ডিম্ব; সর্বশেষে রোটিকা পুরোডাশ ও তিন প্রকার অবদংশ সহ উখ্য মাংস শূল্য মাংস ও দধি।

চিত্রক সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—'উত্তম। দেবদুহিতার কষ্ট না হয়। আর শুন, শূল্য মাংস আমি রন্ধন করিব।'

জম্বুক চক্ষু বিস্ফারিত করিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল—'যেরূপ আপনার অভিরুচি।'

চিত্রক কক্ষের সম্মুখে অঙ্গনের উপর একটা স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল—'এইখানে অঙ্গার চুল্লী রচনা কর।'

জম্বুকের আদেশে ভৃত্য আসিয়া অঙ্গার চুল্লী রচনায় প্রবৃত্ত হইল। এই অবকাশে ইতস্তত

পাদচারণা করিতে করিতে চিত্রক লক্ষ্য করিল, কক্ষশ্রেণী যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে একটি বংশনির্মিত নিঃশ্রেণি বক্রভাবে ছাদসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার মন আবার সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। ছাদে উঠিবার সিঁড়ি কেন ? উপরে যদি কেহ লুকাইয়া থাকে ? চিত্রক জম্বুককে সিঁড়ি দেখাইয়া বলিল—'ছাদে কী আছে ?'

জম্বুক বলিল—'শুষ্ক জ্বালানি কাষ্ঠ আছে। আর কিছু নাই।'

চিত্রকের সন্দেহ ঘুচিল না ; সে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য নিঃশ্রেণি বাহিয়া ছাদে উঠিয়া গেল। জম্বুককে বলিল—'তুমিও এস।'

ছাদের উপর সত্যই জ্বালানি কাষ্ঠ ভিন্ন আর কিছু নাই। চিত্রক নক্ষত্রালোকে ত্রিভুজ ছাদের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ছাদের উপর মন্দ মন্দ শীতল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল ; চারিদিক শব্দহীন, অন্ধকার : কেবল গিরিনদীর বুকে নক্ষত্র খচিত আকাশের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

চিত্রক নামিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বাহিরের অন্ধকার হইতে এক উৎকট অট্ট-কোলাহল উত্থিত হইয়া চিত্রককে চমকিত করিয়া দিল। একদল শৃগাল নিকটেই কোথাও বসিয়া যাম ঘোষণা করিতেছে।

তাহাদের সম্মিলিত ক্রোশন ক্রমে শান্ত হইলে চিত্রক হাসিয়া উঠিল, বলিল—'এখানে জম্বুকের অভাব নাই দেখিতেছি।'

জম্বুক হাসিল, বলিল—'পৃথিবীতে জম্বুকের অভাব কোথায় ? তবে জয়কম্বু বড় অধিক নাই মহাশয়।'

চিত্রক বলিল—'সেকথা সত্য। তুমি উত্তম পান্থপাল।'

এই সময় পশ্চিম দিগন্তের পানে দৃষ্টি পড়িতে চিত্রক দেখিল, বহুদূরে চক্রবালরেখার নিকট যেন পাহাড়ে আগুন লাগিয়াছে ; আগুন দেখা যাইতেছে না, কেবল তাহার উৎসারিত প্রভা দিগন্তকে রঞ্জিত করিয়াছে।

অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া চিত্রক জিজ্ঞাসা করিল—'উহা কি ? পাহাড়ের জঙ্গলে কি আগুন লাগিয়াছে ?'

জম্বুক বলিল—'বোধহয় না। কয়েকদিন ধরিয়া দেখিতেছি, একই স্থানে আছে। পাহাড়ের আগুন হইলে দক্ষিণে বামে ব্যাপ্ত হইত।'

'তবে কী ? ওদিকে কি কোনও নগর আছে ? কিন্তু নগর থাকিলেও রাত্রে এত আলো জ্বলিবে কেন ? ইহা তো দীপোৎসবের সময় নয় !'

'ওদিকে নগর নাই। তবে—'

'তবে ?'

জম্বুক বলিল—'পান্থশালায় অনেক লোক আসে যায়, অনেক কথা শুনিতে পাই। শুনিয়াছি, হূণ আবার আসিতেছে। যদি কথা সত্য হয়, আবার দেশ লণ্ডভণ্ড হইবে।' বলিয়া জম্বুক নিশ্বাস ফেলিল।

চিত্রক বলিল—'তোমার কি মনে হয় হূণেরা ঐখানে ছত্রাবাস ফেলিয়াছে ?'

জম্বুক বলিল—'না, তাহা মনে হয় না। হূণেরা এত কাছে আসিলে লুটপাট করিত, অত্যাচার করিত। কিন্তু এদিকে হূণ দেখি নাই।'

'তবে কী হইতে পারে ?'

'জনশ্রুতি শুনিয়াছি, সম্রাট স্কন্দগুপ্ত সসৈন্যে হূণের গতিরোধ করিতে আসিয়াছেন।'

চিত্রক বিস্মিত হইয়া বলিল—'স্কন্দগুপ্ত স্বয়ং !'

জম্বুক বলিল—'এইরূপ শুনিয়াছি। সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না। কেন, আপনি কিছু জানেন না ?'

চিত্রক চকিতে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল —'না, আমি কিছু জানি না। যুদ্ধ সম্ভাবনার পূর্বেই আমি পাটলিপুত্র ছাড়িয়াছি।'

চিত্রক ও জম্বুক নীচে নামিয়া আসিল।

ভৃত্য ইতিমধ্যে অঙ্গার প্রস্তুত করিয়া শূল্য মাংসের উপকরণাদি আনিয়া রাখিয়াছে। চিত্রক তাহা দেখিয়া প্রথমে গিয়া রট্টার রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল। কান পাতিয়া শুনিল, কিন্তু কিছু শুনিতে পাইল না। তখন সে দ্বার ঈষৎ ঠেলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। দীপের স্নিগ্ধ আলোকে রট্টা শয্যায় শুইয়া আছেন, একটি বাহু চক্ষের উপর ন্যস্ত। বোধহয় নিদ্রাবেশ হইয়াছে। এই নিভৃত দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকের মন এক অপূর্ব সম্মোহে পূর্ণ হইয়া উঠিল ; মৃগমদ-সৌরভের ন্যায় মাদক-মধুর রসোচ্ছ্বাসে হৃৎকুম্ভ কণ্ঠ পর্যন্ত ভরিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মনে মনে বলিল—'ঘুমাও, রাজকুমারী, ঘুমাও।

চাঁদ উঠিয়াছে। কৃষ্ণা চতুর্থীর চন্দ্র পূর্বাচলের মাথায় উঠিয়া ক্লান্ত হাসি হাসিতেছে। পান্থশালার অঙ্গন শূন্য, পারসিকেরা নিজ প্রকোষ্ঠে দ্বার বন্ধ করিয়াছে। অঙ্গন স্তিমিত জ্যোৎস্নায় পাণ্ডুর।

চিত্রক রট্টার দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—'দেবি, উঠুন উঠুন, আহার প্রস্তুত।'

দ্বার খুলিয়া রট্টা হাসিমুখে সম্মুখে দাঁড়াইলেন, ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—'ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।'

সম্মুখেই অলিন্দে আহারের আসন হইয়াছিল, দুইটি আসন মুখোমুখি ; মধ্যে বহু কটোর এবং স্থালীতে খাদ্য সম্ভার। পাশে দুইটি দীপ জ্বলিতেছে। উভয়ে আহারে বসিলেন ; জম্বুক দাঁড়াইয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটি কথা হইতেছে। জম্বুক মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনের জন্য কৌতুকজনক উপাখ্যান বলিতেছে। রাজকন্যা হাসিতেছেন ; তাঁহার মুখে তৃপ্তি, চোখে নিরুদ্বেগ প্রশান্তি। চিত্রক নিজ হৃদয়-মধ্যে একটি আন্দোলন অনুভব করিতেছে, যেন সাগরতরঙ্গে তাহার হৃদয় দুলিতেছে ফুলিতেছে, উঠিতেছে নামিতেছে—

রট্টা বলিলেন—'কাল পিতার দর্শন পাইব ভাবিয়া বড় আনন্দ হইতেছে।'

চিত্রকের মনের উপর ছায়া পড়িল। রট্টার পিতা...তাহার সহিত চিত্রকের একটা বোঝাপড়া আছে...কিন্তু সে চিন্তা এখন নয়...

চিত্রক বলিল—'একটা জনরব শুনিলাম। —পরমভট্টারক স্কন্দগুপ্ত নাকি চতুরঙ্গ সেনা লইয়া এদেশে আসিয়াছেন।'

রট্টা চকিত চক্ষু তুলিলেন—'স্কন্দগুপ্ত !'

চিত্রক নির্লিপ্তস্বরে বলিল—'হাঁ। হূণ আবার আসিতেছে, তাই মহারাজ তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য স্বয়ং আসিয়াছেন।'

রট্টা কিয়ৎকাল নতমুখে রহিলেন, তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন—'আপনি সম্ভবত প্রভুর সহিত মিলিত হইতে চাহেন ?'

চিত্রক বলিল—'সে পরের কথা। আগে আপনাকে চষ্টন দুর্গে পৌঁছাইয়া দিয়া তবে অন্য কাজ।'

রট্টা তাহার মুখের উপর ছায়া-নিবিড় চক্ষু দু'টি স্থাপন করিয়া স্নিগ্ধ হাসিলেন।

আহার সমাপ্ত হইলে রট্টা জম্বুককে বলিলেন—'তোমার সেবায় আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। অন্ন ব্যঞ্জন অতি মুখরোচক হইয়াছে। দেখ, আর্য চিত্রক কিছুই ফেলিয়া রাখেন নাই।'

জম্বুক করতল যুক্ত করিয়া সবিনয়ে হাস্য করিল। চিত্রক মৃদু হাসিয়া রট্টাকে জিজ্ঞাসা করিল—'কোন্ ব্যঞ্জন সর্বাপেক্ষা মুখরোচক লাগিল ?'

রট্টা বলিলেন—'শূল্য মাংস। এরূপ সুস্বাদু রন্ধন রাজ-পাচকও পারে না।'

চিত্রক মিটিমিটি হাসিতে লাগিল ; রট্টা তাহা দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইলেন, বলিলেন—'শূল্য মাংস কে রাঁধিয়াছে ?'

জম্বুক তর্জনী দেখাইয়া বলিল—'ইনি !'

অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া রট্টা হাসিয়া উঠিলেন—'আপনার তো অনেক বিদ্যা। এ বিদ্যা কোথায় শিখিলেন ?'

চিত্রক বলিল—'আমার সকল বিদ্যা যেখানে শিখিয়াছি সেইখানে।'

'সে কোথায় ?'

'যুদ্ধক্ষেত্রে।'

চিত্রকের মন কল্পনায় স্কন্দগুপ্তের স্কন্ধাবারের দিকে উড়িয়া গেল। ঐ যেখানে দিগন্তের কাছে আলোর আভা দেখা গিয়াছিল সেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ বস্ত্র-শিবির তালপত্রের ছাউনি পড়িয়াছে ; শিবিরের ফাঁকে ফাঁকে সৈনিকেরা আগুন জ্বালিয়াছে ; কেহ যবচূর্ণ মাখিয়া দুই হস্তে স্থূল রোটিকা গড়িতেছে ; কেহ ভল্লাগ্রে মাংস গ্রথিত করিয়া আগুনে শূল্য পক্ব করিতেছে—চিৎকার গান বাগ্‌যুদ্ধ...নির্ভয় নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা...অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই...আছে কেবল নিরঙ্কুশ বর্তমান।

রট্টা চিত্রকের মুখের উপর চিন্তার ক্রীড়া লক্ষ্য করিতেছিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন ?'

চিত্রক ঈষৎ চমকিয়া বলিল—'হুঁ। আপনি কি অন্তর্যামিনী ?'

রট্টা রহস্যময় হাসিলেন।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। চন্দ্র প্রায় মধ্যাকাশে।

কুমারী রট্টা আপন কক্ষে শয্যাশ্রয়ে ঘুমাইয়া ছিলেন, একটি নিশ্বাস ফেলিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ঘরের কোণে দীপ জ্বলিতেছে ; জ্বলিয়া জ্বলিয়া শিখাটি ক্রমে ক্ষুদ্র বর্তুলবৎ আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার বিন্দুপ্রমাণ আলোকে ঘরের বিশেষ কিছু দেখা যাইতেছে না। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া রট্টা কিয়ৎকাল ঐ আলোকবিন্দুর পানে চাহিয়া রহিলেন ; তারপর উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বারের অর্গল মোচন করিলেন।

দ্বার ঈষৎ বিভক্ত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার কক্ষের সম্মুখে দ্বারের দিকে পিছন করিয়া অলিন্দের একটি স্তম্ভে পৃষ্ঠ রাখিয়া চিত্রক বসিয়া আছে। পদদ্বয় প্রসারিত, জানুর উপর মুক্ত তরবারি। তাহার ঊর্ধ্বোত্থিত মুখের উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে—চক্ষু স্বপ্নাতুর—

দীর্ঘকাল এক দৃষ্টিতে দেখিয়া রট্টা আবার ধীরে ধীরে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন ; ফিরিয়া আসিয়া অধোমুখে শয্যায় বক্ষ চাপিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
চৈন পরিব্রাজক

সূর্যোদয়ের সঙ্গে পান্থশালার দ্বার খুলিল।

পারসিক সার্থবাহ ইতিপূর্বেই উষ্ট্র গর্দভের পৃষ্ঠে পণ্যভার চাপাইয়া প্রস্তুত ছিল, তাহারা পান্থশালার শুল্ক চুকাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা সারা আর্যাবর্তে পরিভ্রমণ করিবে, পথপার্শ্বে আলস্যবশে বিলম্ব করিলে চলিবে না।

চিত্রক রাত্রে ঘুমায় নাই, কিন্তু সেজন্য তাহার শরীরে তিলমাত্র ক্লান্তিবোধ ছিল না। সে দেখিল, পান্থশালা শূন্য হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রট্টার কক্ষদ্বার এখনও রুদ্ধ। রাজকুমারীর এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। চিত্রক মনে মনে গত রাত্রির অলীক ভয় ভাবনার কথা চিন্তা করিতে করিতে প্রাচীর বেষ্টনের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

নবীন রবিকরে উপত্যকা ঝলমল করিতেছে, তৃণ-প্রান্তে তখনও শিশিরবিন্দু শুকায় নাই। হিমার্দ্র মন্থর বায়ু শরীর পুলকিত করিতেছে। চিত্রক উৎফুল্ল নেত্রে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। আজ তাহার চোখে প্রকৃতির রঙ বদলাইয়া গিয়াছে।

চারিদিকে দেখিতে দেখিতে তাহার চোখে পড়িল, কাল রাত্রে যেখানে সে আগুনের প্রভা দেখিয়াছিল সেইখানে আকাশ ও দিগন্তের সঙ্গমস্থলে অনেক পক্ষী উড়িতেছে; আর কোনও দিকে অমন ঝাঁক বাঁধিয়া পক্ষী উড়িতেছে না। পক্ষীগুলিকে আকাশের পটে সঞ্চরমাণ কৃষ্ণবিন্দুর ন্যায় দেখাইতেছে।

চিত্রক অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এই সময় রট্টা বাহিরে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইলেন। চিত্রক সহাস্য হৃদ্যতার সহিত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল—

'রাত্রে সুনিদ্রা হইয়াছিল?'

রট্টা তাহার মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া নিম্নে নদীর পানে চাহিলেন, বলিলেন—'হাঁ। আপনার?'

চিত্রক অম্লানবদনে বলিল—'আমারও। খুব ঘুমাইয়াছি।'

রট্টা নদীর পানে একটু চাহিয়া রহিলেন। আজ তাঁহার মনের ভাব অন্য প্রকার: একটু চাপা, একটু অন্তর্মুখী। চিত্রকের মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। সে অন্তরে এক অপূর্ব প্রীতি-প্রগল্‌ভ উদ্দীপনা অনুভব করিতেছে; কোনও অজ্ঞাত উপায়ে এই রাজকুমারীর উপর তাহার যেন স্বত্বপূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। যাহার জন্য জাগিয়া রাত কাটাইতে হয়, তাহার প্রতি সম্ভবত এইরূপ অধিকার-বোধ জন্মে।

সে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কি যাত্রার জন্য প্রস্তুত?'

রট্টা বলিলেন—'আমি প্রস্তুত। কিন্তু দু'দণ্ড পরে যাত্রা করিলেও ক্ষতি নাই'—বলিয়া গিরিক্রোড়স্থ নির্জন পান্থশালাটির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিত্রক হাসিয়া উঠিল, বলিল —'সত্য বলুন, এই পান্থশালার প্রতি আপনার মমতা জন্মিয়াছে!'

রট্টা স্মিতমুখে বলিলেন—'তা জন্মিয়াছে।—ফিরিবার পথে আবার এখানে রাত্রিযাপন করিব।' মনে মনে ভাবিলেন, ফিরিবার সময় সঙ্গে অনেক লোক থাকিবে...এমন রাত্রি আর হইবে কি?

দুই একটি অন্য কথার পর চিত্রক পশ্চিমদিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল —'দেখুন তো, কিছু দেখিতে পাইতেছেন?'

রট্টা চক্ষের উপর করতলের অন্তরাল রাখিয়া কিছুক্ষণ দেখিলেন—'অনেক পাখি উড়িতেছে। কী পাখি?'

চিত্রক বলিল—'চিল্ল শকুন—'

রট্টা চকিতে চিত্রকের পানে চাহিলেন। কিন্তু এই সময় তাঁহাদের মনোযোগ অন্য দিকে আকৃষ্ট হইল।

পান্থশালার সম্মুখে ও দুই পাশে পথের তিনটি শাখা এতক্ষণ শূন্য পড়িয়া ছিল ; পারসিক সার্থবাহ অনেক পূর্বেই গিরিসঙ্কটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল ; এখন উত্তরদিক হইতে কয়েকটি মানুষ আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সহিত উষ্ট্র গর্দভ নাই, কেবল কয়েকটি মানুষ অদ্ভুত বেশভূষা পরিয়া পৃষ্ঠে ঝোলা বহিয়া পদব্রজে আসিতেছে।

চিত্রক বিস্মিত হইল। প্রাতঃকালে পান্থশালায় যাত্রী আসে না ; কোথা হইতে আসিবে ? নিকটে কোথাও জনালয় নাই। তবে ইহারা কে ?

যাত্রিগণ আরও কাছে আসিলে চিত্রক দেখিল, ইহাদের বেশভূষাই শুধু অদ্ভুত নয়, আকৃতিও অদ্ভুত। ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষগুলি ; মুখ বর্তুলাকার, হনূ উচ্চ, চক্ষু তির্যক। চিত্রক অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু এরূপ আকৃতির মানুষ কখনও দেখে নাই।

পান্থশালার সম্মুখে আসিয়া পথিকদল দাঁড়াইল। চারিজন পথিক, তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ। মুখে অতি সামান্য শুক্ল শ্মশ্রুগুম্ফ আছে, দেহ কৃশ ও শ্রমসহিষ্ণু ; মুখের ভাব দৃঢ়তাব্যঞ্জক। ইনিই এই দলের নেতা সন্দেহ নাই। চিত্রক ও রট্টা পরম কৌতূহলের সহিত ইঁহাদের দর্শন করিতেছিলেন, বৃদ্ধও কিছুক্ষণ তাঁহাদের নিরীক্ষণ করিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের সম্ভাষণ করিলেন।

চিত্রক ও রট্টা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর মধুর ও মন্দ্র, কিন্তু তাঁহার ভাষা চিত্রক বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিল না। যেন পরিচিত ভাষা, অথচ উচ্চারণের বিকৃতির জন্য ধরা যাইতেছে না।

চিত্রক রট্টাকে হ্রস্বকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কিছু বুঝিতে পারিলেন ?'

রট্টা বলিলেন—'না। ইহারা বোধহয় চীনদেশীয়।'

চিত্রক তখন বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিল—'আপনারা কে ? কি চান ?'

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, কিন্তু এবারও চিত্রক কিছু বুঝিল না। সে মাথা চুলকাইয়া শেষে জম্বুককে ডাকিল, বলিল—'তোমার নূতন অতিথি আসিয়াছে। ইহারা কে ?'

জম্বুক নবাগতদের দেখিয়াই বলিল—'ইঁহারা চৈনিক পরিব্রাজক। এইরূপ পথিক মাঝে মাঝে এই পথে আসেন।'

'ইহাদের ভাষা তুমি বুঝিতে পার ?'

'পারি। ইঁহারা পালি ভাষায় কথা বলেন।'

'ভাল। জিজ্ঞাসা কর আমাদের নিকট কী চান ?'

জম্বুক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিল এবং তাঁহার উত্তর শুনিয়া বলিল—'ভিক্ষু জানিতে চান ইনি রাজকন্যা রট্টা যশোধরা কিনা।'

চিত্রক সন্দেহপূর্ণ নেত্রে ভিক্ষুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'এ প্রশ্নের উত্তর পরে দিব, অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বল।'

অতঃপর জম্বুকের মধ্যস্থতায় ভিক্ষুর সহিত চিত্রকের নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তর হইল।

চিত্রক : আপনি কে ? কোথা হইতে আসিতেছেন ?

ভিক্ষু : আমার নাম টো ইঙ্। আমরা চীনদেশ হইতে আসিতেছি। ইহারা আমার শিষ্য।

চিত্রক : চীনদেশ কত দূর ?

ভিক্ষু : দুই বৎসরের পথ।

চিত্রক : কোথায় যাইবেন ?

ভিক্ষু : কুশীনগর যাইব। লোকজ্যেষ্ঠ বুদ্ধ যেখানে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন সেই পবিত্র স্থানে দেহরক্ষা করিব এই আশা লইয়া চলিয়াছি। এখন বুদ্ধের ইচ্ছা।

চিত্রক : এইজন্য এতদূর পথ আসিয়াছেন ? অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই ?

ভিক্ষু : অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।

চিত্রক : ক্ষমা করুন। আপনারা প্রাতঃকালে এখানে আসিলেন কি করিয়া ?

ভিক্ষু : আমরা অহিংসাধর্মী বৌদ্ধ, অস্ত্রধারণ করা আমাদের নিষেধ। কিন্তু এ পথে দস্যু তস্কর আছে ; তাই আমরা রাত্রিকালে পথ চলি, দিবাভাগে বিশ্রাম করি। কাল রাত্রে চন্দ্রোদয় হইলে যাত্রা করিয়াছিলাম।

চিত্রক : কোথা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন ?

ভিক্ষু : চষ্টন দুর্গ হইতে।

রট্টা এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিলেন ; এখন চষ্টন দুর্গের নাম শুনিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিলেন—'চষ্টন দুর্গ ! তবে আমার পিতার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল !'

ভিক্ষু হাসিলেন ; বলিলেন—'আমি অনুমান করিয়াছিলাম তুমিই রাজকন্যা রট্টা যশোধরা।...আমি তোমার পিতার নিকট হইতে কিছু বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম কপোতকূটে যাইতে হইবে ; ভালই হইল, পথেই তোমার দেখা পাইলাম। এখানে আমার কর্তব্য শেষ করিয়া নিজ কর্মে যাইব।'

রট্টা : পিতা কী বার্তা পাঠাইয়াছেন ?

ভিক্ষু : ধর্মাদিত্যের বার্তা সকলের নিকট প্রকাশ্য নয়। কিন্তু যখন দ্বিভাষীর প্রমুখাৎ কথা বলিতে হইতেছে তখন গোপন রাখা অসম্ভব। ভরসা করি ইহাতে ক্ষতি হইবে না।

রট্টার মুখে শঙ্কার ছায়া পড়িয়াছিল, তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—'না, ক্ষতি হইবে না, আপনি বলুন।'

ভিক্ষু : ধর্মাদিত্য তোমাকে এই বার্তা পাঠাইয়াছেন—তুমি কদাপি চষ্টন দুর্গে আসিও না, আসিলে ঘোর বিপদ ঘটিবে।

রট্টা স্থির বিস্ফারিত নেত্রে ভিক্ষুর পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর স্খলিতস্বরে বলিলেন—'বিপদ ঘটিবে ! কিরূপ বিপদ ?'

ভিক্ষু : যাত্রার পূর্বে ক্ষণেকের জন্য ধর্মাদিত্যের সহিত বিরলে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দুর্গাধিপতি কিরাত অতিশয় দুষ্ট। সে ছলনা দ্বারা তোমাকে চষ্টন দুর্গে লইয়া গিয়া বলপূর্বক বিবাহ করিতে চায়। ধর্মাদিত্যকে সে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

রট্টা : পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে !

ভিক্ষু : কারাগারে বন্দী করে নাই। কিন্তু তাঁহার দুর্গ ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, পত্র লিখিবারও অধিকার নাই। কপোতকূটে যে পত্র গিয়াছিল তাহা ধর্মাদিত্য স্বেচ্ছায় লেখেন নাই।

দীর্ঘ নীরবতার পর রট্টা চিত্রকের দিকে ফিরিলেন। তাঁহার মুখ রক্তহীন, কিন্তু চক্ষে চাপা আগুন। রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'কিরাতের যে এতদূর স্পর্ধা হইবে তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। এখন কর্তব্য কি ?'

চিত্রক কিছুকাল নীরব থাকিয়া ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিল—'মহারাজ কি কোনও অনুজ্ঞা দিয়াছেন ?'

ভিক্ষু : না। তিনি কেবল রট্টা যশোধরাকে চষ্টন দুর্গে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু তোমাদের কর্তব্য এই দুর্জনের হস্ত হইতে ধর্মাদিত্যকে উদ্ধার করা। কিরাত মিষ্ট কথায়

ধর্মাদিত্যকে মুক্তি দিবে না। তাহার কূট অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়াছে জানিলে সে আরও ক্রুদ্ধ হইবে ; হয়তো ধর্মাদিত্যের অনিষ্ট করিতে পারে—

রট্টা ব্যাকুল নেত্রে চিত্রকের পানে চাহিলেন। চিত্রক শান্তস্বরে বলিল—'আপনি অধীর হইবেন না, বিপদের সময় বুদ্ধি স্থির রাখিতে হয়। মহাশয়, আপনারা পরিশ্রমে পীড়িত, এখন বিশ্রাম করুন। জম্বুক, তুমি ইঁহাদের পরিচর্যা কর।'

যে ব্যাপারে যুদ্ধবিগ্রহের গন্ধ আছে তাহাতে চিত্রক কখনও বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় না ; যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রবীণ সেনাপতির ন্যায় সে সমস্ত দায়িত্বভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইল।

রট্টার হাত ধরিয়া সে তাঁহাকে কক্ষে আনিয়া বসাইল। রট্টার করতল তুষারের মত শীতল, অধর ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। নারী বাহিরে যতই পৌরুষের অভিনয় করুন, অন্তরে তিনি অবলা।

চিত্রক তাঁহার সম্মুখে বসিল এবং ধীরভাবে তাঁহাকে দুই চারিটি প্রশ্ন করিয়া কিরাত ও চষ্টন দুর্গ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইল। রট্টাও চিত্রকের সহিত কথা কহিতে কহিতে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এখন কর্তব্য কি—এই প্রশ্নের উত্তরে চিত্রক বলিল—'দুইটি পথ আছে। কিন্তু আপনি যদি কিরাতকে বিবাহ করিতে সম্মত থাকেন তাহা হইলে কোনও পথেরই প্রয়োজন নাই।'

রট্টা বলিলেন—'কিরাতকে বিবাহ করার পূর্বে আমি আত্মঘাতিনী হইব।'

চিত্রক বলিল—'তবে দুই পথ। এক, কপোতকূটে ফিরিয়া যাওয়া, সৈন্যদল লইয়া চষ্টন দুর্গ অবরোধ করা। যতদূর জানি সৈন্য সংগ্রহ করিতে সময় লাগিবে। চষ্টন দুর্গের ন্যায় ক্ষুদ্র দুর্গও অন্তত পাঁচশত সৈন্যের কমে অবরোধ করা অসম্ভব।'

রট্টা প্রশ্ন করিলেন—'দ্বিতীয় পথ কী ?'

চিত্রক বলিল—'দ্বিতীয় পথ, স্কন্দগুপ্তের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা।'

রট্টা উচ্চকিত হইয়া চাহিলেন—'স্কন্দগুপ্ত সাহায্য দিবেন ?'

চিত্রক বলিল—'তিনি ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি। তাঁহার শরণ লইলে তিনি অবশ্য সাহায্য করিবেন।'

'তবে স্কন্দগুপ্তেরই শরণ লইব। তাঁহার নাম শুনিলে কিরাত ভয় পাইবে, বিরুদ্ধতা করিতে সাহস পাইবে না।'

'তাহা সম্ভব। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের কাছে কে যাইবে ?'

'আমি যাইব। আপনি সঙ্গে থাকিবেন।'

চিত্রক ক্ষণেক মৌন রহিল, তারপর বলিল—'আপনি নারী, লক্ষ লক্ষ সৈন্যপূর্ণ স্কন্ধাবার নারীর উপযুক্ত স্থান নয়। অবশ্য আমি সঙ্গে থাকিলে বিশেষ ভয় নাই, অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দেখাইয়া স্কন্দের সমীপে পৌঁছিতে পারিব। কিন্তু একটি কথা আছে—'

'কি কথা ?'

'সকল কথা বলার সময় নাই। কিন্তু আমি যে স্কন্দগুপ্তের দূত একথা তাঁহাকে বলা চলিবে না। আমি বিটঙ্ক রাজ্যেরই একজন সেনানী, এই পরিচয় দিলেই হইবে। স্কন্দ আমাকে চেনেন না, সুতরাং কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা নাই।'

'কিন্তু—কেন ?'

'ওকথা এখন জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিব না।'

রট্টা বলিলেন—'আর্য চিত্রক, চিত্রক, আমি সম্পূর্ণ আপনার অধীন। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।'

চিত্রক বলিল—'আমি আপনার দাস। আপনার মঙ্গলের জন্য যাহা কর্তব্য তাহা করিব। স্কন্দগুপ্তের শরণ লওয়াই স্থির?'

'হাঁ।'

চিত্রক উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'তবে উঠুন। অবিলম্বে যাত্রা করিতে হইবে।' দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল—'একটা কথা। আপনি এমনভাবে বস্ত্র পরিধান করুন যাহাতে আপনাকে কিশোরবয়স্ক পুরুষ বলিয়া মনে হয়। ইহা প্রয়োজন।' বলিয়া তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রট্টার মুখে ধীরে ধীরে অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া নূতনভাবে বেশ-প্রসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

চিত্রক বাহিরে আসিয়া দেখিল, পাশেই একটি কক্ষে চৈন ভিক্ষুগণ আশ্রয় লইয়াছেন; জম্বুক তাঁহাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত আছে। চিত্রক তাঁহাদের নিকটে গিয়া বলিল—'জম্বুক, ভিক্ষু মহাশয়কে আমি একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি—মহারাজ স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কি?'

প্রশ্ন শুনিয়া ভিক্ষু বলিলেন—'জানি। স্কন্দগুপ্ত হূণ দলনের জন্য আসিয়াছেন। নিকটেই আছেন।'

চিত্রক: কোথায় আছেন?

ভিক্ষু: এই উপত্যকার পশ্চিমে যে পর্বতশ্রেণী আছে তাহা পার হইলে আর একটি বৃহত্তর উপত্যকা আছে; স্কন্দগুপ্ত তথায় সৈন্য স্থাপন করিয়াছেন।

চিত্রক: একথা আপনি কিরূপে জানিলেন?

ভিক্ষু: চষ্টন দুর্গে শুনিয়াছি। জনৈক সৈনিক মৃগয়ায় গিয়াছিল, সে দেখিয়া আসিয়াছে।

চিত্রক তখন ভিক্ষুকে সাধুবাদ করিয়া জম্বুককে আড়ালে ডাকিয়া আনিল, বলিল—'জম্বুক, আমরা স্থির করিয়াছি স্কন্দগুপ্তের শিবিরে যাইব।'

জম্বুক বলিল—'সে ভাল কথা।'

চিত্রক বলিল—'তোমাকে কপোতকূটে যাইতে হইবে। মন্ত্রী চতুর ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিবে। তারপর তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন।'

'যথা আজ্ঞা।'

'এখন আমাদের অশ্ব আনিতে বল। এই বেলা যাত্রা করিলে সূর্যাস্তের পূর্বে স্কন্দগুপ্তের শিবিরে পৌঁছিতে পারিব।'

জম্বুক অশ্ব আনিতে গেল। চিত্রক ফিরিয়া গিয়া রট্টার দ্বারে করাঘাত করিল। রট্টা দ্বার খুলিয়া নতচক্ষে সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

চিত্রক দেখিল, বেশ পরিবর্তন করিয়া রট্টাকে অন্যরূপ দেখাইতেছে; প্রথম যেদিন সে রট্টাকে দেখিয়াছিল সে দিনের মতই তাঁহাকে সহসা নারী বলিয়া চেনা যায় না, ভস্মের তলে রূপের আগুন চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু মস্তকে শিরস্ত্রাণ নাই, বেণী শোভা পাইতেছে। তাহার কী হইবে?

চিত্রক নিজ কটিবন্ধ খুলিয়া রট্টার মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিয়া দিল; উষ্ণীষের অন্তরালে বেণীবন্ধ ঢাকা পড়িল। চিত্রক বিচারকের দৃষ্টিতে রট্টার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল—'এতক্ষণে ছদ্মবেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। স্কন্দের সম্মুখে না পৌঁছানো পর্যন্ত ছদ্মবেশ আবশ্যক। যুদ্ধক্ষেত্র কিরূপ স্থান তাহা আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি। তাই এই সাবধানতা।'

রট্টার চোখে জল আসিল ; তিনি অবরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'স্ত্রীজাতি বড় জঞ্জাল।'

চিত্রক মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, পুরুষ বড় জঞ্জাল।'

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
গিরিলঙ্ঘন

রট্টা ও চিত্রক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে জম্বুক ছুটিয়া আসিয়া চিত্রকের অশ্বাসনে একটি বস্ত্রের পোট্টলি বাঁধিয়া দিল। চিত্রক প্রশ্ন করিল—'এ কী ?'

জম্বুক বলিল—'কিছু খাদ্য। সঙ্গে থাকা ভাল। হয়তো প্রয়োজন হইবে।'

চিত্রক বলিল—'ভাল। তুমিও আর বিলম্ব করিও না।'

জম্বুক বলিল—'না। কিন্তু আমার অশ্ব নাই, গর্দভপৃষ্ঠে যাইতে হইবে। পৌঁছিতে বিলম্ব হইতে পারে।'

রট্টা জম্বুকের হস্তে একটি স্বর্ণদীনার দিয়া বলিলেন—'তোমার পারিতোষিক। ভিক্ষুদের কথা ভুলিও না।'

জম্বুক স্বর্ণমুদ্রা সসম্ভ্রমে ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিল—'আজ্ঞা, ভিক্ষুদের জন্য গোধূম লইয়া যাইব। সঙ্গে ভৃত্য থাকিবে, সে সংঘে গোধূম পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে। আমি কপোতকূটে চলিয়া যাইব।'

অতঃপর জম্বুকের কর্মকুশলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া উভয়ে পশ্চিমদিকে অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। সম্মুখে উপত্যকা ; তাহার পরপ্রান্তে পাহাড় আছে, কিন্তু এখান হইতে দেখা যায় না। সেই পাহাড় পার হইয়া স্কন্দগুপ্তের স্কন্ধাবারে পৌঁছিতে হইবে।

রট্টা বায়ুকোণ হইতে নৈর্ঋতকোণ পর্যন্ত চক্ষু ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন্ স্থানে যাইতে হইবে ? দিগ্‌দর্শন হইবে কি প্রকারে ?'

চিত্রক বলিল—'ওই যে-স্থানে চিল্ল-শকুন উড়িতেছে উহাই আমাদের গন্তব্য স্থান। উহা লক্ষ্য করিয়া চলিলে স্কন্ধাবারে পৌঁছিব।'

বিস্মিতা রট্টা বলিলেন—'কি করিয়া বুঝিলেন ?'

চিত্রক একটু হাসিয়া বলিল—'অনেক দেখিয়াছি। যুদ্ধের প্রাক্কালে সৈন্য-শিবিরের মাথায় চিল্ল-শকুন উড়ে ; উহারা বোধহয় জানিতে পারে।—আসুন, আর বিলম্ব নয়, আজ দ্রুত অশ্ব চালাইতে হইবে।'

দুইটি অশ্ব নদীর বাম তীররেখা ধরিয়া ছুটিয়া চলিল। রট্টা একবার চক্ষু ফিরাইয়া পান্থশালার পানে চাহিলেন ; তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, চির পরিচিত গৃহ ছাড়িয়া কোন্ অজানা নিরুদ্দেশের পথে চলিয়াছেন।

দ্বিপ্রহরের সূর্য মধ্যাকাশে উঠিয়াছে।

চিত্রক ও রট্টা এক বিশাল শিংশপা বৃক্ষের তলে আসিয়া অশ্ব থামাইলেন। নদীটি এইখানে ঈষৎ বক্র হইয়া নৈর্ঋতকোণে চলিয়া গিয়াছে ; পরপারের ভূমি শিলাবন্ধুর ও উচ্চ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা উপত্যকার পশ্চিমপ্রান্ত বলা যাইতে পারে।

চিত্রক চারিদিক অবলোকন করিয়া বলিল—'এবার নদী পার হইতে হইবে।'

রট্টা বলিলেন— 'নদীর জল যদি গভীর হয় ?'

চিত্রক নদীর অর্ধস্বচ্ছ জলের ভিতর দৃষ্টি প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'না, নদীগর্ভ প্রস্তরময়, স্রোতও মন্দ, সুতরাং অগভীর হইবার সম্ভাবনা। যা হোক, তাহা পরে পরীক্ষা করা যাইবে, আপাতত আহার ও বিশ্রামের প্রয়োজন।'

রট্টা যেন এই প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি অশ্ব হইতে নামিয়া তরুচ্ছায়ার শষ্পাসনে বসিলেন। চিত্রক অশ্ব দুইটিকে বল্‌গা ধরিয়া নদীর তীরে লইয়া গিয়া জলপান করাইল ; তারপর তাহাদের যথেচ্ছ বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া খাদ্যের পোট্টলি লইয়া রট্টার কাছে আসিয়া বসিল।

পোট্টলি খুলিয়া দেখা গেল জম্বুক অনেক খাদ্য দিয়াছে : যবের পিষ্টক ও তণ্ডুলের পৌলিক : কয়েকটি শঙ্খাকৃতি শর্করাকন্দ ; এক কুঞ্চি চণক ও কিছু গুড়। চিত্রক সহাস্যে বলিল—'জম্বুক বিচক্ষণ ব্যক্তি। এত দিয়াছে যে দুই দিনেও ফুরাইবে না।'

পোট্টলি মধ্যস্থলে রাখিয়া উভয়ে তাহা হইতে তুলিয়া তুলিয়া আহার করিতে লাগিলেন। চিত্রক রট্টার প্রতি একটি সকৌতুক কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'খাদ্য কেমন লাগিতেছে ?'

রট্টা অর্ধমুদিত নেত্রে বলিলেন—'বড় মিষ্ট।'

চিত্রক তরবারি দ্বারা শর্করাকন্দ কাটিতে কাটিতে বলিল—'ক্ষুধায় চায় না সুধা। বৈশ্বানর জ্বলিলে তিন্তিড়ীও মিষ্ট লাগে।'

আহার শেষ হইলে চিত্রক পোট্টলি আবার সযত্নে বাঁধিয়া রাখিল। দুইজনে নদীতীরে গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিলেন। তারপর আবার তরুচ্ছায়া তলে আসিয়া বসিলেন। রট্টা তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া অজিনের ন্যায় ঘন শষ্পশয্যায় অর্ধ-শয়ান হইলেন।

চিত্রক জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার কি ক্লান্তি বোধ হইতেছে ?'

'না, আমি প্রস্তুত।' বলিয়া রট্টা উঠিবার উপক্রম করিলেন।

চিত্রক বলিল—'ত্বরা নাই। অশ্ব দু'টির আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম প্রয়োজন।'

অশ্ব দুইটি ইতিমধ্যে শষ্পাহরণ করিতে করিতে নদীতীর হইতে কিছু দূর চলিয়া গিয়াছিল ; অলস নেত্রে তাহাদের একবার দেখিয়া লইয়া চিত্রকও শ্যামল তৃণশয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর রট্টা ধীরে ধীরে যেন আত্মগতভাবে বলিলেন—'পৃথিবীতে যদি যুদ্ধবিগ্রহ স্বার্থপরতা কুটিলতা না থাকিত !'

চিত্রক চক্ষু মুদিত করিয়া একটু হাসিল।

রট্টা বলিলেন—'কেন এই হিংসা ? কেন এত লোভ ? এত কাড়াকাড়ি ? আর্য চিত্রক, আপনি বলিতে পারেন ?'

চিত্রক উঠিয়া বসিল ; কিছুক্ষণ নতনেত্রে চিন্তা করিয়া বলিল—'না। বোধহয় ইহাই মানুষের নিয়তি। মানুষ যাহা চায় তাহা পাইবার অন্য উপায় জানে না বলিয়াই যুদ্ধ করে, হিংসা করে।'

'কিন্তু অন্য উপায় কি নাই ?'

চিত্রক ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল—'জানি না। হয়তো আছে—'

নদীর দিকে চক্ষু তুলিয়া চিত্রক সহসা নীরব হইল। রট্টা তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলেন, নদীর পরপারে প্রায় ত্রিশ দণ্ড দূরে একটি সুন্দর শৃঙ্গধর মৃগ মদগর্বিত পদক্ষেপে আসিতেছে। নদীর কূলে আসিয়া সে জলপান করিল, তারপর নির্ভয়ে নদী উত্তরণ করিয়া এপারে আসিয়া উপস্থিত হইল, নদীর জল তাহার উদর স্পর্শ করিল না। সে বৃক্ষচ্ছায়ায় মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে নাই, প্রত্যাশাও করে নাই। তীরে উঠিয়া সহসা তাহাদের দেখিতে পাইয়া নিমেষমধ্যে অতি দীর্ঘ লম্ফ প্রদানপূর্বক বিদ্যুদ্বেগে পলায়ন করিল।

চিত্রক হাসিয়া উঠিল. পোট্টলি হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল —'চলুন, এবার যাত্রা করি। নদীর গভীরতা সম্বন্ধে প্রশ্নের সমাধা হইয়াছে।'

পশ্চিম দিগ্বলয় সুরঞ্জিত করিয়া সূর্য অস্ত যাইতেছে। চারিদিকে পাহাড় ; দীর্ঘশায়িত অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী, মাঝে মাঝে প্রস্তরের স্কন্ধ উচ্চ হইয়া আছে। পর্বতগাত্রে সর্বত্র বর্বুর ও বন-বদরীর গুল্ম। এই দৃশ্যের মধ্যস্থলে অশ্বারূঢ় চিত্রক ও রট্টা দাঁড়াইয়া।

রট্টা নীরবে চিত্রকের পানে চাহিলেন ; তাঁহার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাঁহাদের পর্বত-লঙ্ঘনের চেষ্টা বহু পথে বিপথে আবর্তিত হইয়া এই কুটিল গিরিসঙ্কটের চক্রে আবদ্ধ হইয়াছে। রাত্রি আসন্ন ; গন্তব্য স্থান এখনও সুদূর পরাহত।

এই সময় দূরাগত দুন্দুভির ডিণ্ডিম শব্দ তাঁহাদের কর্ণে আসিল ; শব্দ নয়, স্থির বায়ুমণ্ডলে একটা অস্পষ্ট স্পন্দন মাত্র। চিত্রক উৎকর্ণ হইয়া শুনিল ; তারপর রট্টার দিকে ফিরিয়া বলিল—'স্কন্ধাবারে সন্ধ্যার ভেরী বাজিতেছে। শুনিলেন ?'

রট্টা বলিলেন—'হাঁ। এখান হইতে কতদূর অনুমান হয় ?'

চিত্রক ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'সিধা আকাশ পথে অন্তত এক যোজন। আজ স্কন্ধাবারে পৌঁছানো অসম্ভব।'

'তবে—?'

চিত্রক চারিদিকে চাহিল।

'এই স্থানেই রাত্রি কাটাইব। এখানে জল আছে।' বলিয়া সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

কিছু দূরে নগ্ন পর্বতগাত্র প্রাচীরের ন্যায় উর্ধ্বে উঠিয়াছে ; তাহার অঙ্গ বহিয়া ক্ষীণ ধারায় জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

'আসুন. আলো থাকিতে থাকিতে রাত্রির জন্য একটা আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া লইতে হইবে।' বলিয়া চিত্রক অশ্ব চালাইল।

গিরি-স্রুত জলধারা যেখানে সঞ্চিত হইয়াছে তাহার চারিপাশে তৃণ জন্মিয়াছে। চিত্রক ও রট্টা অশ্ব দু'টিকে এই স্থানে ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজে এই পর্বতস্কন্ধের পাদমূলে ইতস্তত খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন। অল্প দূরে গিয়া একটি গুহা দেখা গেল। ঠিক গুহা নয়, দুইটি বিশাল পাষাণ খণ্ড পরস্পরের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া অধোদেশে ক্ষুদ্র একটি কোটর রচনা করিয়াছে। পর্বতের তুলনায় কোটর ক্ষুদ্র হইলেও দুইটি মানুষ তাহার মধ্যে স্বচ্ছন্দে রাত্রি যাপন করিতে পারে। রন্ধ্রমুখ ক্ষুদ্র বটে কিন্তু ভিতরে বেশ পরিসর।

গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া রট্টা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন—'এই তো সুন্দর গৃহ পাওয়া গিয়াছে।'

চিত্রক হাসিল—'সুন্দর গৃহই বটে! আদিম যুগের মানব মানবী বোধকরি এমনই গৃহে বাস করিত। যা হোক, মুক্ত আকাশের তলে রাত্রিযাপন অপেক্ষা এ ভাল। আপনি অপেক্ষা করুন।' বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে কম্বলাসন দুইটি লইয়া আসিল, রট্টার পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিল —'আপনি গৃহের সাজসজ্জা করুন, আমি অন্য চেষ্টা করিতেছি।'

দিনের আলো দ্রুত ফুরাইয়া আসিতেছে। চিত্রক ত্বরিতে বর্বুর-গুল্ম ও বদরী বনের মধ্য হইতে শুষ্ক শাখাপত্র কুড়াইয়া আনিয়া গুহার ভিতর জমা করিতে লাগিল। এইরূপে শুষ্ক পত্র ও কাষ্ঠের স্তূপ প্রস্তুত হইলে সে একখণ্ড প্রস্তরের উপর তরবারির লৌহ পুনঃপুনঃ আঘাত করিয়া অগ্নি উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল।

কিছুক্ষণ মন্থনের পর অগ্নি জ্বলিল ; চড়্‌চড়্‌ পট্‌পট্‌ শব্দ করিয়া শুষ্ক শাখাপত্র জ্বলিতে লাগিল।

রট্টা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আর আমাদের অভাব কি ? অগ্নিদেবতাও উপস্থিত !' বলিয়াই তিনি সহসা লজ্জায় রক্তমুখী হইয়া উঠিলেন।

অগ্নির দুই পাশে দুইটি কম্বল পাতিয়া চিত্রক বলিল—'আপনি বসুন, আমি অশ্ব দু'টির ব্যবস্থা করিয়া আসি।'

চিত্রক বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তখন দিবা-দীপ্তি প্রায় নির্বাপিত হইয়াছে।

রট্টা প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, জীবন কী অদ্ভুত, কী ভয়ঙ্কর, কী সুন্দর। এতদিন তিনি কেবল বাঁচিয়া ছিলেন, আজ প্রথম জীবনের স্বাদ পাইলেন।

চিত্রক ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রট্টা মস্তক হইতে উষ্ণীষ মোচন করিয়াছেন। অগ্নিশিখার চঞ্চল আলোকে ছদ্মবেশমুক্ত সুন্দর সুকুমার মুখখানি দেখিয়া চিত্রকের চিত্ত ক্ষণকালের জন্য যেন স্ফুলিঙ্গের মত চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল ; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ মনকে সংহত করিয়া সহজভাবে বলিল—'ঘোড়া দু'টিকে বল্‌গা খুলিয়া ছাড়িয়া দিলাম। এদিকে যদি শ্বাপদ থাকে—সম্ভবত নাই—তাহারা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।'

শ্বাপদ ! এই পার্বত্য বনানীর মধ্যে শ্বাপদ থাকিতে পারে একথা রট্টার মনে আসে নাই।

চিত্রক রট্টার সম্মুখে খাদ্যের পুঁটুলি রাখিয়া বলিল—'এইবার আহার।'

দুইজনে এক কম্বলাসনে বসিয়া আহার আরম্ভ করিলেন। পিষ্টক পৌলিক কিছু অবশিষ্ট ছিল, চিত্রক সেগুলি রট্টাকে দিয়া নিজে শুষ্ক চণক চিবাইতে লাগিল। রট্টা তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন ; কিছু বলিলেন না। তিনিও দুই চারিটি চণক লইয়া মুখে দিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে আহার চলিবার পর চিত্রক বলিল—'আপনার এই দুর্দশার জন্য আমি বড় কুণ্ঠাবোধ করিতেছি।'

রট্টা বলিলেন—'আপনার কুণ্ঠা কেন ? আমি তো স্বেচ্ছায় আসিয়াছি।'

চিত্রক বলিল—'কিন্তু আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম।'

রট্টা দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'অন্যায় প্রস্তাব করেন নাই। এ পর্বত যে এত দুর্গম তাহা আপনি জানিতেন না।'

চিত্রক অগ্নিতে একটি শাখাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'তাহা সত্য। তবু ভয় হয়, আপনি সন্দেহ করিতে পারেন আমার কোনও দুরভিসন্ধি আছে—'

'আর্য চিত্রক !' রট্টার চক্ষু দু'টি দীপ্ত হইয়া উঠিল—'আমার অন্তঃকরণ এত নীচ মনে করিবেন না।'

চিত্রক দীনকণ্ঠে বলিল—'ক্ষমা করুন, রাজকুমারী। কিন্তু আপনার ক্লেশের নিমিত্ত হইয়া আমি প্রাণে শান্তি পাইতেছি না।'

রট্টা তেমনই উদ্দীপ্তস্বরে বলিলেন—'আপনি আমার ক্লেশের নিমিত্ত হন নাই। আর ক্লেশ ! স্ত্রীজাতির কিসে ক্লেশ হয় তাহা আপনি কি বুঝিবেন ?'

চিত্রকের বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। সে আর কথা কহিল না। স্ত্রীলোকের কিসে ক্লেশ হয়—কিসে সুখ হয়, তাহা অধম যুদ্ধজীবী কি করিয়া বুঝিবে ? স্ত্রীজাতির চরিত্র এবং পুরুষদের ভাগ্য দেবতারাও জানেন না, মানুষ কোন্‌ ছার। কিন্তু তবু রট্টা যশোধরা নাম্নী এই যুবতীটির চরিত্র যতই রহস্যময় হোক, তাহা যে অনন্য অনিন্দ্য এবং অনবদ্য তাহাতে চিত্রকের মনে সংশয়মাত্র রহিল না।

আহারের পর দুইজনে গুহার বাহিরে জলাধারে গিয়া জলপান করিলেন। চিত্রক একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড হাতে লইয়া আলো দেখাইল। বাহিরে তখন গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে; কেবল এখানে ওখানে কয়েকটি জ্যোতিরিঙ্গণ নীল নেত্রানল জ্বালিয়া কোন্ অলক্ষ্য বস্তুর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

গুহায় ফিরিয়া আসিয়া চিত্রক অবশিষ্ট কাষ্ঠগুলি অগ্নিতে সমর্পণপূর্বক বলিল—'এইবার শয়ন।'

এক পাশে রট্টা শয়ন করিলেন, অন্য পাশে চিত্রক। মধ্যস্থলে অগ্নিদেবতা জাগ্রত রহিলেন।

শয়ন করিয়া চিত্রক চক্ষু মুদিত করিল। আজিকার এই অপরূপ পরিস্থিতি, রট্টার সহিত এই কোটরে দুই হস্ত ব্যবধানে শয়ন, চিত্রকের স্নায়ুমণ্ডলে আলোড়নের সৃষ্টি করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার চিন্তাগুলি মস্তিষ্কের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্বেই ছায়াবাজির ন্যায় মিলাইয়া যাইতে লাগিল। দুই দিন অশ্বপৃষ্ঠে এবং এক রাত্রি বিনিদ্র চক্ষে যাপন করিয়া তাহার লৌহময় শরীরেও ক্লান্তি প্রবেশ করিয়াছিল। সে অচিরাৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

মধ্য রাত্রির পর চিত্রক জাগিয়া উঠিল। একেবারে পরিপূর্ণ চেতনা লইয়া উঠিয়া বসিল। অগ্নি নিঃশেষ হইয়া নিভিয়া গিয়াছে, চতুর্দিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। তাহার মধ্যে চিত্রক অনুভব করিল, রট্টা আসিয়া তাহার বাহু চাপিয়া ধরিয়াছেন, তাহার কানে কানে বলিতেছেন —'ঐ দেখুন—গুহার দ্বারের দিকে দেখুন—'

গুহামুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া চিত্রক দেখিল, অঙ্গারের ন্যায় রক্তবর্ণ দুইটি চক্ষু তাহাদের পানে তাকাইয়া আছে। অন্ধকারে এই অঙ্গার-চক্ষু জীবের শরীর দেখা যাইতেছে না; মাঝে মাঝে চক্ষুর পলক পড়িতেছে—

চিত্রক জানিত হিংস্র জন্তুর চক্ষু অন্ধকারে রক্তবর্ণ দেখায়; সুতরাং এই জন্তুটা তরক্ষু হইতে পারে, আবার ব্যাঘ্রও হইতে পারে। বোধহয় গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস পাইতেছে না। কিন্তু ক্রমে সাহস পাইবে; রক্তলোলুপতার কাছে ভয় পরাজিত হইবে।

চিত্রকের দেহের পেশীগুলি শক্ত হইয়া উঠিল। রট্টা তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার বাহু জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন; কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'উহা কি ব্যাঘ্র?'

চিত্রক রট্টার কথার উত্তর দিল না। তৎপরিবর্তে তাহার কণ্ঠ হইতে একটি দীর্ঘ-বিকট শব্দ বাহির হইল। শব্দ এত বিকট ও ভয়ঙ্কর যে কোনও হিংস্র জন্তুর কণ্ঠ হইতে এরূপ শব্দ বাহির হয় না; অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত এবং তূর্যনিনাদ মিশাইয়া এইরূপ ঘোর শব্দ সৃষ্টি হইতে পারে।

এই নিনাদ থামিবার পূর্বেই গুহামুখ হইতে রক্তচক্ষু দুইটি সহসা অন্তর্হিত হইল; বাহিরে শুষ্ক পত্রাদির উপর পলায়মান জন্তুর দ্রুত পদধ্বনি ক্ষণেক শুনা গেল। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ।

চিত্রকের মুখ-নিঃসৃত রোমহর্ষণ শব্দ শুনিয়া রট্টার সংজ্ঞা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। চিত্রক এখন তাঁহাকে কোমলস্বরে বলিল—'রাজকুমারি, আর ভয় নাই, জন্তুটা পলাইয়াছে।'

রট্টা মুখ তুলিলেন। অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। রট্টা ক্ষীণস্বরে বলিলেন—'ও কী ভয়ানক শব্দ! আপনি করিলেন?'

চিত্রক বলিল—'হাঁ। উহার নাম সিংহনাদ। যুদ্ধকালে ঐরূপ হুঙ্কার ছাড়িবার প্রথা আছে।'—বলিয়া লঘুকণ্ঠে হাসিল।

রট্টা একটি অতি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অঙ্গুলিগুলি নামিয়া আসিয়া চিত্রকের অঙ্গুলি জড়াইয়া লইল, তাঁহার কপোল চিত্রকের বাহুর উপর ন্যস্ত হইল।

চিত্রক উদ্‌গত হৃদয়াবেগ দমন করিয়া বলিল—'রাজকুমারি—'

অস্ফুটকণ্ঠে রট্টা বলিলেন—'রাজকুমারী নয়, বলো রট্টা।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া চিত্রক কম্পমানকণ্ঠে বলিল—'রট্টা!'

'বলো রট্টা যশোধরা।'

'রট্টা যশোধরা।'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর রট্টা বলিল—'আজ অন্ধকার আমার লজ্জা ঢাকিয়া দিয়াছে তাই বলিতে পারিলাম। আমি তোমার। জন্ম-জন্মান্তরে আমি তোমার ছিলাম, এ জন্মেও তোমার। পরজন্মেও তোমার হইব।'

হৃদয়তন্তু ছিঁড়িয়া চিত্রক বলিল—'রট্টা, তুমি জান না আমি কে! যদি জানিতে—'

রট্টার অন্য হস্তটি আসিয়া চিত্রকের অধর স্পর্শ করিল। সে পূর্ববৎ শান্ত অস্ফুট স্বরে বলিল—'আমি আর কিছু জানিতে চাহি না। তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি বীর, তুমি মানুষ—কিন্তু এ সকল অবান্তর কথা। তুমি আমার, ইহাই আমার কাছে যথেষ্ট।' চিত্রকের স্কন্ধের উপর মাথাটি সুবিন্যস্ত করিয়া বলিল—'এখন আমি ঘুমাইব; আমার চক্ষু ঢুলিয়া আসিতেছে—' অন্ধকারে ক্ষুদ্র একটি জৃম্ভণের শব্দ হইল।

'তুমি কি আজ ঘুমাও নাই?'

'না। তুমি ঘুমাইলে, আমার ঘুম আসিল না। কী অদ্ভুত মানুষ তুমি, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে জাগিয়া রহিলাম। তাই তো ঐ শ্বাপদের চক্ষু দেখিতে পাইলাম।—কিন্তু এখন ঘুমাইব। তুমি কাল রাত্রে যেমন জাগিয়া ছিলে আজও তেমনি জাগিয়া থাক।' একটু হাসির শব্দ হইল; তারপর রট্টা চিত্রকের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইল। তাহার নিশ্বাস ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল।

চিত্রক উদ্বেল হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।

উষার আলোক গুহার রন্ধ্র-মুখ পরিস্ফুট করিলে রট্টার ঘুম ভাঙ্গিল; সে হাসিভরা চোখ তুলিয়া চাহিল। চিত্রকের বিনিদ্র চক্ষু তাহাকে নূতন দিনের অভিবাদন জানাইল।

'রট্টা যশোধরা!'

'আর্য!'

দুইজনের মধ্যে দীর্ঘ গভীর দৃষ্টি বিনিময় হইল। তারপর তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। চিত্রক বলিল—'চল, এখনও অনেক কাজ বাকি।'

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাহির হইল।

জটিল শিলাবন্ধুর পথ; তাহাও কণ্টকগুল্মে আবৃত। কখনও একটি পথ বহুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখা যায় আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই, দুর্ভেদ্য কণ্টকগুল্ম কিম্বা দুরারোহ শৈল-প্রাচীর পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার ফিরিয়া আসিয়া নূতন পথ ধরিতে হয়।

পর্বতশ্রেণীরও যেন শেষ নাই; একটির পর আর একটি। অতি কষ্টে এক পর্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেখা যায় সম্মুখে আর একটি পাহাড়। গন্তব্য স্থানের চিহ্ন নাই।

দ্বিপ্রহর অতীত হইল। অবশেষে বহু আয়াসে কয়েকটি পর্বতপৃষ্ঠ অতিক্রম করিবার পর একটির শীর্ষে উঠিয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। সম্মুখেই উপত্যকা।

উপত্যকাটি সুচিত্রিত পারসিক গালিচার মত তাহাদের নেত্রতলে প্রসারিত হইয়া আছে। আয়তনে অনুমান দশ বর্গ ক্রোশ হইবে। এই সুবিশাল ভূমিখণ্ডের উপর তিল ফেলিবার স্থান নাই। যতদূর দৃষ্টি যায় অগণিত শিবির—বস্ত্রাবাস, তালপত্রের ছত্রাবাস, তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় মানুষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্কন্ধাবারের বাম প্রান্ত বেষ্টন করিয়া অশ্বের আগড়; শ্বেত কৃষ্ণ পিঙ্গল নানা বর্ণের অসংখ্য অশ্ব; কম্বোজ সিন্ধু আরট্ট বনায়ু—নানাজাতীয়

তীক্ষ্ণ-বীর্য রণঅশ্ব। অন্য প্রান্তে স্কন্ধাবারের দক্ষিণ দিকে নিদাঘের মেঘাড়ম্বরবৎ হস্তীর পাল ; মদস্রাবী হস্তীপুঞ্জ গল-ঘণ্টা বাজাইয়া দুলিতেছে, শূন্যে শুণ্ড আস্ফালন করিতেছে, বৃংহিতধ্বনি করিতেছে।

এই বিক্ষুব্ধ সমুদ্র তুল্য সৈন্যাবাস দেখিয়া রট্টার মুখ শুকাইল। চিত্রক তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল `ভয় নাই, আমার কাছে মন্ত্রপূত কবচ আছে।—ঐ যে মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ বৃহৎ পট্টাবাস দেখিতেছ উহাই সম্রাটের শিবির। ঐখানে আমাদের পৌঁছিতে হইবে।'

অতঃপর তাহারা পর্বতগাত্র অবরোহণ করিয়া উপত্যকায় নামিল। কিন্তু এখনও তাহাদের পথের প্রতিবন্ধক শেষ হয় নাই। একদল অশ্বারোহী শিবির-রক্ষী আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ধরিল। কে তোমরা ? কি অভিপ্রায় ?

চিত্রক স্কন্দগুপ্তের অভিজ্ঞান-মুদ্রা দেখাইয়া পরিত্রাণ পাইল। তারপর আরও কয়েকবার রক্ষীরা তাহাদের গতিরোধ করিল ; সাধারণ সৈনিকরা নূতন লোক দেখিয়া রঙ্গ তামাসা করিল। কিন্তু ভাগ্যবলে রট্টাকে নারী বলিয়া চিনিতে পারিল না।

অবশেষে তাহারা স্কন্দগুপ্তের প্রহরী-বেষ্টিত শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইল ; অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া শূলধারী প্রধান দ্বারপালের সম্মুখে দাঁড়াইল।

দ্বারপাল বলিল—'কি চাও ?'

চিত্রক বলিল—'ইনি বিটঙ্ক রাজ্যের রাজদুহিতা কুমারী রট্টা যশোধরা—পরমভট্টারক সম্রাট স্কন্দগুপ্তের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী।' বলিয়া রট্টার মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া লইল। বন্ধনমুক্ত বিসর্পিল বেণী রট্টার পৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
স্কন্ধাবারে

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর স্কন্দগুপ্ত শিবিরের একটি কক্ষে শয্যায় শায়িত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। দুইজন সম্বাহক তাঁহার পদসেবা করিতেছিল, একজন কিঙ্করী চামর ঢুলাইয়া ব্যজন করিতেছিল। ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ ! সেকালে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামের রীতি ছিল ; রাজা হইতে আপামর সাধারণ সকলেই দ্বিপ্রহরে কিয়ৎকালের জন্য রাজবৎ আচরণ করিতেন।

স্কন্দের বস্ত্রাবাসে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ, তন্মধ্যে এইটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এটি মন্ত্রগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত ; সেনাপতি ও অমাত্যগণের সহিত বসিয়া রাজা মন্ত্রণা করিতেন। সিংহাসনাদি কিছুই ছিল না ; ভূমির উপর স্থূল আস্তরণ বিস্তৃত ; তদুপরি রাজার জন্য উচ্চ গদির শয্যা। মন্ত্রণাকালে ইহাই রাজার আসন ; দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের জন্য ইহাই তাঁহার পালঙ্ক।

কিন্তু বিধাতা যাহাকে অসামান্য কর্মভার প্রদান করিয়াছেন তাহার বিশ্রামের সময় কোথায় ? স্কন্দের তন্দ্রা থাকিয়া থাকিয়া বিঘ্নিত হইতেছিল। গুপ্তচর চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া তাঁহার কানে কানে কথা বলিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল। আবার কিছুক্ষণ পরে অন্য গুপ্তচর আসিতেছিল—

এইরূপ অর্ধ তন্দ্রিত অবস্থায় স্কন্দের মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলিতেছিল—হূণ পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে দল বাঁধিতেছে...কোন দিকে যাইবে ? এক—আমাকে আক্রমণ করিতে পারে...তাহা বোধহয় করিবে না। দুই—আমাকে পাশ কাটাইয়া আর্যাবর্তের সমতল ভূমিতে নামিবার চেষ্টা করিতে পারে...তাহা করিতে দিব না। তিন—আমাকে দক্ষিণে রাখিয়া বিটঙ্ক রাজ্যটা অধিকার করিয়া

বসিতে পারে...বিটঙ্ক রাজ্যের রাজাটা হূণ...সম্মুখে শত্রু ভাল, কিন্তু পিছনে শত্রু যদি ঘাঁটি গাড়িয়া বসে...

দুই তিন দণ্ড এইভাবে কাটিবার পর, স্কন্দের তন্দ্রাবেশ দূর হইল ; তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। সম্বাহকদের হস্ত সঞ্চালনে বিদায় করিয়া ডাকিলেন—'পিপুল।'

কক্ষের এক অন্ধকার কোণে বিপুলকায় রাজবয়স্য পিপ্পলী মিশ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথেচ্ছ প্রসারিত করিয়া রাজবৎ আচরণ করিতেছিলেন, স্কন্দের আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়া একটি প্রকাণ্ড জৃম্ভণ ত্যাগ করিলেন। বলিলেন—'বয়স্য, আমি ঘুমাই নাই, চক্ষু মুদিয়া ব্রাহ্মণীর চিন্তা করিতেছিলাম।'

রাজা প্রশ্ন করিলেন—'পিপুল, ব্রাহ্মণীর জন্য কি বড়ই বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছ ?'

'ঠিক বিরহ নয় ; তবু চারিদিক ফাঁক-ফাঁক ঠেকিতেছে।' বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজসমীপে আসিয়া বসিলেন।

যে কিঙ্করী চামর ঢুলাইতেছিল, রাজা তাহাকে বলিলেন—'লহরি, বয়স্যের জন্য তাম্বুল আনয়ন কর।'

· কিঙ্করী চামর রাখিয়া চলিয়া গেল। লহরী নাম্নী এই দাসীটি উত্তীর্ণযৌবনা কিন্তু সুদর্শনা। স্কন্দের যৌবনকাল হইতে সে তাঁহার সেবা করিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। রাজপরিজনের মধ্যে লহরীই একমাত্র নারী ; স্কন্দ তাহার হস্তে আপন গৃহস্থালীর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে তাঁহার পাচিকা সন্নিধাতা তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী দেহরক্ষিণী। যুদ্ধ শিবিরে ছায়ার ন্যায় সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, যক্ষিণীর ন্যায় তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিত। স্কন্দ তাঁহাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিতেন।

পিপ্পলী মিশ্র দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'কবি কালিদাস লিখিয়াছেন—কিং পুনর্দূরসংস্থে ; মেঘ দেখিলে প্রবাসী ব্যক্তির নাকি বড়ই কষ্ট হয়। মেঘ না দেখিয়াই আমার যেরূপ অবস্থা—'

'তোমার কিরূপ অবস্থা ?'

'এত সৈন্যসামন্ত রহিয়াছে, তবু মনে হয় যেন কেহ নাই। বয়স্য, বয়স যতই বাড়িতে থাকে গৃহিণীর অভাবে দশদিক ততই শূন্য মনে হয়। কিন্তু এসকল গূঢ় বৃত্তান্ত তুমি বুঝিবে না। গৃহিণী কী বস্তু তাহা তো ইহজন্মে জানিলে না।'

'গৃহিণী কী বস্তু ?'

পিপ্পলী বলিলেন—'গৃহিণী সচিবঃ সখী প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।'

স্কন্দ বলিলেন—'তোমার অবস্থা দেখিতেছি শঙ্কাজনক ; বারম্বার কালিদাস আবৃত্তি করিতেছ। তোমার যুদ্ধ দেখিবার সাধ হইয়াছিল তাই সঙ্গে আনিয়াছিলাম ; এমন জানিলে তোমার ব্রাহ্মণীকেও সঙ্গে লইয়া আসিতাম।'

'না বয়স্য, এই ভাল। আমার একটু ক্লেশ হইতেছে তাহাতে ক্ষতি নাই। সে যদি আসিত, এত সৈন্য আর হাতি ঘোড়া দেখিয়া ভয়েই মরিয়া যাইত।' পিপ্পলী মিশ্র অতিদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিলেন ; মনে হইল নিশ্বাসটি তাঁহার মূলাধার চক্রে জন্মলাভ করিয়া ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

এই সময় লহরী তাম্বূলকরঙ্ক আনিয়া পিপ্পলী মিশ্রের অগ্রে রাখিল এবং পুনর্বার চামর লইয়া ব্যজন করিতে লাগিল। তাম্বূল পাইয়া ব্রাহ্মণের মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি শস্কুলার সাহায্যে গুবাক কাটিয়া স্বয়ং তাম্বূল রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

স্কন্দ তখন বলিলেন—'পিপুল, এবার হূণের সহিত যুদ্ধ করার নূতন এক পন্থা আবিষ্কার করিয়াছি।'

পিপুল হৃষ্ট হইয়া বলিলেন—'ভাল ভাল। পলাণ্ডুসেবী দুর্গন্ধ ছুছুন্দরগুলাকে ভাল করিয়া

শিক্ষা দাও। কী পন্থা বাহির করিয়াছ ?'

স্কন্দ বলিলেন—'দেখ, হূণেরা ঘোড়ার পিঠে ছাড়া যুদ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু পার্বত্য দেশে ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ ভাল হয় না। তাই স্থির করিয়াছি—'

পিপুল বলিলেন—'বুঝিয়াছি, হস্তী চড়িয়া যুদ্ধ করিবে।'

স্কন্দ বলিলেন—'তুমি একটি হস্তি-মূর্খ। আমি পদাতি দিয়া যুদ্ধ করিব।'

পিপুল অবাক হইয়া বলিলেন—'পদাতি দিয়া ! তবে পাল পাল হাতি আনিয়াছ কেন ?'

স্কন্দ বলিলেন—'হাতিও কাজে লাগিবে। কিন্তু আসল যুদ্ধ করিবে পদাতি।'

'কিন্তু ইহাতে নূতন আবিষ্কার কী আছে ?'

'নূতন আবিষ্কার এই যে, পদাতিদের হাতে দ্বাদশহস্ত পরিমিত দীর্ঘ বংশদণ্ড থাকিবে।'

'অ্যাঁ ! বাঁশ দিয়া হূণ তাড়াইবে ?'

স্কন্দ হাসিলেন—'শুধু বাঁশ নয়, বাঁশের অগ্রভাগে ভল্লের ফলক থাকিবে। বর্তমানে যে ভল্ল ব্যবহৃত হয় তাহার দৈর্ঘ্য মাত্র ছয় হস্ত। কিছু বুঝিলে ?'

পিপ্পলী মিশ্র কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া শেষে মাথা নাড়িলেন—'যুদ্ধবিদ্যায় আমার তেমন পারদর্শিতা নাই। কিন্তু যখন আবিষ্কার করিয়াছ তখন নিশ্চয় কিছু মানে আছে।'

স্কন্দ হতাশ হইয়া নিশ্বাস ফেলিলেন—'কাহাকেই বা বলি !'

এই সময় দ্বারপাল আসিয়া সংবাদ দিল, বিটঙ্ক রাজ্যের রাজকন্যা এক অনুচরসহ আয়ুষ্মানের দর্শন ভিক্ষা করেন।

স্কন্দ ঈষৎ বিস্ময়ে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—'বিটঙ্কের রাজকন্যা। হূণদুহিতা ! লইয়া এস।'

দ্বারপাল চলিয়া গেল। লহরী একটি সূক্ষ্ম মল্লবস্ত্রের উত্তরীয় দিয়া রাজার নগ্ন স্কন্ধ আবৃত করিয়া দিল। পিপুল তাঁহার তাম্বূলকরঙ্ক লইয়া একপাশে সরিয়া বসিলেন।

অনতিকাল পরে রট্টা আসিয়া শিবির দ্বারের অগ্রে দাঁড়াইল, পশ্চাতে চিত্রক। রট্টার হৃদ্‌যন্ত্র দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল ; সে দেখিল কক্ষের মধ্যস্থলে এক পুরুষসিংহ বসিয়া আছেন। রট্টা অনুমান করিয়াছিল ভারতবর্ষের চক্রবর্তী অধীশ্বর স্কন্দ অবশ্য বয়স্থ পুরুষ হইবেন ; কিন্তু স্কন্দের সুগৌর দেহে জরার করাঙ্ক চিহ্নিত হয় নাই। তেজঃপুঞ্জ মুখমণ্ডল হইতে যৌবনের লাবণ্য বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার অনুভাব এত প্রবল যে শিবির-প্রকোষ্ঠে অন্য কেহ আছে তাহা সহসা লক্ষ্য হয় না।

অপরপক্ষে রাজা দেখিলেন, এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা। মনে হইল এক ঝলক বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

রট্টা ত্বরিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইল, পুটাঞ্জলি হইয়া বলিল —'রট্টা যশোধরার প্রণতি গ্রহণ করুন রাজাধিরাজ।' চিত্রকও রট্টার পশ্চাতে থাকিয়া রাজাকে প্রণাম করিল।

স্কন্দ হস্তের ইঙ্গিতে উভয়কে বসিবার অনুমতি দিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন—'রট্টা যশোধরা ! তুমি বিটঙ্করাজের দুহিতা ?'

'হাঁ রাজাধিরাজ।'

'হূণকন্যা ?'

রট্টার গ্রীবা ঈষৎ বক্র হইল। সে বলিল—'হাঁ, আমি হূণকন্যা। কিন্তু সেজন্য আমার লজ্জা নাই। আমার পিতা মহানুভব পুরুষ।'

স্কন্দের অধরে অল্প হাসি দেখা দিল ; তিনি বলিলেন—'তোমাকে লজ্জা দিবার জন্য এ প্রশ্ন

করি নাই। তোমাকে দেখিয়া আর্যকন্যা বলিয়া মনে হয় তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।'

রট্টা বলিল—'আমার মাতা আর্য ছিলেন।'

স্কন্দ বলিলেন—'ভাল, এখন বুঝিলাম। রাজা কি তোমাকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন?'

'না, মহারাজ, আমি নিজ ইচ্ছায় আসিয়াছি।'

স্কন্দের ভ্রূ ঈষৎ উত্থিত হইল; বলিলেন—'তুমি সাহসিনী বটে। এই বিপুল সেনাসমুদ্রে অন্য কোনও নারী প্রবেশ করিতে পারিত না। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?'

রট্টা বলিল—'উপস্থিত এক পান্থশালা হইতে। পর্বত পার হইতে দুই দিন লাগিয়াছে।'

'দুই দিন! রাত্রি কোথায় যাপন করিলে?'

'পর্বতের গুহায়।'

স্কন্দ প্রশ্ন-কুঞ্চিত চক্ষে রট্টার পানে চাহিলেন। রট্টাও নির্ভীক অকপট নেত্রে রাজার পানে চাহিয়া রহিল। রাজার চক্ষু নিমেষের জন্য একবার চিত্রকের মুখের উপর গিয়া ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন—'ভাল কথা, তুমি কুমারী না বিবাহিতা?'

রট্টা বলিল—'আমি কুমারী।' চিত্রকের দিকে নির্দেশ করিয়া বলিল—'ইনি চিত্রক বর্মা, বিটঙ্ক রাজ্যের এক সেনানী।'

চিত্রক আবার জোড়হস্তে প্রণাম করিল। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় সে পূর্বেই কটিদেশে লুকাইয়াছিল।

স্কন্দ বলিলেন—'তোমরা অবশ্য কোনও প্রয়োজনে আমার নিকট আসিয়াছ। কিন্তু পর্বত লঙ্ঘন করিয়া তোমরা ক্লান্ত; আজ বিশ্রাম কর, কাল তোমাদের কথা শুনিব।'

রট্টা বলিল—'দেব, গুরুতর রাজকার্যে আপনার নিকট আসিয়াছি; অগ্রে আমার বক্তব্য নিবেদন করিব, তারপর বিশ্রাম।'

স্কন্দ বলিলেন—'ভাল। কিন্তু তৎপূর্বে একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি। বিটঙ্করাজার নিকট পত্র দিয়া আমি এক দূত পাঠাইয়াছিলাম। সে দূত কি পৌঁছে নাই?'

পিপ্পলী অদূরে বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন, জনান্তিকে বলিলেন—'শশিশেখর—আমার ব্রাহ্মণীর ভ্রাতুষ্পুত্র।'

রট্টা একবার চিত্রকের দিকে কটাক্ষ করিল; চিত্রক বলিল—'দূতের কথা জানি না আয়ুষ্মন্, কিন্তু রাজকীয় পত্র পৌঁছিয়াছে।'

স্কন্দ বলিলেন—'তবে পত্রের উত্তর আমি পাই নাই কেন?'

রট্টা বলিল—'মহারাজ, আমার বক্তব্য শুনিলেই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।'

স্কন্দ শিরঃসঞ্চালনে সম্মতি দিলেন। রট্টা তখন চষ্টন দুর্গ ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিল; কেবল চিত্রকের দূত-পরিচয় গোপন রাখিল। রাজা মনোযোগের সহিত শুনিলেন। বৃত্তান্ত শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই কিরাত কি হূণ?'

রট্টা বলিল—'হাঁ মহারাজ, আমারই মতন।'

স্কন্দ সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া বলিলেন—'তোমার মতন অল্পই আছে। তোমার ন্যায় পিতৃভক্তি কর্তব্যনিষ্ঠা সাহস অতি বিরল। কিরাতের দোষ নাই; রূপে ও গুণে তুমি সকল পুরুষের লোভনীয়।' বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

রট্টা নতমুখে রহিল। স্কন্দ তখন বলিলেন—'আমি তোমার পিতাকে উদ্ধার করিব। আমার নিজেরও স্বার্থ আছে।' লহরীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'লহরি, গুলিক বর্মাকে ডাকিয়া পাঠাও।'

লহরী এতক্ষণ একাগ্রমনে বাক্যালাপ শুনিতেছিল এবং স্কন্দের মুখভাব নিরীক্ষণ করিতেছিল।

সে চামর রাখিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

গুলিক বর্মা একজন কনিষ্ঠ সেনানায়ক এবং স্কন্দের পার্শ্বচর; ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ মূর্তি; ধূমকেতুর ন্যায় গোঁফ। সে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে স্কন্দ প্রশ্ন করিলেন—'গুলিক, চষ্টন দুর্গ কোথায় জানো?'

গুলিক বলিল—'জানি আয়ুষ্মন্। চষ্টন দুর্গ বিটঙ্ক রাজ্যের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত। এখান হইতে প্রায় বিংশ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।'

স্কন্দ বলিলেন—'শোনো। চষ্টন দুর্গের দুর্গাধিপ কিরাত বিটঙ্করাজকে ছলে নিজ দুর্গে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি একশত অশ্বারোহী লইয়া কল্য প্রত্যূষে যাত্রা করিবে। বিটঙ্ক রাজ্যের এই সেনানী চিত্রক বর্মা তোমার সঙ্গে যাইবেন। তুমি দুর্গাধিপ কিরাতকে আমার নাম করিয়া বলিবে যেন তদ্দণ্ডেই বিটঙ্করাজকে তোমার হস্তে সমর্পণ করে। অতঃপর রাজাকে লইয়া তুমি অবিলম্বে ফিরিয়া আসিবে।'

গুলিক বলিল—'যথা আজ্ঞা। যদি কিরাত রাজাকে সমর্পণ করিতে সম্মত না হয়?'

'তাহাকে বলিও—আদেশ উপেক্ষা করিলে সহস্র রণহস্তী লইয়া আমি স্বয়ং গিয়া তাহার দুর্গ সমভূমি করিব।'

'আজ্ঞা। যদি তাহাতেও ভয় না পায়?'

'তখন আমার কাছে দূত পাঠাইবে। উপস্থিত চিত্রক বর্মাকে তোমার শিবিরে লইয়া যাও, উত্তমরূপে অতিথি সৎকার কর।'

চিত্রক একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু স্কন্দের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সে রট্টার প্রতি একবার পশ্চাদ্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গুলিক বর্মার সহিত প্রস্থান করিল।

চিত্রককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রট্টার মনে ঈষৎ শঙ্কার উদয় হইল। কিন্তু সে তাহা দমনপূর্বক অল্প হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আর আমি? আমি কি চষ্টন দুর্গে যাইব না?'

স্কন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'না। তুমি আমার শিবিরে থাকিবে। তুমি রাজকন্যা; অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আমার কাছে আসিয়াছ। আবার তোমাকে বিপদের মুখে পাঠাইব না।'

রট্টা বলিল—'দেব, আপনার অসীম করুণা। কিন্তু—'

স্কন্দ বলিলেন—'রট্টা যশোধরা, ভয় করিও না। তুমি তোমার পিতার প্রাসাদে যেরূপ নিরাপদ থাকিতে আমার শিবিরে তদপেক্ষা অধিক নিরাপদে থাকিবে।—লহরি, রাজকন্যাকে লইয়া যাও। উনি পথশ্রান্ত; তোমার উপর মাননীয়া অতিথির পরিচর্যার ভার রহিল।'

ইহার পর রট্টার মুখে আর আপত্তির কথা যোগাইল না। লহরী তাহার পাশে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল—'আসুন, কুমার-ভট্টারিকা।'

লহরী রট্টাকে লইয়া প্রস্থান করিলে পিপ্পলী মিশ্র জানু সাহায্যে রাজার পাশে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার কানে কানে বলিলেন—'বয়স্য, কেমন দেখিলে?'

স্কন্দ মৃদুহাস্যে বলিলেন—'অপূর্ব।'

পিপ্পলী বলিলেন—'তবে আর বিলম্ব করিও না। যদি গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিতে চাও, এই সুযোগ। গৃহিণী সচিব সখী—এমনটি আর পাইবে না।'

স্কন্দ স্মিতমুখে নীরব রহিলেন।

নৈশ ভোজনের পর রাত্রি প্রথম প্রহরে চিত্রক রট্টার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। প্রত্যূষে যাত্রা করিতে হইবে।

কক্ষে আর কেহ ছিল না; দীপদণ্ডে স্নিগ্ধজ্যোতি বর্তিকা জ্বলিতেছিল। রট্টা আসিয়া চিত্রকের

হাত ধরিয়া দাঁড়াইল, বলিল -'আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পাইলাম না।'

নিম্নস্বরে কথা হইতে লাগিল। চিত্রক বলিল—'এই ভাল। এখানে তুমি নিরাপদে থাকিবে।'

রট্টা বলিল—'তুমি কাছে না থাকিলে আমার আর নিরাপদ মনে হয় না।'

চিত্রক রট্টার স্কন্ধের উপর হাত রাখিল—'রট্টা, লক্ষ্য করিয়াছ কি, স্কন্দ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।'

চিত্রকের মুখের কাছে মুখ আনিয়া রট্টা বলিল—'লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে ভালই হইবে।'

'সে তুমি জানো।' চিত্রক রট্টার স্কন্ধ হইতে হাত নামাইয়া লইল।

রট্টা বলিল—'হাঁ, আমি জানি। আমার মন আমি জানি।'

'তবে আজ চলিলাম। আবার কবে দেখা হইবে, দেখা হইবে কিনা জানি না।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আবার শীঘ্রই দেখা হইবে।'

চিত্রকের মনে কিন্তু কাঁটা ফুটিয়া রহিল। চতুঃসাগরা পৃথ্বীর একচ্ছত্র অধীশ্বর, তাঁহার একমাত্র মহিষী—এই প্রলোভন কোন্ নারী ছাড়িতে পারে ? কিন্তু সে মুখে কিছু প্রকাশ করিল না ; আরও দুই চারিটি কথার পর রট্টার নিকট বিদায় লইল। মনে মনে ভাবিল, এই বুঝি শেষ সাক্ষাৎ।

অতঃপর রট্টা শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। কিয়ৎকাল শূন্যে চক্ষু মেলিয়া থাকিবার পর দেখিল, দাসী লহরী নিঃশব্দে পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লহরী মৃদুকণ্ঠে বলিল—'দেবি, আপনার পদ-সম্বাহন করিয়া দিই ?'

রট্টা স্মিতমুখে বলিল—'তুমি অনেক সেবা করিয়াছ। আর প্রয়োজন নাই।'

লহরী বলিল—'সে কি কথা। আমি পদসেবা করি, আপনি ঘুমান। আপনি ঘুমাইলে আমিও আপনার পদতলে ঘুমাইব।'

রট্টা বুঝিল, এই কক্ষটি এবং এই শয্যা লহরীর ; যে বস্ত্র রট্টা পরিধান করিয়াছে তাহাও লহরীর। সৈন্য শিবিরে অন্য নারী-বস্ত্র কোথা হইতে আসিবে ? রট্টা আর আপত্তি করিল না ; লহরী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল , তারপর রট্টা বলিল—'শিবিরে অন্য নারী কি নাই ?'

'না দেবি।'

'তোমার নাম লহরী ? তুমি কতদিন রাজ-সংসারে আছ ?'

'দশ বৎসর বয়সে কুমার স্কন্দের তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী হইয়া রাজ-সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলাম ; সে আজ বিশ বছরের কথা। সেই অবধি আছি।'

'যুদ্ধক্ষেত্রেও তোমাকে আসিতে হয় ?'

'আমি না থাকিলে কুমার স্কন্দের সেবা হয় না। তিনি সেবা লইতে জানেন না। ভৃত্যেরা অবহেলা করে। তাই আমাকে আসিতে হয়।'

'তুমি এখনও রাজাকে স্কন্দ বলো ?'

'হাঁ দেবি। পুরাতন অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই।'

'তুমি বিবাহিতা ?'

'না দেবি।'

'বিবাহ কর নাই কেন ?'

'আমি বিবাহ করিলে কুমার স্কন্দের সেবা করিবে কে ?'

রট্টা কিছুক্ষণ লহরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। স্কন্দের প্রতি এই দাসীর মনের ভাব

কিরূপ ? দাস্যভাব ? বাৎসল্য ? সখ্য ? প্রেম ? হয়তো সব ভাব মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

রট্টা প্রশ্ন করিল—'মহারাজ বিবাহ করেন নাই কেন ?'

লহরী বলিল—'যুদ্ধ করিয়াই জীবন কাটিয়া গেল, বিবাহ করিবেন কখন ? তাছাড়া, কোন্ জ্যোতিষী নাকি বলিয়াছিল তিনি চিরকুমার থাকিবেন।'

'ইহাই বিবাহ না করার কারণ ?'

লহরী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—'কুমার স্কন্দের ভোগে রুচি নাই। মনের মধ্যে তিনি বড় একাকী ! কখনও মনের সঙ্গিনী পান নাই। পাইলে হয়তো বিবাহ করিতেন।'

রট্টা বলিল—'বিবাহ করিলে হয়তো মনের সঙ্গিনী পাইতেন। কিন্তু এখন উপায় নাই।'

'উপায় নাই কেন ?'

'এখন কি তিনি আর বিবাহ করিবেন ?'

'তাঁহার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হয় নাই। অন্তরে বাহিরে তিনি যুবাপুরুষ। উপযুক্ত সঙ্গিনী পাইলে কেন বিবাহ করিবেন না ?'

'তা বটে।'

আর কোনও কথা হইল না। ক্রমে রট্টা ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রে কিন্তু ভাল নিদ্রা হইল না ; বারবার কোন নিভৃত উৎকণ্ঠার পীড়নে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

শিবিরের আর একটি কক্ষে স্কন্দ শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারও আজ ভাল নিদ্রা হইল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ
রমণীর মন

স্কন্ধাবার তখনও জাগে নাই ; পূর্বদিকের পর্বতরেখা আকাশের গায় পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। চিত্রক ও গুলিক বর্মা একশত সশস্ত্র অশ্বারোহী লইয়া যাত্রা করিল। চতুর্দিকের সুবিপুল নিস্তব্ধতার মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি ও অস্ত্রের ঝনৎকার অতি ক্ষীণ শুনাইল।

স্কন্দের অধিকৃত এই উপত্যকা হইতে নির্গমনের একটি পথ উত্তর দিকে, দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যস্থলে প্রণালীর ন্যায় সঙ্কীর্ণ সঙ্কট-পথ। এই সঙ্কট প্রায় দুই ক্রোশ দূর পর্যন্ত এক সহস্র সতর্ক প্রহরী দ্বারা রক্ষিত। পাছে শত্রু অতর্কিতে স্কন্ধাবার আক্রমণ করে তাই দিবারাত্র প্রহরার ব্যবস্থা। গুলিক বর্মা ও চিত্রক এই সঙ্কটমার্গ দিয়া চলিল। প্রহরীরা সংবাদ জানিত, তাহারা নিঃশব্দে পথ ছাড়িয়া দিল। ক্রমে সূর্য উঠিল, বেলা বাড়িতে লাগিল। সঙ্কট কখনও প্রশস্ত হইতেছে, আবার শীর্ণ হইতেছে ; কদাচ বক্র হইয়া অন্য উপত্যকায় মিশিতেছে। মাঝে মাঝে স্কন্দের গুপ্তচরেরা প্রচ্ছন্ন গুল্ম রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে ; তাহাদের নিকট পথের সন্ধান জানিয়া লইয়া গুলিক বর্মার দল অগ্রসর হইল।

গুলিক ও চিত্রকের অশ্ব অগ্রে চলিয়াছে ; পশ্চাতে শত যোদ্ধা। গুলিক স্বভাবত একটু বহুভাষী, এক রাত্রির পরিচয়ে চিত্রকের প্রতি তাহার সদ্ভাব জন্মিয়াছে ; দু'জনেই সমপদস্থ সমবয়স্ক এবং যুদ্ধজীবী ! গুলিক নানাবিধ প্রগল্ভ জল্পনা করিতে করিতে যাইতেছে ; কোন্ রাজ্যের যোদ্ধারা কেমন যুদ্ধ করে, কোন্ দেশের যুবতীদের কিরূপ প্রণয়রীতি, আপন অভিজ্ঞতা হইতে এই সকল কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে ধূমকেতুর ন্যায় গুম্ফ আমর্শন করিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে চলিয়াছে। গুলিকের সরল চিত্তে যুদ্ধ ও যুবতী ভিন্ন অন্য কোনও চিন্তার স্থান নাই।

চিত্রক গুলিকের কথা শুনিতেছে, তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া উচ্চ হাস্য করিতেছে, কদাচিৎ নিজেও দুই একটি সরস কাহিনী শুনাইতেছে। কিন্তু তাহার হৃদয়ের মর্মস্থলে একটি ভাবনা লূতা-কীটের ন্যায় নিভৃতে জাল বুনিতেছে। রট্টা...মন বলিতেছে রট্টা আর তাহার হইবে না। বিদ্যুৎ শিখার মত অকস্মাৎ সে তাহার অন্তরে আসিয়াছিল, আবার বিদ্যুৎ শিখার মতই অন্তর্হিত হইল, শুধু তাহার শূন্য অন্তর্লোকের অন্ধকার বাড়াইয়া দিয়া গেল। কাল রাত্রে সে বলিয়াছিল—ইহাতে ভালই হইবে। স্কন্দগুপ্ত রট্টার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, ইহাতে ভালই হইবে।...কাহার ভাল হইবে ?

কিন্তু রট্টার দোষ নাই। নব-যৌবনের স্বভাববশে সে চিত্রকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল ; দুই দিনের নিত্য-সাহচর্য প্রীতির সৃজন করিয়াছিল...রাত্রে গুহার অন্ধকারে ভয়ব্যাকুল চিত্তে রট্টা যে-কথা বলিয়াছিল, যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তাহার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা যায় না : ক্ষণিকের আবেগ-বিহ্বলতাকে স্থায়ী মনোভাব মনে করা অন্যায়। রমণীর মন কোমল ও তরল—অল্প তাপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই সময় চিত্রক গুলিকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল ; গুলিক একটি গল্প শেষ করিয়া বলিতেছে—'বন্ধু চিত্রক বর্মা, নারী যতক্ষণ তোমার বাহুমধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তোমার, বাহুমুক্ত হইলে আর কেহ নয়। অনেক দেশের অনেক নারী দেখিলাম ; সকলে সমান, কোনও প্রভেদ নাই।'

চিত্রক হাসিয়া বলিল—'আমারও তাহাই অভিজ্ঞতা।'

গুলিক আবার নূতন কাহিনী আরম্ভ করিল।

না, চিত্রক রট্টাকে মন্দ ভাবিবে না। রট্টা রাজকন্যা ; স্কন্দকে দেখিয়া সে যদি মনে মনে তাঁহার অনুরাগিণী হইয়া থাকে ইহাতে বিচিত্র কি ? স্কন্দের অনুরাগের যোগ্য পাত্র আর্যাবর্তে আর কে আছে ?...ইহাতে ভালই হইবে।—মণিকাঞ্চন যোগ হইবে। ...

জল নিম্নে অবতরণ করে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ঊর্ধ্বে উচ্ছ্রিত হয়। রট্টা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ; এত রূপ এত গুণ কি সাধারণ মানুষের ভোগ্য হইতে পারে ?

কিন্তু—

চিত্রকের এখন কী হইবে ? সাতদিনের মধ্যে তাহার জীবন সম্পূর্ণ ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। সাতদিন আগে সে যে-মানুষ ছিল, এখন আর সে-মানুষ নাই। সে রাজপুত্র ; কিন্তু নিঃস্ব অজ্ঞাত রাজপুত্র ; যতদিন সে নিজেকে সামান্য সৈনিক বলিয়া জানিত ততদিন তাহার চরিত্র অন্যরূপ ছিল...আর কি সে সামান্য সৈনিক সাজিয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে ? তবে তাহার কী দশা হইবে ? কী লইয়া সে জীবন কাটাইবে ? লক্ষ্যহীন নিরালম্ব জীবন...যে আশাতীত আকাঙ্ক্ষার বস্তু অনাহূত তাহার হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রবলতর স্রোতের টানে সে দূরে ভাসিয়া যাইতেছে—

এখন সে কী করিবে ? তাহার জীবনে আর কিছু অবশিষ্ট আছে কি ?

গুলিক বর্মার হাস্য-কণ্টকিত কণ্ঠস্বর চিত্রকের কর্ণে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গুলিক বলিতেছে—'তিন বৎসর পরে সেই শত্রুর সাক্ষাৎ পাইলাম। বন্ধু, ভাবিয়া দেখ, পুরাতন শত্রুকে তরবারির অগ্রে পাওয়ার সমান আনন্দ আর আছে কি ?'

চিত্রক বলিল—'না, এমন আনন্দ আর নাই।'

গুলিক বলিল—'সেদিন শত্রুর রক্তে তরবারির তর্পণ করিয়াছিলাম, সেকথা স্মরণ করিলে আজিও আমার হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল হয়। ইহার তুলনায় রমণীর আলিঙ্গনও তুচ্ছ।'

চিত্রকের মনে পড়িয়া গেল যে পুরাতন শত্রুর উপর প্রতিহিংসা সাধন—এই কার্যটি বাকি

আছে। যে তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল তাহাকে বধ করিয়া ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালন এখনও বাকি আছে। নিয়তি কুটিল পথে তাহাকে সেইদিকেই লইয়া যাইতেছে। রোট্ট ধর্মাদিত্যকে হত্যা করিয়া সে পিতৃঋণ মুক্ত হইবে।

তারপর ? তারপর কি হইবে ভাবিবার প্রয়োজন নাই। সকল পথের শেষেই তো মৃত্যু।

চিত্রক চষ্টন দুর্গের অভিমুখে চলুক, আমরা স্কন্দের শিবিরে ফিরিয়া যাই।

৮

প্রাতঃকালে স্কন্দ বহিঃকক্ষে আসিয়া বসিলে পিপ্পলী মিশ্র তাঁহাকে স্বস্তিবাচন করিয়া বলিলেন—'বয়স্য, কাল রাত্রে বড় বিপদ গিয়াছে।'

স্কন্দ অন্যমনস্ক ছিলেন ; বলিলেন—'বিপদ !'

পিপ্পলী বলিলেন—'শত্রু আমাদের সন্ধান পাইয়াছে। বয়স্য, এ স্থান আর নিরাপদ নয়।'

স্কন্দ তাঁহার বয়স্যকে চিনিতেন, তাই উদ্বিগ্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাল রাত্রে কি ঘটিয়াছিল ?'

পিপ্পলী বলিলেন—'কাল পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, মধ্যরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অনুভব করিলাম, মেরুদণ্ডের অধোভাগে কি কিলবিল করিতেছে। ভারি আনন্দ হইল ; বুঝিলাম কুলকুণ্ডলিনী জাগিতেছেন। জপতপ ধ্যানধারণা অধিক করি না বটে কিন্তু গোত্রফল কোথায় যাইবে ? অতঃপর সহসা অনুভব করিলাম, কুণ্ডলিনী আমাকে দংশন করিতেছে—দারুণ জ্বালা। দ্রুত উঠিয়া অনুসন্ধান করিলাম। কি বলিব, বয়স্য, কুণ্ডলিনী নয়—পরম-ঘোর কাষ্ঠ-পিপীলিকা। তদবধি আর ঘুমাইতে পারি নাই।'

স্কন্দ ঈষৎ বিমনাভাবে বলিলেন—'কাল আমিও ঘুমাইতে পারি নাই।'

পিপ্পলী বলিলেন—'অ্যাঁ ? তোমারও কাষ্ঠ-পিপীলিকা ?'

স্কন্দ উত্তর দিলেন না, মনে মনে বলিলেন—'প্রায়।'

এই সময় মহাবলাধিকৃত ও কয়েকজন সেনাপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। শত্রুপক্ষ সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা তর্কবিচার চলিল। পরিশেষে স্থির হইল, শত্রুর অভিপ্রায় যতক্ষণ না স্পষ্ট হইতেছে ততক্ষণ তাহাদের আক্রমণ করা হইবে না ; শত্রু যদি আক্রমণ করে তখন তাহাদের প্রতিরোধ করা হইবে। বর্তমানে স্কন্দের স্কন্ধাবার এই উপত্যকাতেই থাকিবে, স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। এখান হইতে, শত্রু যে-পথেই যাক তাহার উপর দৃষ্টি রাখা চলিবে।

মন্ত্রণা সমাপ্ত হইতে দ্বিপ্রহর হইল। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া স্কন্দ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। লহরী আজ রট্টার সেবায় নিযুক্ত ছিল, একজন ভৃত্য স্কন্দকে ব্যজন করিল।

বিশ্রামান্তে স্কন্দ গাত্রোত্থান করিলে লহরী আসিয়া বলিল—'কুমার-ভট্টারিকা রট্টা যশোধরা আসিতেছেন।'

রট্টা আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। সর্বাঙ্গে স্বর্ণভূষা ঝলমল করিতেছে, পরিধানে জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ চীনপট্ট ; সীমন্তে মুক্তাফলের ললাম। লহরী অতি যত্নে কবরী বাঁধিয়া দিয়াছে। রাজা মুগ্ধ বিস্ফারিত নেত্রে এই কন্দর্প-বিজয়িনী মূর্তির পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেকের জন্য নিজ অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন ; ভাবিলেন, জীবন ভঙ্গুর, সুখ চঞ্চল ; সারা জীবন যাহা খুঁজিয়া পাই নাই, তাহা যখন আপনি কাছে আসিয়াছে তখন আর বিলম্ব করিব না—

রট্টা রাজাকে প্রণাম করিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—'দেব, এই সকল উপহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিব কি, বিস্ময়ে আমি হতবাক্‌ হইয়াছি। আপনি কি ইন্দ্রজাল জানেন ? নারী-বর্জিত সৈন্য-শিবিরে এই সকল অপূর্ব নূতন বস্ত্র অলঙ্কার কোথায় পাইলেন ?'

স্মিতহাস্য করিয়া স্কন্দ বলিলেন—'সুচরিতে, চেষ্টা এবং পুরুষকার দ্বারা অপ্রাপ্য বস্তুও লাভ করা যায়।'

রট্টা নম্রকণ্ঠে বলিল—'তাহাই হইবে। আমি নারী, পুরুষকারের শক্তি কি করিয়া বুঝিব ? প্রার্থনা করি আপনার সর্বজয়ী পুরুষকার চিরদিন অক্ষয় থাকুক। উপহারের জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন আর্য।'

স্কন্দ বলিলেন—'ধন্যবাদের প্রয়োজন নাই। তোমাকে উপহার দিয়া এবং সেই উপহার তোমার অঙ্গে শোভিত দেখিয়া আমি তোমার অপেক্ষা অধিক আনন্দ উপভোগ করিতেছি।'

স্কন্দের প্রশংসাদীপ্ত নেত্রতলে রট্টা সলজ্জ নতমুখে রহিল। স্কন্দ তখন বলিলেন—'যুদ্ধের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন আছি, তোমার চিত্তবিনোদনের কোনও চেষ্টাই করিতে পারি নাই। এই সৈন্য-শিবিরে একাকিনী থাকিয়া তোমার মন নিশ্চয় উচাটন হইয়াছে, এস পাশা খেলি। খেলিবে ?'

স্মিতমুখ তুলিয়া রট্টা বলিল—'খেলিব মহারাজ।'

স্কন্দের আদেশে লহরী পাশাক্রীড়ার অক্ষবাট প্রভৃতি আনিয়া পাতিয়া দিল। রট্টা ও স্কন্দ অক্ষবাটের দুইদিকে বসিলেন।

রাজা পাশাগুলি দুই হস্তে ঘষিতে ঘষিতে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'কি পণ রাখিবে ?'

রট্টা দীনভাবে বলিল—'আমার তো এমন কিছুই নাই মহারাজ, যাহা আপনার সম্মুখে পণ রাখিতে পারি।'

স্কন্দ প্রীতকণ্ঠে বলিলেন—'উত্তম, পণ এখন উহ্য থাক। যদি জয়ী হই তখন দাবি করিব।'

রট্টা বলিল—'কিন্তু আর্য, যে পণ আমার সাধ্যাতীত তাহা যদি আপনি আদেশ করেন, কী করিয়া দিব ? পণ দিতে না পারিলে আমার যে কলঙ্ক হইবে।'

স্কন্দ বলিলেন—'তোমার সাধ্যাতীত পণ চাহিব না—তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

'ভাল মহারাজ।—আপনি কি পণ রাখিবেন ?'

'তুমি কি পণ চাও ?'

রট্টা বলিল—'যদি বলি দণ্ড-মুকুট—ছত্র-সিংহাসন ? মহারাজ, পণ রাখিবেন কি ?'

অনুরাগপূর্ণ চক্ষে রট্টার দিকে অবনত হইয়া স্কন্দ গাঢ়স্বরে বলিলেন—'এই পণ কি তুমি সত্যই চাও ?'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া রট্টা ধীরস্বরে বলিল—'আপনার পণও এখন উহ্য থাক, যদি জিতিতে পারি তখন চাহিয়া লইব।'

'ভাল।' বলিয়া স্কন্দ রুদ্ধশ্বাস মোচন করিলেন।

অতঃপর অক্ষক্রীড়া আরম্ভ হইল। মহারাজ স্কন্দগুপ্ত নবযুবকের ন্যায় উৎসাহ ও উত্তেজনা লইয়া নানা প্রকার রঙ্গ পরিহাস করিতে করিতে খেলিতে লাগিলেন। রট্টাও হাস্যকৌতুকে যোগ দিয়া পরম আনন্দে খেলিতে লাগিল। উভয়ে খেলায় মগ্ন হইয়া গেলেন।

এতক্ষণ লহরী ও পিপ্পলী মিশ্র এই কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। পিপ্পলী অদূরে বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন ; কিছুক্ষণ খেলা চলিবার পর মুখ তুলিয়া দেখিলেন, লহরী তাঁহাকে চোখের ইঙ্গিত করিতেছে। পিপ্পলী মিশ্র ইঙ্গিত বুঝিলেন। তারপর লহরী যখন লঘুপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন পিপ্পলীও নিঃশব্দে পা টিপিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রট্টা ও স্কন্দ ভিন্ন কক্ষে আর কেহ রহিল না। তাঁহারাও খেলায় এমনই নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাহাদের অলক্ষ্য অন্তর্ধান জানিতে পারিলেন না।

প্রায় তিন ঘটিকা মহা উৎসাহে খেলা চলিবার পর বাজি শেষ হইল। পরমভট্টারক

শ্রীমন্মহারাজ স্কন্দ পরাজিত হইলেন।

রট্টা করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। স্কন্দ বলিলেন—'রট্টা যশোধরা, আমি তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। এখন কী পণ লইবে লও। দণ্ড-মুকুট ছত্র-সিংহাসন সমস্তই লইতে পার।'

রট্টা বলিল—'না মহারাজ, অত স্পর্ধা আমার নাই। আমার ক্ষুদ্র পণ যথাসময় যাচনা করিব।'

স্কন্দ কিয়ৎকাল রট্টার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—'ভাবিয়াছিলাম পাশার বাজিতে তোমার নিকট হইতে এক অমূল্য বস্তু জিতিয়া লইব। কিন্তু তাহা হইল না। এখন নিতান্ত দীনভাবে তোমার নিকট ভিক্ষা চাওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। তুমি ভিক্ষা দিবে কি ?'

স্কন্দ যে-কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা রট্টার অপ্রত্যাশিত নয় ; তবু তাহার হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—'আদেশ করুন আর্য।'

স্কন্দ বলিলেন—'আমার বয়স পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু আমি বিবাহ করি নাই। বিবাহের প্রয়োজন কোনও দিন অনুভব করি নাই। এইরূপ নিঃসঙ্গভাবেই জীবন কাটিয়া যাইবে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া, তোমার পরিচয় পাইয়া তোমাকে জীবনসঙ্গিনী করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।'

স্কন্দ এইটুকু বলিয়া নীরব হইলেন। রট্টাও দীর্ঘকাল নতমুখে নির্বাক রহিল। তারপর অতি কষ্টে স্খলিত বাক্ সংযত করিয়া বলিল—'দেব, আমি এ সৌভাগ্যের যোগ্য নই। আমাকে ক্ষমা করুন।'

স্কন্দের চোখে ব্যথাবিদ্ধ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল—'তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ ?'

সজল চক্ষু তুলিয়া রট্টা বলিল—'মহারাজ, আপনি অসীম শক্তিধর, সমুদ্রমেখলা আর্যভূমির অধীশ্বর ; কেবল এই তুচ্ছ নারীদেহ লইয়া সন্তুষ্ট হইবেন ?'

তীক্ষ্ণচক্ষে রট্টার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্কন্দ বলিলেন—'না, তোমার দেহ-মন দুই-ই আমার কাম্য। যদি হৃদয় না পাই, দেহে আমার প্রয়োজন নাই। এই বয়সে প্রাণশূন্য নারীদেহ বহন করিয়া বেড়াইতে পারিব না।'

গলদশ্রুনেত্রা রট্টা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল—'রাজাধিরাজ, তবে মার্জনা করুন। হৃদয় দিবার অধিকার আমার নাই।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া স্কন্দ বলিলেন—'অন্যাকে হৃদয় অর্পণ করিয়াছ ?'

রট্টা মুখ অবনত করিল, পুষ্পের মর্মকোষে সঞ্চিত শিশির বিন্দুর ন্যায় কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া তাহার বক্ষে পড়িল।

দীর্ঘকাল উভয়ে নীরব। স্কন্দ ভূমিতে এক হস্ত রাখিয়া অক্ষবাটের দিকে চাহিয়া আছেন ; তাঁহার মুখে বিচিত্র ভাবব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হইয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। শেষে তিনি একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন ; তাঁহার অধরে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'কিছুক্ষণ পূর্বে আমি বলিয়াছিলাম, পুরুষকার দ্বারা অপ্রাপ্য বস্তুও লাভ করা যায়। ভুল বলিয়াছিলাম। ভাগ্যই বলবান। কিন্তু তুমি ধন্য, ধন্য তোমার প্রেম। তোমার প্রেম পাইলাম না, এ ক্ষোভ মরিলেও যাইবে না।'

রট্টা সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া রহিল, কথা বলিতে পারিল না। স্কন্দ আবার বলিলেন—'যাহাকে তুমি হৃদয় দান করিয়াছ সে যেই হোক—আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে প্রলোভন দেখাইব না ; বলপূর্বক তোমাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টাও করিব না। দীর্ঘকাল বলের চর্চা

করিয়া দেখিয়াছি, বলের দ্বারা হৃদয় জয় করা যায় না। তুমি কাঁদিও না। আমি কখনও পরস্ব হরণ করি নাই, আজও তাহা করিব না। —তোমার নিকট একটি প্রার্থনা—আমাকে ভুলিও না, আমি যখন ইহলোকে থাকিব না, তখনও আমাকে মনে রাখিও।'

স্কন্দের পদস্পর্শ করিয়া বাষ্পাকুলকণ্ঠে রট্টা বলিল —'দেব, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, আমার হৃদয় মন্দিরে আপনার মূর্তি দেবতার ন্যায় পূজা পাইবে।'

স্কন্দ রট্টার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—'সুখী হও।'

স্কন্দের শিবিরে যখন এই দৃশ্যের অভিনয় হইতেছিল, সেই সময় চিত্রক ও গুলিক বর্মা দলবল লইয়া চষ্টন দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দিবা তখন একপাদ অবশিষ্ট আছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
হুণ রক্ত

মৎস্যের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একটি উপত্যকায় চষ্টন দুর্গ অবস্থিত। উত্তরদিক হইতে আর্যাবর্তে প্রবেশের যতগুলি সঙ্কট-পথ আছে, এই উপত্যকা তাহার অন্যতম, তাই এখানে দুর্গের প্রতিষ্ঠা। এই পথে পূর্বকালে বহু দুর্মদ যোদ্ধৃজাতির অভিযান আর্যভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে; বণিকের সার্থবাহ মহামূল্য পণ্য লইয়া যাতায়াত করিয়াছে; চৈন পরিব্রাজকগণ তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। উপত্যকাটি উত্তরে দক্ষিণে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘ; প্রস্থে মাত্র অর্ধক্রোশ। পূর্বে ও পশ্চিমে অভ্রংলিহ গিরিশ্রেণী।

চষ্টন দুর্গের সিংহদ্বার দক্ষিণমুখী। দুর্গটি দৃঢ়গঠন, কমঠাকৃতি; কিন্তু আয়তনে বৃহৎ নয়। উচ্চ প্রাকারবেষ্টনীর মধ্যে তিন চারি শত লোক বাস করিতে পারে।

অপরাহ্ণে দুর্গের দ্বার খোলা ছিল; দূর হইতে অশ্বারোহীর দল আসিতে দেখিয়া ঝনৎকার শব্দে লৌহ-কবাট বন্ধ হইয়া গেল।

গুলিক ও চিত্রক দুর্গদ্বারের প্রায় শত হস্ত দূর পর্যন্ত আসিয়া অশ্বের গতিরোধ করিল। এই স্থানে কয়েকটি পার্বত্য বৃক্ষ ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া একটি বৃক্ষ-বাটিকা রচনা করিয়াছে। গুলিকের ইঙ্গিতে সৈনিকের দল অশ্ব পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল। আজ রাত্রি সম্ভবত এই তরুতলেই কাটাইতে হইবে। সকলের সঙ্গে দুই তিন দিনের আহার্য ছিল।

চিত্র ও গুলিক অশ্ব হইতে নামিল না। ওদিকে দুর্গের দ্বার তো বন্ধ হইয়া গিয়াছিলই, উপরন্তু দুর্গ প্রাকারের উপর বহু লোকের ব্যস্ত যাতায়াত দেখিয়া মনে হয় তাহারা আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া দুর্গ রক্ষার আয়োজন করিতেছে।

ইহাদের যুযুৎসা অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া চিত্রক মৃদু হাস্য করিল, বলিল—'মনে হইতেছে ইহারা বিনা যুদ্ধে আমাদের দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবে না। আমরা কে, কোথা হইতে আসিতেছি—তাহা না জানিয়াই দুর্গরক্ষায় উদ্যত হইয়াছে।'

গুলিক বলিল —'আমাদের সংখ্যা দেখিয়া বোধহয় ভয় পাইয়াছে। আমরা সকলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলে উহারা তীর ছুঁড়িবে, পাথর ফেলিবে; কিন্তু দুই একজন যাইলে বোধহয় কিছু বলিবে না। আমরা কে তাহা জানিবার আগ্রহ নিশ্চয় উহাদের আছে। চল, আমরা দুইজনে যাই। আমাদের পরিচয় পাইলে নিশ্চয় দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবে।'

চিত্রক বলিল—'সম্ভব। কিন্তু আমাদের দুইজনের যাওয়া উচিত হইবে না। যদি দুইজনকেই

ধরিয়া রাখে তখন আমাদের নেতৃহীন সৈন্যেরা কী করিবে ?'

গুলিক বলিল—'সে কথা সত্য। তবে তুমি থাক আমি যাই।'

চিত্রক বলিল—'না, তুমি থাক আমি যাইব। প্রথমত, তোমাকে যদি ধরিয়া রাখে তখন আমি কিছুই করিতে পারিব না ; সৈন্যরা তোমার অধীন, আমার সকল আদেশ না মানিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমি যদি কিরাত বর্মার সাক্ষাৎ পাই, আমি তাহাকে এমন অনেক কথা বলিতে পারিব যাহা তুমি জান না। সুতরাং আমার যাওয়াই সমীচীন।'

যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিয়া গুলিক সম্মত হইল। বলিল—'ভাল। দেখ, যদি দুর্গে প্রবেশ করিতে পার। কিন্তু একটা কথা, সূর্যাস্তের পূর্বে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিও। না আসিলে বুঝিব তোমাকে ধরিয়া রাখিয়াছে কিম্বা বধ করিয়াছে। তখন যথাকর্তব্য করিব।'

চিত্রক দুর্গের দিকে অশ্ব চালাইল। সে তোরণ হইতে বিশ হাত দূরে উপস্থিত হইলে তোরণশীর্ষ হইতে পুরুষকণ্ঠে আদেশ আসিল—'দাঁড়াও।'

চিত্রক অশ্ব স্থগিত করিল ; ঊর্ধ্বে চক্ষু তুলিয়া দেখিল, প্রাকারস্থ সারি সারি ইন্দ্রকোষের ছিদ্রপথে কয়েকজন ধানুকী ধনুতে শর সংযোগ করিয়া তাহার পানে লক্ষ্য করিয়া আছে। একটি ইন্দ্রকোষের অন্তরাল হইতে প্রশ্ন আসিল—'কে তুমি ? কী চাও ?'

চিত্রক গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—'আমি পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ স্কন্দগুপ্তের দূত। দুর্গাধিপ কিরাত বর্মার জন্য বার্তা আনিয়াছি।'

প্রাকারের উপর কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে আলাপ হইল ; তারপর আবার উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—'কী বার্তা আনিয়াছ ?'

চিত্রক দৃঢ়স্বরে বলিল—'তাহা সাধারণের জ্ঞাতব্য নয়। দুর্গাধিপকে বলিব।'

আবার কিছুক্ষণ হ্রস্বকণ্ঠে আলোচনার পর তোরণ হইতে শব্দ আসিল—'উত্তম। অপেক্ষা কর।'

কিয়ৎকাল পরে দুর্গের কবাট ঈষৎ উন্মোচিত হইল। চিত্রক দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। কবাট আবার বন্ধ হইয়া গেল।

তোরণ অতিক্রম করিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার ঘোড়ার বল্‌গা ধরিল। চিত্রক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল। চারিদিক হইতে প্রায় ত্রিশজন সশস্ত্র যোদ্ধা তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। চিত্রক লক্ষ্য করিল, ইহাদের অধিকাংশই আকৃতিতে হূণ ; খর্বকায় গজস্কন্ধ ক্ষুদ্রচক্ষু, মুখে শ্মশ্রু গুম্ফের বিরলতা। সকলের চোখেই সন্দিগ্ধ কুটিল দৃষ্টি।

যে-ব্যক্তি ঘোড়া ধরিয়াছিল সে কর্কশকণ্ঠে বলিল—'তুমি দূত ! যদি মিথ্যা পরিচয় দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়া থাক উপযুক্ত শাস্তি পাইবে। চল, দুর্গাধিপ নিজ ভবনে আছেন সেখানে সাক্ষাৎ হইবে।'

চিত্রক এই ব্যক্তিকে শান্তচক্ষে নিরীক্ষণ করিল। চল্লিশ বৎসর বয়স্ক দৃঢ়শরীর হূণ ; বামগণ্ডে অসির গভীর ক্ষতচিহ্ন মুখের শ্রীবর্ধন করে নাই ; বাচনভঙ্গি অতিশয় অশিষ্ট। চিত্রক কিন্তু কোনও রূপ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত প্রশ্ন করিল—'তুমি কে ?'

হূণের মুখ কালো হইয়া উঠিল ; সে চিত্রকের প্রতি কষায়িত নেত্রপাত করিয়া বলিল—'আমার নাম মরুসিংহ। আমি চষ্টন দুর্গের রক্ষক—দুর্গপাল।'

আর কোনও কথা হইল না। চিত্রক নিরুৎসুক চক্ষে দুর্গের চারিদিক দেখিতে দেখিতে চলিল। দুর্গটি সাধারণ প্রাকারবেষ্টিত পুরীর মতই, বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। মধ্যস্থলে দুর্গাধিপের প্রস্তরনির্মিত দ্বিভূমক ভবন।

ভবনের নিম্নতলে প্রশস্ত বহিঃকক্ষে কিরাত বাহু দ্বারা বক্ষ আবদ্ধ করিয়া ভ্রূকুটি-বিকৃত মুখে

পাদচারণা করিতেছিল ; কক্ষের চার দ্বারে চারজন অস্ত্রধারী রক্ষী। চিত্রক ও মরুসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলে কিরাত তাহাদের লক্ষ্য করিল না, পূর্ববৎ পাদচারণা করিতে লাগিল। তারপর সহসা মুখ তুলিয়া ক্ষিপ্রপদে চিত্রকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরস্পরের দর্শনে উভয়ের মনে আনন্দ উপজাত হইল না। চিত্রক দেখিল কিরাতের আকৃতি হূণদের মত নয়, সে দীর্ঘকায় ও সুদর্শন ; কেবল তাহার চক্ষু দু'টি ক্ষুদ্র ও ক্রূর। চিত্রক মনে মনে বলিল—তুমি কিরাত। রট্টার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে।

কিরাত বলিয়া উঠিল—'কে তুমি ? কোথা হইতে আসিতেছ ?'

চিত্রক বলিল—'পূর্বেই বলিয়াছি আমি সম্রাট স্কন্দগুপ্তের দূত। তাঁহার স্কন্ধাবার হইতে আসিয়াছি।'

ক্রোধ-তীক্ষ্ণ স্বরে কিরাত বলিল—'স্কন্দগুপ্ত ! কী চায় স্কন্দগুপ্ত আমার কাছে ? আমি তাহার অধীন নহি।'

চিত্রক বলিল—'সম্রাট স্কন্দগুপ্ত কী চান তাহা তাঁহার বার্তা হইতেই প্রকাশ পাইবে।' একটু থামিয়া বলিল—'শিষ্টসমাজে মাননীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে বিনয় বাক্য প্রয়োগের রীতি আছে।'

কিরাত অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল—'তুমি ধৃষ্ট। আমার দুর্গে আসিয়া আমার সহিত যে ধৃষ্টতা করে আমি তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া প্রাকার বাহিরে নিক্ষেপ করি।'

চিত্রকের ললাটের তিলকচিহ্ন ক্রমশ লাল হইয়া উঠিতে লাগিল ; কিন্তু সে ধীরস্বরে বলিল—'সম্রাট স্কন্দগুপ্তের দূতকে লাঞ্ছিত করিলে স্কন্দ সহস্র রণহস্তী আনিয়া তোমাকে এবং তোমার দুর্গকে হস্তীর পদতলে নিপিষ্ট করিবেন। মনে রাখিও আমি একা নই ; বাহিরে শত অশ্বারোহী অপেক্ষা করিতেছে।'

মনে হইল কিরাত বুঝি ফাটিয়া পড়িবে ; কিন্তু সে দন্ত দ্বারা অধর দংশন করিয়া অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিল। অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিল—'তুমি যে স্কন্দগুপ্তের দূত তাহার প্রমাণ কি ?'

চিত্রক নিঃশব্দে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া দিল।

নতমুখে কিছুক্ষণ অঙ্গুরীয় পর্যবেক্ষণ করিয়া কিরাত যখন মুখ তুলিল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া চিত্রক অবাক হইয়া গেল। কিরাতের মুখে অগ্নিবর্ণ ক্রোধ আর নাই, তৎপরিবর্তে অধরপ্রান্তে মৃদু কৌতুকহাস্য ক্রীড়া করিতেছে। কিরাত মিষ্টস্বরে বলিল—'দূত মহাশয়, আপনি স্বাগত। আমার রূঢ় ব্যবহারের জন্য কিছু মনে করিবেন না। যুদ্ধবিগ্রহের সময় কোনও আগন্তুক দুর্গে প্রবেশ করিলে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। আপনি যদি আমার তর্জনে ভয় পাইতেন তাহা হইলে বুঝিতাম—অঙ্গুরীয় সত্ত্বেও আপনি সম্রাটের দূত নন, শত্রুর গুপ্তচর। যা হোক, আপনার ব্যবহারে আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। আসুন—উপবেশন করুন।'

চিত্রক কথায় ভিজিল না ; মনে মনে বুঝিল কিরাত তাহাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া এখন অন্য পথ ধরিয়াছে। সে আরও সতর্ক হইল। কিরাত শুধু ক্রূর ও ক্রোধী নয়, কপটতায় ধুরন্ধর।

উভয়ে আসন পরিগ্রহ করিলে কিরাত বলিল—'সম্রাট কি বার্তা পাঠাইয়াছেন ? লিখিত লিপি ?'

চিত্রক শুষ্কস্বরে বলিল—'না, সম্রাট সামান্য দুর্গাধিপকে লিপি লেখেন না। মৌখিক বার্তা।'

কিরাত এই অবজ্ঞা গলাধঃকরণ করিল। চিত্রক তখন বলিল—'সম্রাট সংবাদ পাইয়াছেন যে বিটঙ্করাজ রোট্ট ধর্মাদিত্য চষ্টন দুর্গে আছেন—'

চকিতে কিরাত প্রশ্ন করিল—'এ সংবাদ কোথায় পাইলেন ?'

চিত্রক বলিল—'কুমার-ভট্টারিকা যশোধরার মুখে।'

কিরাতের চক্ষু ক্ষণেকের জন্য বিস্ফারিত হইল ; সে কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল—'তারপর বলুন।'

'সম্রাট জানিতে পারিয়াছেন যে আপনি ছলপূর্বক ধর্মাদিত্যকে দুর্গে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।'

কিরাত পরম বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠল—'আমি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি! সে কি কথা! ধর্মাদিত্য আমার রাজা, আমার প্রভু—'

চিত্রক নীরসকণ্ঠে বলিয়া চলিল—'কুমার-ভট্টারিকা রট্টা যশোধরাকেও আপনি কপট-পত্র পাঠাইয়া দুর্গে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—'

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কিরাত বলিল—'সকলেই আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। ইহা দুর্দৈব ছাড়া আর কি হইতে পারে ? ধর্মাদিত্য স্বয়ং কন্যাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন—'

চিত্রক বলিল—'সে যা হোক, সম্রাট স্কন্দগুপ্ত আদেশ দিয়াছেন অচিরাৎ বিটঙ্করাজকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন। সম্রাট তাঁহার সাক্ষাতের অভিলাষী।'

কিরাত বলিল—'কিন্তু বিটঙ্করাজ আমার অধীন নয়, আমিই তাঁহার অধীন। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা না করা তাঁহার ইচ্ছা।'

'তবে বিটঙ্করাজকেই সম্রাটের আদেশ জানাইব। তিনি কোথায় ?'

'তিনি এই ভবনেই আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অতিশয় অসুস্থ। তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইতে পারে না।'

কিছুক্ষণ উভয়ে চোখে চোখে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কিরাতের দৃষ্টি অবনত হইল না। শেষে চিত্রক বলিল—'তবে কি বুঝিব সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিতে আপনি অসম্মত ?'

কিরাত ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—'দূত মহাশয়, আপনিও আমাকে ভুল বুঝিতেছেন। আমি অসহায়। ধর্মাদিত্য আমার রাজা, আমার পিতৃতুল্য, তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়া আমি আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটাইতে পারি না। বৈদ্য আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন, কোনও প্রকার উত্তেজনার কারণ ঘটিলেই ধর্মাদিত্যের প্রাণবিয়োগ হইবে।'

ক্ষণিক চিন্তা করিয়া চিত্রক বলিল—'মহারাজের সঙ্গে সন্নিধাতা আসিয়াছিল, তাহার নাম হর্ষ। সে কোথায় ?'

স্কন্দগুপ্তের দূতের কাছে কিরাত এ প্রশ্ন প্রত্যাশা করে নাই, সে চমকিয়া উঠিল। তারপর দ্রুতকণ্ঠে বলিল—'হর্ষ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু গতকল্য কপোতকূটে ফিরিয়া গিয়াছে।'

'আর নকুল ? এবং তাহার সহচরগণ ?'

'রাজকন্যা রট্টা যশোধরা আসিলেন না দেখিয়া তাহারাও ফিরিয়া গিয়াছে।'

কিরাত যে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহা চিত্রক বুঝিতে পারিল ; হর্ষ ও নকুলের দল দুর্গেই কোনও কূটকক্ষে বন্দী আছে। সে নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'দুর্গাধিপ মহাশয়, আমার দৌত্য শেষ হইয়াছে। সম্রাটকে সকল কথা নিবেদন করিব ; তারপর তাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি করিবেন। তিনি আপনাকে জানাইতে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি স্বয়ং আসিয়া সহস্র হস্তী দ্বারা দুর্গ সমভূমি করিবেন। আপনাকে একথা জানাইয়া রাখা উচিত বিবেচনা করি।'

চিত্রক ফিরিয়া দ্বারের দিকে চলিল।

'দূত মহাশয়!'

কিরাত তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কিরাতের কণ্ঠস্বর মর্মাহিত, মুখের ভাব বশংবদ। সে বলিল—'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন মহাপরাক্রান্ত

সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়া আমার লাভ কি ? নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আমি—'

'সে কথা সম্রাট বিবেচনা করিবেন।'

'দূত মহাশয়, আপনার প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে। আপনি কয়েকদিন অপেক্ষা করুন, এখনি ফিরিয়া যাইবেন না। ইতিমধ্যে যদি ধর্মাদিত্য আরোগ্য হইয়া ওঠেন তখন আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথোচিত কর্তব্য করিবেন। আমার দায়িত্ব শেষ হইবে।'

এ আবার কোন্ নূতন চাতুরী ? চিত্রক বিবেচনা করিয়া বলিল—'আমি আগামী কল্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারি। তাহার অধিক নয়।'

কিরাত ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'মাত্র কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত! ভাল, আপনার যেরূপ অভিরুচি। আপনাদের সকলকে দুর্গমধ্যে স্থান দিতে পারিলে সুখী হইতাম; কিন্তু দুর্গে স্থানাভাব।—মরুসিংহ, দূত-প্রবরকে সসম্মানে দুর্গ বাহিরে প্রেরণ কর।'

মরুসিংহ হিংস্রচক্ষে চিত্রকের পানে চাহিল; তারপর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। চিত্রক তাহার অনুগামী হইল।

ভবনের প্রতিহারভূমি পর্যন্ত আসিয়া চিত্রক একবার ফিরিয়া চাহিল। দ্বারের কাছে কিরাত দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখে বশংবদ ভাব আর নাই, দুই চক্ষু হইতে কুটিল হিংসা বিকীর্ণ হইতেছে। চারি চক্ষুর মিলন হইতেই কিরাত ফিরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

চিত্রক যখন বৃক্ষ-বাটিকায় ফিরিয়া আসিল তখন সূর্যাস্ত হইতেছে। গুলিককে সমস্ত কথা বলিলে গুলিক গুম্ফের প্রান্ত আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল—'হুঁ। অসভ্য বর্বরটার কোনও দুরভিসন্ধি আছে। রাত্রে সাবধানে থাকিতে হইবে; অতর্কিতে আক্রমণ করিতে পারে।'

কিরাতের যে কোনও গুপ্ত অভিপ্রায় আছে তাহা চিত্রকও সন্দেহ করিয়াছিল; কিন্তু রাত্রে আক্রমণ করিবে তাহা তাহার মনে হইল না। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কিরাত কালবিলম্ব করিতে চাহে। কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য ? চিত্রকের দল ফিরিয়া না গিয়া এখানে থাকিলে কিরাতের কী সুবিধা হইবে ? কিরাত কি ধর্মাদিত্যকে হত্যা করিয়াছে ? কিম্বা হত্যা করিতে চায় ? সম্ভব নয়। ইচ্ছা থাকিলেও আর তাহা সাহস করিবে না। তবে কী ?

গুলিক বলিল—'দণ্ডেন গো-গর্দভৌ—লোকটাকে হাতে পাইলে লাঠ্যৌষধি দিয়া সিধা করিতাম। যা হোক, উপস্থিত সতর্ক থাকা দরকার। আমি দশজন প্রহরী লইয়া মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পাহারায় থাকিব, বাকি রাত্রি তুমি পাহারা দিও।'

সন্ধ্যার পর চিত্রক বৃক্ষতলে কম্বল পাতিয়া শয়ন করিল। দেহ ও মন দুইই ক্লান্ত, সে অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

মধ্যরাত্রে গুলিক আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই গুলিক তাহার কম্বলে শয়ন করিয়া নিমেষমধ্যে নিদ্রাভিভূত হইল এবং ঘর্ঘর শব্দে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিল।

বৃক্ষ-বাটিকায় ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে সৈন্যগণ ভূ-শয্যায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তরুচ্ছায়ার বাহিরে আসিয়া চিত্রক সাবধানে বৃক্ষ বাটিকা পরিক্রমণ করিল। ভূমি সমতল নয়; অত্রতত্র বৃহৎ পাষাণখণ্ড পড়িয়া আছে, অন্ধকারে দৃষ্টিগোচর হয় না। দশজন সৈনিক স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে প্রহরা দিতেছে। বাটিকার পশ্চাদ্‌ভাগে অশ্বগুলি ছন্দোবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। বাহিরের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া চিত্রক কিছুই দেখিতে পাইল না, ঘন তমিস্রায় সমস্ত একাকার হইয়া গিয়াছে। কেবল দুর্গের উন্নত স্কন্ধ আকাশের গাত্রে গাঢ়তর অন্ধকারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

সতর্ক থাকা ব্যতীত প্রহরীর আর কিছু করিবার নাই। চিত্রক তরবারি কোমরে বাঁধিয়া অলস

মন্থর পদে বৃক্ষ-বাটিকা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দুর্গ নিস্তব্ধ, শব্দ মাত্র নাই। নানা অসংলগ্ন চিন্তা চিত্রকের মস্তিষ্কে ক্রীড়া করিতে লাগিল। রট্টা...স্কন্দগুপ্ত...কিরাত...

ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। চন্দ্রের পরিপূর্ণ মহিমা আর নাই, অনেকখানি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তবু তাহার ক্ষীণ প্রভায় চতুর্দিক অস্পষ্টভাবে আলোকিত হইল।

পরিক্রমণ করিতে করিতে চিত্রক লক্ষ্য করিল, যে-দশজন সৈনিক পাহারা দিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই একটি বৃক্ষকাণ্ডে বা প্রস্তরখণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের চক্ষু মুদিত। চিত্রক বিস্মিত হইল না; দাঁড়াইয়া ঘুমাইবার অভ্যাস প্রত্যেক সৈনিকের আয়ত্ত করিতে হয়। অল্পমাত্র শব্দ শুনিলেই তাহারা জাগিয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে তাহাদের জাগাইল না।

শত হস্ত দূরে দুর্গের তোরণ ও প্রাকার ম্লান জ্যোৎস্নায় ছায়াচিত্রবৎ দেখাইতেছে। অকারণেই চিত্রক সেই দিকে চলিল। একবার তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে একটি চিন্তা ক্ষণিক রেখাপাত করিল—এই দুর্গ ন্যায়ত ধর্মত আমার।

অর্ধেক দূর গিয়া চিত্রক থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; তারপর দ্রুত এক প্রস্তরখণ্ডের পশ্চাতে লুকাইল। তাহার চোখের দৃষ্টি স্বভাবতই অতিশয় তীক্ষ্ণ। সে দেখিল, দুর্গের দ্বার নিঃশব্দে খুলিতেছে; অল্প খুলিবার পর দ্বারপথে একজন অশ্বারোহী বাহির হইয়া আসিল।

চিত্রক কুঞ্চিত পলকহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল। কিন্তু আর কোনও অশ্বারোহী বাহিরে আসিল না, দুর্গদ্বার আবার বন্ধ হইয়া গেল। যে অশ্বারোহী বাহিরে আসিয়াছিল, এতদূর হইতে মন্দালোকে চিত্রক তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। অশ্বারোহী বাম দিকে অশ্বের মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে ছায়ার ন্যায় প্রাকারের পাশ দিয়া চলিল।

অশ্বারোহীর ভাব-ভঙ্গিতে আত্মগোপনের চেষ্টা পরিস্ফুট; অশ্বক্ষুর হইতে কিছুমাত্র শব্দ বাহির হইতেছে না। চিত্রক একাগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল—অশ্বের চারি পায়ে ক্ষুরের উপর বস্ত্রের মত কিছু বাঁধা রহিয়াছে, তাই শব্দ হইতেছে না। কোথায় যাইতেছে এই নৈশ অশ্বারোহী— ?

সহসা তড়িচ্চমকের ন্যায় চিত্রকের মস্তিষ্ক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পলকের মধ্যে কিরাতের সমস্ত কুটিল দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল। চিত্রক বুঝিল অশ্বারোহী চোরের মত কোথায় যাইতেছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
উপসংহার

দুর্গ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে গিয়া অশ্বারোহী অশ্ব থামাইল। উপত্যকা এখানে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, চারিদিকে উচ্চ নীচ প্রস্তরখণ্ড বিকীর্ণ; সাবধানে অশ্ব চালাইতে হয়। পথ এত বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়াই অশ্বারোহীকে চন্দ্রোদয়ের পর যাত্রা করিতে হইয়াছে; উপরন্তু চন্দ্রালোক সত্ত্বেও বেগে অশ্বচালনা করা সম্ভব হয় নাই। শব্দ নিবারণের জন্য ঘোড়ার পায়ে কর্পট বাঁধা; এরূপ অবস্থায় ঘোড়া অধিক বেগে দৌড়িতে পারে না।

অশ্বারোহী পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূর পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিল। প্রস্তরখণ্ডগুলা চারিদিকে কালো ছায়া ফেলিয়াছে, সচলতার আভাস নাই; সব স্থির নিথর। অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবরোহণ করিল। ঘোড়ার ক্ষুরের কর্পট খুলিয়া এবার বেগে ঘোড়া ছুটানো যাইতে পারে; শব্দ হইলেও শুনিবার কেহ নাই।

তিনটি ক্ষুরের বস্ত্র খুলিয়া অশ্বারোহী চতুর্থ ক্ষুরে হাত দিয়াছে এমন সময় ঘোড়াটা ভয় পাইয়া দূরে সরিয়া গেল। অশ্বারোহী চকিতে উঠিয়া পিছু ফিরিল, অমনি তরবারির অগ্রভাগ তাহার বুকে ঠেকিল। চিত্রক বলিল—'মরুসিংহ, অশুভক্ষণে যাত্রা করিয়াছিলে। আমার সঙ্গে ফিরিতে হইবে।'

মরুসিংহের বুকে লৌহজালিক ছিল, সে এক লাফে পিছু হটিয়া সঙ্গে সঙ্গে তরবারি বাহির করিল। চিত্রকের অসি তাহার বুকে বিঁধিল না, তাহাকে আর একটু দূরে ঠেলিয়া দিল মাত্র।

তখন মলিন চন্দ্রালোকে দুইজনে অসিযুদ্ধ হইল।

যুদ্ধ শেষ হইলে চিত্রক মরুসিংহের বুকের উপর বসিয়া তাহার হস্তদ্বয় তাহারই উষ্ণীষ-বস্ত্র দিয়া বাঁধিল; তারপর তাহাকে দাঁড় করাইয়া উষ্ণীষ-বস্ত্র তাহার কটিতে জড়াইল; উষ্ণীষ-প্রান্ত বাম হস্তে এবং তরবারি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া বলিল—'এবার চল। হাঁটিয়া ফিরিতে হইবে। তুমি আগে চল, আমি পিছনে থাকিব। পলায়নের চেষ্টা করিও না—'

মরুসিংহ এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই, এখনও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না।

তাহারা যখন তরু-বাটিকায় ফিরিল, তখন উষার আলোক ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু তখনও রাত্রির ঘোর কাটে নাই।

চিত্রকের রহস্যময় অন্তর্ধান ইতিমধ্যে লক্ষিত হইয়াছিল। ছাউনিতে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। সকলে জাগিয়া উঠিয়াছিল। চিত্রক বন্দীসহ ফিরিতেই গুলিক ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'একি, কোথায় গিয়াছিলে? এ কে?'

চিত্রক বলিল—'ইনি চষ্টন দুর্গের দুর্গপাল—মরুসিংহ। আগে ইহাকে শক্ত করিয়া গাছের কাণ্ডে বাঁধ। তারপর সব বলিতেছি।'

মরুসিংহকে গাছে বাঁধিয়া দুইজন রক্ষী খোলা তলোয়ার হাতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া চিত্রক গুলিককে অন্তরালে লইয়া গিয়া রাত্রির সমস্ত ঘটনা বলিল।

শুনিয়া গুলিক বলিল—'তোমার অনুমানই সত্য। কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; হূণটার মুখ হইতে প্রকৃত কথা জানিতে হইবে।'

চিত্রক বলিল—'উহার নিকট হইতে কথা বাহির করা শক্ত হইবে।'

গুলিক বলিল—'যদি সহজে না বলে তখন কথা বাহির করিবার অন্য পথ ধরিব।'

তখন সূর্যোদয় হইয়াছে। চিত্রক ও গুলিক গিয়া মরুসিংহকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। মরুসিংহ কিন্তু নীরব; একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া চলিল। নিরামিষ প্রশ্নে ফল হইতেছে না দেখিয়া গুলিক লাঠ্যৌষধের প্রয়োগ করিল। কিন্তু মরুসিংহের মুখ খুলিল না। দৈহিক পীড়ন ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। প্রাণে না মারিয়া যতদূর নৃশংসতা প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা প্রযুক্ত হইল।

দ্বিপ্রহর হইল। তথাপি মরুসিংহের মুখের অর্গল খুলিল না দেখিয়া গুলিক বর্মা সহসা হুঙ্কার ছাড়িল—'হতবুদ্ধি হূণ যখন প্রশ্নের উত্তর দিবে না তখন উহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া লাভ নাই। উহাকে ঘোড়া দিয়া চিরিয়া ফেলিব। তবু একটা হূণ কমিবে।'

ঘোড়া দিয়া চিরিয়া ফেলার প্রক্রিয়া অতি সহজ। যাহাকে চিরিয়া ফেলা হইবে তাহার দুই পায়ে দুইটি রজ্জুর প্রান্ত বাঁধিয়া রজ্জু দু'টির অন্য প্রান্ত দুইটি ঘোড়ার সহিত বাঁধিয়া দিতে হইবে; তারপর ঘোড়া দুইটিকে একসঙ্গে বিপরীত দিকে ছুটাইয়া দিতে হইবে।

মরুসিংহকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার গুল্‌ফে রজ্জু বাঁধা হইলে মরুসিংহ প্রথম কথা কহিল। বলিল—'প্রশ্নের উত্তর দিব।'

দুইজন রক্ষী মরুসিংহকে টানিয়া দাঁড় করাইল।

অতঃপর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল।

প্রশ্ন : গত রাত্রে চুপি চুপি কোথায় যাইতেছিলে ?

উত্তর : হূণ শিবিরে।

প্রশ্ন : হূণ শিবির কত দূর ?

উত্তর : এখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ বায়ুকোণে।

প্রশ্ন : পথ আছে ?

উত্তর : গুপ্তপথ আছে।

প্রশ্ন : তুমি হূণদের পথ দেখাইয়া আনিতে যাইতেছিলে ?

উত্তর : হাঁ।

প্রশ্ন : কে তোমাকে পাঠাইয়াছিল ?

উত্তর : দুর্গাধিপ।

প্রশ্ন : তুমি নিজ ইচ্ছায় যাও নাই ? প্রমাণ কি ?

উত্তর : দুর্গাধিপের পত্র আছে।

প্রশ্ন : কোথায় পত্র ?

উত্তর : আমার তরবারির কোষের মধ্যে।

মরুসিংহের কটি হইতে তখনও শূন্য কোষ ঝুলিতেছিল। কোষ ভাঙ্গিয়া তাহার নিম্ন প্রান্ত হইতে লিপি বাহির হইল। অগুরুত্বকের পত্র, তদুপরি ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত লিপি। লিপি পাঠ করিয়া মরুসিংহকে আর প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইল না। গুলিক বলিল—'বন্দীকে পানাহার দাও। কিন্তু বাঁধিয়া রাখ। উহার ব্যবস্থা পরে হইবে।'

তারপর চিত্রক ও গুলিক বিরলে গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিল। মন্ত্রণার ফলে দুইজন অশ্বারোহী বার্তা লইয়া স্কন্দের স্কন্ধাবারের দিকে যাত্রা করিল। গুরুতর সংবাদ ; অবিলম্বে সম্রাটের গোচর করা প্রয়োজন।

তারপর মন্ত্রণানুযায়ী, অপরাহ্ণের দিকে চিত্রক একাকী দুর্গতোরণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'দুর্গস্বামীর সাক্ষাৎ চাহি।'

আজ আর বিলম্ব হইল না। দুর্গদ্বার খুলিয়া গেল ; চিত্রক প্রবেশ করিল।

কিরাত নিজ ভবনে ছিল, হাসিয়া চিত্রককে সম্ভাষণ করিল—'দূত মহাশয়, আপনি ফিরিয়া যাইবার জন্য নিশ্চয় বড় চঞ্চল হইয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ধর্মাদিত্যের অবস্থা পূর্ব্ববৎ, কোনও উন্নতি হয় নাই। আপনাকে আরও দুই একদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।'

চিত্রক উত্তর দিল না, স্থিরদৃষ্টিতে কিরাতের পানে চাহিয়া রহিল।

কিরাত পুনশ্চ বলিল—'অবশ্য আপনারা যদি নিতান্তই থাকিতে না পারেন তাহা হইলে কল্য প্রাতে ফিরিয়া যাওয়াই কর্তব্য। কিন্তু যে কার্য করিতে আসিয়াছেন তাহার শেষ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া উচিত হইবে কি ?' কিরাতের কণ্ঠস্বরে গোপন ব্যঙ্গের আভাস ফুটিয়া উঠিল।

কিরাতের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চিত্রক বলিল—'আমরা ফিরিয়া না যাই ইহাই আপনার ইচ্ছা ?'

'হাঁ—অবশ্য। সম্রাটের আদেশ—'

'কিন্তু তাহাতে আপনার কোনও লাভ হইবে না।'

'আমার লাভ—?' কিরাত প্রখরচক্ষে চাহিল।

চিত্রক শান্তস্বরে বলিল—'আপনি আশা করিতেছেন আপনার নিমন্ত্রণ লিপি পাইয়া হূণ সেনাপতি সসৈন্যে আসিয়া আমাদের হত্যা করিবে। কিন্তু তাহা হইবার নয়। মরুসিংহ ধরা

পড়িয়াছে ; যে অধম গুপ্তচর হূণদের পথ দেখাইয়া আনিতে পারিত, সে এখন আমাদের হাতে।'

কিরাত প্রস্তরমূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া চিত্রক আবার বলিতে লাগিল—'আপনার পত্র হইতে আপনার অভিপ্রায় সমস্তই ব্যক্ত হইয়াছে। আপনি শত্রুকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া প্রথমে নিজ দুর্গ ও ধর্মাদিত্যকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে চান ; তারপর হূণেরা যাহাতে সহজে বিটঙ্ক রাজ্য অধিকার করিয়া সম্রাট স্কন্দগুপ্তের কণ্টকস্বরূপ হইতে পারে সেজন্য তাহাদের সাহায্য করিতেও উদ্যত আছেন। আপনি রাজদ্রোহী—দেশদ্রোহী। কিন্তু সম্রাট স্কন্দগুপ্ত ক্ষমাশীল পুরুষ। এখনও যদি আপনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া রোট্ট ধর্মাদিত্যকে আমাদের হস্তে অর্পণ করেন তাহা হইলে সম্রাট হয়তো আপনাকে ক্ষমা করিতে পারেন।'

এতক্ষণে কিরাত আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ন্যায় ফাটিয়া পড়িল। তাহার অগ্নিবর্ণ মুখে শিরা উপশিরা স্ফীত হইয়া উঠিল ; সে উন্মত্তবৎ গর্জন করিয়া বলিল—'রাজদ্রোহী ! দেশদ্রোহী ! মূর্খ দূত, তুমি কী বুঝিবে কেন আমি হূণকে ডাকিয়াছি ! এ রাজ্য আমার—অধম ধর্মাদিত্য প্রবঞ্চনা করিয়া আমার পৈতৃক অধিকার অপহরণ করিয়াছে ! আমি বিটঙ্ক রাজ্যের ন্যায্য রাজা—'

চিত্রক বলিয়া উঠিল—'তুমি ন্যায্য রাজা ?'

বাধা অগ্রাহ্য করিয়া কিরাত ফেনায়িত মুখে বলিয়া চলিল—'তথাপি আমি ধৈর্য ধরিয়া ছিলাম, বিদ্রোহ করিয়া নিজ অধিকার সবলে গ্রহণ করিতে চাহি নাই। আমি শুধু চাহিয়াছিলাম, ধর্মাদিত্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভ করিব। তাহাতে কাহারও ক্ষতি হইত না। কিন্তু নষ্টবুদ্ধি ধর্মাদিত্য এবং তাহার নষ্টবুদ্ধি কন্যা—'

চিত্রক বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল—'বিটঙ্ক রাজ্য ন্যায়ত তোমার, একথার অর্থ কি ?'

'তাহা তুমি বুঝিবে না। হূণ হইলে বুঝিতে। আমার পিতা তুষ্‌ফাণ স্বহস্তে পূর্ববর্তী আর্য রাজার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়াছিলেন ; সেই অধিকারে বিটঙ্ক রাজ্য আমার পিতার প্রাপ্য। হূণদের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে। কিন্তু চতুর ধর্মাদিত্য—'

'কি বলিলে ? তোমার পিতা পূর্ববর্তী আর্য রাজাকে হত্যা করিয়াছিল ? ধর্মাদিত্য হত্যা করে নাই ?'

'না। একথা সকলে জানে। কিন্তু এ পৃথিবীতে সুবিচার নাই—'

চিত্রকের তিলক ত্রিলোচনের ললাট বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল। সে কিরাতের দিকে একপদ অগ্রসর হইল—

এই সময় বাহিরে উচ্চ গণ্ডগোল শুনা গেল। দুই তিনজন প্রাকার-রক্ষী কক্ষের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। একজন রুদ্ধশ্বাসে বলিল—'দুর্গেশ, শত শত রণহস্তী লইয়া একদল সৈন্য দক্ষিণদিক হইতে আসিতেছে। বোধহয় স্বয়ং স্কন্দগুপ্ত। একটি হস্তীর মাথায় শ্বেতছত্র রহিয়াছে।'

স্কন্দগুপ্ত বলিলেন—'রট্টা যশোধরার নিকট পাশার বাজি হারিয়াছিলাম, তাই পণ রক্ষার জন্য আসিতে হইয়াছে। এখন দেখিতেছি আসিয়া ভালই করিয়াছি।'

দুর্গের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে সভা বসিয়াছিল ; স্কন্দের রণহস্তীর দল চক্রাকারে সভাস্থল ঘিরিয়া ছিল। দুর্গ এখন স্কন্দের অধিকারে। কিরাত স্কন্দের বিরুদ্ধে দুর্গদ্বার রোধ করিতে সাহসী হয় নাই ; প্রাণ বাঁচাইবার ক্ষীণ আশা লইয়া তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

এদিকে কপোতকূট হইতে চতুরানন ভট্ট অনুমান চারিশত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রায় স্কন্দের সমকালেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জম্বুকও সঙ্গে আসিয়াছে।

স্কন্দ একটি প্রশস্ত বেদীর উপর বসিয়াছিলেন ; পাশে ধর্মাদিত্য। ধর্মাদিত্যের দেহ শুষ্ক শীর্ণ,

মুখে ক্লেশের চিহ্ন বিদ্যমান ; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া মরণাপন্ন রোগী বলিয়া মনে হয় না। রট্টা যশোধরা তাঁহার জানু আলিঙ্গন করিয়া পদপ্রান্তে বসিয়াছিল। চিত্রক গুলিক ও আরও অনেক সেনামুখ্য সভার সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান ছিল। কিরাত কিছু দূরে একাকী বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

ধর্মাদিত্য ভগ্নস্বরে বলিলেন—'আমার আর রাজ্যসুখে স্পৃহা নাই। আমি সংঘের শরণ লইব। রাজাধিরাজ, আপনি আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রহণ করুন ; আততায়ীর সন্ত্রাস হইতে প্রজাকে রক্ষা করুন।'

স্কন্দ বলিলেন—'তাহা করিতে পারি। কিন্তু আমি তো বিটঙ্ক রাজ্যে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতে পারিব না। একজন স্থানীয় সামন্ত প্রয়োজন যে সিংহাসনে বসিয়া প্রজা শাসন করিবে। এমন কে আছে ?'

ধর্মাদিত্য বলিলেন—'আমার একমাত্র কন্যা আছে—এই রট্টা যশোধরা।' বলিয়া রট্টার মস্তকে হস্ত রাখিলেন।

স্কন্দ বলিলেন—'রট্টা আপনার কুমারী কন্যা। যদি আপনার জামাতা থাকিত সে আপনার স্থলাভিষিক্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে পারিত, কাহারও ক্ষোভের কারণ হইত না। কিন্তু অনধিকারী ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইলে রাজ্যে অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, বর্তমান অবস্থায় তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। ধর্মাদিত্য, আপনি আরও কিছুকাল রাজদণ্ড ধারণ করিয়া থাকুন। তারপর...'

ধর্মাদিত্য সবিনয়ে যুক্তকরে বলিলেন—'আমাকে ক্ষমা করুন। সংসারে আমার নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনার রাজ্য আপনি যাহাকে ইচ্ছা দান করুন ; আমার কন্যার জন্যও আর আমি অনুগ্রহ ভিক্ষা করি না। রট্টা আপনার স্নেহ পাইয়াছে, সে আপনারই কন্যা। আপনি প্রজার কল্যাণে যেরূপ ইচ্ছা করুন।'

সভা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল ; তারপর রট্টা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার চিত্রকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাসিল ; তারপর স্কন্দের দিকে ফিরিল। বলিল—'আয়ুষ্মন্, রাজ্যের ন্যায্য অধিকারীর যদি অভাব ঘটিয়া থাকে আমি একজন ন্যায্য অধিকারীর সন্ধান দিতে পারি।'

সকলে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল। রট্টা বলিল—'যে আর্য রাজাকে জয় করিয়া পিতা বিটঙ্ক রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন সেই আর্য রাজার বংশধর জীবিত আছেন—'

স্কন্দ বলিয়া উঠিলেন—'কে সে ? কোথায় সে ?'

উত্তর না দিয়া রট্টা ধীরপদে গিয়া চিত্রকের সম্মুখে দাঁড়াইল। চিত্রক অভিভূতভাবে স্খলিতস্বরে একবার 'রট্টা— !' বলিয়া নীরব হইল।

রট্টা চিত্রকের হাত ধরিয়া স্কন্দের সম্মুখে লইয়া আসিল, বলিল—'ইনিই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী।'

স্কন্দ সবিস্ময়ে বলিলেন—'চিত্রক বর্মা— !'

রট্টা বলিল—'ইঁহার প্রকৃত নাম তিলক বর্মা।'

স্কন্দ বলিলেন—'তিলক বর্মা, তুমি ভূতপূর্ব আর্য রাজার পুত্র ?'

চিত্রক বলিল—'হাঁ, পূর্বে জানিতাম না, সম্প্রতি জানিয়াছি।'

স্কন্দ প্রশ্ন করিলেন—'প্রমাণ আছে ?'

চিত্রক বলিল—'যিনি আমার গোপন পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন তিনিই প্রমাণ দিবেন। আমার কোনও আগ্রহ নাই।'

রট্টা বলিল—'প্রমাণ আছে ; প্রয়োজন হইলে দিব। কিন্তু আর্য, প্রমাণের কি কোনও প্রয়োজন আছে ?'

স্কন্দ তীক্ষ্ণ চক্ষে একবার রট্টার মুখ ও একবার চিত্রকের মুখ দেখিলেন। তাঁহার অধরে ঈষৎ ক্লিষ্ট হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন—'না, প্রয়োজন নাই। তিলক বর্মা, বিটঙ্কের সিংহাসন তোমাকে দিলাম। রট্টা যশোধরা, বিটঙ্কের রাজমহিষী হইতে বোধকরি তোমার কোনও আপত্তি নাই ?'

রট্টা অধোমুখী হইয়া আবার পিতার পদতলে বসিয়া পড়িল। সভাস্থ সকলে চিত্রার্পিতবৎ এই দৃশ্য দেখিতেছিল, এখন হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

রোট্টা ধর্মাদিত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; চিত্রককে সম্বোধন করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—'বৎস, যৌবনের প্রচণ্ডতায় যে হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম তজ্জন্য অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। বিটঙ্কের সিংহাসন তোমার, তুমি তাহা ভোগ কর। আর, আমার রট্টা যশোধরাকে গ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণমুক্ত কর।'

চিত্রক মস্তক অবনত করিয়া বলিল—'আপনি স্বেচ্ছায় ঋণ পরিশোধ করিলেন ; আপনি মহানুভব। কিন্তু অন্য একটি আদান-প্রদান এখনও বাকি আছে।'

চিত্রক দ্রুতপদে কিরাতের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল ; বলিল—'আমার পরিচয় শুনিয়াছ। পিতৃঋণ শোধ করিতে প্রস্তুত আছ ?'

রক্তহীন মুখ তুলিয়া কিরাত বলিল—'আছি।'

চিত্রক বলিল—'তবে তরবারি লও। আমাকেও পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।'

পরিশিষ্ট

আবার কপোতকূট।

রাজপ্রাসাদ আলোকমালায় ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে বাদ্যোদম। ঝল্লরী মুরলী মৃদঙ্গ বাজিতেছে ; নগরীর পথে পথে নাগরিক নাগরিকার নৃত্যগীত আর শান্ত হইতেছে না। পুরাতন রাজপুত্র ও নূতন রাজকুমারীর বিবাহ। দুই রাজবংশ মিলিত হইয়াছে। রোট্টা ধর্মাদিত্য জামাতার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া চিল্লকূট বিহারে আশ্রয় লইবেন। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত বর-বধূর জন্য স্কন্ধাবার হইতে পাঁচটি হস্তী উপহার পাঠাইয়াছেন। বিশ্বাসঘাতক কিরাত মরিয়াছে।

সকলেই সুখী ; সকলেই আনন্দমত্ত। এমন কি বৃদ্ধ হূণ যোদ্ধা মোঙের অধরে হাসি ফুটিয়াছে। প্রত্যেক মদিরা-ভবনে নাগরিকেরা আনন্দ কোলাহল করিয়া তাহাকে ডাকিতেছে এবং মদ্যপান করাইতেছে। তাহার বহুশ্রুত গল্প শুনিয়া কেহই পলায়ন করিতেছে না, বরং উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছে ; বলিতেছে—'মোঙ্, তারপর কী হইল ? তারপর কী হইল ?' মোঙের সুরাভিষিক্ত মন আনন্দে টলমল করিতেছে। সে ক্রমাগত গল্প বলিয়া চলিয়াছে।

রাজপ্রাসাদে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। গভীর রাত্রে একটি পুষ্পসুরভিত কক্ষে চিত্রক রট্টা আর সুগোপা ছিল।

চিত্রক বলিল—'সুগোপা, তুমি আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ।'

সুগোপা চটুলকণ্ঠে বলিল—'বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে সখীকে পাইতেন কি ?'

পুষ্পাভরণভূষিতা রট্টার হাতে একটি রৌপ্যনির্মিত বাণ* ছিল ; কন্যাকে বিবাহকালে ইহা ধারণ করিতে হয়। সেই বাণ দিয়া সুগোপার উরুর উপর মৃদু আঘাত করিয়া রট্টা বলিল—'সুগোপা কি

* আধুনিক কাজললতা

আমার কাছে কিছু গোপন করিতে পারে। পর দিনই প্রাতে আসিয়া আমাকে তোমার সকল পরিচয় দিয়াছিল।'

চিত্রক রট্টার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'রট্টা, আমার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া তোমার কী মনে হইয়াছিল?'

রট্টার চক্ষু দু'টি ক্ষণকাল তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া রহিল; তারপর সে বলিল—'সেদিন সন্ধ্যার পর চাঁদের আলোয় প্রাকারের উপর তোমার সহিত দেখা হইয়াছিল, মনে আছে? তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তোমাকে প্রতিহিংসা লইবার সুযোগ দিব, নচেৎ তোমার হৃদয় জয় করিব। কিন্তু তুমি প্রতিহিংসা লইলে না। তাই তোমার হৃদয় জয় করিলাম; আর তোমাকে ভালবাসিলাম।'

রট্টা চিত্রকের পানে বিদ্যুদ্‌বিলাস তুল্য কটাক্ষ হানিল, তারপর সুগোপার কানে কানে বলিল—'সুগোপা, তুই এখন গৃহে যা—রাত্রি শেষ হইতে চলিল। আজিকার রাত্রে মালাকরকে আর বঞ্চিত করিস না।'

সুগোপাও চুপি চুপি বলিল—'বল না, নিজের মালাকর পাইয়াছ তাই আমাকে বিদায় করিতে চাও। আর বুঝি ত্বর সহিতেছে না?' সুগোপা ফুৎকারে প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

তারপর সুখস্বপ্নের ন্যায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে।

ওদিকে হূণের সহিত স্কন্দগুপ্তের যুদ্ধ চলিতেছে। হূণ কখনও হটিয়া যাইতেছে, কখনও অতর্কিত পথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বিটঙ্ক রাজ্যে এখনও হূণ প্রবেশ করিতে পারে নাই। চষ্টন দুর্গে অধিষ্ঠিত হইয়া গুলিক বর্মা সহস্র চক্ষু হইয়া সঙ্কটপথ পাহারা দিতেছে।

চিত্রক নিজ রাজ্যে এক সৈন্যদল গঠিত করিয়াছে। তিন সহস্র সৈন্য কপোতকূট রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়া আছে।

একদিন সূর্যাস্তের সময় প্রাসাদশীর্ষে উঠিয়া রট্টা দেখিল, চিত্রক স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পশ্চিম দিগন্তের পানে তাকাইয়া আছে।

রট্টা কাছে গিয়া তাহার বাহু জড়াইয়া দাঁড়াইল। 'কি দেখিতেছ?'

চমক ভাঙ্গিয়া চিত্রক বলিল—'কিছু না। সূর্যাস্তের বর্ণগৌরব কী অপূর্ব; মেঘ পাহাড় ও আকাশ একাকার হইয়া গিয়াছে—যেন রক্তবর্ণ রণক্ষেত্র।'

রট্টা কিছুক্ষণ চিত্রকের মুখের উপর চক্ষু পাতিয়া রহিল, তারপর বলিল—'যুদ্ধে যাইবার জন্য তোমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে?'

ধরা পড়িয়া গিয়া চিত্রক একটু করুণ হাসিল। রট্টা তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিল—'যদি মন অধীর হইয়া থাকে, যুদ্ধে যাও না কেন?'

চিত্রক চকিতে একবার তাহার পানে চাহিল, কিন্তু নীরব রহিল। রট্টা তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি। তুমি ভাবিতেছ, হূণ আমার স্বজাতি, তাহাদের বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধযাত্রা করিলে আমি দুঃখ পাইব। তোমার বোধহয় বিশ্বাস স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া পিতা রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন। সত্য কি না?'

চিত্রক বলিল—'না, ধর্মাদিত্য অন্তর হইতে বুদ্ধ তথাগতের শরণ লইয়াছেন। কিন্তু তুমি রট্টা? তোমার দেহে হূণ রক্ত আছে। আমি হূণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলে সত্যই কি তুমি দুঃখ পাইবে না?'

রট্টা দৃঢ়স্বরে বলিল—'না। হূণ যেমন তোমার শত্রু, তেমনই আমার শত্রু। আমার দেশ যে

আক্রমণ করে, পরমাত্মীয় হইলেও সে আমার শত্রু। তোমার মন টানিয়াছে, তুমি যুদ্ধে যাও, স্কন্দগুপ্তের সহিত যোগদান কর।'

চিত্রক রট্টাকে বাহুবদ্ধ করিয়া বলিল—'রট্টা, ভাবিয়াছিলাম আমার রাজ্য যতদিন আক্রান্ত না হইবে ততদিন নিরপেক্ষ থাকিব। কিন্তু তবু হৃদয় অধীর হইয়াছিল। তুমি আমার মনের কথা কি করিয়া জানিলে ?'

'আমি অন্তর্যামিনী তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই ?' রট্টা হাসিল।

উৎসাহভরে চিত্রক বলিল—'তবে যাই ? আমি এক সহস্র সৈন্য লইয়া যাইব ; বাকি দুই সহস্র পুরী রক্ষার জন্য থাকিবে।'

রট্টা বলিল—'তুমি রাজা, তোমার যাহা ইচ্ছা কর। কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে রাজ্য দেখিবে কে ?'

চিত্রক বলিল—'তুমি দেখিবে। চতুর ভট্ট দেখিবেন।'

রট্টা অনেকক্ষণ স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। চোখ দু'টি ছলছল করিতে লাগিল। শেষে বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল—'তুমি যখন যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিবে, একটি নূতন মানুষ পুরদ্বারে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাইবে।' বলিয়া স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল।



গৌড়মল্লার

প্রথম পরিচ্ছেদ
আভীরপল্লী

বাংলা দেশের বহুপ্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায়, সেকালে ময়ূরাক্ষী নদীর একটি সখী-নদী ছিল ; কজঙ্গলের পর্বতসানু হইতে নিঃসৃত হইয়া নদীটি কর্ণসুবর্ণ নগরের নিকট ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। তারপর দুই সখী একসঙ্গে কিছুদূর দক্ষিণে গিয়া ভাগীরথীর স্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় নদীটি এখন আর নাই ; হয়তো মজিয়া শুকাইয়া গিয়াছে, হয়তো অন্য নামে অন্য খাতে বহিতেছে। তাহার পুরাতন নামও মানুষের স্মৃতি হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ হইতে অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বে এই নদীর নাম ছিল ময়ূরী, চলিত কথায় মৌরী নদী। গৌড়বঙ্গের মহাসমৃদ্ধ রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল ময়ূরাক্ষী, মৌরী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে।

মৌরী নদী ময়ূরাক্ষী অপেক্ষা ক্ষীণা। বর্ষায় তাহার জল দু'কূল ছাপাইয়া যায়, কিন্তু বর্ষাপগমে আবার জলধারা শীর্ণ ও স্বচ্ছ হইয়া খাতের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসে। তখন আর তাহার বুকে বড় নৌকা চলে না, তাহার তীররেখার পাশে পাশে মানুষের পদচিহ্ন-মসৃণ পথ জাগিয়া ওঠে।

এই পদাঙ্কচিহ্নিত রেখা ধরিয়া উজান পথে গমন করিলে মৌরীর তীরে ছোট ছোট গ্রাম দেখা যায়। রাজধানী হইতে যত দূরে যাওয়া যায় গ্রামের সংখ্যা ততই বিরল হইয়া আসে। অবশেষে কর্ণসুবর্ণ হইতে অনুমান বিংশ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে একটি গ্রামে আসিয়া পথ শেষ হয়। ইহাই শেষ গ্রাম, ইহার পর আর গ্রাম নাই।

গ্রামটি আভীরপল্লী : নাম বেতসগ্রাম। ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বেকার গৌড়দেশের এক প্রান্তে মৌরী নদীর তীরে এই ক্ষুদ্র গ্রামের কয়েকটি নরনারীকে লইয়া এই কাহিনী।

আভীরপল্লীর বেতসগ্রাম নামটি সার্থক। নদী ও গ্রামের ব্যবধানস্থলটুকু ঘন বেতসবনে পূর্ণ। নদীর পূর্বতীরে উচ্চ বাস্তুভূমির উপর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত, গ্রাম হইতে বেতসবনের ভিতর দিয়া নদীতে যাইতে হয়। নদীর সরসতায় পুষ্ট বেতসলতাগুলি পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া ঊর্ধ্বে বিতান রচনা করিয়াছে ; যেন এক একটি নিভৃত কুটির কক্ষ। মধ্যাহ্নেও এই কুঞ্জ-কুটিরগুলির অভ্যন্তরে সূর্যের তাপ প্রবেশ করে না ; ভূমিতলে স্খলিত পত্রের কোমল আস্তরণ সুখশয্যা রচনা করে।

এই বঞ্জুল-কুঞ্জগুলি গ্রামের বিরাম নিকেতন। এখানে বালক-বালিকারা লুকোচুরি খেলা করে ; ক্লান্ত কিষাণ দ্বিপ্রহরে নিদ্রাসুখ উপভোগ করে ; কিশোরী সখীরা গলা ধরাধরি করিয়া মনের কথা বিনিময় করিতে যায় ; কদাচিৎ কন্দর্পপীড়িত যুবকযুবতী গোপনে সংকেতকুঞ্জে

অভিসার যাত্রা করে। প্রকৃতির কোলে সহজ মধুর মন্থর জীবনযাত্রা ; জটিলতা নাই, আড়ম্বর নাই, উদ্বেগ নাই। মহাকাল এখানে অতি মৃদুচ্ছন্দে পদপাত করেন।

গ্রামের পশ্চিমদিকে যেমন বঞ্জুলবন ও মৌরী নদী, দক্ষিণদিকে তেমনি ইক্ষু ও ধানের ক্ষেত। ধান্য ইক্ষু গোধন এই তিনটি গ্রামের প্রধান সম্পদ। ধান্য হইতে যে চাউল হয় তাহা গ্রামেই থাকে। বাঙালী চিরদিন অন্নভোজী জীব ; ভাত তাহার অন্ন, ভাত তাহার পানীয়। বাঙালীই প্রথম ভারতে ভাত হইতে তীব্র পানীয় প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল।

তারপর গোধন হইতে আসে ঘৃত নবনী ; আর ইক্ষু হইতে গুড়। এই গুড়ই দেশের প্রাণবস্তু ; গুড় হইতেই দেশের নাম গৌড়। আভীরগণ ঘৃত নবনী ও গুড় ভারে বহন করিয়া মৌরীর তীরপথ ধরিয়া ভিন্ন গ্রামে যায়, কখনও বা কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত উপস্থিত হয়। নগরে কড়ি কার্যাপণ দ্রম্মের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয় করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসে। কেহ বধূর জন্য রূপার কর্ণফুল আনে, কেহ বা শিশুর জন্য রঙীন ক্রীড়াপুত্তলি লইয়া আসে। এইভাবে বহির্জগতের সহিত সূক্ষ্ম যোগসূত্র রাখিয়া বেতসগ্রামের নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রা চলিতে থাকে।

গ্রামের উত্তরে বাথান ; সম্মিলিত ধেনুপালের আশ্রয়। ইহার পর কিছুদূর হইতে জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশই পলাশ, অন্যান্য বৃক্ষও আছে। নিবিড় তরুশ্রেণী বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া কজঙ্গলের পার্বত্য উষরতায় লীন হইয়া গিয়াছে। অত দূরে গ্রামের কেহ যায় না। মেয়েরা পলাশবনে যায় লাক্ষাকীটের সন্ধানে ; লাক্ষাকীট হইতে আলতা হয়। লাক্ষার রসে চরণ রঞ্জিত করিয়া সন্ধ্যাকালে গোপকন্যারা বাথানে গো-দোহন করে ; তারপর কলসী কক্ষে ঘরে ফিরিয়া আসে।

গ্রামের পূর্বদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমতল প্রান্তর— মাঠের পর মাঠ, তৃণাঞ্চিত শ্যামল চারণভূমি। এখানে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত শষ্পাহরণনিরত গোধন বিচরণ করে, বেণুকহস্ত রাখাল বালক খেলা করে।

এই ত্রিপ্রান্তর মাঠের পূর্বতম সীমায় উদ্বেলতরঙ্গময়ী ভাগীরথী উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত। তখন ইহাই ছিল জাহ্নবীর মূল ধারা, পদ্মা ছিল সংকীর্ণ উপশাখা মাত্র। এই পথে উত্তর ভারতের বাণিজ্য সমুদ্রে যাইত। চম্পা মুদ্গগিরি পাটলিপুত্র, এমন কি বারাণসী হইতে পণ্যভারমন্থর বাণিজ্যতরী শুভ্র পাল তুলিয়া জাহ্নবীর স্রোতে দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া যাইত। বাংলার নৌবাহিনী বন্দরে বন্দরে পাহারা দিত, শুল্ক আদায় করিত।

স্থলপথেও উত্তর ভারতের সহিত বাংলার যোগ ছিল। গঙ্গার পশ্চিম তীরের সমান্তরালে অশ্মাচ্ছাদিত রাজপথ তাম্রলিপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ণসুবর্ণের পাশ দিয়া উত্তরে চলিয়া গিয়াছিল, উদুম্বরি পার হইয়া কজঙ্গলের গিরিব্যূহ ভেদপূর্বক অযোধ্যা পর্যন্ত গিয়াছিল। এই পথে সার্থবাহ অন্তর্বণিকেরা যাতায়াত করিত, তীর্থযাত্রীরা পদব্রজে পুণ্য আহরণে বাহির হইত ; ক্বচিৎ চীনদেশ হইতে আগত পরিব্রাজক বুদ্ধের স্মৃতিপূত লীলাস্থলগুলি দেখিয়া বেড়াইতেন।

কিন্তু মৌরীতীরের ক্ষুদ্র ঘোষপল্লী হইতে এই নাগরিক বৈভবপ্রবাহ বহু দূরে।

একদিন হেমন্তের পূর্বাহ্ণে বেতসগ্রামে ইক্ষুপর্ব আরম্ভ হইয়াছিল। আকাশে সোনালী রৌদ্র, বাতাসে মধুর কবোষ্ণতা। শালিধান্য ইতিপূর্বে ক্ষেত হইতে মরাইয়ে উঠিয়াছে। আজ প্রথম আখ মাড়াই আরম্ভ।

গ্রামের মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত মাঠ। এই মাঠটিকে গ্রামের যৌথ কুটির-প্রাঙ্গণ বলা চলে ; খড়-ছাওয়া মাটির কুটিরগুলি তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আছে। এই মাঠের কেন্দ্রস্থলে আজ ইক্ষুযন্ত্র বসিয়াছে। ইক্ষুযন্ত্রের দেবতা পণ্ডাসুর পূজা পাইয়াছেন। তারপর গ্রামের

ছেলে-বুড়া স্ত্রীপুরুষ আনন্দে মাতিয়াছে।

কৃষাণগণ ক্ষেত্র হইতে আঁটি আঁটি ইক্ষুদণ্ড আনিয়া পূর্বেই স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছিল ; সেই ইক্ষু এখন নিষ্পেষিত হইয়া তরল রসের আকারে বাহির হইয়া আসিতেছে। রমণীরা কলসীতে রস ধরিতেছে, আর সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া পান করিতেছে। মাটির ভাণ্ডিকায়, নারিকেল ও বিল্বফলের খোলায় স্নিগ্ধ সফেন রস লইয়া সকলে পরস্পরকে দিতেছে, নিজেরাও গলাধঃকরণ করিতেছে। আজিকার রস হইতে গুড় হইবে না ; সকলে কেবল রস পান করিয়া আনন্দ করিবে। যুবতীরা নাচিবে, প্রৌঢ়ারা অশ্লীল গান গাহিবে, পুরুষেরা ঢোল ডুবৃকি বেণু বাজাইয়া যথেচ্ছা মাতামাতি করিবে। আজ কাহারও ঘরে হাঁড়ি চড়ে নাই।

আগামী কল্য হইতে রীতিমত গুড় প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হইবে। ইক্ষুযন্ত্রের চারিপাশে সারি সারি আখা জ্বলিবে ; আখার উপর অগভীর বৃহৎ কটাহে মেয়েরা রস পাক করিবে। রস গাঢ় হইয়া শেষে সোনার বর্ণ ধারণ করিবে। ইহাই বাংলা দেশের খাঁটি সোনা। বাংলার গ্রামে গ্রামে এই সোনা উৎপন্ন হইয়া অর্ধেক পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে এবং ধাতব স্বর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসে।

বেতসগ্রামের অধিবাসী শতাধিক পরিবারের মধ্যে অধিকাংশই গোপ জাতি ; কিন্তু কর্মকার কুম্ভকার তন্তুবায় প্রভৃতি অন্য জাতিও আছে। সকলেই ভূমিজীবী ; অবসরকালে জাতিধর্ম পালন করে। গ্রামে জাতিভেদ বেশি প্রখর নয়, সকলে একত্র পানাহার করে ; তবে বিবাহের সময় জাতি দেখিতে হয়। তাহাতেও খুব বেশি কড়াকড়ি নাই ; কদাচিৎ অসবর্ণ সংযোগ ঘটিয়া গেলে গ্রামপতিরা ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া বা দুই চারি পণ দণ্ড লইয়া ক্ষান্ত হন, কঠিন শাস্তির বিধান নাই। এইরূপ শৈথিল্যের কারণ, যে-সময়ের কথা সে সময়ে জাতের বন্ধন বাঙালীর সর্বাঙ্গে এমন নাগপাশ হইয়া বসে নাই। বিশেষত এই প্রান্তিক পল্লীতে উচ্চবর্ণের কেহ বাস করে না। যাহারা বাস করে তাহাদের শ্যামল দেহে আর্য রক্তের সংস্রব যেমন অতি অল্প, তাহাদের মনে আর্যনীতির প্রভাবও তেমনি শিথিলমূল ; বৈদিক সংস্কার এখনও তাহাদের প্রাণে শিকড় গাড়িতে পারে নাই।

গ্রামের বাহিরে অশ্বত্থমূলে যে দেবস্থান আছে সেখানে দুইটি দেবতার প্রস্তর মূর্তি পাশাপাশি দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখা যায়। একটি চক্রস্বামী বিষ্ণুর বিগ্রহ, অন্যটি শাক্যমুনি বুদ্ধের মূর্তি। গ্রামবাসীরা তিলতুলসী দিয়া চক্রস্বামীর অর্চনা করে, দুগ্ধতণ্ডুল দিয়া শাক্যমুনির সন্তোষ বিধান করে ; কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই। এই দেবস্থানের যিনি স্বয়ংবৃত পূজারী তাঁহার নাম চাতক ঠাকুর। তিনি ব্রাহ্মণ কি বৌদ্ধ তাহা কেহ জানে না ; তাঁহার বয়স ও জাতি দুই-ই রহস্যের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। কিন্তু চাতক ঠাকুরের কথা পরে হইবে।

আজিকার উৎসব হইতে ইতর প্রাণীরাও বাদ পড়ে নাই। গ্রামস্থ ছাগলের পাল ইক্ষুদণ্ডের সবুজ পাতাগুলি চিবাইতেছে। আকাশে অসংখ্য কাক ও শালিক পাখি কলরব করিয়া উড়িতেছে, এবং সুবিধা পাইলেই ভাণ্ডে চঞ্চু ডুবাইয়া কিঞ্চিৎ নেশা করিয়া লইতেছে। বেলা যত বাড়িতেছে, উৎসবকারী মানুষগুলির নেশায় তত পাক ধরিতেছে। গ্রামের মহত্তর ও প্রবীণগণ মাঠের একস্থানে দল পাকাইয়া বসিয়াছেন, পাশে কয়েকটি সফেন রসের কলস। তাঁহারা রসাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুণ্টি ও কড়ি খেলিতেছেন। পণ রাখিয়া হারজিত চলিতেছে। মাঝে মাঝে হর্ষধ্বনি উঠিতেছে। মাঠের অন্য অংশে যুবতীরা হাত-ধরাধরি করিয়া একটি রসপূর্ণ কুম্ভের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। যুবতীরা সকলেই বিবাহিতা ; তাহাদের মধ্যে যাহারা সন্তানবতী তাহারা সন্তান কাঁখে করিয়াই নাচিতেছে। অদূরে যুবকেরা বাহ্বাস্ফোট করিয়া পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, মল্লক্রীড়া করিতেছে, যুবতীদের লক্ষ্য করিয়া রঙ্গ-কৌতুক করিতেছে। চারিদিকে সঙ্কোচহীন প্রাণখোলা মদবিহ্বলতা। আজিকার দিনে ইহাই চিরাচরিত রীতি।

এই সার্বজনীন মদবিহ্বলতায় গ্রামের দুইটি নারী কেবল যোগদান করে নাই ; গোপা ও তাহার

কন্যা রঙ্গনা। মাঠের উত্তরপ্রান্তে তাহাদের কুটির ; অন্যান্য কুটিরের মতই বেতের চঞ্চালীতে মাটির লেপ দেওয়া খড় ছাওয়া ক্ষুদ্র কুটির। গোপা কুটিরের দেহলিতে বসিয়া তুলার পিঞ্জা হইতে টাকুতে সূতা কাটিতেছিল। আর রঙ্গনা গৃহকর্মের ছলে বারবার গৃহের ভিতর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে ভিতরে আনাগোনা করিতেছিল। তাহার মন ও কৌতূহলী দৃষ্টি পড়িয়া ছিল মাঠের ঐ রঙ্গলীলার দিকে।

গোপার বয়স প্রায় চল্লিশ। দেহের গঠন কৃশ এবং দৃঢ় ; গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। মুখের ডৌল ভাল, চোখ দুটি বড় বড়। কিন্তু মুখে চোখে তীক্ষ্ণ কঠিনতা ; ওষ্ঠাধরের সূক্ষ্ম রেখা দৃঢ়সংবদ্ধ। গোপা যৌবনকালে সুন্দরী ছিল ; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সেই শ্রী কমনীয়তায় রূপান্তরিত হয় নাই, বরং কর্কশ কঠোর শ্রীহীনতায় পরিণত হইয়াছে। যাহারা বিশ বছর আগে গোপার যৌবনশ্রী দেখিয়াছিল তাহারা বলাবলি করিত, গোপা এক সময় নারী ছিল— এখন যেন পুরুষ হইয়া গিয়াছে। কথাটা মিথ্যা নয় ; যে স্ত্রীলোকের ঘরে পুরুষ নাই তাহার প্রকৃতি পুরুষভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে ইহা স্বাভাবিক। উপরন্তু গোপার চরিত্রে নারীসুলভ নমনীয়তা কোনও কালেই ছিল না।

গোপা যৌবনকালে সুন্দরী ছিল, তাহা গ্রাম্য আদর্শে। কিন্তু তাহার মেয়ে রঙ্গনাকে দেখিলে গ্রাম্য নাগরিক কোনও আদর্শই মনে থাকে না, কেবল বিস্ময়োৎফুল্ল হইয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। মায়ের মতই দীঘল কৃশাঙ্গী ; কিন্তু সর্বাঙ্গে রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। মাথার আকুঞ্চিত কেশ হইতে পায়ের রক্তিমাভ নখ পর্যন্ত যেন কালিদাসের শকুন্তলা— রূপোচ্চয়েন বিধিনা মনসা কৃতানু। গায়ের রঙ কেবল দুধে-আলতা মিশাইয়াই সৃষ্ট হয় নাই, তাহার সহিত কাঁচা সোনাও মিশিয়াছে।

বেতসগ্রামে এই বিদ্যুল্লতার মত সুন্দরী মেয়ে কোথা হইতে আসিল ? গ্রামে এমন গায়ের রঙ তো আর কাহারও নাই। এখানে গায়ের রঙ অধিকাংশই ঘনশ্যাম অথবা উজ্জ্বল শ্যাম ; দুই চারিটি নবদূর্বাশ্যাম, কদাচিৎ এক-আধটি গোধূমবর্ণ। এই গ্রামের মেয়ে রঙ্গনা এমন অপূর্ব পাণ্ডুশ্রী কোথায় পাইল ?

প্রশ্নটি কেবল আলঙ্কারিক প্রশ্ন নয় ; একদিন এই প্রশ্ন গ্রামের সকল স্ত্রী-পুরুষকে উচ্চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সে যাক। এত রূপ লইয়াও রঙ্গনার এখনও বিবাহ হয় নাই। গ্রামের নিয়ম, কন্যার যৌবন-উন্মেষ হইলেই বিবাহ হইবে। কিন্তু রঙ্গনা পূর্ণযৌবনা হইয়াও এখনও অবিবাহিতা।

রঙ্গনা বারবার ঘর-বাহির করিতেছিল, আর তাহার সতৃষ্ণ চক্ষু দুটি ছুটিয়া যাইতেছিল ঐ মাঠের দিকে যেখানে তাহারই সমবয়স্কা মেয়েরা পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া নূপুর কঙ্কণ বাজাইয়া নৃত্য করিতেছে। রঙ্গনার চোখের দৃষ্টি হইতে মনে হইতেছিল সে বুঝি এখনি ছুটিয়া গিয়া ওই নৃত্যাবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িবে ; কিন্তু আবার অভিমানে অধর দংশন করিয়া সে ঘরের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহার যৌবনভরা মনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ যেন ঐখানে পুঞ্জিত হইয়া আছে ; কিন্তু ওখানে তাহার যাইবার উপায় নাই।

গোপা সূতা কাটিতে কাটিতে মেয়ের এই অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার কঠিন দৃষ্টি মাঝে মাঝে মাঠের দিকে যাইতেছিল ; অধরের দৃঢ়বদ্ধ রেখা বাঁকিয়া উঠিতেছিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে আবার টাকুতে মন দিতেছিল।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। আকাশের দিকে একবার দৃষ্টি তুলিয়া গোপা ডাকিল — 'রাঙা !'

রঙ্গনা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোপা বলিল— 'তোর ঘরের কাজ সারা হল ?'

রঙ্গনা বলিল— 'হাঁ মা।'

'তবে নদীতে যা। নেয়ে জল নিয়ে আসবি।'

'যাই মা।'

রঙ্গনা কলসী আনিতে ঘরের ভিতর গেল। তাহার একটা চাপা নিশ্বাস পড়িল। যে যখন কলসী কাঁখে কুটির হইতে বাহির হইল তখন গোপাও তাহার পানে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রঙ্গনার জন্মকথা

কুটির হইতে বাহির হইয়া রঙ্গনা মাঠের দিকে গেল না, যদিও মাঠের ভিতর দিয়াই নদীতে যাইবার সিধা পথ। সে কুটিরের পিছন দিক ঘুরিয়া নদীর পানে চলিল। মাঠের ভিতর দিয়া যাইলে সকলে তাহাকে দেখিতে পাইবে, হয়তো কেহ কিছু বলিবে। তাহাতে কাজ নাই।

চলিতে চলিতে রঙ্গনার কালো চোখ দুটি ছলছল করিতে লাগিল। আবার একটি নিশ্বাস পড়িল।

ক্রমে সে বেতসবনের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। এই দিকটা বেতসবনের শেষ প্রান্ত, তেমন ঘন নয়। এখানে ওখানে দুই চারিটা ঝোপ, যত নদীর দিকে গিয়াছে তত ঘন হইয়াছে।

এইখানে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে একটি নিভৃত বেতসকুঞ্জ ছিল; এটি রঙ্গনার নিজস্ব, আর কেহ ইহার সন্ধান জানিত না। পাখির খাঁচার মত চারিদিকে জীবন্ত শাখাপত্র দিয়া ঘেরা নিরালা একটি স্থান; এই স্থানটিকে সযত্নে পরিষ্কৃত করিয়া রঙ্গনা কুটির-কক্ষের মতই তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে যখন ঘরে মন টিকিত না বা হাতে কাজ থাকিত না তখন সে চুপি চুপি এই কুঞ্জে আসিত। কয়েকটি খড়ের আঁটি আগে হইতে কুঞ্জে সঞ্চিত ছিল, তাহাই বিছাইয়া শয়ন করিত। নির্জন দ্বিপ্রহরে পত্রান্তরাল-নির্গলিত সবুজ আলো উপর হইতে ঝরিয়া পড়িত; রঙ্গনা সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া যৌবনের কল্পকুহকময় স্বপ্ন দেখিত। কখনও একজোড়া মৌটুসী পাখি আসিয়া শাখাপত্রের মধ্যে খেলা করিত; কখনও দূর আকাশে শঙ্খচিল ডাকিত। এইভাবে তাহার নিঃসঙ্গ তন্দ্রামন্থর মধ্যাহ্ন কাটিয়া যাইত।

আজ রঙ্গনা মাতার আদেশ অনুযায়ী নদীতে না গিয়া প্রথমে তাহার কুঞ্জে আসিয়া ক্লান্তভাবে কলস নামাইয়া বসিল। মনের মধ্যে যখন অভিমান ও অভীপ্সার মল্লযুদ্ধ চলিতে থাকে তখন শরীর অকারণেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। রঙ্গনা দুই হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মাঠ এখান হইতে অনেকটা দূরে, তবু নৃত্যপরা যুবতীদের কণ্ঠোত্থিত ঝুমুর গান বংশীর সহযোগে তাহার কানে আসিতে লাগিল—

ও ভোমরা সুজন, তুমি কাছে এস না
আমার রসের কলস উছলে পড়ে
কাছে এস না।

রঙ্গনা চক্ষু মুদিয়া ভাবিতে লাগিল — কেন! কেন আমি ওদের একজন নই? কেন সবাই আমাকে দূরে ঠেলে রাখে? কেন আমার বিয়ে হয়নি? কেন আমার মা সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে? কেন? কেন?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে রঙ্গনার জন্মকথা বলিতে হয়।

আঠারো বছর আগে গোপার স্বামী দারুক বেতসগ্রামের অধিবাসী ছিল। গোপার বয়স তখন একুশ-বাইশ ; দারুকের বয়স ত্রিশ। কিন্তু তাহাদের সন্তান হয় নাই। এই লইয়া স্ত্রী-পুরুষে কলহ লাগিয়া থাকিত। দারুক রাগী মানুষ, গোপাও অতিশয় প্রখরা ; উভয়ে উভয়কে দোষ দিত। গাঁয়ের লোক হাসিতে হাসিতে তামাসা দেখিত।

একদিন বসন্ত কালের প্রভাতে দাম্পত্য কলহ চরমে উঠিয়াছিল। প্রতিবেশীরা কুটির সম্মুখে সমবেত হইয়া বাগ্‌যুদ্ধ উপভোগ করিতেছিল এবং শব্দভেদী সমর কখন দোর্দণ্ড রণে পরিণত হইবে উদ্‌গ্রীবভাবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় তাহাদের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। দেখা গেল, গো-রথে আরোহণ করিয়া একজন আগন্তুক গ্রামে প্রবেশ করিতেছে।

গ্রামে বহির্জগৎ হইতে বড় কেহ আসে না, উদ্দীপনা উত্তেজনার অবকাশ বড় অল্প। সুতরাং গ্রামের যে-যেখানে ছিল সকলে গিয়া গো-রথ ঘিরিয়া দাঁড়াইল ; স্ত্রীপুরুষ, বালক-বালিকা, কুকুর-বিড়াল, কেহই বাদ গেল না। এমন কি দারুকও দাম্পত্য কলহ ধামাচাপা দিয়া মাঠে আসিয়া জুটিল।

মাঠের মাঝখানে গো-রথ থামাইয়া যিনি অবতরণ করিলেন তিনি একজন রাজপুরুষ, নাম কপিলদেব। অতি সুন্দর আকৃতি, বলদৃপ্ত তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দেহ। পরিধানে যোদ্ধৃবেশ, মস্তকে উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ, কটিদেশে তরবারি। পরমদৈবত শ্রীমন্মহারাজ শশাঙ্কদেবের পক্ষ হইতে ইনি সৈন্য সংগ্রহে বাহির হইয়াছেন।

গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক তখন হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন। রাজ্যবর্ধনের অপমৃত্যুর ফলে উত্তর ভারতে যে আগুন জ্বলিয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। হর্ষবর্ধন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পৃথিবী গৌড়শূন্য করিবেন, গৌড়-পিশুন শশাঙ্কের রাজ্য ছারখার না করিয়া তিনি নিরস্ত হইবেন না। বছরের পর বছর যুদ্ধ চলিয়াছে ; শশাঙ্কের কান্যকুব্জ পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যসীমা ক্রমশ পূর্বদিকে হটিয়া আসিতেছে। যুদ্ধে ক্রমাগত সৈন্যক্ষয় হইতেছে ; তাই নিত্য নূতন সৈন্যের প্রয়োজন। গৌড় রাজ্যের প্রতি গ্রামে প্রতি জনপদে রাজপুরুষগণ পরিভ্রমণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে।

বেতসগ্রামে ইতিপূর্বে কেহ সৈন্য সংগ্রহে আসে নাই, কপিলদেবই প্রথম। কপিলদেবের আকৃতি যেমন নয়নাভিরাম, বচন-পটিমাও তেমনি মনোমুগ্ধকর। তিনি সমবেত গ্রামিকমণ্ডলিকে নিজ আগমনের উদ্দেশ্য সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। গৌড়-গৌরব শশাঙ্কদেব উত্তর ভারতে অগণিত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন, রণদুর্মদ গৌড়সৈন্যের পরাক্রমে আর্যাবর্ত থরথর কম্পমান। যে সকল বীর গৌড়বাসী যুদ্ধে যাইতেছে তাহারা বহু নগর লুণ্ঠন করিয়া স্বর্ণ রৌপ্য মণিমাণিক্য লইয়া ঘরে ফিরিতেছে। এস, কে যুদ্ধে যাইবে— কে অক্ষয়কীর্তি অর্জন করিবে ? তে নির্যান্তু ময়া সহৈকমনসো যেষাং অভীষ্টং যশঃ।

প্রথমেই দারুক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল— 'আমি যুদ্ধে যাব।'

আরও দুই চারিজন নবীন যুবক তাহার সহিত যোগ দিল। কপিলদেব তাহাদের বলিয়া দিলেন— কোথায় গিয়া রাজসৈন্যদের সহিত মিলিত হইতে হইবে। কপিলদেব নিজে তাহাদের সহিত যাইবেন না, আজ রাত্রে গ্রামে বিশ্রাম করিয়া কল্য প্রাতে কর্ণসুবর্ণে ফিরিয়া যাইবেন।

দারুক লাফাইতে লাফাইতে নিজ কুটিরে ফিরিয়া গিয়া সদর্পে পিঠে ঢাল বাঁধিল, হাতে সুদীর্ঘ বংশদণ্ড লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যাত্রাকালে গোপাকে শাসাইয়া গেল— 'যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আর একটা বিয়ে করব। দেখিস্ তখন ছেলে হয় কিনা—'

গোপা খরশান চক্ষে চাহিল। তাহার জিহ্বায় যে কথাটা উদ্‌গত হইয়াছিল তাহা সে অধর দংশন করিয়া রোধ করিল। দারুক বীরপদক্ষেপে চলিয়া গেল।

কপিলদেব গ্রামে রহিলেন। গ্রামের মহত্তর সসম্মানে রাজপুরুষকে স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করিলেন। দধি দুগ্ধ ছাগবৎস প্রভৃতি চর্ব্যচুষ্যেরও প্রচুর আয়োজন হইল। রাজপুরুষ মহাশয় কিছুই অবহেলা করিলেন না।

অন্যান্য গুণাবলির সঙ্গে রাজপুরুষ মহাশয়ের আর একটি সদ্‌গুণ ছিল, সুন্দরী রমণীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইত। গোপাকে তিনি দেখিয়াছিলেন ; তাঁহার অভিজ্ঞ চক্ষের মানদণ্ডে গোপার রূপ-যৌবন তুলিত হইয়াছিল। অবশ্য সামান্যা পল্লীবধূ নগরকামিনীর বিলাস-বিভ্রম কোথায় পাইবে ? কিন্তু মধুর অভাব গুড়ের দ্বারা পূরণ করিতে হয়, এরূপ প্রবাদবাক্য আছে। সুতরাং চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি ? রাজকার্যে ভ্রাম্যমাণ সৈন্য-সংগ্রাহকের মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনেরও তো প্রয়োজন আছে।

সেদিন অপরাহ্ণে গোপা নিজের দ্বার-পিণ্ডিকায় বসিয়া তূলার পাঁজ কাটিতেছিল। তাহার অন্তরের ক্রোধ এখনও শান্ত হয় নাই। দারুক তাহাকে মিথ্যা দোষ দিয়া চলিয়া গিয়াছে— ইহার প্রতিশোধ যদি সে লইতে পারিত ! কিন্তু সে কী করিবে ? নারী তো আর যুদ্ধে যাইতে পারে না—

একটি মধুর কণ্ঠস্বর তাহার উত্তপ্ত চিন্তার উপর যেন কোমল করাঙ্গুলি বুলাইয়া দিল— 'সুচরিতে, তোমার কাছে আমি বড়ই অপরাধী—'

গোপা চমকিয়া মুখ তুলিল। দেখিল, কান্তিমান রাজপুরুষ স্মিতমুখে কুটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। গোপা জড়সড় হইয়া চক্ষু নত করিল।

অনাহূত কপিলদেব দেহলীর এক প্রান্তে বসিলেন। দক্ষিণ হইতে ঝিরি ঝিরি বাতাস দিতে আরম্ভ করিয়াছে, গোপার কর্ণে তালপত্রের লঘু অবতংস দুলিতেছে। কপিলদেব স্নিগ্ধকণ্ঠে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কর্তব্যের অনুরোধে মানুষকে কত অপ্রীতিকর কাজ করিতে হয়, কত সুখের সংসারে বিচ্ছেদ ঘটাইতে হয়। গ্রামবধূরা স্বভাবতই পতিপ্রাণা হইয়া থাকে—

এই কথা শুনিয়া গোপা অধরের ঈষৎ ভঙ্গি করিয়া ভ্রূকুটি করিল, কপিলদেব তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি তৃপ্ত মনে অন্য কথা পাড়িলেন। নগরের নানা কথা ; গ্রাম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন। গোপা প্রথমে নীরব রহিল, তারপর একাক্ষর উত্তর দিল ; শেষে দুই একটি কথা বলিল।

তারপর তাহাদের চক্ষু এক সময় পরস্পর আবদ্ধ হইয়া গেল। চোখে চোখে যে কথার বিনিময় হইল তাহা জীবনের আদিমতম কথা, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না।

কপিলদেব গ্রামে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রত্যূষেই গো-রথে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু গ্রামের সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কপিলদেব যে গভীর রাত্রে গোপার কুটিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা একজন বিনিদ্র প্রতিবেশীর চক্ষু এড়ায় নাই। কথাটা কিন্তু কানাঘুষার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল, প্রকাশ্যে কেহ গোপার নামে কোনও রটনা করিতে সাহস করিল না। প্রমাণ তেমন বলবান নয় ; গোপা বড় মুখরা ; তাহার নামে এরূপ অপবাদ দিলে সেও ছাড়িয়া কথা কহিবে না।

ইহার পর তিন মাস কাটিয়া গেল। গোপার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সে নিজেই তাহা সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করিল। কাহারও দোষ ধরিবার উপায় ছিল না, তবু গ্রামের কৌতুক-কৌতূহলী রসনা আর একবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। রসিক ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল— ভাগ্যে রাজপুরুষ আসিয়া দারুককে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিল তাই তো দারুকের বংশরক্ষা হইল।

দারুক আর যুদ্ধ হইতে ফিরিল না। তাহার সঙ্গীদের মধ্যে একজন ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, মুদ্‌গগিরির যুদ্ধে দারুক মরিয়াছে। গোপা হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিয়া কপালের সিন্দূর মুছিল।

তারপর যথাসময়ে, দারুক যুদ্ধে যাইবার নয় মাস পরে, গোপা এক কন্যা প্রসব করিল। এই ঘটনার জন্য গ্রামবাসীরা প্রস্তুত ছিল, সুতরাং ইহা লইয়া অধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টির কথা নয়। কিন্তু জানা গেল, সদ্যপ্রসূত কন্যাটির গাত্রবর্ণ দুগ্ধফেনের ন্যায় শুভ্র! ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? দারুকের বর্ণ ছিল ধান-সিদ্ধ-করা হাঁড়ির তলদেশের ন্যায়, গোপাকেও বড় জোর উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে। তবে কন্যা এমন গৌরাঙ্গী হইল কেন? গোপার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিল। এত বড় প্রমাণ হাতে পাইয়া কেহই চুপ করিয়া রহিল না।

কন্যা জন্মিবার একুশ দিন পরে গ্রামের মহত্তর মহাশয় গোপার কুটির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গোপা কুটিরের মধ্যে কন্যা কোলে লইয়া বসিয়া ছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন— 'সকলে জানতে চাইছে তোমার মেয়ে এমন ফরসা হল কি করে?'

গোপা মুখ কঠিন করিয়া বলিল— 'আমি দেবস্থানে রাঙা ডাব মানত করেছিলাম, তা রাঙা মেয়ে হয়েছে।'

মহত্তর মহাশয় বয়সে প্রবীণ, তিনি একটু হাসিলেন। বলিলেন— 'গোপা-বৌ, আমরা তোমাকে বেশি শাস্তি দিতে চাই না। যা হবার হয়েছে। তুমি পাঁচ কাহন দণ্ড দিলে আর কেউ কিছু বলবে না।'

কিন্তু দণ্ড দিলেই প্রকারান্তরে অপরাধ স্বীকার করা হয়। গোপা শক্ত হইয়া বলিল— 'আমি এক কানাকড়ি দণ্ড দেব না।'

মহত্তর বিরক্ত হইলেন। 'না দাও সমাজে পতিত হবে। তোমার জারজ সন্তানের বিয়ে হবে না।' বলিয়া চলিয়া আসিলেন।

ইহার পর সমস্ত গ্রাম গোপার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। গোপা যদি গ্রামের শাসন মানিয়া লইত তাহা হইলে তাহার অপরাধ কেহ মনে রাখিত না, দু'দিন পরে ভুলিয়া যাইত। এমন তো কতই হয়। কিন্তু গোপা দণ্ড দিল না; সে ভাঙ্গিবে তবু মচ্‌কাইবে না। গ্রামের লোক তাহার স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিল। নষ্ট স্ত্রীলোকের এত তেজ কিসের!

এরূপ অবস্থায় এক নিঃসহায় রমণীর গ্রামে বাস করা কঠিন হইত। কিন্তু দেবস্থানের পূজারী চাতক ঠাকুর দয়ালু লোক ছিলেন; অনাথা স্ত্রীলোক যাহাতে অনাহারে না মরে তিনি সেদিকে দৃষ্টি রাখিলেন। তাঁহার প্রভাবে গাঁয়ের লোকের রাগও কিছু পড়িল। কিন্তু গোপার সহিত গায়ে পড়িয়া কেহ সদ্ভাব স্থাপন করিতে আসিল না। গোপাও শক্ত হইয়া রহিল।

গোপার মেয়ে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। ফুলের মত সুন্দর টুকটুকে মেয়েটির চাতক ঠাকুরই নাম রাখিলেন— রঙ্গনা। কিন্তু রঙ্গনার সহিত গ্রামের ছেলেমেয়েরা খেলা করে না; তাহারা খেলা করিতে চাহিলে তাহাদের বাপ-মা তাড়না করে। রঙ্গনা কাঁদে, মায়ের কোলে আছড়াইয়া পড়ে। গোপা মেয়েকে বুকে চাপিয়া গলদশ্রুনেত্রে তিরস্কার করে— 'ওরা তোর সমান নয়। তুই ওদের সঙ্গে খেলবি না।'

রঙ্গনা যখন কিশোরী হইল তখন সে নিজেই সমবয়স্কাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতে শিখিল গ্রামে তাহার সমবয়স্কা যত মেয়ে আছে সকলকে সে চেনে, সকলের নাম জানে; কিন্তু কাহারও সহিত মেশে না। কদাচিৎ নদীর ঘাটে কোনও মেয়ের সঙ্গে দু'একটা কথা হয়, তাহার বেশি নয়। অন্য মেয়েরাও রঙ্গনার সহিত মিলিতে উৎসুক; তাহার রূপের জন্য অনেকেই তাহার প্রতি ঈর্যান্বিতা, তবু রঙ্গনা তাহাদের আকর্ষণ করে। সে কেন তাহাদের একজন নয়, কিশোরীরা তাহা ভাল করিয়া জানে না। রঙ্গনাকে লইয়া নিত্য তাহাদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা হয়, কিন্তু নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া কেহই তাহার সহিত সখিত্ব স্থাপন করিতে সাহস করে না।

রঙ্গনার সমবয়স্কাদের একে একে বিবাহ হয়। বিবাহে নৃত্যগীত উৎসব হয়। কিন্তু রঙ্গনা

তাহাতে যোগ দিতে পারে না। রঙ্গনার বিবাহের কথাও কেহ তোলে না। গ্রামের দুই চারিজন অবিবাহিত যুবক দূর হইতে তাঁহার পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বটে, কিন্তু বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার সাহস কাহারও নাই। আর, রঙ্গনার সহিত গুপ্ত প্রণয়ের কথা কেহ ভাবিতেই পারে না ; গোপার তীক্ষ্ণ চক্ষু ও শাণিত রসনাকে সকলেই ভয় করে।

এইভাবে শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া রঙ্গনা যৌবনে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। শৈশবে নিঃসঙ্গতার বেদনা শিশুই জানে। কৈশোরে সঙ্গিসাথীর অভাব মর্মপীড়াদায়ক। কিন্তু নিঃসঙ্গ যৌবনের অন্তর্দাহ বড় গভীর যন্ত্রণাময়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
চাতক ঠাকুরের দূরদর্শিতা

বেতসকুঞ্জে দণ্ডার্ধকাল বসিয়া থাকিয়া রঙ্গনা উঠিল। আবার কলসী কাঁখে নদীর পানে চলিল।

হেমন্তের মৌরী নদী নিজের খাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বেশি চওড়া নয়, কিন্তু স্রোতের টান আছে ; অদূর পর্বতগুহা হইতে যে দুরন্ত চঞ্চলতা লইয়া বাহির হইয়াছিল তাহা এখনও শান্ত হয় নাই। স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ জল, তল পর্যন্ত সূর্যকিরণ প্রবেশ করিয়াছে ; তলদেশে শুভ্র নুড়িগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। দুই দিকের উপলবিকীর্ণ তীরভূমি সমতল নয় ; কোথাও প্রক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড মাথা তুলিয়া আছে, কোথাও প্রবণ বেলাভূমি ক্রমাবনত হইয়া নদীতে মিশিয়াছে।

এইরূপ একটি বেলাভূমিতে বেতসগ্রামের স্নান-ঘাট। বাঁধানো ঘাট নয়, নুড়ি বিছানো স্বাভাবিক ঘাট। কিন্তু আজ ঘাটে কেহ নাই ; এ সময় যাহারা ঘাটে আসিত তাহারা নৃত্যগীতে মত্ত।

রঙ্গনা আসিয়া কলস পূর্ণ করিয়া ঘাটে রাখিল, তারপর স্নান করিতে জলে নামিল। এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া সে অন্যমনস্কভাবে চুলের বিননি খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে আহ্বান আসিল— 'রাঙা মেয়ে ! রাঙা মেয়ে !'

চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া রঙ্গনা দেখিল— দক্ষিণ দিক হইতে নদীর তীর ধরিয়া চাতক ঠাকুর আসিতেছেন। তাঁহার এক হাতে কয়েকটি সনাল পদ্ম, অন্য হাতে পদ্মপাতার একটি ঠোঙা।

চাতক ঠাকুরের বয়সের যদিও কেহ হিসাব রাখে না তথাপি তাঁহার দেহযষ্টি এখনও অটুট ও কর্মক্ষম আছে। বেণুবংশের ন্যায় শীর্ণ দীর্ঘ আকৃতি, গাত্রবর্ণ শুষ্ক তালপত্রের ন্যায়। সুদূর অতীতে মাথায় ও মুখে হয়তো চুল ছিল, এখন একটিও নাই। তুণ্ড সম্পূর্ণ দন্তহীন। তবু কুঞ্চিত রেখাঙ্কিত মুখে একটি অনির্বচনীয় প্রশান্ত শ্রী আছে। অঙ্গে বস্ত্রাদির বাহুল্য নাই, কটিতটে কেবল একটি কষায়বর্ণ বস্ত্র জড়ানো ; তাহাও হাঁটু পর্যন্ত। সেকালে স্ত্রীপুরুষ কাহারও কটিবাস হাঁটুর বেশি নীচে নামিত না ; তবে মেয়েরা বসনাঞ্চল দিয়া ঊর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করিত। আগুল্‌ফলম্বিত শাটী পরিধানের রীতি ছিল না।

রঙ্গনা চুলগুলি হাত-ফের দিয়া জড়াইতে জড়াইতে তীরের দিকে ফিরিল— 'ঠাকুর ! কোথায় গিয়েছিলেন ?'

চাতক ঠাকুর রঙ্গনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রসন্ন হাসিয়া বলিলেন— 'তোর জন্য কি এনেছি দ্যাখ। মৌরলা মাছ !' বলিয়া পদ্মপাতার ঠোঙা খুলিয়া দেখাইলেন।

রঙ্গনার মুখেও হাসি ফুটিল। মৌরী নদীতে মাছ আছে ; কিন্তু যে ধরে সেই খায়, বিতরণ

করে না। রঙ্গনার ভাগ্যে মৌরলা মাছ বড় একটা জুটিয়া ওঠে না। অথচ তখনকার দিনে মোরল মচ্ছ সহযোগে ওগ্‌গরা ভত্তা অতি উপাদেয় ভোজন বিলাস বলিয়া পরিগণিত হইত। বহু শতাব্দী পরেও রসনা-রসিক কবিরা কদলী-পত্রে তপ্ত ভাত, গব্য ঘৃত, মৌরলা মাছ ও নালিতা শাকের গুণ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইতেন।

চাতক ঠাকুরের হাত হইতে ঠোঙা লইয়া রঙ্গনা কলসীর পাশে রাখিল, হাসিমুখে বলিল—'মাছ আনতে গিয়েছিলেন ?'

চাতক ঠাকুর বলিলেন— 'মাছ আনতে যাই নি। ভোরবেলা উঠে ভাবলাম, আজ পর্বদিন, ঠাকুরদের পায়ে পদ্মফুল দেব, যাই দক্ষিণের বিল থেকে পদ্মফুল তুলে আনি। তিন কোশ বৈ তো নয়। গিয়ে দেখি জলগাঁয়ের জেলেরা মাছ ধরছে। তারাই পদ্মফুল তুলে দিলে, আর চারটি মৌরলা মাছও দিলে। তা ভাবলাম, নিয়ে যাই, রাঙা মেয়ে খাবে।'

অদ্ভুত মানুষ এই দেবস্থানের পূজারী ; ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এক হাতে দেবতার ফুল অন্য হাতে মৌরলা মাছ লইয়া ফিরিয়াছেন।

চাতক ঠাকুর যে সহজ সাধারণ মানুষ নয়, সত্যই একজন অদ্ভুত মানুষ, তাহা শুধু বেতসগ্রামের লোক নয়— দক্ষিণের আরও পাঁচখানা গ্রামের লোক জানিত। উপরন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার উপর দেবতার ভর হইত ; তখন তিনি দেবাবিষ্ট হইয়া অতি আশ্চর্য বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের কাহিনী শুনিয়া গ্রামবাসীরা অবাক হইয়া যাইত। প্রবীণ ব্যক্তিরা বলিত, ঠাকুরের বায়ু-রোগ আছে, থাকিয়া থাকিয়া বায়ু কুপিত হয়।

ঠাকুরের বায়ু কুপিত হওয়ার কথা রঙ্গনা মায়ের মুখে শুনিয়াছিল কিন্তু কখনও চোখে দেখে নাই। আজ আকস্মিকভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়া গেল।

চাতক ঠাকুর প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিলেন,— 'যাই, দেবস্থানে ফুল চড়াই গিয়ে।— মৌরলা মাছের কী রাঁধবি ?'

রঙ্গনা জানিত মাছের প্রতি ঠাকুরের লোভ নাই, তিনি নিরামিষাশী। সে সলজ্জ কণ্ঠে বলিল— 'মা যা বলবে তাই রাঁধব।'

'টক্ রাঁধিস্।' বলিয়া রঙ্গনার প্রতি সস্নেহে স্মিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি পা বাড়াইয়াছেন এমন সময় একটি ব্যাপার ঘটিল। একটা সোনাপোকা কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া রঙ্গনার সীমন্তের উপর বসিল ; কালো চুলের মাঝখানে সোনাপোকাটা জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। রঙ্গনা জানিতে পারিল না, কিন্তু চাতক ঠাকুর স্থিরদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, তিনি স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন— 'তোর সিঁথেয় সিঁদুর কেন রে, রাঙা মেয়ে ?'

'সিঁদুর !' রঙ্গনা চমকিয়া চুলের উপর হাত রাখিতে গেল, অমনি সোনাপোকা ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল। রঙ্গনা উড্ডীয়মান পতঙ্গটাকে উজ্জ্বল চক্ষে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া উঠিল— 'সোনাপোকা !'

চাতক ঠাকুর কথা না বলিয়া চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে একটি প্রস্তরপট্টের উপর বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার হস্তপদের স্নায়ুপেশী ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। কাচের ন্যায় নিষ্পলক চক্ষু যেন কোন্ সুদূর মরীচিকার দৃশ্য দেখিতেছে এমনিভাবে শূন্যে বিস্ফারিত হইয়া রহিল।

রঙ্গনা চাতক ঠাকুরের এই দেবাবেশ দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইল ; তারপর সতর্কভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে জানিত এ সময়ে কথা কহিতে নাই, ঠাকুরকে জাগাইবার চেষ্টা করাও বিপজ্জনক।

চাতক ঠাকুর যতক্ষণ অদৃশ্য লোকের স্বপ্ন দেখিতেছেন এই অবকাশে আমরা তাঁহার অতীত সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলিয়া লই।

অনুমান ষাট বছর আগে, গ্রামের বর্তমান বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যখন বালক-বালিকা ছিল, তখন একদিন চাতক ঠাকুর কোথা হইতে বেতসগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই বগলে দুইটি প্রস্তরমূর্তি। ঠাকুরের চেহারা একটু ক্ষেপাটে গোছের, কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতি বলিয়া মনে হয়।

বেতসগ্রাম চিরদিন অতিথি বৎসল ; গ্রামের তাৎকালিক প্রবীণ ব্যক্তিরা চাতক ঠাকুরকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে নিজের কি পরিচয় দিয়াছিলেন, কোথা হইতে আসিতেছেন, কোন বর্ণ, কী গোত্র— এ সকল কথা এখন আর কাহারও স্মরণ নাই। তাঁহার বয়সের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, চেহারা দেখিয়া মনে হইয়াছিল মধ্যবয়স্ক।

যা হোক, চাতক ঠাকুর গ্রামে রহিয়া গেলেন। দেবস্থানের অশ্বত্থ বৃক্ষতলে তখন কেবল একটি ধ্বজা প্রোথিত থাকিত, ওই ধ্বজার মূলেই গ্রামের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদিত হইত। চাতক ঠাকুর তাঁহার আনীত মূর্তি দুটি ধ্বজার দুই পাশে বসাইয়া পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মূর্তি দুটির একটি বুদ্ধমূর্তি এবং অন্যটি বিষ্ণু বিগ্রহ—সেজন্য কাহারও আপত্তি হইল না। বরং একসঙ্গে এক জোড়া দেবতা পাইয়া গ্রামবাসীরা উৎফুল্ল হইল। সে সময় উপাস্য দেবতা লইয়া বেশি বাছ-বিচার ছিল না : পূজার পাত্র যা-হোক একটা থাকিলেই হইল। অধিকন্তু ন দোষায়। যাহার যেটা ইচ্ছা পূজা করিবে।

তারপর বছরের পর বছর কাটিয়া গিয়াছে : চাতক ঠাকুরের আগমন কালে যাহারা বয়স্ক ছিল তাহারা মরিয়া গিয়াছে ; আরও দুই পুরুষ কাটিয়াছে। চাতক ঠাকুরের কিন্তু ক্ষয়-ব্যয় নাই, তিনি তাঁহার শিলা-বিগ্রহের মতই অবিনশ্বররূপে বিরাজ করিতেছেন। গ্রামবাসীরা মাঝে মাঝে তাঁহার বয়স সম্বন্ধে জল্পনা করে। কেহ বলে তাঁহার বয়স আশী ; কেহ বলে শটকে পুরিয়া গিয়াছে। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসেন, উত্তর দেন না ; নিজের বয়স কত তাহা তিনি নিজেই জানেন কিনা সন্দেহ। বস্তুত নিজের সম্বন্ধে তাঁহার মন সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি তিন পুরুষ ধরিয়া গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের সুখ-দুঃখের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ; রোগে এমন সেবা করিতে আর দ্বিতীয় নাই। দুই চারিটি শিকড়-বাকড় মুষ্টিযোগও জানেন এবং প্রয়োজন হইলে প্রয়োগ করেন। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কোনও ভাবনা-চিন্তা নাই। দেবস্থানের পূজা, দিনান্তে দুটি তণ্ডুল এবং হাসিমুখে নির্লিপ্তচিত্তে গ্রামবাসীদের সকল কাজে সাহচর্য— ইহাই তাঁহার জীবন।

গ্রামবাসীরা সস্নেহে বলে—'আমাদের পাগলা ঠাকুর। মাঝে মাঝে বায়ু কুপিত হয় বটে কিন্তু এমন আপনভোলা মানুষ হয় না।'

বায়ু-রোগই হোক আর দেবাবেশই হোক, মৌরীর ঘাটে প্রায় একদণ্ড কাল হৃতচেতন অবস্থায় বসিয়া থাকিবার পর চাতক ঠাকুরের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল ; তাঁহার চোখের দৃষ্টি আবার সহজ হইল। রঙ্গনা এতক্ষণ দুই চক্ষে উৎকণ্ঠা ভরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তিনি তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া ক্ষীণ হাসিলেন। রঙ্গনা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল। চাতক ঠাকুর স্খলিতপদে গিয়া নদীর জলে মুখ প্রক্ষালন করিলেন, মাথায় জল দিলেন। তারপর আবার শিলাপট্টে আসিয়া বসিলেন। এই একদণ্ড সময়ের মধ্যে তাঁহার শারীরিক শক্তি যেন সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

রঙ্গনা তাঁহার পাশে বসিয়া সংহত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল— 'ঠাকুর! কী হয়েছিল?'

চাতক ঠাকুর ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর আস্তে আস্তে বলিলেন— 'তোর চুলে সোনাপোকা বসেছিল ; আমার মনে হল সিঁদুর ডগডগ করছে। সেইদিকে চেয়ে রইলাম। তারপর দেখতে দেখতে সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, নদী ঘাট কিছু রইল না। তার বদলে দেখলাম—দেখলাম—'

'কী দেখলেন ?'

'দেখলাম যুদ্ধ হচ্ছে— হাজার হাজার লোক অস্ত্র নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করছে। আহত মানুষের কাতরানি, হাতি-ঘোড়ার ছুটোছুটি—আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর উড়ছে, গম্‌গম্‌ শব্দে রণভেরী বাজছে—ভয়ঙ্কর যুদ্ধ—'

রঙ্গনা চাতক ঠাকুরের মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিয়াছে, যুদ্ধ তাহার অপরিচিত নয়। সে বলিল— 'কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে ?'

চাতক ঠাকুর বলিলেন,—'তা জানি না। ঐ দিকে— উত্তর দিকে। দুই পাশে পাহাড়, একদিকে প্রকাণ্ড নদী, আর একদিকে জঙ্গল ; তার মাঝখানে যুদ্ধ হচ্ছে।'

'তারপর ?'

'অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলল। দক্ষিণ দিকের দল হটে যেতে লাগল। দেখলাম, একজন অশ্বারোহী উল্কার বেগে বেরিয়ে এল— ঘোড়া ছুটিয়ে এই দিকে পালিয়ে আসতে লাগল। সাদা ঘোড়ার পিঠে প্রকাণ্ড-শরীর আরোহী, তার কপালে তলোয়ারের কাটা দাগ, রক্ত ঝরছে। সাদা ঘোড়া আর আরোহী জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।'

'আর কি দেখলেন ?'

'ক্রমে যুদ্ধ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দক্ষিণের দল পালাতে লাগল, বিজয়ী দল তাদের তাড়া করল। দেখতে দেখতে রণস্থল শূন্য হয়ে গেল, কেবল মরা মানুষ হাতি ঘোড়া পড়ে রইল।'

'আর কিছু দেখলেন না ?'

চাতক ঠাকুর চকিত হইয়া একবার আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে দৃষ্টিপাত করিলেন, তারপর উদ্বিগ্ন স্বরে বলিলেন— 'আর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। শূন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আকাশের পানে চোখ তুলে দেখি, উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে প্রকাণ্ড একটা মেঘ ছুটে আসছে, কালবোশেখীর কালো মেঘ। মেঘ যখন আরও কাছে এল তখন দেখলাম, মেঘ নয়—ধুলোর ঝড়। যেন ঐদিকের কোনও মরুভূমিতে ঝড় উঠেছে, তাই ধুলো-বালি উড়ে আসছে। চক্ষের নিমেষে আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল, সূর্যের আলো নিভে গেল। আর কিছু দেখতে পেলাম না ; অন্ধকারে অন্ধের মত বসে রইলাম। —তারপর আস্তে আস্তে চোখের সহজ দৃষ্টি ফিরে এল।'

শুনিতে শুনিতে রঙ্গনার চক্ষু-তারকা বিস্ফারিত হইয়াছিল, সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—'এর মানে কি ঠাকুর ?'

চাতক ঠাকুর বলিলেন— 'তা জানি না, রাঙা মেয়ে। কিন্তু মনে হয় বড় দুর্দিন আসছে। ঐ যে মরুভূমিতে ঝড় উঠেছে, এ ঝড়ের ঝাপটা আমাদের গায়েও লাগবে, আমাদের ঘরের মট্‌কাও উড়ে যাবে।' কিছুক্ষণ নতমুখে নীরব থাকিয়া তিনি উদ্বিগ্ন চক্ষু তুলিয়া রঙ্গনার পানে চাহিলেন— 'কিন্তু তোর সিঁথেয় সিঁদুর দেখলাম কেন রে রাঙা মেয়ে ? তোর কি তবে বিয়ের ফুল ফুটেছে ! কোথা থেকে বর আসবে ? কোন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজপুত্তুর আসবে ?' বলিয়া তিনি স্নেহকম্পিত করাঙ্গুলি দিয়া রঙ্গনার চিবুক তুলিয়া ধরিলেন।

সলজ্জে ঘাড় ফিরাইয়া রঙ্গনা দেখিল, তাহার মা কখন অলক্ষিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে লজ্জায় আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গোপা বলিল— 'তোর দেরি হচ্ছে দেখে এলাম। তুই এখন ঘরে যা। আমি ঠাকুরের সঙ্গে দুটো কথা বলব।'

রঙ্গনা কলসী আর মৌরলা মাছের ঠোঙা লইয়া চলিয়া গেল। গোপা তখন প্রস্তরপট্টের উপর বসিয়া বলিল— 'ঠাকুর, কি কথা বলছিলেন রাঙাকে, আমায় বলুন। ওর কি বিয়ের ফুল

ফুটেছে ? কবে কোথায় কার সঙ্গে বিয়ে হবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। আপনি কী জানতে পেরেছেন বলুন।'

চাতক ঠাকুর তখন দিব্য চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ গোপাকে শুনাইলেন। শেষে বলিলেন— 'রাঙা মেয়ের চুলে সোনাপোকা বসেছিল, ঠিক সিঁদুরের মত দেখাচ্ছিল ; তাই ভাবছি ওর বুঝি সিঁদুর পরবার সময় হয়েছে— দেবতারা তাই ইশারায় জানিয়ে দিলেন।'

গোপা ব্যাকুল হইয়া বলিল— 'কিন্তু কি করে হবে ঠাকুর ? গ্রামের কোনও ছেলে কি ?— কিন্তু তাই বা কি করে হবে ? মোড়লদের ভয়ে গাঁয়ের ছেলেরা যে ওর পানে চোখ তুলে তাকায় না। নইলে আমার রাঙার মত মেয়ে—'

চাতক ঠাকুর ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন— 'গাঁয়ের কেউ নয়। এ যে সোনাপোকা, গোপা-বৌ। সারা গায়ে সোনা জড়ানো। কোথা থেকে রাজপুত্তুর আসছে কে জানে ? মহাভারতের গল্প শুনেছ তো ! শকুন্তলা বনের মধ্যে মুনির আশ্রমে থাকত ; কোথা থেকে হঠাৎ এলেন রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করতে। রাঙা মেয়েরও তেমনি দুষ্মন্ত আসবে। তুমি ভেবো না।'

গোপা চাতক ঠাকুরের পায়ের উপর নত হইয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল— 'ঠাকুর, আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সোনাপোকা

সেদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে উৎসবকারীরা ক্লান্ত দেহে এবং ঈষৎ মদমত্ত অবস্থায় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। মাঠের মাঝখানে ইক্ষুযন্ত্রটি নিঃসঙ্গভাবে দণ্ডায়মান ছিল ; কেবল কয়েকটা কাক ও শালিক পাখি তখনও আখের ছিবড়ার মধ্যে মাদকদ্রব্য অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল।

গোপা ও রঙ্গনা আপন কুটিরে ছিল। বেলা পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া গোপা মেয়েকে ডাকিল— 'রাঙা, আয় তোর চুল বেঁধে দিই।'

রঙ্গনা মায়ের সম্মুখে আসিয়া বসিল। গোপা তাহার চুলে তেল দিল, কাঁকই দিয়া চুল আঁচড়াইয়া সযত্নে বেণী রচনা করিল। তারপর কানড় সাপের ন্যায় দীর্ঘ বেণী জড়াইয়া জড়াইয়া কবরী বাঁধিয়া দিল। পক্ক তাল ফলের ন্যায় সুপুষ্ট কবরী রঙ্গনার মাথায় শোভা পাইল।

চুল বাঁধিয়া গোপা নিজের আঁচল দিয়া রঙ্গনার মুখখানি অতি যত্নে মুছিয়া দিয়া ললাটতটে খদিরের টিপ পরাইয়া দিল, স্নেহস্ফুরিত চক্ষে অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দেখিয়া গণ্ডে একটি চুম্বন করিল।

রঙ্গনা মায়ের এমন স্নেহার্দ্র কোমলভাব কখনও দেখে নাই, সে লজ্জা পাইল। সে কেমন করিয়া জানিবে তাহার মায়ের মনের মধ্যে কী হইতেছে। গোপার মন আশায় আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল ; তাহার যেন আর ত্বর্ সহিতেছিল না। কবে আসিবে রঙ্গনার বর ? এখনি আসে না কেন ? চাতক ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি সে কেবলই মনে মনে দেবতার উদ্দেশে বলিতেছিল— 'ঠাকুর, আমাকে যত ইচ্ছে শাস্তি দাও, কিন্তু রাঙা যেন সুখী হয় !'

মাতার পদধূলি মাথায় লইয়া রঙ্গনা সলজ্জ চক্ষু তুলিল—'মা, পলাশবনে আল্‌তা-পোকা খুঁজতে যাই ?

গোপা বলিল— 'তা যা। ঘটি নিয়ে যাস, একেবারে বাথান থেকে দুধ দুয়ে ফিরবি।'

রঙ্গনা ঘটি লইয়া পলাশবনের দিকে চলিল। আজ পূর্বাহ্ণে চাতক ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে তাহার মনেও যেন কোন মধুর ভবিতব্যতার বাতাস লাগিয়াছে। মন উৎসুক উন্মুখ, প্রাতঃকালের বিষণ্ণ বিরসতা আর নাই।

বনে প্রবেশ করিয়া রঙ্গনা দেখিল, সেখানে আরও কয়েকটি গ্রাম্যযুবতী উপস্থিত হইয়াছে; তাহারাও দোহনপাত্র লইয়া আসিয়াছে, বাথানে গো-দোহন করিয়া ঘরে ফিরিবে। কারণ, উৎসব উপলক্ষে আর সব কাজ বন্ধ রাখা চলে, গো-দহন না করিলে নয়। যুবতীদের সকলেরই একটু প্রগল্‌ভ অবস্থা, ইক্ষুরসের প্রভাব এখনও দূর হয় নাই। তাহারা রঙ্গ-রসিকতার ছলে পরস্পরের গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে; স্খলদঞ্চলা হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে যে চটুল বাক্-চাতুর্যের বিনিময় হইতেছে তাহাতে আদিরসের ব্যঞ্জনাই অধিক।

রঙ্গনা তাহাদের দেখিয়া একটু থতমত হইল। কিন্তু পলাশবন বিস্তীর্ণ স্থান, সে তাহাদের এড়াইয়া অন্যদিকে গেল। যুবতীরা রঙ্গনাকে দেখিয়াছিল; তাহারা চোখ ঠারাঠারি করিয়া নিম্নকণ্ঠে হাস্যালাপ আরম্ভ করিল।

তাহাদের ভাঙা ভাঙা হাসির শব্দ রঙ্গনার কানে আসিতে লাগিল। উহারা যে তাহার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছে তাহা বুঝিয়া রঙ্গনার গাল দুটি উত্তপ্ত হইল; কিন্তু সে তাহাদের ছাড়িয়া বেশি দূরেও যাইতে পারিল না। এই সমবয়স্কা যুবতীদের প্রতি তাহার মনে কোনও বিদ্বেষ ভাব ছিল না; বরং তাহাদের সহিত মিশিয়া তাহাদের সঙ্গসুখ লাভ করিবার গভীর ক্ষুধা তাহার অন্তরে ছিল, কিন্তু তবু উপযাচিকা হইয়া তাহাদের সমীপবর্তিনী হইবার হঠতাও তাহার ছিল না। সারাজীবনের একাকিত্ব তাহাকে ভীরু করিয়া তুলিয়াছিল।

লাক্ষাকীটের অন্বেষণে বিমনাভাবে এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একটা সোনাপোকা দেখিয়া রঙ্গনা উৎফুল্ল নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। আবার সোনাপোকা! সুবর্ণদেহ পতঙ্গটা বোধহয় রাত্রির জন্য আশ্রয় খুঁজিতেছিল; সে একটা বৃক্ষকাণ্ডে বারবার আসিয়া বসিতেছিল, আবার উড়িয়া যাইতেছিল। তাহার সোনালী অঙ্গে আলোর ঝিলিক খেলিতেছিল।

রঙ্গনা কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্তর্পণে স্কন্ধ হইতে আঁচল নামাইয়া হাতে লইল, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। সোনাপোকা বা কাঁচপোকা দেখিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয় না— এমন মেয়ে সেকালে ছিল না, একালেও নাই।

রঙ্গনা আঁচল হাতে লইয়া গাছের নিকটবর্তিনী হইতেই সোনাপোকাটা উড়িয়া গেল; কিন্তু বেশি দূর গেল না, কাছাকাছি ঘুরিতে লাগিল। রঙ্গনার মনে হইল, যে সোনাপোকা আজ সকালে তাহার চুলে বসিয়াছিল এ সেই সোনাপোকা। সে মহা উৎসাহে তাহার পিছনে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

যুবতীরা দূর হইতে সোনাপোকা দেখিতে পাইতেছিল না, কেবল রঙ্গনার ছুটাছুটি দেখিতেছিল। কিছুক্ষণ দেখিবার পর একটি যুবতী বলিল — 'রঙ্গনা এমন ছুটোছুটি করছে কেন ভাই? দ্যাখ্ দ্যাখ্—ঠিক যেন বাথানিয়া গাই।'*

রসিকতা শুনিয়া অন্য যুবতীরা হাসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। আর একজন বলিল,— 'তা হবে না? অত বড় আইবুড়ো মেয়ে— !'

ওদিকে রঙ্গনা আরও কিছুক্ষণ সোনাপোকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অবশেষে তাহাকে আঁচল চাপা দিয়া ধরিয়া ফেলিল। চোখে মুখে উচ্ছল আনন্দ, আঁচলসুদ্ধ সোনাপোকাকে মুঠির মধ্যে লইয়া

* বাথানিয়া গাই—যৌবনতপ্তা গাভী

কানের কাছে আনিয়া শুনিল, মুঠির ভিতর হইতে আবদ্ধ সোনাপোকার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন আসিতেছে।

এই সময় তাহার চোখে পড়িল, যুবতীরা অদূরে আসিয়া কৌতূহল সহকারে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। রঙ্গনা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, ছুটিয়া তাহাদের কাছে গিয়া কলোচ্ছল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল— 'ও ভাই, দ্যাখো আমি সোনাপোকা ধরেছি !'

যুবতীরা কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল। তারপর, যে মেয়েটি বাথানিয়া গাইয়ের রসিকতা করিয়াছিল সে কথা কহিল। তাহার নাম মঙ্গলা ; যুবতীদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা বাক্-চটুলা। মঙ্গলা বলিল— 'ওমা সত্যি ? তা ভাই, তুমি তো সোনাপোকা ধরবেই, তোমার তো আর আমাদের মত গুব্‌রে পোকার বরাত নয়। একটু দেরিতে ধরেছ, এই যা। তা কেমন সোনাপোকা ধরলে দেখি। সত্যি সোনাপোকা বটে তো ?'

রঙ্গনা এই বাক্যের ব্যঙ্গার্থ বুঝিল কিনা বলা যায় না ; সে মঙ্গলার কাছে গিয়া তাহার কানের কাছে সোনাপোকার মুঠি ধরিল, বলিল— 'হ্যাঁ, সত্যি সোনাপোকা, এই শোনো না।'

মঙ্গলা মুঠির মধ্যে গুঞ্জন শুনিল। আরও কয়েকটি যুবতী কান বাড়াইয়া দিল ; তাহারাও শুনিল। মঙ্গলা বলিল— 'গুন্ গুন্ করছে বটে। তা সোনাপোকা না হয়ে ভোমরাও হতে পারে। — হ্যাঁ ভাই, সোনাপোকা ভেবে একটা কেলে-কিষ্টে ভোমরা ধরনি তো ?'

'না, সোনাপোকা।' বলিয়া রঙ্গনা যেন সকলের প্রতীতি জন্মাইবার জন্যই অতি সাবধানে মুঠি একটু খুলিল। সোনাপোকা এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, ভোঁ করিয়া বাহির হইয়া তীরবেগে অন্তর্হিত হইল।

রঙ্গনা বলিল— 'ঐ যাঃ !'

যুবতীরা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। মঙ্গলা বলিল— 'হায় হায়, এত কষ্টে সোনাপোকা ধরলে তাও উড়ে গেল। ধরে রাখতে পারলে না ? এর চেয়ে আমাদের গুব্‌রে পোকাই ভাল, তারা উড়ে পালায় না। কি বলিস ভাই ?' বলিয়া সখীদের প্রতি কটাক্ষ করিল।

সখীরা মুখে আঁচল দিয়া হাসিল। রঙ্গনার মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। এতক্ষণে সে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিল, ইহারা তাহাকে লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছে। তাহার চোখ দুটি মাটিতে নত হইয়া পড়িল। স্খলিত আঁচলটি ধীরে ধীরে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া সে গমনোদ্যত হইল।

মঙ্গলা কহিল— 'দুঃখ কোরো না ভাই, তোমার কপালে আবার সোনাপোকা আসবে। যার অমন রূপ, তার কি সোনাপোকার অভাব হয় ?'

রঙ্গনা তাহার প্রতি বিহ্বল দৃষ্টি তুলিয়া বলিল— 'কী বলছ ভাই তুমি ? আমি বুঝতে পারছি না।'

'বলছি, গাঁয়ের কাউকে তো আর তোমার মনে ধরবে না। তোমার জন্যে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্তুর আসবে।' বলিয়া ব্যঙ্গভরে হাসিতে হাসিতে মঙ্গলা বাথানের দিকে চলিয়া গেল। অন্য যুবতীরাও তাহার সঙ্গে গেল।

রঙ্গনা কিছুক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তারপর একটু রাগ হইল। সে মনে মনে বলিল— 'আসবেই তো রাজপুত্তুর !'

রঙ্গনার অদৃষ্টদেবতা অন্তরীক্ষ হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া বোধহয় একটু করুণ হাসিলেন। যে ব্যঙ্গোক্তি অচিরাৎ সত্য-রূপ ধরিয়া দেখা দেয়, যে-কামনা সফলতার ছদ্মবেশ পরিয়া আবির্ভূত হয়, তাহার প্রকৃত মূল্য অদূরদর্শী মানুষ কেমন করিয়া বুঝিবে ?

অতঃপর রঙ্গনা কিয়ৎকাল বৃক্ষশাখায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে বৃক্ষতল ছায়াচ্ছন্ন হইল। এতক্ষণে অন্য মেয়েগুলা গো-দোহন শেষ করিয়া নিশ্চয় বাথান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

রঙ্গনা নিজের দোহনপাত্রটি মাটি হইতে তুলিয়া লইয়া বাথানের দিকে পা বাড়াইয়াছে এমন সময় পিছন দিকে একটা শব্দ শুনিয়া সচকিতে ফিরিয়া চাহিল।

উত্তর দিকের তরুচ্ছায়ার ভিতর দিয়া এক পুরুষ শ্বেতবর্ণ অশ্বের বল্গা ধরিয়া আসিতেছে। বিশালকায় পুরুষ ; তাহার পাশে ক্লান্ত স্বেদাক্ত অশ্বটিকে খর্ব মনে হয়। পুরুষের দেহে বর্ম চর্ম, কটিবন্ধে অসি, মস্তকে লৌহ শিরস্ত্রাণ ; কিন্তু বেশবাসের পারিপাট্য নাই। কপালে ক্ষতরেখার উপর রক্ত শুকাইয়া আছে। রঙ্গনা ও পুরুষ পরস্পরকে একসঙ্গে দেখিতে পাইল। পুরুষ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

দুইজনে কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর পুরুষ অশ্বের বল্গা ছাড়িয়া দিয়া রঙ্গনার দিকে অগ্রসর হইল। রঙ্গনার বুকের মধ্যে তুমুল স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছিল। সে সম্মোহিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে পড়িল, চাতক ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে বিশালকায় পুরুষ রণক্ষেত্র হইতে উল্কার বেগে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। এ কি সেই অশ্বারোহী ?

পুরুষ রঙ্গনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; রঙ্গনাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তাহার মুখমণ্ডল বিশদ হাস্যে ভরিয়া গেল। সে সহজ মার্জিত কণ্ঠে বলিল— 'আমার ভাগ্য ভাল যে একলা তোমার দেখা পেলাম। কাছেই বোধহয় গ্রাম আছে, কিন্তু গ্রামে যাবার আমার ইচ্ছা নেই। আমি রণক্লান্ত যোদ্ধা, আমাকে কিছু খাদ্য পানীয় দিতে পার ?'

রঙ্গনা মোহাচ্ছন্নের ন্যায় চাহিয়া রহিল ; তারপর মুখ হইতে আপনি বাহির হইয়া আসিল— 'তুমি কি রাজপুত্তুর ?'

পুরুষের চক্ষে সবিস্ময় প্রশ্ন উঠিল। তারপর সে ঊর্ধ্বে মুখ উৎক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। প্রাণখোলা কৌতুকের হাসি। মানুষটি যে স্বভাবতই মুক্তপ্রাণ, তাহা তাহার হাসি হইতে প্রতীয়মান হয়। অবশেষে সহসা হাসি থামাইয়া সে বলিল— 'আমার পরিচয় কি কপালে লেখা আছে ? ভেবেছিলাম পরিচয় দেব না। কিন্তু তুমি ধরে ফেলেছ। তবে একটু ভুল করেছ, আমি রাজপুত্র বটে, কিন্তু আপাতত রাজা।'

এই পুরুষের সহজ বাক্‌ভঙ্গি এবং অকপট কৌতুকহাস্য শুনিয়া রঙ্গনা অনেকটা সাহস পাইয়াছিল, প্রথম সাক্ষাতের বিহ্বলতাও আর ছিল না। তবু বিস্ময় অনেকখানি ছিল। সে পুরুষের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল— 'রাজা !'

পুরুষ বলিল—'হাঁ, গৌড়দেশের রাজা। আমার নাম—মানবদেব।'

'কিন্তু— গৌড়দেশের রাজার নাম তো শশাঙ্কদেব।'

মানব নীরবে কিছুক্ষণ রঙ্গনার সরল সুন্দর মুখখানি দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল— 'মহারাজ শশাঙ্কদেব আজ আট মাস হল দেহরক্ষা করেছেন। আমি তাঁর পুত্র। তুমি বোধহয় বিশ্বাস কর না—'

অবিশ্বাস করার মত মনের অবস্থা রঙ্গনার নয়। বিশেষত গ্রামে রাজা রাজড়ার খবর কয়জন রাখে ? কোন্ রাজা মরিল, কে নূতন রাজা হইল এ সকল সংবাদ গ্রামাঞ্চলে বহু বিলম্বে আসে, আসিলেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না। রঙ্গনা জন্মাবধি শুনিয়াছে শশাঙ্কদেব রাজা ; রাজা যে মরিতে পারে, এ সম্ভাবনা তাহার মনে আসে নাই। এখন মানবের শালপ্রাংশু আকৃতির দিকে চাহিয়া তাহার মনে তিলমাত্র সংশয় রহিল না। সে যুক্তকরে বলিল— 'মহারাজের জয় হোক।'

রাজাকে 'জয় হোক' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে হয় ইহা সে চাতক ঠাকুরের কাছে পৌরাণিক গল্প শুনিবার কালে শিখিয়াছিল।

মানব হাসিল। বলিল—'জয় আর হল কৈ ? আজ তো পরাজয় হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

পালিয়ে এসেছি। ভাগ্যে জয়ন্ত ছিল— নইলে—' বলিয়া মানব তাহার জয়ন্ত নামক রণঅশ্বের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, কিন্তু অশ্বকে দেখিতে পাইল না। তৃষ্ণার্ত অশ্ব অদূরে জলের আঘ্রাণ পাইয়া নদীর দিকে গিয়াছে।

রঙ্গনার দিকে ফিরিয়া মানব বলিল— 'পরাজিতকে সকলে ত্যাগ করে, জয়ন্তও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন তুমি ভরসা।—তোমার নাম কি ?'

রঙ্গনা নাম বলিল। মানব স্মিত-প্রশংস দৃষ্টি তাহার সর্বাঙ্গে বুলাইয়া হঠাৎ গাঢ়স্বরে বলিল— 'তোমার মত রূপসী রাজ-অবরোধেও বিরল। কপালে সিঁদুর দেখছি না ; এখনও কি বিয়ে হয়নি ?'

নেত্র অবনত করিয়া রঙ্গনা মাথা নাড়িল। মানব বলিল— 'তোমাকে যত দেখছি ততই আশ্চর্য লাগছে, এই সুদূর জনপদে তুমি কোথা থেকে এলে জানি না, কিন্তু মনে হয় তোমার হৃদয় তোমার দেহের মতই কোমল। আমি তোমার কাছে আত্ম-সমর্পণ করলাম, আজ রাত্রির জন্য আমাকে রক্ষা কর।'

রঙ্গনার মনে পড়িল তাহার রাজপুত্র ক্ষুৎপিপাসাতুর। চকিতে মুখ তুলিয়া সে বলিল—'তুমি এখানে থাকো, আমি এখনি তোমার জন্যে দুধ দুয়ে আনছি।' বলিয়া দোহনপাত্র লইয়া সে ছুটিয়া গেল।

যতক্ষণ দেখা গেল মানব সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, এ কি পলাশবনের বনলক্ষ্মী। তারপর বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া সে নিজের ভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিল।

আজ হইতে ঠিক আট মাস পূর্বে গৌড়কেশরী শশাঙ্কদেব বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। শশাঙ্ক একদিকে যেমন দুর্ধর্ষ বীর ছিলেন অন্যদিকে তেমনি অসামান্য কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন ; ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি এক হাতে পূর্ববঙ্গের রাজ্যগৃধ্নু নৃপতিবৃন্দকে এবং অন্য হাতে প্রতিহিংসাপরায়ণ হর্ষবর্ধনের বিপুল রাজশক্তিকে রুখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় শত্রু গৌড়রাজ্যে পদার্পণ করিতে পারে নাই।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মানব গৌড়ের সিংহাসনে বসিল। মানবের বয়স ত্রিশ বৎসর। পিতার মতই সে দুর্মদ বীর, তাহার বিপুল দেহে সিংহের পরাক্রম। কিন্তু তাহার স্বভাব উন্মুক্ত ও সরল, মনের কথা সে গোপন রাখিতে পারে না ; ছলচাতুরী তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যতদিন সে যুবরাজ ছিল ততদিন পিতার অধীনে সৈনাপত্য করিয়াছে, অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছে ; কিন্তু মন্ত্রণাসভায় তাহার বুদ্ধি বিকাশ লাভ করে নাই। তাই সিংহাসন লাভের পরেও তাহার প্রকৃতিগত স্বধর্ম পরিবর্তিত হইল না। যে-মন্ত্রিগণ শশাঙ্কের জীবিতকালে মাথা তুলিতে পারেন নাই, তাঁহারা এখন মাথা তুলিয়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিলেন ; রাজ্যের কল্যাণচিন্তা ভুলিয়া আপন আপন শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টায় তৎপর হইলেন। রাজপুরুষদের মধ্যে ঘরে ঘরে চক্রান্ত চলিতে লাগিল। রাজ্যের মর্মকোষে কীট প্রবেশ করিল।

শত্রুপক্ষ এতবড় সুযোগ উপেক্ষা করিল না। কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মা গোপনে হর্ষবর্ধনের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, তিনি সসৈন্যে গৌড়ের উত্তর প্রান্ত আক্রমণ করিলেন।

কজঙ্গলের শিলা-বন্ধুর উপত্যকায় ভাস্করবর্মার সহিত মানবের যুদ্ধ হইল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার বিষ সেনাপতিদের মনেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত যুদ্ধ চলিবার পর মানব বুঝিল যুদ্ধে জয়ের আশা নাই। রক্তাক্ত দেহে সে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিল। এখন তাহার একমাত্র ভরসা শত্রুর আগে কর্ণসুবর্ণে পৌঁছিয়া আর একবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

আজ দ্বিপ্রহরে রণক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া সে দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু কজঙ্গল হইতে কর্ণসুবর্ণ বহু দূর, অশ্বপৃষ্ঠেও দুই দিনের পথ। মানব পলাশবনের ভিতর দিয়া

ঘোড়া ছুটাইয়া অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভগ্নদেহে ক্ষুৎপিপাসার্ত অবস্থায় বেতসগ্রামের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

সম্মুখে রাত্রি, পশ্চাতে শত্রু আসিতেছে। এই উভয় সংশয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে মানব নিজ ভাগ্য চিন্তা করিতেছে— অতঃপর অদৃষ্ট শক্তি তাহাকে কোন্ পথে লইয়া যাইবে? ভবিষ্যতের গর্ভে কোন্ রহস্যের ভ্রূণ লুক্কায়িত আছে?— ভাবিতে ভাবিতে তাহার অধরে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। রঙ্গনার পুষ্পপেলব যৌবন-লাবণ্য তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেতসকুঞ্জ

পূর্ণ দুগ্ধপাত্র লইয়া রঙ্গনা যখন ফিরিয়া আসিল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে, আকাশে শুক্লা নবমীর চন্দ্র কিরণজাল প্রস্ফুটিত করিয়া সূর্যের অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। পলাশবনের মধ্যে আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা।

রঙ্গনা দুগ্ধপাত্র মানবের সম্মুখে ধরিল; মানব দুই হাতে পাত্র লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার কানায় ওষ্ঠ-সংযোগ করিল। পাত্রটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, একটি ছোটখাটো কলসী বলা চলে। মানব এক চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিয়া রঙ্গনাকে ফিরাইয়া দিল।

রঙ্গনা রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করিল— 'আর কিছু খাবে?'

মানব হাসিয়া বলিল— 'ক্ষুধার কি শেষ আছে? কিন্তু থাক, আপাতত এই যথেষ্ট। তোমাকে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব?'

মানব হাত ধরিয়া রঙ্গনাকে কাছে টানিয়া লইল। রঙ্গনার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, দেহ রোমাঞ্চিত হইল। মানব গাঢ়স্বরে বলিল— 'আমার আজ কিছু নেই, আমি পলাতক। দু'দিন আগে যদি তোমার দেখা পেতাম, প্রাণভরে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে পারতাম।'

রঙ্গনা উত্তর দিতে পারিল না, অধোমুখে রহিল। মুগ্ধা পল্লীযুবতী নাগরিক সভ্যসৌজন্য কোথায় শিখিবে? কিন্তু তাহার স্নিগ্ধ নীরবতা মানবের বড় মিষ্ট লাগিল। সে ধীরে ধীরে কথা বলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সে রঙ্গনাকে বাক্‌চাতুর্যে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিল না। বরং একটি সমধর্মী মানুষ পাইয়া তাহার অন্তরের সরলতা যেন সাগ্রহে বাহির হইয়া আসিল। দুইজনে বৃক্ষশাখায় হেলান দিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে জল্পনা করিতে লাগিল। মানব অধিকাংশ কথা বলিল, রঙ্গনা তন্ময় হইয়া শুনিল। মানব যে-যে প্রশ্ন করিল, রঙ্গনা সরলভাবে তাহার উত্তর দিল।

এইভাবে এক দণ্ড অতীত হইবার পর মানব চকিত হইয়া বলিল— 'সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, তুমি গৃহে যাও।'

'আর তুমি?'

'আমি গাছতলায় রাত কাটিয়ে দেব।'

রঙ্গনা আঙ্গুলে বস্ত্রাঞ্চল জড়াইতে লাগিল।

'তুমি আমাদের কুটিরে চল না কেন? রাত্রে সেখানেই থাকবে।'

মানব একটু ইতস্তত করিয়া শেষে মাথা নাড়িল।

'না। আমার পিছনে শত্রু আসছে, হয়তো আজ রাত্রেই গ্রামে এসে পৌঁছবে। আমি গ্রামে থাকলে ধরা পড়বার ভয় আছে।'

রঙ্গনা তর্জনী দংশন করিল, তারপর চকিত উৎফুল্ল চক্ষু তুলিল।

'তুমি আমার কুঞ্জে থাকবে? আমার কুঞ্জের কথা কেউ জানে না।'

'তোমার কুঞ্জ!'

রঙ্গনা তাহার নিভৃত বেতসকুঞ্জের কথা বলিল। শুনিয়া মানব বলিল—'এ ভাল। চল, তোমার কুঞ্জে রাত কাটাব।'

রঙ্গনা মানবকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। পলাশবনের বাহিরে অনিমেষ জ্যোৎস্না; দু'জনে মৌরীর তীরে উপস্থিত হইল। মানব বলিল—'একি, এ যে নদী! আমি স্নান করব। কিন্তু আগে তোমার কুঞ্জ দেখি।'

কুঞ্জ দেখিয়া মানব দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

'কি সুন্দর তোমাদের জীবন! কেন আমরা নগরে থাকি, রাজ্যের জন্য কাড়াকাড়ি করি? মানুষের যত অনিষ্টের মূল নাগরিক জীবন। ইচ্ছা করে চিরদিন তোমার এই কুঞ্জে কাটাই।'

অস্ফুটস্বরে রঙ্গনা বলিল— 'কাটাও না কেন?'

মানব বলিল—'উপায় নেই, কর্মফল ভোগ করতে হবে।—কিন্তু আবার আমি আসব। তোমাকে ভুলতে পারব না।'

রঙ্গনাও বলিতে চাহিল, 'আমিও তোমাকে ভুলতে পারব না'—কিন্তু লজ্জায় তাহা বলিতে পারিল না। বলিল—'তোমার কপাল কেটে গেছে—লাগছে না? এস, বেঁধে দিই।'

মানব বলিল—'ও কিছু নয়, তলোয়ারের আঁচড় লেগেছিল। আপনি সেরে যাবে।'

'তবে তুমি স্নান করে এস।'

'তুমি চলে যাবে না?'

'না।'

মানব অল্পকাল মধ্যেই স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল; বর্ম চর্ম শিরস্ত্রাণ কুঞ্জের বাহিরে নামাইয়া রাখিল। ইতিমধ্যে রঙ্গনা খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে, কুঞ্জদ্বারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মানব চারিদিকে চাহিল। আকাশে জ্যোৎস্না ফিন্ ফুটিতেছে; সুদূর-প্রসারিত বেতসবনের শাখাপত্র মৃদু মর্মর-ধ্বনি করিয়া কাঁপিতেছে। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই। মানবের মনে হইল, ইহজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে কোন্ এক অর্ধ-বাস্তব মায়াপুরীতে উপনীত হইয়াছে। এখানে আর কেহ নাই, শুধু সে আর রঙ্গনা।

মানব রঙ্গনার হাত ধরিয়া ঈষৎ স্খলিতস্বরে বলিল—'রঙ্গনা— !'

'কি বলছ?'

'না, কিছু না—' মানব নিশ্বাস ফেলিল— 'তুমি এবার ঘরে যাও। কাল সকালে একবার তোমার দেখা পাব কি?'

রঙ্গনা বলিল— 'আজ রাত্রেই আমি আবার আসব।—তোমার খাবার নিয়ে আসব।'

সহসা রঙ্গনার দুই স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া মানব নত হইয়া তাহার চোখের মধ্যে চাহিল—

'রঙ্গনা, তুমি আমার বৌ হবে?'

রঙ্গনা তাহার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া পালাইয়া গেল।

গ্রামের কুটিরগুলিতে দীপ নিভিয়া গিয়াছে ; দিনের মাতামাতির পর গ্রামবাসীরা ক্লান্তদেহে শয্যা আশ্রয় করিয়াছে। কেবল গোপা আপন কুটির দ্বারে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠাভরা চক্ষে বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। তাহার উৎকণ্ঠা ক্রমে আশঙ্কায় পরিণত হইতেছিল, এমন সময় রঙ্গনা ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিল ; গোপা কোনও প্রশ্ন করিবার পূর্বেই একবার 'মা—' বলিয়া ডাকিয়া মাতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধের মধ্যে মুখ লুকাইল।

গোপা অনুভব করিল রঙ্গনার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া সে রঙ্গনাকে লইয়া মেঝেয় বসিল। ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলিতেছে, উনানের উপর ভাত চড়ানো রহিয়াছে। গোপা কন্যার চিবুক ধরিয়া মুখ দেখিল, তারপর বলিল— 'এবার বল্ কি হয়েছে।'

রঙ্গনা কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল মুখ নীচু করিয়া ভয়-ভঙ্গুর হাসিতে লাগিল। গোপা তখন একটি একটি প্রশ্ন করিয়া সব কথা বুঝিয়া লইল।

সব শুনিয়া গোপা কিছুক্ষণ বিভ্রান্তভাবে উনানের আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল। কী করিবে সে এখন ? এমন অচিন্তনীয় অবস্থা যে কল্পনা করাও যায় না। চাতক ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিবে ? কিন্তু তিনি যদি বাধা দেন ? রাজপুত্র যদি আসিল, এমনভাবে আসিল ?

ভাবিতে ভাবিতে গোপা যন্ত্রবৎ বলিল— 'রাঙা, দ্যাখ্ ভাত হল কিনা।'

রঙ্গনা উঠিয়া গেল। গোপা মৃন্ময় মূর্তির মত বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বাহিরে সে নিশ্চল, কিন্তু ভিতরে যেন আগ্নেয়গিরির আন্দোলন চলিতেছে।

রঙ্গনা ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া ফেন গালিল।

সহসা গোপা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। না না, সময় নাই, অধিক চিন্তা করিবার সময় নাই। রঙ্গনার জীবনে যে শুভলগ্ন আসিয়াছে তাহা ভ্রষ্ট হইয়া না যায়। আজিকার রাত্রি আর ফিরিয়া আসিবে না, রাজপুত্র চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না—

ঘরের কোণে একটি পুরাতন বেত্রনির্মিত পেটিরা ছিল। গোপা তাহার তলদেশ হইতে দুইটি শোলার মালা বাহির করিল। তুচ্ছ শোলার টুকরা দিয়া গাঁথা দুটি মালা ; গোপার নিভিয়া যাওয়া যৌবনের স্মৃতি। এক রাত্রির স্মৃতি। গোপার দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। কিন্তু সময় নাই ; স্মৃতির মালা গলায় পরিয়া কাঁদিবার সময় নাই। আর একটি অভাবনীয় রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে। হয়তো আজিকার রাত্রি উনিশ বছর আগের আর একটি রাত্রির সমাবর্তন তিথি— কালচক্র এক পাক ঘুরিয়া আসিয়াছে।

গোপা রঙ্গনাকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার কানে কানে দ্রুত-হ্রস্ব কণ্ঠে উপদেশ দিতে লাগিল ; যে-সকল কথা মেয়েকে আজ পর্যন্ত বলে নাই তাহা বলিল। লজ্জা করিল না, লজ্জার সময় কৈ ? তারপর ছুটিয়া গিয়া ভাত বাড়িতে বসিল।

দুপুরের রান্না মৌরলা মাছ ছিল। তপ্ত ভাতে ঘি ঢালিয়া গোপা পাত্র রঙ্গনার হাতে দিল। রঙ্গনার মণিবন্ধ হইতে শোলার মালা দুটি ঝুলিতেছে ; সে দুই হাতে আহার্যের পাত্র লইয়া চুপিচুপি কুটির হইতে বাহির হইল।

বিচিত্র অভিসার যাত্রা। কাব্যে পুরাণে, এরূপ অভিসারের কথা লেখে না। কিন্তু ইহাই হয়তো সত্যকার অভিসার।

বেতসকুঞ্জে তৃণশয্যায় মানব ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাথার উপর চাঁদ বেতসকুঞ্জের বিরলপত্র শীর্ষ হইতে ভিতরে উঁকি দিতেছিল, মানবের ঘুমন্ত মুখ ও প্রশস্ত নগ্ন বক্ষের উপর ক্রীড়া করিতেছিল, তাহার বাহুতে সোনার অঙ্গদের উপর ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল।

রঙ্গনা নিঃশব্দে কুঞ্জে প্রবেশ করিল, মানবের পাশে বসিয়া তাহার জ্যোৎস্না-নিষিক্ত সুপ্ত মুখ দেখিতে লাগিল। রাজপুত্র—আমার রাজপুত্র! রঙ্গনার বুকের মধ্যে শোণিতনৃত্যের উন্মাদনা, রোমে রোমে হর্ষোল্লাস; মাথার কবরী আপনি শিথিল হইয়া পিঠের উপর এলাইয়া পড়িল। সে সন্তর্পণে অতি লঘুভাবে একটি আতপ্ত করতল মানবের বুকের উপর রাখিল।

মানব চমকিয়া উঠিয়া বসিল। রঙ্গনাকে দেখিয়া তাহার মুখে একটি তন্দ্রামুগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে রঙ্গনাকে দুই হাতে বুকে টানিয়া লইয়া জড়িত স্বরে বলিল— 'আমার বৌ!'

চক্ষু মুদিয়া রঙ্গনা নিস্পন্দ হইয়া রহিল; বিপুল রভসরসের প্লাবনে তাহার সম্বিৎ ডুবিয়া গেল। লজ্জার বাহ্য বিভ্রম-বিলাস সে শেখে নাই, শিথিলদেহে অনুভব করিল মানব তাহার অধরে চুম্বন করিতেছে। আতপ-তাপিতা ধরণী যেমন ঊর্ধ্বমুখী হইয়া বৃষ্টির চুম্বন গ্রহণ করে তেমনিভাবে রঙ্গনা মানবের চুম্বন গ্রহণ করিল।

মানব চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে গদ্‌গদ কণ্ঠে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। ক্রমে রঙ্গনার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল; সহজ অশিক্ষিত লজ্জাও জাগরূক হইল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল—'ছেড়ে দাও।'

মানব বলিল— 'না, ছাড়ব না। তুমি আমার বৌ।'

বৌ! রঙ্গনার মনে পড়িল, মা শিখাইয়া দিয়াছিল কি কি বলিতে হইবে। সে চোখ খুলিয়া মানবের মুখের পানে চাহিল। মানবের মুখ দেখিয়া আবার সব গোলমাল হইয়া গেল। কিন্তু না, মা বলিয়া দিয়াছে, কথাগুলি বলিতেই হইবে।

রঙ্গনা চুপিচুপি বলিল—'তোমার তো আরও বৌ আছে।'

মানব রঙ্গনাকে ছাড়িয়া দিয়া গম্ভীর চক্ষে তাহার পানে চাহিল। শেষে বলিল— 'আছে। কিন্তু তারা আমার রানী, মনের মানুষ নয়।'

'মনের মানুষ কে?'

'তুমি। তোমাকেই এতদিন খুঁজেছি, পাইনি।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

'না। এখন কোথায় নিয়ে যাব? যদি রাজ্য রক্ষা করতে পারি, ফিরে এসে তোমায় নিয়ে যাব। শপথ করছি।'

অতঃপর রঙ্গনার শেখানো বুলি ফুরাইয়া গেল। মা আরও অনেক কথা শিখাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহা আর সে মনে করিতে পারিল না। কি হইবে মনে করিয়া? তাহার রাজপুত্র ক্ষুধিত তৃষিত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছে। ব্যাকুল অনুরাগে রঙ্গনার নিশ্বাস দ্রুত বহিল। সে কম্পিতহস্তে একটি শোলার মালা রাজপুত্রের গলায় পরাইয়া দিল।

অন্য মালাটি মানব রঙ্গনার গলায় দিল।

মোহ-বিহ্বল রাত্রি: নব-অনুভবের বিস্ময়-পুলক ভরা বাসকরজনী। দু'জনে দু'জনের মুখে অন্ন দিল, চুম্বন দিল। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। একসঙ্গে আকুলতা ও চটুলতা, লজ্জা ও প্রগল্‌ভতা। তন্দ্রা ও প্রমীলায় মেশামেশি, ঘুমে জাগরণে জড়াজড়ি।

রাত্রি নিবিড় হইল। চাঁদ অস্ত গেল।

প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিয়া মানব ও রঙ্গনা কুঞ্জের বাহিরে আসিল। পূর্বাকাশে ঊষা ঝলমল করিতেছে। পাখি ডাকিতেছে।

মানব দেখিল অদূরে নদীতীরে তাহার অশ্ব শষ্পাহরণ করিতেছে; তাহার পৃষ্ঠে কম্বলাসন, মুখে

বল্‌গা যেমন ছিল তেমনি আছে। প্রভুকে দেখিতে পাইয়া জয়ন্ত মৃদু হ্রেষাধ্বনি করিল।

মানব ম্লান হাসিয়া বলিল— 'আমার বাহনও উপস্থিত। তবে যাই, রাঙা বৌ।'

রঙ্গনা তাহার বাহু জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল— 'কবে ফিরে আসবে ?'

মানব রঙ্গনাকে দুই হাতে বুকের কাছে তুলিয়া মুখে মুখ রাখিয়া বলিল— 'যেদিন শত্রুকে রাজ্য থেকে দূর করব, সেদিন তোমাকে নিতে আসব। যদি রাজ্য যায় আর বেঁচে থাকি, তাহলেও তোমার কাছে ফিরে আসব।'

কণ্ঠলগ্না রঙ্গনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'আসবে ?'

'আসব। শপথ করছি।'

রঙ্গনাকে নামাইয়া দিয়া মানব নিজ বাহু হইতে অঙ্গদ খুলিয়া তাহার বাহুতে পরাইয়া দিল, বলিল—'এই অঙ্গদ নাও। যতদিন না ফিরে আসি, এটিকে দেখো ; আমায় মনে পড়বে।'

তারপর রঙ্গনার সোনাপোকা উড়িয়া গেল। জয়ন্তের পৃষ্ঠে চড়িয়া মানব চলিয়া গেল। রঙ্গনা অশ্রুবিধৌত মুখে দাঁড়াইয়া বিলীয়মান অশ্বারোহীর পথের পানে চাহিয়া রহিল। মানবের বৃহৎ অঙ্গদ তাহার বাহু হইতে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল, সে তাহা খুলিয়া একবার বুকে চাপিয়া ধরিল, তারপর আঁচলে বাঁধিয়া ঘরের দিকে চলিল।

নিশান্তের পাণ্ডুর চন্দ্রমা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
বজ্রসম্ভব

দিবা অনুমান এক প্রহর সময়ে ইক্ষুযন্ত্রে আখ মাড়াই কার্য সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় একদল সৈন্য হুম্ হুম্ শব্দ করিয়া বেতসগ্রামে ঢুকিয়া পড়িল। গ্রামের পুরুষেরা ভয় পাইল বটে, কিন্তু পলায়ন করিল না। যুবতী মেয়েরা কতক আখের ক্ষেতে, কতক বেতসবনে লুকাইল। গত ত্রিশ বছর ধরিয়া যে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে তাহাতে শত্রুসৈন্য একবারও গৌড়ের মাটিতে পদার্পণ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু নানা লোকের মুখে নানা লোমহর্ষণ কাহিনী শুনিয়া গ্রামবাসীদের মনে বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদলের স্বভাব-চরিত্র আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে একটা বিভীষিকাপূর্ণ ধারণা জন্মিয়াছিল।

সৈন্যদল কিন্তু সংখ্যায় বেশি নয় ; মাত্র কুড়ি পঁচিশজন পদাতিক, হাতে ঢাল সড়কি। ইহারা ভাস্করবর্মার দলের সৈন্য। গতকল্য যুদ্ধ জিতিয়া ভাস্করবর্মা সদলবলে কর্ণসুবর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, ইহারা সেই বিশাল বাহিনীর একটি বিচ্ছিন্ন প্রশাখা।

সৈন্যদল প্রথমেই জানিতে চাহিল, গৌড়ের রাজা বা তৎস্থানীয় কেহ গ্রামে লুকাইয়া আছে কিনা। গ্রামবাসীরা একবাক্যে বলিল, রাজা-গজা কেহ এখানে নাই। অনুসন্ধান কবিবার ছুতায় কিছু লুঠপাট করিবার ইচ্ছা সৈনিকদলের ছিল ; কিন্তু তাহারা দলে ভারী নয়। গ্রামবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তো বটেই, উপরন্তু বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট। সৈনিকদের অস্ত্র আছে সত্য, কিন্তু অমন দুই চারিটা সড়কি বল্লম গ্রামেও আছে। সুতরাং তাহারা কোনও প্রকার উপদ্রব করিতে সাহস করিল না, প্রত্যেকে একটি একটি ইক্ষুদণ্ড লইয়া চিবাইতে চিবাইতে প্রস্থান করিল।

সৈন্যদল চলিয়া যাইবার পর গুড়নির্মাণ কার্য স্বভাবতই শ্লথ হইয়া পড়িল। সকলে জটলা করিয়া জল্পনা করিতে লাগিল ; কোথায় যুদ্ধ হইয়াছে ? ইহারা কোন্ রাজার সৈন্য ? বাহিরের

শত্রু ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, এখন আত্মরক্ষার উপায় কি ? গৌড়ের রাজা কি রাজ্য ছাড়িয়া পলাতক ?

মধ্যাহ্নকালে গোপা অলক্ষিতে দেবস্থানে গেল। কুটির-চক্রের বাহিরে নির্জন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে দেবস্থান, পাশেই চাতক ঠাকুরের একচালা। গোপা দেখিল, ঠাকুর অশ্বত্থ বৃক্ষের একটি উদ্গত শিকড়ে মাথা রাখিয়া ঊর্ধ্বমুখে শয়ান রহিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ।

গোপা আসিলে চাতক ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। দুই একটা অন্য কথার পর গোপা গত রাত্রির ঘটনা বলিল।

চাতক ঠাকুর অবহিত হইয়া শুনিলেন। গোপা নীরব হইলে তিনি একবার চোখ তুলিয়া তাহার পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। গোপা তাঁহার চোখের প্রশ্ন বুঝিয়া নীরবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। ঠাকুর তখন দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন— 'একথা চেপে রাখা চলবে না। গাঁয়ের সকলকে জানিয়ে দেওয়া ভাল।'

গোপা বুঝিল, ঠাকুর কি ভাবিয়া একথা বলিলেন। সে বলিল— 'আপনি যা ভাল বোঝেন।'

ঠাকুর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন— 'আমি যা দেখেছিলাম তা মিথ্যে নয়। কিন্তু ভেবেছিলাম একরকম, হল আর একরকম। যাক, যা হবার তাই হয়েছে। সব তো মনের মত হয় না, গোপা-বৌ। হয়তো ভালই হবে, রাঙার রাজপুত্তুর ফিরে আসবে। কিন্তু—

'কিন্তু কি ঠাকুর ?'

'আমার মন বলছে বড় দুঃসময়ে আসছে। শুধু তোমার আমার নয় ; আমরা তো খড়-কুটো। সারা দেশের দুঃসময়। ঝড় উঠেছে ; রাজার সিংহাসন ভেঙে পড়বে, মন্দিরের চূড়া খসে পড়বে। সব ওলট-পালট হয়ে যাবে—'

ভীত হইয়া গোপা বলিল— 'দীনদুঃখীদের কি হবে ঠাকুর ?'

ঠাকুর বলিলেন— 'যদি কেউ রক্ষা পায়, দীনদুঃখীরাই পাবে। জানো গোপা-বৌ, যখন কালবোশেখী আসে তখন তালগাছ শালগাছ ভেঙে পড়ে, কিন্তু বেতসলতার মত যারা নুয়ে পড়ে তারা বেঁচে যায়।'

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কয়েকজন গ্রামবৃদ্ধ মহত্তর মহাশয়ের কুটিরমণ্ডপে পাটি পাতিয়া বসিয়াছিলেন। প্রাতঃকালের আকস্মিক সৈন্যসমাগমের আলোচনা হইতেছিল, এমন সময় চাতক ঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। আলাপ আলোচনা চলিতে লাগিল। — আজ শশাঙ্কদেব বাঁচিয়া নাই, তাই শত্রুর এত সাহস।...মানব কি সত্যই যুদ্ধে হারিয়া পলায়ন করিয়াছে ?...কোথায় লুকাইয়া আছে ?

চাতক ঠাকুর একটু কাশিয়া বলিলেন— 'মানবদেব কাল রাত্রে আমাদের গ্রামে লুকিয়ে ছিলেন।'

সকলে উচ্চকিত হইয়া উঠিলেন। নানাবিধ উত্তেজিত প্রশ্নের উত্তরে চাতক ঠাকুর সংক্ষেপে ঘটনা বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন—'কাল রাত্রে রাঙার সঙ্গে মানবদেবের বিয়ে হয়েছে। আজ ভোরে তিনি কানসোনায় ফিরে গেছেন।'

আবার তুমুল তর্ক উঠিল। চাতক ঠাকুর স্মিতমুখে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। অবশেষে এক বৃদ্ধ সন্দিগ্ধভাবে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—'তুমি এত কথা জানলে কোথা থেকে ঠাকুর ? রাজা রাঙাকে বিয়ে করেছে তুমি চোখে দেখেছ ?'

চাতক ঠাকুর শান্তস্বরে একটি মিথ্যা কথা বলিলেন—'আমিই বিয়ে দিয়েছি।'

সে-রাত্রে দেবস্থানে ফিরিবার পথে ঠাকুর গোপাকে চুপি চুপি বলিয়া গেলেন— 'গোপা-বৌ, রাঙার সিঁথেয় সিঁদুর দিও। আর যদি কেউ জানতে চায়, বোলো আমি রাঙার বিয়ে দিয়েছি।'

রঙ্গনা সীমন্তে সিন্দূর পরিল। যেন সোনার কমলে রক্ত-চন্দনের ছিটা। রঙ্গনাকে কেন্দ্র করিয়া সারা গ্রামে উত্তেজনার ঘূর্ণাবর্ত বহিয়া গেল। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি রঙ্গনার দিকে, সকলের চটুল রসনায় রঙ্গনার কথা। কিন্তু রঙ্গনার কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, সে যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন আছে। বরং গোপা গ্রামীণ-গ্রামীণাদের ঔৎসুক্য ও কৌতূহল দেখিয়া গর্বিত অবজ্ঞায় ঘাড় বাঁকাইয়া ভ্রূকুটি করে; কিন্তু রঙ্গনার গর্বও নাই, অভিমানও নাই। সে তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় নদীতে স্নান করিতে যায়; মেয়েদের কৌতুক কানাকানি তাহার কর্ণে প্রবেশ করে, কিন্তু অন্তর স্পর্শ করে না। তাহার সূক্ষ্ম অন্তঃ-প্রকৃতি যেন গ্রামের পরিবেশ ছাড়িয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে, জড় দেহটাই পিছনে পড়িয়া আছে।

একটি একটি করিয়া দিন কাটে, পক্ষ কাটে, মাস কাটিয়া যায়। হেমন্ত গিয়া হিম আসে, হিমের শেষে বসন্ত। রঙ্গনা নিজ দেহের অভ্যন্তরে নূতন জীবনের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করে। তাহার দেহ-মন ভরিয়া বিপুল হৃদয়াবেগ উথলিয়া উঠে। সে চুপি চুপি মানবের অঙ্গদটি পেটরা হইতে বাহির করিয়া বুকে চাপিয়া ধরে।

কিন্তু মানব ফিরিয়া আসে না; তাহার কোনও সংবাদও নাই। বহির্জগতের সহিত বেতসগ্রামের যোগাযোগ অতি অল্প; সেই যে একদল শত্রু-সৈন্য আসিয়াছিল, তারপর বাহির হইতে আর কেহ আসে নাই। গ্রামিকেরা কেহ কেহ কদাচ বাহিরে গিয়া কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনে। সে সংবাদও পাকা খবর নয়, জনশ্রুতি মাত্র। কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত যাইবার সাহস কাহারও নাই; সেখানে নাকি মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে, রক্তের স্রোত বহিতেছে। কোনও এক ভাস্করবর্মা নাকি গৌড়দেশ গ্রাস করিয়াছে। মানবদেবের কথা কেহ জানে না; সে মরিয়াছে কি বাঁচিয়া আছে তাহাও অজ্ঞাত।

এ সকল কথা রঙ্গনার কানে পৌঁছায় না; কে পৌঁছাইবে? চাতক ঠাকুর জানেন, কিন্তু তিনি নীরব থাকেন। মাঝে মাঝে গোপা ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হয়, ঠাকুর তাহার প্রশ্ন এড়াইয়া যান। গোপার বুক দমিয়া যায়। কিন্তু সে নিজের আশঙ্কার কথা রঙ্গনাকে বলে না, আশায় বুক বাঁধিয়া থাকে।

রঙ্গনা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে বেতসকুঞ্জে গিয়া শুইয়া থাকে। স্বপ্নালসার কল্পনায় নানা ক্রীড়া চলিতে থাকে। সে কল্পনায় শুনিতে পায়, বহু দূর হইতে জয়ন্তের ক্ষুরধ্বনি আসিতেছে...সাদা ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘকান্তি আরোহী...দূর্বা-হরিৎ প্রান্তরের উপর দিয়া অশ্বের মৃদু ক্ষুরধ্বনি ক্রমে কাছে আসিতেছে...ঐ কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া থামিল!— রঙ্গনা চমকিয়া উঠিয়া বসে; বেতস-শাখার ফাঁকে বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করে; আবার নিশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করে।

বেতসকুঞ্জে মন যখন বড় অধীর হয় তখন রঙ্গনা মৌরীর কিনারা ধরিয়া দক্ষিণদিকে যায়। দক্ষিণে গ্রামের সীমান্তে একটি বৃদ্ধ জটিল ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ঘন-শীতল ছায়াতলে বসিয়া অপলক নেত্রে দূরের পানে চাহিয়া থাকে— দূরে মাঠের শেষে বন আরম্ভ হইয়াছে; বনের শেষে নাকি আবার মাঠ আছে, তারপর কর্ণসুবর্ণ নগর। কত বিস্তীর্ণ এই পৃথিবী! এই পৃথিবীর অন্য প্রান্ত হইতে একটি মানুষ কি আসিবে? কিন্তু সে যে আসিবে বলিয়া গিয়াছিল! কেন আসিবে না? কবে আসিবে?

এইভাবে বসন্ত ফুরাইয়া গেল। রঙ্গনা যখন প্রায় পূর্ণগর্ভা তখন একটি ঘটনা ঘটিল, রঙ্গনার জীবনের যাহা দৃঢ়তম অবলম্বন ছিল তাহা হঠাৎ খসিয়া গেল।

গোপা একদিন অপরাহ্নে শিকড়-বাকড়ের অন্বেষণে গ্রামের বাহিরে মাঠের দিকে গিয়াছিল। মাঠে এক বেদিয়া রমণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বেদিয়ারা সাপ ধরে যত্রতত্র সাপের খেলা দেখাইয়া বেড়ায়, জাঙ্গলিক বিষবৈদ্যের কাছে সাপের বিষ বিক্রয় করে; আবার তুকতাক

মন্ত্রৌষধি জানে, গুপ্তচরের কাজও করে। বেদেনীর সহিত গোপার অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা হইল। কি কথা হইল তাহা কেহ জানিল না। সন্ধ্যার সময় গোপা কুটিরে ফিরিয়া আসিল।

রঙ্গনা লক্ষ্য করিল না, তাহার মায়ের মুখ কালীবর্ণ, হাত-পা কাঁপিতেছে। গোপা আহার না করিয়াই শুইয়া পড়িল। স্বভাবতই সে আজকাল কম কথা বলে, আজ একটিও কথা বলিল না।

গভীর রাত্রে গোপার ত্রাস দিয়া জ্বর আসিল। প্রচণ্ড তাপ, গা পুড়িয়া যাইতেছে, চক্ষু জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। এই মরণান্তক জ্বর আর নামিল না। দুই দিন অঘোর অচৈতন্য থাকিবার পর গোপার প্রাণবিয়োগ হইল। মরণের পূর্বে কিন্তু সে একবার মুখ খুলিল না, একটি বাক্য নিঃসরণ করিল না। বেদেনীর মুখে যে ভয়ঙ্কর সংবাদ সে শুনিয়াছে তাহার ইঙ্গিত পর্যন্ত দিল না।

গ্রামবাসীরা মৃত্যু-মুহূর্তে বিবাদ-বিসংবাদ মনে রাখিল না, মৌরীর তীরে লইয়া গিয়া গোপার অন্ত্যেষ্টি করিল। তাহার দেহ ভস্ম হইয়া মৌরীর জলে মিশিল। গোপার জীবন-জ্বালা জুড়াইল।

গ্রামের কেহ কেহ গোপাকে বেদেনীর সহিত মাঠে কথা কহিতে দেখিয়াছিল, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল— বেদেনীই তুকতাক করিয়া গোপাকে মারিয়াছে। মৃত্যুর যে অন্য কারণ থাকিতে পারে তাহা কেহ ভাবিল না। গোপার জন্য অবশ্য কেহ শোক করিল না, কিন্তু রঙ্গনার প্রতি অনেকেরই মন সদয় হইল। গ্রামের বিবাদ ছিল গোপার সঙ্গে, কারণ গোপা ছিল মুখরা-প্রখরা। রঙ্গনার স্বভাব মায়ের মত নয় ; সে নমনীয়া, মৃদু-স্বভাবা। সে অপরূপ রূপসী, তার উপর রাজবধূ। হোক এক রাত্রির বধূ, তবু রাজবধূ। কে বলিতে পারে, হয়তো মানবদেব কোন্ দিন ফিরিয়া আসিবে, রঙ্গনাকে চতুর্দোলায় তুলিয়া লইয়া যাইবে। গ্রামবাসীদের মন তাহার প্রতি প্রসন্ন হইল। গোপা যেন মরিয়া তাহাকে জাতে তুলিয়া দিয়া গেল।

মাতার মৃত্যুর পর দুই দিন রঙ্গনা ভূমিশয্যা ছাড়িয়া উঠিল না। চাতক ঠাকুর আসিলেন ; স্বয়ং রন্ধন করিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। স্নিগ্ধস্বরে দুই চারিটি কথা বলিলেন।

'মা কারও চিরকাল থাকে না, রাঙা। স্বামীর কথা ভাব। তোর পেটে যে আছে তার কথা ভাব।'

রঙ্গনা মনে বল পাইল। মা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঠাকুর আছেন। না, সে সাহস হারাইবে না, হাল ছাড়িয়া দিবে না। যে-জন আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। অনাগত জীবন-কণিকার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

রঙ্গনার জীবনযাত্রা আবার পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। কুটিরে সে একা। কিন্তু ক্রমে তাহাও অভ্যাস হইয়া গেল। পূর্বে মাতার আদেশে কাজ করিত ; এখন নিজেই রন্ধন করে, নদীতে জল আনিতে যায় ; সন্ধ্যায় চুল বাঁধে, সিঁথি ভরিয়া সিঁদুর পরে। আর প্রতীক্ষা করে—

চাতক ঠাকুর সময়ে অসময়ে আসিয়া তাহার দেখাশুনা করেন, গল্প করেন, জাতক-পুরাণের উপাখ্যান বলেন। রাত্রে তাহার দেহলীতে আসিয়া শয়ন করেন।

এইভাবে নিদাঘও শেষ হইতে চলিল।

সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে সংক্রমণ করিলে, একদিন সায়াহ্নে আকাশের দক্ষিণ হইতে কালো কালো মেঘ উঠিয়া আসিল। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দ্রুত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। কুটির দেহলীতে রঙ্গনা তখন চুল বাঁধিয়া পিত্তলের থালিকা মুখের কাছে ধরিয়া সীমন্তে সিন্দূর পরিতেছে, চাতক ঠাকুর অদূরে বসিয়া এক কৌতুককর কাহিনী বলিতেছেন, এমন সময় দশদিক ধাঁধিয়া নীল বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল, পরক্ষণেই বিকট বজ্রনাদে আকাশ যেন ফাটিয়া পড়িল। রঙ্গনা হঠাৎ ভয় পাইয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

বজ্রের হুঙ্কারধ্বনি প্রশমিত হইলে তীব্র ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল ; তখন রঙ্গনা মাটি হইতে পাংশু-পাণ্ডুর মুখ তুলিল, একবার ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে ঠাকুরের পানে চাহিল, তারপর টলিতে টলিতে উঠিয়া কুটির কক্ষে প্রবেশ করিল।

ঠাকুর তাহার ভয় বিস্ফারিত দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। তিনি বৃষ্টির মধ্যে ছুটিয়া গিয়া আশেপাশের কুটির হইতে দুই জন স্ত্রীলোককে ডাকিয়া আনিলেন।

দুইদণ্ড মধ্যে রঙ্গনা সন্তান প্রসব করিল ; বজ্র-বিদ্যুতের গুড়ুকধ্বনির মধ্যে শিশু কণ্ঠের ক্ষীণ কাকুতি শুনা গেল। ঠাকুর দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—'কী হল, ছেলে না মেয়ে?'

বন্ধ দ্বারের ওপার হইতে একটি স্ত্রীলোক বলিল— 'ছেলে।'

আহ্লাদে ঠাকুরের মন ভরিয়া উঠিল। তিনি দুই হস্ত সহর্ষে ঘর্ষণ করিতে করিতে নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—'ভাল ভাল! আহা ভাল হয়েছে। রাজার ছেলে, বজ্রের ভেরী বাজিয়ে এসেছে। ওর নাম রাখলাম—বজ্র। শশাঙ্কদেবের পৌত্র, মানবদেবের পুত্র বজ্রদেব। ওর মায়েরও নাম রেখেছিলাম, আবার ওর নাম রাখলাম। আহা বেঁচে থাক, মা'র কোল জুড়ে থাক।'

আকাশে ঘন দুর্যোগ ; ধরণীপৃষ্ঠে বৃষ্টির লাজাঞ্জলি বর্ষণ। মেঘের বিতানতলে মর্দলঝল্লরীর রণবাদ্য বাজিতেছে, আবার তড়িল্লতার নৃত্যবিলাস চলিয়াছে। সদ্যোজাত শিশুর অদৃষ্টদেবতা যেন জন্মকালেই তাহার ললাটে ভবিতব্যের তিলক পরাইয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
মধুমথন

স্থির জলাশয়ের মাঝখানে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তরঙ্গচক্র উত্থিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ; শৈবালদল তালে তালে নাচিতে থাকে, কুমুদ কহ্লার দুলিয়া দুলিয়া হাসে। তারপর আবার শান্ত হয়।

বজ্রের জন্ম-সংবাদ তেমনি ক্ষুদ্র বেতসগ্রামে আন্দোলন তুলিল বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। রাজ-সমাগম এবং রঙ্গনার বিবাহের ইতিহাস ইতিপূর্বেই পুরানো হইয়া গিয়াছে, বজ্রের জন্মেও অপ্রত্যাশিত নূতনত্ব কিছু নাই। তাই এই ঘটনা লইয়া গ্রামের জল্পনা-কল্পনা শীঘ্রই শান্ত হইল।

গোপার মৃত্যুর পর গ্রামরমণীদের মন রঙ্গনার প্রতি অনুকূল হইয়াছিল ; কিন্তু একটি কারণে এই অনুকূলতা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল না। যে মেয়েরা রঙ্গনার সঙ্গে সখিত্ব স্থাপন করিতে আসিল, রঙ্গনা তাহাদের সহিত সরলভাবে হাসিয়া কথা কহিল, তাহাদের ছেলে দেখাইল, লজ্জিত নতমুখে তাহাদের রঙ্গ পরিহাস গ্রহণ করিল ; কিন্তু তবু গ্রামের মেয়েরা অনুভব করিল রঙ্গনার গোটা মনটা যেন উপস্থিত নাই ; যেন প্রত্যক্ষ জগতের সহিত তাহার নাড়ির যোগ ছিঁড়িয়া গিয়াছে ; সর্বদাই যেন সে অন্যমনস্ক হইয়া আছে, উৎকর্ণ হইয়া আছে, দূরাগত পদধ্বনি শুনিবার চেষ্টা করিতেছে। যখন সে একাগ্র তন্ময় হইয়া ছেলের পানে চাহিয়া থাকে তখনও মনে হয় সে ছেলেকে দেখিতেছে না, ছেলের মুখে চোখে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আর একজনের পরিচয়-চিহ্ন খুঁজিতেছে। গ্রামের মেয়েরা বুঝিল রঙ্গনা থাকিয়াও নাই। রঙ্গনার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ শিথিল হইয়া পড়িল। পূর্বেকার বিদ্বেষভাবে ফিরিয়া আসিল না বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গ হইবার চেষ্টাও

আর রহিল না। হংসী যেমন জলে বাস করিয়াও জলের নয়, রঙ্গনা তেমনি নির্লিপ্তভাবে গ্রামে রহিল।

বজ্র বড় হইতে লাগিল। মাতৃক্রোড় হইতে কুটির-কুট্টিমে নামিল, সেখান হইতে প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ হইতে গ্রামের মাঠে-ঘাটে। মাতৃস্তন ছাড়িয়া গো-দুগ্ধ, তারপর অন্ন। বজ্রের প্রকৃতি যে সাধারণ শিশু হইতে পৃথক, তাহা তাহার জন্মকাল হইতে লক্ষিত হইয়াছিল। সে বেশি কাঁদে না, আঘাত লাগিলে বা ক্ষুধা পাইলেও কাঁদে না। যখন কথা বলিতে শিখিল, তখনও অধিক কথা বলে না, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলে। সে চঞ্চল নয়, চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া থাকে এবং অন্য শিশুদের ছুটাছুটি লক্ষ্য করে, কিন্তু অকারণে ছুটাছুটি করে না। যখন একাকী থাকে তখন একদৃষ্টে একদিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে, কি চিন্তা করে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা যায় না।

অথচ সে মেধাবী ; তাহার মন সর্ববিষয়ে সজাগ ও সচেতন। দেহের দিক দিয়া যেমন সমবয়স্ক বালকদের তুলনায় অধিক বৃদ্ধিশীল, মনের দিক দিয়াও তেমনি। বজ্রের যখন পাঁচ বছর বয়স, চাতক ঠাকুর তখন তাহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। গ্রামের কেহই লিখিতে পড়িতে জানিত না, চাতক ঠাকুরও না। মুখে মুখে শিক্ষা। চাতক ঠাকুর তাহাকে মুখে মুখে অঙ্ক শিখাইলেন ; কড়া গণ্ডা পণ, যোগ বিয়োগ হরণ পূরণ। বজ্র দ্রুত শিখিল এবং যাহা শিখিল তাহা মনে করিয়া রাখিল।

চাতক ঠাকুর যখন বজ্রকে শিক্ষা দিতেন রঙ্গনা কাছে বসিয়া থাকিত। কখনও গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর মন দিয়া শুনিত, কখনও সব ভুলিয়া তন্ময় দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত।

বজ্রের বয়স সাত-আট বছর হইলে চাতক ঠাকুর তাহাকে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে শিখাইলেন। বজ্র একেই আত্মসমাহিত শান্তস্বভাব বালক, সে ছিপ লইয়া সারাদিন মৌরীর তীরে বসিয়া থাকিত ; সন্ধ্যার সময় মাছ লইয়া হাসিমুখে মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইত। ইহার পর এমন একদিনও যাইত না যেদিন রঙ্গনাকে নিরামিষ খাইতে হইত। কোনও দিন পুঁটি-খয়রা, কোনও দিন শোলের পোনা, কোনও দিন মৌরলা।

মাছ ধরা ছাড়া আর একটি কাজও বজ্র ভালবাসিত, সাঁতার কাটা। সাঁতার কাটিতে কেহ তাহাকে শিখায় নাই, সে নিজেই শিখিয়াছিল। একদিন সে মৌরীর তীরে একাকী খেলা করিতে করিতে উঁচু পাড় হইতে জলে পড়িয়া যায়। সাহায্য করিবার কেহ নাই, সে নিজেই হাত-পা ছুঁড়িয়া তীরে উঠিয়াছিল। তারপর সাঁতার শেখা তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। ইচ্ছা হইলেই সে সাঁতার কাটিয়া মৌরী এপার ওপার হইত, বলিষ্ঠ বাহুর তাড়নে নদীর জল তোলপাড় করিত।

ভিল্ল জাতীয় এক বনচর মাঝে মাঝে গ্রামে আসিত। উত্তরের জঙ্গল হইতে হরিণ বা ময়ূর মারিয়া গ্রামে লইয়া আসিত ; মাংসের বিনিময়ে গুড় ও তণ্ডুল লইয়া যাইত। মসীকৃষ্ণ দেহের বর্ণ, পরিধানে পশুচর্ম, কেশের মধ্যে কঙ্কপত্র, মুখে সরল হাসি। ধনুক কাঁধে লইয়া সে যেদিন বজ্রের সম্মুখে দাঁড়াইল, বজ্র অপলক নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বজ্রের বয়স তখন নয়-দশ বৎসর, ভিলকে সে পূর্বে কখনও দেখে নাই।

ভিল একটি হরিণ মারিয়া আনিয়াছিল। গ্রামের কয়েকজন হরিণ কিনিয়া লইল, পরিবর্তে ভিলকে গুড় ও শস্য দিল।

ভিল যখন ফিরিয়া চলিল বজ্রও তাহার পিছন পিছন চলিল। গ্রামের উত্তরে বাথান পার হইয়া ভিল পলাশবনে প্রবেশ করিল, তখনও বজ্র তাহার পিছন ছাড়িল না। ভিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল, হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'কি চাও ?'

বজ্র বলিল— 'তুমি কি করে হরিণ মারো ?'

ভিল হাসিয়া উঠিল—'এই তীরধনুক দিয়ে।'

তীরধনুক কিছুক্ষণ উৎসুক চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বজ্র বলিল— 'ও দিয়ে হরিণ মারা যায় ?'

ভিল আবার হাসিল। শুভ্রকান্তি বলিষ্ঠ দেহ বালককে তাহার ভাল লাগিল। সে বলিল—'মারা যায়। দেখবে ?'

অদূরে উচ্চ বৃক্ষচূড়ে একগুচ্ছ ফুল ফুটিয়া ছিল। ভিল ধনুতে তীর সংযোগ করিয়া পুষ্পগুচ্ছের প্রতি লক্ষ্য করিল ; আকৃষ্ট ধনু হইতে টঙ্কার শব্দে তীর ছুটিয়া গেল। রক্তবর্ণ কিংশুকগুচ্ছ মাটিতে পড়িল।

ভিল ফুলের গুচ্ছটি বজ্রের হাতে দিল, তারপর নিজের তীর তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বনের পথে চলিল। কিছুদূর গিয়া ভিল দেখিল তখনও বজ্র তাহার পশ্চাতে আসিতেছে। সে বলিল— 'আবার কি ?'

বজ্র বলিল— 'আমাকে শেখাবে ?'

ভিল বলিল— 'শেখাতে পারি। কিন্তু তুমি আমায় কি শেখাবে ?'

বজ্র চিন্তা করিয়া বলিল— 'আমি তোমাকে বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরতে শেখাব।'

ভিল হৃষ্ট হইয়া বলিল— 'আচ্ছা। এবার আমি তাড়াতাড়ি আসব। তোমার জন্যে নতুন তীরধনুক তৈরি করে আনব।'

কিংশুকগুচ্ছটি লইয়া বজ্র ছুটিতে ছুটিতে কুটিরে ফিরিয়া আসিল। এত আহ্লাদ ও উত্তেজনা তাহার জীবনে এই প্রথম। মা'কে সম্মুখে পাইয়া সে দুই বাহু দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। রঙ্গনা তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল—'কি রে !'

লজ্জা পাইয়া বজ্র একটু শান্ত হইল ; মায়ের চুলে রাঙা ফুলগুলি গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল— 'আমি তীরধনুক শিখব।'

রঙ্গনা ছেলের মুখখানি দুই হাতে ধরিয়া বিস্ময়-বেদনাভরা চোখে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মানব চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু যেন সম্পূর্ণ চলিয়া যায় নাই ; নিজের খানিকটা রঙ্গনার কাছে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছে। আবার সে আসিবে, যত বিলম্বেই হোক আবার সে ফিরিয়া আসিবে। রঙ্গনার প্রতীক্ষা বিফল হইবে না।

যারা সংসারী তাহাদের যৌবন অধিক দিন থাকে না। কিন্তু রঙ্গনা সংসারের ফাঁদে ধরা দেয় নাই, নিজের অন্তরের কল্পলোকে বাস করিয়াছে ; তাই কালের নখরাঘাত তাহার অঙ্গে লাগে নাই। এখনও তাহাকে দেখিলে মনে হয়, সে নববধূ ; অনাঘ্রাত পুষ্প, অনাস্বাদিত মধু। দশ বৎসর পূর্বের সেই একটি হৈমন্তী রজনী যেন তাহার রূপ-যৌবনকে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে, দেহে মনে সে আর একটি দিনও বাড়ে নাই।

কিন্তু কালচক্র ঘুরিতেছে। কাহারও পক্ষে মন্থর, কাহারও পক্ষে দ্রুত। রঙ্গনার প্রতীক্ষায় এখন আর ত্বরা নাই, অধীরতা নাই। কিন্তু বজ্রের জীবনে এই প্রথম এক নূতন আকর্ষণ আসিয়াছে, তাহার স্থির স্বভাবকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কৈশোরের স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতায় সে সারাদিন বনের কিনারায় ঘুরিয়া বেড়ায় ; মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া ভাবে, কাল নিশ্চয় ভিল আসিবে।

প্রায় এক মাস পরে ভিল আসিল। নূতন তীরধনুক পাইয়া বজ্রের আনন্দের সীমা নাই। ভিল তাহাকে হাতে ধরিয়া তীর ছুঁড়িতে শিখাইল ; কি করিয়া তীরের পিছনে পুঙ্খ লাগাইয়া তীরের গতি সিধা করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিল। পরিবর্তে বজ্র ভিলকে বঁড়শি দিল এবং নদীতে মাছ ধরিবার কৌশল শিখাইল। দিনের শেষে বিদ্যার আদান-প্রদান সম্পূর্ণ হইলে ভীল মহামূল্য বঁড়শি লইয়া চলিয়া গেল। আর বজ্র সে-রাত্রে তীরধনুক পাশে লইয়া শয়ন করিল।

অতঃপর বজ্র উত্তরের বনে মৃগ অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্রমে তাহার লক্ষ্য স্থির হইল ; সে ময়ূর মারিল, হরিণ মারিল, উড়ন্ত পাখি তীর দিয়া মাটিতে ফেলিতে সমর্থ হইল। তারপর ভিল যখন মাঝে মাঝে আসিত, বজ্রের অব্যর্থ লক্ষ্যবেধ দেখিয়া প্রশংসা করিত, আরও নূতন কৌশল শিখাইয়া দিত।

এইরূপ বিচিত্র পথে বজ্রের শিক্ষাদীক্ষা অগ্রসর হইল। দেহ ও মন দ্রুত পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু ইষদ্‌গম্ভীর সঙ্গাকাঙ্ক্ষাহীন শান্ত স্বভাবের পরিবর্তন হইল না।

বজ্রের যখন বারো বছর বয়স তখন একটি ব্যাপার ঘটিল। গ্রামে মধু নামে এক বালক ছিল ; কুর্চ্চশিখর বৃহৎমুণ্ড কৃষ্ণকায় বালক, বয়সে বজ্র অপেক্ষা দুই এক বৎসরের জ্যেষ্ঠ। মধু'র স্বভাব অতিশয় দুরন্ত ও কলহপ্রিয় ; তাহার পিতা তাহাকে শাসন করিতে পারিত না। মধু তাহার সমবয়স্ক ও কনিষ্ঠ বালক-বালিকাদের উপর অশেষ দৌরাত্ম্য করিত। তাহার দেহও বয়সের অনুপাতে বলিষ্ঠ, কেহ তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিত না।

বজ্রের সহিত গ্রামের কোনও বালকেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, মধু'রও ছিল না। মধু মনে মনে বজ্রকে ঈর্ষা করিত, কিন্তু তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিত না। দূর হইতে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে বজ্রকে ব্যঙ্গভরে 'রাজপুত্তুর' বলিয়া উল্লেখ করিত। বজ্র কদাচিৎ শুনিতে পাইলেও তাহা গায়ে মাখিত না। রাজপুত্র সম্বোধনে কোনও গ্লানির ইঙ্গিত আছে তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

মধু'র অত্যাচার উৎপীড়নের বিশেষ পাত্রী একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম গুঞ্জা। গুঞ্জা মধু'র দূরসম্পর্কের ভগিনী. শৈশবে পিতামাতাকে হারাইয়া সে মধুদের গৃহেই আশ্রয় পাইয়াছিল। গুঞ্জার বয়স সাত বৎসর, কিন্তু তাহাকে দেখিলে আরও অল্পবয়স্ক মনে হইত। ক্ষীণাঙ্গী, মলিন, তামার ন্যায় বর্ণ ; মুখখানি তরতরে, চোখ দুটি বড় বড় ভাসা-ভাসা। কিন্তু চোখে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক। এই পরপালিতা অনাদৃতা মেয়েটিকে মধু নানাভাবে নিগ্রহ করিত। সে ছিল মধু'র আজ্ঞাকারিণী দাসী ; রাগ হইলে মধু তাহাকে মারিত, চুল ছিঁড়িয়া দিত। গুঞ্জা নীরবে সহ্য করিত ; মধু'র ক্রোধ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মধু তাহার অনুচর বালক-বালিকাদের লইয়া মৌরীর উঁচু পাড়ের উপর খেলা করিতেছিল। হঠাৎ কি কারণে ঝগড়া হইল ; মধু গুঞ্জাকে সম্মুখে পাইয়া মারিতে আরম্ভ করিল, তারপর তাহার চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে পাড়ের কিনারায় লইয়া গিয়া ঠেলা দিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল।

বজ্র অদূরে মৌরীর জলে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া ছিল। সে জলে লাফাইয়া পড়িয়া গুঞ্জাকে টানিয়া তুলিল। গুঞ্জার একটা হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে ; ভয়ে ও যন্ত্রণায় মূৰ্ছিতপ্রায় অবস্থা। সে এক হাতে বজ্রের গলা জড়াইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বজ্র তাহাকে তুলিয়া লইয়া পাড়ের উপর উঠিয়া আসিল। দলের ছেলেমেয়ে অধিকাংশই পলাইয়াছিল, দুই একজন মাত্র ছিল। বজ্র গুঞ্জাকে মাটিতে নামাইয়া মধু'র দিকে অগ্রসর হইল। তাহার গৌরবর্ণ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, দেহের স্নায়ুপেশী কঠিন। সে মধু'র সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

মধু হটিল না, ক্ষুদ্র আরক্ত চোখে হিংস্রতা ভরিয়া বিদ্রূপ করিল— 'রাজপুত্তুর ! রাজপুত্তুর !'

বজ্র মধু'র গালে একটি বজ্রসম চড় মারিল।

তারপর যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহাকে মল্লযুদ্ধ বলা চলে, আবার ষাঁড়ের লড়াই বলিলেও অন্যায় হয় না। মধু বয়সে বড়, তার উপর বন্য স্বভাব ; সে নখদন্ত দিয়া শ্বাপদের ন্যায় লড়াই

করিল, বজ্রের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বজ্রের সহিত পারিল না। বজ্রের দেহে পিতৃদত্ত অটল শক্তি ছিল, তাহাই জয়ী হইল। একদণ্ড যুদ্ধের পর মধু ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়া আর উঠিল না, তাহার দেহে আর নড়িবার শক্তি নাই। বজ্র তখন যুদ্ধের মদান্ধতায় জ্ঞানশূন্য, সে মধু'র একটা পা ধরিয়া টানিতে টানিতে নদীর পাড়ের দিকে লইয়া চলিল। উদ্দেশ্য জলে ফেলিয়া দিবে।

ইতিমধ্যে গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিল, চাতক ঠাকুরও আসিয়াছিলেন। তিনি গিয়া বজ্রের হাত ধরিলেন। বলিলেন— 'ছেড়ে দাও। যথেষ্ট হয়েছে।'

বজ্র মধুকে ছাড়িয়া দিল। চাতক ঠাকুর তাহাকে হাত ধরিয়া সরাইয়া লইয়া গেলেন। গুঞ্জা অদূরে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছিল, তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'কি হয়েছিল ?'

বজ্র ও গুঞ্জা ঘটনা বিবৃত করিল। সকলে শুনিয়া বজ্রের সাধুবাদ করিল। মধু'র দুঃশীল দুর্দান্ত স্বভাবের জন্য কেহই তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিল না, তাহার শাস্তিতে সকলে সন্তুষ্ট হইল।

গুঞ্জার কান্না কিন্তু থামে না। চাতক ঠাকুর তাহাকে ও বজ্রকে লইয়া দেবস্থানে গেলেন ; বুড়ির গুয়া পান পাতা দিয়া গুঞ্জার ভাঙ্গা হাত বাঁধিয়া দিলেন। হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন—'মধুমথন। বজ্র, আজ থেকে তোমার একটা নাম হল মধুমথন।'

বজ্র কিন্তু হাসিল না। তাহার রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে কিন্তু মনের উষ্ণতা দূর হয় নাই। সে বলিল—'ও আমাকে রাজপুত্তুর বলে কেন ?'

চাতক ঠাকুর চকিত হইয়া তাহার পানে চাহিলেন, তারপর সহজ সুরে বলিলেন— 'তুমি রাজার ছেলে, তাই রাজপুত্র বলে।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বজ্র প্রশ্ন করিল—'আমার পিতা কোথায় ?'

চাতক ঠাকুর তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'বজ্র, তুমি এখন ছেলেমানুষ, তোমার পিতৃ-পরিচয় এখন জানতে চেও না। যখন বড় হবে, জানতে পারবে।'

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'কবে বড় হব ? কতদিনে জানতে পারব ?'

চাতক ঠাকুর বলিলেন—'তোমার যখন কুড়ি বছর বয়স হবে তখন জানতে পারবে। তোমার মা তোমাকে বলবেন।'

বজ্র আর প্রশ্ন করিল না ; কথাটি মনের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিল।

সন্ধ্যার পর বজ্র গুঞ্জার হাত ধরিয়া নিজ কুটিরে লইয়া গেল ; মা'কে বলিল— 'মা, আজ থেকে গুঞ্জা আমাদের কাছে থাকবে।'

রঙ্গনা দুই হাত বাড়াইয়া গুঞ্জাকে কোলে টানিয়া লইল। সে-রাত্রে রঙ্গনার এক পাশে বজ্র, অন্য পাশে গুঞ্জা শয়ন করিয়া ঘুমাইল।

গুঞ্জা বজ্রের গৃহেই রহিয়া গেল। তাহার মাতুল আপত্তি করিল না ; চাতক ঠাকুর ব্যাপারটিকে সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া দিলেন।

আদর যত্ন ও ভালবাসা পাইয়া গুঞ্জার শ্রী দিনে দিনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাহার ভাঙ্গা হাত জোড়া লাগিল ; মলিন তামার মত বর্ণ উজ্জ্বল মার্জিত তাম্রবর্ণে পরিণত হইল, চোখের শঙ্কাকাতর দৃষ্টি দূর হইল।

একদিন কুটির প্রাঙ্গণে বসিয়া বজ্র ধনুকে নূতন ছিলা পরাইতেছিল, গুঞ্জা আসিয়া পিছন হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল ; কানে কানে বলিল— 'মধুমথন।'

বজ্র তাহাকে টানিয়া সম্মুখে আনিল— 'কি বললে ?'

গুঞ্জা বলিল— 'আমি তোমাকে মধুমথন বলে ডাকব।'

বজ্র হাসিল। বলিল— 'আমিও তোমাকে অন্য নামে ডাকব, গুঞ্জা বলে ডাকব না।'

উৎসুক চক্ষে চাহিয়া গুঞ্জা জিজ্ঞাসা করিল—'কি বলে ডাকবে ?'
গুঞ্জার মেঘবরণ চুল ধরিয়া টানিয়া বজ্র তাহার কানে কানে বলিল— 'কুঁচবরণ কন্যা।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ
সত্যকাম

বজ্র যখন তীরধনুক লইয়া উত্তরের বনে শিকার করিতে যাইত তখন গুঞ্জাও কদাচ তাহার সঙ্গে থাকিত। দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া অরণ্যের রৌদ্র ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত, ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিত। গুঞ্জা সঙ্গে থাকিলে শিকার বড় হইত না। গুঞ্জা শিকারে যাইতে ভালবাসে কিন্তু মৃত পশুপক্ষী দেখিলে তাহার কান্না আসে। তাহার কান্না দেখিয়া বজ্র প্রথম প্রথম হাসিত ; কিন্তু তারপর তাহার সম্মুখে প্রাণী হত্যা করিতে আর তাহার মন সরিত না।

এইভাবে কৌমার অতিক্রম করিয়া তাহারা একসঙ্গে যৌবনে পদার্পণ করিল। বজ্রের যৌবন-পরিণত দেহ হইল তাহার পিতার দেহের প্রতিকৃতি। তেমনই দীর্ঘ প্রাণসার ; বেত্রবৎ সাবলীল। হয়তো আরও একটু সুকুমার : পিতার পৌরুষের উপর মাতার লাবণ্য যেন স্নেহের প্রলেপ দিয়াছে। মাথার গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ স্কন্ধ পর্যন্ত নামিয়াছে, মুখে গুম্ফের সূক্ষ্ম রোমরাজি কজ্জলরেখার ন্যায় মুখের শ্রীবর্ধন করিয়াছে। সে যখন ধনু স্কন্ধে লইয়া দাঁড়াইত, তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইত যে মহাভারতের অর্জুন ; যে অর্জুন পাঞ্চাল রাজসভায় মৎস্য চক্ষু বিদ্ধ করিয়াছিল সেই ভস্মাচ্ছাদিত তরুণ বহ্নি।

বজ্রের পাশে গুঞ্জাকে দেখাইত— শুভ্র রাজহংসের পাশে হেমবরণী চক্রবাকীর ন্যায়। শুধু নবযৌবনের শ্রী নয়, মনের সুখ ও ভালবাসা গুঞ্জাকে লাবণ্যময়ী করিয়া তুলিয়াছিল। কৈশোরের নিত্য সাহচর্য যে স্নেহ-প্রগলভ অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করিয়াছিল, যৌবনের অভ্যুদয়ে তাহাই নিবিড় আসক্তিতে ঘনীভূত হইয়াছিল। কিন্তু এই আসক্তির বাহ্য প্রকাশ কিছু ছিল না। দুইজনে প্রায় সর্বদা একসঙ্গে থাকিত, দুইজনেই জানিত তাহাদের জীবন পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তবু কোনও দিন তাহাদের আচরণে কোনও বিহ্বলতা প্রকাশ পায় নাই। একটিবার কেহ মুখ ফুটিয়া বলে নাই, আমি তোমায় ভালবাসি।

কেবল একবার নিজেদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে আর তাহারা বালক-বালিকা নয় ; অকস্মাৎ যৌবনের তীক্ষ্ণতপ্ত মাদকতার স্বাদ পাইয়াছিল।

যৌবন প্রাপ্তির পরেও তাহারা একসঙ্গে শিকার করিতে যাইত। একদিন চৈত্র মাসে তাহারা কিরাতবেশী দেবমিথুনের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিতেছিল। দ্বিপ্রহরের মন্থর বাতাস তরুচ্ছায়াতলে শীতল আবার আতপতাপে উষ্ণ হইয়া বহিতেছে ; পক্ক মধুকের গুরু সুগন্ধ বনভূমিকে আমোদিত করিয়াছে। পত্রান্তরাল হইতে বন-কপোতের ভীরু কূজন বৃন্তচ্যুত পুষ্পপল্লবের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছে। মদালস মধ্যাহ্নে বনপ্রকৃতি যেন তন্দ্রাতুরা।

একটি উচ্চ বৃক্ষতলে আসিয়া বজ্র ও গুঞ্জা দাঁড়াইল। ঊর্ধ্ব হইতে ঘন গুঞ্জনধ্বনি আসিতেছে : উভয়ে মুখ তুলিয়া দেখিল, প্রায় বিশ হাত উচ্চে একটি শাখা হইতে মধুচক্র ঝুলিতেছে : মৌমাছিরা অদূরস্থ মহুয়াগাছ হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, তাহারই গুঞ্জরন।

বজ্র সপ্রশ্ন নেত্রে গুঞ্জার পানে চাহিল, গুঞ্জা স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িল। তখন বজ্র তীরধনুক লইয়া মৌচাক লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। তীর মৌচাক বিদ্ধ করিয়া মধুলিপ্ত দেহে মাটিতে পড়িল। মৌমাছিরা বহু ঊর্ধ্ব হইতে আততায়ীকে লক্ষ্য করিল না, তাই বিশেষ বিচলিত হইল

না। গুঞ্জা গাছের পাতা ছিঁড়িয়া পত্রপুট রচনা করিয়া মাটিতে রাখিল। চাক হইতে বিন্দু বিন্দু গাঢ় মধু ক্ষরিত হইয়া তাহাতে পড়িতে লাগিল।

পর্ণপুটে মধু সঞ্চিত হইলে দু'জনে তাহা ভাগ করিয়া পান করিল, তারপর তৃপ্ত মনে আবার একদিকে চলিল। শিকার সন্ধানের কোনও ব্যগ্রতা নাই, একসঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ানোই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিবার পর গুঞ্জা বলিল— 'এস, কোথাও বসি।'

একটি ময়ূর ও দুই তিনটি ময়ূরী এক বৃক্ষের ঘনপল্লব ছায়াতলে বিশ্রাম করিতেছিল, তাহাদের আসিতে দেখিয়া সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ত্রস্ত কেকাধ্বনি করিয়া বিপরীত দিকে পলায়ন করিল। বজ্র দ্রুত ধনুতে তীর সংযোগ করিয়াছিল, কিন্তু গুঞ্জা তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল— 'না।'

গাছের তলায় দুইটি সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ পড়িয়াছিল, গুঞ্জা তাহা তুলিয়া লইয়া হাসিমুখে বজ্রের হাতে দিল ; বজ্র সেই দুটি হইতে চন্দ্রক অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া গুঞ্জার দুই কানে দুল দুলাইয়া দিল। স্মিতমুখে বলিল—'কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল, তোমার কানেতে কন্যা পিঞ্ছের দুল।'

কতদিনের পুরানো ছড়া, কাহার জন্য কে রচনা করিয়াছিল কে জানে। কিন্তু মধুমথনের মুখে ঐ ছড়াটি শুনিলে মনে হয় যেন গুঞ্জাকে লক্ষ্য করিয়া উহা রচিত হইয়াছিল। গুঞ্জা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তরুতলে বসিল, সম্মুখে পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠভার এলাইয়া দিল। কুঁচবরণ কন্যা! আর মধুমথন? মধুমথন নামটির স্বাদ যেন চাকভাঙ্গা মধু'র মত মিষ্টি, মধু'র মাদকতার ন্যায় রক্তস্রোতে প্রবেশ করিয়া অনুরণিত হয়। —মধুমথন!—

বজ্র ধনুর্বাণ মাটিতে ফেলিয়া আলস্য ভাঙ্গিল, তারপর গুঞ্জার উরুর উপর মাথা রাখিয়া তৃণশয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল।

এইভাবে কিছুক্ষণ দুইজনে চোখে চোখে চাহিয়া রহিল। শান্ত নিরুদ্বেগ দৃষ্টি, নিস্তরঙ্গ মনের প্রতিবিম্ব। গুঞ্জার একটি হাত বজ্রের কেশগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতেছে ; একবার গণ্ডে হাত বুলাইয়া একটি ইন্দ্রতূলক মুছিয়া লইল। ক্রমে বজ্রের চক্ষু তন্দ্রায় মুদিয়া আসিল।

গুঞ্জা অর্ধনিমীলিত নেত্র তাহার মুখের পানে নত করিয়া রহিল। সাত বছর ধরিয়া ওই মুখখানি সে অহরহ দেখিয়াছে, কিন্তু নয়ন তৃপ্ত হয় নাই। আজ চৈত্রের কবোষ্ণ মধ্যাহ্নে নির্জন বনের ছায়ান্তরালে বসিয়া একটি কুশাগ্রতুল্য বাসনা তাহার মনে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। মধুমথন বোধহয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ধীর নিশ্বাসের ছন্দে তাহার বক্ষ উঠিতেছে পড়িতেছে ; রক্তিম অধরে যেন মধুসিক্ত সরসতা এখনও লাগিয়া আছে। গুঞ্জা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সন্তর্পণে সম্মুখ দিকে নত হইল ; নিজ অধর দিয়া অতি লঘুভাবে বজ্রের অধর স্পর্শ করিল।

বজ্র হয়তো জাগিয়াছিল ; হয়তো অস্পষ্ট তন্দ্রালোকে বিচরণ করিতেছিল ; নিমেষ মধ্যে তাহার দুই বাহু গুঞ্জার কণ্ঠ জড়াইয়া লইল। দীর্ঘকাল তাহাদের অধর দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হইয়া রহিল। তারপর বজ্র চক্ষু মেলিয়া গুঞ্জাকে ছাড়িয়া দিল।

গুঞ্জার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে, অধর পাণ্ডুবর্ণ। সে মুদ্রিত চক্ষে মাথাটি বৃক্ষকাণ্ডে রাখিয়া ঊর্ধ্বমুখীন হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

'কুঁচবরণ কন্যা!'

গুঞ্জা চক্ষু খুলিল না, কিন্তু তাহার মুখখানি ধীরে ধীরে আরক্তিম হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় একটা কোকিল গাছে আসিয়া বসিল এবং বিস্ময়োৎফুল্ল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল— কু কু কু!

বজ্র তীরবিদ্ধবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। গুঞ্জাকে পরম বিস্ময়ে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। গুঞ্জা একবার বজ্রের চোখের পানে চোখ তুলিয়াই আবার নতমুখে বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিল ; তাহার মনে হইল তাহার দেহের অস্থিগুলা সব দ্রবীভূত হইয়া

গিয়াছে।

কিন্তু বজ্র তাহার হাত দৃঢ় মুষ্টিতে আকর্ষণ করিয়া তরুতল হইতে লইয়া চলিল, ঈষৎ শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল— 'চল, মা'র কাছে ফিরে যাই।'

এই ঘটনার পর দু'জনের মাঝখানে যেন সূক্ষ্ম অথচ রহস্যমধুর লজ্জার একটি আবরণ পড়িয়া গেল, কিন্তু এই আবরণ তাহাদের মাঝে ব্যবধানের সৃষ্টি করিল না, বরং আরও নিবিড়ভাবে উভয়ের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিল।

বজ্র ও গুঞ্জার অনুরাগ, প্রকাশ্য না হইলেও, গ্রামের কাহারও অবিদিত ছিল না। সকলেই জানিত তাহাদের বিবাহ হইবে। কিন্তু দুইজনেই প্রাপ্ত-যৌবন, অথচ বিবাহের কোনও উদ্যোগ নাই। রঙ্গনা জল আনিতে নদীর ঘাটে যাইলে অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাহাকে প্রশ্ন করিত— 'হ্যাঁ রাঙা, বেটার বিয়ে না দিয়েই তো ঘরে বৌ পেয়েছ। তা এবার বিয়ে দাও। আর কবে দেবে?'

রঙ্গনা হাসিয়া বলিত— 'আমি জানি না, ঠাকুর জানেন। তিনি বললেই দিয়ে দেব।'

ঠাকুরকে বলিলে তিনি কিছুক্ষণ অন্য মনে আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতেন, বলিতেন—'আর দু'দিন যাক্।'

এইভাবে বজ্রের জন্মের পর উনিশ বছর কাটিয়া গেল। বয়ঃপ্রাপ্তির পর বজ্র যে কেবল শিকার করিয়া বেড়াইত তাহা নয়, প্রয়োজন কালে গ্রামের যৌথ কাজকর্মেও যোগ দিত। নিজের সহজাত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া সকলের সঙ্গে মেলামেশা করিত, মাঠে গিয়া একসঙ্গে কাজ করিত। ধানের সময় ধান রোপণ করিত, আখের সময় আখ মাড়াই কার্যে সহযোগিতা করিত। কিন্তু এই উনিশ বছরে গ্রামের অবস্থা অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হইতেছিল। শুধু গ্রাম নয়, সমস্ত দেশের অবস্থাই বহতা নদীর ন্যায় ক্রমশ নিম্নগামী হইয়াছিল।

কোনও দেশের অবস্থাই চিরদিন সমান থাকে না; কালভেদে তাহার পতন-অভ্যুদয় আছে। শশাঙ্কদেবের দীর্ঘ রাজত্বকালে গৌড়দেশে যে সম্পদ-শ্রীর জোয়ার আসিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাতে ভাঁটা পড়িয়াছিল। গৌড়রাজ্য লইয়া বিভিন্ন রাজশক্তির মধ্যে টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি চলিতেছিল। তাহাতেও হয়তো সামগ্রিকভাবে দেশের জনগণের অধিক ক্ষতি হইত না, কিন্তু এই অন্তর্বিপ্লবের সঙ্গে বাহির হইতেও এক প্রচণ্ড আঘাত পড়িয়াছিল। সে সময়ে সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল গৌড়বঙ্গের প্রাণ; এই সাগর-সমুদ্ভবা বাণিজ্য-লক্ষ্মী সাগরে ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। চাতক ঠাকুর দেবাবিষ্ট হইয়া যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা নয়, আরব দেশের মরুভূমিতে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল এবং সেই বাত্যাবিক্ষিপ্ত বালুকণা সমুদ্রের উপর দিয়া উড়িয়া আসিয়া গৌড়দেশের আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল।

সমগ্র দেশের সহিত ক্ষুদ্র বেতসগ্রামও এই ঘনায়মান দুরদৃষ্টের অংশভাগী হইয়াছিল। গ্রামবাসীরা আর গ্রামের বাহিরে যায় না। কি জন্য যাইবে? গ্রামের গুড় বাহিরে বিক্রয় হয় না। স্বর্ণ রৌপ্যের প্রচলন দেশ হইতে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতেছে; দ্রম্ম কার্যাপণ দিয়া কেহ আর সহজে পণ্য কেনে না; কড়ি এখন প্রধান মুদ্রার স্থান আধিকার করিয়াছে। যে লক্ষ্মী নারিকেলফলাম্বুবৎ আসিয়াছিলেন তিনি আবার গজভুক্তকপিত্থবৎ অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইতেছেন।

যেদিন বজ্রের বয়স উনিশ পূর্ণ হইল সেদিন সায়ংকালে অকস্মাৎ নিদাঘের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া নীল ঘনঘটার আবির্ভাব হইল। অশনি ও প্রভঞ্জনের রুদ্রতাণ্ডব শুরু হইয়া গেল; যেমন বজ্রের জন্মদিনে হইয়াছিল।

গুঞ্জা সায়ংদোহ করিতে বাথানে গিয়াছিল, সে সেইখানেই আটক পড়িল। বজ্র গিয়াছিল দেবস্থানে -চাতক ঠাকুরের একচালায়। বজ্র ঠাকুরের জন্য কৃষ্ণসারের চর্ম হইতে অজিন প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাই ভক্তিভরে ঠাকুরকে দিতে গিয়াছিল। তারপর উভয়ে বসিয়া লঘু জল্পনা

করিতেছিল ; দিনে দিনে দেশের অবস্থা কিরূপ দুর্গতির পথে চলিয়াছে তাহারই আলোচনা হইতেছিল এমন সময় আকাশে দৈত্যদানবের মালসাট্ আরম্ভ হইল।

বৎসরের এই সময় ঝড় ঝাপটা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু এই বছর এই প্রথম। চাতক ঠাকুর চকিতে বজ্রের পানে চাহিলেন, মনে মনে কি গণনা করিলেন, তারপর বলিলেন— 'দিন যায় না ক্ষণ যায়। বজ্র, আজ তোমার উনিশ বছর বয়স পূর্ণ হল।'

বজ্র ভুলে নাই। সে ঋজু হইয়া বসিয়া ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল— 'তাহলে কুড়ি বছর বয়স হয়েছে ?'

'হাঁ, হয়েছে।'

'তাহলে মা'কে জিজ্ঞাসা করতে পারি ?'

'পারো। কিন্তু জেনে কোনও লাভ নেই বজ্র। বরং—'

বজ্র তর্ক করিল না ; উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুধু বলিল— 'আমি জানতে চাই।'

বৃষ্টিবাত্যা ভেদ করিয়া সে গৃহে ফিরিয়া চলিল।

বর্ষণ থামিয়াছে, বায়ু শান্ত হইয়াছে। সিক্ত প্রকৃতির সর্বাঙ্গে চন্দন-শীতল সরসতা। গুঞ্জা বাথান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। মা ও ছেলে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে ; মায়ের চোখে জল। মা ছেলের বাহুতে একটি সোনার অঙ্গদ পরাইয়া দিতেছে। অপূর্ব সুন্দর অঙ্গদ, বজ্রের বাহুতে এমন সুষ্ঠুভাবে লগ্ন হইল যেন তাহার বাহুর পরিমাপেই নির্মিত। রঙ্গনা দরদর-ধারে কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রের মস্তক বুকে টানিয়া লইল।

বজ্র অবরুদ্ধ স্বরে বলিল— 'মা, আমি কালই পিতার সন্ধানে বেরুব। যেখান থেকে পারি সংবাদ নিয়ে আসব।'

এই দৃশ্য দেখিয়া গুঞ্জার হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে দুগ্ধকলস নামাইয়া তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। স্খলিত স্বরে বলিল— 'মা, কি হয়েছে ?'

রঙ্গনা উত্তর দিতে পারিল না, গুঞ্জাকেও বাহু বন্ধনের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া অঝোরে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল।

সে রাত্রে তিনজনের কেহই ঘুমাইল না ; অতীত ও ভবিষ্যতের দুরূহ দুর্গম ভাবনায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইল ; প্রাতঃসূর্যের উদয়ে সদ্যস্নাতা ধরণীর শুচিস্মিত রূপ প্রকাশ পাইল। স্নিগ্ধ বাতাস, প্রসন্ন আকাশ ; শুভযাত্রার অনুকূল মুহূর্ত। বজ্র মাতাকে লইয়া দেবস্থানে উপস্থিত হইল ; যুগল দেবতার সম্মুখে দণ্ডবৎ হইল ; চাতক ঠাকুরের পদধূলি মাথায় লইল। রঙ্গনা পুত্রের কপালে চুম্বন দিল, কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দংশন করিল, তারপর তাহাকে জড়াইয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বজ্র মায়ের কানে কানে বলিল—'মা, কেঁদ না। যদি পিতার সন্ধান না পাই আমি একা তোমার কাছে ফিরে আসব।'

এমনই আশ্বাস দিয়া আর একজন চলিয়া গিয়াছিল। বিপুল সংসার তাহাকে ফিরাইয়া দেয় নাই। এবার দিবে কি ?

রঙ্গনা ও চাতক ঠাকুর মৌরীর ঘাট পর্যন্ত বজ্রের সঙ্গে আসিলেন। তারপর বজ্র নদীর তীর ধরিয়া দক্ষিণমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার মাথায় বাঁধা উত্তরীয়, স্কন্ধে একটি বংশদণ্ড, দণ্ডের প্রান্তে একটি পুঁটুলি বাঁধা। প্রগণ্ডে পিতার অভিজ্ঞান— সোনার অঙ্গদ।

যতক্ষণ দেখা গেল গলদশ্রুনেত্রা রঙ্গনা সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইল না। তারপর চাতক

ঠাকুর হাত ধরিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

কিন্তু গুঞ্জা কোথায় ? অতি প্রত্যুষে সে কলস লইয়া ঘাটে গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই। কোথায় গেল সে ? ঘাটেও তো নাই।

বজ্র হেঁটমুখে চিন্তা করিতে করিতে চলিয়াছে। কত বিচিত্র চিন্তা, কোনও চিন্তাই মনের মধ্যে স্থায়ী হইতেছে না, চঞ্চল জলের উপর সূর্যকিরণের ন্যায় ক্ষণেক নৃত্য করিয়া অদৃশ্য হইতেছে। কাল রাত্রে বজ্র মা'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার পিতার আকৃতি কেমন ছিল ? উত্তরে মা একটি পিত্তলের থালিকা তাহার সম্মুখে ধরিয়াছিল ; সেই থালিকার মার্জিত আদর্শে সে নিজের মুখ দেখিয়াছিল। কুড়ি বছর পূর্বে তাহার পিতার মুখও এমনি ছিল...গৌড়রাজ মানবদেব— তিনি কি জীবিত আছেন ?...কর্ণসুবর্ণ কেমন নগর ? বজ্র পূর্বে কখনও গ্রামের বাহিরে যায় নাই—

বেতসবন পিছনে পড়িয়া রহিল, বজ্র গ্রামের সীমান্তে আসিয়া উপনীত হইল। বৃদ্ধ জটিল ন্যগ্রোধ বৃক্ষ গ্রামের সীমা চিহ্নিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৃক্ষটি অধিক উচ্চ নয়, কিন্তু বহু স্তম্ভযুক্ত চন্দ্রাতপের ন্যায় জটস্তম্ভ রচনা করিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ঘন শাখাপত্রের নিম্নে নিবিড় ছায়া।

ন্যগ্রোধের ছায়াচ্ছত্র প্রান্তে আসিয়া বজ্র দাঁড়াইল, একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল। দূরে বেতসলতার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামটি দেখা যাইতেছে। ঐ গ্রামে তাহার মা আছেন, চাতক ঠাকুর আছেন, গুঞ্জা আছে—

বিদায়কালে গুঞ্জার সহিত দেখা হইল না। কোথায় গেল কুঁচবরণ কন্যা ! সে কি অভিমান করিয়াছে— তাই বিদায়কালে সরিয়া রহিল ?

'মধুমথন !'

বিদ্যুদ্বৎ ফিরিয়া বজ্র দেখিল— ন্যগ্রোধ-বিতানের ভিতর হইতে গুঞ্জা বাহির হইয়া আসিতেছে। সে আসিয়া বজ্রের হাত ধরিল। গুঞ্জার চোখ দুটি যেন আরও বড় হইয়াছে, ঈষৎ রক্তিমাভ। মুখের ব্যঞ্জনা দৃঢ় সম্বৃত। বজ্রের হাত ধরিয়া গুঞ্জা তাহাকে বৃক্ষের ছায়ান্তরালে লইয়া গেল।

আজ গুঞ্জার সঙ্কোচ নাই, লজ্জা নাই। বজ্রকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া সে বাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া লইল, দুরন্ত আবেগে তাহার চক্ষে গ্রীবায় অধরে চুম্বন করিতে লাগিল। বজ্র প্রথমে গুঞ্জার এই আবেগ-প্রগল্‌ভতায় বিমূঢ় হইয়াছিল, তারপর সেও চুম্বনে চুম্বনে তাহার প্রতিদান দিল।

কিছুক্ষণ পরে একটু শান্ত হইয়া গুঞ্জা বলিল— 'তুমি কবে ফিরে আসবে ?'

বজ্র বলিল— 'তা জানি না। কিন্তু ফিরে আসব।'

'আসবে ? আসবে ? আমাকে মনে থাকবে ?'

বজ্র একটু হাসিল—'থাকবে।'

'নগরের মেয়েরা শুনেছি মোহিনী হয়। তাদের দেখে আমাকে ভুলে যাবে না ?'

'না, কুঁচবরণ কন্যা, তোমাকে ভুলে যাব না।'

গুঞ্জা একাগ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে বজ্রর মুখের পানে চাহিল, যেন তাহার অন্তরেব মর্মস্থল পর্যন্ত দেখিবার চেষ্টা করিল। তারপর নিজের বুক হইতে বস্ত্র সরাইয়া বজ্রের একটা হাত নগ্ন বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল।

'আমাকে বুকে হাত দিয়ে বলো— আর কোনও মেয়ের গায়ে হাত দেবে না।'

বজ্রের মেরুমজ্জার ভিতর দিয়া একটা তীব্র বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

'গুঞ্জা ! কুঁচবরণ কন্যা !'

'না, বলো। শপথ কর।'

'শপথ করছি।'

'তুমি আমার ? শুধু আমার ?'

'হ্যাঁ, তোমার। শুধু তোমার।'

তারপর—ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ছায়ান্ধকার যেন আরও নিবিড় হইয়া আসিল। গুঞ্জা চোখ বুজিয়া বলিল—'মনে থাকে যেন। সব দিয়ে তোমাকে নিজের করে নিলাম।'

নবম পরিচ্ছেদ
বনপর্ব

পার্বত্য নদী যেমন সিধা একদিকে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময় মোড় ঘুরিয়া সম্পূর্ণ নূতন দিকে চলিতে আরম্ভ করে, তেমনি বজ্রের জীবনও এতদিন বৈচিত্র্যহীন ঋজু পথে প্রবাহিত হইবার পর অকস্মাৎ নূতন পথ ধরিল। এই অভাবনীয় পরিবর্তনের জন্য বজ্র নিজেও প্রস্তুত ছিল না। সে জানিত সে রাজার ছেলে। সাত বছর ধরিয়া সে পিতার পূর্ণ পরিচয় জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু পিতৃ-পরিচয় পাইবার পর কী করিবে এ প্রশ্ন তাহার মনে আসে নাই। কাল বর্ষণমথিত সন্ধ্যায় যখন সে মায়ের মুখে তাহার পিতার কাহিনী শুনিল, তখন নিমেষমধ্যে তাহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিল— সে পিতার সন্ধানে যাইবে, পিতাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, মাতার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান করিবে। হয়তো তাহার অন্তরের অন্তস্তলে এই সঙ্কল্পের বীজ লুক্কায়িত ছিল, হয়তো চাতক ঠাকুর অনুভবে তাহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বে পিতৃ-পরিচয় জানিতে দেন নাই। এক মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল, বজ্র নিঃসঙ্গভাবে অজানিত নূতন পথে যাত্রা করিল।

পায়ে হাঁটার পক্ষে পথ অল্প নয়। গ্রামের সীমান্ত হইতে বিস্তৃত প্রান্তর আরম্ভ হইয়াছে। তরুপাদপহীন মাঠ, তাহার দক্ষিণে বহু দূরে শ্যামায়মান অরণ্য দিক্‌চক্রকে যেন স্থূল রেখার দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। মৌরী নদীর ধারা কুটিল খাতে আঁকিয়া বাঁকিয়া ঐ বনরেখায় মিলাইয়াছে।

বজ্র যখন বনের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল তখন দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়। এই বন অনুমান দশ ক্রোশ গভীর, বিশাল তরুশ্রেণীর সমাবেশে অন্ধকার এবং দুর্গম। পূর্বকালে নাকি এই বনে হাতি বাস করিত ; এখন হিংস্র জন্তুর মধ্যে ভালুক ও সাপের বাস। অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবজন্তুও আছে। এই বন পার হইয়া আরও একদিনের পথ হাঁটিলে কর্ণসুবর্ণে পৌঁছানো যায়। মৌরীর তীর ধরিয়া চলিলে বনের সঙ্কট এড়াইতে পারা যায় ; কিন্তু এই স্থান হইতে মৌরীর স্রোত ধনুকের মত পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, কূল ধরিয়া চলিলে একটু ঘুর পড়ে। যাহারা শীঘ্র রাজধানীতে পৌঁছিতে চায়, তাহাদের পক্ষে বন ভেদ করিয়া যাওয়াই সুবিধা।

বজ্র এক তরুচ্ছায়ায় বসিয়া আতপতপ্ত দেহের উষ্ণতা দূর করিল। কিন্তু অধিক বিলম্ব করা চলে না, দিনের আলো থাকিতে থাকিতে জঙ্গল পার হইতে পারিলেই ভাল। সে উঠিয়া নদীতে অবতরণ করিল। হাত মুখ ধুইয়া কিছু আহার করিতে হইবে, তারপর আবার যাত্রা।

নদী হইতে তীরে ফিরিয়া বজ্র লক্ষ্য করিল, অদূরে এক বৃহৎ পাষাণখণ্ডের পাশে একজন মানুষ বসিয়া আছে। স্থির হইয়া বসিয়া আছে, একটু নড়িতেছে না, কিন্তু তাহার সমস্ত দেহ

সতর্কতার চেষ্টায় ব্যগ্র হইয়া আছে।

বজ্র বিস্মিত হইল। এই নির্জন বনপ্রান্তে মানুষ কোথা হইতে আসিল, কী করিতেছে, কোথায় যাইবে ? কৌতূহলবশে বজ্র তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল মানুষটি অন্ধ। কঙ্কালসার দীর্ঘ দেহ, দেহের চর্ম রৌদ্রে পুড়িয়া খদির-বর্ণ ধারণ করিয়াছে, মাথায় মুখে জটা-গ্রন্থিযুক্ত রুক্ষ কেশ, কটিতে জীর্ণ কৌপীন। হাতের নড়ি পাশে রাখা রহিয়াছে। অন্ধ বজ্রের পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, সে নড়ি শক্ত করিয়া ধরিয়া আরও সতর্ক হইয়া বসিল ; একবার অধরোষ্ঠ খুলিয়া যেন কিছু বলিবার উদ্যোগ করিল, তারপর কিছু না বলিয়াই মুখ বন্ধ করিল।

বজ্র তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল— 'তুমি অন্ধ, এখানে কি করে এলে ?'

অন্ধ কিছুক্ষণ উত্তর দিল না, তারপর ক্ষীণ অনিশ্চিত স্বরে বলিল— 'আমার দৃষ্টি নেই, কখন কোথায় যাই বুঝতে পারি না। তোমার পায়ের শব্দ শুনে ভেবেছিলাম বনের শ্বাপদ—'

বজ্র প্রশ্ন করিল—'তুমি কোথায় যাবে ? কোনও গন্তব্য স্থান আছে কি ?'

অন্ধ দ্বিধাভরে ক্ষণেক নীরব রহিল, শেষে নড়ি নাড়িয়া বলিল—'না।'

অসহায় অন্ধের ভগ্ন-জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া বজ্রের দয়া হইল। সে বলিল— 'তুমি ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে। আমার কাছে খাদ্য আছে। খাবে ?'

অন্ধ উত্তর দিল না, বুকে চিবুক গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। বজ্র তখন তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, হাত ধরিয়া বৃক্ষতলে লইয়া গেল। পুঁটুলিতে যে খাদ্য ছিল তাহা ভাগ করিয়া অর্ধেক অন্ধকে দিল অর্ধেক নিজে লইল। অন্ধ আর সঙ্কোচ করিল না।

আহার করিতে করিতে বজ্র বলিল— 'আমি কর্ণসুবর্ণ যাচ্ছি, তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?'

অন্ধ কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল—'না।'

'তবে কোথায় যাবে ?'

অন্ধ আবার স্থির সতর্কতার সহিত চিন্তা করিল।

'জানি না। কাছে কি লোকালয় নেই ?'

'দক্ষিণের কথা জানি না। উত্তরে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে গ্রাম আছে।'

'কোন্ গ্রাম ?'

'বেতসগ্রাম।'

অন্ধের চর্বণক্রিয়া বন্ধ হইল, তাহার অস্থিসার দেহ সহসা কঠিন হইয়া স্থির হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ কথা কহিল না, যখন কহিল তখন তাহার কণ্ঠস্বর চাপা উত্তেজনায় অসংলগ্ন শুনাইল— 'কি গ্রাম বললে ?'

'বেতসগ্রাম।'

অন্ধ আর কোনও কথা বলিল না, প্রশ্ন করিল না। কিন্তু তাহার সমস্ত সত্তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে সজাগ হইয়া রহিল।

আহার সমাধা হইলে বজ্র বলিল— 'আমি এবার যাব। তুমি কোথায় যেতে চাও তা তো বললে না।'

অন্ধ কণ্ঠস্বরে ঔদাস্য ভরিয়া বলিল— 'আমার কাছে সব সমান। বেতসগ্রামেই যাই।'

'ভাল।'

বজ্র তখন অন্ধকে উত্তরমুখ করিয়া দাঁড় করাইয়া হাতে নড়ি ধরাইয়া দিল। বলিল - 'এইবার সিধা চলে যাও। বাঁ দিকে বেশি যেও না, নদীতে পড়ে যাবে। এখনও অনেক বেলা আছে, চাকা ডোববার আগে গ্রামে পৌঁছতে পারবে।'

অন্ধ বলিল—'তুমি বড় সৎ, বড় দয়ালু। তোমার নাম কি ?'

বজ্রের একবার ইচ্ছা হইল নিজের নামের সঙ্গে নবলব্ধ পিতৃ-পরিচয়ও অন্ধকে জানাইয়া দেয়। কিন্তু সে প্রলোভন সম্বরণ করিয়া কেবল বলিল— 'আমার নাম বজ্র।'

তারপর দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইল। কেহ কাহাকেও চিনিল না, অদৃষ্টপ্রেরিত হইয়া বিপরীত মুখে চলিল।

শীঘ্র গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার আগ্রহে বজ্র নদীর তীর ছাড়িয়া বনের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিয়াছিল। মনস্থ করিয়াছিল, যদি দিন থাকিতে বন পার হইতে না পারি গাছে উঠিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিব। কিন্তু দুই ঘটিকা চলিবার পর তাহার দিগ্‌ভ্রম হইল। জঙ্গলের অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে মুক্ত স্থান আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন মন্দালোকিত; স্তম্ভের ন্যায় বৃক্ষকাণ্ডের সারি অন্তহীনভাবে চারিদিকে চলিয়া গিয়াছে, নিবিড় পত্রাবচ্ছেদে সূর্য দেখা যায় না। বজ্র দিক্ হারাইয়া ফেলিল, দক্ষিণে যাইতেছে কি পশ্চিমে যাইতেছে কিম্বা যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেইদিকে ফিরিয়া যাইতেছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না।

উপরন্তু বনে যে জীবজন্তু আছে তাহাও সে অনুভব করিয়াছে। উহারা যেন তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে, নিজেরা অদৃশ্য থাকিয়া তাহার আশেপাশে ঘুরিতেছে। ক্বচিৎ অদূরস্থ গুল্মের মধ্যে সর্ সর্ শব্দ করিয়া কোনও প্রাণী অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইতেছে। একবার একটা কৃষ্ণকায় রোমশ জন্তু দূরে একটা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া অন্য গাছের আড়ালে চলিয়া গেল, আবছায়া অন্ধকারে সেটা কী জন্তু ধরা গেল না।

উহারা সকলে হিংস্র শ্বাপদ না হইতে পারে, কিন্তু কিছুই বলা যায় না। বজ্র তীরধনুক আনে নাই; শবরের ন্যায় ধনুষ্পাণি বেশে কর্ণসুবর্ণে অবতীর্ণ হইবার বাসনা তাহার ছিল না, কিন্তু এখন মনে হইল— আনিলেই ভাল হইত। অন্তত বনের মধ্যে অনেকটা নির্ভয় বোধ করিতে পারিত। যেটুকু স্বল্পালোক ছিল তাহাও ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে, সূর্যাস্তের বোধহয় আর বিলম্ব নাই। বজ্র ভাবিল এই বেলা গাছে উঠিয়া বসি, কাল প্রাতে দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া আবার চলিব।

রাত্রিবাসের উপযোগী একটি গাছের সন্ধানে এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে বজ্র চলিল। কিছুদূর যাইবার পর সহসা এক করুণ কাকুতি শুনিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল। কাকুতি মনুষ্যকণ্ঠের নয়, কোনও জন্তুর। কিন্তু কোন্ জন্তুর? কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিবার পর বজ্র আবার সেই আর্তস্বর শুনিতে পাইল। তাহার মুখে বিস্ময়-চকিত হাসি দেখা দিল। কুকুরের ডাক! কুকুর থাকিয়া থাকিয়া ভীতস্বরে রোদন করিয়া উঠিতেছে।

এই অরণ্যে কুকুর কোথা হইতে আসিল? কুকুর তো গ্রামে থাকে; বেতসগ্রামেও দুই চারিটা আছে। তবে, যখন কুকুরের ডাক শুনা গিয়াছে তখন মানুষও আছে। বজ্র জানিত শবরেরা কুকুর লইয়া শিকার করিয়া বেড়ায়, কুকুর তাহাদের নিত্য সঙ্গী। নিশ্চয় শবর আছে।

বজ্র কুকুরের কাতরোক্তি লক্ষ্য করিয়া চলিল। দুই তিন রজ্জু যাইবার পর একটি বৃক্ষতলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া তাহার গতিরোধ হইল। এস্থানে ছায়া তেমন ঘন নয়; বজ্র দেখিল এক কৃশকায় ক্ষুদ্রাকৃতি শবর মাটিতে চিৎ হইয়া পড়িয়া হাঁ করিয়া আছে এবং একটি কুকুর পাশে বসিয়া তাহার মুখমণ্ডল চাটিতেছে।

কুকুর বজ্রকে দেখিয়া সহর্ষে উঠিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। শবরের কিন্তু কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, সে হাঁ করিয়া শুইয়া রহিল।

আরও নিকটবর্তী হইয়া বজ্র ব্যাপার বুঝিতে পারিল। গাছের ডালে কুলার মত একটা মৌচাক ঝুলিতেছে, ঠিক তাহারই নীচে শবর হাঁ করিয়া আছে আর চক্রনিগলিত মধু তাহার মুখে টোপাইয়া পড়িতেছে। তীরধনুক পাশেই রহিয়াছে, সুতরাং অনুমান করা কঠিন নয় যে তীরের খোঁচা দিয়া

সে মৌচাকে ছিদ্র করিয়াছে। শবরের চক্ষু মুদিত, মুখে মদির হাস্য।

কুকুরটির কিন্তু চিত্তে সুখ নাই। সে থাকিয়া থাকিয়া প্রভুর বদনসুধা লেহন করিতেছে বটে কিন্তু বনের মধ্যে রাত্রিযাপন করিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই। তাই সে প্রভুর কানের কাছে ডাকিয়া ডাকিয়া গৃহে ফিরিবার ব্যগ্রতা জানাইতেছে। মধুমত্ত প্রভুর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই।

বজ্র উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

নূতন ধরনের শব্দ শুনিয়া শবর আরক্ত চক্ষু মেলিল, তারপর উঠিয়া বসিল। বজ্রকে পরম গাম্ভীর্যের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ গর্বভরে বলিল— 'আমার নাম কচ্ছু। এ আমার চুচু।'* বলিয়া কুকুরের গলা জড়াইয়া ধরিল।

বজ্র বলিল— 'আমার নাম বজ্র। তোমার ঘর কোথায় ?'

'আমার ঘর—' কচ্ছু অনিশ্চিতভাবে একদিকে হাত নাড়িল—'আমার ঘর ঐদিকে। সেখানে রত্তি আর মিত্তি আছে। আমি ঘরে যাব না, মধু খাব।' বলিয়া শয়নের উপক্রম করিল।

বজ্র একটু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল— 'রাত্রির কিন্তু আর দেরি নেই। আমি বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি, কোথাও আশ্রয় পাচ্ছি না। তুমি আজ রাত্রির জন্যে তোমার ঘরে আমাকে আশ্রয় দেবে ?'

বনের মধ্যে অতিথি! শবর তৎক্ষণাৎ মাদকের মোহ ত্যাগ করিয়া ধনুক হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে গিরিগুহাবাসী বনচর মানুষ, কিন্তু আতিথেয়তা তাহার সহজাত ধর্ম। তাহার লঘু খর্ব দেহটি যেমন পরিপূর্ণ যৌবন-স্বাস্থ্যের প্রলেপে সুচিক্কণ, মনের অকুণ্ঠিত সরলতাও তেমনি মধুর অনুপানে স্নিগ্ধ। পা একটু টলিতেছে বটে কিন্তু মুখে সহৃদয় আতিথ্যের হাসি। সে আসিয়া বজ্রের হাত ধরিল, গদ্গদ স্বরে বলিল— 'তুমি আমার ঘরে যাবে ? আমার ঘরে রত্তি আর মিত্তি আছে, তারা তোমাকে হরিণের মাংস খাওয়াবে। এস এস।'

সে বজ্রের হাত ধরিয়া চলিল। কুকুরটি প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া সানন্দে লাফাইতে লাফাইতে পথ দেখাইয়া চলিল। বজ্র ভাবিল, গাছের ডালে রাত্রিবাসের চেয়ে এ ভাল ; প্রাতে শবর কর্ণসুবর্ণের পথ বলিয়া দিতে পারিবে।

অর্ধদণ্ড কাল চলিবার পর তাহারা একটি মুক্ত স্থানে পৌঁছিল। ভূমি কঙ্করময়, তাই গাছ গজায় নাই ; কেবল ছোট ছোট গুল্ম। উন্মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া বজ্র দেখিল রাত্রি হইতে এখনও বিলম্ব আছে। পশ্চিমের বিশাল তরুশ্রেণীর আড়ালে সূর্য দেখা যাইতেছে না, কিন্তু এখনও সূর্যাস্ত হয় নাই। প্রতিফলিত আলোকে মুক্ত স্থান সমুজ্জ্বল।

'চুচু—চুপ। দাঁড়া।'

মুক্ত স্থানের কিনারায় আসিয়া শবরের অভ্যস্ত চক্ষু শিকার দেখিতে পাইয়াছিল ; তাহার চাপা গলার আওয়াজে কুকুরও স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। বজ্র দেখিল, প্রায় এক রজ্জু দূরে একটা কাঁটাসার গুল্মের পাশে একটি ময়ূর খেলা করিতেছে। মাত্র একটি ময়ূর ; পেখম মেলিয়া নাচিতেছে।

গাছের পিছনে থাকিয়া শবর একবার বজ্রের পানে ঘোলা চোখ তুলিয়া হাসিল, তারপর ধনুকে শরসন্ধান করিল।

কিন্তু মাদকের প্রভাবে তাহার হস্ত স্থির নয়, চক্ষুও তীক্ষ্ণতা হারাইয়াছে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়া সে ধনুক নামাইল, বজ্রের পানে করুণ চক্ষু তুলিয়া মাথা নাড়িল।

বজ্র নিঃশব্দে শবরের হাত হইতে ধনুঃশর লইল, নৃত্যপর ময়ূরের উপর সাবধানে লক্ষ্য স্থির

* কুকুরের অস্তিক প্রতিশব্দ 'চুচু'।

করিল। তারপর টঙ্কার শব্দে ধনু হইতে তীর বাহির হইয়া গেল। বাণবিদ্ধ ময়ূর একবার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

শবর কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তারপর লম্ফ দিয়া বজ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মদোৎফুল্লকণ্ঠে বলিল— 'তুমি তীর ছুঁড়তে জানো? এত ভাল তীর ছুঁড়তে পারো? তুমি আমার বন্ধু। আজ আমরা ময়ূরের মাংস খাব, ময়ূরের পাখা দিয়ে রত্তি-মিত্তি কোমরের গয়না তৈরি করে পরবে।'

বজ্রকে ছাড়িয়া কচ্ছু টলিতে টলিতে মৃত ময়ূরটার দিকে চলিল। ময়ূর শিকার তাহার জীবনে প্রথম নয়। কিন্তু আজ মধুপানে তাহার হৃদয় আনন্দ-বিহ্বল, তার উপর সে মনের মত বন্ধু পাইয়াছে। বজ্রও তাহার উল্লাসে উল্লসিত; সে স্মিতমুখে কচ্ছুর পিছে পিছে গেল। কুকুরটা হর্ষধ্বনি করিতে করিতে সঙ্গে চলিল।

তারপর মুহূর্তমধ্যে তাহাদের সমস্ত আনন্দ আতঙ্কে পরিণত হইল। আনন্দ ও শঙ্কার মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তন, ইহাই বোধহয় বনের আদিম রীতি।

শবর আগে গিয়া মৃত ময়ূরটাকে হাতে তুলিয়া নৃত্য শুরু করিয়াছিল, হঠাৎ 'উঃ' বলিয়া কয়েক পা পিছাইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। বজ্র ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখিল— শবরের পায়ের অঙ্গুষ্ঠ রক্তাক্ত, অদূরে একটা মুমূর্ষু সাপ পড়িয়া আছে। সাপের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু মরে নাই। বজ্রের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, এই সাপটাকে লইয়া ময়ূর খেলা করিতেছিল কিন্তু সাপ মারিবার পূর্বেই ময়ূর শরাহত হইয়া মরিয়াছে। তারপর কচ্ছু হয়তো না দেখিয়া সাপের ঘাড়ে পা দিয়াছে। মুমূর্ষু সাপ কচ্ছুর পায়ে তাহার অন্তিম জিঘাংসা ঢালিয়া দিয়াছে।

বজ্র লাঠি দিয়া সাপ মারিল, কচ্ছুকে জিজ্ঞাসা করিল— 'কামড়েছে?'

কচ্ছুর আর মাদকের মত্ততা নাই, মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া সে শান্ত আত্মস্থ। সহজ স্বরে বলিল—'জাত সাপে খেয়েছে, আর বাঁচব না।'

বজ্র ধনুকের ছিলা ছিঁড়িয়া কচ্ছুর পায়ে দৃঢ় বন্ধন দিল। বলিল— 'এখান থেকে তোমার ঘর কতদূর?'

কচ্ছু বলিল—'বেশি দূর নয়, কিন্তু যেতে পারব না। রত্তি-মিত্তি সাপের ওষুধ জানে, ঘরে পৌঁছুতে পারলে তারা বাঁচাতে পারত। বন্ধু, তোমাকে নিয়ে আনন্দ করতে পেলাম না। যদি পারো, রত্তি-মিত্তিকে খবর দিও। চুচু তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল— 'রত্তি আর মিত্তি কে?'

'ওরা আমার বৌ।' বলিয়া কচ্ছু ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

'না, তোমাকে আমি ঘরে নিয়ে যাব।' বলিয়া বজ্র কচ্ছুর অবসন্ন দেহ দুই হাতে তুলিয়া লইল। চুচু এতক্ষণ প্রভুর পাশে নিশ্চলভাবে বসিয়া ছিল, এখন লাফাইয়া উঠিয়া চিৎকার করিতে করিতে একদিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। বজ্র কচ্ছুকে কাঁধে ফেলিয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিল।

দশম পরিচ্ছেদ
শবরের আতিথ্য

বনের অভ্যন্তর সর্বত্র সমতল নয়, কোথাও কোথাও বৃহৎ পাথরের স্তূপ মাটি ঠেলিয়া মাথা তুলিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, বহু পুরাকালে একদল দৈত্য কালো কালো পাথর সংগ্রহ করিয়া দুর্গরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তারপর কি কারণে পাথরগুলাকে হুণ্ডমুণ্ড ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি প্রস্তরস্তূপের মধ্যে কচ্ছুর নির্জন গুহাগৃহ। এখানে অন্য কোনও মানুষের বসতি নাই।

শুষ্ক শিলাকীর্ণ ভূমি, কিন্তু পাষাণপুঞ্জের ভিতর হইতে জলের একটি ক্ষীণ প্রস্রবণ নির্গত হইয়াছে। এই জলধারার দুই পাশে একটু হরিদাভা, দুই চারিটি গাছ। গাছগুলি বন্য গাছ নয় ; বন এই স্থানটিকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আছে কিন্তু শিলাব্যূহ ভেদ করিতে পারে নাই। যে গাছগুলি জলধারার পাশে জন্মিয়াছে সেগুলি ফলের গাছ ; কদলী, জাম্বুরা, কামরাঙা, ডালিম, শ্রীফল। তাছাড়া ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ ও কন্দ আছে, শিম্বি ও পূতিকা লতা আছে। এগুলি কচ্ছুর দুই বধূ রত্তি ও মিত্তির দ্বারা লালিত।

রত্তি ও মিত্তি দুই সতীন, কিন্তু দু'জনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভালবাসা। দেখিতেও দুটিকে প্রায় একরকম, যেন একজোড়া সুঠাম সুন্দর হরিণশিশু। কৃষ্ণসারের ন্যায় আয়ত কোমল চক্ষু, অজিনের ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণ দেহবর্ণ ; দেহে অটুট নিটোল যৌবন। বেশবাসও এক প্রকার ; কটিতটে বল্কলের আচ্ছাদন, বক্ষ নিরাবরণ, গলায় গুঞ্জার মালা, চুলে সিন্দূরবর্ণ বনকুসুমের নর্মভূষা।

সেদিন প্রদোষকালে রত্তি ও মিত্তি গুহার সম্মুখে জলপ্রণালীর বহমান ধারায় পা ডুবাইয়া বসিয়া ছিল। আকাশে শুক্লপক্ষের আধখানা চাঁদ ফুটি ফুটি করিতেছে ; দিনের শব্দ থামিয়া গিয়াছে, রাত্রির শব্দ এখনও আরম্ভ হয় নাই। দুই শবর যুবতী নীড়ের পাখির মত অস্ফুট ভাষণে দুটি একটি কথা বলিতেছিল, কিন্তু তাহাদের চক্ষু ঘুরিয়া ফিরিয়া বনের কিনারায় সঞ্চরণ করিতেছিল। কচ্ছুর ফিরিবার সময় হইয়াছে।

বনের ভিতরে চুচুর ডাক শুনা গেল। কিন্তু চুচুর ডাক স্বাভাবিক নয়, তাহাতে উত্তেজনা ও আতঙ্কের সঙ্কেত মিশ্রিত রহিয়াছে। রত্তি ও মিত্তি চকিত সশঙ্ক দৃষ্টি বিনিময় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বনের আড়াল হইতে চুচু তীরবেগে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পশ্চাতে এক দীর্ঘকায় গৌরকান্তি যুবক কচ্ছুকে কাঁধে লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

চুচু ছুটিতে ছুটিতে রত্তি ও মিত্তিকে দেখিয়া আবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। মিত্তি রত্তির হাত চাপিয়া ধরিয়া দ্রুতনিম্নকণ্ঠে বলিল— 'সাপ ! জাত সাপ।'

বজ্র যখন কচ্ছুকে পয়ঃপ্রণালীর পাশে নামাইল তখন কচ্ছুর জ্ঞান নাই। বজ্রও এই এক ক্রোশ কণ্টাকাকীর্ণ শিলাকর্কশভূমি কচ্ছুকে বহন করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, পথে কোথাও বিশ্রাম করে নাই ; তাহার সংজ্ঞাও লুপ্তপ্রায়। সে কচ্ছুর পাশে বসিয়া পড়িয়া শুষ্ক তালু হইতে কোনও প্রকারে শব্দ উচ্চারণ করিল— 'সাপ—সাপে কামড়েছে।'

এ সংবাদ রত্তি মিত্তির কাছে নূতন নয়, চুচুর ডাক হইতে পূর্বেই তাহারা জানিয়াছিল। কুকুরের ডাক শবর-শবরীর কাছে যে বার্তা বহন করে সভ্য মানুষের কাছে তাহা দুর্বোধ্য।

রত্তি ও মিত্তি বৃথা বিলাপ করিল না, বজ্রের পানেও ফিরিয়া চাহিল না ; নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতার সহিত কচ্ছুর পরিচর্যা আরম্ভ করিল। কচ্ছুর চোখের পাতা তুলিয়া দেখিল, পায়ের অঙ্গুষ্ঠে সাপের দাঁতের দাগ পরীক্ষা করিল, ধরাধরি করিয়া তাহাকে পয়ঃপ্রণালীর অগভীর জলে শোয়াইয়া দিল।

তারপর মিত্তি হরিণীর মত ছুটিয়া একদিকে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে দিনের দীপ্তি নিঃশেষ হইয়াছে, চাঁদের আলো ফুটিয়াছে। রত্তি অন্তর্জলশয়ান কচ্ছুর পা হইতে ধনুকের ছিলা খুলিয়া ফেলিল, কচ্ছুর অঙ্গুষ্ঠে অধর সংযুক্ত করিয়া রক্ত-মোক্ষণ করিতে লাগিল। কচ্ছু নড়িল না, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল।

মিত্তি ফিরিয়া আসিল, তাহার হাতে কয়েকটা লতাপাতা ও শিকড় বাকড়। সে রত্তিকে ডাক দিয়া গুহায় প্রবেশ করিল এবং আগুন জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। গুহার এক কোণে ভস্মাচ্ছাদনের অন্তরালে অঙ্গার ছিল, মিত্তি ফুঁ দিয়া তাহা জ্বালাইয়া তুলিল। রত্তি কচ্ছুর দেহ অবলীলাক্রমে জল হইতে তুলিয়া লইয়া গুহায় প্রবেশ করিল।

বজ্র বাহিরে বসিয়া দেখিতে লাগিল। আজ সমস্ত দিনের অনভ্যস্ত পরিশ্রমে তাহার বজ্রকঠিন দেহও গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। কচ্ছুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যেটুকু তাহার সাধ্য তাহা সে করিয়াছে ; কিন্তু সে সাপের মন্ত্রৌষধি জানে না, আর কি করিতে পারে ? এখন কচ্ছুর ভাগ্য, আর রত্তি-মিত্তির গূঢ়বিদ্যার শক্তি। বজ্র জলস্রোতের পাশে অবনত হইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান করিল, তারপর শিলাপট্টের উপর শয়ন করিল।

গুহার মধ্যে কচ্ছুর মুষ্টিযোগ আরম্ভ হইয়াছে। মিত্তি পাতা ও শিকড় চিবাইয়া অঙ্গুষ্ঠে বাঁধিয়া দিয়াছে, রত্তি ময়ূরের পালক আগুনে পুড়াইয়া কচ্ছুর নাকের কাছে ধরিতেছে। আর সেই সঙ্গে উভয়ে অস্ফুটকণ্ঠে অবিশ্রাম মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে।

এই দৃশ্য গুহামুখ হইতে দেখিতে দেখিতে বজ্র ঘুমাইয়া পড়িল।

বনপ্রান্তে এক পাল শৃগালের যাম-ঘোষণার শব্দে বজ্র জাগিয়া উঠিল। রাত্রির মধ্যযাম। চন্দ্র অস্ত যাইতেছে।

গুহার মধ্যে রক্তাভ আগুন জ্বলিতেছে। বজ্র উঠিয়া গিয়া দেখিল কচ্ছু তেমনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে, রত্তি ও মিত্তি তাহার দুই পাশে বসিয়া সর্বাঙ্গে হাত বুলাইতেছে ও গূঢ়স্বরে মন্ত্র পড়িতেছে। বজ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে রত্তি ও মিত্তির পানে চাহিল ; কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব তন্ময় সমাহিত। বজ্র প্রশ্ন করিতে পারিল না, কচ্ছুর জীবনের আশা আছে কিনা ? সে বাহিরে আসিয়া আবার শয়ন করিল।

এবার যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন চারিদিকে পাখির কলরব, সূর্যোদয় হইতেছে। বজ্র চক্ষু মেলিয়া দেখিল, রত্তি ও মিত্তি তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের নিকষ অঙ্গে নবারুণের সোনালী কষ লাগিয়াছে ; চোখে মুখে ক্লান্তির জড়িমা। রত্তির হাতে পত্রপুটে হরিণের মাংস, মিত্তির দুই হাতে দুটি পাকা ডালিম।

ধড়মড় করিয়া বজ্র উঠিয়া বসিল— 'কচ্ছু— ?'

উভয়ে ক্লান্তিশিথিল কণ্ঠে হাসিল।

'বাঁচবে।'

বজ্র দ্রুত উঠিয়া গুহায় প্রবেশ করিল। দেখিল, কচ্ছুর জ্ঞান হইয়াছে, সে শুইয়া শুইয়া মিটিমিটি চাহিতেছে। এই এক রাত্রে তাহার দেহ শুকাইয়া প্রেতাকৃতি হইয়া গিয়াছে ; গালের চর্ম কুঞ্চিত, চক্ষু কোটরগত। বজ্র তাহার পাশে নতজানু হইয়া আনন্দবিগলিত স্বরে ডাকিল—'কচ্ছু !'

কচ্ছু শীর্ণ কম্পমান হাত দুটি তুলিয়া বজ্রের গলা জড়াইয়া লইল, স্খলিতস্বরে বলিল —'ভাই, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

বজ্র বলিল— 'না, না, তোমার বৌরা তোমাকে বাঁচিয়েছে।'

রত্তি ও মিত্তি বজ্রের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের পানে চোখ তুলিয়া কচ্ছু ক্ষীণ

হাসিল— 'তুমি কাঁধে তুলে এনেছিলে তাই ওরা বাঁচাতে পারল। কাল থেকে তোমার কিছু খাওয়া হয়নি, আমি অতিথির সেবা করতে পারলাম না। রত্তি ! মিত্তি !'

রত্তি ও মিত্তি হরিণের মাংস ও ডালিম বজ্রের সম্মুখে রাখিল। কচ্ছু বলিল— 'খাও ভাই, আমি দেখি।'

বজ্রের যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, সে খাইতে বসিল। রত্তি ও মিত্তি নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে কি কথা বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বজ্র খাইতে খাইতে কচ্ছুর প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল কচ্ছু যেন তাহার কতদিনের পুরানো বন্ধু ; কচ্ছু যমের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এই তৃপ্তিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আহার শেষে বজ্র বাহিরে গিয়া জল পান করিল। বাহিরে কিন্তু রত্তি মিত্তিকে দেখিতে পাইল না। সে ফিরিয়া আসিয়া কচ্ছুর কাছে বসিল, বলিল— 'রত্তি মিত্তি কোথায় গেল ? তাদের দেখলাম না।'

কচ্ছু বলিল—'বোধহয় জঙ্গলে গেছে শিকারের খোঁজে। কাল আমি কিছু মেরে আনতে পারলাম না—'

বজ্র তখন কচ্ছুর বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল— 'ভাই, আজ তবে আমি যাই। আমাকে কানসোনা যেতে হবে। অনেক দূরের পথ।'

কচ্ছু তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল— 'বন্ধু, আজকের দিনটা থাকো, যদি যেতেই হয় কাল যেও। আমি তোমার সেবা করতে পারলাম না, আমার বৌরা তোমার সেবা করুক। আমাদের সেবা না নিয়ে যদি চলে যাও, তাহলে—তাহলে—' কচ্ছুর অক্ষিকোটর জলে ভরিয়া উঠিল।

'ভাল, কালই যাব।' বজ্র নির্বন্ধ করিল না। তাহার হাত-পা এখনও আড়ষ্ট হইয়া আছে, গায়ের ব্যথা মরে নাই। একদিনের বিলম্বে কী ক্ষতি হইবে ?

দ্বিপ্রহরে রত্তি ও মিত্তি ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে কয়েকটা নধর বন্য কুক্কুট। তাহারা বনে ফাঁদ পাতিয়া আহার্য সংগ্রহ করিয়াছে।

অতঃপর কুঁকুড়ার মাংস রন্ধন হইলে সকলে একসঙ্গে আহারে বসিল। বজ্র একাই দুইটা কুঁকুড়া উদরস্থ করিল। কচ্ছু অল্প একটু খাইল।

আহারান্তে বজ্র কচ্ছুর পাশে লম্বা হইল। রত্তি ও মিত্তি তাহার দুই প্রান্তে আসিয়া বসিল ; মিত্তি পা টিপিতে আরম্ভ করিল, রত্তি মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বজ্র একটু আপত্তি করিল কিন্তু তাহারা শুনিল না। তখন বজ্র পরম আরামে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। রত্তি ও মিত্তি রাত্রে ঘুমায় নাই, তাহারাও অল্পকাল মধ্যে বজ্রের দুই প্রান্তে ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

অপরাহ্নে বজ্র যখন জাগিয়া উঠিল তখন তাহার দেহের সমস্ত গ্লানি দূর হইয়াছে। কচ্ছুও শরীরে অনেকটা বল পাইয়াছে এবং নিজের চেষ্টায় উঠিয়া বসিয়াছে। তিনজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে গুহার বাহিরে প্রস্তরপট্টের উপর বসাইয়া দিল। পশ্চিমে সূর্য তখন বনানীর শীর্ষ স্পর্শ করিয়াছে।

কচ্ছুর দুই পাশে তাহার দুই স্ত্রী গা ঘেঁষিয়া বসিল ; বজ্র তাহাদের সম্মুখে কিছুদূরে বসিল। সকলের মুখেই প্রীতি গদ্‌গদ হাসি। তাহাদের দেখিয়া বজ্র ভাবিতে লাগিল, কী মধুর ইহাদের জীবন ! এই তিনটি আদিম নরনারীর মধ্যে কি নিবিড় ভালবাসা ! ঈর্ষা নাই, স্বার্থপরতা নাই, ক্ষুদ্রতা নাই, আছে শুধু অফুরন্ত প্রাণের প্রাচুর্য !

রত্তি ও মিত্তি কচ্ছুর কানের কাছে গুন্‌গুন্ করিয়া গান গাহিতে লাগিল। গানের কথাগুলি তেমন স্পষ্ট নয়, কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা জংলা সুর কখনও স্নেহে আর্দ্র, কখনও চটুল হাসিতে লুটাইয়া

পড়িতেছে। কচ্ছুর নবজীবন লাভে তাহারা কত সুখী হইয়াছে তাহাই যেন তাহাদের কণ্ঠের কাকলিতে প্রকাশ পাইল। গান শেষ হইলে তাহারা কচ্ছুর দুই কাঁধে মাথা রাখিয়া নীরব রহিল।

শবর-শবরীদের এই অকুণ্ঠ প্রণয়লীলা দেখিয়া বজ্র একটু লজ্জা পাইল, কিন্তু মনে মনে মুগ্ধও হইল। ইহারা যেন পাখির জাত। লজ্জা জানে না।

ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিল। কচ্ছু তখন বজ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল— 'ভাই, কাল সকালে তুমি চলে যাবে। তুমি শুধু আমাদের অতিথি নয়, আমার প্রাণদাতা। আমি বনের মানুষ, কি দিয়ে তোমার পূজা করব? আমার দুই বৌ আছে, এদের মধ্যে যাকে তোমার ভাল লাগে তাকে তুমি নাও, আজ রাত্রির জন্যে সে তোমার বৌ—'

কচ্ছুর ইঙ্গিতে রত্তি ও মিত্তি আসিয়া বজ্রের সম্মুখে বসিল এবং তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া মধুর হাস্য করিল। তাহাদের সরল মুখে মলিনতার চিহ্নমাত্র নাই, তাহাদের সহজ প্রীতি তাহারা অর্পণ করিতে চায়, বন্ধুজনকে প্রীত করিতে চায়।

বজ্র ক্ষণেক হতভম্ব হইয়া রহিল, তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। রত্তি ও মিত্তির হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহাদের কচ্ছুর পাশে বসাইয়া দিয়া বলিল— 'কচ্ছু, তোমার বৌ তোমারই থাক, আমার দরকার নেই।'

কচ্ছু আহতস্বরে বলিল— 'ওদের কাউকে ভাল লাগে না?'

'দু'জনকেই ভাল লাগে। ওদের তুলনা নেই। কিন্তু—'

বজ্র কচ্ছুর সম্মুখে বসিল। গুঞ্জার মুখ তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল; আবেগমথিত মুখ, তীব্র প্রেমতৃষ্ণাভরা চোখ দুটি। বজ্র গাঢ়স্বরে বলিল— 'আমার বৌ আছে। তাকে গ্রামে রেখে এসেছি। অন্য বৌ আমার দরকার নেই।'

বজ্রের বৌ আছে শুনিয়া রত্তি ও মিত্তি কৌতুক-কৌতূহলী চক্ষে চাহিল। কচ্ছু কিন্তু বড় নিরাশ ও মনঃক্ষুণ্ণ হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে বজ্র কচ্ছুর নিকট বিদায় লইল। কচ্ছু আজ বেশ সুস্থ হইয়াছে কিন্তু বেশি দূর পথ হাঁটিতে পারিবে না। তাই রত্তি ও মিত্তি বজ্রকে পথ দেখাইয়া বনের প্রান্তে রাজপথ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।

কচ্ছু বজ্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল— 'বন্ধু, তোমার সঙ্গে আর বোধহয় কখনও দেখা হবে না। আমি বনের মানুষ, তুমি লোকালয়ের মানুষ। কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকব তোমাকে ভুলব না। তুমিও আমাদের ভুল না। যদি কোনও দিন দরকার হয়, মনে রেখো এই জঙ্গলে তোমার তিনজন বন্ধু আছে।'

কচ্ছু গুহাদ্বারে চুচুকে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বজ্র বাহির হইয়া পড়িল। এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল যে বজ্রের সহিত এই শবরদম্পতির ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

বজ্রকে লইয়া রত্তি ও মিত্তি পূর্বদিকে চলিল। আবার বন আরম্ভ হইল; তেমনি প্রদোষছায়াচ্ছন্ন ঘন বনানী। তাহার মধ্যে দুই চঞ্চলা শবরযুবতী অভ্রান্তভাবে পথ চিনিয়া চলিল।

প্রায় দুই ঘটিকা চলিবার পর তাহারা এক রাজপথে আসিয়া উপনীত হইল। উত্তর দক্ষিণে পথ, তাহার অপর পারে কলোর্মি-চঞ্চলা ভাগীরথী। এই রাজপথের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি, উত্তরে মহাকোশল হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত ইহা ভুজঙ্গের ন্যায় বক্ররেখায় পড়িয়া আছে।

রত্তি বজ্রের হাতে একটি লতা দিয়া বাঁধা পাতার মোড়ক দিল, বলিল—'খাবার আছে—খেও। এবার ঐদিকে চলে যাও, কানসোনায় পৌঁছবে।'

'আচ্ছা।'

রত্তি ও মিত্তির মুখে এক ঝলক মিষ্ট হাসি খেলিয়া গেল। তারপর তাহারা দুইটি বিচিত্র নীল প্রজাপতির ন্যায় আবার বনের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ
জয়নাগ

বজ্র রাজপথ ধরিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। একপাশে বিপুলবক্ষা জাহ্নবী, অপরপাশে নিবিড়কুন্তলা বনানী, মাঝখানে প্রস্তর-খচিত উচ্চ পথ যেন সন্তর্পণে দুই দিক বাঁচাইয়া চলিয়াছে। আকাশে প্রখর রৌদ্র, কিন্তু ভাগীরথীর জলস্পর্শীশীতল বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া পথিকের পথ-ক্লেশ নিবারণ করিতেছে।

রাজপথে যাত্রীর বাহুল্য নাই। কদাচিৎ দুই একটি সৈনিকবেশধারী অশ্বারোহী দক্ষিণ হইতে উত্তরে কিম্বা উত্তর হইতে দক্ষিণে মন্দ-স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়া যাইতেছে, অন্যথা পথ নির্জন। নদীতীরে জনবসতি নাই, সম্ভবত প্রতি বৎসর বর্ষাকালে গঙ্গার তুঙ্গস্ফীত জলধারা কূল ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাই মানুষ এখানে বাসস্থান রচনা করিতে সাহসী হয় নাই। ক্রোশের পর ক্রোশ জনহীন বেলাভূমি ; কোথাও কাশের স্তম্ব জন্মিয়াছে, কোথাও বালুময় সৈকতে সঙ্গিহীন সারস এক পা তুলিয়া নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও বা উচ্চ পাহাড়ের গায়ে কোটরবাসী অসংখ্য গাঙ-শালিখের কিচিমিচি।

স্থল অপেক্ষা জলে বরং মানুষের চিহ্ন কিছু অধিক পাওয়া যায়। গঙ্গার স্রোতে দূরে দূরে ছোট ছোট ডিঙি ও ভরা ভাসিতেছে। কখনও বড় বহিত্র পাল তুলিয়া মরালগমনে চলিয়াছে ; দূর হইতে তাহার পট্টপত্তনের উপর মানুষের সচল আকৃতি দেখা যাইতেছে। সব মিলিয়া বহিঃপ্রকৃতির একটি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ রূপ ; তৎপরতা আছে কিন্তু ত্বরা নাই।

সূর্য মধ্যগগনে আরোহণ করিলে বজ্র পথপার্শ্বের এক বৃহৎ অশ্বত্থতলে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাতঃকাল হইতে অনেকখানি পথ হাঁটা হইয়াছে, এইবার একটু বিশ্রাম করা যাইতে পারে। জঠরে অগ্নিদেব জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহারও শান্তিবিধান আবশ্যক।

কিন্তু সর্বাগ্রে গঙ্গায় অবগাহন স্নান। বজ্র অশ্বত্থের ছায়াতলে খাদ্যের পুঁটুলি রাখিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইল।

নদীতট এইখানে ঢালু হইয়া জলে মিশিয়াছে। বজ্র চকিত হইয়া দেখিল, জলের কিনারায় একটা উলঙ্গপ্রায় মানুষ দাঁড়াইয়া আছে এবং গামছার মত রক্তবর্ণ একটি বস্ত্রখণ্ড ঊর্ধ্বে তুলিয়া নাড়িতেছে। মানুষটার দৃষ্টি ছিল নদীর দিকে, তাই সে প্রথমে বজ্রকে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু বজ্র যখন তীরে নামিয়া গেল তখন তাহাকে দেখিয়া সে এমনভাবে চমকিয়া উঠিল যেন সে কোনও গর্হিত কার্যে ধরা পড়িয়াছে।

বজ্র লোকটিকে দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়াছিল কিন্তু কোনও প্রকার সন্দেহ তাহার মনে উদয় হয় নাই। লোকটির পরিধানে কেবল কৌপীন, গামছার মত বস্ত্রখণ্ডটি সম্ভবত তাহার কটিবাস। বজ্র ভাবিল, লোকটি হয়তো যাযাবর সম্প্রদায়ের ভিক্ষু, স্নান করিয়া কটিবাস শুকাইতেছে। সে আর তাহাকে লক্ষ্য করিল না, জলে নামিয়া পরম আরামে স্নান করিতে লাগিল।

লোকটি কিন্তু চোখে উৎকণ্ঠা ভরিয়া বারবার তাহার পানে চাহিতে লাগিল। তাহার আকৃতি দীর্ঘায়ত ও দৃঢ়, মুখে ঈষৎ শ্মশ্রুগুম্ফ আছে, কিন্তু দেখিলে সাধু-বৈরাগী বলিয়া মনে হয় না।

মুখে উদাসীনতা বা বৈরাগ্যের চিহ্নমাত্র নাই।

অবশেষে লোকটি কথা কহিল, ছদ্ম তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল— 'তুমি দেখছি দূরের যাত্রী। কোথা থেকে আসছ ?'

বজ্র গাত্র-মার্জন করিতে করিতে বলিল—'উত্তরের গ্রাম থেকে।'

'তুমি গ্রামবাসী ! কোথায় যাবে ?'

'কর্ণসুবর্ণে।'

'আগে কখনও কর্ণসুবর্ণে গিয়েছ ?'

অপরিচিত ব্যক্তির এত অনুসন্ধিৎসা বজ্রের ভাল লাগিল না, তবু সে সহজভাবেই উত্তর দিল—'না। —তুমি কে ?'

লোকটি অমনি নিজেকে ভিতরে গুটাইয়া লইল।

'আমি পরিব্রাজক।'

বজ্র আর প্রশ্ন করিল না। লোকটি একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল— 'কর্ণসুবর্ণে কী কাজে যাচ্ছ ?'

বজ্র এবার সতর্ক হইল। তাহার মনে হইল লোকটি কেবল কৌতূহলবশেই প্রশ্ন করিতেছে না, কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে। বজ্র উত্তর দিল—'গ্রামে কাজকর্ম নেই, তাই নগরে যাচ্ছি যদি কিছু কাজ পাই।'

স্নান সারিয়া সে তীরে উঠিল। লোকটি কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়, আবার প্রশ্ন করিল—'তোমার হাতে ও কিসের অঙ্গদ ? সোনার ?'

বজ্র লঘুস্বরে বলিল—'না, পিতলের। সোনা কোথায় পাব ?'

সে বস্ত্র পরিধান করিয়া অশ্বত্থতলে ফিরিয়া গেল, পাতার মোড়ক খুলিয়া আহারে বসিল। প্রচুর কুক্কুট মাংস ও কয়েকটি সুপক্ক কদলী। পরম তৃপ্তির সহিত তাহাই আহার করিতে করিতে বজ্র গলা বাড়াইয়া দেখিল লোকটি তখনও নদীতীরে দাঁড়াইয়া আছে, মাঝে মাঝে অশ্বত্থ বৃক্ষের পানে সংশয়পূর্ণ পশ্চাদ্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, আবার নদীর দিকে ফিরিয়া বস্ত্র আন্দোলিত করিতেছে।

বজ্রের কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল। লোকটি কে ? এমন অদ্ভুত আচরণ করিতেছে কেন ? বজ্র আহার করিতে করিতে গলা উঁচু করিয়া দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাটিবার পর দেখা গেল গঙ্গাবক্ষে একটা দীর্ঘ শীর্ণ ডিঙা তীরের দিকে আসিতেছে। ডিঙাতে আট দশজন লোক একের পর এক বসিয়া আছে, চারিটি দাঁড়ের আঘাতে ডিঙা হিংস্র হাঙ্গরের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে।

তীরের কাছাকাছি আসিলে ডিঙার লোকগুলা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—'জয়নাগ।'

তীরের লোকটি উত্তর দিল—'জয়নাগ।'

ডিঙা তীরে ভিড়িল। দুইজন দাঁড়ী ছাড়া আর সকলে নামিয়া পড়িল। তখন ডিঙা আবার মুখ ঘুরাইয়া দূর পরপারের পানে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

যে কয়জন লোক আসিয়াছিল তাহারা সকলে তীরস্থ ব্যক্তিকে ঘিরিয়া ধরিল। তাহারা সকলেই দৃঢ়কায় বলবান ব্যক্তি, বেশবাস প্রায় তীরস্থ ব্যক্তির ন্যায়। দেখিলে মনে হয় তাহারা একই সম্প্রদায়ের লোক।

তীরস্থ ব্যক্তি মৃদুকণ্ঠে অন্যদের কিছু বলিল ; অন্যেরা ভ্রূকুটি করিয়া অশ্বত্থতলের দিকে তাকাইতে লাগিল।

বজ্র একটু অস্বস্তি অনুভব করিল। লোকগুলার আচরণ রহস্যময় ; ইহারা যদি দস্যু-তস্কর হয়

তাহা হইলে এতগুলা লোকের বিরুদ্ধে তাহার একার কোনও আশা নাই। কিন্তু বিপদের মুখে পলায়ন করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে বসিয়া আহার করিতে লাগিল।

লোকগুলা নিম্নকণ্ঠে জল্পনা করিল। তারপর একের পর এক সারি দিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের পাশ দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বজ্রের নিকট দিয়া যাইবার সময় তীক্ষ্ণভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া গেল। বজ্র নিরুৎসুকভাবে তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিল।

বজ্র দেখিল নূতন লোকগুলি রাজপথ লঙ্ঘন করিয়া ওপারের জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গেল, কেবল পুরানো লোকটি গেল না। সে বন্ধুভাবে বজ্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল— 'তুমি বোধহয় জান না আমরা কে?'

বজ্র মাথা নাড়িয়া বলিল—'না।'

'আমরা নাগ সম্প্রদায়ের পরিব্রাজক। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।'

বজ্র সামান্য কৌতূহল প্রকাশ করিল— 'তাই বুঝি জয়নাগ বললে।'

'হাঁ। জয়নাগ শুনলে আমাদের দলের লোককে চিনতে পারি। তুমি যাদের দেখলে ওরা পুণ্ড্রদেশে তীর্থপর্যটনে গিয়েছিল।'

লোকগুলিকে দেখিলে পুণ্যলোভী তীর্থপর্যটক বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু বজ্র তাহা বলিল না। তাহার ভোজন শেষ হইয়াছিল, সে নদীতে গিয়া হাত মুখ ধুইল, জল পান করিল। বলিল— 'আমি এবার চললাম। তুমি কি এখানেই থাকবে?'

নাগ পরিব্রাজক একবার দূরে গঙ্গার অপর পারে দৃষ্টি প্রেরণ করিল, অবহেলাভরে বলিল—'আমরা কখন কোথায় থাকি ঠিক নেই। তুমি চললে? ভাল। তোমার যেমন চেহারা নিশ্চয় রাজার সৈন্যদলে কর্ম পাবে।'

বজ্র ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া বলিল—'রাজার নাম কি?'

পরিব্রাজক চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিল— 'তুমি গৌড়ের মানুষ, রাজার নাম জান না?'

'না। কী নাম?'

পরিব্রাজক ঔদাসীন্যের অভিনয় করিয়া বলিল— 'কে জানে। আমরা নাগপন্থী বৈরাগী, রাজা-রাজড়ার সংবাদ রাখি না।'

বজ্র একটু হাসিয়া যাত্রা করিল। সে বুঝিয়াছিল ইহারা ভণ্ড বৈরাগী, ইহাদের কোনও গুপ্ত অভিসন্ধি আছে; কিন্তু কী অভিসন্ধি তাহা অনুমান করা তাহার সাধ্য নয়। সে পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, নগর এখনও দূরে কিন্তু ইহারই মধ্যে নগরের দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া তাহার পথের উপর পড়িয়াছে। নদী যতই সাগরের কাছে আসিতে থাকে, সাগরের সান্নিধ্য ততই তাহার সর্বাঙ্গে স্পন্দন-শিহরণ জাগাইয়া তোলে; বজ্র দূর হইতে তেমনই নগর-রূপী মহাজলধির গভীর স্পন্দন নিজ অন্তরে অনুভব করিল। গ্রাম ও বনের অকপট ঋজুতা আর নাই, জনসমুদ্রের কুটিল নক্রসঙ্কুল আবর্ত তাহাকে টানিতে আরম্ভ করিয়াছে। গঙ্গাতীরের এই রহস্যময় ঘটনা যেন তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেল।

কর্ণসুবর্ণ ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল; পথপার্শ্বের বন শেষ হইয়া মাঠ আরম্ভ হইল। দিগন্তের কাছে মহানগরীর হর্ম্যচূড়া দেখা গেল। তারপর, রাক্ষসী বেলায়, বজ্র কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে এক বিশাল সংঘারামের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। পশ্চিম দিগন্তে তখন রক্তমসী দিয়া রাত্রি ও দিবার মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইতেছে।

বজ্র দেখিল, রাজপথ ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানে বহুবিস্তীর্ণ ভবন, উচ্চ প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত। ইহাই রক্তমৃত্তিকার বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারাম; চলিত ভাষায় রাঙামাটির মঠ।

নগরের উপকণ্ঠে বটে, কিন্তু বিশাল সংঘারাম ব্যতীত লোকালয় বেশি নাই, কেবল আশেপাশে

দুই তিনটি ক্ষুদ্র বিপণি। নগর হইতে যাহারা সংঘে পূজা দিতে আসে, পূজা দিয়া আবার নগরে ফিরিয়া যায়। সংঘে প্রায় পাঁচ শত বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন, কিন্তু স্থানটি নির্জন শব্দহীন। এখানে সকল কার্যই নিঃশব্দে অলক্ষিতে সম্পাদিত হয়।

সংঘারামের প্রশস্ত তোরণদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বজ্র ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। কবাটহীন তোরণদ্বার দিয়া সংঘভূমি দেখা যাইতেছে, কিন্তু সেখানে লোকজন কেহ নাই, দ্বারে দ্বারীও নাই। বাহিরে বিপণিগুলির আগড় বন্ধ, দোকানীরা সন্ধ্যার পূর্বেই দোকান বন্ধ করিয়া নগরে ফিরিয়া গিয়াছে।

সংঘদ্বারের দুই পাশে দুইটি দীপস্তম্ভ। সেকালে মঠ-মন্দির প্রভৃতির অগ্রে উচ্চ দীপস্তম্ভ রচনার রীতি ছিল। ইষ্টকনির্মিত স্তম্ভের সর্বাঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটর থাকিত, পূজাপার্বণের সময় কোটরগুলিতে দীপ জ্বালিয়া উৎসবের শোভাবর্ধন হইত। বজ্র ঈষৎ বিভ্রান্তভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সহসা দেখিতে পাইল, একটি দীপস্তম্ভমূলে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বাম পদ দক্ষিণ জানু-অস্থির উপর স্থাপিত, দুই হাতে যষ্টিতে ভর দিয়া এবং মস্তকটি বাহুর উপর রাখিয়া সে সারস পক্ষীর ন্যায় এক পায়ে দাঁড়াইয়া ঘুমাইতেছে।

বজ্র ত্বরিতপদে তাহার নিকটবর্তী হইতেই লোকটি চক্ষু মেলিল, দুই পায়ে দাঁড়াইল ও হাই তুলিল। তুড়ি দিয়া বলিল—'জয়নাগ।'

বজ্র আজ দ্বিতীয়বার 'জয়নাগ' শুনিল। সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মানুষটিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, বলবান হৃষ্টপুষ্ট লোক, কিন্তু মুখে ধূর্ততা মাখানো। বজ্র কোনও প্রশ্ন করিবার পূর্বেই সে বলিল— 'কে বাপু তুমি, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে ?'

বজ্র বলিল— 'আমি পথিক, কর্ণসুবর্ণে যাব। নগর এখান থেকে কত দূর ?'

লোকটি মিটিমিটি চাহিয়া বলিল— 'ক্রোশ দুই হবে। আলোয় আলোয় নগরে পৌঁছুতে পারবে না।'

'রাত্রে পান্থশালায় কি আশ্রয় পাব না ?'

'তুমি যদি নূতন লোক হও, রাত্রে পান্থশালা খুঁজে পাবে না।'

'তবে উপায় ?'

'উপায় তো সামনেই রয়েছে। মঠে ঢুকে পড়, আহার আশ্রয় দুই পাবে।'

'কিন্তু—মঠে তো কাউকে দেখছি না।'

'ভেবেছ কি মঠ খালি ?—পাঁচশ নেড়া মাথা আছে। তবে ভারি শান্তশিষ্ট। ভিতরে গেলেই দেখতে পাবে।'

লোকটির কথা বলিবার ভঙ্গি লঘুতাব্যঞ্জক, বৌদ্ধদের প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে বলিয়া মনে হয় না। বজ্র সংঘের দিকে পা বাড়াইয়া একটু ইতস্তত করিল, বলিল—'তুমি কি এখানেই রাত কাটাবে ? সংঘে যাবে না ?'

লোকটি আবার এক পা তুলিয়া ঘুমাইবার উদ্যোগ করিল, বলিল—'আমার জন্যে ভেবো না। জয়নাগ।'

বজ্র প্রশ্ন করিল—'জয়নাগ কাকে বলে ?'

'ও একটা মন্তর'—বলিয়া লোকটি চক্ষু মুদিল।

বজ্র ভাবিতে ভাবিতে সংঘদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। এই অদ্ভুত লোকটা নাগ সম্প্রদায়ের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই ; আগন্তুক পান্থদের মধ্যে তাহার দলের কেহ আছে কিনা জানিবার জন্য এই কূট-কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু কেন ? কিসের জন্য এই চাতুরীপূর্ণ কপটতা ?

কিন্তু এ চিন্তা বজ্রের মস্তিষ্কে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, সংঘভূমির দৃশ্য তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
শীলভদ্র

রক্তমৃত্তিকার মহাবিহার এক পাটক* ভূমির উপর অবস্থিত। তিন দিকে প্রাচীর, পিছনে গঙ্গা। বিহার ভূমির মধ্যস্থলে উচ্চ ত্রিভূমক হর্ম্য। নিম্নতল প্রশস্ত, দ্বিতল তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, ত্রিতল আরও ক্ষুদ্র ; স্তূপের আকৃতি। এই স্তূপসদৃশ ভবনের মধ্য-তলে শাক্যমুনির দিব্য দেহাবশেষ রক্ষিত আছে।

এই গন্ধকুটিকে কেন্দ্র করিয়া চারিপাশে সারি সারি ভিক্ষুগণের প্রকোষ্ঠ। অগণিত প্রকোষ্ঠ, প্রত্যেকটিতে একজন ভিক্ষু বাস করেন। প্রকোষ্ঠগুলি নিরাভরণ, শয়নের জন্য একটি কাঠের পাটাতন ও একটি জলের কুম্ভ ; অন্য কোনও তৈজস নাই।

বজ্র এদিক-ওদিক দৃক্‌পাত করিতে করিতে চলিল। অধিকাংশ পরিবেণই শূন্য, ভিক্ষুরা পরিক্রমণের জন্য গঙ্গার তীরে গিয়াছেন ; শরীর রক্ষার জন্য ইহা তাঁহাদের নিত্য কর্ম। কদাচিৎ একটি দুইটি ভিক্ষু পরিবেণের কবাটহীন দ্বারের কাছে বসিয়া পুঁথি পড়িতেছেন। সন্ধ্যার মন্দালোকে নত হইয়া তাঁহারা পাঠে নিমগ্ন ; বজ্রকে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন না।

ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বজ্র বিহারের পশ্চাদ্দিকে এক চত্বরের নিকট উপস্থিত হইল। বৃহৎ গোলাকৃতি চত্বর, তাহার মধ্যস্থলে বসিয়া দুইটি বৃদ্ধ লঘু স্বরে আলাপ করিতেছেন। একটি বৃদ্ধ স্থূল ও খর্বকায়, মুখে মেদমণ্ডিত প্রসন্নতার সহিত পদাভিমানের গাম্ভীর্য। অন্য বৃদ্ধটি সম্পূর্ণ বিপরীত ; দীর্ঘ দেহ ক্ষীণ ও তপঃকৃশ, স্কন্ধ হইতে মস্তক সম্মুখদিকে একটু অবনত হইয়া পড়িয়াছে ; মুখে মাংসলতার অভাববশত চিবুক ও হনুর অস্থি তীক্ষ্ণভাবে প্রকট হইয়া আছে। ইঁহার মুখভাব হইতে পদবী অনুমান করা যায় না, নিম্নতম শ্রেণীর শ্রমণও হইতে পারেন। কিন্তু অন্য বৃদ্ধটি যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন তাহাতে মনে হয় ইনি সামান্য ব্যক্তি নয়।

বজ্র চত্বরের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলে দুইজনে চক্ষু তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন, তাঁহাদের বাক্যালাপ স্থগিত হইল। বজ্র সসম্ভ্রমে তাঁহাদের সম্বোধন করিল— 'মহাশয়, আমি দূরের পান্থ, কর্ণসুবর্ণে যাব। আজ রাত্রির জন্য সংঘে আশ্রয় পাব কি ?'

স্থূলকায় বৃদ্ধটি বলিলেন—'অবশ্য।'

তিনি এক হস্ত উত্তোলন করিতেই একটি অল্পবয়স্ক শ্রমণ আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন—'মণিপদ্ম, অতিথির পরিচর্যা কর।'

অন্য বৃদ্ধটি এতক্ষণ অপলক নেত্রে বজ্রের পানে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার শান্ত মুখে ক্রমশ বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। শ্রমণ মণিপদ্ম যখন অন্য বৃদ্ধের আদেশ পালনের জন্য বজ্রের দিকে পা বাড়াইল তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া নিম্নস্বরে কিছু বলিলেন। মণিপদ্ম গভীর শ্রদ্ধায় নত হইয়া তাঁহার কথা শুনিল, তারপর বজ্রের কাছে আসিয়া বলিল— 'ভদ্র, আসুন আমার সঙ্গে।'

---

* সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর ভূমিমাপ ৫ কুল্যবাপ

মণিপদ্ম প্রথমে বজ্রকে গঙ্গার তীরে লইয়া গেল। বিস্তীর্ণ ঘাটে রাত্রির ছায়া নামিয়াছে, জলের উপর ধূসর আলোর ম্লান প্রতিফলন। ঘাটের পৈঠাগুলির উপর পরিক্রমণরত ভিক্ষু শ্রমণের নিঃশব্দ ছায়ামূর্তি। কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতেছে না, ক্ষণেকের জন্য গতি বিলম্বিত করিতেছে না, যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় ঘাটের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পাদচারণা করিতেছে। দৃষ্টি ভূমিনিবদ্ধ, বক্ষ বাহুবদ্ধ। এমন প্রায় তিন চারিশত শ্রমণ। বজ্র দেখিল, সংঘ নিতান্ত জনহীন নয়।

ঘাটে হস্ত মুখ প্রক্ষালনের পর বজ্রকে লইয়া মণিপদ্ম এক প্রকোষ্ঠে উপনীত হইল। ইতিমধ্যে প্রকোষ্ঠগুলিতে দীপ জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কয়েকজন শ্রমণ বর্তিকাহস্তে দ্বারে দ্বারে দীপ জ্বালাইয়া ফিরিতেছে। মণিপদ্ম প্রকোষ্ঠে দীপ জ্বালিয়া একপাশে রাখিল, বলিল— 'আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আপনার আহার্য নিয়ে আসি।'

মণিপদ্ম চলিয়া গেল, বজ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া রহিল। ক্রমে আশেপাশের পরিবেণগুলিতেও জনসমাগম হইতে লাগিল। ভিক্ষুরা সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোথাও চঞ্চলতার আভাস নাই। অল্প আলোকে ছায়ার ন্যায় সঞ্চরমাণ মানুষগুলি ; কদাচিৎ নিম্নস্বর বাক্যালাপের গুঞ্জন ; যেন ভৌতিক লোকের অবাস্তব পরিমণ্ডল।

তারপর গন্ধকুটি হইতে মধুর-স্বনে ঘণ্টিকা বাজিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ স্ব স্ব কক্ষ ছাড়িয়া সেইদিকে যাত্রা করিলেন। সেখানে ভগবান তথাগতের পূজার্চনা হইবে, তারপর ভিক্ষুদের নৈশ ভোজন।

পূজার্চনার ঘণ্টিকা নীরব হইবার কিয়ৎকাল পরে মণিপদ্ম বজ্রের আহার্য লইয়া উপস্থিত হইল। আহার্যের মধ্যে ঘৃতপক্ব তণ্ডুল ও গোধূমের একটা পিণ্ড এবং ফলমূল ; কিন্তু পরিমাণে প্রচুর। বজ্র আহারে বসিল ; মণিপদ্ম সম্মুখে নতজানু হইয়া পরিবেশন করিল।

শ্রমণ মণিপদ্ম বজ্রেরই সমবয়স্ক। সুশ্রী ক্ষীণাঙ্গ প্রফুল্ল-মুখ যুবক ; মুণ্ডিত মস্তক ও পীত বস্ত্র তাহার মনের সরসতা মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাহার বৈরাগ্য সহজ আনন্দেরই রূপান্তর। বজ্র আহার করিতে করিতে তাহার সহিত দুই চারিটি বাক্যালাপ করিল ; দেখিল মণিপদ্মের বুদ্ধিদীপ্ত মনে কোনও কৌতূহল নাই, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নাই ; সকলের আজ্ঞাধীন হইয়া অন্যের সেবা করাই তাহার আনন্দময় স্বধর্ম।

আহার সমাধা হইলে মণিপদ্ম বলিল— 'ভদ্র, একটি অনুরোধ আছে। যদি ক্লেশ না হয়, আর্য শীলভদ্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

বজ্র বলিল—'ক্লেশ কিসের ? কিন্তু আর্য শীলভদ্র কে ?'

মণিপদ্ম বলিল—'সদ্ধর্মভাণ্ডার আর্য শীলভদ্রের নাম শোনেন নি ?'

বজ্র মাথা নাড়িল—'না। কে তিনি ?'

মণিপদ্ম বিস্ময়াহতভাবে চাহিয়া রহিল। শীলভদ্রের নাম জানে না এমন মানুষ আছে ? যাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার আশায় সুদূর চীনদেশ হইতে গুণগ্রাহীরা ছুটিয়া আসে, দেশের লোক সেই শীলভদ্রের নাম জানে না ! শেষে মণিপদ্ম বলিল— 'আমার ধারণা ছিল শীলভদ্রের নাম সকলেই জানে। তিনি নালন্দা বিহারের মহাধ্যক্ষ ; তাঁহার মত জ্ঞানী পৃথিবীতে নেই।'

বজ্র দীনকণ্ঠে বলিল— 'ভাই, আমি গ্রামের ছেলে, পৃথিবীর কিছুই জানি না। আর্য শীলভদ্র আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন ?'

'তা জানি না। তিনি আদেশ করেছেন, যদি আপনার ক্লেশ না হয়, আহারের পর আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে।'

'আমি প্রস্তুত। আজ সন্ধ্যাবেলা যে দুটি বৃদ্ধকে দেখলাম, ইনি কি তাঁদেরই একজন ?'

'হাঁ। যিনি শীর্ণকায় অশীতিপর বৃদ্ধ তিনি।'

'আর অন্যটি ?'

'তিনি এই রক্তমৃত্তিকা বিহারের মহাস্থবির।'

অতঃপর মণিপদ্ম বজ্রকে লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইল। গন্ধকুটির নিম্নতলে এক কোণে একটি প্রকোষ্ঠে শীলভদ্র বসিয়া আছেন। কক্ষটি সাধারণ পরিবেণের মতই ক্ষুদ্র ও নিরাভরণ। শীলভদ্র দীপের সম্মুখে বসিয়া একটি তালপত্রের পুঁথি দেখিতেছিলেন ; অশীতি বৎসর বয়সেও তাঁহার চোখের জ্যোতি ম্লান হয় নাই। বজ্র ও মণিপদ্ম তাঁহার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি মণিপদ্মকে বলিলেন—'মণিপদ্ম, তুমি এবার আহার কর গিয়ে। আজ রাত্রে তোমার সেবার আর প্রয়োজন নেই বৎস।'

মণিপদ্ম হাসিমুখে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। শীলভদ্র বজ্রকে বলিলেন— 'এস, উপবেশন কর।'

বজ্র আসিয়া শীলভদ্রের সম্মুখে এক পীঠিকায় বসিল। শীলভদ্র পুঁথি বন্ধ করিয়া সূত্র দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বজ্রকে নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার বাহুতে অঙ্গদ দেখিলেন, তারপর বলিলেন—'তোমার নাম কি বৎস ?'

বজ্র বলিল—'আমার নাম বজ্রদেব।'

শীলভদ্র তখন ধীরস্বরে বলিলেন—'আমি তোমাকে দু' একটি প্রশ্ন করব, ইচ্ছ না হয় উত্তর দিও না। আজ সন্ধ্যায় তোমাকে দেখে অনেক দিনের পুরানো কথা মনে পড়ে গেল, তাই তোমাকে ডেকেছি। আমার পরিচয় বোধহয় শুনেছ। আমি শীলভদ্র, নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ, প্রাচীমণ্ডলের বিহারগুলি পরিদর্শনের জন্য বেরিয়েছি ; এখান থেকে সমতট যাব। সমতট আমার জন্মস্থান।* মৃত্যুর পূর্বে একবার জন্মভূমি দেখবার ইচ্ছা হয়েছে। তারপর, যদি বুদ্ধের ইচ্ছা হয়, আবার এই পথে নালন্দায় ফিরে যাব।'

শীলভদ্র একটু হাসিয়া নীরব হইলেন ; যেন নিজের পরিচয় দিয়া বজ্রকেও পরিচয় দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। বজ্র তাঁহার শান্ত মুখের পানে চাহিয়া অনুভব করিল ইনি সাধারণ কৌতূহলী মানুষ নয়, অন্য স্তরের মানুষ। চাতক ঠাকুরের সহিত ইঁহার আকৃতির কোনই সাদৃশ্য নাই, কিন্তু তবু যেন কোথায় মিল আছে। বজ্র স্থির করিল ইঁহার কাছে কোনও কথা গোপন করিবে না। সে বলিল— 'আপনি প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দেব।'

শীলভদ্র তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন, বলিলেন— 'তুমি বুদ্ধিমান। তোমার পিতার নাম কি ?'

'আমার পিতার নাম শ্রীমানবদেব।'

স্মিতহাস্যে শীলভদ্রের চক্ষুপ্রান্ত কুঞ্চিত হইল ; তিনি বলিলেন—'আমার অনুমান মিথ্যা নয়। তুমি মানবদেবের পুত্র, শশাঙ্কদেবের পৌত্র। ত্রিশ বছর আগে তোমার পিতাকে আমি দেখেছিলাম। তখন তাঁর বয়স ছিল তোমারই মত।'

বজ্র ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'আমার পিতা কোথায় ? তিনি কি এখন গৌড়ের রাজা নয় ?'

শীলভদ্র করুণনেত্রে চাহিয়া বলিলেন— 'না। কিন্তু আগে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দেব।'

শীলভদ্রের প্রশ্নের উত্তরে বজ্র নিজ জন্ম ও জীবন-কথা, মাতার মুখে যেমন শুনিয়াছিল সমস্ত অকপটে বলিল ; কর্ণসুবর্ণে আসার উদ্দেশ্যও প্রকাশ করিল। শুনিয়া শীলভদ্র দীর্ঘকাল নীরব

* শীলভদ্র সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রহিলেন। শেষে কোমলস্বরে বলিলেন—'বৎস, তোমার পিতা জীবিত নেই। তুমি কর্ণসুবর্ণে যেও না ; সেখানে এমন লোক এখনও জীবিত আছে যারা তোমার পিতাকে চিন্‌ত, তোমাকে দেখলে মানবদেবের পুত্র বলে চিন্‌তে পারবে। সেটা তোমার পক্ষে শুভ হবে না। তুমি তোমার গ্রামে ফিরে যাও, আর তুমি যে মানবদেবের পুত্র এ কথাটা গোপন রাখার চেষ্টা কোরো।'

বজ্র বলিল—'কিন্তু আপনি কি স্থির জানেন আমার পিতা জীবিত নেই ?'

শীলভদ্র বলিলেন—'তোমার পিতার সম্বন্ধে যা জানি বলছি। ত্রিশ বছর আগে শশাঙ্কদেব গৌড়ের রাজা ছিলেন ; মানবদেব ছিলেন যুবরাজ। তখন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কদেবের যুদ্ধ চলছে। হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধ ; তাই যুদ্ধের উত্তেজনায় শৈবধর্মী শশাঙ্ক গৌড়ের বৌদ্ধদের ওপর কিছু উৎপীড়ন আরম্ভ করেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে আমি নালন্দা থেকে গৌড়ের রাজসভায় শশাঙ্কদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসি। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। যুবরাজ মানবদেবও আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন, তিনি আমার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। ফলে আমি সিদ্ধমনোরথ হয়ে নালন্দায় ফিরে যাই, শশাঙ্ক তারপর আর কারও ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করেন নি। তোমার পিতার সঙ্গে সেই একবার মাত্র আমার সাক্ষাৎ। তারপর ত্রিশ বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজ তোমাকে দেখেই তাঁর মুখ স্মরণ হয়েছিল।

'যা হোক, এই ঘটনার দশ বছর পরে শশাঙ্কদেব দেহরক্ষা করলেন, মানব রাজা হলেন। মানব সিংহাসন লাভের কয়েক মাস পরে ভাস্করবর্মা উত্তর থেকে গৌড় আক্রমণ করলেন। কজঙ্গলে মানবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হল। মানব পরাজিত হয়ে কর্ণসুবর্ণে ফিরে এলেন।

'কিন্তু ভাস্করবর্মা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন ; কর্ণসুবর্ণে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হল। এবারও মানব পরাজিত হলেন ; রাজপুরী রক্ষার জন্য অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে তিনি ভাস্করবর্মার হাতে বন্দী হলেন। জনশ্রুতি আছে, মানব যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়েছিলেন, সেই রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হয় ; তারপর তাঁর মৃতদেহ রাজপুরীর প্রাকার থেকে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হয়।'

শীলভদ্র নীরব হইলে বজ্রও বহুক্ষণ কথা বলিল না। এইভাবে তাহার পিতার জীবনান্ত হয়, তাই তিনি মাতার কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু—

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'এখন রাজা কে ? ভাস্করবর্মা ?'

শীলভদ্র বলিলেন—'না। কয়েক বছর হল ভাস্করবর্মার মৃত্যু হয়েছে। এখন তাঁর পুত্র অগ্নিবর্মা রাজা।' ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'ভাস্করবর্মাও ধর্মে শৈব ছিলেন এবং বিদ্যানুরাগী সজ্জন ছিলেন। অগ্নিবর্মা শুনেছি ঘোর নরাধম। কিন্তু তার আর বেশি দিন নয়।'

'বেশি দিন নয় কেন ?'

'অগ্নিবর্মা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মনিরত ; রাজকার্য দেখে না। এই সুযোগ নিয়ে দক্ষিণের এক রাজা গৌড়দেশ গ্রাস করার ষড়যন্ত্র করছে ; ইতিমধ্যে দণ্ডভুক্তি গৌড়ের অধিকার থেকে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু অগ্নিবর্মার কোনও দিকেই লক্ষ্য নেই। দেশের যখন সর্বনাশ উপস্থিত হয় তখন রাজারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হন। আজ গৌড় পুণ্ড্র সমতট সর্বত্র এই দেখছি, শাসনশক্তিহীন রাজারা রমণীর মত পরস্পর কোন্দল করছেন, নয় বিলাসব্যাসনে গা ঢেলে দিয়েছেন। রাষ্ট্রের অবস্থা ঘুণ-চর্বিত কাষ্ঠের ন্যায়। অন্তর্বাণিজ্য বহির্বাণিজ্য দুই-ই উৎসন্নে গিয়েছে। প্রজার মনে সুখ নেই, ধর্মজ্ঞানও লুপ্তপ্রায়। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর থেকে দেশের এই দুর্দিন আরম্ভ হয়েছে। কতদিন চলবে জানি না। যতদিন না দেশে নূতন কোনও শক্তিমান রাজার আবির্ভাব হবে ততদিন দেশের মঙ্গল নেই।'

নিশ্বাস ফেলিয়া শীলভদ্র নীরব হইলেন।

বজ্র প্রশ্ন করিল— 'আপনি আমাকে গ্রামে ফিরে যেতে বলছেন কেন ?'

শীলভদ্র বলিলেন—'তুমি নিঃসঙ্গ নিঃসহায় অবস্থায় কর্ণসুবর্ণে যাচ্ছ। বর্তমান রাজার লোকেরা যদি জানতে পারে তুমি মানবদেবের পুত্র, তোমার জীবন-সংশয় হবে, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছিল তারা তোমাকে নিষ্কৃতি দেবে না। তোমার পিতা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর সন্ধান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল মৃত ; ব্যর্থ অন্বেষণে নিজের জীবন বিপন্ন করে লাভ কি ?'

বজ্র বলিল—'আমার পিতা বেঁচে আছেন এ সম্ভাবনা কি একেবারেই নেই ?'

শীলভদ্র বলিলেন— 'তোমার পিতা বেঁচে থাকলে রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতেন। গত বিশ বছরের মধ্যে সেরূপ কোনও চেষ্টা হয়নি।'

সুদীর্ঘ নীরবতার পর বজ্র ধীরে ধীরে বলিল—'পিতার মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে মা'র কাছে ফিরে যেতে আমার মন সরছে না। আমি কর্ণসুবর্ণে যাব, তারপর যা হয় হবে।'

শীলভদ্র বলিলেন—'আর একটা কথা আছে। কর্ণসুবর্ণে রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন। জয়নাগের জাল গুটিয়ে আসছে, হঠাৎ একদিন সমরানল জ্বলে উঠবে, কর্ণসুবর্ণ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে। তুমি বাহিরে আছ, ইচ্ছা করে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন ? জয়নাগ যে-কোনও মুহূর্তে মাথা তুলতে পারে।'

আবার জয়নাগ ! বজ্র চকিত হইয়া বলিল—'জয়নাগ কে ?'

'যে-রাজা গৌড়দেশ অধিকার করবার চক্রান্ত করছে তার নাম জয়নাগ।'

বজ্র নাগদের সম্বন্ধে যে সন্দেহ করিয়াছিল তাহা আরও দৃঢ় হইল, কিন্তু এ বিষয়ে শীলভদ্রের সহিত আলোচনা করিবার স্পৃহা তাহার হইল না। সে করজোড়ে বলিল— 'আপনার সহৃদয়তা ভুলব না। আজ আজ্ঞা করুন।'

শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'কর্ণসুবর্ণে যাবে ?'

বজ্র বলিল—'পিতৃ-পিতামহের রাজধানীর এত কাছে এসে আমি ফিরে যাব না। আমাকে কর্ণসুবর্ণে যেতেই হবে।'

শীলভদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'সকলই তথাগতের ইচ্ছা। যাও। কিন্তু এক কাজ করো, তোমার ঐ অঙ্গদ ঢাকা দিয়ে রাখো।'

'কেন ?'

'দেশের সোনার বড় অভাব হয়েছে। তোমার হাতে সোনার অঙ্গদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কর্ণসুবর্ণে দস্যু-তস্করের অভাব নেই।'

শীলভদ্র কর্পটের ন্যায় একটি বস্ত্রখণ্ড লইয়া নিজ হস্তে বজ্রের অঙ্গদের উপর তাগা বাঁধিয়া দিলেন, বলিলেন—'যদি নগরে অর্থাভাব হয় কোনও স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে অঙ্গদ থেকে সোনা কেটে বিক্রয় কোরো। অন্যথা অঙ্গদ কাউকে দেখিও না। অরাজকতার দেশে সাধুও তস্কর হয়।'

শীলভদ্রের পদধূলি লইয়া বজ্র বলিল—'আপনাকে শতকোটি ধন্যবাদ। কর্ণসুবর্ণে আপনার পরিচিত কেউ আছে কি ?'

শীলভদ্র চকিত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন—'পরিচিত অনেক আছে, কিন্তু তাদের দিয়ে কাজ হবে না। তুমি একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা কোরো। তাঁর নাম কোদণ্ড মিশ্র, নগরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে তাঁর কুটির।'

'তিনি কে ?'

'তিনি এক সময় তোমার পিতামহের সচিব ছিলেন।'

পিতামহের সচিব ! বজ্র আগ্রহভরে শীলভদ্রের পানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তিনি আর কিছু

বলিলেন না।

অতঃপর বজ্র বিদায় লইল। শীলভদ্র দীপ নিভাইয়া অন্ধকারে নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—সুগত, তোমার মনে কি আছে জানি না। এই বালকের হৃদয়ে নিষ্ঠা আছে, ধৈর্য আছে, দৃঢ়তা আছে। যদি প্রাক্তন পুণ্যবলে ও পিতৃরাজ্য ফিরে পায়, হয়তো দেশের ভাগ্যও ফিরবে। তাই ওকে কোদণ্ড মিশ্রের কাছে পাঠালাম। এখন তোমার ইচ্ছা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
কর্ণসুবর্ণ

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বজ্র প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিল। দেখিল সংঘের সকলেই জাগিয়া উঠিয়া নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মণিপদ্ম হাসিমুখে তাহার দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

দুইজনে সংঘের বাহিরে আসিল। বজ্র বলিল—'ভাই, এবার তবে যাই। যদি এ-পথে ফিরি আবার দেখা হবে।'

মণিপদ্ম প্রশ্ন করিল—'কবে ফিরবেন ?'

বজ্র বলিল—'তা জানি না। তুমি সংঘেই থাকবে তো ?'

মণিপদ্ম একমুখ হাসিয়া বলিল—'হয়তো থাকব না। আর্য শীলভদ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, বলেছেন আমাকে নালন্দায় নিয়ে যাবেন।'

'সে কবে ?'

'আর্য শীলভদ্র সমতট থেকে ফিরে এলে।'

বজ্র দেখিল, মণিপদ্মের মুখে চোখে উচ্ছলিত আনন্দ। সে জিজ্ঞাসা করিল—'নালন্দায় গিয়ে কি হবে ? সেখানে কি তুমি অন্য কাজ করবে ?'

মণিপদ্ম বলিল—'না, এখানে যে কাজ করছি সেখানেও তাই করব। কিন্তু সে যে নালন্দা—মহাতীর্থ ! ভদন্ত শীলভদ্র ছাড়াও কত জ্ঞানী মহাপুরুষ, কত সিদ্ধ অর্হৎ আছেন। তাঁদের সেবা করে আমি ধন্য হব।'

মণিপদ্মের উদ্ভাসিত মুখের পানে চাহিয়া বজ্রের অন্তর ক্ষণেকের জন্য টলমল করিয়া উঠিল। মণিপদ্ম যে-পথে চলিয়াছে তাহা কেমন পথ, কোন্ আনন্দঘন শান্তিনিকেতনে তাহার শেষ ? আর বজ্র যে-পথে পা বাড়াইয়াছে তাহারই বা সমাপ্তি কোথায় ?

দুইজন বিপরীত পথের যাত্রী সংঘের সম্মুখে পরস্পর আলিঙ্গন করিল। তারপর বজ্র কর্ণসুবর্ণের পথ ধরিল।

কর্ণসুবর্ণ নগর একদিকে ভাগীরথী ও অন্যদিকে ময়ূরাক্ষী-ময়ূরীর সম্মিলিত ধারার দ্বারা পরিখীকৃত, তাই তাহার আকৃতি ত্রিভুজের ন্যায় ; উত্তরে প্রশস্ত, দক্ষিণে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া সঙ্গমস্থলে কোণের আকার ধারণ করিয়াছে। নগরের উত্তর প্রান্তে বিস্তীর্ণ প্রাকার স্থলপথে নগরকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে।

ত্রিকোণ স্থানটি আয়তনে বড় কম নয়, তাহার মধ্যে লক্ষাধিক লোকের বাস। তাহা ছাড়া প্রাকার পরিখার বাহিরেও বহুলোকের বসতি। দক্ষিণে মৌরীর পরপারে যাহারা বাস করে তাহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক, নগরে ফল ফুল শাক-পত্র যোগান দেওয়া তাহাদের জীবিকা।

কর্ণসুবর্ণ নূতন নগর ; মথুরা বারাণসীর ন্যায় প্রাচীন নয়। তাহার পথগুলি ঋজু, গলিঘুঁজি বেশি নাই। পথের দুই ধারে নানা বর্ণের চূর্ণলিপ্ত দ্বিতল ত্রিতল গৃহ, গৃহচূড়ায় ধাতুকলস। পথে পথে বহু দেবদেবীর মন্দির, বৌদ্ধ চৈত্য মঠ। নগরের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাজপথ গঙ্গার ধার দিয়া গিয়াছে। পথের পূর্ব ধারে অসংখ্য ছোটবড় ঘাট, স্নান ঘাট, খেয়া ঘাট, বন্দর। পথের অপর পাশে ধনী নাগরিক ও রাজপুরুষদিগের তুঙ্গশীর্ষ প্রাসাদ। এই পথ দক্ষিণদিকে যেখানে শেষ হইয়াছে সেই নদীরচিত কোণের উপর দুর্গাকৃতি রাজ-অট্টালিকা। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শশাঙ্কদেব গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া এই জলদুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন ; তারপর দুর্গের ছায়াতলে নগর গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভাগীরথী-তীরস্থ অগণ্য ঘাটের মধ্যে একটি ঘাট সর্বাপেক্ষা বৃহৎ—নাম হাতিঘাট। একশত রাজহস্তী এই ঘাটে একসঙ্গে স্নান করিতে পারে। শুধু তাই নয়, ইহাই নগরের বন্দর। ঘাটের সম্মুখে গভীর জলে বহু সমুদ্রগামী তরণী বাঁধা, তাহাদের ঊর্ধ্বোত্থিত গুণবৃক্ষ শরবনের ন্যায় জলপ্রান্ত কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছে। বণিক শ্রেষ্ঠীদের পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের ইহা একটি প্রধান কেন্দ্র। আবার সাধারণ নগরবাসীর ইহা হট্টও বটে। মৎস্য হইতে আরম্ভ করিয়া কদলী কুষ্মাণ্ড অলাবু ; মুড়ি চালভাজা পর্পট তিলখণ্ড ; ফুল মালা কর্পূর চন্দন— কোনও বস্তুরই এখানে অপ্রতুল নাই। অপরাহ্ণে বায়ুসেবনেচ্ছু নাগরিকেরা এখানে সমবেত হয় ; তখন বহুবিস্তীর্ণ ঘাটে তিল ফেলিবার ঠাঁই থাকে না। গান, পঞ্চালিকার নাচ, অহিতুণ্ডিকের সাপ খেলানো, মায়াবীর ইন্দ্রজাল ; সব মিলিয়া ঘাট গম্‌গম্‌ করিতে থাকে।

বজ্র যেদিন প্রাতঃকালে কর্ণসুবর্ণে আসিয়া উপনীত হইল সেদিন নবারুণ কিরণে নগর ঝলমল করিতেছিল। চারিদিকে নবজাগ্রত নগরের কর্ম-চাঞ্চল্য, গো-রথ অশ্বরথ চল্লরিকা ঝম্পানের ছুটাছুটি। দেব-দেউলে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতেছে। স্নানার্থীরা ঘাটের দিকে চলিয়াছে, পূজার্থীরা মন্দিরে যাইতেছে ; করণেরা তাম্বূলচর্বণ করিতে করিতে অধিকরণে চলিয়াছে। পথে পদচারীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক, দুই চারিটি নারীও দেখা যায়। পুরুষদের মাথায় উষ্ণীষ নাই, তৈলসিক্ত কেশ কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে। সেকালে বাঙ্গালীর চুলের আদর বড় বেশি ছিল ; পাছে কেশকলাপের শোভা ঢাকা পড়ে, তাই তাহারা মাথায় কোনও প্রকার আবরণ দিত না। কেবল যাহারা রাজপুরুষ বা সৈনিক তাহারা মাথায় পাগ পরিত।

বজ্র চারিদিক দেখিতে দেখিতে রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার মুখ শান্ত, উত্তেজনার কোনও চিহ্ন নাই ; মুখ দেখিয়া অনুমান করা যায় না যে তাহার মনের মধ্যে উত্তেজনার ঝড় বহিতেছে। সে পূর্বে কখনও নগর দেখে নাই ; গ্রামে থাকিতে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিত নগর কিরূপ। কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে তাহার কল্পনা বামন হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল—এই কর্ণসুবর্ণ নগর ! এই আমার পিতৃ-পিতামহের লীলাভূমি !

জন্মান্তরের প্রীতিসূত্রের ন্যায় কর্ণসুবর্ণ নগর তাহার নাড়িতে টান দিল, দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি বিপরীত-মুখী মনোবৃত্তি যেন নিভৃতে থাকিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল—বিম্ব দেখিয়া ভুলিও না, জলবিম্বের ভিতরে কিছু নাই, বুদ্বুদ ফাটিলে কিছুই থাকে না—সাবধান ! সতর্ক হও !

লক্ষ্যহীন মোহাক্রান্তভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র এক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অনুভব করিল তাহার উদর শূন্য। ভাণ্ডারে থরে থরে মিষ্টান্ন সাজানো রহিয়াছে—দধি, ঘনাবর্ত দুগ্ধ, মোয়া, খাঁড়, পিঠাপুলি। মিষ্টগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বহু রক্ত পীত বরলা আসিয়া জুটিয়াছে। নগ্নদেহ মোদক বসিয়া বৃহৎ কটাহে রসবড়া ভাজিতেছে।

বজ্র ময়রার দোকানে প্রবেশ করিল। কোমর হইতে কয়েকটি কড়ি ও ক্ষুদ্র ধাতুমুদ্রা বাহির

করিয়া বলিল—'আমার কাছে এই আছে। এতে যা খাবার হয় আমাকে দাও।'

ময়রা দেখিল বিপুলকায় আগন্তুক কানসোনার লোক নয়, বিদেশী। সে পুত্রকে ডাকিয়া ভিয়ানে বসাইল, নিজে উঠিয়া গিয়া চত্বরের উপর পিঁড়ি পাতিয়া বজ্রকে বসিতে দিল। তারপর তাহার দোকানে যত প্রকার মিষ্টান্ন ছিল একে একে পরিবেশন করিতে লাগিল। সেকালে বাংলা দেশে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য ছিল না ; বিশেষত সম্প্রতি বহির্বাণিজ্যে মন্দা পড়ায় দেশজাত সকল বস্তুই সুলভ হইয়াছিল। সোনারূপারই অভাব হইয়াছিল, অন্নবস্ত্রের অভাব কখনও হয় নাই।

ময়রা যত দিল বজ্র তত আহার করিল। আহার করিতে করিতে সে দেখিল একটি লোক দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। লোকটি তালপত্রের ন্যায় কৃশ কিন্তু সাজসজ্জার পারিপাট্য অতি অদ্ভুত। পরিধানে সূক্ষ্ম মল্লের ধৌতি ও উত্তরীয়, মাথায় ফুলের মালা জড়ানো। হাতের নখ দীর্ঘ ও ত্রিকোণ করিয়া কাটা, তদুপরি আলতার প্রলেপ। অধরও অলক্তরাগে রঞ্জিত, কানে শঙ্খের কর্ণফুল। বৃশ্চিকপুচ্ছের ন্যায় বক্র একজোড়া গোঁফ, চক্ষু দুটি গোল, তাহার উপর ভ্রূযুগল আকৃষ্ট ধনুর ন্যায় চক্রীকৃত।

বজ্র এরূপ বিচিত্র জীব কখনও দেখে নাই। সে জানিত না কর্ণসুবর্ণের রসিক ও বিলাসী নাগরিকেরা এইরূপ বেশভূষা করিয়া নাগরবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকেন। সেও কৌতূহলী হইয়া লোকটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ চলিবার পর লোকটি উঠিয়া আসিয়া বজ্রের পাশে বসিল এবং আরও কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিল। তাহার কাঁকড়াবিছার ন্যায় গোঁফ নড়িতে লাগিল। তারপর সে বিস্ময়-কৌতুকভরা মিহি সুরে হাসিয়া উঠিল। বলিল—'তুমি তো দেখছি একটি পিণ্ডবীর হে! দোকান প্রায় শেষ করে এনেছ, এবার কি ময়রাকে ধরে কামড় দেবে নাকি?'

বজ্র উত্তর দিল না, আপন মনে আহার করিতে লাগিল। লোকটি তাহার উরু ও বাহুর পেশী টিপিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—'হুঁ, একেবারে সাক্ষাৎ মধ্যম পাণ্ডব, যাকে বলে নরপুঙ্গব। তুমি তো কানসোনার লোক নয় বাপু। নাম কি? নিবাস কোথায়?'

বজ্র এবারও উত্তর দিল না। লোকটি তখন তাহার পঞ্জরে অঙ্গুলির একটা খোঁচা দিয়া বলিল—'আরে কথা কও না যে। তুমি বংগাল নাকি হে? বলি, কোন্ সুন্দরীবৃক্ষ থেকে নেমে এলে!'

ভাগীরথীর পূর্বপারে বংগাল দেশ। তথাকার ভাষার বিকৃতি লইয়া গৌড়ীয় নগরবিলাসীদের মধ্যে ব্যঙ্গ-পরিহাস চলিত।

বজ্র দেখিল, লোকটি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না। সে ডান হাতে আহার করিতে করিতে বাঁ হাত দিয়া লোকটির মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিল। পাটকাঠির মত হাতের হাড় বজ্রের মুঠির মধ্যে মট্ মট্ করিয়া উঠিল। লোকটি মিহি গলায় চিৎকার করিয়া উঠিল -'আরে আরে, কর কি! উহুহু—ছাড় ছাড়, হাত ভেঙ্গে গেলে কাব্য লিখব কি করে?'

বজ্র হাত ছাড়িল না, মুঠি একটু শিথিল করিল মাত্র। নির্লিপ্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'নাম কি?'

লোকটি দ্রুতকণ্ঠে বলিল—'নাম? আমার নাম বিম্বাধর কবি বিম্বাধর। এবার ছেড়ে দাও বাবা, বাড়ি যাই।'

বজ্র প্রশ্ন করিল—'কবি বিম্বাধর কাকে বলে?'

বিম্বাধর বলিল 'কবি বিম্বাধর বুঝলে না? তুমি দেখছি একেবারেই—না না, তুমি ভারি সজ্জন। তা—আমার নাম বিম্বাধর কিনা, তার ওপর আমি কবি, কাব্য লিখি—তাই লোকে আমাকে কবি বিম্বাধর বলে। বুঝলে?'

বজ্রের আহার সমাধা হইয়াছিল, সে ঘটির জল গলায় ঢালিয়া জল পান করিল। বলিল—'বুঝলাম না। কাব্য কী ?'

বিম্বাধর হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার ধনুসাকৃতি ভ্রূযুগল আরও গোল হইয়া গেল। শেষে সে বলিল—'কাব্য কাকে বলে জান না ! মেঘদূত পড়নি ? নৈষধ ? বল কি হে, তুমি যে অবাক করলে ! কাব্য—কাব্য—রসের কথা—শ্লোক—কশ্চিৎ কান্তা—শৃঙ্গার রস—'

কিন্তু কাব্য কী তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিকে বোঝানো সকলের কর্ম নয়, বিম্বাধর কবি হইয়াও তাহা বুঝাইতে পারিল না। বজ্রেরও বুঝিবার দুর্নিবার আগ্রহ ছিল না, সে বিম্বাধরের হাত ধরিয়া দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু হাসিয়া বলিল—'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আমি নতুন লোক, তুমি আমাকে কানসোনা দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবে।'

বিম্বাধর বড় ফাঁপরে পড়িল। সে স্বভাবত লঘুপ্রকৃতি ও রঙ্গপ্রিয় ; বজ্রকে মোদকালয়ে আহার করিতে দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল ভোজনপটু গ্রামীণটাকে লইয়া দু'দণ্ড রগড় করিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু রগড় করিতে গিয়া অবস্থা দাঁড়াইয়াছে বিপরীত, গ্রামীণটাই তাহাকে বানর-নাচ নাচাইতেছে। তাহার বজ্রমুষ্টি ছাড়াইয়া যে পলায়ন করিবে সে উপায় নাই, যেমন দৈত্যের মত চেহারা, জোরও তেমনি।

বিম্বাধর মনে মনে পলায়নের ফন্দি খুঁজিতেছে, এমন সময় রাস্তার দক্ষিণ দিক হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল। বজ্র সেইদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, একটি চতুর্দোলা আসিতেছে। চারিজন অসুরাকৃতি বাহক দোলা স্কন্ধে বহন করিয়া আনিতেছে। দোলার সম্মুখে পশ্চাতে কয়েকজন বংশীবাদক মিঠা সুরে বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। একটি দাসী সোনার থালায় পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া দোলার পাশে পাশে যাইতেছে।

চতুর্দোলা কাছে আসিতে লাগিল। চতুর্দোলার আসনে দুকূল-বস্ত্রের বেষ্টনীমধ্যে যিনি বসিয়া আছেন তাঁহাকে স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু অনেকখানি অনুমান করা যায় ; মনে হয় যেন শীত-প্রভাতে হিমাচ্ছন্ন সরোবরের মাঝখানে স্বর্ণকমল ফুটিয়া আছে। যে দাসীটি পাশে পাশে চলিয়াছে সে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া অন্তরালবর্তিনীর সহিত হাসিয়া কথা কহিতেছে। দাসীটি লোলযৌবনা, দেহের বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায়, কিন্তু সে রূপসী। তাহার নাম কুহু। কুহু শুধু রূপসী নয়, চটুলা ছলনাময়ী রতি-রস-চতুরা।

কিন্তু কুহুর কথা পরে হইবে।

চতুর্দোলা বজ্রের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সহসা তাহার আবরণ উন্মোচন হইল। যিনি এতক্ষণ অচ্ছাব তিরস্করিণীর অন্তরালে রহস্যময়ী হইয়া ছিলেন বজ্র তাহাকে মুখোমুখি দেখিতে পাইল। অত্যুগ্র আলোকে মানুষের যেমন চোখ ঝলসিয়া যায়, বজ্রেরও তেমনি চক্ষু ধাঁধিয়া গেল।

দোলার পর্দা দুই হাতে সরাইয়া রমণী তাহার দিকেই চাহিয়া আছেন। ওষ্ঠাধর ঈষন্মুক্ত, চক্ষুতারকা নিশ্চল, স্তনপট্ট অল্প স্খলিত, দেহভঙ্গিতে মদালসতার সহিত প্রগল্‌ভতা মিশিয়াছে। রমণী নবযুবতী নয়, প্রগাঢ়যৌবনা ; তন্বী নয়, পরিপূর্ণাঙ্গী ; গায়ের রঙ দুধে-আলতা, আলতার ভাগ কিছু বেশি। চক্ষু দুটি হরিণায়ত, কিন্তু দৃষ্টিতে তীব্রতা মাখানো ; অধর পক্ক-বিম্বফলের ন্যায় সুপুষ্ট ও গাঢ় রক্তবর্ণ, আবার নবপল্লবের ন্যায় কোমল। সব মিলিয়া মুখখানি অপূর্ব সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য ছাড়াও মুখে এমন কিছু আছে যাহা পুরুষের স্নায়ু-শোণিতে আগুন ধরাইয়া দেয়, বুকে উন্মাদনার সৃষ্টি করে।

নারী নয়, ললৎ-শিখা লালসার বহ্নি।

বজ্র চাহিয়া রহিল, দোলা তাহার সম্মুখ দিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। রমণী কিন্তু একদৃষ্টে

তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া দেখিতে দেখিতে তিনি অস্ফুটস্বরে দাসীকে কিছু বলিলেন ; অমনি দাসী ঘাড় ফিরাইয়া বজ্রের দিকে চাহিল।

দাসীর চোখে বিজলী খেলিয়া গেল ; সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। তারপর দেখিতে দেখিতে দোলা দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল। বাঁশির রেশও ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল।

কবি বিম্বাধর এতক্ষণ শিকলে বাঁধা পাখির ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল এবং বজ্রের মুঠি হইতে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। এখন বজ্র তাহার দিকে ফিরিতেই সে বলিয়া উঠিল, 'দেখলে তো ? কানসোনায় আর কিছু দেখবার নেই। এবার হাতটি ছেড়ে দাও, বাড়ি গিয়ে শ্লোক লিখি। মাথায় পদ্য এসেছে।'

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল— 'দোলায় যিনি গেলেন—উনি কে ?'

বিম্বাধর বলিল—'হায় হতভাগ্য, তাও জান না ! রানী—রানী, গৌড়ের রাজমহিষী দেবী শিখরিণী।'

রানী ! হাঁ, রানীর মত রূপ বটে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের মনে পড়িল তাহার মায়ের মুখ। না, এ রানী বয়সে তরুণী বটে, কিন্তু তাহার মায়ের মত সুন্দর নয়। রঙ্গনা রাজহংসী, আর শিখরিণী চক্রবাকী ; উভয়ের তুলনা হয় না।

উপরন্তু রানীর হাবভাব যেন নির্লজ্জতার সূচক ! কিন্তু কিছুই বলা যায় না, রানীদের পক্ষে এইরূপ হাবভাবই হয়তো স্বাভাবিক। বজ্র অনভিজ্ঞ গ্রামবাসী, নগরের রীতিনীতি আচার-আচরণ কী বুঝিবে ?

বজ্রের চিন্তায় বাধা দিয়া বিম্বাধর বলিল— 'ভ্রাতঃ চাতক, তুমি যে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলে। তা আমার হাতটি মোচন করে হতভম্ব হলেই পার। হাতে যে ঝিন্‌ঝিনি ধরে গেল।'

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'রানী কোথায় গেলেন ?'

বিম্বাধর বলিল—'মন্দিরে পূজা দিতে গেলেন। ঐ যে চতুষ্পথের ওপারে প্রকাণ্ড মন্দির—কামেশ্বর শিবের মন্দির—রানী ওখানে প্রায়ই পূজা দিতে যান। তা তুমিও যাও না, দেবমন্দিরে যেতে কারুর মানা নেই। যাও যাও, রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে।'

বিম্বাধরের বক্রোক্তি না বুঝিয়া বজ্র বলিল—'না, আমার অন্য কাজ আছে।'

বিম্বাধর আনন্দিত হইয়া বলিল—'বেশ বেশ। তাহলে আর দেরি করে কাজ নেই, বিলম্বে কার্যহানি। তুমি নিজের কাজে যাও, আমিও বাড়ি গিয়ে শ্লোকটা লিখে ফেলি। এবার হস্তটি উন্মোচন কর।'

বজ্র বলিল—'উন্মোচন করতে পারি, কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। আমি এখানে কিছু চিনি না, আমাকে একটি স্বর্ণকারের দোকান দেখিয়ে দিতে হবে।'

বিম্বাধর অমনি উৎকর্ণ হইল। ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বজ্রের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল—'স্বর্ণকারের দোকান ! সোনাদানা কিনবে নাকি ?'

বজ্র মৃদু হাসিয়া বলিল—'কিনব না। —দেখিয়ে দিতে পারবে ?'

বিম্বাধর বজ্রের বাহুতে তাগা-বাঁধা লক্ষ্য করিয়াছিল, সোৎসাহে বলিল—'পারব না ! সোনা বিক্রি করবে বুঝি ? এতক্ষণ বলনি কেন ? এস এস, এই যে কাছেই স্যাকরার বাড়ি—'

বজ্র বিম্বাধরের হাত ছাড়িয়া দিল। বিম্বাধরের পলায়ন-স্পৃহা আর ছিল না ; যেখানে সোনারূপার গন্ধ আছে সেখান হইতে কবি বিম্বাধরকে মারিয়া তাড়ানো যায় না। এতক্ষণ সে বজ্রকে কপর্দকহীন গ্রামীণ মনে করিয়াছিল বলিয়াই পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল, এখন জোঁকের মত তাহার গায়ে জুড়িয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
নাগর বৃত্ত

সকল বৃহৎ নরগোষ্ঠীতে জলৌকা-জাতীয় এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহারা কোনও কর্ম করে না, নিঃসাড়ে পরের রক্ত-শোষণ করিয়া উদরপূর্তি করে। কবি বিম্বাধর সেই শ্রেণীর লোক। সে রঙ্গ-রসিক ও বাক্‌পটু, ধনী ব্যক্তিদের অশ্লীল কবিতা ও গল্প শুনাইয়া কবিখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। চাটুকার্য ও বিদূষক-বৃত্তি ছিল তাহার জীবিকা। অর্থের জন্য কোনও নিকৃষ্ট কার্য করিতে সে পশ্চাৎপদ ছিল না।

বজ্রের মধ্যে শাঁস আছে বুঝিয়া বিম্বাধর পরম আগ্রহে তাহাকে স্বর্ণকারের গৃহে লইয়া চলিল। বেশি দূর যাইতে হইল না, ঐ পথেরই কয়েকখানা বাড়ি পরে এক স্বর্ণকারের গৃহ। বিম্বাধর বজ্রকে সেখানে উপস্থিত করিয়া স্বর্ণকারকে বলিল—'ওহে অক্রূর, এই নাও, এক বিদেশী ভদ্র তোমার সঙ্গে ব্যাপার করতে চান।'

অক্রূরদাস পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি, শান্ত মন্থর প্রকৃতি। সে প্রাতঃকালে নিজ কর্মকক্ষে বসিয়া দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, সোনায় সোহাগা দিয়া পিত্তলের নালিকা দ্বারা প্রদীপ শিখায় ফুঁ দিয়া সোনা গলাইতেছিল। বজ্র ও বিম্বাধরকে সে সমাদর করিয়া বসাইল।

বজ্র প্রগণ্ড হইতে প্রথমে শীলভদ্রের বস্ত্রবন্ধন মোচন করিল, তারপর অঙ্গদ খুলিয়া অক্রূরদাসকে দিল। বলিল— 'এই অঙ্গদ থেকে এক মাষা কেটে নিয়ে তার দাম দাও।'

অক্রূর অঙ্গদ লইয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিল। পাথরের মত ভারী সুন্দর গঠন দেখিয়া বিম্বাধরের জিহ্বা লালায়িত হইয়াছিল, সে সংহত স্বরে বলিল—'সোনা নাকি?'

অক্রূরদাস অঙ্গদ হইতে চক্ষু তুলিয়া বজ্রের পানে চাহিল, বলিল—'হ্যাঁ, সোনা।— এ অঙ্গদ আপনি কোথায় পেলেন?'

অক্রূরের প্রশ্নের মধ্যে বিপজ্জনক কণ্টক আছে অনুভব করিয়া বজ্র তাচ্ছিল্যভরে বলিল— 'উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তুমি সোনা কিনতে রাজী থাক তো বল, নচেৎ অন্যত্র চেষ্টা করি।'

অক্রূর বলিল—'রাজী আছি। আপনি যদি গোটা অঙ্গদটা বিক্রি করেন আমি কিনতে রাজী আছি।'

বজ্র বলিল—'না, কেবল এক মাষা সোনা বিক্রি করব।'

অক্রূর বলিল—'ভাল। এমন সুন্দর অঙ্গদ কাটতে কিন্তু মায়া হচ্ছে। ত্রিশ বছর আগে কানসোনাতে এক কারুকর ছিলেন, তাঁর হাতের কাজ আমি চিনি। এ অঙ্গদ তাঁরই রচনা। তিনি ছিলেন শশাঙ্কদেবের রাজ-কারুকর।'

বজ্র ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—'তা হবে। আমার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে এই অঙ্গদ লাভ করেছিলেন।'

'গোটা অঙ্গদ আপনি বিক্রি করবেন না?'

'না।'

অক্রূর তখন অতি সাবধানে এক মাষা সোনা কাটিয়া লইল, অঙ্গদের শিল্পশোভা ক্ষুণ্ণ হইল না। তারপর হিসাব কষিয়া সোনার মূল্য কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা, কিছু দ্রম্ম ও কপর্দক বজ্রকে দিল।

মূল্য পাইয়া বজ্র গাত্রোত্থান করিলে অক্রূর সবিনয়ে বলিল—'আবার যদি সোনা বিক্রি করেন আমার কাছে আসবেন, আমি উচিত মূল্য দেব। আর যদি গোটা অঙ্গদ বিক্রি করেন আমি বেশি মূল্য দেব।'

'ভাল।' বলিয়া বজ্র বাহির হইল। বিম্বাধর তাহার সঙ্গে চলিল।

দুইজনে রাজপথে নামিয়া একদিকে চলিল। বজ্র বিম্বাধরের দিকে সহসা কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'কৈ, তুমি কবিতা লিখতে যাবে না ?'

বিম্বাধর বলিল—'কবিতা ! হাঁ হাঁ, লিখতে হবে বটে। —তা তুমি এখন কোনদিকে যাবে ?'

বজ্র বলিল—'এবার একটা বাসস্থান খুঁজে নিতে হবে। কানসোনায় দু'চার দিন থাকব স্থির করেছি। কোথায় বাসস্থান পাওয়া যায় বলতে পার ?'

বিম্বাধর বজ্রের বাহুর সহিত বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া বলিল—'বন্ধু, যার গাঁটে কড়ি আছে তার আবার বাসস্থানের চিন্তা ! চল, তোমাকে ভাল বাসস্থানে নিয়ে যাব। পান ভোজন সব পাবে। ভাল কথা, তোমার নাম তো বললে না।'

একটু চিন্তা করিয়া বজ্র বলিল—'আমার নাম মধুমথন।'

বিম্বাধর বলিল—'বন্ধু মধুমথন, তোমার দেশ কোথায় ?'

বজ্র বলিল—'উত্তরে, মৌরী নদীর তীরে।'

'তুমি যে বংগাল নও তা তোমার কথা শুনেই বুঝেছি। —তা কি কাজে কানসোনায় এসেছ ?'

'কাজ কিছু নেই, ভ্রমণে বেরিয়েছি।'

'বেশ বেশ। ভ্রমণ-রমণের এই তো বয়স। চল, তোমাকে উপযুক্ত স্থানে নিয়ে যাই।'

উৎফুল্ল বিম্বাধর বজ্রকে লইয়া উত্তর দিকে চলিল।

এই সময় আবার বংশীরব শুনা গেল। রানী শিখরিণী পূজা দিয়া ফিরিতেছেন ; আন্দোলিকার পাশে দাসী কুহু রিক্তহস্তে যাইতেছে। বজ্রের কাছাকাছি আসিয়া আবার দোলার দুকূল-আচ্ছাদন উঠিয়া গেল ; রানী শিখরিণীর তপ্ত-তীব্র চক্ষু দুটি যুগ্মতীরের ন্যায় বজ্রকে বিদ্ধ করিল। বজ্র কিন্তু একবার চক্ষু তুলিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল, আর ওদিকে তাকাইল না।

দোলা দক্ষিণে রাজপুরীর দিকে চলিয়া গেল। বজ্র ও বিম্বাধর বিপরীত মুখে চলিল। তাহারা জানিতে পারিল না, দোলা কিছুদূর যাইবার পর রানী শিখরিণী কুহুকে চোখের ইশারা করিলেন ; কুহু অমনি দোলার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বজ্রের পিছু লইল। চাঁপা রঙের উত্তরীয়টি মাথার উপর টানিয়া একটু আড়-ঘোমটা দিয়া মিষ্ট-দুষ্ট হাসিতে হাসিতে সন্তর্পণে বজ্রের অনুসরণ করিল।

বিম্বাধর বজ্রকে লইয়া এপথ ওপথ ঘুরিয়া শেষে নগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে এক জনবিরল পাটকে উপস্থিত হইল। পথটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, গৃহগুলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহ। পথের শেষ প্রান্তে নগরপ্রাকারের কাছে একটি মদিরা-ভবন।

মদিরা-ভবনে দিনের পূর্বাহ্ণে গ্রাহকের ভিড় ছিল না, শৌণ্ডিক মেঝেয় বসিয়া পিঁড়ির উপর ছক কাটিয়া এক প্রতিবেশীর সহিত কড়ি চালিতেছিল। মদিরা-ভবনটি শুধু পানশালা নয়, অড়্ড খেলার আড্ডাও বটে, আবার বহিরাগত পথিকের চটি। সম্মুখের ঘরটি বড়, আশেপাশে কয়েকটি ছোট ছোট কুঠরী আছে।

শৌণ্ডিক লোকটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্কদেহ, বিরলদন্ত। বিম্বাধর ও বজ্র প্রবেশ করিলে সে স্বভাব-রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া চাহিল। বিম্বাধর বলিল—'বটেশ্বর, তোমার জন্য গ্রাহক এনেছি। ইনি কানসোনায় নূতন এসেছেন, কিছুদিন থাকবেন। তাই তোমার আড্ডায় নিয়ে এলাম।'

বটেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল, বজ্রকে আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বিম্বাধরের পানে চক্ষু ফিরাইল। বিম্বাধর একটু ঘাড় নাড়িল। তখন বটেশ্বর পানের ছোপ-ধরা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, জাঁতার ঘর্ঘর শব্দের মত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ঘষা-ঘষা গলায় বলিল— 'আসতে আজ্ঞা হোক। আমার ঘর আপনার ঘর, যতদিন ইচ্ছা থাকুন।'

বজ্র একটি রৌপ্যমুদ্রা বটেশ্বরের হাতে দিয়া বলিল—'এতে কতদিন চলবে ?'

সসম্ভ্রমে মুদ্রা কপালে ঠেকাইয়া বটেশ্বর বলিল—'এক মাস। স্বতন্ত্র ঘর পাবেন, তাছাড়া পান আহার শয়ন সেবা।'

বটেশ্বর বজ্রকে লইয়া গিয়া একটি প্রকোষ্ঠ দেখাইল। প্রকোষ্ঠটি গৃহের এক প্রান্তে, বাহিরে যাইবার স্বতন্ত্র দ্বার আছে। আকারে ক্ষুদ্র ও নিরাভরণ, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বজ্র কক্ষটি মনোনীত করিল। তখন বটেশ্বর ভৃত্য ডাকিয়া মেঝের উপর উত্তম শয্যা পাতিয়া দিল, জলের নূতন কলস ভরিয়া ঘরের এক কোণে রাখিল, দীপদণ্ডের শীর্ষে তৈলপূর্ণ প্রদীপ আনিয়া অন্য কোণে রাখিল। ব্যবস্থা দেখিয়া বজ্র প্রীত হইল।

বিম্বাধর বলিল—'ভাই মধুমথন, চিন্তা কোরো না, তুমি সুখে থাকবে। বটেশ্বর পাকা সহিআর, ওর বাপের নাম ঘটেশ্বর, ঠাকুর্দার নাম ষণ্ডেশ্বর—ওরা তিন পুরুষে আড্ডাধারী। তোমার কোনও অযত্ন হবে না, যখন যা চাইবে হাতের কাছে পাবে। এমন কি—' বলিয়া অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপিল।

বিম্বাধরের সরস ইঙ্গিত বজ্র বোধহয় বুঝিল না, সে বলিল—'ভাল।'

বিম্বাধর বলিল—'এখন তবে চললাম। কিন্তু আবার আসব। তুমি নূতন মানুষ, নগরের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে হবে তো।'

বিম্বাধর যে আবার আসিবে, তাহার এত সহৃদয়তা নিঃস্বার্থ নয়, তাহা বজ্র বুঝিয়াছিল, সে একটু হাসিল। তারপর বিম্বাধর গমনোদ্যত হইলে সে বলিল—'একটা কথা। কানসোনার দক্ষিণে গঙ্গার তীরে এক ব্রাহ্মণ থাকেন—নাম কোদণ্ড মিশ্র। তাঁকে চেন কি?'

বিম্বাধর বলিল—'বামুন? চালকলা? তার সঙ্গে তোমার কী প্রয়োজন?'

বজ্র বলিল—'প্রয়োজন নেই। পুরনো পরিচয় আছে।'

বিম্বাধর মাথা নাড়িল—'কোদণ্ড মিশ্র? কৈ না, কখনও নাম শুনি নি। বটেশ্বর, তুমি চেনো?'

বটেশ্বর বলিল—'না। ব্রাহ্মণ মহোদয়েরা আমার আড্ডায় পায়ের ধুলো দেন না, চিনব কি করে?'

অতঃপর বিম্বাধর আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া বিদায় হইল।

মদিরা-ভবনের বাহিরে একটি গাছের আড়ালে কুহু দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে দেখিল বিম্বাধর চলিয়া গেল, কিন্তু বজ্র বাহির হইল না। কুহু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু বজ্র আসিল না। তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিল। বজ্র কোথায় থাকে এইটুকুই আপাতত তাহার জানার প্রয়োজন ছিল।

বজ্রের নাগরিক জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। কর্মহীন অলস দিনগুলি একে একে কাটিতে লাগিল।

মদিরা-ভবনের পিছনে অনতিদূরে ময়ূরাক্ষী ও ময়ূরীর মিলিত স্রোত বহিয়া গিয়াছে, নদীর ধারে ধারে প্রশস্ত বাঁধ। দুই চারিটি ঘাটও আছে, কিন্তু ঘাটের কোনও শোভা নাই। গঙ্গার ঘাট ছাড়িয়া স্বল্পতোয়া নদীতে বড় কেহ স্নান করিতে আসে না।

বজ্র মাঝে মাঝে নির্জন বাঁধে গিয়া বসিত। মৌরীর খাত আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরে মিলাইয়া গিয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া থাকিত। সে বেতসগ্রাম ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু মৌরী নদী তাহাকে ত্যাগ করে নাই। বাঁধের উপর দিয়া সে নগরসীমা পার হইয়া ময়ূরাক্ষী ও মৌরীর সঙ্গমস্থলে যাইত, মৌরীর উপল-বিকীর্ণ তীরে হাঁটু গাড়িয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিত। মৌরীর জলের চিরপরিচিত স্বাদ মুখে বড় মিষ্টি লাগিত। গ্রামের জন্য হঠাৎ প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত।

কিন্তু তবু সে কর্ণসুবর্ণের মায়া কাটাইয়া বেতসগ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারিত না। প্রত্যহ তাহার মনে হইত, কেন এই নির্বান্ধব পুরীতে পড়িয়া আছি? পিতার সংবাদ পাইয়াছি, তিনি জীবিত নাই; তবে এখানে থাকিয়া লাভ কি? ফিরিয়া যাই, যেখানে মা আছেন, গুঞ্জা আছে সেই স্নেহের নীড়ে ফিরিয়া যাই।—কিন্তু তবু সে যাইতে পারিত না; কর্ণসুবর্ণ নগর অদৃশ্য মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিত।

কবি বিম্বাধর প্রথমে ঘন ঘন আসিত। বজ্রকে লইয়া সে রাজপুরী দেখাইল, নাটকের অভিনয় দেখাইল, বিদগ্ধ-স্ত্রীর নৃত্যগীত শুনাইল, নানাভাবে তাহাকে আমোদ-প্রমোদে আসক্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ক্রমে সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। বজ্রের ললিত-বনিতার প্রতি লোভ নাই, মদ্যপানে আসক্তি নাই, দ্যূতক্রীড়ায় অনুরাগ নাই। এরূপ অরসিক অসামাজিক মানুষের পিছনে কতদিন ঘুরিয়া বেড়ানো যায়! বিম্বাধর আসা-যাওয়া কমাইয়া দিল! কিন্তু একেবারে বন্ধ করিতে পারিল না। বজ্রের বাহুতে পাথরের মত ভারী অঙ্গদটির কথা সে ভুলিতে পারে নাই।

বটেশ্বরের মদিরা-ভবনে বজ্রের অশন বসনের কোনও অসুবিধা ছিল না। অপরাহ্ণে মদিরা-ভবনে যখন জনসমাগম হইত, মদ্যপায়ীরা সুরাভাণ্ডসহ ভর্জিত পর্পট ও ইল্লীশ মৎস্য লইয়া বসিত, দ্যূত-ব্যসনীরা হলহল্ল করিয়া কড়ি চালিত ও বিতণ্ডা করিত, তখন বজ্র নিজ প্রকোষ্ঠের দ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। কখনও পথে পথান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত, কদাচ প্রাকারে উঠিয়া ইতস্তত বিচরণ করিত। প্রাকারে রক্ষী নাই, সংস্কারের অভাবে স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কিছু দেখে না, নগর শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নগর রক্ষার কথা কেহ চিন্তা করে না। সর্বত্র অবহেলার চিহ্ন।

বজ্র দুই একবার রাজপুরীর দিকেও গিয়াছিল। প্রাকারবেষ্টিত বিশাল পুরী; তোরণদ্বারে দুই চারিজন প্রহরী আছে বটে কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে রহস্যালাপ করিতেছে, যে-সকল নরনারী তোরণপথে যাতায়াত করিতেছে তাহাদের সহিত রঙ্গ পরিহাস করিতেছে। বজ্র পথে দাঁড়াইয়া ভীমকান্ত দুর্গপ্রাসাদ নিরীক্ষণ করিত আর ভাবিত—এই গড় আমার পিতামহ গড়িয়াছিলেন—আমার পিতা এই গড় রক্ষা করিতে প্রাণ দিয়াছিলেন! নিশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিয়া আসিত।

অধিকাংশ দিন বজ্র হাতিঘাটে গিয়া বসিত। সায়ংকালে হাতিঘাট বিচিত্র জনসমাবেশে মুখর ও বর্ণাঢ্য হইয়া উঠিত। পুরুষ নারী বালক বৃদ্ধ; কেহ স্নান করিতে আসিয়াছে, কেহ বায়ু সেবনের জন্য। কদাচিৎ রাজার হাতি স্নানের জন্য ঘাটে আনীত হইত। হাতিরা গভীর জলে জলক্রীড়া করিত, শুঁড়ে জল ভরিয়া পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইত।

নানা লোকের নানা কথা বজ্রের কানে আসিত। বেশির ভাগ জল্পনা ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া। গৌড়ের সামুদ্রিক বাণিজ্য রসাতলে যাইতেছে, কেহ আর পণ্য লইয়া সমুদ্রে যাইতে সাহস করে না। রাজা ও রানী সম্বন্ধে কেহ কেহ শ্লেষপূর্ণ বক্রোক্তি করিত। বজ্র এই সব কথা শুনিত এবং দেশের অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিবার চেষ্টা করিত।

ঘাটে বাঁধা সমুদ্রতরীগুলিও বজ্র লক্ষ্য করিত। দিনের পর দিন বিপুলকায় বহিত্রগুলি ঘাটে পড়িয়া আছে; মাঝি-মাল্লা নাই, গুণবৃক্ষে পাল নাই। উত্তর হইতে দুই চারিটি বাণিজ্যপোত আসে বটে কিন্তু তাহারা আবার উত্তরে ফিরিয়া যায়, সমুদ্রের দিকে যায় না।

এইভাবে ঘাটে বসিয়া বজ্রের সন্ধ্যা কাটিয়া যাইত। অন্ধকার নামিয়া আসিলে ঘাটের জনসংঘ ছায়াবাজির ন্যায় মিলাইয়া যাইত। বজ্র শূন্য ঘাট হইতে ফিরিয়া চলিত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
মায়াজাল

নগর পত্তনের ঘাটে ঘাটে পরিভ্রমণ কালে বজ্র কুহুকে কয়েকবার দেখিয়াছিল। কুহুকে সে রানীর দাসী বলিয়া চিনিত না ; কারণ কুহু যখন রানীর দোলার সহিত যাইতেছিল তখন বজ্রের দৃষ্টি তাহার উপর পড়ে নাই, রানীর উগ্রোজ্জ্বল রূপশিখা তাহার চক্ষু আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। কুহুকে সে ভাল করিয়া দেখিল একদিন দ্বিপ্রহরে। বজ্র মৌরীর এক ঘাটের পাশে বাঁধের উপর বসিয়া ছিল, ঘাটে আর কেহ ছিল না। সহসা একটি কিশলয়-শ্যামাঙ্গী যুবতী নৃত্যচটুল ছন্দে নূপুর বাজাইয়া নদীর কিনারায় নামিয়া আসিল এবং বজ্রের দিকে একটি ক্ষিপ্র গোপন কটাক্ষপাত করিয়া বেশবাস বর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে উত্তরীয়টি খসিয়া সোপান পটের উপর পড়িল, তারপর পড়িল কটির ধটি ; তারপর যুবতী যখন কাঁচুলির গ্রন্থি খুলিতে উদ্যত হইল তখন বজ্র উঠিয়া রণে ভঙ্গ দিল। নগর-বিলাসিনীদের নিরংশুকা হইয়া স্নান করাই হয়তো বিধি, কিন্তু বজ্র তাহা বসিয়া দেখিতে লজ্জা বোধ করিল।

ইহার পর আরও কয়েকবার কুহুর সহিত বজ্রের সাক্ষাৎ হইল। কখনও নির্জন প্রাকারের উপর, কখনও জনবহুল রাজপথে। কুহু স্মিত-ভঙ্গুর নেত্রপাতে বজ্রকে নিরীক্ষণ করিত, চোখের সঙ্কেতে তাহাকে ডাকিত। কথা বলিত না, রিমঝিম মঞ্জীর বাজাইয়া চলিয়া যাইত, যাইতে যাইতে পিছু ফিরিয়া আবার চোখের ইঙ্গিতে ডাকিত। কিন্তু বজ্র নাগরিক নয়, সে হয়তো কুহুর চোখের আহ্বান বুঝিতে পারিত না, কিম্বা বুঝিতে পারিলেও আহ্বান উপেক্ষা করিত।

একদিন বৈকালে কালবৈশাখীর প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইয়া যাইবার পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বজ্র তাহার অভ্যস্থ স্থানে না বসিয়া একটি গোলাকৃতি উচ্চ চত্বরের উপর গিয়া বসিল। সমুদ্রগামী বহিত্রগুলি যেখানে ভিড় করিয়া গুণবৃক্ষের অরণ্য রচনা করিয়াছে সেখানে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা যায় ; ঝড়ের দাপটে দুই চারিটি তরণীর আড়কাঠ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, রজ্জু ছিঁড়িয়া জট পাকাইয়া গিয়াছে। একটি তরণী কাত হইয়া পড়িয়া অন্য তরণীর গুণবৃক্ষের সহিত আপন গুণবৃক্ষ আশ্লিষ্ট করিয়া বিপজ্জনক সংস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

এতদিন নৌকাগুলিতে নাবিক বা দিশারু কাহাকেও দেখা যাইত না। আজ দেখা গেল কয়েকটি নৌকার পট্টপত্তনের উপর নাবিকেরা কাজ করিতেছে, সম্ভবত শোধনসংস্কারের চেষ্টা করিতেছে। বজ্র আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিল।

বজ্র যে চত্বরে উপবিষ্ট ছিল সেই চত্বরে আর একজন লোক বসিয়া ব্যাকুল চক্ষে নৌকাগুলির পানে চাহিয়া আছে, বজ্র তাহা লক্ষ্য করে নাই। লোকটির বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর ; দেহ এককালে স্থূল ছিল, এখন শীর্ণ ও লোলচর্ম হইয়া গিয়াছে। মুখে আভিজাত্যের চিহ্ন বর্তমান, কিন্তু বেশভূষার পরিপাট্য নাই ; স্কন্ধের উত্তরীয়টি মলিন। দেখিলে মনে হয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কিন্তু সম্প্রতি দুর্দশায় পড়িয়াছে।

লোকটি সহসা 'হায় হায়' করিয়া উঠিল।

বজ্র চমকিয়া তাহার দিকে ফিরিতেই লোকটি যেন চেতনা ফিরিয়া পাইল এবং অত্যন্ত লজ্জিত কণ্ঠে বলিল— 'ক্ষমা করুন, আমি আত্মসংবরণ করতে পারি নি।'

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'কি হয়েছে ?'

লোকটি কাতর স্বরে বলিল— 'এ বছরও আমার বুহিত্ত সমুদ্রে যেতে পারবে না। বর্ষা এসে পড়ল, আর কবে যাবে ?'

বজ্র বুঝিল, এ ব্যক্তি কোনও সমুদ্রগামী তরণীর স্বামী। সে তাহার কাছে আসিয়া বসিল।

বলিল— 'আপনার নৌকা সমুদ্রে যেতে পারবে না কেন ?'

লোকটি বোধহয় নিজের দুঃখের কথা কাহাকেও বলিবার সুযোগ পায় না, সে অতিশয় আপ্যায়িত হইয়া বলিল— 'আপনি দেখছি মরমী সৎপুরুষ। কানসোনায় কি নূতন এসেছেন ?'

'হাঁ। আপনি বুঝি নৌ-বণিক ?'

'হাঁ। আমার নাম বরুণ দত্ত। কিন্তু কানসোনার লোক আমাকে চারু দত্ত বলে ডাকে।' বলিয়া বরুণ দত্ত করুণ হাসিল।

বজ্র নাটকীয় শ্লেষ বুঝিল না, বলিল—'আপনার ডিঙা আছে ?'

বরুণ দত্ত অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল— 'ঐ যে ঘাটের বাঁয়ে দুটি হংসমুখী ডিঙা, ও দুটি আমার ডিঙা।'

বজ্র আবার প্রশ্ন করিল— 'কিন্তু ওদের সমুদ্রে যেতে বাধা কি ?'

তখন বরুণ দত্ত তাহার দুঃখের কাহিনী বজ্রকে শুনাইল।

বরুণ দত্ত পুরুষানুক্রমে সমুদ্রগামী ব্যবসায়ী, পূর্বকালে তাহাদের অনেকগুলি বহিত্র ছিল, গৌড়বঙ্গের পণ্য লইয়া বহুদূর পর্যন্ত যাত্রা করিত। দক্ষিণে সিংহল অতিক্রম করিয়া ভরুকচ্ছ যাইত, কখনও পারসীকদের দেশে যাইত। পূর্বদিকে মলয় যবদ্বীপ সুবর্ণভূমিতে যাইত। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইভাবে চলিয়াছে, গৌড়বঙ্গ পুণ্ড্রমগধের পণ্যসম্ভার দেশ দেশান্তরে সঞ্চারিত হইয়া স্বর্ণ রৌপ্যের আকারে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

প্রায় বিশ বছর পূর্বে হঠাৎ এক নিদারুণ বাধা উপস্থিত হইল, সমুদ্রে হিংস্রিকা দেখা দিল। এতকাল সমুদ্রে জলদস্যুর উৎপাত ছিল না, সকল দেশের বাণিজ্য-তরী স্বচ্ছন্দে সাগরবক্ষে বিচরণ করিত ; এখন বনায়ু দেশের দস্যুরা সমুদ্রের পথ বিপদ-সঙ্কুল করিয়া তুলিল। নিরীহ নিরস্ত্র পণ্যবাহী জাহাজ লুঠ করিয়া ডুবাইয়া ছারখার করিয়া দিতে লাগিল। তাহাদের দৌরাত্ম্যে গৌড়বঙ্গের সাগরসম্ভবা লক্ষ্মী আবার সাগরে ডুবিতে বসিলেন।

গত বিশ বছরে গৌড়ের নৌ-বাণিজ্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণে সিংহল ও পূর্বে সুবর্ণভূমি পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহাও বুঝি আর থাকে না। আরব জলদস্যুদের দুর্নিবার অভিযান বঙ্গোপসাগরের জল তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে।

বরুণ দত্তের সপ্তদশ ডিঙা ছিল, এখন মাত্র দুইটি অবশিষ্ট আছে, বাকিগুলি ভরাডুবি হইয়াছে। নাবিকেরা সমুদ্রে যাইতে চায় না ; নৃশংস জলদস্যুর হাতে প্রাণ দিবার জন্য কে সমুদ্রে যাইবে ? বণিকেরা বেতন দিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে চায়, কিন্তু বাঙ্গালী সৈন্য সমুদ্রে যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত নয়,* বেতনের লোভেও তাহারা নৌ-যুদ্ধে যাইতে অসম্মত। রাজশক্তি নিশ্চেষ্ট উদাসীন, রাজা থাকিয়াও নাই। বাংলার বন্দরে বন্দরে বাঙ্গালীর নৌ-বাহিনী পঙ্কবদ্ধ হস্তিযূথের ন্যায় নিশ্চল ; নদীর মোহানা পার হইয়া সাগরের নীল জলে ভাসিবার সাহস কাহারও নাই।

বরুণ দত্ত গত দুই বৎসর তাহার তরণী দুটিকে সমুদ্রে পাঠাইতে পারে নাই। এবার কয়েকজন বণিক মিলিয়া কিছু নাবিক ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল, স্থির করিয়াছিল তাহাদের তরণীগুলিকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া একসঙ্গে সমুদ্রে পাঠাইবে ; তাহাতে জলদস্যুর হাত হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা আছে। বরুণ দত্ত অতি কষ্টে কয়েকটি যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়াছিল ; কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড়ে তাহার তরণী দুটি আহত হইয়াছে, শোধনসংস্কার করিতে সময় লাগিবে। এদিকে বর্ষা আসন্ন, অন্য তরণীগুলি অপেক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং এবারও বরুণ দত্তের নৌকা সমুদ্রে যাইতে পারিবে না।

* নদীতে জলযুদ্ধ করিতে নৌ-সাধনোদ্যত বাঙ্গালী পটু ছিল, কালিদাসের রঘুবংশে (৪/৩৬) তাহার প্রমাণ আছে।

বরুণ দত্ত যখন তাহার কাহিনী শেষ করিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া আকাশে তারা ফুটিয়াছে। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বরুণ দত্ত বলিল— 'আমার মন্দ দশা যাচ্ছে। ধন সম্পত্তি প্রায় সবই গিয়েছে ; শেষ পর্যন্ত বোধহয় কিছুই থাকবে না।'

বরুণ দত্ত নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিল তাহা যে সমগ্র দেশের পক্ষে সত্য তাহা সে জানিত না।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল— 'অন্য নৌকাগুলি কবে যাত্রা করবে ?'

বরুণ দত্ত বলিল— 'পরশু উষাকালে। মঙ্গলের ঊষা বুধে পা— সেদিন ত্রয়োদশী তিথিও আছে।'

'এই সময়ের মধ্যে আপনার ডিঙা প্রস্তুত হবে না ?'

'হয়তো হতে পারে। কিন্তু আর এক বিপদ ঘটেছে। যে-সব যোদ্ধা নৌকায় যেতে সম্মত হয়েছিল তারা এখন পশ্চাৎপদ হয়েছে। তারা বলছে, ভাঙা নৌকা, বর্ষাকাল এসে পড়েছে— এখন তারা যাবে না। এ বিপদ কেবল আমার নয়, অন্য নৌকায় যে-সব যোদ্ধা যাচ্ছিল তারাও গণ্ডগোল করছে।'

অতঃপর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি গাঢ় হইতেছে দেখিয়া বজ্র উঠিল। হতাশ বরুণ দত্ত ঘাটেই বসিয়া রহিল।

রাত্রে কর্ণসুবর্ণের পথে আলোক নাই, কদাচিৎ কোনও গৃহস্থের মুক্ত দ্বার বা গবাক্ষপথে একটু আলোর প্রভা আসিয়া রাজপথে পড়িয়াছে। রাত্রে কোনও নাগরিককে কোথাও যাইতে হইলে উল্কা জ্বালিয়া পথ চলিতে হয়। বজ্র নক্ষত্রের আলোকে অতি যত্নে পথ চিনিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া আসিল।

বটেশ্বরের মদিরাগৃহে অতিথির ভিড় কমিয়াছে, মাত্র দুই চারিজন ঝুনা খেলোয়াড় প্রদীপের মিটিমিটি আলোতে অক্ষবাট ঘিরিয়া বসিয়া খেলিতেছে এবং ভর্জিত সহযোগে মদ্যপান করিতেছে। আলো বেশি নয়, ঘরের কোণে কোণে ছায়া জমিয়াছে, কিন্তু সেজন্য কাহারও অসুবিধা নাই ; এইরূপ আলোতেই তাহারা অভ্যস্ত।

ঘরের একটি কোণ হইতে নিম্নস্বর বাক্যালাপের গুঞ্জন আসিতেছিল, বজ্র ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহা বন্ধ হইল। বজ্র নিজ প্রকোষ্ঠের দিকে যাইতে যাইতে একবার সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল কোণের ছায়ান্ধকারে তিনজন লোক বসিয়া আছে, যেন ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া কোনও গুপ্তকথার আলোচনা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন অপরিচিত, বাকি দুইজন বটেশ্বর ও বিম্বাধর। তিনজনেই বজ্রকে দেখিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহাদের নিষ্পলক দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যে বজ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তিনজনের মধ্যে বিম্বাধরই প্রথম আত্মসংবরণ করিল ; ত্বরিতে উঠিয়া আসিয়া কৌতুকের ভঙ্গিতে বলিল— 'কি বন্ধু মধুমথন, তুমি যে দেখি নিশাচর হয়ে উঠলে ! কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

বজ্র বলিল— 'হাতিঘাটে বসেছিলাম।'

'ভাল ভাল। তা এস না, দু' পাত্র মধু পান করা যাক। বটেশ্বর অনুযোগ করছিল তুমি কিছুই পান কর না। এতে যে ওর মদিরা-ভবনের নিন্দা হবে।'

'আমার পক্ষে ভোজনই যথেষ্ট।'

'তা কি হয় ? মধুপান না করলে নাগর হওয়া যায় না। এস এস।'

'না, আজ নয়।'

বিম্বাধর একবার বটেশ্বর ও অপরিচিত ব্যক্তির সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিল, তারপর বলিল—

'তবে থাক। কাল কিন্তু আমি আবার আসব। একটু আসব-সেবা করে একসঙ্গে ভ্রমণে বাহির হব। কেমন?'

বজ্র কিছু বলিল না। বিম্বাধর প্রস্থান করিলে সেও নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। বটেশ্বর ও অপরিচিত ব্যক্তি তখন আবার নিম্নস্বরে আলাপ আরম্ভ করিল। তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় তাহারা বজ্র সম্বন্ধেই গূঢ় আলোচনা করিতেছে।

দুই দণ্ড মধ্যে বজ্র আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয়ন করিল। ক্রমে বটেশ্বরের মদিরাগৃহ নিঃশব্দ হইল, অতিথিরা প্রস্থান করিয়াছে। বজ্রের একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছে এমন সময় দ্বারে খুট্‌খুট্ শব্দ শুনিয়া তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, সে চকিতে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ শব্দ নাই। বজ্র উৎকর্ণ হইয়া রহিল। তারপর আবার বাহিরের দিকের দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল। যে দ্বার দিয়া একেবারে পথে পড়া যায় সেই দ্বারে কেহ টোকা দিতেছে।

ঘরের কোণে দীপ স্তিমিত হইয়াছিল। বজ্র উঠিয়া দীপ উস্কাইয়া দিল, তারপর সন্তর্পণে দ্বারের হুড়ুক্ক খুলিল।

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে একটি যুবতী। রাত্রির মতই গাঢ় নীল তার বসন; এক হস্তে প্রদীপ, অন্য হস্তে অঞ্চল দিয়া প্রদীপের শিখাটিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। প্রদীপের নিরুদ্ধ প্রভা যুবতীর বক্ষে কণ্ঠে পড়িয়াছে, মুখের নিম্নার্ধ আলোকিত করিয়াছে। বাহিরে ছায়া, ভিতরে আলো।

বজ্র কুহুকে দেখিয়াই চিনিয়াছিল, সে ক্ষণকাল বিস্ময়-বিমূঢ় রহিল। সেই ফাঁকে কুহু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বজ্র চমকিয়া বলিয়া উঠিল— 'এ কি! কে আপনি?'

কুহু মাথার গুণ্ঠন সরাইয়া বিলোল চক্ষে বজ্রের পানে চাহিল, ওষ্ঠাধর মুকুলিত করিয়া অধরে অঙ্গুলি রাখিল। তারপর ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল— 'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

বজ্র দৃঢ়ভাবে নিজেকে আত্মস্থ করিল, সাবধানে বলিল— 'বোধহয় দু' একবার দেখেছি। আপনি কে তা জানি না।'

কুহু হাসিল। নিঃশব্দ হাসির তরল তরঙ্গে তাহার সমস্ত দেহ যেন হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। সে কুহক-কলিত স্বরে বলিল— 'আমার নাম কুহু। কিন্তু আমাকে অত সম্মান করে কথা বলবেন না। আমি সামান্যা নারী।'

কুহু প্রদীপটি মাটিতে নামাইয়া রাখিল, বজ্রের কাছে আসিয়া প্রগল্‌ভ হাসিয়া বলিল— 'আমার পরিচয় নিলেন, কৈ নিজের পরিচয় তো দিলেন না।'

বজ্র এক পা পিছু হটিয়া বলিল— 'আমার নাম—মধুমথন। কর্ণসুবর্ণে নূতন এসেছি।'

কুহু ওষ্ঠাধর বিভক্ত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চোখে চাহিয়া রহিল, অর্ধস্ফুট স্বরে যেন নিজ মনেই বলিল— 'মধুমথন— কি মিষ্টি নাম। আপনি যে নগরে নূতন এসেছেন তা অনেক আগেই বুঝেছি। নগরে যারা নাগর আছে আপনি তাদের মত নন।'

কুহু পরিতৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল। এদিক ওদিক চাহিয়া ঘরের কোণে জলের কুম্ভ দেখিয়া সেইদিকে গেল, ঘটিতে জল ঢালিয়া জল পান করিল। তারপর বজ্রের শয্যার এক পাশে গিয়া বসিল। কোনও সঙ্কোচ নাই, এ যেন তাহার নিজেরই ঘর।

বজ্র নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিল। গভীর রাত্রে নিভৃত শয়নকক্ষে এই প্রগল্‌ভা অভিসারিকার আকস্মিক অভিযান, এরূপ সংস্থা তাহার কল্পনাতীত। যুবতীর অভিপ্রায় সম্বন্ধেও বিশেষ সংশয়ের অবকাশ নাই। বজ্রের কর্ণদ্বয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বুকের রক্ত তোলপাড় করিতে

লাগিল।

সে সহসা বলিয়া উঠিল— 'আমার কাছে কি চাও ?' তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ ঘরের মধ্যে উচ্চ শুনাইল।

কুহু অমনি ঠোঁটের উপর অঙ্গুলি রাখিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিল, চাপা গলায় বলিল— 'ছি, ছি, অত জোর গলায় কি রহস্যালাপ করতে আছে ? এখনি কে শুনতে পাবে। আসুন, কাছে এসে বসুন।' বলিয়া নিজের পাশে শয্যা নির্দেশ করিল।

বজ্র একটু ইতস্তত করিয়া শয্যার অন্য প্রান্তে গিয়া বসিল। কুহু তাহা দেখিয়া মিষ্ট-দুষ্ট হাসিল, বজ্রের দিকে সরিয়া আসিয়া ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলিল— 'আমি কী চাই তা কি এখনও বুঝতে পারেন নি ?'

বজ্র কিছুক্ষণ বুকে ঘাড় গুঁজিয়া রহিল, তারপর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল— 'নগরে নাগরের অভাব নেই।'

কুহু বজ্রের আরও কাছে সরিয়া আসিল, চক্ষু দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া বলিল— 'নগরে কুকুরেরও অভাব নেই, কিন্তু বনের বাঘ কটা আছে ? আপনি আমার মধু-নাগর। আমার লজ্জা নেই। আপনি আমার প্রতি সদয় হোন।'

বজ্র পূর্ববৎ বুকে ঘাড় গুঁজিয়া বলিল—'না।'

কুহুর মুখ একটু মলিন হইল। সে ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল—'আমাকে কি আপনার ভাল লাগে না ?'

বজ্র চকিতে একবার চক্ষু তুলিয়া আবার চক্ষু নামাইল, কথা কহিল না। কুহুর মুখে তখন আবার হাসি ফুটিল। বজ্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল ; সে অঙ্গুলি দিয়া বজ্রের বাহুর উপর মৃদু স্পর্শে হাত বুলাইয়া স্নেহ-বিগলিত স্বরে বলিল— 'বুঝেছি। তুমি বড় কাঁচা, এখনও মনে রঙ ধরেনি— তোমার বয়স কত ?'

বজ্রের মনের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে উৎফুল্ল মুখ তুলিল। নগরে আসিয়া অবধি সে যে বস্তুটির জন্য মনে মনে বুভুক্ষু হইয়া উঠিয়াছিল তাহা রমণীর স্নেহস্পর্শ : এতক্ষণে তাহাই সে কুহুর কণ্ঠে শুনিতে পাইল। সে এক মুখ হাসিয়া বলিল— 'আমার বয়স কুড়ি।'

কুহু বলিল— 'আমার উনিশ। কিন্তু তবু আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক কিছু শেখাতে পারি।'

হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিটি কিন্তু নৈরাশ্য-বিদ্ধ।

'আজ আমি ফিরে চললাম। কিন্তু আবার আসব।' বলিয়া কুহু সসঙ্কেত অঙ্গুলি তুলিল।

বজ্রও উঠিল। কুহু দ্বারের কাছে গিয়া বাহিরে উঁকি মারিল, তারপর উদ্বিগ্নমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল— 'নগর নিশুতি, পথ বড় নির্জন। আমার ভয় করছে।'

'কিসের ভয় ?'

'দুষ্ট লোকের ভয়। তুমি আমাকে ঘরে পৌঁছে দেবে ?'

'কোথায় তোমার ঘর ?'

'অনেক দূরে, নগরের দক্ষিণে।'

বজ্র দ্বিধায় পড়িল, ইতস্তত করিয়া বলিল— 'তুমি—তোমার স্বামী—'

কুহু ফিক করিয়া হাসিল— 'তোমার কি ভয় করছে নাকি ?'

'না। চল।'

কুহু সানন্দে বজ্রের হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে লইয়া চলিল। বজ্র বলিল— 'পিদিম নিলে না ?'

'না, আমি অন্ধকারে পথ চিনে যেতে পারব।'

দুইজনে বাহির হইল। মসীবর্ণ রাত্রি, কেবল স্পর্শানুভূতির দ্বারা সঙ্গ পাওয়া যায়। কুহু বজ্রের হাত ধরিয়া রহিল ; ক্রমে তাহার বাহু বজ্রের সহিত জড়াইয়া গেল। বজ্র আপত্তি করিল না।

পথ চলিতে চলিতে দুই চারিটি কথা হইল।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল— 'তুমি রাত্রে পথে পথে ঘুরে বেড়াও, তোমার স্বামী কিছু বলে না ?'

কুহু বলিল—'আমার স্বামী নেই।'

অনেকক্ষণ কথা হইল না। পথ দীর্ঘ, উপরন্তু কুহু যেন ইচ্ছা করিয়াই মন্থর পদে হাঁটিতেছে।

এক সময় কুহু সহসা প্রশ্ন করিল— 'তোমার ঘরে কে কে আছে ?'

'মা আছেন।'

'আর—'

বজ্র উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কুহু মৃদুকণ্ঠে হাসিল। বলিল— 'থাক। ও সব জেনে আমার লাভ কি ?'

অবশেষে তাহারা নগরের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছিল। রাজপ্রাসাদের সম্মুখ দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই পথে আসিয়া কুহু প্রাসাদ-প্রাকারের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। রুদ্ধ তোরণদ্বার পিছনে রাখিয়া আরও দক্ষিণে চলিল।

বজ্র বলিল—'এ কি ! এ যে রাজপ্রাসাদ !'

কুহু অন্ধকারে মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল—'হ্যাঁ।'

প্রাকারের গায়ে একটি ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার ছিল। কুহু তাহাতে মৃদু করাঘাত করিল, বজ্রকে হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'তুমি ভিতরে আসবে না ?'

বজ্র বলিল—'তুমি কে ?'

কুহু বলিল— 'আমি রাজপুরীর দাসী, অবরোধেই থাকি। আমার আলাদা ঘর আছে। একবার আসবে আমার ঘরে ?'

বজ্র শক্ত হইয়া বলিল—'না।'

ইতিমধ্যে গুপ্তদ্বার খুলিয়াছিল। কুহু বজ্রের হাত ছাড়িয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া লইল, কানে কানে বলিল—'তুমি কেমন মধুনাগর ? এত মিষ্টি আবার এত শক্ত !—বেশ, আজ থাক। কাল আমি আবার যাব— তুমি ঘরে থেকো।'

বজ্রকে ছাড়িয়া দিয়া কুহু অন্ধকার গুপ্তদ্বার পথে নিঃশব্দে অদৃশ্য হইয়া গেল। গুপ্তদ্বার আবার বন্ধ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ
অন্তঃপুরে

গুপ্তদ্বার যে-রমণী ভিতর হইতে খুলিয়া দিয়াছিল সে কুহুর অনুচরী। বিপুল রাজসংসারে বহু পর্যায়ভেদ ; রানীর একদল দাসী আছে, সেই দাসীদের আবার দাসী আছে, তস্য দাসী আছে। কুহু পুরী হইতে বাহির হইবার সময় নিজ অনুচরীকে গুপ্তদ্বারে বসাইয়া গিয়াছে। কখন ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই, বেশি রাত হইলে তোরণদ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। অভিসারিকার গতিবিধি অলক্ষ্যে হওয়াই বিধেয়। তাই সতর্কতা।

পুরুভূমিতে প্রবেশ করিয়া কুহু অনুচরীকে বিদায় দিল ; তারপর ক্ষণেক কান পাতিয়া শুনিল। রাজপুরী নিদ্রামগ্ন, কেবল একটি ভবন হইতে মৃদঙ্গ-মঞ্জীরার অস্ফুট নিক্কণ আসিতেছে— ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি। বিনিদ্র রাজ-লম্পটের নৈশ নর্ম-বিলাস এখনও চলিতেছে।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কুহু দ্রুতপদে চলিল। বিশাল অন্তঃপুরে কক্ষের পর কক্ষ, অলিন্দের পর অলিন্দ ; কোথাও বা পুরীর এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাইবার গোপন সুড়ঙ্গ। নিস্তব্ধ পুরী অন্ধকার, কদাচিৎ একটি দুটি দীপ জ্বলিতেছে। এই গোলকধাঁধায় দিবাকালেও দিগ্‌ভ্রম হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু কুহু অভ্রান্তভাবে পথ চিনিয়া উদ্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে চলিল।

একটি অন্ধকার কোণে লুক্কায়িত একশ্রেণী সোপান। কুহু সোপান বাহিয়া উপরে চলিল ; দ্বিতল ছাড়াইয়া ত্রিতল, ত্রিতলের পর চতুস্তল। এই চতুস্তলে একটি বৃহৎ কক্ষ, চারিদিকে মুক্ত ছাদ। কক্ষ হইতে স্নিগ্ধ পুষ্পগন্ধ ও দীপপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। মনে হয় সমস্ত পুরীর মধ্যে এই কক্ষটি জাগিয়া আছে।

কুহু দ্বারের নিকট হইতে সন্তর্পণে উঁকি মারিল, তারপর ভিতরে প্রবেশ করিল।

রানী শিখরিণী পালঙ্কে জাগিয়া শুইয়া ছিলেন ; দুই হাতে একটি যূথীমাল্যের ফুলগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হর্ম্যতলে ছড়াইয়া দিতেছিলেন। নিদাঘ নিশীথে তাঁহার দেহে বস্ত্রাদি অধিক নাই, একটি স্বচ্ছ নীল উর্ণা তপ্তকাঞ্চন অঙ্গে অঞ্জনরেখার ন্যায় লাগিয়া আছে। এক কিঙ্করী শিথানে দাঁড়াইয়া ফুলের পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

কুহু প্রবেশ করিলে রানী সুপ্তোত্থিতা বাঘিনীর ন্যায় দুই চক্ষু মেলিয়া তাহার পানে চাহিলেন। কুহু কিঙ্করীকে চোখের ইশারা করিয়া বলিল—'তুই যা।'

কিঙ্করী পাখা রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। রানী কুহুর পানে নির্নিমেষ চাহিয়া রহিলেন।

কুহু একটু বিকলভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল— 'আজও হল না।'

রানী হাতের যূথীমাল্য খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কুহুর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি শয্যার উপর নত হইয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিল— 'কিন্তু দেখা হয়েছিল। কথা বলেছি।'

রানী শয্যার উপর এক হাতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন— 'কি কথা বলেছিস্ ?'

কুহু বলিল— 'ঠারে ঠোরে যতদূর বলা যায় তা বলেছি। কিন্তু— তিনি নূতন নগরে এসেছেন, রাজপুরীতে প্রবেশ করতে রাজী নয়।'

তীক্ষ্ণ শিখর-দশন দিয়া রানী অধর দংশন করিলেন। মনে হইল অধর কাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে। ঠিক এই সময় দূর হইতে মৃদঙ্গ-মঞ্জীরার মৃদু ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিল— ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি।

রানী শিখরিণীর বক্ষ বিমথিত করিয়া উত্তপ্ত নিশ্বাস বাহির হইল, সুন্দর মুখ হিংসায় ক্রোধে বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি নিজ কণ্ঠে একবার অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন—'পানীয় দে।'

শয্যার পাশে ভৃঙ্গারে কপিত্থ-সুরভিত শীতল পানীয় ছিল, কুহু ত্বরিতে তাহা সোনার পাত্রে ঢালিয়া রানীর হাতে দিল। রানী একবার তাহা অধরে স্পর্শ করিলেন, তারপর ক্রুদ্ধ হস্তসঞ্চালনে পাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

ভয়ে কুহুর বুক শুকাইয়া গেল। তবু সে মুখে সাহস আনিয়া রানীর কানে কানে বলিল—'দেবি, আপনি অধীর হবেন না। ফুলে মধু আসতে সময় লাগে। আমি কাল আবার যাব।'

উপাধানে মুখ গুঁজিয়া রানী বলিলেন—'তুই দূর হয়ে যা।'

কুহু বলিল –'আমি যাচ্ছি, আপনি ঘুমান। আমি শয্যা-কিঙ্করীকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।'

কুহু প্রস্থানোদ্যতা হইলে রানী চকিতে শয্যা হইতে মাথা তুলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি সন্দেহে প্রখর। কুহু দ্বারের কাছে পৌঁছিলে তিনি ডাকিলেন— 'কুহু, শুনে যা।'

কুহু ফিরিয়া শয্যার পাশে আসিল। রানী মর্মভেদী চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিলেন— 'তুই আজ আমার ঘরে শো।'

রানীর মনের ভাব কুহু বুঝিল। সে মুখে হাসি আনিয়া বলিল— 'এ ঘরে শোব আমার ভাগ্যি। শয্যা-কিঙ্করীকে ডেকে দিই, সে বাতাস করুক।'

শয্যা-কিঙ্করী আসিয়া রানীকে বীজন করিতে লাগিল। কুহু পঙ্খের কারুকার্যখচিত মেঝেয় শয়ন করিল। রানী থাকিয়া থাকিয়া সশব্দ উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। কুহু তাহা শুনিতে শুনিতে মনে মনে রানীকে যমালয়ে পাঠাইতে পাঠাইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাজার প্রমোদভবনে তখনও মৃদঙ্গ-মঞ্জীরা বাজিতেছে—ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি।

এইখানে রাজ-অবরোধের সংস্থা সংক্ষেপে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

সক্রিয় রাজশক্তি যখন স্বধর্ম বিসর্জন দিয়া আত্মপরায়ণতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে তখন বদ্ধ জলাশয়ের মত তাহাতে বিষাক্ত কীটাণু জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত পরিমণ্ডল দূষিত করিয়া তোলে। গৌড়ের রাজপরিবারে তাহাই হইয়াছিল। ভাস্করবর্মা তেজস্বী বীরপুরুষ ছিলেন, নিজ বীর্যবলে সমস্ত দেশ করায়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাস্করবর্মার দেহান্তের পর তৎপুত্র অগ্নিবর্মা যখন রাজা হইলেন তখন তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন না, সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিলেন। যৌবনের অদম্য ভোগস্পৃহার স্রোতে রাজধর্ম বিবেকবুদ্ধি হিতবুদ্ধি সব ভাসিয়া গেল; নবীন রাজার পৌরুষ যোষিৎমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল। লজ্জিতা রাজলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়া তিনি অনঙ্গ পূজায় মত্ত হইলেন। অন্তঃপুর ভোগমন্দিরে পরিণত হইল।

রানী শিখরিণীকে বিবাহ করিবার পর কিছুকাল অগ্নিবর্মা রানীর রূপযৌবনের সম্মোহনে আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। কিন্তু ক্রমে নূতনত্বের মোহ অপগত হইলে রাজার মধুলুব্ধ চিত্ত উদ্যানসঞ্চারী চঞ্চরীকের ন্যায় অন্য পুষ্পে ধাবিত হইল। শিখরিণী অন্তঃপুরে পড়িয়া রহিলেন। রাজা অন্তঃপুরের মধু নিঃশেষ করিয়া প্রমোদভবনে গিয়া নূতন সভানন্দিনীদের লইয়া কেলিকুঞ্জ রচনা করিলেন।

রানী শিখরিণী অভিমানিনী রাজকন্যা, তিনি এই অবহেলা সহ্য করিবেন কেন? বিশেষত সম্ভোগতৃষ্ণা তাঁহার অন্তরেও কম ছিল না। রাজার দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়া তিনি প্রতিহিংসার ছলে আপন যৌবন-লালসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইলেন। মন যাহা চায় বিবেক তাহাতে বাধা দিল না। শুদ্ধান্তঃপুরে জার প্রবেশ করিল।

রানীর প্রধানা দাসী ছিল কুহু, সে হইল দূতী। কুহু অতিশয় চতুরা, সে রানীর জন্য নাগর সংগ্রহ করিয়া আনিত। নিজেকেও বঞ্চিত করিত না, ইচ্ছামত মনের মানুষ বাছিয়া লইত।

কদাচ রানী মন্দিরে পূজা দিবার অছিলায় আন্দোলিকায় চড়িয়া পথে বাহির হইতেন; তখন কোনও সুদর্শন পুরুষ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলে তিনি কুহুকে ইঙ্গিত করিতেন। কুহু ব্যবস্থা করিত।

এইভাবে পাঁচ বছর কাটিয়াছে। একথা বেশিদিন চাপা থাকে না; নগরের রসিক সমাজে কানাঘুষা চোখ-ঠারাঠারিতে আরম্ভ হইয়া কালক্রমে প্রকাশ্য শ্লেষ-বিদ্রূপে পর্যবসিত হইয়াছে। রানী কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। রাজ-স্বৈরিণীকে শাসন করিবারও কেহ নাই। নামমাত্র

আবরণের অন্তরালে লজ্জাহীন ব্যভিচার চলিতেছিল।

বজ্রকে দেখিয়া রানীর লিপ্সা যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, কুহুও তেমনি মজিয়াছিল। ফলে দুই সহকর্মিণী গোপনে প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতা করিবার স্পর্ধা কুহুর নাই, সে অতি সূক্ষ্মভাবে নিজের খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সূক্ষ্ম খেলা খেলিতে কুহু বড় কুশলী।

কুহু ও শিখরিণী দুইজনেই সমান পাপিষ্ঠা, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি সমান নয়। রানীর প্রকৃতি বাঘিনীর ন্যায় নিষ্ঠুর ও আত্মসর্বস্ব, আপন ক্ষুধা ব্যতীত আর কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু কুহুর প্রকৃতি অন্য রূপ ; সে অজগর সাপের মত শিকারকে প্রথমে সম্মোহিত করিয়া আলিঙ্গনের পাকে পাকে জড়াইয়া ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিতে চায়।

প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও দুই নারীই সমান মারাত্মক। বোধহয় কুহু একটু অধিক মারাত্মক।

কুহু গুপ্তদ্বার পথে অন্তর্হিত হইলে বজ্র কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল। রাজপুরীর বিপুল ছায়াতল হইতে নির্গত হইয়া সে দেখিল পূর্বাকাশে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্র উদয় হইতেছে। আলোক অতি অস্পষ্ট হইলেও পথভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই।

ঘুমন্ত নগর, নির্জন পথ, গৃহগুলি ছায়ামূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলে মনে হয় এই নগর বাস্তব নগর নয়, কোনও মায়াবী মন্ত্রবলে এই অপ্রাকৃত দৃশ্য রচনা করিয়াছে ; কোনও দিন ইহা জীবন্ত মানুষের কর্মকোলাহলে মুখরিত ছিল না, প্রভাত হইলে অলীক মায়াকুহেলির ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

বজ্রের কিন্তু এই অবাস্তব পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি ছিল না। একাকী পথ চলিতে চলিতে সে আপন মনের বিচিত্র রহস্যজালে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিমিরাবৃত রাজপুরী ; তাহার অভ্যন্তরে কুটিল দুর্গম অন্তঃপুর। কুণ্ডলিত সর্প যেন আপন কুণ্ডলীর মধ্যে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে ; সাপের মাথার মণি ঐ কুণ্ডলীর মধ্যে লুকানো আছে। কুহু এই অপূর্ব রহস্যলোকের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিয়াছিল, ভিতরে আহ্বান করিয়াছিল—

কুহু! —একদিক হইতে কুহু যেমন বজ্রকে আকর্ষণ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি বিকর্ষণও করিয়াছিল। কুহুর রূপযৌবন তাহাকে লুব্ধ করিতে পারে নাই, বরং কুহুর লোলুপ প্রগল্‌ভতা তাহার অন্তরে বিতৃষ্ণার সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু অপর পক্ষে কুহুর স্নেহ-তরল মর্মজ্ঞ নারীপ্রকৃতিকেও সে অবহেলা করিতে পারে নাই। কুহু যত দুষ্টাই হোক তাহার প্রীতিসরস হৃদয়ের মূল্য বজ্রের কাছে অল্প নয়। কুহুকে মনের কথা বলিলে সে বুঝিবে, কুহুর সাহচর্যে তাহার প্রবাসের একাকিত্ব ঘুচিবে, মন শান্ত হইবে। কুহুকে অন্তরের দিক দিয়া তাহার প্রয়োজন।

বজ্র যখন আপন কক্ষে ফিরিল তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর, দীপ নিভিয়া গিয়াছে। বজ্র অন্ধকারে কলস হইতে জল ঢালিয়া পান করিল, তারপর শয্যায় শয়ন করিল।

কাল আবার কুহু আসিবে—। ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
বজ্রহরণ

কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিবার পূর্বে বজ্র সেই যা কয়েকবার জয়নাগের নাম শুনিয়াছিল, নগরে আসিয়া আর শুনিতে পায় নাই ; তাহাদের গোপন তৎপরতার কোনও চিহ্নও তাহার চোখে পড়ে নাই। ষড়যন্ত্র যে ভিতরে ভিতরে ঘনীভূত হইতেছে, জয়নাগ বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে গৌড়রাজ্য করায়ত্ত করিবার কৌশল করিতেছেন বজ্র তাহার কিছুই জানিত না। এমন কি শৌণ্ডিক বটেশ্বর ও কবি বিম্বাধর যে এই চক্রান্তে লিপ্ত আছে তাহাও সে সন্দেহ করে নাই।

মক্ষিকা যেমন দুষ্টব্রণের প্রতি আকৃষ্ট হয় বটেশ্বর ও বিম্বাধর তেমনি অবৈধ কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইত, তা সে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রই হোক, আর অসহায় ব্যক্তির ধনভার লাঘব করাই হোক। ইহাদের ন্যায় বিকৃতচরিত্র মানুষ কোনও দেশে কোনও কালে বিরল নয় ; ইহারা সিধা পথে চলিতে পারে না, প্রকৃতির বক্রতাবশত কর্কটের ন্যায় বক্রপথে চলে এবং আপন অতি ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অন্যের মারাত্মক অনিষ্ট করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। বজ্রের প্রতি ইহাদের আচরণ এই মনোবৃত্তির একটি দৃষ্টান্ত।

বজ্রের সোনার অঙ্গদটি দেখিয়া বিম্বাধরের লোভ হইয়াছিল। কিন্তু একাকী বজ্রের অঙ্গ হইতে অঙ্গদ অপহরণ করিবার দুঃসাহস তাহার ছিল না, তাই সে বটেশ্বরকে এই কর্মে অংশীদার লইয়াছিল। দুইজনে পরামর্শ করিয়াছিল অঙ্গদটি হস্তগত হইলে ভাগাভাগি করিয়া লইবে। বজ্র নগরে আগন্তুক, তাহাকে মাদক দ্বারা হতচেতন করিয়া অঙ্গদ অপহরণ করিলে অধিক গণ্ডগোলের ভয় নাই। কিন্তু সে অতিশয় বলবান, মাদক-প্রভাব হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে যে কী কাণ্ড করিবে কিছুই বলা যায় না। ব্যাপারটা জানাজানি হইলে শৌণ্ডিকের দুর্নাম হইবে, তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই বটেশ্বর ও বিম্বাধর মন্ত্রণা করিয়া এমন ফন্দি বাহির করিয়াছিল যাহাতে সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙ্গিবে না।

ভাগ্যবশে বজ্রের প্রকৃত পরিচয় তাহারা জানিতে পারে নাই, জানিলে নিশ্চয় বজ্রের প্রাণসংশয় হইত। বটেশ্বর ও বিম্বাধর জয়নাগ কিম্বা অগ্নিবর্মার নিকট যদি এই সংবাদ বিক্রয় করিত, তারপর বজ্রকে একদিনও বাঁচিতে হইত না। কিন্তু বজ্রকে দেখিয়া কর্ণসুবর্ণে কেহই চিনিতে পারে নাই ; তাহাকে দেখিয়া মানবদেবের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারে এমন মানুষ কর্ণসুবর্ণে অল্পই ছিল। যে দুই চারিজন প্রৌঢ় বৃদ্ধ তাহাকে দেখিয়া মানবদেবের সহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারা উহা আকস্মিক সাদৃশ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। মানবদেবের যে পুত্র থাকিতে পারে একথা কেহ ভাবিতে পারে নাই।

সে-রাত্রে কুহুকে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিবার পর বজ্র বিলম্বে নিদ্রা গিয়াছিল, পরদিন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইতে বিলম্ব হইল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল সূর্যদেব দ্বারের ছিদ্রপথে কিরণের তীর নিক্ষেপ করিতেছেন।

প্রত্যহ ঊষাকালে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাওয়া বজ্রের অভ্যাস হইয়াছিল ; ঘাটে ভিড় হইবার পূর্বে সে গিয়া স্নান করিত, শীতল জলে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটিত, তারপর ফিরিয়া আসিত। কিন্তু আজ দেরি হইয়া গিয়াছে। বজ্র নিকটে মৌরীর ঘাটে স্নান করিয়া আসিল।

বজ্র যখন স্নান করিয়া ফিরিল তখন বটেশ্বর মদিরাগৃহের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া একটি লোকের সহিত নিম্নস্বরে কথা কহিতেছিল। বজ্র প্রবেশ করিলে লোকটির সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। বজ্র চিনিল, রাঙামাটির মঠের সম্মুখে সারসপক্ষীর মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া যাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়াছিল সেই জয়নাগ দলের লোক। লোকটিও তাহাকে

চিনিয়াছিল, কিন্তু যেন চিনিতে পারে নাই এমনি ভান করিয়া বটেশ্বরের সহিত আরও দুই একটা কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

অতঃপর সারসপক্ষী ও জয়নাগের চিন্তা বজ্রের মনে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। বটেশ্বর তাহাকে প্রাতঃকালীন জলপান আনিয়া দিল। আহার করিতে করিতে বজ্র উৎসুক মনে ভাবিতে লাগিল— আজ রাত্রে কুহু আসিবে— কুহুকে সে গুঞ্জার কথা বলিবে—হয়তো নিজের সত্য পরিচয়ও দিবে—

সেদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে বিম্বাধর আসিল। বজ্র মধ্যাহ্নের খর তাপে শয্যায় শয়ন করিয়া একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, বিম্বাধর ও বটেশ্বর এক ভাণ্ড মদিরা লইয়া তাহার কক্ষে উপস্থিত হইল। বিম্বাধর বলিল— 'বন্ধু, ওঠো, জাগো, জীবন মধুময় কর।'

বজ্র উঠিয়া বসিল—'কী এ ?'

বিম্বাধর বলিল— 'সুধা—সুধা। কানসোনায় এমন বস্তু আর পাবে না। দু'পাত্র খেলেই উড়তে ইচ্ছে করবে।'

বজ্র হাসিয়া বলিল— 'আমার ওড়বার ইচ্ছে নেই।'

বিম্বাধর ও বটেশ্বর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। কবি বিম্বাধর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিকশিত করিয়া বলিল— 'ভ্রাতঃ মধুমথন, জীবন অনিত্য, সুখস্বপ্নের ন্যায় ভঙ্গুর ; তাকে বুভুক্ষুপিপাসিত করে রেখ না। এস, যৌবনের যজ্ঞাগ্নিতে সোমরসের আহুতি দাও— স্বাহা স্বাহা—' বলিয়া নিজে একপাত্র ঢালিয়া এক চুমুকে পান করিয়া ফেলিল।

বজ্র তথাপি ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া বিম্বাধর গভীর ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিল— 'ছি বন্ধু, তুমি একজন দিগ্বিজয়ী পিণ্ডবীর, একা ময়রার দোকান উজাড় করে দিতে পার, তুমি এই ক্ষুদ্র সুধাভাণ্ড দেখে ভয় পাচ্ছ!— কোথায় তোমার দেশ ? সে দেশে কি কেউ খেজুরের রস খায় না ? তোমরা কি মৎস্য, কেবল জল খেয়ে বেঁচে থাক ?'

এইভাবে ধিক্কৃত হইয়া বজ্র একপাত্র ঢালিয়া পান করিল। মদিরা অতি সুস্বাদু, পাত্র শেষ করিয়া বজ্র বটেশ্বরকে বলিল— 'তুমি খাবে না ?'

বটেশ্বর জিভ্ কাটিল। বিম্বাধর বলিল— 'ময়রা কি মোদক খায় ? স্বজাতি ভক্ষণ হবে যে! এস, আর একপাত্র।'

উভয়ে আর একপাত্র ঢালিয়া একসঙ্গে পান করিল। বজ্র বলিল— 'কৈ, ওড়ার ইচ্ছা হচ্ছে না তো ?'

'হবে হবে। বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি উই পোকার পাখনা গজায় ? এস, আর একপাত্র হোক।'

আর একপাত্র হইল। এই সময় বটেশ্বরের ভৃত্য কিছু ভর্জিত মৎস্যাণ্ড আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া গেল। অবদংশ সহযোগে মদিরা আরও মুখরোচক হইয়া উঠিল।

বিম্বাধর তখন নানা কৌতুকোদ্দীপক কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। সে পঠদ্দশায় বিদ্যালাভের ব্যপদেশে কাশ্মীর গিয়াছিল ; তথাকার যুবতীরা কিরূপ তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও অতিথিবৎসলা তাহারই সরস কাহিনী শুনাইতে লাগিল। কাহিনীগুলি পবিত্র নয়, কিন্তু প্রচুর হাস্যরসের সিঞ্চনে কিঞ্চিৎ শোধিত হইয়াছে।

এইভাবে সুধাভাণ্ডটি দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া আসিল। বজ্র বেশ একটি লঘু উৎফুল্লতা অনুভব করিতেছে, প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে, কিন্তু নেশার ঘোরে অচিরাৎ ভূমিশয্যা গ্রহণ করিবার কোনও লক্ষণই তাহার নাই। বরং কবি বিম্বাধরের চক্ষু ঢুলুঢুলু হইয়া আসিয়াছে, কথা জড়াইয়া যাইতেছে। বটেশ্বর পাশে বসিয়া সব লক্ষ্য করিতেছিল, ব্যাপার দেখিয়া সে উদ্বিগ্ন হইয়া

উঠিল। এইভাবে আরও কিছুক্ষণ চলিলে বিম্বাধরই মাটি লইবে, বজ্রের কিছু হইবে না। বটেশ্বরের দৃঢ় ধারণা জন্মিল বজ্র পাকা মদ্যপ, এতদিন ছলনা করিতেছিল।

এইখানে, বিম্বাধর ও বটেশ্বর যে ফন্দি আঁটিয়াছিল তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক। সাপও মারিবে লাঠিও ভাঙ্গিবে না, এই মহাবাক্য ছিল তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র। বজ্রের অঙ্গদ চুরি করিতে হইবে। কিন্তু তারপর আত্মরক্ষার উপায় কি ? এক, বজ্রকে বিষ-প্রয়োগ করা ; মরা মানুষ গণ্ডগোল করে না। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না, মৃতদেহ লইয়া নূতন সমস্যার উদয় হয়। মদিরাগৃহে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইলে শৌণ্ডিকের বধ-বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। মৃতদেহ চুপি চুপি স্থানান্তরিত করা বটেশ্বর ও বিম্বাধরের কর্ম নয়, আরও লোক চাই। তাহাতে জানাজানি হইবে, মন্ত্রগুপ্তি থাকিবে না।

বটেশ্বর ও বিম্বাধর বড় চিন্তায় পড়িয়াছে এমন সময় পানশালায় এক শ্রেষ্ঠী আসিল। শ্রেষ্ঠীর নাম ভূরিবসু। সে ধনবান ব্যক্তি, এরূপ সাধারণ মদিরাগৃহে কখনও পদার্পণ করে না ; নিতান্তই দায়ে পড়িয়া আসিয়াছে। বিম্বাধর তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

ভূরিবসুর কয়েকখানি বাণিজ্য-তরী আছে। তাহারা সমুদ্রে যাইবে, তাহাদের আরব জলদস্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য জলযোদ্ধার প্রয়োজন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও ভূরিবসু জলসৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই, প্রচুর বেতনের লোভেও কেহ যাইতে চায় না।

সিধা পথে বিফল হইয়া ভূরিবসু বাঁকা পথ ধরিয়াছে। নগরের পানশালায় নানা জাতীয় লোকের যাতায়াত ; মদ্যপান করিয়া কেহ কেহ পানশালাতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে। অবৈধ উপায়ে লোক সংগ্রহের এমন স্থান আর নাই। ভূরিবসু আসিয়া বটেশ্বরের নিকট প্রস্তাব করিল— তুমি আমার নৌকায় জীবন্ত মানুষ পৌঁছাইয়া দাও, প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এক নিষ্ক পুরস্কার দিব। কানা খোঁড়া বিকলাঙ্গ লইব না। প্রয়োজন হইলে আমার নাবিকেরা তোমাকে সাহায্য করিবে।

বটেশ্বর দেখিল, এই সুযোগ। বজ্রের অঙ্গদটিও হস্তগত হইবে, উপরন্তু এক নিষ্ক পুরস্কার। পরামর্শে স্থির হইল, ভূরিবসুর বহিত্র যেদিন সমুদ্রে যাইবে তাহার পূর্বদিন অপরাহ্ণে বজ্রকে সুরাপান করাইয়া অজ্ঞান করিবার চেষ্টা করা হইবে ; সে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে গভীর রাত্রে নাবিকদের সাহায্যে বটেশ্বর তাহাকে ভূরিবসুর তরণীতে আনিবে। কিন্তু বজ্র সুরাপান করিতে সম্মত না হইতে পারে। তখন তাহাকে ছলছুতায় ভুলাইয়া তরণীতে লইয়া যাইতে হইবে। একবার তরণীতে পদার্পণ করিলে তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া খোলের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা সহজ হইবে। পরদিন প্রাতে তরণী সমুদ্রযাত্রা করিবে, দুই দিন পরে অকূল সমুদ্রে পৌঁছিবে। তখন বজ্রকে ছাড়িয়া দিলেও ক্ষতি নাই, সে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না ; তখন প্রাণের দায়ে তাহাকে জলদস্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে।

এই উপায়ে অন্যান্য পানশালা হইতে আরও কয়েকজন হতভাগ্যকে বহিত্রে লইয়া গিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাল প্রত্যূষে বহিত্র সমুদ্রযাত্রা করিবে। সুতরাং আজই বজ্রকে হরণ করা চাই।

কিন্তু সুরা ভাণ্ড শেষ ; বজ্র অটল হইয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে অট্টহাস্য করিতেছে। যেন তাহাদের ব্যর্থ চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিতেছে। বটেশ্বর প্রমাদ গণিল।

বিম্বাধর তখন মেঘদূত আবৃত্তি করিতেছে— 'বিদ্যুৎবন্তং বনিত ললিতা ললিত বনিতা—'

বটেশ্বর বাধা দিয়া বলিল— 'ভাই বিম্বাধর, আমাকে এবার উঠ্‌তে হবে। হাতিঘাটে কাজ আছে।'

হাতিঘাটে শব্দটা বটেশ্বর এমন তীক্ষ্ণভাবে উচ্চারণ করিল যে বিম্বাধরের কানে বিঁধিল। সে

সচকিত হইয়া বজ্রকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল, বলিল — 'আরে তাই তো, বেলা যে পড়ে এসেছে। চল, আমাকেও হাতিঘাটে যেতে হবে। তা বন্ধু মধুমথন, তুমি একা থাকবে ? তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে, আমোদ করা যাবে।'

বজ্র প্রত্যহ সন্ধ্যায় হাতিঘাটে গিয়া থাকে, আজ না যাইবার কোনও কারণ নাই। একবার মনে হইল, রাত্রে কুহু আসিবে। কিন্তু কুহু আসিবে অনেক রাত্রে, তাহার জন্য এখন হইতে ঘরে বসিয়া থাকার প্রয়োজন নাই। সে উঠিয়া বলিল— 'চল।'

হাতিঘাটে বিপুল জনসম্বাধ ; রথ-দোলের ভিড়। আগের দিন ঝড় বৃষ্টিতে কেহ আসিতে পারে নাই, আজ তাই ভিড় বেশি। বহু নাগরিক ছোট-ছোট ডিঙিতে চড়িয়া নদীবক্ষে জলবিহার করিতেছে। ধীবরেরা জেলেডিঙিতে ইল্লীশ মৎস্য ধরিতেছে। সমুদ্রগামী বহিত্রগুলিতেও জনসমাগম হইয়াছে ; যে বহিত্রগুলি কল্য প্রত্যূষে যাত্রা করিবে তাহারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মাল-বোঝাই নৌকা ঘাট হইতে গিয়া বহিত্রের গায়ে ভিড়িতেছে, নৌকা হইতে বহিত্রে মাল উঠিতেছে, শূন্য নৌকা ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া আবার মাল লইতেছে।

বজ্র, বিম্বাধর ও বটেশ্বর ভিড়ের মধ্যে না গিয়া ঘাটের এক কিনারায় উপস্থিত হইল। এখানে কয়েকটি ডিঙি রহিয়াছে, ডিঙিতে মাল বোঝাই হইতেছে। একজন সম্ভ্রান্তদর্শন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কর্ম পরিদর্শন করিতেছে। বিম্বাধর তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল—'এই যে শ্রেষ্ঠী মহাশয়, কুশল তো ?' চোখে চোখে ইঙ্গিত খেলিয়া গেল।

শ্রেষ্ঠী ভূরিবসুকে বজ্র গত রাত্রে বটেশ্বর ও বিম্বাধরের সহিত মদিরাগৃহের অন্ধকার কোণে মন্ত্রণা করিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু এখন চিনিতে পারিল না। শ্রেষ্ঠী বলিল—'আপনাদের কুশল তো ?'

বিম্বাধর বলিল—'এ পর্যন্ত কুশল। নগরে এক নূতন বন্ধু এসেছেন, তাঁকে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছি।'

ভূরিবসু সহাস্যমুখে বজ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'ভাল ভাল। তা চলুন না নদীবক্ষে বিচরণ করবেন। আমার ডিঙি রয়েছে।'

বিম্বাধর বজ্রকে বলিল—'কি বল বন্ধু ? গঙ্গাবক্ষ থেকে ঘাটের দৃশ্য তুমি বোধহয় দেখনি। অপূর্ব দৃশ্য। দেখবে ?'

বজ্রের কোনই আপত্তি নাই। চারিজনে একটি শূন্য ডিঙিতে চড়িয়া বসিল, মাঝি-কাণ্ডারী ডিঙি ছাড়িয়া দিল।

গঙ্গার বুক আবার ভরিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, স্বচ্ছ জল ঘোলা হইয়াছে। তরঙ্গগুলি বড় বড়, তাহাদের উত্থান পতনের একটা ছন্দ আছে। সেই ছন্দে নাচিতে নাচিতে ডিঙি গঙ্গার বুকে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

নদী হইতে ঘাটের দৃশ্য সত্যই মনোরম। তার উপর মন্দ মন্দ বাতাস দিতেছে ; অন্য ডিঙিগুলি আশেপাশে ঘুরিতেছে। নাগরিকদের ডিঙি হইতে উচ্চ হাস্যের কাকলি, সঙ্গীতের মূর্ছনা ভাসিয়া আসিতেছে। বজ্র মনের মধ্যে মোহমদির আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

বিম্বাধর বজ্রের কানের কাছে বিড় বিড় করিয়া কিছু বলিতেছে, বজ্র কতক শুনিতেছে কতক শুনিতেছে না। বটেশ্বর জেলেডিঙি হইতে কয়েকটি সডিম্ব ইল্লীশ মৎস ক্রয় করিল ; মাছগুলি ডিঙির খোলের মধ্যে রাজপুত্রের মত শুইয়া আছে। সবই যেন একটা সুখস্বপ্নের ছিন্নাংশ, আনন্দদায়ক কিন্তু অর্থহীন।

সূর্য নগরীর পরপারে অস্ত গেল, নিদাঘের দ্রুত সন্ধ্যা যেন ধূমল পাখা মেলিয়া ছুটিয়া আসিল। ঘাটের জনমর্দ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, নদীবক্ষের তরণীগুলিও ঘাটে ফিরিল। নগরীর

মন্দিরগুলি হইতে দূরাগত মৃদুস্বনে সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

ষড়যন্ত্রকারীরা এই ছায়াম্লান গোধূলি লগ্নের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। ভূরিবসুর সঙ্কেত পাইয়া কাণ্ডারী পুঞ্জীভূত বহিত্রগুলির দিকে ডিঙির মুখ ফিরাইল। সেখানেও নাবিকদের কর্মতৎপরতা শান্ত হইয়াছে। ডিঙি আসিয়া একটি হাঙ্গরমুখ বহিত্রের পাশে ভিড়িল।

ডিঙি হইতে বহিত্রের পট্টপত্তন খানিকটা উচ্চ। প্রথমে ভূরিবসু বহিত্রে উঠিল। কয়েকজন নাবিক গুণবৃক্ষ ঘিরিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের হস্তসঙ্কেতে কাছে ডাকিয়া নিম্নস্বরে উপদেশ দিল, তারপর ডিঙির দিকে গলা বাড়াইয়া বলিল— 'কি বন্ধু, তোমরাও বুহিত্তে উঠবে না কি ? এস না, আমার মণিভাণ্ডারে উৎকৃষ্ট আসব আছে, আস্বাদ করে যাও।'

ডিঙি হইতে বিম্বাধর সোৎসাহে বলিল— 'নিশ্চয় নিশ্চয়। কি বল মধুমথন ?'

মধুমথন মুণ্ডটি আন্দোলিত করিয়া হাস্যবিম্বিত মুখে বলিল— 'নিশ্চয়।'

তিনজনে একে একে বহিত্রে উঠিল। ডিঙির কাণ্ডারী বহিত্রের গলবাহিকায় ডিঙি বাঁধিয়া ফেলিল।

তারপর চক্ষের পলকে নানাবিধ ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। একজন নাবিক পিছন হইতে বজ্রের গলায় দড়ি জড়াইয়া টান দিল। অতর্কিত আকর্ষণে বজ্র চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল, তাহার মাথা পাটাতনের কাঠের উপর সজোরে ঠুকিয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য সে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিল।

অতঃপর যখন সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল তখন তাহার মন হইতে মাদকজনিত স্বপ্নাচ্ছন্নতা দূর হইয়াছে। সে অনুভব করিল একজন লোক তাহার মস্তকের উপর বসিয়া তাহার বাহু হইতে অঙ্গদ খুলিয়া লইবার জন্য টানাটানি করিতেছে এবং আরও কয়েকজন তাহার হাত-পা দড়ি দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

মস্তকের উপর বসিয়া যিনি অঙ্গদ উন্মোচনের চেষ্টা করিতেছিলেন তিনি কবি বিম্বাধর। বজ্র বাহুর এক প্রবল আস্ফালনে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; কিন্তু নাবিকেরা প্রস্তুত ছিল, একসঙ্গে তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া আবার তাহাকে ধরাশায়ী করিল। বিম্বাধর দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল, সেইখান হইতে অশ্রাব্য গালিগালাজ বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার একটা আঙ্গুল ভাঙিয়া গিয়াছিল, মস্তকও অক্ষত ছিল না।

বহিত্রের উপর এ এক বিচিত্র দৃশ্য। সন্ধ্যার ছায়া রাত্রির অন্ধকারে পর্যবসিত হইতেছে, সেই ঘনায়মান প্রদোষে পট্টপত্তনের উপর যেন এক পাল তরক্ষুর সহিত এক বন্য বৃষের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। বহুহস্তপদবিশিষ্ট একটা জীবন্ত মাংসপিণ্ড উঠিতেছে পড়িতেছে, গড়াইয়া এদিক ওদিক যাইতেছে। কিন্তু শব্দ অধিক হইতেছে না। কেবল বজ্রের অবরুদ্ধ গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে কবি বিম্বাধরের কাঁচা খেউড় শুনা যাইতেছে।

এতগুলা লোকের সঙ্গে একা যুদ্ধ করিতে করিতে বজ্রের দেহের শক্তিও ক্রমশ বাড়িতেছে ; যে সুরা তাহার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাই যেন মত্তহস্তীর বল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। নাবিকেরা একে একে তাহার পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাতের স্বাদ পাইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া ভূরিবসু ও বটেশ্বর সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

তারপর বজ্র প্রবল বেগে নিজ দেহ আবর্তিত করিয়া অবশিষ্ট নাবিকদের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইল, হিংস্র প্রজ্বলিত চক্ষে একবার চারিদিকে চাহিল। কিন্তু নিকটে কেহ নাই, বিম্বাধর জানুসাহায্যে পলায়ন করিয়াছে। বজ্রের কণ্ঠ হইতে একটা উন্মত্ত হর্ষধ্বনি বাহির হইল। সে বহিত্রের কিনারায় গিয়া অন্ধকার জলে লাফাইয়া পড়িল।

সকলে ছুটিয়া গিয়া বহিত্রের কিনারায় দাঁড়াইল। কিন্তু বজ্রকে আর দেখিতে পাইল না।

বিম্বাধর তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—'যাঃ, অঙ্গদটা গেল। বেনের পো, এমন লড়াক এনে দিলাম, ধরে রাখতে পারলে না ?'

ক্রুদ্ধ ভূরিবসু বলিল— 'আমি মানুষ চেয়েছিলাম, দৈত্য চাইনি।'

বিম্বাধর বলিল—'তুমি একটা মানুষ চেয়েছিলে, আমি দশটা মানুষ দিয়েছিলাম। এখন আমাদের পুরস্কার ! কথা ছিল বুহিত্তে পৌঁছে দিলেই—'

ভূরিবসু কুটিল ভঙ্গিতে দন্ত বাহির করিয়া বলিল— 'পুরস্কার নেবে— বটে ? পুরস্কার !'

বটেশ্বর ধূর্ত লোক, সে দেখিল এ সময় শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বিবাদ করিলে বিপদ আছে। সে তাড়াতাড়ি বলিল— 'না না, পুরস্কার কিসের ? চল বিম্বাধর, আমরা ফিরে যাই—'

ভূরিবসু অট্টহাস্য করিয়া বলিল— 'ফিরে যাবে ! এই যে ফেরাচ্ছি। —ওরে, এ দুটোকে ধর, খোলের মধ্যে বেঁধে রাখ। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। ওদেরই নিয়ে যাব।'

বিম্বাধর আর্তনাদ করিয়া উঠিল ; বটেশ্বর জলে লাফাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু তৎপূর্বেই নাবিকের দল তাহাদের ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং দড়ি ধরিয়া খোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল।

বিম্বাধর বধ্যভূমিতে নীয়মান শূকরের ন্যায় চিৎকার করিতে লাগিল— 'আমাকে ছেড়ে দাও— আমি যাব না—আমি লড়াই করতে পারব না—'

তাহারা আপন কুটিলতার ফাঁদে আপনি ধরা পড়িয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
জলে স্থলে

জলে লাফাইয়া পড়িয়া বজ্র ডুবিয়া গেল। তারপর অনেক দূর পর্যন্ত ডুব সাঁতার কাটিয়া সে মাথা ঝাড়া দিয়া ভাসিয়া উঠিল। চারিদিক অন্ধকার, তীর দেখা যায় না ; কেবল গঙ্গার খরস্রোত দুর্বার বেগে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

বজ্রের দেহে সামান্য দুই চারিটা আঁচড় লাগিয়াছিল, মাথার আঘাতও গুরুতর নয়। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা বাক্যাতীত বিস্ময় জাগিয়া ছিল। কী হইল ? উহারা কি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল ? কিন্তু কেন ? অঙ্গদের জন্য ?

বজ্র হাত দিয়া অনুভব করিয়া দেখিল— অঙ্গদ যথাস্থানে আছে, উহারা কাড়িয়া লইতে পারে নাই।

গঙ্গার বুকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। পশ্চাতে তাহাকে ধরিবার জন্য ডিঙা আসিতেছে না, আসিলে দাঁড়ের শব্দ শুনা যাইত। বজ্র ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, পিছন দিকে নগরের দুই চারিটা মিটিমিটি আলো দূর হইতে ক্রমশ আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে।

বজ্র আর সাঁতার কাটিতেছিল না, কেবল জলের উপর গা ভাসাইয়া ছিল। তাহার মনে হইল স্রোতের টান আরও বাড়িতেছে ; অজ্ঞাতসারে স্রোতের আকর্ষণ তাহাকে নদীর মাঝখানে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এভাবে ভাসিয়া চলিলে সে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। হয়তো সুন্দরবনে গিয়া পৌঁছিবে, হয়তো সমুদ্রে গিয়া পড়িবে— সমুদ্র কতদূরে তাহা সে জানিত না।

বজ্র আবার সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল, ডান দিকের তীর লক্ষ্য করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। তীর কিন্তু অদৃশ্য, এমন কি তীরাহত জলের কলধ্বনি পর্যন্ত শুনা যায় না।

এইভাবে অন্ধের মত অনেকক্ষণ সাঁতার কাটিবার পর স্রোতের বেগ ঈষৎ মন্দীভূত হইল। বজ্র বুঝিল— সে স্রোত কাটাইয়া তির্যকভাবে তীরের দিকে আসিতেছে। তারপরই অকস্মাৎ সে এক নূতন কল্লোলধ্বনি শুনিতে পাইল ; তাহার চারিদিকে উতরোল তরঙ্গ সংঘাত যেন তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। বজ্র ভাল সাঁতার জানে, দেহে শক্তিও অসীম ; সে তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মাথা জাগাইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ আবার স্রোতের মত্ততা শান্ত হইয়া গেল। বজ্রের চিন্তা করিবার সামর্থ্য ছিল না, থাকিলে বুঝিতে পারিত সে গঙ্গা ও ময়ূরাক্ষীর সঙ্গমস্থল পার হইয়া আসিয়াছে।

আরও কিছুক্ষণ বজ্র নিস্তরঙ্গ জলে ভাসিয়া চলিল। তারপর সহসা একটি আলোকের বিন্দু তাহার চোখে পড়িল। ডান দিকে, কিছু সম্মুখে আলোকবিন্দুটি যেন ঊর্ধ্ব হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। বজ্র আর চিন্তা করিল না, শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ঐ রক্তাভ বিন্দুটির দিকে সাঁতার কাটিয়া চলিল।

ক্রমে সেই ক্ষীণ দীপালোকে তীরের একটি অংশ তাহার চোখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রশস্ত ঘাট নয়, শীর্ণ একশ্রেণী সোপান উচ্চ পাড় হইতে জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। একটি কিশোরী মেয়ে প্রদীপ হস্তে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে।

মেয়েটির বয়স দশ-এগারো বছর ; গায়ের রঙ কোমল কালো। মুখে কৌতুক আগ্রহ ভীরুতা মেশা একটি ভাব। সে একাকিনী ঘাটে আসিয়াছে, জলে প্রদীপ ভাসাইয়া নিজের সৌভাগ্য গণনা করিবে।

মেয়েটি নিম্নতম পৈঠায় আসিয়া বসিল, প্রদীপ পাশে রাখিল, আঙুল জলে ডুবাইয়া মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিল। তারপর সহসা জলে আলোড়নের শব্দ শুনিয়া ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বাক্‌নিঃসরণের ক্ষমতা রহিল না, হস্তপদ সঞ্চালনের শক্তিও রহিত হইল।

প্রথমে একটা সাদা মানুষের মুখ, তারপর একটা প্রকাণ্ড শরীর আসিয়া ঘাটে ঠেকিল। বজ্র জলে নিমজ্জিত পৈঠার উপর উঠিয়া বসিল। মেয়েটি অনড় অভিভূত হইয়া চাহিয়া রহিল।

বজ্র তাহার অবস্থা বুঝিয়াছিল, সে দ্রুত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল— 'ভয় পেও না।'

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কিশোরীর মনের অসাড় ভাব বোধহয় একটু কাটিল। তাহার ঠোঁট দুটি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

বজ্র বলিল—'হাতিঘাটে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, ভাসতে ভাসতে এসেছি।'

এবার কিশোরীর সাহস আর একটু বাড়িল, সে অধরের স্ফুরণ সংযত করিয়া কৌতূহলী চক্ষে বজ্রকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বজ্রের প্রগণ্ডে অঙ্গদটি তাহার চোখে পড়িল। অঙ্গদের বস্ত্রাবরণ সাঁতার কাটিবার সময় খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিশোরী মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল— 'এখান থেকে কানসোনায় ফিরে যাবার পথ আছে ?'

কিশোরী মাথা নাড়িল—'না।'

'পথ নেই !'

কিশোরী বলিল— 'ময়ূরাক্ষী পার হয়ে কানসোনায় যেতে হয়। এখন খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে।'

বজ্র চিন্তা করিল। কানসোনায় ফিরিয়া গিয়াই বা লাভ কি ?— কুহু আসিবে, আসিয়া ফিরিয়া যাইবে। তা যাক।

'এখানে কাছাকাছি বসতি আছে ? তুমি এখানে থাকো ?'

'হাঁ।'

'তোমার ঘরে কে কে আছে ?'

'শুধু আমি আর আয়ি বুড়ি। আর কেউ না।'

'পুরুষ নেই ?'

'না।'

'তোমাদের চলে কি করে ?'

'কানসোনায় শাক-পাতা কলা-মূলো বিক্রি করি।'

'আমাকে আজ রাত্রে তোমাদের ঘরে থাকতে দেবে ? কাল সকালেই আমি চলে যাব।'

'আমি জানি না, আয়ি বুড়ি জানে।'

'বেশ, আমাকে আয়ি বুড়ির কাছে নিয়ে চল।'

'আচ্ছা।'

কিশোরী এতক্ষণ কথা কহিতে কহিতে অঙ্গদটি ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিল, এখন আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না ; জিজ্ঞাসা করিল— 'তোমার তাগা কি সোনার ?'

বজ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'হাঁ।'

কিশোরীর মুখে বিস্ময়ের সঙ্গে একটা ভক্তিভাব ফুটিয়া উঠিল। সে সসম্ভ্রমে বজ্রের মুখের পানে চাহিল ; তারপর প্রদীপ তুলিয়া লইয়া বলিল—'এস।'

তাহার মনের সমস্ত ভয় শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে পরিণত হইয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া কিশোরী একদিকে চলিল ; বজ্র সিক্ত বস্ত্রে তাহার পশ্চাতে চলিল। যাইতে যাইতে সে ভাবিতে লাগিল, আজ রাত্রিটা কোনও ক্রমে কাটাইয়া কালই সে গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। কর্ণসুবর্ণে আর নয় যথেষ্ট হইয়াছে। নাগরিক জীবন তাহার জন্য নয়, সে বেতসগ্রামে ফিরিয়া যাইবে। মা'র কাছে, গুঞ্জার কাছে ফিরিয়া যাইবে।

আশ্চর্য এই যে বিম্বাধর বা বটেশ্বরের প্রতি সে বিশেষ ক্রোধ অনুভব করিল না। প্রথমে নাবিকগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহার মনে যেরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তখন বিম্বাধর বা বটেশ্বরকে হাতের কাছে পাইলে বোধকরি দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিত। কিন্তু এখন তাহার মনে সামান্য তিক্ততা ভিন্ন আর কিছু নাই। সর্প দংশন করে, বাঘ-ভালুক উদরের দায়ে জীবহিংসা করে ; ইহা তাহাদের স্বভাব। ক্রোধ করিয়া লাভ কি ? তাহাদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিলেই হইল।

অল্প কিছুদূর চলিবার পর কিশোরী বজ্রকে লইয়া একটি কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মাটির কুটির, খড়ের চাল। আশেপাশে আরও কয়েকটি কুটির রহিয়াছে তাহা আবছায়াভাবে অনুমান করা যায়।

দ্বারের পাশে প্রদীপ রাখিয়া কিশোরী বলিল— 'তুমি বোসো, আমি আয়িকে ডাক্‌ছি।'

বজ্র ভিজা কাপড়ে দাওয়ার নীচে দাঁড়াইয়া রহিল, কিশোরী ভিতরে গেল। পরক্ষণেই এক বৃদ্ধার স্বর শুনা গেল—'ওলো গঙ্গা, তুই এলি। কোথায় গিছ্‌লি বল্‌ দেখি !'

তারপর কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথা হইল। বুড়ি বাহিরে আসিল। বজ্রকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল— 'ওমা, এ যে সোনার কার্তিক ! এস বাছা, এস। হাতিঘাটে জলে পড়ে গিছ্‌লে ! খুব বেঁচে গেছ্‌ বাছা, ভগবান রক্ষে করেছেন। তা আজ রাত্তিরটা আমার দাওয়ায় থাকো, কাঙ্গালের শাক-ভাত খাও —ওরে গঙ্গা, শুকনো কাপড় এনে দে, পাটি পেতে দে।'

গঙ্গা শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিল, দাওয়ায় পাটি পাতিয়া দিল। বজ্র বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া পাটিতে

লম্বা হইল ; ক্লান্তির সহিত একটি পরম নিশ্চিন্ততা তাহার দেহমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অল্পকাল মধ্যে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

দণ্ড দুই তিন পরে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন গঙ্গা তাহার পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে বলিতেছে— 'ওঠো, ভাত হয়েছে, খাবে চল।'

বজ্র ঘুমভরা চোখে উঠিয়া গিয়া খাইতে বসিল। কুটিরের একটিমাত্র ঘরে পিঁড়ি পাতিয়া আসন করা হইয়াছে ; সম্মুখে কলাপাতায় স্তূপীকৃত ভাত। গরম ভাতে ঘিয়ের ছিটা ; ব্যঞ্জনের মধ্যে ও-বেলার শাকচচ্চড়ি, কচু-ডাঁটার ঘণ্ট, সরিষা-বাটা দিয়া ইল্লিশ মাছের ঝাল ও কাসুন্দী। খাইতে খাইতে বজ্রের বেতসগ্রাম ও মায়ের রান্না মনে পড়িয়া গেল।

আয়ি বুড়ি একটু বেশি কথা বলে, সে নানা অসংলগ্ন কথা বলিয়া চলিল। তারপর বজ্রের আহার শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন সে বলিল— 'ঘরে অতিথ্ আসা তো গেরস্তর ভাগ্যি। তা বাছা, আমার এমন পোড়া কপাল, ঘরে কি ভাল বিছানা আছে! তুমি বড় ঘরের ছেলে, খাট-পালঙ্কে শোয়া অভ্যেস, তুমি কি আমার কাঁথা-কানিতে শুয়ে ঘুমতে পারবে ?'

বজ্র বলিল—'খুব পারব আয়ি। আমি তোমাদেরই মত গাঁয়ের মানুষ। আমার কোন কষ্ট হবে না।'

বুড়ি বলিল— 'তা বললে শুন্‌ব কেন বাছা। তোমার যে সোনার অঙ্গ। আহা, গায়ের রঙ যেন মল্‌মলে বাঁধা খাঁড়ি মসুর ! তাই ভাবছিলাম কি, কোদণ্ড ঠাকুরকে গিয়ে বলি, তিনিই না হয় আজ রাত্তিরটা তোমায় ঘরে ঠাঁই দিন।'

বজ্র চমকিয়া মুখ তুলিল—'কোদণ্ড ঠাকুর ! তিনি কে ?'

বুড়ি বলিল—'বামুন গো। আগে মস্ত লোক ছিলেন, এখন অবস্থা পড়ে গেছে তাই আমাদের মত চাষী-মালীদের মধ্যে আছেন। তাঁকেই বলি গিয়ে, তিনি একলা মানুষ, তোমাকে ঘরে থাকতে দিতে পারবেন। আমার এখানে তো দাওয়ায় পড়ে থাকতে হবে।'

বজ্র ভাবিতে লাগিল, ইনি কি সেই কোদণ্ড মিশ্র যাঁহার কথা শীলভদ্র বলিয়াছিলেন ? তাহার পিতামহ শশাঙ্কদেবের সচিব...কাল প্রাতে বজ্র গ্রামে ফিরিয়া যাইবে, তৎপূর্বে পিতামহের সচিবকে একবার দেখিয়া যাইবে না ?

আহার সমাধা করিয়া বলিল— 'বেশ, তিনি যদি আমাকে থাকতে দেন, তাঁর ঘরেই থাকব।'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ
ষড়যন্ত্র

আয়ি বুড়ির কুটিরের কয়েক ঘর অন্তরে কোদণ্ড মিশ্রের গৃহ। ইহাও মাটির কুটির, খড়ের ছাউনি। গত বিশ বৎসর কোদণ্ড মিশ্র এই কুটিরে বাস করিতেছেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নাই।

কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। বদ্ধ দ্বারের অন্তরালে দুইজন বসিয়া মন্ত্রণা করিতেছেন ; একজন স্বয়ং কোদণ্ড মিশ্র, অন্য ব্যক্তির নাম কোকবর্মা।

কোদণ্ড মিশ্রের সামান্য পরিচয় পূর্বে পাওয়া গিয়াছে। তিনি শশাঙ্কদেবের একজন মন্ত্রী ছিলেন। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর মানবদেবের হ্রস্ব রাজত্বকালে মন্ত্রীদের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল, কোদণ্ড মিশ্র তাহাতে জয়ী হইতে পারেন নাই ; কুটিলতার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি রাজসভা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এই নিভৃত দীন পল্লীতে আসিয়া বাস

করিতেছিলেন।

তারপর ভাস্করবর্মা আসিয়া রাজ্য গ্রাস করিলেন ; বিজয়ী মন্ত্রীরা নূতন রাজার কোপানলে ভস্মীভূত হইলেন। কেবল কোদণ্ড মিশ্র বাঁচিয়া গেলেন ; ভাস্করবর্মা অবজ্ঞাভরে এই স্বয়ং নির্বাসিত মন্ত্রীকে গ্রাহ্য করিলেন না।

তদবধি বিশ বৎসর ধরিয়া কোদণ্ড মিশ্র নূতন রাজবংশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। চাণক্য যেমন নন্দ বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি বর্ম বংশ শেষ না করিয়া ছাড়িবেন না। ভাস্করবর্মার রাজ্যকালে তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই ; কিন্তু এখন অগ্নিবর্মাকে পাইয়া আশা হইয়াছে শীঘ্রই তাঁহার চক্রান্ত ফলবান হইবে। সমস্তই প্রস্তুত, কেবল একটি বাধা ; অগ্নিবর্মার পরিবর্তে সিংহাসনে বসিতে পারে এমন যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইতেছে না।

কোদণ্ড মিশ্রের বয়স এখন সত্তর। অস্থিচর্মসার ব্রাহ্মণ ; তাঁহার জীবনে আর কোনও কাম্য নাই, স্বনির্বাচিত রাজাকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইয়া নিজে মন্ত্রিত্ব করিবেন এই সংকল্প লইয়া বাঁচিয়া আছেন।

আজ রাত্রে কোদণ্ড মিশ্র যাহার সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন সেই কোকবর্মা তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। কোকবর্মার বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু আকৃতি দেখিয়া অধিক বয়স মনে হয়। মাংসল দেহ, কদাকার মুখে মসূরিকার চিহ্ন, চক্ষু দুটি কুঁচের মত রক্তবর্ণ। তাহার মুখ দেখিয়া ভেকের মুখ মনে পড়িয়া যায়।

কোকবর্মা গৌড়রাজ্যের একজন সেনাপতি। সে জাতিতে উগ্র, বর্ধমানভুক্তির এক মাণ্ডলিক। উগ্রগণ তৎকালে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন, বাহুবল ও যুদ্ধে পরাক্রমের জন্য তাঁহাদের খ্যাতি ছিল। কোকবর্মা এই উগ্রগণের পরম্পরাগত অধিনায়ক। অগ্নিবর্মার যৌবরাজ্যকালে সে তাঁহার বয়স্য ছিল, গুপ্তব্যসনে সহযোগিতা করিত। তারপর অগ্নিবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার কৃপায় এবং উগ্রগণের অধিনায়কত্ব হেতু সেনাপতি পদ লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু সেনাপতির গুরু দায়িত্বের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র নিষ্ঠা ছিল না। সে ঘোর নীচকর্মা ও বিবেকহীন পাষণ্ড। চাটুবৃত্তি যেমন তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল তেমনি প্রয়োজন হইলে কৃতঘ্নতা করিতেও সে পশ্চাৎপদ ছিল না।

রানী শিখরিণীকে যেদিন সে প্রথম দেখিল সেদিন তাহার অন্তরে কদর্য লালসা উদ্রিক্ত হইয়াছিল। সেইদিন হইতে সে মনে মনে রাজার শত্রু হইয়াছিল।

রানী শিখরিণী তখন গুপ্ত প্রণয়লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং কোকবর্মার আশা জন্মিল সেও বঞ্চিত হইবে না ; সে দূতীর হস্তে রানীকে লিপি পাঠাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কোনও ফল হইল না ; রানী তাহার ন্যায় কুৎসিত পুরুষকে অনুগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন না। কোকবর্মা অনেক চেষ্টা করিয়াও লালসা চরিতার্থ করিতে পারিল না। উপরন্তু তাহার প্রণয়পত্রগুলি রানীর হস্তে মারাত্মক অস্ত্র হইয়া রহিল।

এইভাবে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া কোকবর্মার লিপ্সা আরও তীব্র হইয়া উঠিল। ছলে বলে যেমন করিয়া হোক রানীকে বশে আনিতে হইবে। কিন্তু শিখরিণী যতদিন রানীর পদে প্রতিষ্ঠিত আছে ততদিন তাহাকে লাভের আশা নাই। ধীরে ধীরে কোকবর্মা কোদণ্ড মিশ্রের ষড়যন্ত্র জালে জড়িত হইয়া পড়িল।

বর্তমানে কোকবর্মা ও কোদণ্ড মিশ্রের মধ্যে যে আলোচনা হইতেছে তাহা নূতন নয়, পূর্বে বহুবার হইয়া গিয়াছে। কোদণ্ড মিশ্র বলিতেছেন— 'কোকবর্মা, তুমি রাজা হও। এমন সুযোগ আর পাবে না।'

কোকবর্মা ভেকমুণ্ড নাড়িয়া বলিল— 'রাজা হতে চাই না, আমি শুধু রানীকে চাই।'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন— 'মূর্খ! রাজ্য পেলে সেই সঙ্গে রানীকেও পাবে।—দেখ, এখন কর্ণসুবর্ণে তোমার দু'হাজার উগ্র ছাড়া আর কোনও সৈন্য নেই, অন্য সব সেনাপতি সৈন্য নিয়ে দণ্ডভুক্তির সীমানা রক্ষা করছে, জয়নাগকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এই সুযোগে তুমি সিংহাসনে বসলে কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

কোকবর্মা দ্রংষ্ট্রাবহুল হাসিয়া বলিল— 'ঠাকুর, আপনার কথা শুনতে ভাল। কিন্তু এখন গৌড়ের সিংহাসনে বসা আর শূলে বসা একই কথা। জয়নাগ অতি ধূর্ত এবং কুটিল, সে একদিন না একদিন গৌড়রাজ্য গ্রাস করবেই।'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন— 'আমিও ধূর্ত এবং কুটিল, আমি কৌটিল্যের শিষ্য। আমি যতদিন মন্ত্রী আছি ততদিন জয়নাগ গৌড়ে দন্তস্ফুট করতে পারবে না।'

কোকবর্মা রূঢ়ভাবে বলিল— 'কিন্তু আপনি আর কতদিন?— তারপর? আমার এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকবার ইচ্ছা আছে, জীবন সম্ভোগ আমার পূর্ণ হয়নি।'

কোদণ্ড মিশ্র ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন— 'তুমি অদূরদর্শীর মত কথা বলছ। রাজার মত জীবন সম্ভোগের সুযোগ আর কার আছে? আজ তুমি রানী শিখরিণীর জন্য লালায়িত, কাল তার প্রতি তোমার অরুচি হবে; নূতন সম্ভোগতৃষ্ণা জাগবে। এ সুযোগ ছেড় না কোকবর্মা। মানুষের জীবনে এমন সুযোগ একবারই আসে। সমস্ত প্রস্তুত। অগ্নিবর্মার অন্তরঙ্গ অর্জুনসেন তাকে মদন-রস খাইয়ে উন্মত্ত করে রেখেছে, আমার সঙ্কেত পেলেই তাকে বিষ খাওয়াবে। তুমি ইচ্ছা করলে কালই গৌড়ের রাজা হতে পার।'

কোকবর্মা কিন্তু ভিজিবার পাত্র নয়, দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল— 'ঐটি হবে না। আমি অগ্নিবর্মাকে সিংহাসন থেকে নামাতে রাজী আছি, তার সিংহাসনে বসতে রাজী নই। আমার শেষ কথা শুনুন। অগ্নিবর্মার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, আমি আমার সৈন্য নিয়ে রাজপুরী দখল করব; রাজপুরীতে যা ধনরত্ন আছে লুঠ করব, রানীকে লুঠ করব, তারপর নিজের মণ্ডলে ফিরে যাব। ইতিমধ্যে আপনার যাকে ইচ্ছা রাজা করুন আমার আপত্তি নেই।'

কোদণ্ড মিশ্র হতাশভাবে বলিলেন—'কিন্তু রাজা পাব কোথায়? কে এমন আছে যাকে দেশের লোক রাজা বলে মেনে নেবে? সেনাপতিরা যাকে স্বীকার করবে? আজ যদি শশাঙ্কদেবের একটা বংশধর থাকত—'

শশাঙ্কদেবের বংশধর তখন ঠিক দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্ধ দ্বারে টোকা পড়িল। কোকবর্মা চমকিয়া তরবারির উপর হাত রাখিল; কোদণ্ড মিশ্রও শঙ্কিতভাবে দ্বারের পানে চাহিল। তখন দ্বারে আবার করাঘাত পড়িল এবং আয়ি বুড়ির স্বর আসিল— 'ঠাকুর, জেগে নাকি গো? একবার দোর খুলবে? আমি গঙ্গার আয়ি।'

কোদণ্ড মিশ্র অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন কিন্তু তাঁহার শঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হইল না। কোকবর্মাকে তিনি নীরব অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঘরের একটি কোণ দেখাইয়া দিলেন। কোণে দড়ি হইতে একটি কাপড় শুকাইতেছিল, কোকবর্মা তাহার পিছনে গিয়া লুকাইল। কোদণ্ড মিশ্র তখন দীপ হস্তে উঠিলেন, দ্বার খুলিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বিরক্ত স্বরে বলিলেন— 'এত রাত্রে তোমার আবার কী চাই গঙ্গার আয়ি?'

কিন্তু আয়ি বুড়িকে উত্তর দিতে হইল না, তৎপূর্বেই কোদণ্ড মিশ্রের দৃষ্টি বজ্রের উপর পড়িল। তিনি দ্রুত নিশ্বাস টানিয়া বলিয়া উঠিলেন— 'কে? কে? কে তুমি?'

বজ্র এতক্ষণ আলোক চক্রের কিনারায় দাঁড়াইয়া ছিল, এখন কোদণ্ড মিশ্রের সম্মুখে আসিয়া শান্তস্বরে বলিল— 'আপনি আর্য কোদণ্ড মিশ্র? শশাঙ্কদেবের মন্ত্রী ছিলেন?'

কোদণ্ড মিশ্র স্খলিত স্বরে বলিলেন— 'হ্যাঁ। তুমি— ?'

বজ্র যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিল— 'আমার নাম বজ্রদেব।'

'বজ্রদেব ! তুমি কি— ! না না, এখন কিছু বোলো না। এস, আমার ঘরে এস।'

কোদণ্ড মিশ্র হাত ধরিয়া বজ্রকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইলেন এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আয়ি বুড়ি কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আপন মনে বিজ্‌বিজ্‌ করিয়া বকিতে বকিতে নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে কোদণ্ড মিশ্র কম্পিত হস্তে দীপদণ্ডে প্রদীপ রাখিলেন, দীর্ঘকাল সম্মোহিতের ন্যায় বজ্রের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন— 'যদি বিশ বছর কেটে না যেত, বলতাম তুমি মানবদেব।'

বজ্র বলিল— 'মানবদেব আমার পিতা।'

'বৎস, উপবিষ্ট হও। তুমি দৈব প্রেরিত হয়ে এসেছ। তোমার নাম বজ্রদেব। বজ্রের মতই আমি তোমাকে ব্যবহার করব।'

উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন। এতক্ষণে কোকবর্মা বস্ত্রের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল। বজ্রকে কুটিল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'এ কে ?'

কোদণ্ড মিশ্র উদ্দীপ্ত চক্ষে বলিলেন— 'মানবদেবের পুত্র বজ্রদেব ! কোকবর্মা, এতদিনে রাজা পাওয়া গেছে।'

কোকবর্মা বজ্রের প্রতি তির্যক কটাক্ষপাত করিয়া বলিল— 'মানবদেবের পুত্র ! মানবদেবের পুত্র ছিল না। হতে পারে এ ব্যক্তি তার দাসীপুত্র।'

বজ্র কোকবর্মার পানে চক্ষু তুলিল, স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া ধীর স্বরে কহিল— 'আমার পিতার সঙ্গে আমার মাতার বিবাহ হয়েছিল।'

কোকবর্মা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কোদণ্ড মিশ্র বাধা দিয়া বলিলেন— 'ও প্রসঙ্গ অবান্তর। তুমি নিঃসন্দেহে মানবদেবের পুত্র। শুধু তোমার আকৃতি নয়, তোমার বাহুর অঙ্গদ তার সাক্ষী। ও অঙ্গদ আমি চিনি। কর্ণসুবর্ণে এমন অনেক প্রাচীন লোক আছে যারা তোমাকে মানবদেবের পুত্র বলে চিনতে পারবে। আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। শশাঙ্কদেবের পৌত্রকে সিংহাসনে বসালে গৌড়দেশে কেউ আপত্তি করবে না।'

কোকবর্মা ঈষৎ মুখ-বিকৃতি করিয়া বলিল—'যাক রাষ্ট্রবিপ্লবের তাহলে আর কোনও বাধা নেই !'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন— 'না, আর বাধা নেই। কোকবর্মা, তুমি আজ ফিরে যাও। তোমার সৈনাদের প্রস্তুত রেখো। ঠিক সময়ে আমি তোমাকে সংবাদ পাঠাব।'

'ভাল। আমার পণ মনে আছে ?'

'আছে। তুমি যা চাও তাই পাবে ! তোমার বাহুবলই নির্ভর।'

কোকবর্মা বিদায় লইল। খেয়াঘাটের অন্ধকারে তাহার ডিঙি বাঁধা ছিল। কোকবর্মা যাইবার সময় বজ্রের সুঠাম সুন্দর দেহের প্রতি একটা সামর্ষ ঈর্ষাবঙ্কিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল। সুদর্শন পুরুষ সে সহ্য করিতে পারিত না।

সে-রাত্রে বজ্র ও কোদণ্ড মিশ্র শয্যাগ্রহণ করিলেন না ; প্রদীপের দুই পাশে বসিয়া সমস্ত রাত্রি কথা হইল। কোদণ্ড মিশ্র মাঝে মাঝে উঠিয়া প্রদীপের তৈল পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন।

বজ্র আপন জীবন-বৃত্তান্ত বলিল ; গ্রামের জীবন, গ্রাম হইতে যাত্রা, শীলভদ্রের সহিত সাক্ষাৎ, কর্ণসুবর্ণে বাস, বহিত্রে অপহরণের দুশ্চেষ্টা, সমস্তই বিবৃত করিল। অপরপক্ষে কোদণ্ড মিশ্র তাঁহার বিংশবর্ষব্যাপী ষড়যন্ত্রের কাহিনী ব্যক্ত করিলেন। অবজ্ঞা, দৈন্য, বিফলতা তাঁহার সংকল্প

টলাইতে পারে নাই। এতদিনে নিয়তির চক্র ঘুরিয়াছে, বর্মবংশের উচ্ছেদ করিয়া শশাঙ্কদেবের বংশধরকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইয়া তিনি ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন।

বজ্র বৃদ্ধের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিল, কোনও আপত্তি করিল না। কাল প্রাতে সে যে গ্রামে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিল তাহা আর তাহার মনে রহিল না।

বাহিরে কাক কোকিলের ডাক শুনিয়া তাঁহাদের চৈতন্য হইল, রাত্রি শেষ হইয়াছে। কোদণ্ড মিশ্র বজ্রের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন— 'বৎস, যতদিন না রাজপুরী অধিকৃত হয় তুমি এখানেই থাক, কর্ণসুবর্ণে ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। আমার অনেক কাজ, অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে, কর্ণসুবর্ণে যেতে হবে। আমি গঙ্গার আয়িকে বলে দেব, সে তোমার সেবা-যত্ন করবে।'

বজ্র কুটিরের বাহিরে আসিয়া দেখিল, সম্মুখেই বিপুল-বিস্তার ভাগীরথী। পরপারের আকাশে সিন্দুরের রঙ ধরিয়াছে, এখনও সূর্যোদয় হয় নাই। স্রোতের মাঝখান দিয়া একটি হাঙ্গর-মুখ বহিত্র ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার পিছনে আরও কয়েকটি বহিত্র। তাহারা সাগরে যাইতেছে।

বহিত্রগুলির পট্টপত্তনের উপর মানুষের চলাফেরা দেখা যাইতেছে। নাবিকেরা পাল তুলিতেছে ; গুণবৃক্ষের শীর্ষে আড়কাঠের উপর বসিয়া দিশারু দিঙ্‌নির্ণয় করিতেছে।

বজ্র হাঙ্গর-মুখ বহিত্রটিকে চিনিল। কিন্তু উহার খোলের মধ্যে যে বিম্বাধর ও বটেশ্বর বন্দী আছে তাহা জানিতে পারিল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ
নরকের দ্বার

দিনটা আলস্য ও কর্মহীনতার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

কোদণ্ড মিশ্র প্রভাতেই স্নানাদি সমাপন করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধের জীর্ণ শরীরে কর্মপ্রেরণা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বজ্র শূন্য কুটিরে কিয়ৎকাল বসিয়া রহিল, তারপর আলস্য ভঞ্জন করিয়া বাহির হইল। তাহার মনের অবস্থা এখন স্তিমিত ; সে যেন বিবাহের বর ; তাহাকে ঘিরিয়া সকল তৎপরতা, অথচ সে নিজে নিষ্ক্রিয়।

বজ্র বাহিরে আসিয়া কাল রাত্রে যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেইদিকে চলিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটির, তাহার চারিপাশে শাক কন্দ ফল ফুলের উদ্যান। কুটিরগুলিতে মানুষ নাই, বোধহয় সকলেই কর্ণসুবর্ণে হাটে গিয়াছে। ইহাদের গৃহে চুরি করিবার মত তৈজস কিছু নাই, তাই তাহাদের মনেও কোনও দুশ্চিন্তা নাই।

এইরূপ কয়েকটি গৃহের পরে একটি কুটিরের সম্মুখীন হইয়া বজ্র গঙ্গাকে দেখিতে পাইল। গঙ্গা দাওয়ায় বসিয়া পায়ের উপর সলিতা পাকাইতেছিল, হাসিমুখে বজ্রকে অভ্যর্থনা করিল। বলিল—'এস। আয়ি এক কাঁদি কলা আর ইঁচড় নিয়ে কানসোনায় বেচতে গেছে। এখুনি আসবে।'

গঙ্গা দাওয়ায় পাটি বিছাইয়া দিল ; ধামিতে করিয়া এক ধামি মুড়ি ও গুড় আনিয়া বজ্রকে খাইতে দিল, উঠানের লতা হইতে ক্ষীরিকা পাড়িয়া দিল। বজ্র পরম তৃপ্তির সহিত মুড়ি চিবাইতে লাগিল।

গঙ্গার আজ আর শঙ্কা সঙ্কোচ নাই, সে সলিতা পাকাইতে পাকাইতে গল্‌ গল্‌ করিয়া কথা বলিতে লাগিল ; আর থাকিয়া থাকিয়া বজ্রের অঙ্গদের পানে বিমুগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

বজ্র তাহা দেখিয়া বলিল— 'দেখবে ?' বলিয়া অঙ্গদটি খুলিয়া তাহার হাতে দিল।

গঙ্গা যেন স্বর্গ হাতে পাইল। দুই চক্ষে আনন্দ এবং সম্ভ্রম ভরিয়া সে অঙ্গদটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ দেখিবার পর গভীর পরিতৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া অঙ্গদ বজ্রকে ফিরাইয়া দিল। বজ্র লক্ষ্য করিল, গঙ্গার মুখে ক্ষণেকের জন্যও লোভ বা গৃধ্নুতা প্রকাশ পাইল না। যাহাদের কিছুই নাই তাহারাই বোধকরি নির্লোভ হইতে পারে।

আয়ি বুড়ি ফিরিয়া আসিল। কলা ও ইঁচড় বিক্রি করিয়া সে কাঁকড়া কিনিয়াছে; ঘটা করিয়া অতিথির জন্য পঞ্চ ব্যঞ্জন রাঁধিতে বসিল। কাঁকড়া কুটিতে বসিয়া গঙ্গার আহ্লাদের সীমা নাই।

দ্বিপ্রহরে বজ্র ভাগীরথীতে স্নান করিয়া আসিল। তারপর উদর পূর্ণ করিয়া বুড়ির রান্না অতি মুখরোচক অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিল।

আহারের পর হরীতকী চর্বণ করিতে করিতে বজ্র কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে ফিরিয়া গেল, দেখিল তিনি এখনও আসেন নাই। সে নল-পাটি পাড়িয়া শয়ন করিল। কাল রাত্রে জাগরণ গিয়াছে, তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল। ক্রমে সে অশান্ত অর্ধনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বজ্র দেহের জড়িমা দূর করিয়া বাহিরে আসিল। কোদণ্ড মিশ্রের দেখা নাই। তিনি এখনও ফিরিয়া আসেন নাই, কিম্বা হয়তো ফিরিয়াছিলেন, আবার বাহির হইয়াছেন; বজ্র ঘুমাইয়াছিল তাই জানিতে পারে নাই।

বজ্র অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ ইতস্তত করিল, তারপর ভাগীরথীর তীর ধরিয়া ভ্রমণে বাহির হইল। নিশ্চেষ্টভাবে কুটিরে বসিয়া থাকিয়া লাভ নাই।

সে উত্তরমুখে চলিল। এখানে জনবসতি অধিক নাই, স্থানে স্থানে দুই চারিটি বিচ্ছিন্ন কুটির। শূন্য তীর ধরিয়া চলিতে চলিতে সে ক্রমে ময়ূরাক্ষী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইল। ময়ূরাক্ষীর ধারা ভাগীরথীর তুলনায় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু যেস্থানে দুই স্রোত মিলিত হইয়াছে সে স্থান তরঙ্গ সমাকুল। গত রাত্রে বজ্র এই স্রোত অন্ধকারে পার হইয়াছিল।

এই সঙ্গমস্থলের অপর পারে কোণের উপর বহু শিখরযুক্ত তুঙ্গ রাজপ্রাসাদ। এদিকটা প্রাসাদের পশ্চাদভাগ। দুই দিক হইতে উচ্চ প্রাকার আসিয়া নদীর কিনারায় দুইটি বিপুল স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে, মাঝের অবকাশ স্থলে অবরোধের স্নান-ঘাট। সারি সারি দীর্ঘ সমান্তরাল সোপান উচ্চ সৌধতল হইতে নামিয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

বজ্র দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। দুই তীরের মাঝখানে অনুমান তিন চারি রজ্জুর ব্যবধান। অস্তমান সূর্যের তির্যক আলোকে প্রাসাদ ও ঘাট স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রাসাদ যেন সুপ্ত, কোথাও কর্মচঞ্চলতা নাই; ঘাটে কয়েকটি পুরনারী জলে নামিয়া গা ধুইতেছে। আসন্ন দুর্যোগের কোনও পূর্বাভাস সেখানে নাই।

বজ্র ময়ূরাক্ষীর তীর ধরিয়া আবার চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি পরপারে প্রাসাদের উপর ন্যস্ত হইয়া রহিল। তাহার অন্তরে কোনও বিপুল হৃদয়াবেগ উত্থিত হইল না, কেবল নির্লিপ্ত শ্লথ চিন্তার ক্রিয়া চলিতে লাগিল; তাহার পিতামহের রচিত ঐ রাজপুরী...কোদণ্ড মিশ্রের চেষ্টা সার্থক হইবে কি ?...কপর্দকহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটা রাজ্য ওলট-পালট করিয়া দিবে...ইহা কি সম্ভব ? না ইহা স্বপ্ন ?—

রাজপুরী পিছনে পড়িয়া রহিল, বজ্র খেয়াঘাটের নিকট উপস্থিত হইল। এখানে খেয়াঘাটের আশেপাশে জনবসতি অধিক। খেয়াতরী যাত্রীদের পারাপার করিতেছে; ওপারেও ক্ষুদ্র একটি খেয়াঘাট। বজ্র অদূরে উচ্চ পাড়ের উপর এক বৃক্ষতলে বসিয়া দেখিতে লাগিল। দর্শনীয় কিছু নয়; তবু তৃপ্ত মনে বসিয়া দেখা যায়।

অল্পকাল পরে সূর্যাস্ত হইল। খেয়ার মাঝি নৌকা বাঁধিয়া প্রস্থান করিল। ঘাট শূন্য হইয়া গেল।

বজ্র উঠিয়া আবার নদীতীর ধরিয়া ফিরিয়া চলিল। রাজপ্রাসাদের সমান্তরালে আসিয়া দেখিল যেখানে প্রাসাদ ছিল সেখানে পিণ্ডীভূত অন্ধকার। সেই অন্ধকারের জঠর হইতে দুই চারিটি বর্তিকার ক্ষীণ রশ্মি নদীবক্ষে প্রতিবিম্ব ফেলিয়া কাঁপিতেছে।

বজ্র যখন কোদণ্ড মিশ্রের কুটির সম্মুখে ফিরিয়া আসিল তখন দিবালোক সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। কোদণ্ড মিশ্র ফিরিয়াছেন, কুটির কক্ষেই আছেন ; বদ্ধ দ্বারের ফাঁকে আলো দেখা যাইতেছে।

বজ্র দাওয়ায় উঠিয়া ঘরের মধ্যে মৃদু জল্পনার শব্দ শুনিতে পাইল। সে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া পড়িল— হয়তো কোনও গূঢ়-পুরুষ আসিয়াছে। বজ্র একটু দ্বিধা করিল, তারপর দ্বারের ফাঁক দিয়া তাহার দৃষ্টি ভিতরে প্রবেশ করিল। সেখানে কোদণ্ড মিশ্রের সম্মুখে যাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিল তাহাতে সে বিস্ময়ে পিছাইয়া আসিল।

কুহু! কোদণ্ড মিশ্রের সহিত মুখোমুখি বসিয়া কুহু কথা কহিতেছে! তাহার অঙ্গ ঘিরিয়া নীল রঙের ঊর্ণা, কিন্তু চিনিতে কষ্ট হয় না—সেই মিষ্ট-দুষ্ট হাসিভরা মুখ! কুহু কোথা হইতে আসিল? কোদণ্ড মিশ্রের সহিত তাহার কী সম্বন্ধ?

দ্বারের বাহিরে নির্বাক দাঁড়াইয়া বজ্র শুনিতে পাইল, কোদণ্ড মিশ্র বলিতেছেন— 'এই লিপি নাও, অর্জুনসেনকে আজ রাত্রেই দিও। আর মুখে বোলো, সমস্ত প্রস্তুত ; অমাবস্যার তিথি যেন ভ্রষ্ট না হয়।"

কুহু বলিল— 'বলব।—অমাবস্যা কবে?'

'পরশু। সেই রাত্রির মধ্যযামে—'

'যে আজ্ঞা। আজ তাহলে উঠি। ফিরতে দেরি করলে রানী সন্দেহ করবে।'

'স্বস্তি।'

কুহু সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। তারপর বজ্রকে দেখিয়া সেও বজ্রাহতবৎ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুইজনেই হতবাক্।

এই সময় ঘরের ভিতর হইতে কোদণ্ড মিশ্রের কণ্ঠস্বর আসিল—'কে? বাহিরে কে?'

বজ্র চমকিয়া বলিল— 'আমি বজ্র।'

'এস বৎস, ভিতরে এস।'

বজ্র দ্বিধাভরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলে কুহু চকিতে হাত তুলিয়া কি যেন ইশারা করিল, তারপর বাহিরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বজ্র কোদণ্ড মিশ্রের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল। বৃদ্ধের মুখে চোখে তীব্র উত্তেজনা, শুষ্ক দেহে তিলমাত্র অবসাদ নাই। তিনি নিম্নকণ্ঠে আজিকার সমস্ত দিনের কর্মতৎপরতা বজ্রকে শুনাইতে লাগিলেন। কর্ণসুবর্ণে এখনও অনেক ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছে যাহারা বর্তমান রাজারানীর কুক্রিয়া ও জঘন্য জীবনযাত্রায় উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শশাঙ্কদেবের বংশধর সিংহাসনে বসিলে তাহারা আনন্দিত হইবে, সহায়তাও করিবে। ব্যবস্থা সমস্তই প্রস্তুত। অমাবস্যার রাত্রে অগ্নিবর্মার নারকীয় জীবন শেষ হইবে। পরদিন প্রাতে কোকবর্মার সৈন্যগণের সাহায্যে বজ্র রাজপুরী অধিকার করিবে। নগরে শাসন-ডিণ্ডিম প্রচারিত হইবে ; অগ্নিবর্মার মৃত্যু এবং বজ্রদেবের অভিষেক ঘোষিত হইবে। কোকবর্মা যাহা চায় তাহা লইয়া নিজের দেশে চলিয়া যাইবে। দুই শত বাছাই করা খস্ যোদ্ধা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহারা রাজপুরী রক্ষা করিবে। কোদণ্ড মিশ্র তখন নিশ্চিন্ত হইয়া নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করিবেন।

দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে।

বজ্র মনোযোগ দিয়া শুনিল, কিন্তু মনের মধ্যে কোনও প্রকার তীব্র আগ্রহ অনুভব করিল না। তাহাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন, অথচ তাহার অন্তর যেন এই জটিলতা কুটিলতায় সায় দিতেছে না। পিতা-পিতামহের সিংহাসন তাহার প্রাপ্য, সে তাহা চায়। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির কূটচক্রান্ত, বিষপ্রয়োগে নরহত্যা, সে স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ইহা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা হইলে সে অধিক সুখী হইত।

কিন্তু মনের সূক্ষ্ম ভাবনা মুখে প্রকাশ করিতে সে অভ্যস্ত নয়। প্রকাশ করিয়াই বা লাভ কি। সে শুধু জিজ্ঞাসা করিল—'আমার কর্তব্য কিছু আছে কি ?'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন— 'উপস্থিত কিছু না। তুমি কেবল অমাবস্যার রাত্রি পর্যন্ত নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখবে, আর কোনও কর্তব্য নেই। আমার ঘরে এখন অনেক লোকের যাতায়াত হবে, তোমার এখানে না থাকাই ভাল। তুমি আয়ি বুড়ির ঘরে থাকবে।'

আরও দুই চারি কথার পর বজ্র বাহিরে আসিল। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়াছে, নিম্নে কুটিরগুলিতে মৃৎ-প্রদীপের ক্ষুদ্র শিখা। বজ্র অন্যমনে আয়ি বুড়ির কুটিরের দিকে পা বাড়াইয়াছে এমন সময় একজন আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

'মধুমথন !'

'কুহু !'

কুহু এতক্ষণ বাহিরের অন্ধকারে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বজ্র তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল— 'তুমি এখানে ?'

কুহু প্রতিধ্বনি করিল— 'তুমি এখানে ?'

বজ্র সংক্ষেপে নিজের নদীসন্তরণ কাহিনী বলিল, তারপর প্রশ্ন করিল—'কিন্তু কোদণ্ড মিশ্রের কাছে তুমি এলে কি করে ? তাঁর সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ ?'

কুহু বলিল— 'আছে, পরে বলব। কাল আমি মদিরাগৃহে গিয়েছিলাম। দেখলাম, দোর বন্ধ, কেউ নেই। কী দুঃখ যে হয়েছিল !'

বজ্র লক্ষ্য করিল কুহু হাত ধরিয়া তাহাকে একদিকে লইয়া যাইতেছে। সে বলিল— 'কোথায় যাচ্ছ ?'

কুহু বলিল— 'চল, আমাকে রাজপুরীতে পৌঁছে দেবে।'

'কিন্তু— খেয়া তো বন্ধ। নদী পার হতে কি করে ?'

'আমার উপায় আছে। এস।'

কুহু তাহার বাহুর সহিত বাহু জড়াইয়া লইল। দুইজনে নক্ষত্রবিদ্ধ অন্ধকারের ভিতর দিয়া চলিল।

খেয়াঘাটে খেয়াতরীর পাশে একটি মোচার খোলার মত ছোট্ট ডিঙি বাঁধা আছে। এটি অবরোধের নারীদের ব্যবহার্য ডিঙি, ঘাটের এক কোণে স্তম্ভের গায়ে অর্ধনিমজ্জিত হইয়া বাঁধা থাকে ; পুরীর দাসীরা প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করে। কুহু ও বজ্র সেখানে উপস্থিত হইলে কুহু বলিল— 'তুমি আগে ওঠ। বৈঠা ধর।'

বজ্র উঠিয়া বসিয়া বৈঠা করিল। কুহু পিছনের গলুইয়ে উঠিয়া বাঁধন খুলিয়া দিল। বজ্র জিজ্ঞাসা করিল— 'রাজপুরী কোন দিকে ? কিছুই যে দেখা যাচ্ছে না।'

কুহু বলিল— 'ভাবনা নেই, দু'বার দাঁড় টেনে স্রোতের মুখে ডিঙি ছেড়ে দাও, আপনি রাজপুরীর ঘাটে গিয়ে লাগবে।'

বজ্র তাহাই করিল। আঁধারে ডিঙি ভাসিয়া চলিল।

এতক্ষণে বজ্র অন্তরের মধ্যে একটা সহর্ষ উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিল। অসংখ্য অপরিচিত ব্যক্তির ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে সে যেন হঠাৎ একান্ত আপনার জনকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। মনের আনন্দে হাসিয়া উঠিয়া সে বলিল -'কুহু, তোমার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে তা একবারও ভাবিনি।'

কুহু বলিল— 'আমিও না। —কিন্তু ঘাট এসে পড়েছে।'

ঘাটের পাষাণে ডিঙি ঠেকিল। দুইজনে অবতরণ করিল। কুহু স্তম্ভের গায়ে লোহার আংটায় ডিঙি বাঁধিল, তারপর আসিয়া বজ্রের হাত ধরিল।

বজ্র বলিল— 'এবার আমি ফিরে যাই ?'

কুহু বজ্রের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল— 'মহারাজ বজ্রদেব, আজ আপনাকে ছাড়ব না। দাসীর ঘরে পায়ের ধুলো দিতে হবে।'

মহারাজ বজ্রদেব! এই সম্বোধন শুনিয়া বজ্র যেন ক্ষণেকের জন্য মন্ত্রমূঢ় হইয়া গেল। কুহু হাত ধরিয়া তাহাকে রাজপুরীর মধ্যে লইয়া চলিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ
নরক

রাজপুরীতে প্রবেশ করিবার সময় বজ্রের পা কাঁপিয়া গেল, চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইল, কণ্ঠের নিকট বাষ্পপিণ্ড উঠিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। পিতৃপুরুষের ভবনে এই তাহার প্রথম পদার্পণ।

রাজপুরীতে দীপ জ্বলিয়াছে, কিন্তু পুরীর পিছন দিকে বেশি আলো নাই। কুহু আলো-আঁধারির ভিতর দিয়া এক সঙ্কীর্ণ সোপানের সম্মুখীন হইল। রাজ-অবরোধের দাসী-কিঙ্করীদের ব্যবহারের জন্য এরূপ সোপান অনেক আছে। কুহু বজ্রের হাত ধরিয়া উপরে চলিল।

দ্বিতলের এক কোণে কুহুর কক্ষ। দূরে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। কুহু নিজ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল তাহার দাসী মালতী দ্বারের পাশে দুই পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। বজ্রকে পিছনে রাখিয়া কুহু আগাইয়া গেল।

মালতী উঠিয়া কুহুর পিছনে চোখ বাঁকাইয়া চাহিল। অবরোধে পুরুষের আবির্ভাব মালতীর চোখে নূতন নয়, তবে এ মানুষটা নূতন বটে; আবছায়া আলোতে দেখিয়াও চাহিয়া থাকিতে হয়। কুহু বজ্রকে যথাসম্ভব আড়াল করিয়া বলিল— 'মালতী, তোকে আর দরকার নেই। তুই যা।'

মালতী চোখ ঘুরাইল, অঙ্গভঙ্গি করিল, তারপর দুষ্টামি-ভরা সুরে বলিল—'এত রাত্তিরে কোথায় যাব গো ঠাকরুন ?'

কুহু ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল— 'তোর মনের মানুষ নেই ? তার কাছে যা। আজ আর ফিরতে হবে না, একেবারে কাল সকালে ফিরিস।'

মালতী একগাল হাসিল। তাহাকে আর দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না, অঞ্চলপ্রান্ত উড়াইয়া সে নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

কুহু বজ্রকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, ভিতর হইতে দ্বারের খিল আঁটিয়া দিল।

ঘরটি খুব বড় নয়, ছোটও নয়। চারি কোণে দীপদণ্ডে চারিটি প্রদীপ, মসৃণ মণিহর্ম্যতলে

আলোক প্রতিফলিত হইতেছে। বাতায়নের পাশে খট্টিকার উপর শুভ্র শয্যা; উপাধানের উপর মল্লিকা ফুলের স্থূল মালা শোভা পাইতেছে। ঘরের বাতাস কস্তূরী ও পুষ্পগন্ধে আমোদিত।

কুহু হাত ধরিয়া বজ্রকে খট্টিকার উপর বসাইয়া দিল ; মুগ্ধবিধুর চক্ষে চাহিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া ধরা-ধরা গলায় বলিল— 'ধুলোয় মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি তা কি আগে জানতাম ! মহারাজ বজ্রদেব, যখন মাথায় রাজমুকুট ধারণ করবেন তখন এই পাপিষ্ঠা দাসীর কথা কি মনে থাকবে ?'

বজ্র কুহুকে টানিয়া তুলিয়া পাশে বসাইল, বলিল— 'কুহু, তুমি জানো না, তোমাকে পেয়ে আমি কী পেয়েছি। এই জনারণ্যে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু।'

কুহু আদরে গলিয়া গেল, বজ্রের কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল— 'মনে থাকবে ?'

'থাকবে। তোমাকে চিরদিন মনে থাকবে।'

কুহু পরিপূর্ণ তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল, তারপর উঠিয়া মল্লিকা ফুলের মালাটি বজ্রের গলায় পরাইয়া দিল। মালাটি সে আজ বৈকালে রানীর আদেশে গাঁথিয়াছিল ; সেই মালা আর একজনের গলায় উঠিবে তখন কে জানিত ! তৃপ্তির মধ্যেও রানীর কথা কুহুর মনে পড়িয়া গেল। রাক্ষসীটার কাছে যাইতে হইবে ; ছলে-ছুতায় আরও দুইটা দিন তাহাকে ভুলাইয়া রাখা দরকার—

ঈষৎ অন্যমনা হইয়া কুহু একটা কুলঙ্গির কাছে গেল। কুলঙ্গিতে নানাবিধ মিষ্টান্ন ছিল, একটি স্থালীতে তাহা লইয়া বজ্রের কাছে ফিরিয়া গেল।

বজ্র বলিল— 'এ কী ?'

কুহু বলিল— 'একটু খাও।'

কুহু দুই হাতে থালি ধরিয়া রহিল, বজ্র মিষ্টান্ন তুলিয়া খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে বলিল— 'কোদণ্ড মিশ্রের সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ তা তো বললে না।'

কুহু বলিল— 'আমার মা এই রাজপুরীর দাসী ছিল। কোদণ্ড ঠাকুর মাকে চিনতেন। মা মরবার সময় ঠাকুরকে বলে যায় তিনি যেন আমার দেখাশুনা করেন। তা ঠাকুর আর আমার কী দেখাশুনা করবেন, আমিই তাঁর দেখাশুনা করি।—ও কি, আর একটু খাও।'

'আর না, অনেক খেয়েছি।'

'এই ক্ষীরের পুলি খেতেই হবে।'—বলিয়া কুহু ক্ষীরের পুলি বজ্রের মুখে তুলিয়া দিল।

আহার শেষ হইলে বজ্র বলিল—'তুমি আর আমাকে মধুমথন বলবে না ?'

'বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তোমার সত্যি নাম পরমভট্টারক শ্রীমন্ মহারাজা বজ্রদেব। মধুমথন তোমার মিথ্যে নাম।'

বজ্র একটু অন্যমনস্ক হইল ; গুঞ্জার মুখখানি তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। সে বলিল— 'মিথ্যে নয়, দুটো নামই সত্যি। তুমি আমাকে মধুমথন বলেই ডেকো।'

কুহু জিভ কাটিল— 'রাজাকে কি অন্য নামে ডাকতে আছে ?'

'রাজা তো এখনও হইনি। হব কিনা তারই বা ঠিক কি ?'

কুহুর মুখ দৃঢ় হইল ; সে বলিল— 'তুমি রাজা হবে।'

'বেশ। যতদিন রাজা না হই ততদিন মধুমথন বলে ডেকো।'

'সে ভাল। তিন রাত্রির জন্য তুমি আমার মধুমথন।' কুহু বজ্রের খুব কাছে সরিয়া আসিল।

বজ্র উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল— 'এবার কিন্তু আমি ফিরে যাব। কোদণ্ড মিশ্র বলেছেন—'

কুহু তাহার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া তাহাকে উঠিতে দিল না। বলিল— 'কোদণ্ড ঠাকুর কি

বলেছেন আমি শুনেছি। কিন্তু এখন তোমার যাওয়া হবে না। ভোর হবার আগেই আমি তোমাকে ডিঙিতে করে পৌঁছে দেব।'

'কিন্তু—এখন রাত কত ?'

'এখনও প্রথম প্রহর শেষ হয়নি।'

বজ্র হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল— 'না, আমি ফিরে যাই। তুমি যেতে না পারো আমি সাঁতরে ময়ূরাক্ষী পার হতে পারব।'

কুহু কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার অধরে একটি গুপ্ত হাসি খেলিয়া গেল। সে বজ্রের বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল— 'আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, আমার একটা কাজ আছে সেটা সেরে এসে আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।'

'কি কাজ ?'

রানীর কাছে যাইতে হবে একথা কুহু বলিল না, বজ্রের কাছে রানীর নাম উচ্চারণ করিল না। বলিল— 'কোদণ্ড ঠাকুর চিঠি দিয়েছেন, রাজার অন্তরঙ্গ অর্জুনসেনকে দিতে হবে।'

'কতক্ষণ সময় লাগবে ?'

'দু' দণ্ড— বেশি নয়।'

'দু' দণ্ড বসে থাকব ?'

কুহু কুহকভরা হাসিল— 'বসে থাকবে কেন ? আমার বিছানায় শুয়ে থাকো।'

বজ্র কোমল শয্যার প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টি করিয়া বলিল— 'যদি ঘুমিয়ে পড়ি ?'

অধরের একটি ভঙ্গুর ভঙ্গি করিয়া কুহু বলিল— 'যদি ঘুমিয়ে পড়, আমি এসে তোমাকে জাগিয়ে দেব।'

বজ্র শয়ন করিল। কুহু তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে ঘর হইতে বাহির হইল।

ঘরের বাহিরে আসিয়া কুহু সতর্কভাবে চারিদিকে চাহিল। কেহ কোথাও নাই, পুরীর এ অংশ নিশুতি হইয়া গিয়াছে। কুহু নিঃশব্দে দ্বারের শিকল তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে চলিল।

চতুস্তলে রানী শিখরিণীর শয়নকক্ষ। কুহু প্রবেশ করিলে রানী অর্ধোত্থিতা হইয়া প্রশ্নবিস্ফারিত চক্ষে চাহিলেন। ব্যজনরতা দাসী কুহুর ইঙ্গিতে সরিয়া গেল।

কুহু মনে মনে যে-কাহিনী গড়িয়া রাখিয়াছিল ম্রিয়মাণ কণ্ঠে তাহা বলিল।— আজও পানশালা বন্ধ, শৌণ্ডিক কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সম্ভবত আগন্তুক যুবকও নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু জানিবার উপায় নাই, পানশালা শূন্য। এদিকে কুহুর অবস্থা শোচনীয়; হাঁটিয়া হাঁটিয়া তাহার পা দুটার আর কিছু নাই। এখন দেবী আজ্ঞা করুন—সে কী করিবে।

দেবী প্রজ্বলিত চক্ষে বলিলেন — 'তুই দূর হয়ে যা— দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা, তোর মুখ দেখতে চাই না।'

কুহু করুণ নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর যুক্তকরে প্রণাম করিয়া ক্লান্তমন্থর পদে দ্বারের দিকে চলিল। দ্বারের বাহিরে গিয়া সে একবার চকিত-বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া চাহিল। তাহার চক্ষে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ নিমেষে দেখা দিয়া নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইল। তারপর সে দ্রুতপদে রাজার প্রমোদভবনের দিকে চলিল। অন্তরঙ্গ অর্জুনসেন রাজার কাছেই আছে, তাহাকে কোদণ্ড মিশ্রের লিপি দিয়া রানী শিখরিণীর সর্বনাশের ব্যবস্থা পাকা করিয়া তবে সে নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবে।

রানী শিখরিণী কিন্তু কুহুর ঐ চকিত কটাক্ষ দেখিয়াছিলেন। তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। ব্যর্থতার ক্রোধ অপগত হইয়া তাঁহার ললাটে সংশয়ের ভ্রূকুটি দেখা দিল।

ব্যজনকারিণী দাসী ফিরিয়া আসিয়া আবার রানীকে বাতাস করিবার উদ্যোগ করিলে রানী

জিজ্ঞাসা করিলেন— 'বল্লী, কুহু কোন্‌দিকে গেল দেখলি ?'

বল্লী চমকিয়া বলিল— 'তা তো দেখিনি দেবি। নিজের ঘরে গিয়েছে বোধহয়। দেখবো ?'

'না— থাক।'

রানী শিখরিণী আরও কিছুক্ষণ অধর দংশন করিতে করিতে চিন্তা করিলেন। তারপর সহসা শয্যা হইতে নামিয়া বস্ত্রাঞ্চল সংবরণ করিতে করিতে বলিলেন—'বল্লী, আয় আমার সঙ্গে, কুহুর ঘরে আমাকে নিয়ে চল।'

বল্লী ভীতচক্ষে রানীর পানে চাহিল। রানীর মুখ দেখিয়া তাহার বুক শুকাইয়া গেল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সে নীরবে অগ্রবর্তিনী হইয়া রানীকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

কুহুর শয্যায় শয়ন করিয়া বজ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাতায়ন দিয়া নদীর জল-ছোঁয়া বাতাস প্রবেশ করিয়া তাহার কপালে বুকে স্নিগ্ধ করাঙ্গুলি বুলাইয়া দিতেছিল। আজ দ্বিপ্রহরে বজ্র ঘুমাইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার দেহের গ্লানি দূর হয় নাই। কুহুর কোমল শয্যায় শুইয়া মৃগমদ ও পুষ্পগন্ধে আচ্ছন্ন হইয়া সে গুঞ্জাকে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

গুঞ্জা যেন তাহার পাশে বসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিতেছে, বুকে কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছে। বলিতেছে— তোমার মাথায় ও কি ? সোনার মুকুট। ছি ছি ফেলে দাও, আমি তোমাকে পলাশ ফুলের মালা পরিয়ে দেব—

গুঞ্জা ! কুঁচবরণ কন্যা !...কিন্তু এ কে ? এ তো গুঞ্জা নয় ! এ কি কুহু !...না, কুহুর মুখ এত সুন্দর নয়, গুঞ্জার মুখও এত সুন্দর নয়। মুখখানা যেন চেনা চেনা...কী তপ্ত নিশ্বাস, বুকের উপর পড়িয়া বুক যেন পুড়াইয়া দিতেছে—

গুঞ্জা কোথায় গেল ?...এই নারীর চোখের দৃষ্টি এত তীব্র কেন ? না—না।...মনে পড়িয়াছে— রানী শিখরিণী ! কিন্তু—না—না ! গুঞ্জা কোথায় ?

রানী শিখরিণী সরিয়া গেল...দ্বার খুলিয়া বাহিরে কাহার সহিত কথা কহিল, আবার দ্বার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল— তাহার হাতে একগুচ্ছ ধূমনিঃস্যন্দী ধূপশলাকা...কিসের ধূপ ! রানী শলাকাগুলি তাহার মুখের কাছে নাড়িতেছে...

ধূপের গন্ধে মাদকতা আছে। বজ্রের শরীর যেন বিবশ হইয়া আসিতেছে। শরীরে অনুভূতি আছে, চেষ্টা নাই—মন কিন্তু সজাগ ; সে জাগিয়া আছে, তবু যেন ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে...

তাহার চোখে রানী নিদালীর মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সে চোখের পাতা খুলিতে পারিতেছে না...অথচ সে জাগিয়া আছে, সমস্তই অনুভব করিতেছে—

গুঞ্জা, তুমি কোথায় ? সোনার মুকুট ভাল নয়, তুমি আমাকে পলাশ ফুলের মালা পরাইয়া দাও—

গুঞ্জা ! তুমি কি রানীর ছদ্মবেশে আমার কাছে আসিয়াছ ! তাই কি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না ! কুঁচবরণ কন্যা— !

রাজার প্রমোদভবন অবরোধ হইতে অনেকখানি দূরে, প্রাসাদের অন্য প্রান্তে। কুহু অলিন্দ দিয়া সেই দিকে চলিল। কখনও এক প্রস্থ সোপান অবরোহণ করিয়া কখনও এক প্রস্থ আরোহণ করিয়া খদ্যোতের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে চলিল। যতই প্রমোদভবনের কাছে আসিতে লাগিল ততই বাদ্যযন্ত্রের শব্দ স্পষ্টতর হইতে লাগিল— ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি।

অবশেষে কুহু প্রমোদকক্ষের দ্বারে পৌঁছিল।

প্রমোদকক্ষটি আয়তনে বৃহৎ, কিন্তু সর্বত্র সমভাবে আলোকিত নয়। মধ্যস্থলে অনেকগুলি

উচ্চ দীপদণ্ড চক্রাকারে সাজানো রহিয়াছে, ছাদ হইতেও শৃঙ্খল-লম্বিত দীপাধার ঝুলিতেছে। কিন্তু এই চক্রের বাহিরে অধিক আলো নাই, কোণে কোণে ছায়ান্ধকার ; কক্ষে অনেকগুলি মানুষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—তাহা সহসা ধরা যায় না।

মানুষগুলি কিন্তু সকলেই স্ত্রীজাতীয়। এমন কেহ নাই যে রূপসী ও নবীনা নয় : তাহাদের বেশভূষা সংক্ষিপ্ত, বুকে কাহারও কাঁচুলি আছে, কাহারও নাই। তাহারা গুচ্ছে গুচ্ছে হর্ম্যতলে বসিয়া আছে, কেহ বা আস্তরণের উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে। যাহারা আলোকচক্র হইতে দূরে আছে তাহাদের অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। আলোকচক্রের মাঝখানে এক বিরলবসনা সভানন্দিনী নৃত্য করিতেছে ; আলোকবিভ্রান্ত প্রজাপতির ন্যায় তাহার নৃত্যের ভঙ্গি। তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তিনটি যুবতী বীণা, মৃদঙ্গ ও মঞ্জীরা বাজাইতেছে— ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি।

রাজা অগ্নিবর্মা যে এই কক্ষে আছেন তাহা সহসা লক্ষ্যগোচর হয় না। কেন্দ্রীয় দীপচক্র হইতে অল্প দূরে একটি স্তম্ভে পৃষ্ঠ অর্পণ করিয়া তিনি বসিয়া আছেন। অগ্নিবর্মার অস্থিসার মুখে শ্মশ্রু গুম্ফ নাই, বক্ষও কেশহীন ; মাথার চুল নারীর মত দীর্ঘ। তিনি স্তিমিতচক্ষে নর্তকীর পানে চাহিয়া আছেন। ছাগ-চক্ষুর ন্যায় ভাবলেশহীন চক্ষুর্দ্বয়, কিন্তু তাহাদের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন উন্মাদনা।

কুহু উঁকি দিয়া দেখিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিল না। অর্জুনসেন রাজার অন্তরঙ্গ, নিজস্ব বৈদ্য, সর্বদা রাজার সন্নিধানে থাকা তাহার কর্তব্য। কিন্তু কুহু প্রমোদকক্ষের ছায়াচ্ছন্ন কোণে কোণে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ভিতরে নৃত্যের তাল ক্রমে দ্রুত হইতেছে। দ্বারের কাছে এক বিপুলকায়া প্রৌঢ়া রমণী হাতে খোলা তলোয়ার লইয়া বসিয়া আছে, সে এই প্রমোদকক্ষের দৌবারিকা। কিন্তু দ্বার রক্ষার দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, নৃত্যলীলার দিকেও নাই। সে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে।

কুহু দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্বিধায় পড়িল। অন্তরঙ্গ অর্জুনসেনকে সে কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইবে ? খুঁজিলেই কি পাওয়া যাইবে ? কুহু ভাবিল, আজ থাক, কাল পত্র দিলেই হইবে। নিজের ঘরের দিকে কুহুর মন টানিতেছিল।

কুহু ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, দেখিল অলিন্দ দিয়া অর্জুনসেন আসিতেছে। তাহার পিছনে এক কিঙ্করী, কিঙ্করীর হস্তে পূর্ণ পানপাত্র।

অন্তরঙ্গ অর্জুনসেনের বয়স পঁয়ত্রিশ, নধর মসৃণ আকৃতি, মাথায় তৈলসিক্ত কুঞ্চিত কেশ, কুঞ্চিত গুম্ফ, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, যেন সর্বদাই বাষ্পোৎফুল্ল। কুহুকে দেখিয়া সে গতি শ্লথ করিল, কিঙ্করীকে বলিল— 'তুমি মহারাজকে পানীয় দাও গিয়ে, আমি যাচ্ছি।'

কিঙ্করী প্রমোদকক্ষে প্রবেশ করিল। কুহু মৃদুস্বরে অর্জুনসেনকে কোদণ্ড মিশ্রের বার্তা জানাইল ও সঙ্কেতলিপি দিল।

অর্জুনসেনের বাষ্পোৎফুল্ল চোখে একটু কৌতুক দেখা দিল, সে স্নিগ্ধস্বরে বলিল— 'অমাবস্যার রাত্রি ? ভাল। নিবন্ত প্রদীপে ফুঁ দেওয়া বৈ তো নয়, তা দেব। আর্য কোদণ্ড মিশ্রকে আমার প্রণাম দিয়ে বোলো, শ্রীমন্মহারাজ একদিন আমাকে অম্বষ্ঠ বৈদ্য বলেছিলেন সে কথা আমার মনে আছে।'

কুহু একবার অর্জুনসেনের স্নিগ্ধ মুখের পানে চাহিল, একবার দ্বারের ভিতর দিয়া পানপাত্র হস্তে উপবিষ্ট মহারাজের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল, তারপর নিঃশব্দ ক্ষিপ্রচরণে ফিরিয়া চলিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ
বিষ মন্থন

কুহুর ঘরের বাহিরে অলিন্দের প্রদীপটি নিব-নিব হইয়াছিল, তাহার অস্থির প্রতিচ্ছায়া ভৌতিক আকার গ্রহণ করিয়া প্রাচীরগাত্রে নৃত্য করিতেছিল।

কুহু কোনও দিকে না চাহিয়া নিজের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, হাত তুলিয়া শিকল খুলিতে গিয়া থমকিয়া গেল। শিকল খোলা! কুহুর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল, সে দ্বারে হাত রাখিয়া চাপ দিল। দ্বার খুলিল না, ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ। কুহুর দেহের রক্ত হিম হইয়া গেল, সে বুদ্ধিভ্রষ্টের মত দ্বারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় পিছন হইতে কেহ তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। কুহু ভীতচক্ষে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল— বল্লী! বল্লী হাত ধরিয়া তাহাকে দূরে টানিয়া লইয়া গেল, ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল— 'কুহু, আজ তুমি মরেছ।'

কুহু চাপা গলায় বলিল—'আমার ঘরে কে দোর দিয়েছে?'

'তা এখনও বোঝোনি? রানী।— তোমার ঘরে কি কেউ ছিল?'

'ছিল কেউ।'

'বুঝেছি। কিন্তু তাকে আর পাবে না, রানী তাকে বশ করেছে। তোমার নাগর শক্ত মানুষ বলতে হবে, বশীকরণ-ধূপ দিয়ে তাকে বশ করতে হয়েছে।'

গলা আরও নিম্ন করিয়া বল্লী যাহা দেখিয়াছিল এবং যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহা বলিল। শুনিয়া কুহু হাত কামড়াইল।

বল্লী বলিল—'হাত কামড়ালে কি হবে? এখন পালাও, রানী যদি তোমাকে পায় তোমার ধড়ে মাথা থাকবে না।'

কুহু তাহা বুঝিয়াছিল। রানীর ঈপ্সিত বস্তু সে নিজের জন্য লুকাইয়া রাখিয়া রানীকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, রানী তাহা জানিতে পারিয়াছে। ধরা পড়িলে আর রক্ষা নাই, রানী তাহাকে তুষানলে পুড়াইয়া মারিবে। কুহু আর কাল ব্যয় না করিয়া রাজপুরীর কুটিল চক্রব্যূহের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কুহু শৈশব হইতে রাজ-অবরোধে পালিত, অবরোধের অন্ধি-সন্ধি তাহার নখদর্পণে। সে একটি অতি নিভৃত গূঢ় কক্ষে গিয়া লুকাইয়া রহিল। এখানে কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না।

ধূলিমলিন অন্ধকার কোটরে একাকিনী বসিয়া উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কুহু তীব্র প্রতিহিংসা-চিন্তায় মনের বল্‌গা ছাড়িয়া দিল। তাহার ইচ্ছা হইল রাজাকে গিয়া সংবাদ দিবে, অগ্নিবর্মার হাত ধরিয়া ব্যভিচার-রতা রানীকে ধরাইয়া দিবে। কিন্তু তাহাতে বজ্রের প্রাণনাশ অনিবার্য। কুহু রুদ্ধবীর্য সর্পিণীর মত সারা রাত্রি তর্জন করিতে লাগিল।

তৃতীয় প্রহরের ভেরী বাজিয়া গেলে কুহু নিঃশব্দে উঠিয়া গুপ্ত কক্ষের বাহিরে আসিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে; রাজপুরীর অলিন্দপথে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকে গাঢ় তমিস্রা, একটি দীপও জ্বলিয়া নাই।

নিজের দ্বারের কাছে আসিয়া কুহু সন্তর্পণে হাত দিয়া অনুভব করিল, দ্বার খোলা। সে কক্ষে প্রবেশ করিল, কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শুনিল, শয্যা হইতে একজনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসিতেছে।

কুহু দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, ঘরের কোণে গিয়া কম্পিত হস্তে প্রদীপ জ্বালিল, তারপর ছুটিয়া গিয়া শয্যার পাশে দাঁড়াইল।

বজ্র চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছে, ধীরে ধীরে তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে। কুহু তাহার বাহু ধরিয়া নাড়িল, কানে কানে নাম ধরিয়া ডাকিল— মধুমথন ! বজ্র কিন্তু জাগিল না। ইহা কি নিদ্রা ? না মাদকজাত মোহাচ্ছন্নতা ?

বজ্রের সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া কুহুর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। বল্লী না দেখিয়াও যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহা সত্য। কুহু দন্তে অধর কাটিয়া রক্তাক্ত করিল।

এদিকে রাত্রি ফুরাইয়া আসিতেছে। রানী চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আবার কখন তাহার কি মতি হইবে কে জানে ! কুহু ত্বরান্বিত হইয়া বজ্রের পরিচর্যা আরম্ভ করিল। মারণ উচাটন বশীকরণের যেমন ঔষধ ও প্রক্রিয়া আছে তাহার প্রতিষেধক ঔষধ প্রক্রিয়াও আছে। কুহু বজ্রের মাথায় শীতল জল দিল, সিক্ত বস্ত্র দিয়া বক্ষস্থল মুছিয়া দিল, আরও নানা প্রক্রিয়া করিল। অবশেষে বজ্র রক্তাভ চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

তাহার দেহমনের জড়তা কাটিতে আরও কিছুক্ষণ গেল। সে উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিল— 'আমি এখানে কেন ?'

কুহু তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল— 'তুমি রাজপুরীতে এসেছিলে মনে নেই ? আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে।'

বজ্র স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল— 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু—'

কুহু বলিল— 'তারপর বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিলে। ও কথা ভুলে যাও। রাত আর নেই। চল, তোমাকে কোদণ্ড ঠাকুরের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কোদণ্ড ঠাকুর !—চল।'

কুহুর হাত ধরিয়া বজ্র ঘাটে আসিল। পূর্বাকাশে তখনও ঊষার উদয় হয় নাই, শুকতারা প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ দপ্ দপ্ করিতেছে।

কুহু বজ্রকে ডিঙিতে বসাইল, হাতে বৈঠা ধরাইল দিল। বজ্র যন্ত্রবৎ বৈঠা টানিতে লাগিল।

তাহারা যখন কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে পৌঁছিল তখনও তাঁহার ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তিনি উষ্ণ মস্তিষ্কে কুটির মধ্যে পাদচারণা করিতেছেন। এই এক অহোরাত্রের মধ্যে বৃদ্ধের দেহ আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট ; চক্ষে জ্বরাক্রান্ত দৃষ্টি। বজ্রকে দেখিয়া তিনি দুই হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন— 'বজ্র ! তুমি কোথায় গিয়েছিলে বৎস ? তোমাকে খুঁজে না পেয়ে আমি ভেবেছিলাম আমার সমস্ত আয়োজন বুঝি পণ্ড হল ! কোথায় ছিলে তুমি ?'

বজ্র নিরুত্তর রহিল। কোদণ্ড মিশ্র কুহুর পানে চাহিলেন। কুহু তাঁহার কাছে সরিয়া গিয়া হ্রস্বকণ্ঠে ব্যাপার বুঝাইয়া দিল, নিজের অভিসন্ধিটুকু গোপন রাখিয়া বাকি সব সত্য কথা বলিল। শুনিয়া কোদণ্ড মিশ্র বিস্ফারিত নেত্রে বজ্রের পানে চাহিলেন, বলিলেন— 'কি বিপত্তি ! যদি ধরা পড়ত ! যদি প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ত ! —কিন্তু যাক, বাঘিনীর কবল থেকে ফিরে এসেছে এই যথেষ্ট। বজ্র, এখন থেকে তুমি আর কোথাও যাবে না, সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা এখানে থাকবে। কুহু, তুমিও আর অবরোধে ফিরে যেও না, বাঘিনী তোমাকে পেলে নিশ্চয় হত্যা করবে।'

কুহু প্রজ্বলিত চক্ষে বলিল—'আমি ফিরে যাব, এমনভাবে লুকিয়ে থাকব যে রানীর সাধ্য নেই আমাকে খুঁজে বার করে। কোকবর্মা রানীকে চুলে ধরে টেনে নিয়ে যাবে— নিজের চোখে দেখব তবে আমার বুক ঠাণ্ডা হবে।' বজ্রের কাছে গিয়া বলিল— 'অমাবস্যার পরদিন রাজপুরীতে আবার দেখা হবে।'

কুহু চলিয়া গেল। বজ্র বাহিরে আসিয়া ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইল। নদীর ওপারে চক্রবাক-পক্ষের ন্যায় ঈষৎ রক্তিমা দেখা দিয়াছে, আর একটি নূতন দিনের সূচনা হইতেছে।

সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া বজ্রের মস্তিষ্কের কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গেল। তাহার মনে হইল, সেই যে বটেশ্বর ও বিম্বাধরের সঙ্গে সে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল তাহার পর এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে।

সূর্যোদয় হইলে বজ্র স্নান করিতে জলে নামিল। গঙ্গার স্নিগ্ধশীতল জলে অবগাহন করিয়া তাহার দেহমন সুস্থ হইল।

এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নাই, দুই হাতে সবেগে গাত্রমার্জন করিতে করিতে তাহার চোখে পড়িল, বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয়! সোনার অঙ্গুরীয়, মাঝখানে গাঢ় নীল একটি মণি। বজ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অনেকক্ষণ অঙ্গুরীয়টি নিরীক্ষণ করিল। কোথা হইতে আসিল অঙ্গুরীয়? কে পরাইয়া দিল? গত রাত্রে তাহার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের এমন অবিচ্ছেদ্য জড়াজড়ি হইয়া গিয়াছিল যে কিছুই সে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছিল না। কিন্তু এই আংটি নিশ্চয় স্বপ্ন নয়। আংটির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল ইহার সহিত যেন কোন অজ্ঞাত অশুচিতার স্পর্শ লাগিয়া আছে। সে আংটি খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু ফেলিতে গিয়া সে থামিয়া গেল। আংটি এত সুন্দর, তাহার নীলবর্ণ মণি হইতে এমন অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে যে সে তাহা জলে ফেলিয়া দিতে পারিল না। বিশেষত মূল্যবান কোনও বস্তু নষ্ট করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে একটু চিন্তা করিয়া আবার উহা অঙ্গুলিতে পরিধান করিল।

স্নান শেষে সে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিল এবং সিক্তবস্ত্রে গঙ্গার কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আজও বুড়ি কানসোনার হাটে গিয়াছে। গঙ্গা পা ছড়াইয়া বসিয়া সলিতার পাঁজ কাটিতেছিল, হাসিমুখে উঠিয়া শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিল, ধামিতে মুড়ি শসা কলা গুড় নারিকেল আনিয়া সম্মুখে রাখিল।

অর্ধমুদিত চক্ষে খাইতে খাইতে বজ্র বলিল—'গঙ্গা, তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।'

'কী জিনিস?' গঙ্গা উৎসুক আনন্দে চাহিল।

বজ্র আংটি খুলিয়া তাহার হাতে দিল। আংটি হাতে লইয়া গঙ্গার মুখে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল; ভয় সম্ভ্রম আনন্দ সঙ্কোচ ক্ষণকালের জন্য তাহাকে নির্বাক করিয়া দিল। তারপর সে রুদ্ধশ্বাসে বলিল— 'এ আমার জন্যে এনেছ! এত সুন্দর আংটি! এ নিয়ে আমি কি করব?'

বজ্র বলিল—'এখন রেখে দেবে। যখন তোমার বিয়ে হবে তখন এই আংটি বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে। সেই টাকা নিয়ে তুমি আর তোমার বর সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করবে।'

লজ্জায় আহ্লাদে গঙ্গার মুখখানি সিন্দূরবর্ণ হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ
গৌড়ের সিংহাসন

অমাবস্যার পরদিন প্রত্যূষে কর্ণসুবর্ণের অধিবাসীরা শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্বেই শুনিল, রাজপথ দিয়া ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে একদল পদাতিক সৈন্য চলিয়াছে। সকলে দ্বার গবাক্ষ খুলিয়া দেখিতে লাগিল। পথ দিয়া দীর্ঘ সর্পিল সেনাদল চলিয়াছে। তাহাদের পৃষ্ঠে চর্ম, হস্তে শল্য, কটিবন্ধে তরবারি। তাহারা রাজপ্রাসাদের দিকে চলিয়াছে।

সেনাদলের অগ্রভাগে একটি সুসজ্জিত রথ। রথের ছত্র নাই, মুক্ত রথে পাশাপাশি বজ্র ও কোদণ্ড মিশ্র দাঁড়াইয়া আছেন। কোদণ্ড মিশ্রের শীর্ণ হস্তে অশ্বের রশ্মি, তিনি রথ

চালাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, শুদ্ধ প্রাণশক্তির বলে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষে বিজয় গর্ব পরিস্ফুট। তাঁহার পাশে বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া বজ্র দাঁড়াইয়া। বজ্রের মাথায় ধাতুময় শিরস্ত্রাণ, বক্ষে বর্ম, মুখে বজ্রকঠোর দৃঢ়তা। সে অচঞ্চলচক্ষে সম্মুখ দিকে চাহিয়া আছে।

রথের অগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে কোকবর্মা। সে কদাকার মুখে বিকৃত ভঙ্গিমা লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া আছে, দেহে লৌহজালিক, হস্তে বিনিষ্ক্রান্ত অসি। সে দক্ষিণে বামে মর্কট-চক্ষু ফিরাইয়া পথিপার্শ্বস্থ জনগণের মুখভাব পর্যবেক্ষণ করিতেছে, যেন মুখ দেখিয়া তাহাদের মনোভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছে।

সর্বাগ্রে শাসন-ডিণ্ডিম ধ্বনিত করিয়া ঘোষক পদব্রজে চলিয়াছে। চলিতে চলিতে ডিণ্ডিম থামাইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে— নগরবাসিগণ, অবহিত হও। অগ্নিবর্মার কালান্ত হয়েছে। কিন্তু গৌড়ের সিংহাসন শূন্য নয়। পুরুষব্যাঘ্র মহারাজ শশাঙ্কদেবের পৌত্র, অমিতবীর্য মহারাজ মানবদেবের পুত্র পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ বজ্রদেব তাঁর পিতৃপুরুষের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তোমরা মহারাজ বজ্রদেবের জয় ঘোষণা কর।

নাগরিকেরা কিন্তু জয় ঘোষণা করিতেছে না। তাহারা উৎসুক নেত্রে শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করিতেছে, কিন্তু এই রাজ-পরিবর্তন ব্যাপারে নিজেদের অংশভাক্ মনে করিতেছে না। কোন রাজা মরিল, কোন নূতন রাজা আসিল, এ বিষয়ে তাহাদের কৌতূহল থাকিতে পারে কিন্তু তদধিক কিছু নয়। কে যাইবে রাজা মহারাজার ব্যাপারে মাথা গলাইতে? নিরুপদ্রবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই যথেষ্ট।

জনগণের মধ্যে কেবল একদল লোক এই আকস্মিক ঘটনাসম্পাতে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা জয়নাগের দল। জয়নাগের ষড়যন্ত্র প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল ; সাধারণ যাত্রিকের বেশে তাঁহার দলের পাঁচ সহস্র যোদ্ধা কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। স্বয়ং জয়নাগ ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। গৌড়ের সেনাপতিরা যে-সময় দণ্ডভুক্তির সীমান্ত ঘিরিয়া বসিয়া জয়নাগের গতিরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন, চতুর জয়নাগ সেই অবকাশে জলপথে কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিয়া রাজ্যের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবার কৌশল করিয়াছিলেন। গৌড়ের সেনাপতিগণ যতক্ষণে সংবাদ পাইয়া রাজধানী রক্ষার জন্য ফিরিবে, ততক্ষণে পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত এবং সম্মুখে প্রতিবদ্ধ হইয়া ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। জয়নাগের এই কূটকৌশল কার্যে পরিণত হইতে আর দুই চারিদিন মাত্র বিলম্ব ছিল, সহসা এই নূতন সংস্থার উদ্ভব হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল।

সে যাহা হউক, কোকবর্মার সৈন্যদল ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে রাজপুরীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। অগ্নিবর্মার মৃত্যুসংবাদ রাজপুরীতে গোপন ছিল না, রক্ষী প্রতীহার দৌবারিক যে যেখানে ছিল পলায়ন করিয়াছিল। তৎপরিবর্তে কোদণ্ড মিশ্রের সংগৃহীত দুইশত পণ্য-যোদ্ধা পুরদ্বার রক্ষা করিতেছিল। ইহারা খস্-পুক্কস-হূণ-যবন শ্রেণীর যোদ্ধা ; ইহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, যে বেতন দিবে তাহার জন্যই যুদ্ধ করিবে। ইহারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, যাহার বেতন লইয়াছে তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

কোদণ্ড মিশ্রের আজ্ঞায় তাহারা তোরণদ্বার খুলিয়া দিল। কোকবর্মা সদলবলে পুরভূমিতে প্রবেশ করিল এবং পঞ্চাশজন বাছা বাছা অনুচর লইয়া অন্তঃপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। আর সকলে পুরী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। চিৎকার আর্তনাদ হুড়াহুড়ির শব্দে রাজপুরী পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কোদণ্ড মিশ্র বজ্রকে লইয়া রাজভবনের একদিকে চলিলেন। খস্-পুক্কসদের কয়েকজন

প্রধান যোদ্ধা রক্ষিরূপে তাঁহাদের সঙ্গে রহিল।

কোদণ্ড মিশ্র রাজার প্রমোদভবনে উপনীত হইলেন। লুণ্ঠনকারীরা এখনও এদিকে আসে নাই, কেবল একজন পুরুষ প্রমোদভবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, সে রাজার অন্তরঙ্গ অর্জুনসেন। তাহার কেশকলাপ সুবিন্যস্ত, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, বাষ্পোৎফুল্ল। অর্জুনসেন প্রফুল্ল মুখে বলিল— 'আর্য কোদণ্ড মিশ্র, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। মহারাজের জয় হোক।'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন—'অগ্নিবর্মার দেহ কোথায়?'

'এই যে। আসুন।' অর্জুনসেন অগ্রবর্তী হইয়া তাহাদের ভিতরে লইয়া গেল। বিশাল ভবন শূন্য, ছায়ান্ধকার; রাত্রির ক্লেদ যেন এখনও তাহার বাতাসে লাগিয়া আছে। কোথাও পলাতকা সভানন্দিনীর দেহচ্যুত রঙ্গিন উত্তরীয় রক্তরেখার ন্যায় পড়িয়া আছে, কোথাও স্খলিত নূপুর গড়াগড়ি যাইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ শিলাকুট্টিমের উপর শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি শব। অর্জুনসেন বস্ত্রের প্রান্ত তুলিয়া দেখাইল। মৃত্যুর কঠিন স্পর্শে অগ্নিবর্মার কামনা-বিধ্বস্ত দেহ চিরতরে স্থির হইয়াছে।

বজ্র একবার সেইদিকে দেখিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইল। কোদণ্ড মিশ্র কিয়ৎকাল মৃত মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বিতৃষ্ণাসূচক মুখভঙ্গি করিলেন, তারপর রক্ষীদের বলিলেন— 'মৃতদেহ গঙ্গার জলে নিক্ষেপ কর। হয়তো সদ্‌গতি হবে।'

অগ্নিবর্মার দেহ প্রাকারশীর্ষ হইতে ভাগীরথীর জলে নিক্ষিপ্ত হইল। বজ্র ভাবিল তাহার পিতার দেহও এই পথে গিয়াছিল! গৌড় রাজগণের রাজপুরী হইতে নির্গমনের ইহাই বুঝি একমাত্র পথ।

অতঃপর সকলে সভাগৃহে আসিলেন।

ওদিকে রাজ-অবরোধে যে বীভৎস ব্যাপার চলিতেছিল তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। বেলা দ্বিপ্রহরে কোকবর্মা ও তাহার সৈন্যগণ লুণ্ঠনকার্য শেষ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য পুরপ্রাঙ্গণে রক্ষণ করিল; রানী শিখরিণীকে দোলায় তুলিল। তারপর বিদায় গ্রহণের পূর্বে কোকবর্মা কোদণ্ড মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কার্যসিদ্ধির দম্ভে তাহার কদর্য মুখ আরও কদর্য আকার ধারণ করিয়াছে, মদমত্ততার বশে দেহ টলিতেছে। সে উচ্চ বিকৃতকণ্ঠে হাস্য করিয়া বলিল— 'ঠাকুর, আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার আমি চললাম। তোমার রাজা আর তুমি মনের সুখে রাজত্ব কর।' বলিয়া আবার ধৃষ্টতা-ভরা হাসি হাসিল।

কোকবর্মাকে দেখিয়া বজ্রের অন্তর দুঃসহ ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। নরকের পশুটাকে পদাঘাত করিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া সে মুখ ফিরাইয়া বাতায়ন সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

কোকবর্মা বোধহয় কোদণ্ড মিশ্র ও বজ্রের নিকট বহু প্রশস্তি ও চাটুবচন আশা করিয়াছিল, কিন্তু বজ্রকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে শ্বাপদের ন্যায় দশন নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল— 'কুকুরের মাথায় রাজছত্র কতদিন থাকে দেখব।'

বজ্র বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কোকবর্মা উচ্চ ব্যঙ্গহাস্য করিতে করিতে দ্রুতপদে সভাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহার মনে যতই গরল থাক, বজ্রের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার দুঃসাহস তাহার নাই।

দুই দণ্ডের মধ্যে কোকবর্মার দল রাজপুরী ত্যাগ করিল। কোদণ্ড মিশ্রের সৈন্যদল তখন পুরী রক্ষার ভার লইল। তোরণে প্রাকারশীর্ষে সর্বত্র ধনুর্ধর রক্ষিগণ পাহারা দিতে লাগিল।

সভাগৃহে বজ্র ও কোদণ্ড মিশ্র ভিন্ন আর কেহ ছিল না; একটি রমণী দ্বারের নিকট উঁকি মারিল। বজ্র অমনি ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল— 'কুহু। তুমি কোথায় ছিলে?'

কুহু হাসিয়া বলিল— 'লুকিয়ে ছিলাম।' তারপর নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল—

'শ্রীমন্মহারাজ বজ্রদেবের জয় হোক।'

বজ্রের মুখ কঠিন হইল। সে কুহুকে হাত ধরিয়া তুলিয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল, কোদণ্ড মিশ্র আসিয়া বলিলেন— 'কুহু! ভালই হল। এখনই রাজার অভিষেক হবে। আজই অভিষেক করব। তুমি ব্যবস্থা কর।'

কুহু সবিস্ময়ে বলিল— 'সে কি ঠাকুর। লোকজন কৈ, সভাসদ কৈ? কার সাক্ষাতে অভিষেক হবে?'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন— 'আমি নগরে খবর দিয়েছি, প্রধান নাগরিকেরা এখনি আসবে। যদি না আসে তবু আমি একাই অভিষেক করব।'

'ভাল।' বলিয়া কুহু অভিষেকের ব্যবস্থা করিতে গেল।

প্রধান নাগরিকেরা আসিলেন না, কেহই আসিল না। কোদণ্ড মিশ্র কয়েকজন রক্ষীকে ডাকিয়া রাজসভায় সমবেত করিলেন। অবরোধে যে-কয়েকজন প্রৌঢ়া নারী অবশিষ্টা ছিল তাহারা আসিয়া হুলুধ্বনি করিল, লাজাঞ্জলি ছড়াইল; কুহু শঙ্খধ্বনি করিল। কোদণ্ড মিশ্র বজ্রের ললাটে রাজটিকা পরাইয়া দিলেন। বজ্র পিতৃপুরুষের সিংহাসনে বসিল। এইভাবে অভিষেকের হাস্যকর অভিনয় সম্পন্ন হইল।

সভা আবার শূন্য হইলে কোদণ্ড মিশ্র সভাগৃহের এক প্রান্তে একটি বেদিকার উপর শয়ন করিলেন। বৃদ্ধের মনের অবস্থা অনুমান করা যায় না, কিন্তু দেহ যে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত তিন চারিদিন যাবৎ তিনি অন্নজল গ্রহণ করেন নাই, নিদ্রাও যান নাই; এক সর্বগ্রাসী ভাবনা তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া বেদিকার উপর শয়ান রহিলেন।

সভাগৃহের অন্য প্রান্তে বসিয়া কুহু ও বজ্র নিম্নস্বরে কথা বলিতেছিল।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'অবরোধের অবস্থা কি?'

কুহু বলিল— 'ভাল নয়। যেন কদলী বনে একপাল বুনো হাতি ঢুকেছিল।'

'আর রানী?'

কুহু মলিন মুখে বলিল— 'রানীকে কোকবর্মা ধরে নিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম আমার আনন্দ হবে, কিন্তু দেখে কান্না এল।'

বজ্র সহসা বলিল— 'কুহু, চল এবার পালিয়ে যাই।'

কুহু বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল— 'সে কি, কোথায় পালিয়ে যাবেন?'

'যেখানে হোক। রাজা তো হলাম, আর কি!' বলিয়া বজ্র একটু তিক্ত হাসিল।

'কিন্তু—কিন্তু—এখনও যে সবই বাকি!'

'থাক বাকি। সত্যি বলছি, কুহু, আমার রাজা হওয়ার সাধ মিটে গেছে, নাগরিক জীবনে ঘৃণা জন্মেছে। এ জীবনযাত্রা আমার জন্যে নয়। আমি চলে যেতে চাই।'

কুহু গালে আঙুল রাখিয়া চিন্তা করিল, বজ্রের মুখের উপর গুপ্ত স্নেহদৃষ্টি বুলাইল, শেষে কোদণ্ড মিশ্রের দিকে মাথা নাড়িয়া বলিল— 'কিন্তু উনি? আপনি যদি চলে যান ওঁর কি অবস্থা হবে?'

বজ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল— 'সেই একটা কথা। ওঁর এই রাজা-রাজা খেলা দেখে কৌতুক আর করুণা দুইই অনুভব করছি, কিন্তু ওঁকে ছেড়ে যেতে পারছি না।'

বেলা তৃতীয় প্রহরে একজন গূঢ়পুরুষ সংবাদ লইয়া আসিল। বলিল— 'জয়নাগ ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে রাজপুরীর দিকে আসছেন।'

কোদণ্ড মিশ্র উঠিয়া বসিলেন— 'জয়নাগ!'

গুপ্তচর জয়নাগ সম্বন্ধে সামান্য যাহা সংবাদ পাইয়াছিল তাহা বলিল। শুনিয়া কোদণ্ড মিশ্র শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পকাল পরে দ্বিতীয় গুপ্তচর আসিল। সে সংবাদ দিল—'কোকবর্মা জয়নাগের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দু'জনে একসঙ্গে পুরী অধিকার করতে আসছে।'

কোদণ্ড মিশ্রের কণ্ঠমধ্যে অস্পষ্ট একটি শব্দ হইল। তিনি ধীরে ধীরে আবার শয়ন করিলেন।

সঙ্কল্পিত কর্মে সহসা অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া জয়নাগ চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা যে সংবাদ লইয়া আসিল তাহাতে তিনি যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলেন। বজ্রদেব নামক এক যুবক নিজেকে মানবদেবের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া অগ্নিবর্মাকে হত্যা করিয়াছে এবং নিজে রাজা হইয়া বসিয়াছে। তাহার পৃষ্ঠপোষক কেবল কোদণ্ড মিশ্র নামধারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং দুই সহস্র সেনার অধিনায়ক কোকবর্মা।

কোকবর্মার পরিচয় জয়নাগ পূর্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার দুই হাজার সৈন্য ব্যতীত অন্য কোনও রাজকীয় সেনাদল উপস্থিত কর্ণসুবর্ণে নাই। কোকবর্মার সেনাদল উত্তম যোদ্ধা বটে, কিন্তু কোকবর্মা স্বয়ং অতি হীন চরিত্র ব্যক্তি। উপযুক্ত উৎকোচ পাইলে সে যুদ্ধ করিবে না।

তারপর জয়নাগ সংবাদ পাইলেন, কোকবর্মা রাজপুরী লুঠপাট করিয়া সসৈন্যে নগরের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। জয়নাগ এই বিচিত্র সংবাদে উদ্বিগ্ন হইলেন, কোকবর্মা কোথায় যাইতেছে, কি জন্য যাইতেছে বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি ত্বরিতকর্মা কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি তৎক্ষণাৎ কোকবর্মার নিকট দূত পাঠাইলেন।

কর্ণসুবর্ণে কোকবর্মার বাসভবন ও সেনানিবাস ছিল। দূত সেখানে না গিয়া নগরের উত্তর তোরণের নিকট কোকবর্মাকে ধরিল। জনান্তিকে উভয়ে কথা হইল। দূতের প্রস্তাব শুনিয়া কোকবর্মার পাপবুদ্ধি আবার জাগ্রত হইল। সে বলিল— 'জয়নাগের প্রস্তাবে আমি সম্মত। তিনি যে গৌড় গ্রাস করবেন তা আগেই জানতাম, তাই সময় থাকতে কর্ণসুবর্ণ ছেড়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি যখন আমাকে তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে স্থান দিচ্ছেন তখন আমি তাঁর দলে; যে কুকুরটাকে আমি সিংহাসনে বসিয়েছি, তাকে আমিই সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেব। জয়নাগকে কোনও কষ্টই করতে হবে না।'

নিয়তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কোকবর্মা ফিরিয়া চলিল। ইতিমধ্যে জয়নাগ প্রকাশ্যভাবে নিজে সৈন্যদের সমবেত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, গোপনতার আর প্রয়োজন ছিল না। কোকবর্মা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং বন্দিনী রানীকে নিজভবনে পাহারার মধ্যে রাখিয়া জয়নাগের সঙ্গে যোগ দিল।

জয়নাগ স্থির করিয়াছিলেন নূতন রাজাকে শক্তি সংগ্রহ করিবার সময় দেওয়া হইবে না, গাছ শিকড় গাড়িবার পূর্বেই তাহাকে উৎপাটিত করিতে হইবে। তিনি কোকবর্মাকে পার্শ্বে লইয়া সম্মিলিত সৈন্যদলের অগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে চলিলেন। নগরের অধিবাসিগণ প্রাতঃকালে যেমন শোভাযাত্রা দেখিয়াছিল অপরাহ্ণেও তেমনি শোভাযাত্রা দেখিল। কেহ একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করিল না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ
উজান স্রোত

কুহু বজ্রকে রণসাজ পরাইয়া দিল। বুকে পিঠে লোহার সাঁজোয়া, মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, কটিতে তরবারি। পরাইতে পরাইতে কুহুর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এতদিনে পাপিষ্ঠা কুহু ভালবাসিয়াছে। শুধু দেহের আসক্তি নয়, এই সরল স্বল্পবাক্ অ নাগরিক মানুষটি তাহার হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছে।

বাষ্পোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কুহু বলিল— 'চল, পালিয়ে যাই। কাজ নেই যুদ্ধে।'

বজ্র বলিল—'আর হয় না। শত্রু আসছে, যুদ্ধ না দিয়ে পালাতে পারি না।'

'কিন্তু লাভ কি ? ওরা সাত হাজার, আমরা মাত্র দুশো জন।'

'তবু যুদ্ধ করতে হবে। যতক্ষণ একজন সৈনিক যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকবে ততক্ষণ আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তা ছাড়া কোদণ্ড মিশ্র আছেন। এ আমার যুদ্ধ নয়, কোদণ্ড মিশ্রের যুদ্ধ। তিনি যতক্ষণ আজ্ঞা না দিচ্ছেন ততক্ষণ লড়তে হবে।'

বজ্র তোরণের দিকে চলিল। তোরণদ্বার বন্ধ, তাহার ছায়াতলে পঞ্চাশজন যোদ্ধা প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যুদ্ধের উদ্দীপনা ছিল না। বজ্রের সসজ্জ মূর্তি দেখিয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। একজন অধিনায়ক সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিল— 'জয়নাগ আক্রমণ করতে আসছে একথা কি সত্য ?'

বজ্র বলিল— 'সত্য। তোমরা তোরণদ্বার বন্ধ রাখো, কিন্তু এমনভাবে বন্ধ রাখো যাতে সহজে খোলা যায়।'

'যে আজ্ঞা।'

বজ্র তখন প্রাকারের উপর উঠিল। আকৃষ্ট ধনুর ন্যায় অর্ধচক্রাকৃতি প্রাকার, তাহার উপর দেড়শত সৈন্য যথেষ্ট নয়। তথাপি তাহারা প্রসারিত হইয়া সতর্কভাবে অবস্থান করিতেছে, শত্রু বিনা বাধায় প্রাকার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। বজ্র সমস্ত পরিদর্শন করিয়া বুঝিল, ইহার অধিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। কিন্তু একটা দিক এখনও অরক্ষিত আছে। রাজপুরীর পশ্চাতে স্নানঘাট অরক্ষিত, শত্রু সেই দিক দিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। যদিও এ আশঙ্কা অমূলক, জয়নাগ এত অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট নৌকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই ; তবু সাবধান থাকা ভাল। বজ্র দশজন সৈনিককে ঘাট রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিল ; যদি ওদিক দিয়া আক্রমণ আসে তাহারা গতিরোধ করিতে পারিবে। অন্তত সংবাদ দিতে পারিবে।

তারপর সূর্যাস্ত হইতে যখন আর দুই দণ্ড বাকি আছে তখন দূরে রাজপথের অন্য প্রান্তে জয়নাগের সৈন্যদল দেখা দিল। অগ্রে দুই অশ্বপৃষ্ঠে জয়নাগ ও কোকবর্মা, পিছনে ঘনসন্নিবিষ্ট সৈন্য-সম্বাধ ; যেন জাঙ্গাল ভাঙ্গিয়া বন্যার স্রোত আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে ভেরী-তূরী নাই ; কিন্তু বিপুল জন-প্রবাহের সঞ্চরণ শব্দ অবরুদ্ধ গর্জনের মত শুনা যাইতেছে।

বজ্র তোরণশীর্ষে প্রাকারের উপর দাঁড়াইয়া ছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার বক্ষে হর্ষোন্মাদনা নৃত্য করিয়া উঠিল। এ দৃশ্য যেন তাহার চিরপরিচিত। অস্তোন্মুখ সূর্যের ছটায় সৈন্যদের পদোদ্ধূত ধূলা গৈরিকবর্ণ ধারণ করিয়া বিপুল বাহিনীর ঊর্ধ্বে কুণ্ডলিত হইতেছে। তাহার ভিতর দিয়া অস্ত্রের ঝকমকি, বহুবর্ণ কেতন পতাকার আন্দোলন। বজ্র নিজের সমাসন্ন বিপদ ভুলিয়া গেল, ইহারা যে শত্রু তাহা ভুলিয়া গেল। তাহার কর্ণমধ্যে রক্তের দ্রুত প্রবাহ ঝাঁঝর-ঝল্লরীর মত রণিত হইতে লাগিল ; তীব্রোজ্জ্বল চক্ষে স্ফুরিত নাসাপুটে সে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

তোরণ হইতে অনুমান তিনশত হস্ত দূরে আসিয়া জয়নাগ অশ্ব স্থগিত করিলেন : দক্ষিণ হস্ত

উত্তোলন করিয়া সৈন্যদের ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা দাঁড়াইল।

জয়নাগ কোকবর্মার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। উভয়ের দৃষ্টি দুর্গের উপর ; কথা কহিতে কহিতে সৈন্যদের পিছনে রাখিয়া দুই আরোহী সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

বজ্র তোরণশীর্ষ হইতে দেখিতেছিল। অশ্বারূঢ় ব্যক্তিদ্বয় কি কথা কহিতেছে সে শুনিতে পাইল না, কিন্তু কোকবর্মাকে চিনিতে পারিল। অন্য ব্যক্তি নিঃসন্দেহে জয়নাগ। বজ্রের চোখের দৃষ্টি কঠিন হইয়া উঠিল।

তোরণশীর্ষের যোদ্ধারা ধনুতে তীর যোজনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল ; এখনও শত্রু বহুদূরে, তীর নিক্ষেপ করা তীরের অপব্যয় মাত্র। সকলে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছে।

বজ্র একজন নায়ককে কাছে ডাকিল। অশ্বারূঢ় ব্যক্তিদের নির্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল— 'ওরা এখান থেকে কত দূরে বলতে পার ?'

নায়ক বিচার করিয়া বলিল—'আড়াইশো হাতের কম হবে না।'

বজ্র বলিল— 'ভাল। আমাকে একটা ধনু দাও।'

নায়ক বিস্মিত চক্ষু তুলিয়া বলিল— 'এত দূর থেকে—'

বজ্র বলিল— 'একটা ভাল ধনু দাও।'

অন্য যোদ্ধারা আসিয়া নিজ নিজ ধনু বজ্রকে দেখাইল। বজ্র একটি শার্ঙ্গ ধনু বাছিয়া লইল ; ধনুর্মুষ্টি লৌহের, দুই দিকে শৃঙ্গ। চতুর্হস্ত প্রমাণ ধনু, তাহাতে মৃগতন্তুর ছিলা। বজ্র ধনুর গুণ খুলিয়া আবার টান করিয়া গুণ পরাইল। তারপর অতি যত্নে দুইটি দ্বাদশমুষ্টি পরিমিত কঙ্কপত্রযুক্ত শর নির্বাচন করিয়া লইল।

অশ্বারূঢ় দুইজন ইতিমধ্যে আরও কিছু নিকটে আসিয়াছে ; তাহারা গভীরভাবে কোনও বিষয় আলোচনা করিতেছে। কিন্তু তাহারা এখনও দুইশত হস্তের অধিক দূরে আছে ; দুর্গ হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে তাহাদের নিকট পৌঁছিতে পারে, কিন্তু বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। বিশেষত জয়নাগ ও কোকবর্মা উভয়ের দেহই লৌহজালিকে আবৃত, তীর গায়ে পড়িলেও বিদ্ধ করিতে পারিবে না।

ঠিক দুইশত হস্ত পর্যন্ত আসিয়া জয়নাগ অশ্ব সংযত করিলেন ; যেন অবচেতন মন তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল ইহার অধিক নিকটে যাওয়া নিরাপদ নয়। দুই অশ্ব পাশাপাশি দাঁড়াইল ; দুই আরোহী প্রাসাদের দিকে চক্ষু তুলিলেন।

বজ্র ইন্দ্রকোষের ছিদ্রমুখে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে ধনুতে শরসংযোগ করিল। পাশে দাঁড়াইয়া নায়ক অন্য তীরটি ধরিয়া ছিল, মৃদুস্বরে বলিল— 'কিন্তু এখনও দুইশত হস্ত দূরে।'

বজ্র শুনিতে পাইল না। শর সন্ধান করিয়া ধীরে ধীরে গুণ আকর্ষণ করিল। কর্ণ পর্যন্ত গুণ আকর্ষণ করিয়া শর ছাড়িয়া দিল। টঙ্কার শব্দ হইল, যেন এক ঝাঁক ভ্রমর একসঙ্গে গুঞ্জন করিয়া উঠিল।

কোকবর্মা হাস্য করিতে করিতে কিছু বলিতেছিল ; তাহার মুখের হাসি সহসা মিলাইয়া গেল। সে নিজের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল একটি তীরের পুঙ্খ তাহার বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আছে। বজ্রের তীর তাহার লৌহজালিক ভেদ করিয়া বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ হইতে একটা শুষ্ক হিক্কার ন্যায় শব্দ বাহির হইল। তারপর সে ঘোড়ার পিঠ হইতে টলিয়া পড়িয়া গেল। নরাধম কোকবর্মা জানিতেও পারিল না যে তাহার লালসা-কলুষিত পঙ্কিল জীবনের অবসান হইয়াছে।

জয়নাগ কিন্তু নিমেষমধ্যে ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিজের ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া পশ্চাদ্দিকে

ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। বজ্র দ্বিতীয় শর লইয়া ধনুতে যোজনা করিয়াছিল, কিন্তু শরসন্ধান করিবার পূর্বেই জয়নাগ লক্ষ্যের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তোরণশীর্ষে যাহারা বজ্রের এই অদ্ভুত লক্ষ্যবেধ দেখিয়াছিল তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সাধারণ ধানুকী আশী হস্ত পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ করিতে পারে, মধ্যম ধানুকী দেড় শত হস্ত পর্যন্ত পারে। কিন্তু অসামান্য শক্তি না থাকিলে দুই শত হস্ত দূরস্থ শত্রুকে লৌহজালিক ভেদ করিয়া বধ করা অসম্ভব। যোদ্ধৃগণের উৎসাহ শত গুণ বর্ধিত হইল, এমন ধনুর্ধরের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া গৌরব আছে।

বজ্র ধনু প্রত্যর্পণ করিয়া তোরণশীর্ষ হইতে নামিয়া গেল। সে মনে বিশেষ কোনও উল্লাস অনুভব করিল না, কেবল ভাবিল— 'রাজা হয়ে অন্তত একটা সৎকার্য করেছি।'

ওদিকে কোকবর্মার তীরবিদ্ধ দেহ পথের উপর পড়িয়া ছিল, তাহার ঘোড়াটা পলায়ন করিয়াছিল। শত হস্ত পশ্চাতে বিস্ময়াহত সেনাদলের সম্মুখে জয়নাগ নিজ অধীনস্থ সেনানীদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রাসাদের রক্ষীরা যত অল্পসংখ্যক হোক তাহারা যুদ্ধ করিবে, স্বেচ্ছায় তোরণদ্বার খুলিয়া দিবে না। জয়নাগের সঙ্গে হস্তী নাই, দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপযোগী যন্ত্র নাই। এখন কী কর্তব্য?

ক্রমে সূর্য চক্রবালরেখা স্পর্শ করিল; রাত্রির আর বিলম্ব নাই। প্রাসাদের রক্ষিসৈন্যদের মুখেও উদ্বেগের ছায়া পড়িল। তাহারা নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে জল্পনা করিতে লাগিল: রাত্রি হইলে প্রাসাদ রক্ষা করা কিরূপে সম্ভব হইবে? অন্ধকারে গা ঢাকিয়া শত্রু যদি পাঁচ দিক দিয়া প্রাকার উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করে তবে তাহাদের নিবারণ করার উপায় কি? একবার তাহারা তোরণদ্বার খুলিয়া দিতে পারিলে আর রক্ষা নাই, পুরীর সকলকে মরিতে হইবে।

বজ্র বন্ধ তোরণদ্বারের সম্মুখে কুঞ্চিত ললাটে পাদচারণা করিতেছিল এমন সময় বাহিরে দূরে বহুজনের কলকোলাহল উত্থিত হইল। কোলাহল ক্রমশ কাছে আসিতেছে। তোরণশীর্ষ হইতে একজন যোদ্ধা ডাকিয়া বলিল— 'ওরা আক্রমণ করতে আসছে।'

নীচে হইতে একজন নায়ক প্রশ্ন করিল— 'কতজন?'

'তিন চারশো। একটা গো-শকট ঠেলে নিয়ে আসছে, বোধহয় তোরণদ্বার ভাঙবার জন্য।'

বজ্র ত্বরিতে প্রাকারে উঠিয়া একবার দেখিয়া আসিল। তারপর নিম্নে দ্বার-রক্ষীদের বলিল— 'তোমরা প্রস্তুত থাকো। ধনুর্বাণ রাখো, তরবারি নাও। আমি যা আদেশ করব তাই করবে।'

আক্রমণকারীরা কাছে আসিতেছে। তাহারা লক্ষ্যান্তরে আসিলে প্রাকার হইতে নিক্ষিপ্ত শর তাহাদের মধ্যে গিয়া পড়িতে লাগিল; তাহারা বামহস্তে বর্ম তুলিয়া ধরিয়া শর নিবারণ করিতে লাগিল। দুই চারিজন হতাহত হইল, কিন্তু তাহাদের গতি রুদ্ধ হইল না।

তোরণদ্বারের ভিতর দিকে পঞ্চাশজন অসিধারী যোদ্ধা অপেক্ষা করিয়া রহিল। তারপর শত্রুদল গো-শকট ঠেলিয়া সবেগে দ্বারের উপর আঘাত করিল। দ্বার অটুট রহিল বটে কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে বারম্বার এইরূপ আঘাত পাইলে দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় বার গো-শকট দ্বারের উপর সবেগে প্রহৃত হইল। তারপর বাহির হইতে উচ্চ পুরুষ কণ্ঠস্বর আসিল— 'শোন সবাই। তোমরা পুরী রক্ষা করতে পারবে না। যদি দ্বার খুলে দাও, যোদ্ধারা সকলে মুক্তি পাবে, জয়নাগ সকলকে নিজ সেনামধ্যে স্থান দেবেন। কিন্তু যদি বাধা দাও, বাতি দিতে কাউকে রাখব না। যদি ইষ্ট চাও দ্বার খুলে দাও।'

কিছুক্ষণ দ্বারের উভয় পক্ষ নীরব, কোনও শব্দ নাই। তারপর বজ্র তরবারি নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল— 'দ্বার খুলে দাও।'

বজ্রের পশ্চাতে যে পঞ্চাশজন রক্ষী ছিল তাহারা তাহার অভিপ্রায় বুঝিল। সকলে তরবারি

দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া দাঁড়াইল।

দ্বার খুলিয়া গেল। এত শীঘ্র দ্বারোন্মোচনের জন্য শত্রু প্রস্তুত ছিল না, তাহারা ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া রহিল। এই অবকাশে বজ্র ও তাহার দল সিংহনাদ করিয়া তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল।

অতর্কিত আক্রমণে প্রথমেই শত্রুদলের অনেক সৈনিক কাটা পড়িল। তারপর প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বজ্রের পক্ষে পঞ্চাশ, বিপক্ষে তিন শত। কিন্তু বজ্র একা এমন মত্তহস্তীর মত যুদ্ধ করিল যে কেহই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার সৈন্যগণও তাহার আদর্শে উদ্দীপ্ত হইয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিল। শত্রুপক্ষ যেন হতবুদ্ধি হইয়াই পলাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় অর্ধদণ্ড যুদ্ধ হইবার পর জয়নাগের দল গো-শকট ফেলিয়া মূল সৈন্যদলে ফিরিয়া গেল। বজ্রের রক্ষিদল বিজয়োল্লাসে শকট টানিয়া ভিতরে আনিল এবং আবার তোরণদ্বারে ইন্দ্রকীলক আঁটিয়া দিল।

বজ্র সম্পূর্ণ অক্ষতদেহে ছিল ; তাহার পক্ষের কয়েকজন যোদ্ধা অল্পবিস্তর আহত হইয়াছিল, কেহ মরে নাই। সকলে মহোল্লাসে বজ্রকে ঘিরিয়া কলরব করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাদের উল্লাস অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। একজন প্রবীণ যোদ্ধা অগ্রে আসিয়া বজ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল— 'মহারাজ, আপনার মত বীরের পাশে যুদ্ধ করতে করতে আমরা প্রত্যেকে প্রাণ দিতে পারি। কিন্তু প্রাণ দিয়ে লাভ কি ? আপনাকে রক্ষা করতে পারব না। ওরা অসংখ্য, আমরা মাত্র দুই শত। শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হবে।'

বজ্র বলিল— 'তোমাদের ইচ্ছা কি ?'

নায়ক বলিল— 'আমরা আপনার বেতনভুক্, যতক্ষণ আদেশ করবেন ততক্ষণ যুদ্ধ করব। কিন্তু প্রাসাদ রক্ষা করা যাবে না। আমাদের প্রাণ তো যাবেই, আপনারও প্রাণ যাবে। তার চেয়ে আপনি যদি গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করেন তখন আমাদের আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না। আমরা যেমন ইচ্ছা করতে পারব।'

বজ্র একটু চিন্তা করিয়া বলিল— 'আমিও নিরর্থক নরহত্যা চাই না। কিন্তু কোদণ্ড মিশ্র আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। তুমি এস আমার সঙ্গে।'

দুইজনে সভাগৃহের অভিমুখে চলিল। কুহু পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত প্রাসাদের মধ্যে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া বজ্রের সঙ্গে চলিল।

সভাগৃহ প্রায় অন্ধকার। কোদণ্ড মিশ্র বেদিকার উপর পূর্ববৎ শুইয়া আছেন। বহুক্লান্ত বৃদ্ধ গভীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ; কিন্তু এখন না জাগাইলে নয়। বজ্র তাঁহার কাছে গিয়া ডাকিল—'আর্য কোদণ্ড মিশ্র !'

কোদণ্ড মিশ্র উত্তর দিলেন না। বজ্র আবার ডাকিল, এবারও তিনি নীরব। তখন বজ্র তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেখিল অঙ্গ হিমবৎ শীতল। কোদণ্ড মিশ্র আর জাগিবেন না।

বজ্র কুহুর দিকে ফিরিয়া বলিল— 'কুহু, যাঁর জন্য যুদ্ধ তিনি নিজেই চলে গেছেন। সুতরাং আমাদের পালাতে আর বাধা নেই।' সেনানায়ককে বলিল— 'তোমরা দুর্গের দ্বার খুলে দাও। যুদ্ধ শেষ হয়েছে।'

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ
স্রোতের ফুল

কুহু ও বজ্র যখন স্নানঘাটে আসিল তখন দিনের চিতা নিভিয়া গিয়াছে, আকাশ হইতে যেন সেই চিতার ধূসর ভস্ম নদীর জলে ঝরিয়া পড়িতেছে। যে দশজন যোদ্ধাকে বজ্র ঘাট রক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিল তাহারা তখনও ঘাটের স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া শত্রুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। শত্রু কিন্তু আসে নাই। হয়তো এদিক দিয়া আক্রমণের কথা জয়নাগ চিন্তা করেন নাই, কিম্বা নৌকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরিপূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বেই আক্রমণ করিতে হইয়াছে বলিয়া এই অবস্থা।

বজ্র যোদ্ধাদের বিদায় দিল। তারপর দুইজনে ঘাটের কোণের দিকে গেল। স্তম্ভের ছায়াতলে ডিঙি বাঁধা আছে, দড়ি খুলিয়া উভয়ে আরোহণ করিল।

কুহু বলিল, 'কিন্তু কোথায় যাব তা তো জানি না।'

বজ্র বলিল, 'আমি জানি। দাঁড় আমায় দাও।'

দাঁড়ের টানে ডিঙি স্রোতের মুখে পড়িল, তারপর স্রোতের টানে সঙ্গমের দিকে ভাসিয়া চলিল।

বজ্র শিরস্ত্রাণ খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিল, বুক হইতে সাঁজোয়া খুলিয়া নদীতে বিসর্জন দিল। তরবারিও সেই পথে গেল। সে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল— 'বাঁচলাম।'

দুইজন ডিঙির দুই প্রান্তে বসিয়া আছে, অস্পষ্টভাবে পরস্পর দেখিতে পাইতেছে। কুহু জিজ্ঞাসা করিল— 'তোমার দুঃখ হচ্ছে না?'

বজ্র বলিল— 'না। তোমার হচ্ছে নাকি?'

কুহু বলিল— 'কি জানি। আমরা যে বেঁচে আছি এই আশ্চর্য মনে হচ্ছে।'

বজ্র বলিল—'আমার আশ্চর্য মনে হচ্ছে এতদিন নিজেকে চিনতে পারিনি। কিন্তু এবার পেরেছি। আমি শশাঙ্কদেবের পৌত্র, মানবদেবের পুত্র বটে, কিন্তু আমার প্রকৃত পরিচয়— আমি মধুমথন।'

ডিঙি দুই নদীর সঙ্গমস্থলে আসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ জলের প্রবল কল্লোলধ্বনি হইল, ডিঙি টলমল করিয়া দুলিতে লাগিল; তারপর ভাগীরথীর প্রবলতর স্রোতের মধ্যে গিয়া পড়িল। বজ্র তখন দুই হাতে বৈঠা লইয়া উজান টানিয়া চলিল।

আকাশে তারা ফুটিয়াছে; অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইলে অল্প দেখা যায়, পশ্চিমের তীর নিকটে। ডিঙি আলোকহীন রাজপুরীর প্রাকাররেখা ছাড়াইয়া চলিল। গতি কিন্তু অতি মন্দ; দাঁড়ের জোরে যেমন দুই হাত আগে যাইতেছে, স্রোতের টানে তেমনি এক হাত পিছাইতেছে।

কুহু জিজ্ঞাসা করিল— 'কোথায় যাচ্ছ?'

দাঁড় টানিতে টানিতে বজ্র বলিল— 'রাঙামাটির মঠে। সেখানে আমার একজন বন্ধু আছেন, হয়তো দেখা পাব। তারপর গ্রামে ফিরে যাব।

অনেকক্ষণ কথা হইল না। অন্ধকারে কেবল ছপ্‌ছপ্‌ দাঁড়ের শব্দ।

সহসা কুহু বলিল— 'আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?' বলিয়াই অন্ধকারে জিভ কাটিল।

বজ্রের নিকট হইতে উত্তর আসিল না। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল; তারপর বজ্র কথা বলিতে আরম্ভ করিল। কুহুর প্রশ্নের উত্তর দিল না; মৌরীতীরের ক্ষুদ্র গ্রামটির কথা, মায়ের কথা, গুঞ্জার কথা, চাতক ঠাকুরের কথা বলিতে লাগিল। যেন কাহাকেও শুনাইবার জন্য বলিতেছে না, আপন মনে বলিয়া চলিয়াছে। জলের কলধ্বনির মধ্যে কুহু কান পাতিয়া শুনিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহারা রাঙামাটির মঠের ঘাটে পৌঁছিল। বিস্তৃত ঘাটের পাশে বিপুলকায় চৈত্য আকাশে মাথা তুলিয়া আছে, চিনিয়া লইতে কষ্ট হইল না।

ঘাটে জনমানব নাই, সংঘ সুপ্ত। বজ্র ডিঙি ঘাটের পৈঠার উপর টানিয়া তুলিয়া রাখিল, যাহাতে স্রোতে ভাসিয়া না যায়। তারপর দুইজনে শুষ্ক সোপানের উপর পাশাপাশি বসিল। সংঘের কাহাকেও এখন জাগানো চলিবে না, নিশাবসান পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

কুহু বলিল— 'মধুমথন।'

'কী ?'

'তুমি চলে যাবে, তারপর আমি কি করব, কোথায় যাব বলে দাও।'

স্নেহে ও করুণায় বজ্রের বুক ভরিয়া উঠিল, সে বাহু দিয়া কুহুর পৃষ্ঠ জড়াইয়া লইয়া বলিল— 'চল, কুহু, তুমি আমার সঙ্গে গ্রামে চল।'

কুহু ধীরে ধীরে বলিল—'না, আমি ভুল বলেছিলাম। তোমার সঙ্গে গ্রামে গেলে তোমার জীবনে অনেক দুঃখ অশান্তি আসবে, তাতে কাজ নেই।—কিন্তু একদিন আমি যাব তোমার কাছে। যখন আমার আর যৌবন থাকবে না, তখন যাব। ততদিন আমাকে মনে থাকবে ?'

বজ্র গাঢ় স্বরে বলিল— 'থাকবে। আমি যাদের ভালবাসি তাদের ভুলি না।'

কুহু নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু বজ্র তাহার অশ্রু দেখিতে পাইল না।

ক্রমে দীর্ঘ রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। গঙ্গার বুক-ছোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, পূর্বাকাশে যেন একটু লালিমার স্বপ্ন। সংঘের ভিতর নিদ্রোত্থিত মানুষের ক্ষীণ সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইল। বজ্র বলিল—'কুহু, এবার তোমায় যেতে হবে। ডিঙি ভাসিয়ে একেবারে গঙ্গার আয়ির ঘাটে যেও, সেখানে কিছুদিন লুকিয়ে থেকো। তারপর— অদৃষ্ট যেদিকে নিয়ে যায়।'

কুহু বলিল— 'সেই ভাল। আমার তো আর কেউ নেই যার কাছে যাব।'

বজ্র বাহু হইতে অঙ্গদ খুলিয়া কুহুকে দিল, বলিল— 'এটা রাখো। দেখলে আমাকে মনে পড়বে।'

কুহু অঙ্গদটি আঁচলে বাঁধিল। আলো ফুটিতেছে, দু'জনে অনচ্ছভাবে পরস্পর মুখ দেখিতে পাইতেছে। কুহু জলভরা চোখ তুলিয়া বলিল— 'শুধু অঙ্গদ দেখলে তোমাকে মনে পড়বে ? না হলে পড়বে না ?'

বজ্র কুহুকে দুই বাহু দিয়া বুকের কাছে তুলিয়া লইল, তাহার অধরে চক্ষে ললাটে চুম্বন করিয়া নামাইয়া দিল।

কুহু কিছুক্ষণ বজ্রের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিল, তারপর ডিঙিতে গিয়া উঠিল। ডিঙি স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল।

মণিপদ্ম বজ্রকে ঘাটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল।

'আপনি ফিরে এসেছেন !'

মণিপদ্ম বজ্রের হাত ধরিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল ; তাহাকে আহার্য দিল। বজ্র বলিল— 'কানসোনায় টিকতে পারলাম না, পালিয়ে এলাম।'

মণিপদ্ম বিমনাভাবে বলিল— 'হ্যাঁ, আমরাও শুনেছি কি যেন গোলমাল হয়েছে।' তারপর উৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া বলিল—'আর্য শীলভদ্র কাল সমতট থেকে ফিরে এসেছেন। এবার আমরা নালন্দা যাব।'

'কবে ?'

'তা জানি না। আর্য শীলভদ্র জানেন।'

বজ্র তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া বলিল—'ভাই, তাঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দাও। তাঁকে কিছু বলবার আছে।'

মণিপদ্ম বজ্রকে শীলভদ্রের নিকট লইয়া গেল। শীলভদ্র পূর্বের ন্যায় গন্ধকুটির কোণের প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। বজ্র প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলে শীলভদ্র তাহার মুখ ক্ষণেক অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর বলিলেন— 'কর্ণসুবর্ণের সংবাদ কিছু কিছু পেয়েছি। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভুক্তভোগী। সব কথা বল।'

বজ্র সকল কথা বলিল। শুনিয়া শীলভদ্র দীর্ঘকাল নীরব রহিলেন, শেষে হাত নাড়িয়া যেন এ প্রসঙ্গ মন হইতে সরাইয়া দিয়া বলিলেন— 'বুদ্ধের ইচ্ছা।—এখন কি করবে স্থির করেছ ?'

বজ্র বলিল— 'আপনার কি উপদেশ ?'

শীলভদ্র বলিলেন— 'আমি আগে যা বলেছিলাম এখনও তাই বলি। গ্রামে ফিরে যাও। আর তোমার নাম যে বজ্রদেব তা ভুলে যাও।'

বজ্র নীরবে চাহিয়া রহিল। শীলভদ্র বলিলেন— 'কিন্তু পথঘাট এখন তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়। রাজা হবার পর তোমাকে সকলেই দেখেছে, সকলেই চিনতে পারবে। এ পথ দিয়ে ক্রমাগত সৈন্য যাতায়াত করছে, তারা সব জয়নাগের সৈন্য।' একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন— 'কিন্তু তুমি এক কাজ করতে পার। কাল প্রভাতে আমি নালন্দা যাত্রা করব, আমার সঙ্গে কয়েকজন ভিক্ষু থাকবেন। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাকো তাহলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম।'

শীলভদ্রকে নিজের কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে বজ্রের মন ক্লান্তি ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইল, আর কাজ নাই সংসারে ফিরিয়া গিয়া। এই মহাপুরুষের সঙ্গে জ্ঞানের মহাতীর্থে চলিয়া যাই, বুদ্ধের শরণ লই। তিনি আমাকে শান্তি দিবেন। মণিপদ্ম যে আনন্দের স্বাদ পাইয়াছে আমিও সেই আনন্দের স্বাদ পাইব।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল নিজ গ্রামের কথা। চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল চিরপ্রতীক্ষমানা মায়ের মুখ। অর্ধেক জীবন যাহার নিষ্ফল প্রতীক্ষায় কাটিয়াছে বাকি অর্ধেক জীবনও তাহার তেমনিভাবে কাটিবে! স্বামীহারা অভাগিনী পুত্রকেও ফিরিয়া পাইবে না? আর গুঞ্জা! গুঞ্জা দিনের পর দিন ন্যগ্রোধ বৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া তাহার পথ চাহিয়া থাকিবে—

বজ্র মস্তক নত করিয়া বলিল—' যে আজ্ঞা। আমি আপনার সঙ্গে যতদূর সম্ভব যাব, তারপর গ্রামের পথ ধরব।'

সেদিন বজ্র সংঘের একটি প্রকোষ্ঠে রহিল।

সারাদিন সংঘের সম্মুখস্থ পথ দিয়া দলবদ্ধ সৈন্যগণের যাতায়াত। পদাতি গজ অশ্ব, অধিকাংশই কর্ণসুবর্ণের দিকে যাইতেছে। সমবেত পদধ্বনির গমগম শব্দ, হস্তীর গলঘণ্টা, চিৎকার কোলাহল। সংঘে কিন্তু কেহ প্রবেশ করিল না, কোনও উৎপাত করিল না।

বজ্র নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই সকল শব্দ শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল— জয়নাগ প্রাসাদ অধিকার করিয়াছেন, নগর তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছে। নগরের উপর অধিকার দৃঢ় করিবার জন্য তিনি আরও সৈন্য আনিতেছেন। হয়তো যুদ্ধ বাধিবে। যে সকল সেনাপতি দণ্ডভুক্তির সীমানা রক্ষা করিতেছে তাহারা রাজধানী পতনের সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসিবে—

বজ্রের জল্পনা সর্বৈব মিথ্যা নয়, কিন্তু তাহার পক্ষে যাহা অনুমান করা সম্ভব নয় এরূপ অনেক ঘটনাও ঘটিতেছিল।

দণ্ডভুক্তি-অবরোধকারী সেনাপতিদের নিকট রাজধানী পতনের সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। তাঁহারা প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন; তারপর তাঁহাদের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। কেহ বলিলেন, জয়নাগ যখন কর্ণসুবর্ণে গিয়াছে তখন দণ্ডভুক্তি আক্রমণ করিব। কেহ বলিলেন, কর্ণসুবর্ণে ফিরিয়া গিয়া যুদ্ধ দিব। কেহ বলিলেন, রাজাই নাই, কাহার জন্য যুদ্ধ করিব? মতভেদ বাড়িয়াই চলিল। ইতিমধ্যে, দণ্ডভুক্তিতে জয়নাগের যে সৈন্য ছিল তাহারা তীব্রবেগে আক্রমণ করিল। একতাহীন হতোৎসাহ সেনাপতিগণ নিজ নিজ সৈন্য লইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহাদের ফিরিবার স্থান নাই, উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যগণকে শাসন করিবার শক্তি নাই, তাহাদের বেতন দিবার সামর্থ্য নাই। সৈন্যগণ এরূপ অবস্থায় যাহা করে তাহাই করিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া নিজের দেশ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সমগ্র দেশে গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

চতুর জয়নাগ আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিলেন না; ইহাতে তাঁহার ইষ্ট বই অনিষ্ট নাই। তিনি জানিতেন সৈন্যগণের এই উচ্ছৃঙ্খলতা একদিন শান্ত হইবে। এখন তাহাদের আশ্রয় নাই, একদিন তাহাদের আশ্রয়ের প্রয়োজন হইবে। তখন তাহারা নূতন রাজার পতাকাতলে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিবে। নূতন রাজার রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হইবে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ
পুনর্মিলন

পরদিন প্রাতঃকালে যাত্রারম্ভ করিতে কিছু বিলম্ব হইল। শীলভদ্রের সঙ্গে সমতট হইতে দুইটি চৈন ভিক্ষু আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও নালন্দা যাইবেন। সর্বসুদ্ধ দশ বারোজন যাত্রিক। মণিপদ্ম বজ্রকে চৈনিক বেশ পরাইয়া দিয়াছিল, যাহাতে তাহাকে সহজে কেহ চিনিতে না পারে; অঙ্গে চীনাংশুকের কষায়বর্ণ অঙ্গাবরণ জানু পর্যন্ত লম্বিত, মাথায় শুঁড়তোলা কানঢাকা শিরস্ত্রাণ।

যাত্রারম্ভ হইল। অগ্রে অশীতিপর শীলভদ্র দুইজন চৈন ভিক্ষুকে দুই পাশে লইয়া পদব্রজে চলিয়াছেন, তাঁহাদের পিছনে এক সারি ভিক্ষু। মাঝে চারিটি অশ্বতর দীর্ঘ পথের পাথেয় বহন করিয়া চলিয়াছে। চৈনিক শ্রমণদ্বয় বহু তালপত্রের পুঁথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন; সেগুলি দুইটি গর্দভের পৃষ্ঠে বাহিত হইতেছে। জন্তুগুলির পশ্চাতে মণিপদ্ম ও বজ্র তাহাদের তাড়না করিয়া লইয়া যাইতেছে। সর্বশেষে দুই সারি ভিক্ষু।

যাত্রিদল রাজপথ ধরিয়া উত্তর দিকে চলিল।

পথে সৈন্যদলের চলাচল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ পদাতিক সৈন্য, মাঝে মাঝে যূথবদ্ধ হস্তী অশ্ব বা রথ যাইতেছে। সকলের গতি কর্ণসুবর্ণের দিকে। কদাচিৎ বার্তাবাহী একক অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটাইয়া উত্তর মুখে যাইতেছে। তাহারা সকলে আপন আপন কর্মে ব্যগ্রনিবিষ্ট, পীতবাসধারী ভিক্ষুদের কেহ বিরক্ত করিল না।

মণিপদ্ম হ্রস্বকণ্ঠে বজ্রের সহিত নানা কথা বলিতে বলিতে চলিয়াছে। তাহার মুখে চোখে আনন্দ ক্ষরিত হইতেছে; সে যেন তাহার জীবনের চূড়ান্ত অভীপ্সা লাভ করিয়াছে, আর কিছু তাহার কাম্য নাই।

বজ্র চলিতে চলিতে নতমুখে শুনিতেছে, কিন্তু সব কথা শুনিতে পাইতেছে না। তাহার মন অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে দোল খাইতেছে। একদিকে বিম্বাধর বটেশ্বর কুহু শিখরিণী কোদণ্ড মিশ্র, অন্যদিকে মা গুঞ্জা চাতক ঠাকুর। এই দুইয়ের মাঝখানে যেন যুগান্তরের ব্যবধান।

কতদিন হইল সে গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়াছে। এক মাস ? এক বৎসর ? দশ বৎসর ? মাস বৎসর দিয়া এই সময়ের পরিমাপ হয় না। যখন আসিয়াছিল তখন তাহার মন ছিল শিশুর মত, আর এখন— ?

সন্ধ্যার পূর্বে তাহারা বনের কিনারায় পৌঁছিল। পথের পশ্চিমে বন ; এই বনের ভিতর দিয়া রত্তি ও মিত্তি তাহাকে পথ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। শীলভদ্র স্থির করিলেন এই স্থানেই রাত্রি যাপন করিবেন।

বন দেখিয়া বজ্রের মন অস্থির হইয়াছিল, সে শীলভদ্রের কাছে গিয়া বলিল— 'এই বন পার হয়ে আমি এসেছিলাম, আমার গ্রাম বনের পরপারে। যদি অনুমতি করেন এখনি যাত্রা করি।'

শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করিলেন— 'বন কত বড় ?'

বজ্র হিসাব করিয়া বলিল— 'এক দিনের পথ।'

শীলভদ্র বলিলেন— 'তবে আজ রাত্রিটা আমাদের সঙ্গে থাকো। কাল সকালে যেও।'

ভাগীরথীর তীরে একটি বৃক্ষতলে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইল। ক্রমে সূর্য অস্ত গেল ; আকাশে কৃশাঙ্গী চন্দ্রকলা দেখা দিয়াই অস্তমিত হইল। পথে সৈন্যদলের যাতায়াত থামিয়া গিয়াছে। বজ্র অশান্ত মন লইয়া রাজপথের এক প্রান্তে বসিয়া বনের পানে চাহিয়া রহিল।

রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইলে বজ্র লক্ষ্য করিল, বনের গভীর অন্তর্দেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু দেখা যাইতেছে। সম্ভবত আলোক নয়, আগুন ; অসংখ্য বৃক্ষকাণ্ডের অন্তরাল হইতে আলোকবিন্দু বলিয়া মনে হইতেছে। তারপর নিস্তব্ধ বাতাসে যেন অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ভাসিয়া আসিল। বজ্র অবহিত হইয়া শুনিল, আবার অশ্বের হ্রেষা শুনা গেল।

বজ্র গিয়া শীলভদ্রকে বলিল। শীলভদ্র বৃক্ষতলে বদ্ধাসন প্রস্তরমূর্তির ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। অদূরে ভিক্ষুগণ চুল্লী জ্বালিয়া রাত্রির জন্য রন্ধন করিতেছিলেন, চুল্লীর চঞ্চল প্রভা তাঁহার অস্থিসার মুখের উপর সঞ্চরণ করিতেছিল। তিনি বজ্রের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন— 'বোধহয় একদল সৈন্য ওখানে লুকিয়ে আছে। কোন্ দলের সৈন্য বলা যায় না ; জয়নাগের দলও হতে পারে, অপরপক্ষও হতে পারে। তা সে যে পক্ষই হোক, কাল তোমার বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হবে না। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে। আরও উত্তরে বন শেষ হয়ে মাঠ আরম্ভ হয়েছে। সেই মাঠ বোধহয় পশ্চিমে মৌরী নদীর তীরে গিয়ে শেষ হয়েছে। তুমি মাঠ ধরে পশ্চিমে গেলে গ্রামে পৌঁছুতে পারবে।'

রাত্রে বজ্র ভাগীরথীর সৈকতে শয়ন করিয়া জ্যোতিঃচর্চিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে বিস্ময়াবিষ্ট চিন্তার ক্রিয়া চলিতে লাগিল—আজ আমি মুক্ত আকাশের তলে শুইয়া আছি। কাল রাত্রে ছিলাম রক্তমৃত্তিকার সংঘারামে। তার আগের রাত্রে কোথায় ছিলাম ? সংঘের ঘাটে কুহুর সঙ্গে। তার আগের রাত্রে ? কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে। তার আগে ? রাজপুরীতে— ! কি বিচিত্র সঙ্গতিহীন মানুষের জীবন !

প্রাতে আবার যাত্রা আরম্ভ হইল।

তীব্র সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাত। পথ যতই উত্তরে যাইতেছে ততই জনবিরল হইতেছে। বজ্র আসিবার সময় যেমন দেখিয়াছিল তেমনি দেখিতে দেখিতে চলিল, ভাগীরথীর বুকে ছোট ছোট ডিঙা ও ভরা ভাসিতেছে, দুই একটা বহিত্র পালের ভরে চলিয়াছে ; নদীর উচ্চ পাড়ে গাঙ-শালিকের ঝাঁক কোটরের চারিপাশে কিচিমিচি করিতেছে ; একটা সারস পাখি জলের কিনারায় নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে। বজ্র ভাবিল, এই কি সেই পাখিটা, যাইবার সময় যাহাকে দেখিয়াছিলাম ? পাখিটা কি সেই অবধি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে !

বেলা দ্বিপ্রহরে যাত্রিদল বনের উত্তর প্রান্তে পৌঁছিলেন। বনের কোল হইতে মাঠ আরম্ভ

হইয়াছে— সীমাহীন শ্যামলতা—কালবৈশাখীর অকালবর্ষণ তৃণগুলিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। বজ্র এই তৃণের বর্ণ দেখিয়া যেন চিনিতে পারিল ইহা তাহার গ্রামের গোচারণ মাঠের তৃণ ! এই প্রান্তরের পরপারে তাহার একান্ত আপনার বেতসগ্রাম।

এই স্থানে সকলে মধ্যাহ্নের আহার সম্পন্ন করিলেন। তারপর বজ্র চৈনিক ছদ্মবেশ খুলিয়া নিজ বেশ পরিধান করিল ; মণিপদ্মকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিল ; শীলভদ্রের পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। শীলভদ্র তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া স্নেহগম্ভীর স্বরে বলিলেন— 'বৎস, সংসারে ফিরে যাও, এখনও তোমার অনেক কাজ বাকি আছে। সংসারকে ভয় কোরো না, তাকে জয় কোরো। আর মহাকারুণিকের করুণার জন্য হৃদয়ের দ্বার সর্বদা খুলে রেখো। কখন তাঁর কৃপা আসবে কেউ জানে না ; দেখো যেন এসে ফিরে না যায়।'

সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়াছে। বজ্রের ক্লান্তি নাই, জনহীন প্রান্তর দিয়া যতই সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ততই তাহার অধীরতা বাড়িতেছে। ঐ বুঝি মাঠের সীমান্তে তাহার গ্রাম দেখা যায়। না—গ্রাম নয়, কয়েকটি বর্বুর বৃক্ষ সারি দিয়া দিগন্তরেখার ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে।

সূর্যের প্রখর শুভ্রতা ক্রমে পীতাভ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাপের কিছুমাত্র হ্রাস নাই। বজ্রের সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে। বর্বুরশ্রেণীর বিরল ছায়াতলে ক্ষণেক বিশ্রাম করিলে অঙ্গের ঘাম শুকাইত, কিন্তু বজ্র থামিতে পারিল না। গৃহের এত কাছে আসিয়া থামা যায় না।

আরও ক্রোশেক পথ চলিবার পর বজ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে দৃষ্টি পড়িল, দিগন্তের কাছে সোনার সূতার মত কি যেন ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। বজ্র নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিল। ঐ আমার মৌরী নদী ! এতক্ষণে দেখা দিয়াছে।

বজ্র দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ দৌড়িয়া থামিল, চক্ষু হইতে ঘর্ম কলুষ মুছিয়া আবার দেখিল। হাঁ, মৌরী নদীই বটে। কিন্তু গ্রাম কোথায় ? বজ্র নদীর রেখা অনুসরণ করিয়া উত্তর দিকে চক্ষু সঞ্চালন করিল। —একস্থানে উচ্চভূমি নদীর সুবর্ণসূত্রকে অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বেতসগ্রাম ! কিন্তু গ্রামের মাথার উপর আকাশে যেন একটা কালো মেঘ স্থির হইয়া আছে। মেঘ ? না ধূম ?

বজ্র আবার ছুটিয়া চলিল।

মৌরী নদীর তীরে বেতসগ্রাম। কিন্তু গ্রাম আর চেনা যায় না। কুটিরগুলি একটিও নাই, তাহাদের স্থানে এক স্তূপ করিয়া ভস্ম পড়িয়া আছে। ভস্মস্তূপ হইতে এখনও মৃদু ধূম উত্থিত হইতেছে। জীবন্ত মানুষ নাই, এখানে ওখানে কয়েকটা মৃতদেহ পড়িয়া আছে।

কাল প্রাতে হঠাৎ একদল সৈন্য আসিয়াছিল, সংখ্যায় প্রায় এক হাজার। পূর্বে ইহারা অগ্নিবর্মার সৈন্য ছিল, এখন যূথভ্রষ্ট নায়কহীনভাবে লুঠপাট করিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের লোক তাহাদের আসিতে দেখিয়া অধিকাংশই পলায়ন করিয়াছিল। সৈন্যগণ প্রায় নির্বিবাদে গ্রামের সঞ্চিত শস্যাদি লুঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তারপর কুটিরগুলিতে আগুন দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

আজ অপরাহ্ণে ভস্মীভূত গ্রামের প্রান্তে দাঁড়াইয়া বজ্র ক্ষণকালের জন্য পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এ কি ! এই তাহার বেতসগ্রাম ! কেমন করিয়া এমন হইল ! গ্রামের লোক সব কোথায় ? মা কোথায় ? গুঞ্জা কোথায় ?

উন্মাদের মত বজ্র ভস্মচক্রের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইল আর 'মা' 'মা' বলিয়া চিৎকার করিল, কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। মৃতদেহগুলা সব পুরুষের। বজ্র একে একে তাহাদের চিনিল। গ্রামের

মহত্তর। আরও দুইজন বৃদ্ধ, যাহারা পলাইতে পারে নাই। গ্রামের কর্মকার রাজীব, কুম্ভকার শ্রীদাম। একটি মৃতদেহ এমনভাবে পড়িয়া আছে যে তাহার মুখ দেখা যাইতেছে না ; বজ্র ছুটিয়া গিয়া তাহাকে উল্টাইয়া দেখিল— মধু ! যে-মধুর সহিত গুঞ্জার জন্য তাহার লড়াই হইয়াছিল, সেই মধু। মধু গ্রাম রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়াছে। বজ্র মধু'র দুই বলিষ্ঠ বাহু ধরিয়া সবলে নাড়া দিতে দিতে বলিল— 'মধু ! মধু ! মা কোথায় ? গুঞ্জা কোথায় ?'

মধু'র নিকট হইতে উত্তর আসিল না। বজ্র কিছুক্ষণ মধু'র মৃত মুখের পানে পাগলের মত চাহিয়া রহিল, তারপর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ কি জীবিত নাই ? চাতক ঠাকুর ! তিনি কোথায় ? তিনি তো পলাইবার লোক নয়—

বজ্র দেবস্থানের অভিমুখে ছুটিল।

দেবস্থানে চাতক ঠাকুরের একচালা অক্ষত আছে। বজ্র প্রবেশ করিয়া দেখিল ঠাকুরের শুষ্ক শীর্ণ দেহ এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে ; তাঁহার মাথায় ও দেহে রক্ত শুকাইয়া আছে। বজ্র তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া আর্তস্বরে ডাকিল— 'ঠাকুর ! ঠাকুর !'

ঠাকুরের দেহে তখনও প্রাণ ছিল, তিনি কোটরগত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। বজ্রকে দেখিয়া তাঁহার ওষ্ঠ একটু নড়িল—'বজ্র এসেছিস ! ওরা বেঁচে আছে— পলাশবনের মধ্যে— !'

এইটুকু বলিবার জন্যই তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার মাথা বামদিকে হেলিয়া পড়িল, ক্ষীণ বক্ষস্পন্দন থামিয়া গেল।

সূর্য তখন পাটে বসিয়াছে। দিগন্তে শোণিতোৎসব চলিতেছে। রাক্ষসী বেলা।

বজ্র বনের দিকে ছুটিল। বনের আগে বাথান। বজ্র দেখিল, বাথানের আগড় খোলা ; পূর্বে যেখানে শতাধিক গরু থাকিত সেখানে মাত্র গুটিকয় রহিয়াছে। অন্য গরুগুলি মাঠে চরিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসে নাই, রাখালের অভাবে বনে জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছে।

পলাশবনে প্রবেশ করিয়া বজ্র কোন দিকে যাইবে ভাবিয়া পাইল না। রাত্রি আসন্ন, অল্পক্ষণ পরেই অন্ধকার হইয়া যাইবে। কিন্তু চাতক ঠাকুর বলিয়াছেন, উহারা বাঁচিয়া আছে। বজ্র চিৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে বনের একদিকে ছুটিল— 'মা ! মা ! গুঞ্জা ! গুঞ্জা !'

অবশেষে বহুদূর বনের মধ্যে গিয়া বজ্র ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে দাঁড়াইয়া পড়িল। দেহে আর শক্তি নাই, চিৎকার করিয়া ডাকিবার শক্তি নাই। এদিকে বন ছায়াচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, দূরে ভাল দেখা যায় না। বজ্রের অজ্ঞাতসারে চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কী করিবে সে এখন ? কোথায় তাহাদের খুঁজিয়া পাইবে ? তাহারা কি আছে ?

ও কী ! বজ্র উচ্চকিত হইয়া চাহিল। দূর হইতে কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল— 'মধুমথন !'...অস্পষ্ট ছায়া-কুহেলির মধ্য দিয়া কে ঐ ছুটিয়া আসিতেছে—মুক্তবেণী প্রেতিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার পা দু'টি যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে না। —গুঞ্জা !

বজ্রও পাগলের মত ছুটিল— 'কুঁচবরণ কন্যা।'

'মধুমথন।'

দুইটা জ্বলন্ত উল্কা যেন পরস্পর সংঘৃষ্ট হইয়া এক হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ
মানবের কাহিনী

গতকল্য উষাকালে চাতক ঠাকুর দক্ষিণের দহে পদ্মফুল তুলিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অতদূর যাইতে হইল না, পথেই তিনি দেখিলেন অসংখ্য অস্ত্রধারী পুরুষ নদী পার হইতেছে। মৌরী নদী এখানে অগভীর ; কোথাও হাঁটু জল, কোথাও কোমর পর্যন্ত।

দেখিয়া চাতক ঠাকুর ছুটিতে ছুটিতে গ্রামে ফিরিলেন। গ্রামে সংবাদ রাষ্ট্র হইল। প্রথমে গ্রামবাসীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল ; ঠাকুর ঠিক দেখিয়াছেন তো ? বুড়া মানুষ, হয়তো কি দেখিতে কি দেখিয়াছেন। কয়েকজন যুবক আগ বাড়িয়া দেখিতে গেল।

চাতক ঠাকুর রঙ্গনার কুটিরে গিয়া বলিলেন— 'রাঙা বৌ, গ্রামে দস্যু আসছে, তোমরা এই বেলা পালাও, নইলে পরে আর পালাতে পারবে না। যা পারো সঙ্গে নিয়ে যাও, পলাশবনের মধ্যে লুকিয়ে থাকো। আমি এদিকে রইলাম, যদি ভালয় ভালয় বিপদ কেটে যায়, তোমাদের ডেকে আনব।'

ওদিকে যাহারা দেখিতে গিয়াছিল তাহারা একদণ্ড পরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরিয়া আসিল। গ্রামে ভয়ার্ত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। মেয়েরা যে যেদিকে পাইল পলাইতে লাগিল ; পুরুষেরাও তাহাদের পিছু লইল। ছেলে বুড়া স্ত্রী পুরুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে শুরু করিল। দুই চারিজন বেতসকুঞ্জে লুকাইল ; অনেকে নদী সাঁতরাইয়া পরপারে চলিয়া গেল।

কেবল মুষ্টিমেয় পুরুষ গ্রাম ছাড়িল না, লাঠি ভল্ল মুদ্গর যাহা পাইল হাতে লইয়া দাঁড়াইল। চিরদিনই পৃথিবীতে এক জাতীয় লোক আছে যাহারা নিজের বিপদ চিন্তা করে না ; মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও রুখিয়া দাঁড়ায়। অকারণে বা তুচ্ছ কারণে মৃত্যু বরণ করিয়া তাহারা চিরঞ্জীব হইয়া আছে। তাহাদের লইয়া কোনও কবি মহাকাব্য লেখেন নাই ; তাহারা যুগে যুগে মৃত্যুঞ্জয়, তাই তাহাদের লইয়া মহাকাব্য লেখার প্রয়োজন হয় না।

'মার্' 'মার্' শব্দ করিয়া দস্যুদল গ্রামে প্রবেশ করিল। ক্ষুধাক্ষিপ্ত সশস্ত্র জনতা ; যুক্তিহীন, বিবেকহীন ; আপন উদগ্র প্রয়োজন ছাড়া তাহারা কিছুই বোঝে না। সম্মুখে কয়েকজন অস্ত্রধারী পুরুষ দেখিয়া হিংস্র তরক্ষুপালের মত তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল ; প্রত্যেক গ্রামবাসীকে পঞ্চাশজন দস্যু আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধের প্রহসন অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, গ্রামের সকলেই মরিল। কেবল চাতক ঠাকুর নিরস্ত্র ছিলেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ মরিলেন না, মরণাহত হইয়া পড়িয়া রহিলেন, তারপর অতিকষ্টে দেবস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

দস্যুগণ গ্রামে সঞ্চিত সমস্ত খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া কুটিরগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিল। আপন দুষ্কৃতির চিহ্ন আগুন দিয়া মুছিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পলাশবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র স্থান ঘন তরুশ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এত ঘন এই তরুবেষ্টন যে রাত্রিকালে আগুন জ্বালিলে বাহির হইতে দেখা যায় না।

আজ এই স্থানে আগুন জ্বলিতেছিল। চুল্লীর আগুন ; তিনটি প্রস্তর খণ্ডের মাঝখানে থাকিয়া কচিৎ শিখা-প্রক্ষেপ করিয়া জ্বলিতেছিল। চুল্লীর উপর মৃৎপাত্রে অন্ন সিদ্ধ হইতেছে, তাই কোনও দিক দিয়াই আগুন বাহির হইতে পারিতেছিল না, পিঞ্জরাবদ্ধ বন্দীর মত ছিদ্রপথে অঙ্গুলি বাহির করিয়া আবার টানিয়া লইতেছিল।

আবদ্ধ আগুনের শিখায় স্থানটি অস্পষ্টভাবে আলোকিত। বৃক্ষের কাণ্ডগুলি স্তম্ভের মত ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে, ইহারাই যেন এই বনগৃহের প্রাচীর।

বনগৃহে দুইটি মানুষ রহিয়াছে। ইহাদের দেখিয়া সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে হয় না ; যেন ইহারা কোন্ অবাস্তব স্বপ্নলোকের অধিবাসী। এই মানুষ দুটি রঙ্গনা ও মানব। দস্যুর আক্রমণে পলাইয়া আসিয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছে।

রঙ্গনা উনানের উপর নত হইয়া হাঁড়িতে কাঠি দিতেছে। তাহার মুখের উপর মুগ্ধ আলোর খেলা। মুখখানি তেমনি মধুর-সুন্দর, কিন্তু যেন ইহলোকের নয়, পরীরাজ্যের স্বপ্নাতুর মুখ, রূপকথার বিস্ময়মুকুলিত মুখ। রঙ্গনার দেহ-মন যেন বাস্তবলোক ছাড়িয়া কল্পলোকে চলিয়া গিয়াছে।

মানব কিছুদূরে একটা গাছের স্তম্ভে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে ভাল দেখা যাইতেছে না ; দেহের অস্থিপঞ্জরের উপর অস্পষ্ট আলোক ক্রীড়া করিতেছে ; দীর্ঘ রুক্ষ চুল মুখের উপর পড়িয়া মুখের অধিকাংশ ঢাকিয়া দিয়াছে। মানব স্থির হইয়া বসিয়া আছে, নড়িতেছে না। যেন উৎকর্ণ হইয়া কিছু শুনিবার যত্ন করিতেছে।

'রাঙা !'

রঙ্গনা মানবের পাশে গিয়া বসিল, একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল। মানব তাহার একটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে লইল, বলিল— 'গুঞ্জা অনেকক্ষণ জল আনতে গেছে, এখনও ফিরল না কেন ?'

রঙ্গনা বলিল— 'এখনি ফিরবে। নদী তো কাছে নয়।'

'ভাবনা হচ্ছে।'

'তুমি ভেব না। গুঞ্জা এল বলে।'

'খুব অন্ধকার হয়ে গেছে কি ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু গুঞ্জা পথ চেনে।'

দুইজন কিছুক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া নিশ্চল বসিয়া রহিল। তারপর মানব কথা কহিল— 'বজ্র যদি ফিরে আসে, সে কি করে জানবে আমরা বনে লুকিয়ে আছি ?'

রঙ্গনার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল—'চাতক ঠাকুর আছেন।'

'চাতক ঠাকুর কি আছেন ? থাকলে আমাদের খবর নিতেন না ?'

সহসা মানব খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল, একাগ্র হইয়া শুনিল। বলিল— 'কারা আসছে ! দু'জন—'

পদধ্বনি রঙ্গনা শুনিতে পায় নাই। সে সত্রাসে নতজানু হইয়া মানবকে দুই বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া লইল। এবার মানব তাহাকে আশ্বাস দিল— 'ভয় পেও না। হয়তো গুঞ্জা আর চাতক ঠাকুর—'

কয়েকটা স্পন্দিত মুহূর্ত কাটিয়া গেল। যাহারা আসিতেছে তাহাদের পদশব্দ এখন স্পষ্ট শুনা যাইতেছে। তারপর গুঞ্জা আর বজ্র তরুস্তম্ভের আড়াল হইতে আলোকচক্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। গুঞ্জার বাষ্পোচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল— 'মা, দেখ কে এসেছে !'

তীরবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় রঙ্গনা উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর অশ্রুবিকৃত স্বরে নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল।

রঙ্গনার সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা এতদিনে শেষ হইল।

মাতাপুত্র কিছুক্ষণের জন্য জগৎ ভুলিয়া গেল। ক্রমে বজ্রের কর্ণে একটি কণ্ঠস্বর বারবার প্রবেশ করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল— 'বজ্র ! পুত্র ! পুত্র !'

পুরুষের কণ্ঠস্বর, গভীর আবেগে অবরুদ্ধ। বজ্র চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল তরুতলের অস্পষ্ট ছায়ায় এক দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। দুই বাহু বাড়াইয়া ভগ্নস্বরে ডাকিতেছে—'পুত্র !

পুত্র !'

বজ্র মাতার দেহ এক হাতে জড়াইয়া পুরুষের দিকে অগ্রসর হইল। কাছে গিয়া চিনিতে পারিল, এ সেই অন্ধ ভিক্ষুক, যাহাকে সে কর্ণসুবর্ণ যাত্রার পথে বনের অন্তিকে দেখিয়াছিল ! ভিক্ষুকের অক্ষি কোটর হইতে অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতেছে।

বজ্রের কণ্ঠেও প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। সে ব্যাকুল চক্ষে মায়ের পানে চাহিয়া বলিল— 'এ কে ?'

রঙ্গনা কম্পিত অধরে অস্ফুট স্বরে বলিল— 'তোমার পিতা—মহারাজ মানবদেব।'

বজ্রের সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সে নতজানু হইয়া পিতার জানু আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সে-রাত্রে চারিজনের কেহই ঘুমাইল না, চুল্লীর আগুনের প্রভায় পরস্পর হাত ধরিয়া জাগিয়া রহিল ; যে হারানিধি তাহারা ফিরিয়া পাইয়াছে তাহা আবার হারাইয়া না যায়। অতীত আতঙ্কের স্মৃতি, বর্তমানের পরিপূর্ণতা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মিলিয়া চারিটি হৃদয়কে এক করিয়া দিল।

বজ্র তাহার কর্ণসুবর্ণ প্রবাসের কাহিনী বলিল। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে বলিল, যেন কেহ আঘাত না পায়। শুনিয়া মানব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল— 'আমার পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে বসেছে— হোক একদিনের জন্য— আমার আর দুঃখ নেই। কিন্তু আর্য শীলভদ্র যথার্থ বলেছেন, আজ থেকে ও-কথা ভুলে যেতে হবে। আমরা গৌড়দেশের সামান্য গ্রামবাসী, এই আমাদের পরিচয়। আমাদের রক্ত জনসাধারণের রক্তের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে, এই আমাদের গৌরব। রাজৈশ্বর্য চিরন্তন নয়, মনুষ্যত্ব চিরন্তন। আমাদের নাম লোকে ভুলে যাক ক্ষতি নেই, আমাদের মনুষ্যত্ব যেন যুগ-যুগান্তর ধরে গৌড়বঙ্গের অন্তরে বেঁচে থাকে।'

তারপর মানব আপন কাহিনী বলিল। দীর্ঘ বিংশ বৎসরের কাহিনী। একটা মানুষ কী দুঃসহ দুঃখভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহারই ইতিহাস।

রঙ্গনাকে ফিরিয়া আসিবার আশ্বাস দিয়া মানব কর্ণসুবর্ণে উপনীত হইল। রাজধানী রক্ষার জন্য নূতন সৈন্যদল গঠন করিবার পূর্বেই ভাস্করবর্মা বিজয়ী সেনাদল লইয়া কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করিলেন। নগর রক্ষা হইল না। মানব রাজপুরী সুরক্ষিত করিয়া শেষবার যুদ্ধ করিল।

ভাস্করবর্মা দুই দিন রাজপুরী অবরোধ করিয়া তৃতীয় দিনে নদীর ঘাটের পথে পুরীতে প্রবেশ করিলেন। পুরী অধিকৃত হইল ; মানব রক্তাক্ত-কলেবরে যুদ্ধ করিতে করিতে বন্দী হইল।

মানব যদি যুদ্ধে মরিত তাহা হইলে ভাস্করবর্মা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু সে জীবন্ত বন্দী হইয়া ভাস্করবর্মাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। পরাজিত শত্রু-রাজাকে হত্যা করা রাজধর্ম নয়, তাহাতে সকল রাজার জীবনই সংশয়ময় হইয়া পড়ে। অথচ শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। ভাস্করবর্মা এক কূটকৌশল অবলম্বন করিলেন। গভীর রাত্রে মানবের চক্ষু অন্ধ করিয়া তাহাকে প্রাকার হইতে ভাগীরথীর জলে নিক্ষেপ করা হইল। প্রকাশ্যে রটনা করা হইল, যুদ্ধকালে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তির ফলে মানবের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকৃত তত্ত্ব চারি পাঁচজন ব্যতীত কেহ জানিল না।

অন্ধ অবস্থায় ক্ষতবিক্ষত দেহে নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও মানব মরিল না। একদল বেদিয়া ভেলায় নদীপার হইতেছিল, তাহারা সন্তরমান মানবকে তুলিয়া লইল।

ভাগীরথীর পূর্বতীরে বন বাদাড়ের মধ্যে বেদিয়ারা কিছুদিনের জন্য ডেরাডাণ্ডা ফেলিল। তাহাদের যত্ন ও শুশ্রূষায় মানবের দেহক্ষত জোড়া লাগিল। সে সারিয়া উঠিয়া বিপদের বন্ধু বেদিয়াদের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করিল।

পরিচয় শুনিয়া বেদিয়ারা ভয় পাইয়া গেল। তাহারা অতি দীনপ্রকৃতি, সকল সমাজের অপাংক্তেয়, রাষ্ট্রনীতি-ঘটিত কোনও ব্যাপারে তাহারা থাকে না। তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া মানবকে স্নানের ছলে গঙ্গাতীরে লইয়া গেল এবং উচ্চ পাড় হইতে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল।*

অন্ধ মানব ভাগীরথীর স্রোতে ভাসিয়া চলিল। সমস্ত দিন ভাসিয়া চলিবার পর সন্ধ্যার সময় অর্ধমৃত অবস্থায় সে কূল পাইল। বহুদুর দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহারই ঘাটে সারারাত্রি পড়িয়া রহিল।

পরদিন হইতে মানবের দীর্ঘ পরিব্রজন আরম্ভ হইল। যষ্টি হস্তে অন্ধ ভিক্ষুক দেশে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত নদী পার হইয়া কত রাজ্যে গেল, বঙ্গাল, সমতট, পুণ্ড্রবর্ধন, প্রাগ্‌জ্যোতিষ। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বারবার ফিরিয়া আসিল। কিন্তু মানবের প্রব্রজ্যা শেষ হইল না।

মানব একবার যে ভুল করিয়াছিল তাহা আর দ্বিতীয়বার করিল না, কাহাকেও নিজের পরিচয় দিল না। এখন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বেতসগ্রামে ফিরিয়া আসা।

সে সসংকোচে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করিত—'ভাই, বেতসগ্রাম কত দূর?' কিন্তু বেতসগ্রামের উদ্দেশ কেহ দিতে পারিত না। অন্ধ ভিক্ষুককে অনেকেই দয়া করিত ; কেহ অন্ন দিত, কেহ ছিন্ন কন্থা দান করিত, কিন্তু বেতসগ্রামের সন্ধান কেহ দিতে পারিত না। মানব অধিক প্রশ্ন করিতেও সাহস করিত না। কি জানি যদি কিছু সন্দেহ করে!

এইভাবে বিশ বছর কাটিয়াছে। ভাগীরথী যে কতবার মানব পারাপার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দণ্ডভুক্তি বর্ধমানভুক্তি কঙ্কগ্রামভুক্তি, সর্বত্র সে বিচরণ করিয়াছ, কিন্তু বেতসগ্রামের সন্ধান পায় নাই।

তারপর একদিন নদীতটে বজ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বজ্র তাহাকে নিজ অন্নের ভাগ দিল, বেতসগ্রামের পথ দেখাইয়া দিল—

বিশ বছর পরে রঙ্গনার নিকট মানবের শপথ উদ্‌যাপন হইল।

রঙ্গনা এ কাহিনী পূর্বে শুনিয়াছিল, দ্বিতীয়বার শুনিয়া তাহার চোখে আবার অশ্রুর নীরব ধারা নামিল। কাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিল না ; চারিজন একসঙ্গে কাঁদিল।

পরিশিষ্ট

পরদিন বজ্র চাতক ঠাকুরের দেহ মৌরীর তীরে দাহ করিল। শুদ্ধ শান্ত নিরীহ ঠাকুরের দেহ ভস্ম হইয়া গৌড়বঙ্গের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল।

বাকি দেহগুলি মৌরীর জলে বিসর্জন দিতে হইল। সকলকে দাহ করিবার মত ইন্ধন নাই।

তারপর তাহাদের নূতন জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। নূতন জীবনযাত্রার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই ; পুরাতন রথের যে চক্র ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাহাই সংস্কৃত হইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সেই পথ, সেই রথ। পুরাতনের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইল না।

দস্যুর ভয়ে যাহারা পলাইয়াছিল তাহার কেহ কেহ ফিরিয়া আসিল, কিন্তু ভস্মাবশেষ গ্রামের অবস্থা দেখিয়া অধিকাংশই আবার চলিয়া গেল। দুই চারিজন রহিল।

* গোপা বেদেনীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া মরিয়াছিল।

বজ্র পুরাতন গৃহের ভিত্তি পরিষ্কার করিয়া আবার কুটির বাঁধিল। পূর্বে দুইজনের উপযোগী কুটির ছিল, এখন চারিজনের উপযোগী কুটির হইল। রঙ্গনা নদী হইতে জল আনিয়া মাটিতে ঢালিয়া কাদা করিল, অন্ধ মানব পা দিয়া কাদা দলিয়া পিণ্ড করিল; গুঞ্জা বেতসবন হইতে বেতের চঞ্চারী কাটিয়া আনিয়া দিল। সকলে মিলিয়া কুটির নির্মাণ করিল।

বর্ষা নামিল। ধান্য ও ইক্ষুর ক্ষেত্র আর্দ্র হইয়া নূতন শস্য উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু কে বপন করিবে? বীজ কোথায়? গুঞ্জা অতি যত্নে কয়েক মুঠি ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, বজ্র তাহাই ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিল। যে কয়টি গাভী বাথানে অবশিষ্ট আছে তাহাদের দুগ্ধই এখন এই কয়টি প্রাণীর প্রধান আহার্য-পানীয়।

বর্ষা কাটিয়া শরৎ আসিল। ধানের শীষ লক্ লক্ করিয়া বাড়িতে লাগিল। ইক্ষুক্ষেত্রে পুরাতন মূল হইতে আপনি অঙ্কুর বাহির হইল।

বজ্র বনে গিয়া হরিণ ময়ূর শিকার করিয়া আনে; সুযোগ পাইলে গুঞ্জা তাহার সঙ্গে যায়। রঙ্গনা আর মানব কুটির-দেহলিতে হাত-ধরাধরি করিয়া বসিয়া থাকে। মানব রঙ্গনার মুখ অঙ্গুলি বুলাইয়া অনুভব করে, তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে।

কর্মহীন মধ্যাহ্নে বজ্র বেতসকুঞ্জে গিয়া একাকী শুইয়া থাকে; অতীতের কথা ভাবে। কি বিচিত্র এই জীবন! কখনও নিষ্কম্প নিস্তরঙ্গ, কখনও উত্তাল তরঙ্গসংকুল।...কুহু এখন কী করিতেছে?...রানী শিখরিণীর কি পরিণাম হইল?...আর্য শীলভদ্র ও বন্ধু মণিপদ্ম কি এতদিনে নালন্দায় পৌঁছিয়াছেন;...তাহার দিবাস্বপ্ন শেষ হইতে পাইত না। গুঞ্জা আসিয়া তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত; গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিত— 'আমাদের চেয়ে সুখী আর কি কেউ আছে?'

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা। পথ এখনও শেষ হয় নাই। হে চির-সারথি, যে-পথে তোমার রথ লইয়া চলিয়াছ কোথাও কি তাহার শেষ আছে?



তুমি সন্ধ্যার মেঘ

প্রথম পরিচ্ছেদ
এক

শকাব্দের দশম শতকে ভারতের ভাগ্যাকাশে সূর্যাস্ত হইতেছিল। নয়শত বর্ষব্যাপী মহারাত্রি আসন্ন, পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে রাক্ষসী বেলার রুধিরোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

দীর্ঘকাল ভারতের সংকট-সীমান্তে উল্লেখযোগ্য বহিরুৎপাত কিছু হয় নাই। পাঁচশত বৎসর পূর্বে হূণেরা আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া জনসমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে ; ভারতের সংস্কৃতি তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তাকে জঠরস্থ করিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তারপর আর কেহ আসে নাই। আর কেহ আসিতে পারে এ চিন্তাও মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। ভারতের অগণিত রাজন্যবর্গ পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া, অবস্থা বিশেষে মৈত্রী মিতালি করিয়া মনের আনন্দে কাল কাটাইতেছিলেন। প্রজারাও মোটের উপর মনের সুখে ছিল। তাহাদের জীবনধারা অভ্যস্ত পরিচিত খাতে প্রবাহিত হইতেছিল।

৮৯৯ শকাব্দে সবক্তগীণ আসিয়া লাহোর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিলেন। ৯২০ শকাব্দে আসিলেন মামুদ গজনী। ৯৪৬ হইতে ৯৪৮ শকাব্দের মধ্যে সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠিত হইল। ১১১৫ শকাব্দে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করিলেন। মহারাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

ইহা ভারতের পশ্চিম প্রান্তের কথা। ভারতের পূর্বভাগে তখনও একটু আলো ছিল। ক্ষীণ চন্দ্রের আবছায়া আলো। সে আলোতে দূর পর্যন্ত দেখা যায় না, নিজের আঙিনাটুকু মাত্র দেখা যায়। আঙিনায় ফুল ফুটিয়াছিল, লবঙ্গলতার পরিশীলনে কোমল মলয়ানিল বহিতেছিল। মানুষ নিশ্চিন্ত মনে প্রেম করিতেছিল, গান গাহিতেছিল, শিল্প রচনা করিতেছিল। রাজারাও নিজেদের অভ্যস্ত খেলা খেলিতেছিলেন ; যুদ্ধবিগ্রহ, মৈত্রী মিতালি, রাজনৈতিক কূট-ক্রীড়া চলিতেছিল। কিন্তু আসন্ন দুর্যোগের অগ্রবর্তী ছায়া তাঁহাদের মুখের উপর পড়ে নাই। পশ্চিম ভারতে বিজাতীয় শত্রু প্রবেশ করিয়াছে এ সংবাদ যে তাঁহারা একেবারেই জানিতেন না তাহা নয়। তাঁহারা ঘরের ব্যবস্থা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, বাহিরের দিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর তাঁহাদের ছিল না।

পূর্ব ভারতের কেবল একটি মানুষ পশ্চিম প্রান্তে দুর্মদ আততায়ীর আবির্ভাব শঙ্কিত চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এবং ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই মানুষটির নাম অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

দুই

দীপঙ্কর বাঙ্গালী ছিলেন। বঙ্গাল দেশের বিক্রমণিপুর মণ্ডলে বজ্রযোগিনী গ্রামে তাঁহার জন্ম ; জাতনাম চন্দ্রগর্ভ। অলৌকিক প্রতিভার বলে তিনি জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের শিখরে উঠিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য অশেষবিৎ জ্ঞানী তৎকালীন ভারতে কেহ ছিল না। ভারতের বাহিরেও ছিল না। সুদূর চীন ও তিব্বত হইতে জ্ঞানভিক্ষুরা আসিতেন তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া জ্ঞানভিক্ষা লইতে। তারপর দেশে ফিরিয়া গিয়া দিকে দিকে তাঁহার জয়গান করিতেন। তাঁহার লৌকিক নাম কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই উপাধিতে প্রথিত হইয়াছিলেন। সংক্ষেপে দীপঙ্কর। জ্ঞান-জ্যোতির আধার।

কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞানের সাধনাতেই দীপঙ্করের সমস্ত প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নাই। কর্মশক্তিতেও তিনি অসামান্য ছিলেন। তাঁহার কর্মকাহিনীর স্মৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থে বিধৃত আছে। ষাট বছর বয়সে তিনি হিমদুর্গম পথে তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।

যে সময় এই আখ্যায়িকার আরম্ভ সে সময় দীপঙ্কর ছিলেন বিক্রমশীল বিহারের মহাচার্য। বিক্রমশীল বিহারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন পাল রাজবংশের মুকুটমণি পরমসৌগত মহারাজ ধর্মপালদেব। তারপর দুই শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। পাল রাজবংশ বহু উত্থান পতনের ভিতর দিয়া শিলাসংকুল পথে আপন অদৃষ্টলিপি খোদিত করিতে করিতে চলিয়াছে। ধর্মপালের অধস্তন অষ্টমপুরুষ নয়পালদেব এখন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আসীন। নয়পালের পিতা মহীপালদেব পরাক্রান্ত পুরুষ ছিলেন, তিনি অনধিকৃত-বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু মহীপালের মৃত্যুর পর পালরাজ্য আবার সঙ্কুচিত হইয়া মগধের সীমানার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হইয়াছে। পূর্বদিকে বঙ্গালদেশে স্বাধীন রাজারা মাথা তুলিয়াছেন। পশ্চিম ও দক্ষিণেও তাই। ভারতের পূর্বার্ধে সার্বভৌম নরপতি কেহ নাই।

মহীপালদেব দীপঙ্করকে বিক্রমশীলার মহাচার্যের আসনে বসাইয়াছিলেন। তারপর অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। দীপঙ্কর সগৌরবে উক্ত আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন।

বিক্রমশীল বিহার মগধের অঙ্গদেশে গঙ্গার তীরে অবস্থিত। উচ্চ শিলাপট্টের উপর প্রাচীর-বেষ্টিত বিস্তীর্ণ বিহারভূমি ; মধ্যস্থলে চৈত্য ঘিরিয়া বিশাল উপাসনাগৃহ। উপাসনাগৃহকে আবেষ্টন করিয়া ছয় দিকে ছয়টি দেবায়তন। সর্বশেষে সীমা-প্রাচীরের সমান্তরালে অষ্টোত্তরশত মন্দিরের শ্রেণী। একশত চৌদ্দজন আচার্য আছেন, তাঁহারা অগণিত বিদ্যার্থীদের বিভিন্ন শাস্ত্রে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কেবল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রই নয়, বেদ ব্যাকরণ শব্দবিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যা যোগশাস্ত্র জ্যোতিষ সঙ্গীত, সকল বিদ্যারই পঠন-পাঠন হয়। সকলের উপরে আছেন সর্ববিদ্যার আধার মহাচার্য দীপঙ্কর। মহারাত্রির সায়াহ্নে নালন্দার গৌরব গরিমা ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছে, কিন্তু বিক্রমশীল মহাবিহারের জ্ঞান-দীপ এখনও ভাস্বর শিখায় জ্বলিতেছে।

তিন

আজ হইতে নয় শতাব্দী পূর্বের একটি শারদ অপরাহ্ণ। বিক্রমশীল বিহারের পাষাণ-তট-লেহী গঙ্গার জল স্বচ্ছ হইয়াছে। গাঢ় নীল আকাশে একটি দুটি লঘু মেঘ ভাসিতেছে। গঙ্গার বুকে যেন ওই মেঘেরই প্রতিচ্ছবির ন্যায় একটি পাল-তোলা নৌকা। অস্তমান সূর্য পশ্চিম দিগন্তে স্বর্ণরেণুর প্রলেপ দিতেছে। চারিদিক শান্ত উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন।

বিহারভূমির মধ্যেও প্রসন্ন শান্তি বিরাজ করিতেছে। বিদ্যায়তনগুলি শূন্য, বিদ্যার্থীরা বিদ্যাভ্যাস শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাহারা বিহারে বাস করে তাহারা নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে অন্তর্হিত হইয়াছে। বিদ্যায়তন ও সীমান্ত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী শষ্পাকীর্ণ মাঠে চৈত্যচূড়ার ছায়া দীর্ঘতর হইতেছে। মাঠে ইতস্তত অশোক কদম্ব বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ। একটি বকুল বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া তিনজন আচার্য বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বাহিরে আর কাহাকেও দেখা যায় না। বিহারের অসংখ্য অধিবাসী এই সময়টিতে যেন বল্মীকের ন্যায় বিবরপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

চৈত্যচূড়ার চারিপাশে চতুষ্কোণ ছাদ, উপাসনাগৃহের স্তম্ভগুলি এই ছাদকে ধরিয়া রহিয়াছে। সঙ্কীর্ণ সোপানশ্রেণী বাহিয়া ছাদে উঠিতে হয় ; কিন্তু উপরে উঠিয়া আর সঙ্কীর্ণতা নাই, স্তম্ভের স্থূল চূড়া ঘিরিয়া প্রশস্ত ছাদ অঙ্গনের মত চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই ছাদের এক কোণে একটি দারুনির্মিত প্রকোষ্ঠ ; অবশিষ্ট স্থান অসংখ্য মৃৎকুণ্ডে পূর্ণ। প্রত্যেকটি কুণ্ডে একটি করিয়া শিশুবৃক্ষ বা লতা ; চম্পা মল্লিকা জাতী কুরুবক শেফালী ; পারস্য দেশের দ্রাক্ষালতা, মহাচীনের চারুকেশর, তিব্বতের সূচীপর্ণ। মহাচার্য দীপঙ্কর এই দারু-প্রকোষ্ঠে বাস করেন এবং অবসরকালে শিশুবৃক্ষগুলিকে সন্তানস্নেহে লালন করেন।

আজ সায়াহ্নে তিনি ছাদের উপর একাকী পদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছিলেন। শাস্ত্রচিন্তা নয়, ধর্মচিন্তা নয়, নিতান্তই ঐহিক ভাবনা তাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া তিনি ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। কার্পাসের মত শুভ্র একখণ্ড মেঘ ধীরে ধীরে মধ্যাকাশ হইতে পশ্চিম দিকে যাইতেছে। প্রথমে মেঘের প্রান্তে রক্তিমার স্পর্শ লাগিল, তারপর মেঘ পশ্চিম আকাশের লাবণ্য শোষণ করিয়া লইয়া সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিল। দীপঙ্কর দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মনে বহিঃপ্রকৃতির প্রতিবিম্ব পড়িতেছে না।

ষাট বৎসর বয়সে দীপঙ্করের মুখে জরার চিহ্নমাত্র নাই। মুখের গঠন দৃঢ় ; মস্তক ও শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডিত না হইলে যোদ্ধার মুখ বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। চক্ষু উজ্জ্বল অথচ শান্ত। দেহের আয়তন অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব বলা চলে, কিন্তু স্কন্ধ বাহু ও বক্ষ দৃঢ় পেশীবদ্ধ। পরিধানে পীতবর্ণ সংঘাটি স্কন্ধ হইতে জানু পর্যন্ত আবৃত করিয়া রাখিয়াছে এবং দেহের মুক্ত অংশে চম্পকতুল্য বর্ণাভা সঞ্চারিত করিয়াছে। দীপঙ্করকে একবার দেখিলে তাঁহার পৌরুষই সর্বাগ্রে চোখে পড়ে, তাঁহাকে মহাতেজস্বী কর্মবীর বলিয়া মনে হয়। তিনি যে সকল বিদ্যার পারঙ্গম দিগ্বিজয়ী জ্ঞানবীর তাহা অনুমান করা যায় না।

ছাদে পরিক্রমণ করিতে করিতে দীপঙ্কর চিন্তা করিতেছিলেন—লোকজ্যেষ্ঠ বলিয়াছেন হিংসায় হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়...সত্য কথা...কিন্তু হিংসা ও আপৎ নিবারণ এক বস্তু নয়, রাগদ্বেষ অনুভব না করিয়া বিগতজ্বর হইয়া যুদ্ধ করা যায়। কিন্তু যুদ্ধ করিবে কে ? রাজার ইচ্ছায় যুদ্ধ। ভারতবর্ষের শতাধিক রাজা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষা করিতে ব্যস্ত। যে-সব রাজারা যুদ্ধ করিতে ভালবাসে তাহারাও বহিরাগত বর্বর আততায়ীর কথা ভাবে না, নিজের প্রতিবেশী রাজার গলা কাটিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। চাণক্যনীতি ! এই চাণক্যনীতি দেশের সর্বনাশ করিয়াছে।...মহীপালদেব ছিলেন দূরদর্শী রাজা ; তিনি বুঝিয়াছিলেন এই বিধর্মী দুর্বৃত্তগুলাকে সময়ে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে তাহারা সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিবে, আর্যাবর্তের অপৌরুষেয় সংস্কৃতি শোণিতপঙ্কে নিমজ্জিত হইবে। মহীপাল তুরস্কদের দূর করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু দেশের দুরদৃষ্ট, তিনি বাঁচিলেন না। এখন কে দেশ রক্ষা করিবে ? নয়পাল মহীপালের পুত্র হইলেও পিতার ন্যায় ভবিষ্যচিন্তক নয়, যুদ্ধবিগ্রহেও রুচি নাই। অন্য যাহারা আছে তাহারা শৌর্যবীর্যে রণকৌশলে তুরস্কদের সমকক্ষ নয়। তুরস্কগণ নিষ্ঠুর যোদ্ধা, তাহার উপর ঘোর বিশ্বাসঘাতক। তাহাদের ধর্মজ্ঞান নাই ; যুদ্ধে তাহাদের কে পরাস্ত করিবে ? সমস্ত

আর্য রাজাগণ একত্র হইলে পরাস্ত করিতে পারে। কিন্তু আর্য রাজারা কখনও একত্র হইবে না, তাহারা একে একে মরিবে তবু একত্র হইবে না। আজ যদি একজন একচ্ছত্র চক্রবর্তী সম্রাট থাকিত ! অশোকের মত—হর্ষবর্ধনের মত—ধর্মপাল দেবপালের মত ! কিন্তু সে দিন আর নাই। একটি সিংহের পরিবর্তে ভারতবর্ষ জুড়িয়া এক পাল ফেরু !...তুরস্করা অস্ত্রশস্ত্রেও ভারতবাসী অপেক্ষা উন্নত ; তাহাদের অসিতে ধার বেশি, ভল্ল অধিক তীক্ষ্ণ।...হায়, যদি রামায়ণ মহাভারতের অলৌকিক অস্ত্রের ন্যায় শতঘ্ন সহস্রঘ্ন বাণ থাকিত— ! সেকালে অগ্নিবাণ বরুণবাণ কি সত্যই ছিল ? না কবিকল্পনা ? হয়তো কিছু সত্য ছিল, কবিকল্পনারও অবলম্বন চাই।...যদি ঐরূপ অলৌকিক অস্ত্র বর্তমানে থাকিত দুর্ধর্ষ ম্লেচ্ছগুলাকে হিমালয়ের পরপারে তাড়াইয়া দেওয়া যাইত, রাজাদের সংঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন হইত না...

দীপঙ্করের চিন্তা কোনও দিকে নিষ্ক্রমণের পথ না পাইয়া নিষ্ফল কল্পনা বিলাসের চক্রপথ ধরিয়াছে এমন সময় সোপান বাহিয়া আর এক ব্যক্তি ছাদে উপস্থিত হইলেন। ইনি বিক্রমশীল বিহারের মহাধ্যক্ষ রত্নাকর শান্তি। বয়সে দীপঙ্কর অপেক্ষা কিছু বড়, জ্যেষ্ঠের অধিকারে দীপঙ্করকে নাম ধরিয়া ডাকেন ; কিন্তু সকল সময় গুরুর ন্যায় মান্য করেন। শরীর কিছু স্থূল, জরার প্রকোপে চর্ম লোল হইয়াছে ; মুখে বিপুল দায়িত্ব বহনের কিণচিহ্ন। বিক্রমশীল বিহারের সহস্র কর্মভারে অবনত এই বৃদ্ধের তুলনায় দীপঙ্করকে তরুণ বলিয়া মনে হয়।

রত্নাকরের কটিলম্বিত কুঞ্চিকাগুচ্ছের ঝুম ঝুম শব্দে দীপঙ্কর পরিক্রমণ স্থগিত করিয়া দাঁড়াইলেন। রত্নাকর তাঁহার কাছে আসিলেন, কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস টানিয়া বলিলেন—'আজকাল সিঁড়ি উঠতে হাঁফ ধরে।'

দীপঙ্কর উদ্বিগ্নচক্ষে রত্নাকরকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর কটিবদ্ধ কুঞ্চিকাগুচ্ছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—'ওই প্রকাণ্ড চাবির গোছা নিয়ে ছাদে উঠতে কার না হাঁফ ধরে ? সম্প্রতি চাবির গোছা কি আরও বেড়েছে ?—কিন্তু তুমি এলে কেন। ডেকে পাঠালেই তো আমি তোমার কাছে যেতাম।'

রত্নাকর হাত নাড়িয়া যেন ও প্রসঙ্গ সরাইয়া দিলেন, বলিলেন—'চন্দ্রগর্ভ, তিব্বতীরা আট দিন হল এসেছে, তাদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

দীপঙ্কর ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। তিব্বতীরা আসিয়াছে তিনি জানিতেন, কেন আসিয়াছে তাহাও অনুমান করিয়াছিলেন, তাই তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। এখন বলিলেন—'ওরা আবার এসেছে কেন ? গতবারে আমাকে তিব্বতে নিয়ে যেতে এসেছিল, আমি অস্বীকার করেছিলাম। আবার কি চায় ?'

রত্নাকর বলিলেন—'কিছু বলছে না। এবার তোমার জন্য অনেক উপঢৌকন এনেছে।'

দীপঙ্কর হাসিলেন—'উপঢৌকন !'

'হাঁ। তিব্বতের রাজা পাঠিয়েছেন। ওদের সঙ্গে আমার যা দু'চারটে কথা হয়েছে তা থেকে মনে হয় তিব্বতে ধর্মের গ্লানি বেড়ে গেছে, তুমি গিয়ে ধর্মসংস্থাপন করবে এই তাদের আশা। কিন্তু স্পষ্ট কিছু বলছে না। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'দেখা করব। কিন্তু তিব্বতরাজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা তো সম্ভব নয়। একবার না বলেছি, আবারও না বলতে হবে।'

'উপায় কি ?'

'বেশ, তুমি তাদের এখানেই পাঠিয়ে দাও।'

রত্নাকর কয়েক পা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন—'অতীশ, তুমি যদি তিব্বতে যাও তিব্বতে ধর্মের দীপ জ্বলে উঠবে, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্ধকার হয়ে যাবে। অগণ্য তুরস্ক সৈন্য

ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। তিব্বতীদের মধুর বাক্যে সেকথা ভুলে যেও না।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'আমি থাকলেই কি তুরস্কদের রোধ করতে পারব ?'

'তবু তো আপৎকালে তুমি কাছে থাকবে।'

'ভয় নেই, আমি তিব্বতে যাব না। তুমি ওদের পাঠিয়ে দাও।'

রত্নাকর নামিয়া গেলেন। অর্ধদণ্ড পরে চারিজন তিব্বতী ভিক্ষু ছাদে উপস্থিত হইলেন। তিব্বতীদের যিনি অগ্রণী তাঁহার নাম আচার্য বিনয়ধর, তিব্বতী নাম ট্ষল্ খ্রিম গ্যাল্‌বা। তাঁহার সহচরগণ একটি গুরুভার বেত্র-পেটিকা ধরাধরি করিয়া আনিতেছে।

বিনয়ধর ভূমিষ্ঠ হইয়া দীপঙ্করকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার সঙ্গীরাও করিলেন। দীপঙ্কর সকলকে আলিঙ্গন করিলেন।

তখন সূর্যাস্ত হইয়াছে, কিন্তু ছাদের উপর যথেষ্ট আলো আছে। দীপঙ্কর তাঁহার দারুকক্ষ হইতে তৃণাস্তরণ আনিয়া পাতিয়া দিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

কিছুক্ষণ শিষ্টাচার ও কুশলপ্রশ্ন বিনিময়ের পর বিনয়ধর বলিলেন—'আর্য, গতবার যাঁর আজ্ঞায় আপনার চরণদর্শন করতে এসেছিলাম সেই তিব্বতরাজ লাহ-লামা-যে-শেস্-এর মৃত্যু হয়েছে। বড় শোচনীয় তাঁর মৃত্যু, সে কাহিনী পরে আপনাকে জানাব। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আপনাকে একটি পত্র লিখেছিলেন, সে-পত্রও আমি সঙ্গে এনেছি, যথাকালে নিবেদন করব। বর্তমান রাজা চান্-চুব পূর্বতন রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র। এবার তিনিই আমাদের পাঠিয়েছেন।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'ভাল। নূতন তিব্বতরাজ সদ্ধর্মে নিষ্ঠাবান জেনে সুখী হলাম। কিন্তু তিনি আবার আপনাদের এই দুর্গম পথে কেন পাঠিয়েছেন আচার্য ?'

আচার্য বিনয়ধর একটু হাস্য করিলেন। তাঁহার কৃশ দেহ, অস্থিসার মুখ এবং তির্যক চক্ষু দেখিয়া মনে হয় না যে তাঁহার প্রাণে বিন্দুমাত্র রস আছে ; কিন্তু তাঁহার শান্ত অত্বরিত বাক্‌ভঙ্গিতে এমন একটি মসৃণ সমীচীনতা আছে যাহা প্রবীণ রাষ্ট্রদূতগণের মধ্যেও বিরল। তিনি ধীরস্বরে বলিলেন—'বারবার একই প্রস্তাব নিয়ে আপনার সম্মুখীন হতে আমি বড় সঙ্কুচিত হচ্ছি আর্য। কিন্তু ও কথা এখন থাক। আমাদের নবীন রাজা আপনাকে যে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন তাই আগে নিবেদন করি।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'কিন্তু আমাকে উপঢৌকন কেন ? আমি তো রাজা নই, সামান্য ভিক্ষু।'

বিনয়ধর বলিলেন—'আপনি রাজার রাজা, রাজাধিরাজ।'

বিনয়ধর ইঙ্গিত করিলেন, বাকি তিনজন ভিক্ষু বেত্র-পেটিকাটিকে তুলিয়া দীপঙ্করের সম্মুখে রাখিল এবং ডালা খুলিয়া দিল। দীপঙ্কর দেখিলেন পেটিকাটি কপিত্থ ফলের ন্যায় গোলাকৃতি বস্তুতে পূর্ণ। গোলকগুলি পোড়া মাটি দিয়া প্রস্তুত মনে হয়। দীপঙ্কর ঈষৎ বিস্ময়ে ভ্রূ উত্থিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—'এ কী বস্তু ?'

বিনয়ধর পেটিকা হইতে একটি গোলক তুলিয়া লইয়া মৃদু হাস্যে বলিলেন—'আর্য, এর নাম অগ্নিকন্দুক। চীন দেশ থেকে কারুকর আনিয়ে আমাদের রাজা এই কন্দুক নির্মাণ করিয়েছেন। এর সাহায্যে আপনি বিধর্মী তুরস্কদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারবেন।'

দীপঙ্কর বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই নিম্নে বিহারভূমি হইতে বহুজনের রূঢ় কলকোলাহল আসিল।

চার

শান্তরসাস্পদ বিহারভূমিতে দিবাবসানকালে বহু নরকণ্ঠের উগ্র কোলাহল কোথা হইতে আসিল তাহার বৃত্তান্ত কিছু পূর্ব হইতে জানা প্রয়োজন।

পাল রাজা যেমন মগধে রাজত্ব করিতেন, তেমনি মগধের দক্ষিণ-পশ্চিমে নর্মদাতীরে চেদি রাজ্য ছিল ; কলচুরি-রাজ লক্ষ্মীকর্ণ সেখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নাম ত্রিপুরী। নয়পাল ও লক্ষ্মীকর্ণের মধ্যে বংশানুক্রমিক শত্রুতা ছিল। লক্ষ্মীকর্ণের পিতা গাঙ্গেয়দেব এবং নয়পালের পিতা মহীপাল অক্লান্তভাবে সারা জীবন পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীকর্ণ মধ্যবয়সে রাজা হইয়া মহানন্দে পিতৃব্রত মাথায় তুলিয়া লইলেন। তিনি অতি ধূর্ত ও দুষ্টবুদ্ধি লোক ছিলেন। প্রকাণ্ড দেহ, হস্তিতুল্য বলশালী ; নানাপ্রকার ব্যসনের মধ্যে যুদ্ধকার্যই ছিল তাঁহার প্রধান ব্যসন। তিনি ধর্মে বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু সেকালে বৈষ্ণব বলিলে বিষ্ণু-উপাসক বুঝাইত, পরবর্তী কালের কণ্ঠিধারী নিরামিষ বৈষ্ণব বুঝাইত না। লক্ষ্মীকর্ণ প্রত্যহ অন্যান্য খাদ্যাখাদ্যের সহিত একটি আস্ত ময়ূর ভক্ষণ করিতেন এবং প্রচুর মদ্যপান করিতেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না ; কেবল দুই কন্যা, বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী। পাটরানীর মৃত্যুর পর আর মহিষী গ্রহণ করেন নাই ; রাজপুরীর দাসী কিঙ্করীরা কেহ কেহ উপ-মহিষী হইয়া থাকিত। আত্মসুখ ও পরনিগ্রহ ভিন্ন লক্ষ্মীকর্ণদেবের অন্য চিন্তা ছিল না।

অপরপক্ষে নয়পাল ছিলেন ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ। তিনিও মধ্যবয়সে রাজা হইয়াছিলেন ; পিতার জীবনব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ দেখিয়া তাঁহার যুদ্ধে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। তাই তিনি ক্ষাত্রতেজ সংবরণ করিয়া যেটুকু পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। অবসরকালে পট্ট মহিষীর সহিত পাশা খেলিতেন, অথবা বৌদ্ধ আচার্যদের ডাকিয়া তন্ত্রের গূঢ় প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। যুবরাজ বিগ্রহপালের বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে, একথা মহিষী বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিলেও নয়পাল সেদিকে কর্ণপাত করিতেছিলেন না। তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ, পুত্রের বিবাহ দিতে গেলে রাজকন্যা অন্বেষণ করিতে হইবে, বিবাহ উৎসবে সমস্ত রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ করিতে হইবে, দীর্ঘকালব্যাপী একটা হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড চলিবে ; তাই কর্তব্য বুঝিয়াও নয়পালের মন পরাঙ্মুখ হইয়া ছিল। তিনি এমন প্রকৃতির লোক যে বাহির হইতে প্রবল খোঁচা না খাইলে কোনও কাজে অগ্রসর হইতে পারেন না।

লক্ষ্মীকর্ণ নয়পালের শান্ত নির্বিরোধ প্রকৃতির কথা জানিতেন। তদুপরি একটা গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পাইলেন যে পাটলিপুত্রে নয়পাল অনেকগুলি তান্ত্রিক সাধুকে লইয়া মাতিয়াছেন, দিবারাত্র গোপনে বীরাচারের অভ্যাস চলিয়াছে ; তাঁহার সৈন্যগণও অবিন্যস্ত, যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত। লক্ষ্মীকর্ণের মন অনেকদিন যাবৎ যুদ্ধ করিবার জন্য উস্‌খুস্ করিতেছিল, কেবল সুযোগের অভাবে এতদিন লাগিয়া পড়িতে পারেন নাই। তিনি দেখিলেন এই সুযোগ। এক মাসের মধ্যে ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য, এই ফাঁকে মগধের দক্ষিণে অঙ্গদেশটা দখল করিয়া বসিবেন। সংবাদ পাইয়া নয়পাল যদি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে আসে তখন দেখা যাইবে।

লক্ষ্মীকর্ণ বুদ্ধিটা ভালই খেলাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হিসাবে একটু ভুল ছিল। তাঁহার গুপ্তচর পাটলিপুত্র হইতে ত্রিপুরীতে আসিতে একপক্ষ কাল লইয়াছিল, তিনি নিজে সৈন্য সাজাইয়া যাত্রা করিতে এক মাস লইয়াছিলেন ; তারপর সসৈন্যে অঙ্গদেশে পৌঁছিতে আরও এক মাস লাগিয়াছিল। এই আড়াই মাসে পাটলিপুত্রের পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল।

তান্ত্রিকেরা এক মাস চেষ্টা করিয়াও যখন ভৈরবীচক্রে দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটাইতে পারিল না তখন নয়পাল বীতশ্রদ্ধ হইয়া তান্ত্রিকদের তাড়াইয়া দিলেন। তারপর সপরিবারে সেনা পরিবৃত হইয়া চম্পা নগরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চম্পা অঙ্গদেশের প্রধানা নগরী।

এইখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। পাল রাজাদের কোনও স্থায়ী রাজধানী বা মহাস্থানীয় ছিল না। পাল রাজ্যকালের আরম্ভে ধর্মপাল ও দেবপাল প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এক স্থানে বসিয়া এই বিপুল ভূভাগ শাসন করিবার সুবিধা ছিল না। তাই তাঁহারা সৈন্যসামন্ত অমাত্য সচিব শ্রেষ্ঠী পরিষৎ সঙ্গে লইয়া সাম্রাজ্যের একস্থান হইতে স্থানান্তরে পর্যটন করিয়া বেড়াইতেন। বারাণসী মুদ্‌গগিরি গৌড় মহাস্থান, যখন যেখানে যাইতেন সেখানে অস্থায়ী রাজধানী বা স্কন্ধাবার বসিত। কিন্তু কালক্রমে যখন পালরাজ্য সঙ্কুচিত হইয়া মগধের সীমানায় আবদ্ধ হইল তখনও রাজা পুরাতন রীতি ত্যাগ করিলেন না। পাটলিপুত্রে রাজার স্থায়ী পীঠ রহিল বটে কিন্তু মাঝে মাঝে রাজা রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইয়া পড়িতেন। ভ্রমণও হইত, দূরস্থ রাজকর্মচারীদের উপর দৃষ্টিও রাখা চলিত।

যা হোক, নয়পাল মন্দ মন্থরগতিতে চম্পার দিকে আসিতেছেন, ওদিকে লক্ষ্মীকর্ণ যথাসম্ভব চুপিচুপি আসিতেছেন; চম্পা নগরীর সন্নিকটে উভয়পক্ষে দেখা হইয়া গেল। নয়পাল লক্ষ্মীকর্ণের এই তঞ্চকতায় অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন। রাগ হইলে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, ক্ষাত্রতেজ বিস্ফুরিত হয়, তিনি আক্রমণের আজ্ঞা দিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ ভাবিলেন নয়পাল তাঁহার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে, নিশ্চয় তাহার সঙ্গে বিশ হাজার সৈন্য আছে। নয়পালের দলে অধিকাংশ লোকই যে অসামরিক তাহা তিনি কি করিয়া জানিবেন? তিনি ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যরাও মন দিয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না, দুই চারি ঘা মার খাইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

পলায়ন ছাড়া লক্ষ্মীকর্ণের আর গত্যন্তর রহিল না। তিনি অল্পাধিক এক সহস্র সৈন্য লইয়া পূর্বদিকে পলাইয়া চলিলেন। নয়পালের তখন রোখ চড়িয়া গিয়াছে, তিনি অসামরিক সহচরদের পিছনে রাখিয়া দুই সহস্র সৈন্য সঙ্গে লক্ষ্মীকর্ণের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। পুত্র বিগ্রহপাল সঙ্গে রহিল।

নয়পাল কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণকে ধরিতে পারিলেন না। লক্ষ্মীকর্ণ পলায়ন করিতে করিতে গোধূলি কালে বিক্রমশীল বিহারের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার মাথায় আর একটি বুদ্ধি খেলিয়া গেল। নয়পাল ধর্মে বৌদ্ধ, তিনি কখনই সশস্ত্র সৈন্য লইয়া বিহারভূমিতে প্রবেশ করিবেন না। অতএব—

বিহারভূমিতে প্রবেশের কোনই বাধা নাই; প্রাচীরগাত্রে বিস্তৃত উন্মুক্ত তোরণদ্বার, যে-কেহ যখন ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারে। লক্ষ্মীকর্ণ সদলবলে বিহারভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

ইহাদেরই রূঢ় কোলাহল দীপঙ্কর ছাদ হইতে শুনিয়াছিলেন।

নয়পাল যখন আসিয়া পৌঁছিলেন তখন মূষিক বিবরে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি পবিত্র বিহারভূমিতে সৈন্য লইয়া পদার্পণ করিলেন না, তোরণের বাহিরে অনতিদূরে থানা দিয়া বসিলেন।

পাঁচ

দীপঙ্কর ছাদের কিনারায় গিয়া দেখিলেন বন্যার ঘোলা জলের ন্যায় সৈন্যস্রোত তোরণপথে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র সন্ধ্যার আলোয় ঝিকঝিক করিতেছে। দীপঙ্কর ত্বরিতে নীচে নামিয়া গেলেন। তিব্বতী চারিজন তাঁহার পিছনে রহিলেন।

নীচে তখন ভারি গণ্ডগোল। সংঘভূমির চারিদিকে লোক দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। সংঘের যাহারা বাসিন্দা তাহারা নিজ নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিয়াছে, ভয়ার্তেরা নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি গুঁতাগুঁতি করিতেছে। দেখিতে দেখিতে কয়েকটা মশাল জ্বলিয়া উঠিল ; মশালগুলা অন্ধকারে আলেয়ার অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় শূন্যে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দীপঙ্কর নামিয়া আসিয়া চারিদিকে চাহিলেন। মশালের আলো সত্ত্বেও মনে হয় অসংখ্য প্রেত ছুটাছুটি করিতেছে। একস্থানে তিনি লক্ষ্য করিলেন কয়েকটা মশাল স্থির হইয়া আছে এবং কয়েকটি লোক সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। একজন লোকের আকৃতি বিশাল, সে মেঘমন্দ্র স্বরে আদেশ দিতেছে, অন্য সকলে সেই আদেশ পালনের জন্য দৌড়িতেছে। দীপঙ্কর সেইদিকে গেলেন ; দেখিলেন শালপ্রাংশু ব্যক্তি ও তাহার আশেপাশে যাহারা দাঁড়াইয়া আছে সকলের অঙ্গে লৌহজালিক, হস্তে তরবারি। সুতরাং ইহারাই এই সৈন্যদলের অধিনায়ক সন্দেহ নাই। দীপঙ্কর তাহাদের সম্মুখীন হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তোমরা কারা ? পবিত্র বিহারক্ষেত্রে তোমাদের কী প্রয়োজন ?'

শালপ্রাংশু ব্যক্তি দীপঙ্করের দিকে ব্যাঘ্র-দৃষ্টি ফিরাইলেন। মশালের অস্থির আলোকে তাঁহার বৃহৎ মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর দেখাইল। তিনি রূঢ়স্বরে বলিলেন—'তুমি কে ?'

দীপঙ্কর ধীরকণ্ঠে বলিলেন—'আমি বিক্রমশীল বিহারের একজন ভিক্ষু। তুমি কে ?'

ব্যাঘ্র-চক্ষু ব্যক্তির মুখ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। এই ধৃষ্ট ভিক্ষুটাকে হত্যা করা কর্তব্য কিনা তিনি এই কথা ভাবিতেছেন এমন সময় তাঁহার পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি কথা কহিল। তরুণকান্তি যুবক, যোদ্ধৃবেশ সত্ত্বেও তাহাকে যোদ্ধা বলিয়া মনে হয় না। সে বলিল—'ইনি ত্রিপুরীর মহারাজ শ্রীমৎ লক্ষ্মীকর্ণদেব।'

দীপঙ্করের ভ্রূ বিস্ময়ে ঈষৎ উত্থিত হইল। তিনি বলিলেন—'চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণদেব। মহারাজ, আপনি নিজ রাজ্য থেকে বহুদূরে এসে পড়েছেন।'

ভিক্ষুটা তাঁহাকে চেনে দেখিয়া লক্ষ্মীকর্ণের মন একটু নরম হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় কূটবুদ্ধিরও উদয় হইল। সংঘভূমিতে রক্তপাত করিয়া লাভ নাই ; বিশেষত নয়পাল পিছনে বসিয়া আছে। বরং মিষ্টকথায় যদি কার্যসিদ্ধি হয় সেই চেষ্টাই করিয়া দেখা যাক না। তিনি কণ্ঠস্বরে প্রসন্নতা আনিয়া বলিলেন—'তুমি আমার নাম জান, তুমি তো সামান্য ভিক্ষু নও। তোমার নাম কি ?'

শীর্ণকায় বিনয়ধর দীপঙ্করের পিছনে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বলিলেন—'ইনি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, এই বিহারের মহাচার্য।'

লক্ষ্মীকর্ণ চকিত হইলেন। অতীশ দীপঙ্করের নাম জানে না এমন মানুষ তখন ভারতে ছিল না। লক্ষ্মীকর্ণের পাশে যে দাঁড়াইয়া ছিল তাহার চক্ষে সম্ভ্রম ফুটিয়া উঠিল। লক্ষ্মীকর্ণ মস্তক ঈষৎ আনত করিয়া বলিলেন—'আপনি অতীশ দীপঙ্কর ! ধন্য।'

দীপঙ্কর স্থির নেত্রে লক্ষ্মীকর্ণের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'মহারাজ, আপনি কি মগধ আক্রমণ করেছেন ?'

মহারাজ দুই হাত নাড়িয়া উচ্চহাস্য করিলেন। হাস্য করিলে তাঁহার মুখখানি অশোকস্তম্ভের শীর্ষস্থিত সিংহের মুখের মত দেখায়। তিনি অসি কোষবদ্ধ করিয়া বলিলেন—'না না, সে কি কথা! আমরা মৃগয়ায় বেরিয়েছিলাম, পথ ভুলে মগধের সীমানায় ঢুকে পড়েছি।'

কথাটা এতই মিথ্যা যে তাঁহার পার্শ্বস্থ যুবক এবং অন্য লোকগুলি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিল। লক্ষ্মীকর্ণ কিন্তু তিলমাত্র লজ্জিত না হইয়া সহাস্যমুখে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। দীপঙ্করের মুখেও একটু হাসির আভাস দেখা দিল। তিনি বলিলেন—'বিক্রমশীল বিহারেও কি মহারাজ মৃগয়ার উদ্দেশ্যে ঢুকে পড়েছেন?'

লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন—'না, নিরুপায় হয়ে ঢুকেছি। আমাদের সঙ্গে যা খাদ্য ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই আপনার আশ্রয় নিয়েছি। মহাশয়, আপনি ধার্মিক ব্যক্তি, আমরা নিরাশ্রয়। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করুন।' নয়পালের তাড়া খাইয়া যে তাঁহারা বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন সে কথা লক্ষ্মীকর্ণ চাপিয়া গেলেন।

এই সময় বিহারের একজন শ্রমণ সেইদিক দিয়া ছুটিয়া যাইতে যাইতে মশালের আলোকে দীপঙ্করকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কাছে আসিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—'মহাচার্য, দস্যুরা আর্য রত্নাকর শান্তির কাছ থেকে কুঞ্চিকা কেড়ে নিয়ে অন্নকোষ্ঠ লুণ্ঠন করছে।'

দীপঙ্করের মুখ কঠিন হইল। তিনি লক্ষ্মীকর্ণকে বলিলেন—'এই কি আশ্রয় যাঞ্চার রীতি?'

লক্ষ্মীকর্ণ আবার অট্টহাস্য করিলেন, তারপর ছদ্ম বিনয়ের ব্যঙ্গবঙ্কিম স্বরে বলিলেন—'ওরা ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার্তের অন্নস্পৃহা স্বাভাবিক। আপনি ওদের ক্ষমা করুন।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ, ধর্মের প্রতি যদি আপনার নিষ্ঠা থাকে এই দণ্ডে আপনার অনুচরদের বিহারভূমি ত্যাগ করতে আদেশ করুন।'

লক্ষ্মীকর্ণের মুখ আবার গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন—'অসম্ভব। আমাদের আশ্রয় এবং খাদ্যের প্রয়োজন।'

'বিহার ত্যাগ করবেন না?'

'না।' লক্ষ্মীকর্ণ ব্যাঘ্র-চক্ষু মেলিয়া একবার দীপঙ্করকে দেখিলেন, তারপর নিজের সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন।

দীপঙ্করের অন্তর ব্যর্থতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। দুর্বৃত্তদের দমন করিবার কোনও অহিংস পন্থা কি নাই; তথাগত, তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিতে বলিয়াছ, কিন্তু—

বিনয়ধর চুপি চুপি তাঁহার কানে বলিলেন—'মহাচার্য, যদি আদেশ করেন আমরা এদের তাড়াবার চেষ্টা করতে পারি।'

দীপঙ্কর ঘাড় ফিরাইয়া কিছুক্ষণ বিনয়ধরের পানে চাহিয়া রহিলেন, কি করিয়া বিনয়ধর এতগুলা বর্বরকে তাড়াইবেন বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া শুষ্কস্বরে বলিলেন—'চেষ্টা করুন।'

বিনয়ধর ও তাঁহার তিব্বতী সঙ্গীরা নিঃশব্দে সংঘের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

দীপঙ্কর দাঁড়াইয়া রহিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ আর তাঁহার দিকে ফিরিলেন না, নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। মশালধারীরা মশাল ঊর্ধ্বে তুলিয়া দণ্ডায়মান রহিল। লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে যুবক ব্যতীত আর যে কয়জন পুরুষ ছিল তাহারা সকলেই বয়স্থ এবং পুষ্টদেহ; বোধহয় তাহারা লক্ষ্মীকর্ণের সেনাধ্যক্ষ। লক্ষ্মীকর্ণ তাহাদের সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে বোধকরি কূট-পরামর্শ করিতেছেন। যুবক একটু দূরে সরিয়া গিয়া এদিক ওদিক কৌতূহলী দৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তারপর আচম্বিতে এই মশালবিদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে যে কাণ্ড আরম্ভ

হইল তাহার বর্ণনা করা দুষ্কর। হঠাৎ দুম্ করিয়া একটা বিকট শব্দ হইল ; মাটি হইতে খানিকটা আগুন ছিটকাইয়া পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূরে আবার দুম্ করিয়া শব্দ এবং আগুনের উচ্ছ্বাস! মাটি কাঁপিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বিহারভূমির চতুর্দিক বিকট দুম্‌দাম্ শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন অনৈসর্গিক শব্দ কেহ কখনও শোনে নাই। যেন ভূগর্ভ ফাটিয়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘোর শব্দে বাহির হইয়া আসিতেছে।

শুধু শব্দই নয়। হঠাৎ আগুনের একটা সাপ স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিতে করিতে মাটির উপর ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আর একটা! আর একটা! চারিদিকে বিসর্পিত স্ফুলিঙ্গ কিল্‌বিল্ করিতে লাগিল।

প্রথম দুইবার বিকট শব্দ হইবার পরই মশালধারীরা মশাল ফেলিয়া দৌড় মারিয়াছিল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। এ কী বীভৎস ব্যাপার! বৌদ্ধরা কি পিশাচসিদ্ধ। এরূপ প্লীহা-চমকপ্রদ শব্দ ও আগুনের খেলা প্রেত-পিশাচ ছাড়া আর কে সৃষ্টি করিতে পারে? লক্ষ্মীকর্ণদেব যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও ভয় পান নাই, কিন্তু আজ তাঁহার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল।

দুম্ দাম্ দড়াম্ শব্দের ফাঁকে ভয়ার্ত চিৎকার আসিতে লাগল। লক্ষ্মীকর্ণের সৈন্যগণ কিছুক্ষণ হতভম্ব থাকিয়া পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়িতে ছাড়িতে পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে যেদিকে পাইল পলাইল, কেহ প্রাচীর ডিঙাইয়া ছুট দিল, কেহ অন্ধ ত্রাসে গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে বিহারভূমি শূন্য হইয়া গেল। কেবল লক্ষ্মীকর্ণ ও তাঁহার সহচরগণ অভিভূত বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দীপঙ্করও কম অভিভূত হন নাই। কিন্তু তিনি অস্পষ্টভাবে ব্যাপার বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

দুম্ দাম্ শব্দ কমিয়া আসিতেছে। হঠাৎ লক্ষ্মীকর্ণের পশ্চাদ্দেশে ফর্‌র্ শব্দ করিয়া আগুনের একটা উৎস জ্বলিয়া উঠিল, যেন ভূতলস্থ কোনও ছিদ্রপথে অগ্নিশ্বাস রাক্ষস ফুৎকার দিতেছে। লক্ষ্মীকর্ণ সভয়ে পলাইতে গিয়া পড়িয়া গেলেন ; আবার উঠিয়া পলায়নের চেষ্টা করিবেন এমন সময় একজন সেনাধ্যক্ষ তাঁহার পিঠের উপর পড়িল। তার উপর আর একজন পড়িল। সর্বোপরি পড়িল যুবক। সকলে মিলিয়া হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিলেন।

মশালগুলি নিভিয়া গিয়াছে ; দুম্ দাম্ শব্দ প্রায় থামিয়া আসিয়াছে ; আগুনের উৎস আর স্ফুরিত হইতেছে না। চারিদিক ঘোর অন্ধকার।

দীপঙ্করের স্বর শোনা গেল—'মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ, আপনি আছেন তো?'

মাটির নিকট হইতে লক্ষ্মীকর্ণের উত্তর আসিল—'এই যে আমি এখানে। মহাচার্যদেব, আপনার পিশাচদের সম্বরণ করুন।'

অন্ধকারে দীপঙ্কর হাসিলেন।

সংঘের ভিতর হইতে একটি আলোকবর্তিকা বাহির হইয়া আসিতেছে। কাছে আসিলে দেখা গেল, তিব্বতী আচার্য বিনয়ধর দীপ হস্তে আসিতেছেন। দীপের প্রভায় দেখা গেল, লক্ষ্মীকর্ণ সপারিষৎ মৃত্তিকার উপর উপবিষ্ট আছেন।

দীপঙ্কর বলিলেন—'মহারাজ, আপনার সৈন্যেরা বোধহয় আপনার অনুমতি না নিয়েই বিহারভূমি ত্যাগ করেছে।'

লক্ষ্মীকর্ণ দীপঙ্করের কথা শুনিতে পাইলেন কিনা সন্দেহ। তিনি পূর্বে কখনও তিব্বতী দেখেন নাই, প্রদীপের আলোয় বিনয়ধরের মুখ দেখিয়া তাঁহার বুক গুরুগুরু করিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন—পিশাচ। দীপঙ্করের পোষা পিশাচ। তিনি হাত জোড় করিয়া কম্পিত স্বরে

বলিলেন—'আচার্য দীপঙ্কর, আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি যা বলবেন তাই শুনব।'

দীপঙ্কর মৃদু হাস্যে বলিলেন—'ভয় নেই। আসুন আমার সঙ্গে। অস্ত্র ত্যাগ করে আসুন।'

ছয়

নয়পাল তাঁহার দুই সহস্র সৈন্য লইয়া বিহার-তোরণ হইতে তিন-চারি রজ্জু দূরে বসিয়াছিলেন। রাত্রি আসন্ন, সঙ্গে রাত্রিবাসের উপযোগী বস্ত্রাবাস আচ্ছাদন কিছুই নাই, লক্ষ্মীকর্ণকে তাড়া করিবার সময় সবই পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং আজ রাত্রিটা নক্ষত্রখচিত আকাশের তলে কাটাইতে হইবে।

শুধু তাহাই নয়। প্রত্যেক সৈনিকের সঙ্গে সামরিক নিয়মানুযায়ী এক বেলার খাদ্য, অর্থাৎ দুই মুষ্টি চণক বা তণ্ডুল বা যবচূর্ণ আছে বটে, কিন্তু রাজা বা রাজপুত্রের সঙ্গে কণামাত্র আহার্য নাই; অতএব পেটে কিল মারিয়া রাত্রিযাপন করা ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। সঙ্গে যে কয়জন সেনানী আছেন তাঁহাদেরও সেই অবস্থা।

মহারাজ নয়পাল তাহাতে বিশেষ বিচলিত হন নাই। তিনি বয়স্থ ব্যক্তি, জঠরের অগ্নি মন্দ হইয়াছে; পবিত্র গঙ্গাজল পান করিয়া তাঁহার চলিয়া যাইবে। তিনি লক্ষ্মীকর্ণের উদ্দেশ্যে কিছু গালিগালাজ বর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। সেনানীরাও সৈন্যদের কাছে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া যাহোক একটা ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু যুবরাজ বিগ্রহপাল?

বিগ্রহপাল যুবাপুরুষ, জঠরাগ্নি বিলক্ষণ প্রবল। সৈনিকদের নিকট কণা-ভিক্ষা তিনি প্রাণ গেলেও করিবেন না। তাই সারারাত্রি না খাইয়া কাটাইবার সম্ভাবনায় তাঁহার মন বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। রাজপুত্রদের উপবাস করার অভ্যাস কোনও কালেই নাই।

বিগ্রহপালের বয়স এই সময় কুড়ি বৎসর। উজ্জ্বল কাংসফলকের ন্যায় শুক্লপীতাভ দেহের বর্ণ, নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব আকৃতি, মুখে পৌরুষের লাবণ্য। রাজপুত্র বটে, কিন্তু দেহে যেমন লেশমাত্র মেদ নাই, মনে তেমনি বিন্দুমাত্র অভিমান নাই। ক্রীড়াচটুল কৌতুকোচ্ছল প্রগল্ভ প্রকৃতি। রাজপুত্রদের মধ্যে এরূপ প্রকৃতি প্রায়শঃ দেখা যায় না; বোধকরি বাঞ্ছনীয়ও নয়।

বর্তমানে যুবরাজ ক্ষুৎপীড়িত অবস্থায় বিচরণ করিতেছেন। অন্ধকারে সৈন্যগণ মাটির উপর বসিয়া শুষ্ক শস্য চিবাইতে চিবাইতে গল্প করিতেছিল; মহারাজ তাঁহার সেনানীদের লইয়া সৈন্য-মণ্ডলীর মাঝখানে বিরাজ করিতেছিলেন; কিন্তু যুবরাজ সৈন্যচক্রের মাঝখানে নিরাপদ স্থানে আবদ্ধ থাকিতে পারেন নাই, চক্রের বাহিরে আসিয়া একাকী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। পশ্চিমে দিনের চিতা নিভিয়া গিয়াছে। অদূরে গঙ্গার স্রোতঃপ্রবাহ দেখা যাইতেছে না কিন্তু তাহার কলধ্বনি কানে আসিতেছে। সম্মুখে বিহারের ঊর্ধ্বোত্থিত চূড়া বিপুলায়তন প্রস্তরীভূত অন্ধকারের আকার ধারণ করিতেছে; বিহারভূমি হইতে কোলাহলের শব্দ আসিতেছে...কয়েকটি মশাল জ্বলিয়া উঠিল...

সেনা-মণ্ডলীর সীমান্ত পরিক্রমণ করিতে করিতে যুবরাজ বিগ্রহপাল চিন্তা করিতেছিলেন—বুড়া লক্ষ্মীকর্ণ একটা গ্রন্থিচ্ছেদক...চোর...দিব্য বিহারে ঢুকিয়া চর্ব্যচূষ্য খাইতেছে, আর আমরা...দূর হোক। আজ যদি প্রিয়বয়স্য অনঙ্গপাল সঙ্গে থাকিত নিশ্চয় একটা বুদ্ধি বাহির করিত...অন্ধকারে চুপি চুপি বিহারে ঢুকিয়া পড়িলে কেমন হয়? আমাকে তো কেহ চেনে না।...কিন্তু পিতৃদেবের নিষেধ সশস্ত্রভাবে বিহারে প্রবেশ করিবে না।...কী উপায়! আজ রাত্রে খাদ্যসংগ্রহ করিতেই হইবে। নিরস্ত্র হইয়া বিহারে প্রবেশ করিলে কেমন হয়? একবার আর্য

দীপঙ্করের কাছে পৌঁছিতে পারিলে আর ভয় নাই...কিন্তু আর্য দীপঙ্কর কিরূপ আছেন কে বলিতে পারে ! হয়তো মহাপিশুন লক্ষীকর্ণ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তা যদি করিয়া থাকে, পাষণ্ডের মুণ্ড লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিব...

এই সব চিন্তার জালে বিগ্রহপালের মন জড়াইয়া গিয়াছে এমন সময় বিহারভূমি হইতে বিকট শব্দ আসিল—দুম্ ! তারপর দ্রুত পরম্পরায়—দুম্ দাম্ দড়াম্ ! নয়পালের দুই হাজার সৈন্য একযোগে উঠিয়া দাঁড়াইল। এ কি ভয়ানক শব্দ ! সকলে কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া বিহারের দিকে চাহিয়া রহিল। শব্দটা বিহারের প্রাচীর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ আছে তাই কেহ পলায়ন করিল না, নচেৎ অবশ্য পলায়ন করিত। বিগ্রহপাল ক্ষণেকের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলেন, তারপর কটি হইতে তরবারি খুলিয়া ফেলিয়া দ্রুতহস্তে দেহের বর্মচর্ম মোচন করিতে লাগিলেন। যেখানে উত্তেজক ব্যাপার ঘটিতেছে সেখান হইতে বিগ্রহপালকে ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব।

দুম্ দাম্ শব্দ চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তাহার সহিত ভীত মনুষ্যকণ্ঠের কলকল শব্দ মিশিল। তারপর বিহারের চারিদিক হইতে ছায়ামূর্তির মত মানুষ ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল ; বল্মীকস্তূপের উপর পদাঘাত করিলে যেমন পিল্‌পিল্ করিয়া কীট বাহির হয় তেমনি। নয়পালের সৈন্যদল যেখানে যূথবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল সেদিকে কেহ আসিল না, বিভিন্ন দিকে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল।

বিগ্রহপালের কৌতূহল ও আগ্রহ আর বাধা মানিল না। পিতার অনুমতি লইতে গেলে অনেক সময় লাগিবে, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া বিহারের দিকে ছুটিলেন। দুম্ দাম্ শব্দ এতক্ষণে থামিয়া আসিয়াছে, পলায়মান মানুষগুলাও অদৃশ্য হইয়াছে।

বিগ্রহপাল বিহার-তোরণের সম্মুখে যখন পৌঁছিলেন তখন বিহার নিস্তব্ধ ও অন্ধকার। বিড়ালের ন্যায় লঘুপদক্ষেপে তিনি সোপান অতিক্রম করিয়া বিহারভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

বিহারভূমি জনশূন্য, কেবল একটি কটু ধূমের গন্ধ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। বিগ্রহপাল বিহারের কেন্দ্রস্থিত ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি পূর্বে কয়েকবার পিতার সঙ্গে বিক্রমশীল বিহারে আসিয়াছেন, স্থানটি তাঁহার অপরিচিত নয়। মহাচার্য দীপঙ্কর ছাদের কাষ্ঠ-প্রকোষ্ঠে বাস করেন তাহাও তিনি জানেন। তবু ছাদে উঠিবার সিঁড়িটা সহসা খুঁজিয়া পাইলেন না। একে সূচীভেদ্য অন্ধকার, তার উপর কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই।

সতর্কভাবে এদিক ওদিক হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে সহসা দূরে আলোকের প্রভা তাঁহার চোখে পড়িল। তিনি অতি সন্তর্পণে সেইদিকে চলিলেন। সংঘ শত্রু কিম্বা মিত্র কাহার অধিকারে তাহা জানা নাই, সাবধানে চলা ভাল।

আলোকপ্রভার কাছাকাছি আসিয়া তিনি দেখিলেন একটি প্রকোষ্ঠে তিন-চারিটি দীপ জ্বলিতেছে, কয়েকজন লোক আহারে বসিয়াছে। দুইজন ভিক্ষু পরিবেশন করিতেছে। ভোক্তাদের মধ্যে একজন বিশালকায় পুরুষ গোগ্রাসে আহার করিতেছে, তাহার পাত্রে খাদ্যদ্রব্য পড়িতে পড়িতে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

আজ দ্বিপ্রহরে বিগ্রহপাল এই বিশালকায় লোকটাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বহুদূর হইতে দেখিয়াছিলেন—নিশ্চয় লক্ষ্মীকর্ণ। বিগ্রহপাল বাহিরের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার কর্ণে আসিল একটি শান্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর। দীপঙ্কর প্রকোষ্ঠের মধ্যেই আছেন, বাহির হইতে তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না। বিগ্রহপাল শুনিতে পাইলেন, দীপঙ্কর বলিতেছেন—'মহারাজ লক্ষীকর্ণ, বৌদ্ধবিহারে রাজকীয় খাদ্য-পানীয় নেই, রাজকীয় রতিগৃহের পালঙ্কশয্যাও নেই। আজ ভিক্ষুর খাদ্য এবং ভিক্ষুর শয্যাতে আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আপনারা পথক্লান্ত, আহারের পর বিশ্রাম করুন। পাশের প্রকোষ্ঠে আপনাদের তৃণশয্যা রচিত

হয়েছে। ভয় নেই, প্রেত পিশাচ বা মানুষ, কেউ আপনাদের বিরক্ত করবে না। কাল প্রাতে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে। তারপর আপনি যদি ইচ্ছা করেন নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে পারবেন। আজ আমি চললাম। আমার কিছু অন্য কাজ আছে।—আরোগ্য।'

উত্তরে লক্ষ্মীকর্ণ গলার মধ্যে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করিলেন। দীপঙ্কর একটি দীপ হস্তে লইয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন। বিগ্রহপালকে তিনি দেখিতে পাইলেন না, অলিন্দ দিয়া একদিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

বিগ্রহপাল নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অলিন্দের প্রান্তে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি। দীপঙ্কর সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়াছেন এমন সময় পিছনে অস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বিগ্রহপাল তাঁহার কাছে আসিয়া নত হইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিলেন।

প্রদীপ তুলিয়া ধরিয়া দীপঙ্কর বিগ্রহপালের মুখ দেখিলেন, বিস্ময়োৎফুল্ল স্বরে বলিলেন—'এ কি বিগ্রহ! তুমি এখানে কোথা থেকে এলে?'

'ভয়ঙ্কর শব্দ শুনে এসেছি আর্য।' বলিয়া দ্রুত নিম্নকণ্ঠে সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া দীপঙ্কর হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—'এতক্ষণে লক্ষ্মীকর্ণের ব্যাপার বুঝলাম। ভাল হয়েছে, ভাল হয়েছে।—তুমি এখন ফিরে যাও, তোমার পিতৃদেবকে সঙ্গে করে নিয়ে এস। তাঁর সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

'যে আজ্ঞা। কিন্তু আর্য, কিসের এমন বিকট শব্দ হচ্ছিল?'

'পরে শুনো। এখন যাও, শীঘ্র মহারাজকে নিয়ে এস।'

'আজ্ঞা। কিন্তু আর্য, বড় পেট জ্বলছে, ফিরে এসে যেন খেতে পাই।'

দীপঙ্কর তাঁহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'পাবে।'

সাত

রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বিহারের একটি কক্ষে খড়ের শয্যায় শয়ন করিয়া মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ সানুচর নিদ্রা যাইতেছেন। তৃণশয্যার জন্য নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত হয় নাই, মহারাজের নাসারন্ধ্র হইতে থাকিয়া থাকিয়া বীরোচিত সিংহনাদ বাহির হইতেছে। অন্যথা বিহার নিস্তব্ধ এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

কেবল ছাদে দীপঙ্করের দারু-কক্ষে দীপ জ্বলিতেছে। কক্ষটি আয়তনে প্রশস্ত, ভূমির উপর তৃণাস্তরণ; চারি কোণে স্তূপীকৃত তালপাতার পুঁথি ছাড়া কক্ষে আর কিছু নাই। এই কক্ষের মাঝখানে পাঁচটি মানুষ অর্ধচন্দ্রাকারে বসিয়াছেন। দীপঙ্করের একপাশে নয়পাল ও বিগ্রহপাল, অন্যপাশে আচার্য বিনয়ধর ও মহাধ্যক্ষ রত্নাকর শান্তি।

বিগ্রহপালের পেট ঠাণ্ডা হইয়াছে, নয়পাল যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াছেন। গুরুতর আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। যদিও এত রাত্রে ছাদে কেহ নাই, তবু যথাসম্ভব নিম্নকণ্ঠে কথা হইতেছে।

মহারাজ নয়পাল গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'কাল সকালে লক্ষ্মীকর্ণকে বিহারের বাহিরে টেনে নিয়ে গিয়ে ওর নাক কেটে নেব।' নয়পালের চক্ষু দুটি ঈষৎ রক্তাভ; অন্তরের অগ্নিশিখা প্রশমিত হইয়া এখন কেবল অঙ্গার জ্বলিতেছে।

দীপঙ্কর হাসিলেন—'অতটা প্রয়োজন হবে না। লক্ষ্মীকর্ণ বিলক্ষণ ভয় পেয়েছে। যে অদ্ভুত ব্যাপার আজ সে দেখেছে—'

নয়পাল বলিলেন—'অদ্ভুত ব্যাপার—অসম্ভব ব্যাপার ! মানুষ যে এমন শব্দ সৃষ্টি করতে পারে তা কল্পনা করা যায় না।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'লক্ষ্মীকর্ণ ভেবেছে এ পিশাচের কাণ্ড।'

আচার্য বিনয়ধর নিজের কেশহীন কঙ্কালসার মুখে আঙুল বুলাইয়া বলিলেন—'শুধু তাই নয়, আমাকেই তিনি পিশাচ মনে করেছেন।'

অন্য সকলের মুখে হাসির স্ফুরণ দেখা দিল, কিন্তু তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিলেন। দীপঙ্কর বলিলেন—'আচার্য বিনয়ধর, তিব্বতের নবীন মহারাজা যে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন তার তুল্য মূল্যবান বস্তু পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। সোনারূপা মণিমাণিক্য এর কাছে তুচ্ছ।'

নয়পাল বলিলেন—'এ বস্তু পেলে একজন সামান্য রাজা সারা পৃথিবী জয় করতে পারে।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'ঠিক এই কথা আমিও ভাবছিলাম। পৃথিবী জয়ের কথা নয়, সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে উৎপাত এসেছে তাকে দূর করার কথা। বর্বর তুরস্কদের বিতাড়িত করতে হলে এই বস্তুটির একান্ত প্রয়োজন।'

বিনয়ধর ধীরে ধীরে বলিলেন—'আচার্য দীপঙ্কর, আজ আপনারা অগ্নিকন্দুকের যে-ক্রিয়া দেখেছেন তা এর শক্তির সামান্য নিদর্শন মাত্র। অমিতশক্তি এই অগ্নিপদার্থ, এর সাহায্যে মুষ্টিমেয় লোক একটা রাজ্য ছারখার করে দিতে পারে, অগণিত শত্রুকে নাশ করতে পারে।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'সম্ভব। যেখানে শক্তি আছে সেখানে শক্তি-প্রয়োগের কৌশল জানা থাকলে কিছুই অসম্ভব নয়। আচার্য বিনয়ধর, এই অগ্নিকন্দুক আপনি কত এনেছেন ?'

'যা এনেছিলাম সবই প্রায় শেষ হয়ে গেছে, আর্য, কেবল একটি অবশিষ্ট আছে।' বলিয়া বিনয়ধর নিজের জটিল বস্ত্রাবরণের ভিতর হইতে একটি গোলক বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে রাখিলেন।

সকলের নিষ্পলক নেত্র ক্ষুদ্র গোলকের উপর নিবদ্ধ হইল। এই বিশেষত্বহীন ক্ষুদ্রকন্দুকের মধ্যে যে এত শক্তি নিহিত আছে তাহা বিশ্বাস হয় না। বিগ্রহপাল একবার সেদিকে লোলুপ হস্ত প্রসারিত করিয়া আবার হাত টানিয়া লইলেন। বিনয়ধর সহাস্যে বলিলেন—'আপনি স্বচ্ছন্দে ওটি হাতে নিতে পারেন। সজোরে আছাড় না মারলে ওর শক্তি আত্মপ্রকাশ করে না।'

বিগ্রহপাল সন্তর্পণে গোলকটি তুলিয়া লইয়া পরম কৌতূহলভরে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, তারপর আবার সন্তর্পণে রাখিয়া দিলেন। দীপঙ্কর একটি নিশ্বাস ফেলিলেন—'মাত্র একটি। কিন্তু একটি দিয়ে তো তুরস্কদের তাড়ানো যাবে না। অনেক চাই। আচার্য বিনয়ধর, আপনি এই বস্তুর নির্মাণ কৌশল জানেন ?'

বিনয়ধর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন—'না আর্য। তিব্বতে কেউ এ গূঢ়বিদ্যা জানে না। কেবল চীনদেশে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানবিৎ আছেন যাঁরা এর রহস্য জানেন। আমাদের মহারাজ তাঁদেরই একজন আনিয়ে এই অগ্নি-ক্রীড়নকগুলি প্রস্তুত করিয়ে আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন। এগুলি খেলার সামগ্রী মাত্র ; এর চেয়ে শতগুণ ভীষণ অস্ত্র তাঁরা নির্মাণ করতে জানেন।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হইল না। দীপশিখার আলোকে পাঁচটি মূর্তি সম্মুখস্থ অগ্নিকন্দুকের পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। অবশেষে দীপঙ্কর বলিলেন—'এই গূঢ়বিদ্যা যদি কেউ শিখতে চায় তাঁরা কি শেখাবেন ?'

বিনয়ধর বলিলেন—'সকলকে শেখাবেন না। দুষ্ট লোকের হাতে এ বিদ্যা সর্বনাশা হয়ে উঠতে পারে, মনুষ্যজাতিকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। তাই তাঁরা এ বিদ্যা সহজে কাউকে দেন না। তবে যদি কোনও শুদ্ধ-সাত্ত্বিক সাধু ব্যক্তি লোকহিতের জন্য শিখতে চান তাহলে শেখাতে পারেন।'

দীপঙ্কর বিনয়ধরের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া সাগ্রহকণ্ঠে বলিলেন—'আচার্য বিনয়ধর, আপনি জানেন ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে এক মহা আপৎ উপস্থিত হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধির মত এ আপৎ ক্রমে পূর্বদিকে এগিয়ে আসছে। একে যদি সময়ে শাসন করা না যায় তাহলে ভারতের সংস্কৃতি ঐতিহ্য কিছু থাকবে না, সংঘ এবং ধর্ম ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে, এই বিক্রমশীল বিহার ভগ্নস্তূপে পরিণত হবে। আমাদের এই মহা আশঙ্কার দিনে মহাচীনের বিজ্ঞানবিৎ সাধুরা কি আমাদের সাহায্য করবেন না ?'

বিনয়ধর বলিলেন—'অবশ্য করবেন। কিন্তু মহাচার্য, অযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁরা এই মহা গুহ্যবিদ্যা দেবেন না।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'না, না, অযোগ্য ব্যক্তিকে এ বিদ্যা দান করা কদাপি উচিত নয়।—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মহারাজ নয়পাল যদি চৈনিক গুণীদের ভারতে আসতে আমন্ত্রণ করেন, তাঁরা আসবেন কি ?'

বিনয়ধর মাথা নাড়িলেন—'না আর্য, আসবেন না। আমাদের মহারাজ অতি কষ্টে একজন গুণীকে তিব্বতে আনিয়েছেন, আর অধিক দূর তিনি আসবেন না। হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।'

দীপঙ্কর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—'মনে করুন, বিক্রমশীল বিহারের কোনও বিদ্যার্থী বা আচার্য যদি তিব্বতে যান, তিনি শেখাবেন কি ?'

বিনয়ধরের ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি খেলিয়া গেল, তিনি বলিলেন—'জানি না আর্য। কিন্তু একটা কথা বলতে পারি। বিক্রমশীল বিহারের মহাচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যদি যান, তাঁকে অবশ্য শেখাবেন।'

দীপঙ্কর কিছুক্ষণ বিনয়ধরের গূঢ়হাস মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, ক্রমে তাঁহার অধরকোণেও একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। 'বুঝেছি'—বলিয়া তিনি করলগ্নকপোলে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

বিনয়ধরের কৌশল অন্য সকলেও বুঝিয়াছিলেন। রত্নাকর শান্তি সন্ত্রস্ত হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'অতীশ, তুমি যদি চলে যাও—'

দীপঙ্কর মুখ তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'আমিই তিব্বতে যাব। বিনয়ধর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হল। হয়তো বুদ্ধেরও তাই ইচ্ছা।' তিনি অগ্নিকন্দুকটি সাবধানে তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—'আজ মন্ত্রণা স্থগিত হোক, রাত্রি অনেক হয়েছে।—মহারাজ, আপনি আর কুমার বিগ্রহ এই কক্ষেই শয়ন করুন, আমরা ছাদে থাকব। কাল প্রাতে লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে।'

রত্নাকরও উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কাকুতি-ভরা স্বরে বলিলেন—'চন্দ্রগর্ভ, কিন্তু তোমার অবর্তমানে—'

দীপঙ্কর তাঁহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'রত্নাকর, আমাকে তিব্বতে যেতেই হবে। এ বিদ্যা না শিখতে পারলে ভারতের রক্ষা নেই। সামনেই হিমঋতু, সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব যাত্রা করব। তুমি চিন্তা কোরো না, গূঢ়বিদ্যা শিখে আমি অবিলম্বে ফিরে আসব।'

আট

পরদিন পূর্বাহ্ণে আবার সভা বসিয়াছে। এবার ছাদে নয়, নিম্নের একটি প্রকোষ্ঠে। দীপঙ্কর মাঝখানে বসিয়াছেন, একপাশে সপুত্র নয়পাল, অন্যপাশে লক্ষ্মীকর্ণ ও তাঁহার সহচর নবীন যুবা। রত্নাকর শান্তি ও বিনয়ধর আজিকার সভায় উপস্থিত নাই। গত সন্ধ্যাকালে বিহারে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, রত্নাকর শান্তি তাহার শোধন-সংস্কারে ব্যস্ত আছেন, বিদ্যার্থীরা ভয়চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের শান্ত করিতেছেন। আর আচার্য বিনয়ধর সঙ্গীদের লইয়া বিহারভূমির একটি আমলক বৃক্ষতলে বসিয়া সহর্ষে হাত ঘষিতেছেন এবং বলিতেছেন—'জয় সিদ্ধার্থ! দীপঙ্কর তিব্বতে যাবেন! জয় সিদ্ধার্থ!' তিনি মাঝে মাঝে গিয়া বিগলিত চিত্তে মন্ত্রণাগৃহে উঁকি মারিয়া আসিতেছেন।

মন্ত্রণাগৃহের বাতাবরণ কিছু আতপ্ত। প্রকাশ্যে নয়পাল বা লক্ষ্মীকর্ণ কোনও প্রকার পারুষ্য প্রকাশ করিতেছেন না বটে, কিন্তু উভয়েরই রক্ত প্রবাহ উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নয়পাল স্থির-কষায় নেত্রে লক্ষ্মীকর্ণকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, নরাধমটাকে হাতে পাইয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না এই ক্ষোভ তাঁহার অন্তরে তুষানলের মত জ্বলিতেছে। অপরপক্ষে লক্ষ্মীকর্ণের পারুষ্য দেখাইবার মত অবস্থা নয়, তিনি বড়ই বিপাকে পড়িয়া গিয়াছেন; নিরস্ত্র নিঃসহায় অবস্থায় শত্রুর সম্মুখীন হইয়া বিক্রম প্রকাশের সুবিধা পাইতেছেন না। সৈন্যগুলা যদি পিশাচের ভয়ে না পলাইত তাহা হইলেও বা কথা ছিল। লক্ষ্মীকর্ণ মাঝে মাঝে তির্যকভাবে নয়পালের দিকে ব্যাঘ্র-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন।

বিগ্রহপাল ও অপরপক্ষীয় যুবকটি কিন্তু পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন নয়। দুইজনের বয়স প্রায় সমান, বিগ্রহপাল সম্ভবত দুই তিন বছরের ছোট, দুইজনেরই দু'জনকে ভাল লাগিয়াছে। বিপক্ষদল না হইলে তাঁহারা এতক্ষণ ভাব করিয়া ফেলিতেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁহারা কেবল পরস্পরের প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই নিবৃত্ত আছেন।

মন্ত্রণাসভার আলোচনা কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হইতেছে। দীপঙ্কর বলিতেছেন—'কৌটিল্যানীতি আমি অবগত আছি—অন্তরহীন রাজ্যের অধিপতিরা পরস্পর শত্রু। সুখের বিষয়, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও একথা আংশিক সত্য। প্রতিবেশীদের মধ্যে যেমন বৈরভাব থাকতে পারে তেমনি মৈত্রভাবও থাকতে পারে। সজ্জন প্রতিবেশী পরস্পর ভরণ করে, কেবল দুর্জন প্রতিবেশী পরস্পর অনিষ্টচিন্তা করে। একথা সামান্য গৃহস্থ সম্বন্ধে যেমন সত্য রাজাদের সম্বন্ধেও তেমনি সত্য।'

লক্ষ্মীকর্ণ যেন অবোধ শিশুকে বুঝাইতেছেন এমনি ধীরতার অভিনয় করিয়া বলিলেন—'মহাশয়, সামান্য গৃহস্থের সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা তুলনীয় নয়। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয় রাজার ধর্ম।' তিনি মৃগয়া করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে মগধরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এই হাস্যকর ভান বহুপূর্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

দীপঙ্কর ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন—'যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয় রাজার ধর্ম একথা আপনি কোথায় পেলেন?'

'আমাদের ধর্মশাস্ত্রে আছে।' লক্ষ্মীকর্ণ এমনভাবে কথাটা বলিলেন যেন ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন বিনা তিনি এক পা চলেন না।

দীপঙ্কর দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'কদাপি নয়। আর্তের ত্রাণই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। মহারাজ, আপনি ধর্মে বৈষ্ণব, স্মরণ করুন স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন। ধর্মযুদ্ধই শ্রেয়ঃ, তস্করবৃত্তি ক্ষাত্রধর্ম নয়।'

লক্ষ্মীকর্ণ উগ্রভাবে উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এই সময় তাঁহার চোখে পড়িল দ্বারের

নিকট হইতে গতরাত্রের পিশাচটা উঁকি মারিতেছে। মহারাজের ক্ষাত্রতেজ অমনি প্রশমিত হইল। একে তো দীপঙ্করের সঙ্গে শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তর্কে জয়ের আশা নাই, লোকটা ঘোর পণ্ডিত; উপরন্তু তাহার পোষা পিশাচ আছে। মহারাজ ঢোক গিলিয়া নীরব হইলেন।

নয়পাল অধীরভাবে বলিলেন—'মহাচার্য, পাথরে জল ঢেলে লাভ কি? পাথর গলবে না। এখন কর্তব্য কি তাই আদেশ করুন।'

দীপঙ্কর বলিলেন—'কর্তব্য শান্তি রক্ষা, মৈত্রী রক্ষা। দেশে বহিঃশত্রু দেখা দিয়েছে, এ সময় যদি আপনারা কলহ করেন তাহলে দু'জনেই ধ্বংস হবেন।'

নয়পাল কহিলেন—'আমি কলহ করিনি। কলহ বিবাদ আমার ভাল লাগে না।'

লক্ষ্মীকর্ণ কথা কহিলেন না, কেবল নাকের মধ্যে একপ্রকার শব্দ করিলেন। নয়পালের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। দীপঙ্কর হাত তুলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন, বলিলেন—'এভাবে প্রশ্নের মীমাংসা হবে না। যেখানে এক পক্ষ কলহ করবার জন্য বদ্ধপরিকর সেখানে কলহ অপরিহার্য। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে পাণ্ডবেরা শান্তি চেয়েছিল, কিন্তু শান্তি রক্ষা হয়নি। আমি কাল রাত্রে অনেক চিন্তা করেছি। আমার একটি প্রস্তাব আছে।'

লক্ষ্মীকর্ণ সন্দিগ্ধ চক্ষে দীপঙ্করের পানে চাহিলেন। নয়পাল বলিলেন—'আদেশ করুন আর্য।'

দীপঙ্কর একবার দুই পার্শ্বস্থ দুই রাজার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, তারপর অত্বরিত কণ্ঠে বলিলেন—'স্বভাব বশে যদি দুই রাজার মধ্যে মৈত্রী না হয় তখন কুটুম্বিতার দ্বারা মৈত্রী স্থাপনের প্রথা আছে। মহারাজ নয়পাল, আপনার পুত্র যুবরাজ বিগ্রহপালের বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে। আমার প্রস্তাব, কুমার বিগ্রহের সঙ্গে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের কন্যার বিবাহ হোক।'

প্রকোষ্ঠের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বিগ্রহপাল চকিতে মুখ তুলিয়া লক্ষ্মীকর্ণের পানে চাহিলেন। লক্ষ্মীকর্ণের সহচর যুবক উৎফুল্ল মুখে বিগ্রহের প্রতি কৌতুকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া লাফাইয়া উঠিলেন—'অসম্ভব! আমার কন্যা—অসম্ভব!' নয়পালও নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণের লম্ফঝম্ফ দেখিয়া তাঁহার মন বিপরীত-মুখী হইল। লক্ষ্মীকর্ণের যখন আপত্তি তখন তাহার কন্যার সহিত তিনি বিগ্রহের বিবাহ দিবেন। স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।

লক্ষ্মীকর্ণ আরও কয়েকবার অসংলগ্নভাবে 'অসম্ভব' বলিয়া ক্রমশ নীরব হইলেন। তাঁহার বিরাগপূর্ণ অসম্মতি ভেদ করিয়া কূটবুদ্ধি ও পিশাচভীতি আবার মাথা তুলিল। এরূপ অবস্থায় ঝগড়া করা চলে না, কৌশলে আত্মরক্ষার প্রয়োজন। কৌশল! সাপও মরিবে দণ্ডও ভাঙিবে না। তারপর একবার এই বেড়া-জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারিলে—

রাজাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া দীপঙ্করের মুখ গম্ভীর হইয়াছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন—'মহারাজ নয়পাল, আপনার আপত্তি আছে?'

নয়পাল পরম ভক্তিভরে বলিলেন—'আপনি আমার গুরু, আপনার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। আপনি যদি চণ্ডাল কন্যা ঘরে আনতে বলেন, তাও আনতে পারি।'

বক্রোক্তিটা লক্ষ্মীকর্ণ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই দীপঙ্কর তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'আপনার যে সম্মতি নেই তা বুঝতে পারছি। ভাল—আমার সাধ্যমত আপনার ইষ্টচেষ্টা আমি করলাম, কিন্তু তা যখন আপনার মনঃপূত নয় তখন আমি আর কি করতে পারি। আপনারা পবিত্র সংঘের বাহিরে গিয়ে পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করুন। আমার আর কিছু বলবার নেই।'

দীপঙ্কর গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া লক্ষ্মীকর্ণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

তিনি ইতিমধ্যে একটি ফন্দি বাহির করিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন—'না না, আচার্য, আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। কন্যার বিবাহ দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, আমার কন্যা বিবাহিতা ; বিবাহিতা কন্যাকে তো দ্বিতীয়বার সম্প্রদান করতে পারি না। এই দেখুন আমার জামাতা। এঁর নাম জাতবর্মা। বংগাল দেশের মহাপরাক্রান্ত রাজা বজ্রবর্মা এঁর পিতা।'

লক্ষ্মীকর্ণ পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবককে নির্দেশ করিলেন। বাকি তিনজন এতক্ষণে যুবককে ভাল করিয়া দেখিলেন। বিগ্রহপালের মুখে চকিত হাসির বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। দীপঙ্কর বলিলেন—'ইনি আপনার জ্যেষ্ঠ জামাতা। কিন্তু আপনার আর একটি অনূঢ়া কন্যা আছে।'

লক্ষ্মীকর্ণ আবার বিপদে পড়িয়া গেলেন। এই ভিক্ষুগুলা সব খবর রাখে, কোন্ রাজার কয়টা মেয়ে তাহাও ইহাদের অজ্ঞাত নয়। মনে মনে সমস্ত ভিক্ষুসমাজকে নিরয়গামী করিয়া তিনি স্খলিতস্বরে কহিলেন—'অ্যাঁ—তা—আমার কনিষ্ঠা কন্যা—অর্থাৎ—'

সহসা তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে আর একটি সুবুদ্ধি জন্মলাভ করিল ; তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'আচার্যদেব, আমাকে ক্ষমা করুন। অবস্থাবিপর্যয়ে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে, তাই প্রকৃত কথা ভাল করে বলতে পারছি না। এখন বলি শুনুন।—আমার বংশে দীর্ঘকাল যাবৎ একটি প্রথা চলে আসছে, প্রত্যেক রাজা অন্তত একটি কন্যাকে স্বয়ংবরা করবেন। সহস্র বৎসরের মধ্যে চেদিবংশে এই প্রথার অন্যথা হয়নি। আমার দুই কন্যা। প্রথমা কন্যা বীরশ্রীর স্বয়ংবর হয়নি, সৎপাত্র পেয়ে তাঁর হাতেই কন্যা সমর্পণ করেছিলাম। সুতরাং কনিষ্ঠা কন্যা যৌবনশ্রীর স্বয়ংবর করতেই হবে। যদি না করি পিতৃপুরুষেরা রুষ্ট হবেন, পিণ্ডোদক গ্রহণ করবেন না। এখন আপনিই বিচার করুন, কি করে কুমার বিগ্রহপালের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে পারি।'

কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিলেন। দীপঙ্কর মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—লক্ষ্মীকর্ণ সম্ভবত মিথ্যা গল্প বানাইয়া বলিতেছে, কিন্তু গল্প না হইতেও পারে। তাঁহার মনে পড়িল, অনুমান ত্রিশ বৎসর পূর্বে গাঙ্গেয়দেবের এক কন্যা, অর্থাৎ লক্ষ্মীকর্ণের ভগিনী স্বয়ংবরা হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় বংশের ধারা লঙ্ঘন করিতে জোর করিলে উৎপীড়ন করা হয়।

দীপঙ্কর একবার বিগ্রহপালের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। সুন্দরকান্তি যুবা, রাজবংশেও এমন সুপুরুষ দুর্লভ। দীপঙ্কর মনস্থির করিয়া বলিলেন—'মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ, আপনার অবস্থাবিপর্যয়ে আমাদের আনন্দ নেই, আপনাকে পীড়ন করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দুই রাজবংশে মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ় হয় ইহাই কাম্য।—আপনি কবে আপনার কন্যার স্বয়ংবর সভা আহ্বান করবেন মনস্থ করেছেন ?'

লক্ষ্মীকর্ণ কিছুই মনস্থ করেন নাই, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলিলেন—'আগামী চৈত্র মাসে।'

'ভাল। স্বয়ংবর সভায় আপনি অনেক মিত্র রাজাকে আমন্ত্রণ করবেন। কুমার বিগ্রহকে আমন্ত্রণ করবেন কি ?'

লক্ষ্মীকর্ণ কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—'অবশ্য অবশ্য।'

'কন্যা কুমার বিগ্রহের গলায় মাল্যদান করলে আপনার আপত্তি হবে না ?'

'কিছুমাত্র না।'

দীপঙ্কর নয়পালের পানে একবার চাহিলেন—'তাহলে এই স্থির রইল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ কন্যার স্বয়ংবর সভায় কুমার বিগ্রহকে আহ্বান করবেন। কন্যা যদি কুমারের গলায় বরমাল্য দান করে তাহলে দুই রাজবংশের মধ্যে কুটুম্ব-মৈত্রী স্থাপিত হবে। সমস্যার সম্যক সমাধান যদিও হল না, তবু মন্দের ভাল। আশা করি অন্তে শুভ হবে।'

লক্ষ্মীকর্ণ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—'অবশ্য অবশ্য। আমি তাহলে নির্বিঘ্নে স্বরাজ্যে ফিরে যেতে পারি ?'

দীপঙ্কর বলিলেন—'পারেন।'

নয়

আবার অপরাহ্ণ। আকাশে দুই একটি লঘু মেঘ ভাসিতেছে, গঙ্গায় দুই একটি পাল-তোলা নৌকা। পশ্চিম দিগন্তে স্বর্ণকুঙ্কুমের প্রলেপ।

দীপঙ্কর ছাদে একাকী বিচরণ করিতেছেন। এক অহোরাত্রের মধ্যে কত অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল। দীপঙ্কর মনের মধ্যে এক অনভ্যস্ত উত্তেজনা অনুভব করিতেছেন। তিব্বত যাইবার কোনও সঙ্কল্পই ছিল না, অথচ ঘটনাচক্রের আবর্তনে তিব্বত যাওয়া স্থির হইয়াছে। কী অদ্ভুত আসুরিক বিদ্যা ! এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। তিব্বতের পথ হিম-দুর্গম, উপরন্তু দস্যু-অধ্যুষিত। তিনি ফিরিয়া আসিতে পারিবেন কি ?—বুদ্ধের ইচ্ছা—সকলই বুদ্ধের ইচ্ছা।

আজ দ্বিপ্রহরে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ জামাতা ও সহচরদের লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার মনে কী আছে তিনিই জানেন। সুখের বিষয় তাঁহার পলাতক সৈন্য ফিরিয়া আসে নাই। নয়পাল এখনও আছেন ; তাঁহার সৈন্যদল নিকটবর্তী গ্রাম হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। কাল প্রাতে নয়পাল সসৈন্যে চম্পা নগরীতে চলিয়া যাইবেন। আপাতত তিনি পুত্রসহ সংঘেই আছেন।

নানা চিন্তায় মগ্ন হইয়া দীপঙ্কর তাঁহার শিশুতরুশ্রেণীর মধ্যে বিচরণ করিতেছেন এমন সময় রত্নাকর শান্তি ও বিনয়ধর আসিলেন। দীপঙ্কর হাসিয়া বলিলেন—'রত্নাকর, তুমি তোমার চাবির গোছা ফিরে পেয়েছ দেখছি।'

রত্নাকরের নিকট হইতে হাসির উত্তর আসিল না। বিষণ্ণমুখে তিনি বলিলেন—'অতীশ, তিব্বতে যাওয়া তবে স্থির ? এ বিষয়ে আর একবার চিন্তা করে দেখবে না ?'

দীপঙ্কর বলিলেন—'চিন্তা করবার আর কি আছে রত্নাকর ? বুদ্ধের নাম নিয়ে যাত্রা করলেই হল। সামনে হিমঋতু, তার আগে তিব্বতে পৌঁছানো প্রয়োজন। আশীর্বাদ কর যেন সিদ্ধার্থ হই।'

রত্নাকর ক্ষুব্ধমুখে নীরব রহিলেন দেখিয়া বিনয়ধর সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন—'আর্য রত্নাকর, আপনি মুহ্যমান হচ্ছেন কেন ? আগামী বৎসর এই সময় অতীশ ফিরে আসবেন।'

রত্নাকর গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ তুলিলেন, বিনয়ধরকে বলিলেন—'অতীশ না থাকলে ভারতবর্ষ অন্ধকার। বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চাবি ওঁর হাতে, ওঁর অবর্তমানে সেই সব প্রতিষ্ঠান শূন্য হয়ে যাবে। চারিদিকের অবস্থা দেখে মনে হয় ভারতবর্ষের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে ; আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছি। তবু আশীর্বাদ করি তোমরা অতীশকে নিয়ে তোমাদের দেশে ফিরে যাও, সকল প্রাণীর কল্যাণে অতীশের কর্ম ও সেবা নিয়োজিত হোক।—অতীশ, তোমার অনুপস্থিতি কালে আমি কি করব বলে দাও।'

দীপঙ্কর রত্নাকরের স্কন্ধে হাত রাখিলেন, চারিদিকের শিশুবৃক্ষগুলির উপর স্নেহক্ষরিত দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন—'আমার অবর্তমানে এই গাছগুলির পরিচর্যা কোরো। এরা যখন বড় হবে তখন বিহারভূমিতে এদের রোপণ কোরো। দেখো যেন সেবার অভাবে এরা শুকিয়ে না

যায়।'—

দিনের আলো মুদিত হইয়া আসিতেছে। রত্নাকর ও বিনয়ধর নীচে নামিয়া গিয়াছেন। দীপঙ্কর একাকী।

বিগ্রহপাল আসিয়া প্রণাম করিলেন।

দীপঙ্কর বলিলেন—'কী বিগ্রহ ?'

বিগ্রহপাল সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন—'একটি ভিক্ষা আছে।'

'ভিক্ষা ! কি ভিক্ষা ?'

'ওই অগ্নিকন্দুকটি আমায় দান করুন।'

দীপঙ্কর হাসিলেন।

'ছেলেমানুষ ! ও নিয়ে কি করবে ?'

'তা জানি না। কাছে রাখব। হয়তো কোনও দিন কাজে লাগবে।'

'এস দিচ্ছি। কিন্তু ওর অপব্যবহার কোরো না।'

নিজের দারু-প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া দীপঙ্কর বিগ্রহপালকে অগ্নিকন্দুকটি বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—'এটিকে শুষ্ক স্থানে রেখো, যেন ভিজে না যায়। বিনয়ধর বলছিলেন জল লাগলে এর গুণ নষ্ট হয়ে যায়।'

'যে আজ্ঞা।'

'আর একটা কথা।—লক্ষ্মীকর্ণের নিমন্ত্রণ পেলে স্বয়ংবর সভায় যেও। তারপর বুদ্ধের ইচ্ছা।'

'যে আজ্ঞা।'

এইখানেই বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে দীপঙ্কর অল্পকাল মধ্যেই তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন ; তারপর সেখানে ত্রয়োদশ বর্ষ যাপন করিয়া সেইখানেই দেহরক্ষা করেন, আর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই। তিনি গূঢ়বিদ্যা শিখিয়াছিলেন কিনা এবং শিখিয়া থাকিলে কেন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন না এ সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক

এক মাস চম্পা নগরীতে যাপন করিয়া মহারাজ নয়পাল স্কন্ধাবার তুলিয়া পাটলিপুত্রে ফিরিয়া গেলেন। দীপঙ্কর তিব্বতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কোনও সংবাদ নাই। লক্ষ্মীকর্ণও চুপচাপ।

কুমার বিগ্রহ অগ্নিকন্দুকটি অতি যত্নে একটি ক্ষুদ্র পেটরার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন, অগ্নিকন্দুকের কথা পিতামাতাকেও বলেন নাই। কেবল একজনকে বলিবার জন্য তাঁহার মন ছটফট করিতেছে, সে তাঁহার প্রাণের বন্ধু অনঙ্গপাল। অনঙ্গপাল পালবংশেরই সন্তান, বিগ্রহপালের দূরস্থ দায়াদ। সে উত্তরাধিকার সূত্রে বহু ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছে, পালবংশে জন্মগ্রহণ করিলে কাহাকেও বৃত্তি-চিন্তা করিতে হয় না, যোগ্যতা অনুযায়ী রাজকর্ম জুটিয়া যায়। অনঙ্গপাল কিন্তু কোনও বৃত্তি অবলম্বন করে নাই। সে একজন শিল্পী ; ছবি আঁকে, মূর্তি গড়ে, গান যায়, বাঁশি বাজায়। আবার সাঁতার কাটিতে, অশ্বপৃষ্ঠে মৃগয়া করিতেও সে পটু। সে সঙ্গে নাই বলিয়া চম্পা নগরীতে আসিয়া বিগ্রহপালের মনে সুখ ছিল না। পাটলিপুত্রে ফিরিবার পর

দুই বন্ধুর মিলন হইল।

রাজপুরীর দীর্ঘিকায় পাশাপাশি বসিয়া ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে বিগ্রহপাল বন্ধুকে বিক্রমশীলা ঘটিত সমস্ত কাহিনী বলিলেন। শুনিয়া অনঙ্গপাল অগ্নিকন্দুকের কথা বিশ্বাস করিল না, বলিল—'মহাপুরুষ দীপঙ্কর বিভূতি দেখিয়েছেন। যা হোক, গোলাটা রেখে দিস, হয়তো ওতে এখনও মন্ত্রের তেজ আছে।' লক্ষ্মীকর্ণ ও স্বয়ংবরের প্রসঙ্গে সে বলিল—'ছিপ দিয়ে কুমীর ধরা যায় না। বুড়ো ঘড়িয়ালটাকে যখন হাতে পাওয়া গিয়েছিল তখন ঠেঙ্গিয়ে মারলেই ভাল হত। যাক, বুড়ো যদি স্বয়ংবরে না ডাকে তখন দেখা যাবে।'

অতঃপর আরও এক মাস কাটিয়া গেল। বিগ্রহপাল বন্ধু অনঙ্গপালের সঙ্গে পাশা খেলিয়া, মাছ ধরিয়া, কদাচ মৃগয়া করিয়া কালহরণ করিলেন। স্বয়ংবরের নিমন্ত্রণ লিপি কিন্তু আসিল না।

গূঢ়পুরুষ আসিয়া মহারাজ নয়পালকে সংবাদ দিল, লক্ষ্মীকর্ণ স্বয়ংবরের আয়োজন করিতেছেন, বহু রাজা এবং রাজপুত্রের নিকট লিপি প্রেরিত হইয়াছে। নয়পাল ক্রুদ্ধ হইয়া স্থির করিলেন মিথ্যাবাদী তস্করের কন্যার সহিত তিনি পুত্রের বিবাহের কোনও চেষ্টাই করিবেন না। তিনি কাশী কোশল কলিঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে ভাট পাঠাইলেন ; যদি উপযুক্ত রাজকন্যা পাওয়া যায় তাহার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবেন।

মাসাবধি কাল পরে ভাটেরা একে একে ফিরিয়া আসিল। কাশী কোশল প্রভৃতি দেশের রাজারা সকলেই মগধের যুবরাজকে জামাতারূপে পাইতে উৎসুক ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাশীরাজকন্যা ইতিপূর্বেই বিবাহিতা ও বহুপুত্রবতী, কোশলরাজের কন্যা অন্যের বাগ্‌দত্তা ; কলিঙ্গরাজের একটি কন্যা আছে বটে, কিন্তু সেটি দাসীকন্যা, মহারাজ নয়পাল যদি তাহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন—

নয়পাল রাগে ফুলিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে এ সমস্তই লক্ষ্মীকর্ণের নষ্টামি। শৃগাল খাল পার হইয়া কুমীরকে কলা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, শত্রুতা করিতেছে। ক্রুদ্ধ নয়পাল কয়েকজন তেজস্বী বজ্রযানী সাধককে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্মীকর্ণকে সংহার করা যায় কিনা তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

বিগ্রহপাল সকল সংবাদ পাইতেছিলেন ; তাঁহার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি অনঙ্গপালকে গিয়া বলিলেন—'চল অনঙ্গ, ত্রিপুরী যাই। বুড়ো শেয়ালের মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে আসি।'

অনঙ্গপাল আপন গৃহে বসিয়া মাটির মূর্তি গড়িতেছিল—একটি পীনপয়োধরা যক্ষিণীমূর্তি। অনঙ্গপাল বিপত্নীক, দুই বছর পূর্বে পত্নীকে হারাইয়া সে আর বিবাহ করে নাই ; বাঁশি বাজাইয়া, চিত্র আঁকিয়া, যক্ষিণী কিন্নরীর মূর্তি গড়িয়া যৌবনের ক্ষুধা মিটাইতেছিল। সে বিগ্রহপালের দিকে একবার চক্ষু ফিরাইল, তারপর একতাল মৃত্তিকা যক্ষিণীর বক্ষে জুড়িয়া দিয়া নিপুণহস্তে গড়িতে গড়িতে বলিল—'কেড়ে আনতে হলে সৈন্য নিয়ে যেতে হয়, তাতে সুবিধা হবে না। স্বয়ংবরের আগে সেখানে অনেক রাজা আসবে, তারাও লড়বে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'তবে চল, চুরি করে আনি।'

'সে কথা মন্দ নয়'—অনঙ্গপাল জলপূর্ণ কটাহে হাত ধুইয়া বিগ্রহের কাছে আসিয়া বসিল—'কিছু ফন্দি মাথায় এসেছে নাকি?'

'না। আয় দু'জনে ফন্দি বার করি।'

দুই বন্ধুর মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া মন্ত্রণা চলিল। উচ্চ হাসি ও চটুল রসালাপের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রণা। অবশেষে অভিসন্ধি পাকা হইলে অনঙ্গ বলিল—'মহারাজকে কোনও কথা বলা হবে

না। চল, ভট্ট যোগদেবের কাছে যাই। তিনি রসিক ব্যক্তি, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে দেবেন।'

দুই বন্ধু উপসচিব যোগদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যোগদেবের বয়স চল্লিশের নীচে, মন্ত্রিত্বের নিম্নতন সোপানে পা রাখিয়াছেন ; রাজনীতির ইক্ষুযন্ত্রে তাঁহার মন এখনও ছিব্‌ড়া হইয়া যায় নাই। বিগ্রহপালকে তিনি ভালবাসিতেন ; পরবর্তী কালে বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি রাজার মহাসচিব হইয়াছিলেন।

মন্ত্রণা শুনিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—'শঠে শাঠ্যম্। —ভাল, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। ত্রিপুরীতে আমার অগ্রজ রন্তিদেব বাস করেন, তিনি ওখানকার বড় জ্যোতিষী। আমি তাঁকে পত্র লিখে দেব, ওখানকার ব্যবস্থা তিনি করতে পারবেন।'

দুই

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন রথে চড়িয়া, ফিরিলেন গো-শকটে আরোহণ করিয়া। যাত্রাকালে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল ছয় সহস্র সৈন্য, ফিরিয়া আসিল গুটি চার-পাঁচ সেনানী। জামাতা জাতবর্মা পথেই শ্বশুর মহাশয়ের পদধূলি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, শ্বশুরের সান্নিধ্যে তাঁহার আর রুচি ছিল না। নিজগৃহে শ্বশুরকন্যাকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন সেইদিকে তাঁহার মন টানিতেছিল।

বলা বাহুল্য লক্ষ্মীকর্ণের মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না। রাজপুরীতে ফিরিয়া ময়ূর মাংস সহযোগে মাধ্বী পান করিতে করিতে তিনি মাঝে মাঝে দন্ত কড়মড় করিতেছিলেন। প্রিয় কিঙ্করীরা নানাভাবে সেবা করিয়াও তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিতেছিল না।

লক্ষ্মীকর্ণ এমন অপদস্থ জীবনে হন নাই। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই, তাহাতে লজ্জা নাই। কিন্তু এ তো পরাজয় নয়, নয়পাল তাঁহার মুখে চুন-কালি দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। এর প্রতিশোধ লইতে না পারিলে—

কিন্তু প্রতিশোধ লওয়া সহজ নয়। আবার সৈন্য সাজাইয়া যুদ্ধযাত্রা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ফল ভিন্নরূপ হইবে কি ? ওই দুষ্টবুদ্ধি দীপঙ্করটা আছে, তাহার পোষা পিশাচ আছে। কী ভয়ঙ্কর পিশাচ ! কী তার হৃৎপ্রকম্পী ক্রিয়াকলাপ ! এরূপ পিশাচের বিরুদ্ধে কে যুদ্ধ করিবে ?

স্বয়ংবর ! কন্যা যৌবনশ্রীর স্বয়ংবর দিবার অভিপ্রায় তাঁহার কস্মিনকালেও ছিল না, দীপঙ্করকে ভুলাইবার জন্য একটা ছুতা করিয়াছিলেন মাত্র। অবশ্য যৌবনশ্রীর সপ্তদশ বৎসর বয়স হইয়াছে, সে সুন্দরী ; সুতরাং তাহার স্বয়ংবর দিলে মন্দ হয় না। লক্ষ্মীকর্ণের মস্তকে কুবুদ্ধি অঙ্কুরিত হইল—ঠিক হইয়াছে ! লক্ষ্মীকর্ণ স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিবেন, ভারতবর্ষের সমুদয় রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবেন। কিন্তু মগধের যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিবেন না। একটি বানরের মূর্তি গড়াইয়া স্বয়ংবর সভায় বসাইয়া দিবেন ; ভাট মূর্তির পরিচয় দিবে—মগধের যুবরাজ। দেখিয়া সভারূঢ় রাজকুল অট্টহাস্য করিবে, সেই অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি মগধের রাজসিংহাসনে গিয়া পৌঁছিবে—

এই কূট-কৌশল উদ্ভাবন করিয়া লক্ষ্মীকর্ণের প্রতিহিংসা-পিপাসু মন অনেকটা শান্ত হইল। তিনি মহা উদ্যমে স্বয়ংবর সভা আহ্বানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উত্তরাপথের ও দাক্ষিণাত্যের রাজারা কুঙ্কুমরঞ্জিত চন্দন সুরভিত নিমন্ত্রণ পত্র পাইলেন ; উপরন্তু দূতমুখে তাঁহারা নানা দিগ্‌দেশের সন্দেশ পাইলেন। দূতগণের বাক্‌চাতুর্যের ইঙ্গিতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে মগধের যুবরাজ আপন উচ্ছৃঙ্খলতার দোষে রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাই তাঁহাকে

স্বয়ংবর সভায় আহ্বান করা হয় নাই।

যাহার স্বয়ংবর সে কিন্তু কিছুই জানিল না।

একদিন অপরাহ্ণকালে রাজকুমারী যৌবনশ্রী আপন ভবনে বাতায়ন তলে বসিয়া রঘুবংশম্ পাঠ করিতেছিলেন।

বিরাট দ্বি-ভূমক রাজপুরীর বহু শাখা-প্রশাখা। তন্মধ্যে দ্বিতলের একটি প্রশাখা যৌবনশ্রীর নিজস্ব। বাতায়ন দিয়া পিছনের দীর্ঘিকা দেখা যায়, আম্রকাননের সুগন্ধি মর্মর ভাসিয়া আসে, অস্তমান সূর্যের কনকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়। এইরূপ একটি বাতায়ন তলে কোমল অজিনাসনে পা ছড়াইয়া বসিয়া পৃষ্ঠ দ্বারা শীতের রৌদ্র সেবন করিতে করিতে কুমারী যৌবনশ্রী কালিদাসের মহাকাব্য কোলে লইয়া পাঠ করিতেছেন। ষষ্ঠ সর্গ পাঠ করিতে করিতে মন বসিয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ বৎসর বয়সে রাজকুমারী যৌবনশ্রীর দেহ নবোদ্ভিন্ন লাবণ্যের রসে টলমল করিতেছে, যেন এইমাত্র তিনি লাবণ্যের সরসীনীরে স্নান করিয়া আসিলেন। মন কিন্তু কৌমার্যের প্রশান্তিতে নিস্তরঙ্গ ; সেখানে যৌবনসুলভ প্রগল্‌ভতা নাই, রাজকন্যাসুলভ গর্ব নাই। মুখখানিতে একটু মধুর গাম্ভীর্য, চোখ দুটিতে স্নিগ্ধ বুদ্ধির প্রভা। পিছন হইতে চুলের উপর সূর্যের আলো পড়িয়া একটি স্বর্ণাভ মণ্ডল রচনা করিয়াছে। একাকী বসিয়া কাব্য পড়িতে পড়িতে তিনি মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন।

যৌবনশ্রীর সৌম্যশুচি রূপলাবণ্য দেখিয়া কেহ কল্পনা করিতে পারে না যে তিনি দৈত্যাবতার লক্ষ্মীকর্ণের কন্যা। লক্ষ্মীকর্ণের মহিষী পরম রূপবতী ছিলেন, ভাগ্যক্রমে কন্যা মাতার রূপ পাইয়াছে। নহিলে কন্যার স্বয়ংবর করা চলিত না।

রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়িতে পড়িতে দ্বারের কাছে দ্রুত চঞ্চল পদধ্বনি শুনিয়া যৌবনশ্রী চক্ষু তুলিলেন। বান্ধুলি আসিতেছে। বান্ধুলি তাঁহার প্রিয় সহচরী ও পর্ণসম্পুট বাহিনী। সে অন্যান্য পুরাঙ্গনার মত রাজপুরীতে বাস করে না, দ্বিপ্রহরে গৃহে যায়, আবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুরীতে ফিরিয়া আসে। রাত্রে কখনও গৃহে যায় কখনও কুমারীর পালঙ্কের পায়ের কাছে শুইয়া রাত কাটাইয়া দেয়। দুইজনে প্রায় সমবয়স্কা, দুইজনের মধ্যে বড় প্রীতি। বান্ধুলির এখনও বিবাহ হয় নাই।—কিন্তু বান্ধুলির প্রসঙ্গ থাক, তাহার সম্বন্ধে পরে অনেক কথা বলিতে হইবে।

যৌবনশ্রী বান্ধুলির চোখে-মুখে উৎফুল্ল উত্তেজনা দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন—'কি রে বান্ধুলি ?'

বান্ধুলি আসিয়া যৌবনশ্রীর কাছে বসিল, একটু হাঁপাইয়া বলিল—'ও পিয়সহি, তুমি শোনোনি ? তোমার যে স্বয়ংবর।'

যৌবনশ্রী রঘুবংশের পুঁথি মুড়িয়া বান্ধুলির মুখের পানে চাহিলেন, তাঁহার নবকিশলয়ের মত ঠোঁট দুটি একটু বিভক্ত হইল। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করা বা অধিক কথা বলা তাঁহার স্বভাব নয়। একটু মৌন থাকিয়া তিনি বলিলেন—'আমি শুনিনি। তুই কোথায় শুনলি ?'

বান্ধুলি গাঢ়স্বরে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—'লম্বোদর বলেছে। বাহিরে এখনও প্রকাশ নেই, কিন্তু রাজাদের কাছে লিপি গেছে।'

রাজকুমারীর নবনীতুল্য গাল দুটি একটু উত্তপ্ত হইল, স্খলিত আঁচলটি তুলিয়া তিনি বুকের উপর টানিয়া দিলেন। ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বান্ধুলির দিকে দৃষ্টি নামাইলেন, একটু হাসির উন্মেষ তাঁহার অধর কোণে দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। তারপর কিছু না বলিয়া তিনি আবার ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মহাকবির কাব্য এখন তাঁহার কাছে নূতন অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বান্ধুলি সাগ্রহে বলিল—'পিয়সহি, মহারাজ তোমাকে কিছু বলেননি ?'

যৌবনশ্রী স্মিতমুখ তুলিয়া বলিলেন—'না।' তারপর আবার কাব্যে মনঃসংযোগ করিলেন।

বান্ধুলি বোধহয় প্রিয়সখীর নিকট অন্যরূপ প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিল। সে একটু নিরাশ হইল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—'তোমার চুল বেঁধে দেব ?'

যৌবনশ্রী পুঁথি হইতে চোখ না তুলিয়া বলিলেন—'দে।'

তিন

বিগ্রহ মাতার কাছে গিয়া বলিলেন—'মা, আমি দেশ ভ্রমণে যাব। পাটলিপুত্র আর ভাল লাগে না।'

মাতা উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন—'কোথায় যাবি ?'

বিগ্রহ বলিলেন—'কোথাও যাব না, নৌকায় চড়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াব। তুমি ভেব না মা, অনঙ্গ আমার সঙ্গে থাকবে।'

মাতা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, কারণ অনঙ্গপালের উপর তাঁহার অগাধ আস্থা। অনঙ্গ বুদ্ধিমান ও সাহসী, সে বিগ্রহকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিবে। বলিলেন—'মহারাজের অনুমতি নিয়েছিস ?'

'না। তুমি মহারাজকে বল।'

মহারাজ শুনিয়া আপত্তি করিলেন না। তাঁহার আয়ু ফুরাইয়া আসিতেছে, ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। একবার সিংহাসনে বসিবার পরে পর-রাজ্যে ভ্রমণের আর সুযোগ থাকিবে না ; সুতরাং এইবেলা কাজটা সারিয়া আসুক। স্বয়ংবরের ব্যাপারে সে বোধহয় মনে আঘাত পাইয়াছে, দু'দিন ঘুরিয়া আসিলে মন ভাল হইবে।

মাঘ মাসের এক দ্বিপ্রহরে অনঙ্গকে লইয়া বিগ্রহ নৌকায় উঠিলেন। নৌকাটি বেশ বড়, উপরে সুসজ্জিত রইঘর ; নীচে রন্ধনের ও হালী মাঝিদের থাকিবার স্থান। ছয়জন দাঁড়ী, একজন হালী, একজন দিশারু ; ভৃত্য বা পাচক সঙ্গে নাই। অনঙ্গপাল নিজে উৎকৃষ্ট পাচক ; দিশারুর কাজ কম, সেও রাঁধিবে। সর্ব-সাকুল্যে নৌকায় দশজন মানুষ। সকলেই অস্ত্রধারণ করিতে জানে। সঙ্গে অস্ত্রও যথেষ্ট আছে। এদিকে জলদস্যু নাই, দক্ষিণে গৌড় বঙ্গে জলদস্যুর বড় দৌরাত্ম্য। তবু সাবধানের মার নাই ; জলপথে বা স্থলপথে যে পথেই হোক, বিদেশযাত্রার সময় অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইতে হয়।

অনুকূল পবনে পাল তুলিয়া নৌকা মরালগতিতে উজান চলিল। গুণবৃক্ষের মাথায় রাজকীয় লাঞ্ছন নাই, নৌকায় যে রাজপুত্র চলিয়াছেন তাহা অনুমান করা যায় না ; মনে হয় প্রয়াগ বা বারাণসীর কোনও বণিকের নৌকা, সাগর হইতে ফিরিতেছে। বিগ্রহের উদ্দেশ্যও তাই, আত্মপরিচয় প্রকাশ না করিয়া তিনি ত্রিপুরী নগরীতে প্রবেশ করিতে চান।

দাঁড়ীরা দাঁড় ধরিল ; নৌকার বেগ বর্ধিত হইল। ঘাটে দাঁড়াইয়া দাসীপরিবৃতা রানী সাশ্রুনেত্রে নৌকার পানে চাহিয়া রহিলেন। বিগ্রহপাল নৌকার ছাদে দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে হাত নাড়িতে লাগিলেন।

ক্রমে পাটলিপুত্রের শত সৌধচূড়া নদীর বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। বিগ্রহপাল ছাদ হইতে নামিয়া রইঘরে আসিয়া বসিলেন। মন স্ফূর্তিতে পূর্ণ ; তিনি যেন রাজহংসের মত রেবাতীরস্থ কমলবনের উদ্দেশে উড়িয়া চলিয়াছেন। সেখানে কমলবনের পরাগ-সুরভিত জলে একটি

রাজহংসী বাস করে—

অনঙ্গপাল একটি বীণাযন্ত্রের কর্ণমর্দন করিতে করিতে তন্ত্রীতে সুর বাঁধিতেছিল, বিগ্রহপাল তাহার পৃষ্ঠে সস্নেহ মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন—'যাত্রা ভালই হয়েছে, কি বলিস ? ঘাটের ধারে দুটো খঞ্জনপাখি ল্যাজ নাচাচ্ছিল।'

অনঙ্গপাল বীণার তন্ত্রীতে তর্জনীর টঙ্কার দিয়া বলিল—'খঞ্জন নয়, ও-দুটো কাদাখোঁচা।'

'না না, খঞ্জন। কাদাখোঁচা কখনো ল্যাজ নাচায়! তা সে যাহোক, কতদিনে ত্রিপুরীতে পৌঁছুব বল দেখি ?'

'তোর মন যে বাতাসের আগে উড়ে চলেছে! এ কি মনপবনের নাও ? এত বেশি আগ্রহ কিসের ? যাকে চুরি করতে যাচ্ছিস তাকে তো চোখেও দেখিসনি!'

বিগ্রহপালের চক্ষু উত্তেজনায় নাচিয়া উঠিল—'তাতে কি! চুরি করাটাই আসল। আর মেয়েটা নিশ্চয় সুন্দর, নইলে স্বয়ংবর হত না।'

বীণা নামাইয়া রাখিয়া অনঙ্গ বলিল—'তা কি বলা যায় ? রাজারা কি শুধু রূপ দেখেই বিয়ে করে, অনেক সময় রাজনৈতিক চালও থাকে। দশটা রানীর মধ্যে গোটা তিন-চার সুন্দরী থাকলেই হল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের কন্যাটি হয়তো বাপের মত দেখতে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'যদি তা হয় তাহলে তাকে হরণ করে এনে তোর সঙ্গে বিয়ে দেব।'

অনঙ্গ বলিল—'তুইও ভীষ্ম নয়, আমিও বিচিত্রবীর্য নই, তোর হরণ করা মেয়ে আমি বিয়ে করব কেন ? তোকেই বিয়ে করতে হবে।'

'আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। আগে বল ত্রিপুরীতে পৌঁছুব কখন ?'

অনঙ্গ দিশারুকে ডাকিল। দিশারুর নাম গরুড়ধ্বজ, চেহারা গিরগিটির মত। সে গুণবৃক্ষে উঠিয়া দিগ্‌দর্শন করিতেছিল, নামিয়া আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল—'গরুড়, ত্রিপুরী যেতে কতদিন লাগবে ?'

গরুড় বলিল—'আজ্ঞা, নৌকা ত্রিপুরী পর্যন্ত যাবে না। ত্রিপুরী নগরী হল গিয়ে নর্মদা নদীর তীরে, শোণ নদের শেষ ঘাট থেকে চার ক্রোশ দূরে।'

'অর্থাৎ শোণ নদের শেষ ঘাটে নেমে স্থলপথে যেতে হবে। সেখানে যানবাহন পাওয়া যাবে ?'

'আজ্ঞা, মাঝে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পথ আছে, বণিকেরা পণ্য নিয়ে যাতায়াত করে।'

'এখান থেকে শোণ নদের শেষ ঘাটে পৌঁছুতে কতদিন লাগবে ?'

'গঙ্গাতে উজান ঠেলে যেতে হচ্ছে, শোণেও উজান ঠেলে যেতে হবে। সারা পথ উজান, দশ দিন লাগবে। ফেরার সময় পাঁচ দিনে হবে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'দশ দিন! হা হতোস্মি!—আর গঙ্গা-শোণ মোহানায় পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে ?'

গরুড় বলিল—'আজ্ঞা, শোণের মোহানা এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ ; বাতাস যদি অনুকূল থাকে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছাতে পারি। দু'ঘটি দেরি হলেও ক্ষতি নেই ; আজ শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী, আকাশে চাঁদ থাকবে।'

'তাহলে আজ রাত্রে গঙ্গা-শোণ সঙ্গমেই নৌকা বাঁধবে ?'

'আজ্ঞা, তাই ইচ্ছা।'

'ভাল, যাও তুমি নিজের কাজ কর গিয়ে।'

গরুড় চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'আজ্ঞা, আড়কাঠে উঠেছিলাম, দেখলাম সামনে অনেক দূরে একটা নৌকা যাচ্ছে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'বটে ! কি রকম নৌকা ?'

গরুড় বলিল—'দূর থেকে বংগাল দেশের নৌকা মনে হল। সঙ্গে একটি ছোট ডিঙি আছে।'

'বংগাল দেশের নৌকা ! হয়তো পশ্চিমে বাণিজ্যে যাচ্ছে।'

'আজ্ঞা, হতে পারে। তবে বংগাল দেশের নৌকা পশ্চিমে বড় আসে না। পশ্চিম দেশের নৌকাই বংগাল দেশ দিয়ে সাগরে যায়।'

'আচ্ছা, তুমি যাও। আশঙ্কার কিছু নেই তো ?'

'আজ্ঞা, মনে তো হয় না। তবে যদি বংগাল দেশের নৌকা হয়, সতর্ক থাকা ভাল।'

চার

শীতের সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িলে বিগ্রহপাল নৌকার ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। অনঙ্গ বীণা লইয়া মৃদু মৃদু বাজাইতে লাগিল। মিঠা লঘু চৈতালি সুর, যেন অদূর বসন্তকে চুপি চুপি ডাকিতেছে।

ছাদের উপর আতপ্ত রৌদ্র ও শীতল বাতাসের সংমিশ্রণ বড়ই উপাদেয়। চারিদিকের দৃশ্যও চিত্তগ্রাহী। নৌকা স্রোতের ঠিক মাঝখান দিয়া যাইতেছে না ; মাঝখানে স্রোতের বেগ বেশি, তাই একটু পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে ; বাম দিকের তীর নিকটে, দক্ষিণ দিকের তীর দূরে। মাঘ মাসের কৃশাঙ্গী গঙ্গা দুই তীরে সিকতাঞ্চল বিছাইয়া দিয়াছে। নদীর বুকেও স্থানে স্থানে বালুচর জাগিয়াছে। চরের শুষ্ক বালুকার উপর অগণিত হংস লীন হইয়া রোদ পোহাইতেছে, নৌকা কাছে আসিলে গ্রীবা তুলিয়া ডাকাডাকি করিতেছে। শীতের আরম্ভে হিমালয়ের হ্রদগুলি যখন হিমাবৃত হয় তখন ইহারা দলে দলে ভারতের নদ-নদীতে নামিয়া আসে, শীতের অন্তে আবার হিমালয়ে ফিরিয়া যায়।

গঙ্গার দক্ষিণ তীর নৌকা হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। সৈকতসীমা পার হইয়া উচ্চ পাড় ; পাড়ের উপর কোথাও কর্কশ কাশ-স্তম্ব, কোথাও পীতপুষ্পিত সরিষার ক্ষেত, কোথাও তৃণশীর্ষ ছোট গ্রাম। নৌকা আগে চলিয়াছে, গ্রাম পিছাইয়া যাইতেছে ; আবার কাশের বন, আবার পীতপুষ্পিত সরিষার ক্ষেত, আবার গ্রাম। বিগ্রহ হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে দেখিতে দেখিতে চলিলেন।

ক্রমে সূর্য পাটে বসিল। আর একটি অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রাম ; গ্রাম-বধূরা নদীতে জল ভরিতে আসিয়াছে, একপাল গরু বাছুর জলের কিনারায় সারি দিয়া দাঁড়াইয়া জল পান করিতেছে। ঘাট হইতে অদূরে চক্রবাক মিথুন কাতর কলধ্বনি করিয়া পরস্পর বিদায় লইল। সন্ধ্যা নামিতেছে, আকাশের গায়ে বৈরাগ্যের গৈরিক উত্তরীয়।

অতঃপর শোণ-সঙ্গম পর্যন্ত আর গ্রাম নাই, কেবল কাশের স্তূপ। শোণের মোহানা এক স্থানে স্থির থাকে না, কখনও পশ্চিমে সরিয়া যায়, আবার কখনও পাটলিপুত্রের দিকে সরিয়া আসে। স্মরণাতীত কাল হইতে এই চলিতেছে। তাই এই অব্যবস্থিত চিত্ত নদের মুখের কাছে জনবসতি নাই।

বিগ্রহপালের নৌকা যখন গঙ্গা-শোণ সঙ্গমে পৌঁছিল তখন দিনের আলো আর নাই, চাঁদের আলো ফুটিফুটি করিতেছে। অনচ্ছ চন্দ্রকিরণে জলস্থল অবাস্তব আলো-আঁধারিতে পরিণত হইয়াছে। বাতাস মন্থর হইয়া ক্রমশ থামিয়া আসিতেছে।

গরুড় আসিয়া বলিল—'আজ এখানেই নৌকা বাঁধি। বংগাল দেশের নৌকাটা সামনেই বেঁধেছে।'

বিগ্রহপাল হিম-কুহেলির ভিতর দিয়া সম্মুখে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন, দেখিলেন চার-পাঁচ রজ্জু দূরে কিনার ঘেঁষিয়া একটি নৌকার অস্পষ্ট অবয়ব দেখা যাইতেছে। পাল নামানো, গুণবৃক্ষটি শীর্ণ তর্জনীর মত ঊর্ধ্বদিকে নির্দিষ্ট।

অনঙ্গপালও দেখিতেছিল, বলিল—'মোহানার কাছে নৌকা বেঁধেছে, ওরাও বোধহয় শোণ নদে যাবে।'

গরুড় বলিল—'আজ্ঞা, তাই মনে হয়। ওরা বেলা থাকতে থাকতে নৌকা বেঁধেছে, গঙ্গা দিয়ে যাবার হলে মোহানা পেরিয়ে নৌকা বাঁধত।'

অনঙ্গ বলিল—'তুমি এখানেই নৌকা বাঁধো, আর বেশি কাছে গিয়ে কাজ নেই।'

অতঃপর পাল নামাইয়া নৌকা তীরের আরও কাছে লইয়া গিয়া কাদায় বাঁশ পুতিয়া বাঁধা হইল। দাঁড়ী মাঝিরা সারা দিন পরে বিশ্রাম পাইল।

গরুড় রইঘরে দীপ জ্বালিয়া দিল, চারি কোণে দণ্ডের মাথায় চারিটি ঘৃতদীপ। দুই বন্ধু পাশা পাতিয়া খেলিতে বসিলেন। গরুড় নীচে রন্ধন করিতে গেল। অনঙ্গ তাহাকে বলিয়া দিল—'গরুড়, বেশি কিছু রাঁধতে হবে না, কেবল ভাত আর অলাবুর দধিপাক। মহারানী প্রচুর মাছ রেঁধে সঙ্গে দিয়েছেন, তাতেই আজ রাতটা চলে যাবে। তোমরাও পাবে।'

পাল রাজ-বংশীয়েরা বাঙ্গালী ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়াও তাঁহারা মাছ-ভাতের নেশা ছাড়িতে পারেন নাই।

যথাকালে অন্ন প্রস্তুত হইলে দুই বন্ধু আহার করিলেন। অনঙ্গপাল পানের বাটা লইয়া পান সাজিতে বসিল। এলা দারুচিনি ও কেয়া-খয়ের দেওয়া সুগন্ধি তাম্বূল; দুইজনে পান চিবাইতে চিবাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, কালপুরুষকে মধ্যে লইয়া অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আকাশে ঝলমল করিতেছে।

সহসা দূর হইতে মধুর স্ত্রীকণ্ঠের সঙ্গীত ভাসিয়া আসিল। দুই বন্ধু চকিত হইয়া চাহিলেন; সম্মুখের নৌকা হইতে স্বরলহরী আসিতেছে। বিগ্রহ কিছুক্ষণ কান পাতিয়া শুনিয়া বলিলেন—'ধন্য! কথা বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ভারি মিষ্ট গলা।'

অনঙ্গ বলিল—'দেশ-বরাড়ী রাগ, যতি তাল। সঙ্গে সুষির বাজছে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'ওদের সঙ্গে যখন স্ত্রীলোক আছে, তখন ওরা নিশ্চয় চোর ডাকাত নয়।'

অনঙ্গ মাথা নাড়িল—'বলা যায় না, হয়তো মেয়ে-গলার গান শুনিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করবার একটা ছল, ব্যাধ যেমন বাঁশি বাজিয়ে হরিণ ধরে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'তোর সব তাতেই সন্দেহ। যদি ওদের সত্যিই কোনও দুরভিসন্ধি থাকে, আমার সঙ্গে অগ্নিকন্দুক আছে।'

অনঙ্গ কিছু বলিল না। অগ্নিকন্দুক সম্বন্ধে তাহার মনে বিশেষ ভরসা ছিল না। মায়াবী যন্ত্রের সাহায্যে মায়া দেখায়, সেই যন্ত্র পাইলে প্রাকৃতব্যক্তি মায়া দেখাইতে পারে কি? যা হোক, গান বন্ধ হইলে অনঙ্গ গরুড়কে ডাকিয়া রাত্রে সতর্ক থাকিবার অনুজ্ঞা দিল, তারপর দুই বন্ধু রইঘরে গিয়া পাশাপাশি শয্যায় শয়ন করিল। দুই দণ্ড পরে গঙ্গার কুলকুল ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল।

অন্য নৌকার যাত্রীরাও দেখিয়াছিল পাটলিপুত্র হইতে একটি নৌকা দূরে দূরে তাহাদের পিছনে আসিতেছে। তাহারাও সতর্কভাবে রাত্রিযাপন করিল।

পাঁচ

লক্ষ্মীকর্ণদেবের জামাতা জাতবর্মা শ্বশুর মহাশয়ের নিকট অর্ধপথে বিদায় লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। শ্বশুরের সহিত যুদ্ধযাত্রার সাধ তাঁহার আদৌ ছিল না, নিতান্তই শ্বশুরের সাগ্রহ আহ্বানে অনিচ্ছাভরে জয়যাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। জয়যাত্রা যে এমন প্রহসনে পরিণত হইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

রাজধানী বিক্রমপুরে উপনীত হইয়া জাতবর্মা পিতৃদেবকে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। শুনিয়া মহারাজ বজ্রবর্মা খুব খানিকটা হাসিলেন ; বৈবাহিক বিপাকে পড়িলে কার না আনন্দ হয় ? তারপর বলিলেন—'যাক, প্রাণে প্রাণে ফিরে এসেছ এই যথেষ্ট। ভরসা করি বৈবাহিক মহাশয়ের শিক্ষা হয়েছে। নয়পাল নিরীহ মানুষ, তাই বেঁচে গেলেন।—বিগ্রহপালের সঙ্গে যদি যৌবনশ্রীর বিবাহ হয় তাহলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। আমাদেরও মঙ্গল। বিগ্রহপাল তোমার শ্যালীপতি হবে। শ্যালীপতিদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা কম। এখন অন্তঃপুরে যাও। বধূমাতা তোমার জন্য উৎকণ্ঠিতা আছেন।'

জাতবর্মা অন্তঃপুরে গেলেন। পত্নীর সহিত মিলন হইল। যেন কতদিনের দীর্ঘ বিচ্ছেদ, দুইজনে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন।

বীরশ্রী তাঁহার ভগিনী যৌবনশ্রী অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। দীঘল পূর্ণায়ত দেহ ; সর্বাঙ্গে পরিণত যৌবনের প্রাচুর্য ফাটিয়া পড়িতেছে। মুখখানি হয়তো যৌবনশ্রীর মত অত সুন্দর নয়, তবু রসে রহস্যে চটুলতায় এমনই প্রাণবন্ত যে নিছক সৌন্দর্যের ন্যূনতা সহসা অনুভব হয় না। দুই ভগিনীর প্রকৃতিও সম্পূর্ণ বিপরীত ; একজন যেমন শান্ত গম্ভীর, অন্যজন তেমনি হাস্যকৌতুকময়ী। তিন বৎসর হইল বীরশ্রীর বিবাহ হইয়াছে, এখনও সন্তানাদি হয় নাই ; স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে মগ্ন হইয়া আছেন।

তৎকালে ভারতে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, বিশেষত রাজাদের মধ্যে। তাই বলিয়া সকলেই বহু বিবাহ করিতেন না। এক পত্নীতে যাঁহারা সুখী হইতেন তাঁহারা একনিষ্ঠ থাকিতেন। জাতবর্মাও একনিষ্ঠ ছিলেন।

জাতবর্মা ও বীরশ্রী দুই মাস আনন্দে কাটাইয়া দিলেন। তারপর ত্রিপুরী হইতে পত্র লইয়া দূত আসিল। যৌবনশ্রীর স্বয়ংবরে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ কন্যা-জামাতাকে আহ্বান করিয়াছেন।

জাতবর্মা প্রথমটা ইতস্তত করিয়াছিলেন, শ্বশুর মহাশয়ের ব্যাপারে আবার জড়াইয়া পড়িবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু বীরশ্রী স্বামীকে শয্যায় পাড়িয়া ফেলিয়া দুই মৃণালভুজে তাঁহার কণ্ঠাশ্লেষ করিয়া ধরিলেন, বলিলেন—'যৌবনার স্বয়ংবরে যদি আমায় না নিয়ে যাও, জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইব না।'

এরূপ অবস্থায় কোনও স্বামীই অধিকক্ষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে না, জাতবর্মা তবু বলিলেন—'কিন্তু বীরা, ভেবে দেখ, যৌবনশ্রী যদি স্বয়ংবর সভায় আমার গলায় মালা দেয় তখন যে বড় বিপদ হবে।'

বীরশ্রী মুখ টিপিয়া হাসিলেন—'বেশ তো, ভালই হবে। দুই বোনে কেমন একসঙ্গে থাকব।'

জাতবর্মা বলিলেন—'তোমাদের দুই বোনের না হয় ভালই হবে। কিন্তু আমি ? একটি বোনকেই সামলাতে পারি না—'

বীরশ্রী স্বামীর মুখের উপর মুখ রাখিয়া চুপিচুপি বলিলেন—'ভয় নেই, তোমাকে আমি

স্বয়ংবর সভায় যেতে দেব না, ঘরে বন্ধ করে রাখব।'

সুতরাং রাজী হইতে হইল। মহারাজ বজ্রবর্মাও আপত্তি করিলেন না। যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন হইল। বাংলা দেশ হইতে ত্রিপুরী যাইতে হইলে জলপথই প্রশস্ত। স্থলপথে যাইলে অনেক লোকজন সঙ্গে লইতে হয়, জলপথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। জাতবর্মা নৌকা সাজাইয়া বীরশ্রীকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বড় নৌকা ; চৌদ্দজন নাবিক, দুইজন ভীমকায় দেহরক্ষী সঙ্গে আছে। উপরন্তু খাদ্যাদি অতিরিক্ত বস্তু বহনের জন্য একটি ছোট ডিঙা।

নৌকা প্রথমে উত্তরমুখে চলিল, তারপর কজঙ্গলের গিরিসংকট পার হইয়া পশ্চিমমুখী হইল। এখান হইতে মগধের সীমান্ত আরম্ভ। এতদিন গুণবৃক্ষের শীর্ষে রাজকীয় কেতন উড়িতেছিল, মগধে প্রবেশ করিয়া জাতবর্মা কেতন নামাইয়া লইবার আদেশ দিলেন। পররাজ্যে আত্মপরিচয় ঘোষণার প্রয়োজন নাই। মগধে অবশ্য বন্দর নাই, নৌ-সৈন্যের দ্বারা শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা নাই। যে-কালে এখানে অসংখ্য বিশাল রণতরীর সমাবেশ সেতুবন্ধ রামেশ্বরের শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া মনে হইত সে-কাল আর নাই। তবু যথাসম্ভব প্রচ্ছন্নভাবে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যাত্রার এক পক্ষ পরে একদিন প্রত্যূষে জাতবর্মার নৌকা পাটলিপুত্র পার হইয়া গেল। আর কয়েক ক্রোশ পরে গঙ্গা-শোণ সঙ্গম ; সন্ধ্যার পূর্বেই সেখানে পৌঁছানো যাইবে। একবার শোণ নদে প্রবেশ করিতে পারিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত, সম্মুখে মাত্র সাত-আট দিনের পথ বাকি থাকিবে। এ পর্যন্ত অবশ্য নিরুপদ্রবেই আসা গিয়াছে, কিন্তু নারী লইয়া পথে যাত্রা করিলে মনে সর্বদাই চিন্তা লাগিয়া থাকে। এইজন্যই প্রবাদ আছে—পথি নারী বিবর্জিতা।

সেদিন দ্বিপ্রহরে দেখা গেল পাটলিপুত্রের ঘাট হইতে একটি নৌকা বাহির হইয়া তাঁহাদের পিছু লইয়াছে। জেলেডিঙি বা খেয়াতরী নয়, বেশ বড় নৌকা। অবশ্য ইহাতে উদ্বিগ্ন হইবার কিছু নাই, নৌকাটি সম্ভবত কাশী বা প্রয়াগ যাইতেছে। সন্ধ্যার মুখে জাতবর্মা শোণের মোহানার কাছে নৌকা বাঁধিলেন। দুই দণ্ড পরে অস্ফুট চন্দ্রালোকে গা ঢাকিয়া অন্য নৌকাটি নিশাচর পেচকের ন্যায় অদূরে আসিয়া পাল নামাইল।

জাতবর্মা মনে মনে খুবই শঙ্কিত হইলেন কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না। নাবিক ও রক্ষীরা আপনা হইতেই সতর্ক হইয়াছিল, তাহাদের কিছু বলিতে হইল না। কিয়ৎকাল চিন্তিতভাবে নৌকার পট্টপত্তনের উপর বিচরণ করিয়া জাতবর্মা মুখে প্রফুল্লতা আনিয়া রইঘরে প্রবেশ করিলেন। বীরাকে কিছু বলা হইবে না, সে ভয় পাইতে পারে।

রইঘরে দীপ জ্বলিয়াছে। বীরশ্রী আপন হাতে বেণী রচনা করিয়া দর্পণ হস্তে সীমন্তে সিন্দূর পরিতেছেন। সীমন্তে সিন্দূর পরার রীতি তিনি বিবাহের পর শিখিয়াছেন, বঙ্গ-মগধের বাহিরে দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতে সিঁথির সিন্দূর পরার রীতি নাই ; বিবাহিতা রমণীরা কণ্ঠে মঙ্গলসূত্র ও ললাটে কুঙ্কুমের টিপ পরেন। জাতবর্মা বীরশ্রীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলে বীরশ্রী মৃদু হাসিয়া স্বামীর ভ্রূমধ্যে সিন্দূরের ফোঁটা আঁকিয়া দিলেন। জাতবর্মা আপত্তি করিলেন না। তৎকালে স্ত্রী ও পুরুষের প্রসাধন অনেকটা একই প্রকার ছিল ; বিলাসী পুরুষেরা অঙ্গদ কুণ্ডল পরিতেন, লাক্ষারসে নখ ও অধর রঞ্জিত করিতেন, চোখে কাজল দিতেন। গলায় হার থাকিত, পায়ে ময়ূরপঙ্খী পাদুকা।

জাতবর্মা বাঁশি লইয়া পালঙ্কের পাশে বসিলেন এবং ধীরে ধীরে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বীরশ্রী আসিয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া পাশে বসিলেন, তারপর তাঁহার কণ্ঠ হইতে গানের মৃদু গুঞ্জরন বাহির হইল। দুইজনেই সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ। নির্জন গঙ্গার তীরে নৌকার দীপালোকিত রতিগৃহে যেন গন্ধর্বলোকের মায়া সৃষ্ট হইল।

ছয়

পরদিন প্রাতঃকালে দুই নৌকা প্রায় একই সময় কাছি খুলিয়া যাত্রা শুরু করিল। রাত্রে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নাই, তাই উভয় পক্ষই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন—অপর পক্ষ দস্যু তস্কর নয়।

বংগাল দেশের নৌকা আগে আগে শোণ নদে প্রবেশ করিল, তাহার পাঁচ রশি পিছনে বিগ্রহপালের নৌকা। এতক্ষণ তাঁহারা পশ্চিম দিকে চলিতেছিলেন, এখন দক্ষিণ-পশ্চিমে চলিলেন। এই পথে আরও তিন দিন চলিলে মগধের সীমানায় পৌঁছানো যাইবে ; তারপর হইতে চেদিরাজ্যের আরম্ভ।

সূর্যোদয় হইল। শোণের স্বর্ণাভ জল কাঁচা রৌদ্রে ঝলমল করিয়া উঠিল। দুইটি নৌকা আগে-পিছে চলিয়াছে। যাত্রীদের মন নিশ্চিন্ত হইয়াছে বটে কিন্তু দুশ্চিন্তার পরিবর্তে কৌতূহল জাগিয়াছে।—ওরা কারা ? কোথায় যাইতেছে ? ওরাও কি ত্রিপুরী যাইবে ? না যাইতেও পারে ; হয়তো পথে রোহিতাশ্বগড়ে থাকিয়া যাইবে। রোহিতাশ্বগড় শোণ নদের তীরে মগধের দক্ষিণ সীমান্তের প্রহরী।

অনঙ্গপাল নদীতে মাছ ধরার উদ্যোগ করিতেছিল। মাছ না হইলে তাহার চলে না ; সে মুগার সূতা, বঁড়শি প্রভৃতি সঙ্গে আনিয়াছিল। এখন নৌকার পিছন দিকে গিয়া বসিল, বঁড়শিতে টোপ গাঁথিয়া দূরে জলের মধ্যে ফেলিয়া সূতা ধরিয়া বসিয়া রহিল। সকালবেলার নরম রৌদ্র বড় মিঠা।

বিগ্রহপাল বন্ধুর কাছে আসিয়া বসিলেন। দুইজনে অলস জল্পনা করিতে লাগিলেন। গঙ্গার জল ধূসর, শোণের জল সোনালি কেন ? কত জাতের হাঁস চরে বসিয়া রোদ পোহাইতেছে। উহাদের ধরা যায় না ?

তারপর বিগ্রহ বলিলেন—'সামনের নৌকায় কে যাচ্ছে জানবার ভারি কৌতূহল হচ্ছে। হয়তো গৌড় কি সমতট কি প্রাগ্‌জ্যোতিষ থেকে কেউ স্বয়ংবরে যাচ্ছে।'

অনঙ্গ বলিল—'যদি তাই হয় দূরে থাকাই ভাল। তোকে চিনে ফেললেই বিপদ।'

বিগ্রহ বলিলেন—'আমাকে ওরা কি করে চিনবে ? যদি জানতে চায়, বললেই হবে আমরা বণিক, ত্রিপুরীতে বাণিজ্য করতে যাচ্ছি।'

মন খুঁত খুঁত করিলেও অনঙ্গ আর আপত্তি করিল না। বিগ্রহপাল তখন গরুড়কে ডাকিয়া বলিলেন—'নৌকা আরও জোরে চালাও। সামনের নৌকার পাশাপাশি হয়ে খবর নাও, ওরা কারা, কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে। আমাদের পরিচয় জানতে চাইলে বোলো আমরা ব্যাপারী।'

'আজ্ঞা' বলিয়া গরুড় চলিয়া গেল।

নৌকা এতক্ষণ পালের ভরে চলিতেছিল, সঙ্গে চার দাঁড় ছিল ; এখন ছয় দাঁড় লাগিল। নৌকার গতি শীঘ্র হইল। এক দণ্ডের মধ্যে দুই নৌকা পাশাপাশি হইল, মধ্যে ত্রিশ হস্তের ব্যবধান।

দুই নৌকার দুই দিশারুর মধ্যে সতর্ক বাক্যালাপ আরম্ভ হইল। গরুড় গলা বাড়াইয়া প্রশ্ন করিল—'কোথা যাও ?'

অন্য দিশারুর চেহারাও টিকটিকির মত ; নাম বোধকরি জটায়ু। সে বলিল—'তুমি কোথা যাও ?'

গরুড় বলিল—'ত্রিপুরীর ঘাট অবধি।'

জটায়ু বলিল—'আমিও ত্রিপুরীর ঘাট অবধি।'

এইখানে ভাষা সম্বন্ধে দু'টা কথা বলিয়া রাখি। তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারতে দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল ; পশ্চিমে শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং পূর্বে মাগধী অপভ্রংশ। উভয় ভাষাই সংস্কৃতের বিকার ; উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বেশি ছিল না। বাংলা দেশের মানুষ বিনা ক্লেশে শৌরসেনী ভাষা বুঝিত, পশ্চিম ও মধ্যদেশের লোকেরা মাগধী অপভ্রংশের বঙ্গীয় রূপ বুঝিতে গলদ্‌ঘর্ম হইত না। তখনও বাংলা ও অন্যান্য প্রান্তীয় ভাষাগুলি দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে নাই।

যা হোক, গরুড় বলিল—'কোন কাজে ত্রিপুরী যাও ?'

জটায়ু বলিল—'তুমি কোন কাজে যাও ?'

গরুড় বলিল—'ব্যাপার করতে যাই।'

জটায়ু বলিল—'আম্মো।'

গরুড় বলিল—'তোমার নৌকায় কয়জন যাত্রী ?'

এই সময় জাতবর্মা রইঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অপর নৌকায় বিগ্রহপাল দিশারুদ্বয়ের বাক্‌চাতুর্যে অধীর হইয়া নৌকার পিছন দিক হইতে উঠিয়া আসিলেন। দুইজনে দৃষ্টি বিনিময় হইল। কিছুক্ষণ অবাক থাকিয়া দুইজনেই উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

বিগ্রহ বলিলেন—'এ কি, যুবরাজ ভট্টারক জাতবর্মা। শ্বশুরালয়ে চলেছেন ?'

জাতবর্মা বলিলেন—'আপনি ! কুমার—'

বিগ্রহপাল সচকিতে অধরের উপর অঙ্গুলি রাখিলেন, জাতবর্মা থামিয়া গেলেন। ওদিকে অনঙ্গপাল হাসি ও কথার শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, সে গলুইয়ে মাছ-ধরা সূতা বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল, কর্ণধারকে বলিয়া আসিল—'তুমি এদিকে একটু দৃষ্টি রেখো।'

অনঙ্গ বিগ্রহপালের পাশে উপস্থিত হইলে বিগ্রহ তাহার কানে কানে জাতবর্মার পরিচয় দিলেন। অনঙ্গ এমনভাবে বিগ্রহের পানে তাকাইল যাহার অর্থ—কেমন, বলেছিলাম কিনা। তারপর সে জাতবর্মার দিকে ফিরিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিল। বিগ্রহ বলিলেন—'আমার বয়স্য অনঙ্গ।'

জাতবর্মা প্রতি-নমস্কার করিলেন। বিগ্রহ বলিলেন—'আপনি আসুন না আমার নৌকায়, ভাল করে আলাপ করা যাক।'

জাতবর্মা বলিলেন—'আপনারা আসুন না, আমি ডিঙা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বিগ্রহ বলিলেন—'আপত্তি নেই। আপনি একা যাচ্ছেন তো ?'

বিগ্রহ বলিলেন—'না, সঙ্গে শ্বশুরকন্যা আছেন।'

বিগ্রহপাল মুখের একটি সকৌতুক ভঙ্গি করিলেন, বলিলেন—'তাহলে আপনিই আসুন।'

জাতবর্মা পলকের জন্য ইতস্তত করিলেন, কিন্তু তাহা অভ্যস্ত সতর্কতার সংস্কার মাত্র। বিগ্রহপালের মনে যে ছল-চাতুরী নাই তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই অনুভব হয়। জাতবর্মা হাসিয়া বলিলেন—'ভাল, কি খাওয়াবেন বলুন। বিক্রমশীল মঠের লপ্সিকা দিলে কিন্তু যাব না।'

বিগ্রহপাল উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন—'না না, মায়ের হাতের কর্চরিকা আর ক্ষীরের লাডু আছে। যদি আপত্তি না থাকে আসুন।'

জাতবর্মা বলিলেন—'মায়ের হাতের কুচুরি ! ক্ষীরের লাডু ! ধন্য ! আমি এখনি যাচ্ছি। আমার সঙ্গেও কিছু মিষ্টান্ন ছিল, কিন্তু সেঁ অনেক দিন শেষ হয়ে গেছে।'

জাতবর্মার নৌকার পিছনে ডিঙা বাঁধা ছিল, তাঁহার আদেশে নৌকা পাশে আসিয়া ভিড়িল। তিনি ডিঙায় চড়িয়া বিগ্রহপালের নৌকায় আসিয়া উঠিলেন। দুই নৌকা পাশাপাশি চলিতেই রহিল।

বিগ্রহপাল জাতবর্মাকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন—'প্রথম দর্শনেই আপনার সঙ্গে আলাপ

করবার লোভ হয়েছিল। কিন্তু তখন দৈব ছিল প্রতিকূল—'

জাতবর্মা বলিলেন —'আপনাদের বোধহয় বিশ্বাস আমি শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে মগধ জয় করতে এসেছিলাম। আপনারা আমাকে ভুল বুঝেছিলেন। শ্বশুর মহাশয় আমাকে মৃগয়ার ছল করে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যা হোক, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। আপনি স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন তো?'

বিগ্রহপাল অনঙ্গের দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিলেন, বলিলেন—'কতকটা তাই বটে। আসুন, ভিতরে বসা যাক।'

বিগ্রহ ও জাতবর্মা রইঘরের মধ্যে গিয়া বসিলেন। অনঙ্গপাল মান্য অতিথির জন্য পেটরা হইতে মিষ্টান্নাদি বাহির করিয়া সোনার থালায় সাজাইতে লাগিল।

জাতবর্মা বলিলেন—'কি ব্যাপার বলুন। মনে হচ্ছে কিছু গণ্ডগোল আছে।'

বিগ্রহপাল বলিলেন—'গণ্ডগোল আছে। আমি ত্রিপুরী যাচ্ছি বটে কিন্তু স্বয়ংবর সভায় নিমন্ত্রিত হইনি।'

'নিমন্ত্রিত হননি!' জাতবর্মা হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিলেন।

বিগ্রহপাল বলিলেন—'আপনি দেখছি জানেন না। আপনার শ্বশুর মহাশয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। আর্যাবর্তের ও দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল রাজাই আমন্ত্রিত হয়েছেন, কেবল মগধ বাদ পড়েছে।'

জাতবর্মার মুখ ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন—'লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। শ্বশুর মহাশয় সম্বন্ধে আমার মনে কোনও মোহ নেই, কিন্তু তিনি যে বাক্যদান করে খণ্ডন করবেন এ আমার কল্পনার অতীত।'

বিগ্রহ বলিলেন—'আপনি ক্ষত্রিয়ের মত কথা বলেছেন। এখন বলুন দেখি, আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন?'

জাতবর্মার কণ্ঠস্বর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—'আমি কি করতাম? চেদিরাজ্য আক্রমণ করতাম, বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করে আনতাম।'

বিগ্রহপাল কলকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে জাতবর্মার গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন, বাহু দিয়া পৃষ্ঠ আবেষ্টন করিয়া বলিলেন—'বন্ধু, আপনি আমার মনের কথাটি বলেছেন।'

বিগ্রহপালের মুক্তকণ্ঠ হাসি জাতবর্মার মুখেও সংক্রামিত হইল। তিনি বলিলেন—'ব্যাপার কি? আপনি কি তবে— ?'

এই সময় অনঙ্গ স্বর্ণপাত্রে জলযোগ আনিয়া জাতবর্মার সম্মুখে স্থাপন করিল। বিগ্রহ বলিলেন—'আগে একটু মিষ্টিমুখ করুন।'

জাতবর্মা আহার্যগুলিকে সস্নেহে নিরীক্ষণ করিয়া একটি কর্চরিকা তুলিয়া লইলেন, তাহাতে একটু কামড় দিয়া চক্ষু মুদিয়া চিবাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া বলিলেন—'বিগ্রহ, তুমি আমার ভাই, তোমার মা আমার মা। ত্রিপুরী থেকে ফেরবার পথে আমি পাটলিপুত্রে নামব, মায়ের হাতের রান্না পেটভরে খেয়ে তবে দেশে ফিরব। তুমি যদি আপত্তি কর তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যাবে।'

বিগ্রহ গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন—'আজ থেকে তুমি আমার জ্যেষ্ঠ, আমি তোমার কনিষ্ঠ, আমার মা তোমার মা। কিন্তু মনে থাকে যেন তোমার মায়ের ভাগও আমাকে দিতে হবে।'

জাতবর্মা নিশ্বাস ফেলিলেন—'আমার মা নেই, জীবনে মায়ের আদর পাইনি। তাই তো তোমার মায়ের ওপর লোভ।'

পরিপূর্ণ হৃদয়ে দুইজন কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। প্রথম দর্শনে তাঁহারা পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা যেন এখন সুদৃঢ় বন্ধনে পরিণত হইল। নবীন যৌবনে হৃদয় যখন কোমল থাকে তখন এমনি করিয়াই প্রণয় হয়।

অনঙ্গপাল এতক্ষণ ঘরের মধ্যেই ছিল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া নিজেকে একটু পিছনে রাখিয়াছিল ; বিগ্রহ প্রাণ-খোলা মানুষ, সে হয়তো জাতবর্মার কাছে গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিবে, এ-আশঙ্কা তাহার মনে ছিল। কিন্তু জাতবর্মার মনের পরিচয় পাইয়া তাহার শঙ্কা দূর হইল। জাতবর্মা এমন মানুষ যে তাঁহার কাছে মনের গুহ্যতম কথা বলিয়াও পশ্চাত্তাপের ভয় নাই।

অনঙ্গ এখন জাতবর্মার কাছে আসিয়া বসিল, বলিল—'যুবরাজ, আপনি কিছুই খাচ্ছেন না। মা'র কাছে এত কম খেলে বকুনি খেতে হবে।'

'সেটাও তো খাওয়া। মা'র কাছে বকুনি খাওয়ার সৌভাগ্য কয়জনের হয় ?' জাতবর্মা আবার জলযোগে প্রবৃত্ত হইলেন, 'যাক, বিগ্রহ, এখন বল দেখি তুমি একা একা ত্রিপুরী যাচ্ছ কেন ? যদি আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য, সৈন্য সঙ্গে নেই কেন ? সৈন্য কি স্থলপথে যাচ্ছে ?'

বিগ্রহ মাথা নাড়িলেন—'না। পিতৃদেব সামান্য কারণে যুদ্ধ করার বিরোধী। আমি তাঁকে না জানিয়ে চুপি চুপি ত্রিপুরী যাচ্ছি।'

'কিন্তু কেন ? কোনও ফন্দি আছে নিশ্চয়।'

'ফন্দি আছে একটা। কিন্তু তোমাকে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে।'

'কি, বড় ভায়ের কাছে সঙ্কোচ ! শীঘ্র বল কি ফন্দি এঁটেছ।'

'তুমি কাউকে বলবে না ?'

'কাকে বলব ? শ্বশুর মহাশয়কে ? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ও বুড়ার ওপর আমার তিলমাত্র শ্রদ্ধা নেই। তাঁকে ঘুণাক্ষরে কিছু বলব না।' জাতবর্মা এই বলিয়া একটু থামিলেন, তারপর বলিলেন—'কিন্তু একটা কথা আছে।'

'কি কথা ?'

'তোমার ভ্রাতৃবধূর কথা, যিনি আমার সঙ্গে আছেন। তিনি যদি সন্দেহ করেন আমি তাঁর কাছে কথা গোপন করছি তাহলে যেন-তেন প্রকারেণ কথাটি বার করে নেবেন। তাঁকে প্রতিরোধ করতে পারি এত শক্তি আমার নেই।'

বিগ্রহপাল হাসিলেন—'বধূরানীর কাছে গোপন করতে না পার, তাঁকে বোলো। তিনি নিশ্চয় অন্য কাউকে বলবেন না ?'

জাতবর্মা গম্ভীর মুখে বলিলেন—'বীরশ্রীর ইচ্ছা না থাকলে তার পেট থেকে কথা বার করতে পারে এমন মানুষ আজও জন্মায়নি।'

বিগ্রহ বলিলেন—'তা হলেই হল। বেশি জানাজানি হলে সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে।'

'জানাজানি হবে না। তুমি বল।'

বিগ্রহ তখন বলিলেন—'ফন্দি আর কিছু নয়, যৌবনশ্রীকে চুরি করে আনব।'

জাতবর্মা কিয়ৎকাল বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন—'চুরি করে আনবে !'

'হাঁ। তোমার আপত্তি নেই তো ?'

'আপত্তি ! চুরি করা আর হরণ করা একই কথা। ক্ষত্রিয় যদি কন্যা হরণ করে বিবাহ করে তাতে অন্যায় হয় না। বিশেষত বর্তমান ক্ষেত্রে যৌবনশ্রীকে চুরি করবার সম্পূর্ণ অধিকার তোমার আছে।—কিন্তু চুরি করবে কি করে ? রাজপুরী থেকে রাজকন্যাকে চুরি করা তো সহজ কাজ নয়।'

'উপায় এখনও কিছু স্থির হয়নি। ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে। তোমার তাহলে অমত নেই ?'

'না, অমত নেই। যৌবনশ্রী যদি আমার শ্যালিকা না হয়ে ভগিনী হত তবু অমত হত না। এবং আমার বিশ্বাস বীরা যদি জানতে পারে তারও অমত হবে না। সে—বাঙালী স্বামী তার খুব পছন্দ।' বলিয়া জাতবর্মা বিগ্রহপালের পানে অপাঙ্গে হাসিলেন।

অন্য দুইজনও ঘাড় ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। জাতবর্মা জলযোগ সমাপ্ত করিয়া তাম্বূল মুখে দিতে দিতে পরিতৃপ্ত স্বরে বলিলেন—'ধন্য।'

এই সময় নৌকার পিছন দিক হইতে কর্ণধারের উচ্চ কণ্ঠস্বর আসিল—'ভট্টা, মাছ টোপ গিলেছে। শীঘ্র আসুন।'

অনঙ্গ এক লাফে বাহিরে গেল। বিগ্রহপাল ও জাতবর্মা তাহার পিছনে গেলেন। গলুইয়ে বাঁধা সূতায় টান পড়িয়াছে, জলের তলায় বঁড়শিবিদ্ধ মাছ মুক্তির জন্য প্রাণপণ ছুটাছুটি করিতেছে। অনঙ্গ দ্রুত সূতা নিজের হাতে লইল, তারপর সূতায় অদৃশ্য মাছের প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া হাসিমুখে বলিল—'বড় মাছ।'

এক দণ্ড খেলাইয়া অনঙ্গ মৎস্যটিকে নৌকায় তুলিল। সিন্দূরবর্ণ প্রকাণ্ড একটি রোহিত মৎস্য। সকলের মুখের হাসি আকর্ণ প্রসারিত হইল।

বিগ্রহ মুগ্ধ চক্ষে মৎস্যটি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'অনঙ্গ, এ মাছ আমাদের জন্য নয়, বধূরানী এ মাছ খাবেন। এখনি তেল-সিঁদুর দিয়ে মাছ ও নৌকায় পাঠিয়ে দাও।'

অনঙ্গ বলিল—'সাধু! এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

জাতবর্মা দুই একবার না না করিলেন, তারপর বলিলেন—'বেশ, কিন্তু একটি শর্ত। এ বেলা আর সময় নেই, কিন্তু রাত্রে তোমরা দু'জন আমার নৌকায় আহার করবে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'ভাল। কিন্তু বধূরানী যদি নিজের হাতে রাঁধেন তবেই খাব।'

জাতবর্মা বলিলেন—'ওকে দিয়েই রাঁধাব। বিয়ের পর ও মাছ রাঁধতে শিখেছে। পিতৃদেবের আজ্ঞা, বধূরা প্রত্যহ স্বামী শ্বশুরের জন্য অন্তত একটি ব্যঞ্জন রাঁধবে।'

রাজমহিষী রাজবধূ নিজ হস্তে রন্ধন করেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। সেকালে রাজকুলের কন্যাদের চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষা করিতে হইত। বিপুল রাজসংসার পরিচালনের ভার তাঁহাদের হাতেই থাকিত। কেবল পালঙ্কে শুইয়া দাসীদের পদসেবা গ্রহণ করিলে তাঁহাদের নিন্দা হইত। কালিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—বামা কুলস্যাধয়ঃ। বস্তুত রাজারানী ও রাজবংশীয়গণ প্রাকৃতজনের সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করুন নিজেদের মধ্যে সহজ সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করিতেন।

অতঃপর বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া জাতবর্মা মৎস্য লইয়া নিজ নৌকায় ফিরিয়া গেলেন।

সাত

জাতবর্মা ও বিগ্রহপাল যখন দুই নৌকায় দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে বাক্যালাপ করিতেছিলেন তখন বীরশ্রী অন্তরাল হইতে তাহা শুনিয়াছিলেন। স্বভাবতই তাঁহার মনে কৌতূহল জাগরূক হইয়াছিল। তারপর জাতবর্মা অন্য নৌকায় চলিয়া গেলেন এবং প্রকাণ্ড একটি মাছ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মাছ দেখিয়া বীরশ্রীর মন আহ্লাদে ভরিয়া উঠিল। তিনি যতদিন পিত্রালয়ে ছিলেন মাছের স্বাদ জানিতেন না। বংগাল দেশে বিবাহের পর মাছের মহিমা বুঝিয়াছেন। মাছ দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন—'কী সুন্দর পাকা রুই। আমি রাঁধব।'

জাতবর্মা বলিলেন—'ভাল, তুমিই রাঁধ। আজ ও নৌকার দু'জনকে রাত্রে খেতে বলেছি।'

বীরশ্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওরা কারা?'

জাতবর্মা অবহেলাভরে বলিলেন—'চেনা লোক।' বলিয়া স্নানের জন্য প্রস্থান করিলেন। বীরশ্রী কিছুক্ষণ চোখ বাঁকাইয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর ভৃত্য ডাকিয়া মাছটির আঁশ ছাড়াইয়া কুটিয়া রাখিবার জন্য ডিঙায় পাঠাইয়া দিলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর জাতবর্মা তাড়াতাড়ি পালঙ্কে শুইয়া পড়িলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার মৃদু মৃদু নাক ডাকিতে লাগিল। বীরশ্রী মনে মনে হাসিয়া রইঘরের ছাদে চুল শুকাইতে গেলেন। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র একটু কড়া বটে কিন্তু পালের আওতায় বসিলে গায়ে রোদ লাগে না, কেবল মধুর উত্তাপটুকু পাওয়া যায়।

নিঃঝুম মধ্যাহ্নে চারদিক তন্দ্রাচ্ছন্ন। অন্য নৌকাটা আবার পিছাইয়া পড়িয়াছে। পাটলিপুত্র হইতে ওই নৌকা তাঁহাদের পিছু লইয়াছে। উহাতে কে যাইতেছে? জাতবর্মার চেনা লোক, সুতরাং কখনই সামান্য লোক নয়—

বীরশ্রীর মনে পড়িল দুই মাস পূর্বে মৃগয়া হইতে ফিরিয়া জাতবর্মা তাঁহাকে ভাসা-ভাসা ভাবে পর্যটনের কাহিনী শুনাইয়াছিলেন, মৃগয়া যে প্রকৃতপক্ষে মৃগয়া নয়, মগধ আক্রমণের ছল তাহাও বলিয়াছিলেন। বিক্রমশীল বিহার...পিশাচের দৌরাত্ম্য...মহারাজ নয়পাল, যুবরাজ বিগ্রহপাল—সব কথা বীরশ্রী মন দিয়া শোনেন নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করেন নাই। বহুদিন পরে স্বামীকে পাইয়া অন্য সব কথা অবান্তর হইয়া গিয়াছিল, পরম প্রাপ্তির মধ্যে কৌতূহলও ডুবিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু ওই নৌকায় কাহারা যাইতেছে? জাতবর্মা উহাদের পরিচয় গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন কেন? নিশ্চয় কোনও রহস্য আছে।

চুল শুকাইলে বীরশ্রী নীচে গেলেন। জাতবর্মা শয্যায় পূর্ববৎ শুইয়া আছেন। তাঁহার শয়নের ভঙ্গি দেখিয়া সন্দেহ হয়—কপট নিদ্রা। বীরশ্রী তাঁহার পায়ের তলায় অতি কোমলভাবে অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলেন। জাতবর্মা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বীরশ্রী মধুর হাসিয়া বলিলেন—'পদসেবা করছিলাম। পতির পদসেবা করা সতীর ধর্ম।'

জাতবর্মা গলার মধ্যে একটি শব্দ করিয়া আবার শয়নের উপক্রম করিলেন। বীরশ্রী কিন্তু তাঁহাকে শুইতে দিলেন না, দুই বাহু দিয়া কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া খাড়া রাখিলেন। বলিলেন—'এবার কিন্তু কানে কাঠি দেব। মট্‌কা মেরে শুয়ে থাকলেই কি আমার হাত এড়াতে পারবে?'

জাতবর্মা যেন ঈষৎ সচেতন হইয়াছেন এমনিভাবে হাই তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—'কি হয়েছে?'

বীরশ্রী বলিলেন—'হয়নি কিছু। ওরা কারা? সত্যি কথা বল, সহধর্মিণীর কাছে মিথ্যে কথা বলতে নেই।'

জাতবর্মা অবাক হইয়া বলিলেন—'ওরা? কাদের কথা বলছ?'

'আহা, কিছুই যেন জানেন না! ওই নৌকার ওরা।'

'ও—ওদের কথা বলছ! বলেছি তো ওরা চেনা লোক।'

'চেনা লোক তা বুঝেছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে পরিচয় হল কি করে? কোথায় পরিচয় হল?'

'এঁ—বিক্রমশীল বিহারে দেখা হয়েছিল।'

'বিক্রমশীল বিহারে তো ভিক্ষুরা থাকে। এরা কি ভিক্ষু?'

'না। এরা—মানে—বণিক, শ্রেষ্ঠী। স্বয়ংবর উপলক্ষে ত্রিপুরীতে বাণিজ্য করতে যাচ্ছে।'

'নাম কী?'

'নাম? নামটা ঠিক মনে পড়ছে না—' জাতবর্মা মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

'এত চেনা-শোনা, আর নাম মনে পড়ছে না !'

'হাঁ হাঁ, বিক্রমপাল।'

বীরশ্রী বিশ্বাস করিলেন না। জাতবর্মার ভাবভঙ্গি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি সত্য গোপন করিতেছেন। বীরশ্রী তখন বৃথা তর্ক ত্যাগ করিয়া জাতবর্মাকে শয্যার উপর চিৎ করিয়া ফেলিলেন এবং নানা প্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। ঘটয় ভুজ বন্ধনম্ জনয় রদ খণ্ডনম্—কবি জয়দেব এই জাতীয় উৎপীড়নের বিশদ বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। যুগযুগ ধরিয়া প্রেমবতী যুবতীরা পতিদেবতাদের এইভাবে নির্যাতন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কেহ কিছু বলে না। জাতবর্মা বেশিক্ষণ এই নির্যাতন প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না।

'আচ্ছা—বলছি।'

'বল—শীঘ্র বল। নইলে—'

'বলছি—বলছি।'

অতঃপর শান্তি স্থাপিত হইল, দুইজনে পাশাপাশি শয়ন করিলেন ; জাতবর্মা সত্য কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মীকর্ণের মগধ-অভিযান হইতে আজ প্রাতঃকালের ঘটনা পর্যন্ত সমস্তই প্রকাশ পাইল। শুনিয়া বীরশ্রী শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বিস্ময়াহত নেত্রে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

'বাবা এই কাণ্ড করেছেন ?'

'করেছেন। এখন বল, এ প্রস্তাবে তোমার অমত আছে ?'

বীরশ্রীর মন সম্পূর্ণরূপে যৌবনশ্রীর হরণ প্রস্তাবে সায় দিয়াছিল। কিন্তু যুবতীরা কোনও কালেই এক কথায় কোনও প্রস্তাবে সম্মত হন না। বীরশ্রী স্রস্ত চুলগুলিকে জড়াইয়া কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে গূঢ় হাসিলেন। বলিলেন—'আগে মানুষটিকে দেখি।'

অনন্তর বেলা পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া বীরশ্রী কোমরে আঁচল জড়াইয়া মৎস্য রন্ধনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

নদীর মাঝখানে মকরপৃষ্ঠের মত একটি লম্বা বালুচর জাগিয়া উঠিয়াছে। সূর্যাস্ত হইলে জাতবর্মা এই চরের পাশে নৌকা ভিড়াইলেন। বিগ্রহপালের নৌকা এক রশি পিছনে পাল নামাইল। আজ রাত্রিটা এই বালুচরের পাশেই কাটানো হইবে। তীরের চেয়ে নদীর মধ্যস্থিত চর অধিক নিরাপদ। রাজহংস জাতীয় জলচর পাখিরাও রাত্রে নদীতীরে বাস করে না, এইরূপ চরে আসিয়া রাত্রিযাপন করে।

নৌকা বাঁধা হইলে বিগ্রহপাল অনঙ্গকে বলিলেন—'আয়, বালির ওপর একটু বেড়াই। মনে হচ্ছে কতদিন মাটিতে পা দিইনি।'

অনঙ্গ বলিল—'তোকে তো ও নৌকায় নেমন্তন্ন খেতে হবে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'তার এখনও দেরি আছে। রাত্রি হোক, তারপর যাব। তুইও তো যাবি।'

অনঙ্গ মাথা নাড়িয়া হাসিল—'না, আমি যাব না, তুই একা যা। আমি গেলে রসভঙ্গ হবে। বলে দিস্, আমার কান কট্‌কট্ করছে।'

বিগ্রহপাল বুঝিলেন, অনঙ্গের কথা যথার্থ। যেখানে দুই পক্ষে ঘনিষ্ঠতার আগ্রহ সেখানে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি বরবধূর মিলন-মন্দিরে ননদিনীর মত, বাধারই সৃষ্টি করে। বিগ্রহ জোর করিলেন না।

নৌকা হইতে বালুচরের কিনারা পর্যন্ত পাটাতন ফেলিয়া সেতু রচিত হইল, বিগ্রহপাল অবতরণ করিলেন। বালুর উপরিভাগ শুষ্ক, স্থানে স্থানে কাশের অঙ্কুর গজাইয়াছে। অসমতল

বালুর খাঁজে নদীর জল ধরা পড়িয়াছে ; স্বচ্ছ অগভীর জলে ছোট ছোট শফরী খেলা করিতেছে।

বিগ্রহপাল সামনের নৌকার দিকে না গিয়া পিছন দিক দিয়া দ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন। কয়েকটি ময়ূরকণ্ঠী রঙের ছোট হাঁস জলের ধারে রাত্রিবাসের উদ্যোগ করিতেছিল, তাহারা উড়িয়া গিয়া দ্বীপের অপর অংশে বসিল। একটি হ্রস্বপুচ্ছ দীর্ঘজঙ্ঘ সারস মানুষের অভ্যাগমে বিরক্ত হইয়া অন্য দ্বীপের সন্ধানে উড়িয়া গেল।

জলের ধারে ধারে পরিক্রমণ সম্পূর্ণ করিয়া বিগ্রহপাল যখন জাতবর্মার নৌকার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন চাঁদের আলো ফুটিয়াছে। জাতবর্মা নিজ নৌকা হইতে নামিয়া বালুর উপর দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন—'এস ভাই, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। অনঙ্গ কোথায় ?'

বিগ্রহ বলিলেন—'সে এল না। দাঁত কন্‌কন্ করছে।'

অনঙ্গ সম্বন্ধে আর কথা হইল না। দুইজনে নৌকায় উঠিলেন।

রইঘর বহু দ্বীপের আলোকে উজ্জ্বল। জাতবর্মা প্রবেশ করিয়া বলিলেন—'বীরা, এই নাও তোমার দেবর—আমার ভাই বিগ্রহ।'

বীরশ্রী দেখিলেন, বিগ্রহপাল ননীর পুতুল নয়, লৌহ ভীমও নয় ; কমকান্তি নবীন যুবা। মুখ হইতে কৈশোরের সৌকুমার্য সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। চরিত্রে গাম্ভীর্যের হয়তো একটু অভাব আছে, কিন্তু অসংযত লঘুতাও নাই। চোখের দৃষ্টি তীরের মত ঋজু, অধরোষ্ঠ কৌতুকের পুষ্পধনু। বীরশ্রী তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে যৌবনশ্রীকে বিগ্রহপালের পাশে দাঁড় করাইলেন। দিব্য মানাইবে।

বিগ্রহপাল দেখিলেন, বীরশ্রী যেন মূর্তিমতী লক্ষ্মী। পরিধানে রত্নদ্যুতিখচিত পট্টাম্বর, কণ্ঠে কর্ণে কটিতে মণিময় অলঙ্কার, মণিবন্ধে শশিকলার ন্যায় শঙ্খবলয়, সীমন্তে সিন্দূর, মাথায় অবগুণ্ঠন সীমন্ত পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। বিগ্রহ মনে মনে ভাবিলেন, যৌবনশ্রী যদি দিদির মত দেখিতে হন—

তিনি দ্রুত গিয়া বীরশ্রীর পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—'দেবি, আমি আপনার শরণ নিলাম।'

বীরশ্রী অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া কৌতুক-তরল কণ্ঠে বলিলেন—'বিজয়ী হও—তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হোক।'

জাতবর্মা মহানন্দে হাসিয়া উঠিলেন।

তারপর হাস্য পরিহাস পান আহার চলিল। বীরশ্রী বিগ্রহপালের সঙ্গে এমন ব্যবহার করিলেন যেন বিগ্রহ তাঁর অল্পবয়স্ক দেবর, একটু দুষ্ট অকালপক্ব দেবর। বিগ্রহপালও বীরশ্রীর জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া ছেলেমানুষ হইয়া রহিলেন। বীরশ্রী যে সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

স্বয়ংবর ও যৌবনশ্রী সম্বন্ধে কোনও কথা হইল না। বিগ্রহপাল বুঝিলেন, ও প্রসঙ্গ স্থগিত রহিল মাত্র, পরে উত্থাপিত হইবে।

অবশেষে চন্দ্র অস্ত যায় দেখিয়া বিগ্রহপাল পূর্ণ তৃপ্ত হৃদয়ে নিজ নৌকায় ফিরিয়া গেলেন।

অনঙ্গ জাগিয়া ছিল। বিগ্রহপাল শয়ন করিলে জিজ্ঞাসা করিল—'দেবী বীরশ্রীকে কেমন দেখলি ?'

বিগ্রহ গাঢ়স্বরে বলিলেন—'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। এমন মহিমময়ী নারী আর দেখিনি।'

অনঙ্গ বলিল—'বাপের মত নয় ?'

বিগ্রহ হাসিয়া উঠিলেন—'দূর ! একেবারে বিপরীত।'

'ভাল। ভরসা করা যেতে পারে, দেবী যৌবনশ্রী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত হবেন, বাপের মত হবেন না। এবার তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়।'

বিগ্রহপালের কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘুম আসিল না। তিনি অনঙ্গকে আজিকার রাত্রির সমস্ত ঘটনা, সমস্ত বাক্যালাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনাইলেন। শুনিয়া অনঙ্গ বলিল—'লক্ষণ তো ভালই ঠেকছে। ওঁরা যদি সাহায্য করেন কার্যোদ্ধার করা শক্ত হবে না। তবে যদি দেবী যৌবনশ্রী তোকে অপছন্দ করেন—'

বিগ্রহপাল অন্ধকারে হাসিলেন। ও আশঙ্কা তাঁহার ছিল না।

আট

অতঃপর সপ্তাহকাল একটি দীর্ঘ সোনালি সুখস্বপ্নের মত কাটিয়া যায়। আকাশে চন্দ্র দিনে দিনে পূর্ণ হইয়া ওঠে, শোণ নদ অলক্ষিতে শীর্ণ হইতে থাকে। দুইটি নৌকা যেন অদৃশ্য বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইয়া একসঙ্গে চলিয়াছে। যখন অনুকূল বাতাস থাকে না তখন দাঁড় চলে, কিম্বা নাবিকেরা তীরে নামিয়া গুণ টানে। তীরে দূরান্তরিত গ্রাম, গ্রামের আশেপাশে মাষকলায় ও চণকের ক্ষেত। নৌকার যাত্রীরা কখনও তীরে নামিয়া ক্ষেত হইতে কাঁচা মাষকলায় ও চণকের শিম্বী আহরণ করিয়া ভক্ষণ করেন, কখনও গ্রামে গিয়া দুগ্ধ ও নবনীত সংগ্রহ করেন, শাক ফল মূল সংগ্রহ করেন।

নৌকা চলিতে থাকে। মগধের সীমানা শেষ হইয়া যায়, পাষাণদুর্গ রোহিতাশ্বগড় পিছনে পড়িয়া থাকে, তীরভূমি উপল-বন্ধুর হইয়া ওঠে। জাতবর্মা নিজ নৌকায় রাজকীয় লাঞ্ছন উড়াইয়া দেন। বিগ্রহপালের নৌকা কেতনহীন থাকে।

বিগ্রহ প্রত্যহ অন্য নৌকায় যান। কত খেলা হয়; পাশা খেলা, গুটি খেলা, দশ-পঁচিশ খেলা। কত জল্পনা হয়। বিগ্রহ বীরশ্রীর সহিত খুনসুড়ি করেন।—বলেন—দেবি, নিশ্চয় আপনি শ্বশুরবাড়ির দেশ থেকে কৈ-ডিম্ব নিয়ে যাচ্ছেন, নইলে আপনার রান্না এমন মিষ্ট হয় কি করে ? বীরশ্রী কপট ক্রোধে শাসন করেন—দাঁড়াও না, বাপের বাড়ি গিয়ে তোমাদের সব ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেব। যৌবনশ্রীর কানে এমন মন্ত্র দেব সে তোমার পানে ফিরেও চাইবে না।

পরামর্শ সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। বীরশ্রী গিয়া যৌবনশ্রীকে রাজী করাইবেন, তারপর স্বয়ংবরের পূর্বেই একদিন বিগ্রহপাল তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন করিবেন, একেবারে নৌকায় তুলিয়া পাটলিপুত্র লইয়া যাইবেন। ঘরের ইঁদুর যদি বেড়া কাটে, কে কি করিতে পারে ? লক্ষ্মীকর্ণ যখন জানিতে পারিবেন তখন আর উপায় থাকিবে না। তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করা সহজ হইবে।

যড়যন্ত্রকারীদের মনে আনন্দ আর উত্তেজনা। আহার বিহার ক্রীড়া কৌতুকে দিন কাটিয়া যায়। অনঙ্গ মাছ ধরে, গান গায়। জাতবর্মা বাঁশি বাজান। দুই দিশারুর মধ্যে ভাব হইয়াছে। জাতবর্মার দিশারুর নাম জটায়ু নয়, শুভঙ্কর। রাত্রে নৌকা বাঁধা হইলে তাহারা বালুতে নামিয়া পাশাপাশি বসে, মৃদুস্বরে জল্পনা করে—তুমি কয়বার সমুদ্রে গিয়াছ ? আমি কান্যকুব্জে গিয়াছি। সুবর্ণভূমি দেখিয়াছ ? আমি সিংহল গিয়াছি। –সিংহলের মেয়েরা বড় কুৎসিত—কিন্তু –

অবশেষে অষ্টম দিনের পূর্বাহ্ণে দূরে শোণ নদের শেষ ঘাট দেখা গেল। শোণ নদ এইখানে

পাহাড় হইতে নামিয়া অপেক্ষাকৃত সমতল ক্ষেত্রে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার আগে আর নৌকা চলে না। ঘাটটি নদীর পশ্চিম তীরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক

জাতবর্মা নৌকাযোগে আসিতেছেন এ সংবাদ পূর্বেই ত্রিপুরীতে পৌঁছিয়াছিল। রোহিতাশ্বগড়ে লক্ষ্মীকর্ণদেবের একজন গূঢ়পুরুষ ছিল; সে নৌকা যাইতে দেখিয়াছিল, নৌকার শীর্ষে কেতন চিনিয়াছিল। বেগবান অশ্বে চড়িয়া সে লক্ষ্মীকর্ণকে জানাইয়াছিল। কথাটা এমন কিছু গোপনীয় নয়। তাই রাজপুরী হইতে ক্রমশ নগরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। স্বয়ংবর উপলক্ষে প্রথম আসিলেন রাজ-জামাতা; তিনিও কি স্বয়ংবর সভায় বসিবেন না কি? নাগরিকদের মধ্যে নানাবিধ জল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য স্বয়ংবরের কথাটা এখন আর গোপন নাই; রাজপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ পুরোভূমিতে মণ্ডপ নির্মাণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

জাতবর্মার নৌকা বেলা দ্বিপ্রহরে যখন ঘাটে আসিয়া লাগিল তখন লক্ষ্মীকর্ণ ও যৌবনশ্রী ঘাটে উপস্থিত আছেন। লক্ষ্মীকর্ণ কন্যা-জামাতাকে আগ বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছেন, সঙ্গে অনেক অশ্বারোহী রক্ষী। যৌবনশ্রী দিদিকে দেখিবার জন্য উৎসুক ছিলেন, তিনিও পিতার সঙ্গে রথে আসিয়াছেন।

আর একজন লক্ষ্মীকর্ণের সঙ্গে আসিয়াছে, তাহার নাম লম্বোদর। কথিত আছে, গুপ্তচর রাজাদের কর্ণ। লম্বোদর ছিল মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের কর্ণ, সকল সময় তাঁহার কাছে থাকিত।

জাতবর্মা ও বীরশ্রী নৌকা হইতে অবতরণ করিলে লক্ষ্মীকর্ণ কন্যার মস্তক আঘ্রাণ, জামাতাকে আলিঙ্গন করিলেন। যৌবনশ্রী ঈষৎ লজ্জিতভাবে একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, বীরশ্রী ছুটিয়া তাঁহার কাছে গেলেন—'ওমা! যৌবনা, তুই এতবড় হয়েছিস!' দুই ভগিনী পরস্পর কণ্ঠলগ্ন হইলেন। তিন বৎসর পরে সাক্ষাৎ; বিবাহের পর বীরশ্রী যখন পতিগৃহে যান তখন যৌবনশ্রীর বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর।

ওদিকে শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে কথা হইতেছিল। কুশল প্রশ্নের পর নৌকা সম্বন্ধে লক্ষ্মীকর্ণের অনুসন্ধিৎসার উত্তরে জাতবর্মা বলিতেছিলেন—'...দ্বিতীয় নৌকাটি আমার নয়, পাটলিপুত্র থেকে ওরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।'

পাটলিপুত্রের নামে লক্ষ্মীকর্ণ কান খাড়া করিলেন—'পাটলিপুত্র থেকে! ওরা কারা জানো?'

জাতবর্মা তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন—'বণিক। স্বয়ংবর উপলক্ষে ত্রিপুরীতে বাণিজ্য করতে এসেছে।'

লক্ষ্মীকর্ণের সন্দেহ দূর হইল না। বিগ্রহপালের নৌকা ঘাটের অন্য প্রান্তে বাঁধা হইয়াছিল, তিনি ভ্রূকুটি করিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। এই সময় রইঘর হইতে অনঙ্গ বাহির হইয়া আসিল এবং উৎসুক নেত্রে ঘাটের জন-সমাবেশ দেখিতে লাগিল। তাহার পরিধানে মহার্ঘ বেশ, মাথায় পাগ, পায়ে ময়ূরপঙ্খী পাদুকা। বিগ্রহপাল কিন্তু বাহিরে আসিলেন না। লক্ষ্মীকর্ণ তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিলে সর্বনাশ।

লক্ষ্মীকর্ণ কিয়ৎকাল বিরাগপূর্ণ নেত্রে অনঙ্গকে নিরীক্ষণ করিয়া ঘাটের এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাইলেন। লম্বোদর অদূরে একটি নিম্ববৃক্ষ তলে দাঁড়াইয়া অচঞ্চল চক্ষে লক্ষ্মীকর্ণের পানে চাহিয়া ছিল; তাহার সহিত চোখাচোখি হইতেই লক্ষ্মীকর্ণ শিরঃসঞ্চালন করিয়া অনঙ্গকে

দেখাইলেন। লম্বোদর একবার অনঙ্গের পানে চক্ষু ফিরাইয়া সপ্রশ্ন ভ্রূ তুলিল, তারপর ঘাড় নাড়িল।

অতঃপর লক্ষ্মীকর্ণ জামাতা ও কন্যাদের লইয়া ঘাটের বাহিরে গেলেন। ঘাট-সংলগ্ন ভূমিতে ক্ষুদ্র একটি জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি চালা ঘর, একটি বিপণি, দুই চারিটি গো-শকট ; এই পথে যে-সকল যাত্রী যাতায়াত করে তাহাদের পথের প্রয়োজন মিটাইয়া ইহারা জীবন নির্বাহ করে। আজ সহসা রাজ-সমাগমে স্থানটি অনভ্যস্ত জনবাহুল্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

অশ্বারোহী রক্ষীর দল অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া এইখানে অপেক্ষা করিতেছিল ; দুইটি রথও ছিল। লক্ষ্মীকর্ণ জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রথে যাবে ? না ঘোড়ার পিঠে ?'

'ঘোড়ার পিঠে' বলিয়া জাতবর্মা এক লাফে একটি অশ্বের পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন। দীর্ঘকাল নৌকায় বাস করিয়া তাঁহার হস্তপদে কিছু জড়ত্ব আসিয়াছিল, অশ্ব চালাইলে তাহা দূর হইবে। —'আপনারা রথে যান।'

লক্ষ্মীকর্ণ একবার চোখ পাকাইলেন। জামাতা বাবাজী বয়সে নবীন হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কি মনে করেন লক্ষ্মীকর্ণ একেবারেই অথর্ব হইয়া পড়িয়াছেন ? তিনি আর একটি অশ্বের পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—'আমিও ঘোড়ার পিঠে যাব।'

কন্যাদের রথে আসিবার আদেশ দিয়া তিনি ঘোড়া চালাইলেন। অধিকাংশ রক্ষীর দল তাঁহার সঙ্গে চলিল, বাকি রথের অনুগমন করিবে বলিয়া রহিয়া গেল। যে দুইজন অশ্বারোহীর অশ্ব জাতবর্মা ও লক্ষ্মীকর্ণ লইয়াছিলেন তাহারা অন্য রথে ফিরিবে।

ঘাটের অঙ্গন প্রায় শূন্য হইয়া গেলে বীরশ্রী এবং যৌবনশ্রী হাত ধরাধরি করিয়া রথের দিকে চলিলেন। রাজরথের বৃদ্ধ সারথি বীরশ্রীকে প্রণাম করিল। বীরশ্রী আবদার করিয়া বলিলেন—'সম্পৎ, আমি রথ চালাব।'

বৃদ্ধ সম্পৎ চক্ষু মুদিয়া দন্তহীন হাসিল—'সে আমি জানি। তাই মন্দুরা থেকে সবচেয়ে সুবোধ ঘোড়া দুটোকে জুতে এনেছি। কিন্তু তুমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে রথ চালাতে ভুলে যাওনি তো ? বংগাল দেশে শুনেছি ঘোড়া নেই, কেবল হাতি।'

বীরশ্রী ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন—'আমার শ্বশুরবাড়ির নিন্দা করলে ভাল হবে না সম্পৎ। রথ চালাতে আমি মোটেই ভুলিনি। তোমার চেয়ে ভাল চালাব, দেখে নিও।'

সম্পৎ আবার চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া হাসিল—'আচ্ছা আচ্ছা। তোমরা দুই বোন আমার রথে চড়। আমি পিছনের রথে থাকব।'

দুই ভগিনী রথে চড়িতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় একটি শব্দ তাঁহাদের কানে আসিল—'বম্ শঙ্কর—বম্ বম্।'

দুইজনে চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। অদূরে বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ তলে প্রস্তরের চক্রবেদী, তাহার উপর বসিয়া আছেন এক সন্ন্যাসী। মাথায় সর্পিল জটা, মুখে গাঢ় ভস্ম প্রলেপ, কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম। মেরুযষ্টি কঠিন করিয়া তিনি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন এবং গালবাদ্য করিতেছেন—বম্ বম্ ববম্ বম্।

বীরশ্রী বলিলেন—'ওমা, সন্ন্যাসী !—আয় ভাই, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম করি।'

দুই বোন অশ্বত্থবৃক্ষের দিকে চলিলেন।

ওদিকে অনঙ্গ নৌকায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। লক্ষ্মীকর্ণ ও জাতবর্মা ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়া যাইবার পর সে বিগ্রহপালকে ডাকিল। বিগ্রহ রইঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহার পরিধানে সাধারণ বেশভূষা, রাজপুত্র বলিয়া মনে হয় না। ধরা পড়িবার আশঙ্কা আর নাই

দেখিয়া তিনি নৌকা হইতে ঘাটে নামিলেন। নির্লিপ্ত লম্বোদর যে নিম্বতলে দাঁড়াইয়া আছে তাহা কাহারও চোখে পড়িল না।

বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী ভক্তিভরে বেদীর উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন—'চিরায়ুষ্মতী হও। ভর্তার বহুমতা হও। স্বর্ণপ্রসূ হও।' তাঁহার মুখে ভস্মাচ্ছাদিত প্রসন্নতা ক্রীড়া করিতে লাগিল।

বীরশ্রী বলিলেন—'ঠাকুর, আপনি সিদ্ধপুরুষ। আমার এই বোনটির শীঘ্রই বিয়ে হবে। ওর করকোষ্ঠী একবার দেখুন না।'

যৌবনশ্রীর মুখখানি অরুণাভ হইয়া উঠিল। মনে যথেষ্ট কৌতূহল, কিন্তু সন্ন্যাসীর সম্মুখে হস্ত প্রসারিত করিতে লজ্জা করিতেছে। বীরশ্রী তখন জোর করিয়া তাঁহার বাঁ হাতখানি সাধুর সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিলেন।

সাধু যৌবনশ্রীর প্রসারিত করতলের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিলেন, তারপর সম্মুখে ঝুঁকিয়া অভিনিবেশ সহকারে দেখিলেন। তাঁহার মুখে আবার ছাই-ঢাকা হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি যৌবনশ্রীর মুখের পানে মিটিমিটি চাহিয়া বলিলেন—'রাজনন্দিনি, তোমার প্রিয়-সমাগমের আর বিলম্ব নেই। অদ্যই তুমি ভাবী পতির সাক্ষাৎ পাবে।'

যৌবনশ্রী অবাক হইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চোখ তুলিলেন। বীরশ্রী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—'অ্যাঁ—কি বললেন প্রভু— ?'

এই সময় বাধা পড়িল। সহসা পিছন হইতে একটি হাত আসিয়া যৌবনশ্রীর প্রসারিত করতলের উপর ন্যস্ত হইল, একটি মন্দ্র-মন্থর পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল—'সাধুবাবা, আমার হাতটা একবার দেখুন তো!'

চমকিয়া যৌবনশ্রী ঘাড় ফিরাইলেন। রাজকন্যার হাতের উপর হাত রাখে কোন্ ধৃষ্ট!

যে মুখখানি যৌবনশ্রী দেখিতে পাইলেন তাহাতে একটু দুষ্টামিভরা হাসি লাগিয়া আছে, আরও কত কি আছে। চোখে চোখে দৃষ্টি বিনিময় হইল। যৌবনশ্রীর দেহ একবার বিদ্যুৎপৃষ্টের মত কাঁপিয়া উঠিল, সবেগে নিশ্বাস টানিয়া তিনি একেবারে রুদ্ধশ্বাস হইয়া গেলেন; তাঁহার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি নিজের প্রসারিত হাতখানি আগন্তুকের করতল হইতে সরাইয়া লইতে ভুলিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী বিগ্রহপালের করকোষ্ঠী দেখিতেছিলেন, বলিলেন—'বৎস, তুমি রাজকুলোদ্ভব—'

'চুপ চুপ!'—বিগ্রহপাল সচকিতে চারিদিকে চাহিলেন। ভাগ্যক্রমে কাছে পিঠে কেহ নাই।

বীরশ্রী বিগ্রহপালের এই হঠকারিতায় চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভয় হইল, আর বেশিক্ষণ এখানে থাকিলে বিগ্রহ না জানি আরও কি প্রগল্‌ভতা করিয়া বসিবে। তিনি যৌবনশ্রীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইলেন। বলিলেন—'চল, যৌবনা, আমরা যাই।'

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত যৌবনশ্রী সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। বীরশ্রী রথে উঠিয়া অশ্বের বল্‌গা হাতে লইলেন। যৌবনশ্রী রথে উঠিবার আগে আপনার অবশে একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। প্রগল্‌ভ যুবক দুষ্টামিভরা মুখে তাঁহার পানেই চাহিয়া আছে। তিনি বিহ্বলভাবে রথে উঠিয়া পড়িলেন।

রথ চলিতে আরম্ভ করিল।

বীরশ্রী বলিলেন—'আশ্চর্য সন্ন্যাসী! বোধহয় তান্ত্রিক।'

যৌবনশ্রী উত্তর দিলেন না।

রথের গতি ক্রমশ দ্রুত হইল। আরও কিছুক্ষণ চলিবার পর যৌবনশ্রী প্রথম কথা বলিলেন। সম্মুখ দিকে চক্ষু রাখিয়া ঈষৎ স্খলিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—'দিদি, ও কে?'

বীরশ্রী ভগিনীর প্রতি একটি তির্যক দৃষ্টি হানিলেন ; তাঁহার অধরপ্রান্ত একটু স্ফুরিত হইল। যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই এমনিভাবে বলিলেন—'কার কথা বলছিস ? সন্ন্যাসী ঠাকুরের ?'

যৌবনশ্রী একবার দিদির পানে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি ফিরাইলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—'বল না।'

'কি বলব ?' বীরশ্রী মুখ টিপিয়া হাসি গোপন করিলেন—'ও ! যে তোর হাতে হাত রেখেছিল তার কথা বলছিস ? তা—সে কে আমি কি জানি।'

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া যৌবনশ্রী বলিলেন—'বল না।'

বীরশ্রী হাসিয়া ফেলিলেন—'বণিক। পাটলিপুত্র থেকে ব্যবসা করতে এসেছে।'

এবার যৌবনশ্রী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। বীরশ্রী রথ চালাইতে চালাইতে একবার ঘাড় ফিরাইলেন, যৌবনশ্রীর চক্ষু দুটি বাষ্পাকুল, অধর কাঁপিতেছে। বীরশ্রী অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন—'আচ্ছা আচ্ছা, বণিক নয়—রাজপুত্র। এবার হল তো ? ধন্যি মেয়ে তুই! কোথায় ভেবেছিলাম তোকে অনেক বোঝাতে পড়াতে হবে, অনেক কষ্টে রাজী করাতে হবে। তা নয়, একবার দেখেই মূর্ছা !'

যৌবনশ্রী চক্ষু দুটি কিছুক্ষণ মুদিয়া রহিলেন ; চোখের বাষ্প গলিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

একবার দেখিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলা সকলের জীবনে ঘটে না। মানুষের সহিত মানুষের প্রীতি বড়ই বিচিত্র বস্তু। কখনও দেখা যায়, দীর্ঘ পরিচয়ের পর হঠাৎ একদিন মানুষ বুঝিতে পারিল—ওই মানুষটি না থাকিলে জীবন অন্ধকার। কখনও মনের মানুষ চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবার পর বুঝিতে পারে সে কী হারাইয়াছে। আবার কখনও মেঘমালার ভিতর হইতে তড়িল্লতার মত অজ্ঞাত অপরিচিত মানুষ হৃদয়ে শেল হানিয়া দিয়া চলিয়া যায়, অন্তর্লোকে অলৌকিক ইন্দ্রজাল ঘটিয়া যায়।

যাহারা যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়ের কথা চিন্তা করে, প্রেম লইয়া মনে মনে জল্পনা করে, তাহাদের পক্ষে প্রথম প্রেমের আবির্ভাব তেমন মারাত্মক নয়। কিন্তু যাহাদের মনের কৌমার্য ভঙ্গ হয় নাই তাহাদের পক্ষে প্রথম প্রেম বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই দারুণ ; দুঃসহ জ্যোতিরুচ্ছ্বাসে চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়।

রাজকুমারী যৌবনশ্রীর তাহাই হইয়াছিল।

দুই

রাজকুমারীরা রথে চড়িয়া চলিয়া গেলেন ; অন্য রথটি এবং বাকি রক্ষীর দল তাঁহাদের পিছনে গেল। ঘাটের অঙ্গন শূন্য হইল। কেবল লম্বোদর অঙ্গনের অন্য প্রান্তে একটি ঘোড়ার রাশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া অনঙ্গ ও বিগ্রহপালের উপর নজর রাখিল।

অনঙ্গ এতক্ষণ সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে আসে নাই, একটু দূরে অপেক্ষা করিতেছিল ; এখন বিগ্রহপালের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বিগ্রহপাল তখনও বিলীয়মান রথের পানে চাহিয়া আছেন। অনঙ্গ বলিল—'কি হল তোর ? ধন্দ লেগে গেল নাকি ?'

চমক ভাঙিয়া বিগ্রহপাল হাসিলেন। বন্ধুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—'দেখলি ?'

অনঙ্গ বলিল—'দেখলাম।'

'অপরূপ সুন্দরী—না ?'

'হুঁ। কিন্তু এখন ত্রিপুরী যাবার উপায় কি ?'

এই সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর গলা খাঁকারি দিলেন। বিগ্রহপাল সন্ন্যাসীর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এখন তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া অনঙ্গকে বলিলেন—'জানিস অনঙ্গ, সাধুবাবা একেবারে ত্রিকালদর্শী পুরুষ। আমার হাত দেখে বলে দিলেন, আমি রাজকুলোদ্ভব !'

অনঙ্গ সাধুবাবাকে ভাল করিয়া পরিদর্শন করিল, তারপর নিজের হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—'বলুন তো সাধুবাবা, আমি কে ?'

সাধুবাবা অনঙ্গের হাতের দিকে দৃকপাত করিলেন না, বলিলেন—'তুমি অনঙ্গপাল।'

অনঙ্গ চমকিত হইল, আর একবার সাধুবাবাকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিল ; তাহার মুখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটিয়া উঠিল—'ও—আপনি জ্যোতিষাচার্য রন্তিদেব।'

বিগ্রহপাল সবিস্ময়ে বলিলেন—'অ্যাঁ ! আর্য যোগদেবের ভ্রাতা রন্তিদেব— ?'

সাধুবাবা ব্যগ্রস্বরে বলিলেন—'চুপ চুপ, কেউ শুনতে পাবে। —তোমাদের জন্যে কাল থেকে এখানে অপেক্ষা করছি। চারিদিকে লক্ষ্মীকর্ণের গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই ছদ্মবেশে এসেছি। কে জানতো যে লক্ষ্মীকর্ণ স্বয়ং এসে উপস্থিত হবে। —যা হোক, আমি সঙ্গে দুটো ঘোড়া এনেছি, আর একটা গো-শকট। তোমরা ঘোড়ায় চড়ে চলে যাও, আমি পরে গো-শকটে যাব। তোমাদের সঙ্গে যে তৈজসপত্র আছে তাও গো-শকটে যাবে।'

বিগ্রহপাল বলিলেন—'ধন্য। কিন্তু নগরে গিয়ে আপনার গৃহ খুঁজে পাব কোথায় ?'

রন্তিদেব বলিলেন—'নগরে গিয়ে কাক কোকিলকে জিজ্ঞাসা করলে রন্তিদেব দৈবজ্ঞের গৃহ দেখিয়ে দেবে। তবে, আমার ভৃত্য তোমাদের চেনে না। এই রুদ্রাক্ষ নাও, ভৃত্যকে দেখালে সে তোমাদের গৃহে স্থান দেবে, আদর যত্ন করবে। আমার ফিরতে সন্ধ্যা হবে।'

রুদ্রাক্ষ লইয়া বিগ্রহপাল বলিলেন—'আপনি সকল ব্যবস্থাই করেছেন দেখছি। অনঙ্গ, তুমি নৌকায় যাও, গরুড়কে বলে দাও আমাদের তৈজসপত্র যেন সাধুবাবার গো-শকটে তুলে দেয়।'

'যাই'—অনঙ্গ রন্তিদেবের দিকে ফিরিয়া বলিল—'গ্রহাচার্য মহাশয়, একটি প্রশ্ন আছে। আমরা দু'জন যে বিগ্রহপাল ও অনঙ্গপাল তা অবশ্য আর্য যোগদেবের পত্রে জানতে পেরেছেন। কিন্তু আমি যে অনঙ্গপাল আর ও যে বিগ্রহপাল তা চিনলেন কি করে ? আগে কি আমাদের দেখেছেন ?'

'না, পঞ্চদশ বৎসর আমি ত্রিপুরীতে আছি।'

'তবে ?'

রন্তিদেব হাসিলেন—'ও যদি অনঙ্গপাল হত তাহলে যৌবনশ্রীর হাতের ওপর হাত রাখত না। শুধু সাজসজ্জা দিয়ে সকলের চোখে ধূলা দেওয়া যায় না।'

উত্তর শুনিয়া অনঙ্গ পরিতুষ্ট হইল এবং হাসিতে হাসিতে নৌকার দিকে চলিয়া গেল। একজন তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিকে সঙ্কটময় কার্যে সহকারীরূপে পাওয়া কম কথা নয়। লক্ষণ সবই ভাল মনে হইতেছে।

নৌকায় গিয়া অনঙ্গ গরুড়কে তৈজসপত্র সম্বন্ধে যথাযোগ্য উপদেশ দিল, তারপর বলিল—'আমরা ত্রিপুরী চললাম, কবে ফিরব কিছু স্থির নেই। তোমরা সর্বদা নৌকায় থাকবে, সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। হয়তো এক নিমেষের মধ্যে নৌকা নিয়ে দেশে ফিরে যেতে হবে। মনে রেখো।'

গরুড় বলিল—'আজ্ঞা।'

দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। রন্তিদেবের ঘোড়া দুটি চালা ঘরে বাঁধা ছিল, দুই বন্ধু তাহাদের বাহিরে আনিয়া রন্তিদেবের নিকট বিদায় লইলেন, ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া ত্রিপুরী অভিমুখে যাত্রা

করিলেন।

লম্বোদর এতক্ষণ দূর হইতে সমস্ত দেখিতেছিল, কিন্তু কথাবার্তা কিছু শুনিতে পায় নাই। অনঙ্গ এবং বিগ্রহপাল যখন বাহির হইয়া পড়িলেন তখন সেও ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

ঘাট হইতে যে পথটি নগরের দিকে গিয়াছে তাহা ঈষৎ আঁকাবাঁকাভাবে মেখল পর্বতকে বেষ্টন করিয়া গিয়াছে। মেখল পর্বত বিন্ধ্য গিরিশ্রেণীর নিতম্বদেশ। এই পর্বত হইতে দুইটি নদ-নদী শোণ ও নর্মদা উৎপন্ন হইয়া পূর্ব ও পশ্চিমে মেখলার মতই ভারতবর্ষের কটিদেশ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে।

পথটি মেখল পর্বতকে যথাসম্ভব পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে, তবু সর্বত্র সমতল হইতে পারে নাই, ক্রমাগত উচ্চ হইতে হইতে আবার নিম্নাভিমুখে গড়াইয়া পড়িয়াছে। এই তরঙ্গায়িত নিরস্তপাদপ পথে দুই অশ্বারোহী ক্ষুরোদ্ধৃত ধূলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছেন। মধ্যাহ্নে সূর্যের তাপ কিছু প্রখর বটে কিন্তু গতিবেগের জন্য তাহা অনুভব হয় না।

পাশাপাশি অশ্ব চালাইতে চালাইতে দুইজনের মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ হইতেছিল। বিগ্রহপাল বলিলেন—'এ পর্যন্ত যাত্রা বেশ ভালই হয়েছে বলতে হবে। যাত্রার সময় খঞ্জন দেখেছিলাম সে কি মিথ্যে হয়? তুই বললি—কাদাখোঁচা। কাদাখোঁচা হলে কি যাত্রা এত ভাল হত?'

অনঙ্গ বলিল—'যাত্রা এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু ও-কথা যাক। এখানকার খঞ্জনটিকে কেমন মনে হল খুলে বল।'

বিগ্রহপালের চক্ষু রসাবিষ্ট হইয়া উঠিল, তিনি গাঢ়স্বরে বলিলেন—'ভাই, ও খঞ্জন নয়—রাজহংসী। মানস সরোবরের রাজহংস। তুইও তো দেখেছিস। বল, সত্যি কিনা!'

অনঙ্গ ঢোক গিলিয়া বলিল—'হাঁ, তা—সত্যি বৈকি। তোর চোখে যখন ভাল লেগেছে—'

বিগ্রহপাল মহা বিস্ময়ে বলিলেন—'এ কি বলছিস! তোর চোখে ভাল লাগেনি?'

অনঙ্গ বলিল—'না না, ভাল লেগেছে, খুবই সুন্দরী। তবে—'

'তবে কি?'

'ভাই একটু বেশি তন্বী। অত তন্বী হওয়া ভাল নয়। আমার বৌটা ছিল ভীষণ তন্বী, তাই টিকল না। গায়ে একটু মেদমাংস থাকলে হয়তো টিকত।' বলিয়া অনঙ্গ গভীর নিশ্বাস মোচন করিল।

বিগ্রহপাল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন—'তুই শিল্পী কিনা, তাই জগদ্দল পাথরের যক্ষিণীমূর্তি না হলে তোর মন ওঠে না। দাঁড়া, এবার, পাটলিপুত্রে ফিরে গিয়ে তোর জন্যে একটি হস্তিনী খুঁজে বার করব।'

অনঙ্গপাল বলিল—'রোগা বৌয়ের অবশ্য একটা সুবিধা আছে, দরকার হলে কাঁধে তুলে নিয়ে পালাতে পারবি।'

রঙ্গ পরিহাসে দুই ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইল। বিগ্রহ বলিলেন—'এ পথে বেশি লোক চলাচল নেই। এতদূর এলাম, একজন পথিকও চোখে পড়ল না।'

অনঙ্গ বলিল—'পথিক যারা ছিল তারা সব এগিয়ে গেছে, পিছনে কেউ নেই।' অলসভাবে পিছন দিকে ঘাড় ফিরাইয়া সে বলিয়া উঠিল—'আছে আছে। একটা লোক পিছনে আসছে।'

বিগ্রহপাল পিছন ফিরিয়া দেখিলেন। প্রায় পাঁচ-ছয় রজ্জু দূরে পথ যেখানে কুব্জ পৃষ্ঠের ন্যায় উঁচু হইয়াছে সেইখানে একজন অশ্বারোহী আসিতেছে। এতদূর হইতে মানুষটার চেহারা ভাল দেখা গেল না, পোশাক পরিচ্ছদেরও আড়ম্বর নাই। বিগ্রহ বলিলেন—'লোকটা আসুক, ওর কাছ থেকে জানা যাবে ত্রিপুরী আর কত দূর।'

লোকটা কিন্তু আসিল না। ইঁহারা ঘোড়া থামাইয়াছেন দেখিয়া সেও ঘোড়া থামাইয়া অবতরণ করিল এবং ঘোড়ার পা তুলিয়া ক্ষুর পরীক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দুইজনে আবার মন্থরগতিতে অশ্ব চালাইলেন। পিছনের পথিকও ঘোড়ায় চড়িয়া মন্থরগতিতে আসিতে লাগিল। তাহাদের মাঝখানের ব্যবধান কমিল না। দুই বন্ধু জোরে ঘোড়া চালাইলেন; কিছুক্ষণ পরে পিছু ফিরিয়া দেখিলেন পিছনের অশ্বারোহী যত দূরে ছিল তত দূরেই আছে, ব্যবধান বাড়ে নাই।

অনঙ্গ মাথা নাড়িয়া বলিল—'গতিক সুবিধার নয়। বোধহয় মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ আমাদের পিছনে একটি গুপ্তচর জুড়ে দিয়েছেন।'

'আচ্ছা দেখা যাক—' বলিয়া বিগ্রহপাল আবার ঘোড়া থামাইলেন, ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া হাত তুলিয়া লোকটিকে আহ্বান করিলেন। লোকটি যেন দেখিতেই পায় নাই, এমনিভাবে ঘোড়া হইতে নামিয়া আবার ঘোড়ার ক্ষুর পরীক্ষা করিতে লাগিল। তখন আর সন্দেহ রহিল না।

দুইজনে আবার সম্মুখ দিকে অশ্ব চালাইলেন। অনঙ্গ বলিল—'গুপ্তচরই বটে। আমরা কোথায় যাই দেখতে চায়।'

বিগ্রহ বলিলেন—'হুঁ। কিন্তু গুপ্তচর লাগিয়েছে কেন? আমি কে তা কি জানতে পেরেছে?'

অনঙ্গ বলিল—'সম্ভব নয়। নূতন লোক দেখলেই বোধহয় পিছনে গুপ্তচর লাগে।' কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—'গুপ্তচরটা আমার পিছু নিয়েছে, তোর নয়। কারণ লক্ষ্মীকর্ণ যতক্ষণ ছিলেন তুই ততক্ষণ বাইরে আসিসনি।—এক কাজ করা যাক। নগরে পৌঁছে আমরা দু'জনে দুই পথে যাব। গুপ্তচরটা তখন কী করবে? নিশ্চয় আমার পিছনে আসবে। তুই তখন নির্বিঘ্নে রন্তিদেবের বাড়িতে গিয়ে উঠিস।'

'তারপর?'

'তারপর আমরা নগরের মধ্যে হারিয়ে যাব। যদি দেখি গুপ্তচরকে এড়াতে পারলাম না, তখন নগরে কোথাও বাসা নেব। আর যদি ফাঁকি দিতে পারি রন্তিদেবের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হব। যদি আজ রাত্রির মধ্যে না যেতে পারি তুই ভাবিসনি।'

দুইজনে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া পরামর্শ স্থির করিলেন। ক্রমে ত্রিপুরী নগরী নিকটবর্তী হইতে লাগিল। পথের ধারে দুটি-একটি গৃহ, দুটি-একটি মন্দির, ক্রমশ ঘন সন্নিবিষ্ট লোকালয়।

পথটি নগরে প্রবেশ করিতে গিয়া ত্রিধা হইয়াছে; একটি পথ নগরের বুক চিরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, অন্য দুইটি দক্ষিণে ও বামে বাহু বিস্তার করিয়া নগরকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। অনঙ্গ ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিল গুপ্তচর পিছনে আছে; দুই বন্ধু দুই পথ ধরিলেন।

অনঙ্গ যে পথ ধরিয়াছিল তাহা অপেক্ষাকৃত বিরলগৃহ; এক পাশে অধিকাংশই মাঠ, অন্য পাশে দুই চারিটা গৃহ আছে। গৃহগুলি মধ্যমশ্রেণীর; পথে মানুষের যাতায়াত কম। দিবা তৃতীয় প্রহরে স্থানটি নিরাবিল এবং নিদ্রালু।

গুপ্তচর তাহারই পিছনে আসিতেছে দেখিয়া অনঙ্গ প্রীত হইল। সে জোরে ঘোড়া চালাইল। এইবার গুপ্তচর মহাশয়কে ধরিতে হইবে।

কিছুদূর ঘোড়া ছুটাইবার পর অনঙ্গ দেখিল, সম্মুখে একটি শাখা-পথ বাহির হইয়া নগরের অভ্যন্তরের দিকে গিয়াছে। সন্ধিস্থলের কোণে ঘন বাঁশ-ঝাড়ের যবনিকা। অনঙ্গ ঘোড়ার মুখ সেই দিকে ফিরাইয়া শাখা-পথে প্রবেশ করিল, তারপর ঘোড়ার বেগ সংযত করিয়া চুপি চুপি বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে গিয়া লুকাইল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। গুপ্তচরও এই দিকে

ঘোড়া ফিরাইয়াছে, অনঙ্গকে সম্মুখে দেখিতে না পাইয়া তাহার মুখ উদ্বিগ্ন—

বক্র হাসিয়া অনঙ্গ বাঁশ-ঝাড়ের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল, ঘোড়া ছুটাইয়া গুপ্তচরের পার্শ্ববর্তী হইল। গুপ্তচর তাহাকে পাশে দেখিয়া ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল, তারপর তাহার মুখে বোকাটে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

দুইটি ঘোড়া পাশাপাশি চলিয়াছে। অনঙ্গ এতক্ষণে গুপ্তচরের মূর্তি ভাল করিয়া দেখিল। মাঝারি মাংসল দেহ, তামাটে বর্ণ, বয়স অনুমান চল্লিশ ; মুখখানি গোলাকার, চক্ষু দুটি গোলাকার, ভ্রূ অর্ধ-গোলাকার ; নাকটি বোধহয় ভালুকে খাইয়া গিয়াছে। মুখে বুদ্ধির নামগন্ধ নাই। অনঙ্গের মনে একটু ধোঁকা লাগিল। সত্যই গুপ্তচর বটে তো ?

ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে আলাপ হইল। অনঙ্গ বলিল—'বাপু, তুমি কি এই নগরীর নাগরিক ?'

দন্তবিকাশ করিয়া গুপ্তচর বলিল—'আজ্ঞা— ?'

অনঙ্গ বলিল—'তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি। তুমি কি শোণের ঘাটে ছিলে ?

গুপ্তচর বলিল—'আজ্ঞা। কাজে গিয়েছিলাম। —আপনি ?'

অনঙ্গ বলিল—'আমি বণিক, পাটলিপুত্রে বাড়ি। ত্রিপুরীতে প্রথম এসেছি।'

গুপ্তচর বলিল—'বণিক—অহহ। স্বয়ংবরে অনেক রাজ-রাজড়া আসবে তাই অসংখ্য বণিকও এসেছে। তা—আপনার পণ্যবস্তু কৈ ?'

'পণ্যবস্তু নৌকায় রেখে এসেছি। আগে একটা বাসস্থান ঠিক করে পণ্যবস্তু নিয়ে আসব। তুমি ত্রিপুরীর নাগরিক ?'

'আজ্ঞা। আমি রাজকর্মচারী।'

'বটে ! কি কাজ কর ?'

'করণ।'

'নাম কি ?'

'লম্বোদর।'

'ভাল, লম্বোদর, তুমি আমাকে একটা বাসস্থানের সন্ধান দিতে পার ? একটা ঘর হলেই চলবে।'

লম্বোদর মাথা চুলকাইয়া চিন্তা করিল।

'একটা ঘর ?'

'হাঁ।'

'আমার ঘরে আসতে পারেন। আমার গৃহটি বেশ বড়। আমরা মাত্র তিনটি প্রাণী।'

অনঙ্গের মনে একটু দ্বিধা জাগিলেও সে মুখে বলিল—'বেশ বেশ। কত ভাটক লাগবে ?'

'কতদিন থাকবেন ?'

'মনে কর এক মাস।'

'আহারাদি ?'

'মনে কর তোমার গৃহেই।'

লম্বোদর বিবেচনা করিয়া বলিল—'তাহলে এক মাসের জন্য এক রূপক লাগবে।'

'এক রূপক ? বেশ, আমি সম্মত আছি।'

লম্বোদর আকর্ণ হাসিয়া বলিল—'আসুন, আমার গৃহ বেশি দূর নয়। রেবার তীরে।'

লম্বোদর ডান দিকে মোড় ঘুরিল, অনঙ্গ মোড় ঘুরিল। দুইজন নীরবে চলিল। লম্বোদর একসময় ঘাড় বাঁকাইয়া অনঙ্গের অশ্বটিকে দেখিল, নিতান্ত ভাল মানুষের মত বলিল—'সুন্দর ঘোড়া ! কোথায় পেলেন ?'

অনঙ্গ চট্ করিয়া গল্প তৈয়ার করিয়া বলিল—'আমার নৌকায় একটি লোক এসেছে, সে ত্রিপুরীতে অশ্বের ব্যবসা করে। ঘাটে তার জন্যে দুটি ঘোড়া উপস্থিত ছিল, সে একটি ঘোড়া আমাকে ধার দিয়েছে।'

আর কোনও প্রশ্নোত্তর হইল না। অনঙ্গ মনে মনে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল ; লোকটার চেহারা এবং কথাবার্তা হইতে ঘোর নির্বোধ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু নির্বোধ না হইতেও পারে। সাবধান থাকা ভাল। যে গুপ্তচরকে গুপ্তচর বলিয়া চেনা যায় না সেই গুপ্তচর ভয়ানক। আজ রাত্রিটা ওর ঘরেই কাটানো যাক, তারপর কাল দেখা যাইবে। বিগ্রহ নিরাপদে যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে ইহাই যথেষ্ট।

লম্বোদর মনে মনে ভাবিল—লোকটাকে বণিক বলিয়াই মনে হইতেছে। যা হোক, এ মন্দ হইল না। আমার গৃহে থাকিবে, আমি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে পারিব।

অল্পক্ষণ পরে তাহারা লম্বোদরের গৃহে পৌঁছিল। নগরের উপান্তে নর্মদার তীরে লম্বোদরের গৃহ, আশেপাশে জনবসতি নাই। নদীর তীর ধরিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিলে অর্ধ-ক্রোশ দূরে রাজপ্রাসাদ দেখা যায়।

তিন

রাজপুরীতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল।

জামাতাকে লইয়া মহারাজ আসিলেন, তারপর আসিলেন রাজকন্যারা। রাজভবনের দাসী কিঙ্করীরা পুরদ্বারে দাঁড়াইয়া উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা শঙ্খ বাজাইল, হুলুধ্বনি করিল, পূর্ণ ঘট হইতে পথের উপর জল ঢালিয়া দিল। বীরশ্রীর মধুর-সরস চরিত্রের জন্য সবাই তাঁহাকে ভালবাসে ; সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। তিন বৎসর পরে দেখা, কিন্তু বীরশ্রী কাহারও নাম ভোলেন নাই। জনে জনে প্রিয়সম্ভাষণ করিলেন, কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, রঙ্গ পরিহাস করিলেন। বান্ধুলির আঁচল ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ লা বান্ধুলি, তুইও তো বেশ ডাগর হয়ে উঠেছিস, তা তোর স্বয়ংবরটাও এই সঙ্গে হয়ে যাক না।'

দ্বিতলে উঠিয়া বীরশ্রী যৌবনশ্রীকে বলিলেন—'চল ভাই, আগে ঠাকুরানীকে প্রণাম করি গিয়ে। কেমন আছেন তিনি ?'

'আছেন।' বলিয়া যৌবনশ্রী দিদিকে ঠাকুরানীর কোষ্ঠের দিকে লইয়া চলিলেন।

ঠাকুরানী—মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের জননী অম্বিকা দেবী। অতিশয় প্রবল-পরাক্রান্তা মহিলা ; লক্ষ্মীকর্ণের পিতা মহারাজ গাঙ্গেয়দেবও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। লক্ষ্মীকর্ণ রাজা হইবার পর কিছুকাল অম্বিকা দেবী তাঁহার জীবনে কণ্টকস্বরূপ হইয়া ছিলেন, স্বাধীনভাবে একটি কাজও করিবার অধিকার লক্ষ্মীকর্ণের ছিল না। প্রজারা অম্বিকা দেবীকে ভক্তি করিত, চণ্ডী হইলেও তিনি প্রজাবৎসলা ছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন লক্ষ্মীকর্ণের কপাল খুলিল, অম্বিকা দেবী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। লক্ষ্মীকর্ণ নিষ্কণ্টক হইলেন বটে, কিন্তু অম্বিকা দেবীর স্বভাব পরিবর্তিত হইল না ; তিনি সময়ে অসময়ে পুত্রকে রোগ-শয্যার পাশে ডাকিয়া পাঠাইয়া তর্জন ও ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীকর্ণ মাতার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন। অম্বিকা শুইয়া শুইয়া যথাসম্ভব পুত্রের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অম্বিকা ক্রোধন-স্বভাব হইলেও অতিশয় কূটবুদ্ধি ছিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ দূরে থাকিয়া তাঁহাকে ভয় করিতেন।

দ্বিতলের এক পাশে নিভৃত অংশে অম্বিকা দেবীর বাসস্থান। তাঁহার পরিচর্যার জন্য দুইজন উপস্থায়িকা অহর্নিশি উপস্থিত থাকে। যৌবনশ্রী প্রাতে ও রাতে একবার করিয়া ঠাকুরানীকে দেখিয়া যান। বীরশ্রী যে আজ শ্বশুরালয় হইতে ফিরিবেন এ সংবাদ ঠাকুরানী পাইয়াছিলেন ; তাই শয্যায় শয়ান থাকিয়াও তাঁহার চক্ষু দ্বারের উপর নিবদ্ধ ছিল। দুই নাতিনীর মধ্যে প্রথমাকেই তিনি অধিক ভালবাসিতেন।

বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী কক্ষে প্রবেশ করিলে অম্বিকা উপবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার বামাঙ্গ পঙ্গু, নিজের চেষ্টায় উপবিষ্ট হওয়া সহজ নয়। তিনি উপস্থায়িকাদের আদেশ করিলেন—'আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দে।'—রোগের প্রকোপে তাঁহার জিহ্বা স্খলিতবাক্ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আদেশ দিবার ভঙ্গিতে তিলমাত্র জড়তা নাই।

উপস্থায়িকারা তাঁহার পৃষ্ঠে উপাধান দিয়া বসাইয়া দিল। তিনি দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া বীরশ্রীকে ডাকিলেন—'আয়।'

বীরশ্রী প্রথমে পিতামহীর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, তারপর বাষ্পাকুল চক্ষে শয্যার পাশে বসিতেই অম্বিকা তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া লইলেন। তাঁহার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

অম্বিকার বয়স এখন প্রায় সত্তর। দেহ স্থূল, শিথিলচর্ম, মুখে রোগজীর্ণ লোলতা, চক্ষু দুটি বড় বড় এবং ধীরসঞ্চারী : মাথার পলিত কেশ বিরল হইয়া গিয়াছে। তবু সব মিলাইয়া এমন একটি অনমিত দুর্দমতা আছে যে শয্যাগত অবস্থাতেও দর্শকের মনে সম্ভ্রম উৎপাদন করে।

কিছুক্ষণ নাতিনীকে বক্ষলগ্ন করিয়া রাখিয়া অম্বিকা তাঁহাকে তুলিয়া গভীর প্রশ্নসমাকুল চক্ষে তাঁহার মুখ দেখিলেন। তারপর কড়া সুরে বলিলেন—'তোর বাঙালী তোকে এখনও ভালবাসে ?'

বীরশ্রীর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি খেলিয়া গেল।

অম্বিকা বলিলেন—'অন্য বিয়ে করেনি ?'

বীরশ্রী দশন রেখা ঈষৎ ব্যক্ত করিয়া মাথা নাড়িলেন—'না দিদি।'

অম্বিকা তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিলেন—'ভাল। কিন্তু পুরুষকে বিশ্বাস নেই। সব সময় কড়া নজর রাখবি।'

বীরশ্রী বলিলেন—'রাখব দিদি। তুমি কেমন আছ ?'

অম্বিকা বলিলেন—'আমার আবার থাকা—বেঁচে আছি। তোদের বাপ—' অম্বিকার চক্ষু ধীরে ধীরে যৌবনশ্রীর দিকে ফিরিল—'তোর স্বয়ংবর করছে। কেন স্বয়ংবর করতে চায় জানি না, নিশ্চয় কোনও দুরভিপ্রায় আছে। স্বয়ংবর হলেই রাজায় রাজায় মন কষাকষি, ঝগড়া, যুদ্ধ। তোদের বাপ বোধহয় তাই চায়। —যৌবনা, কাছে আয়।'

যৌবনশ্রী এতক্ষণ পালঙ্কের পদমূলে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এখন পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অম্বিকা আরও কিছুক্ষণ তাঁহাকে স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'তোর কি ইচ্ছা ? স্বয়ংবরা হতে চাস ?'

যৌবনশ্রী উত্তর দিলেন না, আনত আতপ্ত মুখে নীরব রহিলেন। বীরশ্রী মৃদুস্বরে বলিলেন—'তাতে দোষ কি দিদি ? স্বয়ংবর প্রথা আমাদের বংশে আছে। যৌবনার স্বয়ংবর হলে ও নিজের মনের মত্ বর পছন্দ করে নিতে পারবে। জোর করে বুড়ো রাজার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে সে কি ভাল নয় ?'

অম্বিকা বীরশ্রীর পানে তির্যক চক্ষে চাহিলেন—'তোর কি বুড়ো রাজার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ?'

বীরশ্রী হাসিয়া ফেলিলেন—'আমার কথা ছেড়ে দাও—'

অম্বিকা বলিলেন—'আমি যতদিন আছি সে ভয় নেই। তোর বাপের মনে যত কুবুদ্ধিই

থাকুক, আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব পণ্ড করে দিতে পারি।'

বীরশ্রী বলিলেন—'কিন্তু দিদি, যৌবনার স্বয়ংবরে কি তোমার মত নেই?'

অম্বিকা বলিলেন—'তোরা ছেলেমানুষ। কিছু বুঝিস না। আজকাল স্বয়ংবর আর সে স্বয়ংবর নেই। মেয়ের বাপ আগে থাকতে ঠিক করে রাখে কার গলায় মেয়ে মালা দেবে। সব রাজনৈতিক কূট-কচাল। —যৌবনা, তোর বাপ তোকে কিছু বলেছে?'

যৌবনশ্রী সঙ্কুচিতভাবে মাথা নাড়িলেন—'না।'

'বলবে। তোর পিসীর যখন স্বয়ংবর হয় তখন ওরা বাপ-বেটায় ওই মতলব করেছিল, বুড়ো রাজেন্দ্র চোলকে স্বয়ংবরে ডেকেছিল। আমি জানতে পেরে সব ভণ্ডুল করে দিলাম।' পুরাতন কথার স্মরণে বৃদ্ধার মুখের দক্ষিণভাগে একটি বাঁকা হাসির খাঁজ পড়িল। বীরশ্রী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। যৌবনশ্রীর মুখেও চাপা কৌতুকের ঝিলিক খেলিয়া গেল।

অম্বিকা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'হাসির কথা নয়। যৌবনা, স্পষ্ট করে বল, স্বয়ংবরা হতে চাস? যদি কারুর ওপর তোর মন পড়ে থাকে, আর সে যদি রাজা বা রাজপুত্র না হয়—আমার কাছে লুকোসনি।'

যৌবনশ্রীর মুখ সিন্দূরবর্ণ হইয়া উঠিল। বীরশ্রী সচকিতে কক্ষের চারিদিকে চাহিলেন। উপস্থায়িকা দুইজন দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে এবং নিশ্চয় কান খাড়া করিয়া সব কথা শুনিতেছে। বীরশ্রী ঠাকুরানীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি বলিলেন—'দিদি, এখন এ সব কথা থাক, পরে তোমাকে বলব। অনেক কথা বলবার আছে।'

বৃদ্ধা তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দুই নাতিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া অল্প ঘাড় নাড়িলেন। বলিলেন—'তোরা এখন যা, খাওয়া-দাওয়া কর গিয়ে।'

অতঃপর নাতিনীরা প্রস্থান করিলে পক্ষাঘাতপঙ্গু বৃদ্ধা পুত্রের যজ্ঞপণ্ড করিবার চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

লক্ষ্মীকর্ণ তখন জামাতাকে পাশে লইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিয়াছিলেন। সোনার পাত্রে ছত্রিশ ব্যঞ্জন সেবন করিতে করিতে দুইজন মাঝে মাঝে কথা হইতেছিল।

জাতবর্মা বলিলেন—'স্বয়ংবরের আয়োজন সব প্রস্তুত?'

লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন—'এখনও এক মাস সময় আছে। আজ পূর্ণিমা, আগামী পূর্ণিমায় স্বয়ংবর। ততদিনে সব আয়োজন সম্পূর্ণ হবে।'

'কোন্ কোন্ রাজা আসছেন?'

'দ্বাদশ জন রাজা ও রাজপুত্র আসছেন এ পর্যন্ত সংবাদ পেয়েছি। তন্মধ্যে ভোজরাজ, কলিঙ্গের দুই রাজপুত্র, উৎকলরাজ, মৎস্যরাজ, অন্ধ্ররাজ, কর্ণাটরাজ বিক্রম আছেন।'

জাতবর্মা নিরীহভাবে প্রশ্ন করিলেন—'মগধের বিগ্রহপাল আসছে তো?'

'মগধের বিগ্রহপাল—' এক গ্রাস অন্ন মুখে পুরিয়া লক্ষ্মীকর্ণ দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

জাতবর্মা ঈষৎ বিস্ময়ে শ্বশুরের পানে চাহিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ তখন অন্ন-পিণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—'হা—হা—রহস্য আছে। পরে জানতে পারবে।'

জাতবর্মা আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না। বুড়া ভারি ধূর্ত, বেশি কৌতূহল প্রকাশ করিলে হয়তো সন্দেহ করিবে।

চার

নগরের মধ্যস্থলে চতঃশৃঙ্গের উপর জ্যোতিষাচার্য রন্তিদেবের চতুঃশাল গৃহ। গৃহ ঘিরিয়া ফলফুলের উদ্যান। রন্তিদেব সমৃদ্ধ ব্যক্তি ; প্রধানত ধনী শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় তাঁহার যজমান। শ্রেষ্ঠীরা দূর দেশে বাণিজ্য যাত্রার পূর্বে তাঁহার কাছে ভাগ্য-গণনা করাইতে আসে, প্রয়োজন হইলে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করায়, স্বর্ণমুষ্টি প্রণামী দিয়া যায়। বহিরাগত শ্রেষ্ঠীরাও রন্তিদেবের নাম জানে, তাহারা ত্রিপুরীতে আসিয়া দৈব বিষয়ে রন্তিদেবের শরণ লয়, কেহ কেহ তাঁহার গৃহেই অবস্থান করে। রন্তিদেবের ভবনে অতিথি সৎকারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে।

রন্তিদেবের গৃহ খুঁজিয়া বাহির করিতে বিগ্রহপালের কোনই কষ্ট হইল না। নগরের কেন্দ্রভূমিতে বহু অট্টালিকা, পথে বহু নাগরিকের যাতায়াত। বিগ্রহ একজন নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিতেই সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল—

'ওই যে তোরণের উপর সাত ঘোড়ার রথ আঁকা রয়েছে, ওই বাড়ি।'

সপ্তাশ্ব রথ, অর্থাৎ সূর্য রথ, সুতরাং গ্রহাচার্যের গৃহই বটে। বিগ্রহপাল তোরণ পথে অশ্ব চালাইলেন।

গৃহদ্বারের সম্মুখে গৃহের প্রধান ভৃত্য, একজন মালী এবং অশ্বশালার ঘোড়াডোমের সঙ্গে দাঁড়াইয়া গালগল্প করিতেছিল। অশ্বারোহীকে দেখিয়া ভৃত্য অগ্রসর হইয়া আসিল। বিগ্রহপাল তাহার হাতে রুদ্রাক্ষ দিলেন।

ভৃত্যটি চালাক চতুর, ঘোড়া দেখিয়াই চিনিয়াছিল। সে মহা সমাদর করিয়া বিগ্রহপালকে লইয়া গিয়া ভবনের দ্বিতলে একটি সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত করিল। ঘোড়াটিকে ঘোড়াডোম গৃহের পশ্চাদ্দেশে অশ্বকুঠীতে লইয়া গেল।

বিগ্রহপাল হস্তমুখ প্রক্ষালন ও বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিয়া কিঞ্চিৎ ফলমূল ও মিষ্টান্ন জলযোগ করিলেন, তারপর খট্টাঙ্গে দুগ্ধফেন শয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া অব্যবহিত অতীতকালের কথা মনে মনে পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। নানা চিন্তার মধ্যে যৌবনশ্রীর বিদ্যুল্লতার মত রূপ থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনে চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

রন্তিদেব ফিরিলেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে। ভস্মজটাদি ছদ্মবেশ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত আকৃতি : ক্ষৌরিত মস্তকে গ্রন্থিবদ্ধ শিখা, শীর্ণ-শাণিত মুখ, চক্ষু দুটিতে বুদ্ধির সহিত কৌতুকের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে। রন্তিদেব জ্যোতিষশাস্ত্রে ও অন্যান্য নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত, বয়সও চটুলতার গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে ; কিন্তু অন্তরে তিনি এখনও গম্ভীর হইতে পারেন নাই। একটু রঙ্গ-পরিহাস বা নাট্যাভিনয়ের গন্ধ পাইলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না। সাধারণত জ্যোতির্বিদেরা জীবন-মৃত্যুর সমস্যা লইয়া সর্বদা নাড়াচাড়া করিতে করিতে অতিমাত্রায় গম্ভীর হইয়া পড়েন ; রন্তিদেবের চরিত্র ঠিক তাহার বিপরীত। জীবন-মৃত্যু তাঁহার কাছে মহাকালের নর্তন ছন্দ মাত্র।

রন্তিদেব বিগ্রহপালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'কুমার, আপনি আজ আমার গৃহে অতিথি, এ কেবল আমার পূর্বার্জিত সৎকৃতির ফল।'

বিগ্রহপাল হাসিয়া বলিলেন—'আর্য রন্তিদেব, আপনি আমাকে বেশি সম্মান দেখালে লোকে সন্দেহ করবে।'

রন্তিদেব বলিলেন—'বটে বটে, সত্য কথা। অভিনয় করতে হবে। তুমি আমার বন্ধু-পুত্র, নিবাস কাশী। তোমার নাম— ?'

বিগ্রহ বলিলেন—'রণমল্ল কেমন হয় ?'

রন্তিদেব সহর্ষে দুই হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন—'রণমল্ল—চমৎকার। ভাল কথা, তোমার বন্ধুটি কোথায় ?'

বিগ্রহপাল তখন অনঙ্গ ও গুপ্তচরের কথা বলিলেন। শুনিয়া রন্তিদেব কিছুক্ষণ ললাট কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন—'লক্ষ্মীকর্ণের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়, লোকটি অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত। বৃষ লগ্নে জন্ম, তার উপর লগ্নে বৃহস্পতি। শাস্ত্রে বলে—বৃষ লগ্নে গুরুঃ খলঃ।'

বিগ্রহ বলিলেন—'আপনি মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণকে চেনেন ?'

রন্তিদেব মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। —'বিলক্ষণ চিনি। মহারাজ আমার প্রতি তুষ্ট নয়।'

'তুষ্ট নয় কেন ?'

'রাজমাতা অম্বিকা দেবী যখন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন তখন মহারাজ আমাকে ডেকে মাতার মৃত্যুকাল গণনা করতে বলেছিলেন। আমি গণনা করে বলেছিলাম মাতৃদেবী এখনও দীর্ঘকাল জীবিতা থাকবেন ; এবং মাতার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে মহারাজের মৃত্যু হবে। সেই থেকে মহারাজ আমার প্রতি বিরূপ। একটি নিরেট ভণ্ড-পণ্ডিতকে সভা-জ্যোতিষী নিযুক্ত করেছেন।' বলিয়া রন্তিদেব উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বিগ্রহপাল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শুনিতেছিলেন, বলিলেন—'সত্যি কি গণনায় এই ফল পেয়েছিলেন ?'

রন্তিদেব বলিলেন—'দীর্ঘায়ু পেয়েছিলাম। বাকিটা কল্পনা।'

'তবে— ?'

'বৎস রণমল্ল, আয়ু থাকলেও কখনও কখনও অপঘাত মৃত্যু হতে পারে, তাই একটু সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম।'

'আপনার বিশ্বাস এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ নিজের মাতাকে— ?'

রন্তিদেব একবার ঊর্ধ্বদিকে উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অলসকণ্ঠে বলিলেন—'মাতৃহত্যা মহাপাপ, এ কাজ মহারাজ কখনই করতে পারেন না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত অবহেলায় রুগ্ন ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে। —যাক এসব কথা, এখন তোমার কথা বল। যৌবনশ্রীকে ভাল লেগেছে ?'

বিগ্রহ একটু সলজ্জ হাসিলেন, বলিলেন—'আর্য, আপনি ওকে আগে দেখেছেন ?'

'দেখিনি ! শিশুকাল থেকে ওদের দুই বোনকে দেখছি। বীরশ্রী একটু চঞ্চলা, কিন্তু যৌবনশ্রী বড় ধীরা। সে শুধু রূপবতী নয়, তার মত গুণবতী কন্যা রাজবংশেও বিরল। যদি তাকে লাভ করতে পার বুঝব তুমি ভাগ্যবান।'

বিগ্রহপাল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু বিস্ময়ভাবে বলিলেন—'আর্য রন্তিদেব, পিতা ও পুত্রীর চরিত্রে এতখানি ভিন্নতা কি করে সম্ভব হয় ?'

রন্তিদেব বলিলেন—'সৃষ্টির এ এক বিচিত্র রহস্য। হিরণ্যকশিপুর ঔরসে প্রহ্লাদ জন্মেছিলেন। বীরের পুত্র কাপুরুষ হয়, লম্পটের সন্তান সাধু হয়, আমি অনেক দেখেছি।'

তারপর দুইজন নানা কথার আলোচনা করিলেন, নানাবিধ মন্ত্রণা করিলেন। রাত্রি হইল, ভৃত্য কক্ষে দীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল।

নৈশ ভোজনের আহ্বান আসিলে বিগ্রহপাল ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন—'অনঙ্গ এখনও এল না।'

রন্তিদেব বলিলেন—'উদ্বেগের কারণ নেই। তাকে একবার দেখেই বুঝেছি সে ভারি চতুর। আজ না হোক কাল সে আসবেই।'

বস্তুত রন্তিদেব ঠিকই বলিয়াছিলেন। অনঙ্গের জন্য উদ্বেগের কোনও কারণ ছিল না। সে লম্বোদরের গৃহের বহির্ভাগে একটি কক্ষে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। লম্বোদর খট্টাঙ্গ পাতিয়া শয্যা

বিছাইয়া দিয়াছিল, গৃহের অভ্যন্তর হইতে জলপান আনিয়া খাইতে দিয়াছিল। সবিনয়ে বলিয়াছিল—'মহাশয়, আপনার নামটি এখনও জানা হয়নি।'

অনঙ্গ বিবেচনা করিল সত্য নাম না বলাই ভাল ; সে বলিল—'আমার নাম মধুকর। মধুকর সাধু।'

'নিবাস ?'

'নিবাস মগধের পাটলিপুত্র নগরে।'

'ভাল। আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আমি একবার বেরুব। শীঘ্র ফিরব।' বলিয়া লম্বোদর রাজাকে সমাচার দিতে গেল।

বাহিরে সন্ধ্যা নামিয়াছে। অনঙ্গ কিয়ৎকাল খট্টাঙ্গের পাশে বসিয়া কিংকর্তব্য চিন্তা করিল ; তারপর শয্যার উপর লম্বা হইল। রাত্রি আসন্ন, এখন আর বিগ্রহের সন্ধানে বাহির হইয়া কাজ নাই, কাল প্রাতে খোঁজ-খবর লইলেই চলিবে।

পাঁচ

দীপান্বিতা রাজপুরী। প্রথম বসন্তের বাতাসের মত রাজভবনে উৎসবের স্পর্শ লাগিয়াছে। পৌরজনের অঙ্গে নূতন বস্ত্র, পৌরতরুণীদের অঙ্গে নূতন অলঙ্কার। তোরণশীর্ষে মিঠা মিঠা বাঁশি ও মৃদঙ্গ বাজিতেছে। আকাশে নবোদিত পূর্ণচন্দ্র।

প্রমোদকক্ষে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ জামাতাকে লইয়া নববল খেলিতে বসিয়াছেন। পীঠিকার উপর চৌষট্টি কোঠার ছক আঁকা, তাহার উপর সাদা-কালো বল বসিয়াছে—ঠাকুর, মন্ত্রী, গজবল, নৌবল, অশ্ববল। বড়িয়ার চাল দিয়া খেলা আরম্ভ হইয়াছে। পাশে তাম্বূলের করঙ্ক ও ফলাম্লরসের ভৃঙ্গার লইয়া দুইজন কিঙ্করী নতজানু হইয়া খেলা দেখিতেছে।

খেলা জমিয়া উঠিয়াছে। দুইজনেরই চক্ষু একাগ্রভাবে ছকের উপর নিবদ্ধ। রাজার সন্নিধাতা আসিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার কানে কানে কথা বলিতেছে ; রাজা অধীরভাবে হাত নাড়িয়া তাহাকে বিদায় করিতেছেন। রাজকর্মের এত তাড়া কী ? লম্বোদর আসিয়াছে, অপেক্ষা করুক। স্বয়ংবর-মণ্ডপ নির্মাতা সূত্রধর আদেশ চায়, কাল প্রাতে আদেশ পাইবে। আজ জামাতা বাবাজীকে পরাস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। নয়পালের নিকট নাকাল হইবার পর হইতে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের গূঢ় অন্তর্লোকে একটু আত্মগ্লানি আসিয়াছে, তাই তিনি নানা প্রকারে জামাতার চক্ষে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।—

ভবনের দ্বিতলে দুই ভগিনী প্রসাধন করিয়াছেন। দুইজনের পরিধানে দলিতহরিতালদ্যুতি দুকূল ; বঙ্গাল দেশ ছাড়া এমন কোমল সূক্ষ্ম দুকূল আর কোথাও পাওয়া যায় না। বীরশ্রী ভগিনীর জন্য অনেক আনিয়াছেন। দুইজনের বেণীতে কুন্দকলি অনুবিদ্ধ। সর্বাঙ্গে পুষ্পভূষা ; কর্ণে শিরীষ, কণ্ঠে মল্লীমালা, নিতম্বে অশোকপুষ্পের কাঞ্চী। চরণে গুঞ্জরী নূপুর। যেন দুইটি সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।

দুই ভগিনী সারা প্রাসাদময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কুমারী-বয়সের পিতৃগৃহ দেখিয়া দেখিয়া বীরশ্রীর যেন সাধ মিটিতেছে না। বান্ধুলি পর্ণসম্পুট লইয়া সর্বদা তাঁহাদের সঙ্গে আছে। হাস্য কৌতুক ও স্মৃতিরোমন্থন চলিতেছে।

'চল ভাই, ছাদে যাই।'

রাজভবনের অতিবিস্তীর্ণ ছাদ ; চারিদিক উন্মুক্ত। নগর এখানে ভিড় করিয়া আসে নাই।

দক্ষিণে নর্মদা প্রবাহিতা। চাঁদের আলো নর্মদার জলে চূর্ণ হইয়া গলিত রৌপ্যের মত বহিয়া যাইতেছে।

তিনজনে কিছুক্ষণ মুক্ত আকাশতলে অকারণে ছুটাছুটি করিলেন ; তারপর ছাদের মাঝখানে বসিলেন। বীরশ্রী বলিলেন—'বান্ধুলি, তুই নাচতে শিখেছিস ?'

সরলা বান্ধুলি বলিল—'শিখেছি দিদিরানী।'

'তবে নাচ।'

'নাচব দিদিরানী, কিন্তু তোমাকে গান গাইতে হবে।'

'আচ্ছা গাইব, তুই নাচ।'

বান্ধুলি তখন কোমরে উত্তরীয় জড়াইয়া ঝুম্ ঝুম্ নূপুর বাজাইয়া নাচিল, বীরশ্রী চটুলছন্দে গান গাহিলেন। যৌবনশ্রী কেবল দুই হাতে তাল দিলেন।

তারপর আনন্দের ঝর্ণার মত কলহাস্য করিতে করিতে তিনজন ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন।

যৌবনশ্রীর শয়নকক্ষে আসিয়া দুই বোন পালঙ্কের পাশে বসিলেন। অগুরু মৃগমদের ধূমগন্ধে কক্ষের বাতাস আমোদিত। বীরশ্রী একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'বান্ধুলি, তুই এবার নিজের ঘরে ফিরে যা। আজ আমরা দুই বোন একসঙ্গে শোব, সারা রাত গল্প করব।'

যৌবনশ্রী দিদির বাহু জড়াইয়া বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন—'হ্যাঁ দিদি।'

বান্ধুলি কিন্তু অবাক হইয়া গালে হাত দিল, বলিল—'ওমা, তোমরা একসঙ্গে শোবে ! আর জামাই রাজা ?'

বীরশ্রী ভ্রূ বাঁকাইয়া বলিলেন—'জামাই রাজা কী ?'

'জামাই রাজা একলা শোবেন ?'

বীরশ্রী হাসি চাপিয়া ভ্রূকুটি করিলেন—'তোমার যে জামাই রাজার জন্যে নাড়ি কট্ কট্ করে উঠল ! তা—তুমিই না হয় আজ জামাই রাজার কাছে শোও গিয়ে।'

বান্ধুলি লজ্জায় জিভ কাটিল, পানের বাটা ঝনাৎ শব্দে মেঝেয় রাখিয়া ছুটিয়া পলাইল। দিদিরানী যেন কী ! মুখে কোনও কথা বাধে না। একটু কি লজ্জা আছে !

ছয়

বীরশ্রী ও যৌবনশ্রীকে শয়নকক্ষে ছাড়িয়া এখন গৃহাভিমুখিনী বান্ধুলিকে অনুসরণ করা যাইতে পারে। কারণ, দুই ভগিনী সারা রাত্রি জাগিয়া কী গল্প করিবেন তাহা আমাদের অজানা নাই ; কিন্তু বান্ধুলির সহিত এখনও ভাল করিয়া পরিচয় হয় নাই।

রাজভবন হইতে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া বান্ধুলি নিজের গৃহের পানে চলিল। নর্মদার তীর ধরিয়া পায়ে-হাঁটা পথ, সেই পথে অর্ধদণ্ড চলিলেই গৃহে পৌঁছানো যায়। রাজপথ দিয়া যাইলে অনেকখানি ঘুর হয়, তাই সে এই পথ দিয়াই যাতায়াত করে।

চাঁদিনী রাত্রে পথটি নির্মোকের মত পড়িয়া আছে। এক পাশে নদীর স্রোত, অন্য পাশে উন্মুক্ত ভূমি ; কদাচ দুই একটি ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ঝিল্লি ডাকিতেছে। কোথাও জনমানব নাই। বান্ধুলি চলিতে চলিতে আপন মনে গুন গুন করিয়া গানের কলি আবৃত্তি করিতে লাগিল ; তাহার পায়ের নূপুরধ্বনির সহিত গানের গুঞ্জন মিশিয়া গেল। হঠাৎ এক সময় নর্মদার জল-ছোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিতেই তাহার গায়ে কাঁটা দিল, গলার গুঞ্জন একটু কাঁপিয়া গেল। বান্ধুলি

আপনা আপনি হাসিয়া উঠিল, তারপর উত্তরীয়টি ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া চলিতে লাগিল।

বান্ধুলি মেয়েটি বড় সরলা। তাহার আঠারো বছর বয়স হইয়াছে, পাঁচ-ছয় বছর ধরিয়া সে রাজপুরীতে যাতায়াত করিতেছে, নারীজীবনের অবিচ্ছেদ্য সুখদুঃখ সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞানও তাহার হইয়াছে ; তবু তাহার অন্তরের সহজ সরলতা ঘুচিয়া যায় নাই। একটুতে তাহার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, আবার একটুতে চক্ষু বাষ্পাকুল হয়। তাহার আঠারো বছরের জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের জীবন নয়, তবু সে নিজেকে দুঃখী মনে করিতে পারে নাই। বস্তুত নিজের সুখ-দুঃখের কথা সে বেশি ভাবে না, তাহার মন পরমুখাপেক্ষী ; পরের সুখ-দুঃখই তাহার মনে অধিক প্রতিফলিত হয়।

বান্ধুলির পিতা নাগসেন জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন না। চেদি রাজবংশের অধীনে দৌত্যকর্ম করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দূতকর্মে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। সে সময় রাজায় রাজায় মনোমালিন্য লাগিয়াই থাকিত ; পূর্বতন মহারাজ গাঙ্গেয়দেব গোলমাল দেখিলেই নাগসেনকে পররাজ্যে দূতরূপে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে নাগসেনকে প্রায়ই এ রাজ্য হইতে ও রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত ; কখনও কাশী, কখনও কাঞ্চী, কখনও কর্ণাট। গৃহে গৃহিণী ছিলেন, আর ছিল দুইটি অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা—বেতসী ও বান্ধুলি। নাগসেন বৈশ্য হইলেও তাঁহার অন্তরে লোভ ছিল না ; একটি গৃহ, কিছু ভূসম্পত্তি এবং রাজার নিকট হইতে বৃত্তি পাইয়া তিনি তৃপ্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে যখন গৃহে আসিতেন, গৃহে আনন্দের ধুম পড়িয়া যাইত।

একবার নাগসেন দৌত্যকর্মে কলিঙ্গে গিয়াছেন, হঠাৎ সংবাদ পাইলেন, গুটিকা রোগে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। নাগসেন ত্বরিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ; শোক সংবরণ করিয়া কন্যাদের কথা চিন্তা করিতে বসিলেন। তাঁহার পক্ষে স্থায়িভাবে গৃহে বাস করা সম্ভব নয়, রাজকার্যে বাহিরে যাইতেই হইবে। আসন্নযৌবনা কন্যাদের অভিভাবকত্ব করিবে কে ?

দৌত্যকর্মের সূত্রে একটি লোকের সঙ্গে নাগসেনের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, তাহার নাম লম্বোদর। সে অতিশয় চতুর এবং বিশ্বাসী। তাহার আকৃতি সুদর্শন নয়, কিন্তু সে রাজার প্রিয়পাত্র ; রাজা তাহার চোখ দিয়া দেখেন, তাহার কান দিয়া শোনেন। নাগসেন লম্বোদরের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিলেন। তারপর কনিষ্ঠা কন্যার হাত ধরিয়া রাজপুরীতে লইয়া গেলেন, তাহাকে যৌবনশ্রীর হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন—'মা, আজ থেকে বান্ধুলি তোমার দাসী।' যৌবনশ্রী সমবয়স্কা মেয়েটিকে নিজের সখী করিয়া লইলেন ; নামমাত্র পরিচয় হইল—পর্ণসম্পূটবাহিনী।

জামাতাকে গৃহে বসাইয়া নাগসেন আবার রাজকার্যে দেশান্তরে প্রস্থান করিলেন। বান্ধুলি রাজগৃহে যাতায়াত করে ; কখনও রাত্রে রাজপুরীতেই থাকিয়া যায়, কখনও গৃহে ফিরিয়া আসে। লম্বোদর গুপ্তচর হইলেও মানুষ মন্দ নয়। তাঁহার মনে দাম্পত্য-প্রীতি আছে, বান্ধুলিকে সে স্নেহ করে। সুখে শান্তিতে আবার দিন কাটিতে লাগিল।

কিন্তু গৃহীর সুখ-শান্তি স্থায়ী হয় না। দুই বৎসর পরে বিদেশে গুপ্তশত্রুর বিষপ্রয়োগে নাগসেনের মৃত্যু হইল। পিতাকে হারাইয়া মেয়েরা কান্নাকাটি করিল। লম্বোদর এবার সত্যসত্যই গৃহস্বামী হইয়া বসিল। তবু পারিবারিক পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হইল না, যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিল।

বছর দেড়েক পরে আর একটি ব্যাপার ঘটিল। বেতসী একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া রোগে পড়িল। ক্রমে রোগ প্রশমিত হইল বটে কিন্তু বেতসীর শরীর আর সারিল না। বেতসী স্বাস্থ্যবতী ফুল্লমুখী যুবতী ছিল, তাহার দেহ-মন অকালে শুকাইয়া গেল। ফুলন্ত লতার মূলে যেন

উপদিকা লাগিয়াছে।

দাম্পত্যরসে বঞ্চিত হইয়া লম্বোদর কিন্তু কোনও গণ্ডগোল করিল না। সে যদি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিত কেহ তাহাকে দোষ দিত না, সেকালে একাধিক বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু সে তাহা করিল না। লম্বোদর বুদ্ধিজীবী মানুষ, হয়তো তাহার মনে রসের স্থান খুব বেশি ছিল না; কিম্বা কোনও গভীরতর অভিসন্ধি তাহার মনকে পরিচালিত করিতেছিল। বেতসী বেশি দিন বাঁচিবে না, তাহার মৃত্যুর পর বান্ধুলিকে বিবাহ করিলে সংসারে অশান্তির সম্ভাবনা থাকিবে না, উপরন্তু শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তি নির্বিরোধে হস্তগত হইবে—এইরূপ কোনও দূরবিসর্পী অভিপ্রায় তাহার মনের মধ্যে থাকা বিচিত্র নয়।

বান্ধুলি বোধহয় লম্বোদরের মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত পাইয়াছিল। সে সরলা হইলেও বুদ্ধিহীনা নয়। তাহার কৈশোর-মুকুলিত দেহের প্রতি লম্বোদর মাঝে মাঝে চকিত-সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে ইহা তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। কখনও কখনও লম্বোদর তাহাকে নিজ কর্মজীবনের এমন সব গূঢ় বৃত্তান্ত বলে যাহা সে বেতসীকে কোনও দিন বলে নাই। এই সব মিলাইয়া বান্ধুলি অনুভব করিয়াছিল যে লম্বোদর মনে মনে তাহাকে চায়। কিন্তু সেজন্য বান্ধুলি কোনও দিন শঙ্কা বা উদ্বেগ বোধ করে নাই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করা তাহার স্বভাব নয়। যদি দিদির মৃত্যু হয়, যদি লম্বোদর তাহাকে বিবাহ করিতে চায় তখন কী হইবে সেকথা এখন ভাবিয়া লাভ নাই।

এইভাবে দুই তিন বছর কাটিয়াছে। বেতসী শীর্ণ হইয়া ক্রমে একটি সঞ্চরমাণ ছায়ায় পরিণত হইয়াছে। বান্ধুলির মুকুলিত কৈশোর বিকশিত শতদল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। লম্বোদরের মনের ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা প্রবাহিত হইতেছে। বাহ্যত তাহাদের সম্পর্কে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।—

সেরাত্রে কৌমুদী-স্নাত হইয়া বান্ধুলি রাজপুরী হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

বাড়িটি ঘিরিয়া বেণু-বংশের বেড়া, ভিতরে ক্ষুদ্র মালঞ্চ। দুইটি কিশোর নীপ তরু আছে, একটি কুরুবক, একটি অশোক। আর আছে সুগন্ধি ফুলের লতাগুল্ম, জাতী, মালতী, লবঙ্গলতা, কুন্দ। মালঞ্চটি বান্ধুলির, সে নিত্য তাহার পরিচর্যা করে। প্রত্যহ প্রভাতে রাজপুরীতে যাইবার আগে গাছে জল দেয়। যদি কোনও দিন সন্ধ্যার আগে রাজপুরী হইতে ফিরিয়া আসে, তখন আবার জল দেয়।

বান্ধুলি গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল অশোকতরুর নীচে ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে। ঘোড়াটা যে লম্বোদরের ঘোড়া নয় তাহা সে ছায়ান্ধকারে লক্ষ্য করিল না; ভাবিল, লম্বোদর গৃহে আসিয়াছে, এখনি আবার বাহির হইবে তাই ঘোড়া মন্দুরায় না বাঁধিয়া বাহিরে রাখিয়াছে। লম্বোদর কখন যায় কখন আসে তাহার কোনও স্থিরতা নাই।

বাড়িতে একটিমাত্র ঘরে দীপ জ্বলিতেছে। ঘরটি বেতসী ও লম্বোদরের শয়নকক্ষ। দুইটি খট্বা, মাঝখানে পিত্তলের দীপদণ্ডের মাথায় দীপ। একটি খট্বায় শয়ন করিয়া বেতসী দীপশিখার পানে চাহিয়া আছে।

বান্ধুলি প্রবেশ করিল—'দিদি!'

বেতসী যেমন শুইয়া ছিল তেমনি শুইয়া রহিল, কেবল নিষ্প্রভ চক্ষু বান্ধুলির দিকে ফিরাইয়া বলিল—'এলি? আমি ভেবেছিলাম আজ তুই আসবি না। বীরশ্রী এসেছেন?'

বান্ধুলি স্মিতমুখে বলিল—'এসেছেন, দিদি। তিনিই আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।'

'কেমন দেখলি বীরশ্রীকে?'

'কি বলব দিদি, ঠিক যেন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।'

বেতসী একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—'তাঁর স্বামী আর বিয়ে করেননি?'

বান্ধুলি পাশের খট্টার কিনারায় বসিয়া হাসিয়া উঠিল—'ওমা, সে কি কথা, বিয়ে করতে যাবেন কোন দুঃখে। দিদিরানীর মুখ দেখলেই বোঝা যায় তিনি স্বামীর মন জুড়ে আছেন।'

বেতসীর অক্ষিকোটরে ধীরে ধীরে জল ভরিয়া উঠিল, সে অস্ফুট স্বরে বলিল—'হাঁ, আঁচলে যার সোনা বাঁধা আছে তার মুখ দেখলে বোঝা যায়।'

বেতসীর মুখ দেখিয়া বান্ধুলি চকিত উদ্বেগভরে বলিল—'দিদি! তোর শরীর কি আজ বেশি খারাপ হয়েছে?'

বেতসী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, জল-ভরা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—'বেশি খারাপ আর কী হবে? আমি কি সহজে মরব? সকলকে দগ্ধে দগ্ধে তবে মরব।'

বান্ধুলি ছুটিয়া তাহার পাশে গিয়া বসিল, তাহাকে জড়াইয়া লইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—'ছি দিদি, ওকথা বলতে নেই। তুই তো ভাল হয়ে গেছিস। দেখ না, বসন্তঋতু এসে পড়ল, এবার তুই ঠিক আগের মত হয়ে যাবি।'

বেতসীর মুখে একটু হাসি ফুটিল বটে কিন্তু চোখ দুটি নিরাশায় ডুবিয়া রহিল। সে জানে, সে বুঝিয়াছে। যাহারা মৃত্যু-পথের যাত্রী তাহারা বুঝিতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে বান্ধুলি এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—'কুটুম্ব কোথায় গেলেন? তাঁকে দেখছি না।'

বেতসী বলিল—'সে বিকেলবেলা এসেছিল, আবার তখনি বেরিয়ে গেছে। একজন অতিথ্ রেখে গেছে।'

তাহাদের গৃহে অতিথি সজ্জনের যাতায়াত নাই। বান্ধুলি অবাক হইয়া বলিল—'অতিথ্! কোথায় অতিথ্?'

বেতসী বলিল—'বাইরের ঘরে আছে। তোর কুটুম্ব তাকে জলপান দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল, বলে গেল দু'দণ্ডের মধ্যে ফিরে আসবে। তা এখনও দেখা নেই।'

বান্ধুলি জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন অতিথ্ তুই দেখেছিস?'

বেতসী বলিল—'দেখিনি। শুনলাম মগধের এক বণিক।'

বান্ধুলি বলিল—'ওর ঘোড়াই তাহলে অশোকতলায় বাঁধা আছে। তা, একটা মানুষ বাড়িতে রয়েছে কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ তো পাওয়া যাচ্ছে না।'

বেতসী বলিল—'হয়তো বুড়ো মানুষ, একলাটি অন্ধকারে টাকার পুঁটুলি কোলে করে বসে আছে।'

বান্ধুলি গালে হাত দিল—'ওমা! ঘরে পিদিম জ্বালা হয়নি?'

বেতসী বলিল—'কৈ আর হয়েছে। বাড়ির কর্তা উধাও, আমার নড়বার ক্ষমতা নেই। কে করবে বল। বাড়িতে অতিথ্, তাকে রাত্রে কি খেতে দেব জানি না।'

'সে তুই ভাবিস কেন দিদি, চারখানা চর্পটিকা আমি গড়ে দিতে পারব। আগে যাই, ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে আসি। বুড়ো বণিক হয়তো ভাবছেন, এরা কেমন গৃহস্থ।'

বণিকেরা সাধারণত বুড়াই দেখা যায়, তাই দুই বোনের ধারণা জন্মিয়াছিল, অতিথি বয়োবৃদ্ধ। বান্ধুলি তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া বাহিরের ঘরে গেল।—

অনঙ্গপাল খট্টাঙ্গে লম্বা হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্বপ্ন দেখিতেছিল, ছিপ দিয়া মস্ত মাছ ধরিয়াছে। মাছের মুখটা লম্বোদরের মত; গোল চোখ, ভাল্লুকে খাওয়া নাক, বোকাটে হাসি। অনঙ্গপাল ভাবিতেছিল, মাছের ঝোল রাঁধিবে, না রাই-সরিষা দিয়া ঝাল রাঁধিবে, এমন সময় মাছটা জলে লাফাইয়া পড়িল এবং অদৃশ্য হইল।...অনঙ্গপাল জলের পানে চাহিয়া আছে, দেখিল একটি আলোর বুদ্বুদ জল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। বুদ্বুদ শূন্যে উঠিয়া তাহার দিকে

ভাসিয়া আসিল। বুদ্বুদের ভিতর হইতে শব্দ আসিতেছে—ঝুম ঝুম ঝুম—

ঘুম ভাঙিয়া গেল, অনঙ্গ চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল। বুদ্বুদ নয়, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে দীপহস্তা এক যুবতী। যুবতীর অঙ্গ নধর, কান্তি কমনীয়, অধর রসসিক্ত, চক্ষু দুটি কাজল না পরিয়াও কৃষ্ণায়ত—

অনঙ্গ চোখ মুছিয়া আবার দেখিল। যুবতীর কণ্ঠে সোনার চিলমীলিকা, কানে সোনার কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গের প্রগল্ভ উচ্ছলতা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে অচ্ছাভ নীহারিকার ন্যায় একটি নিচোল—

দুইজন অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর যুবতী সহসা প্রদীপ মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া দ্বারের দিকে চলিল। তাহার পায়ে মঞ্জরী বাজিয়া উঠিল—ঝিম ঝিম ঝিম।

অনঙ্গপাল সূচীবিদ্ধের মত চমকিয়া মুখে শব্দ করিল—'এহুম্ এহুম্—'

যুবতী দ্বারের কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ ঈষৎ তুলিল। অনঙ্গপাল রাজহংসের মত গলা বাড়াইয়া প্রশ্ন করিল—'তুমি কে?'

যুবতীর অধরপ্রান্ত একটু নড়িল, সে বলিল—'আমি—গৃহস্বামী আমার কুটুম্ব।' সে দ্বারের বাহিরে গিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল। অনঙ্গপাল রাজহংসের মত গলা বাড়াইয়া ব্যগ্র-বিহ্বল চক্ষে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল।

বেতসী নিজ শয্যায় বসিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া ছিল, বান্ধুলি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া অন্য শয্যায় শুইয়া পড়িল এবং মুখে উত্তরীয় চাপা দিয়া মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিল। বেতসী উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিল—'কি হয়েছে রে?'

বান্ধুলি ক্ষণেক মুখ হইতে উত্তরীয় সরাইয়া গাঢ়স্বরে বলিল—'এহুম্ এহুম্।' তারপর আবার মুখে কাপড় দিয়া দুলিতে লাগিল।

বেতসীর উৎকণ্ঠা বাড়িয়া গেল। সে নিজের শয্যা হইতে নামিয়া বান্ধুলির পাশে বসিল। তাহার গায়ে হাত রাখিয়া চাপা গলায় বলিল—'বুড়ো বণিক কিছু বলেছে নাকি?'

'বুড়ো নয়—তরুণ।' বান্ধুলি উঠিয়া বসিল এবং বেতসীর কাঁধে মাথা রাখিয়া অসহায়ভাবে হাসিতে লাগিল।

বেতসী বিরক্তিভরে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—'আ গেল! অত হাসছিস কেন?'

বান্ধুলি কেন এত হাসিতেছে সে নিজেই জানে না। তাহার মনে হাসির কোন্ গোপন উৎস-মুখ খুলিয়া গিয়াছে।—অন্ধকার ঘরে বুড়া বণিক শুইয়া আছে দেখিয়া সে পা টিপিয়া টিপিয়া কাছে গিয়াছিল, কৌতূহলবশে প্রদীপ তাহার মুখের কাছে ধরিয়াছিল, তারপর—

বান্ধুলির হাসি আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

হাসি রোগটা ছোঁয়াচে। কিছুক্ষণ পরে বেতসীও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, তারপর ছদ্ম তিরস্কারের সুরে বলিল—'দেখন-হাসি!—শুধু হাসলেই চলবে? বণিককে খেতে দিতে হবে না?'

বান্ধুলি উঠিয়া পড়িল—'তুইও আয় না দিদি। রাঁধতে রাঁধতে গল্প করব।'

দুই বোন রসবতীতে গেল।—

লম্বোদর ফিরিল দুই দণ্ড পরে। তাহার মন ভাল নয়, দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াও রাজার দর্শন পায় নাই। আবার কাল সকালে যাইতে হইবে।

আহার্য প্রস্তুত হইয়াছিল, লম্বোদর তাহা লইয়া বাইরের ঘরে গেল। অনঙ্গপাল ঊর্ধ্বে চাহিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল, লম্বোদর বলিল—'সাধু মহাশয়, আমার ফিরতে বড় দেরি হয়ে গেল। আপনার

খুবই কষ্ট হয়েছে—'

অনঙ্গপাল বলিল—'কিছু না। আমি বেশ আনন্দে আছি।'

লম্বোদর বলিল—'আসুন, আহারে বসুন।'

অনঙ্গ আহারে বসিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটা কথা হইল। লম্বোদর বলিল—'আমার কুটুম্বিনী রুগ্না, বেশি কাজকর্ম করতে পারে না। একটি শ্যালিকা আছে, সে রাজকন্যার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী ; বেশির ভাগ রাজপুরীতে থাকে, মাঝে মাঝে গৃহে আসে। আমিও সকল সময় গৃহে থাকি না। একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এসে বাড়ির কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। আপনি কোনও সঙ্কোচ করবেন না, আমার গৃহ নিজের গৃহ মনে করবেন। যদি কোনও প্রয়োজন হয় আমার স্ত্রীকে বলবেন কিম্বা দাসীকে আদেশ করবেন।'

অনঙ্গ বলিল—'ভাল। কিন্তু আমি শিল্পী মানুষ, আমার প্রয়োজন অতি সামান্য।'

লম্বোদরের গোল চক্ষু আরও গোল হইল, বলিল—'শিল্পী ? তবে যে বলেছিলেন আপনি বণিক ?'

অনঙ্গ বলিল—'বণিকও বটে শিল্পীও বটে। আমি চিত্র আঁকি, মূর্তি গড়ি, আর দেশে দেশে তাই বিক্রয় করে বেড়াই।'

লম্বোদর কিছুক্ষণ ঈষৎ হাঁ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—'অহহ—বুঝলাম।—আপনার শিল্পসামগ্রী বুঝি নৌকায় আছে ?'

অনঙ্গ বলিল—'কিছু নৌকায় আছে, বাকি এইখানেই রচনা করব। তোমার গৃহটি বেশ নির্জন, এখানে অবাধে কাজ করতে পারব। ভাল কথা, ত্রিপুরীতে উত্তম গণৎকার আছেন ?'

'আছেন। রন্তিদেব নামে একজন মহাপণ্ডিত গণৎকার আছেন। বণিকেরা সকলে তাঁর কাছে যান। তিনি নগরের মাঝখানে থাকেন ; জিজ্ঞাসা করলে যে কেউ বাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

'ভাল। কাল প্রাতেই রন্তিদেব মহাশয়ের কাছে যাব। ভাগ্যটা পরীক্ষা করাতে হবে।'

অতঃপর অনঙ্গ আহার সম্পন্ন করিলে লম্বোদর বিদায় লইল।

শয্যায় শুইয়া শুইয়া অনঙ্গ ভাবিতে লাগিল—লম্বোদরের শ্যালিকাটি রাজকন্যার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী ! যোগাযোগ ভাল হইয়াছে। শ্যালিকাটি দেখিতে যেন সাগর-সেঁচা উর্বশী ! কী তার তনুর তনিমা, বক্ষ ও নিতম্বের গরিমা, অধরের লালিমা, কেশকলাপের কালিমা—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক

পূর্ণিমার রাত্রি শেষ হইয়া নূতন দিন আরম্ভ হইতেছে। ত্রিপুরী নগরীর নরনারীরা জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। আমাদের পরিচিত কয়েকজনেরও একে একে নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে।

লম্বোদরের গৃহে প্রথম ঘুম ভাঙ্গিল লম্বোদরের। সে উঠিয়া নদীতীরে গেল। তখনও একটু ঘোর-ঘোর আছে। নদীতীর হইতে ফিরিয়া লম্বোদর বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিল। রাত্রে এক মুঠি চণক ভিজানো ছিল তাহাই গুড় সহযোগে ভক্ষণ করিল। ঘরের মধ্যে আলো ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে দেখিল বেতসীরও ঘুম ভাঙ্গিয়াছে ; বেতসী শয্যায় শুইয়া শুইয়া তাহাকে দেখিতেছে। চোখে চোখ পড়িতে বেতসী একটু হাসিল।

লম্বোদর বেতসীর খট্টার উপর ঝুঁকিয়া মৃদুস্বরে বলিল—'আমি বেরুচ্ছি। তুমি অতিথিটিকে দেখো।'

সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। বেতসী আরও কিছুক্ষণ শুইয়া রহিল, তারপর আলস্য ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিল। আজ তাহার শরীর-মন যেন অনেকটা স্বচ্ছন্দ মনে হইতেছে। গৃহে অতিথি, তাহার পরিচর্যা করিতে হইবে। বান্ধুলি তো এখনি রাজবাটী চলিয়া যাইবে। লম্বোদর কখন ফিরিবে স্থির নাই। অন্যদিন দাসী না আসা পর্যন্ত সে শয্যায় পড়িয়া থাকে, আজ ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। সংসারের সব কাজ তো দাসীকে দিয়া হয় না।—

গৃহের আর একটি ঘরে বান্ধুলির ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। চোখ মেলিয়া সে কিছুক্ষণ শূন্যে চাহিয়া রহিল। কাল রাত্রে অনেকখানি হাসি বুকে লইয়া সে ঘুমাইয়াছিল ; হাসিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়াছিল, আবার তাহার জাগার সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কিসের জন্য হাসি ? দিদিরানী আসিয়াছেন তাই কি ? হঠাৎ মনে পড়িল। অতিথি ! মজার অতিথি !...কিন্তু এখনই রাজপুরীতে যাইতে হইবে। অতিথি কি জাগিয়াছে ? বান্ধুলি শয্যায় উঠিয়া বসিল।

বাহিরের ঘরে অতিথি তখনও ঘুমাইতেছিল। কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত সাগর-সেঁচা উর্বশী সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে অনঙ্গ নিদ্রা গিয়াছিল, এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। কিছুক্ষণ পরে বান্ধুলি যখন রাজবাটী যাইবার জন্য বাহির হইল তখন সে বহিঃকক্ষের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় বন্ধ দ্বারের কাছে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল ; কান পাতিয়া শুনিল, কিন্তু কিছু শুনিতে পাইল না। তখন সে গৃহ হইতে নির্গত হইল। এতক্ষণে বাহিরে বেশ আলো ফুটিয়াছে।—

রাজভবনের বাতায়ন পথেও রবিরশ্মির সোনার কাঠি প্রবেশ করিয়াছিল, ঘরে ঘরে ঘুমন্ত মুখের উপর পড়িয়াছিল।

বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী একটি শয্যায় মুখামুখি শুইয়া ঘুমাইতেছেন। যৌবনশ্রীর ঘুম একটু তরল হইল। তিনি চোখ মেলিয়া দেখিলেন দিদির চক্ষু দুটি তখনও মুদিত। তিনি আবার চক্ষু মুদিলেন। কিছুক্ষণ পরে বীরশ্রী চক্ষু মেলিলেন, যৌবনশ্রীর চক্ষু মুদিত দেখিয়া তিনি আবার চক্ষু মুদিলেন। তারপর দুই বোন একসঙ্গে চক্ষু মেলিলেন। দু'জনের চোখে আলস্য-ভরা হাসি ফুটিল।—

আর একটি কক্ষে বিশাল শয্যার উপর জাতবর্মা নিদ্রিত। ঘুমের ঘোরে তিনি পাশের দিকে হাতড়াইলেন কিন্তু কিছুই না পাইয়া চক্ষু খুলিলেন। অপরিচিত শয্যা, বীরা শয্যায় নাই ; তিনি বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তারপর সব মনে পড়িয়া গেল।—

রাজভবনের অন্য প্রান্তে আর একটি কক্ষে পালঙ্কের উপর মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের দেহ রণক্ষেত্রে নিহত ঘটোৎকচের মত পড়িয়া ছিল ; তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে ঘোর সিংহনাদ নিঃসৃত হইতেছিল। একজন কিঙ্করী পদপ্রান্তে বসিয়া পদসেবা করিতেছিল। লক্ষ্মীকর্ণ সহসা পা ঝাড়া দিলেন, পদসেবিকা ছিট্‌কাইয়া নীচে পড়িল। মহারাজ তখন পাশ ফিরিয়া শুইয়া আবার নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন। দাসী উঠিয়া আবার মহারাজের পা কোলে তুলিয়া লইল। মহারাজ যখন পা ঝাড়া দিয়াছেন তখন শীঘ্রই গা ঝাড়া দিবেন এরূপ আশা করা অন্যায় হইবে না।—

রাজপুরীর মধ্যে কেবল অম্বিকা দেবী নিজ কক্ষের দ্বারের দিকে চক্ষু পাতিয়া বিনিদ্র চাহিয়া ছিলেন। রোগীর ঘুম কখন আসে কখন যায় ; তিনি মধ্যরাত্রির পর আর ঘুমান নাই। কখন ভোর হইবে, কখন নাতিনীরা তাঁহার কাছে আসিবে এই আশায় পথ চাহিয়া ছিলেন।—

রাজপুরী হইতে দূরে নগরের কেন্দ্রস্থলে গ্রহাচার্য রন্তিদেবের গৃহে যুবরাজ বিগ্রহপালের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। প্রথমেই তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল যৌবনশ্রীর মুখখানি। তিনি সহর্ষে আলস্য ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিলেন। তারপর মনে পড়িয়া গেল, কাল রাত্রে অনঙ্গ আসে নাই। কোথায় গেল অনঙ্গ !

অনঙ্গ কোথাও যায় নাই, সে তখনও ঘুমাইতেছে। কিন্তু তাহাকে আর বেশিক্ষণ ঘুমাইতে

হইল না, দ্বারে ঠক্ ঠক্ শব্দ শুনিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চকিতে উঠিয়া আলুথালু বেশবাস সম্বরণ করিতে করিতে সে গিয়া দ্বার খুলিল।

দ্বার খুলিয়া কিন্তু নিরাশ হইল। যাহাকে দেখিবে আশা করিয়াছিল সে নয়, এ অন্য মেয়ে। কৃশাঙ্গী রোগমলিন মুখশ্রী তবু কাল রাত্রির সেই নধরকান্তি যুবতীর সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। নিশ্চয় লম্বোদরের রুগ্ণা কুটুম্বিনী।

অনঙ্গ চট্ করিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। মুখে গদ্‌গদ আপ্যায়নের ভাব আনিয়া বলিল—'ক্ষমা করুন, আমার ঘুম ভাঙ্গতে বড় দেরি হয়ে গেছে।—আপনি গৃহস্বামীর স্বামিনী—কেমন ?'

বেতসী মাথার উপর একটু আঁচল তুলিয়া দিয়া চক্ষু নত করিল, মৃদু স্বরে বলিল—'গৃহস্বামী কাজে বেরিয়েছেন, আমাকে অতিথির পরিচর্যা করতে বলে গেছেন।'

অনঙ্গ ব্যস্ত হইয়া বলিল—'সে কি কথা! আপনার শরীর অসুস্থ, আপনি পরিচর্যা করতে পারবেন কেন ? বরং আপনার ভগিনী—'

বেতসী চোখ তুলিল—'সে রাজবাটীতে গেছে।'

অনঙ্গ কণ্ঠস্বরে নৈরাশ্য দমন করিয়া বলিল—'ও। সে বুঝি দিনের বেলা রাজবাটীতে থাকে ?'

বেতসী বলিল—'রাত্রেও থাকে। কদাচ কখনও গৃহে আসে। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন, আমি আপনার জলপান তৈরি করে রেখেছি।'

'আমি এখনই প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি।'

অল্পকাল পরে অনঙ্গ আহারে বসিল। কিছু ফলমূল, যবের শক্তুর সহিত দুগ্ধ-শর্করা মিশ্রিত কিছু মণ্ড, তিল ও গুড়ের পাক মিষ্টান্ন। অনঙ্গ পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিতে লাগল, বেতসী দ্বারের কাছে চৌকাঠ ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনঙ্গ বলিল—'আপনি রোগা মানুষ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন।'

বেতসী দ্বার-পীঠিকার একপাশে বসিল। অতিথি বড় মিষ্টভাষী সজ্জন। কাল রাত্রে বেতসী অতিথিকে বুড়া মনে করিয়াছিল। মোটেই বুড়া নয়, কমকান্তি যুবা। তাহাকে দেখিলে তাহার কথা শুনিলে মন প্রীত হয়।

আহার করিতে করিতে অনঙ্গ বলিল—'আপনাদের নগর অতি সুন্দর। এখানে কেউ মাছ খায় না ?'

বেতসী উৎসুক মুখ তুলিল—'মাছ ?'

'হাঁ। নর্মদায় মাছ আছে, আপনারা মাছ খান না ?'

'খাই। কিন্তু সব সময় পাই না।'

'পান না কেন ? জেলেরা মাছ ধরে না ?'

'ধরে। ডিঙায় চড়ে নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরে, তারপর নদীর ঘাটে এনে বিক্রি করে। এখানে মাছের বাজার নেই। আমরা কালেভদ্রে মাছ খাই।'

অনঙ্গ গাঢ়স্বরে বলিল—'ভগিনি, তোমার শরীর দুর্বল, মাছ না খেলে শরীর সারবে কি করে ? শুধু শাক-পাতা খেলে কি স্বাস্থ্য ভাল থাকে ?'

বেতসীর অধরে হাসি ফুটিল। যে অতিথি ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করে তাহার কাছে কতক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকা যায়! সে স্মিতমুখে বলিল—'আপনি বুঝি মাছ খেতে ভালবাসেন ?'

অনঙ্গ বলিল—'খেতে ভালবাসি এবং খাওয়াতে ভালবাসি। তোমাকে মাছ রেঁধে খাওয়াব। তিন দিন খেলে তোমার দুর্বলতা দেশ ছেড়ে পালাবে।'

বেতসী বলিল—'আমি আজই দাসীকে মাছের সন্ধানে পাঠাব—'

অনঙ্গ হাত নাড়িয়া বলিল—'কোনও প্রয়োজন নেই। আমি মাছ সংগ্রহ করব। আজ আর হবে না। আজ আমাকে তৈজসপত্র আনতে যেতে হবে।'

'দ্বিপ্রহরে ফিরবেন তো ?'

'ফিরব। আমার জন্য বেশি কিছু রেঁধো না, আজ দুটি তণ্ডুল আর ঘৃত হলেই চলে যাবে।'

জলপান সমাধা করিয়া অনঙ্গ উঠিল। তারপর ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইল। বেতসী দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। আজ তাহার রুগ্ন দেহে ক্লান্তি আসিল না।

অনঙ্গ যখন রন্তিদেবের গৃহে পৌঁছিল তখন বেলা বাড়িয়াছে। দ্বিতলের অলিন্দে নাপিত বিগ্রহপালের ক্ষৌরকর্ম করিয়া দিতেছে। অনঙ্গও বসিয়া গেল।

নাপিতের সম্মুখে কোনও কথা হইল না। সে বিদায় লইলে অনঙ্গ বলিল—'আমার নাম মধুকর সাধু।'

বিগ্রহ বলিলেন—'সাধু সাধু। আমি কাশীর বণিকপুত্র, নাম রণমল্ল।—কাল রাত্রে তুই কোথায় ছিলি ?'

'গৃহস্থ লম্বোদরের গৃহে'—বলিয়া অনঙ্গ কল্যকার ঘটনা বিবৃত করিল।

বিগ্রহ উচ্চহাস্য করিলেন—'বাঘের ঘরে ঘোগের বসতি !—যা হোক, আর ওদিকে যাস্‌নি।'

অনঙ্গ মাথা নাড়িল—'না, যেতে হবে। একটা সূত্র পাওয়া গেছে, ছাড়া চলবে না।'

রন্তিদেব আসিয়া আলাপে যোগ দিলেন, বলিলেন—'কি সূত্র ?'

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—'বড় সূক্ষ্ম সূত্র, টানাটানি করলে ছিঁড়ে যাবে।—আর্য রন্তিদেব, আপনার ঘোড়াটা ফিরিয়ে এনেছি। ওটা আমি আর চড়ব না। আমি আপনার ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছি যদি গুপ্তচর চিনতে পারে গণ্ডগোল বাধবে।'

রন্তিদেব বলিলেন—'সে কথা ঠিক। কিন্তু ঘোড়া তো তোমাদের দরকার।'

বিগ্রহ জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখানে ঘোড়া কিনতে পাওয়া যায় না ?'

রন্তিদেব বলিলেন—'পাওয়া যায়। বানায়ু দেশ থেকে সম্প্রতি একদল বণিক অনেক ঘোড়া এনেছে। উৎকৃষ্ট ঘোড়া।'

বিগ্রহ বলিলেন—'তাহলে আর কথা কি ! আজ বৈকালে গিয়ে দুটো ঘোড়া কিনলেই হবে।'

রন্তিদেব বলিলেন—'ভাল। আমি আমার ঘোড়াডোমকে তোমাদের সঙ্গে দেব, তোমরা পছন্দ করে ঘোড়া কিনো।'

তখন বিগ্রহপাল বলিলেন—'আর্য রন্তিদেব, আমরা নিরাপদে ত্রিপুরীতে এসে পৌঁচেছি, আপনার গৃহে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি। যতদূর মনে হয় কেউ সন্দেহ করে না। এখন বলুন কর্তব্য কি ?'

রন্তিদেব বলিলেন—'বৎস, কাল রাত্রেও তুমি এই প্রশ্ন করেছিলে। তোমার প্রশ্ন শুনে আমি খড়ি পেতে প্রশ্ন-গণনা করেছিলাম।'

শ্রোতৃদ্বয়ের চোখের দৃষ্টি উৎসুক হইল—

'কি পেলেন ?'

রন্তিদেব একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—'তোমার কার্যসিদ্ধি হবে, কিন্তু বর্তমানে কিছু বাধাবিঘ্ন আছে। পূর্ণ সিদ্ধিলাভ এখন হবে না।'

বিগ্রহপাল ব্যর্থতা-ভরা চক্ষে চাহিলেন—'কার্যসিদ্ধি হবে না।'

রন্তিদেব বলিলেন—'ভগ্নোদ্যম হয়ো না। এখন পূর্ণ সিদ্ধি না হলেও অন্তে সিদ্ধি অনিবার্য।'

কিছুক্ষণ তিনজনে নীরব রহিলেন। তারপর অনঙ্গ শান্তস্বরে বলিল—'দৈবের কথা বলা যায় না, যা ভবিতব্য তা হবেই। কিন্তু তাই বলে চুপ করে বসে থাকা যায় না।'

রন্তিদেব বলিলেন—'আমিও তাই বলি। ফল যাই হোক পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা করতে হবে। আমার গণনা ভুলও হতে পারে। জন্ম মৃত্যু বিবাহ বলতে পারে না বরাহ।'

বিগ্রহপাল ক্ষণিক অবসাদ কাটাইয়া উঠিলেন, বলিলেন—'যা হবার হবে। এখন কর্তব্য কি বলুন ?'

রন্তিদেব কহিলেন—'প্রথম কর্তব্য রাজপুরীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা।'

অনঙ্গ বলিল—'অবশ্য। কিন্তু আমি কিম্বা বিগ্রহ রাজপুরীতে গেলে ধরা পড়বার ভয়। অন্য কী উপায়ে রাজপুরীতে জাতবর্মা কিম্বা দেবী বীরশ্রীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যেতে পারে আপনি ভেবেছেন ?'

রন্তিদেব ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—'আর কাউকে পাঠানো চলবে না, ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ।' তারপর সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন—'আমি যেতে পারি ! মুখে ছাই মেখে জটাজূট ধারণ করে যদি যাই, কেউ আমাকে চিনতে পারবে না—'

অনঙ্গ হাসিয়া মাথা নাড়িল—'না আর্য, আপনাকে আর ষড়যন্ত্রের পাকে জড়ানো উচিত হবে না। এখন থেকে যা করবার আমরাই করব, আপনি নেপথ্যে থাকবেন।'

রন্তিদেব ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন—'কিন্তু আর তো কোনও উপায় দেখছি না—'

অনঙ্গ বলিল—'একটা উপায় হতে পারে। আমি যার বাড়িতে আছি সে সম্ভবত রাজার গুপ্তচর। কিন্তু তার এক শ্যালী আছে, সে যৌবনশ্রীর তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী। তাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার হতে পারে।'

বিগ্রহ অনঙ্গের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—'শ্যালিকাটি অনূঢ়া ?'

অনঙ্গ মুচকি হাসিল—'তাই মনে হল।'

'দেখতে কেমন ?'

উত্তরে অনঙ্গ ইঙ্গিতপূর্ণ চোখ নাচাইল। তারপর রন্তিদেবকে বলিল—'আর্য, আপনি কি বলেন ? চেষ্টা করতে পারি ? অবশ্য খুব সতর্কভাবে চেষ্টা করতে হবে—'

অতঃপর তিনজনে দীর্ঘকাল আলাপ আলোচনা করিলেন। ক্রমে দ্বিপ্রহর সমাসন্ন দেখিয়া অনঙ্গ উঠিয়া পড়িল। নিজের প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র একটি ভৃত্যের স্কন্ধে তুলিয়া পদব্রজে লম্বোদরের গৃহে ফিরিয়া চলিল।

দুই

রাজপুরীতে ঠাকুরানী কক্ষে পর্যঙ্কের উপর ঠাকুরানী শয়ান ছিলেন, তাঁহার দুই পাশে দুই নাতিনী। লক্ষ্মীকর্ণ জামাতাকে মাতৃদেবীর চরণ দর্শন করাইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রস্থান করিয়াছেন। যে দুইজন উপস্থায়িকা অম্বিকা দেবীর কাছে থাকে তাহাদের বিদায় করা হইয়াছে। বান্ধুলি রাজকুমারীদের পিছন পিছন ঘুরিতেছিল, বীরশ্রী তাহাকে বলিয়াছেন—'বান্ধুলি, তোর বাড়িতে অতিথ্ এসেছে বলছিলি, তা তুই ঘরে ফিরে যা। বেতসী একলা হয়তো পেরে উঠবে না।' বান্ধুলির মন দোটানায় পড়িয়াছিল. ছুটি পাইয়া সে উৎসুকচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল।

কক্ষ শূন্য হইলে ঠাকুরানী দুই নাতিনীর দিকে পর্যায়ক্রমে মন্থর চক্ষু ফিরাইলেন, বলিলেন—'এবার তোদের কথা শুনব। তার আগে একটা কাজের কথা বলে রাখি। আজ

মাসের প্রথম দিন, আজ থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত যৌবনশ্রী মন্দিরে পূজা দিতে যাবে। নগরে যত মন্দির আছে সব মন্দিরে নিজে গিয়ে পূজা দেবে। রাজবংশের এই প্রথা।'

বীরশ্রী বলিলেন—'ঠিক তো, আমার মনে ছিল না। আমিও তো গিয়েছিলাম পূজা দিতে।'

অম্বিকা বলিলেন—'নগরের বাইরে নর্মদার উৎসমুখের কাছে ত্রিপুরেশ্বরীর দেউলেও পূজা দিতে যেতে হবে।'

বীরশ্রী বলিলেন—'হাঁ দিদি। আমি যৌবনাকে নিয়ে রথে চড়ে সব মন্দিরে পূজা দিয়ে আসব।'

অম্বিকা বলিলেন—'এবার তোদের কথা বল।'

তখন বীরশ্রী নৌকায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল এবং বিগ্রহপালের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া অম্বিকা কিয়ৎকাল অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে নীরব রহিলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে বলিলেন—'এই ব্যাপার! যুদ্ধে হেরে কর্ণ শপথ করেছিল, বিগ্রহপালকে স্বয়ংবর সভায় নিমন্ত্রণ করবে, সে শপথ ভঙ্গ করেছে! এখন সব বুঝতে পারছি। কর্ণের মনে পাপ আছে, অন্য কোনও রাজাকে জামাই করবে স্থির করেছে।'—যৌবনশ্রীর দিকে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন—'তুই বিগ্রহপালকে দেখেছিস। তাকে বিয়ে করতে চাস?'

যৌবনশ্রী অরুণাভ মুখখানি নত করিয়া রহিলেন, তাঁহার ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল। বীরশ্রী তাঁহার পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন—'বিগ্রহ যদি স্বয়ংবর সভায় থাকেন তাহলে যৌবনা তাঁর গলাতেই মালা দেবে।'

ঠাকুরানীর স্তিমিত চক্ষু কৌতূহলী হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'সত্যি ওকে মনে ধরেছে? যৌবনা, আমার পানে চোখ তুলে তাকা। তোর চোখ দেখলেই বুঝতে পারব।'

যৌবনশ্রী চোখ তুলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু চোখ অর্ধেক উঠিয়া আবার নামিয়া পড়িল। ঠাকুরানীর মুখে একটু হাসি ফুটিল, তিনি একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'আচ্ছা বুঝেছি। তোরা এখন যা। আমি কর্ণকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

বীরশ্রী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—'বাবাকে এসব কথা যেন বোলো না দিদি।'

ঠাকুরানী বলিলেন—'আমি কিছুই বলব না। শুধু তাকে জিজ্ঞাসা করব কোন্ কোন্ রাজাকে স্বয়ংবরে ডেকেছে, মগধের যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করেছে কিনা।'

বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী আশ্বস্ত হইয়া ঠাকুরানীর কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন।

জাতবর্মা নিজকক্ষে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় একাকী পাদচারণ করিতেছিলেন, পত্নী ও শ্যালিকা প্রবেশ করিলে তিনি বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—'বলতে পার আমি শ্বশুরালয়ে এসেছি, না কারাগারে এসেছি?'

বীরশ্রীও গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'তুমি কারাগারে এসেছ। আমরা দু'জন তোমার রক্ষী।'

জাতবর্মা বলিলেন—'চমৎকার রক্ষী! সারারাত্রি দেখা নেই।'

বীরশ্রী বলিলেন—'বন্দী কি রক্ষীদের দেখতে পায়! রক্ষীরা আড়াল থেকে বন্দীর ওপর নজর রাখে।'

জাতবর্মা যৌবনশ্রীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—'ভাল কথা। কিন্তু একটি বন্দীর পিছনে দুটি রক্ষী কেন? দ্বিতীয় বন্দীটাকে ধরতে পারছ না?'

জাতবর্মার সহিত যৌবনশ্রীর পরিহাসের সম্পর্ক, দু'জনের মধ্যে প্রীতিও যথেষ্ট আছে। কিন্তু যৌবনশ্রী রঙ্গ-রস সম্পূর্ণ উপভোগ করিলেও নিজে প্রগল্ভতা করিতে পারেন না, রসের কথা ঠোঁট পর্যন্ত আসিয়া আট্‌কাইয়া যায়। তিনি দিদির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া হাসিলেন। হাসির অর্থ তুমি উত্তর দাও।

বীরশ্রী বলিলেন—'দ্বিতীয় বন্দী কোথায় যে ধরব ? কাল নদীর ঘাটে সেই শেষ দেখেছি।'

জাতবর্মা এবার হাসিলেন, বলিলেন—'ভেব না। সে যখন যৌবনশ্রীকে দেখেছে তখন তাকে কারাগারের বাইরে ঠেকিয়ে রাখাই শক্ত হবে। নিতান্তই শ্বশুর মহাশয়ের ভয়ে ঢুকে পড়তে পারছে না।—যৌবনশ্রী, তুমি অধীরা হয়ো না। দু'একদিনের মধ্যেই সে পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে জুটবে।'

যৌবনশ্রী আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, ভগিনী ও ভগিনীপতিকে একত্র রাখিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন। সেখান হইতে একবার মুষ্টি তুলিয়া জাতবর্মাকে দেখাইলেন, তারপর দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ওদিকে মন্ত্রগৃহে মহারাজ তখন নিভৃতে নানা রাজকর্ম চালাইতেছেন। লম্বোদর তাহার বার্তা নিবেদন করিয়াছে। নৌকায় আগত লোকটা সম্ভবত নিরীহ ; বিশেষত যে যখন লম্বোদরের গৃহেই উঠিয়াছে তখন তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। লক্ষ্মীকর্ণ লম্বোদরকে অন্য গুহ্য কর্মে নিয়োগ করিলেন। স্বয়ংবর ব্যপদেশে রাজধানীতে নানা লোক আসিতেছে, শীঘ্রই রাজারা আসিতে আরম্ভ করিবেন। সুতরাং গুপ্তচর সম্প্রদায়ের ব্যস্ততার অন্ত নাই।

লম্বোদর প্রস্থান করিলে লক্ষ্মীকর্ণ কিছুক্ষণ একাকী বসিয়া তাম্বূল চর্বণ করিলেন। শিল্পাগারে রাজশিল্পী যে শিল্পকর্মটি আরম্ভ করিয়াছে রাজার মন সেইদিকে প্রক্ষিপ্ত হইল। শিল্পী কী করিতেছে তাহা রাজা ভিন্ন আর কেহ জানে না, শিল্পাগারে অন্য সকলের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু শিল্পীর কর্ম রাজার মনোমত হইতেছে না। তিনি ঠিক যাহা চান তাহা হইতেছে না।

শিল্পাগার রাজভবনেরই একটি অংশ। রাজা উঠিয়া শিল্পাগারের দিকে চলিলেন।

এই সময় অন্তঃপুরের এক দাসী আসিয়া নিবেদন করিল, অম্বিকা দেবী পুত্রকে স্মরণ করিয়াছেন। মহারাজ ভ্রূকুটি করিলেন, চক্ষু ঘূর্ণিত করিলেন ; তারপর বলিলেন—'দু'দণ্ড আগে মাতৃদেবীর চরণ দর্শন করেছি, আবার কী প্রয়োজন ? বল গিয়ে আমি রাজকার্যে ব্যস্ত আছি, পুনরায় মাতৃদেবীর চরণ দর্শন করবার অবকাশ নেই।'

গলার মধ্যে ঘুৎকার শব্দ করিয়া তিনি শিল্পাগার অভিমুখে চলিলেন।

তিন

অনঙ্গপাল লম্বোদরের গৃহে ফিরিয়া আসিল। ভৃত্য তাহার কক্ষে পেটরা পোট্টলি প্রভৃতি নামাইয়া রাখিলে তাহাকে কিছু পুরস্কার দিয়া বলিল—'আর্যকে বোলো আজ অপরাহ্ণে আমি আবার আসব।'

ভৃত্য প্রস্থান করিলে অনঙ্গ নিজ কক্ষের বাহিরে আসিয়া ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। গৃহে সাড়াশব্দ নাই। দাসী গৃহকর্ম সারিয়া প্রস্থান করিয়াছে, গৃহস্বামী এখনও ফিরিয়া আসে নাই ; গৃহিণী সম্ভবত পাকশালায় রন্ধনে ব্যস্ত। গৃহের এই নিরাবিলতার মধ্যে যেন একটি শান্তিপূর্ণ প্রসন্নতা আছে।

অনঙ্গ তখন আবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল, পেটরা খুলিয়া নিজ দ্রব্যসামগ্রী দিয়া ঘর সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল। নিজ ব্যবহার্য বস্ত্রাদির সঙ্গে ছিল কয়েকটি ক্ষুদ্র মৃৎপুত্তলি, রঙের পাত্র তুলিকা ইত্যাদি। দক্ষিণ দিকের গবাক্ষ খুলিয়া দিয়া অনঙ্গ শিল্পসামগ্রীগুলি তাহার নীচে মেঝেয় সাজাইয়া রাখিল। কিছু মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতে হইবে। এই গবাক্ষের নীচে বসিয়া সে নূতন মূর্তি গড়িবে।

অতঃপর আর কোনও কাজ নাই। জঠরে ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে দেখিয়া অনঙ্গ গামোছা কাঁধে ফেলিয়া নদীতে স্নান করিতে চলিল।

এখানে রেবার তীরে বাঁধা ঘাট নাই, কিন্তু উচ্চ পাড় ক্রমশ নিম্নগামী হইয়া নদীর জলে মিশিয়াছে। অনঙ্গ জলের কিনারায় নামিয়া আসিয়া এক তাল ভিজা মাটি হাতে তুলিয়া পরীক্ষা করিল। ভাল মাটি। কাঁকর নাই, ঈষৎ বালু মিশ্রিত লাল মাটি। এ মাটিতে ভাল মূর্তি গড়া যাইবে। অনঙ্গ নিশ্চিন্ত হইয়া নদীতে অবগাহন করিল।

ওদিকে বান্ধুলি ঘরে ফিরিয়াছিল। অতিথির ঘরের দ্বার বন্ধ রহিয়াছে। এখনও ঘুমাইতেছে নাকি? বান্ধুলি একটু ইতস্তত করিল, তারপর সন্তর্পণে কপাটের উপর করতল রাখিয়া অল্প ঠেলিল। দ্বার ঈষৎ খুলিল।

ভিতরে কেহ নাই, শয্যা শূন্য। কিন্তু জানলার নীচে ও কি! বান্ধুলি চমৎকৃত হইয়া গেল, নিজের অজ্ঞাতসারেই সে কক্ষে প্রবেশ করিল।

কী অপূর্ব মূর্তিগুলি! কোনটি লক্ষ্মীর মূর্তি, কোনটি সরস্বতীর; কার্তিক আছেন, গজানন আছেন; তাছাড়া বুদ্ধমূর্তি, যক্ষিণীমূর্তি। বিতস্তিপ্রমাণ মূর্তিগুলিতে বর্ণের সমাবেশই বা কি অপরূপ। সবগুলি যেন জীবন্ত।

বান্ধুলি কিছুক্ষণ উৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া রহিল, তারপর ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গৃহের পশ্চাদ্ভাগে পাকশালা বা রসবতী। বেতসী উনানে আঢ়কী দাল চড়াইয়া দর্বীদ্বারা মন্থন করিতেছিল, বান্ধুলি ছুটিয়া গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। বলিল—'ও দিদি, দেখবি আয়, দেখবি আয়। কি সুন্দর পুতুল!'

বেতসী কৌতূহলী হইয়া বলিল—'পুতুল! কোথায় পুতুল?'

'অতিথির ঘরে। শিগ্‌গির দেখবি আয়।' বলিয়া বান্ধুলি ফিরিয়া চলিল।

বেতসী দর্বী হাতে লইয়াই তাহার পিছন পিছন চলিল। চলিতে চলিতে বলিল—'অতিথি কি ফিরে এসেছে নাকি?'

'তা জানি না। ঘরে কেউ নেই।'

দুই ভগিনী অতিথির ঘরে প্রবেশ করিল। মূর্তিগুলি দেখিয়া বেতসীও মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কুম্ভকার রচিত স্থূল হাতি-ঘোড়া নয়, অপরূপ শিল্পকৃতি। বেতসী সংহতকণ্ঠে বলিল—'সত্যি সুন্দর। বণিক বোধহয় পুতুলের ব্যবসা করে।'

বান্ধুলি বলিল—'পাশে রঙ তুলি রয়েছে। হয়তো নিজেই মূর্তি গড়ে। কারুকর।'

বেতসী বলিল—'তাই হবে। তল্পিতল্পা নিয়ে ফিরেছে দেখছি। কিন্তু গেল কোথায়?'

পিছন হইতে শব্দ হইল—'এই যে আমি। নর্মদাতে স্নান করতে গিয়েছিলাম।'

দুইজনে ফিরিয়া দেখিল—অতিথি। তাহার গায়ে ভিজা গামোছা জড়ানো, এক হাতে সিক্ত বস্ত্রের পিণ্ড, অন্য হাতে এক দলা কাদা। দুই বোন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, বেতসী হাতের দর্বী পিছনে লুকাইল। অনঙ্গ কিন্তু লেশমাত্র অপ্রতিভ হইল না, মাটির দলা ভূমিতে রাখিয়া বলিল—'আমার পুতুল দেখছিলে? কেমন, ভাল নয়? এই কাদা এনেছি, আরও পুতুল গড়ব।'

দুই ভগিনী তির্যকভাবে দ্বারের দিকে চলিল। সেখানে পৌঁছিয়া বেতসী বলিল—'আমার রান্না তৈরি, এখনি দিচ্ছি।'

সে অদৃশ্য হইল। বান্ধুলিও তাহার অনুসরণ করিতেছিল, কিন্তু তৎপূর্বেই অনঙ্গ তাহাকে সম্বোধন করিল—'এই যে, তুমি রাজবাটী থেকে ফিরে এসেছ।'

বান্ধুলি জড়িতস্বরে বলিল—'হাঁ, দিদিরানী বললেন—'

অনঙ্গ বলিল—'আমি ভেবেছিলাম আজ রাত্রির আগে তোমার দেখা পাব না। দিদিরানী

কে ?'

বান্ধুলি বলিল—'বড় রাজকুমারী দেবী বীরশ্রী।'

'ও—বড় রাজকুমারীর নাম বীরশ্রী।—আর তোমার নাম কি ?'

বান্ধুলি থতমত খাইয়া বলিল—'বান্ধুলি।'

'বান্ধুলি !' অনঙ্গ ফিক করিয়া হাসিল—'সুন্দর নাম। আমার নাম কি জান ? মধুকর।'

বান্ধুলি প্রথমে শ্লেষটা ধরিতে পারে নাই। তারপর তাহার মুখে যেন আবীর ছড়াইয়া পড়িল। বান্ধুলি আর মধুকর—ফুল আর ভোমরা। সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া পলায়ন করিল। অতিথি হয়তো সরলভাবেই নিজের নাম বলিয়াছে, কিন্তু—

বান্ধুলি যখন রসবতীতে ফিরিয়া গেল তখন তাহার মুখে ভয়ভঙ্গুর হাসি লাগিয়া থাকিলেও বুক ঢিব ঢিব করিতেছে। বেতসী কিছু লক্ষ্য করিল না, থালিতে অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইতে সাজাইতে বলিল—'অতিথি লোকটি বেশ ভাল, না রে ?'

বান্ধুলি বলিল—'হুঁ। তুই রোগা শরীর নিয়ে নিজেই সব রেঁধেছিস !'

বেতসী বলিল—'আজ আমার শরীর অনেক ভাল। তুই ফিরে আসবি তা কি জানতাম ? তা এখনও তো অনেক কাজ বাকি, তুই কর না।'

'কি করব বল।'

'অতিথির ঘরে জল-ছড়া দিয়ে পিঁড়ি পেতে দে, ঘটিতে কর্পূর-দেওয়া খাবার জল দে, ঝারিতে আচমনের জল দে, মুখশুদ্ধির পান-সুপারি সাজিয়ে রাখ। কাজ কি একটা !'

বান্ধুলিও কাজে লাগিয়া গেল। ছোট পিতলের শরাবে পান-সুপারি সাজাইয়া রাখিয়া জলের ঘটি লইয়া অতিথির ঘরে গেল। পরম সংযতভাবে দেহের বস্ত্রাদি সম্বরণ করিয়া মেঝেয় জল-ছড়া দিল ; ঘরেই পিঁড়ি ছিল ; তাহা পাতিয়া দিয়া জলের ঘটি পাশে রাখিল। অনঙ্গ খট্টার পাশে বসিয়া সপ্রশংস নেত্রে দেখিতে লাগিল।

'তোমরা দুই বোন ভারি অতিথিবৎসলা।—গৃহস্বামী লম্বোদর ভদ্র এখনও আসেননি ?'

বান্ধুলি উত্তর দিবার পূর্বেই বেতসী থালা লইয়া প্রবেশ করিল, পীঠিকার সম্মুখে থালা রাখিয়া বলিল—'গৃহস্বামীর কি সময়ের জ্ঞান আছে। রাজভৃত্য যে। কখন আসেন কখন যান তা দৈবজ্ঞও বলতে পারে না।—আসুন।'

অনঙ্গ পীঠিকায় বসিল। আহার্য শুধু ঘৃত-তণ্ডুল নয় ; অড়রের দাল, শাক-শিম্বির ব্যঞ্জন, নিম্বের তিক্ত, তিন্তিড়ির অম্ল, দধি ও পর্পট। আহার্যগুলি পরিদর্শন করিয়া অনঙ্গ বলিল—'এ কি করেছ ভগিনী ! এত অন্ন-ব্যঞ্জনের প্রয়োজন ছিল না। সামান্য শাক-তণ্ডুলই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

বেতসী প্রীতা হইয়া বলিল—'সে কি কথা, আপনি অতিথি।—বান্ধুলি, পাখা নিয়ে আয়।'

বান্ধুলি তালবৃন্তের পাখা আনিয়া দিল, বেতসী সম্মুখে বসিয়া থালার উপর পাখা নাড়িতে লাগিল। অনঙ্গ আহারে মন দিল। বান্ধুলি তাম্বূলের শরাব হস্তে দ্বারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিবার পর বেতসী বলিল—'আপনি আমাকে ভগিনী বলে ডেকেছেন তাই জিজ্ঞাসা করতে সাহস করছি। আপনার দেশ কোথায় ভদ্র ?'

অনঙ্গ বলিল—'আমার দেশ বঙ্গ-মগধ। আমি পাটলিপুত্রে বাস করি।' বলিয়া লম্বোদরকে যেরূপ পরিচয় দিয়াছিল বেতসীকেও সেইরূপ দিল।

বেতসী জিজ্ঞাসা করিল—'পিতা-মাতা ? দার-কুটুম্ব ? সন্তান-সন্ততি ?'

'কেউ নেই। পৃথিবীতে আমি একা। তাই তো ভবঘুরের মত হেথা হোথা ঘুরে বেড়াই।'

বলিয়া অনঙ্গ সুগভীর নিশ্বাস মোচন করিল।

বেতসী সমবেদনাপূর্ণ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; বান্ধুলির চোখ ছলছল করিতে লাগিল। অনঙ্গ মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—'কিন্তু সংসারে কেঁদে কোনও লাভ নেই। আমি আমার শিল্পকলা নিয়ে আনন্দে আছি। তোমাদের মত সুখের সংসার যখন দেখি তখন ইচ্ছা হয় আবার সংসার পেতে বসি। পাটলিপুত্রে আমার ঘর-বাড়ি জমিজমা সব আছে, কেবল ভোগ করবার কেউ নেই।' বলিয়া বান্ধুলির দিকে বৈরাগ্যপূর্ণ কটাক্ষপাত করিল।

ক্রমে আহার করিতে করিতে অনঙ্গের মুখ আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল—'কি মিষ্টি তোমার হাতের রান্না ভগিনী। তোমার বোনও কি তোমার মত রাঁধতে পারে ?'

বেতসী বান্ধুলির দিকে তৃপ্তিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল—'পারে বইকি। তবে ও তো বেশি রাঁধে না, কুমারী যৌবনশ্রীর কাছে থাকে। ক্রমে শিখবে।'

আহারান্তে বান্ধুলির হাত হইতে পান লইয়া অনঙ্গ বলিল—'আমি এখন দু'দণ্ড বিশ্রাম করব, তারপর উঠে মূর্তি গড়তে আরম্ভ করব। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও গিয়ে।'

বেতসী ও বান্ধুলি রসবতীতে গিয়া আহারে বসিল, আহার করিতে করিতে পরস্পরের পানে স্মিত চকিত কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। অজ্ঞাত অখ্যাত শিল্পী কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের জীবনে রঙ ফলাইতে আরম্ভ করিয়াছে ; যে বীজ মাটির তলে অনাদৃত পড়িয়া ছিল তাহা অলক্ষিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে। আশা—অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট আশা ; তবু বেতসীর কাছে তাহা যেন নব-জীবনের সঞ্জীবনমন্ত্র। আশা মানুষের মনে যে বর্ণাঢ্য চিত্র আঁকিতে পারে মর্ত্য শিল্পীর তাহা সাধ্যাতীত।

বেতসী ও বান্ধুলি আহার শেষ করিয়া উঠিলে লম্বোদর ফিরিল। ঝড়ের মত আসিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিল, বলিল—'শিগ্‌গির খেতে দাও, এখনি আবার বেরুতে হবে।'

বান্ধুলি তাড়াতাড়ি অন্ন-ব্যঞ্জন আনিয়া দিল। বেতসী পাশে বসিয়া তাহার গায়ে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। সঙ্কুচিতস্বরে বলিল—'একটু বিশ্রাম করবে না ?'

'সময় নেই' বলিয়া লম্বোদর গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল। তাহার মন বাহিরে কাজের দিকে পড়িয়া ছিল ; তবু সে অনুভব করিল গৃহে যেন কিছু ভাবান্তর ঘটিয়াছে। আহার্যের বৈচিত্র্য কিছু বেশি। সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া বেতসীর পানে চাহিল ; প্রত্যুত্তরে বেতসী একটু হাসিল। লম্বোদর আবছায়াভাবে মনের মধ্যে একটু বিস্ময় অনুভব করিল।

খাওয়া শেষ করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতে করিতে লম্বোদর বলিল—'অতিথি খেয়েছে ?'

বেতসী তাহার হাতে পান দিয়া বলিল—'হাঁ। অতিথি নিজের তল্পিতল্পা নিয়ে এসেছে, এখন আহারের পর বিশ্রাম করছে।'

'ভাল।' আর কোনও কথা হইল না। লম্বোদর একবার বান্ধুলির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, যেন প্রথম তাহাকে লক্ষ্য করিল। তারপর মুখে পান পুরিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করিল।

দুই বোন পরস্পর চাহিয়া হাসিল। লম্বোদরের এমনই স্বভাব। যখন ঘরে আসে মনটা বাহিরে রাখিয়া আসে।

বেতসী আজ অত্যধিক পরিশ্রম করিয়াছিল, সে এবার নিজ শয্যায় আশ্রয় লইল। বান্ধুলিকে বলিল—'আমি শুলাম, সন্ধ্যার আগে আর উঠছি না। তুই অতিথির দেখাশুনা করিস।'

'আচ্ছা' বলিয়া বান্ধুলি কিছুক্ষণ সেখানে ঘোরাঘুরি করিল, তারপর নিজের ঘরে গেল। দরজা একটু ফাঁক করিয়া রাখিয়া শয্যার পাশে বসিল। বালিশের তলে অশ্বত্থপত্রের আকারের একটি ক্ষুদ্র রূপার আদর্শ ছিল, সেটি মুখের সামনে ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল ; শুধু নিজের চোখ দিয়া নয়, যেন আর একজনের চক্ষু দিয়া নিজেকে দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু

সেই সঙ্গে তাহার কান বাহিরের দিকে সতর্ক হইয়া রহিল।

অনঙ্গ আহারের পর শয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মস্তিষ্কের মধ্যে সূক্ষ্ম চিন্তার সূত্র লূতা-জাল বুনিতেছিল—মেয়েটা দেখিতে বড় সুন্দর, দেখিলেই লোভ হয়...কিন্তু তাহার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া বেশি অগ্রসর হওয়া যায় না...বোধহয় ভারি সরলা...কিন্তু যে মেয়েরা অহরহ রাজকন্যার পার্শ্বে বিচরণ করে তাহারা কি সরল হইতে পারে?...রাজপুরীতে নিরন্তর প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা কৈতব চক্রান্ত, চক্রের মধ্যে চক্র...বান্ধুলি...নামটি যেন মধুক্ষরা...

দুই দণ্ড ঝিমাইয়া অনঙ্গ উঠিয়া বসিল। এবার মূর্তি গড়া আরম্ভ করিতে হইবে; পাটলিপুত্র ত্যাগ করার পর আর সে মূর্তি গড়ে নাই; মন বুভুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঘরে জল নাই। সে উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিল, মুণ্ড বাড়াইয়া দেখিল অলিন্দে কেহ নাই। তখন সে গলা ঝাড়া দিয়া বলিল—'এহ্‌ম্—!'

বান্ধুলি নিজ কক্ষের দ্বার হইতে মুণ্ড বাহির করিয়া চাহিল। দু'জনের চোখাচোখি হইল, অধরে অনাহূত হাসি খেলিয়া গেল। অনঙ্গ বলিল—'একটু জল চাই।'

বান্ধুলি ঘাড় নাড়িল, তারপর ত্বরিতে রসবতী হইতে শীতল জল লইয়া অতিথির কক্ষে উপস্থিত হইল।

অনঙ্গ বান্ধুলির হাত হইতে ঘটি লইয়া কিছু জল আলগোছে গলায় ঢালিল, তারপর জানালার সম্মুখে গিয়া বসিল। ঘটির জলে দুই হাত ভিজাইয়া মাটির পিণ্ডটা তুলিয়া লইল, দুই হাতে তাহা চট্‌কাইতে লাগিল। বান্ধুলি ঘর হইতে চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল, কিন্তু বেশি দূর যাইতে পারিল না, দ্বার পর্যন্ত গিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল। অনঙ্গ আড়চোখে তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—'তোমার যদি অন্য কাজ না থাকে তুমি বসে আমার কাজ দেখ না।'

এই আমন্ত্রণটুকু বান্ধুলি লোলুপমনে কামনা করিতেছিল। শিল্পী কেমন করিয়া মূর্তি গড়ে তাহা জানিবার জন্য তাহার ঔৎসুক্যের সীমা ছিল না। সে দ্বিরুক্তি না করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং অনঙ্গ হইতে কিছু দূরে একপাশে হাঁটু মুড়িয়া বসিল।

অনঙ্গ কাদা থাসিতে থাসিতে হাস্যমুখে বলিল—'কী মূর্তি গড়ব বলো?'

বান্ধুলি সলজ্জে চক্ষু নত করিল—'আমি জানি না।'

অনঙ্গ আর কিছু বলিল না, নিপুণ অঙ্গুলি দিয়া মৃৎপিণ্ড গড়িতে আরম্ভ করিল। বান্ধুলির মুখের দিকে তাকায় আর গড়ে। তারপর তালপত্রের ক্ষুরিকা দিয়া সন্তর্পণে মাটি চাঁছিয়া ফেলে। বান্ধুলিও কৌতূহলী চক্ষে চাহিয়া থাকে, কিন্তু অনঙ্গের অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে কী বস্তু প্রস্তুত হইতেছে তাহা ধরিতে পারে না। শিল্পীর কর্মতৎপর অঙ্গুলিগুলির দিক হইতে তাহার উৎসুক দৃষ্টি শিল্পীর মুখের দিকে সঞ্চারিত হয়, আবার অঙ্গুলির দিকে ফিরিয়া আসে। তাহার মনে হয় যেন সে চতুর মায়াবীর ইন্দ্রজাল দেখিতেছে।

অবশেষে অনঙ্গ মৃৎপিণ্ডটি বান্ধুলির মুখের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'কার মুখ চিনতে পারো?'

বান্ধুলি রুদ্ধশ্বাসে দেখিল, তাহারই মুখ। নাক চোখ কপাল গণ্ড, কোনও প্রভেদ নাই। ভিজা মাটিতে তাহার মুখের ডৌল অবিকল ফুটিয়াছে। সে ব্যগ্রবিহ্বল কণ্ঠে বলিল—'আমি!'

অনঙ্গ হাসিতে হাসিতে মুখখানাকে আবার নিরবয়ব মৃৎপিণ্ডে পরিণত করিল, বলিল—'ভাল হয়নি। পরে তোমার মুখ আবার ভাল করে গড়ব।'

বান্ধুলি সম্মোহিতের ন্যায় বসিয়া দেখিতে লাগিল। অনঙ্গ তাল-সদৃশ মৃৎপিণ্ডকে তিন ভাগ করিয়া ছোট ছোট মূর্তি গড়িতে আরম্ভ করিল। এবার শুধু মুখ নয়, পূর্ণাবয়ব মূর্তি। গড়িতে

গড়িতে অনঙ্গ লঘুকণ্ঠে আলাপ করিতে লাগিল।

'আমার গড়া পুতুল তোমার ভাল লেগেছে?'

'এত সুন্দর পুতুল—' বান্ধুলির কথা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

'আমার পুতুল রাজকুমারীদের ভাল লাগবে?'

'খুব ভাল লাগবে। এমন চমৎকার পুতুল রাজকুমারীরাও দেখেননি।'

অনঙ্গ কিছুক্ষণ নীরবে কাজ করিল, তারপর বলিল—'আমি একটি ভাল পুতুল তৈরি করে তোমাকে দেব, তুমি সেটি রাজপুরীতে নিয়ে গিয়ে কুমার-ভট্টারিকাদের দেখাতে পারবে?'

বান্ধুলি সাগ্রহে বলিল—'পারব। ওঁরা দেখলে খুব প্রীতা হবেন। কবে আপনি পুতুল তৈরি করে দেবেন?'

তাহার আগ্রহ দেখিয়া অনঙ্গ হাসিল। সত্যই মেয়েটা সরলা। সে বলিল—'পুতুল তৈরি করে তাকে আগুনে পোড়াতে হবে, তারপর রঙ রসান চড়াতে হবে। দুই তিন দিন লাগবে।'—

এইভাবে তিন চারি দণ্ড কাটিয়া গেল। বান্ধুলির জড়তা ক্রমে কাটিয়া যাইতে লাগিল। অপরাহ্ণকাল উপস্থিত হইলে অনঙ্গ কাজ বন্ধ করিয়া উঠিল। বলিল—'আমাকে একবার বেরুতে হবে। সন্ধ্যার আগেই ফিরব।'

চার

বিগ্রহপাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অনঙ্গ উপস্থিত হইলে দুইজনে অশ্বক্রয়ের জন্য বাহির হইলেন। পদব্রজে চলিলেন; একজন ঘোড়াডোম কম্বল বল্‌গা প্রভৃতি পর্যয়ণ লইয়া তাঁহাদের পথ দেখাইয়া চলিল।

নগরের পশ্চিম প্রান্তে যেখানে লোকালয় শেষ হইয়া মাঠ আরম্ভ হইয়াছে সেইখানে বিস্তীর্ণ স্থান ঘিরিয়া ঘোড়ার আগড়। প্রায় ছয়-সাত শত অশ্ব এই বংশ-বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ আছে; অধিকাংশ অশ্বই মুক্ত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কয়েকটি বাঁধা আছে। লাল কালো সাদা নানা বর্ণের উৎকৃষ্ট তেজস্বী অশ্ব।

আগড়ের প্রবেশদ্বারের পাশে একটি শ্বেতবর্ণ বড় পট্টাবাস। তাহার চারিধারের যবনিকা খোলা রহিয়াছে; মাটিতে পুরু আস্তরণ পাতা। তিন চারিজন মানুষ বসিয়া আছে।

মানুষগুলিকে দেখিলেই চমক লাগে। যেমন তাহাদের বেশবাস, তেমনই আকৃতি। বিগ্রহ এবং অনঙ্গ নিকটবর্তী হইলে তাহারা পট্টাবাসের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই দীর্ঘাঙ্গ, প্রাণসার মেদবর্জিত দেহ। পরিধানে আগুল্‌ফলম্বিত অঙ্গাবরণ মধ্যদেশে নীল কটিবন্ধ দ্বারা সম্বৃত; মস্তকে অবগুণ্ঠনের ন্যায় আচ্ছাদন পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কেবল মুখমণ্ডল অনাবৃত রহিয়াছে। মুখের বর্ণ যেমন তুষার-গৌর, মুখাস্থির গঠন তেমনি মর্মরদৃঢ়। নাসা তীক্ষ্ণোচ্চ, গণ্ড ও চিবুকের চর্ম অল্প কেশাবৃত। ইহারা যে ভারতবর্ষের লোক নয় তাহা ইহাদের দর্শনমাত্রেই বুঝিতে পারা যায়।

ইহাদের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্থ ব্যক্তি ছিল, বিগ্রহ ও অনঙ্গ সম্মুখীন হইলে সে নিজে বুকের কাছে মুক্ত করতল তুলিয়া অভিবাদন করিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা অবহট্ট ভাষায় বলিল—'শান্তি হোক। আপনারা ঘোড়া কিনতে এসেছেন? আদেশ করুন।'

বিগ্রহ কিছুক্ষণ উৎসুক নেত্রে তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'হাঁ, আমরা ঘোড়া কিনতে এসেছি। আপনারা কোন্ দেশের লোক?'

বয়স্ক ব্যক্তির চোখের দৃষ্টি সতর্ক হইল। সে গম্ভীরমুখে বলিল—'আমরা আরব দেশের সওদাগর—বণিক।'

বিগ্রহ বলিলেন—'আরব দেশ—সে কোথায় ?'

বণিক পশ্চিমদিকে বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল—'এই দিকে। অনেক দূরে। বহু নদী পাহাড় মরুভূমি পার হয়ে যেতে হয়।'

'ভাল। আমরা দুটি উৎকৃষ্ট ঘোড়া কিনতে চাই।'

'আমার সব ঘোড়াই উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ঘোড়া নেই। আরব দেশ থেকে নিকৃষ্ট ঘোড়া আনলে আমাদের পোষায় না।'

'ভাল। ঘোড়া দেখান।'

বণিক তখন বলিল—'আর একটা কথা। আমরা ঘোড়ার দাম সোনা ছাড়া অন্য কোনও মুদ্রায় নিই না।'

বিগ্রহ বলিলেন—'সোনাই পাবেন।'

অনঙ্গ এতক্ষণ নীরব ছিল, নীরবে এই বিদেশী বণিকদের পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, ইহাদের ভাবভঙ্গি বাহ্যত বণিকজনোচিত হইলেও সম্পূর্ণ সহজ ও স্বাভাবিক নয়। ইহারা সম্বৃতমন্ত্র ও সতর্ক, যেন সর্বদাই নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ঘোড়া বিক্রয় করাই ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

অনঙ্গ বলিল—'সোনা ছাড়া অন্য মুদ্রা নেবেন না এর কারণ কি ? অন্য ব্যবসায়ীরা তো নিয়ে থাকেন।'

বণিক চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ অনঙ্গকে দেখিল—'হিন্দুস্তান স্বর্ণপ্রসূ, আরব দেশে সোনা নেই। উপরন্তু সোনা নিয়ে যাবার সুবিধা।'

অনঙ্গ বলিল—'তা বটে। আপনারা কি ভারতবর্ষের সর্বত্র যাতায়াত করেন ?'

এই সময় বণিকের পাশের এক ব্যক্তি অবোধ্য ভাষায় কিছু বলিল ; বণিক তাহার উত্তর না দিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল—'আমরা অশ্ব-বণিক, অশ্ব বিক্রয় করবার জন্যই দেশ ছেড়ে এখানে আসি এবং যেখানে অশ্ব বিক্রয়ের সম্ভাবনা দেখি সেখানে যাই। সব অশ্ব বিক্রয় হলে দেশে ফিরে যাই।'

'প্রতি বৎসর আসেন ?'

'দুই তিন বৎসরে আসি।'

'উত্তম। এবার অশ্ব দেখান।'

'আসুন।'

অর্গল খুলিয়া সকলে বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অশ্বগুলি এতক্ষণ যথেচ্ছা বিচরণ করিতেছিল, এখন তাহাদের মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। যাহারা দূরে ছিল তাহারা মনোরম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া ফিরিয়া তাকাইল। নিকটস্থ অশ্বগুলি কিছুক্ষণ ব্যায়তনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের কাছে আসিতে লাগিল ; কেহ কেহ নাসামধ্যে মৃদু হর্ষধ্বনি করিল। যে ঘোড়াগুলি বাঁধা ছিল—বোধহয় বণিকদের নিজস্ব ব্যবহারের ঘোড়া—তাহারা পদদাপ করিয়া আগ্রহ জ্ঞাপন করিল।

কয়েকটি ঘোড়া কাছে আসিলে বণিক মুখে একপ্রকার শব্দ করিল, ঘোড়াগুলি সঙ্গে সঙ্গে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া পড়িল। বণিক মুখে আর একপ্রকার শব্দ করিল, ঘোড়াগুলি তিন কদম পিছু সরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বণিক বলিল—'শিক্ষিত ঘোড়া। মানুষের মত বুদ্ধিমান, যা শেখাবেন তাই শিখবে।'

বিগ্রহ ও অনঙ্গ মুগ্ধভাবে ঘোড়াগুলির পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহাদের যেমন সুঠাম আকৃতি, চোখের দৃষ্টিতে তেমনই বুদ্ধি জ্বলজ্বল করিতেছে। সহসা অনঙ্গ একটি দুগ্ধশুভ্র অশ্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—'দেখ্ দেখ্, ওর নাক দিয়ে যেন দিব্যজ্যোতি বেরুচ্ছে!'

বিগ্রহ হাসিয়া বলিলেন—'বেশ, তুই ওটা নে, নাম রাখিস দিব্যজ্যোতি।'

অনঙ্গ বলিল—'না, তুই ওটা নে।'

'বেশ।' বলিয়া বিগ্রহ শ্বেত অশ্বটির কাছে গেলেন। তাহার কপালে হাত রাখিতেই সে স্নেহভরে হ্রেষাধ্বনি করিল।

বণিক বলিল—'আপনাকে ও প্রভু বলে স্বীকার করেছে। স্বীকার না করলে মুখ ফিরিয়ে নিত।'

বিগ্রহ বলিলেন—'ওর দিব্যজ্যোতি নামই রইল।—অনঙ্গ, তুই এবার নিজের ঘোড়া পছন্দ কর।'

'আমি এই লাল ঘোড়াটা নিলাম' বলিয়া অনঙ্গ একটি পাটলবর্ণ অশ্বের গ্রীবায় হাত রাখিল। অশ্ব মুখ ফিরাইয়া লইল না, বরং অনঙ্গের দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া নাসামধ্যে আনন্দধ্বনি করিল।

বিগ্রহ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি নাম রাখবি?'

অনঙ্গ বলিল—'রোহিতাশ্ব।'

অতঃপর বণিককে অশ্বের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—'সাদা ঘোড়ার দাম দশ স্বর্ণ-দীনার, লাল ঘোড়ার দাম আট স্বর্ণ-দীনার।'

বিগ্রহ প্রশ্ন করিল—'দামে তফাৎ কেন?'

বণিক বলিল—'সাদা ঘোড়া রাজাদের বাহন, তাই দাম বেশি।'

তখন ঘোড়া দুটির মুখে বল্‌গা লাগাইয়া বেষ্টনীর বাহিরে আনা হইল। ঘোড়াডোম তাহাদের পিঠে পর্যয়ণ বাঁধিয়া দিল। বণিককে অশ্বের মূল্য দিয়া দুই বন্ধু ঘোড়ার পিঠে উঠিলেন।

এই সময় সূর্য দিগন্তরেখা স্পর্শ করিয়াছে। বণিক তাহা দেখিয়া একজন সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিল; সঙ্গী পট্টাবাসের ভিতর হইতে একটি পট্টিকা আনিয়া মুক্ত আকাশের তলে বিছাইয়া দিল; তারপর সকলে তাহার উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইল। বিগ্রহ ও অনঙ্গ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন তাহারা এক বিচিত্র প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে। সকলে একসঙ্গে নতজানু হইতেছে, মাটিতে মাথা ঠেকাইতেছে, উরুতে হাত রাখিয়া ন্যুব্জ হইয়া দাঁড়াইতেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটস্বরে অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র পড়িতেছে।

অনঙ্গ ও বিগ্রহ বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। ঘোড়াডোমটা বোধহয় এই বিদেশীদের আচার-ব্যবহার অবগত ছিল, সে চুপিচুপি বলিল—'ওরা পূজা করছে।'

পূজা! এ কি রকম পূজা? ফুল নাই, নৈবেদ্য নাই—পূজা! কিছুক্ষণ ইহাদের ক্রিয়া-কলাপ নিরীক্ষণ করিয়া বিগ্রহ ও অনঙ্গ ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া তাহাদের নগরের দিকে চালিত করিলেন। ঘোড়া দুটি কপোত-সঞ্চারী গতিতে যেন উড়িয়া চলিল।

চলিতে চলিতে অনঙ্গ একসময় বলিল—'বণিকদের ভাবগতিক খুব স্বাভাবিক নয়।'

বিগ্রহ বলিলেন—'বিদেশীদের আচার-আচরণ অস্বাভাবিক মনে হয়।'

'আমি তা বলছি না। ঘোড়ার ব্যাপার করাই ওদের প্রধান উদ্দেশ্য মনে হয় না।'

'প্রধান উদ্দেশ্য তবে কী?'

'হয়তো গুপ্তচর বৃত্তি। পশ্চিমে বিধর্মী বর্বরজাতি ঢুকছে। এরা তাদের চর হতে পারে।'

বিগ্রহ হাসিয়া উঠিলেন—'তোর মন বড় সন্দিগ্ধ। সে যাক, এদিকের সংবাদ কি বল। তোর গৃহস্বামীর শ্যালিকাটি কি বেশ নাদুস নুদুস?'

অনঙ্গ বলিল—'নাদুস নুদুস নয়— ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা।'*

দুই বন্ধু তখন হাস্য পরিহাসের ফাঁকে ফাঁকে কাজের কথা আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন।

পাঁচ

তারপর একটি একটি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। নব-বসন্ত যেন একটি একটি করিয়া তাহার শতদল উন্মোচন করিতেছে।

কিন্তু বসন্তের এই নবোন্মীলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি নাই। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ অতিশয় ব্যস্ত। একদিকে স্বয়ংবর সভা নির্মাণ, অন্যদিকে প্রত্যাসন্ন রাজবৃন্দ ও তাঁহাদের পরিজনবর্গের জন্য স্কন্ধাবার মণ্ডপ রচনা, রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্য নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুক নৃত্যগীত বিলাসব্যসনের ব্যবস্থা। নর্মদার তীর ধরিয়া বস্ত্রনগরী গড়িয়া উঠিতেছে। লক্ষ্মীকর্ণ সমস্ত কার্য পরিদর্শন করিতেছেন, আবার চুপি চুপি শিল্পশালায় গিয়া গুপ্ত শিল্পকার্য দেখিয়া আসিতেছেন। শিল্পীকে ধমক দিতেছেন, মন্ত্রীদের তাড়না করিতেছেন, কর্মীদের গালাগালি দিতেছেন। কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই।

লম্বোদর ও তাহার অধীনস্থ চরগণও ব্যস্ত। তাহারা যেন সহস্রাক্ষ হইয়া চারিদিকে বিচরণ করিতেছে। কোন্ বণিক বিদিশা হইতে বিক্রয়ার্থ বহুসংখ্যক অসি আনিয়াছে, তাহার উপর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বিদিশার অসি অতি বিখ্যাত, এ অসি হাতে পাইলে কাপুরুষও সিংহ হয়। ওদিকে উজ্জয়িনী হইতে এক দল নট-নটী আসিয়া নগরের এক রম্যোদ্যানে আসর বাঁধিয়াছে; দলে দলে নাগরিকেরা কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র ভবভূতির উত্তররাম মালতীমাধব বিশাখাদত্তের মুদ্রারাক্ষস অভিনয় দেখিতে যাইতেছে। কিন্তু যাযাবর নট-সম্প্রদায় সর্বকালেই রাজপুরুষদের সন্দেহভাজন, ইহাদের কোনও গোপন অভিসন্ধি আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। লম্বোদর দ্বিপ্রহরে কখনও ঘরে আসে কখনও ঘরে আসে না; রাত্রিটুকু কোনও মতে ঘরে কাটাইয়া প্রভাত হইতে না হইতে চলিয়া যায়।

রাজপুরীর অবরোধ অংশে কিন্তু তেমন ব্যস্ততা নাই। ভরা নদীর মাঝখান দিয়া যখন খরস্রোত প্রবাহিত হয় নদীর দুই তীরে তখন সামান্য আবর্ত মাত্র দেখা যায়। বীরশ্রী ভগিনীকে লইয়া প্রত্যহ মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিতে যান, এ ছাড়া অন্য কোনও তৎপরতা নাই। যৌবনশ্রীর আচরণ পূর্বের মতই ধীর ও শান্ত; কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় চোখ দুটিতে যেন একটু চাঞ্চল্যের আবির্ভাব হইয়াছে। চোখ দুটি যেন সর্বদাই চকিত হইয়া আছে। যৌবনশ্রী মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু বীরশ্রী তাঁহার চোখের প্রশ্ন শুনিতে পান—আবার কবে দেখা হবে? বীরশ্রী স্বামীকে গিয়া খোঁচা দেন—কোথায় গেল বিগ্রহ? তার সন্ধান নিতে হবে না?—জাতবর্মা কী উপায়ে বিগ্রহপালের সন্ধান করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া শ্বশুরকে গিয়া বলিলেন—আমি নগরভ্রমণে যাব। শ্বশুর বলিলেন—ভাল, দশজন পার্শ্বচর রক্ষী সঙ্গে দিচ্ছি। জাতবর্মা হতাশ হইয়া পুনরায় অবরোধে ফিরিয়া আসেন। দশজন সঙ্গী লইয়া বিগ্রহপালকে খুঁজিতে বাহির হইলে নগরে কাহারও জানিতে বাকি থাকিবে না, সর্বাগ্রে শ্বশুর মহাশয় জানিতে

* স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্যা নিতম্বে চ বিশালতা।
মধ্যে ক্ষীণা ভবেদ যা সা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা॥

পারিবেন। অণ্ড দ্রব হইয়া যাইবে।

রন্তিদেবের গৃহে বিগ্রহপালও ছটফট করিতেছেন। তীরে আসিয়াও তরী ঘাটে ভিড়িতেছে না। একবার দেখিয়া যাহার মূর্তি চিত্তপটে আঁকা হইয়া গিয়াছে সে যেন ছলনা করিয়াই আবার দেখা দিতেছে না। বিগ্রহপালের উষ্ণ নিশ্বাসে রন্তিদেবের গৃহমারুত আতপ্ত হইয়া উঠিল।

লম্বোদরের গৃহে কিন্তু শীতল মলয়ানিল বহিতেছিল, গৃহে যেন প্রচ্ছন্ন উৎসবের ছোঁয়া লাগিয়াছিল। অনঙ্গ নদীর ঘাট হইতে পাকা রুই মাছ আনিয়া রাই-সরিষার ঝাল রাঁধিয়া বেতসী ও বান্ধুলিকে খাওয়াইয়াছে। বেতসীর দেহ-মন হিমশীর্ণা লতার ন্যায় কিশলয়-রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। এখনও বাহিরে কিছু দেখা যায় না ; কিন্তু তাহার প্রাণে আশা জাগিয়াছে, আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, জীবনের শত ক্ষুদ্র সুখ ভোগ করিবার স্পৃহা জন্মিয়াছে। অনঙ্গ কি ইন্দ্রজাল জানে ? কেবলমাত্র তাহার আবির্ভাবেই যেন বেতসীর জীবনের নিম্নগামী ধারা অবরুদ্ধ হইয়াছে।

আর বান্ধুলি ? যেন জন্মান্ধ যুবতী হঠাৎ একদিন প্রভাতে চক্ষু মেলিয়া রূপরসময়ী ধরিত্রীকে দেখিতে পাইয়াছে ! যেমন বিস্ময় তেমনি আনন্দের অবধি নাই। একদিন ছিল যখন অবস্থাবশে লম্বোদরকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল না ; কিন্তু এখন তাহাকে কুচিকুচি করিয়া কাটিলেও সে অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। একজন মানুষ কোথা হইতে আসিয়া তাহার মনের কৌমার্য হরণ করিয়া লইয়াছে। যাহাকে প্রথম দর্শনে বুকের মধ্যে হাসির উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল সে ছাড়া পৃথিবীতে অন্য পুরুষ নাই, দেহ মন সমস্তই তাহার মধ্যে একাকার হইয়া গিয়াছে।

অনঙ্গ আপন মনে মূর্তি গড়ে, বান্ধুলি অদূরে বসিয়া দেখে। কখনও শিল্পকর্মের দিকে চাহিয়া থাকে, কখনও শিল্পীর পানে। অনঙ্গ সহসা চোখ তুলিলে চোখে চোখ ধরা পড়িয়া যায়। বান্ধুলি মুখ ফিরাইয়া হাসে। অনঙ্গ বলে—'তুমি আমাকে দেখে হাসো কেন বল দেখি ? আমি কি সঙ ?'

বান্ধুলি উত্তর দেয় না, নড়িয়া চড়িয়া বসে ; তাহার অধরে হাসি আরও গাঢ় হয়।

বেতসী প্রবেশ করিয়া বলে—'মধুকর-ভাই, তোমার পুতুল কেমন হল দেখি।—ওমা, কী সুন্দর !'

এই তিনজনের মধ্যে একটি রস-নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, লম্বোদর তাহার কোনও খবরই রাখে না। বেতসী অনঙ্গকে মধুকর-ভাই বলিয়া ডাকে, অনঙ্গ বেতসীকে বলে বহিন। বান্ধুলিকে সে নাম ধরিয়া ডাকে, বান্ধুলি অনঙ্গকে নাম ধরিয়া ডাকে না, সম্বোধনটা এড়াইয়া যায়।

বেতসী প্রশ্ন করে—'এ কার মূর্তি ভাই ?'

অনঙ্গ বলে—'অনঙ্গ-বিগ্রহ।'

বিতস্তিপ্রমাণ মূর্তি। হাতে ধনুর্বাণ, আকুঞ্চিত-সব্যপাদ হইয়া তীর ছুঁড়িতেছে। অতি নিপুণ সূক্ষ্ম কারুকলায় মূর্তিটি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মূর্তিটি গড়িতে অনঙ্গের তিনদিন লাগিল। মূর্তি প্রস্তুত হইলে তাহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া পরে আগুনে পোড়ানো হইল। তিনজনে মিলিয়া পোড়াইল। উদ্যানে মূর্তিটি শুকনা পাতার উপর রাখিয়া সযত্নে খড় ও পাতা দিয়া ঢাকা হইল, তারপর সন্তর্পণে তাহার উপর জ্বালানি কাঠ চাপা দেওয়া হইল। বেতসী প্রদীপের পলিতা দিয়া তাহাতে আগুন দিল।

তিন ঘটিকা পুড়িবার পর আগুন নিভিলে ভস্মের ভিতর হইতে মূর্তি বাহির করা হইল। মূর্তি অটুট আছে এবং পুড়িয়া পাটল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। তিনজনে শোভাযাত্রা করিয়া মূর্তি ঘরে লইয়া গেল।

অনঙ্গ মৃন্মূর্তির চোখ মুখ আঁকিল, পাদপীঠে লিখিল—অনঙ্গ-বিগ্রহ। রঙ রসান চড়াইয়া

মূর্তিটি করতলের উপর তুলিয়া ধরিয়া বলিল—'কেমন হয়েছে ? রাজকুমারীদের পছন্দ হবে ?'

বান্ধুলির চোখ আনন্দে মুদিত হইয়া আসিল ; বেতসী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। —

বেতসীর উচ্ছ্বাস কমিলে বান্ধুলি ধরা-ধরা গলায় বলিল—'মূর্তি রাজবাটীতে নিয়ে যাই ?'

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—'বেশ তো। রাজকুমারীরা যদি জানতে চান বোলো পাটলিপুত্রের কারিগরের তৈরি।'

অপরাহ্নে বান্ধুলি রাজবাটীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। মূর্তিটি অতি যত্নে তুলায় মুড়িয়া উত্তরীয়ের প্রান্তে বাঁধিয়া লইল।

দুই রাজকুমারী সেদিন দ্বিপ্রহরে নগরের কয়েকটি মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন, বৈকালে ফিরিয়া একরাশ ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে বসিয়াছিলেন। বীরশ্রী ফন্দি করিয়াছিলেন, একটি বরমাল্য গাঁথিবেন, তারপর বরমাল্যটি যৌবনশ্রীর হাতে দিয়া দুই ভগিনী একযোগে জাতবর্মাকে আক্রমণ করিবেন, বলিবেন—ভাল চাও তো শীঘ্র বিগ্রহপালকে খুঁজে বার কর, নইলে যৌবনশ্রী তোমার গলাতেই বরমাল্য দেবে। তখন বিপাকে পড়িয়া জাতবর্মা নিশ্চয় একটা কিছু ব্যবস্থা করিবেন। শ্বশুরবাড়ি আসিলে সব জামাতাই অলস ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, জাতবর্মাকে খোঁচা না দিলে তিনি কিছু করিবেন না।

যৌবনশ্রী দিদির সহিত পারিয়া ওঠেন না, নিতান্ত ছেলেমানুষী জানিয়াও তিনি সম্মত হইয়াছেন। মালা গাঁথা হইতেছে।

মালা গাঁথিতে গাঁথিতে বীরশ্রী বলিলেন—'কিন্তু যৌবনা, ও যদি সত্যি তোর মালা নেয় তখন কি হবে ?'

যৌবনশ্রী মুখ টিপিয়া হাসিলেন। দিদির সহবাসে তাঁহার একটু মুখ ফুটিয়াছে, বলিলেন—'তখন বলব, ও মালা আমার নয়, দিদি গেঁথেছে।'

'যদি তাতেও না শোনে ?'

'তখন তুমি সামলাবে।'

বীরশ্রী বলিলেন—'মন্দ কথা নয়। তুই মালা হাতে নিয়ে যাবি, আর আমি যাব মুগুর হাতে নিয়ে। যদি গণ্ডগোল করে মাথায় এক ঘা।'

কিন্তু যুবতীদ্বয়ের মন্ত্রণা কার্যে পরিণত করিবার প্রয়োজন হইল না, এই সময় বান্ধুলি আসিয়া উপস্থিত হইল।

বীরশ্রী বলিলেন—'কি রে বান্ধুলি, তোর অতিথির খবর কি ?'

বান্ধুলি সলজ্জ উত্তেজনা চাপিয়া কাছে আসিয়া বসিল, একটু হাঁপাইয়া বলিল—'দিদিরানী, একটা জিনিস এনেছি। দেখবে ?'

বীরশ্রী বললেন—'কী জিনিস ? তোর অতিথিকে আঁচলে বেঁধে এনেছিস নাকি ?'

বান্ধুলি উত্তরীয়ের বাঁধন খুলিয়া মূর্তি বাহির করিল, বীরশ্রী তাহা হাতে লইয়া বলিলেন—'ওমা, এ যে আমার শ্বশুরবাড়ির দেশের কারুকলা ! এ তুই কোথায় পেলি ?'

বান্ধুলি সবিভ্রম ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—'অতিথি গড়েছে।'

'সত্যি ? তোর অতিথি তো ভারি গুণী লোক—' এই পর্যন্ত বলিয়া বীরশ্রী থামিয়া গেলেন। তাঁহার চোখ পড়িল মূর্তির পাদপীঠে ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা আছে—অনঙ্গ-বিগ্রহ।

মদনমূর্তির নীচে অনঙ্গ-বিগ্রহ লেখা থাকিলে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই ; কিন্তু অনঙ্গ এবং বিগ্রহ দুইটা নামই বীরশ্রীর পরিচিত। তিনি চকিতে একবার বান্ধুলির মুখের পানে চাহিলেন। বান্ধুলির মুখে কিন্তু কোনও রহস্যের সঙ্কেত নাই। সে সরলভাবে বলিল—'অতিথি পাটলিপুত্রের শিল্পী।'

'তাই নাকি ?' বীরশ্রীর সন্দেহ দৃঢ় হইল। তিনি বলিলেন—'ভারি সুন্দর অনঙ্গ-বিগ্রহ গড়েছে পাটলিপুত্রের শিল্পী। আচ্ছা, তুই পান নিয়ে আয়।'

বান্ধুলি পর্ণসম্পুট আনিতে গেল। বীরশ্রী তখন মূর্তির নীচে লেখা নাম যৌবনশ্রীকে দেখাইলেন। যৌবনশ্রীর মুখে চকিত অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল। বীরশ্রী বলিলেন—'সংকেত বলেই মনে হচ্ছে। বান্ধুলি কিছু জানে না। ওর কাছে এখন কিছু ভেঙ্গে কাজ নেই। আমি বুদ্ধি বার করছি।'

বান্ধুলি পর্ণসম্পুট লইয়া আসিলে দুই ভগিনী পান মুখে দিলেন। বীরশ্রী বলিলেন—'দিব্যি অতিথি পেয়েছিস। নাম কি রে অতিথির ?'

বান্ধুলি নতনেত্রে বলিল—'মধুকর।'

বীরশ্রীর একটু ধোঁকা লাগিল। কিন্তু ছদ্মনাম হইতে পারে। তিনি প্রশ্ন করিলেন—'বয়স কত ?'

'তা জানি না।'

'আ গেল ছুঁড়ি! মানুষ দেখে বলতে পারিস না বুড়ো কি ছোঁড়া ?'

অপ্রতিভ বান্ধুলি বলিল—'ও—মানে—বুড়ো নয়।'

'তাহলে কত বয়স ?'

'পঁচিশ ছাব্বিশ হবে।'

'চেহারা কেমন ?'

'যাও দিদিরানী—আমি জানি না।'

'চেহারা কেমন জানিস না! কী ব্যাপার বল দেখি! তোর রকম-সকম ভাল মনে হচ্ছে না।'

বান্ধুলি রক্তবর্ণ হইয়া বলিল—'আমি—চেহারা ভালই—মানে মন্দ না। রঙ ফরসা—কোঁকড়া চুল—বড় বড় চোখ—'

'লম্বোদরের মত নয় ?'

বান্ধুলি ঠোঁটে আঁচল চাপা দিল, বলিল—'না।'

বীরশ্রী ভাবিলেন, বোধ হইতেছে অনঙ্গপালই বটে। তিনি বলিলেন—'আচ্ছা, এই পুতুলটি আমি নিলাম।' বলিয়া কান হইতে অবতংস খুলিয়া বান্ধুলির হাতে দিলেন—'শিল্পীকে দিস, আমার পুরস্কার।'

যদি অনঙ্গ হয়, অবতংস চিনিতে পারিবে, নৌকাযাত্রা কালে অনেকবার দেখিয়াছে।

বান্ধুলি গদ্‌গদ মুখে কর্ণাভরণ অঞ্চলে বাঁধিল। বীরশ্রী বলিলেন—'তুই আর এখানে থেকে কি করবি, বাড়ি ফিরে যা। কাল সকালে আসিস্ কিন্তু, অতিথি নিয়ে মেতে থাকিস না। কাল আমরা দুপুরবেলা ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে পূজা দিতে যাব। তুইও যাবি।'

'আচ্ছা দিদিরানী।'

ছয়

পরদিন মধ্যাহ্নের দুই তিন দণ্ড পূর্বে অনঙ্গ ও বিগ্রহ যথাক্রমে রোহিতাশ্ব ও দিব্যজ্যোতির পিঠে চড়িয়া ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির অভিমুখে চলিয়াছেন। সঙ্গে একজন ভৃত্য আছে, সে পথ দেখাইয়া দিবে।

নগরের উপান্ত হইতে পূর্বদিকে পথ চলিয়া গিয়াছে। নগরসীমায় পৌঁছিলে ভৃত্য

বলিল—'এই পথে সিধা চলে যান, তিন চার ক্রোশ গেলেই ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির পাবেন।' বলিয়া সে ফিরিয়া গেল।

বিটপচ্ছায়াচিত্রিত পথ ; দক্ষিণদিক হইতে জলকণাস্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে। দুটি অশ্ব যুগ্ম তীরের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। বিগ্রহপাল প্রাণশক্তির আতিশয্যে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

'এতক্ষণে মনে হচ্ছে বেঁচে আছি। তোর মনে হচ্ছে না ?' বলিয়া অনঙ্গের পানে হর্ষোৎফুল্ল মুখ ফিরাইলেন।

অনঙ্গ বলিল—'আমার বরাবরই মনে হচ্ছে।'

বিগ্রহ আবার উচ্চহাস্য করিলেন—'হাঁ, তুই তো তোর মানসীকে পেয়েছিস। কিন্তু তোকে বিশ্বাস নেই। হয়তো কার্যোদ্ধারের জন্য প্রেমের অভিনয় করছিস।'

অনঙ্গ বলিল—'না ভাই, এ সত্যি প্রেম। প্রথমে ভেবেছিলাম একটু রঙ্গ-রসিকতা করে কাজ উদ্ধার করব। কিন্তু এমন ওর স্বভাব, না ভালবেসে উপায় নেই।'

'তা এখন কি করবি ?'

'তুই যা করবি আমিও তাই করব, ঘোড়ার পিঠে তুলে প্রস্থান।'

'ওকে কিছু বলেছিস নাকি ?'

'এখনও বলিনি, তাক্ বুঝে বলব। এখন শুধু হাবুডুবু খাচ্ছি।'

'তুই একলা খাচ্ছিস ? না সেও হাবুডুবু খাচ্ছে ?'

অনঙ্গ অধর মুকুলিত করিয়া বিগ্রহের দিকে সহাস্য কটাক্ষপাত করিল, উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না।

এইভাবে লঘু বাক্যালাপে দুইজনে পথ অতিক্রম করিলেন। পথে পথিকের বাহুল্য নাই। অশ্মাচ্ছাদিত পথ ক্রমশ উপরে উঠিতে উঠিতে নর্মদা প্রপাতের সন্নিকটে শেষ হইয়াছে। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই দুইজনে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

নর্মদা যেখানে প্রস্রবণের আকারে অন্ধকার গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার অনতিনিম্নে উচ্চ পাষাণ-চত্বরের উপর শ্বেতপ্রস্তর-নির্মিত ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির। মন্দিরে কয়েকজন পূজারী আছেন, তাঁহারা অশ্বারোহীদের আসিতে দেখিয়া চত্বরের উপর সারি দিয়া দাঁড়াইলেন। এখানে পূজার্থী যাত্রীর যাতায়াত বেশি নয়, তবে পূজা পার্বণের সময় মেলা হয়।

অশ্বারোহিদ্বয় মন্দিরের নিকট থামিলেন না, আরও অগ্রসর হইয়া গুহার মুখের কাছে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। বিপুল গুহা-মুখ হইতে শান্ত ধারায় জল বাহির হইতেছে, স্রোতের উন্মাদনা নাই। যেন নিদ্রোত্থিত অনন্তনাগ ধীর সঞ্চারে বিবর হইতে নির্গত হইতেছে। পশ্চাতে মেখল পর্বত স্কন্ধের পর স্কন্ধ তুলিয়া গুহার পটভূমিকা রচনা করিয়াছে।

গুহার পাশে শীলাকীর্ণ অসমতল ভূমির উপর এখানে ওখানে পাহাড়ী গাছপালা জন্মিয়াছে, গুল্ম রচনা করিয়াছে। উপরন্তু একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বাটিকা আছে। মন্দিরের পূজারীরা যত্ন করিয়া অনুর্বর ভূমিতে আম্র, জম্বু, বকুল, কদম্ব প্রভৃতি ফলমূলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া বোধ করি কর্মবিরল দিবসের জড়তা অপনোদন করিয়াছেন।

অনঙ্গ ও বিগ্রহ একটি গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিলেন। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র বেশ প্রখর, কিন্তু নবোদ্গতপল্লব গাছের নীচে একটু ছায়া আছে।

বিগ্রহ বলিলেন—'ওরা এখনও আসেনি। ততক্ষণ কি করা যায় ?'

দুইজনে গুহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। অনঙ্গ বলিল—'স্নান করলে কেমন হয় ?'

বিগ্রহ স্নিগ্ধ শীতল জলের পানে সাভিলাষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—'স্নান! মন্দ হয় না। কিন্তু অন্য বস্ত্র কৈ ?'

অনঙ্গ বলিল—'নির্জন স্থানে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করলে ক্ষতি কি ? কেউ দেখতে পাবে না।'

'কিন্তু ওরা যদি এসে পড়ে ?'

চিন্তার কথা বটে। বিবস্ত্র অবস্থায় মহিলাদের কাছে ধরা পড়িলে লজ্জার অবধি থাকিবে না। অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—'এক কাজ করা যেতে পারে। গুহার ভিতরে অন্ধকার, পাশ দিয়ে ভিতরে যাবার সংকীর্ণ পাড় আছে। ভিতরে গিয়ে স্নান করা যায়। আমি যখন স্নান করব তুই বাইরে পাহারা দিবি, তুই যখন স্নান করবি আমি পাহারা দেব।'

এই সময় পিছনে কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'ভদ্র, আপনারা কি গুহায় প্রবেশের অভিলাষ করেছেন ?'

মন্দিরের পূজারী। কপালে রক্তচন্দনের তিলক, ক্ষৌরিত মস্তকের অধিকাংশ জুড়িয়া স্থূল শিখা, কিন্তু সৌম্য সহাস্য মুখশ্রী। অনঙ্গ বলিল—'আপনি বুঝি মন্দিরের পণ্ডপুরুষ ! আমরা যদি গুহায় প্রবেশ করে স্নান করি, আপত্তি আছে কী ?'

পণ্ডিত বলিলেন—'আপত্তি কিসের ? তবে গুহার ছাদে বহু মধুমক্ষিকার চক্র আছে, তারা বিরক্ত হতে পারে।'

'মধুমক্ষিকা বিরক্ত হবে ?'

'হতে পারে। তারা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। তারা রুষ্ট হলে হস্তীরও প্রাণ সংশয় হয়।'

অনঙ্গ বলিল—'তবে থাক। —গুহার বাইরে এখানে যদি স্নান করি ?'

পণ্ডিত আবার হাসিলেন—'করতে পারেন। আপনারা মনে হচ্ছে বিদেশী। শোনেননি কি নর্মদার জল কর্কটপূর্ণ ? কর্কটেরা এই গুহার মধ্যেই বংশবৃদ্ধি করে, তাই গুহার সন্নিকটে কর্কটের প্রাদুর্ভাব বেশি।'

'তবে কাজ নেই, স্নান না করলেও চলবে।'

পূজারী অমায়িকভাবে বলিলেন—'আপনারা মন্দিরে পূজা দেবার আগে স্নান করে শুচি হতে চান, এই তো ? কিন্তু স্নানের প্রয়োজন নেই ; নর্মদার জল অতি পবিত্র, মাথায় ছিটা দিলেও শুদ্ধ হবেন। —আসুন।'

মন্দিরে পূজা দিবার কথা বিগ্রহপালের মনে আসে নাই, তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'অবশ্য অবশ্য। মন্দিরে পূজা দিতে হবে। কিন্তু পূজার উপচার তো কিছু সঙ্গে আনা হয়নি। আপনি এই সামান্য মূল্য নিয়ে আমাদের পূজার আয়োজন করে দিন।'

বিগ্রহ পণ্ডিতকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। পণ্ডিত অতিশয় হৃষ্ট হইয়া দুইজনের মাথায় নর্মদার পবিত্র জল ছিটাইয়া দিলেন, তারপর মন্দিরে লইয়া গিয়া যথোপচার পূজার্চনা সম্পন্ন করাইলেন।

পূজান্তে মন্দিরের চত্বর হইতে অবতরণ করিতে করিতে বিগ্রহ দেখিলেন পথ দিয়া দুইটি রথ অগ্রপশ্চাৎ আসিতেছে। প্রথম রথটি চালাইতেছেন যৌবনশ্রী, পার্শ্বে বীরশ্রী উপবিষ্ট। পিছনের রথে পূজোপচারসহ বান্ধুলি।

দুই বন্ধু উৎফুল্ল কটাক্ষ বিনিময় করিলেন। তারপর ক্ষিপ্রপদে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন।

সোপানের পদমূলে দুই পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। বীরশ্রী সর্বাগ্রে ছিলেন, তাঁহার মুখে গূঢ় হাসি স্ফুরিত হইয়া উঠিল। তাঁহার পিছনে যৌবনশ্রী দিদির আঁচল চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার মুখ পর্যায়ক্রমে রক্তিম ও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল। সর্বশেষে বান্ধুলি সোনার থালায় পূজোপচার লইয়া বিভক্ত ওষ্ঠাধরে অনঙ্গের পানে চাহিয়া ছিল।

বীরশ্রী বিগ্রহপালকে লক্ষ্য করিয়া ছলনাভরে বলিলেন—'ভদ্র, আপনাকে যেন কোথায়

দেখেছি মনে হচ্ছে !'

বিগ্রহ যৌবনশ্রীর উপর চক্ষু রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—'ভদ্রে, এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ! আমি যে পলকের তরেও আপনাদের ভুলতে পারিনি ।'

বীরশ্রী বলিলেন—'মনে পড়েছে। আপনার নাম কী যেন—'

'অধীনের নাম রণমল্ল ।'

এই সময় যৌবনশ্রী একবার চক্ষু তুলিয়া আবার চক্ষু নত করিয়া ফেলিলেন। বীরশ্রী বলিলেন—'নামটা নূতন নূতন ঠেকছে, কিন্তু মানুষটা সেই।' অনঙ্গের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'আপনি বুঝি বান্ধুলির বন্ধু মধুকর ?'

অনঙ্গ দশনচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া হাত জোড় করিল।

বীরশ্রী সোপানের উর্ধ্বদিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'আর না, পুরোহিত মহাশয় নেমে আসছেন। আপনারা কি এখনই নগরে ফিরে যাবেন ?'

বিগ্রহ বলিলেন—'আপাতত কিছুক্ষণ বৃক্ষ-বাটিকায় বিশ্রাম করবার ইচ্ছা আছে।'

'ভাল। আমরাও পূজা দিয়ে কিছুক্ষণ বৃক্ষ-বাটিকায় বিশ্রাম করব।—আয় বান্ধুলি, হাঁ করে পরপুরুষের পানে তাকিয়ে থাকতে নেই।'

বান্ধুলি লজ্জায় ঘাড় ফিরাইয়া ভগিনীদ্বয়ের অনুসরণ করিল। ততক্ষণে পুরোহিত মহাশয় নামিয়া আসিয়া মহা সমাদর সহকারে পূজার্থিনীদের উপরে লইয়া গেলেন।—

দুই দণ্ড পরে পূজার্থিনীরা মন্দির হইতে নামিয়া আসিলেন। বৃদ্ধ রাজ-সারথি সম্পৎ দ্বিতীয় রথটি চালাইয়া আসিয়াছিল ; দেখা গেল সে রথ দুটিকে এক বৃক্ষের ছায়ায় লইয়া গিয়াছে এবং অশ্বগুলিকে কিছু ঘাস দিয়া নিজে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছে। যুবতীরা তখন নিঃশঙ্কে বৃক্ষ-বাটিকার দিকে চলিলেন।

বৃক্ষ-বাটিকার পুরোভাগে এক চম্পক বৃক্ষতলে অনঙ্গ দাঁড়াইয়া ছিল, সসম্ভ্রমে বীরশ্রীকে সম্বোধন করিল—'দেবি, যে ছদ্মবেশী চোরকে আপনারা খুঁজছেন, সে ওই আমলকী বৃক্ষতলে লুকিয়ে আছে।'

বীরশ্রী বলিলেন—'ভাল। তুমি বুঝি এই কুঞ্জবনের দ্বারপাল ? আপাতত এই মেয়েটাকে তুমি আটক রাখ, ওকে আমাদের এখন প্রয়োজন নেই। ফেরবার পথে ওকে আবার অক্ষতদেহে আমার কাছে সমর্পণ করবে।'

অনঙ্গ যুক্তকরে বলিল—'যথা আজ্ঞা দেবি।'

বীরশ্রী তখন যৌবনশ্রীর হাত ধরিয়া কুঞ্জবনে প্রবেশ করিলেন।

অনঙ্গ দেখিল, প্রণয় সম্ভাষণের পক্ষে স্থান কাল সমস্তই অনুকূল। সে আর দ্বিধা করিল না। বান্ধুলির সম্মুখে আসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—'তুমি আমার বন্দিনী।'

বান্ধুলি হাসিয়া গলিয়া পড়িল। তারপর যথাসম্ভব আত্মসম্বৃত হইয়া বলিল—'আপনি কি করে এখানে এলেন ? আপনার সঙ্গে উনি কে ?'

অনঙ্গ বলিল—'কাল বলেছিলে তোমরা এখানে আসবে, মনে নেই ? কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক। তুমি আমার বন্দিনী। কিন্তু তোমাকে বেঁধে রাখবার পাশ রজ্জু উপস্থিত আমার কাছে নেই। সুতরাং—' অনঙ্গ বান্ধুলির হাত ধরিল—'চল, ওই গাছতলায় চুপটি করে আমার পাশে বসে থাকবে।'

প্রণয়ীর প্রথম করস্পর্শে নাকি প্রণয়িনীর দেহে হর্ষোল্লাস জাগিয়া ওঠে, মন রাগপ্রদীপ্ত হয়। কিন্তু বান্ধুলির মনে হইল তাহার সারা দেহ যেন জুড়াইয়া গেল, স্নিগ্ধ হইয়া গেল। সে শুদ্ধশান্ত চিত্তে অনঙ্গের পাশে বৃক্ষতলে গিয়া বসিল। তাহার ডান হাতখানি অনঙ্গের হাতে ধরা রহিল।

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব ; তারপর অনঙ্গ বলিল —'বান্ধুলি, আমি যদি তোমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে অনেক দূর দেশে নিয়ে যাই, তুমি যাবে ?'

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। কিন্তু বান্ধুলি চিন্তা করিল না, ক্ষণেকের জন্যও দ্বিধা করিল না, সরল অপ্রগল্‌ভ চক্ষু দুটি অনঙ্গের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল—'যাব।'

'সব ছেড়ে আমার সঙ্গে যেতে ভয় করবে না ?'

'না।'

অনঙ্গ বান্ধুলিকে আরও কাছে টানিয়া লইল, চুপিচুপি বলিল—'বান্ধুলি, তুমি এখন কোনও কথা জানতে চেও না। আমরা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ত্রিপুরীতে এসেছি ; হঠাৎ একদিন আমাদের চলে যেতে হবে। তখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, পাটলিপুত্রে ফিরে গিয়ে বিয়ে হবে।'

বান্ধুলি নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। সে বুদ্ধিহীনা নয়, আজিকার উপপত্তি দেখিয়া বুঝিয়াছিল বীরশ্রীর সহিত ইহাদের পূর্ব হইতে পরিচয় আছে, ভিতরে ভিতরে নিগূঢ় কোনও ব্যাপার চলিতেছে। কিন্তু তাহার মনে কোনও কৌতূহল জাগিল না। যে-মানুষটিকে সে চায় সেই মানুষটিও তাহাকে একান্তভাবে চায় এই পরম চরিতার্থতার আনন্দেই সে বিভোর হইয়া রহিল।

কুঞ্জবনের অভ্যন্তরে একটি সহকার বৃক্ষতলে আর একপ্রকার প্রণয় সম্ভাষণ চলিতেছিল। চূতাঙ্কুরের গন্ধে বিহ্বল ভ্রমরের মত বিগ্রহপাল যৌবনশ্রীর কর্ণে গুঞ্জন করিতেছিলেন। নব অনুরাগের অর্থহীন গদভাষণ। যৌবনশ্রী বৃক্ষতলে প্রস্তর বেদিকার উপর বসিয়া করলগ্নকপোলে শুনিতেছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার নিশ্বাস আপনি নিরুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, গণ্ডে ও বক্ষে রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠিতেছিল। বীরশ্রী তাঁহাকে বিগ্রহপালের কাছে রাখিয়া অশোক পুষ্পের অন্বেষণ ব্যপদেশে অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছিলেন।

প্রণয়ীর মনে সময়ের জ্ঞান নাই ; পলকে রাত্রি পোহাইয়া যায়, পলকের বিরহ যুগান্তকাল বলিয়া মনে হয়। বেলা তৃতীয় প্রহরে বীরশ্রী যখন সহকার বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিলেন তখন দেখিলেন যৌবনশ্রী তেমনই নতমুখে বসিয়া আছেন এবং বিগ্রহপাল তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি দুই করপুটে ধরিয়া গাঢ়স্বরে প্রলাপ বকিতেছেন।

বীরশ্রী প্রণয়ীযুগলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেও তাঁহারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন না। তখন তিনি বলিলেন—'বেলা যে তিন পহর হল, এখনও তোমাদের মনের কথা বিনিময় হল না ?'

দুইজনে চমকিয়া উঠিলেন। বিগ্রহপাল যৌবনশ্রীর হাত ছাড়িয়া বীরশ্রীর দিকে ফিরিলেন ; করুণ হাসিয়া বলিলেন—'দিদি, বিনিময় হল কৈ ? আমিই কেবল মনের কথা বলে গেলাম, উনি কিছুই বললেন না।'

বীরশ্রী বলিলেন—'আচ্ছা, সে আর একদিন হবে। আজ দেরি হয়ে গেছে, এখনি হয়তো সম্পৎ সারথি খুঁজতে আসবে। তার কাছে ধরা পড়া বাঞ্ছনীয় নয়।'

বিগ্রহ এবার বীরশ্রীর হাত ধরিলেন—'দিদি, আবার কবে দেখা হবে ?'

বীরশ্রী হাসিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন—'যথাসময় জানতে পারবে। আয় যৌবনা।'

যৌবনশ্রী ও বান্ধুলিকে লইয়া বীরশ্রী চলিয়া গেলেন। দুই বন্ধু কুঞ্জবনে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে রথের ঘর্ঘরধ্বনি দূরে মিলাইয়া গেল। বিগ্রহপাল নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'চল অনঙ্গ, আমরাও ফিরি।'

অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল—'ভাব হল ?'

বিগ্রহ হাসিলেন, প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন—'তোর বান্ধুলিকে দেখলাম। যা চাস তাই পেয়েছিস। কতদূর অগ্রসর হলি ?'

অনঙ্গ বলিল—'অনেক দূর। আমরা প্রস্তুত। এখন তোরা প্রস্তুত হলেই যাত্রা করা যেতে পারে।'

বিগ্রহ বিমর্ষভাবে বলিলেন—'আমাদের প্রস্তুত হতে সময় লাগবে।'

সাত

বেশি সময় কিন্তু লাগিল না। অমাবস্যা তিথি পূর্ণ হইবার পূর্বেই যৌবনশ্রীর মুখ ফুটিল। হৃদয় যেখানে সহস্র কথার ভারে পূর্ণ সেখানে মুখ কতদিন নীরব থাকে ?

ত্রিপুরেশ্বরী সংঘটনের পরদিন প্রাতঃকালে অনঙ্গ রোহিতাশ্বের পিঠে চড়িয়া শোণের ঘাটের দিকে চলিল। নৌকাটা কী অবস্থায় আছে দেখা আবশ্যক, কারণ প্রত্যাবর্তনের দিন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে।

নৌকা সচল সক্রিয় অবস্থায় আছে, গরুড় সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া নৌকাতেই বিরাজ করিতেছে। জাতবর্মার নৌকাটাও আছে, কিন্তু তাহাতে মাঝিমাল্লা নাই। অনঙ্গ গরুড়কে জিজ্ঞাসা করিল—'যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত আছ ?'

গরুড় বলিল—'আজ্ঞা, এই দণ্ডে যাত্রা করতে পারি।'

অনঙ্গ সন্তুষ্ট হইল এবং গরুড়কে কিছু অর্থ দিয়া ফিরিয়া চলিল। গরুড় নদীতে সূতা ফেলিয়া একটা মাঝারি আয়তনের মাছ ধরিয়াছিল, অনঙ্গ সেটা সঙ্গে লইল।

দ্বিপ্রহরে খাইতে বসিয়া অনঙ্গ বেতসীকে জিজ্ঞাসা করিল—'বহিন, এখন তোমার শরীর কেমন ?'

বেতসী কৃতজ্ঞস্বরে বলিল—'তোমার রান্না মাছ খেয়ে অনেক ভাল আছি ভাই।'

অনঙ্গ বলিল—'আজকের মাছটা তুমিই রাঁধো। দেখি কেমন রাঁধতে শিখেছ।'

বেতসী আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া বলিল—'আচ্ছা।'

আহারের পর দ্বার ভেজাইয়া দিয়া অনঙ্গ শয়ন করিল। একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, পায়ে লঘু করস্পর্শে সে চমক ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল। নিঃশব্দে বান্ধুলি ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

অনঙ্গ বলিল—'রাজবাটী থেকে কখন এলে ?'

বান্ধুলি ষড়যন্ত্রকারিণীর মত চুপি চুপি বলিল—'এইমাত্র। দিদিরানী বললেন আজ সূর্যাস্তের পর তিনি প্রিয়সখীকে নিয়ে রেবার তীরে বেড়াতে আসবেন।'

অনঙ্গ চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—'রেবার তীরে—কোথায় ?'

'রাজবাটীর পিছন দিকে।'

'আচ্ছা।' অনঙ্গ হাসিয়া বান্ধুলির হাত ধরিল—'তুমি কাউকে কিছু বলনি ?'

বান্ধুলি দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িল—'না।'

'বহিন কোথায় ?'

'শুয়েছে।'

'আর—কুটুম্ব ?'

'কুটুম্ব খেতে এসেছিল, খেয়ে আবার বেরিয়েছে।'

অনঙ্গ বান্ধুলিকে টানিয়া পাশে বসাইল। দুইজনে পরস্পরের মুখের পানে স্মিত-বিগলিত মুখে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

'বান্ধুলি, আমি তোমাকে চুরি করে নিয়ে পালালে বহিন রাগ করবে না ?'

বান্ধুলি ক্ষণেক নতনেত্রে থাকিয়া বলিল—'না, সুখী হবে।'

'সুখী হবে!'

'হাঁ। দিদি আমাকে ভালবাসে ; আমি সুখী হলে দিদিও সুখী হবে।'

'আর —লম্বোদর ?'

বান্ধুলির মুখে একটু অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল ; সে ঘাড় হেঁট করিয়া হাতের নখ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

'লম্বোদর সুখী হবে না—কেমন ?'

বান্ধুলি চোখ তুলিল না, কেবল মাথা নাড়িল।

অনঙ্গ নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ তাহার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'বুঝেছি। একটি ভগিনীকে বিবাহ করে লম্বোদরের উদর পূর্ণ হয়নি। তুমি ভেবো না, লম্বোদরকে কদলী প্রদর্শন করব। কিন্তু কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। দিদিও না।'

'কেউ জানতে পারবে না।'

অনঙ্গ নিশ্চিন্ত হইল, বান্ধুলি প্রাণ গেলেও কাহাকেও কিছু বলিবে না।

'তুমি কি এখন রাজবাটীতে ফিরে যাবে ?'

'হাঁ। দিদিরানী যেতে বলেছেন।'

'আচ্ছা এস। রেবার তীরে আবার দেখা হবে।'

সেদিন সূর্যাস্তের পর রাজপ্রাসাদের পশ্চাদ্দেশে নির্জন রেবার তীরে যৌবনশ্রীর সহিত বিগ্রহপালের আবার দেখা হইল। সন্ধ্যার ঝিলিমিলি আলো নদীর উপর দিয়া লঘু পদক্ষেপে পশ্চিম দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে, রাত্রি আসিয়াছে রত্ন-খচিত নিবিড় নীল উত্তরীয়ের মত ; প্রণয়ীযুগলকে স্নেহভরে আবৃত করিয়াছে।

বিগ্রহপাল আবার গাঢ়স্বরে প্রলাপ বকিলেন। যৌবনশ্রী দুটি একটি কথা বলিলেন ; কখনও 'হুঁ,' কখনও 'না'। বীরশ্রী অলক্ষিতে থাকিয়া পাহারা দিলেন, রাজপুরী হইতে দাসদাসী কেহ না আসিয়া পড়ে। অনঙ্গ ও বান্ধুলিও দূরে থাকিয়া পাহারা দিল।

তারপর দুই দণ্ড অতীত হইলে বীরশ্রী আসিয়া যৌবনশ্রীর হাত ধরিয়া রাজপুরীতে লইয়া গেলেন। বলিলেন—'আজ এই পর্যন্ত। আবার কাল হবে।'

পরদিন আবার ওই স্থানে প্রণয়ীযুগল মিলিত হইলেন। তার পরদিন আবার। এইভাবে চলিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষ কাটিয়া আকাশে নবীন চাঁদের ফলক দেখা দিল। যৌবনশ্রীর হৃদয়ের মুদিত কোরকটি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতেছে ; একটু একটু করিয়া মুখ ফুটিতেছে। দুইজনে নদীর তীরে পাশাপাশি বসিয়া থাকেন, বিগ্রহপালের মুঠির মধ্যে যৌবনশ্রীর আঙ্গুলগুলি আবদ্ধ থাকে। পশ্চিম দিগন্তে চাঁদ বঙ্কিম হাসিয়া অস্ত যায়। নদীতীরের অন্ধকারে দুইটি মন যৌবন-মদগন্ধে ভরিয়া ওঠে। যৌবনশ্রী অস্ফুটস্বরে, প্রায় মনে মনে, বলেন—'আর্যপুত্র!'

আট

জাতবর্মা যৌবনশ্রীকে বলিলেন—'পূর্বরাগ অনুরাগ মিলন রসোদ্গার সবই তো হল। এখন আমাদের বিরহ সাগরে ভাসাচ্ছ কবে ?'

প্রশ্নটি যৌবনশ্রী বুঝিতে পারিলেন না। জাতবর্মা আরও কিছুক্ষণ রঙ্গ-রহস্য করিয়া প্রস্থান করিবার পর যৌবনশ্রী দিদির প্রতি জিজ্ঞাসু নেত্রপাত করিলেন।

কক্ষে অন্য কেহ ছিল না। বীরশ্রী হ্রস্বকণ্ঠে বলিলেন—'যৌবনা, বিগ্রহ কি তোকে কিছু বলেছে ? কোনও প্রস্তাব করেছে ?'

বিগ্রহপাল কথা বলিয়াছেন অনেক, কিন্তু তাহা বহুলাংশে হৃদয়োচ্ছ্বাস ; যাহাকে প্রস্তাব বলা যায় এমন কথা তিনি বলেন নাই। যৌবনশ্রী মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'না। কী প্রস্তাব ? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

বীরশ্রী একটু অধীরভাবে বলিলেন—'শুধু অভিসার করলেই চলবে ? এর শেষ কোথায় ?'

শেষ কোথায় ! যৌবনশ্রী সবই জানিতেন। কিন্তু কিছু মনে ছিল না। পিতা বিগ্রহপালকে স্বয়ংবরে আহ্বান করেন নাই, এদিকে লুকাইয়া লুকাইয়া দেখাশুনা চলিতেছে। যৌবনশ্রী বিগ্রহপালকে প্রথম দর্শনেই হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়াছেন ; তারপর যতবার দেখা হইয়াছে প্রণয়ের আকর্ষণ ততই দৃঢ় হইয়াছে। তিনি মনে মনে কালিদাসের শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন—ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি ত্বমেব ভর্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ। কিন্তু ইহার পরিণাম কোথায় তাহা তিনি ভাবেন নাই ; বর্তমানের ভাব-প্লাবনে তাঁহার হৃদয় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল, ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁহার মনে আসে নাই।

তিনি হঠাৎ ভয় পাইয়া বীরশ্রীকে জড়াইয়া ধরিলেন—'দিদি, কি হবে ?'

বীরশ্রী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া হাসিলেন—'কি আর হবে ? বিগ্রহ স্থির করেছে স্বয়ংবরের আগেই তোকে চুরি করে নিয়ে পালাবে, নৌকায় তুলে একেবারে পাটলিপুত্র। এখন তুই মন স্থির করে ফেললেই হল। স্বয়ংবরের কিন্তু আর বেশি দেরি নেই।'

যৌবনশ্রী ধীরে ধীরে বীরশ্রীর স্কন্ধ হইতে মুখ তুলিলেন। তাঁহার মুখখানি প্রভাতের শিশিরক্লিষ্ট কুমুদিনীর মত শীর্ণ দেখাইল। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন—'চুরি করে— ?'

কেবল এই কথাটি বীরশ্রী ভগিনীকে বলেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, হঠাৎ বলিলে যৌবনশ্রী চমকিয়া যাইবে, আগে ভাব-সাব হোক, তারপর বলিলেই চলিবে। বীরশ্রী এখন বিগ্রহপালের সমস্ত অভিসন্ধি ব্যক্ত করিলেন ; বীরশ্রী ও জাতবর্মার যে এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে তাহাও জানাইলেন। যৌবনশ্রী ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন। তাঁহার মন ক্রমে আত্মস্থ হইল।

মানুষের চরিত্র, বিশেষত স্ত্রী-চরিত্র, অতি গহন দুর্জ্ঞেয়। কখন যে তাহা কুসুমের ন্যায় কোমল, আবার কখন যে বজ্রাদপি কঠোর, তাহা আজ পর্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই।

সেদিন রেবার তীরে খণ্ড চাঁদের আলোয় দু'জনের দেখা হইল। যৌবনশ্রী বিগ্রহপালের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন : তারপর আরও কাছে গিয়া তাঁহার বুকের উপর মাথা রাখিলেন। এই স্বতঃ পরিশীলনের জন্য বিগ্রহপাল প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি হর্ষরোমাঞ্চিত দেহে দুই বাহু দিয়া যৌবনশ্রীকে বেষ্টন করিয়া লইলেন।

'যৌবনশ্রী—ভুবনশ্রী— !'

যৌবনশ্রীর একটি হাত সরীসৃপের ন্যায় ধীরে ধীরে উঠিয়া বিগ্রহপালের স্কন্ধের উপর লগ্ন হইল, মুখখানি একটু উন্নমিত হইল। বিগ্রহপাল দেখিলেন তাঁহার চোখে জল টলমল করিতেছে।

'যৌবনা ! কী হয়েছে ?'

যৌবনশ্রীর ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল—'তুমি নাকি আমাকে চুরি করে নিয়ে যাবে ?'

বিগ্রহের মুখ উদ্বিগ্ন হইল। এ প্রশ্নের পিছনে আনন্দ, ঔৎসুক্য নাই। তিনি ব্যগ্রস্বরে বলিলেন—'অন্য উপায় যে নেই যৌবনা। তোমার পিতা আমাকে স্বয়ংবর সভায় আমন্ত্রণ করেননি।'

যৌবনশ্রী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—'জানি। কিন্তু তুমি আমাকে চুরি করে নিয়ে যাবে, এ যে

বড় লজ্জার কথা কুমার।'

বিগ্রহপালের মুখ ঈষৎ উত্তপ্ত হইল। তিনি বলিলেন—'ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কন্যা হরণ করে বিবাহ করা লজ্জার কথা নয়।'

যৌবনশ্রীর যে বাহুটি বিগ্রহপালের স্কন্ধ পর্যন্ত উঠিয়াছিল তাহা এবার তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া লইল, তিনি বলিলেন—'কুমার, আজ আমার নির্লজ্জতা তুমি ক্ষমা কর। আমি তোমার, কায়মনোবাক্যে তোমার ; তাই আমি তোমাকে কদাচ এ কাজ করতে দেব না। বাহুবলে কন্যা হরণ করা আর চোরের মত কন্যা চুরি করা এক কথা নয়। রাবণ তস্করের মত সীতাকে চুরি করেছিল ; অর্জুন শত শত রাজাকে পরাস্ত করে কৃষ্ণাকে লাভ করেছিলেন।'

বিগ্রহপালের বাহুবেষ্টন শিথিল হইল, তিনি বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। যে প্রথমপ্রণয়ভীতা লজ্জাহতা যুবতীকে তিনি প্রেম নিবেদন করিতেছিলেন এ যেন সে নয়। কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল এত তেজ, এত দৃঢ়তা!

অবশেষে বিগ্রহপাল বলিলেন—'কিন্তু যৌবনা, তুমি কি বুঝতে পারছ না ? এ ছাড়া তোমাকে পাবার আর তো কোনও উপায় নেই।'

যৌবনশ্রী কম্পিতস্বরে বলিলেন—'আমাকে তো পেয়েছ। তুমি আমার স্বামী, ইহজন্মে জন্মজন্মান্তরে তুমি আমার স্বামী। কিন্তু যতক্ষণ সর্বসমক্ষে, ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গের সমক্ষে তোমার গলায় মালা না দিচ্ছি ততক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাব না। তাতে তোমার পিতৃকুলের, আমার—আমার শ্বশুরকুলের অপমান হবে। ভুলে যেও না কুমার, কোন্ মহিমময় রাজকুলে তোমার জন্ম ; অমরকীর্তি ধর্মপাল দেবপাল মহীপাল তোমার পিতৃপুরুষ। অনুরূপ অবস্থায় তাঁরা কি করতেন ?'

এ প্রশ্নের সদুত্তর নাই ; বিগ্রহপাল নির্বাক রহিলেন। বালসুলভ চপলতার বশে তিনি যে কর্মে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাতে বিবেকের দিক হইতে যে কোনও বাধা আসিতে পারে তাহা তিনি চিন্তা করেন নাই। তিনি যেন নদীতীরে এক-হাঁটু জলে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ গভীর জলে পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে দীর্ঘ নীরবতার পর তিনি বলিলেন—'যৌবনা, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। সমস্ত ভারতবর্ষ আমাকে ধিক্কার দেবে ; পাল রাজবংশে কলঙ্ক লাগবে। তা হতে পারে না। কিন্তু এখন উপায় কি ?'

'উপায় তুমি জান।'

'তুমি কি করবে ?'

'তুমি যা বলবে তাই করব।'

'স্বয়ংবর তো বন্ধ করা যাবে না। তোমাকে স্বয়ংবর সভায় যেতে হবে।'

'তুমি যদি স্বয়ংবর সভায় না থাক, আমি যাব না।'

'কিন্তু তোমার পিতা—'

যৌবনশ্রী নীরব রহিলেন। আকাশের শশিকলা অস্ত গেল, অন্ধকার ঘিরিয়া আসিল। বিগ্রহপাল যৌবনশ্রীকে বাহুমুক্ত করিয়া বলিলেন—'আজ আমি যাই। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। ভাবতে হবে, অনঙ্গের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, রন্তিদেবের উপদেশ নিতে হবে।—কাল আবার এইখানে এস, দেখা হবে।'

তাঁহাদের প্রেম লঘু পূর্বরাগের স্তর উত্তীর্ণ হইয়া একমুহূর্তে গভীরতর স্তরে উপনীত হইয়াছে।

রাজপুরীতে ফিরিয়া গিয়া যৌবনশ্রী শয্যায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সঙ্কল্প যতই দৃঢ়

হোক, আশঙ্কাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। বীরশ্রী যথাসাধ্য তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। চুরি করিয়া পলায়নের মধ্যে যে ঘোর দুর্নীতি ও স্বৈরাচার রহিয়াছে তাহা তিনিও বুঝিয়াছিলেন, যৌবনশ্রী যদি তাহাতে সম্মত না হয় তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বীরশ্রী পলায়নের প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিলেন না।

কিন্তু যৌবনশ্রী ও বিগ্রহপালের ঘনিষ্ঠতা যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে এখন আর হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকা যায় না। গভীর রাত্রে দুই ভগিনী ঠাকুরানীর কক্ষে গেলেন। উপস্থায়িকাদের বিদায় করিবার পর বীরশ্রী বর্তমান সংস্থা ঠাকুরানীর গোচর করিলেন। যৌবনশ্রী পিতামহীর বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অম্বিকা দেবী যৌবনশ্রীর সংকল্প শুনিয়া একদিকে যেমন উদ্বিগ্ন হইলেন অন্যদিকে তেমনি প্রসন্ন হইলেন। যৌবনশ্রী রাজকন্যার মতই সঙ্কল্প করিয়াছে, বর্তমানের তরলমতি যুবক-যুবতীদের মধ্যে এমন দৃঢ়তা দেখা যায় না। কিন্তু—এই জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করিবে কে ? প্রেম ও কর্তব্যের এই দুরত্যয় ব্যবধানের মাঝখানে সেতুবন্ধ হইবে কিরূপে ?

বীরশ্রী চক্ষু মুছিয়া বলিলেন—'দিদি, সব দোষ আমার। আমি যদি যোগাযোগ না ঘটাতাম—'

যৌবনশ্রী পিতামহীর বুকের মধ্যে মাথা নাড়িলেন, অস্ফুট রোদনরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'না—না—'

ঠাকুরানী বলিলেন—'যা হবার হয়েছে, পশ্চাত্তাপে লাভ নেই। যে জট পাকিয়েছ তা ছাড়াতে হবে।'

বীরশ্রী বলিলেন—'দিদি, তুমি উপায় কর।'

অম্বিকা বলিলেন—'আমি কী উপায় করতে পারি ! তোদের বাপকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, সে আসেনি। তাকে আবার ডেকে পাঠাতে পারি, যদি আসে তাকে সব কথা বলতে পারি। কিন্তু তাতে বিপরীত ফল হবে। কর্ণ যদি জানতে পারে বিগ্রহপাল ত্রিপুরীতে এসেছে তাহলে তার জীবন সংশয় হবে—'

যৌবনশ্রী পূর্ববৎ মাথা নাড়িলেন—'না—না—'

কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীন আলোচনার পর বীরশ্রী বলিলেন—'দিদি, এক কাজ করলে কেমন হয় ? রাজারা আসতে আরম্ভ করেছে ; তাদের কাছে যদি চুপিচুপি খবর পাঠানো যায় যে যিনি স্বয়ংবরা হবেন তিনি অন্যের বাগ্‌দত্তা—তাহলে—'

অম্বিকা বলিলেন—'তাহলে কলঙ্কের সীমা থাকবে না। রাজারা কি চুপ করে দেশে ফিরে যাবে। তারা ঢাক পেটাবে। তোদের বাপকে জিজ্ঞাসা করবে—বাগ্‌দত্তা মেয়ের স্বয়ংবর দিতে যাও কেন। তখন ?'

কোনও মীমাংসা হইল না, কর্তব্য নির্ধারিত হইল না। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরানী বলিলেন—'এখনও সময় আছে, ভেবে দেখি।—ওদিকে বিগ্রহও ভাবছে। হয়তো কোনও উপায় হবে।'

শেষ রাত্রে ক্লান্ত বিধুর হৃদয় লইয়া যৌবনশ্রী শুইতে গেলেন।

বীরশ্রী নিজ শয়নকক্ষে গিয়া স্বামীকে জানাইলেন এবং সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া জাতবর্মা বড়ই বিরক্ত হইলেন। স্ত্রীলোকের আর কোনও কাজ নেই, কেবল পিণ্ড পাকাইতে জানে। এতটা যদি নীতিজ্ঞান, প্রেম করিবার কী প্রয়োজন ছিল, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী !

তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক

রাজারা আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। রেবার তীরে মেঘপুঞ্জবৎ পট্টাবাসগুলি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কোনও রাজার সঙ্গে সহস্র পরিজন, কোনও রাজার সঙ্গে দুই সহস্র : অরক্ষিত অবস্থায় কেহ আসেন নাই। পরিজন যাহারা আসিয়াছে তাহাদের মনোভাব বরযাত্রীর মত ; দেহে নবীন বস্ত্র, নূতন মণ্ডন। তাহারা গুম্ফ শাণিত করিয়া নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মোণ্ডা মিঠাই খাইতেছে, তালকী মাধুক ইক্ষুরস পান করিতেছে, মদবিহ্বলা নগরকামিনীদের সঙ্গে শ্লেষযুক্ত রসিকতা করিতেছে। গীত বাদ্য হট্টগোল ; নগরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে স্বাধীন নরপতি সামন্ত মাণ্ডলিক প্রভৃতি মিলিয়া অনেক রাজা ; মিত্র রাজারা সকলেই আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ছোট রাজারা একটু আগে ভাগেই আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে উত্তর-পশ্চিম হইতে আসিয়াছেন মৎস্যরাজ, দক্ষিণ হইতে ভোজরাজ। কলিঙ্গ হইতে সভারূঢ় হইতে আসিয়াছেন দুই রাজপুত্র। দুই চারিজন সামন্ত অন্তপাল উপস্থিত হইয়াছেন। বরমাল্য লাভ যদি নাও ঘটে সেই সূত্রে আমোদপ্রমোদ দেশভ্রমণ বহ্বাড়ম্বর তো হইবে। রাজাদের জীবনে মৃগয়া দ্যূত এবং গ্রামধর্ম পালন ব্যতীত বৈচিত্র্যের অবকাশ কোথায় ?

যা হোক, লক্ষ্মীকর্ণের পক্ষ হইতে সকলকেই আদর আপ্যায়ন করা হইতেছে। রাজপুরুষেরা অতিথিদের খাদ্য পানীয় এবং মন যোগাইতে গলদ্‌ঘর্ম হইতেছেন। সেই সঙ্গে গুপ্তচরেরা আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; কোন্ রাজার মনে কিরূপ দুর্বুদ্ধি আছে তাহা লক্ষ্য করিতেছে। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ নিপুণ সারথির মত রশ্মি ধরিয়া সকলকে পরিচালিত করিতেছেন।

কেবল একটি বিষয়ে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের মনে সুখ নাই। স্বয়ংবর সভায় যে বিরাট প্রহসন রচনা করিয়া সারা ভারতবর্ষে অট্টহাস্যের ঢক্কানিনাদ তুলিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন তাহা মনের মত হইতেছে না। শিল্পীটা অভিপ্রেত মূর্তি গড়িতে পারিতেছে না।

গুপ্ত মন্ত্রগৃহে লক্ষ্মীকর্ণ শিল্পীকে ডাকিয়া ধমক দিতেছেন। প্রাতঃকালে গুপ্তকক্ষে অন্য কেহ নাই, কেবল এক কোণে লম্বোদর অদৃশ্য হইয়া বসিয়া আছে। সে মহারাজের কর্ণে দৈনিক সংবাদ নিবেদন করিতে আসিয়াছে।

মহারাজ শিল্পীকে বলিলেন—'তুমি অপদার্থ।'

শিল্পী জোড়হস্তে বলিল—'মহারাজ, যাকে কখনও চোখে দেখিনি তার মূর্তি আমি কী করে গড়ব ? সাধ্যমত চেষ্টা করছি, পঞ্চাশটা মুখ গড়েছি—'

মহারাজ বলিলেন—'কিছুই হয়নি, কেবল পণ্ডশ্রম। যাও, আবার চেষ্টা কর।'

অসহায় শিল্পী প্রস্থান করিলে অন্ধকার কোণ হইতে লম্বোদর মৃদু গলা ঝাড়া দিয়া বলিল—'আয়ুষ্মন্—'

লক্ষ্মীকর্ণের ইঙ্গিত পাইয়া সে গুটি গুটি কাছে আসিয়া যুক্তকরে বসিল, কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া বলিল—'আমার গৃহে যে অতিথিটা রয়েছে সে মূর্তি গড়তে জানে।'

লক্ষ্মীকর্ণ বিরক্তস্বরে বলিলেন—'মূর্তি গড়তে জানে এমন লোক অনেক আছে।'

লম্বোদর কহিল—'এ পাটলিপুত্রের লোক, হয়তো মগধের যুবরাজকে দেখেছে।'

লক্ষ্মীকর্ণ কিছুক্ষণ লম্বোদরের মুখের পানে প্রখরচক্ষে চাহিয়া রহিলেন, তাহার কথার মর্মার্থ বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি কতকটা নিজ মনেই বলিলেন—'বটে। তাহলে হয়তো—। লম্বোদর, তুমি চেষ্টা কর। যদি সে পারে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। এখনও

দশদিন সময় আছে।'

লম্বোদর ঘরে ফিরিয়া চলিল। মধুকর যে ভাল মূর্তি গড়িতে পারে তাহা সে নিজে দেখে নাই, বেতসীর মুখে শুনিয়াছিল। শিল্পকলার প্রতি তাহার তিলমাত্র অনুরাগ ছিল না, তাই সে উদাসীন ছিল। শিল্পকলার রসাস্বাদন করিবার সময়ই বা কোথায়? কিন্তু মধুকর পাটলিপুত্রের মানুষ, বিগ্রহপালকে অবশ্য দেখিয়াছে। সে যদি ভাল শিল্পী হয় নিশ্চয় বিগ্রহপালের মূর্তি গড়িতে পারিবে।

দুই

গতরাত্রে বিগ্রহপালের মুখে যৌবনশ্রীর সংকল্পের কথা শুনিয়া অনঙ্গের মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আজ প্রাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াও মনের তিলমাত্র উন্নতি হয় নাই। এই স্ত্রীজাতিকে লইয়া কি করা যায়!

ভগবান তাহাদের বুদ্ধি দেন নাই, ভালই করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির বুদ্ধির প্রয়োজন কি? সেজন্য পুরুষ আছে। মেয়েরা গৃহস্থালি করিবে, পতিগতপ্রাণা হইবে, সর্ববিষয়ে ভর্তার অনুবর্তিনী হইবে; পূজার্হা গৃহদীপ্তি হইয়া থাকিবে। মনু যথার্থই লিখিয়া গিয়াছেন, স্ত্রীজাতি বাল্যে পিতার বশ, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের। কিন্তু বর্তমান যুগের যুবতীরা মনুকে গ্রাহ্যই করে না; তাহারা ভাবে তাহাদের ভারি বুদ্ধি হইয়াছে। অবশ্য বান্ধুলি সে রকম নয়। কিন্তু রাজকন্যার এ কিরূপ মতিগতি? এমন একটা অসম্ভব সংকল্প করিয়া বসিলেন! তিনি বিগ্রহকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার এই ব্যবহার।...এত চেষ্টা এত কৌশল, বুড়া লক্ষ্মীকর্ণকে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার এমন সুযোগ—সব ভ্রষ্ট হইয়া গেল। নাঃ, স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস নাই—পুরুষের কাজ ভণ্ডুল করিবার জন্যই তাহাদের জন্ম।

এইরূপ ক্ষুব্ধ-বিরক্ত চিন্তায় বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া অনঙ্গ মূর্তি গড়িতে বসিয়াছিল। কিন্তু মূর্তি গঠনে তাহার মন বসিল না; একতাল মাটি লইয়া সে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। আজ সকালে উঠিয়া সে বান্ধুলির দেখা পায় নাই, ভোর হইতে না হইতে বান্ধুলি রাজবাটীতে চলিয়া গিয়াছে। সে জন্যও মন ভাল নয়।

পিছনে দরজা ভেজানো ছিল। একটু শব্দ শুনিয়া অনঙ্গ পিছু ফিরিয়া চাহিল; দেখিল দ্বার ঈষৎ ফাঁক করিয়া লম্বোদর উঁকি মারিতেছে। লম্বোদরের সুবর্তুল চোখ দুটিতে কৌতূহল, ভালুকে খাওয়া নাকটি শশকের নাকের মত একটু একটু নড়িতেছে, অধরে বোকাটে হাসি।

অনঙ্গ আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—'এই যে লম্বোদর ভদ্র। অনেকদিন আপনার দেখা নেই। আসুন।'

বকধার্মিকের মত শনৈঃ শনৈঃ পদক্ষেপ করিয়া লম্বোদর প্রবেশ করিল, অপ্রতিভস্বরে বলিল—'সময় পাই না। রাজকন্যার স্বয়ংবর ব্যাপারে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু কুটুম্বিনীর কাছে আপনার সংবাদ পাই। আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো?'

অনঙ্গ বলিল—'আমি পরম আনন্দে আছি।—বসুন। আজ বুঝি রাজকার্যের তেমন চাপ নেই?'

অনঙ্গ বুঝিয়াছিল লম্বোদর বিনা প্রয়োজনে আসে নাই; তাহার মন কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। লম্বোদর উপবেশন করিয়া বলিল—'হেঁ হেঁ, আপনি দেখছি মূর্তি গড়ছেন। কুটুম্বিনীর কাছে শুনেছি আপনি উত্তম শিল্পী; কিন্তু আপনার শিল্পবস্তু দেখার সুযোগ হয়নি।'

অনঙ্গ হাসিয়া বলিল—'সামনেই রয়েছে—দেখুন।'

লম্বোদর মূর্তিগুলি দেখিল ; তাহাদের শিল্প-সৌন্দর্য বুঝিল কিনা বলা যায় না, বলিল—'অহহ, কী সুন্দর !—আপনি নিশ্চয় মানুষ দেখে তার প্রতিমা গড়তে পারেন ?'

'পারি। দেখবেন ? তাহলে স্থির হয়ে বসুন।' মৃৎপিণ্ড তুলিয়া লইয়া অনঙ্গ গড়িতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যে একটি মুণ্ড তৈয়ার করিয়া বলিল—'দেখুন। কেমন হয়েছে ?'

লম্বোদর কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া থাকিয়া বলিল—'আপনি অদ্ভুত শিল্পী। মগধের ভদ্ররা দেখছি কলাকুশলী হয়। এঁ—আপনি মগধের যুবরাজ বিগ্রহপালকে দেখেছেন ?'

অনঙ্গ একটু চমকিত হইল। কলাকুশলতার সঙ্গে বিগ্রহপালের সম্পর্ক কি ? সে সতর্কভাবে বলিল—'দেখেছি—দূর থেকে।'

'আচ্ছা, আমার মুখ যেমন গড়লেন, তাঁর মুখ তেমন গড়তে পারেন ?'

'পারি। যার মুখ একবার দেখেছি তার মুখ গড়তে পারি। কেন বলুন দেখি ?'

লম্বোদর একবার কান চুলকাইল, একবার ঘাড় চুলকাইল,—তারপর বলিল—'মধুকর ভদ্র, আপনি শিল্পী। আপনার মত শিল্পী চেদিরাজ্যে নেই।'

অনঙ্গ বিনয় করিয়া বলিল—'না না, সে কি কথা !'

লম্বোদর বলিল—'চলুন আপনি রাজার কাছে। মহারাজ কর্ণদেব শিল্পকলার অনুরাগী, তিনি আপনার গুণের পরিচয় পেলে প্রীত হবেন।'

অনঙ্গের খট্‌কা লাগিল। লম্বোদরের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? তবে কি লক্ষ্মীকর্ণ জানিতে পারিয়াছে ? ছল করিয়া তাহাকে রাজপুরীতে লইয়া গিয়া বন্দী করিতে চায় ? কিন্তু না, লক্ষ্মীকর্ণ যদি জানিতে পারিত তাহা হইলে ছল-চাতুরী করিত না, গলায় রজ্জু দিয়া সিধা টানিয়া লইয়া যাইত। হয়তো অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে।

সে বলিল—'মহারাজের দর্শনলাভ তো ভাগ্যের কথা। কিন্তু—আমি সামান্য বিদেশী, বিনা প্রয়োজনে মহারাজের সম্মুখীন হওয়া—'

লম্বোদর বলিল—'স্বয়ংবর সভা অলঙ্কৃত হচ্ছে, মহারাজ আপনার গুণের পরিচয় পেলে আপনাকে দিয়েও অলঙ্করণের কাজ করিয়ে নিতে পারেন।'

অনঙ্গ ভাবিল, মন্দ কথা নয়। দেখাই যাক না ইহাদের মনে কি আছে। সে বলিল—'বেশ, আমি যাব। কখন যেতে হবে ?'

লম্বোদর বলিল—'এখনই চলুন না। আমাকে কর্মসূত্রে মহারাজের কাছে যেতে হবে। আপনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'এখনি ?'

'দোষ কি ? আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন, আমি ততক্ষণ কুটুম্বিনীকে দেখা দিয়ে আসি।'

লম্বোদর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে অনঙ্গ বেশবাস পরিবর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সামান্য বেশে রাজসমীপে যাওয়া চলিবে না ; অনঙ্গ মূল্যবান বেশভূষা পরিধান করিল। উপরন্তু অরিক্তপাণি হইয়া রাজার কাছে যাইতে হয়, হাতে উপঢৌকন থাকা প্রয়োজন। অনঙ্গ একটি স্বকৃত বিষ্ণুমূর্তি সঙ্গে লইল। লক্ষ্মীকর্ণকে সামনা-সামনি দেখিবার আকস্মিক সুযোগ পাইয়া তাহার মন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। এইবার মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের প্রকৃত স্বরূপ জানা যাইবে।

ওদিকে লম্বোদর রসবতীতে গিয়া দেখিল বেতসী রন্ধনকার্যে ব্যস্ত। পিছন হইতে বেতসীকে দেখিয়া সে দ্বারের কাছেই দাঁড়াইয়া পড়িল। বেতসীর কুণ্ডলিত চুলগুলি শিথিল হইয়া গ্রীবামূলে এলাইয়া পড়িয়াছে, কাঁচলি ও কটির মাঝখানে পিঠের নিম্নভাগ দেখা যাইতেছে। লম্বোদর উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া রহিল। শীর্ণ লতায় কখন অলক্ষিতে নব পল্লবোদ্‌গম হইতে আরম্ভ

করিয়াছে তাহা সে লক্ষ্য করে নাই।

হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া বেতসী লম্বোদরকে দেখিতে পাইল। হাতা-বেড়ি ফেলিয়া আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে সে লম্বোদরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আনন্দ বিগলিত স্বরে বলিল—'কখন এলে ?'

লম্বোদর চকিতে একবার বেতসীর সারা দেহে চক্ষু বুলাইয়া উদ্বিগ্নভাবে বলিল—'এই এলাম—এখনি আবার যেতে হবে।'

বেতসী তাহার হাতে হাত রাখিয়া আবদারের সুরে বলিল—'একটু থাক না। আজকাল দিনান্তে তোমার দেখা পাই না।'

লম্বোদর কুণ্ঠাভরে বলিল—'রাজকার্য—'

বেতসী বলিল—'হোক রাজকার্য, একটু থাক আমার কাছে।—আচ্ছা, এক কাজ কর না! আমার রান্না তৈরি, গরম গরম খেয়ে নাও না। নইলে তো সেই তিন পহর।'

লম্বোদর তাড়াতাড়ি বলিল—'না বেতসি, এখন নয়। রাজবাটী যেতে হবে। ফিরে এসে খাব।'

বেতসী ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—'রাজবাটী আর রাজবাটী। নিজের বাড়ি বুঝি কিছু নয়।—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে যাও।'

বেতসী নারিকেল গুড় ও ক্ষীর দিয়া মিষ্টান্ন তৈয়ার করিয়াছিল, দ্রুত গিয়া এক মুঠি আনিয়া বলিল—'হাঁ কর।'

লম্বোদর মুখ ব্যাদান করিল। বেতসী মুখের মধ্যে মিষ্টান্ন পুরিয়া দিয়া বলিল—'তবু পেটে ভর পড়বে।—জল নাও।'

জল পান করিয়া লম্বোদর বলিল—'আমি অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। চেষ্টা করব মধ্যাহ্নে ফিরতে।'

বেতসী বলিল—'আচ্ছা, আমি থালা সাজিয়ে বসে থাকব।'

ইতিমধ্যে অনঙ্গ সাজসজ্জা করিয়া মাথায় পাগ বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল ; লম্বোদর তাহাকে লইয়া বাহির হইল। পথে যাইতে যাইতে লম্বোদর অধিক কথা বলিল না, কিন্তু নানা কূটচিন্তার ফাঁকে ফাঁকে কর্মরতা বেতসীর চিত্রটি বার বার তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল।

তিন

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ গুপ্ত মন্ত্রগৃহেই ছিলেন। অনঙ্গ তাঁহার সম্মুখে বিষ্ণুমূর্তিটি রাখিয়া যুক্তকর হইল। লক্ষ্মীকর্ণ মূর্তিটি দেখিলেন, অনঙ্গকে দেখিলেন ; তারপর মূর্তিটি তুলিয়া লইলেন।

অনঙ্গও লক্ষ্মীকর্ণকে দেখিল। ইতিপূর্বে সে লক্ষ্মীকর্ণের রূপবর্ণনাই শুনিয়াছিল ; দেখিল বর্ণনায় তিলমাত্র অত্যুক্তি নাই। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ সত্যই একটি কদাকার অতিকায় দৈত্য বিশেষ।

অতঃপর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল। লক্ষ্মীকর্ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনঙ্গকে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন—'তুমি বিদেশী। তোমার নিবাস কোথায় ?'

অনঙ্গ বলিল—'আজ্ঞা, মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে।'

'নাম কি ?'

'আজ্ঞা, নাম মধুকর সাধু।'

'বৈশ্য ?'

'আজ্ঞা।'

'পিতার নাম ?'

অনঙ্গ প্রস্তুত ছিল, বলিল—'আমার পিতা স্বর্গত। নাম ছিল সুধাকর সাধু।'

'ত্রিপুরীতে কি জন্য এসেছ ?'

'স্বয়ংবর উপলক্ষে শিল্পসামগ্রী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এসেছি।'

'অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই ?'

'অন্য উদ্দেশ্য দেশ ভ্রমণ।'

লক্ষ্মীকর্ণ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন।—

'তুমি পাটলিপুত্রের লোক, যুবরাজ বিগ্রহপালের সঙ্গে নিশ্চয় পরিচয় আছে ?'

অনঙ্গ জিভ কাটিয়া বলিল—'আজ্ঞা না। আমি সামান্য ব্যক্তি, রাজপুত্রের সঙ্গে পরিচয় নাই। তবে তাঁকে অনেকবার দেখেছি।'

'বিগ্রহপাল এখন কোথায় জানো ?'

'সম্ভবত পাটলিপুত্রেই আছেন। আমি জানি না।'

লক্ষ্মীকর্ণ গলার মধ্যে শব্দ করিলেন, বলিলেন—'আমি সংবাদ পেয়েছি সে পাটলিপুত্রে নেই। যা হোক—' লক্ষ্মীকর্ণ ক্ষণেক বাক্‌ সম্বরণ করিয়া পুনশ্চ বলিলেন—'তুমি পাটলিপুত্রের লোক হলেও তোমাকে সজ্জন বলে মনে হচ্ছে।' বিষ্ণুমূর্তিটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন—'লম্বোদরের মুখে শুনলাম তুমি ভাল শিল্পী, তোমার কাজ দেখেও তাই মনে হচ্ছে।—তুমি দেখা-মুখের প্রতিমা গড়তে পারো ?'

'আজ্ঞা পারি' বলিয়া অনঙ্গ লম্বোদরের পানে চাহিল। লম্বোদর সবেগে মুণ্ড আন্দোলন করিল।

'ভাল।' মহারাজ কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া বলিলেন—'তোমাকে দিয়ে একটা গোপনীয় কাজ করাতে চাই। যদি করতে পারো, পুরস্কার পাবে।'

হাত জোড় করিয়া অনঙ্গ বলিল—'আজ্ঞা করুন।'

মহারাজ ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বলিলেন—'তোমরা আমার সঙ্গে এস।'

কয়েকটি অলিন্দ পার হইয়া শিল্পশালার দ্বার। শিল্পশালা রাজভবনের অন্তর্গত হইলেও তাহার প্রবেশদ্বার স্বতন্ত্র। দ্বারে শূলধারী দৌবারিক পাহারা দিতেছে।

লক্ষ্মীকর্ণ সঙ্গীদের লইয়া প্রবেশ করিলেন। শিল্পশালার কক্ষটি সভাগৃহের ন্যায় বিস্তৃত, মাঝে মাঝে স্থূল স্তম্ভ ছাদকে ধরিয়া রাখিয়াছে ; স্তম্ভের গায়ে শিল্পকর্ম। কিন্তু শোভা কিছু নাই। দুই চারিটা প্রাচীরচিত্র, দুই চারিটা প্রস্তরমূর্তি যত্রতত্র বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়াইয়া আছে, যত্নের অভাবে ধূলিমলিন হইয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মীকর্ণের পূর্বপুরুষেরা শিল্পকলারসিক ছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণ নিজে ও-সবের ধার ধারেন না। হঠাৎ দুষ্টবুদ্ধি মস্তিষ্কে উদিত হওয়ায় শিল্পশালার দ্বার খুলিয়াছে।

শিল্পশালার মাঝখানে একটি স্তম্ভে ঠেস দিয়া হতাশ ভঙ্গিতে শিল্পী বসিয়া আছে। তাহার পাশে স্তূপীকৃত মূর্তি গড়িবার মৃত্তিকা, সম্মুখে অসংখ্য মৃন্ময় মুণ্ড, অদূরে একটি মুণ্ডহীন কবন্ধ। কবন্ধ ও মুণ্ডগুলি সবই প্রমাণ আকৃতির।

রাজাকে দেখিয়া শিল্পী এস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহাকে বলিলেন—'চক্রনাথ, তুমি এখন গৃহে যাও। তোমার কাজ সম্বন্ধে কারও সঙ্গে জল্পনা করবে না। যদি প্রয়োজন হয় তোমাকে

আবার ডেকে পাঠাব।'

শিল্পী চক্রনাথ অনঙ্গের প্রতি বক্র কটাক্ষপাত করিল, তারপর 'যথা আজ্ঞা মহারাজ' বলিয়া প্রস্থান করিল।

তখন লক্ষ্মীকর্ণ অনঙ্গকে বলিলেন—'মধুকর, এই মুণ্ডগুলা দেখে বলতে পার, বিগ্রহপালের সঙ্গে কোনও মুণ্ডের সাদৃশ্য আছে কিনা ?'

লক্ষ্মীকর্ণ কোন্ পথে চলিয়াছেন তাহা অনঙ্গ এখনও বুঝিতে পারে নাই, মনের মধ্যে বিস্ময় লুকাইয়া সে মুণ্ডগুলি পরীক্ষা করিল, বলিল—'না আর্য, সাদৃশ্য নেই।'

'তুমি বিগ্রহপালের মুণ্ড গড়ে দেখাতে পার ?'

'মোটামুটি গড়ে দেখাতে পারি।'

'দেখাও।'

অনঙ্গ তখন মর্মর কুট্টিমের উপর উপবেশন করিল, মাথার পাগ খুলিয়া পাশে রাখিল, এক তাল মাটি তুলিয়া দুই হাতে গড়িতে আরম্ভ করিল। রাজা তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

বিগ্রহপালের মুখ গঠন করা অনঙ্গের পক্ষে কিছুই কঠিন কাজ নয় ; চোখ মুদিয়া গড়িতে পারে। কিন্তু সে ত্বরা করিল না : ধীরে ধীরে, যেন স্মরণ করিতে করিতে গড়িতে লাগিল। অবশেষে অর্ধদণ্ড পরে মুণ্ডটি এক পীঠিকার উপর রাখিয়া বলিল—'তাড়াতাড়িতে ভাল হল না। তবু চিনতে বোধহয় কষ্ট হবে না।'

মুণ্ড দেখিয়া লক্ষ্মীকর্ণের ব্যাঘ্র-মুখে হাসি ফুটিল ; হাঁ, সেই মুখই বটে। তিনি অনঙ্গের স্কন্ধে থাবা রাখিয়া বলিলেন—'তুমি উত্তম শিল্পী, তোমাকে আমি রাজশিল্পী করে রাখব। চক্রনাথটা ঘোর অকর্মণ্য। —এখন কী কাজ করতে হবে শোনো।'

লক্ষ্মীকর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষায় নিজ উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেন। শুনিতে শুনিতে অনঙ্গের মুখ ভাবলেশহীন হইয়া গেল, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ক্রিয়া চলিতে লাগিল। হতভাগ্য বুড়ার এই উদ্দেশ্য ! প্রকাশ্য স্বয়ংবর সভায় বিগ্রহপালকে অপদস্থ করিতে চায় !

লক্ষ্মীকর্ণ যতক্ষণে নিজ বক্তব্য শেষ করিলেন ততক্ষণে অনঙ্গ নূতন ফন্দি বাহির করিয়াছে। দাঁড়াও বুড়া, তোমার অস্ত্রে তোমাকে সংহার করিব ! তুমি বিগ্রহপালের মুখে চুন-কালি দিতে চাও, তোমার নিজের মুখে চুন-কালি পড়িবে। এতক্ষণ পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না, এবার পাইয়াছি। যৌবনশ্রী স্বয়ংবর সভাতেই বিগ্রহপালের গলায় মালা দিবে—

লক্ষ্মীকর্ণ প্রশ্ন করিলেন—'কত দিন সময় লাগবে ?'

অনঙ্গ যুক্তকরে বলিল—'ভাল করে তৈরি করতে কিছু সময় লাগবে মহারাজ।'

'স্বয়ংবরের আগে তৈরি হওয়া চাই। তোমার যদি কোনও দ্রব্য প্রয়োজন হয় আমাকে জানিও।'

'আজ্ঞা, আমার কিছু বেতস ও বাঁশের কঞ্চি চাই। এই যে মাটির কবন্ধ তৈরি হয়েছে এ বড় ভারী। আমি কঞ্চি ও বেতস দিয়ে দেহের কাঠামো তৈরি করব ; এত লঘু হবে যে দুইজন লোক মূর্তিটাকে এখান থেকে স্বয়ংবর সভায় নিয়ে যেতে পারবে।'

'বেশ বেশ। তুমি যা চাও তাই পাবে। এবার কাজ আরম্ভ করে দাও। আমি মাঝে মাঝে এসে তোমার কাজ দেখে যাব। যতদিন তোমার কাজ শেষ না হয় ততদিন তুমি এখানেই থাকবে। স্বয়ংবরের আগের রাত্রে স্বয়ংবর সভায় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে তারপর তোমার ছুটি।'

অনঙ্গ ত্রস্ত হইয়া বলিল—'কিন্তু মহারাজ—'

'তোমার প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র সব লম্বোদর পৌঁছে দেবে। তুমি এখানেই পানাহার করবে,

রাজ-পাকশালা থেকে তোমার আহার্য আসবে। রাত্রে শয়নের জন্য শয্যা পাবে। যতদিন কাজ শেষ না হয় ততদিন এই ব্যবস্থা।'

মহারাজ লম্বোদরকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। দৌবারিককে বলিয়া গেলেন যেন কোনও অবস্থাতেই শিল্পীকে বাহিরে যাইতে দেওয়া না হয়।

অনঙ্গ মাথায় হাত দিয়া বসিল। বাহির হইতে না পারিলে সে বিগ্রহপালের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবে কিরূপে?

চার

লম্বোদর যখন গৃহে ফিরিল তখন তৃতীয় প্রহর আগতপ্রায়। ইতিমধ্যে বান্ধুলি আসিয়াছিল; দুই ভগিনী রসবতীতে অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। লম্বোদর ও অতিথি ফিরিলে তাহাদের খাওয়াইয়া নিজেরা খাইতে বসিবে।

লম্বোদরকে দেখিয়া বেতসী বলিল—'এতক্ষণে আসা হল। নাও, আর দেরি নয়, বসে পড়। সব জুড়িয়ে গেল।'

লম্বোদর হাত ধুইয়া পীঠিকায় বসিল। বেতসী তাহার সম্মুখে থালি ধরিয়া দিয়া বলিল—'বান্ধুলি, তুই অতিথির খাবার দিয়ে আয়।'

লম্বোদর মুখে গ্রাস তুলিতে যাইতেছিল, থামিয়া বলিল—'অতিথি আসেনি।'

বেতসী অবাক হইয়া বলিল—'আসেনি! ওমা, কোথায় গেল অতিথি?'

লম্বোদর খাদ্যচর্বণ করিতে করিতে নিরুদ্বেগকণ্ঠে বলিল—'রাজপুরীতে আছে।'

বান্ধুলি অতিথির থালা হাতে লইবার জন্য নত হইয়াছিল, সেই অবস্থাতেই রহিল; তাহার মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়িল। সে শুনিয়াছিল অনঙ্গ লম্বোদরের সঙ্গে বাহির হইয়াছে, কিন্তু ফিরিয়া আসিল না কেন? রাজবাড়িতে রহিল কি জন্য?

বেতসী বলিল—'রাজপুরীতে! কখন ফিরবে?'

লম্বোদর বলিল—'এখন দু'চার দিন সেখানেই থাকবে।'

বান্ধুলির বুক ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তবে কি রাজা জানিতে পারিয়াছে, অনঙ্গকে ছলে রাজপুরীতে লইয়া গিয়া কারাগারে পুরিয়াছে?

বেতসী বলিল—'সে কি! রাজপুরীতে থাকবে কেন?'

লম্বোদর বলিল—'রাজা তাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিতে চান, যতদিন কাজ শেষ না হয় ততদিন সে শিল্পশালায় থাকবে। ভাবনার কিছু নেই, খুব আরামে থাকবে। রাজার পাকশালা থেকে খাবার আসবে।'

বেতসী আরও অবাক হইয়া বলিল—'হ্যাঁ গা, কী এমন কাজ?'

'একটা মূর্তি গড়তে হবে।'

'কার মূর্তি? রাজার? রাজকন্যের?'

লম্বোদর আর উত্তর দিল না, আহারে মন দিল। এতটা না বলিলেই ভাল হইত। মেয়েদের বড় বেশি কৌতূহল, তার উপর পেটে কথা থাকে না। যা হোক, আহার শেষ করিয়া আচমন করিতে করিতে সে বলিল—'এসব কথা কাউকে বলবে না। আমি এখন চললাম, অতিথির কিছু তৈজসপত্র শিল্পশালায় পৌঁছে দিতে হবে।'—

লম্বোদর প্রস্থান করিবার পর দুই ভগিনী আবার রসবতীতে ফিরিয়া আসিল। বেতসী

বলিল—'আয় খেতে বসি।'

বান্ধুলি বলিল—'দিদি!'

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বেতসী চমকিয়া তাহার পানে চাহিল। এতক্ষণ বান্ধুলির মুখের পানে তাহার নজর পড়ে নাই, এখন দেখিল বান্ধুলির মুখ যেন শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বেতসী বলিল—'কি রে?'

বান্ধুলি বলিল—'আমি—আমি রাজবাটীতে ফিরে যাই।'

'বেশ তো। খেয়ে নে, তারপর যাস।'

'না দিদি, আমি যাই—'

বেতসী বান্ধুলির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'কী হয়েছে বল দেখি।'

উত্তর দিতে গিয়া বান্ধুলি কাঁদিয়া ফেলিল, তারপর বেতসীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ গুঁজিল।

বেতসীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না—'বান্ধুলি!'

বান্ধুলি গলার মধ্যে অস্পষ্টস্বরে বলিল—'বড় ভয় করছে।'

হঠাৎ বেতসীর মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল। মধুকর! মধুকরের বিপদ আশঙ্কা করিয়া বান্ধুলি উতলা হইয়াছে। মধুকরকে সে মনে মনে—!

বেতসী বলিল—'দেখি, মুখ তোল।'

বান্ধুলি অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিল। বেতসী তাহার মুখ দেখিয়া মহানন্দে হাসিয়া উঠিল—'তুই মধুকরকে—আঁ!'

বান্ধুলির অশ্রুপ্লাবন আরও বাড়িয়া গেল। বেতসী তাহাকে আবার কণ্ঠলগ্ন করিয়া বলিল—'এই কথা! তা এত কান্না কিসের? শুনলি তো রাজা মূর্তি গড়াবার জন্যে তাকে রাজপুরীতে রেখেছেন। এতে ভাবনার কী আছে?'

বেতসী সব কথা জানে না, সুতরাং তাহার ভাবনার কিছু না থাকিতে পারে; কিন্তু বান্ধুলি নিশ্চিন্ত হইবে কি করিয়া? লম্বোদর যে মিথ্যা স্তোক দেয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত বান্ধুলির মন প্রবোধ মানিবে না। সে ভাঙ্গা গলায় বলিল—'আমি যাই দিদি। তুই কাউকে কিছু বলিস না। কুটুম্ব যদি জানতে পারে—'

বেতসী বলিল—'তুই নিশ্চিন্ত থাক।'

বান্ধুলি চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

বেতসী একাই খাইতে বসিল। মধুকরের প্রতি বান্ধুলির মন আসক্ত হইয়াছে ইহা বেতসী আগে জানিতে পারে নাই। কি করিয়াই বা জানিবে? তাহার মন নিজের পুনরুজ্জীবিত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার জালে জড়াইয়া গিয়াছিল, বান্ধুলির মনের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই। এখন উদ্বেলিত আনন্দে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। কেবল বান্ধুলির জন্য নয়, নিজের জন্যও। সংশয়ের দুষ্ট কীট তাহার বুকের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছিল, স্বাস্থ্যোন্নতির পরও কীটের দংশন থামে নাই। কিন্তু এখন আর ভয় নাই। বান্ধুলি মধুকরকে চায়। এখন বেতসী লম্বোদরের মন আবার আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিবে।

বান্ধুলি যখন রাজপুরীতে পৌঁছিল তখন তাহার চোখের জল শুকাইয়াছে। সে প্রথমে রাজ-পাকশালায় উপস্থিত হইল। রাজপুরীর কাণ্ড, অনঙ্গ খাইতে পাইয়াছে কিনা তাহা আগে জানা দরকার।

রাজপুরীর বিশাল পাকশালা, দশ বারোটা আখা জ্বলিতেছে। রাজ পরিবারের আহার সমাধা

হইলেও অসংখ্য পরিজনের মধ্যাহ্ন ভোজন এখনও বাকি। একপাল পাচক প্যাচিকা কলরব করিতেছে, পাকশালা কাকসমাকুল উচ্ছিষ্ট স্থানের ন্যায় মুখরিত।

বান্ধুলিকে দেখিয়া কল-কোলাহল একটু শান্ত হইল। বান্ধুলিকে রাজপুরীতে কে না চেনে ? কনিষ্ঠা কুমার-ভট্টারিকার সখী।

বান্ধুলি প্রধান সূপকারের কাছে গিয়া বলিল—'কৃষ্ণ, শিল্পশালায় খাবার পাঠাতে হবে জানো ?'

কৃষ্ণ স্থূলকায় বয়স্ক ব্যক্তি, ঘর্মাক্ত দেহে রন্ধন পরিদর্শন করিতেছিল ; সে বলিল—'হাঁ দিদি, শিল্পশালায় খাবার পাঠাতে হবে খবর পেয়েছি। —ও মারুতির মা, শিল্পশালায় খাবার নিয়ে যেতে বলেছিলাম তার কি হল ?'

মারুতির মা প্রৌঢ়া বিধবা, অদূরে বসিয়া লোহার উদূখলে কচি আম কুটিয়া কাশমর্দ তৈয়ার করিতেছিল, বলিল—'এই যে বাছা, একটা কাজ সেরে তবে তো অন্য কাজে হাত দেব। এটা হলেই দিয়ে আসব।'

বান্ধুলি কৃষ্ণকে বলিল—'আমার হাতে দাও, আমি দিয়ে আসছি।'

কৃষ্ণ বলিল—'তুমি দিয়ে আসবে দিদি ! তাহলে তো কথাই নেই। এই যে আমি খাবার সাজিয়ে দিচ্ছি।'

কৃষ্ণ বুঝিয়াছিল রাজকন্যার সখী নিজের হাতে যাহার খাবার লইয়া যাইতে চায় সে সামান্য লোক নয়। কৃষ্ণ প্রকাণ্ড থালায় উৎকৃষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইয়া বান্ধুলির হাতে দিল।

বান্ধুলি থালি লইয়া শিল্পশালার দিকে চলিল। দেখিল শিল্পশালার দ্বারে অস্ত্রধারী দৌবারিক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল।

দৌবারিকও বান্ধুলিকে চিনিত। বলিল—'শিল্পীর জন্য খাবার এনেছ ?'

বান্ধুলি বলিল—'হাঁ। লম্বোদর ভদ্র কি এসেছিলেন ?'

দৌবারিক বলিলেন—'হাঁ। শিল্পীর তৈজসপত্র রেখে গেছেন। যাও, ভিতরে যাও।'

যাক, লম্বোদরের সঙ্গে এখানে সাক্ষাৎকার ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। বান্ধুলি সাহস করিয়া শিল্পশালায় প্রবেশ করিল। বিশাল কক্ষের এক কোণে শয্যা পাতিয়া অনঙ্গ অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। বান্ধুলিকে দেখিয়া সে এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাতছানি দিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল।

বান্ধুলি যখন তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িয়াছে। অনঙ্গ কিন্তু আনন্দের আবেগে আর একটু হইলেই তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিত, যথাসময় আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—'বান্ধুলি ! তুমি !'

বান্ধুলি শয্যার পাশে থালা নামাইয়া বলিল—'আগে খেতে বোসো। খুব পেট জ্বলছে তো !'

'পেট ! হাঁ, জ্বলছে বটে।' অনঙ্গ সংযতভাবে খাইতে বসিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় যে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা সে নানা দুশ্চিন্তায় ভুলিয়া গিয়াছিল।

বান্ধুলি হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'বাড়ি গিয়ে শুনলাম তুমি কুটুম্বের সঙ্গে বেরিয়েছ। তারপর কুটুম্ব ফিরে এলেন, তুমি এলে না। কুটুম্ব বললেন, রাজা তোমাকে শিল্পশালায় আটকে রেখেছেন। তাই আমি—'

'ধন্য।' কিছুক্ষণ নীরবে আহার করিয়া অনঙ্গ মুখ তুলিল—'তুমি খেয়েছ ?'

বান্ধুলি হেঁট মুখে মাথা নাড়িল। অনঙ্গ তখন পাত হইতে এক খণ্ড ভর্জিত মৎস্যাণ্ড লইয়া বান্ধুলির মুখের কাছে ধরিল, বলিল—'খাও।'

বান্ধুলি সলজ্জে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—'যাঃ !'

অনঙ্গ মৎস্যাণ্ডটি তাহার মুখের কাছে ধরিয়া রাখিয়া বলিল—'এক পাতে না খেলে বৌ হওয়া

যায় না।'

বান্ধুলি ক্ষণেক দ্বিধা করিল ; তারপর মুখ ফিরাইয়া মৎস্যাণ্ডে একটু কামড় দিয়া মুখ বুজিল। অনঙ্গ আর পীড়াপীড়ি করিল না। বাকি মৎস্যাণ্ড নিজের মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল এবং বান্ধুলির পানে আড়চোখে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বান্ধুলির মুখ আকণ্ঠ রাঙা হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে অনঙ্গ সতর্কভাবে ঘাড় তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল। দ্বার এখান হইতে অনেকটা দূরে, দৌবারিককেও এ কোণ হইতে দেখা যায় না। তাহাদের কথা কেহ শুনিতে পাইবে না এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া অনঙ্গ গলা নামাইয়া বলিল—'বান্ধুলি, তোমাকে আমি সব কথা বলিনি। কিন্তু তুমি বুদ্ধিমতী, যা বলিনি তা নিশ্চয় অনুমান করে নিয়েছ। আমি এক নূতন ফন্দি বার করেছি। দেবী যৌবনশ্রী যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছেন তাকে সরাবার কৌশল উদ্ভাবন করেছি। এখন যা বলছি মন দিয়ে শোনো। বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী ছাড়া একথা আর কাউকে বলবে না। আর কেউ যদি জানতে পারে সর্বনাশ হয়ে যাবে ; মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ আমাদের সবাইকে কুচ্ কুচ্ করে কেটে ফেলবেন।'

বান্ধুলি কম্প্রবক্ষে শঙ্কা-হর্ষ-উত্তেজনা লইয়া শুনিল ; অনঙ্গ বক্তব্য শেষ করিয়া বলিল—'তুমি এখন যাও। অনেকক্ষণ আছ, প্রহরীটা সন্দেহ করবে।'

'সন্ধ্যার পর আবার আমি তোমার খাবার নিয়ে আসব।'

অনঙ্গ হাসিল—'এস।'

শূন্য ভোজনপাত্র লইয়া বান্ধুলি পিছু ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। অনঙ্গ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার জীবনে অভাবিত পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে ; কিন্তু বান্ধুলির সহিত বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তাহাদের প্রণয়কুঞ্জ স্থানান্তরিত হইয়াছে মাত্র।...নাঃ, বান্ধুলিকে লইয়া পলাইতে না পারিলে জীবন বৃথা!

সে উঠিয়া গিয়া কাদামাটি লইয়া কাজ আরম্ভ করিল।

পাঁচ

বিগ্রহপালের মন লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল। বণিকের তরণী সাত সাগর পাড়ি দিয়া শেষে নিজ ঘাটের কাছে আসিয়া ডুবিবার উপক্রম করিতেছে। অমৃতের পূর্ণপাত্র অধরের কাছে আসিয়া খসিয়া পড়িতেছে! এখন কি করা যায়?

বিগ্রহপাল প্রথম দর্শনে যৌবনশ্রীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন ; তারপর যৌবনশ্রীর কোমল মধুর প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া প্রীতির রসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এতখানি চরিত্রের দৃঢ়তা যৌবনশ্রীর আছে তাহা তিনি কল্পনা করেন নাই। এই দৃঢ়তার ফলে বিগ্রহপালের সমস্ত পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মরি মরি! কী চরিত্র! এমন চরিত্র নহিলে মগধের পট্টমহিষী হইবার যোগ্যতা আর কাহার আছে! বিগ্রহপাল এতদিন যৌবনশ্রীকে শুধুই ভালবাসিয়াছেন ; এখন শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। যৌবনশ্রীর মত নারীকে পত্নীরূপে না পাইলে জীবন মরুভূমি।

কিন্তু কী উপায়ে তাহাকে পাওয়া যায়? বিগ্রহপাল নিজে কোনও পন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। অনঙ্গ পরিস্থিতির কথা শুনিয়াছে কিন্তু কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। রন্তিদেবও শুনিয়াছেন, কিন্তু বিমর্ষভাবে মস্তকান্দোলন করিয়া 'গ্রহের ফের' বলা ছাড়া আর কিছুই

করিতে পারেন নাই।

রাত্রে বিগ্রহপালের ভাল নিদ্রা হয় নাই। প্রভাতে উঠিয়া তিনি বিক্ষিপ্তচিত্তে শয়নকক্ষে পাদচারণ করিলেন। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের কথা যতবার মনে আসিল ততবার ক্রোধে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। ওই হতভাগা বুড়াই যত নষ্টের গোড়া। ও যদি বাক্যদান করিয়া বাক্যভঙ্গ না করিত তাহা হইলে কোনও গণ্ডগোলই হইত না। নষ্টবুদ্ধি জরদ্গব! মোহান্ধ মর্কট! অনার্য বর্বর পিশুন!

ভাবী শ্বশুরের উদ্দেশে কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া কোনও ফল হইল না, মাথায় বুদ্ধি আসিল না। বেলা বাড়িতে লাগিল। রন্তিদেব প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিগ্রহপালের মন প্রবোধ মানিল না। অনঙ্গও আসিল না। সে কোথায় গেল? বোধহয় বান্ধুলিকে লইয়া মত্ত হইয়া আছে, নহিলে এতক্ষণে একটা ফন্দি বাহির করিতে পারিত। বিগ্রহপাল ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন—হায়, আপৎকালে অতিবড় বান্ধবও ত্যাগ করে—

দ্বিপ্রহরে নামমাত্র আহার করিয়া বিগ্রহপাল শয্যায় শয়ন করিলেন। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—অগ্নিকন্দুক! তিনি দ্রুত শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। ত্রিপুরীতে পদার্পণ করিবার পর হইতে তিনি অগ্নিকন্দুকের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিনা যুদ্ধে শত্রুকে জয় করিবার পর অস্ত্রশস্ত্রের কথা কে মনে রাখে? কিন্তু এখন আবার বিপাকে পড়িয়া এই পরম অস্ত্রটির কথা মনে পড়িয়া গেল।

বিগ্রহপাল উঠিয়া পেটরা খুলিলেন। পেটরার তলদেশে বস্ত্রাবরণের মধ্যে অগ্নিকন্দুকটি রহিয়াছে। পলাণ্ডুকন্দের ন্যায় আকৃতি, অজ্ঞ ব্যক্তি দেখিলে ভাবিতেও পারে না উহার মধ্যে অমিতশক্তি সংহত আছে। কিন্তু বিগ্রহপাল স্বচক্ষে ইহার তেজ দেখিয়াছেন; তিনি অনেকক্ষণ কন্দুকটি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর আবার পেটরার মধ্যে সযত্নে রাখিয়া দিতে দিতে মনে মনে বলিলেন—সিধা পথে যদি যৌবনাকে না পাই, স্বয়ংবর সভা ছারখার করিয়া দিব।

সন্ধ্যার পর বিগ্রহপাল নদীতীরে গেলেন। রাজপুরীর পশ্চাতে চাঁদের আলোয় বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী দাঁড়াইয়া আছেন। বিগ্রহপাল প্রথমেই গিয়া বীরশ্রীর হাত ধরিলেন—'দেবি, এ কি হল! এখন কি উপায় হবে?'

বীরশ্রী হাসিয়া বলিলেন—'উপায় হয়েছে।'

বিগ্রহপাল উত্তেজিতভাবে দুই ভগিনীর মুখ পর্যায়ক্রমে নিরীক্ষণ করিলেন—'উপায় হয়েছে!'

'হয়েছে। অনঙ্গ ভদ্র উপায় বার করেছেন।'

'অনঙ্গ! সে কোথায়? তাকে কোথায় পেলেন?'

'সব বলছি, অস্থির হয়ো না। এস, ঘাসের ওপর বসি।'

তিনজন শষ্পাস্তরণের উপর বসিলেন; মধ্যে বিগ্রহ, দুইপাশে দুই ভগিনী। বীরশ্রী বান্ধুলির মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া বিগ্রহপাল কখনও ক্রুদ্ধ হইলেন, কখনও কৌতুকে হাসিলেন; ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের প্রতি যে ক্রোধ হইল তাহা তরল হাস্যরসে ভাসিয়া গেল। অনঙ্গের প্রতি মনে মনে যে অবিচার করিয়াছিলেন সেজন্য লজ্জিত হইলেন। তারপর যৌবনশ্রীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন—'এবার হয়েছে তো? বানরের গলায় মালা দিতে আপত্তি নেই?'

যৌবনশ্রী মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে নীরব রহিলেন। বীরশ্রী বলিলেন—'যার যেমন পছন্দ।'

সেরাত্রে চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত আলাপ আলোচনা হইল। অনন্তর বিগ্রহপাল যখন নদীতীর হইতে ফিরিয়া চলিলেন তখন তাঁহার মন অনেকটা শান্ত হইয়াছে। অনঙ্গ মন্দ ফন্দি বাহির করে নাই।

যৌবনশ্রীকে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল বটে, কিন্তু এই নূতন কৌশল আরও চমকপ্রদ, আরও নাটকীয়। সারা ভারতবর্ষে সাড়া পড়িয়া যাইবে, মুখে মুখে গল্প রচিত হইবে। লক্ষ্মীকর্ণ যেমন মগধকে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেছে তেমনি নিজে হাস্যাস্পদ হইবে। পালবংশের গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইবে।

ছয়

আকাশের চাঁদ স্বয়ংবরের দিন লক্ষ্য করিয়া ক্রমশ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সেদিন আবার বসন্তপূর্ণিমা—হোলিকা ; রঙ ও কুঙ্কুম খেলার দিন।

স্বয়ংবরের দিন যত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তত বড় বড় রাজারা আসিতেছেন। কেহ গজপৃষ্ঠে, কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ চতুর্দোলায়। বড় রাজাদের মধ্যে আছেন উৎকলরাজ, অন্ধ্ররাজ, এবং সর্বোপরি কর্ণাটের মহাপরাক্রান্ত বিক্রমাদিত্য। কর্ণাটের বিক্রমাদিত্য বয়সে পঞ্চাশোর্ধ্বগত হইলেও অদ্যাপি যুবরাজ। অতিবৃদ্ধ পিতা এখনও সিংহাসনে আসীন, তাই তিনি যুবরাজ অবস্থাতেই বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়াছেন। অতিশয় দুর্মদ বীর ; অনেকগুলি মহিষীর স্বামী। কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণের নিকট গোপন ইঙ্গিত পাইয়া স্বয়ংবর সভায় আসিয়াছেন।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের ব্যস্ততা প্রত্যেক নূতন রাজার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইতেছে। তিনি দিবাভাগে অক্লান্তদেহে অতিথি সৎকার করিতেছেন এবং রাত্রিকালে অপর্যাপ্ত মদিরা সেবন ও ময়ূরমাংস ভক্ষণ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তবু শিল্পকর্মের কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই, অবকাশ পাইলেই চট্ করিয়া গিয়া অনঙ্গের কাজকর্ম পরিদর্শন করিয়া আসিতেছেন।

অনঙ্গের শিল্পকর্ম শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। সে ইচ্ছা করিয়াই মন্থর হস্তে কাজ করিতেছে ; শীঘ্র কাজ শেষ করিলেও স্বয়ংবরের আগে ছাড়া পাওয়া যাইবে না। তাড়া কিসের ? বাঙ্কুলির সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইতেছে, বাঙ্কুলি বিগ্রহের সংবাদ আনিয়া দিতেছে। সমস্ত প্রস্তুত ; এখন স্বয়ংবরের শুভলগ্ন উপস্থিত হইলেই হয়।

অনঙ্গ বাঁশের চঞ্চারি দিয়া একটি বৃহৎ খাঁচা তৈয়ার করিয়াছে ; ইহা মূর্তির নিম্নাঙ্গ। খাঁচার অধোভাগ শূন্য, শুধু চারিপাশে ঘন কঞ্চির বেড়া, তাহার উপর মৃত্তিকার লঘু প্রলেপ। এই নিম্নাঙ্গ দেখিয়া মনে হয় মূর্তি উচ্চ আসনের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছে। মূর্তির উধর্বাঙ্গ ও হস্তদ্বয় বেত্র দিয়া নির্মিত হইয়াছে ; অঙ্গে রঞ্জিত পট্টতন্তুর বড় বড় লোম। এখনও স্কন্ধের উপর মুণ্ড বসে নাই ; যখন বসিবে তখন কাহারও বুঝিতে বাকি থাকিবে না যে মগধের যুবরাজ বিগ্রহপাল একটি মর্কট।

বাঙ্কুলি অনঙ্গের খাবার লইয়া আসে, অনঙ্গ খাইতে বসিলে ব্যাকুলনেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। যত দিন যাইতেছে তাহার মনের উদ্বেগ ততই বাড়িয়া যাইতেছে। কী হইবে ? শেষ রক্ষা হইবে তো ! এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন দিশাহারা হইয়া যায়। অথচ অনঙ্গ সম্পূর্ণ অটল, সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ; যেন তাহার কোনও দুশ্চিন্তাই নাই। বাঙ্কুলির ভয় ও দুশ্চিন্তা যখন অত্যন্ত বাড়িয়া যায় তখন তাহার দুই চোখে জল ভরিয়া ওঠে ; ইচ্ছা হয় ওই অটল মানুষটির বুকে মুখ গুঁজিয়া সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়। অনঙ্গ তাহার চোখের জল দেখিয়া হাসে, মুখের কাছে মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া বলে—'কেঁদো না, চন্দ্রপুলি খাও।'

নগরের মাঝখানে রন্তিদেবের গৃহে বিগ্রহপাল পিঞ্জরনিবদ্ধ বন্য ব্যাঘ্রের ন্যায় পরিক্রমণ করিতেছেন। দিনগুলি তাঁহার পিঞ্জরের লৌহ শলাকা ; একটি একটি করিয়া খসিয়া পড়িতেছে

বটে, কিন্তু যতদিন সবগুলি না খসিবে ততদিন তাঁহার উদ্ধার নাই। প্রত্যহ নদীতীরে যৌবনশ্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে, কিন্তু এ যেন প্রকৃত মিলন নয় ; দুইজনের মাঝখানে অদৃশ্য পিঞ্জরের শলাকা ব্যবধান রচনা করিয়াছে। অধীরতা দূর হইতেছে না। রন্তিদেব নানাভাবে তাঁহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছেন, নববল পাশা ইত্যাদি খেলার দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু বিশেষ ফল হইতেছে না।

লম্বোদরের গৃহে বেতসীর দেহ-মনে যেন স্বাস্থ্য ও স্ফূর্তির জোয়ার আসিয়াছে। দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা। ওই বেঁটে খাঁদা বর্তুলচক্ষু লোকটিকে সে ভালবাসে ; কেন এত ভালবাসে সে নিজেই জানে না। স্বামী বলিয়াই যে ভালবাসে তাহা নয় ; নিতান্তই অহৈতুকী প্রীতি, রূপগুণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ভালবাসা চায়। প্রীতির ক্ষেত্রে শুধু দিয়া সুখ নাই, পাওয়াও চাই ; তবে মন ভরে। তাই হারানো ভালবাসা ফিরিয়া পাইবার আশায় বেতসী নববর্ষা সমাগমে কদম্বপুষ্পের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে।

লম্বোদরের মানসিক অবস্থা একটু অন্য প্রকার। সে যখন বেতসীকে খরচের খাতায় লিখিয়াছিল তখন তাহার মন স্বভাবতই বান্ধুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এখন পুনরুজ্জীবিতা বেতসী আবার তাহাকে টানিতেছে। অথচ বান্ধুলির লোভও সে ছাড়িতে পারিতেছে না। হিন্দোলার মত তাহার মন দুইজনের মাঝখানে দোল খাইতেছে। নিতান্তই বাহিরের কাজে তাহার মন গ্রস্ত হইয়া আছে তাই সে নিজের কথা ভাল করিয়া ভাবিতে পারিতেছে না ; এই স্বয়ংবরটা চুকিয়া গেলেই সে ঘরোয়া সমস্যার নিষ্পত্তি করিবে।

ওদিকে রাজপুরীতে এখন প্রায় অষ্টপ্রহরই বাঁশি বাজিতেছে। উৎসবের উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

জাতবর্মা শ্বশুরের সঙ্গে গিয়া সমাগত রাজন্যবর্গের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই কপটতায় তাঁহার চিত্তে সুখ নাই। স্বয়ংবর সভায় যে ব্যাপার ঘটিবে তাহার ফল যেরূপই হোক, জাতবর্মা যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন তাহা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা আছে। শ্বশুর মহাশয় লোক ভাল নয়। তিনি জানিতে পারিয়া কিরূপ মূর্তি ধারণ করিবেন তাহা চিন্তা করিয়া জাতবর্মা মনে মনে একটু উদ্বেগ ও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছেন। বীরশ্রী কিন্তু স্ত্রীজাতি, ছলনা কপটতা তাঁহার সহজাত ; তাই তিনি উদ্বেগ অপেক্ষা উত্তেজনাই অধিক অনুভব করিতেছেন।

যৌবনশ্রীর মন উদ্বেগ উত্তেজনা ও অনিশ্চিতের সংশয়ে নিরন্তর দোল খাইতেছে। রাত্রে নিদ্রা আসে না, আসিলে শেষ রাত্রে ভাঙ্গিয়া যায় ; তখন দীর্ঘকাল অন্ধকার শূন্যপানে চাহিয়া থাকেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দিনে দিনে শীর্ণা হইয়া যাইতেছেন। লুকাইয়া প্রেম করার অনেক জ্বালা।

আর আছেন অম্বিকা দেবী। রোগপঙ্গু বৃদ্ধা শয্যায় শুইয়া শুধু চিন্তা করেন। পুত্র কাছে আসে না, তাহাকে আদেশ বা তিরস্কার করিবার সুবিধা নাই। অম্বিকা দেবী মনে মনে গুমরিয়া আগ্নেয়গিরির গর্ভ-গহ্বরের ন্যায় তপ্ত হইতে থাকেন। নাতিনীকে বুকে লইয়া সান্ত্বনা দেন—'ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই আমার নাতনী, গাঙ্গেয়দেবের নাতনী ; তোকে জোর করে বিয়ে দেবে এমন সাধ্য তোর বাপের নেই। যদি তা করে আমি দেশসুদ্ধ লোককে ক্ষেপিয়ে দেব, প্রজারা ডিম্ব করবে—'

যৌবনশ্রী মনে মনে ভাবেন আমার প্রিয়তমকে যদি না পাই, প্রজারা ডিম্ব করিলে কী লাভ হইবে !

এইভাবে দিবারাত্র কাটিতেছে। রাজপুরীর অন্য সকলে আনন্দে মগ্ন, কেবল যে চারিজন গূঢ়তত্ত্ব জানেন তাঁহাদের মনে আশঙ্কার ছায়া। প্রদীপের নীচে অন্ধকার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এক

শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ মধ্যরাত্রির পূর্বেই মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছে ; তিথি জানা না থাকিলে মনে হইত পূর্ণিমার চাঁদ। স্বপ্নাকুল জ্যোৎস্না নগরের মাথার উপর বর্ষিত হইতেছিল, নর্মদার জলে টলমল করিতেছিল, রাজভবনের পাষাণগাত্রে সুধা-লেপন করিয়াছিল। পুরীর পশ্চাতে আম্রকুঞ্জে একটা বপ্‌পীহ পাখি বুক-ফাটা স্বরে ডাকিতেছিল—পিয়া পিয়া পিয়া !

কিন্তু চন্দ্রালোক বা পক্ষীকূজনের প্রতি মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের লক্ষ্য ছিল না। দিনের কর্ম শেষ করিয়া তিনি অপরিমিত পান-ভোজন করিলেন, তারপর ঈষৎ মদ-বিহ্বল অবস্থায় শয়ন করিতে চলিলেন। অদ্যই শেষ রজনী, কাল এই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইবে ; রাজারা সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া বিদায় লইবেন। তখন পরিপূর্ণ বিশ্রামের সময় পাওয়া যাইবে।

পালঙ্কে শয়ন করিতে গিয়া তাঁহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আজ নানা কর্মের জালে আবদ্ধ হইয়া শিল্পকর্মের তত্ত্বাবধান করা হয় নাই। অথচ আজই শেষ দিন, আজ রাত্রির মধ্যে শিল্পবস্তুটি স্বয়ংবর সভায় প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। মধুকর সাধু অবশ্য চতুর ব্যক্তি, তাহাকে কিছু বলিতে হয় না ; কি করিতে হইবে সবই সে জানে। তবু—

লক্ষ্মীকর্ণ শিল্পশালায় গেলেন। দৌবারিক দাঁড়াইয়া আকাশ-পাতাল হাই তুলিতেছিল, মহারাজ তাহাকে বলিলেন—'তুই যা, এবার তোর ছুটি।'

দৌবারিক দীর্ঘকাল গৃহে যায় নাই, বসন্তরজনীতে মিলনোৎসুকা বধূর কথা স্মরণ করিয়া তাহার মন বড়ই কাতর হইয়াছিল ; সে রাজার পদপ্রান্তে আভূমি নত হইয়া 'জয় হোক মহারাজ' বলিয়া দৌড় দিল।

মুখে প্রসন্ন বিহ্বল হাস্য লইয়া রাজা শিল্পশালায় প্রবেশ করিলেন। অনঙ্গ দীপ জ্বালিয়া মূর্তির অঙ্গে শেষ বারের মত প্রসাধন দিতেছিল। কবন্ধের উপর মুণ্ড বসাইয়া মূর্তিটি এখন পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। মহারাজ ঘুরিয়া ফিরিয়া মূর্তি পরিদর্শন করিলেন, তারপর দুই হস্তে পেট চাপিয়া নিঃশব্দে হাসিতে আরম্ভ করিলেন। হাসি একেবারে নিঃশব্দ নয় ; মাঝে মাঝে তাঁহার বদনগহ্বর হইতে খট্টাশহাস্যের ন্যায় নিগৃহীত শব্দ বাহির হইতে লাগিল। তিনি মূর্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনন্তর কৌতুক সংবরণ করিয়া মহারাজ অনঙ্গের পৃষ্ঠে সস্নেহ চপেটাঘাত করিলেন, বলিলেন—'সাধু ! আজ থেকে তুমি আমার সভাশিল্পী। উপস্থিত এই পুরস্কার নাও।' তিনি নিজের অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া অনঙ্গকে দিলেন—'এখন মূর্তিটা স্বয়ংবর সভায় বসাতে হবে। তুমি একা পারবে ?'

অনঙ্গ বলিল—'পারব মহারাজ। যদি না পারি, লোক যোগাড় করে নেব।'

'ভাল। কিন্তু দেখো, বেশি জানাজানি না হয়।' বলিয়া মহারাজ আর একবার পেট চাপিয়া হাস্য করিলেন, তারপর শয়ন করিতে গেলেন। স্বয়ংবরের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে।

অনঙ্গ দু'দণ্ড অপেক্ষা করিল, তারপর প্রদীপ ঘরের কোণে সরাইয়া রাখিয়া বাহির হইল।

রাজভবনের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পুরঃপ্রাঙ্গণ শূন্য। নবগঠিত স্বয়ংবর সভা বিস্তীর্ণ ভূমির

মাঝখানে বিপুলায়তন শুভ্র বুদ্বুদের ন্যায় শোভা পাইতেছে ; সেখানেও লোকজন নাই। কিন্তু তোরণের প্রতীহার ভূমিতে প্রহরী আছে। অনঙ্গ সেখানে উপস্থিত হইলে একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল—'কে তুমি ? কোথা যাও ?'

অনঙ্গ বলিল—'আমি রাজশিল্পী মধুকর সাধু। একজন লোক ডাকতে যাচ্ছি।'

'এত রাত্রে ?'

'হাঁ, রাজার আদেশ।'

'রাজার আদেশ ?'

'হাঁ। এই দেখ রাজার অঙ্গুরীয়।'

অঙ্গুরীয় দেখিয়া প্রহরী বলিল—'রাজশিল্পী মহাশয়, আপনি যথা ইচ্ছা যেতে পারেন। কখন ফিরবেন ?'

'লোক পেলেই ফিরব। দু'তিন দণ্ড লাগবে।'

চন্দ্রালোকে অনঙ্গ নগরের দিকে চলিল। নগর নিদ্রালু, পথ জনবিরল। চতুষ্পথের উপর জ্যোতিষাচার্য রন্তিদেবের গৃহে দীপনির্বাণ হইয়াছে। অনঙ্গ দ্বারে করাঘাত করিল।

বিগ্রহপাল জাগিয়া ছিলেন। তিনি জানিতেন রাত্রে কোনও সময় অনঙ্গ আসিবে। দুই বন্ধু কণ্ঠলগ্ন হইলেন। রন্তিদেবও বোধ করি নিদ্রা যান নাই, তিনিও আসিয়া জুটিলেন।

অন্ধকার কক্ষে চুপি চুপি কথা হইল। বিগ্রহপাল প্রস্তুত হইলেন। অসময়ে কিছু খাদ্যপানীয় গলাধঃকরণ করিলেন। পেটরা হইতে অগ্নিকন্দুক বাহির করিয়া কবচের ন্যায় বক্ষে ঝুলাইয়া লইলেন। তারপর দুই বন্ধু রন্তিদেবের পদ বন্দনা করিলেন ; হয়তো এ যাত্রা আর সাক্ষাৎ হইবে না। রন্তিদেব আশীর্বাদ করিলেন—'সর্বস্তরতু দুর্গাণি—। আমি সভায় উপস্থিত থাকব।'

রন্তিদেবের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দুইজনে রাজভবনে ফিরিয়া চলিলেন। নগর এতক্ষণে নিশুতি হইয়া গিয়াছে, চাঁদ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। দুইজনের পদশব্দ শূন্য পথে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাজভবনের তোরণদ্বারে প্রহরীরা ঝিমাইতেছিল, অনঙ্গ ও তাহার সাথীর আগমনে চক্ষু তুলিয়া চাহিল। অনঙ্গকে চিনিতে পারিয়া নীরবে পথ ছাড়িয়া দিল।

দুইজনে প্রথমে শিল্পশালায় গেলেন। সেখান হইতে মূর্তি বহন করিয়া স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করিলেন।

দুই

কাক কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরী জাগিয়া উঠিল। চারিদিকে হৈ হৈ হট্টগোল ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়া গেল।

যৌবনশ্রী কাল বীরশ্রী ও বান্ধুলির সহিত অনেক রাত্রি পর্যন্ত পর্যঙ্কে বসিয়া জল্পনা কল্পনা করিয়াছিলেন ; তারপর বীরশ্রী নিজ কক্ষে শয়ন করিতে গিয়াছিলেন, যৌবনশ্রীও শয়ন করিয়াছিলেন। বান্ধুলি তাঁহার পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়াছিল। প্রভাত হইতে বীরশ্রী একদল সখী সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

বীরশ্রী হাসিমুখে ডাকিলেন—'ওঠ্ যৌবনশ্রী, বিয়ের দিনে অত ঘুমতে নেই। গ্রহাচার্য বলেছেন, সূর্যোদয়ের সাড়ে সাত দণ্ড পরে শুভকর্মের লগ্ন।'

সখীরা কলকণ্ঠে হুলুধ্বনি করিল। যৌবনা শয্যাত্যাগ করিলেন। বীরশ্রী বান্ধুলিকে বলিলেন,

'তুই বাড়ি যা। একেবারে সাজগোজ করে তৈরি হয়ে আসিস।'

ব্যবস্থা পূর্ব হইতে স্থির হইয়াছিল। বান্ধুলি চলিয়া গেল।

সখীরা যৌবনশ্রীর হাত ধরিয়া স্নানাগারে লইয়া গেল। সেখানে তাঁহাকে পীঠিকার উপর বসাইয়া প্রথমে গোধূমচূর্ণ ও দুধের সর দিয়া গাত্র-মার্জন করিয়া দিল; পরে চন্দন হরিদ্রা মিশ্রিত জলে গা ধুইয়া দিল; তারপর পুষ্পসুবাসিত জলে স্নান করাইল। সঙ্গে সঙ্গে কত রঙ্গ-রস হাস্য পরিহাস চলিল। স্নানান্তে যৌবনশ্রী রক্ত পট্টাম্বর পরিধান করিলেন।

স্নানাগার হইতে প্রসাধন গৃহ। এখানে সোনার থালায় সজ্জিত বহু রত্নালঙ্কার তো ছিলই, উপরন্তু স্তবকে স্তবকে নানা জাতীয় পুষ্প পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল; অশোক কর্ণিকার নবমল্লিকা চম্পা কুরুবক সিন্ধুবার কুন্দ কুসুম্ভ। বহু পৌরনারী বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। কেহ কাঞ্চনপাত্রে পুষ্প চন্দন অগুরু সাজাইতেছিল। একটি তরুণী মালিনী দূর্বাখচিত মধুকমালা রচনা করিতেছিল; এই মালা গলায় দিয়া রাজকন্যা স্বয়ংবর সভায় যাইবেন। বরমাল্য প্রস্তুত হইয়াছে; যূথীপুষ্পের ঘনসংবদ্ধ স্থূল মাল্য। ইহা একজন সখী সুবর্ণস্থালীতে লইয়া কন্যার পিছে পিছে যাইবে; কন্যা তাহার নিকট হইতে মালা লইয়া ঈপ্সিত বরের গলায় দিবেন।

যৌবনশ্রীকে প্রসাধন কক্ষে লইয়া গিয়া সখীরা তাঁহাকে মাঝখানে বসাইয়া সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার পরাইল। কিন্তু আজ শুধু রত্নালঙ্কার নয়, পুষ্পভূষাও চাই। প্রতিটি রত্নালঙ্কারের সঙ্গে অনুরূপ পুষ্পাভরণ। সখীরা তাঁহার সিক্ত কেশ ধূপের ধুঁয়ায় শুকাইয়া কবরী রচনা করিল, চূড়াপাশে কুরুবকের গুচ্ছ আরোপ করিল, কর্ণে দিল যবাঙ্কুরের অবতংস। চক্ষে কজ্জল, ললাট ঘিরিয়া গণ্ড পর্যন্ত শ্বেতচন্দনের তিলক, কণ্ঠে মুক্তাহারের সঙ্গে দূর্বা-মধুকের মালা। বাহুতে মাণিক্যের সহিত চম্পার কেয়ূর, প্রকোষ্ঠে বজ্রমণির কঙ্কণের সহিত জড়িত কুন্দকলির মণিবন্ধ; কটিতে হিরণ্ময় চন্দ্রহারের সমান্তরালে অশোকপুষ্পের রশনা। কেবল চরণে ফুলের অলঙ্কার নাই, অলক্তরাগের উপর সোনার গুঞ্জরী নূপুর। সুন্দরীর অঙ্গে ফুলের আভরণ যতই শোভাবর্ধন করুক, পায়ে সোনার মঞ্জীর না থাকিলে প্রতি পদক্ষেপে ঝঙ্কার উঠিবে কি করিয়া!

প্রসাধন সম্পূর্ণ হইলে যৌবনশ্রী সোনার বাণ হাতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যেন পূর্বগগনে অরুণোদয় হইল। সখীরা ঘিরিয়া ঘিরিয়া হুলুধ্বনি করিল, শঙ্খ বাজাইল।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্তমধ্যে কল-কোলাহল শান্ত হইল। তিনি একবার কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, তারপর ইঙ্গিতপূর্ণ হস্তসঞ্চালন করিলেন; ইন্দ্রজালের ন্যায় কক্ষ শূন্য হইয়া গেল। কেবল যৌবনশ্রী রহিলেন।

সালঙ্কারা কন্যাকে দেখিয়া লক্ষ্মীকর্ণের হৃদয় গর্বে ভরিয়া উঠিল। হ্যাঁ, স্বয়ংবর দিবার মত কন্যা বটে, রাজাগুলার মুণ্ড ঘুরিয়া যাইবে। তিনি কন্যার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যৌবনশ্রী নতজানু হইয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন।

যৌবনশ্রীর মস্তক আঘ্রাণ করিয়া লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন, 'চিরায়ুষ্মতী হও। আজ তোমাকে দেখে তোমার মায়ের কথা মনে পড়ছে। তিনিও একদিন এমনি বেশে সজ্জিত হয়ে চেদিরাজ্যে এসেছিলেন।'

যৌবনশ্রী নতনেত্রে রহিলেন, তাঁহার ঠোঁট দুটি একটু কাঁপিয়া উঠিল।

লক্ষ্মীকর্ণ তখন বলিলেন—'কন্যা, আজ তোমার জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। অনেক পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে একজন যোগ্যপাত্রকে বেছে নিতে হবে। কিন্তু তুমি বালিকা। জীবনের কোনও অভিজ্ঞতাই তোমার নেই। তাই আমার কর্তব্য তোমাকে পরিচালন করা। যে রাজারা স্বয়ংবরে এসেছেন তাঁদের সকলকে আমি চিনি। তাঁদের মধ্যে তোমার পাণিগ্রহণের যোগ্য যদি কেউ থাকে তো সে কর্ণাটের যুবরাজ বিক্রমাদিত্য। তাঁর মত শক্তিধর যুবরাজ ভারতবর্ষে আর

নেই। তিনি বয়সে প্রবীণ, চঞ্চলমতি যুবক নয়। তাঁর গলায় বরমাল্য দিলে তুমি সুখী হবে।'

যৌবনশ্রী এবারও নতনেত্রে রহিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ পুনশ্চ বলিলেন—'রূপবান রাজপুত্র পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু তারা মহাকাল ফল ; তাদের চাকচিক্য ছলাকলায় ভুলো না। —লগ্নের আরও দণ্ড দুই বাকি আছে, আমি সভায় চললাম রাজাদের অভ্যর্থনা করতে। তুমি যথাসময় সভায় যাবে। আমার কথা মনে থাকবে তো ? কর্ণাটের যুবরাজ বিক্রমাদিত্য।'

যৌবনশ্রী উত্তর দিলেন না, পূর্ববৎ ভূমিলগ্ন নয়নে রহিলেন। মৌনং সম্মতিলক্ষণম্ মনে করিয়া লক্ষ্মীকর্ণ পরিতুষ্ট হইলেন। যৌবনশ্রী বড় ভাল মেয়ে, কখনও অবাধ্য হয় নাই। তিনি কন্যার পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া প্রস্থান করিলেন।

তিন

বান্ধুলি গৃহে ফিরিয়া দেখিল গৃহের দ্বার খুলিয়াছে। সম্মুখে কেহ নাই। সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে অনঙ্গের কক্ষের দ্বার ঠেলিল। কক্ষে অনঙ্গ নাই ; শিল্পকর্মগুলি যেমন ছিল তেমনি সাজানো রহিয়াছে।

দরজা ভেজাইয়া দিয়া বান্ধুলি বেতসীর শয়নকক্ষে গেল। বেতসী রাত্রির বাসি কাপড় ছাড়িতেছিল। বান্ধুলি বলিল—'কুটুম কোথায় ?'

বেতসী গাল ফুলাইয়া বলিল—'কুটুম সারা রাত্রি বাড়ি আসেনি। রাজকার্য।'

বান্ধুলি বেতসীর আরও কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ধরা ধরা গলায় বলিল—'দিদি—'

বেতসী আঁচল কাঁধে ফেলিয়া বলিল—'তুই আজ সকালে এলি যে ? স্বয়ংবরে থাকবি না ?'

বান্ধুলি গলদশ্রু নেত্রে বলিল—'দিদি, আজ আমি চলে যাচ্ছি।'

'চলে যাচ্ছিস ?' বেতসী সশব্দে নিশ্বাস টানিল।

'জীবনে তোর সঙ্গে আর বোধ হয় দেখা হবে না'—বান্ধুলি দিদির কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বেতসী হ্রস্বকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'সব কথা আমায় বলবি ?'

বান্ধুলি বলিল—'পরে সবই জানতে পারবি। এখন তোর শুনে কাজ নেই।'

এই সময় লম্বোদর দ্বার দিয়া উঁকি মারিল। সে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ সমস্ত রাত্রি রাজাদের শিবিরের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া এখন গৃহে ফিরিয়াছে। আবার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া লওয়া প্রয়োজন। শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া সে বান্ধুলির কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল।

সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—'বান্ধুলি কাঁদছে কেন ?'

বান্ধুলি চমকিয়া মুখ তুলিল, লম্বোদরকে দেখিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল। বেতসী কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া বলিল—'তুমি এলে ! বাবা ধন্যি রাজকার্য।'

লম্বোদর সন্দিগ্ধভাবে তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া আবার প্রশ্ন করিল—'কাঁদে কেন ?'

'আমি মেরেছি।' বেতসী হাসিয়া উঠিল ; পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া বলিল—'কাঁদবে না ? আজ ওর প্রিয়সখীর স্বয়ংবর, কাল তিনি স্বামীর ঘরে চলে যাবেন। ইহজন্মে হয়তো আর দেখা হবে না। তাই কাঁদছে।'

কথাটা এমন কিছু অবিশ্বাস্য নয়, কিন্তু লম্বোদরের মনে প্রত্যয় জন্মিল না। ভিতরে ভিতরে কী যেন একটা ঘটিতেছে, একটা পারিবারিক ষড়যন্ত্র অলক্ষিতে ঘরের কোণে জাল বুনিতেছে।

লম্বোদরের মন স্বভাবতই রহস্যভেদী, যেখানে অন্ধকার সেখানেই তার মন উঁকিঝুঁকি মারে ; কিন্তু এখন এদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর নাই। পরে ইহার নিরাকরণ করিতে হইবে। লম্বোদর উত্তরীয় এবং পাগ খুলিয়া বেশ পরিবর্তনের উপক্রম করিল। বান্ধুলি তাহাকে পাশ কাটাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

লম্বোদর বেশিক্ষণ রহিল না। বেশ পরিবর্তন করিয়া কিছু জলপান মুখে দিয়া বাহির হইয়া গেল। কেবল যাইবার পূর্বে বেতসীকে একটা প্রশ্ন করিল—'অতিথি এসেছিল ?'

বেতসী বলিল—'কৈ না তো।'—

বান্ধুলি নিজের ঘরে গিয়া তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা করিল। দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন কিছু পরিল না ; সাধারণ মেঘডম্বর শাড়ি, বাসন্তীরঙের কাঁচুলি, সোনার চিল্‌মীলিকা, কানে সোনার ফুল। পায়ের নূপুর খুলিয়া ফেলিল। আর যে দুই চারিটি সোনার অলঙ্কার ছিল তাহা কর্পটে বাঁধিয়া কোমরে গুঁজিয়া লইল।

ঘরের বাহিরে আসিয়া সে দেওয়ালে মাথা ঠেকাইয়া গৃহদেবতাকে প্রণাম করিল। তারপর দিদির গলা ধরিয়া আর একবার কাঁদিল। তারপর রাজপুরীতে ফিরিয়া চলিল।

চার

স্বয়ংবর সভায় রাজারা আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সভার প্রধান দ্বারে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ জামাতা জাতবর্মা এবং অন্যান্য পারিষদবর্গকে লইয়া বিরাজ করিতেছেন ; মাল্যচন্দনের থালা হাতে বহু কিঙ্করীও উপস্থিত আছে। প্রত্যেক রাজার আগমনের সঙ্গে তোরণ দ্বারে গিড়িগিড়ি শব্দে দুন্দুভি বাজিতেছে। রাজারা যানবাহন হইতে অবতরণ করিয়া একটি বা দুইটি বয়স্যসহ স্বয়ংবর সভার দ্বারে উপস্থিত হইলে মাল্যচন্দন দ্বারা অভ্যর্থিত হইতেছেন এবং সভামধ্যে আপন নির্দিষ্ট আসনে অধিষ্ঠিত হইতেছেন।

এইখানে স্বয়ংবর সভার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সভামণ্ডপের গঠন অনেকটা মৎস্যাকৃতি। দুই প্রান্তে দুইটি প্রধান প্রবেশ দ্বার, তাছাড়া আরও কয়েকটি ছোট ছোট দ্বার আছে। মৎস্যমুখের দিকে যে দ্বার তাহার শোভা অধিক, এই দ্বার দিয়া রাজারা প্রবেশ করিবেন। ল্যাজের দিকের দ্বারটি অপেক্ষাকৃত সাদামাটা, এই পথে গণ্যমান্য নাগরিকেরা আসিয়া সভারূঢ় হইবেন। স্বয়ংবর সর্বজনগম্য অনুষ্ঠান, সকলে তাহা প্রত্যক্ষ করিবে ইহাই রীতি।

সভামণ্ডপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় চতুর্দিকের দারু প্রাচীর নানা চিত্রকলায় শোভিত ; হরপার্বতীর বিবাহের দৃশ্য, রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গ ; দেব দেবী যক্ষিণী রক্ষিণী। তন্মধ্যে ইন্দ্রাণীর মূর্তি প্রধান ; ইন্দ্রাণী স্বয়ংবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দারু প্রাচীরের ঊর্ধ্বে শুভ্র বস্ত্রের আবরণ। বস্ত্রাবরণ ভেদ করিয়া উজ্জ্বল দিবালোক মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ভূমির উপর দূর্বাশ্যামল আস্তরণ। আস্তরণের উপর বীথি রচনা করিয়া দুই সারি ক্ষুদ্র মণ্ডপ সমব্যবধানে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চলিয়া গিয়াছে ; এগুলি রাজাদের বসিবার আসন। বীথি যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানে নাগরিকদের বসিবার জন্য বিস্তৃত বেদী।

রাজাদের বসিবার মণ্ডপগুলি চূড়াযুক্ত মন্দিরের মত দেখিতে। তাহাদের মাথায় নানাবর্ণের কেতন উড়িতেছে। মণ্ডপের সম্মুখভাগ উন্মুক্ত, তিন ধাপ সোপান আরোহণ করিলে প্রশস্ত সিংহাসন। সিংহাসনে একাধিক লোক বসিতে পারে। মণ্ডপ ও সিংহাসন পুষ্পমালায় সজ্জিত।

রাত্রি প্রভাত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডপে নাগরিক সমাগম আরম্ভ হইয়াছে : মঞ্চে তিল ধারণের স্থান নাই। স্বয়ংবর দর্শনের সৌভাগ্য ইতিপূর্বে অনেকেরই হয় নাই : সকলে বসিয়া চাপা উত্তেজনার সহিত জল্পনা করিতেছেন ; মণ্ডপের এটা ওটা লইয়া আলোচনা হইতেছে। একটি মণ্ডপের সম্মুখে সূক্ষ্ম বস্ত্রের যবনিকা ঝুলিতেছে ; ইহার মধ্যে কী আছে এই লইয়া অনেকের মধ্যে বিতণ্ডা চলিতেছে। কেহ বলিতেছেন স্বয়ং রাজকুমারী ওখানে লুক্কায়িত আছেন : কেহ বলিতেছেন, না ওখানে বসিয়া আছেন বীরশ্রীর স্বামী জাতবর্মা, যৌবনশ্রীও তাঁহাকেই মাল্যদান করিবেন। কিন্তু কাহারও অনুমান সন্তোষজনক হইতেছে না।

নাগরিকদের মঞ্চের এক পাশে প্রবেশ-পথের নিকটে লম্বোদর আসিয়া বসিয়াছে এবং নাগরিকদের কথাবার্তা শুনিতেছে। তাহার দলের অন্য চরেরাও নাগরিকদের মধ্যে ইতস্তত বসিয়া আছে। আজ স্বয়ংবর সভার অভ্যন্তর ভাগে দৃষ্টি রাখা তাহাদের কাজ।

লম্বোদরের চক্ষুকর্ণ যদি স্বয়ংবর সভার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সভার পশ্চাদ্ভাগে সঞ্চারিত হইত তাহা হইলে সে বিশেষ বিচলিত হইত সন্দেহ নাই। মণ্ডপের পিছন দিকে একটি নিভৃত স্থানে অনঙ্গ দাঁড়াইয়া ছিল : তাহার দুই পাশে দুইটি ঘোড়া, রোহিতাশ্ব এবং দিব্যজ্যোতি। অদূরে একটি লতাকুঞ্জের আড়ালে দাঁড়াইয়া বাকুলি সঙ্কেত ধ্বনির অপেক্ষা করিতেছিল। পুরপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইবার এই দিকে একটি স্বতন্ত্র দ্বার আছে, ভৃত্যদের যাতায়াতের পথ।

ওদিকে সভার সম্মুখদিকে গিড়িগিড়ি দুন্দুভি বাজিতেছে ; রাজারা একে একে আসিয়া স্বয়ংবর সভায় নির্দিষ্ট মণ্ডপে বসিতেছেন। সকলের দেহে বিচিত্র সজ্জা ; অঙ্গদ কুণ্ডল কেয়ূর কাঞ্চি মুক্তাহার। সেকালে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বসনভূষণে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। অবশ্য রাজারা সভারোহণ কালে কটিতে তরবারি ধারণ করিতেন।

যা হোক, রাজারা নিজ নিজ মণ্ডপে বসিয়া তাম্বূলচর্বণ করিতে করিতে বয়স্যের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে রসালাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মণ্ডপগুলি পূর্ণ হইয়া উঠিল। সর্বশেষে আসিলেন কর্ণাটের বিক্রমাদিত্য। প্রৌঢ় বয়স্ক পুরুষ, কিন্তু রত্নালঙ্কারে তাঁর দেহের কঠিন পৌরুষ ঢাকা পড়ে নাই। তিনি কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অতঃপর লগ্নকাল উপস্থিত হইলে স্বয়ংবর-কন্যার চতুর্দোলা সভার দ্বারে উপস্থিত হইল।

পাঁচ

রাজপুরীর সিংহদ্বার হইতে স্বয়ংবর সভার কদলীস্তম্ভ শোভিত প্রধান প্রবেশ-পথ যদিও মাত্র এক রজ্জু দূরে তথাপি রাজকন্যা চতুর্দোলায় আরোহণ করিয়া স্বয়ংবর সভায় আসিলেন। যাহা চিরাচরিত রীতি তাহা পালন করিতে হইবে। একদল সখী চতুর্দোলার অগ্রে ও পশ্চাতে লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিতে করিতে আসিল। শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইল।

রাজকুমারী সভাদ্বারে চতুর্দোলা হইতে অবতরণ করিলেন, যেন মেঘলোক হইতে হিরণ্ময়ী বিদ্যুল্লতা নামিয়া আসিল। রাজা লক্ষ্মীকর্ণ কন্যার বাহু ধরিয়া সভামধ্যে লইয়া গেলেন, জাতবর্মা রাজপুরোহিত ও ভট্ট প্রভৃতি সঙ্গে রহিলেন।

রাজগণ এযাবৎ শ্লথভাবে অবস্থান করিতেছিলেন. যৌবনশ্রীর আবির্ভাবে জ্যা-বদ্ধ ধনুর ন্যায় টান হইয়া বসিলেন, তাঁহাদের স্নায়ুতন্ত্র যেন টঙ্কার দিয়া উঠিল। তাঁহাদের সম্মিলিত চক্ষু একঝাঁক তীরের মত যৌবনশ্রীর উপর গিয়া পড়িল।

সভার অপরপ্রান্তে নাগরিকবৃন্দের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সারসের মত গলা

উঁচু করিয়া একদৃষ্টে রাজকুমারীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একটি অস্ফুট হর্ষ-গুঞ্জন তাঁহাদের মধ্য হইতে উত্থিত হইল।

লক্ষ্মীকর্ণ এতক্ষণে কন্যাকে লইয়া রাজমণ্ডপ শ্রেণীর পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি পুরোহিতকে ইঙ্গিত করিলেন ; পুরোহিত সম্মুখে আসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক স্বস্তিসূচনা করিলেন। তারপর রাজার ইঙ্গিতে সম্মুখে আসিলেন ভট্ট। সে সময় প্রত্যেক রাজার একজন করিয়া ভাট থাকিত, ভাটেরা ছিল রাজাদের বাক্‌প্রতিভূ। সদসি বাক্‌পটুতা সকল রাজার ছিল না, ভাটেরা রাজার বক্তব্য নিপুণভাবে প্রকাশ করিত। লক্ষ্মীকর্ণের ভাট একজন সৌম্যকান্তি প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ ; মুণ্ডিত শীর্ষে সুপুষ্ট শিখা, স্কন্ধে উপবীত, অধরে একটু সরস হাস্য। ভাট মহাশয় প্রথমে রাজাদের সম্বোধন করিয়া রাজকুমারীর পরিচয় দিলেন, তাঁহার বংশগরিমা কীর্তন করিলেন ; তারপর রাজকুমারীকে সম্বোধন করিয়া একে একে রাজাদের পরিচয় দিলেন। পরিশেষে মুখের একটি চটুল ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—'রাজনন্দিনি, সকল রাজা ও রাজপুত্রের গৌরব-গরিমার কথা তোমাকে শুনিয়েছি, কেবল একটি রাজপুত্রের কথা এখনও বলা হয়নি। ওই যে আবরণের অন্তরালে মণ্ডপটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে ওতে বিরাজ করছেন মগধের যুবরাজ পরম শ্রীমন্ত বিগ্রহপাল।'

যৌবনশ্রী অবিচলিত মুখে নির্দিষ্ট মণ্ডপের দিকে চাহিলেন। রাজারা একসঙ্গে সেইদিকে ঘাড় ফিরাইলেন। মণ্ডপের আবরণ ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। রাজারা দেখিলেন, মণ্ডপের মধ্যে বসিয়া আছে এক নরাকৃতি মর্কটমূর্তি। তাহার সর্বাঙ্গ দীর্ঘ কপিশ লোমে আবৃত, কিন্তু মুখখানা সম্পূর্ণ বানরাকৃতি নয়। যাঁহারা বিগ্রহপালকে পূর্বে দেখিয়াছেন তাঁহাদের চিনিতে কষ্ট হইল না, মূর্তির মুখের সহিত মগধের যুবরাজের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

রাজারা এই উপাদেয় রসিকতা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিলেন। কর্ণাটের বিক্রমাদিত্যের কঠোর অধরে একটু বক্র হাসি দেখা দিল ; অন্য সকলে অট্টহাস্য করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিলেন।

অতঃপর রাজকীয় হর্ষোল্লাস প্রশমিত হইলে সভার মূল ক্রিয়া আরম্ভ হইল, রাজকন্যা পতিবরণে অগ্রসর হইলেন। আগে আগে চলিলেন ভট্ট, তাঁহার পিছনে যৌবনশ্রী ; যৌবনশ্রীর পশ্চাতে হেমস্থালীতে বরমাল্য লইয়া এক সখী, তারপর নানা উপচার বহন করিয়া অন্যান্য সখীরা।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে স্বয়ংবরের যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পর স্বয়ংবরের বর্ণনা লিখিতে যাওয়া ঘোরতর ধৃষ্টতা। তবু কালিদাস যে সময়ে লিখিয়াছিলেন তাহার পর কয়েক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, রীতি নীতি আচারের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কালিদাসের কালে পরিচারিকা স্বয়ংবর-কন্যার সঙ্গে থাকিয়া রাজাদের পরিচয় দিত, অধুনা ভট্ট সেই কাজ করিতেছেন। কিন্তু মোটের উপর আচার অনুষ্ঠান প্রায় একই প্রকার আছে। তাই, যাঁহারা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়িয়াছেন তাঁহাদের কাছে স্বয়ংবর সভার ক্রিয়াকলাপের বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

লক্ষ্মীকর্ণ জাতবর্মা প্রভৃতি দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভট্ট মহাশয় এক রাজার মণ্ডপ হইতে অন্য রাজার মণ্ডপের দিকে যৌবনশ্রীকে লইয়া চলিলেন। এবার রাজাদের পূর্ণ পরিচয় না দিয়া কেবল নামধামের উল্লেখ করিলেন ; ক্ষণেক দাঁড়াইয়া যৌবনশ্রীর পানে তাকাইলেন ; তারপর আবার অগ্রসর হইলেন। যে-রাজা পিছনে পড়িলেন তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল, যিনি সম্মুখে আছেন তাঁহার মুখ এখনও উজ্জ্বল হইয়া আছে। অন্ধকার রাত্রে কেহ যেন দীপ হস্তে রাজপথ দিয়া চলিয়াছে ; সম্মুখে আলো, পিছনে অন্ধকার।

এইরূপে কয়েকটি রাজমণ্ডপ অতিক্রম করা হইল। কর্ণাটকুমার বিক্রমাদিত্য ও আরও

কয়েকজন রাজার মণ্ডপ এখনও বাকি আছে, যৌবনশ্রী বিগ্রহপালের মণ্ডপ-সম্মুখে উপনীত হইলেন। নাগরিক সঙ্ঘের মধ্য হইতে একটি গুঞ্জন উত্থিত হইয়াই শান্ত হইল। ভট্ট মহাশয় বঙ্কিম হাসিয়া বলিলেন—'রাজকুমারি, ইনি পাটলিপুত্রের যুবরাজ বিগ্রহপাল।' বলিয়া রাজকুমারীর মুখের পানে না চাহিয়াই সম্মুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজকুমারী কিন্তু চলিলেন না। তিনি কিছুক্ষণ মণ্ডপস্থ মর্কটমূর্তির পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর প্রধানা সখীর দিকে ফিরিয়া স্থালী হইতে বরমাল্য তুলিয়া লইলেন।

সভায় যেটুকু শব্দ ছিল তাহাও এবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ভট্ট থমকিয়া পিছু ফিরিলেন। দূরে সভার দ্বারমুখে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের বিরাট দেহ অকস্মাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন।

যৌবনশ্রী মূর্তির দিকে ফিরিয়া কম্পিত মৃদুস্বরে ডাকিলেন—'কুমার।'

মূর্তি নড়িয়া উঠিল, তারপর উল্টাইয়া পিছন দিকে পড়িল। রাজারা তড়িৎপৃষ্টের ন্যায় স্ব স্ব মণ্ডপে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, দেখিলেন মূর্তির নিম্নভাগের শূন্য কোটর হইতে এক যুবাপুরুষ বাহির হইয়া যৌবনশ্রীর সম্মুখে দাঁড়াইল; যৌবনশ্রী তাহার গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিলেন।

লোমহর্ষণ কাণ্ড! সমস্ত সভা একসঙ্গে কোলাহল করিয়া উঠিল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের ব্যাঘ্র-চক্ষুতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্ফুরিত হইল। নাগরিকমণ্ডলীর ভিতর হইতে কে একজন তীক্ষ্ণোচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'ধন্য! রাজকুমারী সত্যকার বিগ্রহপালের গলায় মালা দিয়েছেন।' বক্তা আর কেহ নয়, জ্যোতিষাচার্য রন্তিদেব।

কলরব আরও বাড়িয়া গেল। রাজারা মণ্ডপ হইতে নামিয়া অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ দন্ত কড়মড় করিয়া একটানে কোষ হইতে তরবারি বাহির করিলেন, তারপর বৃষভ-গর্জন করিয়া বিগ্রহপালের প্রতি ধাবিত হইলেন। আজ আর কাহারও নিস্তার নাই। ওই অধম তস্করপুত্রটাকে তিনি বধ তো করিবেনই, কুলকজ্জল কন্যাটাকেও কাটিয়া ফেলিবেন।

লক্ষ্মীকর্ণকে কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইল না। যৌবনশ্রী পিতাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া বিগ্রহপালের বুকের কাছে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিগ্রহপাল মনস্থ করিয়াছিলেন—মূর্তির তলদেশে বসিয়া বসিয়া তিনি চিন্তা করিবার প্রচুর অবসর পাইয়াছিলেন—ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্বে তিনি মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ ও সভাস্থ রাজবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিবেন; বলিবেন—'হে আর্যগণ, রাজকুমারী যৌবনশ্রী আর্যরীতি অনুসারে আমার কণ্ঠে বরমাল্য দান করিয়াছেন, সুতরাং আপনাদের রুষ্ট হওয়া উচিত নয়। রাজকুমারী যদি মর্কটের গলায় মালা দিতেন তাহাও আর্যরীতি অনুযায়ী সিদ্ধ হইত। আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করুন এবং আনন্দিত মনে নিজ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করুন।' কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ তরবারি উঁচাইয়া ছুটিয়া আসিতেছেন, রাজারাও লোচন ঘূর্ণিত করিতেছেন, এখন বক্তৃতা চলিবে না। বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্বেই মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইবে।

অগ্নিকন্দুকটি বুকের কাছে ঝুলিতেছিল, সেটি ডান হাতে লইয়া বিগ্রহপাল বাম হস্তে যৌবনশ্রীর স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া লইলেন, চুপিচুপি বলিলেন—'ভয় পেও না।' তারপর অগ্নিকন্দুকটি সবেগে মাটিতে আছাড় মারিলেন।

বিরাট ভূমিকম্পে যেন সভাগৃহ কাঁপিয়া উঠিল; কর্ণবিদারী শব্দের সঙ্গে মাটি হইতে এক ঝলক আগুন ছিটকাইয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ কটুগন্ধ ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

বিগ্রহপাল বলিলেন—'চল এবার পালাই।' বলিয়া যৌবনশ্রীর হাত ধরিয়া পাশের একটি দ্বারের দিকে লইয়া চলিলেন।

ছয়

যৌবনশ্রী যখন সভাগৃহে প্রবেশ করেন তখন লম্বোদর নাগরিকমণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল যে অনুবর্তিনী সখীদের মধ্যে বান্ধুলি নাই। বান্ধুলি রাজকন্যার নিকটতমা সখী, সে উপস্থিত নাই কেন ? কোথায় গেল ? লম্বোদরের সন্দিগ্ধ মনে খট্‌কা লাগিয়াছিল।

তারপর বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। মৃন্মূর্তির তলা হইতে জীবন্ত মানুষ বাহির হইয়া আসিল। রাজকুমারী তাহার গলায় মালা দিলেন, এবং সর্বশেষে বিকট অপার্থিব শব্দ হইয়া সভা ধূমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। লম্বোদর অতিশয় স্থিরবুদ্ধি মানুষ, কিন্তু তাহার মাথাটাও গোলমাল হইয়া গেল।

ওদিকে রাজাদের অবস্থা সত্যই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এরূপ গগনভেদী শব্দ তাঁহারা জীবনে শোনেন নাই, তাই শব্দ শুনিয়া তাঁহাদের হস্তপদ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। যাঁহাদের চলচ্ছক্তি একেবারে লোপ পায় নাই তাঁহারা কেহ স্খলিতপদে কেহ জানু সাহায্যে সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন ; রাজকন্যার পলায়মানা সখীরা চিৎকার করিতে করিতে তাঁহাদের ঘাড়ের উপর পড়িতেছিল ; কিন্তু কেহই ভ্রূক্ষেপ করিতেছিলেন না। কলিঙ্গের দুই রাজপুত্র দৃঢ়ভাবে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছিলেন। অভ্যাগত রাজাদের মধ্যে কেবল কর্ণাটের বিক্রম ধৈর্য হারান নাই, তিনি মুক্ত কৃপাণহস্তে নিজ মণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধূমজালের মধ্যে সতর্কভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন।

সর্বাপেক্ষা দুর্গতি হইয়াছিল মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের। ক্রোধান্ধ রক্তপিপাসু মন লইয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ পৈশাচিক শব্দের আঘাতে তিনি মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন ; ক্রোধের স্থানে ভয় আসিয়া তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিল। তিনি সেই অবস্থায় থাকিয়া ইতিউতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কয়েকজন রাজা ও সখী তাঁহাকে পদদলিত করিয়া চলিয়া গেল তিনি লক্ষ্য করিলেন না। পিশাচ ! দীপঙ্করের পিশাচ এখানেও আসিয়া জুটিয়াছে।

নাগরিকমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। দলবদ্ধ জনতা এরূপ অবস্থায় যাহা করিয়া থাকে ইহারাও তাহাই করিয়াছিল। অগ্নিকন্দুকের শব্দ শুনিয়া তাহারা ক্ষণকাল বিমূঢ় অবস্থায় রহিল, তারপর বাঁধভাঙা জলস্রোতের ন্যায় হুড়মুড় শব্দে পিছনের দ্বার দিয়া বাহির হইতে লাগিল। ঠেলাঠেলি গুঁতাগুঁতিতে কয়েকজনের হাত-পা ভাঙিল কিন্তু কেহ তাহা গ্রাহ্য করিল না।

এই পলায়মান জনস্রোতের আবর্তে লম্বোদর পড়িয়া গিয়াছিল। প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই সে বাহিরের দিকে চলিয়াছিল, কিন্তু দ্বার দিয়া বাহির হইতে পারিল না। সেখানে বড় পেষাপেষি। ভাগ্যক্রমে সে জনতার পাশের দিকে ছিল, তাই দুই-চারিবার সজোরে কফোণি তাড়না করিয়া জনতার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইল। অনতিদূরে ক্ষুদ্র একটি খিড়কি দ্বার, লম্বোদর সেই পথ দিয়া সভা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

এদিকটা নির্জন, গণ-সম্বাধের ভিড় নাই। কিন্তু ও কি ? লতাকুঞ্জের নিকটে দুইটা ঘোড়া দাঁড়াইয়া আছে ; শিল্পী মধুকর লাল ঘোড়াটার পিঠের উপর বসিয়া আছে এবং বান্ধুলিকে টানিয়া নিজের কোলের কাছে তুলিতেছে। বান্ধুলি তিলমাত্র আপত্তি করিতেছে না, বরং সেও ঘোড়ায় চড়িবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীলা।

পাগলের মত চিৎকার করিয়া লম্বোদর সেই দিকে ছুটিল। তাহার চিৎকারে অনঙ্গ ও বান্ধুলি দুইজনেই ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল। ইত্যবসরে বান্ধুলি ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া বসিয়াছে। সে অনঙ্গের গলা জড়াইয়া ধরিল, অনঙ্গ ঘোড়ার নিতম্বে কশাঘাত করিল ; ঘোড়াটা হরিণের মত

লাফ দিয়া নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

লম্বোদর দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘোড়ার পিছনে ছুটিয়া সে পলাতকদের ধরিতে পারিবে না এ-জ্ঞান তাহার ছিল। সে বিমূঢ় চক্ষু ফিরাইয়া দ্বিতীয় ঘোড়াটার দিকে চাহিল। শ্বেতবর্ণ অশ্ব পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। কাহার ঘোড়া? এখানে দাঁড়াইয়া আছে কেন? যাহার ঘোড়াই হোক, ইহার পিঠে চড়িয়া পলাতকদের তাড়া করিলে ধরা যাইবে কি? ধরিলেও আটকাইয়া রাখা যাইবে কি?

পিছনে শব্দ শুনিয়া লম্বোদর চকিতে ফিরিল। স্বয়ংবর সভার পাশের একটি দ্বার দিয়া যৌবনশ্রী বাহির হইয়া আসিলেন; তাঁহার সঙ্গে সেই যুবক যাহার গলায় তিনি মালা দিয়াছিলেন—বিগ্রহপাল! দুইজন হাত ধরাধরি করিয়া প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে এই দিকেই আসিতেছেন। মুহূর্তের মধ্যে লম্বোদরের মাথাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। বান্ধুলিকে লইয়া মধুকর পলাইয়াছে, রাজকুমারীকে লইয়া বিগ্রহপাল পলায়ন করিতেছে। সাদা ঘোড়াটা ইহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে! ষড়যন্ত্র! চক্রান্ত!

লম্বোদর আর চিন্তা করিল না, প্রহর্তুমুদ্যত ষণ্ড যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করে সেইভাবে বিগ্রহপাল ও যৌবনশ্রীর দিকে ছুটিল। তাঁহাদের নিকটে গিয়া সে যৌবনশ্রীর পদতলে আছড়াইয়া পড়িল, দুই বাহু দিয়া সবলে তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া রাসভনিন্দিত কণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিল—'ধরো ধরো—শীঘ্র এস—পালাচ্ছে—'

যৌবনশ্রী চলৎশক্তিহীন; লম্বোদর এমনভাবে পা সাপ্টাইয়া ধরিয়াছে যে নড়িবার সামর্থ্য নাই। তিনি ব্যাকুল চক্ষে বিগ্রহপালের পানে চাহিলেন।

বিগ্রহপালের হাতে যদি তরবারি থাকিত নিঃসন্দেহে লম্বোদরকে হত্যা করিতেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত্র, যৌবনশ্রীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। বৃথা চেষ্টা; লম্বোদর কর্কটের মত যৌবনশ্রীর পা আঁকড়াইয়া রহিল। বিগ্রহপাল তাহাকে পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত করিলেন; লম্বোদর আরও তারস্বরে চেঁচাইতে লাগিল—'বাঁচাও। কে আছ—শীঘ্র এস।'

এবার স্বয়ংবর সভার পাশের দ্বার দিয়া লক্ষ্মীকর্ণ বাহির হইলেন। এতক্ষণে তাঁহার পিশাচ-ভয় কাটিয়াছে। তাঁহার পিছনে কয়েকজন রাজাও আছেন, সকলের হস্তে তরবারি। পৈশাচিক শব্দের পুনরাবৃত্তি হইল না দেখিয়া তাঁহাদের ক্ষাত্রতেজ আবার মাথা তুলিয়াছে। যৌবনশ্রী ও বিগ্রহপালকে দেখিয়া তাঁহারা রৈ রৈ শব্দে সেইদিকে ধাবিত হইলেন।

যৌবনশ্রী তাঁহাদের দেখিয়া ভয়ার্তকণ্ঠে বলিলেন—'কুমার, তুমি যাও, আর এখানে থেকো না। ওরা তোমাকে হত্যা করবে।'

বিগ্রহ বলিলেন—'আর তুমি?'

'আমার যা হবার হবে, তুমি যাও।'

'না।'

যৌবনশ্রী ব্যাকুলস্বরে বলিলেন—'কুমার, আমার কথা শোনো। পিতা আমাকে হত্যা করবেন না। আমি তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকব। তুমি আবার এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও।'

বিগ্রহপাল সম্মত হইলেন। নিরস্ত্র অবস্থায় সপ্তরথী বেষ্টিত হইয়া মৃত্যুবরণ করা মূঢ়তা। লক্ষ্মীকর্ণ ও রাজার দল তখন কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, বিগ্রহপাল তাহাদের দিকে বহ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'তাই হবে। আবার আমি আসব। কিন্তু এবার একলা আসব না।'

যৌবনশ্রীর হাত ছাড়িয়া তিনি ছুটিয়া দিব্যজ্যোতির পাশে গেলেন, এক লাফে তাহার পিঠে উঠিয়া বসিলেন। দিব্যজ্যোতি বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল।

শিকার হাতছাড়া হইয়া গেল দেখিয়া লক্ষ্মীকর্ণ ব্যর্থ ক্রোধের হুঙ্কার ছাড়িলেন, তারপর

পাকশাট খাইয়া কন্যার দিকে ফিরিলেন ; জলন্ত চোখে বলিলেন—'কুলকলঙ্কিনি, তোর মনে এই ছিল ! বংশের মুখে কালি দিলি। আজ তোকে কেটে ফেলব।'

তিনি তরবারি তুলিলেন। কিন্তু কাটা হইল না, রাজারা নিবারণ করিলেন। নিন্দা-কলঙ্ক যাহা হইবার তাহা হইয়াছে ; শুধু লক্ষ্মীকর্ণের নয়, নিমন্ত্রিত রাজাদেরও ; নারীহত্যা করিলে তাহার মাত্রা কমিবে না। যৌবনশ্রীর মুখে রাগদ্বেষ লজ্জাভয় কিছুই নাই, তিনি মুকুলিত নেত্রে দাঁড়াইয়া আছেন। লম্বোদর এতক্ষণে কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার পানে কেহ ফিরিয়া চাহিল না। তাহার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, সে অলক্ষিতে পিছনে সরিয়া গেল।

অতঃপর রাজারা একজোট হইয়া লক্ষ্মীকর্ণকে ভর্ৎসনা করিলেন। তাঁহারা কিছু আর বলিতে বাকি রাখিলেন না। বিশেষত কর্ণাটকুমার বিক্রমের রসনার ধার তাঁহার অসির ধার অপেক্ষা কোনও গুণে কম নয় ; তিনি বাছা বাছা কটুবাক্য ও ধিক্কার লক্ষ্মীকর্ণের শিরে বর্ষণ করিলেন। তুমি নির্লজ্জ ও নির্বোধ। যেমন তোমার হস্তীর মত আকার তেমনি হস্তিমূর্খ তুমি। যাহার কন্যা গুপ্তপ্রেমে লিপ্ত সে স্বয়ংবর সভা আহ্বান করে কোন্ লজ্জায় ! যে নিজের অবরোধের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারে না সে রাজ্যশাসন করিতে চায় কোন্ স্পর্ধায় ! ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্য রাজারা সঙ্গে সঙ্গে ঘৃতাহুতি দিলেন। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ বক্ষে তুষানল জ্বালিয়া সব শুনিলেন, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না।

রাজারা হৃদয়ভার লাঘব করিয়া প্রস্থান করিবার পর লক্ষ্মীকর্ণ বজ্রমুষ্টিতে কন্যার হাত ধরিয়া তাহাকে রাজপুরীতে লইয়া চলিলেন।

সাত

অনঙ্গ ও বান্ধুলিকে পিঠে লইয়া রোহিতাশ্ব বায়ুবেগে নগর পার হইয়া গেল। ক্ষুরধ্বনিতে সচকিত নগরের পথচারীরা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল, এক ঘোড়ার পিঠে যুগলমূর্তি ! তাহারা নানাবিধ জল্পনা করিল। এরূপ দৃশ্য পূর্বে এ নগরে দেখা যায় নাই। কালে কালে এ সব হইতেছে কী ? কলি—ঘোর কলি।

নগর অতিক্রম করিয়া রোহিতাশ্ব যখন শোণ-ঘাটের পথ ধরিল তখনও অনঙ্গ তাহার গতি শ্লথ করিল না, কেবল মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল বিগ্রহ যৌবনশ্রীকে লইয়া আসিতেছে কিনা। এ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই পরিকল্পিত পথে চলিয়াছে ; অগ্নিকন্দুক ফাটিয়াছে, সভায় বিষম গণ্ডগোলের মধ্যে বিগ্রহ যৌবনশ্রীকে লইয়া নিশ্চয় পলায়ন করিতে পারিবে। কিন্তু লম্বোদরটা হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া জুটিল ? সে কোনও প্রকার বিঘ্ন করিবে না তো ? নাঃ, বিগ্রহকে লম্বোদর ঠেকাইতে পারিবে না। তবু অনঙ্গ মনে মনে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল।

রোহিতাশ্ব ছুটিয়া চলিয়াছে, নির্জন অশ্মাচ্ছাদিত পথে তাহার ক্ষুরধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বান্ধুলি অনঙ্গের বুকের উপর ছিন্নমূল লতার মত পড়িয়া আছে, তাহার মুদিত অক্ষিপল্লব অল্প অল্প স্ফুরিত হইতেছে, মুখ রক্তহীন। অনঙ্গ তাহার পানে দৃষ্টি নামাইয়া হাসিমুখে ডাকিল—'বান্ধুলি !'

বান্ধুলির চোখ দুটি খুলিয়া গেল। অনঙ্গের মুখে হাসি দেখিয়া তাহার অধরেও একটু হাসি ফুটি-ফুটি করিল, কিন্তু ফুটিল না ; অধর একটু কাঁপিল মাত্র। সে আবার চক্ষু মুদিত করিল। তাহার বাম বাহু আরও দৃঢ়ভাবে অনঙ্গের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল।

অনঙ্গ তাহার কানের উপর মুখ রাখিয়া বলিল—'তোমার এখনো ভয় করছে ?...আমার মনে হচ্ছে পক্ষীরাজে চড়ে স্বর্গে যাচ্ছি।'—

শোণের ঘাটে বণিকের নৌকা নাই, লোকজন নাই। কিন্তু গরুড় তাহার দলবল লইয়া উপস্থিত আছে। নৌকা পাড়ি দিবার জন্য প্রস্তুত।

অনঙ্গ বান্ধুলিকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া নৌকায় তুলিল। তাহাকে রইঘরে বসাইয়া বাহিরে আসিল। বিগ্রহপালের এখনও দেখা নাই। এত দেরি হইতেছে কেন ? এদিক ওদিক চাহিয়া অনঙ্গ দেখিল, জাতবর্মার নৌকা অদূরে বাঁধা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে দাঁড়ী-মাঝি কেহ নাই, নৌকা শূন্য। অনঙ্গ গরুড়কে জিজ্ঞাসা করিল—'ও নৌকার লোকজন গেল কোথায় ?'

গরুড় বলিল—'আজ্ঞা, ওরা স্বয়ংবর দেখতে নগরে গিয়েছে।'

'কেউ নেই ?'

'না। আমাদের বলে গেছে ওদের নৌকার উপর যেন দৃষ্টি রাখি।'

অনঙ্গ চিন্তা করিল। লক্ষ্মীকর্ণ নিশ্চয় তাড়া করিবে, ছাড়িবে না। ঘাটে আসিয়া যে-নৌকা পাইবে তাহাতে চড়িয়া তাড়া করিবে। জাতবর্মার নৌকায় এখন নাবিক নাই বটে, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে পারে ; তখন জাতবর্মার নৌকায় চড়িয়া লক্ষ্মীকর্ণ পশ্চাদ্ধাবন করিবে। অতএব জাতবর্মার নৌকাটাকে বানচাল করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

অনঙ্গ গরুড়কে বলিল—'তুমি লোকজন নিয়ে ও নৌকায় যাও। যত দাঁড় আছে সব এ নৌকায় নিয়ে এস।'

গরুড় জিজ্ঞাসুনেত্রে একবার অনঙ্গের পানে চাহিল, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়া আদেশ পালনে অগ্রসর হইল।

সব দাঁড়গুলি এ নৌকায় উঠিয়াছে এমন সময় দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। অনঙ্গ নৌকা হইতে লাফাইয়া তীরে নামিল। দিব্যজ্যোতির পিঠে বিগ্রহপাল আসিতেছেন। কিন্তু যৌবনশ্রী কোথায় ?

ঘোড়া থামিবার পূর্বেই অনঙ্গ ছুটিয়া গিয়া তাহার বল্গা ধরিল—'দেবী যৌবনশ্রী ?'

বিগ্রহপাল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত স্বরে বলিলেন—'তাকে আনতে পারলাম না।'

নৌকা ঘাট ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বায়ু প্রতিকূল তাই পাল তোলা হয় নাই, ছয়জন দাঁড়ী দাঁড় ধরিয়াছে। নৌকা স্রোতের মুখে গিয়া পড়িল।

অনঙ্গ ও বিগ্রহপাল রইঘরের ছাদে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে ঘাটের দিকে চাহিয়া আছেন।

বান্ধুলি চুপিচুপি আসিয়া অনঙ্গের পাশে দাঁড়াইল, চুপিচুপি তাহার একটা আঙ্গুল মুঠিতে চাপিয়া ধরিয়া তীরের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। এরূপ সময়ে কত বিচিত্র হৃদয়াবেগ নারীর চিত্ত জুড়িয়া বসে তাহার ইয়ত্তা নাই। অশ্রুধারাই তাহার একমাত্র অভিব্যক্তি।

ঘাটে জনমানব নাই। লক্ষ্মীকর্ণের দল এখনও আসে নাই, কিম্বা হয়তো আসিবে না ; যৌবনশ্রীকে তাহারা ধরিয়াছে, না আসিতেও পারে। ঘাটে কেবল দুইটি অশ্ব তীরের অতি নিকটে আসিয়া গ্রীবা বাড়াইয়া নৌকার পানে নিষ্পলক চাহিয়া আছে। দিব্যজ্যোতি ও রোহিতাশ্ব। তাহারা কি বুঝিয়াছে যে তাহাদের প্রভু চলিয়া যাইতেছে, আর ফিরিবে না ?

বিগ্রহপাল সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন—'দিব্যজ্যোতি আর রোহিতাশ্বকেও ফেলে যেতে হল।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক

স্বয়ংবর অনুষ্ঠানের গোড়া হইতেই জাতবর্মা শ্বশুরের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। প্রকাশ্যভাবে যৌবনশ্রী ও বিগ্রহপালের পলায়নে সাহায্য করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, সাহায্য প্রয়োজন হইবে এ সম্ভাবনাও তাঁহার মনে আসে নাই। তাই, যৌবনশ্রী যখন ধরা পড়িয়া গেলেন তখন জাতবর্মা কিছুই করিতে পারিলেন না। মুহূর্তমধ্যে একটা অঘটন ঘটিয়া গেল ; কোথাকার একটা নগণ্য ভৃত্য সব পণ্ড করিয়া দিল।

লক্ষ্মীকর্ণ যৌবনশ্রীকে হাত ধরিয়া অবরোধে টানিয়া লইয়া চলিলে জাতবর্মাও সঙ্গে চলিলেন। শ্বশুরের প্রতি তাঁহার মন কোনও কালেই প্রসন্ন ছিল না, এখন আরও বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। তবু শ্বশুরগৃহে শ্বশুরের সহিত কলহ বাঞ্ছনীয় নয়, তিনি যথাসাধ্য শান্তস্বরে বলিলেন—'মহাশয়, এ আপনার অনুচিত। কন্যা যার গলায় সর্বসমক্ষে বরমাল্য দিয়েছে তাকে আপনার গ্রহণ করা উচিত ছিল। নইলে স্বয়ংবরের সার্থকতা কি?'

লক্ষ্মীকর্ণের চক্ষু দেখিয়া মনে হইল এখনি চক্ষু ফাটিয়া রক্ত বাহির হইবে। তিনি সেই চক্ষু জামাতার দিকে ফিরাইয়া গলার মধ্যে গূঢ় শব্দ করিলেন—'ষড়যন্ত্র! চক্রান্ত! সবাই বিশ্বাসঘাতক।'

জাতবর্মা এবার প্রকাশ্যভাবেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—'ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী আপনি। আপনি যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করতেন ষড়যন্ত্রের প্রয়োজন হত না।'

লক্ষ্মীকর্ণের ইচ্ছা হইল জাতবর্মাকে কাটিয়া ফেলেন। কন্যার বৈধব্য না ঘটাইয়া জামাতাকে কাটিয়া ফেলা সম্ভব হইলে তিনি অবশ্য তাহা করিতেন। কিন্তু তাহা অসম্ভব জানিয়া বলিলেন—'কালসাপ! আমি ক্ষীর খাইয়ে কালসাপ পুষেছি।'

জাতবর্মা দেখিলেন তর্ক করা বৃথা। তিনি অতি কষ্টে আত্মনিগ্রহ করিয়া নীরব রহিলেন, মনস্থ করিলেন অবিলম্বে পত্নীকে লইয়া পাপপুরী ত্যাগ করিবেন। এমন যাহার শ্বশুর তাহার শ্বশুরালয় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের নামান্তর মাত্র। রাজভবনে প্রবেশ করিয়া তিনি বীরশ্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সংবাদ রাজপুরীতে রাষ্ট্র হইয়াছিল, বীরশ্রী সজল শঙ্কিত চক্ষে স্বামীর পানে চাহিলেন।

জাতবর্মা বলিলেন—'চল বীরা, দেশে ফিরে যাই। এখানে আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে।'

বীরশ্রী কাছে সরিয়া আসিয়া বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিলেন—'যৌবনা কোথায়?'

জাতবর্মা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন—'তাকে তোমার পিতৃদেব এইমাত্র অবরোধে টেনে নিয়ে এলেন। বোধহয় পাকশালায় নিয়ে গেছেন, কেটে কুটে শূল্য মাংস রন্ধন করবেন।'

লক্ষ্মীকর্ণ কিন্তু কন্যাকে রন্ধনশালায় লইয়া যান নাই, তাহাকে তাহার নিজ গৃহাংশে লইয়া গিয়া শয়নকক্ষের মর্মর কুট্টিমে বসাইয়া প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিগ্রহপালের সহিত কোথায় যৌবনশ্রীর দেখা হইয়াছিল? কে দূতীর কাজ করিয়াছে? কেমন করিয়া যোগাযোগ ঘটিল? রাজপুরীর কোন কোন ব্যক্তি এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। ইত্যাদি। যৌবনশ্রী একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেন নাই, বসুধাবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নীরব ছিলেন।

উত্তর না পাইয়া লক্ষ্মীকর্ণ খুব খানিকটা দাপাদাপি করিয়া শেষে বলিলেন—'বিশ্বাসঘাতিনি, তুই যেমন রাজাদের সমক্ষে আমাকে অপদস্থ করলি, আমিও তেমনি তোকে শাস্তি দেব। এই ঘরে তুই সারা জীবন বন্ধ থাকবি, পুরুষের মুখ দেখতে পাবি না। আজ থেকে এই ঘর তোর কারাগার।' বলিয়া তিনি রঙ্গিণীকে ডাকিলেন।

রঙ্গিণী রাজপুরীর এক প্রেষ্যা। আট নয় বছর আগে সে কিছুদিনের জন্য লক্ষ্মীকর্ণের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। বর্তমানে গতযৌবনা হইলেও তাহার শরীর শক্ত ও সমর্থ, মুখে লাবণ্যের স্থানে কঠিনতা দেখা দিয়াছে। এখন সে অবরোধের দীপ-পালিকা। পুরাতন অনুগ্রহভাগিনীদের মধ্যে তাহাকেই লক্ষ্মীকর্ণ সর্বাধিক বিশ্বাস করেন।

রঙ্গিণী আসিলে লক্ষ্মীকর্ণ তাঁহার নিজের তরবারি তাহার হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিলেন—'রঙ্গিণি, আজ থেকে তোর অন্য কাজ নেই, তুই একে পাহারা দিবি। একে ঘরের বাইরে যেতে দিবি না। কাউকে ঘরে ঢুকতে দিবি না। এই আমার আদেশ, যদি অন্যথা হয়, তোর রক্ত দর্শন করব।'

বিদ্রোহিণী কন্যাকে প্রহরিণীর হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া লক্ষ্মীকর্ণ প্রস্থান করিলেন। রাগ যতই হোক, তাঁহার বুদ্ধির ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয় নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন ষড়যন্ত্রে রাজপুরীর অনেকেই লিপ্ত আছে। দশম গ্রহরূপী জামাতা বাবাজী আছেন, সম্ভবত বীরশ্রীও আছে। এবং নিশ্চয় আছেন পরমারাধ্যা মাতৃদেবী। তিনিই নিঃসন্দেহে এই ষড়যন্ত্রের প্রবর্তক, সকল অনিষ্টের মূল। লক্ষ্মীকর্ণ মাতৃদেবীর কক্ষে গেলেন।

হস্ত সঞ্চালনের ইঙ্গিতে সেবিকাদের কক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া লক্ষ্মীকর্ণ কট্‌মট্ চক্ষে মাতার প্রতি চাহিলেন। শয্যায় শায়িতা মাতাও কট্‌মট্ চাহিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন। ষড়যন্ত্র যে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে এ সংবাদ এখনও অম্বিকা দেবীর কাছে পৌঁছে নাই। রোগপঙ্গু বৃদ্ধাকে কে সংবাদ দিবে?

লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন—'আপনি যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তা সফল হয়নি। অণ্ড দ্রব হয়ে গেছে।'

অম্বিকার চক্ষে উদ্বেগের ছায়া পড়িল, তিনি একটি ভ্রূ তুলিয়া নীরবে পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন।

পুত্র বলিলেন—'বিগ্রহপাল কুক্কুর শাবকের মত পালিয়েছে, যৌবনশ্রীকে নিয়ে যেতে পারেনি। তাকে আমি ঘরে বন্ধ করে রেখেছি। যতদিন বেঁচে থাকবে বন্ধ করে রাখব। আর যারা ষড়যন্ত্র করেছে—' লক্ষ্মীকর্ণ ব্যাঘ্র-চক্ষু মেলিয়া অকথিত বাক্যাংশের ইঙ্গিত মাতাকে বুঝাইয়া দিলেন।

অম্বিকার পক্ষাহত মুখে বিশেষ ভাবান্তর লক্ষিত হইল না, কেবল কণ্ঠ হইতে একটি অস্পষ্ট ধ্বনি নির্গত হইল। এই ধ্বনিকে পরাজয়ের স্বীকৃতি মনে করিয়া লক্ষ্মীকর্ণ ঈষৎ সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন।

দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন এমন সময় পিছন হইতে অম্বিকার জড়িত কণ্ঠস্বর আসিল—'তোর স্বয়ংবর তো পণ্ড হয়েছে।'

লক্ষ্মীকর্ণ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ক্রোধ আবার শিখায়িত হইয়া উঠিল। এই জড়পিণ্ড বুড়িটাকে গলা টিপিয়া মারিলেই ভাল হয়। কিন্তু মাতৃহত্যা মহাপাপ ; বিশেষত প্রজারা জানিতে পারিলে ডিম্ব করিতে পারে। হতভাগ্য প্রজাগুলা বুড়িকে ভালবাসে : লক্ষ্মীকর্ণ কয়েকবার উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া অনিচ্ছাভরে প্রস্থান করিলেন।

দুই

গুপ্ত মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া রাজা দেখিলেন লম্বোদর দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া বলিলেন—'তোকে শূলে দেব।'

লম্বোদর হাত জোড় করিল—'আয়ুষ্মন্, আমি নির্দোষ।'

'তুই সব নষ্টের মূল। শিল্পীটাকে ঘরে পুষে রেখেছিলি।'

'প্রভু, শিল্পীটা আমার শ্যালীকে নিয়ে পালিয়েছে।'

'ভাল করেছে। এবার তোকে শূলে দেব।'

'মহারাজ, আমি বাধা না দিলে বিগ্রহপাল রাজকন্যাকে নিয়ে পলায়ন করত।'

মহারাজ এ কথাটা চিন্তা করেন নাই। লম্বোদর ষড়যন্ত্রে থাকিলে যৌবনশ্রীর পা জড়াইয়া ধরিয়া নিজেই ষড়যন্ত্র পণ্ড করিয়া দিত না। তিনি অঙ্গুলির ইঙ্গিতে লম্বোদরকে মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিতে বলিলেন। চারিদিকে গুপ্তশত্রু পরিবৃত হইয়া মহারাজ মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিলেন, এখন যেন সহায় পাইলেন। যাক, তবু একজন বিশ্বাসী মানুষ আছে।

মন্ত্রগৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া আলোচনা হইল। পরস্পরের সহিত সংবাদ বিনিময়ের ফলে ষড়যন্ত্রের প্রক্রিয়া স্পষ্ট হইল। বিগ্রহপালকে তাড়া করিয়া কোনও লাভ আছে কিনা তাহাও আলোচিত হইল। বিগ্রহপাল সম্ভবত নদীপথেই পলাইয়াছে, কিন্তু এত বিলম্বে আর বোধহয় তাহাকে ধরা যাইবে না। তবু রাজা শোণের ঘাটে একদল অশ্বারোহী পাঠাইলেন। লম্বোদর সঙ্গে গেল। বলা বাহুল্য বিগ্রহপালের নৌকা বহু পূর্বেই ঘাট হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল।—

সূর্যাস্তের পর লম্বোদর ক্লান্ত অবসন্ন দেহে গৃহে ফিরিল। আজিকার দিনটা যেন বিভীষিকায় পূর্ণ। প্রাণ বাঁচিয়াছে বটে কিন্তু মন ক্ষতবিক্ষত।...কর্তব্য করিতে গেলে পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাত, না করিলে, রাজরোষ—লাঞ্ছনা—। তাহাও সহ্য হয়—কিন্তু বান্ধুলি! তাহার চোখের উপর দিয়া বান্ধুলি চলিয়া গিয়াছে, মধুকরের ঘোড়ায় চড়িয়া তাহার গলা জড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে!

বেতসী দ্বার পিণ্ডিকার বাহিরে দাঁড়াইয়া ব্যাকুল নয়নে পথের পানে চাহিয়া ছিল। স্বয়ংবর সভায় কি একটা গোলমাল হইয়াছে এইটুকুই তাহার কানে আসিয়াছিল। তাই অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তায় সে দ্বিপ্রহর হইতেই গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাটাইয়াছে, মধ্যাহ্নে অন্নগ্রহণের কথাও মনে ছিল না। লম্বোদর স্বয়ংবরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কি জানি কি ঘটিয়াছে! তারপর সন্ধ্যার সময় লম্বোদরকে আসিতে দেখিয়া সে ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল।

প্রদোষের ম্লান আলোকে লম্বোদরের মুখ দেখিয়া বেতসীর বুক ধড়াস করিয়া উঠিল। যেন সর্বস্বহারার মুখ। বেতসীর মনে অনেক প্রশ্ন জমা হইয়াছিল, কিন্তু একটি প্রশ্নও সে মুখে আনিতে পারিল না। নীরবে হাত ধরিয়া সে লম্বোদরকে গৃহের মধ্যে লইয়া গেল। পীঠিকায় বসাইয়া তাহার পা ধুইয়া দিল। মুখে জল দিয়া গামোছায় গা মুছিয়া লম্বোদরের দেহ অনেকটা সুস্থ হইল। বেতসী তাহাকে শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া নিজের শয্যায় বসাইয়া বলিল—'আমি তোমার খাবার নিয়ে আসি।'

বেতসী খাবার আনিতে গেল। লম্বোদর শয্যায় বসিয়া রহিল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘন হইতেছে। এ জগতে কেহ কাহারও নয়, সব বিচ্ছিন্ন সংযোগহীন নিরর্থক। জীবন শূন্য, কেবল বুকের মধ্যে একটা অবশ বেদনা হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে ধুক্ ধুক্ করিতেছে।

বেতসী খাদ্য পানীয় আনিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল—'আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

লম্বোদর কী খাইল কিছুরই স্বাদ পাইল না। কপিত্থ সুরভিত তক্র, তাহারও স্বাদ নাই।

পানাহার শেষ হইলে বেতসী বলিল—'তুমি শোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। দীপ জ্বালব ?'

'না।'

লম্বোদর শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিল, বেতসী শিয়রে বসিয়া লঘুহস্তে চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে লম্বোদর যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সংসারে কোনও কিছুরই অর্থ হয় না...রাজকার্য...গুপ্তচরবৃত্তি...বান্ধুলি...সব অলীক...মিথ্যা। মিথ্যা।

পূর্বগগনে চাঁদ উঠিতেছে, পূর্ণিমার চাঁদ। শয্যার উপর চাঁদের আলো বাতায়ন দিয়া আসিয়া পড়িল, যেন শুভ্র ফুলের আস্তরণ বিছাইয়া দিল। সেই আলোতে লম্বোদরের মুখের পানে চাহিয়া বেতসী আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার বুকের মধ্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। সে নত হইয়া লম্বোদরের মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিল।

লম্বোদর চমকিয়া চোখ খুলিল। একি! চাঁদের আলোয় ঘর ভরিয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইল সে যেন এক অন্ধকারময় দুঃস্বপ্নের পঙ্ককুণ্ড হইতে উঠিয়া আসিল। এত আলো পৃথিবীতে আছে! আলো আছে, মাধুর্য আছে, স্নেহমমতা আছে। তাহার আপনার জন আছে, একান্ত আপনার জন। সুখে দুঃখে জীবনে মরণে সে শুধু তাহারই। তবে আর কিসের জন্য ক্ষোভ ?

দুই বিন্দু আতপ্ত অশ্রু লম্বোদরের গণ্ডের উপর পড়িল। সে হাত বাড়াইয়া বেতসীকে বুকের কাছে টানিয়া লইল, পুরাতন চিরাভ্যস্ত স্নেহার্দ্র স্বরে ডাকিল—'বেতসি—'

তিন

পরদিন প্রভাতে জাতবর্মা সস্ত্রীক স্বদেশ প্রতিগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বীরশ্রী প্রথমে ঠাকুরানীর ঘরে গেলেন। অম্বিকা তাঁহার প্রিয়তমা নাতিনীর গলা জড়াইয়া অশ্রু বিসর্জন করিলেন। তারপর বলিলেন—'তোর সঙ্গে আর দেখা হবে না। কিন্তু তুই এ পাপপুরীতে আর থাকিস না, স্বামীকে নিয়ে নিজের দেশে চলে যা। এ রাজ্যের আর ইষ্ট নেই, পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। বিধাতার অভিশাপ, রাজা পুত্রহীন ; তার উপর এত পাপ। এ বংশ আর বেশি দিন নয়।'

বীরশ্রী বলিলেন—'কিন্তু দিদি, যৌবনার কী হবে ?'

অম্বিকা বলিলেন—'যৌবনার ভালই হবে। দেশসুদ্ধ লোকের সামনে সে বিগ্রহপালের গলায় মালা দিয়েছে, এখন আর অন্য কোনও রাজা তাকে বিয়ে করবে না। তোর বাপ কতদিন তাকে বন্ধ করে রাখবে ? তুই দেখিস যৌবনার ভালই হবে। বাপ যতবড় দুরাচারই হোক, এ বংশের কোনও মেয়ে কখনও অসুখী হয়নি।'

ঠাকুরানীর পদধূলি মাথায় লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বীরশ্রী বিদায় লইলেন। পিতামহীর সহিত জীবনে আর দেখা হইবে না ; পিত্রালয়ে আর কখনও আসিবেন সে সম্ভাবনাও অল্প।

সেখান হইতে বীরশ্রী যৌবনার নিকটে গেলেন। রঙ্গিণী খোলা তলোয়ার হাতে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, বীরশ্রীকে আসিতে দেখিয়া তাহার কঠিন মুখ আরও কঠিন হইল। বীরশ্রী কাছে আসিলে সে বলিল—'বড় কুমারি, এ ঘরে প্রবেশ নিষেধ।'

বীরশ্রী ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, যেন রঙ্গিণী নাম্নী দাসীকে দেখিতেই পান নাই। কিন্তু তিনি কক্ষে প্রবেশ করিলেন না, বাহির হইতে ডাকিলেন—'যৌবনা।'

যৌবনশ্রী আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন। তিনিও দ্বার অতিক্রম করিলেন না। দুই বোন দ্বারের দুই দিক হইতে পরস্পরের পানে চাহিলেন। দুইজনেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কাল যৌবনশ্রীর রূপ ছিল নবোদ্ভিন্ন হিমচম্পকের ন্যায়, আজ সেই রূপ শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চোখের কোলে ছায়া, কেশ-বেশ অবিন্যস্ত, অঙ্গ নিরাভরণ। বীরশ্রীর হৃদয় মথিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

কিন্তু রঙ্গিণীর সম্মুখে অধিক হৃদয়াবেগ প্রকাশ করা চলিবে না। বীরশ্রী কণ্ঠস্বর দৃঢ় করিয়া বলিলেন—'যৌবনা, আজ আমরা চলে যাচ্ছি।'

এই কথা কয়টির মধ্যে কি ছিল জানি না, তাঁহাদের হৃদয়াবেগ আর শাসন মানিল না ; দুইজনে ছুটিয়া আসিয়া পরস্পরের কণ্ঠলগ্না হইলেন। রঙ্গিণী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তলোয়ার হাতে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ঘোর বিপদ, একদিকে রাজা অন্যদিকে দুই রাজকন্যা ; আগু হইলে রাম, পিছাইলে রাবণ।

বীরশ্রী ভগিনীর কানে কানে বলিলেন—'আমরা পাটলিপুত্রে থামব। তুই বিগ্রহকে কিছু বলবি ?'

যৌবনশ্রী কয়েকবার অশ্রু গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—'তাঁকে বলো, এ জন্মে যদি দেখা না হয়, পরজন্মে দেখা হবে।'

বীরশ্রী বলিলেন—'এ জন্মেই দেখা হবে। তোকে বিগ্রহের কোলে যদি না তুলে দিতে পারি, বৃথাই আমি তোর দিদি।'

আরও খানিক কান্নাকাটি হইল, তারপর বীরশ্রী চলিয়া গেলেন। রঙ্গিণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মধ্যাহ্নের পূর্বেই জাতবর্মা ও বীরশ্রী রথে চড়িয়া শোণ-ঘাটের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মীকর্ণ মন্ত্রীদের লইয়া গুপ্ত মন্ত্রগৃহের দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন, বিদায়কালে কন্যা-জামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না।

ঘাটে পৌঁছিয়া জাতবর্মা ও বীরশ্রী বিষণ্নমনে নৌকায় উঠিলেন। দিশারু শুভঙ্কর অপহৃত দাঁড়ের পরিবর্তে নূতন দাঁড় যোগাড় করিয়াছিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

চার

পূর্বদিন এই সময় বিগ্রহপালের নৌকা ঘাট ছাড়িয়াছে।

ঘাট ছাড়িয়া নৌকা স্রোতের মুখে পড়িল। বায়ু প্রতিকূল হইলেও স্রোত ও দাঁড়ের জোরে নৌকা ক্ষিপ্রবেগে চলিল। দুই দণ্ডের মধ্যে শোণের ঘাট দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল। দিব্যজ্যোতি ও রোহিতাশ্বকে আর দেখা গেল না।

আকাশে প্রখর রৌদ্র ; এক মাসেই উত্তরগামী সূর্য বিলক্ষণ তপ্ত হইয়াছে। তিনজনে নিশ্বাস ফেলিয়া ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন। বান্ধুলি শয্যা পাতিয়া দিল, দুই বন্ধু উপবেশন করিলেন। বান্ধুলি ঘরের এক কোণে গিয়া পান সাজিতে লাগিল।

কথা বলিতে যেন সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। অনঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া উদ্বিগ্নচক্ষে বিগ্রহপালের দিকে চাহিতেছে, কিন্তু কথা কহিতেছে না। সে জানে বিগ্রহের মনের অবস্থা কিরূপ ; এখন সান্ত্বনা দিতে গেলে সে আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে। আর বান্ধুলি ? সে কী কথা বলিবে ? তাহার অবস্থা নববধূর মত ; উপরন্তু শঙ্কা ও সঙ্কোচে সে এতটুকু হইয়া গিয়াছে। যৌবনশ্রী

আসিতে পারেন নাই অথচ সে আসিয়াছে, এই অপরাধের ভারে সে যেন মাটিতে মিশিয়া আছে।

বিগ্রহপালের মনের মধ্যে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে ; তাঁহার সংজ্ঞা অন্তর্মুখী, তাই তিনিও নীরব।—এ কী হইল ! যৌবনশ্রী ! যৌবনা ! তোমাকে পাইয়াও পাইলাম না। এতদিনের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা সমাপ্তির উপান্তে আসিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।...আরম্ভ হইতে দৈব ছিল অনুকূল। পথে বীরশ্রী ও জাতবর্মার সহিত সাক্ষাৎ, যৌবনশ্রীকে হরণ করার প্রস্তাবে তাঁহাদের সম্মতি ও সহায়তা, যৌবনশ্রীর সহিত সাক্ষাৎমাত্রেই উভয়পক্ষের অনুরাগ, তারপর কার্যসিদ্ধির পক্ষে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা যেন অযাচিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু হঠাৎ এ কী হইয়া গেল ! প্রসন্ন ভাগ্যদেবতা অকস্মাৎ মুখ ফিরাইলেন। তীরে আসিয়া তরী ডুবিল !

বিগ্রহপালের মনে আত্মগ্লানিও কম ছিল না। কেন যৌবনাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। না হয় দুইজনে একসঙ্গে মরিতাম। রাজারা হাসিবে, কাপুরুষ বলিয়া ব্যঙ্গ করিবে। আর যৌবনা ! সে যদি আমাকে কাপুরুষ মনে করে ? না না, তা করিবে না। কিন্তু যৌবনশ্রী কি বাঁচিয়া আছে ? যদি—

তাঁহার মন অস্থিরতায় ছটফট করিয়া উঠিল ; তিনি আর রইঘরে থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া গিয়া ছাদে বসিলেন। সূর্যের তাপ কমিয়াছে, দক্ষিণ হইতে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রইঘরে বান্ধুলি অনঙ্গের কাছে আসিয়া চোখ ডাগর করিয়া চাহিল। দুইজনে নিম্নস্বরে কথা হইল। তারপর অনঙ্গও ছাদে গিয়া বিগ্রহের কাছে বসিল।

দুইজনে বসিয়া আছেন, কাহারও মুখে কথা নাই। সূর্যের বর্ণ পীত হইয়া ক্রমে লোহিতাভা ধারণ করিল। নৌকার ছায়া সম্মুখে দীর্ঘায়িত হইতে লাগিল।

হঠাৎ বিগ্রহপাল কথা বলিলেন। যেন দীর্ঘ নীরবতা লক্ষ্য করিয়া লঘুতার অভিনয় করিলেন, বলিলেন—'তুই ঠিক বলেছিলি অনঙ্গ। পাটলিপুত্রের ঘাটে যে পাখি দুটো দেখেছিলাম সে-দুটো খঞ্জন নয়, কাদাখোঁচাই বটে।'

অনঙ্গ একটু হাসিল, বলিল—'আর্য রন্তিদেবও ঠিক বলেছিলেন, এখন পূর্ণ সিদ্ধি না হলেও অন্তে সিদ্ধি অনিবার্য।'

বিগ্রহপালের মনের অন্ধকার কিছু স্বচ্ছ হইল না। রন্তিদেবের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তাঁহার মনে ছিল না। তবে একেবারে হতাশ হইবার কারণ নাই। অন্তে সিদ্ধি—কিন্তু সে অন্ত কতদূর ?

তিনি ধীরে ধীরে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্বে অনঙ্গকে অতি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছিলেন, সভা হইতে বাহির হইবার পর লম্বোদর কর্তৃক যৌবনশ্রীর পদধারণ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া শেষে প্রশ্ন করিলেন—'এ অবস্থায় তুই কি করতিস ?'

অনঙ্গ যেন একটু চিন্তা করিল, তারপর মাথা নাড়িল—'কি করতাম বলতে পারি না। ঢাল নেই তলোয়ার নেই, এ অবস্থায় মানুষ কি করতে পারে ? হয়তো লম্বোদরের বগলে কাতুকুতু দিতাম। কিন্তু তাতে ফল হত বলে মনে হয় না। লম্বোদর মানুষ নয়, গণ্ডার।'

এতক্ষণে বিগ্রহপালের মুখে হাসির আভাস দেখা দিল, আত্মগ্লানিও লাঘব হইল। অনঙ্গ অপ্রত্যক্ষভাবে সেই চেষ্টাই করিতেছিল।

সূর্যাস্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাকাশে চাঁদ উঠিল। বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রি। বিগ্রহপাল চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

গরুড় আসিয়া বলিল—'রাত্রি হল, এবার নৌকা বাঁধি ?'

অনঙ্গ বিগ্রহের পানে চাহিল। বিগ্রহ বলিলেন—'আমি জানি না। যা ইচ্ছা কর।'

অনঙ্গ তখন গরুড়কে বলিল—'পিছনে ওরা আসছে কিনা জানা নেই, নৌকা বাঁধা নিরাপদ হবে না। সারা রাত চাঁদ থাকবে, দিনের মত আলো। তুমি নৌকা চালাও। অনুকূল বাতাস উঠেছে, দাঁড় বন্ধ করে পাল তোল। স্রোতের মুখে পালের ভরে ভেসে চল। কিন্তু সাবধান, নৌকা চরে আটকে না যায়।'

'আজ্ঞা' বলিয়া গরুড় প্রস্থান করিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই গরুড় দাঁড় বন্ধ করিয়া পাল তুলিয়া দিল। চারিদিক আবছায়া হইয়া গিয়াছে, তীররেখা অস্পষ্ট। নৌকার সম্মুখে গরুড় বসিয়াছে, পিছনে আছে হালী। দুইজনে সতর্কভাবে নৌকা চালাইতে লাগিল।

রাত্রির আহার শেষ হইলে বিগ্রহ অনঙ্গকে বলিলেন—'তুই আর বান্ধুলি রইঘরে থাক। আমি ছাদে শোব।'

অনঙ্গ বলিল—'আমিও ছাদে শোব।'

বিগ্রহ বলিলেন—'কিন্তু, একা বান্ধুলির ভয় করবে না ?'

অনঙ্গ মুখ টিপিয়া বলিল—'আমি থাকলেই ওর ভয় বেশি।—চল শুই গিয়ে।'

ছাদে শয্যা রচনা করিয়া দুই বন্ধু শয়ন করিলেন। মুক্ত আকাশের তলে জ্যোৎস্নার প্লাবনে যেন ভাসিয়া চলিলেন। বিগ্রহপাল ভাবিতে লাগিলেন—যৌবনা যদি আজ এই নৌকায় থাকিত, পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়া আসিত। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। ক্লান্ত-পীড়িত মন লইয়া একে একে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কেবল গরুড় ও হালী সারা রাত্রি জাগিয়া নৌকা চালাইল।

পাঁচ

তিন দিন নদীবক্ষে যাপন করিয়া চতুর্থ দিনের পূর্বাহ্ণে বিগ্রহপাল পাটলিপুত্রের রাজঘাটে পৌঁছিলেন।

মহারানী পুত্রের মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, কিছু ঘটিয়াছে। কিন্তু তিনি কুশলপ্রশ্ন করিবার পূর্বেই বিগ্রহপাল বলিলেন—'মা, দেখ অনঙ্গ কেমন বৌ এনেছে।'

বান্ধুলি মহারানীকে প্রণাম করিল। মহারানী বিস্ময়োৎফুল্ল মুখে তাহাকে কাছে টানিয়া লইলেন, তাহার ভীত-লজ্জিত মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—'কী সুন্দর বউ! এমন বউ কোথায় পেলি অনঙ্গ ?'

অনঙ্গ ঘাড় চুলকাইতে লাগিল। বিগ্রহ বলিলেন—'সব পরে শুনো। ওদের এখনও বিয়ে হয়নি, তোমাকে বিয়ে দিতে হবে। এখন এদিকের সংবাদ বল। মহারাজ কেমন আছেন ?'

রানী বলিলেন—'মহারাজ অসুস্থ।'

'অসুস্থ ?'

'কিছুদিন থেকে শরীর ভাল নেই। তোরা তাঁর কাছে যা। তোদের আসার খবর পেয়েছেন, বিরামকোষ্ঠে আছেন।'

বিগ্রহ ও অনঙ্গ বান্ধুলিকে মায়ের কাছে রাখিয়া মহারাজ নয়পালের নিকটে গেলেন।

নয়পাল প্রাসাদের একটি কক্ষে দিবাশয্যায় অর্ধশয়ান অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছিলেন, একজন সংবাহক পদসেবা করিতেছিল। মহারাজের শরীর কিছু কৃশ, মুখের চর্ম শিথিল ও রেখাঙ্কিত হইয়াছে ; কিন্তু তিনি শয্যাশায়ী হন নাই। লক্ষ্মীকর্ণের উদ্দেশে তিনি যে মারণ যজ্ঞের প্রবর্তন

করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজেও যোগ দিয়াছিলেন ; কুম্ভক রেচকাদি প্রক্রিয়ার ফলে, লক্ষ্মীকর্ণের যত না অনিষ্ট হোক, তিনি নিজে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি উলট-পালট হইয়া গিয়াছিল। অজীর্ণ ও অনিদ্রা রোগ ধরিয়াছিল।

বিগ্রহ ও অনঙ্গ আসিয়া পদবন্দনা করিলে তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, সংবাহককে বিদায় করিয়া কুশল প্রশ্নাদি করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় কোথায় গিয়েছিলে ? কোন কোন দেশ দেখলে ?'

এখনই পিতাকে সব কথা বলার সংকল্প বিগ্রহপালের ছিল না, কিন্তু সরাসরি মিথ্যা কথাও বলিতে পারিলেন না। বলিলেন—'কেবল ত্রিপুরী গিয়েছিলাম।'

মহারাজ উচ্চকিত হইয়া চাহিলেন—'ত্রিপুরী ! অর্থাৎ—লক্ষ্মীকর্ণের কন্যার স্বয়ংবরে ?'

বিগ্রহ কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন—'আজ্ঞা মহারাজ।'

নয়পাল বিরক্ত হইলেন—'অনাহূত শত্রুরাজ্যে গিয়েছিলে ! লক্ষ্মীকর্ণ মহাপিশুন, সে যদি অসহায় পেয়ে তোমাকে হত্যা করত ! কি জন্য গিয়েছিলে ? যাবার আগে আমাকে বলনি কেন ?'

বিগ্রহপাল অধোমুখে রহিলেন। অনঙ্গ তখন সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে বলিল—'মহারাজ, যদি অনুমতি হয় আমি সব কথা বলতে পারি।'

নয়পাল তাহার প্রতি অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—'বল।'

অনঙ্গ তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া সব কথা বলিল। শুনিতে শুনিতে মহারাজের অপ্রসন্নতা দূর হইল, তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। আখ্যান শেষ হইলে তিনি শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—'যৌবনশ্রী স্বয়ংবর সভায় বিগ্রহের গলায় বরমাল্য দিয়েছে ! তবে তো যৌবনশ্রী আমার পুত্রবধূ ! লক্ষ্মীকর্ণ তাকে আটকে রাখে কোন্ স্পর্ধায় !'

অনঙ্গ যখন মহারাজকে কাহিনী শুনাইতেছিল বিগ্রহপাল তখন বাতায়নের সম্মুখে গিয়া বাহিরে তাকাইয়া ছিলেন। এখন তিনি সচকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মুখ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। তিনি দ্রুত গিয়া পিতার হাত ধরিলেন—'মহারাজ, আপনি শান্ত হোন। আপনার শরীর অসুস্থ—'

মহারাজ কিন্তু শান্ত হইলেন না, বলিলেন—'তোমরা যৌবনশ্রীকে আনতে পারলে না, অত্যন্ত পরিতাপের কথা। কিন্তু আমি ছাড়ব না। আমি এখনি লক্ষ্মীকর্ণের কাছে দূত পাঠাচ্ছি। সে যদি এই দণ্ডে আমার পুত্রবধূকে আমার কাছে পাঠিয়ে না দেয় আমি যুদ্ধ করব। চেদিরাজ্য ছারখার করে দেব।'

বিগ্রহ ও অনঙ্গ মহারাজকে ধরিয়া শয্যায় বসাইয়া দিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—'মহারানী কোথায় ? তিনি সংবাদ জানেন ? তাঁকে ডেকে আনো। আমি যুদ্ধ করব। মহারানী কোথায় ?'

দুই বন্ধু মহারানীর কাছে গেলেন। গিয়া দেখিলেন মহারানী বান্ধুলির নিকট হইতে সব কথাই বাহির করিয়া লইয়াছেন। তিনি হাস্যবিম্বিতমুখে পুত্রের বুকের উপর স্নিগ্ধ করতল রাখিয়া বলিলেন—'তুই ভাবনা করিস না। আমার ঘরের লক্ষ্মী আট্‌কে রাখে এমন সাধ্য কারও নেই।'

বিগ্রহ পিতার উত্তেজিত আস্ফালনে যে আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন মাতার শান্ত দৃঢ়তায় তদপেক্ষা অধিক আশ্বাস পাইলেন। হাসিমুখে কহিলেন—'মহারাজ বলছেন যুদ্ধ করবেন।'

মহারানী বলিলেন—'প্রয়োজন হলে যুদ্ধ হবে। আপাতত বান্ধুলি আর অনঙ্গের বিয়েটা দিয়ে দিই। অনেকদিন বাড়িতে উৎসব হয়নি।'

তারপর মহারানী বান্ধুলির হাত ধরিয়া এবং বন্ধুযুগল কর্তৃক অনুসৃত হইয়া মহারাজের নিকট চলিলেন।



দুই দিন পরে জাতবর্মা ও বীরশ্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাটলিপুত্রের রাজভবনে অনঙ্গের বিবাহ উপলক্ষে উৎসবের সূচনা হইয়াছিল, এখন তাহা চতুর্গুণ বর্ধিত হইল। বিগ্রহপাল বীরশ্রীকে প্রায় কাঁধে করিয়া ঘাট হইতে রাজপুরীতে আনিয়া মায়ের কোলে সঁপিয়া দিলেন। জাতবর্মাকে নয়পাল পুত্রস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। এই সময় ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে পরস্পর প্রীতির সম্পর্ক ছিল না, যেখানে বাহিরে মৈত্রীবন্ধন আছে সেখানেও ভিতরে ভিতরে ঈর্ষা দ্বেষ অসহিষ্ণুতা ছিল। জাতবর্মা সস্ত্রীক পাটলিপুত্রে আসিয়া যেন সত্যকার হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। নয়পাল স্বয়ং হৃদয়বান পুরুষ, তিনি বিগলিত হইয়া গেলেন। তাঁহার শত্রুর কন্যা এবং জামাতা স্বেচ্ছায় প্রীতিবশে তাঁহার কাছে আসিয়াছে। নয়পাল অসুস্থ শরীর লইয়া সর্বদা জাতবর্মার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং বারম্বার অবরোধে গিয়া বীরশ্রীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া আসিলেন। মহারানী স্বহস্তে জাতবর্মাকে মিষ্টান্ন খাওয়াইলেন। বীরশ্রী তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দিয়া তাঁহার হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। বান্ধুলি বীরশ্রীকে পাইয়া নববধূসুলভ লজ্জা সঙ্কোচ ভুলিয়া গেল এবং ক্রমাগত মহারানীর জন্য পান সাজিতে লাগিল। মহারানী পান ভালবাসেন, দিনে ত্রিশ-চল্লিশটা পান খান।

একদিন মহা ধুমধামের সহিত অনঙ্গ ও বান্ধুলির বিবাহ হইয়া গেল। মহারাজ স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিলেন ; মহারানী ও বীরশ্রী বান্ধুলিকে মহার্ঘ যৌতুক দিলেন। অনঙ্গ বধূ লইয়া নিজ গৃহে গেল। বিগ্রহপাল যৌবনশ্রীর কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে বেদনা পাইলেও বন্ধুর বিবাহে সর্বদা অগ্রণী হইয়া রহিলেন এবং বাসক রজনীতে নবদম্পতিকে পুষ্পশয্যায় শয়ন করাইয়া গৃহে ফিরিলেন।

অতঃপর উৎসবের কলবলা কথঞ্চিত শান্ত হইলে নয়পালের বিরামকোষ্ঠে কূটনৈতিক সভা বসিল। সভায় উপস্থিত রহিলেন কেবল পাঁচজন, নয়পাল বিগ্রহপাল জাতবর্মা অনঙ্গ ও সচিব যোগদেব। যৌবনশ্রী সম্পর্কে কি করা যাইবে তাহাই বিচার্য। আলাপ আলোচনা মুখ্যত নয়পাল ও জাতবর্মার মধ্যে হইল।

নয়পালের মানসিক উত্তেজনা এখন সমীভূত হইয়াছে, তিনি ধীরকণ্ঠে বলিলেন—'আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার আয়ু শেষ হয়ে আসছে। তার উপর দেহ পীড়াগ্রস্ত। তোমরা নবীন, আজ নয় কাল রাজ্যশাসনের ভার তোমাদের উপর পড়বে। তোমাদের প্রজা পালন করতে হবে, অন্য রাজাদের সঙ্গে মন্ত্রযুদ্ধ করতে হবে। এখন তোমরা বল, স্বয়ংবর সভায় যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার সমাধান কোন পথে ? আমাদের কর্তব্য কি ?'

কেহ কোনও উত্তর দিল না, যোগদেব নীরব রহিলেন। তখন জাতবর্মা অগ্রণী হইয়া বলিলেন—'আগে আপনি আজ্ঞা করুন, আর্য, আপনি কি কোনও কর্তব্য স্থির করেছেন ?'

নয়পাল বলিলেন—'স্থির কিছু করিনি। তবে আমার বিবেচনায় প্রথমে লক্ষ্মীকর্ণের কাছে দূত পাঠানো উচিত।'

জাতবর্মা বলিলেন—'রাষ্ট্রনীতির নিয়মে দূত পাঠানোই হয়তো কর্তব্য। কিন্তু তাতে কোনও ফল হবে না আর্য। শ্বশুর মহাশয়কে আমি চিনি।'

'তাহলে অন্য উপায় আর কী আছে ? ছলে বা কৌশলে কার্যোদ্ধার হতে পারে কি ?'

'এখন আর সম্ভব নয়। শ্বশুর মহাশয় সাবধান হয়েছেন। যৌবনশ্রীর ঘরেব দ্বারে পাহারা, রাজপুরী ঘিরে পাহারা বসেছে। ছল-চাতুরীতে আর কিছু হবে না।'

নয়পাল নিশ্বাস ফেলিলেন। যৌবনশ্রী যদি চুপি চুপি পলায়ন করিতে সম্মত হইতেন তাহা

হইলে কোনও গণ্ডগোল হইত না একথা সকলেরই মনে হইল। কিন্তু সেজন্য যৌবনশ্রীকে দোষী করিবার চিন্তা কাহারও মনে আসিল না। তিনি উচিত কার্য করিয়াছেন, আর্য নারীর ন্যায় আচরণ করিয়াছেন ; তাঁহার আচরণে সকলেই গৌরবান্বিত। তবু—তিনি উচিত কার্য সম্বন্ধে এতটা সচেতন না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।

'তাহলে যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর নেই, এই তোমার মত ?'

জাতবর্মা নতমস্তকে নীরব রহিলেন। নয়পাল তখন বলিলেন—'আমি নিজের অভিপ্রায় তোমাদের বললাম। যদি বিনা যুদ্ধে কার্যসিদ্ধি হয় তাই ভাল, কিন্তু যদি যুদ্ধ করতেই হয় তাতে আমার অমত নেই। এখন তোমরা বল তোমাদের অভিপ্রায় কি !'

বিগ্রহ নির্বাক রহিলেন, অনঙ্গও কথা বলিল না ; যোগদেব একটা কিছু বলি বলি করিয়া থামিয়া গেলেন। শেষে কেহ কিছু বলিল না দেখিয়া জাতবর্মা বলিলেন—'মহারাজ, আপনাকে মন্ত্রণা দেবার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু অবস্থা যেরূপ দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় যুদ্ধ ছাড়া যৌবনশ্রীকে উদ্ধার করা যাবে না। এবং যদি যুদ্ধই করতে হয় তবে যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। শ্বশুর মহাশয় এখন একটু বিপাকে পড়েছেন, চেদিরাজ্য আক্রমণের এই প্রকৃষ্ট সুযোগ।'

ঈষৎ হাসিয়া নয়পাল প্রশ্ন করিলেন—'কিরূপ বিপাক ?'

জাতবর্মা বলিলেন—'স্বয়ংবর সভায় যে-সব মিত্র রাজা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেছেন, তাঁদের ধারণা চেদিরাজ তাঁদের হাস্যাস্পদ করেছেন। এখন আপনি চেদিরাজ্য আক্রমণ করলে তাঁরা কেউ সাহায্য করতে আসবেন না। শ্বশুর মহাশয় ভয় পেয়ে আপনার হাতে যৌবনশ্রীকে অর্পণ করতে পারেন।'

নয়পাল প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন—'যথার্থ বলেছ। একথা আমার মনে উদয় হয়নি। হয়তো যুদ্ধ করবার প্রয়োজন হবে না, হুঙ্কারেই কাজ হবে। বৎস জাতবর্মা, আমি তোমার প্রতি বড় প্রীত হয়েছি। তুমি তোমার পিতার সুপুত্র বটে। আশীর্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও।'

এইবার সচিব যোগদেব প্রথম কথা বলিলেন, জাতবর্মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—'ক্ষমা করবেন, একটি প্রশ্ন আছে। মগধ যুদ্ধযাত্রা করলে আপনি সঙ্গে থাকবেন তো ?'

জাতবর্মা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, নয়পালের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'মহারাজ, অন্তর্যামী জানেন আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধাভিযানে যোগ দিতে কত উৎসুক। শ্বশুর মহাশয় যেরূপ ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর প্রতি তিলমাত্র সহানুভূতি আমার নেই। কিন্তু আমি স্বাধীন নই, মাথার উপর পিতৃদেব আছেন। আমি দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর কাছে সব নিবেদন করব। তিনি ন্যায়বান পুরুষ, অন্যায়ের পক্ষ কদাপি অবলম্বন করবেন না।'

'ভাল। আমি তাঁকে পত্র লিখব, তারপর তাঁর ইচ্ছা।'—নয়পাল ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—'আর একটা কথা। আমি লক্ষ্মীকর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে মাতা যৌবনশ্রীর কোনও অনিষ্ট সম্ভাবনা নেই ?'

জাতবর্মার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—'মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ যদি আপনার প্রতি বিদ্বেষবশত নিজের কন্যার অনিষ্ট করেন তবে তাঁর মত নরাধম ভূ-ভারতে নেই।'

অতঃপর আরও কিছুক্ষণ আলোচনা হইল। যোগদেব কনিষ্ঠ সচিব হইলেও রাজার পারিবারিক মন্ত্রণায় যোগ দিতেন ; বিশেষত এই ব্যাপারের সহিত আরম্ভ হইতেই তাঁহার একটা যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি এখন সমস্ত করণীয় কর্মের ভার লইলেন। স্থির হইল চেদিরাজ্যে দূত পাঠানো হইবে, সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ হইবে। দৌত্য যদি বিফল হয় তখন নয়পাল যুদ্ধযাত্রা করিবেন। বজ্রবর্মা যদি তাঁহার সহযাত্রী হন ভাল, নচেৎ একাই যুদ্ধে

যাইবেন। মগধ এখন আর সে-মগধ নাই সত্য, কিন্তু একেবারে মরিয়া যায় নাই।

সাত দিন মগধের আতিথ্য উপভোগ করিয়া জাতবর্মা ও বীরশ্রী আবার নৌকায় উঠিলেন। যাত্রার পূর্বে মহারানী বীরশ্রীর কণ্ঠে মহামূল্য রত্নহার পরাইয়া দিলেন। নয়পাল জাতবর্মাকে মণিমাণিক্যখচিত অঙ্গদ ও শিরস্ত্রাণ দিলেন।

প্রণামকালে বীরশ্রী মহারানীকে বলিলেন—'মা, আমরা আবার আসব। এবার যৌবনাকে নিয়ে আসব।'

মহারানী সজল নেত্রে তাঁহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন—'এস।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এক

স্বয়ংবরে আমন্ত্রিত রাজারা লক্ষ্মীকর্ণকে গালি দিতে দিতে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরী নগরীতে বহু জন সমাগমে যে সংখ্যাস্ফীতি ঘটিয়াছিল তাহা আবার সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। নগরীর ব্যবসায়ী ও বিলাসিনীরা দুঃখিত, শান্তিপ্রিয় গৃহস্থেরা আনন্দিত। জল্পকেরা স্বয়ংবর সম্পর্কে নানা সম্ভব অসম্ভব কাহিনী পরস্পরকে শুনাইতেছে এবং শুনিতেছে। মোটের উপর নগরীর অবস্থা স্বাভাবিক।

রাজভবনের অবস্থা কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক নয়। রাজমাতা অম্বিকা দেবী নিজ শয্যায় অনড় হইয়া পড়িয়া আছেন; আগে দুই একটি কথা বলিতেন এখন তাহাও বলেন না, কেবল দুঃস্বপ্নভরা চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকেন। গভীর রাত্রে প্রদীপের আলোকে তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয় তিনি উৎকর্ণ হইয়া চঞ্চলা রাজলক্ষ্মীর ক্রম-বিলীয়মান পদধ্বনি শুনিতেছেন।

প্রাসাদের অন্যত্র যৌবনশ্রী নিজ কক্ষে অবরুদ্ধা আছেন। দ্বারে রঙ্গিণী প্রহরিণী। একাকিনী রাজকন্যা, দিন কাটে তো রাত কাটে না। তিনি বেণী খুলিয়া আবার বয়ন করেন; আবার খোলেন, আবার বয়ন করেন। পাচিকা অন্ন রাখিয়া যায়, কখনও আহারে বসেন, কখনও বসেন না। কক্ষে কালিদাসের কয়েকটি পুঁথি আছে, তাহাই খুলিয়া নাড়াচাড়া করেন। মেঘদূতের দুই চারিটি শ্লোক পড়েন, রঘুবংশের অজবিলাপ পড়েন, কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ পড়িতে পড়িতে সহসা পুঁথি বন্ধ করিয়া শয্যায় শয়ন করেন। চক্ষু মুদিয়া শয্যায় পড়িয়া থাকেন। বাতায়নের বাহিরে বপ্‌পীহ্ পাখিটা আম্রকানন হইতে বুক-ফাটা স্বরে ডাকে—পিয়া পিয়া পিয়া!

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের মানসিক অবস্থা বোধ করি সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক। যত দিন যাইতেছে অপমান ও লাঞ্ছনার শেল ততই গভীরভাবে তাঁহার মর্মে প্রবেশ করিতেছে। মন্ত্রীরা তাঁহাকে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু বিশেষ ফল হইতেছে না। তিনি পণ করিয়াছেন মগধের কুক্কুরবংশকে নির্বংশ করিবেন, পালবংশে বাতি দিতে কাহাকেও রাখিবেন না। মন্ত্রণাসভায় এইরূপ আস্ফালন করিতে করিতে হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া তিনি দেখিয়া আসিতেছেন, মেয়েটা পলাইয়াছে কিনা। যদিও রাজপুরী ঘিরিয়া কঠিন প্রহরা বসিয়াছে, প্রহরীদের চক্ষু এড়াইয়া একটি ইন্দুরেরও বাহির হইবার উপায় নাই, তবু মহারাজ নিজ চক্ষে না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না।

মন্ত্রীরা তাঁহাকে বুঝাইতেছেন, মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে পরিপূর্ণরূপে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করা উচিত। স্বয়ংবর সংক্রান্ত ব্যয়বাহুল্যের ফলে রাজকোষের অবস্থা ভাল নয়; এক্ষেত্রে একা যুদ্ধযাত্রা না করিয়া যদি কোনও মিত্র রাজাকে সহযাত্রী রূপে পাওয়া

যায় তাহা হইলে সব দিক দিয়া মঙ্গল। সম্প্রতি মগধের বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধযাত্রা করিয়া যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহার পুনরভিনয় বাঞ্ছনীয় নয়।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের ওইখানেই সবচেয়ে বেশি ব্যথা। তিনি ক্রোধে লাফাইতে লাগিলেন। গড্ডলচূড়ামণি নয়পাল যুদ্ধের জানে কি? দীপঙ্কর ও তাহার পিশাচগুলা না থাকিলে তিনি দেখিয়া লইতেন! এখন দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়াছে, তাহার পিশাচগুলাও সুতরাং নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, এইবার তিনি দেখিয়া লইবেন। নয়পালকে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবেন, তারপর কাক-শকুন ডাকিয়া তাহাদের ভূরিভোজন করাইবেন।

যা হোক, শেষ অবধি মন্ত্রিগণ রাজাকে রাজী করাইলেন, কর্ণাটকুমার বিক্রমাদিত্যকে পত্র পাঠানো হইবে। পত্র এইরূপ—

স্বস্তি শ্রীমন্মহাপরাক্রম কর্ণাটযুবরাজ পরমভট্টারক শ্রীবিক্রমাদিত্য সমীপে চেদীশ্বর শ্রীলক্ষ্মীকর্ণদেবের সাদর সংবোধন। অতঃপর স্বয়ংবর সভায় অধম গুপ্তশত্রুর দ্বারা আমি কিভাবে অপমানিত হইয়াছি তাহা আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কেবল আমি নয়, সমগ্র রাজকুল অপমানিত হইয়াছেন। আপনার ন্যায় বীরকেশরী অপমানিত হইয়াছেন। সিংহের গ্রাস যদি শৃগালের দ্বারা উচ্ছিষ্ট হয় তবে কি সিংহ তাহা সহ্য করে? কদাপি নয়।

আমি প্রস্তাব করিতেছি, আসুন, আপনি এবং আমি সম্মিলিত হইয়া মগধ আক্রমণ করি। নষ্টবুদ্ধি নয়পালকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহার রাজ্য উভয়ে ভাগ করিয়া লইব। আপনি পুরুষসিংহ, অপমানের প্রতিশোধ লইতে এবং ক্ষত্রোচিত ধর্মযুদ্ধের সুযোগ লইতে কখনও বিরত হইবেন না। অলমিতি।

পত্রের উত্তর আসিতে বিলম্ব হইল না। বিক্রম লিখিলেন—নরপুঙ্গব চেদিরাজ, আপনি নিতান্তই বালকোচিত পত্র লিখিয়াছেন। যুদ্ধ করিয়া আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, কৈতববাদে আর্দ্র হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইবার বয়স আমার নাই। আপনি যদি অপমানিত হইয়া থাকেন সেজন্য দোষ সম্পূর্ণ আপনার; মগধের যুবরাজকে মর্কটবৃত্তি অবলম্বন করিতে আপনিই শিখাইয়াছেন। অনুরক্তা কন্যার জন্য স্বয়ংবর সভা আহ্বান করা অতীব গর্হিত কার্য; আপনি স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিয়া আমাদের সকলকে অপমান করিয়াছেন। মগধরাজ বা মগধের যুবরাজের প্রতি আমার ক্রোধ নাই; তাহারা আমার কোনও অনিষ্ট করে নাই। আমি কিজন্য মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিব? বরং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলে অন্যায় হইত না। কিন্তু আপনি নিজ নির্বুদ্ধিতার জন্য সমুচিত দণ্ডিত হইয়াছেন, আপনাকে আর অধিক দণ্ড দিতে চাহি না।

আপনি যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। শ্রবণ করুন।—আর্যাবর্তের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বর্বর ম্লেচ্ছ জাতি বারবার উপদ্রব করিতেছে। বহু আর্য রাজার রাজ্য তাহারা কাড়িয়া লইয়াছে; তাহারা নারীহরণ করিতেছে, মন্দির দূষিত করিতেছে। আসুন, যদি যুদ্ধ করিবার সাধ থাকে, আমার নেতৃত্বে যুদ্ধযাত্রা করুন; আপনি আমার সঙ্গে যোগ দিলে অন্য রাজারাও যোগ দিবেন। বর্বর বিজাতীয়দের অচিরাৎ হিমালয়ের পরপারে খেদাইয়া দিতে পারিব। আসুন, আর্তত্রাণরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করিয়া যশস্বী হোন। অলমিতি।

পত্র পাইয়া মহারাজ লেলিহ শিখায় জ্বলিতেছিলেন, এমন সময় আসিল মগধের দূত। অগ্নি দাবানলে পরিণত হইল।

মন্ত্রীদের মধ্যস্থতায় দূতের প্রাণটা বাঁচিয়া গেল। মহারাজ বজ্রকণ্ঠে মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া দূতকে বিদায় করিলেন। এবার আর ছয় হাজার সৈন্য নয়, বিশ হাজার সৈন্য লইয়া তিনি যাইবেন; রক্তস্রোতে পৃথিবী প্লাবিত করিবেন। প্রথমে নয়পালের কাটা-মুণ্ড হাতে লইয়া তাণ্ডব নাচিবেন, তারপর কর্ণাটের ওই অথর্ব জরদ্গবটাকে মজা দেখাইবেন। এতবড় স্পর্ধা! আমাকে

তাহার অধীনে যুদ্ধ করিতে ডাকে। তিনটা যুদ্ধ জিতিয়া এত দর্প ! ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে সহস্র যোজন দূরে বর্বর হানা দিয়াছে তাহাতে আমার কি ? আমি কেন বর্বরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইব ?

মন্ত্রিগণ রাজার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। রণসজ্জা আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের অবর্তমানে কে শূন্যপাল হইয়া থাকিবে, কিভাবে মন্ত্রীরা রাজ্য পরিচালনা করিবেন, রাজকোষ পূর্ণ করিবার জন্য কিরূপ কর ধার্য করিতে হইবে তাহার আলোচনা হইতে লাগিল।

একদিন মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ অবরোধ পরিদর্শনে গিয়াছেন। কন্যা যথাস্থানে আছে দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা হইল মাতৃদেবীকেও একবার দর্শন করেন। ইচ্ছাটা মাতৃভক্তি প্রণোদিত নয় ; মাতৃদেবীকে একটি বিশেষ সংবাদ শুনাইয়া তাঁহার মর্মপীড়া ঘটানোই প্রধান উদ্দেশ্য।

মাতৃদেবী তাঁহাকে দেখিয়া প্রীতা হইলেন না, কেবল একটি ভ্রূ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন। মহারাজ বলিলেন—'আমি মগধ জয় করতে যাচ্ছি বোধহয় শুনেছেন। এবার কুকুর দুটাকে গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে আনব, তারপর নর্মদার জলে চুবিয়ে মারব।'

অম্বিকা বললেন—'তোর মতিচ্ছন্ন হয়েছে। প্রজাদের ওপর নূতন কর বসিয়েছিস। তুই যুদ্ধে গেলেই প্রজারা ডিম্ব করবে।'

লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন—'ডিম্বের ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছি। আপনি যে আমার বিরুদ্ধে আবার যড়যন্ত্র করে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলবেন তা হতে দেব না। আপনাকে এবং যৌবনশ্রীকে আমার সঙ্গে যুদ্ধে নিয়ে যাব।'

জননীর মুখে নিরাশার ব্যঞ্জনা দেখিয়া মহারাজ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

দুই

অম্বিকা দেবীর মস্তিষ্কের অর্ধাংশ রোগে অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেও চিন্তা করিবার শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তিনি দুই দিন ধরিয়া একাগ্রভাবে চিন্তা করিলেন। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বিগ্রহপাল ত্রিপুরীতে আসিয়া জ্যোতিষী রন্তিদেবের গৃহে লুকাইয়া ছিল। তিনি পথ দেখিতে পাইলেন। মনে মনে প্রবন্ধ স্থির করিয়া পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

লক্ষ্মীকর্ণ ভাবিলেন মাতৃদেবী যুদ্ধে যাওয়ার নামে ভয় পাইয়াছেন, স্তুতিমিনতি কান্নাকাটি করিয়া গৃহে থাকিবার অনুমতি ভিক্ষা করিবেন। তিনি প্রফুল্ল মনে মাতৃসকাশে চলিলেন।

অম্বিকা কিন্তু কান্নাকাটি করিলেন না, বলিলেন—'জ্যোতিষীকে পাঠিয়ে দে। কবে মরব জানতে চাই।'

লক্ষ্মীকর্ণ একটু বিমূঢ় হইলেন। অবশ্য মাতার মৃত্যুকাল জানিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না ; কিন্তু একটা অসুবিধা ছিল। মগধ হইতে ভ্রষ্ট-অভিযানের পর ফিরিয়া আসিয়া তিনি সভাজ্যোতিষীকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। যাহার কথায় যুদ্ধযাত্রা করিয়া এমন দুর্দশা হয় তাহাকে সভাপণ্ডিত করিয়া রাখার কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু তাহার পরিবর্তে অন্য পণ্ডিত নিয়োগ করাও ঘটিয়া উঠে নাই। তেমন ত্রিকালদর্শী পণ্ডিতই বা কোথায় ? সব পিণ্ডভোজী ভণ্ড !

লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন—'আমার সভাপণ্ডিত নেই, তাকে দূর করে দিয়েছি।'

অম্বিকা বলিলেন—'সভাজ্যোতিষী চাই না। তোর সভাজ্যোতিষীর জ্ঞানবুদ্ধি তোরই মত।

রন্তিদেবকে ডেকে পাঠা।'

রন্তিদেব! রন্তিদেবের কথা লক্ষ্মীকর্ণের মনে ছিল না। লোকটা স্পষ্টবাদী বটে, কিন্তু পাণ্ডিত্য আছে। সে একবার বলিয়াছিল, মাতার আয়ু যতদিন লক্ষ্মীকর্ণেরও ততদিন। 'আচ্ছা দেখি' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে তিনি ফিরিয়া গেলেন। রন্তিদেব যে আকণ্ঠ তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন তাহা লক্ষ্মীকর্ণ জানিতে পারেন নাই।

রন্তিদেব সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছিলেন এমন সময় রাজার আহ্বান আসিল। রন্তিদেব শঙ্কিত হইলেন। পাষণ্ড জানিতে পারিয়াছে নাকি? অবশ্য জ্যোতিষ গণনা অনুসারে রন্তিদেবের সময় এখন ভালই যাইতেছে। তবু কিছুই বলা যায় না; জন্ম মৃত্যু বিবাহ বলিতে পারে না বরাহ। তিনি ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া বাহির হইলেন। সহধর্মিণীকে বলিয়া গেলেন—'যদি না ফিরি, পুত্রকন্যার হাত ধরে পাটলিপুত্রে যেও, সেখানে আমার ভাই আছে।'

লক্ষ্মীকর্ণ রন্তিদেবকে ভদ্রভাবেই সম্ভাষণ করিলেন। বলিলেন—'আমি যুদ্ধযাত্রার সংকল্প করেছি। গণনা করে দেখুন ফলাফল ভাল হবে কিনা।'

ভয়ের কোনও কারণ নাই দেখিয়া রন্তিদেব নিশ্চিন্ত হইলেন। বলিলেন—'এটা যুদ্ধযাত্রার সময় নয়, তবে জ্যেষ্ঠা-মূলীয়া যাত্রা হতে পারে। দেখি।'

তিনি খড়ি পাতিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলেন। আজ আর কোনও প্রকার চাতুরী অবলম্বন করিলেন না। বলিলেন—'নরপাল, গণনায় বড় বিচিত্র ফল পাচ্ছি। আপনার এই যুদ্ধযাত্রার জয় কিম্বা পরাজয় কিছুই হবে না।'

লক্ষ্মীকর্ণ ভ্রূ বাঁকাইয়া বলিলেন—'তা কি করে সম্ভব? যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই।'

রন্তিদেব কহিলেন—'কি করে সম্ভব তা জানি না মহারাজ। গণনায় যা পেলাম তাই বলছি।'

মহারাজ খুব তুষ্ট হইলেন না, কিয়ৎকাল ভ্রূবদ্ধ-ললাটে থাকিয়া বলিলেন—'পরাজয় হবে না?'

'না মহারাজ।'

'প্রাণের আশঙ্কা নেই?'

'না মহারাজ।'

'ভাল। যদি আপনার গণনা সত্য হয়, অভিযান থেকে ফিরে এসে আপনাকে সভাজ্যোতিষী নিয়োগ করব।'

রন্তিদেব অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, শুধু বলিলেন—'মহারাজের অনুগ্রহ।'

লক্ষ্মীকর্ণ পণ্ডিতকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিতেছিলেন, অম্বিকা দেবীর কথা মনে পড়ায় বলিলেন—'মাতৃদেবী আপনাকে স্মরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুকাল জানতে চান।'

'ভাল মহারাজ।'

এক কিঙ্করী রন্তিদেবকে লইয়া অম্বিকা দেবীর কক্ষে উপনীত করিল। অম্বিকা চোখের ইঙ্গিতে কিঙ্করী এবং সেবিকাদের বিদায় করিলেন, তারপর রন্তিদেবকে শয্যার পাশে বসিতে আদেশ করিলেন। রন্তিদেব উপবিষ্ট হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—'দেবি, আপনার কোষ্ঠী গণনা—'

অম্বিকা বলিলেন—'কোষ্ঠী গণনার জন্য তোমাকে ডাকিনি। কাছে এসে আমার কথা শোনো।—বিগ্রহপাল ত্রিপুরীতে এসে তোমার গৃহে ছিল। তুমি সবই জানো?'

রন্তিদেব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৃদ্ধাকে নিরীক্ষণ করিয়া সতর্কভাবে ঘাড় নাড়িলেন। বৃদ্ধা বলিলেন—'এখন মন দিয়ে আমার কথা শোনো। লক্ষ্মীকর্ণ যৌবনশ্রীকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু সে শীঘ্রই মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে, তখন যৌবনশ্রীকে এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। আমাদের চোখের আড়াল করতে চায় না। এই সংবাদ বিগ্রহপালকে জানানো প্রয়োজন। তুমি যত শীঘ্র সম্ভব পাটলিপুত্রে যাও। সেখানে গিয়ে বিগ্রহপালকে সব কথা

বলবে। বলবে, লক্ষ্মীকর্ণ যখন আমাদের নিয়ে মগধে উপস্থিত হবে তখন যেন কৌশলে যৌবনশ্রীকে হরণ করে নিয়ে যায়। আমি যত প্রকারে সম্ভব সাহায্য করব।'

রন্তিদেব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। এই জাতীয় কার্য তাঁহার অত্যন্ত রুচিকর। তিনি নিজের ইষ্টানিষ্ট চিন্তা করিলেন না. মহোৎসাহে বলিলেন—'দেবি, আমি অবিলম্বে পাটলিপুত্র যাত্রা করব. অনেক দিন স্বদেশে যাইনি। আর কিছু আজ্ঞা আছে কি ?'

অম্বিকা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—'আমার বড় নাতনী বংগাল দেশের রাজপুত্রবধূ—'

'জানি দেবি।'

'সে বড় চতুরা। তাকেও সংবাদটা দিতে পারলে ভাল হয়।'

'দেব। পাটলিপুত্র থেকে আমি স্বয়ং বংগাল দেশে যাব। বীরশ্রীকে নিজমুখে সব কথা বলব।'

'ভাল। তোমার পাথেয় এবং পুরস্কার—'

'দেবি, আপনার দর্শন পেলাম—এই আমার পাথেয় এবং পুরস্কার।'

রাজপুরী হইতে বাহির হইবার পথে রন্তিদেব আবার মহারাজের সাক্ষাৎ পাইলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—'মাতৃদেবীর আয়ু আর কতদিন ?'

রন্তিদেব সহাস্যে বলিলেন—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আর্যা এখনও দীর্ঘকাল বাঁচবেন।'

তিনদিনের মধ্যে রন্তিদেব স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া নৌকাযোগে যাত্রা করিলেন। বন্ধু ভৃত্য যজমানদের বলিয়া গেলেন তীর্থযাত্রায় চলিয়াছেন ; কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া দুই চারি মাসের মধ্যে ফিরিবেন। সঞ্চিত নিধি যাহা ছিল সব সঙ্গে লইলেন। মন একটু বিষণ্ণ হইল। সংসার অনিত্য. আবার ফিরিতে পারিবেন কিনা কে জানে ?

তিন

ত্রিপুরীতে রণসজ্জা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে।

রাজার যে স্থায়ী সেনাদল আছে তাহা যথেষ্ট নয়। তাই রাজ্যের সর্বত্র রাজপুরুষেরা গিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে। নবাগত সৈনিকেরা রণাভ্যাস করিতেছে, ধনুর্বাণ অসি ভল্ল চালাইতে শিখিতেছে। নবাগতদের মধ্যে যাহারা যোগ্যতর তাহারা নায়ক পত্তিনায়কের পদ পাইতেছে। মাঠে মাঠে রণাঙ্গন। কড় কড় শব্দে রণভেরী বাজিতেছে, শৃঙ্গ তূরী করতাল বাজিতেছে। সেই তুমুল শব্দ-সংঘট্টে সৈনিকদের রক্ত নাচিয়া উঠিতেছে। হুলস্থূল কাণ্ড।

কেবল সৈন্য সংগ্রহ নয় ; সেই সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহ, খাদ্য সংগ্রহ, বাহন সংগ্রহ। চতুরঙ্গ সেনা, হস্তী অশ্ব রথ পদাতি। তাহার উপযোগী খাদ্য চাই, খাদ্য বহনের জন্য যানবাহন চাই। অসংখ্য অনুচর—পাচক. বৈদ্য, গুপ্তচর, পথনির্দেশক, হস্তীপক, অশ্বপাল, গণক, গণিকা। উপরন্তু রাজমাতা ও রাজকন্যা সঙ্গে যাইতেছেন, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র অবরোধ, স্বতন্ত্র দাসী কিঙ্করী সেবিকা। রাজ্যের রাজপুরুষগণ নানা প্রকার ব্যবস্থা লইয়া গলদ্‌ঘর্ম হইতেছেন। সময় বড় বেশি নাই, জ্যেষ্ঠা-মূলীয়া তিথি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

প্রজারা, বিশেষত নগরবাসী প্রজারা, নূতন করবৃদ্ধির জন্য প্রথমে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু রণসজ্জা যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাহারাও অসন্তোষ ভুলিয়া যাইতে লাগিল। রণোদ্যমের একটা প্রবল উন্মাদনা আছে ; রণবাদ্য, শ্রেণীবদ্ধ সেনার সদর্প পদপাত, অস্ত্রের ঝনঝনা, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহণ, সকল মিলিয়া অসামরিক মানুষকেও রণমত্ত করিয়া তোলে, যুদ্ধটা ন্যায়যুদ্ধ

কি অন্যায় যুদ্ধ সে বিচার আর থাকে না।

একদিন অশ্ব-ব্যাপৃতকের অধীন এক সেনানী মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বলিলেন—'আয়ুষ্মন্, ঘোড়া কিছু কম পড়ছে। তিন হাজার ঘোড়া সংগ্রহ হয়েছে। আরও চার পাঁচ শত প্রয়োজন।'

মহারাজ বলিলেন—'যখন প্রয়োজন তখন সংগ্রহ কর।'

সেনানী বলিলেন—'যুদ্ধের উপযোগী ঘোড়া আর পাওয়া যাচ্ছে না। দেশান্তরে পাঠিয়েও সংগ্রহ করা গেল না।'

মহারাজ বলিলেন—'কি আশ্চর্য, কোনও দেশে ঘোড়া নেই!'

সেনানী বলিলেন—'দূর দেশে লোক পাঠালে সংগ্রহ করা যায় কিন্তু তাতে বিলম্ব হবে। জ্যৈষ্ঠ মাস আগতপ্রায়, জ্যেষ্ঠা-মূলীয়া তিথিতে যাত্রা করতে হলে আর সময় নেই।'

মহারাজ বলিলেন—'তোমরা অপদার্থ। যেখান থেকে পার সংগ্রহ কর।'

সেনানী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'এখানে এক ম্লেচ্ছ অশ্ব-বণিক কিছুদিন থেকে রয়েছে, তার আগড়ে তিন চার শত ঘোড়া আছে। উৎকৃষ্ট ঘোড়া, কিন্তু বড় বেশি মূল্য চাইছে। কোষাধ্যক্ষ বলছেন, অত মূল্য দিয়ে ঘোড়া কেনা যেতে পারে না।'

লক্ষ্মীকর্ণ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন—'বেশি মূল্য চাইছে! কত মূল্য চায়?'

'প্রত্যেক ঘোড়ার জন্য আট স্বর্ণ-দীনার।'

মহারাজ লাফাইয়া উঠিলেন—'আট দীনার! একটা ঘোড়ার মূল্য আট দীনার! চোর! তস্কর! আট দীনারে আটটা ঘোড়া পাওয়া যায়। যাও তুমি, সৈন্য নিয়ে এখনি সমস্ত ঘোড়া কেড়ে নিয়ে এস।'

সেনানী ইতস্তত করিয়া বলিলেন—'কত মূল্য দেওয়া হবে?'

রাজা বলিলেন—'দেব না মূল্য। এক কপর্দক মূল্য দেব না।'

সেনানী আরও কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—'কিন্তু আয়ুষ্মন্, বিদেশী বণিকের পণ্য হরণ করলে নিন্দা হবে। ভবিষ্যতে কোনও বিদেশী বণিক এ রাজ্যে আসবে না।'

রাজা গর্জন করিলেন—'না আসুক। ম্লেচ্ছ বণিকের এত স্পর্ধা সে আমার রাজ্যে বাণিজ্য করবে আবার আমাকেই ঠকাবে! যাও, তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে এস। শুধু ঘোড়া নয়, ধনরত্ন যা পাবে সব হরণ করে আনবে।'

সেনানী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিন অপরাহ্নে একদল সৈন্য গিয়া ম্লেচ্ছ বণিকের আস্তানায় হানা দিল। তাহাদের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া বণিক নীরব রহিল, এতগুলা সশস্ত্র সৈনিকের বিরুদ্ধে তাহারা কয়জন কী করিতে পারে? কেবল তাহাদের চক্ষু দিয়া অসহায় ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল।

সৈন্যগণ অশ্ব ও ধনরত্ন লইয়া প্রস্থান করিলে বণিক কিছুক্ষণ শূন্য আগড়ের দিকে চাহিয়া কঠিন-দেহে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে সূর্য মাঠের পরপারে দিগন্তরেখা স্পর্শ করিল। বণিক তখন একজন সহচরকে ইঙ্গিত করিল, সহচর কয়েকটি পট্টিকা আনিয়া মুক্ত স্থানে পাতিয়া দিল। তারপর সকলে পট্টিকার উপর পশ্চিমাস্য দাঁড়াইয়া তাহাদের পুষ্প-নৈবেদ্যহীন অনাড়ম্বর উপাসনা আরম্ভ করিল।

লক্ষ্মীকর্ণ বিনা শুল্কে ঘোড়া পাইয়া হৃষ্ট হইলেন। তিনি জানিতেন না যে এ সংসারে বিনা শুল্কে কিছুই পাওয়া যায় না, মহাকালের অক্ষপটল পুস্তিকায় কালির আঁচড় পড়িয়াছে।

চার

রন্তিদেব পাটলিপুত্রে উপনীত হইয়া দেখিলেন সেখানেও সাজ সাজ রব। তিনি ভ্রাতা যোগদেবের গৃহে পরিবার রাখিয়া রাজভবনে চলিলেন।

রাজভবনের বাতাস কিছু উত্তপ্ত। একে তো যুদ্ধের উত্তেজনা, উপরন্তু ত্রিপুরী হইতে দূত ফিরিয়া আসিয়া নয়পালের নিকট লক্ষ্মীকর্ণের যুদ্ধঘোষণাকালীন কটুবাক্যগুলি নিবেদন করিয়াছে। মহারাজ অসুস্থ দেহে চটিয়া আগুন হইয়া আছেন।

বিগ্রহপালের সহিত রন্তিদেবের সাক্ষাৎ হইলে বিগ্রহ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন, প্রশ্নোৎফুল্ল নেত্রে বলিলেন—'আর্য, আপনি! কোনও সংবাদ আছে নাকি?'

রন্তিদেব বলিলেন—'আছে। গ্রহ অনুকূল। চল, নিভৃত স্থানে বসা যাক।'

এই সময় অনঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিবাকালে অধিকাংশ সময় রাজপুরীতেই কাটায়, বিগ্রহের সঙ্গ ছাড়ে না। রাত্রিকালে বিগ্রহ জোর করিয়া তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া দেন, বলেন—'তুই মহাপাষণ্ড, সারাদিন বান্ধুলিকে একলা ঘরে ফেলে চলে আসিস। বান্ধুলি হয়তো ভাবে, আমিই তোকে আট্‌কে রাখি। কাল থেকে তুই আর এখানে আসবি না। এখানে তোর এত কি কাজ?' অনঙ্গ হাসিয়া চলিয়া যায়, পরদিন আবার আসে। সে বিগ্রহপালের চরিত্রের দুর্বলতা জানে, অতি অল্প কারণে তিনি হতাশ্বাস হইয়া পড়েন; তাই সে সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকে।

অনঙ্গকে দেখিয়া রন্তিদেব আহ্লাদিত হইলেন। তিনজনে রাজপুরীর এক নিভৃত বিশ্রামকক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন।

রন্তিদেবের মুখে সংবাদ শুনিয়া বিগ্রহপাল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, অনঙ্গও উল্লসিত হইল। তিনজনে মিলিয়া মন্ত্রণা হইল। মহারাজকে বা অন্য কাহাকেও এখন একথা বলিবার প্রয়োজন নাই; মহারাজের শরীর ভাল নয়, এ সময় তাঁহার চিত্ত বহু চিন্তায় ভারাক্রান্ত করা অনুচিত। যাহা করিবার তাঁহারা তিনজনে করিবেন। লক্ষ্মীকর্ণদেবের গুপ্তচরেরা নিশ্চয় পাটলিপুত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোনও প্রকারে মন্ত্রভেদ ঘটিলে সব ভ্রষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

রন্তিদেব বলিলেন—'আর একটা কথা। অম্বিকা দেবীর আজ্ঞা, বীরশ্রীকেও সংবাদ দিতে হবে।'

বিগ্রহপাল অনঙ্গের উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—'ঠিক কথা। অনঙ্গ, দিদিকে সংবাদ দিতে হবে! কিন্তু কে যাবে দিদিকে সংবাদ দিতে? অচেনা কেউ গেলে চলবে না। অনঙ্গ, তুই—'

রন্তিদেব বলিলেন—'আমি বিক্রমণিপুর যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি। বীরশ্রী আমাকে চেনে, কোনও অসুবিধা হবে না।'

বিগ্রহপাল বিগলিত হইয়া বলিলেন—'আপনি যাবেন! ধন্য! আর্য, আমাদের জন্য আপনাকে কত ক্লেশ স্বীকার করতে হচ্ছে—'

রন্তিদেব বলিলেন—'কুমার, এতেই আমার আনন্দ। তুমি আমার যাত্রার ব্যবস্থা কর।'

বিগ্রহ বলিলেন—'যাত্রার ব্যবস্থাপক তো আপনার ঘরেই রয়েছেন। আর্য যোগদেব সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল। পরদিন পূর্বাহ্ণে রন্তিদেব নৌকায় চড়িয়া বংগাল যাত্রা করিলেন। যে নৌকায় বিগ্রহপাল ত্রিপুরী গিয়াছিলেন সেই নৌকা। দিশারুও সেই গরুড়।

যাত্রার পূর্বে বিগ্রহপাল রন্তিদেবের হাতে একটি লিপি দিয়া বলিলেন—'এই পত্রখানি দেবী

বীরশ্রীকে দেবেন।'

পাটলিপুত্র হইতে জাতবর্মা ও বীরশ্রী যথাকালে বিক্রমণিপুর পৌঁছিয়াছিলেন।

জাতবর্মা পিতাকে সমস্ত সমাচার জানাইয়া নয়পালের পত্র তাঁহাকে দিলেন। মহারাজ বজ্রবর্মা স্থিরবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ; তিনি একদিকে যেমন পরিতোষ লাভ করিলেন, অন্যদিকে তেমনি উদ্বিগ্ন হইলেন। নয়পালের সহিত এতদিন তাঁহার রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল না, এখন যদি মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয় তাহা অতীব সুখের কথা ; কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণদেব কুটুম্ব, তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বিরোধও বাঞ্ছনীয় নয়। একদিকে পর আপন হইতেছে, অপরদিকে আপন পর হইয়া যাইতেছে। জীবনে নিত্যই এই ব্যাপার ঘটে। কিন্তু মিত্রের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল। লক্ষ্মীকর্ণটা মহা দুষ্ট, স্বয়ংবর সভায় এ কী করিয়া বসিল ! কিন্তু তবু সে কুটুম্ব ; যতই দুর্ব্যবহার করুক এক কথায় তাহাকে ত্যাগ করা যায় না। অথচ নয়পাল প্রকৃত সজ্জন, তাঁহার মিত্রতার প্রস্তাব উপেক্ষা করিলে নিজেরই অনিষ্ট—

বজ্রবর্মা সহসা মনঃস্থির করিতে পারিলেন না, কিংকর্তব্য চিন্তা করিতে করিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

এই সময় হঠাৎ রন্তিদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জাতবর্মা তাঁহাকে চিনিতেন না, পরিচয় শুনিয়া বীরশ্রীর কাছে সংবাদ পাঠাইলেন। বীরশ্রী আসিয়া গ্রহাচার্যকে প্রণাম করিলেন।

রন্তিদেব তখন তাঁহার আগমনের রহস্য ভেদ করিলেন। বিগ্রহপালের পত্রও বীরশ্রীকে দিলেন। বীরশ্রী পাঠ করিয়া পত্র জাতবর্মাকে দিলেন। পত্রে লেখা ছিল—

ভ্রাতৃজায়া দেবী বীরশ্রী ও অগ্রজ শ্রীজাতবর্মার চরণাম্বুজে হতভাগ্য বিগ্রহপালের শতকোটি বিনতি। দিদি, তোমরা চলিয়া গিয়া অবধি পাটলিপুত্র শূন্য হইয়া গিয়াছে। অধিক কি লিখিব, আমার হৃদয়ের বেদনা তোমরা অবগত আছ। যৌবনশ্রীকে যদি না পাই এ জীবন রাখিব না, আগামী যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিব। আর্য রন্তিদেবের মুখে নূতন সংবাদ শুনিও। একটু আশার আলো দেখা দিয়াছে। কিন্তু তুমি না থাকিলে কে বুদ্ধি দিবে ? কে নিয়ন্ত্রিত করিবে ? যদি ভাগ্যহত দেবরের প্রতি তিলমাত্র করুণা থাকে, পতিদেবতাকে লইয়া নিজ গৃহ পাটলিপুত্রে চলিয়া আসিও। পিতৃদেব অসুস্থ, যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। অলমিতি।

সপ্তাহকাল পরে পাঁচখানি রণতরী সাজাইয়া জাতবর্মা পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে বীরশ্রী ও রন্তিদেব। স্থলপথে একশত রণহস্তী চলিয়াছে। মহারাজ বজ্রবর্মা কর্তব্য স্থির করিয়া নয়পালকে পত্র দিয়াছেন—

...কুমার জাতবর্মাকে আমার প্রতিভূস্বরূপ যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য পাঠাইলাম। আমার একশত রণহস্তী আপনার পক্ষে যুদ্ধ করিবে। ধর্মের জয় হোক।

পাঁচ

জ্যৈষ্ঠ মাসের নির্দিষ্ট তিথিতে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ চতুরঙ্গ সেনা সাজাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সৈন্যদলের মাঝখানে অন্তঃপুর, ব্যূহের মধ্যে ব্যূহ। রাজমাতা অম্বিকা ও রাজকুমারী যৌবনশ্রী আন্দোলিকায় চলিয়াছেন। দুইটি স্বতন্ত্র আন্দোলিকা, সূক্ষ্ম পট্টাবরণ দ্বারা বেষ্টিত। অম্বিকা নিজ আন্দোলিকায় শয়ান রহিয়াছেন, দুই পাশে দুই উপস্থায়িকা। যৌবনশ্রী নিজ আন্দোলিকায় একাকিনী আছেন ; তপঃকৃশা অপর্ণার ন্যায় মূর্তি, যেন পঞ্চাগ্নি তপস্যা করিয়া শরীর কৃশ হইয়াছে ; তবু রূপের অবধি নাই। রঙ্গিণী ও দাসী কিঙ্করীরা পশ্চাতে কেহ শিবিকায় কেহ

গো-রথে চলিয়াছে।

শঙ্খধ্বনি তূর্যধ্বনি করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া বিপুল বাহিনী মহাস্থানীয় হইতে নির্গত হইল। সর্পিল গতিতে মেখল পর্বতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শোণ নদের উৎস পরিক্রমণ করিয়া নদের পূর্বপারে পৌঁছিল. তারপর তীর ধরিয়া ঈশান কোণ অভিমুখে চলিল। ওইদিকে মগধ।

রাজ্যের মহামন্ত্রী ত্রিপুরীতে শূন্যপাল হইয়া রহিলেন। তাঁহার অধীনে কর্মসচিব হইয়া রহিল লম্বোদর। লম্বোদর অনুচ্চপদস্থ গুপ্তচর, এ পদ তাহার প্রাপ্য নয় ; কিন্তু সে যৌবনশ্রীর পলায়নে বাধা দিয়া রাজার প্রিয়পাত্র হইয়াছিল, এ পদ তাহারই পুরস্কার। উপরন্তু মহামন্ত্রী মহাশয়ের মনে যদি পাপ থাকে, লম্বোদর তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিবে। চক্রের ভিতর চক্র।—

পাটলিপুত্রেও রণসজ্জা সম্পূর্ণ হইয়াছে। জাতবর্মা বীরশ্রী ও শত হস্তী উপস্থিত। গুপ্তচরেরা প্রত্যহ আসিয়া ত্রিপুরীর সংবাদ দিতেছে। লক্ষ্মীকর্ণ শোণ নদকে পাশ কাটাইয়া পূর্বতটে উপস্থিত হইয়াছেন এবং শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন। তিনি মগধের সীমান্তে পদার্পণ করিবার পূর্বেই তাঁহার পথরোধ করিতে হইবে।

যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজনের মধ্যে যৌবনশ্রীকে উদ্ধার করিবার পরামর্শ চলিতেছে। মন্ত্রণাচক্রে আছেন বীরশ্রী জাতবর্মা বিগ্রহপাল অনঙ্গ ও রন্তিদেব। বহু আলোচনার পর পরামর্শ স্থির হইয়াছে। দুই সৈন্যদল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইবে তখন বীরশ্রী মাতামহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। রন্তিদেবের বড়ই ইচ্ছা ছিল তিনি সন্ন্যাসী সাজিয়া শত্রুব্যূহে প্রবেশ করেন কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব এক কথায় অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। বীরশ্রী বলিয়াছেন—'আপনি যদি ধরা পড়েন পিতৃদেব আপনার মুণ্ডটি কেটে নেবেন, কিন্তু আমার উপর যত রাগই হোক মুণ্ড কাটবেন না।' অগত্যা রন্তিদেব রাজবৈদ্যের নিকট হইতে একটি অতি দুষ্প্রাপ্য চৈনিক ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ঔষধের নাম অহিফেন। ইহা বিষও বটে রসায়নও বটে ; অধিক সেবন করিলে মৃত্যু, কিন্তু অল্প সেবন করিলে অনিদ্রার মহৌষধ। এই পরম বস্তুটি যৌবনশ্রীর উদ্ধার কার্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

তারপর একদিন যুদ্ধযাত্রার কাল উপস্থিত হইল। মহারাজ নয়পাল আপন বিশ্রামকক্ষে যুদ্ধগামীদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। নয়পালের বাসনা ছিল তিনি স্বয়ং সৈন্যদলের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে যাইবেন. কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মহারানী তাঁহাকে যাইতে দেন নাই, রাজবৈদ্যও ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া আপত্তি করিয়াছেন। মহারাজের কক্ষে বিগ্রহপাল জাতবর্মা অনঙ্গ ও প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ সমবেত হইলে নয়পাল বলিলেন—'আমি অসমর্থ, তাই যুবরাজ বিগ্রহপালকে সেনাপতিত্বে বরণ করলাম।' বিগ্রহপালের ললাটে তিলক পরাইয়া দিয়া পুনশ্চ বলিলেন—'বৎস, তোমাকে উপদেশ আর কী দেব ? তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত, বুদ্ধিমান, বীর ; বীরকুলে তোমার জন্ম। তোমার সঙ্গে রইলেন অগ্রজপ্রতিম কুমার জাতবর্মা আর রণপণ্ডিত সেনানীগণ ; এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে সব কাজ করবে। যাও, শত্রু দলন করে ফিরে এস। ভগবান সিদ্ধার্থ তোমার মনোরথ সিদ্ধ করুন।'

নয়পাল পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, বিগ্রহ পিতার পদধূলি মস্তকে লইলেন। তারপর নয়পাল অন্য সকলকে আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুনেত্রে বিদায় দিলেন। বিদায়কালে জাতবর্মার হাত ধরিয়া জনান্তিকে বলিলেন—'তোমরা ভিতরে ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র করছ আমি বুঝতে পেরেছি। কী ষড়যন্ত্র আমি জানতে চাই না। তুমি বিগ্রহকে দেখো। আর স্মরণ রেখো, আমার পুত্রবধূ যৌবনশ্রীর মুখ না দেখা পর্যন্ত আমার প্রাণে আনন্দ নেই।'

জাতবর্মা তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিলেন—'স্মরণ রাখব মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

তারপর জাতবর্মা বিগ্রহ ও অনঙ্গপাল মহারানীর নিকট গেলেন। বীরশ্রী ও বান্ধুলি সেখানে

উপস্থিত। সকলে মহারানীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। মহারানী দরবিগলিত নেত্রে সকলের শিরশ্চুম্বন করিয়া রণমঙ্গল কামনা করিলেন।

দ্বিপ্রহরে মগধের সৈন্যদল শঙ্খধ্বনি তূর্যধ্বনি করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া বাহির হইল। সেনাদলের মধ্যস্থলে পুষ্পমাল্যভূষিত একটি রথ, রথের চূড়ায় রক্তবর্ণ কেতন উড়িতেছে। রথ চালাইতেছেন বীরশ্রী, তাঁহার পাশে উপবিষ্টা বান্ধুলি। দিদিরানী যুদ্ধে যাইতেছেন, তাই বান্ধুলিকেও ধরিয়া রাখা যায় নাই ; সে না থাকিলে দিদিরানীর পর্ণসম্পুট বহন করিবে কে ? রথের দুইপাশে বিগ্রহপাল ও জাতবর্মা অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছেন, রথের পিছনে অনঙ্গ।

এ যেন যুদ্ধযাত্রা নয়, অপূর্ব শোভাযাত্রা।

নবম পরিচ্ছেদ

এক

দুই পক্ষের গুপ্তচরগণ বিপক্ষ-বাহিনীর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিল। মগধের সৈন্যদল পাটলিপুত্র হইতে যাত্রা করিবার অষ্টাহ পরে একদিন প্রখর মধ্যাহ্নে দুই পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। স্থানটি শোণ নদের পূর্বতটে, পাটলিপুত্র হইতে পঞ্চাশ-ষাট ক্রোশ দক্ষিণে।

নদের অববাহিকায় কোথাও ঊষর মুক্ত ভূমি, কোথাও বা শাল তমাল জম্বু শাল্মলীর বন, শাখোট শিংশপাও আছে। চেদিরাজ্য ও মগধের সীমান্ত এই জনবসতিহীন অরণ্যমেখলা দ্বারাই নির্দেশিত হইত, সুচিহ্নিত সীমারেখা ছিল না। সেদিন দ্বিপ্রহরে লক্ষ্মীকর্ণ এই সীমান্তের এক জম্বুবনে আসিয়া বাহিনীর যাত্রা স্থগিত করিলেন। জম্বুবন ছায়াস্নিগ্ধ, তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে বিস্তীর্ণ প্রান্তর ; এইখানে তপ্ত দ্বিপ্রহর নিষ্পন্ন করিয়া তৃতীয় প্রহরে আবার অগ্রসর হইবেন। মগধের সৈন্যদল বেশি দূরে নাই, শীঘ্রই সাক্ষাৎকার ঘটিবে। অতএব সৈন্যদলকে বিশ্রাম দিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

ধূলিধূসর সৈন্যদল ছুটি পাইয়া প্রথমেই ছুটিয়া গিয়া নদের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল ; হস্তী ও অশ্বগণ তীরে গিয়া জল পান করিল। সৈন্যগণ স্নানান্তে জম্বুকুঞ্জে ফিরিয়া দ্বৈপ্রাহরিক আহারের চেষ্টায় তৎপর হইল। ঘোড়াগুলি নদীর তীরে সবুজ শষ্প যাহা পাইল ছিঁড়িয়া খাইল। হস্তীযূথ জম্বুবৃক্ষের সপত্র সফল শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া চর্বণ করিতে লাগিল।

সৈনামণ্ডলীর মধ্যস্থলে এক বিশাল জম্বুবৃক্ষতলে আসন পরিগ্রহ করিয়া মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ একটি আস্ত কণ্টকী ফল সেবন করিয়া পিণ্ডপূজা সম্পন্ন করিলেন ; সঙ্গে পরিপাকের জন্য এক স্কন্ধ কদলী। রাজমাতা আন্দোলিকায় শুইয়া কেবল এক ঘটিকা জল পান করিলেন। যৌবনশ্রী আহার্যের স্থালী হইতে এক মুষ্টি ভিজা মুদ্‌গ দাল লইয়া মুখে দিলেন।

সহসা সৈন্যদলের সম্মুখভাগ হইতে কড় কড় শব্দে পটহ বাজিয়া উঠিল। সৈন্যগণ যে যেমন অবস্থায় ছিল ক্ষণকাল তেমনি রহিল, তারপর হাতের কাজ ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিল। লক্ষ্মীকর্ণ আসন ত্যাগ করিয়া নিমেষমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পটহধ্বনির সংকেত সুস্পষ্ট ; শত্রুসৈন্য দেখা দিয়াছে।

লক্ষ্মীকর্ণ লৌহজালিক ত্যাগ করেন নাই, তরবারি কটিতে ছিল ; কিন্তু হাতের কাছে যানবাহন ছিল না। তিনি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় সেনাদলের সম্মুখদিকে চলিলেন। অনেক সৈনিকও সেইদিকে ছুটিয়াছিল ; লক্ষ্মীকর্ণ তাহাদের মৃগযূথের ন্যায় দুইপাশে সরাইয়া দিয়া অগ্রসর হইলেন।

মহারাজ সেনাদলের পুরোভাগে উপস্থিত হইলে পটহধ্বনি নীরব হইল। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় দশ রজ্জু। প্রান্তরের পরপারে শালবন আরম্ভ হইয়াছে। শালবনের মাথা ভেদ করিয়া ধ্বজশীর্ষে কেতন উড়িতেছে, কয়েকটা হস্তী বন হইতে বাহিরে আসিয়া শুণ্ড আস্ফালন করিতেছে। বনের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায় কাতারে কাতারে সৈন্য। তাহারাও প্রান্তরের পরপারে শত্রু সমাবেশ দেখিতে পাইয়াছে এবং ডঙ্কা বাজাইতেছে।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ কিছুক্ষণ শাণিত চক্ষে শালবনের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাঁহার মস্তিষ্কে দ্রুত চিন্তার ক্রিয়া হইতে লাগিল। এই সুযোগ ! উহারা পথশ্রমে ক্লান্ত, ব্যূহ রচনার অবকাশ পায় নাই। আমার সৈন্যদল বিশ্রাম পাইয়াছে, আহার করিয়াছে। এখন যদি আক্রমণ করি উহারা দাঁড়াইতে পারিবে না। —

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীকর্ণের সেনানীদল তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, লক্ষ্মীকর্ণ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বজ্রকণ্ঠে কহিলেন—'দেখছ কি ! ঢক্কা বাজাও—শৃঙ্গ বাজাও ! সৈন্যগণ প্রস্তুত হোক। এখনি ওদের আক্রমণ করব। আর কাল বিলম্ব নয়, সন্ধ্যার পূর্বেই অধম শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করে দেব।'

ঢক্কা ও শৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল—ডঙ্ক ডঙ্ক ! তুতুহু তুতুহু ! এই বিপুল শব্দ-সংঘট্টের সঙ্কেত সৈন্যগণের অপরিচিত নয়। হস্তী অশ্ব রথ পদাতি ঝটিতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। —

সেদিন লক্ষ্মীকর্ণ যদি মগধ-বাহিনীকে আক্রমণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে ফল কিরূপ হইত বলা যায় না ; হয়তো তিনি জয়লাভ করিতেন। কিন্তু তাঁহার আক্রমণ করা হইল না, বিধাতা বাদ সাধিলেন। সহসা সূর্যের মুখের উপর ছায়া পড়িল, চারিদিক ধূম্রবর্ণ হইয়া গেল। লক্ষ্মীকর্ণ চকিতে ঊর্ধ্বে চক্ষু তুলিলেন। নৈর্ঋত হইতে যমদূতাকৃতি মেঘ ছুটিয়া আসিতেছে। নিদাঘের প্রমত্ত ঝঞ্ঝাবাত।

দেখিতে দেখিতে ঝড় আসিয়া পড়িল। ঝক্‌মক্ বিদ্যুৎ, কড় কড় বজ্র, শন্ শন্ ঝটিকা। মনে হইল উন্মত্ত ঝটিকা জম্বুবনের বৃক্ষগুলাকে কেশ ধরিয়া নাড়া দিয়া উন্মূলিত করিয়া ফেলিবে। তারপর সেখান হইতে লাফাইয়া শালবনের উপর গিয়া পড়িল। শালবন মথিত হইয়া উঠিল।

ঝড়ের সঙ্গে নামিল বৃষ্টি। মুষলধারায় বর্ষণ। হাতি ঘোড়া ভিজিতে লাগিল ; সৈন্যদল ভিজিয়া কাদা হইল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ ভিজিলেন। আন্দোলিকার আবরণের জন্য অম্বিকা ও যৌবনশ্রী কিছু রক্ষা পাইলেন। আর এক বিপদ, জম্বুবৃক্ষের মোটা মোটা ডাল ঝড়ের ঝাঁকানিতে মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। দুই-চারি জন সৈনিকের হাত-পা ভাঙ্গিল। কয়েকটা ঘোড়া ভয় পাইয়া ছুটিয়া পলাইল। হাতিগুলা আত্মরক্ষার চেষ্টায় শুঁড় উঁচু করিয়া রহিল। দুই পক্ষের প্রায় সমান অবস্থা। ওপক্ষে বীরশ্রী বান্ধুলি জাতবর্মা বিগ্রহপাল সকলে রথে বসিয়া ভিজিলেন ; সৈন্যদের তো কথাই নাই। কেবল শালগাছের ডাল অত পল্‌কা নয়, তাই বেশি ভাঙ্গিল না।

এ দুর্যোগে কে যুদ্ধ করিবে ? সকলে সাময়িকভাবে যুদ্ধচিন্তা ত্যাগ করিলেন।

প্রায় দুই ঘটিকা মাতামাতি চলিবার পর ঝড় উড়িয়া গিয়া আকাশ আবার পরিষ্কার হইল। চতুর্দিক বর্ষণধৌত সূর্যকিরণে ঝলমল করিয়া উঠিল। তখনও সূর্যাস্ত হইতে দুই ঘটিকা বিলম্ব আছে।

এখন আর যুদ্ধ করিয়া লাভ নাই, আরম্ভ করিলে যুদ্ধ অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে। দুই পক্ষ বনের মধ্যে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিলেন ; কয়েকটা শিবির পড়িল। যুদ্ধ হইবে কাল প্রাতে।

দুই

দুই সৈন্যদল মুখোমুখি বসিয়াছে, মাঝখানে প্রান্তরের ব্যবধান। দুই পক্ষই সতর্ক আছে; জম্বুবন ও শালবন ঘিরিয়া রক্ষীরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বাদ্যকরের দল বনের কিনারে স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিতেছে, শত্রুপক্ষের কোনও প্রকার সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখিলেই ভেরী-তূরী বাজাইয়া নিজপক্ষকে সাবধান করিয়া দিবে।

তখনও সূর্যাস্ত হইতে দুই তিন দণ্ড বিলম্ব আছে, শালবনের ভিতর হইতে একটি রথ বাহির হইয়া আসিল। জম্বুবনের রক্ষীরা দেখিল রথটি ধীর মন্থর গমনে কণ্টকগুল্ম বাঁচাইয়া তাহাদের দিকেই আসিতেছে। সঙ্গে হস্তী অশ্ব পদাতি নাই, কেবল একটি রথ। সকলে বিস্ময়-বর্তুলিত চক্ষে চাহিয়া রহিল।

রথটি অর্ধেক পথ আসিলে বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। রথের সারথি স্ত্রীলোক। সঙ্গে আর কেহ নাই, স্ত্রীলোকটি রথ চালাইয়া একাকিনী আসিতেছে।

অবশেষে রথ আসিয়া জম্বুবনের সম্মুখে দাঁড়াইল। রক্ষীরা রথ ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা পূর্বে বীরশ্রীকে দেখে নাই, ভাবিল—এ কি মগধের রাজ্যশ্রী! এমন নয়ন ভুলানো রূপ, এমন রত্নদ্যুতি বিচ্ছুরিত বেশভূষা—এ রাজলক্ষ্মী না হইয়া যায় না।

রক্ষীদের নায়ক সাহসে ভর করিয়া বলিল—'দেবি, আপনি কে? এখানে কার সঙ্গে প্রয়োজন?'

দেবী প্রসন্ন হাসিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন, বলিলেন—'একজন ঘোড়ার রাশ ধর।—তোমরা আমাকে চেনো না। আমি মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণদেবের কন্যা বীরশ্রী।'

সকলে মুখ ব্যাদান করিয়া রহিল। বীরশ্রী রথ হইতে একটি জলপূর্ণ তাম্রকুণ্ড হাতে লইয়া বলিলেন—'হাঁ করে দেখছ কি? রথের মধ্যে ঠাকুরের প্রসাদ আছে, বার কর। আমি ঠাকুরানীকে দেখতে এসেছি। কোথায় আছেন ঠাকুরানী, আমাকে সেখানে নিয়ে চল।'

একজন রক্ষী রথ হইতে প্রকাণ্ড থালি বাহির করিল; থালির উপর স্তূপীকৃত মিষ্টান্নের গোলক। বীরশ্রী তাম্রকুণ্ড হস্তে মরাল গমনে জম্বুবনে প্রবেশ করিলেন, রক্ষী মিষ্টান্নের থালি হস্তে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। বীরশ্রী শত্রুশিবির হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার আদেশ যে অমান্য করা যাইতে পারে একথা কাহারও মনে আসিল না। কেবল, তিনি বনের মধ্যে অন্তর্হিত হইলে রক্ষীদের নায়ক একজনের কানে কানে কিছু বলিল, সে ছুটিয়া গেল মহারাজকে সংবাদ দিতে।

জম্বুবনের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ চলিবার পর বীরশ্রী দেখিলেন, বড় বড় কয়েকটি গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঘন সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি শিবির তোলা হইয়াছে। এই শিবিরগুলিতে রাজা, তাঁহার প্রধান সেনানীগণ, রাজমাতা এবং রাজকন্যার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধারণ সৈনিকদের জন্য কোনও ব্যবস্থা নাই, তাহারা যে যেখানে পাইবে মাটিতে শুইয়া রাত্রি কাটাইবে।

মধ্যস্থলে রাজার শিবির। তাহার বামপার্শ্বে কয়েকটি বৃক্ষের অন্তরে অন্তঃপুর, অর্থাৎ রাজমাতা, রাজকন্যা এবং তাঁহাদের চেটী-কিঙ্করীদের বাসস্থল। মিষ্টান্নের থালি লইয়া রক্ষী সেইদিকে চলিল, বীরশ্রী তাহার অনুসরণ করিলেন। জম্বুবনের মধ্যে দিনের আলো কমিয়া আসিতেছে; এখনও শিবির ঘিরিয়া পাহারা বসে নাই। একটি বস্ত্রাবাসের সম্মুখে আসিয়া রক্ষী দাঁড়াইল। বলিল—'এটি রাজমাতার শিবির।'

বীরশ্রী শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রক্ষী দ্বারের কাছে থালি নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শিবিরের মধ্যে দিবালোক নিঃশেষিত, এখনও দীপ জ্বলে নাই। অম্বিকা একাকী শয্যায় শুইয়া

আছেন। বীরশ্রী হ্রস্বকণ্ঠে ডাকিলেন—'দিদি!'

কর্কশ স্খলিতস্বরে অম্বিকা প্রশ্ন করিলেন—'কে?'

'আমি বীরা'—জলের পাত্র রাখিয়া বীরশ্রী পিতামহীর শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইলেন। অম্বিকা একটি বাহু দিয়া তাঁহাকে সবলে জড়াইয়া লইলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ আলিঙ্গনবদ্ধ থাকিবার পর অন্ধকারে দুইজনে কানে কানে কথা বলিতে লাগিলেন; দ্রুত নিম্নকণ্ঠে বার্তা বিনিময় হইল।

ওদিকে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের কাছে সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। তিনি তীরবিদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন। কী, এত বড় স্পর্ধা! শত্রুর পুত্রবধূ আমার শিবিরে আসিবে! আজ দেখিয়া লইব। বলা বাহুল্য, বীরশ্রী ও জাতবর্মা যে একশত রণহস্তী লইয়া নয়পালের পক্ষে যোগ দিয়াছেন, লক্ষ্মীকর্ণ গুপ্তচরের মুখে তাহা অবগত ছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ যখন মাতৃদেবীর শিবিরে প্রবেশ করিলেন তখন শিবিরে দীপ জ্বলিয়াছে। উপস্থায়িকা দুইজন ভয়ে ভয়ে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। বীরশ্রী পিতামহীর শয্যাপার্শে বসিয়া ছিলেন, উঠিয়া আসিয়া সহজভাবে পিতাকে প্রণাম করিলেন।

লক্ষ্মীকর্ণ জ্বলজ্বল চক্ষে চাহিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিলেন, বলিলেন—'তুই কি জন্য এখানে এসেছিস?'

উপস্থায়িকারা মহারাজের মূর্তি দেখিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া পলায়ন করিল। বীরশ্রী শান্তস্বরে বলিলেন—'আমি ঠাকুরানীকে দেখতে এসেছি। তাঁর জন্য গঙ্গাজল আর দেবতার প্রসাদ এনেছি।'

লক্ষ্মীকর্ণ গর্জন করিলেন—'গঙ্গাজল! প্রসাদ! দুষ্টা, তুই শত্রুর গুপ্তচর, তোকে পাঠিয়েছে সন্ধান নেবার জন্য। যা—এই দণ্ডে চলে যা আমার শিবির থেকে। নইলে—'

শয্যা হইতে ঠাকুরানী কথা বলিলেন—'নইলে কী? নিজের কন্যাকে হত্যা করবি? তাই কর্। তুই অপুত্রক, মেয়ে দুটোকেও হত্যা কর্। বংশে বাতি দেবার জন্যে কাউকে রাখিসনি।'

মাতার বাক্যে লক্ষ্মীকর্ণের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি বাক্যব্যয় করিলেন না, কেবল কষায় চক্ষে মাতার পানে চাহিলেন। বীরশ্রীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—'পিতা, কেন আপনি আমাকে এত নিষ্ঠুর কথা বলছেন? আমি কি আপনার কন্যা নই?'

লক্ষ্মীকর্ণ বলিলেন—'কন্যা হলেও তুই আমার শত্রু। তোরা সবাই আমার শত্রু। আমি ক্ষীর খাইয়ে কালনাগিনী পুষেছি।' বলিয়া মাতার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

বীরশ্রী বলিলেন—'পিতা, কেউ আপনার সঙ্গে শত্রুতা করেনি। আপনি যৌবনশ্রীর স্বয়ংবর সভা আহ্বান করেছিলেন, যৌবনশ্রী নিজের মনোমত বরের গলায় মালা দিয়েছে। এ কি তার দোষ? আপনি বাক্যদান করে কেন বিগ্রহপালকে স্বয়ংবর সভায় আহ্বান করেননি? এ কি যৌবনশ্রীর অপরাধ? পিতা, যারা আপনার একান্ত আপন জন তাদের আপনি পর করে দিয়েছেন। কিসের জন্য যুদ্ধ? জগতের চক্ষে বিগ্রহপাল যৌবনশ্রীর স্বামী; আপনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। যুদ্ধে পরাজয় যারই হোক, ইষ্ট কার হবে? পিতা, আমরা আপনার সন্তান, আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, ক্রোধ ত্যাগ করুন।'

লক্ষ্মীকর্ণ পদদাপ করিয়া বলিলেন—'না না না—যুদ্ধ হবে। আমি বুঝেছি, ধূর্ত নয়পাল তোকে পাঠিয়েছে চাটুবাক্যে আমাকে বশ করতে। কিন্তু তা হবার নয়। কাল যুদ্ধ হবে। তোর শ্বশুর যত হাতিই পাঠাক, মগধ আমি ছারখার করব। নয়পালকে শূলে দেব। তারপর বংগাল দেশে গিয়ে তোর শ্বশুরকে উৎখাত করব। আমার কুটুম্ব হয়ে আমার বিরুদ্ধে হাতি পাঠিয়েছে, এতবড় স্পর্ধা!'

বীরশ্রী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—'ভাল, আপনার যা অভিরুচি তাই করবেন। নিয়তি কে খণ্ডাতে পারে ? আমি আজ চক্রস্বামীর প্রসাদ এনেছিলাম, ভেবেছিলাম দেবতার প্রসাদে আপনার মন প্রসন্ন হবে।' বীরশ্রী প্রসাদের থালি দুই হাতে ধরিয়া লক্ষ্মীকর্ণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'পিতা, চক্রস্বামীর প্রসাদও কি আপনি গ্রহণ করবেন না ?'

চক্রস্বামীর প্রসাদ—অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রসাদ। মহারাজ ধর্মে বৈষ্ণব। যুদ্ধের প্রাক্কালে ইষ্টদেবতার প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন নয়। ফাঁপরে পড়িয়া মহারাজ একখণ্ড মিষ্টান্ন তুলিয়া মুখে ফেলিলেন। বীরশ্রী বলিলেন—'যাই, বাকি প্রসাদ পরিজনদের বিতরণ করে দিই। আমি বেশিক্ষণ থাকব না পিতা। ঠাকুরানী ও আপনার চরণ দর্শন করলাম, এবার যৌবনার সঙ্গে দুটো কথা বলেই চলে যাব।'

লক্ষ্মীকর্ণ গলার মধ্যে ঘুৎকার শব্দ করিয়া পদদাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। কন্যার সহিত বাগ্‌যুদ্ধে তিনি জয়ী হইতে পারেন নাই, কন্যাকে শাস্তি দেওয়াও সম্ভব নয়, এই খেদ বক্ষে লইয়া তিনি নিজ শিবিরে ফিরিয়া গেলেন এবং শয্যায় শয়ন করিলেন। এ সংসারে স্ত্রীজাতিকে সমুচিত শাস্তি দিবার কোনও উপায় নাই, বিশেষত যদি তাহারা মাতা কিম্বা কন্যা হয়। পুরুষ এরূপ ধৃষ্টতা করিলে—

শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে করিতে মহারাজের ক্ষুব্ধ মন—সম্ভবত চক্রস্বামীর প্রসাদের গুণে—ক্রমশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল। কাপুরুষ নয়পাল নিশ্চয় ভয়ে মুক্তকচ্ছ হইয়াছে, তাই বীরশ্রীকে পাঠাইয়াছে সন্ধি করিবার আশায়। ধূর্ত শৃগাল ! কণ্টক দিয়া কণ্টক উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু আমি সতর্ক আছি। আমার চক্ষে ধূলা দেওয়া নয়পালের কর্ম নয়—

ক্রমে একটি পরম সুখকর আলস্য তাঁহার সারা দেহে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। চিন্তার সূত্র ক্ষীণ হইয়া আসিল। কাল যুদ্ধ, আজ রাত্রে উত্তম বিশ্রাম প্রয়োজন—

মহারাজ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

তিন

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ মাতৃশিবির হইতে বাহির হইবার পর বীরশ্রীও প্রসাদের পাত্র হস্তে বাহির হইলেন। বাহিরে জম্বুবনে তখন অন্ধকার নামিয়াছে। একদল রক্ষী শিবিরগুলিকে ঘিরিয়া পরিক্রম আরম্ভ করিয়াছে, দুই চারিটা উল্কা জ্বলিতেছে। সেনানিবাসের নিয়ম, সন্ধ্যার পূর্বেই রাত্রির আহার সম্পন্ন করিতে হইবে ; সৈনিকেরা আহার সমাপ্ত করিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছে।

একজন শিবির-রক্ষী উল্কা হস্তে অম্বিকা দেবীর শিবিরের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, বীরশ্রীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল। বীরশ্রী যে শত্রুশিবির হইতে পিতৃশিবিরে আসিয়াছেন একথা কাহারও অবিদিত ছিল না ; মহারাজের উগ্রকণ্ঠের চিৎকারও বাহির হইতে অনেকে শুনিয়াছিল। চেটী-কিঙ্করীরা শুনিয়াছিল বস্ত্র-প্রাচীরের পরপার হইতে ; মুখে মুখে কথাটা প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। দেবী বীরশ্রী শান্তির প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু উদ্ধত রাজা প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। কাল যুদ্ধ হইবেই। কত লোক মরিবে, কত লোক অন্ধ খঞ্জ হইবে। কিন্তু কে তাহা গ্রাহ্য করে ? রাজার ইচ্ছায় যুদ্ধ।

বীরশ্রী রক্ষীর কাছে আসিলেন, হাসিমুখে তাহাকে একটি মিষ্টান্ন দিয়া বলিলেন—'চক্রস্বামীর প্রসাদ নাও।'

রক্ষী কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ মুখে দিল। বীরশ্রী বলিলেন—'সকলকে প্রসাদ দেওয়া তো সম্ভব নয়, কেবল রক্ষীদেরই দিই, চক্রস্বামীর দয়ায় সকলেরই মঙ্গল হবে। চল তুমি উল্কা নিয়ে আমার সঙ্গে, আমি সকলকে প্রসাদ দিয়ে আসি।'

রক্ষী বলিল—'কোথাও যাবার প্রয়োজন হবে না দেবি। রক্ষীরা সবাই এই পথেই ঘুরছে, এখনি একে একে আসবে।'

বীরশ্রী দাঁড়াইয়া রহিলেন, রক্ষীও উল্কা লইয়া রহিল। অন্য রক্ষীরা আবর্তনের পথে সেখানে আসিল এবং রাজকুমারীর হাত হইতে প্রসাদ পাইয়া চরিতার্থ হইল। তারপর বীরশ্রী বলিলেন—'এবার অন্তঃপুরিকাদের প্রসাদ দিই গিয়ে। কুমারী যৌবনশ্রীর শিবির কোনটা?'

'এই যে—পাশেই'—রক্ষী বীরশ্রীকে যৌবনশ্রীর শিবিরের দ্বার পর্যন্ত আলো দেখাইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল, যাইবার সময় ভক্তিভরে বীরশ্রীকে প্রণাম করিল। বীরশ্রী মধুরকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন—'চিরঞ্জীব হও—বিজয়ী হও।'

রক্ষী মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, বীরশ্রীর মধুর বাক্যে তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। সে গদ্‌গদ স্বরে বলিল—'মা, তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আমি সামান্য যোদ্ধা, আমার আয়ুর হিসাব চিত্রগুপ্তও রাখেন না। জয়-বিজয়েও আমার গৌরব নেই; সে গৌরব রাজার। আশীর্বাদ কর, আমার সন্তান-সন্ততি যেন সুখে থাকে।'

এই সরল যোদ্ধার ক্ষুদ্র আকিঞ্চনে বীরশ্রীর হৃদয়ও আর্দ্র হইল। তিনি বলিলেন—'তোমরা সকলে সুখে থাক।'

বীরশ্রী শিবিরদ্বারের প্রচ্ছদ সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দীপের মন্দালোকে যৌবনশ্রী শয্যায় বসিয়া আছেন; আর, ভূমিতে বসিয়া রঙ্গিণী রাবণ রাজার চেড়ীর মত তাঁহাকে পাহারা দিতেছে। যৌবনশ্রী যেন অশোক বনের সীতা। রণক্ষেত্রে শিবিরে বসিয়াও তাঁহার বন্দীদশা ঘুচে নাই।

কিন্তু রঙ্গিণীর ভাবভঙ্গি এখন আর তেমন কঠিন নয়। দীর্ঘকাল রাজকন্যাকে পাহারা দিয়া সে বোধহয় বুঝিয়াছে এ কাজ কেবল গায়ের জোরে হয় না, কিছু কলাকৌশলও প্রয়োজন। বিশেষত রাজপ্রাসাদে ও রণক্ষেত্রের বাতাবরণে অনেক প্রভেদ; কাল যুদ্ধের ফলাফল কী হইবে কেহ জানে না, যদি লক্ষ্মীকর্ণ পরাজিত হন তখন রঙ্গিণীর দশা কী হইবে? তাই বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী যখন আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন তখন সে বাধা দিল না, ভূমি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্বচ্ছন্দভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বীরশ্রী বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'কী হয়ে গিয়েছিস যৌবনা!'

যৌবনশ্রীর গণ্ডে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

যৌবনশ্রীকে ছাড়িয়া বীরশ্রী আবার প্রসাদের থালি হাতে লইলেন। রঙ্গিণীর সম্মুখে কোনও কথাই হইতে পারে না। তিনি যৌবনশ্রীর সম্মুখে থালি ধরিয়া বলিলেন—'চক্রস্বামীর প্রসাদ নে যৌবনা।'

যৌবনশ্রী প্রসাদ হাতে লইবার পূর্বেই বীরশ্রী রঙ্গিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'তুমিও নাও। আর, অন্য সব মেয়েদের ডেকে নিয়ে এস। সকলকে প্রসাদ দেব।'

রঙ্গিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া প্রসাদ লইয়া মুখে দিল, তারপর মাথায় হাত মুছিয়া অন্য সকলকে ডাকিতে গেল।

সে প্রস্থান করিলে বীরশ্রী যৌবনশ্রীর কানে কানে দ্রুত হ্রস্বকণ্ঠে সংক্ষেপে ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। যৌবনশ্রী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন, তারপর থরথর কাঁপিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন।

রঙ্গিণী যখন পুরস্ত্রীদের লইয়া ফিরিয়া আসিল তখন দুই ভগিনী শয্যায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পুরস্ত্রীরা সংখ্যায় দশ বারো জন, অম্বিকার উপস্থায়িকা দুইজনও আছে। সকলেই বীরশ্রীর পরিচিতা। তাহারা বীরশ্রীর পদধূলি লইল, কলকণ্ঠে সংবর্ধনা করিল। বীরশ্রী সকলের সহিত মিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন, সকলের হাতে মিষ্টান্ন দিলেন। সকলে প্রসাদ মুখে দিয়া আনন্দিত মনে চলিয়া গেল।

রঙ্গিণী কিন্তু গেল না, শিবিরের এক পাশে ভূমির উপর বসিয়া রহিল।

বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী শয্যার উপর মুখোমুখি বসিয়া গল্প করিতেছেন। বীরশ্রী অধিকাংশ কথা বলিতেছেন; শ্বশুরবাড়ির গল্প, নৌকাযোগে ত্রিপুরী হইতে বিক্রমণিপুর গমনের গল্প। তাঁহার নিজ শিবিরে ফিরিয়া যাইবার কোনও ত্বরা নাই। যৌবনশ্রী মাঝে মাঝে দুই একটি কথা বলিতেছেন। অদূরে বসিয়া রঙ্গিণী কান পাতিয়া শুনিতেছে।

দুই দণ্ড বসিয়া বসিয়া গল্প করিবার পর দুই ভগিনী শয্যায় পাশাপাশি শয়ন করিলেন; শুইয়া শুইয়া গল্প চলিতে লাগিল।

রঙ্গিণীও হাই তুলিয়া শয়ন করিল।

শুইয়া শুইয়া তাহার তন্দ্রাবেশ হইল। সে জাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মাথার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের যোগসূত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল।

আরও কিছুক্ষণ কাটিবার পর বীরশ্রী ঘাড় তুলিয়া রঙ্গিণীর দিকে দেখিলেন, ডাকিলেন—'রঙ্গিণি!'

রঙ্গিণী সাড়া দিল না। সাড়া দিলে হয়তো বীরশ্রী পানীয় জল চাহিতেন। কিন্তু কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াও যখন সাড়া পাওয়া গেল না তখন তিনি নিঃশব্দে শয্যা ছাড়িয়া উঠিলেন, শিবিরের দ্বারের কাছে গিয়া প্রচ্ছদ সরাইয়া বাহিরে উঁকি মারিলেন।

বাহিরে জম্বুছায়াচ্ছন্ন নীরন্ধ্র অন্ধকার; আকাশ মৃত্তিকা কিছুই দেখা যায় না। শব্দও নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

চার

কেবল শিবিরের মধ্যে স্নিগ্ধ দীপ জ্বলিতেছে।

বীরশ্রী ভিতর দিকে ফিরিয়া হাতছানি দিলেন, যৌবনশ্রী নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইলেন। বীরশ্রী তাঁহার হাত ধরিলেন; তাঁহার জিজ্ঞাসু নেত্র একবার রঙ্গিণীর দিকে সঞ্চারিত হইল; সে অঘোরে ঘুমাইতেছে। বীরশ্রী ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন—'ওষুধ ধরেছে। চল্, এবার যাই। আগে ঠাকুরানীর শিবিরে।'

হাত ধরাধরি করিয়া দুইজনে বাহিরে আসিলেন। পিছনে শিবিরদ্বারের প্রচ্ছদ দীপের ক্ষুদ্র আলোর সম্মুখেও আবরণ টানিয়া দিল। চতুর্দিকে কাজলরুচি তমিস্রা, নিজের হাত দেখা যায় না।

এই অন্ধকারে অম্বিকা দেবীর শিবির কোন্ দিকে? বীরশ্রী স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। যৌবনশ্রীর শিবিরে আসিবার সময় অম্বিকার শিবির ডান দিকে পড়িয়াছিল, মাঝে একটি সুপুষ্ট জম্বুকাণ্ডের ব্যবধান। যৌবনশ্রীর হাত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া বীরশ্রী সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। কোনও অদৃশ্য বস্তুতে হোঁচট খাইলে শব্দ হইবে, তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। মন্দং নিধেহি চরণৌ—

সম্মুখে হাত বাড়াইয়া চলিতে চলিতে একটি বৃক্ষের কর্কশ ত্বক হাতে ঠেকিল। সঙ্গে সঙ্গে

পায়ে ঠেকিল একটি মনুষ্য দেহ। বীরশ্রী তীক্ষ্ণ নিশ্বাস টানিয়া সরিয়া আসিলেন। বোধহয় কোনও সৈনিক কিম্বা রক্ষী বৃক্ষতলে শুইয়া ঘুমাইতেছে। ভাগ্যক্রমে পদস্পর্শে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল না। রক্ষীই হইবে, চক্রস্বামীর প্রসাদে বুঁদ হইয়া ঘুমাইতেছে। সৈনিক হইলে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত।

আরও সাবধানে দুইজনে চলিলেন। একটু একটু পা বাড়াইয়া ; অন্ধ কিঞ্চুলুক যে-ভাবে চলে। আর কাহারও গায়ে পা ঠেকিল না।

কিছুক্ষণ চলিবার পর হঠাৎ একটি অতি ক্ষুদ্র আলোকের বিন্দু যৌবনশ্রীর চোখে পড়িল। মাটির উপর যেন একখণ্ড অঙ্গার জ্বলিয়া জ্বলিয়া ভস্মাবৃত হইয়াছে। যৌবনশ্রী দিদির হাত চাপিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন—'দিদি—'

বীরশ্রীও দেখিতে পাইলেন। নিঃশব্দে সেইদিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিলেন, অঙ্গার নয় ; কোনও একটি শিবিরের প্রচ্ছদ নিম্নভাগে একটু সরিয়া গিয়াছে, ভিতরের আলো দেখা যাইতেছে।

কাহার শিবির ? যদি ঠাকুরানীর শিবির না হয় ! যদি ভিতরে অন্য কেহ জাগিয়া থাকে ! বীরশ্রী প্রচ্ছদের বাহিরে দাঁড়াইয়া ক্ষণেক কান পাতিয়া শুনিলেন, কিন্তু নিজের হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। তখন তিনি ধীরে ধীরে পর্দার কোণ তুলিয়া উঁকি দিলেন।

দ্বারের কাছেই দুই উপস্থায়িকা হাত-পা ছড়াইয়া পড়িয়া আছে : শয়নের অসম্বৃত ভঙ্গি দেখিয়া বোঝা যায় তাহারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী নির্ভয়ে শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

অম্বিকা জাগিয়া ছিলেন ; স্থিরচক্ষে উর্ধ্বদিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। হাত তুলিয়া সঙ্কেত করিলেন।

তিনটি মাথা কিছুক্ষণ শয্যার উপর একত্র হইয়া রহিল। শেষে বীরশ্রী বলিলেন—'দিদি, বাইরে বড় অন্ধকার, কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। ভয় হচ্ছে, যদি ধরা পড়ে যাই।'

ঠাকুরানী বলিলেন—'এক কাজ কর। আমার শিবিরের প্রদীপ দ্বারের বাইরে নিয়ে গিয়ে রাখ। তবু খানিকটা দেখতে পাবি।'

বীরশ্রী বলিলেন—'সে ভাল। হাতে প্রদীপ নিয়ে তো যাওয়া চলবে না। যে রক্ষীরা সীমানা পাহারা দিচ্ছে তারা নিশ্চয় ঘুমোয়নি, আলো দেখলে তারা ধরে ফেলবে।'

অম্বিকা বলিলেন—'হাঁ। এবার তোরা যা। যত দেরি করবি তত ধরা পড়ার ভয়। নিজের শিবিরে পৌঁছে একবার ডঙ্কায় ঘা দিতে বলিস, যাতে আমি শুনতে পাই।'

দুই ভগিনী আবার বাহির হইলেন। প্রথমে যৌবনশ্রী শিবির হইতে নির্গত হইলেন, পরে বীরশ্রী প্রদীপ হাতে লইয়া আসিলেন। তিনি প্রদীপটি দ্বারের সম্মুখে রাখিলেন। বাহিরে বাতাস নাই, প্রদীপ অকম্প্রশিখায় জ্বলিতে লাগিল।

এতটুকু আলো, বাহিরের সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। তবু নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের চেয়ে ভাল। নিজেকে দেখা যায়। পাশের মানুষকে দেখা যায় ; বিরাট দৈত্যের মত গাছগুলাকে ঠাহর করা যায়। কোনও ক্রমে জম্বুবন পার হইতে পারিলে হয়তো নক্ষত্রের আলো পাওয়া যাইবে।

প্রদীপ পশ্চাতে রাখিয়া দুইজনে পা বাড়াইলেন—

অকস্মাৎ প্রলয়ঙ্কর শব্দে তাঁহাদের মাথার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ! ঢং ঢং ঢং ঢং শব্দ ! সমস্ত জম্বুবন যেন এই শব্দের অট্টরোলে আলোড়িত হইয়া উঠিল। দুই ভগিনী ভয় পাইয়া পরস্পর জড়াইয়া ধরিলেন। মনে হইল, সর্বনাশ হইয়াছে, সকলে জানিতে পারিয়াছে ; তাঁহারা

ধরা পড়িয়া গিয়াছেন।

শব্দ যতটা ভয়ঙ্কর মনে হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে ততটা ভয়ঙ্কর নয়। রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হইয়া দ্বিতীয় প্রহর আরম্ভ হইয়াছে, ঘটিকাশালার প্রহরীরা তাহাই ঘোষণা করিতেছে। প্রথম ভয়বিহ্বলতা কাটিয়া যাইবার পর দুইজনে তাহা বুঝিতে পারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, শিবির-প্রহরী রক্ষীরা যতই ঘুমাক, জম্বুবনের কিনারে সীমান্ত রক্ষীরা সতর্কভাবে জাগিয়া আছে।

দুইজনে আবার চলিলেন। কোন্ দিকে চলিয়াছেন তাহা জানেন না, কেবল প্রদীপশিখাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়াছেন। একবার ভাঙ্গা গাছের ডাল তাঁহাদের পথরোধ করিল ; তাহাকে এড়াইয়া বীরশ্রী একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইলেন। আলোকরশ্মি দেখা যায় কি যায় না।

আরও কিছুদূর চলিবার পর তাঁহারা হঠাৎ শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। সম্মুখে ও কী ? অন্ধকারের মধ্যে আরও গাঢ় অন্ধকারের পিণ্ড যেন তাল পাকাইতেছে। সঙ্গে ফোঁস ফোঁস শব্দ ; যেন কাহারা সমবেতভাবে নিশ্বাস ফেলিতেছে। একটা দীর্ঘ কালো হাত আসিয়া লঘুভাবে তাঁহাদের মস্তক স্পর্শ করিল।

যৌবনশ্রী বলিলেন—'দিদি ! হাতি !'

দুই ভগিনী ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন। অন্ধকারে অপরিচিত হস্তীর মত ভয়াবহ জীব আর নাই। বনের এক স্থানে সমস্ত রণহস্তী বাঁধা ছিল, বীরশ্রী ও যৌবনশ্রী একেবারে তাহাদের দঙ্গলের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলেন।

হাত ধরাধরি করিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাঁহারা বার কয়েক হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন ; বসন ছিঁড়িয়া গেল, পায়ে কাঁটা ফুটিল। তারপর সহসা এক সময় আছাড় খাইয়া উঠিয়া তাঁহারা অনুভব করিলেন, অন্ধকার যেন একটু তরল হইয়াছে। তাঁহারা চারিদিকে চাহিলেন, তারপর ঊর্ধ্বে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন আকাশে তারা মিটমিট করিতেছে। তাঁহারা জম্বুবনের বাহিরে আসিয়াছেন।

যাক, জম্বুবনের দুর্ভেদ্য গোলকধাঁধা হইতে নির্গত হইয়াছেন। কিন্তু কোন্ দিকে ? সম্মুখদিকে না পশ্চাদ্দিকে ? নক্ষত্রের আলোকে যতটুকু অনুভব করা যায়, তাহা নিতান্তই সীমাবদ্ধ ; প্রান্তরের এখানে ওখানে দুই চারিটা আগাছার গুল্ম রহিয়াছে ; একটা কণ্টকগুল্ম অসংখ্য খদ্যোতিকার জ্যোতিরলঙ্কার পরিয়া ঝলমল করিতেছে। কিন্তু প্রান্তরের পরপারে শালবন আছে কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই।

তবু জম্বুবনের প্রহরীচক্র যে তাঁহারা নিরাপদে পার হইয়া আসিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। এখন জম্বুবনকে পশ্চাতে রাখিয়া যত দূর যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

দুই বোন আবার চলিতে লাগিলেন। জম্বুবনে বেশি কাঁটা ছিল না, এখানে দুই পা চলিলেই পায়ে কাঁটা ফোটে। কিছুদূর চলিয়া উভয়ে মাটিতে বসিলেন, অনুভবের দ্বারা পায়ের কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। একটি দীর্ঘকম্পিত নিশ্বাস যৌবনশ্রীর বুক হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বীরশ্রী বলিলেন—'নিশ্বাস ফেলছিস কেন রে যৌবনা ?'

যৌবনশ্রী বলিলেন—'আমার জন্য তুই কত কষ্ট পেলি তাই ভেবে কান্না পাচ্ছে।'

বীরশ্রী বলিলেন—'আমার কষ্টের কথাই ভাবছিস ! তোর নিজের ?'

যৌবনশ্রী বলিলেন—'আমার আবার কষ্ট কি ! আমি আমার স্বামীর কাছে যাচ্ছি। দরকার হলে আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারি।'

যৌবনশ্রীর এই স্বভাব-বিরুদ্ধ প্রগল্‌ভতাটুকু বীরশ্রীর বড় মিষ্ট লাগিল। তিনি হাসিলেন—'আমিও আমার স্বামীর কাছে যাচ্ছি। নে ওঠ্। শিবিরে গিয়ে প্রথমেই বিগ্রহকে

বলবি পায়ের কাঁটা তুলে দিতে।'

দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যৌবনশ্রী বলিলেন—'কিন্তু শিবির কোথায় ?'

প্রশ্ন অনুত্তর রহিয়া গেল। এই সময় হঠাৎ সন্নিকট হইতে একপাল অদৃশ্য শৃগাল হুক্কাহুয়া করিয়া ডাকিয়া উঠিল। দুইজনে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

শৃগালের হট্টকোলাহল থামিলে বীরশ্রী বলিলেন—'তোর প্রেমের পথে যে এত কাঁটা তা কে জানত ! শেষ পর্যন্ত শিয়ালকাঁটা। দেখছি আজ রাত্রিটা এই মাঠেই কাটাতে হবে। নইলে হয়তো পথ ভুলে আবার জম্বুবনেই ফিরে যাব। দিগ্‌ভ্রম হয়েছে ! ভোরের আলো ফুটলে তখন—'

'কিন্তু—'

ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত মাঠে বসিয়া থাকার বিপদ আছে তাহা বীরশ্রীও জানিতেন। ভোর হইলে কেবল তাঁহারাই চক্ষু পাইবেন তা নয়, জম্বুবনের প্রহরীরাও চক্ষু পাইবে। তখন—

সমস্যার সমাধান আসিল বিচিত্ররূপ ধরিয়া। নিশীথ রাত্রির নিস্তরঙ্গ বাতাসে দূর হইতে ভাসিয়া আসিল অতি মধুর বাঁশির সুর। বীরশ্রী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় শিহরিয়া যৌবনশ্রীর হাত চাপিয়া ধরিলেন—'ঐ শোন যৌবনা ! শুনতে পাচ্ছিস ?'

যৌবনশ্রী উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলেন—'পাচ্ছি। বাঁশির শব্দ। কে—কে বাজাচ্ছে দিদি !'

বীরশ্রী ভগিনীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, গাঢ়স্বরে বলিলেন—'আর কে বাজাবে ? ও বাঁশিতে ও সুর আর কে বাজাতে পারে ? আয়—দিশা পেয়েছি।'

দুই ভগিনী বাঁশির স্বর লক্ষ্য করিয়া হরিণীর মত ছুটিয়া চলিলেন। পায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল কিন্তু কেহই তাহা অনুভব করিলেন না।—

শালবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জাতবর্মা বাঁশি বাজাইতেছিলেন, পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন বিগ্রহপাল।

'আমরা এসেছি'—নারীকণ্ঠের রুদ্ধশ্বাস স্বর।

'বীরা !' দুইজনে সম্মুখে ছুটিয়া গেলেন।

'যৌবনাকে এনেছি।'

নক্ষত্রসূচীবিদ্ধ অন্ধকারে চারিজন মুখোমুখি হইলেন।

'যৌবনশ্রী ! যৌবনা !'

যৌবনশ্রী মুখে একটি অব্যক্ত শব্দ করিলেন, তারপর সংজ্ঞা হারাইয়া ধীরে ধীরে মাটিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে শালবনের ভিতর হইতে রণডঙ্কার বিজয়োদ্ধত উল্লাস একবার দ্রুতছন্দে মন্দ্রিত হইয়াই নীরব হইল। মাঠের পরপারে জম্বুবনের একটি দীপহীন শিবিরে এক রোগপঙ্গু বৃদ্ধা সেই শব্দ শুনিতে পাইলেন।

পাঁচ

রাত্রিশেষে মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ স্বপ্ন দেখিলেন। মুক্ত কৃপাণ হস্তে তিনি রণাঙ্গনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন। সম্মুখে অগণিত শত্রুসৈন্য, রথ অশ্ব গজ পদাতিক ; রণবাদ্য বাজিতেছে। মহারাজ শত্রুকে আক্রমণ করিবার পূর্বে একবার পশ্চাতে ও পার্শ্বে দৃষ্টি ফিরাইলেন। দেখিলেন,

কেহ নাই, তিনি একাকী। তাঁহার সৈন্যদল সমস্ত শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছে।

মহারাজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শিবিরের বাহিরে পূর্বাকাশে তখন ঊষার অলক্ত-রাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘুমন্ত বনভূমি জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে ; গাছের ডালে পাখি, গাছের তলে মানুষ হাতি ঘোড়া।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ শয্যায় উঠিয়া কিছুক্ষণ জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল। মিথ্যা স্বপ্ন, অর্থহীন স্বপ্ন। তিনি গদার ন্যায় বাহুদ্বয় আস্ফালনপূর্বক আলস্য ত্যাগ করিলেন, তারপর হুঙ্কার ছাড়িয়া শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন। আজ যুদ্ধ!

কয়েকজন পরিজন ছুটিয়া আসিল। মহারাজের আজ্ঞায় ঢক্কা তূরী ভেরী শৃঙ্গ পটহ বাজিয়া উঠিল। যে সকল সৈনিক বৃক্ষতলে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল তাহারা চক্ষু মর্দন করিয়া উঠিয়া বসিল। আজ যুদ্ধ!

যৌবনশ্রীর শিবিরে রঙ্গিণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে ঘাড় তুলিয়া দেখিল যৌবনশ্রীর শয্যা শূন্য।...এরূপ ঘটনা পূর্বে কখনও ঘটে নাই। কোথায় গেলেন রাজকুমারী ? রঙ্গিণীর মনে পড়িল, কাল রাত্রে দুই ভগিনী শয্যায় শুইয়া জল্পনা করিতেছিলেন, রঙ্গিণী শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তারপর—তারপর—কোথায় গেলেন দুই রাজকুমারী ? তবে কি—তবে কি— ? রঙ্গিণীর হাত-পা হিম হইয়া গেল। যদি তাই হয়, মহারাজ জানিতে পারিলে কি করিবেন ? রঙ্গিণী আবার চোখ বুজিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল।

রাজা যৌবনশ্রীর অন্তর্ধানের কথা জানিতে পারিলেন না। কন্যার কথা চিন্তা করিবার সময় তাঁহার ছিল না, তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যুদ্ধ! যুদ্ধ! সৈন্যগণ প্রস্তুত হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।

সূর্যোদয় হইল।

দুই সৈন্যদল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রান্তরের দুই প্রান্তে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। নববল খেলায় যেরূপ বলবিন্যাস হয়, যুদ্ধক্ষেত্রের বলবিন্যাসও সেইরূপ। সম্মুখে পদাতিক সৈন্যের পঙ্ক্তি, তাহার পশ্চাতে রথ অশ্ব গজের শ্রেণী। শ্রেণীর মধ্যস্থলে রাজার রথ।

দুই পক্ষে বিপুল বাদ্যোদ্যম আরম্ভ হইয়াছে। আকাশবিদারী শব্দে চতুরঙ্গ সৈন্যের ধমনীতে রক্ত-স্রোত উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের রথ সৈন্যব্যূহের মাঝখান হইতে বাহির হইয়া ধীরগমনে সম্মুখ দিকে চলিল। ইহা যুদ্ধারম্ভের সঙ্কেত। সৈন্যদল জয়ধ্বনি করিয়া রাজরথের পশ্চাতে অগ্রসর হইল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাঠের অপর প্রান্তে একটি রথ বাহির হইয়া আসিল। এতদূর হইতে রথের আরোহীকে দেখা যায় না। দুই সৈন্যদল পদভরে মেদিনী দলিত করিয়া পরস্পর নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সম্পৎ, কার রথ চিনতে পারছিস ?'

সম্পৎ কিছুক্ষণ উত্তর দিল না। দুইটি রথ সৈন্যদল পশ্চাতে লইয়া আরও নিকটবর্তী হইল। মহারাজ কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত করিলেন।

দুই রথ যখন তিন রজ্জু দূরে তখন সম্পৎ হঠাৎ বলিল—'আয়ুষ্মন্, ও রথ চালাচ্ছেন কুমারী যৌবনশ্রী !'

'কী ! যৌবনশ্রী !' মহারাজ হতভম্ব হইয়া চাহিলেন। হাঁ, যৌবনশ্রীই বটে! রথ চালাইতেছে সারথি-বেশিনী যৌবনশ্রী, আর রথের রথী—বিগ্রহপাল।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ ক্ষণেকের জন্য দারুব্রহ্মের ন্যায় রথে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে কোন্ চিন্তার ক্রিয়া হইল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। বীরশ্রী এইজন্য আসিয়াছিল তাহা বুঝিতে

তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। স্বপ্নের কথাও মনে পড়িল। বীরশ্রী যৌবনশ্রী জাতবর্মা ছাড়িয়া গিয়াছে, যাহারা আছে তাহারাও ছাড়িয়া যাইবে ?

অতঃপর মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের মনে যে প্রতিক্রিয়া হইল তাহা অদ্ভুত। কুটিল মন স্বভাবতই বক্র পথে চলে ; বিশেষত মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণের মন শুধু কুটিল নয়, অত্যন্ত জটিল। তিনি এক অভাবনীয় কার্য করিলেন।

'থামা থামা ! রথ থামা !'

সম্পৎ রথ থামাইল। পশ্চাতে সৈন্যদল গতি রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ এক লাফে রথ হইতে নামিলেন। হাতের তরবারি দূরে ফেলিয়া উন্মত্ত দৈত্যের মত বিগ্রহপালের রথের প্রতি ধাবিত হইলেন।

বিগ্রহপালের রথও থামিয়া গিয়াছিল, তাঁহার পিছনে সৈন্যদলও থামিয়াছিল। গগনভেদী বাদ্যোদ্যম স্তব্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধারম্ভে এরূপ অচিন্তনীয় ব্যাপার পূর্বে কখনও ঘটে নাই। দুই পক্ষের সৈন্যদল মার্গাচলরুদ্ধ স্রোতস্বিনীর মত ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিল।

মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ যদি অসি ফেলিয়া না দিতেন তাহা হইলে তাঁহার কার্যের একটা অর্থ পাওয়া যাইত। কিন্তু এ কি ! এরূপ আত্মঘাতী কার্য উন্মাদ ভিন্ন আর কে করিতে পারে ! তবে কি লক্ষ্মীকর্ণ সত্যই উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন ?

বিগ্রহপাল ব্যাপার দেখিয়া নিজ রথ হইতে অবতরণ করিলেন। লক্ষ্মীকর্ণের অভিপ্রায় কি তাহা জানা নাই ; কিন্তু তিনি অস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং বিগ্রহপালও অস্ত্রত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তাহা দেখিয়া যৌবনশ্রী ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন, যেন নিজ দেহ দিয়া স্বামীর দেহ রক্ষা করিবেন। বিগ্রহপাল তাঁহাকে সম্মুখ হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যৌবনশ্রী অটল রহিলেন। তাঁহার চক্ষে জল অধরোষ্ঠে কঠিন দৃঢ়তা। যদি মরিতেই হয় দুইজনে একসঙ্গে মরিবেন।

উন্মত্ত দৈত্য আসিয়া পড়িল। তারপর মুহূর্তমধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। মহারাজ লক্ষ্মীকর্ণ কন্যা ও জামাতাকে দুইটি মার্জার শাবকের মত অবহেলে তুলিয়া নিজের দুই স্কন্ধে স্থাপন করিলেন এবং উদ্দাম তাণ্ডব নাচিতে শুরু করিলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে মেঘগর্জনের ন্যায় শব্দ বাহির হইতে লাগিল—'ধন্য ! ধন্য ! ধন্য ! আমার কন্যা ! আমার জামাতা ! ধন্য ! ধন্য ! ধন্য !'

যুদ্ধ হইল না ; রক্তপাত হইল না ; রণক্ষেত্র কোন্ মায়াবীর মন্ত্রবলে উৎসব ক্ষেত্রে পরিণত হইল। যে সৈন্যদল পরস্পর হানাহানি করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিল, হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। উগ্র রণবাদ্য পলকে পারুষ্য ত্যাগ করিয়া ডিমি ডিমি ডিমি আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রলয়ঙ্কর মহাকাল আর এক বুড়ার কাণ্ড দেখিয়া সহাস্য শিবসুন্দর মূর্তি ধারণ করিলেন।

জাতবর্মা বীরশ্রী অনঙ্গপাল বাঙ্কুলি সকলে ছুটিয়া আসিয়া নৃত্যপরায়ণ লক্ষ্মীকর্ণকে ঘিরিয়া ধরিলেন। ক্রমে মহারাজ নৃত্য সম্বরণ করিয়া যৌবনশ্রী ও বিগ্রহপালকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দিলেন, তারপর বিপুল বাহু দিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। বলিলেন—'তোরা সবাই মিলে বুড়োকে ঠকিয়েছিস। কেউ মুক্তি পাবি না। চল ত্রিপুরীতে। সেখানে গিয়ে যৌবনার বিয়ে দেব। আমার বুড়ি মা কোথায় ? তাঁকেও কি তোরা চুরি করে এনেছিস নাকি ?'

সকলের চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিল।

আলিঙ্গন-চক্রের কিনারা হইতে জ্যোতিষাচার্য রন্তিদেব বলিলেন—'মহারাজ, আমার গণনা ফলেছে কিনা !'

মহারাজ রন্তিদেবকে শিখা ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিলেন, বলিলেন—'পণ্ডিত, আজ থেকে তুমি আমার সভাজ্যোতিষী।'

ছয়

সেদিন ভারতের নাট্যমঞ্চে যে কৌতুকনাট্যের অভিনয় হইয়াছিল, যে নটনটীরা অভিনয় করিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যার রাঙা মেঘের মত শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। কোথায় যৌবনশ্রী, কোথায় বিগ্রহপাল? সেদিন ধীরে ধীরে নাট্যমঞ্চের উপর মহাকালের কৃষ্ণ যবনিকা নামিয়া আসিয়াছিল, প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছিল।

তারপর রঙ্গমঞ্চ যুগান্তকাল ধরিয়া তিমিরাবৃত ছিল। নৃত্য গীত হাস্য কৌতুক মূক হইয়া গিয়াছিল। মানুষ চামচিকার মত অন্ধকারে বাঁচিয়া ছিল।

নয়শত বর্ষ পরে আবার সেই রঙ্গমঞ্চে একটি একটি করিয়া দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে, কালের কৃষ্ণ যবনিকা সরিয়া যাইতেছে। এবার এই পুরাতন রঙ্গমঞ্চে জানি না কোন্ মহা নাটকের অভিনয় হইবে!



কুমারসম্ভবের কবি

একালের কথা নয়, কালিদাসের কালের কাহিনী।

জনাকীর্ণ নগরীর রাজপথ দিয়া এক হরিচন্দন চিত্রিত হস্তী রাজকীয় মন্থরতায় হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। স্কন্ধে অঙ্কুশধারী মাহুত ; পৃষ্ঠের মহার্ঘ কারুখচিত আসনের উপর বসিয়া ঘোষক পটহ বাজাইতেছে। ঘোষকের দুই হস্তে দুইটি মুষলাকৃতি পটহ-দণ্ড দ্রুতচ্ছন্দে পটহচর্মের উপর আঘাত বৃষ্টি করিতেছে।

চারিদিকে নাগরিকের জনতা। সকলেই ঘোষকের জ্ঞাপনী শুনিবার জন্য উৎসুক ঊর্ধ্বমুখে হস্তীর সহগমন করিতেছে। পথপার্শ্বের দ্বিতল ত্রিতল হর্ম্যগুলির গবাক্ষে অলিন্দে কুতূহলী নাগরিকাদের মুখ লোভনীয় পশ্চাৎপটের সৃষ্টি করিয়াছে। জনতার কোলাহল ও পটহের রোল মিশিয়া বিচিত্র ধ্বনি-কল্লোল উত্থিত হইতেছে।

ডিণ্ডিম-ধ্বনি সহসা স্তব্ধ হইল। ঘোষক দৃপ্তভঙ্গিতে দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিতেই জনতার কোলাহলও শান্ত হইয়া গেল। ঘোষক তখন শঙ্খের ন্যায় গম্ভীরস্বরে ঘোষণা আরম্ভ করিল—'ভো ভোঃ ! শোন সবাই—মহারাষ্ট্র কুন্তল দেশের কুমার-ভট্টারিকা পরমবিদুষী রাজকন্যা হৈমশ্রী স্বয়ংবরা হবেন। সামন্ত-শ্রেষ্ঠী, চণ্ডাল-পামর, সকলে শ্রবণ কর—জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলে এই স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে পারবে—'

জনতার এক অংশে অবধূত নামধারী একজন অতি স্থূলকায় ব্যক্তি ক্ষুদ্র ধামিতে মুড়ি লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছিল, ঘোষণার শেষ অংশ শুনিয়া তাহার চরণ ও চর্বণ একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। সে ঘাড় বাঁকাইয়া বিস্ফারিত চক্ষে ঊর্ধ্বে ঘোষকের পানে চাহিয়া রহিল।

ঘোষক ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছে—'রাজকুমারী হৈমশ্রী প্রত্যেক পাণিপ্রার্থীকে তিনটি প্রশ্ন করবেন ; যে ব্যক্তি তিনটি প্রশ্নেরই যথার্থ উত্তর দিতে পারবে তার গলায় কুমারী মালা দেবেন—'

উপরোক্ত কথাগুলি শুনিবামাত্র অবধূত হন্তদন্তভাবে পিছু ফিরিয়া জনতা ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যেন স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতে তাহার আর বিলম্ব সহিতেছে না।

জনতার অন্যত্র, ঝাড়ু ও চুপ্‌ড়ি হস্তে একটি হরিজন সম্মোহিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া ঘোষণা শুনিতেছিল : অকস্মাৎ সে সর্বাঙ্গে শিহরিয়া উচ্চ হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল, তারপর ঝাড়ু চুপ্‌ড়ি সজোরে রাজপথে আছড়াইয়া তীরবেগে বিপরীত মুখে দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

ঘোষকের জ্ঞাপনী তখন শেষ হইতেছে—'আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন কুন্তল রাজধানীতে স্বয়ংবর সভা বসবে। অবহিত হও—সকলে অবহিত হও !'

ঘোষণার শেষে ঘোষক আবার দ্রুতচ্ছন্দে পটহ ধ্বনিত করিল।

পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া দীর্ঘ বঙ্কিম পথ চলিয়া গিয়াছে ; পথের অপর পাশে বহু নিম্নে সমুদ্র ।. ইহা সহ্যাদ্রি ও আরব সাগরের মধ্যবর্তী বাণিজ্য-পথ্ ।

পথের উপর সম্মুখেই একটি চতুর্দোলা ; আটজন হৃষ্টপুষ্ট বাহক উহা স্কন্ধে বহন করিয়া চলিয়াছে। চতুর্দোলায় স্থূলকায় অবধূত উপবিষ্ট ; সে উদ্বিগ্নমুখে বসিয়া একছড়া কদলী ভক্ষণ করিতেছে।

·পিছন হইতে এক সুবেশধারী অশ্বারোহী অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। তাহার অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিতে পাইয়া শঙ্কিত অবধূত চতুর্দোলা হইতে গলা বাড়াইয়া দেখিল। অশ্বারোহী দন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে অবধূতকে অতিক্রম করিয়া গেল। অবধূত দেখিল পশ্চাতে আরও দুইজন অশ্বারোহী দ্রুত আগে বাড়িয়া আসিতেছে। আশঙ্কা ও উত্তেজনায় কদলী ভক্ষণ ভুলিয়া সে দু'হাতে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বাহকদের বলিল—'ওরে—ওরে ! তোরা মানুষ না বলদ ! জলদি চল্—জলদি চল্—সব বেটা এগিয়ে গেল—'

নিম্নে সমুদ্রের কিনারা বাহিয়া একটি ময়ূরপঙ্খী তরণী পালের ভরে চলিয়াছে। ঝিকিমিকি রৌদ্র-প্রতিফলিত নীল জলের উপর ময়ূরপঙ্খী মরালের মত ভাসিতেছে। পিছনে হাল ধরিয়া মাঝি দাঁড়াইয়া আছে। তরণী হইতে গানের স্বর ভাসিয়া আসিতেছে—

রূপনগরীর রাজকুমারীর দেশে
চল্‌রে ডিঙা মোর—চল্‌রে ডিঙা ভেসে।
সোনার পালে বাতাস লেগেছে
পূর্ণিমাতে জোয়ার জেগেছে
ভিড়বে তরী রূপের ঘাটে রূপনগরে এসে।
চল্‌রে ডিঙা মোর—চল্‌রে ডিঙা ভেসে !—

এইরূপে নানা পথ দিয়া নানা জাতীয় যানবাহন বহু যাত্রীকে লইয়া কুন্তল রাজধানীর অভিমুখে চলিয়াছে। রাজপুত্রদের মাথায় রাজকীয় শিরস্ত্রাণ আপন আপন স্বতন্ত্র গঠনের বিচিত্রতায় শিরস্ত্রাণধারীদের পরিচয় নির্দেশ করিতেছে। উচ্চপদস্থ সেনানীগণের বক্ষে লৌহজালিক, কটিতে তরবারি। কাহারও সঙ্গে অনুচর আছে, কেহ একাকী যাইতেছে। সকলেরই গন্তব্যস্থান কুন্তলকুমারী হৈমশ্রীর স্বয়ংবর সভা।

কাননের মধ্যে একটি জলাশয়। জলাশয়ের চারিপাশে কিছুদূর পর্যন্ত উন্মুক্ত ভূমি, তারপর একটি দু'টি বড় বড় গাছ ; তারপর নিবিড় বনানীর শাখায় শাখায় জড়াজড়ি। নিম্নে ছায়ান্ধকার, উপরে দূরপ্রসারী পল্লবপুঞ্জের অঙ্গে দ্বিপ্রহরে খর সূর্যকিরণের প্রতিভাস।

জলাশয়ের অনতিদূরবর্তী একটি বৃক্ষ হইতে কাঠ-ঠোকরা পাখির আওয়াজের মত একটি শব্দ আসিতেছে—ঠক্‌ঠক্ ঠক্‌ঠক্—

শব্দ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলে দেখা যায়—বৃক্ষের নিম্নতন একটি শাখায় পা ঝুলাইয়া একটি মানুষ বসিয়া আছে এবং যে শাখায় বসিয়া আছে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। মানুষটি অল্পবয়স্ক, কুড়ির বেশি বয়স হইবে না। অতি সুন্দর গৌরকান্তি যুবা, মুখে শিশুর সরলতা ; হাসিটি নব-বিস্ময় ও কৌতুকে ভরা, যেন এইমাত্র কোন্ দৈব দুর্বিপাকে এই বিস্ময়কর পৃথিবীতে সে আসিয়া পড়িয়াছে। সাংসারিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তাহার বিন্দুমাত্র আছে বলিয়া মনে হয় না।

যুবকের ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, কেবল স্কন্ধে উপবীত আছে। সে আপন মনে হাসিতেছে এবং ক্ষুদ্র

কুঠারের সাহায্যে বৃক্ষশাখার গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ মারিতেছে। কুঠার-দণ্ডের প্রান্তে একটি সূত্র সংলগ্ন।

যুবক মনের আনন্দে ডাল কাটিতেছে, সহসা অদূরে অন্য একপ্রকার শব্দ তাহার কানে আসিল ; সে কুঠার নামাইয়া কৌতূহলভরে বাহিরের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। যে-শব্দ যুবককে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা বনভূমির শষ্পাস্তরণের উপর মন্দীভূত অশ্বক্ষুরধ্বনি।

যুবক দেখিল জলাশয়ের পাশ দিয়া একজন অশ্বারোহী আসিতেছে ; আসিতে আসিতে অশ্ব ও অশ্বারোহী উভয়েই সতৃষ্ণভাবে জলাশয়ের পানে ঘাড় বাঁকাইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে ; যেন ইচ্ছা, থামিয়া জলপান করে।

আরও নিকটবর্তী হইলে দেখা গেল, অশ্বারোহীর বেশভূষা ঘর্মাক্ত ও ধূলিধূসর হইলেও রাজোচিত ; অশ্বও তদনুরূপ।—আরোহীর বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর ; মাংসল দেহ, গোলাকৃতি মাংসল মুখ। মুখে শাসক-সম্প্রদায়সুলভ আত্মাভিমান সুপরিস্ফুট।

ঘোটকটি কতক নিজ ইচ্ছানুসারেই ক্রমশ মন্দবেগ হইয়া শেষে সরোবরের তীরে থামিয়া গেল ; আরোহীও মনে মনে বিচার করিল, এখানে নামিয়া অজ্ঞাত জলাশয়ে জল পান করা সমীচীন হইবে কিনা। ওদিকে শাখারূঢ় যুবক পশ্চাৎ হইতে পরম আগ্রহে তাহাদের নিরীক্ষণ করিতেছিল, তন্ময়তাবশত তাহার কুঠার স্খলিত হইয়া ঝনৎকার শব্দে মাটিতে পড়িল।

চমকিয়া অশ্বারোহী ফিরিয়া দেখিল গাছের উপর এক কাঠুরিয়া বসিয়া আছে। সে তখন ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইল।

যুবক ততক্ষণে সূত্রের সাহায্যে ভূপতিত কুঠারটি টানিয়া তুলিয়া লইয়াছে। তাহার কুঠার বোধহয় প্রায়ই পড়িয়া যায়, তাই উহা বিনা পরিশ্রমে উদ্ধার করিবার এই বালকোচিত কৌশল আবিষ্কার করিয়া যুবক গর্বপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতেছে।

অশ্বারোহী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া অশ্ব থামাইলেন, যুবকের কার্যকলাপ নিরুৎসুক চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—'তুই কে রে ?'

সরল হাস্যে কাঠুরিয়ার মুখ ভরিয়া গেল, সে সহজ অকপটতার সহিত উত্তর দিল—'আমি কালিদাস। জঙ্গলের ঐধারে ছোট্ট গাঁ আছে, ওখানে আমি থাকি। মামা বললেন—বামুনের ঘরের এঁড়ে, লেখাপড়া শিখলি না—যা, জঙ্গলে কাঠ কেটে আনগে যা। তাই কাঠ কাটছি।'

অশ্বারোহীর মুখভাব দেখিয়া মনে হইল তিনি কালিদাসকে নিরেট নির্বোধ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে প্রশ্ন করিলেন—'কুন্তল রাজধানী এখান থেকে কতদূর জানিস ?'

কালিদাস বলিলেন—'জানি। হেঁটে গেলে একদিনের পথ।'

অশ্বারোহী যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, অশ্ব হইতে নামিবার উপক্রম করিয়া নিজ মনেই বলিলেন—'তাহলে ঘোড়ার পিঠে দু'দণ্ডে যাওয়া যাবে—'

কালিদাস বৃক্ষশাখায় বসিয়া সকৌতুকে আরোহীর অবরোহণ ক্রিয়া দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে ?'

অশ্বারোহী ভূপৃষ্ঠে নামিয়া তাচ্ছিল্যভরে একবার কালিদাসের পানে চোখ তুলিলেন, বলিলেন—'আমি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ মকরবর্মা।'

কালিদাসের ভাগ্যে রাজপুত্র দর্শন এই প্রথম ; উত্তেজনায় তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া তিনি সংহত স্বরে বলিলেন—'রাজপুত্তুর ! কিন্তু তোমার মন্ত্রিপুত্তুর কোটালপুত্তুর সৈন্য সামন্ত—এরা সব কৈ ?'

যুবরাজ ঈষৎ হাস্য করিলেন—'আমার দলবল সব পাকা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, দেরি হয়ে যাচ্ছিল

তাই আমি জঙ্গলের রাস্তা ধরেছি।'

কালিদাস উৎসুক স্বরে প্রশ্ন করিলেন—'তুমি বুঝি স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছ ?'

যুবরাজ ঘাড় নাড়িলেন। ইতিমধ্যে ঘোড়াটিকে তিনি কালিদাসের ঠিক নীচে গাছের একটি উপশাখায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন এবং মস্তক হইতে ধাতুময় শিরস্ত্রাণটি মোচন করিয়া গাছের আর একটি গোঁজের মত ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। এখন ঘর্মাক্ত কুর্তাটি খুলিতে খুলিতে তিনি তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন—'নাইতে হবে—ঘামে ধুলোয় কাপড়-চোপড় সব নষ্ট হয়ে গেছে। তোদের ঐ পুকুরটার জল কেমন ? ভাল ?'

কালিদাস বলিলেন—'হ্যাঁ—খুব ভাল।'

কুর্তা মাটিতে ফেলিয়া যুবরাজ নূতন বস্ত্রাদি বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোড়ার পিঠে কম্বলাসনের নীচে বহুবিধ উৎকৃষ্ট পট্ট বস্ত্রাদি পাট করিয়া রাখা ছিল ; কম্বল তুলিয়া সেগুলি একে একে বাহির করিয়া যুবরাজ মকরবর্মা ঘোড়ার পিঠের উপরেই সাজাইয়া রাখিতে লাগিলেন ; উদ্দেশ্য স্নান সারিয়া সেগুলি পরিধানপূর্বক বরবেশে স্বয়ংবর সভায় যাত্রা করিবেন।

তিনি আত্মগতভাবে বলিলেন—'স্বয়ংবর সভায় যেতে হবে, যা-তা পরে গেলে তো চলবে না—আজকালকার মেয়েদের আবার পোশাকের ওপর নজর বেশি। আমার প্রথম রানীকে যখন বিয়ে করেছিলাম, তখন এত হাঙ্গামা ছিল না—'

কালিদাস সহস্র চক্ষু হইয়া এই সব বস্ত্র-বৈভব দেখিতেছিলেন। প্রশ্ন করিলেন—'তোমার বুঝি অনেক রানী ?'

মকরবর্মা বলিলেন—'না—বেশি আর কৈ—মাত্র সাতটি।'

সোনালী জরির জুতাজোড়া গাছের তলায় খুলিয়া রাখিতে রাখিতে তিনি বলিলেন—'হ্যাঁ দ্যাখ্—কি নাম তোর—কালিদাস! শোন্, আমি পুকুরে নাইতে চললাম। তুই এগুলোর ওপর নজর রাখিস—যেন জংলি কেউ এসে নিয়ে না পালায়—বুঝলি ?'

কালিদাস ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জানাইলেন। যুবরাজ আর বিলম্ব না করিয়া সরোবরের দিকে চলিলেন। কিন্তু কিছু দূর গিয়া তাঁহার গতিরোধ হইল, তিনি ইতস্তত করিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন। জুতাজোড়া মাটিতে পড়িয়া রহিল, যদি শৃগালে লইয়া পলায়ন করে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া জুতাজোড়া শিরস্ত্রাণের সঙ্গে গাছে ঝুলাইয়া রাখিলেন।

গাছের উপর কালিদাস মুগ্ধ তন্ময়তার সহিত বিচিত্র সুন্দর আভরণগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যুবরাজ প্রস্থান করিবার পর তাঁহার চোখ দু'টি দূরে যুবরাজের দিকে সঞ্চারিত হইল, আবার বস্ত্রগুলির দিকে ফিরিয়া আসিল, আবার যুবরাজের দিকে প্রেরিত হইল—তারপর তিনি সন্তর্পণে হাত বাড়াইয়া শিরস্ত্রাণটি তুলিয়া লইলেন। মহানন্দে কিছুক্ষণ তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিবার পর তিনি সেটি নিজ মস্তকে পরিধান করিলেন। বাঃ, একটুও বড় হয় নাই, যেন তাঁহারই মাথার মাপে প্রস্তুত হইয়াছিল। শাণিত কুঠার-ফলকে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে উল্লসিত শিহরণ খেলিয়া গেল। অতঃপর জুতাজোড়াও তাঁহার শ্রীচরণেষু হইল। আরে! একটু আঁট হইয়াছে বটে, কিন্তু বে-মানান হয় নাই।

ওদিকে যুবরাজ তখন এক-কোমর জলে দাঁড়াইয়া পরম আরামে স্নান করিতেছেন, নাক টিপিয়া জলে ডুব দিতেছেন, দুই হস্তে সবেগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘর্ষণ করিতেছেন। কালিদাসের দিকে তাঁহার নজর নাই।

কালিদাস কিন্তু ইতিমধ্যে একটি একটি করিয়া রাজবেশ অঙ্গে ধারণ করিতেছেন ; বস্ত্র উত্তরীয় আঙ্‌রাখা শ্রীঅঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল। যুবরাজ মকরবর্মা ওদিকে আপন মনে স্নান করিয়া চলিয়াছেন।

সর্বাঙ্গে রাজাভরণ পরিয়া কালিদাসের বুকে আনন্দ ধরে না। কিন্তু এত সাজসজ্জা করিয়া তো চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না, একটি কিছু করা চাই। শাখারূঢ় কালিদাস হঠাৎ কুঠারটি তুলিয়া লইয়া খটাখট্ ডাল কাটিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। নিম্নে ঘোড়াটি এই আকস্মিক শব্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শাখাটি ইতিপূর্বেই বেশ জখম হইয়াছিল, এই দ্বিতীয় আক্রমণ আর সহ্য করিতে পারিল না। মুহূর্তমধ্যে অনেকগুলি ব্যাপার ঘটিয়া গেল। শাখাটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হইলেও মড় মড় শব্দে নীচে নামিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, কালিদাসের হাত হইতে কুঠার ছিট্‌কাইয়া পড়িল। ঘোড়াটা নিম্নে লাফালাফি শুরু করিয়াছিল, শাখাচ্যুত কালিদাস তাহার পৃষ্ঠের উপর পড়িয়া ভাল্লুকের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ভয়ার্ত ঘোড়া মুখের এক ঝট্‌কায় বন্ধন ছিঁড়িয়া তীরবেগে একদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল। কালিদাস প্রাণপণে তাহার গ্রীবা আঁক্‌ড়াইয়া রহিলেন।

স্নানরত যুবরাজের কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিতেই তিনি উত্তেজিত হইয়া সেইদিকে তাকাইলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে ঘোর উদ্বেগে হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া তিনি জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সিক্ত বস্ত্রে দৌড়িতে দৌড়িতে যখন বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন তখন অশ্ব কাঠুরিয়াকে পৃষ্ঠে লইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

বনের মধ্যে কালিদাস অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যুবরাজ মকরবর্মা হতভম্ব হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তাঁহার সুবর্তুল মুখে ক্রোধ ও হতাশার মিশ্রণে এক অপূর্ব অভিব্যক্তি ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি সহসা ব্যাঘ্রের মত গর্জন ছাড়িয়া দুই হস্ত ঊর্ধ্বে আস্ফালন করিতে করিতে যেন পলাতক অশ্বের পশ্চাদ্ধাবন করিবার উদ্দেশ্যে দৌড়িবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে এক পদও অগ্রসর হইতে হইল না। তাঁহার সিক্ত বস্ত্র হইতে জল ঝরিয়া মাটি কর্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজ পা পিছলাইয়া সশব্দে মৃত্তিকার উপর উপবিষ্ট হইলেন।

কুন্তল রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে সাধারণের উপভোগ্য নগরোদ্যান। উদ্যান ঘিরিয়া চক্রাকার রাজপথ, রাজপথের অপর পার্শ্বে সারি সারি অট্টালিকা, বিপণি, মদিরাগৃহ পতাকা ও তোরণমাল্যে ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

নগরোদ্যানের কেন্দ্রে একটি অতি সুদৃশ্য মর্মরনির্মিত কন্দর্প-মন্দির ; মন্দিরের দেয়াল নাই। কেবল চারিটি স্তম্ভ ; তাই বাহির হইতে কন্দর্পদেবের ধনুর্ধর মূর্তি দেখা যাইতেছে। স্থানে স্থানে নাগরিকদের উপবেশনের জন্য প্রস্তরবেদিকা আছে। উদ্যানের চারি প্রান্তে চারিটি প্রস্রবণ ; উহার জল গো-মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া বৃহৎ শ্বেত জলাধারে পড়িতেছে। একঝাঁক পারাবত উদ্যানভূমিতে বসিয়া নির্ভয়ে উঞ্ছবৃত্তি করিতেছে। কুঞ্জের বিতানবাটিকায় নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া নব বসন্তের জয় ঘোষণা করিতেছে।

আজ মদনোৎসব ; তাহার উপর রাজকন্যার স্বয়ংবর। নগরের উত্তেজনা চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং রাজন্যবর্গের সমাগমে নগরী গম্‌গম্ করিতেছে।

উদ্যান ও রাজপথের মধ্যবর্তী স্থানে অগণিত ফুলের দোকান বসিয়াছে। দারু নির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, চারিটি দণ্ডের উপর অবস্থিত ; তাহার মধ্যে রাশীকৃত ফুল। ফুলের রাশির মধ্যে এক একটি যুবতী মালিনী বসিয়া আছে, তাম্বূলরঞ্জিত বিম্বাধরে হাসিয়া বিলাসী নাগরিকদের পুষ্পমালা পুষ্পের অঙ্গদ কুণ্ডল শিরোভূষণ বিক্রয় করিতেছে।

পথে জনস্রোত আবর্তিত। মাঝে মাঝে উষ্ট্রের সারি বাণিজ্যদ্রব্য বহন করিয়া উত্তুঙ্গ

অবজ্ঞাভরে চলিয়াছে। দোলা চতুর্দোলারও অভাব নাই, সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাদের বহন করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত করিতেছে।

সহসা এই পথের উপর ক্ষণকালের জন্য এক চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। প্রধান পথটি হইতে কয়েকটি শাখাপথ বাহির হইয়া গিয়াছিল ; এইরূপ একটি পথ দিয়া প্রচণ্ড বেগে একটি উন্মত্ত অশ্ব বাহির হইয়া আসিল। অশ্বের পৃষ্ঠে একজন আরোহী অতি কষ্টে নিজেকে জুড়িয়া রাখিয়াছে। ক্ষিপ্ত অশ্ব দেখিয়া পথের জনতা সভয়ে চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। একটি ফুলের দোকানের সম্মুখ পর্যন্ত আসিয়া অশ্ব দুই পায়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া গতিবেগ সংবরণ করিল, তারপর গতি পরিবর্তন করিয়া উগ্রবেগে অন্য একটা পথ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

অশ্ব ও অশ্বারোহী আমাদের পরিচিত। তাহারা অন্তর্হিত হইলে পথের কোলাহল ও উত্তেজনা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। যে ফুলের দোকানটিকে অশ্ববর প্রায় বিমর্দিত করিয়া গিয়াছিল, তাহার অধিষ্ঠাত্রী মালিনী এতক্ষণে ফুলের স্তূপ হইতে মাথা তুলিয়া চাহিল। দোকানের সম্মুখে তিনটি নাগরিক ছিলেন, ঘোটকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা কে কোথায় তিরোধান করিয়াছিলেন ; এখন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন দোকানের নিম্নদেশ হইতে গুড়ি মারিয়া বাহিরে আসিলেন। বেশভূষা কিছু অবিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সংস্কার করিতে করিতে ও জানুর ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে এক ব্যক্তি সশব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন—'বাবাঃ! রগ ঘেঁষে গেছে। আর একটু হলেই উচ্চৈঃশ্রবা বুকের ওপর পা চাপিয়ে দিয়েছিল আর কি।'

দ্বিতীয় নাগরিক স্খলিত কর্ণভূষা আবার পরিধান করিতেছিলেন, বিরক্তিভরে বলিলেন—'অনেক রাজকুমারই তো স্বয়ংবরে এসেছে কিন্তু এমন বেপরোয়া ঘোড়সোয়ার দেখিনি। ভাগ্যে শ্রীমতীর দোকানের তলায় ঢুকেছিলাম, নইলে মুণ্ডটি পিণ্ড করে দিয়ে চলে যেত।'

দোকানের মালিনী এবার কথা কহিল, উৎসুকভাবে বলিল—'নিশ্চয় কোনো রাজকুমার! চিনতে পারলে না?'

এতক্ষণে তৃতীয় নাগরিকটি, যেন কিছুই হয় নাই এমনিভাবে ফুলের পাখার বাতাস খাইতে খাইতে ফিরিয়া আসিলেন। মালিনীর প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিলেন ; অবজ্ঞায় ভ্রূ তুলিয়া আর দুইজনের প্রতি দৃক্‌পাত করিয়া বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিলেন—'চোখ চেয়ে থাকলে তো চিনতে পারবে! ঘোড়া দেখেই শ্রীমানদের পদ্মপলাশ নেত্র কমল কোরকের মত মুদিত হয়ে গিয়েছিল যে!'

দ্বিতীয় নাগরিক বলিলেন—'আরে যাও যাও, তুমি তো দৌড় মেরেছিলে। সরু সরু এক জোড়া পা আছে কিনা—'

মালিনী এই দেহতাত্ত্বিক আলোচনায় বাধা দিয়া তৃতীয় নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি চিনতে পেরেছ বুঝি?'

তৃতীয় নাগরিক বলিলেন—'চেনা আর শক্ত কি? এক নজর দেখেই চিনেছি। মাথায় শিরস্ত্রাণটা দেখলে না!'

মালিনী বলিল—'হ্যাঁ হ্যাঁ, শিরস্ত্রাণটা নতুন ধরনের—রোদ্দুরে ঝক্‌ঝক্ করে উঠল—'

তৃতীয় নাগরিক গম্ভীরভাবে বলিলেন—'আর্যাবর্তের দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজার রাজকীয় লাঞ্ছন আমার নখদর্পণে। ইনি হচ্ছেন সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ।'

মালিনীর চক্ষু বিস্ফারিত হইল, সে বলিল—'নিশ্চয় স্বয়ংবর সভায় গেলেন। তাই এত তাড়া।'

প্রথম নাগরিক হুঁ হুঁ করিয়া আনুনাসিক হাস্য করিলেন—'যতই তেড়ে যান গুড়্‌গুড়্ করে

ফিরে আসতে হবে। সে বড় কঠিন ঠাঁই, রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারছে না।'

তৃতীয় নাগরিকের নাসা অবজ্ঞায় স্ফুরিত হইল—'প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বিদ্যা এবং বুদ্ধি দুই-ই দরকার—বুঝলে হে? অথচ যে-সব রাজা-রাজড়া রথি-মহারথ যাচ্ছেন, সত্যি কথা বলতে কি, তাদের কোনোটাই নেই।'

দ্বিতীয় নাগরিক শ্লেষভরে বলিলেন—'কিন্তু তোমার তো দুই-ই আছে: তুমি গিয়ে সভায় ঢুকে পড় না। চণ্ডাল পামর কারুর তো যেতে মানা নেই।'

তৃতীয় নাগরিক ঈষৎ রুষ্টমুখে চাহিলেন, তারপর সগর্ব মর্যাদার সহিত বলিলেন—'যাব। আগে রাজা-রাজড়াগুলো শেষ হয়ে যাক তারপর যাব।'

দ্বিতীয় নাগরিক অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। প্রথম নাগরিকের মুখে কিন্তু একটু বিমর্ষতার ছায়া পড়িল। তিনি বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিলেন—'আমিও যেতাম। কিন্তু সদর দেউড়িতে যে দুটো আখাম্বা হাব্‌শী খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—'

রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ তোরণ ও প্রতীহার ভূমি। অতি স্থূল তোরণস্তম্ভের গর্ভে প্রতীহারদের জন্য বিরাম-কক্ষ আছে। স্তম্ভের দুই পাশ হইতে কারুকার্য খচিত উচ্চ প্রাচীর প্রশস্ত প্রাসাদভূমিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

দুইজন ভীমকান্তি হাব্‌শী মুক্ত কৃপাণ হস্তে তোরণ-সম্মুখে প্রহরা দিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে প্রায় শত হস্ত দূরে রাজভবনের প্রথম মহল; তাহার পশ্চাতে অন্যান্য যে-সকল মহল আছে সম্মুখ হইতে সেগুলি দেখা যায় না।

দূর রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটি লোক তোরণের দিকে আসিতেছে দেখা গেল। লোকটি মহার্ঘ বেশভূষায় সজ্জিত, মস্তকে ধাতুময় শিরস্ত্রাণ। তাহার হাঁটিবার ভঙ্গি হইতে মনে হয় সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে।

তোরণের বাহিরে আসিয়া লোকটি ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিল—'নারীজাতি রসাতলে যাক।—আমার ঘোড়া কোথায়?'

হাব্‌শীদ্বয় উত্তর দিল না, প্রস্তরমূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময় একটি অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া একজন অশ্বপাল তোরণ হইতে বাহির হইয়া আসিল। পূর্বোক্ত ব্যক্তি বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বপৃষ্ঠে লাফাইয়া উঠিয়া বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া অদৃশ্য হইলেন। অশ্বপাল মুচকি হাসিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল, যাইবার সময় হাব্‌শীদের দিকে একবার চোখ টিপিয়া গেল।

এইবার বোধকরি অশ্বক্ষুরশব্দে আকৃষ্ট হইয়া একটি প্রবীণ ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন। ক্ষৌরিত মস্তকে সুস্পষ্ট শিখা, কর্ণে শরের লেখনী, হস্তে তালপত্রের পুস্তিকা। ইনি রাজ্যের পুস্তপাল।

পুস্তপাল মহাশয় বিলীয়মান অশ্বারোহীর দিকে একবার দৃক্‌পাত করিয়া নিরুৎসুক কণ্ঠে হাব্‌শীদের জিজ্ঞাসা করিলেন—'বিদর্ভরাজকুমার চলে গেলেন?'

বিশদ হাস্যে হাব্‌শীদ্বয়ের সুকৃষ্ণ মুখমণ্ডল দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল; তাহারা যুগপৎ মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল। পুস্তপাল মহাশয় গম্ভীর মুখে কর্ণ হইতে লেখনী লইয়া পুস্তিকায় লিখিতে লিখিতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিলেন—'বিদর্ভকুমার—অর্থাৎ—ঊনপঞ্চাশৎ সংখ্যা—'

অতঃপর আমরা কুন্তলকুমারী হৈমশ্রীর স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করিতে পারি।

বৃহৎ সভাগৃহ। এত বৃহৎ যে পাঁচশত লোক অনায়াসে তাহাতে বসিতে পারে। গোলাকৃতি কক্ষ: প্রাচীর সাধারণ কক্ষ হইতে চতুর্গুণ উচ্চ। প্রাচীরের নিম্নভাগে নানাবিধ পৌরাণিক ঘটনার

চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে : ঊর্ধ্বে ছাদের প্রায় নিকটে আলিসার মত প্রশস্ত মঞ্চ প্রাচীর বেষ্টন করিয়া আছে। তাহার উপর শূলধারী দুইজন হাব্‌শী রক্ষী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পর সম্মুখীন হইবামাত্র তাহারা এক বিচিত্র অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিতেছে ঃ স্কন্ধ হইতে শূল নামাইয়া যেন পরস্পর আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে, তারপর উভয়ে উভয়কে মিত্র বলিয়া চিনিতে পারিয়া শূল স্কন্ধে তুলিয়া আবার বিপরীত মুখে পরিক্রমণ আরম্ভ করিতেছে। তাহাদের অভিনয় বস্তুত অহিংস হইলেও দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর।

সভাগৃহের মধ্যস্থলে মণিকুট্টিমের উপর একটি সুবৃহৎ চক্রাকার বেদী, ভূমি হইতে মাত্র এক ধাপ উচ্চ। মূলত ইহা রাজসভায় সিংহাসন রক্ষার জন্য পট্টবেদিকা ; কিন্তু রাজসভা স্বয়ংবর সভায় রূপান্তরিত হওয়ায় সিংহাসন অন্তর্হিত হইয়াছে। এই বেদীর সম্মুখে অল্প দূরে আর একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি ক্ষুদ্র বেদিকা—ইহা রাজার সহিত ভাষণপ্রার্থী মান্য অতিথির জন্য নির্দিষ্ট। উপস্থিত এই বেদিকা শূন্য।

কিন্তু প্রধান পট্টবেদিকাটি শূন্য নয়, বরঞ্চ কিছু অধিক পরিমাণেই পূর্ণ। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি সুন্দরী সুবেশা তরুণী এই বেদীর উপর, পদ্মের উপর প্রজাপতির ন্যায় ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বেদীর স্থানে স্থানে স্বর্ণস্থালীতে মালা পুষ্প চন্দন শঙ্খ লাজ ইত্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে। তরুণীরা কলকণ্ঠে গল্প করিতেছে, হাসিতেছে, তাম্বূল চর্বণ করিতেছে ; কেহ বা বেদীর উপরে অর্ধশয়ান হইয়া অলস অঙ্গুলি সঞ্চালনে বীণার তন্ত্রীতে মৃদু আঘাত করিতেছে।

বেদীর এক পাশে দীর্ঘ স্বর্ণদণ্ডের শীর্ষে দুইটি শুক পক্ষী চরণে শৃঙ্খল পরিয়া বসিয়া আছে। একটি তরুণী মৃণাল বাহু তুলিয়া তাহাদের ধানের শীষ খাওয়াইতেছেন। এই তরুণীর মুখাবয়ব পশ্চাৎ হইতে দেখা না গেলেও তাঁহার দেহের ও গ্রীবার মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিমা হইতে অনুমান হয় যে ইনিই রাজকন্যা হৈমশ্রী।

আর একটি যুবতী বেদীর কিনারায় বসিয়া গভীর মনঃসংযোগে কজ্জলমসী দিয়া ভূমির উপর আঁক কষিতেছে। অন্য কোনো দিকে তাহার দৃষ্টি নাই ; মুখে উদ্বেগ ও শঙ্কা পরিস্ফুট। অবশেষে অঙ্ক শেষ করিয়া যুবতী হতাশাব্যঞ্জক মুখ তুলিল, হৃদয় ভারাক্রান্ত নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—'ঊনপঞ্চাশ—'

যুবতীর কণ্ঠস্বরে রাজকুমারী পক্ষীদণ্ডের দিক হইতে ফিরিলেন। এতক্ষণে তাঁহার মুখ দেখা গেল। এতগুলি সম্ভ্রান্ত কুলোদ্‌ভবা রূপসীর মধ্যে তিনিই যে প্রধানা তাহা তাঁহার মুখের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে আর সন্দেহ থাকে না। অভিমান তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৈদগ্ধ্য ও সৌকুমার্য মিশিয়া মুখে অপূর্ব লাবণ্য যেন ঝলমল করিতেছে।

প্রিয়সখী চতুরিকার হতাশ মুখভঙ্গি দেখিয়া হৈমশ্রীও একটু বিষণ্ণ হাস্য করিলেন, তারপর অলসপদে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—'চতুরিকা, ঠিক জানিস ঊনপঞ্চাশটা ? আমার তো মনে হচ্ছে, একশো ঊনপঞ্চাশ।'

চতুরিকা আবার হিসাবের দিকে দৃষ্টি নামাইল, মনে মনে হিসাব পরীক্ষা করিল, তারপর বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িল—'উঁহু ঊনপঞ্চাশ। এই যে হিসেব—তেরো জন রাজকুমার, সতেরোটি সামন্ত, চৌদ্দজন শ্রেষ্ঠিপুত্র, আর পাঁচটি নাগরিক। কত হল ?'

আরও কয়েকটি সখী চতুরিকার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, একজন চট্‌ করিয়া জবাব দিল—'সাতচল্লিশ।'

দ্বিতীয়া সখী বলিল—'দূর মুখপুড়ি, তিপ্পান্ন !'

রাজকুমারী হাসিলেন—'তোরা সবাই অঙ্কশাস্ত্রে বররুচি।'

চতুরিকা সকৌতুকে ভ্রূভঙ্গি করিয়া রাজকন্যার পানে চোখ তুলিল—'শুধু তোমার বুঝি বরে

রুচি নেই ?'

সকলে হাসিয়া উঠিল। হৈমশ্রীও হাসিতে হাসিতে চতুরিকার পাশে উপবেশন করিলেন। অন্য সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। হৈমশ্রী মুখের একটি কৌতুক-করুণ ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—'রুচি থেকেই বা লাভ কি বল্। উনপঞ্চাশ জনের একজনও তো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না।'

চতুরিকা রাজকন্যার সবচেয়ে প্রিয় সখী, তাঁহার মনের অনেক খবর রাখে ; সে মিটি মিটি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—'আচ্ছা সত্যি বল পিয়সহি, এদের মধ্যে কেউ উত্তর দিতে পারলে তুমি সুখী হতে ?'

হৈমশ্রীও হাসিলেন—'যদি বলি হতুম।'

চতুরিকা মাথা নাড়িয়া বলিল—'তাহলে আমি বিশ্বাস করতুম না। ওদের মধ্যে একজনকেও তোমার মনে ধরেনি।'

সখীদের মধ্যে একজন কৌতুক-তরল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'শুধু রামছাগলটিকে ছাড়া।'

হাসির লহর উঠিল। একটি হতভাগ্য পাণিপ্রার্থীর ছাগ-সদৃশ দাড়ি লইয়া ইতিপূর্বে অনেক রঙ্গ রসিকতা হইয়া গিয়াছিল ; রাজকুমারী একমুঠি ফুল ছুঁড়িয়া রহস্যকারিণীকে প্রহার করিলেন, বলিলেন—'রামছাগলটিকে মৃগশিরার ভারি মনে ধরেছে, ঘুরে-ফিরে কেবল তারই কথা। তোর জন্যে চেষ্টা করে দেখব নাকি ? এখনো হয়তো খুঁজলে পাওয়া যাবে।'

মৃগশিরা রাজকুমারীর নিক্ষিপ্ত ফুলগুলি কবরীতে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল—'তা মন্দ কি ! আমি রাজী।'

দ্বিতীয়া সখী বলিল—'রাজযোটক হবে—মৃগশিরা আর রামছাগল।'

চতুরিকা একটু গম্ভীর হইল, বলিল—'ঠাট্টা নয়, ভারি আশ্চর্য কথা। এতগুলো বড় বড় লোক, একটা প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারল না।'

তৃতীয়া সখী বলিল—'যা বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন !'

রাজকুমারী শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—'প্রশ্ন বিদ্‌ঘুটে নয় মালবিকা, লোকগুলো বিদ্‌ঘুটে। ওদের যদি সহজবুদ্ধি থাকত তাহলে সহজেই উত্তর দিতে পারত।'

একটি সখীর কৌতূহল দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল, সে রাজকন্যার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া আবদারের সুরে বলিল—'বল না পিয়সহি, প্রথম প্রশ্নের উত্তর কি ?'

অন্য একজন তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল—'না না, আমরা সকলে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর শুনতে চাই—পৃথিবীতে সবচেয়ে মিষ্ট কী ?'

রাজকুমারী অলস হাসিয়া বলিলেন—'তোরাই বল্ না দেখি।'

সকলে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। একটি সরলা যুবতী উৎসাহভরে বলিল—'আমি বলব ? রসাল ! রসালের চেয়ে মিষ্টি পৃথিবীতে আর কিচ্ছু নেই।'

মৃগশিরা মুখ তুলিল—'আমি বুঝেছি—আখ ! ইক্ষুদণ্ড ! আখের চেয়ে মিষ্টি আর কী আছে। আখ থেকেই তো যত সব মিষ্টি জিনিস তৈরি হয়।'

বিদ্যুল্লতা আপত্তি তুলিল—'তাহলে মধু হবে না কেন ? মধুই বা কি দোষ করেছে ? হ্যাঁ পিয়সহি, মধু—না ?'

হৈমশ্রী হাসিয়া উঠিলেন—'দূর হ' পেটুকের দল। কিন্তু আর তো পারা যায় না। মাথার উপর উনপঞ্চাশ পবনের নৃত্য হয়ে গেল, আর কি সহ্য হবে !'

তিনি ম্রিয়মাণ চক্ষে চতুরিকার পানে তাকাইলেন। বিদ্যুল্লতা সান্ত্বনার সুরে বলিল—'এরি মধ্যে হাঁপিয়ে পড়লে চলবে কেন। —এখনো সমস্ত দিন পড়ে রয়েছে।'

হৈমশ্রী অধীরভাবে মাথা নাড়িলেন—'তা নয় বিদ্যুল্লতা। কিন্তু আর্যাবর্তের এত অধঃপতন হয়েছে! এক অশিক্ষিতা মেয়ের তিনটে সামান্য প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারছে না!'

চতুরিকা মুখভঙ্গি করিল—'তুমি অশিক্ষিতা মেয়ে! বাব্বাঃ! চতুঃষষ্টি কলা শেষ করে বসে আছ!'

বনজ্যোৎস্না রাজকুমারীকে আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিল—'হতাশ হয়ো না পিয়সহি, এখনো অনেক আসবে। কেউ না কেউ ঠিক উত্তর দিয়ে ফেলবেই।'

হৈমশ্রী বলিলেন—'উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়। যাঁরা আসবেন তাঁরা ওই রামছাগলের ভায়রাভাই। তার চেয়ে যদি আমার শুকসারীকে প্রশ্ন করতুম, ওরা ঠিক উত্তর দিতে পারত।'

চতুরিকা বলিল—'তবে তাই কর, সব হাঙ্গামা চুকে যাক। ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে, শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে না। তাহলে মহারাজকে তাই বলি, কী বল?' রাজকুমারী বিমনাভাবে মৃদু হাসিলেন।

বাহিরে তোরণের প্রতীহার ভূমিতে কৃপাণধারী হাব্‌শীদ্বয় পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া ছিল। অনেকক্ষণ কেহ আসে নাই। সহসা সম্মুখে চাহিয়া হাব্‌শীরা আরো সতর্ক হইয়া দাঁড়াইল।

যাহাকে দেখিয়া হাব্‌শীরা সতর্ক হইয়াছিল সে আর কেহ নয়, আমাদের অশ্বারূঢ় কালিদাস। নগরের বহু স্থান ঘুরিয়া উন্মত্ত ঘোটক অবশেষে রাজপ্রাসাদের দিকে উল্কার বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। কালিদাস ঘোড়ার কেশর ধরিয়া কোনো মতে টিকিয়া আছেন।

ঝড়ের মত ঘোড়া হাব্‌শীদ্বয়ের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হাব্‌শীরাও প্রস্তুত ছিল, ডালকুত্তার মত লাফ দিয়া দুই দিক হইতে ঘোড়ার বল্‌গা চাপিয়া ধরিল। হাব্‌শীদের কালো দেহে অসুরের শক্তি; ঘোড়া আর অধিক আস্ফালন করিতে পারিল না, শান্ত হইয়া দাঁড়াইল। কালিদাস অমনি পিছ্‌লাইয়া ঘোড়ার ঘর্মাক্ত পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পড়িলেন।

দীর্ঘকাল একটা উদ্দাম অসংযত ঘোড়ার পিঠে মরি-বাঁচি ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবার পর কালিদাসের মানসিক ক্রিয়াকলাপ প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিলেন। অশ্বপাল আসিয়া অশ্বটিকে লইয়া গেল। পুস্তপাল মহাশয় ব্যস্তসমস্তভাবে প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, কালিদাসকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন—'আসুন আসুন কুমার—'

কালিদাস থতমত খাইয়া বলিলেন—'আমি—আমি—'

পুস্তপাল বলিলেন—'পরিচয় দিতে হবে না সৌরাষ্ট্রকুমার, আপনার শিরস্ত্রাণ কে না চেনে? আসতে আজ্ঞা হোক—এই দিকে—এই দিকে—মহামন্ত্রী প্রতীক্ষা করছেন—'

পুস্তপাল আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে দুই হস্ত ভিতরের দিকে প্রসারিত করিলেন। হতবুদ্ধি অবস্থায় কালিদাস পুস্তপালের সঙ্গে রাজতোরণ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজপুরীর প্রথম ভবনে মহামন্ত্রী যুক্তকরে কালিদাসকে সংবর্ধনা করিলেন। শীর্ণকায় তীক্ষ্ণচক্ষু বৃদ্ধ মহা আড়ম্বরে সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন—'স্বাগতম্—শুভাগতম্। অষ্টোত্তর শ্রীযুক্ত পরমভট্টারক পরমভাগবত সৌরাষ্ট্রকুমারের জয় হৌক। আসুন মহাভাগ—আপনার পদদ্বন্দ্ব স্পর্শে—'

কালিদাস সম্মোহিতভাবে শুনিতে শুনিতে এতক্ষণে কেবল 'পদ' শব্দটি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু 'পদদ্বন্দ্ব' কী বস্তু? তিনি ত্রস্তভাবে নিজের পায়ের দিকে চক্ষু নামাইলেন—'পদদ্বন্দ্ব!'

মহামন্ত্রী স্মিতমুখে বলিলেন—'পদযুগল।'

কালিদাস তথাপি বিভ্রান্ত। বলিলেন—'পদযুগল!'

মহামন্ত্রী সপ্রশংস মুখে একটু হাস্য করিলেন—'কুমার দেখছি পরিহাস-প্রিয়। পদদ্বন্দ্ব অর্থাৎ পদযুগল—অর্থাৎ দু'টি পা—।'

কালিদাসের মুখের মেঘ কাটিয়া গেল—'ওঃ! দ্বন্দ্ব মানে দু'টি! তাই পদদ্বন্দ্ব বললেন!'

মহামন্ত্রী আসিয়া কালিদাসের বাহু ধরিলেন। রসিক ও কৌতুকী রাজপুত্র এ জগতে বড়ই বিরল। বৃদ্ধ স্মিতহাস্যে বলিলেন—'বৃদ্ধের সঙ্গে পরিহাস করবেন না কুমার, রসালাপের যোগ্যতর স্থান কাছেই আছে। আসুন, আপনাকে রাজকন্যার কাছে নিয়ে যাই—'

স্বয়ংবর সভায় বহুক্ষণ কোনো পাণিপ্রার্থীর শুভাগমন হয় নাই; এই অবকাশে সখীদের মধ্যে রঙ্গরস জমিয়া উঠিয়াছিল। রাজকুমারী একটি সখীর পৃষ্ঠে পৃষ্ঠভার অর্পণ করিয়া অলস ভঙ্গিতে বসিয়া ছিলেন; বিদ্যুল্লতা দুইটি ময়ূরপুচ্ছ হাতে লইয়া রাজকুমারীকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে এবং অনুচ্চ জনান্তিক স্বরে গান গাহিতেছে। তাহার গানের কথাগুলিতে যে মৃদু রতিরস আছে হৈমশ্রী তাহা উপভোগ করিতেছেন। সখীরা কেহ মুখ টিপিয়া হাসিতেছে, কেহ বা ব্যক্তভাবেই কুন্দদন্ত বিকশিত করিয়া আছে। একটি সখীর অঙ্গুলির মৃদু আঘাতে ভূমিশয়ান বীণার তন্ত্রী হইতে মুগ্ধ মূর্ছনা গুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে।

সহসা বাধা পড়িল। কয়েকটি সখী দূরে মহামন্ত্রীকে আসিতে দেখিয়া বিদ্যুল্লতার দিকে উৎকণ্ঠ হইয়া সমস্বরে শীৎকার করিয়া উঠিল—'স্‌স্‌—!'

বিদ্যুল্লতা ঘাড় ফিরাইয়া একবার দ্বারের দিকে ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করিয়াই থপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। হৈমশ্রী ঈষৎ চকিতভাবে দ্বারের পানে আয়ত চক্ষু ফিরাইলেন।

প্রধান দ্বারপথে মহামন্ত্রী কালিদাসকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। কালিদাসের চোখেমুখে অকুণ্ঠ বিস্ময়; মাঝে মাঝে কোনো একটি সুন্দর কারুকার্য দেখিয়া তাঁহার মন্থর গতি রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে; মহামন্ত্রী তাঁহার বাহু স্পর্শ করিয়া আবার তাঁহাকে সম্মুখে পরিচালিত করিতেছেন।

উভয়ে দ্বিতীয় বেদীর উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। কালিদাস সম্মুখস্থ যুবতিযূথের প্রতি সুস্মিত বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন।

সখীরাও ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সহস্রচক্ষু লইয়া এই মুকুটধারী পরম সুন্দর যুবাপুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। রাজকুমারী একবার চক্ষু তুলিয়া আবার চক্ষু নত করিয়াছিলেন; তাঁহার মুখের নিরুৎসুক ঔদাসীন্য অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এমন কান্তিমান পাণিপ্রার্থী ইতিপূর্বে স্বয়ংবর সভায় পদার্পণ করেন নাই।

মহামন্ত্রী মহাশয় একবার গলা ঝাড়া দিয়া দক্ষিণ হস্তখানি অভয়মুদ্রার ভঙ্গিতে তুলিলেন—'স্বস্তি।—পরমভট্টারক শ্রীমান সৌরাষ্ট্রকুমার রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিতে এসেছেন। শুভমস্তু।'

রাজকুমারী দুই করতল যুক্ত করিয়া বুক পর্যন্ত তুলিলেন; চোখ দু'টি ঈষৎ উঠিয়া আবার নত হইল। বাহিরে কিছু প্রকাশ না পাইলেও তিনি যেন অন্তরে অন্তরে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, জোয়ারের জলস্পর্শে ঘাটে বাঁধা তরণীর মত।

এদিকে মহামন্ত্রী কালিদাসকে চক্ষু দ্বারা ইশারা করিতেছেন মাথা হইতে শিরস্ত্রাণটি খুলিয়া ফেলিতে; কিন্তু কালিদাস ইঙ্গিতটা ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না। মহামন্ত্রী তখন তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কথা বলিলেন; কালিদাস তাড়াতাড়ি শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ওটা রাখিবেন কোথায়? এদিক ওদিক স্থান না পাইয়া শেষে মহামন্ত্রীর হাতে ওটা ধরাইয়া

দিয়া সহাস্য মুখে রাজকুমারীর দিকে ফিরিলেন।

কালিদাসের শিরস্ত্রাণ-মুক্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া যুবতীদের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। তাহারা নিশ্বাস সংবরণ করিয়া দেখিতে লাগিল; এক ঝাঁক খঞ্জন যেন কোন্ মায়াবীর মন্ত্রকুহকে স্থির চলৎশক্তিহীন হইয়া গিয়াছে। শেষে মৃগশিরা আর থাকিতে না পারিয়া পাশের সখীর কানে কানে বলিল—'কী চমৎকার চেহারা ভাই, যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। এমন আর কখনো দেখেছিস!'

আশেপাশের দুই তিনজন চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—'স্‌স্‌— !'

চতুরিকা রাজকুমারীর মনের ভাব বুঝিয়াছিল, সে তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'মহেশ্বরের কাছে মানত করো এবার যেন না ফস্কায়।'

রাজকুমারী মুখ টিপিয়া হাসিলেন, আঙুল দিয়া ঠেলিয়া চতুরিকাকে পাশে সরাইয়া দিলেন। চতুরিকা বড় প্রগল্‌ভা।

প্রশ্ন করিতে বিলম্ব হইতেছে। সৌরাষ্ট্রকুমারকে কতক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখা যায়! মহামন্ত্রী আর একবার গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন—'কুমারি, কুমার-ভট্টারক নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, এবার আপনার প্রশ্ন করুন।'

রাজকুমারী মুখ তুলিলেন। কালিদাসের সঙ্গে তিনি ঠিক মুখোমুখিভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন না। একটু পাশ ফিরিয়া ছিলেন। এখন মনোরম গ্রীবাভঙ্গি সহকারে তিনি একবার কালিদাসের দিকে মুখ ফিরাইলেন, তারপর আবার সম্মুখ দিকে চাহিয়া অনুচ্চ স্পষ্ট স্বরে বলিলেন—'প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে—জগতে সবচেয়ে শক্তিমান কী?'

সখীরা এতক্ষণ একদৃষ্টে রাজকুমারীর পানে চাহিয়া ছিল, এখন যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিতবৎ একসঙ্গে কালিদাসের পানে মুণ্ড ফিরাইল।

কালিদাস কিন্তু ইত্যবসরে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন; চারিদিকে এত মহার্ঘ বৈচিত্র্য ছড়ানো রহিয়াছে যে চক্ষু বিভ্রান্ত হইলে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি রাজকুমারীর প্রশ্ন করার ব্যাপারটা ভালরূপ অনুধাবন করিয়াছিলেন কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। মহামন্ত্রী তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে করিলেন ইহা সৌরাষ্ট্রদেশীয় রসিকতার একটা অঙ্গ। তিনি সসম্ভ্রমে প্রশ্নের পুনরুক্তি করিয়া কালিদাসের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন—'কুমারী প্রশ্ন করেছেন, জগতে সবচেয়ে শক্তিমান কী?'

কালিদাসের চক্ষুযুগল এই সময় বিস্ময়-বিমুগ্ধভাবে ঊর্ধ্বে উঠিতেছিল, হঠাৎ তাঁহার মুখে ভয়ের ছায়া পড়িল। ত্রাস-বিস্ফারিত নেত্র ঊর্ধ্বে রাখিয়া তিনি একটি বাহু পাশের দিকে বাড়াইয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাকে দুই হস্তে জাপ্টাইয়া ধরিয়া আলিসার পানে তাকাইতে লাগিলেন।

ঊর্ধ্বে আলিসার উপর যে হাব্‌শী রক্ষীযুগলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধাভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়াই যে কালিদাসের ঈদৃশ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। বৃদ্ধ মহামন্ত্রী উত্ত্যক্ত হইয়া ভাবিলেন, সৌরাষ্ট্র দেশের রাজকীয় রসিকতা ক্রমশ চরমে উঠিতেছে। গলা ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে তিনি বলিলেন—'প্রশ্নের উত্তর দিন কুমার।'

ব্যাপার বেশিদূর গড়াইতে পারিল না; হাবশী যুগল ইত্যবসরে দ্বন্দ্বাভিনয় শেষ করিয়া আবার শান্তভাবে বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কালিদাস কতকটা আশ্বস্ত হইয়া মন্ত্রীকে ছাড়িয়া দিলেন। ক্ষুব্ধ মন্ত্রী কণ্ঠের ঘাম মুছিতে মুছিতে পুনশ্চ বলিলেন—'এইবার প্রশ্নের উত্তর!'

কিন্তু কালিদাস বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার পূর্বেই রাজকুমারী কথা কহিলেন, বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—'প্রথম প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পেয়েছি।'

সকলে অবাক। উত্তেজিত সখীর দল রাজকুমারীকে ভাল করিয়া ঘিরিয়া ধরিল। চতুরিকা

বলিয়া উঠিল—'অ্যাঁ—কী উত্তর পেলে !'

কুমারীর গণ্ডদু'টি ঈষৎ অরুণাভ হইল। তিনি ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া স্পষ্ট অথচ সংবৃতকণ্ঠে বলিলেন—'প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—ভয়। কুমার অভিনয়ের দ্বারা যথার্থ উত্তর দিয়েছেন।'

সখীর দল সশব্দে নিশ্বাস ছাড়িয়া কালিদাসের দিকে ফিরিল।

কালিদাস মন্ত্রীর পানে চাহিয়া একটু বিহ্বলভাবে হাসিতেছেন, কোন্ দিক দিয়া কী হইয়া গেল ধারণা করিতে পারিতেছেন না। মন্ত্রীও কতকটা বোকা বনিয়া গিয়া ঘাড় চুলকাইতে লাগিলেন।

রাজকুমারী কথা কহিলেন। তাঁহার মুখচ্ছবিতে একটু উদ্বেগ দেখা দিয়াছে ; কি জানি কুমার দ্বিতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারিবেন কিনা। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর তেমনি সংযত এবং আবেশহীন হইয়া রহিল। তিনি বলিলেন—'এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন—দ্বন্দ্ব হয় কাদের মধ্যে ?'

প্রশ্ন করিয়াই রাজকুমারী কালিদাসের পানে একটি উৎকণ্ঠা-মিশ্র দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন।

কালিদাস এবার প্রস্তুত ছিলেন ; প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মন্ত্রীর পানে কৌতুক-কটাক্ষপাত করিয়া তর্জনী তুলিলেন, যেন ইঙ্গিতে বলিতে চাহিলেন যে এ প্রশ্নের সমাধান তো পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। তারপর বিজয়দীপ্ত চক্ষে রাজকুমারীর দিকে চাহিয়া দুইটি অঙ্গুলি ঊর্ধ্বে তুলিয়া বলিলেন—'দ্বন্দ্ব—দুই।'

রাজকুমারীর চক্ষে চকিত আনন্দ খেলিয়া গেল, তিনি রুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিলেন। চতুরিকা উত্তেজনা-বিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কি হল—ঠিক হয়েছে ?'

রাজকুমারী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বোধ করি নিজের উদ্‌গত হৃদয়বৃত্তি সংবরণ করিয়া লইলেন, তারপর ধীর স্বরে কহিলেন—'কুমার দ্বিতীয় প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়েছেন—দ্বন্দ্ব হয় দুই-এর মধ্যে।'

সভাকক্ষের ভিতর দিয়া উত্তেজনার একটা ঝড় বহিয়া গেল। সখীরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে কলকূজন করিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ 'স্‌স্‌' শব্দের শাসনে নীরব হইল। উত্তেজনায় মৃগশিরা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল ; বনজ্যোৎস্না ভূলুণ্ঠিত বীণাটার উপর পা চাপাইয়া দিয়া তাহার মর্মতন্তু হইতে যন্ত্রণার কাকুতি বাহির করিল ; বিদ্যুল্লতার নীবিবন্ধ খুলিয়া খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, হঠাৎ সেইদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় সে ব্যাকুলভাবে বস্ত্র সংবরণ করিয়া সকলের পিছনে লুকাইল। রাজকুমারী সকলের মধ্যে দাঁড়াইয়া নীহারশুভ্র উত্তরীয়টি ভাল করিয়া অঙ্গে জড়াইয়া লইলেন।

বুড়া মন্ত্রীর গায়েও বোধহয় উত্তেজনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল, তিনি দুই হস্ত সহর্ষে ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন—'ধন্য কুমার ! ধন্য কুমার। আপনি দু'টি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন। এবার শেষ প্রশ্ন। মাত্র একটি প্রশ্ন বাকি।'

এই সব উত্তেজনা উদ্দীপনার মধ্যে কালিদাস কিন্তু অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে একদিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন ; স্বর্ণদণ্ডের উপর পাখি দু'টি তাঁহার সকৌতুক মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। তাই রাজকুমারী যখন তৃতীয় প্রশ্ন উচ্চারণ করিলেন তাহা কালিদাসের কানে গেল কিনা সন্দেহ।

যিনি প্রশ্নের উত্তর দিবেন তাঁহার কোনো উৎকণ্ঠা নাই, কিন্তু রাজকুমারীর গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, বুকের ভিতর হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া ঠিক স্বাভাবিকভাবে চলিতেছিল না। কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করা চলিবে না। কুমার যদি শেষ প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন অথচ কুমারীর মনের পক্ষপাত প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে সে বড় লজ্জার কথা হইবে। তিনি যথাসম্ভব স্থির স্বরে কথা বলিলেন, তবু গলা একটু কাঁপিয়া গেল—'শেষ প্রশ্ন—পৃথিবীতে সবচেয়ে মিষ্ট কি ?'

যুবতিবৃন্দ যুগপৎ কালিদাসের পানে চক্ষু ফিরাইল।

কালিদাস ফিক্ করিয়া হাসিলেন। কিন্তু তাঁহার মুখে কথা নাই, চক্ষু শুক-মিথুনের উপর নিবদ্ধ। রাজকুমারী ঈষৎ বিস্ময়ে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন কালিদাস অন্য দিকে তাকাইয়া আছেন ; তাঁহার মুখে ক্ষণিক ক্ষোভের ছায়া পড়িল। পরক্ষণেই কালিদাস সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'ঐ দ্যাখো—ঐ দ্যাখো—'

সকলে একসঙ্গে তাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেত অনুসরণ করিয়া তাকাইলেন। ব্যাপার এমন কিছু গুরুতর নয়, দণ্ডের উপর বসিয়া শুক-দম্পতি অর্ধমুদিতনেত্রে পরস্পর চঞ্চুচুম্বন করিতেছে ; তাহাদের কণ্ঠ হইতে গদ্‌গদ কূজন নির্গত হইতেছে। যিনি ভবিষ্যকালে লিখিবেন—'মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ—' তিনি এই দেখিয়াই বিহ্বল আত্মবিস্মৃত।

রাজকুমারীর চক্ষে কিন্তু আনন্দের বিজলী খেলিয়া গেল ; তিনি কালিদাসের পানে সভ্রূভঙ্গ একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সলজ্জ রক্তিম মুখখানি নত করিয়া ফেলিলেন।

কালিদাস হাসিতে হাসিতে রাজকুমারীর দিকে ফিরিলেন, চমকিত হইয়া দেখিলেন তিনি ধীরে ধীরে নতজানু হইতেছেন। যুক্তকরে শির অবনমিত করিয়া কুমারী অর্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন—'আর্যপুত্র শেষ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়েছেন। পৃথিবীতে সবচেয়ে মিষ্ট—প্রণয়।'

ক্ষণকালের বিস্ময় বিমূঢ়তা কাটিয়া যেন শত ছিন্ন হইয়া গেল। সখীরা আর সম্ভ্রম শালীনতার শাসন মানিল না। চিৎকার হুড়াহুড়ি অঞ্চল-উত্তরীয়ের উৎক্ষেপে তাহাদের প্রমত্ত উল্লাস একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িল। রাজকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইতে চার পাঁচজন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে একসঙ্গে জড়াইয়া ধরিল। কয়েক জন মুঠি মুঠি লাজ লইয়া সকলের মাথার উপর বৃষ্টি করিতে লাগিল। একজন ঘন ঘন শঙ্খ বাজাইয়া তুমুল শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরস্পর হাত ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল ; অন্য কয়জন পরস্পর আঁচল টানিয়া, কবরী খুলিয়া দিয়া কপট কলহে হৃদয়াবেগ লাঘব করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মহামন্ত্রী কালিদাসের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—'ধন্য কুমার ! ধন্য আপনার কূটবুদ্ধি ! আমি মহারাজকে সুসংবাদ দিতে চললাম।' বলিয়া তিনি দ্রুতপদে সভা হইতে নিক্রান্ত হইয়া গেলেন।

বিস্রস্তকুন্তলা চতুরিকা বেদীর কিনারায় ঊর্ধ্বমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত নাড়িয়া উপরিস্থিত হাব্‌শী রক্ষীকে ইশারা করিতেছিল, মুখের কাছে সম্পুটিত করপল্লব যুক্ত করিয়া জানাইতেছিল—শিঙা বাজাও, বিষাণ বাজাও, নগরীতে সংবাদ দাও রাজকন্যা পতিবরণ করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে নগরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, রাজকন্যা পতিবরণ করিয়াছেন। নগরোদ্যানে আনন্দ-বিহ্বল নাগরিকেরা ছুটিয়া আসিয়া সমবেত হইল ; নৃত্যগীত আরম্ভ হইয়া গেল, যেন সকলের গৃহেই আজ পরমোৎসব।—

নগরোদ্যান বেষ্টনকারী পথের উপর দিয়া এক সুসজ্জিত হস্তী চলিয়াছে ; চারিদিকে বিপুল জনতা। হস্তীপৃষ্ঠে আসীন ঘোষক চিৎকার করিয়া দুই বাহু আস্ফালন করিয়া বোধ করি রাজকুমারীর স্বয়ংবর সংক্রান্ত কোনো রাজকীয় বার্তা ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু জনতার কলকোলাহলে কিছুই শোনা যাইতেছে না। ঘোষকের পশ্চাতে বসিয়া দ্বিতীয় এক পুরুষ মুঠি মুঠি স্বর্ণমুদ্রা চারিদিকে ছড়াইতেছে। নিম্নে সোনা কুড়াইবার হুড়াহুড়ি মারামারি।

ক্রমে রাত্রি হইল। রাজপুরীর পূজামন্দিরে অগ্নি সাক্ষী করিয়া কুমারী হৈমশ্রীর সহিত কালিদাসের বিবাহ হইল।

রাত্রি গভীর হইতেছে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, দীপান্বিতা নগরী। সৌধে সৌধে আলোকমালা ; গীতবাদ্যে, সুগন্ধি অগুরু-ধূমে বাতাস আমোদিত। সর্বাঙ্গে দীপালঙ্কার পরিয়া রাজপুরী

সখিপরিবৃতা প্রধানা নায়িকার ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাত্রি যত বাড়িতেছে উৎসাহ উত্তেজনা ততই মন্থর রসঘন হইয়া আসিতেছে, নায়ক নায়িকার নিভৃত মিলনের আর বিলম্ব নাই।

নগরীর এক মদিরাগৃহের সম্মুখে একদল মশালহস্ত উৎসবকারী সৌরাষ্ট্রের প্রকৃত যুবরাজকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল এবং প্রমত্ত রঙ্গ-কৌতুকের অঙ্কুশে বিঁধিয়া তাঁহাকে প্রায় পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। মকরবর্মা দীর্ঘ বনপথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া সবেমাত্র নগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ; অঙ্গের বসন ছিন্ন কর্দমাক্ত, জঠরে জ্বলন্ত ক্ষুধা—তাঁহার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে কেহই তাঁহাকে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ মকরবর্মা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে না।

মকরবর্মা উত্তপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—'আমি বলছি আমিই সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ।'

এক ব্যক্তি মুখে চট্‌কার শব্দ করিয়া বলিল—'তা তো অনেকক্ষণ থেকেই বলছ, আমরাও শুনে আসছি। কিন্তু তার প্রমাণ কই বাছাধন।'

মকরবর্মা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিলেন, উদ্ধত স্বরে কহিলেন—'প্রমাণ! প্রমাণ আবার কি? দেখতে পাচ্ছ না আমি যুবরাজ?' বলিয়া তিনি বুক ফুলাইয়া গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়াইলেন। সকলে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে একজন সান্ত্বনার স্বরে বলিল—'আচ্ছা আচ্ছা, তুমিই সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ।—কিন্তু যার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হল, সে তবে কে?'

যুবরাজ মকরবর্মা এবার একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন, ফেনায়িত মুখে চিৎকার করিলেন—'সে—সে একটা কাঠুরে। চোর—প্রবঞ্চক বাটপাড়! আমার কাপড় জামা জুতো ঘোড়া সব চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।'

আবার উচ্চহাস্যে তাঁহার কথা চাপা পড়িয়া গেল ; রাজকুমার নিষ্ফল ক্রোধে দন্ত কিড়িমিড়ি করিতে লাগিলেন। হাসি মন্দীভূত হইলে প্রথম ব্যক্তি মিটিমিটি চাহিয়া বলিল—'সত্যি কথা বলতে কি চাঁদবদন, তোমাদের মধ্যে কাঠুরে যদি কেউ থাকে সে তিনি নয়—তুমি। বলি, ক' ঘড়া তালের রস চড়িয়েছ?'

সকলে হাসিল। মকরবর্মা দেখিলেন এখানে কিছু হইবে না ; তিনি রূঢ় হস্তে ভিড় সরাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিলেন—'ছেড়ে দাও—সরে যাও। আমি দেখে নেব সেই চোর কাঠুরেটাকে—শূলে দেব। যাবে কোথায় সে! একবার তাকে দেখতে চাই।'

তাঁহার কণ্ঠস্বর জনতার বাহিরে মিলাইয়া গেল। প্রথম ব্যক্তি নীরস কণ্ঠে মন্তব্য করিল—'কী আর দেখবে যাদু। তিনি এতক্ষণে রাজকন্যেকে নিয়ে বাসর-শয্যায় শয়ন করেছেন।'

আবার হাসির লহর ছুটিল।

রাজভবনের উদ্যান-মধ্যে একটি সরোবর। সরোবরের স্থির দর্পণে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

বাঁধানো ঘাটের পাশে মর্মরবেদী ; তাহার উপর কালিদাস ও হৈমশ্রী পাশাপাশি বসিয়া আছেন। নব পরিণয়ের পীতসূত্র তাঁহাদের মণিবন্ধে জড়ানো রহিয়াছে। হৈমশ্রীর হাতে একটি ক্ষুদ্র রৌপ্যনির্মিত তীর—যাহা পরবর্তী কালে কাজললতায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

রাজকুমারী নতমুখে তীরটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন ; কালিদাস মুগ্ধ উন্মনাভাবে চাঁদের পানে চাহিয়া আছেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা নাই। তারপর কালিদাস একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'কী সুন্দর চাঁদ! ঠিক যেন—ঠিক যেন—' যে উপমাটি খুঁজিতেছিলেন তাহা পাইলেন না। হৈমশ্রী মুখখানি একটু তুলিয়া স্মিত সলজ্জ কণ্ঠে বলিলেন—'ঠিক যেন— ?'

কালিদাস ক্ষুব্ধভাবে মাথা নাড়িলেন—'জানি না। মনে আসছে মুখে আসছে না—'

রাজকুমারী একটু নিরাশ হইলেন ; নব অনুরাগের আকাঙ্ক্ষায় যে সুমিষ্ট উপমাটি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন কালিদাসের কণ্ঠে তাহা আসিল না।

এই সময় সহসা বিকট শব্দ শুনিয়া হৈমশ্রী চমকিয়া উঠিলেন।

শব্দটি আসিল প্রাসাদ বেষ্টনকারী প্রাচীরের পরপার হইতে। প্রাচীরের বাহিরে রাজপথ গিয়াছে, সেই পথ দিয়া এক শ্রেণী ভারবাহী উষ্ট্র চলিয়াছিল। একটি উষ্ট্র বোধ করি প্রাচীরের উপর হইতে গলা বাড়াইয়া অদূরে নবদম্পতিকে দেখিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল।

ভয় পাইয়া হৈমশ্রী কালিদাসের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। কালিদাস কৌতুক অনুভব করিয়া উচ্চ হাসিয়া উঠিলেন। রাজকুমারীর শিরীষ কোমল হস্তে একটু সস্নেহ চাপ দিয়া বলিলেন—'ভয় নেই রাজকুমারি, ও একটা উট—যাকে সাধুভাষায় বলে—উট্র।'

সাধুভাষা বলিয়া কালিদাস উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু হৈমশ্রীর মুখে সংশয়ের ছায়া পড়িল ; তিনি বিস্ফারিত নেত্রে কালিদাসের পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন—'কি—কি বললেন আর্যপুত্র !'

কালিদাস দেখিলেন ভুল হইয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি ভুল সংশোধন করিলেন—'না না—উট্র নয় উট্র নয়—উষ্ট।'

হৈমশ্রীর মুখ শুকাইয়া গেল ; শঙ্কিত সন্দেহে কালিদাসের পানে চাহিয়া থাকিয়া তিনি আপনার অবশে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'উট্র—উষ্ট—'

তারপর চকিতে তাঁহার মুখের মেঘ কাটিয়া গেল ; কালিদাস আজ প্রথম হইতে যে আচরণ করিয়াছেন তাহা মনে পড়িয়া গেল। তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'ও—আর্যপুত্র পরিহাস করছেন ! কী পরিহাস-প্রিয় আপনি !'

কালিদাসও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন না, কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তোরণের ঘটিকাগৃহে মধ্যরাত্রির প্রহর বাজিল। ক্ষণস্থায়ী রাগিণীর আলাপ বন্ধ হইলে কালিদাস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—'ও কি ?'

হৈমশ্রীর চোখে আবার বিস্ময়মিশ্র সন্দেহ দেখা দিল। রাজপুরীতে প্রহর বাজে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ তাহাও জানেন না। না, ইহাও পরিহাস !

তিনি বলিলেন—'মধ্যরাতের প্রহর বাজল।'

কালিদাস বলিলেন—'ওহো—বুঝেছি, রাত দুপুর হয়েছে। —এবার চল, ভেতরে যাই।'

তিনি অকুণ্ঠ সহজতায় হৈমশ্রীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। হৈমশ্রীর সংশয় আবার দূর হইল। এমন স্বচ্ছন্দ আভিজাত্য, এমন অনিন্দ্যকান্তি, রাজপুত্র নহিলে কি সম্ভব ?

দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া শয়নমন্দিরের দিকে চলিলেন।

ঠিক এই সময় প্রাসাদের এক বহিঃকক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের অভিনয় চলিতেছিল। বক্রী পাপগ্রহের ন্যায় সৌরাষ্ট্রের মকরবর্মা তির্যক গতিতে কুন্তলরাজের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

দীপোৎসব তখনো শেষ হয় নাই ; সেই দীপাবলীর আলোকে কক্ষের মধ্যস্থলে চারিটি ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিলেন—সৌরাষ্ট্রের মকরবর্মা, কুন্তলের বৃদ্ধ মহামন্ত্রী, পুস্তপাল মহাশয় এবং স্বয়ং কুন্তলরাজ। সৌরাষ্ট্র কুমারের বেশবাস পূর্ববৎ, তিনি সংহত ক্রোধে ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ; মহামন্ত্রীর মনের ভাব বুঝিবার উপায় নাই, পুস্তপাল মহাশয় যে ত্রস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন তাহা বুঝিতে কাহারও বেগ পাইতে হয় না। স্বয়ং কুন্তলরাজও বিলক্ষণ বিচলিত

হইয়াছেন ; তিনি গম্ভীর প্রকৃতির স্বল্পভাষী দৃঢ়শরীর পুরুষ. বয়স অনুমান পঞ্চাশ, মাথার চুল ও গুম্ফ পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার চোখের স্বাভাবিক শান্ত দৃষ্টি আকস্মিক বিপৎপাতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

পুস্তপালের প্রাণে ভয় ঢুকিয়াছে এই অনর্থের জন্য তাহাকেই দায়ী করা হইবে। তিনি করুণ স্বরে আপত্তি করিতেছেন—'কিন্তু মহারাজ, এ যে—এ যে একেবারেই অসম্ভব! এই লোকটা—মানে ইনি—এও কি সম্ভব!'

প্রতিবাদে মকরবর্মা একটি অন্তর্গূঢ় গর্জন ছাড়িলেন। ক্রমাগত চিৎকার করিয়া তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, শরীরও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তবু দক্ষিণহস্তের মুষ্টি পুস্তপালের নাসিকার অনতিদূরে স্থাপন করিয়া তিনি দন্ত খিঁচাইয়া বলিলেন—'সম্ভব! এই দ্যাখো সৌরাষ্ট্রের মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয়। সম্ভব!'

পুস্তপাল মহাশয় মুষ্টির সান্নিধ্য হইতে নাসিকা দ্রুত অপসারিত করিয়া দেখিলেন তর্জনীতে সত্যই একটি মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী রহিয়াছে। তিনি বার কয়েক চক্ষু মিটিমিটি করিয়া বলিলেন—'কিন্তু—কিন্তু—আপনি যদি সত্যিই—। আপনার সহচর ভৃত্য পরিজন কোথায়?'

মকরবর্মা বলিলেন—'বলছি না পরিজনদের পিছনে ফেলে আমি এগিয়ে আসছিলাম, তোমাদের জঙ্গলে একটা বাটপাড়—'

কুন্তলরাজ বাধা দিয়া বলিলেন—'দেখি অঙ্গুরীয়। সৌরাষ্ট্রের মুদ্রা আমি চিনতে পারব।'

মকরবর্মা অঙ্গুরীয় খুলিয়া রাজার হাতে দিলেন। রাজা লক্ষ্য করিলেন, তর্জনীর মূলে অঙ্গুরীয় পরিধানের চক্রচিহ্ন রহিয়াছে। এ ব্যক্তি যে অঙ্গুরীয় কুড়াইয়া পাইয়া বা চুরি করিয়া সদ্য অঙ্গুরীয় পরিধান করিয়াছে তাহা নয়। রাজা তখন মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয় উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া শেষে উহা প্রত্যর্পণ করিলেন, অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে গুম্ফের প্রান্ত টানিতে টানিতে অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—'হুঁ—মুদ্রা সৌরাষ্ট্রেরই বটে।'

মকরবর্মা অঙ্গুরীয় পুনশ্চ পরিধান করিতে করিতে চারিদিকে বিজয়দীপ্ত চক্ষু ঘুরাইতে লাগিলেন। পুস্তপাল মহাশয়ের মুখ কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিল। মহামন্ত্রী মৃদু গলা ঝাড়া দিলেন—'ইনি যদি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজই হন, তাহলেও এখন তো আর—'

কুন্তলরাজ বলিলেন—'কোনো উপায় নেই। সে-ব্যক্তি যেই হোক, অগ্নি সাক্ষী করে আমার কন্যাকে বিবাহ করেছে—'

মহামন্ত্রী জুড়িয়া দিলেন—'তাছাড়া রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞা ছিল, চণ্ডাল হোক, পামর হোক, যে-কেউ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে—'

সৌরাষ্ট্রকুমার বিস্ফোরকের ন্যায় ফাটিয়া পড়িলেন—'ভস্ম হোক প্রশ্ন আর তার উত্তর! কুন্তলরাজ, আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাই না। আমি চাই—বিচার। যে চোর আমার অশ্ব আর বস্ত্রাদি চুরি করেছে সে আপনার জামাতাই হোক, আর—'

মহামন্ত্রী মোলায়েম সুরে অনুরোধ করিলেন—'ধীরে কুমার, সংযম হারাবেন না।'

মকরবর্মা আরও চড়া সুরে বলিলেন—'আমি বিচার চাই। কুন্তলরাজ্যের সীমানার মধ্যে এই চুরি হয়েছে ; তস্করকে শূলে দেওয়া হোক। আর, তা যদি না হয়, সৌরাষ্ট্র দেশ নির্বীর্য নয় এ কথা স্মরণ রাখবেন।'

কুন্তলরাজ এই স্পর্ধিত উক্তি গলাধঃকরণ করিলেন ; ক্রোধে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইলেও এই ব্যক্তি যে সত্যই রাজপুত্র সে প্রত্যয়ও দৃঢ় হইল। তিনি কণ্ঠ সংযত করিয়া বলিলেন—'এ বিষয়ে পরিপূর্ণ অনুসন্ধান না করে কিছুই হতে পারে না। আপনার অভিযোগ যদি সত্য হয়—' রাজা মহামন্ত্রীর পানে ফিরিলেন।

চতুর মহামন্ত্রী রাজার প্রতি একটি গোপন কটাক্ষপাত করিয়া পরম আপ্যায়নের ভঙ্গিতে মকরবর্মার দিকে ফিরিলেন—'নিশ্চয় নিশ্চয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।—কিন্তু শ্রীমন্, আপনি আজ রাত্রিটা রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম করুন—রাত্রির মধ্যযাম অতীত হয়েছে—'

মহামন্ত্রী পুস্তপালের পেটে গোপনে কনুইয়ের এক গুঁতা মারিলেন। পুস্তপাল অমনি বলিয়া উঠিলেন—'হাঁ হাঁ, কুমার-ভট্টারক, আর কালক্ষয় করবেন না—সারাদিন অভুক্ত আছেন—পরিশ্রমও কম হয়নি—আসুন, কুমার, এই দিকে—এই যে বিশ্রান্তিগৃহ—'

ক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসাতুর যুবরাজের পক্ষে প্রলোভন প্রবল হইলেও তিনি সহজে নরম হইবার পাত্র নয়।. তিনি বলিলেন—'আমি বিচার চাই, ন্যায়দণ্ড চাই—নইলে—'

মহামন্ত্রী তাড়াতাড়ি বলিলেন—'অবশ্য—অবশ্য। সে তো আছেই। উপস্থিত আপনার বস্ত্রাদি ত্যাগ করা প্রয়োজন—'

পুস্তপাল সাগ্রহে বলিলেন—'ওদিকে ময়ূর মাংস পিণ্ডক্ষীর মাহিষ-দধি, মাধ্বী দ্রাক্ষাসব—সমস্তই প্রস্তুত রয়েছে। আসুন, আর বিলম্ব করবেন না—'

মহামন্ত্রী বলিলেন—'চলুন চলুন—অশুভস্য কালহরণম্—'

সৌরাষ্ট্রকুমার তথাপি বলিলেন—'কিন্তু যদি প্রতিবিধান না পাই—'

তিনি আর লোভ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না, মহামন্ত্রী ও পুস্তপালের সাদর আহ্বানের অনুবর্তী হইয়া বিশ্রান্তিগৃহের অভিমুখে চলিলেন। কুন্তলরাজ একাকী দাঁড়াইয়া উদ্বিগ্ন মুখে গুম্ফের প্রান্ত টানিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে কালিদাস ও হৈমশ্রী শয়নকক্ষে উপনীত হইয়াছেন। সখী কিঙ্করীরাও বিদায় লইয়াছে। আড়ি পাতিয়া বর-বধূকে বিরক্ত করিবার বিধি যদিচ সেকালেও ছিল, কিন্তু আজিকার দিনব্যাপী মাতামাতির পর সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাছাড়া আজ বসন্তোৎসবের রাত্রে নিজস্ব মিলনোৎকণ্ঠাও কম ছিল না।

নির্জন সুবৃহৎ শয়নকক্ষটি ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন ; যূথী ও মল্লী মিলিয়া পালঙ্কের শুভ্র আস্তরণ রচনা করিয়াছে। পালঙ্কের চারিকোণে দীপদণ্ডের মাথায় সুরভি বর্তিকা জ্বলিতেছে।

প্রাচীরগাত্রে হরপার্বতী রামজানকী প্রভৃতি আদর্শ দম্পতির মিথুন চিত্র। প্রাচীরের একটি অংশ বস্ত্র দ্বারা আবৃত, বস্ত্রের উপর রাজহংসের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে ; হংসের চঞ্চুতে সনাল পদ্মকোরক।

রাজকুমারী কালিদাসকে লইয়া যবনিকার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, কালিদাসের দিকে মৃদু হাসিয়া যবনিকা সরাইয়া দিলেন। দেখা গেল, প্রাচীরগাত্রে একটি কুলঙ্গি রহিয়াছে ; কুলঙ্গির থাকে থাকে অগণিত পুঁথি থরে থরে সাজানো।

কালিদাসের চক্ষু মুগ্ধ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। পুঁথির প্রতি এই গ্রামীণ যুবকের অহেতুক আকর্ষণ ছিল ; তিনি একবার রাজকুমারীর দিকে, একবার পুঁথিগুলির দিকে হর্ষোৎফুল্ল দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তারপর সন্তর্পণে একখানি পুঁথি হস্তে তুলিয়া পরম স্নেহ ও শ্রদ্ধাভরে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

পুঁথির মলপট্টের লিখন কালিদাস পড়িতে পারিলেন কিনা তিনিই জানেন ; মলপট্টের উপর বিশদ অক্ষরে লেখা ছিল—

মৃচ্ছকটিকম্

কালিদাস গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—'কত পুঁথি ! তুমি সব পড়েছ ?'

হৈমশ্রী গ্রীবা ঈষৎ হেলাইয়া সায় দিলেন। কালিদাসের মুখ একটু ম্লান হইল। তিনি হাতের

পুঁথিটির প্রতি বিষণ্ণভাবে চাহিয়া সেটি আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'আমি একটিও পড়িনি। যদি পড়তে পারতাম, আজকের চাঁদ কিসের মত সুন্দর নিশ্চয় বলতে পারতাম।'

আবার কুমারী হৈমশ্রীর মুখ শুকাইল। তিনি স্খলিতস্বরে বলিলেন—'কিন্তু—না না, পরিহাস করবেন না আর্যপুত্র! আপনি সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ— !'

কালিদাসের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিল—'কিন্তু আমি তো রাজপুত্তুর নই!'

হৈমশ্রীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—'রাজপুত্র নয়! তবে—কে আপনি?'

কালিদাস বলিলেন—'আমি কালিদাস।—বনের মধ্যে কাঠ কাটছিলাম, এমন সময়—'

হৈমশ্রী বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বলিলেন—'কাঠ কাটছিলেন! কাঠুরে! তুমি তবে সত্যিই বর্ণপরিচয়হীন মূর্খ?'

সরলভাবে কালিদাস ঘাড় নাড়িলেন—'হ্যাঁ, আমি লেখাপড়া জানি না।—যখনই কোনো সুন্দর জিনিস দেখি, ইচ্ছে করে তার বাখান করি। কিন্তু পারি না।'

রাজকন্যা আর শুনিলেন না; উর্ধ্বে মুখ তুলিয়া দুই চক্ষু সজোরে মুদিত করিয়া যেন একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নকে মনশ্চক্ষুর সম্মুখ হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। তারপর টলিতে টলিতে পালঙ্কের পাশে গিয়া নতজানু হইয়া শয্যার পুষ্পাস্তরণের মধ্যে মুখ গুঁজিলেন। প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাঁহার দেহের উর্ধ্বাঙ্গ মথিত হইয়া উঠিল।

কালিদাস কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, তারপর সসংকোচ পদক্ষেপে রাজকন্যার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজকন্যা জানিতে পারিলেন কালিদাস পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তিনি মুখ তুলিয়া তীব্রস্বরে প্রশ্ন করিলেন—'রাজপুত্র সেজে তুমি এখানে কি করে এলে?'

হৈমশ্রীর স্ফুরিতাধর মুখ দেখিয়া কালিদাস শঙ্কা ভুলিয়া গেলেন। ক্রোধেও মুখখানি কী সুন্দর—ঠিক যেন—ঠিক যেন—। তিনি ক্রোধ দেখিতে পাইলেন না, সৌন্দর্যই দেখিলেন। উপরন্তু ভারি মজার কাহিনীটা রাজকুমারীকে শুনাইতে হইবে। কালিদাসের মুখে হাসি ফুটিল, তিনি শয্যাপার্শে বসিয়া সহাস্যে বলিলেন—'সে ভারি মজার কথা। শুনবে? তবে বলি শোন—'

তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন। আখ্যানবস্তু আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট, সুতরাং শুনিবার প্রয়োজন নাই।

ওদিকে রাজপ্রাসাদের বিশ্রান্তিগৃহে যুবরাজ মকরবর্মা এক খট্টার উপর পৃষ্ঠে বহু উপাধান দিয়া অর্ধশয়ানভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সবেমাত্র বিপুল পান ভোজন শেষ করিয়াছেন, তাঁহার চক্ষু মুদিত হইয়া আসিতেছে, ঘুমাইয়া পড়িতে বেশি বিলম্ব নাই। একটি কিঙ্করী শিয়রে দাঁড়াইয়া তাঁহার মস্তকে বীজন করিতেছে।

পুস্তপাল মহাশয় স্ফটিকপাত্রে দ্রাক্ষাসব ভরিয়া মকরবর্মার সম্মুখে ধরিলেন। মকরবর্মা এক চুমুকে পাত্র নিঃশেষ করিয়া পাত্রটি দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং জড়িতস্বরে বলিলেন—'বিচার! জামাতাই হোক আর বিমাতাই হোক—শূলে দেওয়া চাই। নচেৎ—'

তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার নাসিকা হঠাৎ ঘর্ঘর শব্দ করিয়া উঠিল।

পুস্তপাল কিঙ্করীকে ইঙ্গিতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া জানাইলেন—আরো জোরে পাখা চালাও। তারপর কতক নিশ্চিন্ত হইয়া নিঃশব্দে বিড়ালগতিতে দ্বারের পানে চলিলেন। দ্বারের ঠিক বাহিরেই কুন্তলরাজ ও মহামন্ত্রী উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, পুস্তপালের দিকে ভ্রূ তুলিয়া

যুগপৎ প্রশ্ন করিলেন। পুস্তপালও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা নিঃশব্দে বুঝাইয়া দিলেন যে যুবরাজ নিদ্রিত।

তিনজনে একত্র হইলে মৃদুস্বরে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। কুন্তলরাজ বলিলেন—'আজ রাত্রির মত নিশ্চিন্ত। কিন্তু—তারপর ?'

মহামন্ত্রী ভ্রূবদ্ধ ললাটে বলিলেন—'উভয় সঙ্কট। এক, রাজজামাতাকে শূলে দিতে হয়—নচেৎ—'

কুন্তলরাজ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'নচেৎ সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ।'

তিনজন পরস্পর চাহিয়া ঘাড় নাড়িলেন। মহামন্ত্রী বলিলেন—'যদি যুদ্ধ হয়, সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় আমাদের কোনো আশা নেই—'

রাজা বলিলেন—'অর্থাৎ রাজ্য ছারখার হবে।'

তিনজনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিলেন। সহসা ঘরের ভিতর হইতে যুবরাজ মকরবর্মার কণ্ঠস্বর আসিল। তিনি নিদ্রাবশে বিকৃতকণ্ঠে বলিতেছেন—'প্রতিশোধ—শূল—'

পুস্তপাল গলা বাড়াইয়া দেখিলেন ; যুবরাজ ঘুমন্ত পাশ ফিরিতেছেন ; পুস্তপাল কিঙ্করীকে জোরে পাখা চালাইবার ইশারা করিলেন। যুবরাজের গলার মধ্যে বাকি কথাগুলা অস্পষ্ট রহিয়া গেল—'চোরের দণ্ড—শূলদণ্ড !'

কুন্তলরাজ এতক্ষণে লৌহবলে নিজেকে সংযত রাখিয়াছিলেন, এইবার তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন, উদ্‌গত বাষ্পোচ্ছ্বাস কণ্ঠে রোধ করিয়া বলিলেন—'আমার কন্যা—' তাঁহার দুই চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া উঠিল।

মহামন্ত্রী ও পুস্তপাল অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। মহামন্ত্রীর মুখ দুরূহদ্রুত চিন্তায় ভ্রূকুটিকুটিল হইয়া উঠিল। একটা কিছু উপায় বাহির করিতেই হইবে—করিতেই হইবে—

সহসা তিনি রাজার দিকে ফিরিলেন, তাঁহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া রাজা ও পুস্তপাল সাগ্রহে আরো কাছাকাছি হইয়া দাঁড়াইলেন। মহামন্ত্রী বলিলেন—'রাজজামাতার প্রাণরক্ষার এক উপায় আছে—' তিনি সচকিতে বিশ্রান্তিগৃহের দিকে তাকাইলেন, গলা আরো খাটো করিয়া বলিলেন—'আজ রাত্রেই তাঁকে চুপিচুপি রাজ্য থেকে—' বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি এমনভাবে বাম হস্ত সঞ্চালন করিলেন যাহা হইতে বোঝা যায় যে তিনি রাজজামাতাকে বহু দূরে প্রেরণ করিতে চান। রাজা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিলেন, শেষে অস্ফুটস্বরে বলিলেন—'কিন্তু—বিবাহের রাত্রেই আমার কন্যা—'

মহামন্ত্রী দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'অন্তত রাজদুহিতা বিধবা তো হবেন না।'

উভয়ে কিছুক্ষণ পূর্ণদৃষ্টিতে পরস্পর চাহিয়া রহিলেন ; তারপর রাজা ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িলেন।

ওদিকে শয়নমন্দিরে কালিদাস গল্প বলা শেষ করিতেছেন। রাজকুমারী শয্যাপাশে তেমনি নতজানু হইয়া আছেন ; ক্ষোভে হতাশায় তাঁহার বক্ষে যে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতেছে তাহা কালিদাস দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে কাহিনী শেষ করিলেন—'তারপর এখানে সকলে আমাকে সৌরাষ্ট্রের যুবরাজ বলে ভুল করল—ভারি মজা হল—না ?'

রাজকুমারী বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—'মজা ! হা অদৃষ্ট, আমার ললাটে বিধি এই লিখেছিলেন ! একটা কাঠুরের সঙ্গে—তাতেও ক্ষতি ছিল না,—কিন্তু তুমি মূর্খ—মূর্খ ! পৃথিবীতে যা আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি তুমি তাই—'

রাজকুমারী আবার শয্যায় মুখ লুকাইলেন।

হাস্যরত বালকের গণ্ডে অকস্মাৎ চপেটাঘাত করিলে তাহার মুখভাব যেরূপ হয় কালিদাসেরও সেইরূপ হইল। কোথায় কিভাবে তিনি কোন্ অপরাধ করিয়াছেন কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। রাজকন্যার স্কন্ধ ও অংস ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে; কালিদাস ব্যথিত স্বরে বলিলেন -'রাজকুমারি, তুমি আমার ওপর রাগ করলে ? কিন্তু আমি তো কোনো দোষ করিনি। রাজকুমারি—'

তিনি সংকোচভরে কুমারীর স্কন্ধ স্পর্শ করিলেন। সেই স্পর্শে কুপিতা সর্পীর মত রাজকুমারী তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—'ছুঁয়ো না ! কোন্ স্পর্ধায় তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ কর ? মূর্খ নিরক্ষর গ্রামীণ !—'

প্রত্যেকটি শব্দ নিষ্ঠুর কশাঘাতের ন্যায় কালিদাসের মুখে পড়িল। এই সময় দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া রাজকন্যা জ্বলন্ত চক্ষু সেইদিকে ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—'ওঃ ! পিতা !'

বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে রাজা আসিতেছিলেন, কুমারী ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িলেন, জানু আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—'রাজাধিরাজ, আমাকে রক্ষা করুন, এই গ্রামীণের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করুন—'

রাজা বুঝিলেন হৈমশ্রী সত্য কথা জানিতে পারিয়াছেন, তিনি কন্যার মস্তকে হস্ত রাখিয়া কঠোর চক্ষে কালিদাসের পানে চাহিলেন—'এদিকে এস।'

কালিদাস কুণ্ঠিত পদে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বলিলেন—'তুমি শঠতা দ্বারা কুমারীর পাণিগ্রহণ করেছ ?'

কালিদাস বিমূঢ়ভাবে বলিলেন—'শঠতা !'

রাজার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ মিশিল—'প্রিয়দর্শন বালক, তোমার এ দুর্বুদ্ধি কেন হল ? তুমি চুরি করলে কেন ?'

পাণ্ডুর মুখে কালিদাস বলিলেন—'চুরি ! কিন্তু আমি তো চুরি করিনি—'

কুন্তলরাজ বলিলেন—'করেছ। শুধু তাই নয়, আমার রাজ্যের সর্বনাশ করতে বসেছ। কিন্তু সে তুমি বুঝবে না।' কন্যার দিকে হেঁট হইয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন—'কন্যা, অধীর হয়ো না। তুমি রাজদুহিতা, বিদুষী ; ধৈর্য হারিও না।' কন্যাকে ছাড়িয়া রাজা কালিদাসকে সংক্ষিপ্ত আদেশ করিলেন—'এস আমার সঙ্গে।'

রাজা ফিরিয়া চলিলেন। কালিদাস তন্দ্রাচ্ছন্নের মত তাঁহার অনুবর্তী হইলেন। দ্বার পর্যন্ত গিয়া কালিদাস একবার ফিরিয়া চাহিলেন ; কুমারী হৈমশ্রী তেমনি নতজানু হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার ক্ষোভ-বিধ্বস্ত মুখখানি বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছে।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, আকাশে পূর্ণচন্দ্র নীচাভিমুখী। নগর তোরণের দীপগুলি কতক নিভিয়া গিয়াছে, কতক নিব-নিব। নগরীর শব্দগুঞ্জন শান্ত হইয়াছে।

তিনটি অশ্ব পাশাপাশি তোরণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। দুই পার্শ্বের দুটি অশ্বের পৃষ্ঠে দুইজন রক্ষী, মধ্যে কালিদাস। প্রধান রক্ষী মস্তক সঞ্চালন দ্বারা ইঙ্গিত করিল ; তিনটি অশ্ব একসঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের গতি নগর হইতে বাহিরের দিকে।—

নিবিড় বনের উপান্ত। অশোকস্তম্ভের ন্যায় একটি স্তম্ভ নির্জনে দাঁড়াইয়া কুন্তলরাজ্যের সীমানা নির্দেশ করিতেছে। অস্তমান চন্দ্রের দূরপ্রসারী ছায়া ভূমির উপর সুকৃষ্ণ সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে।

তিনটি অশ্ব স্তম্ভের ছায়ারেখার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রধান রক্ষী নিঃশব্দে কালিদাসকে অশ্ব হইতে নামিবার ইঙ্গিত করিল ; কালিদাস নামিলেন। প্রধান রক্ষী তখন সম্মুখের বনানীর

দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—'যাও, আর কখনো কুন্তলরাজ্যে পদার্পণ কোরো না। স্মরণ রেখো এ রাজ্যে প্রবেশ করলেই তোমার শূলদণ্ড—'

কালিদাস বাক্ নিষ্পত্তি করিলেন না, স্খলিত পদে বনের দিকে চলিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল রক্ষীরা স্থিরভাবে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া রহিল। তারপর ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া, শূন্য-পৃষ্ঠ অশ্বটিকে মধ্যে লইয়া যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া চলিল।

প্রভাত হইয়াছে। বনের পাতায় পাতায় সোনালী সূর্যকিরণ লাগিয়াছে, মাকড়শার জালে শিশিরবিন্দু এখনো শুকায় নাই ; পাখির কাকলি ও বানরের কিচিমিচিতে বনস্থলী পূর্ণ।

একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ। তাহার স্থূল মূলগুলি স্থানে স্থানে মাটির গোপনতা ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে ; এইরূপ একটি মূলের উপর মাথা রাখিয়া কালিদাস ঘুমাইতেছেন। তাঁহার শয়নের ভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়, রাত্রির অন্ধকারে যেখানে হোঁচট খাইয়া পড়িয়াছিলেন সেখানেই নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন।

একটি বানরশিশু এই সময় এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে কালিদাসের কোল ঘেঁষিয়া বসিল এবং একটি বৃক্ষচ্যুত ফল তুলিয়া লইয়া পরম যত্নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঘুমন্ত কালিদাসের অঙ্গে উষ্ণ স্পর্শ লাগিতেই তিনি একটি হাত দিয়া বানরশিশুটিকে জড়াইয়া লইলেন। বানরশিশু এই আলিঙ্গনের জন্য প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ ভয় পাইয়া কালিদাসের হাতে এক কামড় দিয়া দ্রুত পলায়ন করিল। কালিদাসের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

এক হাতে ভর দিয়া কালিদাস ক্লান্তভাবে উঠিয়া বসিলেন। বেশবাস ছিন্ন, অঙ্গ ধূলিমলিন ; চোখের কোলে ও গণ্ডে অশ্রুর চিহ্ন শুকাইয়া আছে। তিনি চক্ষু মার্জনা করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া শ্লথচরণে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

বন শেষ হইয়া শুষ্ক মরুভূমি। দ্বিপ্রহরে কালিদাস এই মরুভূমির ভিতর দিয়া চলিয়াছেন। বালুকণা উড়িয়া আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে ; এই তপ্ত বালুঝটিকা উপেক্ষা করিয়া দিগ্‌ভ্রান্তের মত কালিদাস যাইতেছেন, তাঁহার চোখে মুখে এক দুর্লভ দুরাকাঙ্ক্ষা জ্বলিতেছে।

বালু-কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়া একটি ভগ্ন দেবায়তনের উচ্চ বহিঃপ্রাচীর দেখা গেল। কালিদাস সেই দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন ; প্রাচীরের নিকটবর্তী হইয়া তিনি একটি প্রস্তরখণ্ডে পা লাগিয়া পড়িয়া গেলেন।

প্রাচীর ধরিয়া কোনো ক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ক্ষণকাল ক্লান্তিভরে চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন। তারপর চোখ খুলিয়া দেখিলেন তিনি প্রাচীরের যে-স্থানে বাহুর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন উহা একটি বিরাট মূর্তির উরুস্থল। কালিদাস উর্ধ্বে চাহিলেন ; প্রাচীরের খোদিত বিশাল শঙ্কর-মূর্তি যেন এই বহ্নি শ্মশানে তপস্যারত। কালিদাস নতজানু হইয়া মূর্তির পদমূলে মাথা রাখিলেন, তারপর গলদশ্রু চক্ষু দেবতার মুখের পানে তুলিয়া ব্যাকুল প্রার্থনা করিলেন—'দেবতা, বিদ্যা দাও।'—

সূর্যাস্ত হইতেছে। দিগন্তহীন প্রান্তরে একাকী দাঁড়াইয়া কালিদাস যুক্তকরে বলিতেছেন—'সূর্যদেব, তুমি জগতের অন্ধকার দূর কর, আমার মনের অন্ধকার দূর করে দাও। বিদ্যা দাও।'

উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির। কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত মন্দির আকাশে চূড়া তুলিয়াছে ; চূড়ার

স্বর্ণত্রিশূল দিনান্তের অস্তরাগ অঙ্গে মাখিয়া জ্বলিতেছে। সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা ঘোর রবে বাজিতেছে। মন্দিরের বহিরঙ্গনে লোকারণ্য, স্ত্রী পুরুষ সকলে জোড়হস্তে তদ্‌গত-মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আরতি শেষ হইলে সকলে অঙ্গনে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। অঙ্গনের এক কোণে এক বৃদ্ধ প্রণাম শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যুক্তকরে মন্দিরের পানে চাহিয়া প্রার্থনা করিল—'মহাকাল, আয়ু দাও।'

অনতিদূরে একটি নারী নতজানু অবস্থায় মন্দির উদ্দেশ করিয়া বলিল—'মহাকাল, পুত্র দাও।'

বর্মশিরস্ত্রাণধারী এক যোদ্ধা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'মহাকাল, বিজয় দাও।'

বিনত ভুবনবিজয়ীনয়না একটি নবযুবতী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল—'মহাকাল, মনোমত পতি দাও।'

দীনবেশী শীর্ণমুখ কালিদাস অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—'মহাকাল, বিদ্যা দাও।'

পাতা-ঝরা একটি অরণ্য। নিষ্পত্র বৃক্ষ-শাখাগুলি আকাশে জাল রচনা করিয়াছে। নির্বিঘ্ন আলোক বনতলের কুণ্ঠিত লজ্জা হরণ করিয়া ভূ-লুণ্ঠিত শুষ্ক পল্লবের মধ্যে সকৌতুক ক্রীড়া করিতেছে।

একটি আট-নয় বছরের গৌরাঙ্গী বালিকা এই বনভূমির উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে গান গাহিয়া চলিয়াছে। তাহার পরিধানে শুভ্র বস্ত্র ও উত্তরীয়, কণ্ঠে কুন্তলে বাহুতে শ্বেত পুষ্পের আভরণ। বালিকা থাকিয়া থাকিয়া বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া পিছনে তাকাইতেছে, আবার গাহিতে গাহিতে আগে চলিয়াছে—

'নীল সরসীজলে সিত কমলদলে
আমি নাচিয়া ফিরি আমি গাহিয়া ফিরি।'

লাস্যচপল চরণে বালিকা দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া গেল ; তাহার গানের ধ্বনিও ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল।

কালিদাস মোহগ্রস্তের ন্যায় বালিকার সঙ্গীতধ্বনি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মুখ বিশীর্ণ, চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট। এক দুরন্ত উৎকণ্ঠা তাঁহাকে ওই অশরীরী সঙ্গীতের পিছনে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

বনের অন্য অংশে বালিকা গাহিতে গাহিতে যাইতেছে—

'হিম-তুষার-গলা আমি নির্ঝরিণী
মোর নূপুর বাজে রুম্‌ রিন্‌কি ঝিনি
আমি নাচিয়া ফিরি আমি গাহিয়া ফিরি।'

উপলবঙ্কিম গতি একটি সঙ্কীর্ণ জলধারা লঙ্ঘন করিয়া বালিকা নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।

গানের রেশ মিলাইয়া যাইবার আগেই কালিদাস প্রবেশ করিলেন, ব্যগ্রচক্ষে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে তিনি অগ্রসর হইতেছেন। কোথায় গেল সেই সঙ্গীতময়ী ! জলধারার তীরে দাঁড়াইয়া তিনি ক্ষণেক উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, তারপর স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া আবার চলিলেন।

দূরে একটি শ্বেতকমলপূর্ণ সরোবর। বালিকা সেইদিকে চলিয়াছে, তাহার কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত কাকলি চারিদিকে হিল্লোল তুলিয়াছে—

'যেথা মরাল চাহে—ফিরি ফিরি
যেথা কপোত গাহে—ধীরি ধীরি
তীরে বন নিরজনে

আমি নাচিয়া ফিরি আমি গাহিয়া ফিরি !'

বালিকা দূরে চলিয়া গেল, কালিদাস তাহাকে দেখিতে পাইয়া উন্মাদের মত তাহার পশ্চাতে চলিয়াছেন। বালিকা সরোবরের ঘাটে দাঁড়াইয়া একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল, তারপর মৃদু হাসিয়া সোপান অবতরণ করিতে লাগিল।

কালিদাস যখন ঘাটে পৌঁছিলেন তখন বালিকা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ঘাটের সম্মুখে জলের উপর একদল কমল বায়ুভরে হেলিতেছে দুলিতেছে, যেন বালিকা এইমাত্র জলে ডুব দিয়া ওইখানে অন্তর্হিত হইয়াছে। ঘাটের নিম্নতন সোপানে নামিয়া কালিদাস পাগলের মত জলের পানে চাহিলেন ; বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। চঞ্চল পদ্মগুলির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন—'কোথায় গেলে ? দেবি, তুমি কোথায় গেলে ?—শুনেছি তুমি পদ্মবনে থাক। আমাকে দয়া কর—বিদ্যা দাও—নইলে—'

তিনি মূর্ছিত হইয়া ঘাটের উপর পড়িয়া গেলেন।

মূর্ছিত অবস্থায় তিনি অনুভব করিলেন, সরসীর স্বচ্ছ জলতলে তিনি শুইয়া আছেন ; দিক-আলো-করা এক পূর্ণযৌবনবতী দেবীমূর্তি শুচিস্মিত হাস্যে তাঁহার শিয়রে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—'কালিদাস !'

কালিদাসের ভাবাতুর নেত্র নিমীলিত, তিনি যুক্তকরে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—'মা !'

দেবী বলিলেন—'তুমি আমার বরপুত্র, তোমার কাব্য জগতে অমর হয়ে থাকবে। বারাণসী যাও, সেখানে আচার্য পাবে। ওঠ বৎস।'

হর্ষোৎফুল্ল মুখে কালিদাস উঠিবার চেষ্টা করিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—'মা মা মা— !'

দেবী অবনত হইয়া কালিদাসের শিরশ্চুম্বন করিলেন, তারপর অপূর্ব জ্যোতিরুৎসবের মধ্যে দেবীমূর্তি মিলাইয়া গেল।

ন্যূনাধিক পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে।

কুন্তল রাজপুরীর অন্তঃপুরে রাজকুমারী হৈমশ্রী নিজ শয়নকক্ষে ভূমির উপর অজিনাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে কাষ্ঠাসনের উপর একটি উন্মুক্ত পুঁথি, রাজকুমারী তন্ময় হইয়া পুঁথি পড়িতেছেন।

পাঁচ বৎসরে হৈমশ্রীর দেহলাবণ্যের অতি অল্পই পরিবর্তন হইয়াছে। তাঁহার দেহে সূক্ষ্ম শুভ্র কার্পাসবস্ত্র, কেশ একটিমাত্র বেণীতে আবদ্ধ, ললাটে আয়তির চিহ্ন কেবল একটি কুমকুমের টিপ—অলঙ্কার নাই বলিলেও চলে। চুলের ঈষৎ রুক্ষতায়, চোখের কোলে ছায়ার নিবিড়তায়, দেহের অল্প কৃশতায় তাঁহার রূপ বাহুল্য বর্জন করিয়া নিষ্কলুষ হইয়া উঠিয়াছে—বর্ষার অন্তে স্বচ্ছসলিলা শরতের স্রোতস্বিনীর মত।

পুঁথি পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে প্রবল ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি কম্পিত কণ্ঠে কাব্যের শেষ পংক্তি আবৃত্তি করিলেন—

'মাভূদ্ এবং ক্ষণমপি চতে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥'

গবাক্ষপথে বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিলেন। মলপট্টের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

মেঘদূতম্

শ্রীকালিদাস বিরচিতম্

পুঁথির উপর হাত রাখিয়া রাজকুমারী উন্মনা হইয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষু পুঁথির উপর ফিরিয়া আসিল। কালিদাসের নামের উপর ললাট স্পর্শ করিয়া তিনি প্রণাম করিলেন—'ধন্য কবি।'

নামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মুখের ভাব আবার উন্মনা হইল, তিনি অর্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন—'কালিদাস! কে তিনি?—' তাঁহার অধর কাঁপিয়া উঠিল, তিনি বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িলেন—'না না...সে তো মূর্খ ছিল—'

অঞ্চলে চোখ মুছিয়া দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইতেই চোখে পড়িল, দ্বারের চৌকাঠ ধরিয়া বিষাদ গম্ভীর মুখে রাজা দাঁড়াইয়া আছেন। তাড়াতাড়ি মুখে হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া হৈমশ্রী বলিয়া উঠিলেন—'পিতা!—আসুন আর্য।'

রাজা কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হৈমশ্রী আসন ছাড়িয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই রাজা হাত তুলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন—'বোসো বোসো বৎসে।'

রাজা আসিয়া দ্বিতীয় একটি আসনে বসিলেন, স্নিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করিলেন—'কি পড়ছিলে?'

হৈমশ্রী ঈষৎ লজ্জিতভাবে পুঁথিটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন—'কিছু নয় পিতা—একটি নতুন কাব্য—মেঘদূত।'

রাজা প্রীতভাবে ঘাড় নাড়িলেন। সেকালে পিতাপুত্রীতে কাব্য আলোচনা, এমন কি আদিরস ঘটিত কাব্যের আলোচনা দূষণীয় বিবেচিত হইত না; আদিরসের প্রতি তাঁহাদের সম্ভ্রম ছিল।

কুন্তলরাজ বলিলেন—'মেঘদূত—বিরহী যক্ষ ও বিরহিণী যক্ষপত্নী! আমি পড়েছি—সুন্দর কাব্য।'

হৈমশ্রী পিতার দিকে উদ্দীপ্ত চক্ষু তুলিলেন। যে কাব্য পড়িয়া তাঁহার মন আষাঢ়ের মেঘের মতই দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে তাহার এইটুকু প্রশংসা তাঁহার মনঃপূত হইল না; তিনি বলিলেন—'সুন্দর কাব্য কী বলছেন পিতা—অপূর্ব। ভাষায় এর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আমি বারবার পড়েছি, তবু আবার পড়তে ইচ্ছে করে।'

কুন্তলরাজ কন্যার উৎসাহ দেখিয়া সানন্দে ঘাড় নাড়িলেন, বলিলেন—'সত্যই অপূর্ব। কাব্য জগতে এক অপূর্ব সৃষ্টি।—তুমি যে কাব্যশাস্ত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছ এতে আমার মনে একটু শান্তি হচ্ছে।'

রাজা কন্যার মুখের পানে চাহিলেন; হৈমশ্রীর চোখের দীপ্তি নিভিয়া গেল, তিনি মুখ নত করিলেন। রাজা একটি নিশ্বাস মোচন করিয়া নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—'পাঁচ বছর হয়ে গেল...সেই রাত্রে চুপি চুপি তাকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলাম, তারপর আর কিছুই জানি না। গোপনে গোপনে কত খোঁজ করিয়েছি—'

হৈমশ্রী মুখ তুলিলেন কিন্তু পিতার দিকে না চাহিয়া ধীরস্বরে বলিলেন—'প্রয়োজন কি পিতা! আমি তো বেশ আছি, ভালই আছি—'

রাজা বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িলেন—'না বৎসে। ভালই যদি থাকবে তবে মাঝে মাঝে তোমার চোখে জল দেখি কেন। তুমি এখনো তাকে ভুলতে পারনি। এই তো এখনি—'

হৈমশ্রী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—'ও কিছু নয় পিতা। কাব্য পড়তে পড়তে—'

কুন্তলরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন—'মা, আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা কোরো না, তুমি এখনো তাকে ভুলতে পারনি। আমিও পারিনি।—কি জানি কী ছিল তার সেই সরল সুকুমার মুখে!

যদি কোথাও তাকে পাই, ফিরিয়ে নিয়ে আসি।'

হৈমশ্রী সহসা পুঁথির উপর মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া উঠিলেন, রুদ্ধস্বরে বলিলেন—'না না পিতা. সে মূর্খ—নিরক্ষর—'

রাজা বুঝিলেন কন্যার হৃদয়ে প্রেম ও অভিমানে কঠিন দ্বন্দ্ব চলিতেছে। তিনি শান্তস্বরে বলিলেন—'সে তোমার স্বামী।'

শিপ্রা নদীর মাঝখান দিয়া একটি মধ্যমাকৃতি মহাজনী নৌকা পালের ভরে তরতর করিয়া চলিয়াছে। পাশে শিপ্রার তীরে মালব রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী মহানগরী তাহার অসংখ্য ঘাট মন্দির সৌধ লইয়া দ্বিপ্রহরের প্রদীপ্ত আলোকে জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে। নগরীর সীমান্তে শষ্প-হরিৎ প্রান্তর : মাঝে মাঝে দুই একটি কুটির, জলের কিনারায় সৈকতলীন হংসমিথুন—

নৌকার পিছনে বসিয়া মাঝি গান ধরিয়াছে। নৌকার ছাদে পালের ছায়ায় বসিয়া এক পুরুষ একটি তন্ত্রীযুক্ত স্বরযন্ত্র অলসভাবে বাজাইয়া মাঝির গানের সঙ্গে সুর মিলাইতেছেন। পরিধানে অতি সাধারণ শুভ্র বস্ত্র ও উত্তরীয়, ললাটে শ্বেত চন্দনের তিলক। পাঁচ বছরে তাঁহার বহিরাকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় নাই, তেমনি সরল হাসিটি মুখে লাগিয়া আছে : কিন্তু তবু মনে হয় এ ব্যক্তি সে ব্যক্তি নয়, অন্তর্লোকে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

কালিদাস যে যন্ত্রটি বাজাইতেছেন তাহা বোধ করি নাবিকদের কাহারো স্বরচিত সম্পত্তি, একটি বক্রাকৃতি তুম্বের শূন্যগর্ভ খোলসের উপর তিনটি তার চড়ানো। কালিদাস তাহাই বাজাইতে বাজাইতে মাঝির গানের প্রাকৃত ভাষা লক্ষ্য করিতেছেন—

আমার মন-তরণী ভাসল দরিয়ায়—
 মরি হায় মরি হায় রে!
দখিন বায়ে রূপ লহরে চলছে তরী পালের ভরে
কিনার ডাকে কলস্বরে আয় রে তরী আয়—
 মরি হায় মরি হায় রে।
কোন্ ঘাটেতে পথিক-বধূ আছে রে পথ চেয়ে
সেই কিনারে বৈঠা তুলে ভিড়াস্ তরী, নেয়ে,
যেথা কমল চোখে সজল হাসি অঝোর ঝরি যায়—
 মরি হায় মরি হায় রে!

গান শেষ হইলে কালিদাস যন্ত্র নামাইয়া রাখিয়া চক্ষু তুলিলেন, অমনি উজ্জয়িনীর রবি-করোজ্জ্বল দৃশ্যটি তাঁহার দৃষ্টি টানিয়া লইল, তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তারপর যেন আত্মগতভাবে বলিলেন—'কী চমৎকার নগরী! যেন আমার কল্পলোকের অলকাপুরী। —মাঝি ভাই, এ কোন্ রাজ্য?'

মাঝি একবার তীরের দিকে মুখ ফিরাইল, বলিল—'ঠাকুর, এটা অবন্তী রাজ্য। আমরা এখন উজ্জয়িনীর পাশ দিয়ে যাচ্ছি।'

কালিদাস তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে চাহিয়া রহিলেন—'অবন্তী! উজ্জয়িনী! এতদিন শুধু কল্পনাই করেছি। —এর পর কোন্ রাজ্য?'

মাঝি বলিল—'এর পর কুন্তল রাজ্য।'

কালিদাসের মুগ্ধ তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, তিনি সজাগ হইয়া উঠিলেন—'কুন্তল রাজ্য!'

মাঝি বলিল—'হ্যাঁ। কিন্তু কুন্তল রাজ্য অবন্তীর কাছে লাগে না। এখানকার রাজা

বিক্রমাদিত্য একজন মহাবীর, অসভ্য হূণদের উনিই যুদ্ধে হারিয়েছিলেন। ভারি তেজী রাজা। শুনেছি পণ্ডিতদের খুব আদর করেন।'

মাঝি যতক্ষণ হূণ-হরিণ-কেশরী বিক্রমাদিত্যের পরিচয় দিতেছিল, কালিদাস ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ; তাঁহার মুখে দৃঢ় সংকল্প স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝি থামিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—'ভাই মাঝি, আমাকে তুমি এখানেই নামিয়ে দাও।'

মাঝি ঈষৎ বিস্ময়ে চোখ তুলিল—'এখানেই— ?'

কালিদাসের দৃষ্টি শিপ্রার তীরভূমি চুম্বন করিয়া চলিয়ছিল ; তিনি মাঝির পানে না ফিরিয়াই বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—'হ্যাঁ, এখানেই। আমার কাছে সব রাজাই তো সমান। এই উজ্জয়িনীর উপকণ্ঠে নদীর তীরে কুটির বেঁধে আমি থাকবো—'

মাঝি একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—'তা বেশ, আপনার যা ইচ্ছে ঠাকুর।—ওরে ওরে, পাল নামা।'

মাঝি হালের মুখ ফিরাইয়া ধরিল। অন্য যেসব নাবিকেরা নীচে ছিল তাহারা ছাদে উঠিয়া আসিল।

কয়েকদিন কাটিয়াছে।

উজ্জয়িনীর সীমান্তে শিপ্রার উপকূল। তীরভূমি ঢালু হইয়া জলে মিশিয়াছে, তীরে দূরে দূরে উপবনবেষ্টিত কুটির। যাহারা ফুলের চাষ করে নগরের বাহিরেই তাহাদের সুবিধা, তাই মালাকরেরা এইদিকেই পুষ্পোদ্যান রচনা করিয়াছে।

জলের কিনারা দিয়া যে হাঁটা-পথ গিয়াছে সেই পথে মালিনী নগরের দিকে চলিয়াছিল। তাহার বিশেষ তাড়া ছিল না, সূর্যাস্তের এখনো বিলম্ব আছে। বাঁ হাতের মণিবন্ধ হইতে ফুলের সাজি ঝুলিতেছে, ডান হাতে সূচী ও সূত্রের সাহায্যে মালা গড়িয়া উঠিতেছে। মালিনী অস্ফুট গুঞ্জনে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল।

মালিনীর বয়স পনেরো-ষোল, শ্যামকান্তি পল্লবিতা দেহলতা ; মনে ও দেহে দুই-একটি কুঁড়ি ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। মালব দেশের মালিনীদের যৌবন যেমন বিলম্বে আসে তেমনি বিলম্বে যায়। এই তরুণী মালিনীটি দেখিতে ছোটখাটো চঞ্চলা হাস্যময়ী, চুলগুলি চিকণ করিয়া বাঁধা। পরিধানে বাসন্তী রঙ্ শাড়ি, ঊর্ধ্বাঙ্গে বাসন্তী রঙ আঙরাখা সর্বাঙ্গে আঁট হইয়া বসিয়াছে।

মালিনী চলিতে চলিতে মালা গাঁথিতেছে, তাহার চক্ষু তাহাতেই নিবদ্ধ। যে গানটি ঈষন্মুক্ত অধর হইতে নিঃসৃত হইতেছে তাহা বেশি দূর যাইতেছে না, ফুলের চারিপাশে ভ্রমরের মত গুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে। তাহার গতিভঙ্গিতেও একটু নৃত্যের স্পর্শ আছে।

মালা গাঁথা শেষ করিয়া সে এক পাক ঘুরিয়া চোখ তুলিয়া সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িল ! এ কি, হঠাৎ একটা নূতন কুটির কোথা হইতে আসিল ? সাত দিন আগেও কিছু ছিল না !

নদীতীর হইতে পঞ্চাশ হাত ব্যবধানে উঁচু জমির উপর সত্যই একটি নূতন কুটির নির্মিত হইয়াছে। ঘন সন্নিবিষ্ট পাহাড়ী বেত্রের উপর মাটির প্রলেপ দিয়া দেয়াল, উপরে কুশের ছাউনি। সম্মুখের খানিকটা স্থানে ছিটে-বেড়ার বেষ্টনী ; উঠানের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র বেদিকা।

কুটির সম্পূর্ণ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার প্রসাধন ও অঙ্গশোভা এখনো বাকি আছে। স্বয়ং গৃহস্বামী অধুনা এই কার্যে ব্যাপৃত। এক হাতে পিটুলি-পূর্ণ ভাঁড় ও অন্য হাতে দাঁতনের মত একটি তুলি লইয়া তিনি অভিনিবেশ সহকারে গৃহদ্বারের উপর শঙ্খ চক্র প্রভৃতি চিত্রলেখায় প্রবৃত্ত।

দূর হইতে দেখিয়া মালিনী কৌতূহল বশে সেই দিকে অগ্রসর হইল। পা টিপিয়া টিপিয়া

কালিদাসের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। কালিদাস চিত্র রচনায় এতই নিমগ্ন যে কিছুই জানিতে পারিলেন না।

চিত্রবিদ্যায় কবির পটুত্ব কিছু কম। দ্বারের একটি কপাটে তিনি যে-শঙ্খটি আঁকিয়াছেন তাহা যে শঙ্খই এমন কথা জোর করিয়া বলা শক্ত, কুণ্ডলিত বিষধর সর্পও হইতে পারে ; এইজন্য কবি তাহার নিম্নে স্পষ্টাক্ষরে চিত্রপরিচয় লিখিয়া দিয়াছেন 'শঙ্খ'। বর্তমানে যে-চিত্রটি আঁকিতেছেন তাহাও আশানুরূপ আকার গ্রহণ করিতেছে না। সুদর্শন চক্র গোলাকার হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কবির হস্তে উহা ডিম্বের আকৃতি ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাছাড়া তুলিটাও ভদ্র ব্যবহার করিতেছে না, অতর্কিতে কবির চোখে মুখে রঙ ছিটাইয়া দিতেছে।

কালিদাস শেষে উত্ত্যক্ত হইয়া তুলির দ্বারা সুদর্শন চক্রের মাঝখানে একটা খোঁচা দিলেন ; তুলির রঙ অমনি ধারার মত গড়াইয়া পড়িল। মালিনী এতক্ষণ কালিদাসের পিছনে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে দেখিতেছিল ; এখন খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চমকিয়া কবি ফিরিলেন ; হাতের তুলিটা কেমন একভাবে ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া মালিনীর মুখে চোখে রঙ ছিটাইয়া দিল।

মালিনী মুখখানি একবার কুঞ্চিত করিয়া আবার হাসিয়া উঠিল—'কেমন মানুষ গা তুমি! আমার মুখেও চিত্তির আঁকবে নাকি ?'

কালিদাস অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন—'এ হে হে, দেখতে পাইনি—ভারি অন্যায় হয়েছে। —তা, এ চুন নয় পিটুলি গোলা, তোমার মুখের কোনো ক্ষতি করবে না। বরং—বেশ দেখাচ্ছে—।'

মালিনীর মুখে শ্বেত বিন্দুগুলি তিলকের মত ফুটিয়া উঠিয়া সত্যই সুন্দর দেখাইতেছিল, সে স্মিতমুখে এই কান্তিময় তরুণ ব্রাহ্মণকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। মানুষটি দেখিতেও সুন্দর, কথাও বলে ভারি মিষ্ট। সে বলিল—'তুমি নতুন এসেছ, না ? সাত দিন আগেও এ পথ দিয়ে গেছি, তোমার কুঁড়ে ঘর তো ছিল না।'

কালিদাস বলিলেন—'না, এই তো ক'দিন হল এসেছি। নিজের হাতে ঘর তৈরি করেছি। কেমন, চমৎকার হয়নি ?' তিনি সগর্বে গৃহের পানে তাকাইলেন।

মালিনী বলিল—'বেশ হয়েছে। ওটা কি হচ্ছিল ?'

মালিনীর তর্জনীনির্দেশ অনুসরণ করিয়া শঙ্খ চক্র দেখিয়া কালিদাস লজ্জিত হইলেন, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—'মঙ্গল চিহ্ন আঁকছিলাম, তা ওই হয়েছে।' বলিয়া নিজেই হাসিয়া ফেলিলেন।

মালিনীও হাসিল। ফুলের মালা সাজিতে রাখিয়া সাজি কালিদাসের হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিল—'তুমি সাজি ধরো আমি এঁকে দিচ্ছি। আল্‌পনা দেওয়া কি পুরুষের কাজ !'

ভাঁড় ও তুলি হাতে লইয়া মালিনী দ্বারের কাছে গেল ; কালিদাস পুলকিত হইয়া বলিলেন—'তুমি এঁকে দেবে ! বাঃ, তাহলে তো কথাই নেই। —আমরা পুরুষেরা শুধু মোটা কাজ করতে পারি, সূক্ষ্ম কাজ মেয়েরা না হলে হয় না।'

মালিনী হাসিমুখে স্বজাতির এই প্রশংসা আত্মসাৎ করিয়া আল্‌পনা অঙ্কনে মন দিল, পূর্বের অঙ্কন মুছিয়া দক্ষহস্তে নূতন করিয়া শঙ্খ আঁকিতে লাগিল। কালিদাস সপ্রশংস নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন—'ভাল কথা, তুমি কে তা তো বললে না।'

'ফুলের সাজি দেখে বুঝলে না ?—মালিনী।'

'ও—তা বটে। কিন্তু তোমার একটা নাম আছে তো।'

মালিনী মুখ না ফিরাইয়াই মাথা নাড়িল।

'না, সবাই আমাকে মালিনী বলে ডাকে। আমার কেউ নেই কিনা।—গুরুবারে গুরুবারে আমি রাজবাড়িতে যাই রানী ভানুমতীকে ফুল যোগাতে। রানী ভানুমতী আমাকে খু—ব ভালবাসেন। সবাই আমাকে খুব ভালবাসে। আমার কেউ নেই কিনা।'

কালিদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে শুনিতেছিলেন, মালিনী মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল—'তুমি কে?'

কালিদাস একটু ইতস্তত করিয়া শেষে বলিলেন—'আমি কালিদাস।'

মালিনী পরিতুষ্টভাবে ঘাড় নাড়িল—'বেশ নাম।—তুমি কি কাজ কর?'

কালিদাস চিন্তা করিয়া বলিলেন—'কাজ!—আমিও মালা গাঁথি।'

মালিনীর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—'ওমা সত্যি! কিন্তু—কিন্তু তোমার গলায় পৈতে রয়েছে, তুমি তো মালাকর নও।'

কালিদাস মৃদু হাসিলেন—'আমি কথার মালাকর—কবি।'

চিবুকে একটি আঙুল ঠেকাইয়া মালিনী কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল, তারপর রুদ্ধশ্বাসে বলিল—'কবি! তুমি গান বাঁধতে পার?'

কালিদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, মালিনীর চক্ষু বিস্ময়ে আরো বর্তুলাকার হইল। সে বলিল—'তবে—তবে তুমি এখানে কুঁড়ে ঘর বেঁধেছ যে? রাজসভায় যাও না কেন? রাজা কবিদের ভারি ভালবাসেন, কত সোনাদানা দেন, থাকবার বাড়ি দেন—'

কালিদাসের মুখে ঈষৎ তিক্ততার আভাস খেলিয়া গেল, তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'রাজারানীর সোনাদানা আমার দরকার নেই। নিজের হাতে তৈরি এই কুঁড়ে ঘর আমার অট্টালিকা।'

মালিনী ক্ষণেক জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিল, সদয় কণ্ঠে বলিল—'বুঝেছি। তুমি রাজারানীদের সঙ্গে কখনো মেশোনি কিনা তাই ভয় করছে। তুমি ভয় পেও না। ওরা খুব ভাল লোক হয়। আমার রানী ভানুমতী খুব ভাল লোক—আর কী সুন্দর! চোখ ফেরানো যায় না।'

কালিদাস একটু হাসিলেন—'তুমিও তো ভাল লোক; জানা-শোনা নেই তবু আমার কত কাজ করে দিচ্ছ। আর দেখতেও সুন্দর—যেন প্রতিমাটি। তবে তোমাকে ফেলে রাজারানীর পিছনে ছোটবার কী দরকার?'

মালিনী আহ্লাদে বিগলিত হইয়া গেল, বলিল—'আমি সুন্দর! যাঃ—তুমি কবি কিনা তাই মিছিমিছি বলছ। এবার এদিকে দ্যাখো দেখি, কেমন আল্পনা হয়েছে।'

কবি সহজ কৃতজ্ঞতার কণ্ঠে বলিলেন—'ভাল হয়েছে, যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি হয়েছে। নারীই গৃহকে গৃহের রূপ দিতে পারে—সে গৃহদেবতা।'

মালিনী মাথা হেলাইয়া কিছুক্ষণ কবির পানে চাহিয়া রহিল। এ ধরনের কথাবার্তার সহিত সে পরিচিত নয়, তবু একটু হাসিয়া বলিল—'তোমার কথার মানে বুঝেছি। শুনতে হেঁয়ালির মত লাগে. কিন্তু ভাবলে মানে পাওয়া যায়।—আচ্ছা, সব কবিই কি হেঁয়ালির ছন্দে কথা বলে?'

কালিদাস হাসিয়া বলিলেন—'স—ব।'

ইতিমধ্যে সূর্যদেব শিপ্রার পরপারে অস্তচূড়া স্পর্শ করিয়াছেন; এখন নগর হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিল। মালিনী চকিতে দিগন্তের পানে চাহিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—'ওমা কি হবে! সূয্যি যে পাটে বসলেন! আজকেই আমি মরেছি, রানীমার ফুল যোগান দিতে দেরি হয়ে যাবে। দাও দাও, সাজি দাও, আমি চললুম—'

কালিদাসের হাতে ভাঁড় ধরাইয়া দিয়া এবং সাজিটি প্রায় কাড়িয়া লইয়া মালিনী ক্ষিপ্রপদে অঙ্গনের বাহিরে চলিল। যাইতে যাইতে একবার পিছু ফিরিয়া বলিল—'আবার যেদিন আসব

তোমার ঘর গুছিয়ে দিয়ে যাব।'

কালিদাস স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর মৃদুস্বরে আত্মগতভাবে বলিলেন—'মালিনী ! যেন সাক্ষাৎ মালিনী ছন্দ—চপল-চরণ-ছন্দা—নন্দিনী—পুষ্পগন্ধা !'

অবন্তীর বিশাল রাজপুরী ; প্রাকার-বেষ্টিত একটি নগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিস্তৃত বিহার ভূমির উপর কুঞ্জবাটিকা উপবন, মধ্যে মধ্যে এক একটি অট্টালিকা। কোনোটি মন্ত্রগৃহ, কোনোটি শস্ত্রাগার, কোনোটি যন্ত্রভবন—এইরূপ আরও অনেক।

পুরভূমির সর্ব পশ্চাতে মহাদেবী ভানুমতীর অবরোধ—নগরের মধ্যে ক্ষুদ্র নগরী। অবরোধের ভূভাগ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, প্রাচীরের কোল ঘেঁষিয়া সঙ্কীর্ণ পরিখা। এখানে প্রবেশের একটি মাত্র পথ ; তাহাও এত সঙ্কীর্ণ যে দুইজন পাশাপাশি প্রবেশ করিতে পারে না।

যে-সময়ের কাহিনী সে-সময়ে রাজপুরীর পুরস্ত্রীদের প্রাকার পরিখার অন্তরালে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক বৎসর পূর্বে হূণ বর্বরদের উৎপাত হইয়াছিল ; সেই সময় পুরনারীদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই অবরোধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তারপর হূণ উৎপাত দূর হইয়াছিল ; কিন্তু প্রথা একবার গড়িয়া উঠিলে সহজে ভাঙ্গা যায় না। অবরোধ এবং তৎ-সংক্রান্ত বিধি-বিধান রহিয়া গিয়াছিল।

সেদিন একজন সশস্ত্র প্রহরী অবরোধের অপ্রসর প্রবেশ-পথের সম্মুখে পাহারায় নিযুক্ত ছিল। রক্ষীর বয়স কম, মাত্র উনিশ কুড়ি ; কিন্তু ভারি জোয়ান। হাতের লৌহশূল অবহেলাভরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সে দ্বার সম্মুখে পাদচারণ করিতেছিল। কেহ কোথাও নাই। দ্বারপথে অবরোধের প্রাসাদ প্রাঙ্গণ কিয়দংশ দেখা যাইতেছে ; বাহিরে বকুল তমাল পিয়াল শোভিত মুক্ত ভূমি জনশূন্য। সন্ধ্যা সমাগত।

দূরে মালিনীকে আসিতে দেখিয়া রক্ষী থমকিয়া দাঁড়াইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর একটু গদ্‌গদ হাসি তাহার মুখে দেখা দিল। মালিনীর প্রতি তাহার মনে যে বেশ প্রীতির ভাব আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

মালিনী তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাড়াতাড়ি অবরোধে প্রবেশের উদ্যোগ করিল। রক্ষী এজন্য প্রস্তুত ছিল. মালিনীর অবজ্ঞা তাহার কাছে নূতন নয় ; তাহার বল্লম অর্গলের মত পড়িয়া মালিনীর পথ রোধ করিয়া দিল। চমকিয়া মালিনী অধীর রুষ্ট মুখে রক্ষীর পানে তাকাইল ; বলিল—'কি হচ্ছে ! পথ ছেড়ে দাও।'

মালিনীর ভ্রূকুটি দেখিয়া রক্ষী ঘাবড়াইয়া গেল। সে নূতন প্রেম করিতে শিখিতেছে, এখনো আনাড়ী ; অথচ একটু রসিকতা না করিয়াও মালিনীকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। তাই সে বোকার মত হাসিয়া বলিল—'বিনা প্রশ্নে তোমাকে রানীর মহলে ঢুকতে দিই কি করে ? কঞ্চুকী মশায়ের হুকুম—'

মালিনী বলিল—'ঢের হয়েছে, এবার বল্লম নামাও। এম্‌নিতেই আমার দেরি হয়ে গেছে—'

রক্ষী বলিল—'কঞ্চুকী মশায়ের হুকুম, পুরুষ ঢুকতে দেবে না। এখন তুমি যে মেয়ের ছদ্মবেশে পুরুষ নও—'

মালিনী ধমক দিয়া বলিল—'আবার ! আচ্ছা বেশ, রঙ্গই কর তাহলে—'

মালিনী অদূরস্থ বেদীর মত ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডের উপর সাজি কোলে লইয়া বসিল, আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া নীরসকণ্ঠে বলিল—'আমার কি ! রানীমার এতক্ষণ চুল বাঁধা গা ধোয়া হয়ে গেছে, ফুল আর মালার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছেন। বেশ তো, বসে থাকুন। যত দেরি হবে ততই তাঁর রাগ বাড়বে। তা আমি কি করব ! আমাকে যখন তলব হবে আমি বলব—'

রক্ষী এবার রীতিমত ভয় পাইয়া গেল, ত্বরিতে দ্বার হইতে বল্লম সরাইয়া মিনতির সুরে বলিল—'না না মালিনী, আমি কি তোমাকে আটকেছি! আমি একটু—ইয়ে—রস করছিলাম। নাও—তুমি ভিতরে যাও।'

মালিনী উঠিল না, মুখ কঠিন করিয়া বলিল—'আগে নিজের হাতে কান মলো।'

রক্ষীর বয়স অল্প, তাহার কর্ণ দু'টি রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? সে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আচ্ছা, এই নাও মলছি। কিন্তু এ শুধু তোমাকে—ইয়ে—ভালবাসি বলে।'

মালিনী ফিক্ করিয়া হাসিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া গ্রীবার একটি লীলায়িত ভঙ্গি করিয়া বলিল—'ইঃ, ভালবাসা!' সহসা গম্ভীর হইয়া মালিনী প্রশ্ন করিল—'জানো, নারীই গৃহকে গৃহের রূপ দিতে পারে? সে গৃহদেবতা—জানো?'

রক্ষী অবোধের মত ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—'কৈ, না তো।'

'তবে তুমি কিচ্ছু জান না।' মালিনী সদর্পে দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল।

:

মহাদেবী ভানুমতীর প্রসাধন কক্ষে একটি শিঙার-বেদিকার উপর অপরূপ রূপবতী প্রগাঢ়যৌবনা রানী অর্ধশয়ানভাবে অবস্থান করিতেছেন। চার পাঁচটি কিঙ্করী তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে; একজন ভানুমতীর আলুলায়িত কুন্তল দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত করিতেছে, দ্বিতীয়া কিঙ্করী পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া লাক্ষারসে চরণপ্রান্ত রঞ্জিত করিতেছে। অবশিষ্ট কিঙ্করীরা প্রসাধন দ্রব্য হাতে লইয়া সাহায্য করিতেছে।

দ্রুত ব্যস্তপদে মালিনী প্রবেশ করিল; বাক্যব্যয় না করিয়া ভানুমতীর দেহ পুষ্পাভরণে সাজাইতে লাগিয়া গেল। রানী মদালস নেত্র মালিনীর দিকে ফিরাইয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন—'আমার মালিনী মেয়ের আজ এত দেরি যে!'

মালিনী ক্ষিপ্রহস্তে ভানুমতীর মৃণালভুজে ফুলের অঙ্গদ পরাইতে পরাইতে হ্রস্বস্বরে বলিল—'কার মুখ দেখে যে আজ উঠেছিলুম, দেরি হয়ে গেল রানিমা। ফুল নিয়ে নদীর ধার দিয়ে আসছি, চোখ তুলে দেখি—ওমা, এক কবি! বল তো রানিমা, অবাক কাণ্ড না?'

রানী অধর প্রান্ত একটু কুঞ্চিত করিলেন—'এ আর অবাক কাণ্ড কী! মহারাজের কৃপায় উজ্জয়িনীতে এত কবি জুটেছে যে, বর্ষাকালে ইন্দ্রগোপ কীটও এত জন্মায় না।'

মালিনী মাথা নাড়িয়া বলিল—'ওমা না গো না, এ তোমার ন্যাড়ামাথা নাকলম্বা চিমসে কবি নয়। কি বলব তোমায় রানিমা, চেহারা যেন ঠিক—কুমার কার্তিক! গায়ের রঙ ডালিম ফেটে পড়ছে—কী নাক, কী চোখ! বয়স কতই বা হবে, বড় জোর চব্বিশ পঁচিশ।'

ঈষৎ ভ্রূভঙ্গ করিয়া ভানুমতী মালিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন—'হুঁ?'

মালিনী উৎসাহভরে বলিয়া চলিল—'হ্যাঁ গো রানিমা। বললে বিশ্বাস করবে না, এত সুন্দর কবি আমি জন্মে দেখিনি।—নদীর পাড়ে কুঁড়ে ঘর তৈরি করেছে, সেখানেই থাকবে!' মালিনী হঠাৎ হাসিয়া উঠিল 'দরজায় আল্‌পনা দিচ্ছিল—কিবা আল্‌পনার ছিরি! হাত থেকে পিটুলির ভাঁড় কেড়ে নিয়ে আমি আল্‌পনা এঁকে দিলুম। তাই না এত দেরি হল। কবির নাম—কালিদাস। বেশ মিষ্টি নাম, না? আর তেমনি কি মিষ্টি কথা—কথা শুনলে কান জুড়িয়ে যায়।'

ভানুমতী মন দিয়া শুনিতেছিলেন, তাঁহার মুখের গূঢ় হাসি গভীর হইতেছিল; মালিনী থামিতেই তিনি ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন—'সত্যি!—নদীর ধারে খাসা কবি কুড়িয়ে পেয়েছিস তো! তা—কি বল্‌ল তোর কবিটি? কানের কাছে ভোমরার মত গুনগুন করে গান শুনিয়েছে বুঝি?'

মালিনী রানীর কথার ব্যঙ্গার্থ বুঝিল না ; সে এখনো অতশত বুঝিতে শেখে নাই, সরলভাবে বলিল—'না রানিমা, গান করেনি, শুধু কথা বলেছে। কিন্তু কী মিষ্টি কথা, ঠিক যেন মধু ঢেলে দিচ্ছে।'

ভানুমতী ফিক্ করিয়া হাসিয়া কিঙ্করীদের পানে চাহিলেন ; তাহারাও মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। রানী অলসহস্তে মালিনীর চিবুক তুলিয়া ধরিয়া তাহার কচি মুখখানি দেখিলেন, তরল কৌতুকের সুরে বলিলেন—'আমার মালিনী-কুঁড়িটি এতদিনে সত্যিই ফুটবে ফুটবে করছে, ভোমরাও ঠিক এসে জুটেছে। দেখিস মালিনী, তুই যেমন ভালমানুষ, তোর কবি-ভোমরা সব মধুটুকু শুষে নিয়ে উড়ে না পালায়।'

কিঙ্করীরা হাসিতে লাগিল। মালিনী ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া সকলের মুখের পানে তাকাইতে লাগিল। রানী হাসিতে হাসিতে উঠিয়া মালিনীর দুই স্কন্ধের উপর হাত রাখিলেন, স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন—'বোকা মেয়ে। এখনো ঘুম ভাঙেনি।—ভয় নেই, একদিন ঘুম ভাঙবে, হঠাৎ সব বুঝতে পারবি। তোর কবি বুঝি ঘুম ভাঙাতেই এসেছে।'

কিছুদিন কাটিয়াছে।

একদা প্রভাতকালে কালিদাস নিজ কুটির প্রাঙ্গণে বেদীর উপর বসিয়া আছেন। সম্মুখে মৃত্তিকার মসীপাত্র, খাগের কলম ও একতাড়া তালপত্র। কবি রচনায় নিমগ্ন, কিন্তু যত না রচনা করিতেছেন চিন্তা করিতেছেন তাহার দশগুণ। ললাট চিন্তা-চিহ্নিত, কোথাও যেন আটকাইয়া গিয়াছে। কবি কয়েকবার মুখে বিড়বিড় করিতে করিতে করাগ্রে গণনা করিলেন, তারপর অন্যমনস্কভাবে লেখনী মসীপাত্রে ডুবাইলেন। কিন্তু মনে মনে যাহা গড়িয়াছিলেন তাহা মনঃপূত হইল না, তিনি আবার কলম রাখিয়া দিলেন। তালপত্রে একটি অসমাপ্ত শ্লোক লেখা ছিল, তালপত্রটি তুলিয়া জানুর উপর রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন, যেন উহার ধ্বনি হইতে পরবর্তী অলিখিত পংক্তির ইঙ্গিত ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন—

অবচিত বলিপুষ্পা বেদি সম্মার্গদক্ষা
নিয়মবিধি জলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা—ভবানী !

শেষ শব্দটি তিনি সংশয়সঙ্কুল কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন। 'ভবানী' শব্দটি পত্রে লেখা ছিল না, কবি পাদপূরণের জন্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তিনি মাথা নাড়িলেন—'উহুঁ, ভবানী চলবে না! এখনো তো দেবী ভবানী হননি। কৃশাঙ্গী— ? উহু—মৃগাক্ষী ?—উহু উহু—'

কবির ভাবাবিষ্ট চক্ষু এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বারের কাছে গিয়া সহসা রুদ্ধ হইল ; কবি ভাবতন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন। প্রাঙ্গণের দ্বারপথে মালিনী হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিতেছে। সদ্যঃস্নাতা ; হাতে তাম্রের থালিতে একরাশ ফুল, মাথার সিক্ত চুলগুলি বুকে কাঁধে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; প্রভাতের শিশির বিন্দুর মত চৌদিকে আনন্দের রশ্মি বিকীর্ণ করিতে করিতে মালিনী কালিদাসের দিকে অগ্রসর হইল। কালিদাস চকিত বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন—এ কি ! এ যে গিরিকন্যারই মর্ত্য প্রতিমূর্তি ! যে শব্দটির অভাবে তাঁহার শ্লোক এবং কাব্যের প্রথম সর্গ সমাপ্ত হইতেছে না সেই শব্দটি বিদ্যুৎস্ফুরণের মত তাঁহার মস্তিষ্কে জ্বলিয়া উঠিল। ত্বরিতে লেখনী ধরিয়া কবি লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, খস্‌খস্ শব্দে তালপত্রের উপর লেখনী চলিতে লাগিল।

ফুলের থালি হাতে মালিনী বেদীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল ; কবি কিন্তু তাহাকে অন্য দিনের মত সম্ভাষণ করিলেন না, মুখ তুলিয়া দেখিলেন না। মালিনীর হাসিভরা মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, অভিমানে চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। কবি ব্যগ্রভাবে লিখিয়া চলিয়াছেন, যেন মুহূর্তের জন্য অন্য দিকে মন দিলেই শব্দগুলি মস্তিষ্কের পিঞ্জর খুলিয়া উড়িয়া যাইবে। মালিনী ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ভারী গলায় বলিল—'এত কাজ—আমার পানে চোখ তুলে চাইবারও সময় নেই ! বেশ !—'

কালিদাস মুখ না তুলিয়াই চাপা সুরে বলিলেন—'স্‌স্‌—একটু দেরি কর—এটা শেষ করে ফেলি—। নি-য়-মি-ত প-রি-খে-দা—'

মুখে অসমাপ্ত বাক্য মিলাইয়া গেল, কালিদাস লিখিয়া চলিলেন। অবশেষে লেখা সমাপ্ত হইল। লেখার নীচে কলমের একটি সাড়ম্বর আঁচড় টানিয়া তিনি মালিনীর পানে হাস্যোজ্জ্বল মুখ তুলিলেন—'ব্যস—ইতি প্রথম সর্গঃ।'

মালিনী মুখ ভার করিয়া রহিল, কালিদাস সোৎসাহে বলিয়া চলিলেন—'একটা শব্দ কিছুতেই মাথায় আসছিল না, তোমাকে দেখেই মনে পড়ে গেল—তোমার ওই কালো কালো কোঁকড়া চুল দেখে—'

মালিনীর পক্ষে আর অভিমান করিয়া থাকা সম্ভব হইল না, কৌতূহল-দীপ্ত চোখে সে কালিদাসের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—'কি কথা—বল না।'

কালিদাস বলিলেন—'কথাটি হচ্ছে—সুকেশী। তোমার সুন্দর ভিজে চুলগুলি দেখে মনে পড়ে গেল।'

মালিনী বেদীর একপাশে বসিয়া পড়িল। কৌতূহলের সীমা নাই ; ফুলের থালিটি নামাইয়া রাখিয়া সে এক অঞ্জলি ফুল কবির কোলের উপর ফেলিয়া দিল, তারপর লেখনী মসীপাত্র তালপত্রের উপর দুই চারিটি ফুল ছড়াইয়া দিতে দিতে বলিল—'কিসের গল্প লিখছ ? শিবের গীত বুঝি ?'

কালিদাস বলিলেন—'হ্যাঁ। শিব আর পার্বতীর গল্প। শিবের সঙ্গে পার্বতীর তখনো বিয়ে হয়নি। শিব তপস্যা করছেন—কঠিন তপস্যা, আর গিরিরাজ-কন্যা উমা রোজ এসে তাঁর সেবা করেন, ফুল সমিধ আহরণ করে আনেন, পূজার জন্যে বেদী-মার্জন করে দেন। তারপর এইসব কাজ ক'রে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন শিবের ললাট-চন্দ্রের কিরণের তলায় বসে ক্লান্তি দূর করেন।—শুনবে শেষ শ্লোকটা ?'

মালিনী অবহিত চিত্তে শুনিতেছিল, সে কেবল সাগ্রহে ঘাড় নাড়িল। কালিদাস তালপত্র তুলিয়া পড়িলেন—

'অবচিত বলিপুষ্পা বেদি সম্মার্গদক্ষা
নিয়মবিধি জলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী
নিয়মিত পরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ।'

কিছুক্ষণ দুইজনে নীরব। কালিদাস ধীরে ধীরে তালপত্র নামাইয়া রাখিলেন, মালিনীর দিকে মৃদু সস্নেহ হাসিয়া বলিলেন—'এ ছন্দের নাম জানো ?'

মালিনী বলিল—'না—কী ?'

কালিদাস বলিলেন—'মালিনী ছন্দ—তোমার নামের ছন্দ। প্রত্যেক সর্গের শেষে তোমার নামের ছন্দে শ্লোক লিখব ইচ্ছা আছে। আমার কাব্য যদি বেঁচে থাকে মালিনীর নামও কেউ ভুলবে না, আমার কাব্যে তোমার নাম গাঁথা থাকবে।'

মালিনীর মুখ আনন্দে গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কালিদাস হাসিতে হাসিতে বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরম বিলাসভরে আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে অঙ্গন-বেষ্টনীর বাহিরে শিপ্রার তীরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার হাস্য-আলস্য ভরা মুখে সহসা ভাবান্তর দেখা গেল।

শিপ্রার তীররেখা ধরিয়া এক শ্রেণী উট চলিয়াছে। আর একদিনের কথা কালিদাসের মনে পড়িয়া গেল—পূর্ণিমার নিথর রাত্রি, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাজোদ্যান, প্রাকার-বেষ্টনীর পরপারে উটের সারি চলিয়াছে—তারপর—

স্মৃতির বেদনা কালিদাসের মুখে করুণ ছায়াপাত করিল। মালিনী ঊর্ধ্বমুখী হইয়া কবির পানে চাহিয়া ছিল, সে তাঁহার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। ঈষৎ বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে প্রাঙ্গণ-বেষ্টনীর ওপারে দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না ; তখন সেও বেদীর উপর উঠিতে উঠিতে বলিল—'কী দেখছ ?'

কালিদাস উত্তর দিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। মালিনী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডিঙি মারিয়া দেখিল উটের সারি। সে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—'আ কপাল—উট ! আমি বলি না জানি কী ! তো হ্যাঁ কবি, উট দেখে তোমার ভয় হল নাকি ?'

কালিদাস ম্লান হাসিলেন—'ভয় নয় মালিনী, দুঃখ হল। ঐ উটের সঙ্গে একটা বড় দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।'

কালিদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। মালিনী সপ্রশ্ন নেত্রে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তিনি আর কিছু বলিলেন না।

অবন্তীর রাজসভা। কুন্তল রাজসভার সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও এ আরও বৃহৎ ব্যাপার। উপরন্তু অবরোধের মহিলাগণের জন্য প্রাচীরগাত্রে উচ্চ প্রেক্ষামঞ্চের ব্যবস্থা আছে।

অপরাহ্ণকালে সভার প্রধান বেদিকার উপর মহারাজ বিক্রমাদিত্য আসীন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের দৃপ্তকায় পুরুষ ; দণ্ড মুকুটাদির আড়ম্বর নাই, তিনি বেদীর আস্তরণের উপর কেবলমাত্র একটি স্থূল উপাধান আশ্রয় করিয়া অর্ধশয়ান আছেন।

চারিপাশে কয়েকজন অন্তরঙ্গ সভাসদ নিকটে-দূরে অবস্থান করিতেছেন। বরাহমিহির ও অমরসিংহ একত্র বসিয়া নিম্নস্বরে বাক্যালাপ করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে তুড়ি দিয়া হাই তুলিতেছেন। এক শীর্ণকায় মুণ্ডিতচিকুর কবি দন্তহীন মুখ রোমন্থনের ভঙ্গিতে নাড়িতে নাড়িতে একাগ্র মনে শ্লোক রচনা করিতেছেন। প্রবীণ মহামন্ত্রী এক পাশে বসিয়া পারাবতপুচ্ছের সাহায্যে কর্ণকুহর কণ্ডূয়ন করিতেছেন। তাঁহার অনতিদূর পশ্চাতে স্থূলকায় বিদূষক চিৎ হইয়া উদর উদ্‌ঘাটনপূর্বক নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে।

মহারাজের শিয়রের কাছে এক তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী যুবতী বসিয়া একমনে তাম্বূল রচনা করিয়া সোনার থালে রাখিতেছে। অন্য একটি যবনী সুন্দরী শীতল ফলাম্লরসের ভৃঙ্গার হস্তে নতজানু হইয়া চিত্রার্পিতার ন্যায় একপাশে অবস্থান করিতেছে।

কর্মহীন অপরাহ্ণের আলস্য সকলকে চাপিয়া ধরিয়াছে। মহারাজ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু কেহ একটা রসের কথা পর্যন্ত বলিতেছে না। সভাটা যেন নিতান্ত ব্যাজার হইয়া শেষ পর্যন্ত ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মধ্যে বরাহমিহির ও অমরসিংহের মৃদু জল্পনা ঝিল্লিগুঞ্জনের ন্যায় শুনাইতেছে।

বরাহমিহির প্রকাণ্ড একটি হাই তুলিয়া হস্তদ্বারা উহা চাপা দিলেন, তারপর ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—'রবি এবার মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন।'

বিক্রমাদিত্য একটু উৎসুকভাবে সেইদিকে তাকাইলেন—'কি বললেন মিহিরভট্ট ?'

বরাহমিহির বলিলেন—'আমি বলছিলাম মহারাজ, যে রবি এবার মকর রাশিতে গিয়ে ঢুকবেন।'

মহারাজ আবার উপাধানে হেলান দিয়া বসিলেন, ব্যঙ্গ-বঙ্কিম মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন—'হুঁ, ঢুকবেন তো এত দেরি করছেন কেন ? তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেই পারেন। আমার তো এই আলস্য আর নৈষ্কর্ম্য অসহ্য হয়ে উঠেছে। এ রাজ্যে কেউ যেন কিছু করছে না, কেবল বসে বসে ঝিমচ্ছে। ইচ্ছে করে সৈন্য সামন্ত নিয়ে আবার যুদ্ধযাত্রা করি। তবু তো একটু কিছু করা হবে।'

মহামন্ত্রী কর্ণকণ্ডূয়নে ক্ষণকাল বিরতি দিয়া মিটিমিটি হাসিলেন, গূঢ় পরিহাসের কণ্ঠে বলিলেন—'কার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন মহারাজ ? শত্রু তো একটিও অবশিষ্ট নেই।'

বিরক্তি সত্ত্বেও মহারাজের মুখে হাসি ফুটিল—'তাও বটে। বড় ভুল হয়ে গেছে মন্ত্রী। সবগুলো শত্রুকে একেবারে নিপাত করে ফেলা উচিত হয়নি। অন্তত দু'একটা শত্রুকে এই রকম দুর্দিনের জন্য রাখা উচিত ছিল।'

এই সময় রচনা-রত কবি গলার মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ করিলেন, তাঁহার রচনা শেষ হইয়াছে। রাজা তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'কী হয়েছে কবি, আপনি অমন করছেন কেন ? হাতে ওটা কি ?'

গলা পরিষ্কার করিয়া কবি বলিলেন—'শ্লোক লিখেছি মহারাজ। আপনার প্রশস্তি রচনা করেছি।'

বিক্রমাদিত্য নিরুপায়ভাবে একবার চারিদিকে চাহিলেন, শেষে গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন—'হুঁ। বেশ পড়ুন—শুনি।'

মহারাজের প্রশস্তি পাঠ হইবে, সুতরাং অন্য সকলেও সেদিকে মন দিলেন। কবি শ্লোকটি পাঠ করলেন—

'শত্রুণাং অস্থিমুণ্ডানাং শুভ্রতাং উপহাস্যতি।
হে রাজন্ তে যশোভাতি শরচ্চন্দ্র মরীচিবৎ॥'

সকলে অবিচলিত মুখচ্ছবি লইয়া বসিয়া রহিলেন ; কেবল অমরসিংহ ভ্রূকুটি করিয়া কবির দিকে তাকাইলেন। বোধহয় শব্দ প্রয়োগে কিছু ভুল হইয়া থাকিবে।

এই জাতীয় শুষ্ক কবিত্বহীন প্রশস্তি শুনিয়া রাজার কর্ণজ্বর উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তবু কবির প্রাণে আঘাত দিতে তাঁহার মন সরিল না। অথচ সাধুবাদ করাও চলে না। তিনি বিপন্নভাবে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী এই সময় তাম্বূলপূর্ণ থালি রাজার সম্মুখে ধরিল। রাজা চকিত হইয়া তাহার পানে চাহিলেন, তারপর মৃদুস্বরে বলিলেন—'মদনমঞ্জরি, তুমিই এই কবিতার বিচারক হও। একে কি কবিতা বলা চলে ? মোট কথা, কবিকে পান দেওয়া যেতে পারে কিনা ?'

মদনমঞ্জরী অতি অল্প হাস্য করিল, তাহার অধর একটু নড়িল—'পারে মহারাজ। কারণ কবিতা যেমনই হোক, তাতে আপনার গুণগান করা হয়েছে।'

মহারাজ একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, পান লইয়া মুখে পুরিতে পুরিতে স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন—'তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী, কবিকে তাম্বূল উপহার দাও, তাঁর কবিতা শুনে আমরা প্রীত হয়েছি।'

মদনমঞ্জরী উঠিয়া গিয়া তাম্বূলের থালি কবির সম্মুখে ধরিল, কবি লুব্ধহস্তে একটি পান লইয়া মুখে পুরিলেন। রাজা সদয় কণ্ঠে বলিলেন—'কবি, আজ আপনার যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে,

আপনি গৃহে গিয়ে বিশ্রাম করুন।'

'জয়োস্তু মহারাজ' বলিয়া কবি রাজসভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাজা আর একবার উপাধানের উপর এলাইয়া পড়িয়া সনিশ্বাসে বলিলেন—'আমার বয়স্যটি কোথায় কেউ বলতে পারেন ?'

মন্ত্রী পশ্চাদ্দিকে একটি বক্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'এই যে এখানে মহারাজ ; অকাতরে ঘুমোচ্ছে।'

মহারাজ আবার উঠিয়া বসিলেন—'ঘুমোচ্ছে ! আমরা সকলে জেগে আছি—অন্তত জেগে থাকবার চেষ্টা করছি—আর পাষণ্ড ঘুমোচ্ছে। তুলে দাও মন্ত্রী।'

আদেশ পাইবামাত্র মন্ত্রী পারাবতপুচ্ছটি বিদূষকের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইয়া পাক দিলেন। বিদূষক ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল—'আরে রে মন্ত্রি-শাবক !—মহারাজ, আপনার এই অস্থিচর্মসার মন্ত্রীটা আমার নাকে বিষপ্রয়োগ করেছে।'

মন্ত্রীর ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি নির্বিকার চিত্তে কানে পালক দিতেছেন ; রাজা গভীর ভর্ৎসনার কণ্ঠে বিদূষককে বলিলেন—'বয়স্য, রাজসভায় তুমি ঘুমোচ্ছিলে ?'

বিদূষক কট্‌মট্‌ করিয়া মন্ত্রীর পানে তাকাইল, বলিল—'কে বলে ঘুমোচ্ছিলাম ? কোন্ উচ্চিটিঙ্গ বলে ?—মহারাজ, আমি মনে মনে আপনার প্রশস্তি রচনা করছিলাম।'

মহারাজের অধর কোণে একটু হাসি দেখা দিল ; তিনি পুনশ্চ গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'প্রশস্তি রচনা করছিলে ? বটে। ভাল, শোনাও তোমার প্রশস্তি। কিন্তু মনে থাকে যেন, যে-প্রশস্তি আমরা এখনি শুনেছি তার চেয়ে যদি ভাল না হয় তাহলে তোমাকে শূলে যেতে হবে।'

'তথাস্তু।' বিদূষক আসিয়া রাজার সম্মুখে পদ্মাসনে বসিল, বলিল—'শ্রুয়তাং মহারাজ—

তাম্বূলং যৎ চর্বয়ামি সর্ব তে রিপুমুণ্ডবঃ।
পিক্ ত্যজামি পুচুৎ কৃত্বা তদেব শত্রু শোণিতম্।

প্রাকৃত ভাষায় অস্যার্থ হচ্ছে—আমরা যে পান খাই তা সর্বৈব মহারাজের শত্রুদের মুণ্ড, আর পুচ্ করে যে পিক্ ফেলি তা নিছক শত্রুশোণিত।'

মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই বিদূষক সুবর্ণথালি হইতে এক খাম্‌চা পান তুলিয়া মুখে পুরিল এবং সাড়ম্বরে চিবাইতে লাগিল। মহারাজ হাসিলেন ; অন্য সকলেও মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিলেন।

কালিদাসের কুটির প্রাঙ্গণের বেষ্টনীতে লতা উঠিয়াছে, লতায় ফুল ধরিয়াছে।

পূর্বাহ্ণে কালিদাস গৃহে নাই। মালিনী পরম স্নেহভরে আঁচল দিয়া কবির বেদিকাটি মুছিয়া দিতেছে। মার্জন শেষ হইলে সে কুটির হইতে কবির লেখনী মসীপাত্র ও পুঁথি লইয়া আসিল, সযত্নে সেগুলি বেদীর উপর সাজাইয়া রাখিল। তারপর ফুল দিয়া বেদীর চারিপাশ সাজাইল। অবশেষে একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উৎসুক নেত্রে প্রাঙ্গণদ্বারের পানে তাকাইল।

মালিনীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে বাকি থাকে না যে সে মরিয়াছে। প্রাঙ্গণদ্বার দিয়া কালিদাস সিক্ত বস্ত্র নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে প্রবেশ করিলেন ; তিনি পূজা ও স্নানের জন্য শিপ্রার তীরে গিয়াছিলেন।

মালিনী বলিল—'আসা হল ? বাবাঃ, পুজো আর স্নান যেন শেষই হয় না।—নাও বোসো। কী হচ্ছিল এতক্ষণ ?'

কালিদাস ভাল মানুষটির মত বেদীর উপর বসিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'পুজো আর স্নান।'

মালিনী সিক্ত বস্ত্র লইয়া নিজের কাঁধের উপর ফেলিল, তারপর এক রেকাবি ফল কবির কোলের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল—'আচ্ছা, এবার এগুলো মুখে দেওয়া হোক।'

কালিদাস ফলগুলি দেখিয়া বলিলেন—'এ কোথা থেকে এল ?'

মালিনী বলিল—'এল কোথাও থেকে। সে খোঁজে তোমার দরকার ?'

কালিদাস মৃদুহাস্যে বলিলেন—'আমার ভাণ্ডারে তো যতদূর মনে পড়ছে—'

মালিনী বলিল—'চারটি আতপ চাল আর দু'টি ঝিঙে ছাড়া কিছু নেই।—আচ্ছা, খাবার সামিগ্রি ঘরে এনে রাখতে মনে না থাকে, আমাকে বল না কেন ? দুপুরবেলা না হয় দু'টি ভাত ফুটিয়ে নিলেই চলে যাবে—বামুন মানুষের কথাই আলাদা—কিন্তু সকালে স্নান আহ্নিক করে কিছু মুখে দিতে হয় না ? দুটো বাতাসা কি একছড়া কলাও ঘরে রাখতে নেই ?'

কালিদাস করুণ কণ্ঠে বলিলেন—'ভুল হয়ে যায় মালিনী।'

'ভুল—সব তাতেই ভুল। এমন মানুষও দেখিনি কখনো—খাবার কথা ভুল হয়ে যায় !'

'ঐ তো মালিনী, কবি জাতটাই ঐ রকম। পৃথিবীতে যে-কাজ সবচেয়ে দরকারী, তাতেই তাদের ভুল হয়ে যায়। আমার এক তুমিই ভরসা।'

অনির্বচনীয় প্রীতিতে মালিনীর মুখ ভরিয়া উঠিল। তবু সে তিরস্কারের ভঙ্গিতেই বলিল—'আচ্ছা হয়েছে, এবার খাওয়া হোক। মনে থাকে যেন গল্প যে-পর্যন্ত শুনেছি তারপর থেকে পড়ে শোনাতে হবে।' সে সিক্ত বস্ত্র বেড়ার উপর শুকাইতে দিতে গেল, কালিদাস প্রসন্নমুখে আহারে মন দিলেন।

আহার শেষ হইলে আচমন করিয়া কালিদাস সম্মুখে রক্ষিত পুঁথি তুলিয়া লইলেন। ইত্যবসরে মালিনী বেদীর নীচে আসিয়া বসিয়াছিল এবং বেদীর উপর একটি বাহু রাখিয়া কালিদাসের মুখের পানে চাহিয়া পরম তৃপ্তিভরে প্রতীক্ষা করিতেছিল। কালিদাস পুঁথির পাতাগুলি সাজাইতে সাজাইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন—'আচ্ছা শোনো এবার। ইন্দ্রসভা থেকে বিদায় নিয়ে মদন আর বসন্ত হিমালয়ে মহাদেবের তপোবনে উপস্থিত হলেন। অমনি হিমালয়ের বনে উপত্যকায় অকালবসন্তের আবির্ভাব হল। শুকনো অশোকের ডালে ফুল ফুটে উঠল, আমের মঞ্জরীতে ভোমরা এসে জুটলো। শোনো—

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎপ্রভৃত্যেব সপল্লবানি
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীনাং সম্পর্কমাশিঞ্জিত নূপুরেণ ॥'

কালিদাস একটু সুর করিয়া শ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া চলিলেন, মালিনী মুগ্ধ তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ দু'টি কখনো আবেশভরে মুকুলিত হইয়া আসিল, কখনো বা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; নিশ্বাস কখনো দ্রুত বহিল, কখনো স্তব্ধ হইয়া রহিল। মন্ত্রমুগ্ধ সর্পীর মত তাহার দেহ ছন্দের তালে তালে দুলিতে লাগিল। এ কি অনির্বচনীয় অনুভূতি ! প্রতি শব্দ যেন মূর্তিমান হইয়া চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কল্পনার অলৌকিক লীলাবিলাসে, ভাবের অগাধ গভীরতায়, ছন্দের অনাহত মন্দ্র মহিমায় মালিনী আপনাকে হারাইয়া ফেলিল। এমন গান সে আর কখনো শোনে নাই। মালিনী জানিত না যে এমন গান মানুষ পূর্বে আর কখনো শোনে নাই, সে-ই প্রথম শুনিল।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত করিয়া কালিদাস ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব। তারপর মালিনী গভীর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাষ্পাকুল নেত্র কালিদাসের মুখের পানে তুলিল, ভাঙা ভাঙা স্বরে বলিল—'কবি, স্বর্গ বুঝি এমনিই হয় ? কোন্ পুণ্যে আমি স্বর্গ চোখে দেখলুম !—না না, আমি এর যোগ্য নই, এ গান আমাকে শোনাবার জন্যে নয়—এ গান

রাজাদের জন্যে। দেবতাদের জন্যে—' সহসা মালিনী কবির হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—'কবি, আমার একটা কথা শুনবে ? রানিমাকে তোমার গান শোনাবে ?'

কালিদাসের মুখে বেদনার ছায়া পড়িল—'মালিনী, রাজারানীদের আমার গান শুনিয়ে কী লাভ ! তোমার ভাল লেগেছে, এই যথেষ্ট।'

মালিনী ব্যাকুলভাবে বলিল—'না না কবি, আমার ভাল-লাগা কিছু নয়, আমার ভাল-লাগা তুচ্ছ। আমি কতটুকু ? আমার বুকে আমি এত ভাল-লাগা ধরে রাখতে পারি না। কবি, বলো আমার কথা শুনবে ? রাজাকে শোনাতে না চাও শুনিও না, কিন্তু রানিমা'কে তোমার গান শোনাতেই হবে। বলো শোনাবে ! আমার রানী ভানুমতী—ওগো কবি, তুমি জানো না—তাঁর মত মানুষ আর হয় না। তিনিই তোমার মরম বুঝবেন, তিনি তোমার গানে ডুবে যাবেন—'

কালিদাসের বিমুখতা ক্রমে দূর হইতেছিল, তবু তিনি আপত্তি তুলিয়া বলিলেন—'কিন্তু কাব্য যে এখনো শেষ হয়নি।'

মালিনী বলিল—'না হোক। যা হয়েছে তাই শোনাবে।'

কালিদাস তখন দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলিলেন—'তা—ভাল। রানী যদি শুনতে চান—'

কালিদাসের কথা শেষ হইবার পূর্বেই মালিনী সোল্লাসে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রানী ভানুমতীর মহলে একটি প্রশস্ত কক্ষের মেঝেয় স্থানে স্থানে মৃগচর্মের আস্তরণ বিস্তৃত। মধ্যস্থলে একটি গজদন্ত পালঙ্কের উপর ভানুমতী অর্ধশয়ান রহিয়াছেন। বক্ষের নিচোল কিছু শিথিল, চুলের ফুল আতপ্ত দ্বিপ্রহরে মুরঝাইয়া গিয়াছে। রানীর কাছে দাসী কিঙ্করী কেহ নাই, কেবল মালিনী পালঙ্কের পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ব্যগ্র-হ্রস্ব কণ্ঠে কথা বলিতেছে—'হ্যাঁ গো রানিমা, সত্যি বলছি তোমাকে, এমন গান তুমিও শোনোনি কখনো। শুনতে শুনতে মনে হয়—' মালিনী দুই হাত নাড়িয়া নিজের মনের অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না—'কি বলে বোঝাব তোমাকে ভেবে পাই না। চোখে জল আসে, বুক ভরে ওঠে—নাঃ বলতে পারছি না। তুমি একবার নিজের কানে শোনো রানিমা। দেখো তখন, সব ভুলে যাবে, সংসার মনে থাকবে না।'

মালিনীর উদ্দীপনা দেখিয়া ভানুমতী একটু হাসিলেন—'বড় সরলা তুই মালিনী। সংসার ভুলিয়ে দিতে পারে এমন কবি আজকাল আর জন্মায় না। আমি সব আধুনিক কবির গান শুনেছি ; তারা সব স্তাবক—চাটুকার, কেবল ইনিয়ে বিনিয়ে রাজার প্রশস্তি লিখতে জানে।'

মালিনী বলিল—'ওগো রানিমা, আমার কবি তেমন নয়, সে কারুর তোষামোদ করে না, সে কেবল ঠাকুর দেবতার গান লেখে। মহাদেব পার্বতী—মদন বসন্ত—এই সব।'

ভানুমতী আলস্যজড়িত স্বরে বলিলেন—'যাই হোক, আমার মালিনীটিকে যে-কবি এমন করে পাগল করেছে, তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে—'

মালিনী উৎসাহে আহ্লাদে রানীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল—'দেখবে তাকে রানিমা ? দেখবে ?'

ভানুমতী বলিলেন—'দেখতে পারি। কিন্তু কি করে সম্ভব ভেবে পাচ্ছি না।—তোর কবি তো রাজসভায় যাবে না ; আর অন্দরমহলে আনা, সেও অসম্ভব।'

মালিনী বলিল—'অসম্ভব কেন রানিমা, তোমার হুকুম পেলে আমি সব ঠিক করতে পারি।'

'কী ঠিক করতে পারিস ?'

'এই—আমার কবি চুপিচুপি তোমার মহলে এসে গান শুনিয়ে যাবে, কেউ কিছু জানতে পারবে না। তুমি শুধু তোমার চেড়িদের একটু তফাতে রেখো—বাকি যা দরকার আমি করব।'

ভানুমতী ঊর্ধ্বে চক্ষু তুলিয়া একটু ভ্রূকুটি করিলেন, একটু হাসিলেন—'মন্দ হয় না, নতুন

রকমের হয়। আর্যপুত্রকে—'

এক যবনী প্রতিহারী আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইল। তাহার নীল চক্ষু, সোনালী চুল, বক্ষে লৌহজালিক ; ভাঙা-ভাঙা উচ্চারণ। সে বলিল—'দেবপাদ মহারাজ আসছেন, সঙ্গে কঞ্চুকী মহাশয়।'

বার্তা ঘোষণা করিয়া প্রতিহারী অপসৃতা হইল। রানী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া উত্তরীয় দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিলেন। তাঁহার চোখের ইঙ্গিতে মালিনী ঘরের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

বিক্রমাদিত্য প্রবেশ করিলেন, পশ্চাতে কঞ্চুকী। কঞ্চুকী নপুংসক ; কৃশকায় মুণ্ডিতশীর্ষ কদাকার, চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহ ও অসন্তোষ স্থায়িভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্ব ভক্ষণের অব্যবহিত পরে মুখের আকৃতি যেরূপ হয়, কঞ্চুকীর মুখের সহজ অবস্থাই সেইরূপ।

ভানুমতী অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে দাঁড়াইয়া আর্যপুত্রের সংবর্ধনা করিলেন, উভয়ের চোখে চোখে যে প্রসন্নতার বিনিময় হইল, তাহা হইতে অনুমান হয় যে এই রাজ-দম্পতির মধ্যে প্রণয়ের উৎসধারা এখনো মন্দবেগ হয় নাই। রানীর দিকে আসিতে আসিতে রাজা একবার পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—'তুমি এখন যেতে পারো কঞ্চুকী।'

কঞ্চুকী পশ্চাৎ হইতে রাজ-দম্পতিকে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া চলিল। দ্বারের কাছে পৌঁছিয়া সে ঘরের চারিদিকে একবার সতর্ক সন্দিগ্ধ চক্ষু ফিরাইল ; ঘরের কোণে দণ্ডায়মানা মালিনীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া সে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর নিঃশব্দে মুণ্ড সঞ্চালন করিয়া তাহাকে কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইবার ইঙ্গিত করিল। মালিনী শঙ্কিত মুখে পা টিপিয়া টিপিয়া কঞ্চুকীর আগে আগে দ্বারপথে নির্গত হইল।

কক্ষ শূন্য হইয়া গেলে ভানুমতী দুই বাহু দিয়া রাজার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া স্নিগ্ধ কৌতুকের স্বরে বলিলেন—'আজ বুঝি আমার সতীন পতিদেবতাকে ধরে রাখতে পারল না ?'

মহারাজ স্মিতমুখে ভ্রূ তুলিলেন—'তোমার সতীন ?'

ভানুমতী বলিলেন—'তাকে আপনি চেনেন না আর্যপুত্র ? পুরুষ জাতি এমনি কপটই বটে। আমার সতীনের নাম রাজসভা, যাকে ছেড়ে আপনি এক দণ্ডও থাকতে পারেন না।'

রাজা ভানুমতীর কুন্তল হইতে একটি ফুল লইয়া আঘ্রাণ করিলেন, আবার তাহা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। ভানুমতী বলিয়া চলিলেন—'শুনেছি কনিষ্ঠা ভার্যার প্রতি পুরুষের অনুরাগ বেশি হয়, কিন্তু মহারাজের সবই বিপরীত—জ্যেষ্ঠার প্রতি তাঁর আসক্তি বেশি। রাজ্যশ্রী চিরযৌবনা, তাই বুঝি তাকে এত ভালবাসেন মহারাজ।'

বিক্রমাদিত্যের মুখ হইতে কৌতুকের ছায়া অপসৃত হইল, তিনি ভানুমতীর মুখ দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ গভীর অনুরাগভরে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—'তা জানি না। রাজ্যশ্রী যদি যায়, তবু তুমি আমার বুক জুড়ে থাকবে। কিন্তু তুমি যদি যাও আমার চোখে রাজ্যশ্রীর এ সম্মোহন রূপ কি থাকবে ? রাজলক্ষ্মী যে তোমারই ছায়া ভানুমতী।'

বাষ্পাকুল চক্ষে ভানুমতী পতির বক্ষের উপর ললাট রাখিলেন, গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—'ও কথা বলতে নেই প্রিয়তম। রাজলক্ষ্মীই প্রধানা, আমি কেউ নই। মহাকাল করুন রাজলক্ষ্মীর কোলে আপনাকে তুলে দিয়ে যেন যেতে পারি।'

কিছুক্ষণ উভয়ে তদবস্থায় রহিলেন। বাহিরে মানমন্দির হইতে দিবা তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করিয়া বাঁশি বাজিয়া উঠিল। রানীর একটি সখী মঞ্জীর বাজাইয়া কক্ষের দ্বার পর্যন্ত আসিয়া রাজ-দম্পতিকে আশ্লেষবদ্ধ অবস্থায় দেখিয়া জিহ্বাকর্তনপূর্বক লঘুচরণে পলায়ন করিল।

রাজারানী পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া পালঙ্কের উপর পাশাপাশি বসিলেন ; ভানুমতী হাসিমুখে বলিলেন—'কিন্তু আজ মহারাজ তিন প্রহরের আগেই সভা থেকে পালিয়ে এলেন কেন তা তো

বললেন না। সভাকবিরা কি চিত্তবিনোদন করতে পারল না?'

রাজা মুখে কারুণ্য ফুটাইয়া বলিলেন—'চিত্তবিনোদন! সভাকবিদের ভয়েই তো তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি ভানুমতী।'

হাস্য গোপন করিয়া রানী কপট ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—'ছি মহারাজ, আপনি বীর কেশরী, আর কিনা কয়েকজন নির্জীব হংসপুচ্ছধারী কবির ভয়ে পালিয়ে এলেন?'

বিক্রমাদিত্য বলিলেন—'উপায় কি? কবি দিঙ্‌নাগ সংবাদ পাঠালেন যে তিনি 'কুম্ভকর্ণ-সংহার' নামে মহাকাব্য শেষ করেছেন, আমাকে শোনাবার জন্যে উটের পিঠে কাব্য বোঝাই করে সভায় নিয়ে আসছেন। শুনে অমরসিংহ, বররুচি, বরাহমিহির—যাঁরা সভায় ছিলেন, সকলেই উঠে দ্রুত প্রস্থান করলেন। আমিও আর বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনা করে. অন্তঃপুরের দিকে চলে এলাম। এখানে অন্তত দিঙ্‌নাগ ঢুকতে পারবে না।'

ভানুমতী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। রাজা বলিলেন—'এবার এসো, একদান পাশা খেলা যাক।'

ভানুমতী হাস্য সংবরণ করিয়া ডাকিলেন—'মধুশ্রী! বনজ্যোৎস্না!'

দুইটি সখী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতী তাহাদের বলিলেন—'মহারাজ পাশা খেলবেন, খেলার উপযোগ কর।'

সখিদ্বয় ত্বরিতে কাজে লাগিয়া গেল। মধুশ্রী কুট্টিমের মধ্যস্থল হইতে মৃগচর্ম অপসারিত করিতেই মর্মরের উপর খোদিত অক্ষবাট বাহির হইয়া পড়িল; বনজ্যোৎস্না দুইটি পক্ষ্মল আসন তাহার দুই পাশে বিছাইয়া দিল, তারপর ঘরের কোণ হইতে গজদন্তের একটি ক্ষুদ্র পেটিকা আনিয়া অক্ষবাটের পাশে রাখিল।

রাজা ও রানী গিয়া আসনে বসিলেন; রাজা পেটিকাটি অক্ষবাটের উপর উজাড় করিয়া দিয়া পার্ষ্টি তিনটি তুলিয়া লইলেন, রানী রঙিন গুটিকাগুলি যথাস্থানে সাজাইতে লাগিলেন।

রাজা পার্ষ্টিগুলি দুই হাতে ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—'আজ তোমাকে নিশ্চয় হারাবো।' তাঁহার কথার ভাবে মনে হয় রানীকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করা তাঁহার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া ওঠে না।

রানী মুখ টিপিয়া হাসিলেন—'ভাল কথা। কিন্তু যদি হেরে যান কী পণ দেবেন?'

বিক্রমাদিত্য উদার কণ্ঠে বলিলেন—'যা চাও। অঙ্গদ কুণ্ডল দণ্ড মুকুট—কিছুতেই আপত্তি নেই।—জয় কৈতবনাথ!'

মহারাজ ঘর্ঘর শব্দে পাশা ফেলিলেন। খেলা আরম্ভ হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে খেলা জমিয়া উঠিল। আরো কয়েকটি সখী কিঙ্করী আসিয়া জুটিল এবং চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া সকুতূহলে খেলা দেখিতে লাগিল। রাজার পাশে সুরা-ভৃঙ্গার, রানীর পাশে তাম্বূলকরঙ্ক; দু'জনেই খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। খেলার মত্ততায় তাঁহারা কখনো কলহ করিতেছেন, কখনো উচ্চহাস্য করিতেছেন; মুখের অর্গলও খুলিয়া গিয়াছে, প্রগল্‌ভ শাণিত বাক্যবাণে উভয়ে পরস্পরকে বিদ্ধ করিতেছেন। সখীরা পরম কৌতুকে এই রঙ্গরস উপভোগ করিতেছে।

ক্রমে খেলা শেষ হইয়া আসিল। মহারাজের মুখ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল তাঁহার অবস্থা ভাল নয়। তবু তিনি বীরের ন্যায় শেষ পর্যন্ত লড়িলেন। কিন্তু কোনো ফল হইল না। বাজি শেষ হইলে ভানুমতী উচ্ছলিত হাসিয়া বলিলেন—'আর্যপুত্র, আবার আপনি হেরে গেলেন!'

বিক্রমাদিত্য অত্যন্ত বিমর্ষভাবে একপাত্র সুরা পান করিয়া ফেলিলেন.—তারপর কপট ক্রোধের

ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন—'অয়ি দর্পিতা বিজয়িনি, তোমার বড় অহঙ্কার হয়েছে। আচ্ছা, আর একদিন তোমার গর্ব খর্ব করব। এখন তোমার পণ দাবি কর।'

ভানুমতী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত হইয়া আসিল। তিনি কুহক মধুর স্বরে বলিলেন—'এখন নয় আর্যপুত্র। আজ রাত্রে—নিভৃতে—আমার বর ভিক্ষা চেয়ে নেব।'

রাজার চক্ষু দু'টিও প্রীতিহাস্যে ভরিয়া উঠিল।

রাজপুরীর পুরসীমার অন্তর্ভুক্ত বিহার ভূমি। অদূরে অবরোধের তোরণদ্বার দেখা যাইতেছে।

বৃক্ষ গুল্মাদি শোভিত বিহার ভূমির উপর দিয়া মালিনী ও কালিদাস অবরোধের পানে চলিয়াছেন। কালিদাসের বাহুতলে অসমাপ্ত কুমারসম্ভবের পুঁথি। মালিনী সাবধান সতর্ক চক্ষে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে।

কবি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, তাঁহার ভাব-ভঙ্গিতে বিশেষ সতর্কতা নাই; তিনি যেন মালিনীর এই ছেলেমানুষী কাণ্ডে লিপ্ত হইয়া একটু আমোদ অনুভব করিতেছেন মাত্র। ক্রমে দু'জনে অবরোধদ্বারের অনতিদূরে এক বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালিনী সংহত কণ্ঠে বলিল—'আস্তে। সামনেই দেউড়ি।'

কালিদাস উঁকি মারিয়া দেখিলেন। আমাদের পূর্বপরিচিত নবযুবক দৌবারিক শূলহস্তে পাহারায় নিযুক্ত—আর কেহ নাই।

মালিনী দ্রুত-অনুচ্চ কণ্ঠে কালিদাসকে কিছু উপদেশ দিয়া একাকিনী অবরোধদ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; কালিদাস বৃক্ষকাণ্ডের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রক্ষী দ্বারের সম্মুখে পরিক্রমণ করিতেছিল, মালিনীকে আসিতে দেখিয়া একগাল হাসিল। মালিনী পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল, তারপর সন্ত্রস্তভাবে এদিকে ওদিকে চাহিয়া নিজ ঠোঁটের উপর তর্জনী রাখিল।

রক্ষী ঘোর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—'কি হয়েছে? অমন করছ কেন?'

মালিনী চাপা গলায় বলিল—'চুপ—চেঁচিও না। তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি!'

রক্ষী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—'কি জিনিস?'

মালিনী রহস্যপূর্ণভাবে বলিল—'লাড়ু।' কোঁচড়ের উপর হাত রাখিয়া মালিনী ইঙ্গিতে জানাইল যে লাড়ু ঐখানে আছে। রক্ষীর মুখ আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল—'অ্যাঁ—লাড়ু! আমার জন্যে এনেছ? দেখি দেখি।'

মালিনী মাথা নাড়িল—'এখানে নয়। খাবে তো ওদিকে চল—ঐ মল্লিকা-ঝাড়ের আড়ালে।'

লাড়ু খাইবার জন্য মল্লিকা-ঝাড়ের আড়ালে যাইবার কী প্রয়োজন? কিংবা মালিনীর মনে আরো কিছু আছে? উৎসাহে রক্ষী ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু অবরোধের দ্বার ছাড়িয়াই বা যায় কি করিয়া! সে ইতস্তত করিয়া বলিল—'তা—তা—দেউড়ি খালি থাকবে?'

মালিনী বলিল—'তাতে কি হয়েছে? এ সময় কেউ আসবে না।'

রক্ষী দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলিল—'তা আসে না বটে—কিন্তু কঞ্চুকী মশাই—। কাজ নেই মালিনী, তুমি লাড়ু দাও, আমি এখানে দাঁড়িয়েই খাই।'

মালিনী ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—'দেউড়িতে দাঁড়িয়ে লাড়ু খাবে! যদি কেউ দেখে ফ্যালে কী ভাববে বল দেখি।'

রক্ষী বলিল—'তাও বটে। কিন্তু উপায় কি বলো? দেউড়ি ছাড়া যে বারণ।'

মালিনী রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, বলিল—'বেশ, কাজ নেই তোমার লাড়ু খেয়ে, আমি আর কাউকে খাওয়াব। এত যত্ন করে নিজের হাতে তৈরি করেছিলুম—'

রক্ষী আর পারিল না, বলিল,—'না না মালিনী, তোমার লাড়ু খাচ্ছি। চল কোথায় যাবে।'

দেয়ালের গায়ে বল্লম হেলাইয়া রাখিয়া রক্ষী মালিনীর পিছে পিছে চলিল। ওদিকে কালিদাস গাছের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলেন। তোরণ হইতে বিংশতি হস্ত দক্ষিণে একটি মল্লিকার ঝোপ ছিল, মালিনী ও রক্ষী তাহার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। মালিনী সাবধানে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া রক্ষীকে দ্বারের দিকে পিছন করিয়া দাঁড় করাইল। রক্ষী ব্যাপার না বুঝিয়া বিস্ময়ভরে মালিনীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

মালিনী বলিল—'হয়েছে। এবার চোখ বোজো।'

রক্ষী বলিল—'চোখ বুজবো ? কেন ?'

মালিনী ধমক দিয়া বলিল—'যা বলছি কর। যতক্ষণ হুকুম না দিই চোখ খুলবে না।'

রক্ষী অগত্যা চক্ষু মুদিত করিল। লাড়ুর লোভ যতটা না হোক, মালিনীকে প্রসন্ন রাখা প্রয়োজন। সে একটুতে বড় রাগিয়া যায়।

মালিনীর কিন্তু রক্ষীকে বিশ্বাস নাই ; কে জানে হয়তো চোখের পাতার ফাঁকে দেখিতেছে। মালিনী তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল ; না, চোখ বুজিয়াই আছে, দেখিতেছে না। মালিনী তখন হাত তুলিয়া কালিদাসকে ইশারা করিল। কালিদাস বৃক্ষতল হইতে নিক্রান্ত হইয়া গুটিগুটি অরক্ষিত দ্বারের পানে চলিলেন।

রক্ষী চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, বলিল—'কি হল। লাড়ু কৈ ?'

মালিনী চকিতে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—'এই যে। হাঁ করো।'

রক্ষী হাঁ করিল, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দু'টিও খুলিয়া গেল। কালিদাস তখনো অর্ধপথে ; মালিনী ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল—'ও কি করছ। চোখ বন্ধ কর—চোখ বন্ধ কর।'

কালিদাস রক্ষীর পিছন দিক দিয়া যাইতেছিলেন তাই সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। সে আবার চোখ বন্ধ করিল, সঙ্গে সঙ্গে মুখও বন্ধ হইল। মালিনী গলা বাড়াইয়া দেখিল কালিদাস নির্বিঘ্নে তোরণে প্রবেশ করিলেন। তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে রক্ষীর মুখের পানে চাহিল, হাসিয়া বলিল—'নাও এবার মুখ খোলো।'

রক্ষী যুগপৎ চক্ষু ও মুখ খুলিল।

মালিনী বলিল—'দূর, হল না। চোখ বন্ধ, মুখ খোলা—এই রকম—বুঝলে।'

মালিনী প্রক্রিয়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও রক্ষী কৃতকার্য হইল না ; হাঁ করিলেই চক্ষু খুলিয়া যায়। মালিনী হাসিতে লাগিল। রক্ষী কাতর স্বরে বলিল—'কি করি—হচ্ছে না যে।'

মালিনী বলিল—'তাহলে লাড়ু পেলে না।'

হাসিতে হাসিতে সে দ্বারের দিকে চলিল। অর্ধপথে থামিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—'তুমি ততক্ষণ অভ্যেস কর। ফিরে এসে যদি দেখি ঠিক হয়েছে, তখন লাড়ু পাবে।'

মালিনী অবরোধের ভিতর অন্তর্হিত হইয়া গেল। রক্ষী বিমর্ষ মুখে ফিরিয়া আসিয়া বল্লমটি তুলিয়া লইল, তারপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গভীর মনঃসংযোগে চক্ষু মুদিত রাখিয়া মুখব্যাদান করিবার দুরূহ সাধনায় আত্মনিয়োগ করিল।

অবরোধের প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্যে একটি উদ্যানে মহাদেবী ভানুমতীর সখী-কিঙ্করীরা জমা হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা কম নয়, প্রায় গুটি পঞ্চাশ। কেহ বৃক্ষশাখায় লম্বিত ঝুলায় দুলিতে দুলিতে গান করিতেছে ; এক ঝাঁক যুবতী ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে ; কোথাও দুইটি সখী

পাশাপাশি বসিয়া মালা গাঁথিতেছে এবং মৃদুকণ্ঠে জল্পনা করিতেছে। আজ তাহারা রানীর পরিচর্যা হইতে ছুটি পাইয়াছে।

দূর হইতে কালিদাস তাহাদের দেখিতে পাইয়া সেইদিকেই চলিয়াছিলেন, পিছন হইতে মালিনী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। আর একটু হইলেই সর্বনাশ হইয়াছিল ; সখীরা দেখিতে পাইত অবরোধে পুরুষ প্রবেশ করিয়াছে। কঞ্চুকী মহাশয়ের কানে কথা উঠিত—

মালিনী দৃঢ়ভাবে কবির হাত ধরিয়া তাঁহাকে অন্য পথে টানিয়া লইয়া চলিল। —

মহাদেবী ভানুমতীর বিরামকক্ষটি লূতাজালের মত সূক্ষ্ম তিরস্করিণীর দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক ভাগে রানীর বসিবার আসন, অন্য ভাগে কবির জন্য একটি মৃগচর্ম ও পুঁথি রাখিবার নিম্ন কাষ্ঠাসন। ভানুমতী নিজ আসনে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কক্ষে অন্য কেহ নাই।

ত্বরিত অথচ সতর্ক পদক্ষেপে মালিনী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, একবার ঘরের চারিদিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক সঞ্চালনে রানীকে জানাইল যে কালিদাস আসিয়াছেন। রানী বেশবাস সংবরণপূর্বক ঘাড় নাড়িয়া অনুমতি দিলেন। তখন মালিনী পাশের দিকে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

কালিদাস অলিন্দে অপেক্ষা করিতেছিলেন, দ্বারের সম্মুখে আসিলেন ; উভয়ে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মালিনী ভিতর হইতে কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

রানীকে দেখিতে পাইয়া কালিদাস হাত তুলিয়া সংযত স্বরে বলিলেন—'স্বস্তি।'

কালিদাসের প্রশান্ত অপ্রগল্‌ভ মুখচ্ছবি, তাঁহার অনাড়ম্বর হ্রস্বোক্তি ভানুমতীর ভাল লাগিল, মনের ঔৎসুক্যও বৃদ্ধি পাইল। তিনি স্মিতমুখে হস্ত প্রসারণ করিয়া কবিকে বসিবার অনুজ্ঞা জানাইলেন।

কবি আসনে উপবেশন করিয়া পুঁথির বাঁধন খুলিতে লাগিলেন ; মালিনী অদূরে মেঝের উপর বসিল।

অবরোধের উদ্যানে ভানুমতীর সখীরা পূর্ববৎ গান গাহিতেছে, ঝুলায় ঝুলিতেছে, ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে। একটি সখী কোমরে আঁচল জড়াইয়া লীলাভরে নৃত্য করিতেছে, অন্য কয়েকটি তরুণী করকঙ্কণ বাজাইয়া গান ধরিয়াছে—

ওপথে দিস্‌নে পা
দিস্‌নে পা লো সই
মনে তোর রইবে না সুখ
রইবে না লো সই।
যদি না মন বাঁচে
কালো তোর হবে সোনার গা লো সই—

ভানুমতীর কক্ষে কুমারসম্ভব পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। ভানুমতী করলগ্নকপোলে শুনিতেছেন, প্রতি শ্লোকের অনুপম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষু কবির মুখের পানে তুলিতেছেন। কোথা হইতে আসিল এই অখ্যাতনামা ঐন্দ্রজালিক, এই তরুণকান্তি কথাশিল্পী!

কালিদাস পড়িতেছেন—উমার রূপ বর্ণনা :

দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা—

ভানুমতীর বিরামকক্ষের পাশে একটি গুপ্ত অলিন্দ আছে; দেখিতে কতকটা সুড়ঙ্গের মত। প্রাচীরগাত্রে মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন রন্ধ্র আছে, সেই রন্ধ্রপথে কক্ষের অভ্যন্তর দেখা যায়। অবরোধের প্রত্যেক কক্ষে, যাহাতে কঞ্চুকী মহাশয় স্বয়ং অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য রাখিতে পারেন সেই জন্য এইরূপ ব্যবস্থা।

রানীর একটি সহচরী—নাম ভ্রমরী—পা টিপিয়া টিপিয়া অলিন্দ পথে চলিয়াছে। তাহার মুখে সন্দেহপূর্ণ উত্তেজনার ব্যঞ্জনা। একটি ছিদ্রের নিকটে আসিয়া সে কান পাতিয়া শুনিল—কক্ষ হইতে একটানা গুঞ্জনধ্বনি আসিতেছে। তখন ভ্রমরী ডিঙি মারিয়া সন্তর্পণে ছিদ্রপথে উঁকি মারিল।

রন্ধ্রটি নীচের দিকে ঢালু; ভ্রমরী কক্ষের কিয়দংশ দেখিতে পাইল। কালিদাস কাব্য পাঠ করিতেছেন, স্বচ্ছ তিরস্করিণীর অন্তরালে ভানুমতী উপবিষ্টা। মালিনী রন্ধ্রের দৃষ্টিচক্রের বাহিরে ছিল বলিয়া ভ্রমরী তাহাকে দেখিতে পাইল না।

কিছুক্ষণ একাগ্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রমরী রন্ধ্রমুখ হইতে সরিয়া আসিল, উত্তেজনা-বিবৃত চক্ষে চাহিয়া নিজ তর্জনী দংশন করিল; তারপর দ্রুত লঘুপদে ফিরিয়া চলিল।

অতঃপর ভ্রমরী উদ্যানে ফিরিয়া গিয়া তাহার প্রিয় বয়স্যা মধুশ্রীকে কী বলিল, মধুশ্রী তাহার প্রিয়সখী মঞ্জুলার কানে কানে কী বার্তা শুনাইল এবং সর্বশেষে অবরোধের রক্ষক কঞ্চুকী মহাশয়ের কাছে সংবাদটি কীভাবে বহুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উপস্থিত হইল তাহার বিশদ বর্ণনা প্রয়োজন নাই। গুপ্তকথার বিচিত্র ভুজঙ্গপ্রয়াত গতিভঙ্গির সহিত আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত।

ইতিমধ্যে, রানী ভানুমতীর কক্ষে কালিদাস রতিবিলাপ নামক চতুর্থ সর্গ পাঠ শেষ করিয়াছেন। এই পর্যন্তই লেখা হইয়াছে। মদনপ্রিয়া রতির নব-বৈধব্যের মর্মান্তিক বর্ণনা শুনিয়া দেবী ভানুমতী কাঁদিয়াছেন, তাঁহার চক্ষু দু'টি অরুণাভ। মালিনীর কপোলও অশ্রুধারায় অভিষিক্ত।

পাঠ শেষে কালিদাস ধীরে ধীরে পুঁথি বন্ধ করিলেন; ভানুমতী আর্দ্র তদ্‌গত কণ্ঠে বলিলেন—'ধন্য কবি! ধন্য মহাভাগ!'—

কঞ্চুকী এতক্ষণে আসিয়া গুপ্ত রন্ধ্রপথে উঁকি মারিতেছিল। কক্ষ হইতে কোমল কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, রানী বলিতেছেন—'আবার কতদিনে দর্শন পাব?'

কালিদাস বলিলেন—'দেবি, আপনার অনুগ্রহ লাভ করে আমি কৃতার্থ; যখন আদেশ করবেন তখনি আসব। কিন্তু কাব্য শেষ হতে এখনো বিলম্ব আছে—'

ভানুমতী বাধা দিয়া বলিলেন—'না না, শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারব না।'

কালিদাস স্মিতমুখে কহিলেন—'ভাল, পরের সর্গ শেষ করে আমি আবার আসব।'

হাত তুলিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদনপূর্বক কালিদাস মালিনীর দিকে ফিরিলেন।

কঞ্চুকী রন্ধ্রমুখে কান খাড়া করিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু আর কিছু শুনিতে পাইল না। তখন সে রন্ধ্রমুখ হইতে সরিয়া আসিয়া ভ্রূবদ্ধ ললাটে ক্ষণেক চিন্তা করিল, তারপর শিখার গ্রন্থি খুলিয়া আবার তাহা বাঁধিতে বাঁধিতে অলিন্দ হইতে অপসৃত হইল।

বিক্রমাদিত্যের অস্ত্রাগার। একটি বৃহৎ কক্ষ; নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে প্রাচীরগুলি সুসজ্জিত। এই অস্ত্রগুলির উপর মহারাজের যত্ন ও মমতার অন্ত নাই। তিনি স্বহস্তে এগুলিকে প্রতিনিয়ত মার্জন করিয়া থাকেন।

বর্তমানে, কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বেদিকার প্রান্তে বসিয়া তিনি তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়

তরবারিটি পরিষ্কার করিতেছেন। তাঁহার পাশে ঈষৎ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কঞ্চুকী নিম্নস্বরে কথা বলিতেছে। রাজার মুখ কালবৈশাখীর মেঘের মত অন্ধকার ; চক্ষে মাঝে মাঝে বিদ্যুদ্বহ্নির চমক খেলিতেছে। তিনি কিন্তু কঞ্চুকীর মুখের পানে তাকাইতেছেন না।

কঞ্চুকী বার্তা শেষ করিয়া বলিল—'যেখানে স্বয়ং মহাদেবী—এঁ—লিপ্ত রয়েছেন সেখানে আমার স্বাধীনভাবে কিছু করার অধিকার নেই। এখন দেবপাদ মহারাজের যেমন অভিরুচি।'

মহারাজ তাঁহার চক্ষু তরবারি হইতে তুলিয়া ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কঞ্চুকীর পানে চাহিলেন ; কয়েক মুহূর্ত তাঁহার খরধার দৃষ্টি কঞ্চুকীর মুখের উপর স্থির হইয়া রহিল। তারপর আবার তরবারিতে মনঃসংযোগ করিয়া তিনি ধীর সংযত কণ্ঠে বলিলেন—'এখন কিছু করবার দরকার নেই। শুধু লক্ষ্য রাখবে। সে—সে—ব্যক্তি যদি আবার আসে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দেবে।'

কঞ্চুকী মাথা ঝুঁকাইয়া সম্মতি জানাইল। তাহার বিকৃত মনোবৃত্তি যে এই ব্যাপারে উল্লসিত হইয়াছে, তাহা তাহার স্বভাব-তিক্ত মুখ দেখিয়াও বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

রাজপ্রাসাদের স্ফটিকনির্মিত ডমরুসদৃশ বালু-ঘটিকা হইতে ক্ষীণ ধারায় বালু ঝরিয়া পড়িতেছে। কয়েক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে।

একদিন অপরাহ্ণে ভানুমতীর কক্ষে কবির জন্য মৃগচর্ম ও পুঁথি রাখিবার জন্য কাষ্ঠাসন যথাস্থানে ন্যস্ত হইয়াছে। ভানুমতী নতজানু হইয়া পরম শ্রদ্ধাভরে কাষ্ঠাসনটি ফুল দিয়া সাজাইয়া দিতেছেন। কক্ষে অন্য কেহ নাই।

মালিনী দ্বারের নিকট প্রবেশ করিয়া মস্তক-সঞ্চালনে ইঙ্গিত করিল ; প্রত্যুত্তরে ভানুমতী ঘাড় নাড়িলেন, তারপর তিরস্করিণীর অন্তরালে নিজ আসনে গিয়া বসিলেন।

মালিনী বাহিরের দিকে হাতছানি দিয়া কবিকে ডাকিল, কবি পুঁথি-হস্তে দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময় বিক্রমাদিত্য নিজ অস্ত্রাগারে বসিয়া একাকী একটি চর্মনির্মিত গোলাকৃতি বর্ম পরিষ্কার করিতেছিলেন। কঞ্চুকী বাহির হইতে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল ; মহারাজ তাহার দিকে চক্ষু তুলিলেন। কঞ্চুকী কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া যেন রাজার অকথিত প্রশ্নের উত্তরে ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িল।

রাজা বর্ম রাখিয়া দ্বারের কাছে গেলেন। দ্বারের পাশে প্রাচীরে একটি কোষবদ্ধ তরবারি ঝুলিতেছিল, কঞ্চুকী তাহা তুলিয়া লইয়া অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে রাজার সম্মুখে ধরিল। রাজা একবার তীব্র দৃষ্টিতে কঞ্চুকীকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর এক ঝটকায় তরবারি কোষমুক্ত করিয়া স্বহস্তে তরবারি লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। কঞ্চুকী পিছে পিছে চলিল।

ভানুমতীর কক্ষে কালিদাস পার্বতীর তপস্যা অংশ পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। কপোল-ন্যস্ত-হস্তা রানী অবহিত হইয়া শুনিতেছেন ; তাঁহার দুই চক্ষে নিবিড় রস-তন্ময়তার আভাস।

গুপ্ত অলিন্দে তরবারি হস্তে মহারাজ আগে আগে আসিতেছেন, পশ্চাতে কঞ্চুকী। রন্ধ্রের সম্মুখে আসিয়া মহারাজ দাঁড়াইলেন ; রন্ধ্রপথে একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন, তারপর সেই দিকে কর্ণ ফিরাইয়া রন্ধ্রাগত স্বর-গুঞ্জন শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ পূর্ববৎ কঠিন ও ভয়াবহ হইয়া রহিল।

রন্ধ্রপথে ছন্দোবদ্ধ শব্দের অস্পষ্ট গুঞ্জরন আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে রাজা প্রাচীরে স্কন্ধ

অর্পণ করিয়া দাঁড়াইলেন। হাতের তরবারিটা অস্বস্তিদায়ক ; সেটা কয়েকবার এহাতে ওহাতে করিয়া শেষে কঞ্চুকীর হাতে ধরাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কঞ্চুকী মহারাজের দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিল ; কিন্তু তাঁহার বজ্রকঠিন মুখ দেখিয়া মানসিক অবস্থা অনুমান করিতে পারিল না। সে ঈষৎ উদ্বিগ্নভাবে মনে মনে জল্পনা করিতে লাগিল—কি আশ্চর্য ! মহারাজ এখনও ক্ষেপিয়া যাইতেছেন না কেন ?

ভানুমতীর কক্ষে কালিদাস পাঠ শেষ করিয়া পুঁথি বাঁধিতেছেন, রানীর দিকে চোখ তুলিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন—'ওই পর্যন্ত হয়েছে মহারানী।'

ভানুমতী প্রশ্ন করিলেন—'কবি, বাকিটুকু কত দিনে শুনতে পাব ? আমার মন যেন আর ধৈর্য মানছে না। কবে কাব্য শেষ হবে ?'

কালিদাস বলিলেন—'মহাকাল জানেন। তিনিই স্রষ্টা, আমি অনুলেখক মাত্র। এবার অনুমতি দিন দেবি।'

গুপ্ত অলিন্দে রাজা এতক্ষণ দেয়ালে ঠেস দিয়া ছিলেন, হঠাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। কঞ্চুকী মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তাড়াতাড়ি তরবারিটি বাড়াইয়া ধরিল। রাজা তরবারির পানে আরক্ত দৃষ্টিপাত করিয়া সেটি নিজ হস্তে লইলেন, তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে বাহিরে চলিলেন।

কঞ্চুকীর মনে আশা জাগিল, এতক্ষণে রাজার রক্ত গরম হইয়াছে। সে উৎফুল্ল মুখে তাঁহার অনুবর্তী হইল।

রানীর কক্ষে কালিদাস পুঁথি হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ভানুমতী দাঁড়াইয়া যুক্তকরে তাঁহাকে বিদায় দিতেছেন। মালিনী দ্বারের দিকে চলিয়াছে ; কবিকে বাহিরে পৌঁছাইয়া দিয়া সে আবার ফিরিয়া আসিবে।

সহসা প্রবল তাড়নে দ্বার খুলিয়া গেল। মুক্ত তরবারি হস্তে বিক্রমাদিত্য সম্মুখে দাঁড়াইয়া। মালিনী সভয়ে পিছাইয়া আসিয়া আর্ত চিৎকার কণ্ঠমধ্যে রোধ করিল।

রাজা প্রবেশ করিলেন, পশ্চাতে কঞ্চুকী। রাজার তীব্রোজ্জ্বল চক্ষু একবার চারিদিকে বিচরণ করিল ; মালিনী এক কোণে মিশিয়া গিয়া থর থর কাঁপিতেছে ; কালিদাস তাঁর নিজের ভাষায় 'চিত্রার্পিতারম্ভ' ভাবে দাঁড়াইয়া ; মহাদেবী ভানুমতী প্রশান্ত নেত্রে রাজার পানে চাহিয়া আছেন, যেন মন হইতে কাব্যের ঘোর এখনো কাটে নেই।

কবির দিকে একবার কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা ভানুমতীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, দুইজনে নিষ্পলক চক্ষে পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে রানীর মুখে ঈষৎ কৌতুকহাস্য দেখা গেল। রাজা চাপা গর্জনে বলিলেন—'মহাদেবি ভানুমতি, এই কি তোমার উচিত কাজ হয়েছে ?'

ভানুমতী বলিলেন—'কি কাজ আর্যপুত্র ?'

বিক্রমাদিত্য গভীর ভর্ৎসনাভরে বলিলেন—'এই দেব-ভোগ্য কবিতা তুমি একা-একা ভোগ করছ। আমাকে পর্যন্ত ভাগ দিতে পারলে না ! এত কৃপণ তুমি !'

কক্ষ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কালিদাসের মুখে চোখে নবোদিত বিস্ময়। কঞ্চুকী হঠাৎ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া খাবি খাওয়ার মত শব্দ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন ; কঞ্চুকীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, সে ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া উঠিল—'মহারাজ, আমি—আমি বুঝতে পারিনি।'

রাজা ঈষৎ চিন্তার ভান করিয়া বলিলেন—'সম্ভব। তুমি জানতে না যে মহাদেবী পাশার বাজি জিতে এই পণ চেয়ে নিয়েছিলেন। যাও, তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু—ভবিষ্যতে মহাদেবী

ভানুমতী সম্বন্ধে মনে মনেও আর এমন ধৃষ্টতা কোরো না।'

বিক্রমাদিত্য হাতের তরবারিটা কঞ্চুকীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন; মসৃণ হর্ম্যতলে তরবারি পিছলাইয়া কঞ্চুকীর দুই পায়ের ফাঁক দিয়া গলিয়া গেল। কঞ্চুকী লাফাইয়া উঠিল, তারপর তরবারি কুড়াইয়া লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

রাজার মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল। তিনি কালিদাসের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন, কবির স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন—'তরুণ কবি, তোমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করা আমার পক্ষে আরও কঠিন। তুমি আমাকে উপেক্ষা করে রানীকে তোমার কাব্য শুনিয়েছ। তোমার কি বিশ্বাস বিক্রমাদিত্য শুধু যুদ্ধ করতেই জানে, কাব্যের রস গ্রহণ করতে সে অক্ষম?'

কালিদাস ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'মহারাজ—আমি—'

বিক্রমাদিত্য বাধা দিয়া বলিলেন—'কোনো কথা শুনব না। তোমার শাস্তি, আবার আমাকে তোমার কাব্য গোড়া থেকে শোনাতে হবে। আড়াল থেকে যতটুকু শুনেছি তাতে অতৃপ্তি আরো বেড়ে গেছে—' রানীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—'এস দেবি, আমরা দু'জনে কবির পায়ের কাছে বসে আজ দেব-দম্পতির মিলন-গাঁথা শুনব।'

রাজা ও রানী পাশাপাশি ভূমির উপর উপবেশন করিলেন; কালিদাস ঈষৎ লজ্জিতভাবে নিজ আসনে বসিবার উপক্রম করিলেন।

মালিনী এতক্ষণ এক কোণে লুকাইয়া কাঁপিতেছিল, এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন অনুভব করিয়া দ্বিধাজড়িত পদে বাহির হইয়া আসিল। কবিকে অক্ষতদেহে আবার কাব্য পাঠের উদ্যোগ করিতে দেখিয়া তাহার মন নির্ভয় হইল—বিপদ বুঝি কাটিয়াছে।

রাজা মালিনীকে দেখিতে পান নাই, কালিদাসকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—'কবি, কাব্যপাঠ আরম্ভ করবার আগে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আজ থেকে তুমি আমার সভাকবি হলে।'

কালিদাস ত্রস্তবিব্রত হইয়া বলিলেন—'না না মহারাজ, আমি এ সম্মানের যোগ্য নই।'

রাজা বলিলেন—'সে কথা বিশ্ববাসী বিচার করুক। আগামী শারদোৎসবের দিন আমি মহান কবি-সভা আহ্বান করব, দেশ-দেশান্তরের রাজা পণ্ডিত রসজ্ঞদের নিমন্ত্রণ করব—তাঁরা এসে তোমার কাব্য শুনবেন।'

কালিদাস অভিভূতভাবে বসিয়া রহিলেন। রাজা পুনশ্চ বলিলেন—'কিন্তু বসন্তের কোকিলের ন্যায় তুমি কোথা থেকে এলে কবি? তোমার নাম কি?'

কবি বলিলেন—'অধমের নাম কালিদাস।'

'কালিদাস—কালিদাস—' রাজা স্মৃতি মন্থন করিতে করিতে বলিলেন—'কয়েক মাস আগে ঋতুসংহার নামে একটি মধুর রসের কাব্য পড়েছিলাম, মনে হচ্ছে কবির নাম ছিল কালিদাস। তুমি কি সেই কালিদাস?'

কবি বলিলেন—'হাঁ আর্য। ইতিপূর্বে ঋতুসংহার ও মেঘদূত নামে দু'টি খণ্ডকাব্য লিখেছি।'

রাজা বলিলেন—'মেঘদূত! কৈ, আমি তো দেখিনি। বোধহয় আমার বর্তমান সভাকবি সেটি আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন। যা হোক, তুমি উজ্জয়িনীতে কোথায় বাস কর?'

মালিনী এতক্ষণে রাজার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কালিদাসকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া বলিল—'উনি যে নদীর ধারে কুঁড়ে ঘর তৈরি করেছেন—সেইখানেই থাকেন।'

রাজা ঘাড় ফিরাইয়া মালিনীকে দেখিলেন, তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া পাশে বসাইলেন; ছদ্ম কোপের কণ্ঠে বলিলেন—'দূতী! দূতী! তুমি ফুলের বেসাতি কর, না ভোমরার?'

মালিনী ঈষৎ ভয় পাইয়া বলিল—'ফ্ ফুলের, মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'হুঁ। ভেবেছ তোমার কথা আমি কিছু জানি না ? সব জানি। আর, শাস্তিও দেব তেমনি। কঞ্চুকীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব—তখন বুঝবে।'

পরিহাস বুঝিতে পারিয়া মালিনী হাসিল। রাজা কালিদাসের পানে ফিরিলেন—'কিন্তু নদীর ধারে কুঁড়ে ঘর ! তা তো হতে পারে না। তোমার জন্য নগরে প্রাসাদ নির্দিষ্ট হবে, সেখানে তুমি থাকবে।'

কালিদাস হাত জোড় করিলেন—'মহারাজ, আপনার অসীম কৃপা। কিন্তু আমার কুটিরে আমি পরম সুখে আছি।'

রাজা বলিলেন—'কিন্তু কবিকে বিষয়-চিন্তা থেকে মুক্তি দেওয়া রাজার কর্তব্য। নইলে কবি কাব্য রচনা করবেন কি করে ? অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ !'

কালিদাস বলিলেন—'রাজাধিরাজ, আমার কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। মহাকাল আমাকে যা দিয়েছেন তার অধিক আমি কামনা করি না। মনের দৈন্যই দৈন্য মহারাজ।'

'ধনসম্পদ চাও না ?'

'না আর্য। আমি মহাকালের সেবক। আমার দেবতা চির-নগ্ন, তাই তিনি চির-সুন্দর। আমি যেন চিরদিন আমার নগ্নসুন্দর দেবতার উপাসক থাকতে পারি।'

অবন্তীর বিশাল রাজমন্ত্রভবনের মধ্যে একটি কক্ষে পঞ্চাশজন মসীজীবী অনুলেখক সারি দিয়া ভূমির উপর বসিয়াছে। প্রত্যেকের সম্মুখে একটি করিয়া অনুচ্চ কাষ্ঠপীঠিকা, তদুপরি মসীপাত্র ভূর্জপত্রের কুণ্ডলী প্রভৃতি ন্যস্ত। স্বয়ং জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ একটি লিখিত পত্র হস্তে লইয়া অনুলেখকদের সম্মুখে পাদচারণ করিতেছেন এবং পত্রটি উচ্চকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া পাঠ করিতেছেন ; অনুলেখকগণ শুনিয়া শুনিয়া লিখিতেছেন।

জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ স্থূলকায় মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, অপিচ রসিক। তিনি পড়িতেছেন—'আগামী শারদ পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগর মহোৎসব দিবসে—হুম্ হুম্—সভাকবি শ্রীকালিদাস বিরচিত কুমারসম্ভবম্ নামক মহাকাব্য অবন্তীর রাজসভায় পঠিত হইবে...অথ শ্রীমানের, বিকল্পে শ্রীমতীর—অহহহ—চরণরেণুকণাস্পর্শে অবন্তীর রাজসভা পবিত্র হৌক—হুম্—'

মন্ত্রগৃহে স্বয়ং বিক্রমাদিত্য উপবিষ্ট। তাঁহার একপাশে স্তূপীকৃত নিমন্ত্রণ-লিপির কুণ্ডলী, মহামন্ত্রী একটি করিয়া লিপি রাজার সম্মুখে ধরিতেছেন, দ্বিতীয় এক কর্মিক ক্ষুদ্র দর্বীতে দ্রবীভূত জতু লইয়া পত্রের উপর ঢালিয়া দিতেছে, মহারাজ তাহার উপর মুদ্রাঙ্গুরীয়ের ছাপ দিতে দিতে বলিতেছেন—'উত্তরাপথে দক্ষিণাপথে যেখানে যত জ্ঞানী গুণী রসজ্ঞ আছেন—পুরুষ নারী—কেউ যেন বাদ না যায়—'

উজ্জয়িনী নগরীর পূর্ব তোরণ। তোরণ হইতে তিনটি পথ বাহির হইয়াছে ; দুইটি পথ প্রাকারের ধার ঘেঁষিয়া উত্তরে ও দক্ষিণে গিয়াছে, তৃতীয়টি তীরের মত সিধা পূর্বমুখে গিয়াছে।

পঞ্চাশজন অশ্বারোহী রাজদূত তোরণ হইতে বাহিরে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল। পৃষ্ঠে আমন্ত্রণ-লিপির বস্ত্রপেটিকা ঝুলিতেছে, অস্ত্রশস্ত্রের বাহুল্য নাই।

গোপুর শীর্ষ হইতে দুন্দুভি ও বিষাণ বাজিয়া উঠিল। অমনি অশ্বারোহী দল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল ; দুই দল উত্তরে ও দক্ষিণে চলিল, মাঝের দল ময়ূরসঞ্চারী গতিতে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইল।

কুন্তল রাজ্যের রাজভবন ভূমি। পূর্বোল্লিখিত সরোবরের মর্মর সোপানের উপর কুন্তল রাজকুমারী একাকিনী বসিয়া আছেন। মুখে চোখে হতাশা ও নৈরাশ্য পদাঙ্ক মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে, কেশ বেশ অযত্নবিন্যস্ত ; বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন যেন তাঁহার শেষ হইয়া গিয়াছে।

সরোবরের জল বায়ুস্পর্শে কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে ; রাজকুমারী লীলাকমলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া জলে ফেলিতেছেন ; কোনোটি নৌকার মত ভাসিয়া যাইতেছে, কোনোটি ডুবিতেছে।

অদূরে একটি তরুশাখায় হেলান দিয়া বিদ্যুল্লতা গান গাহিতেছে, তাহার গানের গুঞ্জরন কতক রাজকুমারীর কানে যাইতেছে, কতক যাইতেছে না—

ভাস্‌লো আমার ভেলা—
সাগর জলে নাগরদোলা ওঠা-নামার খেলা
সেথা ভাস্‌লো আমার ভেলা। ...

গান শেষ হইয়া গেল ; রাজকুমারী তাঁহার ভাসমান পদ্মপলাশগুলির পানে চাহিয়া ভাবিতেছেন—'দিনের পর দিন...আজকের দিন শেষ হল, আবার কাল আছে...তারপর আবার কাল...কালের কি অবধি নেই— ?'

রাজকুমারীর পিছনে চতুরিকা আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাতে কুণ্ডলিতে নিমন্ত্রণ-লিপি। সে বিষণ্ণমুখে ইতস্তত করিয়া রাজকুমারীর পাশে আসিল, সোপানের পৈঠার উপর পা মুড়িয়া বসিতে বসিতে বলিল—'পিয়সহি, অবন্তীর রাজসভা থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, তোমার জন্যে স্বতন্ত্র লিপি—'

নিরুৎসুকভাবে লিপি লইয়া রাজকুমারী জতুমুদ্রা খুলিয়া দেখিলেন, চতুরিকা বলিয়া চলিল—'মহারাজ সভা থেকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরও আলাদা নিমন্ত্রণ-লিপি এসেছে কিন্তু তিনি যেতে পারবেন না। বলে পাঠালেন, তুমি যদি যেতে চাও তিনি সুখী হবেন।'

লিপি পাঠ শেষ করিয়া রাজকুমারী আবার তাহা কুণ্ডলাকারে জড়াইতে লাগিলেন, যেন চতুরিকার কথা শুনিতে পান নাই এমনিভাবে জলের পানে চাহিয়া রহিলেন। ঈষৎ তিক্ত হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল, তিনি লিপি জলে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিলেন কিন্তু ফেলিলেন না। চতুরিকার দিকে না ফিরিয়াই অবসন্ন কণ্ঠে বলিলেন—'পিতা সুখী হবেন ? বেশ—যাব।'

উজ্জয়িনীর পূর্ব-তোরণ পুষ্পপল্লব ও মাল্যে শোভা পাইতেছে। তিনটি পথ দিয়া পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় মানুষ আসিয়া তোরণের রন্ধ্রমুখে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। রাজন্যবর্গ হস্তীর গলঘণ্টা বাজাইয়া মন্দমন্থর গতিতে আসিতেছেন ; যোদ্ধৃবেশধারী পদাতি অশ্ব, এমন কি উষ্ট্রও আছে। মাঝে মাঝে দু'একটি চতুর্দোলা আসিতেছে ; সূক্ষ্ম আবরণের ভিতর লঘু মেঘাবৃত শরৎচন্দ্রের ন্যায় সম্ভ্রান্ত আর্য মহিলা।

একটি দোলা তোরণমধ্যে প্রবেশ করিল ; সঙ্গে মাত্র দুই চারিজন পদাতি পরিচর। দোলায় ক্ষীণাবরণের মধ্যে এক সুন্দরী বিমনাভাবে করতলে কপোল রাখিয়া বসিয়া আছেন। দর্শকদের মধ্যে যাহারা দোলার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিল তাহারা অনুমান করিল, ইনি কুন্তল রাজদুহিতা হৈমশ্রী।

সভাগৃহের প্রবেশদ্বারে মহামন্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন উচ্চ কর্মচারী দাঁড়াইয়া আছেন। অতিথিগণ একে একে দুয়ে দুয়ে আসিতেছেন, মহামন্ত্রী তাঁহাদের পদোচিত অভ্যর্থনাপূর্বক তিলক-চন্দন ও গন্ধমাল্যে ভূষিত করিয়া অভ্যন্তরে প্রেরণ করিতেছেন। নেপথ্যে মধুর স্বননে বাঁশি বাজিতেছে।

সভার অভ্যন্তরে বক্তার বেদী ব্যতীত অন্য আসনগুলি ক্রমশ ভরিয়া উঠিতেছে। সন্নিধাতা কিঙ্করগণ সকলকে নির্দিষ্ট আসনে লইয়া গিয়া বসাইতেছে। উর্ধ্বে মহিলাদের মঞ্চেও অল্প শ্রোত্রীসমাগম হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মহাদেবী ভানুমতীর আসন এখনো শূন্য আছে।

কালিদাসের কুটির প্রাঙ্গণে কবি সভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, মালিনী তাঁহার ললাটে চন্দন পরাইতে দিতেছে। মালিনীর চোখ দু'টি অরুণাভ, যেন লুকাইয়া কাঁদিয়াছে। সে থাকিয়া থাকিয়া দন্ত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিতেছে।

কুমারসম্ভবের পুঁথি বেদীর উপর রাখা ছিল, তাহা কবির হাতে তুলিয়া দিতে দিতে মালিনী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'এতদিন তুমি আমার কবি ছিলে, আজ সারা পৃথিবীর কবি হলে। কত লোক তোমার গান শুনবে, ধন্যি ধন্যি করবে—'

কালিদাস সলজ্জ হাসিলেন—'কি যে বলো। আমার কাব্য লেখার চেষ্টা বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানো। হয়তো সবাই হাসবে।'

মালিনী তাঁহার বিনয় বচনে কান না দিয়া বলিল—'আজ পৃথিবীর যত জ্ঞানী গুণী সবাই তোমার গান শুনবে, কেবল আমিই শুনতে পাব না—'

কালিদাস সবিস্ময়ে চক্ষু তুলিলেন—'তুমি শুনতে পাবে না কেন?'

মালিনী দীনকণ্ঠে বলিল—'সভায় কত রাজা রানী, কত বড় বড় লোক এসেছেন, সেখানে আমাকে কে জায়গা দেবে কবি!'

কালিদাসের মুখের ভাব দৃঢ় হইল, তিনি মালিনীর একটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—'রাজসভায় যদি তোমার জায়গা না হয় তাহলে আমারও জায়গা হবে না। এস।'

মালিনীর চক্ষু দু'টি সহসা-উদ্‌গত অশ্রুজলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অধর কাঁপিয়া উঠিল।

রাজসভা অগুরুগন্ধে আমোদিত। অতিথিগণ স্ব স্ব আসনে বসিয়াছেন, সভায় তিল ফেলিবার স্থান নাই। রাজ-বৈতালিক প্রধান বেদীর উপর যুক্তকরে দাঁড়াইয়া মহামান্য অতিথিগণের সাদর সম্ভাষণ গান করিতেছেন। কিন্তু সেজন্য সভার জল্পনা গুঞ্জন শান্ত হয় নাই। সকলেই প্রতিবেশীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন, চারিদিকে ঘাড় ফিরাইয়া সভার শিল্পশোভা দেখিতেছেন, মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন।

উপরে মহিলামঞ্চও কলভাষিণী মহিলাপুঞ্জে ভরিয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রস্থলে মহাদেবীর স্বতন্ত্র আসন কিন্তু এখনো শূন্য।

বৈতালিক স্তবগান গাহিয়া চলিয়াছেন।

মহিলামঞ্চের দ্বারের কাছে দেবী ভানুমতীকে আসিতে দেখা গেল। তিনি কুন্তলকুমারী হৈমশ্রীর হাত ধরিয়া হাস্যালাপ করিতে করিতে আসিতেছেন। হৈমশ্রীও সময়োচিত প্রফুল্লতার সহিত কথা কহিতেছেন। মনে হয় উৎসবের বাতাবরণে আসিয়া তাঁহার অবসাদ কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইয়াছে।

তাঁহারা স্বীয় আসনে গিয়া পাশাপাশি বসিলেন। রাজবংশজাতা অন্য কোনো মহিলা বোধ হয় আসেন নাই, কেবল কুন্তলকুমারীই আসিয়াছেন। সেকালে মহিলা মহলে বিদ্যাচর্চার সমধিক অসম্ভাব ছিল বলিয়া মনে হয়; তাই যে দুই চারিটি বিদুষী নারী দেখা দিতেন, তাঁহারা অতিমাত্রায় সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিতেন।

বৈতালিকের স্তুতিগান শেষ হইয়া আসিতেছে।

মালিনী ভীরু সঙ্কুচিত পদে মহিলামঞ্চের দ্বারের কাছে আসিয়া ভিতরে উঁকি মারিল। ভিতরে

আসিয়া অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে একাসনে বসিবার সাহস নাই, সে দ্বারের কাছেই ইতস্তত করিতে লাগিল। তাহার হাতে একটি ফুলের মালা ছিল, মাধবী ও বান্ধুলি পুষ্প দিয়া গঠিত। মালাগাছি লইয়াও বিপদ ; পাছে কেহ দেখিয়া হাসে। মালিনী অবশেষে মালাটি কোঁচড়ের মধ্যে রাখিয়া দ্বারের পাশেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। এখান হইতে গলা বাড়াইলে নিম্নে বক্তার বেদী সহজেই দেখা যায়।

বৈতালিকের গান শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোর রবে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়া সভাগৃহ-মধ্যে তুমুল ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল।

তারপর—

সভা একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছে, পাতা নড়িলে শব্দ শোনা যায়।

কালিদাস বেদীর উপর বসিয়াছেন, সম্মুখে উন্মুক্ত পুঁথি। তিনি একবার প্রশান্ত চক্ষে সভার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তারপর মন্দ্রকণ্ঠে পাঠ আরম্ভ করিলেন—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

মহিলামঞ্চের মধ্যস্থলে কুন্তলকুমারী নির্নিমেষ নেত্রে নিম্নে কালিদাসের পানে চাহিয়া আছেন। এ কে ? সেই মূর্তি—সেই কণ্ঠস্বর ! তবে কি—তবে কি— ?

কালিদাস পাঠ করিয়া চলিয়াছেন। শ্রোতাদের মনশ্চক্ষে ধীরে ধীরে একটি দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতেছে—তুষারমৌলি হিমালয়। দূরে একটি অধিত্যকা, তথায় একটি ক্ষুদ্র কুটির ও লতাবিতান। পতিনিন্দা শুনিয়া দক্ষদুহিতা সতী প্রাণবিসর্জন দিবার পর মহেশ্বর এই নির্জন স্থানে উগ্র তপস্যায় রত আছেন।

কালিদাস শ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া চলিয়াছেন। বিশাল সভা চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া আছে ; কালিদাসের কণ্ঠস্বর এই নিঃশব্দ একাগ্রতার মধ্যে মৃদঙ্গের ন্যায় মন্দ্রিত হইতেছে।

মহিলামঞ্চে কুন্তলকুমারী তন্দ্রাহতার ন্যায় বসিয়া শুনিতেছেন। বাহ্যজ্ঞান নাই, চক্ষু নিষ্পলক ; কখন বক্ষ ভেদ করিয়া নিশ্বাস বাহির হইতেছে, কখন গণ্ড বহিয়া অশ্রুর ধারা নামিতেছে তাহা জানিতেও পারিতেছেন না।

মহাকাব্যের ছন্দে ছন্দে চিত্র রচিত হইতেছে। হিমালয়ের অধিত্যকায় মহেশ্বরের লতাগৃহ। দ্বারে নন্দী প্রকোষ্ঠে হেমবেত্র লইয়া দণ্ডায়মান। বেদীর উপর যোগাসনে বসিয়া মহেশ্বর ধ্যানমগ্ন।

বনপথ দিয়া গিরিকন্যা উমা কুটিরের পানে আসিতেছেন। হস্তে ফুল জল সমিধপূর্ণ পাত্র।

বেদীপ্রান্তে পৌঁছিয়া উমা নতজানু হইয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। শঙ্কর ধ্যানমগ্ন।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত হইলে কালিদাস ক্ষণেক বিরাম দিয়া দ্বিতীয় সর্গ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

মেঘলোকে ইন্দ্রসভা। ইন্দ্র ও দেবগণ মুহ্যমানভাবে বসিয়া আছেন ; মদন ও বসন্ত প্রবেশ করিল। মদনের কণ্ঠে পুষ্পধনু, বসন্তের হস্তে চূত-মঞ্জরী। ইন্দ্র সাদরে মদনের হাত ধরিয়া বলিলেন—'এস বন্ধু, আমাদের দারুণ বিপদে তুমিই একমাত্র সহায়।'

কৈতববাদে স্ফীত হইয়া মদন সদর্পে বলিল—'আদেশ করুন দেবরাজ। আপনার প্রসাদে আমি কেবলমাত্র বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে সাক্ষাৎ পিণাকপাণির ধ্যানভঙ্গ করতে পারি।'

দেবগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মদন ঈষৎ ত্রস্ত ও চকিত হইয়া সকলের মুখের পানে চাহিল। সত্যই মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে হইবে নাকি ?—

কালিদাস কাব্যপাঠ করিয়া চলিয়াছেন। সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছে। মহিলামঞ্চে হৈমশ্রীর

অবস্থা পূর্ববৎ—বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ভানুমতী তাহা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কিছু না বলিয়া কাব্যশ্রবণে মন দিলেন।

হিমালয়। সমস্ত প্রকৃতি শীতজর্জর, তুষার-কঠিন। বৃক্ষ নিষ্পত্র, প্রাণীদের প্রাণচঞ্চলতা নাই। তপোবনের সন্নিকটে একটি শাখাসর্বস্ব বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে। মদন ও বসন্তের সূক্ষ্ম দেহ এই বৃক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি পুষ্প পল্লবে ভরিয়া উঠিল। দূরে সহসা কোকিল-কাকলি শুনা গেল। হিমালয়ে অকাল বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে।

সহসা হরিতায়িত বনভূমির উপর কিন্নর মিথুন নৃত্যগীত আরম্ভ করিল, পশুপক্ষী ব্যাকুল বিস্ময়ে ছুটাছুটি ও কলকূজন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রমথগণ প্রমত্ত উদ্দাম হইয়া উঠিল।

নন্দী প্রকৃতির এই আকস্মিক রূপান্তরে বিব্রত হইয়া চারিদিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তারপর ওষ্ঠে অঙ্গুলি রাখিয়া প্রমথদের নীরবে শাসন করিল—চপলতা করিও না, মহেশ্বর ধ্যানমগ্ন।

বেদীর উপর মহেশ্বর যোগাসনে উপবিষ্ট। চক্ষু ভ্রূমধ্যে স্থির, শ্বাস নাসাভ্যন্তরচারী, নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় দেহ নিশ্চল।

রুমঝুম মঞ্জীরের শব্দ কাছে আসিতেছে; উমা যথানিয়ত পূজার উপকরণ লইয়া আসিতেছেন। নন্দী সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল।

মহেশ্বরের ধ্যানসমাধি ক্রমে তরল হইয়া আসিতেছে; তাঁহার নয়নপল্লব ঈষৎ স্ফুরিত হইল। লতাবিতানের এক কোণে দাঁড়াইয়া মদন ধনুর্বাণ হস্তে অপেক্ষা করিতেছে। পার্বতী আসিতেছেন, এই উপযুক্ত সময়।

পার্বতী আসিয়া বেদীমূলে প্রণাম করিলেন, তারপর নতজানু অবস্থায় স্মিতসলজ্জ চক্ষু দু'টি মহেশ্বরের মুখের পানে তুলিলেন। মদনের অলক্ষিত উপস্থিতি উভয়ের মনেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; মহাদেবের অরুণায়ত নেত্র পার্বতীর মুখের উপর পড়িল।

মদন এই অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সাবধানে লক্ষ্য স্থির করিয়া সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিল।

মহেশ্বরের তৃতীয় নয়ন খুলিয়া গিয়া ধক্‌ধক্ করিয়া ললাট-বহ্নি নির্গত হইল—কে রে তপোবিঘ্নকারী। তিনি মদনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। হরনেত্রজন্মা বহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হইল।

ভয়ব্যাকুলা উমা বেদীমূলে নতজানু হইয়া আছেন। মহেশ্বর বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে একবার রুদ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তারপর তাঁহার প্রলয়ঙ্কর মূর্তি সহসা শূন্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কালিদাস মদনভস্ম নামক সর্গ শেষ করিয়া ক্ষণেকের জন্য নীরব হইলেন, সভাও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। এতগুলি মানুষ যে সভাগৃহে বসিয়া আছে, শব্দ শুনিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

কালিদাস পুঁথির পাতা উল্টাইলেন, তারপর আবার নূতন সর্গ পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

রতিবিলাপ শুনিয়া কুন্তলকুমারীর নয়নে অশ্রুধারা বহিল। ভানুমতীও আবার নূতন করিয়া কাঁদিলেন। দ্বার পার্শ্বে বসিয়া মালিনী কাঁদিল। প্রিয়-বিয়োগ ব্যথা কাহাকে বলে এতদিনে মালিনী বুঝিতে শিখিয়াছে।

কবি ক্রমে উমার তপস্যা অধ্যায়ে পৌঁছিলেন।

হিমালয়ের গহন গিরিসঙ্কটের মধ্যে কুটির রচনা করিয়া গিরিরাজসুতা উমা কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। পতি লাভার্থ তপস্যা। স্বয়ং বিশীর্ণ দ্রুমপর্ণ, অর্থাৎ আপনা হইতে খসিয়া

পড়া গাছের পাতা—তাহাও পার্বতী আর আহার করেন না। তাই তাঁহার নাম হইয়াছে—অপর্ণা।

কৃচ্ছ্রসাধন বহু প্রকার। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে তপঃকৃশা পার্বতী চারি কোণে অগ্নি জ্বালিয়া মধ্যস্থ আসনে বসিয়া প্রচণ্ড সূর্যের পানে নিষ্পলক চাহিয়া থাকেন। ইহা পঞ্চাগ্নি তপস্যা। আবার শীতের হিম-কঠিন রাত্রে যখন জলের উপর তুষারের আস্তরণ পড়ে তখন সেই আস্তরণ ছিন্ন করিয়া উমা জলমধ্যে প্রবেশ করেন ; আকণ্ঠ জলে ডুবিয়া শীতের রাত্রি অতিবাহিত হয়। সারা রাত্রি চন্দ্রের পানে চাহিয়া উমা চন্দ্রশেখরের মুখচ্ছবি ধ্যান করেন।

এইভাবে কল্প কাটিয়া যায়। তারপর একদিন—

উমার কুটির দ্বারে এক তরুণ সন্ন্যাসী দেখা দিলেন। ডাক দিলেন—'অয়মহং ভোঃ!'

উমা কুটিরে ছিলেন, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসীকে পাদ্যঅর্ঘ্য দিলেন। সন্ন্যাসীর চোখের দৃষ্টি ভাল নয় ; লোলুপনেত্রে পার্বতীকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন—'সুন্দরি, তুমি কী জন্য তপস্যা করছ ?'

পার্বতী অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন—'পতিলাভের জন্য।'

সন্ন্যাসী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'কি আশ্চর্য! তোমার মত ভুবনৈকা সুন্দরীকেও পতিলাভের জন্য তপস্যা করতে হয়! কে সেই মূঢ় যে নিজে এসে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে না! তার নাম কি ?'

পার্বতী সন্ন্যাসীর চটুলতায় বিরক্ত হইলেন, গম্ভীরমুখে বলিলেন—'তাঁর নাম শঙ্কর মহেশ্বর শিব চন্দ্রশেখর—'

সন্ন্যাসী বিপুল বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া শেষে উচ্চ ব্যঙ্গ-হাস্য করিয়া উঠিলেন—'কি বললে—শিব মহেশ্বর! সেই দিগম্বর উন্মাদটা—যে একপাল প্রেত-প্রমথ নিয়ে শ্মশানে মশানে নেচে বেড়ায়! তাকে তুমি পতিরূপে কামনা কর! হাঃ হাঃ হাঃ!'

সন্ন্যাসীর ব্যঙ্গ-বিস্ফুরিত অট্টহাস্য আবার ফাটিয়া পড়িল। পার্বতীর মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি সন্ন্যাসীর প্রতি একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—'কপট সন্ন্যাসী, তোমার এত স্পর্ধা তুমি শিবনিন্দা কর! আর আমি এখানে থাকব না।'

পার্বতী কুটিরের পানে পা বাড়াইলেন। পিছন হইতে শান্ত কোমল স্বর আসিল—'উমা, ফিরে চাও—দেখ আমি কে ?'

উমা ফিরিয়া চাহিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চিত তনু থরথর কাঁপিতে লাগিল। শিলা-রুদ্ধগতি তটিনীর ন্যায় তিনি চলিয়া যাইতেও পারিলেন না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিলেন না।

সন্ন্যাসীর স্থানে স্বয়ং মহেশ্বর। তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। পার্বতীর কণ্ঠ হইতে ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধ স্বর বাহির হইল—'মহেশ্বর!'

গিরিরাজ গৃহে হর-পার্বতীর বিবাহ।

মহা আড়ম্বর ; হুলস্থূল ব্যাপার। পুরস্ত্রীগণ হুলুধ্বনি করিতেছেন, দেবগণ অন্তরীক্ষে স্তুতিগান করিতেছেন, ভূতগণ কলকোলাহল করিয়া নাচিতেছে।

বিবাহ মণ্ডপে বর বধূ পাশাপাশি বসিয়াছেন। রতি আসিয়া মহেশ্বরের পদতলে পড়িল। গৌরী একবার মহেশ্বরের পানে অনুনয়-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

আশুতোষ প্রীত হইয়া রতির মস্তকে হস্ত রাখিলেন ; অমনি মদন পুনরুজ্জীবিত হইয়া যুক্তকরে দেব-দম্পতির সম্মুখে উপস্থিত হইল।

অবন্তীর রাজসভায় কালিদাস কুমারসম্ভব পর্ব শেষ করিয়াছেন। জয়ধ্বনিতে সভা পূর্ণ।

কবির মস্তকে মালা বর্ষিত হইতেছে ; ক্রমে তাঁহার কণ্ঠে মালার স্তূপ জমিয়া উঠিল। তিনি যুক্তকরে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া এই সংবর্ধনা গ্রহণ করিলেন।

উপরে মহিলামঞ্চেও চাঞ্চল্যের অন্ত নাই। কুঙ্কুম লাজাঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলি কবির মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। মহিলাদের রসনাও নীরব নাই, সকলে একসঙ্গে কথা কহিতেছেন। সভা ভঙ্গ হইয়াছে, তাই মহিলারাও নিজ নিজ আসন ছাড়িয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু আশু সভা ছাড়িবার কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভানুমতী মাতিয়া উঠিয়াছেন, পরম উৎসাহভরে সকলের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।

এই প্রমত্ত আনন্দ-অধীর সমষ্টির এক প্রান্তে কুন্তলকুমারী হৈমশ্রী মূর্ছাহতার ন্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষে দৃষ্টি নাই, কেবল অধরোষ্ঠ যেন কোন্ অনুচ্চারিত কথায় থাকিয়া থাকিয়া নড়িয়া উঠিতেছে—'আমার স্বামী—আমার স্বামী—'

মালিনীর অবস্থাও বিচিত্র। সে একসঙ্গে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, একবার ছুটিয়া মঞ্চের প্রান্ত পর্যন্ত যাইতেছে, আবার দ্বারের কাছে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার দিকে কাহারো দৃষ্টি নাই। মালিনী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর সাবধানে কোঁচড় হইতে মালাটি বাহির করিয়া কালিদাসের শির লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল। মালাটি চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে কালিদাসের মাথা গলিয়া পড়িল। কবি স্মিত চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন।

রাজসভা শূন্য হইয়া গিয়াছে। নীচে একটিও লোক নাই, উপরে একাকিনী কুন্তলকুমারী বসিয়া আছেন, আর মালিনী দ্বারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে কোন্ দুর্গম চিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

সহসা চমক ভাঙ্গিয়া কুন্তলকুমারী দেখিলেন তিনি একা, সকলে চলিয়া গিয়াছে। তিনি উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন। সকলে হয়তো তাঁহার ভাব-বিহ্বলতা লক্ষ্য করিয়াছে। কে কি ভাবিয়াছে কে জানে।

হৈমশ্রী দ্বারের কাছে পৌঁছিলে মালিনী চট্‌কা ভাঙ্গিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, সসম্ভ্রমে বলিল—'দেবি, আমার ওপর মহাদেবী ভানুমতীর আজ্ঞা আছে, আপনি যেখানে যেতে চাইবেন নিয়ে যাব।'

হৈমশ্রী নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিছুদূর গিয়া তাঁহার গতি হ্রাস হইল, ইতস্তত করিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, তারপর মালিনীর দিকে ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন—'তুমি কি মহাদেবী ভানুমতীর কিঙ্করী ?'

মালিনী বলিল—'হাঁ দেবি, আমি তাঁর মালিনী।'

কুন্তলকুমারী আসল প্রশ্নটি সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু গলা বুজিয়া গেল। অতি কষ্টে উচ্চারণ করিলেন—'তুমি—তুমি—কবি শ্রীকালিদাস কোথায় থাকেন তুমি জানো ?'

মালিনী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল ; সহজ সম্ভ্রমের সুরেই বলিল—'হাঁ দেবি, জানি।'

আগ্রহের কাছে সংকোচ পরাভূত হইল, কুন্তলকুমারী আর এক-পা কাছে আসিলেন—'কোথায় থাকেন তিনি ?'

মালিনীর মুখে একটু হাসি খেলিয়া গেল—'শিপ্রা নদীর ধারে নিজের হাতে কুঁড়ে ঘর তৈরি করেছেন, সেইখানেই থাকেন। তাঁর খবর নিয়ে আপনার কী লাভ দেবি ? কবি বড় গরিব, দীনদরিদ্র ; কিন্তু তিনি বড়লোকের অনুগ্রহ নেন না।'

হৈমশ্রী আর একটু কাছে আসিলেন—'তবে কি—তুমি কি—তাঁর সঙ্গে কি তোমার পরিচয় আছে ?'

তিক্ত হাসিতে মালিনীর অধরপ্রান্ত নত হইয়া পড়িল—'আছে দেবি, সামান্যই। তিনি মহাকবি, আমি মালিনী। তাঁর সঙ্গে আমার কতটুকু পরিচয় থাকতে পারে ?'

কুন্তলকুমারী কিছু শুনিলেন না, প্রবল আবেগে মালিনীর হাত চাপিয়া বলিলেন—'তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারবে ?'

মালিনীর চোখ হইতে যেন ঠুলি খসিয়া পড়িল। এতক্ষণ সে ভাবিয়াছিল রাজকুমারীর জিজ্ঞাসা বড় মানুষের ক্ষণিক কৌতূহল মাত্র ; এখন সে সন্দেহ-প্রখর চক্ষে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর সহসা প্রশ্ন করিল—'তুমি কে ? কবি তোমার কে ?'

ওষ্ঠাধর চাপিয়া কুন্তলকুমারী দুরন্ত বাষ্পোচ্ছ্বাস দমন করিলেন—'তিনি—আমার স্বামী।'

অতর্কিতে মস্তকে প্রবল আঘাত পাইলে মানুষ যেমন ক্ষণেকের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া যায়, মালিনীরও তদ্রূপ হইল। সে বিহ্বলভাবে চাহিয়া বলিল—'স্বামী—স্বামী ?'

তারপর ধীরে ধীরে তাহার উপলব্ধি ফিরিয়া আসিল, সে ঊর্ধ্বমুখে চক্ষু মুদিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—'ও স্বামী ! তাই ! বুঝতে পেরেছি, দেবি, এবার সব বুঝতে পেরেছি। তা আপনি তাঁর কাছে যেতে চান ?'

হৈমশ্রী মিনতি করিয়া বলিলেন—'হাঁ। তুমি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।'

মালিনীর বুকের ভিতরটা শূলবিদ্ধ সর্পের মত মুচড়াইয়া উঠিতেছিল, সে একটু বক্রোক্তি না করিয়া থাকিতে পারিল না—'দেবি, আপনি রাজার মেয়ে, সেখানে যাওয়া কি আপনার শোভা পাবে ? সে একটা খড়ের কুঁড়ে ঘর, সেখানে কবি নিজের হাতে রেঁধে খান। এই দারিদ্র্য কি আপনি সহ্য করতে পারবেন রাজকুমারী ?'

হৈমশ্রীর ভয় হইল মালিনী বুঝি তাঁহাকে লইয়া যাইবে না। তিনি হাতের কঙ্কণ খুলিতে খুলিতে ব্যগ্রভাবে বলিলেন—'তুমি বুঝতে পারছ না—আমি যে তাঁর স্ত্রী—সহধর্মিণী। এই নাও পুরস্কার। দয়া করে আমাকে তাঁর কুটিরে নিয়ে চল।'

হৈমশ্রী কঙ্কণটি মালিনীর হাতে গুঁজিয়া দিতে গেলেন, কিন্তু মালিনী লইল না, বিতৃষ্ণার সহিত হাত সরাইয়া লইল। তিক্ত হাসিয়া বলিল—'থাক, দরকার নেই, এইটুকু কাজের জন্যে আবার পুরস্কার কিসের ! আসুন আমার সঙ্গে।'

রাজকুমারীর জন্য অপেক্ষা না করিয়াই মালিনী চলিতে আরম্ভ করিল।

কালিদাসের কুটির প্রাঙ্গণ। কুন্তলকুমারীকে সঙ্গে লইয়া মালিনী বেদীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালিদাস নাই ; কেবল বেদীর উপর মালার স্তূপ পড়িয়া আছে। যেন কবি ক্লান্তভাবে এই সম্মানের বোঝা এখানে ফেলিয়া গিয়াছেন।

মালিনী নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছে, তাহার মুখের ভাব দৃঢ়। রাজকুমারী হৈমশ্রী যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছেন। মালিনী ঘরের উদ্দেশে ডাকিল—'কবি, ওগো কবি ! তুমি কোথায় ?'

ঘরের ভিতর হইতে সাড়া আসিল না। কুন্তলকুমারী শঙ্কিত দীন নেত্রে মালিনীর পানে চাহিলেন।

মালাগুলি জড়াজড়ি হইয়া বেদীর উপর পড়িয়া আছে, তাহার মধ্য হইতে মালিনী নিজের মালাটি বাছিয়া বাহির করিয়া লইল। পর পর লাল সাদা ফুলে গাঁথা মালা—চিনিতে কষ্ট হয় না। মালাটি সে রাজকুমারীর হাতে ধরাইয়া দিয়া বলিল—'নাও—আমার সঙ্গে এস। উনি

ঘরেই আছেন, হয়তো পুজোয় বসেছেন।'

মালিনী অগ্রবর্তিনী হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, হৈমশ্রী কম্প্রবক্ষে দ্বিধাজড়িত পদে তাহার পিছনে চলিলেন।

কুটিরে একটিমাত্র কক্ষ, আয়তনেও ক্ষুদ্র। এক পাশে কালিদাসের দীন শয্যা গুটানো রহিয়াছে, আর এক কোণে একটি দীপখণ্ড, তাহার পাশে অনুচ্চ কাষ্ঠাসনের উপর কুমারসম্ভবের পুঁথি রহিয়াছে। কিন্তু কালিদাস ঘরে নাই।

হৈমশ্রীর দেহের সমস্ত শক্তি যেন ফুরাইয়া গিয়াছিল, তিনি পুঁথির সম্মুখে জানু ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িলেন, অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন—'কই, কোথায় তিনি ?'

মালিনী সবই লক্ষ্য করিতেছিল, বুঝি বা তাহার মনে অনুকম্পাও জাগিয়াছিল। সে বাহিরে যাইতে যাইতে আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলিল—'তুমি থাক, আমি দেখছি। বুঝি নদীতে স্নান করতে গেছেন।'

মালিনী অদৃশ্য হইলে হৈমশ্রী হাতের মালাটি কুমারসম্ভবের পুঁথির উপর রাখিলেন, তারপর আর আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া পুঁথির উপর মাথা রাখিয়া সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন।

শিপ্রার তীরে কালিদাস একাকী নদীর ধারে বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে নুড়ি কুড়াইয়া লইয়া অলস-হস্তে জলে ফেলিতেছেন। রাজসভার উত্তেজনা কাটিয়া গিয়া নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতার অনুভূতি তাঁহার অন্তরকে গ্রাস করিয়া ধরিয়াছে। অন্তর্লোকে শ্রান্ত বাণী ধ্বনিত হইতেছে—কেন ? কিসের জন্য ? কাহার জন্য ?

মালিনী নিঃশব্দে তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া হ্রস্বকণ্ঠে ডাকিল—'কবি !'

কালিদাস চমকিয়া মুখ তুলিলেন—'মালিনী !'

মালিনী বলিল—'কি ভাবা হচ্ছিল ?'

কালিদাস একটু চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন—'ভাবছিলাম—অতীতের কথা।'

মালিনী মৃদুস্বরে বলিল—'কিন্তু ভাবনা সুখের নয়—কেমন ?'

কালিদাস ম্লান হাসিয়া বলিলেন—'না, সুখের নয়। কিন্তু এ জগতে সকলে সুখ পায় না মালিনী।'

মালিনী বহমানা শিপ্রার জলে একটি নুড়ি ফেলিল—'না, সকলে পায় না। কিন্তু তুমি পাবে।'

কালিদাস ভ্রূ তুলিয়া মালিনীর পানে চাহিলেন, তারপর মৃদু ঘাড় নাড়িলেন—'কীর্তি যশ সম্মান—তাতে সুখ নেই মালিনী। সুখ আছে শুধু—প্রেমে।'

মালিনীর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল ; সে কবির পানে একবার চোখ পাতিয়া যেন তাঁহাকে দৃষ্টি-রসে অভিষিক্ত করিয়া দিল, তারপর মুখ টিপিয়া বলিল—'প্রেমে জ্বালাও আছে কবি। নাও, ওঠ এখন। তোমাকে ডাকতে এসেছিলুম, একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

'ও—কে তিনি ?'

'আগে চলই না, দেখতে পাবে।'

কালিদাস উঠিলেন। শিপ্রার পরপারে সূর্যদেব তখন দিগ্‌বলয় স্পর্শ করিয়াছেন।

প্রাঙ্গণ-দ্বারে পৌঁছিয়া কালিদাস দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মালিনী কিন্তু ভিতরে আসিল না, চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কালিদাস তাহার দিকে ফিরিয়া চোখের ইঙ্গিতে

তাহাকে ভিতরে আহ্বান করিলেন, মালিনী কিন্তু একটু ফিকা হাসিয়া মাথা নাড়িল।

এই সময় কুটিরের ভিতর হইতে শঙ্খধ্বনি হইল। কালিদাস মহা বিস্ময়ে সেইদিকে ফিরিলেন। মালিনী এই অবকাশে ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণ-দ্বার বন্ধ করিয়া দিল. তাহার মুখের ব্যথা-বিদ্ধ হাসি কবাটের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল।

ওদিকে কালিদাস দ্রুত অনুসন্ধিৎসায় কুটিরের পানে চলিয়াছিলেন—তাঁহার ঘরে শঙ্খ বাজায় কে? সহসা সম্মুখে এক অপরূপ মূর্তি দেখিয়া তিনি স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। এ কি!

কুটির হইতে হৈমশ্রী বাহির হইয়া আসিতেছেন। গললগ্নীকৃত অঞ্চলপ্রান্ত, এক হস্তে দীপ অন্য হস্তে মালা। কালিদাসকে দেখিয়া তাঁহার গতি শ্লথ হইল না, স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া তিনি কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চোখ দু'টিতে এখন আর জল নাই, অধর যদিও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে তবু অধরপ্রান্তে যেন একটু হাসির আভাস নিদাঘ-বিদ্যুতের ন্যায় স্ফুরিত হইতেছে। তিনি প্রদীপটি বেদীর উপর রাখিলেন, তারপর দুই হাতে স্বামীর গলায় মালা পরাইয়া দিয়া নতজানু হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'আর্যপুত্র!'

কালিদাস জড়মূর্তির মত দাঁড়াইয়া ছিলেন; যাহা কল্পনারও অতীত তাহাই চক্ষের সম্মুখে ঘটিতে দেখিয়া তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তিও প্রায় লোপ পাইয়াছিল। এখন তিনি চমকিয়া চেতনা ফিরিয়া পাইলেন। নত হইয়া রাজকুমারী হৈমশ্রীকে দুই হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া বিহ্বল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—'দেবি, দেবি—না না, পায়ের কাছে নয়—'

কুন্তলকুমারী স্বামীর মুখের পানে চোখ তুলিয়া দেখিলেন সেখানে প্রীতি ও ক্ষমা ভিন্ন আর কিছুরই স্থান নাই, এতটুকু অভিমান পর্যন্ত নাই। যে অশ্রুকে রাজনন্দিনী এত যত্নে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা আর বাঁধন মানিল না, বাঁধ ভাঙিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল।

কালিদাস তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিতেই দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়াইলেন। অমনি মহাকালের মন্দির হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিল।—

অতঃপর কিছুক্ষণ কাটিয়াছে। ভাব-প্লাবনের প্রথম উদ্দাম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইয়াছে। উভয়ে বেদীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের হাত পরস্পর নিবদ্ধ।

কালিদাস মিনতি করিয়া বলিতেছেন—'কিন্তু দেবি, এ যে অসম্ভব। এই দীন পর্ণকুটিরে—না না, এ হতে পারে না—'

হৈমশ্রী বলিলেন—'যেখানে আমার স্বামী থাকতে পারেন সেখানে আমিও থাকতে পারব।'

কালিদাস বলিলেন—'না না, তুমি রাজার মেয়ে—'

হৈমশ্রী বলিলেন—'আমার ও পরিচয় আজ থেকে মুছে গেছে, এখন আমি মহাকবি কালিদাসের স্ত্রী।'

কালিদাসের মুখে ক্ষোভের সহিত আনন্দও ফুটিয়া উঠিল—'কিন্তু—এই দারিদ্র্য—তুমি সহ্য করতে পারবে কেন? চিরদিন ঐশ্বর্যের মধ্যে পালিত হয়েছ, রাজদুহিতা তুমি—'

হৈমশ্রী ঈষৎ ভ্রূভঙ্গ করিয়া চাহিলেন—'আর্যপুত্র, আপনার উমাও তো রাজদুহিতা—গিরিরাজসুতা; কিন্তু কৈ, তাঁকে মহেশ্বরের লতাগৃহে পাঠাতে আপনার তো আপত্তি হয়নি। তবে?'

কালিদাসের মুখে আর কথা রহিল না। হৈমশ্রীর দক্ষিণ হস্তটি ধীরে ধীরে উঠিয়া কবির বাম স্কন্ধের উপর আশ্রয় লইল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শিপ্রার পরপারে দিগন্তের অস্তচ্ছটা ক্রমশ মেদুর হইয়া আসিতেছে।

সেইদিকে চাহিয়া কালিদাস সহসা নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন ; হৈমশ্রীও তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেইদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

এক শ্রেণী উষ্ট্র শিপ্রার কিনারা ধরিয়া চলিয়াছে।

হৈমশ্রী কালিদাসের পানে একটি অপাঙ্গদৃষ্টি প্রেরণ করিলেন, নিরীহভাবে প্রশ্ন করিলেন—'ও কী আর্যপুত্র ?'

কালিদাসের মুখেও একটু হাসি খেলিয়া গেল, তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—'ওর নাম উষ্ট।'

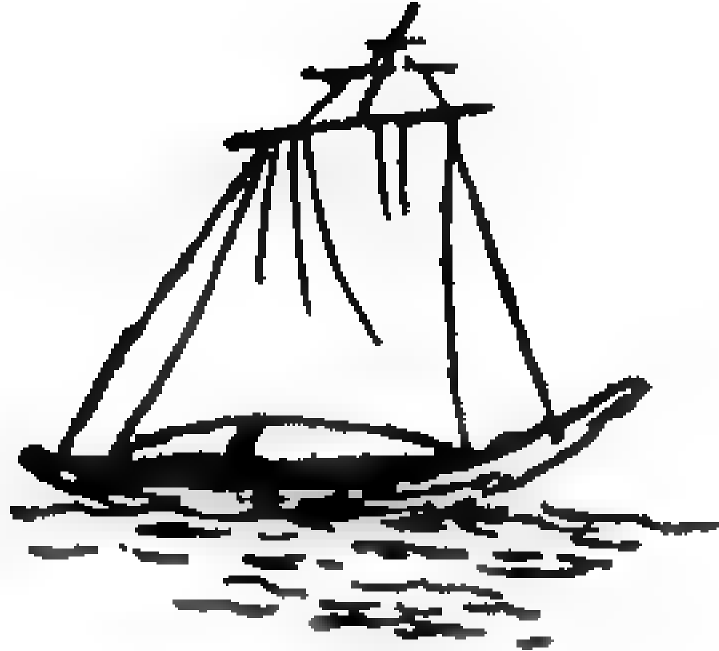
হৈমশ্রী হাসি চাপিয়া বলিলেন—'কী—কী নাম বললেন আর্যপুত্র ?'

কালিদাস তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করিলেন—'না না, উষ্ট নয়, উষ্ট নয়—উট্র !'

উভয়ে একসঙ্গে কলহাস্য করিয়া উঠিলেন। কুন্তলকুমারীর যে হস্তটি স্কন্ধ পর্যন্ত উঠিয়াছিল, তাহা ক্রমে কালিদাসের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া লইল। কালিদাসও তাঁহার মাথাটি নিজের বুকের উপরে সবলে চাপিয়া ঊর্ধ্বে আকাশের পানে চাহিলেন।

পূর্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া শারদ পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছে।

এইরূপে এক বসন্ত পূর্ণিমার তিথিতে স্বয়ংবর-সভায় যে কাহিনী আরম্ভ হইয়াছিল, আর এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় শিপ্রাতীরের পর্ণকুটিরে তাহা পরিসমাপ্তি লাভ করিল।



তুঙ্গভদ্রার তীরে

উর্মিমর্মর

দক্ষিণ ভারতে বাক্য প্রচলিত আছে : গঙ্গার জলে স্নান, তুঙ্গার জল পান। অর্থাৎ গঙ্গার জলে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, তুঙ্গার জল পান করিলেও সেই পুণ্য। তুঙ্গার জল পীযূষতুল্য, মৃত-সঞ্জীবন।

সহ্যাদ্রির সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি ক্ষুদ্র নদী উত্থিত হইয়াছে, তুঙ্গা ও ভদ্রা। দুই নদী পর্বত হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পরস্পর মিলিত হইয়াছে, এবং তুঙ্গভদ্রা নাম গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রা নদী স্বভাবতই তুঙ্গা বা ভদ্রা অপেক্ষা পুষ্টসলিলা, কিন্তু তাহার পুণ্যতোয়া খ্যাতি নাই। তুঙ্গভদ্রা অনাদৃতা নদী।

তুঙ্গভদ্রার যাত্রাপথ কিন্তু অল্প নয়। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে যাত্রা আরম্ভ করিয়া সে ভারতের পূর্ব সীমায় বঙ্গোপসাগরে উপনীত হইতে চায়। পথ জটিল ও শিলা-সঙ্কুল, সঙ্গিসাথী নাই। কদাচিৎ দুই-একটি ক্ষীণা তটিনী আসিয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তুঙ্গভদ্রা তরঙ্গের মঞ্জীর বাজাইয়া দুর্গম পথে একাকিনী চলিয়াছে।

অর্ধেকেরও অধিক পথ অতিক্রম করিবার পর তুঙ্গভদ্রার সঙ্গিনী মিলিল। শুধু সঙ্গিনী নয়, ভগিনী। কৃষ্ণা নদীও সহ্যাদ্রির কন্যা, কিন্তু তাহার জন্মস্থান তুঙ্গভদ্রা হইতে অনেক উত্তরে। দুই বোন একই সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল : পথে দেখা। দুই বোন গলা জড়াজড়ি করিয়া একসঙ্গে চলিল।

তুঙ্গভদ্রার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা কিছু ঘটে নাই, তাহার তীরে তীর্থ-সিদ্ধাশ্রম মঠ-মন্দির রচিত হয় নাই, তাহার নীরে মহানগরীর তুঙ্গ সৌধচূড়া দর্পণিত হয় নাই। কেবল একবার, মাত্র দুই শত বৎসরের জন্য তুঙ্গভদ্রার সৌভাগ্যের দিন আসিয়াছিল। তাহার দক্ষিণ তীরে বিরূপাক্ষের পাষাণমূর্তি ঘিরিয়া এক প্রাকারবদ্ধ দুর্গ-নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। নগরের নাম ছিল বিজয়নগর। কালক্রমে এই বিজয়নগর সমস্ত দাক্ষিণাত্যের উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র ছয় শতাব্দীর কথা। কিন্তু ইহারই মধ্যে বিজয়নগরের গৌরবময় স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তটে বিজয়নগরের বহুবিস্তৃত ভগ্নস্তূপের মধ্যে কী বিচিত্র ঐতিহ্য সমাহিত আছে তাহা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল তুঙ্গভদ্রা ভোলে নাই।

কোনো এক স্তব্ধ সন্ধ্যায়, আকাশে সূর্য যখন অস্ত গিয়াছে কিন্তু নক্ষত্র পরিস্ফুট হয় নাই, সেই সন্ধিক্ষণে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলে ত্রিকোণ ভূমির উপর দাঁড়াও। কান পাতিয়া শোনো, শুনিতে পাইবে তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার কানে কানে কথা বলিতেছে ; নিজের অতীত সৌভাগ্যের দিনের

গল্প বলিতেছে। কত নাম—হরিহর বুক্ক কুমার কম্পন দেবরায় মল্লিকার্জুন—তোমার কানে আসিবে। কত কুটিল রহস্য, কত বীরত্বের কাহিনী, কত কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম বিদ্বেষ কৌতুক কুতূহল, জন্মমৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনিতে পাইবে।

তুঙ্গভদ্রার এই ঊর্মিমর্মর ইতিহাস নয়, স্মৃতিকথা। কিন্তু সকল ইতিহাসের পিছনেই স্মৃতিকথা লুকাইয়া আছে। যেখানে স্মৃতি নাই সেখানে ইতিহাস নাই। আমরা আজ তুঙ্গভদ্রার স্মৃতিপ্রবাহ হইতে এক গণ্ডূষ তুলিয়া লইয়া পান করিব।

প্রথম পর্ব

এক

কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থল হইতে ক্রোশেক দূর ভাটির দিকে তিনটি বড় নৌকা পালের ভরে উজানে চলিয়াছে। তাহারা বিজয়নগর যাইতেছে, সঙ্গম পার হইয়া বামদিকে তুঙ্গভদ্রায় প্রবেশ করিবে। বিজয়নগর পৌঁছিতে তাহাদের এখনো কয়েকদিন বিলম্ব আছে, সঙ্গম হইতে বিজয়নগরের দূরত্ব প্রায় সত্তর ক্রোশ।

বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণ। ১৩৫২ শকাব্দ সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

তিনটি নৌকা আগে পিছে চলিয়াছে। প্রথম নৌকাটি আয়তনে বিশাল, সমুদ্রগামী বহিত্র। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও রণতরীর আকারে গঠিত, সঙ্কীর্ণ ও দ্রুতগামী ; তাহাতে পঞ্চাশ জন যোদ্ধা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। তৃতীয় নৌকাটি ভারবাহী ভড়, তাহার গতি মন্থর। তাই তাহার সহিত তাল রাখিয়া অন্য বহিত্র দু'টিও মন্থর গতিতে চলিয়াছে।

নৌকা তিনটি বহুদূর হইতে আসিতেছে। পূর্ব সমুদ্রতীরে কলিঙ্গদেশের প্রধান বন্দর কলিঙ্গপত্তন, সেখান হইতে তিন মাস পূর্বে তাহাদের যাত্রা শুরু হইয়াছিল। এতদিনে তাহাদের যাত্রা শেষ হইয়া আসিতেছে ; আর সপ্তাহকাল মধ্যেই তাহারা বিজয়নগরে পৌঁছিবে—যদি বায়ু অনুকূল থাকে।

যে-সময়ের কাহিনী সে-সময়ের সহস্রবর্ষ পূর্ব হইতেই ভারতের প্রাচ্য উপকূলে নৌবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ হইয়াছিল। উত্তরে 'নৌ-সাধনোদ্যত' বঙ্গদেশ হইতে দক্ষিণে তৈলঙ্গ তামিল দেশ পর্যন্ত বন্দরে বন্দরে সমুদ্রযাত্রী বৃহৎ বহিত্র প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাতে চড়িয়া ভারতের বণিকেরা ব্রহ্ম শ্যাম কম্বোজ ও সাগরিকার দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিয়া ফিরিতেছিল ; উপনিবেশ গড়িতেছিল, রাজ্যস্থাপন করিতেছিল। এইভাবে বহু শতাব্দী চলিবার পর একদা কালান্তক ঝড়ের মত দিক্‌প্রান্তে আরব জলদস্যু দেখা দিল, তাহার সংঘাতে ভারতের রতনভরা তরী লবণজলে ডুবিল। তবু ভারতের তটরেখা ধরিয়া সমুদ্রপোতের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হইল না, তটভূমি ঘেঁষিয়া নৌ-যোদ্ধার দ্বারা সুরক্ষিত পোত এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে যাতায়াত করিতে লাগিল। নদীপথেও নৌ-বাণিজ্যের গমনাগমন অব্যাহত রহিল।

নৌকা তিনটির মধ্যে সর্বাগ্রগামী নৌকাটির প্রধান যাত্রী কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যা কুমারী ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা। রাজকন্যা বিজয়নগরে যাইতেছেন বিজয়নগরের তরুণ রাজা দ্বিতীয় দেবরায়কে বিবাহ করিবার জন্য।

প্রথম নৌকাটি ময়ূরপঙ্খী। তাহার বহিরঙ্গ ময়ূরের ন্যায় গাঢ় নীল ও সবুজ রঙে চিত্রিত ; পালেও নীল-সবুজের বিচিত্র চিত্রণ। দ্বিতীয় নৌকাটি মকরমুখী ; তাহার দেহে বর্ণবৈচিত্র্য নাই, ধূসর বর্ণের নৌকা। তাহার ভিতরে আছে ত্রিশজন নৌ-যোদ্ধা ; তাহারা এই নৌ-বহরের রক্ষী। এতদ্ব্যতীত নৌকায় আছে পাচক সূপকার নাপিত ও নানা শ্রেণীর ভৃত্য। সর্ব পশ্চাৎবর্তী ভড় বিবিধ তৈজস, আবশ্যক বস্তু ও খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ। এতগুলা লোক দীর্ঘকাল ধরিয়া আহার করিবে, চাল দাল ঘৃত তৈল গম তিল গুড় শর্করা লবণ হরিদ্রা কাশমর্দ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে চলিয়াছে।

ভড়ের পিছনে একটি শূন্য ডিঙি দড়ি-বাঁধা অবস্থায় ল্যাজের মত ভড়ের অনুসরণ করিয়াছে। এক নৌকা হইতে অন্য নৌকায় যাতায়াত করিবার সময় ইহার প্রয়োজন।

এইভাবে রাজকীয় আড়ম্বরের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজনন্দিনী বিদ্যুন্মালা বিবাহ করিতে চলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনে সুখ নাই।

সেদিন অপরাহ্ণে তিনি নৌকার ছাদে বসিয়া ক্লান্ত চক্ষে জলের পানে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার বৈমাত্রী ভগিনী মণিকঙ্কণা তাঁহার সঙ্গে ছিল। মণিকঙ্কণা শুধু তাঁহার ভগিনী নয়, সখীও। তাই বিদ্যুন্মালা যখন বিবাহে চলিলেন তখন মণিকঙ্কণাও স্বেচ্ছায় সঙ্গে চলিল। বিবাহের যিনি বর তিনি ইচ্ছা করিলে বধূর সহিত তাহার অনূঢ়া ভগিনীদেরও গ্রহণ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা না করিলে পাত্রকুলের অন্য কেহ তাহাকে বিবাহ করিতেন। এই প্রথা আবহমানকাল প্রচলিত ছিল।

মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার বৈমাত্রী ভগিনী, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো একটু প্রভেদ ছিল। বিদ্যুন্মালার মাতা পট্টমহিষী রুক্মিণী দেবী ছিলেন আর্যা, কিন্তু মণিকঙ্কণার মাতা চম্পাদেবী অনার্যা। আর্যগণ প্রথম দক্ষিণ ভারতে আসিয়া একটি সুন্দর রীতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন; আর্য পুরুষ বিবাহকালে আর্যা বধূর সঙ্গে সঙ্গে একটি অনার্যা বধূও গ্রহণ করিতেন। বংশবৃদ্ধিই প্রধান উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রথাটি লোভনীয় বলিয়াই বোধকরি টিকিয়া ছিল। আর্যা পত্নীর মর্যাদা অবশ্য অধিক ছিল, কিন্তু অনার্যা পত্নীও মাননীয়া ছিলেন।

বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার বয়স প্রায় সমান, দু'এক মাসের ছোট বড়। কিন্তু আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক তফাৎ। আঠারো বছর বয়সের বিদ্যুন্মালার আকৃতির বর্ণনা করিতে হইলে প্রাচীন উপমার শরণ লইতে হয়। তন্বী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, কিন্তু চকিত হরিণীর ন্যায় চঞ্চলনয়না নয়। নিবিড় কালো চোখ দু'টি শান্ত অপ্রগল্‌ভ; সর্বাঙ্গের উচ্ছলিত যৌবন যেন চোখ দু'টিতে আসিয়া স্থির নিস্তরঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতিতেও একটি মধুর ভাবমন্থর গভীরতা আছে যাহা সহজে বিচলিত হয় না। অন্তঃসলিলা প্রকৃতি, বাহির হইতে অন্তরের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়।

মণিকঙ্কণা ঠিক ইহার বিপরীত। সে তন্বী নয়, দীর্ঘাঙ্গী নয়, তাহার সুবলিত দৃঢ়পিনদ্ধ দেহটি যেন যৌবনের উদ্বেল উচ্ছ্বাস ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চঞ্চল চক্ষু দু'টি খঞ্জনপাখির মত সঞ্চরণশীল, অধর নবকিশলয়ের ন্যায় রক্তিম। দেহের বর্ণ বিদ্যুন্মালার ন্যায় উজ্জ্বল গৌর নয়, একটু চাপা; যেন সোনার কলসে কচি দূর্বাঘাসের ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। তাহার প্রকৃতিও বড় মিষ্ট, মোটেই অন্তর্মুখী নয়; বাহিরের পৃথিবী তাহার চিত্ত হরণ করিয়া লইয়াছে। মনে ভাবনা-চিন্তা বেশি নাই, কিন্তু সকল কর্মে পটীয়সী; বিচিত্র এবং নূতন নূতন কর্মে লিপ্ত হইবার জন্য সে সর্বদাই উন্মুখ। পৃথিবীটা তাহার রঙ্গকৌতুক খেলাধূলার লীলাঙ্গন।

কিন্তু তিন মাস নিরবচ্ছিন্ন নৌকারোহণ করিয়া দুই ভগিনীই ক্লান্ত। প্রথম প্রথম সমুদ্রের ভীমকান্ত দৃশ্য তাঁহাদের মুগ্ধ করিয়াছিল, তারপর নদীর পথে দুই তীরের নিত্যপরিবর্তমান চলচ্ছবি কিছুদিন তাঁদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল। নদীর কিনারায় কখনো গ্রাম কখনো শস্যক্ষেত্র কখনো শিলাবন্ধুর তটপ্রপাত; কোথাও জলের মাঝখানে মকরাকৃতি বালুচর, বালুচরের উপর নানা জাতীয় জলচর পক্ষী—সবই অতি সুন্দর। কিন্তু ক্রমাগত একই দৃশ্যের পুনরাবর্তন দেখিতে আর ভাল লাগে না। নৌকার অল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ জীবনযাত্রা অসহ্য মনে হয়, স্থলচর জীবের স্থলাকাঙ্ক্ষা দুর্বার হইয়া ওঠে।

সেদিন দুই ভগিনী পালের ছায়ায় গুণবৃক্ষের কাণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া ছিলেন। ছাদের উপর অন্য কেহ নাই; নৌকার পিছন দিকে হালী একাকী হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে ছাদ হইতে দেখা যায় না। বিদ্যুন্মালার ক্লান্ত চক্ষু জলের উপর নিবদ্ধ, মণিকঙ্কণার চক্ষু দু'টি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত চারিদিকে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে। মণিকঙ্কণার মনে অনেক অসন্তোষ জমা হইয়া উঠিয়াছে। এ নৌকাযাত্রার কি শেষ নাই? আর তো পারা যায় না! সহসা তাহার অধীরতা বাঙ্‌মূর্তি ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল, সে বিদ্যুন্মালার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া

বলিল—'একটা কথা বল্ দেখি মালা। চিরদিনই বিয়ের বর কনের বাড়িতে বিয়ে করতে যায়। কিন্তু তুই বরের বাড়িতে বিয়ে করতে যাচ্ছিস, এ কেমন কথা?'

সত্যই তো, এ কেমন কথা! এই বিপরীত আচরণের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে কিছু ইতিহাসের চর্চা করিতে হইবে।

দুই

সঙ্গম বংশীয় দুই ভাই, হরিহর ও বুক্ক বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনকথা অতি বিচিত্র। দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘলক দুই ভ্রাতার অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাদের জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন। সে-সময়ে গুণী ও কর্মকুশল হিন্দু পাইলেই মুসলমান রাজারা তাঁহাদের বলপূর্বক মুসলমান করিয়া নিজেদের কাজে লাগাইতেন। কিন্তু হরিহর ও বুক্ক বেশি দিন মুসলমান রহিলেন না। তাঁহারা পলাইয়া আসিয়া শৃঙ্গেরি শঙ্করমঠের এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইলেন। সন্ন্যাসীর নাম বিদ্যারণ্য, তিনি তাঁহাদের হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করিলেন। তারপর দুই ভাই মিলিয়া গুরুর সাহায্যে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিজয়নগরের আদি নাম বিদ্যানগর, পরে উহা মুখে মুখে বিজয়নগরে পরিণত হয়।

কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে যখন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতেছিল, ঠিক সেই সময় কৃষ্ণার উত্তর তীরে একজন শক্তিশালী মুসলমান দিল্লীর নাগপাশ ছিন্ন করিয়া এক স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই রাজ্যের নাম বহমনী রাজ্য। উত্তরকালে বিজয়নগর ও বহমনী রাজ্যের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায় চিরস্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বহমনী রাজ্যের চেষ্টা কৃষ্ণার দক্ষিণে মুসলমান অধিকার প্রসারিত করিবে, বিজয়নগরের প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণার দক্ষিণে মুসলমানকে ঢুকিতে দিবে না।

রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনুমান শত বর্ষ পরে বিজয়নগরের যিনি রাজা হইলেন তাঁহার নাম দেবরায়। ইতিহাসে ইনি প্রথম দেবরায় নামে পরিচিত। দেবরায় অসাধারণ রাজ্যশাসক ও রণপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তুরস্ক হইতে ধানুকী সৈন্য আনাইয়া নিজ সৈন্যদল দৃঢ় করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্চাশবর্ষব্যাপী শাসনকালে সমস্ত দাক্ষিণাত্য বিজয়নগরের পদানত হইয়াছিল, মুসলমান রাজশক্তি কৃষ্ণার দক্ষিণে পদার্পণ করিতে পারে নাই।

কিন্তু দেবরায়ের দুই পুত্র রামচন্দ্র ও বিজয়রায় ছিলেন কর্মশক্তিহীন অপদার্থ। ভাগ্যক্রমে বিজয়রায়ের পুত্র দ্বিতীয় দেবরায় পিতামহের মতই ধীমান ও রণদক্ষ। তাই প্রথম দেবরায় নিজের মৃত্যুকাল আসন্ন দেখিয়া দুই পুত্রের সহিত তরুণ পৌত্রকেও যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন এবং কতকটা নিশ্চিন্ত মনে দেহরক্ষা করিলেন।

তরুণ দেবরায় পিতা ও পিতৃব্যকে ডিঙ্গাইয়া রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন। অতঃপর আট বৎসর অতীত হইয়াছে। পিতৃব্য রামচন্দ্র বেশি দিন টিকিলেন না, কিন্তু পিতা বিজয়রায় অদ্যাপি জীবিত আছেন; রাজা হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই, প্রৌঢ় বয়সে রাজপ্রাসাদে বসিয়া তিনি দুষ্ট শিশুর ন্যায় বিচিত্র খেলা খেলিতেছেন।

দেবরায়ের বয়স বর্তমানে পঁয়ত্রিশ বছর। তাঁহার দেহ যেমন দৃঢ় ও সুগঠিত, চরিত্রও তেমনি বজ্রকঠিন। গম্ভীর মিতবাক্, সংবৃতমন্ত্র পুরুষ। রাজ্যশাসন আরম্ভ করিয়া তিনি দেখিলেন, ম্লেচ্ছ

শত্রু তো আছেই, উপরন্তু হিন্দু রাজারাও নিরন্তর পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একতা নাই, সহধর্মিতা নাই। অথচ ম্লেচ্ছ-শক্তির গতিরোধ করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেবরায় একটি একটি করিয়া রাজকন্যা বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইষ্টবুদ্ধির দ্বারা যদি ঐক্যসাধন না হয় কুটুম্বিতার দ্বারা হইতে পারে। সেকালে রাজন্যবর্গের মধ্যে এই জাতীয় বিবাহ মোটেই বিরল ছিল না, বরং রাজনৈতিক কূটকৌশলরূপে প্রশংসার্হ কার্য বিবেচিত হইত।

সকল রাজা অবশ্য স্বেচ্ছায় কন্যাদান করিলেন না, কাহারও কাহারও উপর বলপ্রয়োগ করিতে হইল। সবচেয়ে কষ্ট দিলেন কলিঙ্গের রাজা গজপতি চতুর্থ ভানুদেব।

দাক্ষিণাত্যের পূর্ব প্রান্তে সমুদ্রতীরে কলিঙ্গ দেশ, বিজয়নগর হইতে বহু দূর। দেবরায়ের দূত বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইল। কলিঙ্গরাজ ভানুদেব ভাবিলেন, এই বিবাহের প্রস্তাব প্রকারান্তরে তাঁহাকে বিজয়নগরের বশ্যতা স্বীকার করার আমন্ত্রণ। তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিবেশী অন্ধ্র রাজ্য সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন, কারণ অন্ধ্র দেশ বিজয়নগরের মিত্র।

সংবাদ পাইয়া দেবরায় সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে ভানুদেব পরাজিত হইয়া শান্তি ভিক্ষা করিলেন। শান্তির শর্তস্বরূপ তাঁহাকে দেবরায়ের হস্তে নিজ কন্যাকে সমর্পণ করার প্রস্তাব স্বীকার করিতে হইল। দেবরায় কিন্তু বিবাহ করিতে শ্বশুরগৃহে আসিতে পারিবেন না; কন্যাকে বিজয়নগর পাঠাইতে হইবে, সেখানে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

তৎকালে রাজাদের নিজ রাজ্য ছাড়িয়া বহু দূরে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। চারিদিকে শত্রু ওত পাতিয়া আছে, সিংহাসন শূন্য দেখিলেই ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তাছাড়া ঘরের শত্রু তো আছেই।

ভানুদেব কন্যাকে বিজয়নগরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। স্থলপথ অতি দুর্গম ও বিপজ্জনক; কন্যা জলপথে যাইবে। কলিঙ্গপত্তন বন্দরে তিনটি বহিত্র সজ্জিত হইল। খাদ্যসামগ্রী উপঢৌকন ও জলযোদ্ধার দল সঙ্গে থাকিবে। রাজদুহিতা বিদ্যুন্মালা সখী পরিজন লইয়া নৌকায় উঠিলেন। তিনটি নৌকা সমুদ্রপথে দক্ষিণদিকে চলিল। তারপর কৃষ্ণা নদীর মোহনায় পৌঁছিয়া নদীতে প্রবেশ করিল। তদবধি নৌকা তিনটি উজানে চলিয়াছে।

যাত্রা শেষ হইতে বেশি বিলম্ব নাই। ইতিমধ্যে দুই রাজকন্যা অধীর ও উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সঙ্গে কন্যাকর্তারূপে আসিয়াছেন মাতুল চিপিটকমূর্তি এবং রাজকন্যাদের ধাত্রী মন্দোদরী। রাজবৈদ্য রসরাজও সঙ্গে আছেন। ইহাদের কথা ক্রমশ বক্তব্য।

তিন

মণিকঙ্কণার কথা শুনিয়া কুমারী বিদ্যুন্মালা তাহার দিকে ফিরিলেন না, সম্মুখে চাহিয়া থাকিয়া অলসকণ্ঠে বলিলেন—'কঙ্কণা, তুই হাসালি। এ নাকি বিয়ে! এ তো রাজনৈতিক দাবাখেলার চাল।'

মণিকঙ্কণা পা গুটাইয়া বিদ্যুন্মালার দিকে ফিরিয়া বসিল। বলিল—'হোক দাবাখেলার চাল। বর বিয়ে করতে আসবে না কেন?'

সম্মুখে অর্ধ ক্রোশ দূরে দুই নদী মিলিত হইয়া যেখানে বিক্ষুব্ধ জলভ্রমি রচনা করিয়া ছুটিয়াছে, সেইদিকে তাকাইয়া বিদ্যুন্মালার অধরপ্রান্তে একটু বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'তিন তিনটি বৌ ছেড়ে আসা কি সহজ? তাই বোধহয় আসতে পারেনি।'

মণিকঙ্কণা হাসি-হাসি মুখে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর বিদ্যুন্মালার বাহুর উপর হাত রাখিয়া

বলিল—'মহারাজ দেবরায়ের তিনটি রানী আছে, তুই হবি চতুর্থী। তাই বুঝি তোর ভাল লাগছে না?'

বিদ্যুন্মালা এবার মণিকঙ্কণার পানে চক্ষু ফিরাইলেন—'তোর বুঝি ভাল লাগছে?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'আমার ভালও লাগছে না, মন্দও লাগছে না। রাজাদের অনেকগুলো রানী তো থাকেই। এক রাজার এক রানী কখনো শুনিনি।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আমি শুনেছি। রামচন্দ্রের একটিই সীতা ছিল।'

মণিকঙ্কণা হাসিল—'সে তো ত্রেতাযুগের কথা। কলিকালে মেয়ে সস্তা, তাই পুরুষেরা যে যত পারে বিয়ে করে। যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা।'

বিদ্যুন্মালার কণ্ঠস্বর একটু উদ্দীপ্ত হইল—'বিশ্রী ব্যবস্থা। স্ত্রী যদি স্বামীকে পুরোপুরি না পায়, তাহলে বিয়ের কোনো মানেই হয় না।'

মণিকঙ্কণা কিয়ৎকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'পুরোপুরি পাওয়া কাকে বলে ভাই? স্বামী তো আর স্ত্রীর সম্পত্তি নয় যে, কাউকে ভাগ দেবে না। বরং স্ত্রীই স্বামীর সম্পত্তি।'

বিদ্যুন্মালার বিম্বাধর স্ফুরিত হইল, চোখে বিদ্রোহের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—'আমি মানি না।'

মণিকঙ্কণা কলস্বরে হাসিয়া উঠিল—'না মানলে কী হবে, বিয়ে করতে তো যাচ্ছিস!'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'যাচ্ছি। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নিরপরাধ মানুষ যেমন বধ্যভূমিতে যায়, আমিও তেমনি যাচ্ছি। যে-স্বামীর তিনটে বৌ আছে তাকে কোনোদিন ভালবাসতে পারব না।'

মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার গলা জড়াইয়া ধরিল—'কেন তুই মনে কষ্ট পাচ্ছিস ভাই! ভেবে দ্যাখ, তোর মা আর আমার মা কি মহারাজকে ভালবাসেন না? বিয়ে হোক, তুইও নিজের মহারাজটিকে ভালবাসবি। তখন আর সতীনের কথা মনে থাকবে না।'

বিদ্যুন্মালা কিছুক্ষণ বিরসমুখে চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—'মনে কর, মহারাজ দেবরায় আমার সঙ্গে সঙ্গে তোকেও গ্রহণ করলেন; তুই তাঁকে ভালবাসতে পারবি?'

মণিকঙ্কণা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—'পারব না! বলিস কি তুই! তাঁকে অন্য বৌরা যতখানি ভালবাসে আমি তার চেয়ে ঢের বেশি ভালবাসব। আমার বুকে ভালবাসা ভরা আছে। যিনিই আমার স্বামী হবেন তাঁকেই আমি প্রাণভরে ভালবাসব।'

বিদ্যুন্মালা মণিকঙ্কণাকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন, একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'আমি যদি তোর মতন হতে পারতুম! আমার মন বড় স্বার্থপর, যাকে চাই কাউকে তার ভাগ দিতে পারি না।'

মণিকঙ্কণা আবেগভরে বিদ্যুন্মালাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া লইয়া বলিল—'না না, কখনো না। তুই বড় বেশি ভাবিস; অত ভাবলে মাথা গোলমাল হয়ে যায়। যা হবার তাই যখন হবে তখন ভেবে কি লাভ?'

বিদ্যুন্মালা উত্তর দিলেন না; দুই ভগিনী ঘনীভূত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। সূর্যের বর্ণ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, রৌদ্রের উত্তাপ নিম্নগামী; দক্ষিণ তীরের গন্ধ লইয়া মন্দ মধুর বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। নদীবক্ষে এই সময়টি পরম মনোরম।

ছাদের নীচে মড়্‌মড়্‌ মচ্‌মচ্‌ শব্দ শুনিয়া যুবতিদ্বয়ের চমক ভাঙিল। মণিকঙ্কণা চকিত হাসিয়া চুপিচুপি বলিল—'মন্দোদরীর ঘুম ভেঙেছে।'

অতঃপর ছাদের উপর এক বিপুলকায়া রমণীর আবির্ভাব ঘটিল। আলুথালু বেশ, হাতে একটি রূপার তাম্বূলকরঙ্ক; সে আসিয়া থপ্‌ করিয়া রাজকন্যাদের সম্মুখে বসিল, প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া তুড়ি দিল, বলিল—'নমো দারুব্রহ্ম।'

মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালাকে চোখের ইঙ্গিত করিল, মন্দোদরীকে ক্ষেপাইতে হইবে। সময় যখন কাটিতে চায় না তখন মন্দোদরীকে লইয়া দু'দণ্ড রঙ্গ-পরিহাস করিতে মন্দ লাগে না।

কলিঙ্গের উত্তরে ওড্রদেশ, মন্দোদরী সেই ওড্রদেশের মেয়ে। বয়স অনুমান চল্লিশ, গায়ের রঙ গব্য ঘৃতের মত ; নিটোল নিভাঁজ কলেবরটি দেখিয়া মনে হয় একটি মেদপূর্ণ অলিঞ্জর। গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা, মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সদাই হাস্য-বিম্বিত। আঠারো বছর পূর্বে সে বিদ্যুন্মালার ধাত্রীরূপে কলিঙ্গের রাজসংসারে প্রবেশ করিয়াছিল, অদ্যাপি সগৌরবে সেখানে বিরাজ করিতেছে। বর্তমানে সে দুই রাজকন্যার অভিভাবিকা হইয়া বিজয়নগরে চলিয়াছে। তাহার তিন কুলে কেহ নাই, রাজসংসারই তাহার সংসার।

মণিকঙ্কণা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—'দারুব্রহ্ম তোমার মঙ্গল করুন। আজ দিবানিদ্রাটি কেমন হল ?'

মন্দোদরী পানের ডাবা খুলিতে খুলিতে বলিল—'দিবানিদ্রা আর হল কই। খোলের মধ্যে যা গরম, তালের পাখা নাড়তে নাড়তেই দিন কেটে গেল। শেষ বরাবর একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলুম।'

বিদ্যুন্মালা উদ্বেগভরা চক্ষে মন্দোদরীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'এমন করে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক'দিন বাঁচবি মন্দা। দিনের বেলা তোর চোখে ঘুম নেই, রাত্রে জলদস্যুর ভয়ে চোখে-পাতায় করতে পারিস না। শরীর যে দিন দিন শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাচ্ছে।'

মন্দোদরী গদ্‌গদ হাস্য করিয়া বলিল—'যা যা, ঠাট্টা করতে হবে না। আমি তোদের মতন অকৃতজ্ঞ নই, খাই-দাই মোটা হই। তোরা খাস-দাস কিন্তু গায়ে গত্তি লাগে না।'

পানের বাটা খুলিয়া মন্দোদরী দেখিল তাহার মধ্যে ভিজা ন্যাকড়া জড়ানো দুই-তিনটি পানের পাতা রহিয়াছে। ইহা বিচিত্র নয়, কারণ দীর্ঘপথ আসিতে পানের অভাব ঘটিয়াছে। দুই-একটি নদীতীরস্থ গ্রামে ডিঙি পাঠাইয়া কিছু কিছু পান সংগ্রহ করা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয়। অথচ পানের ভোক্তা অনেক। মন্দোদরী প্রচুর পান খায়, মাতুল চিপিটকমূর্তিও তাম্বূল-রসিক। বস্তুত যে পানের বাটাটি মন্দোদরীর সম্মুখে দেখা যাইতেছে, তাহা মাতুল মহাশয়ের। মন্দোদরী নিজের বরাদ্দ পান শেষ করিয়া মামার বাটায় হাত দিয়াছে।

বাটায় পান ছাড়াও চুন গুয়া কেয়াখয়ের মৌরী এলাচ দারুচিনি, নানাবিধ উপচার রহিয়াছে। মন্দোদরী পানগুলি লইয়া পরিপাটিভাবে পান সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

দুই ভগিনী দেখিলেন স্থূলতার প্রতি কটাক্ষপাতে মন্দোদরী ঘামিল না, তখন তাঁহারা অন্য পথ ধরিলেন। মণিকঙ্কণা বলিল—'আচ্ছা মন্দোদরি, তোকে তো আমরা জন্মে অবধি দেখছি, কিন্তু তোর রাবণকে তো কখনো দেখিনি। তোর রাবণের কি হল ?'

মন্দোদরী বলিল—'আমার রাবণ কি আর আছে, অনেক দিন গেছে। আমি রাজসংসারে আসার আগেই তাকে যমে নিয়েছে।'

বিদ্যুন্মালা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—'সত্যিই তোর স্বামীর নাম রাবণ ছিল নাকি ?'

মন্দোদরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, তার নাম ছিল কুম্ভকর্ণ।'

মণিকঙ্কণা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—'ও—তাই! তোর কুম্ভকর্ণ যাবার সময় ঘুমটি তোকে দিয়ে গেছে।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'তাহলে তোর এখন শুধু বিভীষণ বাকি !'

মন্দোদরী আর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আর বিভীষণ! তোদের সামলাতে সামলাতেই বয়স কেটে গেল, এখন আর বিভীষণ কোত্থেকে পাব।'

মণিকঙ্কণা সান্ত্বনার স্বরে বলিল—'পাবি পাবি। কতই বা তোর বয়স হয়েছে। এই দ্যাখ না,

বিজয়নগরে যাচ্ছিস, সেখানকার বিভীষণেরা তোকে দেখলে হাঁ করে ছুটে আসবে।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'কে বলতে পারে, ম্লেচ্ছ দেশের আমীর-ওমরা হয়তো তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেগম করবে।'

মন্দোদরী বলিল—'ও মা গো, তারা যে গরু খায়।'

মণিকঙ্কণা বলিল—'তোকে পেলে তারা গরু খাওয়া ছেড়ে দেবে।'

মন্দোদরী জানিত ইহারা পরিহাস করিতেছে; কিন্তু তাহার অন্তরের এক কোণে একটি লুক্কায়িত আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা এই ধরনের রসিকতায় তৃপ্তি পাইত। সে পান সাজিয়া মুখে দিল, চিবাইতে চিবাইতে বলিল—'তা যা বলিস। কার ভাগ্যে কি আছে কে বলতে পারে? নমো দারুব্রহ্ম।'

এই সময়ে নৌকার নিম্নতল হইতে তীক্ষ্ণ চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। শব্দটি স্ত্রী-কণ্ঠোত্থিত মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত উহা মাতুল চিপিটকমূর্তির কণ্ঠস্বর। কোনো কারণে তিনি জাতক্রোধ হইয়াছেন।

পরক্ষণেই তিন চার লাফ দিয়া চিপিটকমূর্তি ছাদে উঠিয়া আসিলেন। মন্দোদরী কোলের কাছে পানের বাটা লইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত হইল, তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সূচীতীক্ষ্ণ কণ্ঠে তর্জন করিলেন—'এই মন্দোদরি! আমার ডাবা চুরি করেছিস!' তিনি ছোঁ মারিয়া ডাবাটি তুলিয়া লইলেন।

মন্দোদরী গালে হাত দিয়া বলিল—'ও মা! ওটা নাকি তোমার ডাবা! আমি চিনতে পারিনি।'

চিপিটকমূর্তি ডাবা খুলিয়া দেখিলেন একটিও পান নাই, তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন—'রাক্ষুসী! সব পান খেয়ে ফেলেছিস! দাঁড়া, আজ তোকে যমালয়ে পাঠাব। ঠেলা মেরে জলে ফেলে দেব, হাঙরে কুমীরে তোকে চিবিয়ে খাবে।'

মন্দোদরী নির্বিকার রহিল; সে জানে তাহাকে ঠেলা দিয়া জলে ফেলিয়া দিবার সামর্থ্য চিপিটকমূর্তির নাই। তাছাড়া এইরূপ অজাযুদ্ধ তাহাদের মধ্যে নিত্যই ঘটিয়া থাকে। চিপিটকমূর্তি মহাশয়ের কণ্ঠস্বর যেমন সূক্ষ্ম তাঁহার চেহারাটিও তেমনি নিরতিশয় ক্ষীণ। তাঁহাকে দেখিলে গঙ্গাফড়িং-এর কথা মনে পড়িয়া যায়; সারা গায়ে কেবল লম্বা এক জোড়া ঠ্যাং, আর যাহা আছে তাহা নামমাত্র। কিন্তু মাতুল মহাশয়ের পূর্ণ পরিচয় যথাসময়ে দেওয়া যাইবে।

দুই রাজকন্যা বাহুতে বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া মাতুল মহাশয়ের বাহ্বাস্ফোট পরম কৌতুকে উপভোগ করিতেছেন ও হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন। সূর্য তুঙ্গভদ্রার স্রোতে রক্ত উদ্‌গিরণ করিয়া অস্ত যাইতেছে। নৌকা সঙ্গমের নিকটবর্তী হইতেছে, সম্মিলিত নদীর উতরোল তরঙ্গে অল্প অল্প দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নৌকাগুলি দক্ষিণদিকের তটভূমির পাশ ঘেঁষিয়া যাইতেছে, এইভাবে সঙ্গমের তরঙ্গভঙ্গ যথাসম্ভব এড়াইয়া তুঙ্গভদ্রার স্রোতে প্রবেশ করিবে। উত্তরের তটভূমি বেশ দূরে। মণিকঙ্কণার চঞ্চল চক্ষু জলের উপর ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক স্থানে আসিয়া স্থির হইল; কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সে বিদ্যুন্মালাকে বলিল—'মালা, দ্যাখ তো—ঐ জলের ওপর—কিছু দেখতে পাচ্ছিস!' বলিয়া উত্তরদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

চার

দুই ভগিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিদ্যুন্মালা চোখের উপর করতলের আচ্ছাদন দিয়া দেখিলেন, তারপর বলিয়া উঠিলেন—'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। একটা মানুষ ভেসে যাচ্ছে—ঐ যে হাত তুলল—হাতে কি একটা রয়েছে—'

মণিকঙ্কণাও দেখিতেছিল, বলিল—'কৃষ্ণা নদী দিয়ে ভেসে এসেছে, বোধহয় অনেক দূর থেকে সাঁতার কেটে আসছে—আর ভেসে থাকতে পারছে না—সঙ্গমের তোড়ের মুখে পড়লেই ডুবে যাবে।'

হঠাৎ মণিকঙ্কণা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। বিদ্যুন্মালা উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। মামাও যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া ইতি-উতি ঘাড় ফিরাইতে লাগিলেন। অন্য নৌকা দু'টির বাহিরে লোকজন নাই। কেহ কিছু লক্ষ্যও করিল না।

তারপর শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে মণিকঙ্কণা আবার ছাদে উঠিয়া আসিল, সে শঙ্খ আনিবার জন্য নীচে গিয়াছিল। শাঁখ বাজাইয়া এক নৌকা হইতে অন্য নৌকায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই নৌ-বহরের সাধারণ রীতি ; কেবল আশঙ্কাজনক কিছু ঘটিলে ডঙ্কা বাজিবে। মণিকঙ্কণা পুনঃ পুনঃ শাঁখ বাজাইয়া চলিল ; বিদ্যুন্মালা উদ্বেগভরা চক্ষে ভাসমান মানুষটার দিকে চাহিতে লাগিলেন। মানুষটা স্রোতের প্রবল আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রাণপণে ভাসিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

শঙ্খনাদ শুনিয়া দ্বিতীয় নৌকার খোলের ভিতর হইতে পিল্ পিল্ করিয়া লোক বাহির হইয়া পটপত্তনের উপর দাঁড়াইল। সকলের দৃষ্টি ময়ূরপঙ্খীর দিকে। বিদ্যুন্মালা বাহু প্রসারিত করিয়া ভাসমান মানুষটাকে দেখাইলেন। সকলের চক্ষু সেইদিকে ফিরিল।

ব্যাপার বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না ; একটা মানুষ স্রোতে পড়িয়া অসহায়ভাবে নাকানি-চোবানি খাইতেছে, তলাইয়া যাইতে বেশি দেরি নাই। তখন দ্বিতীয় নৌকা হইতে একজন লোক জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল, ক্ষিপ্র বাহু সঞ্চালনে সাঁতার কাটিয়া মজ্জমানের দিকে চলিল। তাহার দেখাদেখি আরো দুই-তিনজন জলে ঝাঁপ দিল।

ময়ূরপঙ্খীর ছাদে দাঁড়াইয়া দুই রাজকন্যা, মন্দোদরী ও মাতুল চিপিটকমূর্তি সাগ্রহ উত্তেজনাভরে দেখিতে লাগিলেন ; কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ রাজবৈদ্য রসরাজও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি চোখে ভাল দেখেন না, মণিকঙ্কণা তাঁহাকে পরিস্থিতি বুঝাইয়া দিল।

প্রথম সাঁতারুর নাম বলরাম ; লোকটা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘবাহু। সে প্রবল বাহু তাড়নায় তীরের মত জল কাটিয়া অগ্রসর হইল ; নদীর মাঝখানে উতরোল জলপ্রবাহ তাহার গতি মন্থর করিতে পারিল না ; যেখানে মজ্জমান ব্যক্তি স্রোতের মুখে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কোনোক্রমে ভাসিয়া চলিয়াছিল তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইল। লোকটি চতুর, কি করিয়া মজ্জমানকে উদ্ধার করিতে হয় তাহা জানে। মজ্জমান লোকের হাতের কাছে যাইলে সে উন্মত্তের ন্যায় উদ্ধর্তাকে জড়াইয়া ধরিবে ; তাই বলরাম তাহার হাতের নাগালে না গিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিল।

ময়ূরপঙ্খীর ছাদে যাঁহারা শতচক্ষু হইয়া চাহিয়া ছিলেন তাঁহারা দেখিলেন, বলরাম ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহার পাঁচ-ছয় হাত ব্যবধানে মজ্জমান লোকটি তাহার অনুসরণ করিতেছে ; যেন কোনো অদৃশ্যসূত্রে দুইজন আবদ্ধ রহিয়াছে। তারপর দেখা গেল, অদৃশ্য সূত্রটি বংশদণ্ড। দুইজনে বংশদণ্ডের দুইপ্রান্ত ধরিয়াছে এবং বলরাম অন্য ব্যক্তিকে নৌকার দিকে টানিয়া আনিতেছে। অন্য সাঁতারুরাও আসিয়া পড়িল। তখন দেখা গেল, একটা নয়, দুইটা বংশদণ্ড। সকলে মিলিয়া বংশের এক প্রান্ত ধরিয়া লোকটিকে টানিয়া আনিতে লাগিল।

নৌকার উপর সকলে বিস্ময় অনুভব করিলেন। বংশদণ্ড দু'টা কোথা হইতে আসিল ? তবে কি মজ্জমান ব্যক্তির হাতেই লাঠি ছিল ? কিন্তু লাঠি কেন ?

ইতিমধ্যে দুইজন নাবিক বুদ্ধি করিয়া ডিঙিতে চড়িয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু মজ্জমান ব্যক্তিকে ডিঙিতে তোলা সম্ভব হইল না ; উদ্ধর্তরা ডিঙির কানা ধরিল, ডিঙির নাবিকেরা দাঁড় টানিয়া সকলকে নৌকার দিকে লইয়া চলিল।

নৌকা তিনটি পাল নামাইয়াছিল এবং স্রোতের টানে অল্প অল্প পিছু হটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মণিকঙ্কণা দেখিল ডিঙাটি মাঝের নৌকার দিকে যাইতেছে, সে হাত তুলিয়া আহ্বান করিল। তখন ডিঙা আসিয়া ময়ূরপঙ্খীর গায়ে ভিড়িল। বলরাম ও সাঁতারুরা নৌকায় উঠিল, মজ্জমানকে নৌকায় টানিয়া তুলিয়া নৌকার গুড়ার উপর শোয়াইয়া দিল। লোকটিকে দেখিয়া মৃত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সে দুই হাতে দুইটি বংশদণ্ড দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া আছে।

নৌকার ছাদ হইতে সকলে দেখিলেন জল হইতে সদ্যোদ্ধৃত ব্যক্তি বয়সে যুবা ; তাহার দেহ দীর্ঘ এবং দৃঢ়, কিন্তু বর্তমানে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। দেহের গৌর বর্ণ দীর্ঘকাল জলমজ্জনের ফলে মৃতবৎ পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছে। বিদ্যুন্মালার হৃদয় ব্যথাভরা করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল ; আহা, হতভাগ্য যুবক কোন্ দৈব দুর্বিপাকে এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে—হয়তো বাঁচিবে না—

মণিকঙ্কণা তাঁহার মনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া সংহত কণ্ঠে বলিল—'বেঁচে আছে তো ?'

মাতুল চিপিটকমূর্তি গ্রীবা লম্বিত করিয়া দেখিতেছিলেন, শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'মরে গিয়েছে, জল থেকে তোলবার আগেই মরে গিয়েছে।'

বলরাম সংজ্ঞাহীন যুবকের বুকে হাত রাখিয়া দেখিতেছিল, সে ফিরিয়া ছাদের দিকে চক্ষু তুলিল, সসম্ভ্রমে বলিল—'আজ্ঞা না, বেঁচে আছে ; বুক ধুক্‌ধুক্ করছে। রসরাজ মহাশয় দয়া করে একবার নাড়িটা দেখবেন কি ?'

ক্ষীণদৃষ্টি রসরাজ এতক্ষণ সবই শুনিতেছিলেন এবং অস্পষ্টভাবে দেখিতেছিলেন, কিন্তু কিছুই ভালভাবে ধারণা করিতে না পারিয়া আকুলি-বিকুলি করিতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—'হাঁ হাঁ, অবশ্য অবশ্য। আমি যাচ্ছি—এই যে—'

মণিকঙ্কণা তাঁহার হাত ধরিয়া পাটাতনের উপর নামাইয়া দিল, তিনি সন্তর্পণে গিয়া প্রথমে যুবকের গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, তারপর নাড়ি টিপিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। মণিকঙ্কণা তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন দেখছেন ?'

রসরাজ সজাগ হইয়া বলিলেন—'নাড়ি আছে, কিন্তু বড় দুর্বল। দাঁড়াও, আমি ওষুধ দিচ্ছি।' তিনি রইঘরের দিকে চলিলেন। মণিকঙ্কণা তাঁহার সঙ্গে চলিল।

ময়ূরপঙ্খী নৌকায় দুইটি রইঘর ; একটিতে দুই রাজকন্যা থাকেন, অন্যটিতে মাতুল চিপিটকমূর্তি ও রসরাজ। নিজের রইঘরে গিয়া রসরাজ একটি পেটরা খুলিলেন। পেটরার মধ্যে নানাবিধ ঔষধ, খল-নুড়ি প্রভৃতি রহিয়াছে। রসরাজ একটি স্ফটিকের ফুকা তুলিয়া লইলেন ; তাহাতে জলের ন্যায় বর্ণহীন তরল পদার্থ রহিয়াছে। এই তরল পদার্থ তীব্রশক্তির কোহল। রসরাজ একটি পানপাত্রে অল্প জল লইয়া তাহাতে পাঁচ বিন্দু কোহল ফেলিলেন, মণিকঙ্কণার হাতে পাত্র দিয়া বলিলেন—'এতেই কাজ হবে। খাইয়ে দাও গিয়ে।'

মণিকঙ্কণা দ্রুতপদে উপরে গিয়া পাত্রটি বলরামের হাতে দিল, বলিল—'ওষুধ খাইয়ে দাও।'

'এই যে রাজকুমারি !' বলরাম পাত্রটি লইয়া নিপুণভাবে সংজ্ঞাহীনের মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিল। মণিকঙ্কণা সপ্রশংস নেত্রে তাহার কার্যকলাপ দেখিতে দেখিতে বলিল—'তুমিই প্রথমে গিয়ে ওকে ভাসিয়ে রেখেছিলে—না ? তোমার নাম কি ?' মণিকঙ্কণা রাজকন্যা হইলেও সকল

শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিতে পারে।

বলরাম হাত জোড় করিয়া বলিল—'দাসের নাম বলরাম কর্মকার। আমি বঙ্গদেশের লোক, তাই ভাল সাঁতার জানি।'

মণিকঙ্কণা কৌতূহলী চক্ষে বলরামকে দেখিল, হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া তাহার পরিচয় স্বীকার করিল, তারপর ছাদে উঠিয়া গিয়া বিদ্যুন্মালার পাশে বসিল। রসরাজ মহাশয়ও ইতিমধ্যে ছাদে ফিরিয়া গিয়াছেন। ছাদ পাটাতন হইতে বেশি উচ্চ নয়, মাত্র তিন হাত। ছাদে উঠিবার দুই ধাপ তক্তার সিঁড়ি আছে। রসরাজ মহাশয় সহজেই ছাদে উঠিতে পারেন, কেবল নামিবার সময় কষ্ট।

অতঃপর প্রতীক্ষা আরম্ভ হইল, ঔষধের ক্রিয়া কতক্ষণে আরম্ভ হইবে। মাতুল ও রসরাজ নিম্নকণ্ঠে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, দুই রাজকন্যা ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া মৃতকল্প যুবকের পানে চাহিয়া রহিলেন, মন্দোদরী থুম হইয়া বসিয়া রহিল।

অর্ধ দণ্ড কাটিতে না কাটিতে যুবক ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। বলরাম তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিল, সহাস্য মুখে বলিল—'এখন কেমন মনে হচ্ছে?'

দর্শকদের সকলের মুখেই উৎফুল্ল হাসি ফুটিয়াছে। যুবক প্রশ্নের উত্তর দিল না, ধীর সঞ্চারে ঘাড় ফিরাইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। বলরাম বলিল—'তুমি কে? তোমার দেশ কোথা? নাম কি? নদীতে ভেসে যাচ্ছিলে কেন?'

এবারও যুবক উত্তর দিল না, দুই হাতে লাঠিতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। রসরাজ ছাদ হইতে বলিলেন—'আহা, ওকে এখন প্রশ্ন কোরো না। নিজেদের নৌকায় নিয়ে যাও, আগে এক পেট গরম ভাত খাওয়াও। নাড়ি সুস্থ হবে, তখন যত ইচ্ছা প্রশ্ন কোরো।'

'যে আজ্ঞা।'

বলরাম ও নাবিকেরা ধরাধরি করিয়া যুবককে ডিঙিতে তুলিল। ডিঙি মকরমুখী নৌকার দিকে চলিয়া গেল।

পশ্চিম আকাশে দিনের চিতা ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। নৌকা তিনটি পাল তুলিয়া আবার সম্মুখদিকে চলিতে আরম্ভ করিল। আজ শুক্লা ত্রয়োদশী, আকাশে চাঁদ আছে। নৌকা তিনটি সঙ্গম পার হইয়া তুঙ্গভদ্রায় প্রবেশ করিবে, তারপর তীর ঘেঁষিয়া কিংবা নদীমধ্যস্থ চরে নোঙর ফেলিবে। নদীতে রাত্রিকালে নৌকা চালনা নিরাপদ নয়।

রসরাজ মহাশয় উৎফুল্ল স্বরে বলিলেন—'কোহলের মত তেজস্কর ওষুধ আর আছে! পরিস্রুত সুরাসার—সাক্ষাৎ অমৃত। এক ফোঁটা মুখে পড়লে তিন দিনের বাসি মড়া শয্যায় উঠে বসে।'

মন্দোদরী একটি গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—'জয় দারুব্রহ্ম।'

মণিকঙ্কণা হাসিয়া উঠিল—'এতক্ষণে মন্দোদরীর দারুব্রহ্মকে মনে পড়েছে।—চল মালা, নীচে যাই। আজ আর চুল বাঁধা হল না।'

পাঁচ

শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ মাথার উপর উঠিয়াছে। নৌকা তিনটি সঙ্গম ছাড়াইয়া তুঙ্গভদ্রার খাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং একটি চরের পাশে পরস্পর হইতে শতহস্ত ব্যবধানে নোঙর ফেলিয়াছে। চারিদিক নিথর নিস্পন্দ, বহতা নদীর স্রোতেও চাঞ্চল্য নাই; চরাচর যেন জ্যোৎস্নার সূক্ষ্ম মল্লবস্ত্র সর্বাঙ্গে জড়াইয়া তন্দ্রাঘোরে অবাস্তবের স্বপ্ন দেখিতেছে।

ময়ূরপঙ্খী নৌকার একটি রইঘর স্নিগ্ধ দীপের প্রভায় উন্মেষিত। সন্ধ্যাকালে ঘরে অগুরু চন্দনের ধূপ জ্বালা হইয়াছিল, তাহার গন্ধ এখনো মিলাইয়া যায় নাই। একটি সুপরিসর শয্যার উপর দুই রাজকন্যা পাশাপাশি শয়ন করিয়াছেন। মন্দোদরী দ্বারের সম্মুখে আড় হইয়া জলহস্তীর ন্যায় ঘুমাইতেছে।

রাজকুমারীদের চেতনা বারংবার তন্দ্রা ও জাগরণের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে। বৈচিত্র্যহীন জলযাত্রার মাঝখানে আজ হঠাৎ একটি অতর্কিত ঘটনা ঘটিয়াছে; তাই তাঁহাদের উৎসুক মন নিদ্রার সীমান্তে পৌঁছিয়া আবার জাগ্রতে ফিরিয়া আসিতেছে। অপরাহ্ণের ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে তাঁহাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে।

দুই ভগিনী মুখোমুখি শুইয়াছিলেন। মণিকঙ্কণা এক সময় চক্ষু খুলিয়া দেখিল বিদ্যুন্মালার চক্ষু মুদিত, সেও চক্ষু মুদিত করিল। ক্ষণেক পরে বিদ্যুন্মালা চক্ষু মেলিলেন, দেখিলেন কঙ্কণার চক্ষু মুদিত, তিনি আবার চক্ষু নিমীলিত করিলেন। তারপর দুইজনে একসঙ্গে চক্ষু খুলিলেন।

দুইজনের মুখে হাসি উপচিয়া পড়িল। মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার মুখের আরো কাছে মুখ আনিয়া শুইল। বিদ্যুন্মালা ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন—'ভাগ্যে তুই দেখতে পেয়েছিলি, নইলে লোকটাকে উদ্ধার করা যেত না।'

মণিকঙ্কণা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'মানুষটি উচ্চবর্ণের মনে হল। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয়।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'কিন্তু গলায় পৈতে ছিল না।'

মণিকঙ্কণা বলিল—'পৈতে হয়তো নদীর জলে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু হাতে লাঠি কেন ভাই? লাঠি নিয়ে কেউ কি জলে নামে?'

বিদ্যুন্মালা ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—'হয়তো ইচ্ছে করেই লাঠি নিয়ে জলে নেমেছিল, যাতে ভেসে থাকতে পারে। বাঁশের লাঠি তো, ভাসিয়ে রাখে।'

'তাই হবে।'

তারপর আরো কিছুক্ষণ জল্পনা-কল্পনার পর তাঁহাদের চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিল, তাঁহারা ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ময়ূরপঙ্খীর যে কক্ষটিতে রসরাজ ও চিপিটকমূর্তি থাকেন তাহা নিষ্প্রদীপ। দুইজনে পৃথক শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। রসরাজ মহাশয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, তিনি নিদ্রা গিয়াছেন। চিপিটক অন্ধকারে জাগিয়া আছেন; তাঁহার মস্তিষ্কবিবরে নানা কুটিল চিন্তা উইপোকার ন্যায় বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে—যে লোকটিকে নদী হইতে তোলা হইয়াছে সে হিন্দু না মুসলমান? মুসলমান হইলে শত্রুর গুপ্তচর হইতে পারে; হিন্দু হইলেও হইতে পারে—আজকাল কে শত্রু কে মিত্র বোঝা কঠিন। ছুতা করিয়া নৌকায় উঠিয়াছে, কী অভিসন্ধি লইয়া নৌকায় উঠিয়াছে কে বলিতে পারে—

চিপিটকমূর্তির গঙ্গাফড়িং-এর ন্যায় আকৃতির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, এবার তাঁহার প্রকৃতিগত পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। মাতুল মহোদয়ের যথার্থ নাম চিপিটক নয়, অবস্থাগতিকে চিপিটক হইয়া পড়িয়াছিল। বিংশ বৎসর পূর্বে কলিঙ্গের চতুর্থ ভানুদেব দক্ষিণ দেশের এক সামন্তরাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া যখন স্বদেশে ফিরিলেন, তখন তাঁহার অসংখ্য শ্যালকদিগের মধ্যে একটি শ্যালক সঙ্গে আসিলেন। কিছুকাল কাটিবার পর ভানুদেব দেখিলেন শ্যালকের স্বগৃহে ফিরিবার ইচ্ছা নাই; তিনি তখন তাঁহাকে রাজপরিবারের ভাণ্ডারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। রাজ-ভাণ্ডারে বহুবিধ খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে রাশি রাশি চিপিটক স্তূপীকৃত থাকে, দধি ও গুড় সহযোগে ইহাই ভৃত্য-পরিজনের জলপান। শ্যালক মহাশয়ের আদি নাম বোধকরি হরিআপ্পা কৃষ্ণমূর্তি গোছের একটা কিছু ছিল, কিন্তু তিনি যখন ভাণ্ডারের ভার গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে চিপিটক বিতরণ করিতে

লাগিলেন তখন ভৃত্য-পরিজনের মধ্যে তাঁহার নাম অচিরাৎ চিপিটকমূর্তিতে পরিণত হইল। ক্রমে নামটি সাধারণের মধ্যেও প্রচারিত হইল। শুধু চিপিটক বিতরণের জন্যই নয়, শ্যালক মহাশয়ের নাকটিও ছিল চিপিটকের ন্যায় চ্যাপ্টা।

মনুষ্যচরিত্র লইয়া প্রকৃতির এক বিচিত্র পরিহাস দেখা যায়, যাহার বুদ্ধি যত কম সে নিজেকে তত বেশি বুদ্ধিমান মনে করে। চিপিটকমূর্তি মহাশয় পিতৃরাজ্যে অবস্থানকালে নিজের ভ্রাতাদের কাছে নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রখ্যাত ছিলেন, তাই সুযোগ পাইবামাত্র তিনি অভিমানভরে ভগিনীপতির রাজ্যে চলিয়া আসিয়াছিলেন। তারপর রাজ-ভাণ্ডারের অধিকর্তার পদ পাইয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে ভানুদেব তাঁহার বুদ্ধির মর্যাদা বুঝিয়াছেন। কিন্তু তবু তাঁহার নিভৃত অন্তরে যে চরম আশাটি লুক্কায়িত ছিল তাহা অদ্যাপি পূর্ণ হয় নাই।

দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট আর্য জাতির মধ্যে—সম্ভবত দ্রাবিড় জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে—একটি বিশেষ সামাজিক নীতি প্রচলিত হইয়াছিল; তাহা এই যে, মাতুলের সহিত ভাগিনেয়ীর বিবাহ পরম স্পৃহনীয় ও বাঞ্ছিত বিবাহ। উত্তরাপথে যাঁহারা এই জাতীয় বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাঁহারাও দাক্ষিণাত্যে গিয়া দেশাচার ও লোকাচার বরণ করিয়া লইতেন। দীর্ঘকালের ব্যবহারে ইহা সহজ ও স্বাভাবিক বিধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তাই চিপিটকমূর্তি যখন ভগিনীপতির ভবনে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন তখন তাঁহার মনে দূর ভবিষ্যতের একটি আশা বীজরূপে বিরাজ করিতেছিল। যথাকালে তাঁহার একটি ভাগিনেয়ীর আবির্ভাব ঘটিল, চিপিটকের আশা অঙ্কুরিত হইল। তারপর বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মাতুলের সহিত রাজকন্যার বিবাহের প্রসঙ্গ কেহ উত্থাপন করিল না; চিপিটকের আশার অঙ্কুর জলসিঞ্চনের অভাবে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল; শ্যালকরূপে রাজসংসারে প্রবেশ করিয়া রাজ-জামাতা পদে উন্নীত হইবার উচ্চাশা তাঁহার ফলবতী হইল না। চিপিটকমূর্তি একবার ভগিনীর কাছে কথাটা উত্থাপন করিয়াছিলেন, শুনিয়া রাজমহিষী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন—'একথা অন্য কারুর কাছে বলো না।'

প্রকৃত কথা, কলিঙ্গের সমাজবিধি ঠিক আর্যাবর্তের মতও নয়, দাক্ষিণাত্যের মতও নয়, মধ্যপথগামী। ভারতের মধ্যপ্রদেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা প্রায় একই প্রকার; তাহারা সুবিধামত একূল-ওকূল দুকূল রাখিয়া চলে। কলিঙ্গের লোকেরা মামা-ভাগিনেয়ীর বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না। আবার অতি উচ্চাঙ্গের সৎকার্য বলিয়াও মনে করে না। স্ত্রীলোকের কাছা দিয়া কাপড় পরার মত ইহা তাহাদের কাছে কৌতুকজনক ব্যাপার; তার বেশি নয়।

চিপিটক কিন্তু আশা ছাড়িলেন না, ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। ভাগিনেয়ী বিদ্যুন্মালা বড় হইয়া উঠিল। তারপর যুদ্ধ-বিগ্রহ নানা বিপর্যয়ের মধ্যে বিদ্যুন্মালার বিবাহ স্থির হইল বিজয়নগরের দেবরায়ের সঙ্গে। এবং এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে, চিপিটকমূর্তি বধূর মাতুল বিধায় অভিভাবকরূপে তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত হইলেন।

আশা আর বিশেষ ছিল না। কিন্তু চিপিটক হাল ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি নৌকায় চড়িয়া চলিলেন। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

সে-রাত্রে নৌকার অন্ধকার রইঘরে শয়ন করিয়া চিপিটক চিন্তা করিতেছিলেন—নদী হইতে উদ্ধৃত লোকটা নিশ্চয় মুসলমান এবং শত্রুর গুপ্তচর। কাল সকালে তাহাকে নৌকায় ডাকিয়া কূট প্রশ্ন করিলেই গুপ্তচরের স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িবে। গুপ্তচর যত ধূর্তই হোক চিপিটকের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবে না।

ছয়

ওদিকে মকরমুখী নৌকায় সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কেবল দুইজন রাত-প্রহরী নৌকার সম্মুখে ও পিছনে জাগিয়া বসিয়া ছিল। আর জাগিয়া ছিল বলরাম কর্মকার ও জলোদ্ধৃত যুবক। চাঁদের আলোয় পাটাতনের উপর বসিয়া দুইজনে নিম্নস্বরে কথা বলিতেছিল। যুবক এক পেট গরম ভাত খাইয়া ও দুই দণ্ড ঘুমাইয়া লইয়া অনেকটা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

তাহাদের বাক্যালাপ অধিকাংশই প্রশ্নোত্তর ; বলরাম প্রশ্ন করিতেছে, যুবক উত্তর দিতেছে। বলরাম যে যুবককে প্রশ্ন করিতেছে তাহা কেবল কৌতূহল প্রণোদিত নয়, অনাহূত অতিথির প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করাই তাহার মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে বুদ্ধিহীন চিপিটকমূর্তি ও বুদ্ধিমান বলরামের মনোভাব একই প্রকার।

বলরাম বলিল—'তুমি যে মুসলমান নও তা আমি বুঝেছি। তোমার নাম কি ?'

যুবক বলরামের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া চরের দিকে চক্ষু ফিরাইল, অস্পষ্ট স্বরে বলিল—'আমার নাম অর্জুনবর্মা।'

বলরাম মৃদুস্বরে হাসিল—'ভাল। আমি ভেবেছিলাম তোমার নাম বুঝি দণ্ডপাণি।'

অর্জুনবর্মার পাশে দণ্ড দু'টি রাখা ছিল, সে একবার সেই দিকে চক্ষু নামাইয়া বলিল—'তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। কিন্তু এই দণ্ড দু'টি না থাকলে এতদূর আসতে পারতাম না, তার আগেই ডুবে যেতাম।'

বলরাম বলিল—'তুমি কোথা থেকে আসছ ?'

অর্জুনবর্মা বলিল—'গুলবর্গা থেকে।'

বলরাম বলিল—'গুলবর্গা—নাম শুনেছি। দক্ষিণে যবনদের রাজধানী। ওরা বড় অত্যাচারী, বর্বর জাত। আমিও ওদের জন্যে দেশ ছেড়েছি। বাংলা দেশ যবনে ছেয়ে গেছে। তুমিও কি ওদের অত্যাচারে দেশ ছেড়েছ ?'

'হ্যাঁ।' অর্জুনবর্মা থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—'গুলবর্গার কাছে ভীমা নদী—ওদের অত্যাচারে আজ সকালবেলা ভীমা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম—ভীমা এসে কৃষ্ণাতে মিশেছে—তার অনেক পরে কৃষ্ণা তুঙ্গভদ্রায় মিশেছে—এত দূর তা ভাবিনি—লাঠি দুটো ছিল তাই কোনোমতে ভেসে ছিলাম—তারপর তুমি বাঁচালে—'

বলরাম প্রশ্ন করিল—'কোথায় যাচ্ছিলে ?'

'বিজয়নগর। ভেবেছিলাম সাঁতার কেটে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে উঠব, তারপর পায়ে হেঁটে বিজয়নগরে যাব।'

'তা ভালই হল। আমরাও বিজয়নগরে যাচ্ছি। তোমার পায়ে হাঁটার পরিশ্রম বেঁচে গেল।'

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিল, তারপর অর্জুনবর্মা প্রশ্ন করিল—'তোমরা কোথা থেকে আসছ ?'

'কলিঙ্গ থেকে। তিন মাসের পথ।'

'সামনের বড় নৌকায় কারা যাচ্ছে ?'

বলরাম একটু চিন্তা করিল। কিন্তু এখন তাহারা তুঙ্গভদ্রার স্রোতে প্রবেশ করিয়াছে, নদীর দুই কূলেই বিজয়নগরের অধিকার, যবন রাজ্য অনেক দূরে কৃষ্ণার পরপারে, সুতরাং অধিক সাবধানতা নিষ্প্রয়োজন। সে বলিল—'কলিঙ্গের দুই রাজকন্যা যাচ্ছেন। বড় রাজকন্যার সঙ্গে বিজয়নগরের রাজা দেবরায়ের বিয়ে হবে।'

অর্জুনবর্মা আর কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। বলরাম পাটাতনের উপর লম্বমান হইয়া

বলিল—'রাত হয়েছে, শুয়ে পড়। এখনো তোমার শরীরের গ্লানি দূর হয়নি।

অর্জুন লাঠি দু'টি পাশে লইয়া শয়ন করিল, বলিল—'তোমার নিজের কথা তো বললে না। তুমি কলিঙ্গ দেশের মানুষ, বাংলা দেশের কথা কী বলছিলে?'

বলরাম বলিল—'আমি কলিঙ্গ থেকে আসছি বটে, কিন্তু বাংলা দেশের লোক। আমার নাম বলরাম, জাতিতে কর্মকার।'

অর্জুন বলিল—'বাংলা দেশ তো অনেক দূর! তুমি দেশ ছেড়ে এতদূর এসেছ!'

বলরাম আক্ষেপভরে বলিল—'আরে ভাই, বাংলা দেশ কি আর বাংলা দেশ আছে, শ্মশান হয়ে গেছে; সেই শ্মশানে বিকট প্রেত-পিশাচ নেচে বেড়াচ্ছে। তাই দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।'

'বাংলা দেশে বুঝি যবন রাজা?'

'হ্যাঁ। মাঝে কয়েক বছর রাজা গণেশ সিংহাসনে বসেছিলেন, বাঙ্গালী হিন্দুর বরাত ফিরেছিল। তারপর আবার যে-নরক সেই নরক।'

'ওরা বড় অত্যাচারী, বড় নৃশংস—' অর্জুনের কথাগুলি অসমাপ্ত রহিয়া গেল, যেন মনের মধ্যে অসংখ্য অত্যাচার ও নৃশংসতার কাহিনী অকথিত রহিয়া গেল।

বলরাম হঠাৎ বলিল—'ভাল কথা, তোমার বিয়ে হয়েছে?'

'না।' আকাশে অবরোহী চন্দ্রের পানে চাহিয়া অর্জুন ম্রিয়মাণ স্বরে বলিল—'যবনের রাজধানীতে বিয়ে করলে তার প্রাণসংশয়, বিশেষত যদি বৌ সুন্দরী হয়। যাদের ঘরে সুন্দরী মেয়ে জন্মেছে তারা মেয়ের বয়স সাত-আট হতে না হতেই বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। অনেকে মেয়ের মুখে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে মেয়েকে কুৎসিত করে দেয়, যাতে যবনদের নজর না পড়ে। তাতেও রক্ষে নেই, মুসলমান সিপাহীরা যুবতী মেয়ে দেখলেই ধরে নিয়ে যায়, আর স্বামীকে কেটে রেখে যায়; যাতে নালিশ করবার কেউ না থাকে। দক্ষিণ দেশে মেয়েদের পর্দা ছিল না; এখন তারা যবনের ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না।'

বলরাম উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল—'যেখানে যবন সেখানেই এই দশা। তবে আমার জীবনের কাহিনী বলি শোনো। বর্ধমানের নাম তুমি বোধহয় শোননি; দামোদর নদের তীরে মস্ত নগর। সেখানে আমার কামারশালা ছিল; বেশ বড় কামারশালা। কাস্তে কুড়ুল কাটারি তৈরি করতাম, ঘোড়ার ক্ষুরে নাল ঠুকতাম, গরুর গাড়ির চাকায় হাল বসাতাম। তলোয়ার, সড়কি, এমনকি কামান পর্যন্ত তৈরি করতে জানি, কিন্তু মুসলমান রাজারা তৈরি করতে দিত না; মাঝে মাঝে রাজার লোক এসে তদারক করে যেত। আমরা অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতাম। কিন্তু সে যাক—

'একবার লোহা কিনতে জংলীদের গাঁয়ে গিয়েছিলাম। ওরা পাহাড় জঙ্গল থেকে লোহা-নুড়ি সংগ্রহ করে এনে পুড়িয়ে লোহা তৈরি করে; আমরা কামারেরা গরুর গাড়ি নিয়ে যেতাম, তাদের কাছ থেকে লোহা কিনে আনতাম। সেবার গাঁ থেকে লোহা কিনে দু'দিন পরে ফিরে এসে দেখি, মুসলমান সেপাইরা আমার কামারশালা তছনছ করে দিয়েছে, আর আমার বৌটাকে ধরে নিয়ে গেছে—' বলরাম আবার শয়ন করিল, কিছুক্ষণ আকাশের পানে চাহিয়া থাকিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—'বৌটা মুখরা ছিল বটে, কিন্তু ভারি সুন্দর দেখতে ছিল। যাক গে, মরুক গে। যে যেমন কপাল নিয়ে এসেছে। আমার আর দেশে মন টিকল না। ভাবলাম যে-দেশে মুসলমান নেই সেই দেশে যাব। তারপর একদিন লোহার ডাণ্ডা দিয়ে একটা জঙ্গি জোয়ানের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে কলিঙ্গ দেশে চলে এলাম।

'কলিঙ্গ দেশে এখনও যবন ঢুকতে পারেনি। কিন্তু ঢুকতে কতক্ষণ? আমি একেবারে কলিঙ্গের দক্ষিণ কোণে কলিঙ্গপত্তনে এসে আবার নতুন করে কামারশালা ফেঁদে বসলাম।

কলিঙ্গে তখন যুদ্ধ চলছে, কামারদের খুব পসার। আমি অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে লেগে গেলাম। রাজা থেকে পদাতি পর্যন্ত সবাই আমার নাম জেনে গেল। তারপর যুদ্ধ থামল, বিজয়নগরের রাজার সঙ্গে কলিঙ্গের রাজকন্যার বিয়ে ঠিক হল। নৌ-বহর সাজিয়ে রাজকন্যে বিয়ে করতে যাবেন। আমি ভাবলাম, দূর ছাই, দেশ ছেড়ে এতদূর যখন এসেছি তখন বিজয়নগরেই বা যাব না কেন? বিজয়নগরের রাজবংশ বীরের বংশ, একশো বছর ধরে যবনদের কৃষ্ণা নদী ডিঙোতে দেননি। বর্তমান রাজা শুধু বীর নয়, গুণের আদর জানেন; যদি তাঁর নজরে পড়ে যাই আমার বরাত ফিরে যাবে। গেলাম নৌ-নায়ক মশায়ের কাছে। নৌ-বহরে দূরযাত্রার সময় যেমন সঙ্গে ছুতোর দরকার, তেমনি কামারও দরকার। নৌ-নায়ক মশায় আমার নাম জানতেন, খুশি হয়ে নৌকোয় কাজ দিলেন। আর কি, যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেই থেকে চলেছি।'

বলরামের কথা বলিবার ভঙ্গি হইতে মনে হয়, সে জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, কিন্তু দুঃখ বস্তুটাকে সে বেশি আমল দেয় না। দুঃখ তো আছেই, দুঃখ তো জীবনের সঙ্গী; তাহার ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সুখ আহরণ করা যায় ততটুকুই লাভ।

বলরাম ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, অর্জুনবর্মার চক্ষু মুদিত, সে বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার ক্লান্তি-শিথিল মুখের পানে চাহিয়া বলরাম হৃদয়ের মধ্যে একটু স্নেহের ভাব অনুভব করিল। আহা, ছেলেটার কতই বা বয়স হইবে, বড় জোর একুশ-বাইশ, বলরামের চেয়ে অন্তত দশ বছরের ছোট। এই বয়সে অভাগা অনেক দুঃখ পাইয়াছে; অনেক দুঃখ না পাইলে কেহ দেশ ছাড়িয়া পলাইবার জন্য নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে না।

সাত

পরদিন প্রত্যূষে নৌকা তিনটি নোঙ্গর তুলিয়া আবার উজানে যাত্রা করিল।

তুঙ্গভদ্রায় বড় নৌকা চালানো কিন্তু কৌশলসাধ্য কর্ম, তজ্জন্য আড়কাঠির সাহায্য লইতে হয়। নদীগর্ভ পূর্বের ন্যায় গভীর নয়, নদীর তলদেশ শিলাপ্রস্তরে পূর্ণ, কোথাও পাথুরে দ্বীপ জল হইতে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে; অতি সাবধানে লগি দিয়া জল মাপিতে মাপিতে অগ্রসর হইতে হয়। নদীর প্রসারও অধিক নয়, কোথাও পঞ্চদশ রজ্জু, কোথাও আরো কম; দুই তীরের উচ্চ পাষাণ-প্রাকার নদীকে সঙ্কীর্ণ খাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। নৌকা নদীর মাঝখান দিয়া চলিলেও দুই তীর নিকটবর্তী।

সঙ্গে দেশজ্ঞ আড়কাঠি আছে, তাহার নির্দেশে হাঙ্গরমুখী নৌকাটি সর্বাগ্রে চলিল। তার পিছনে ময়ূরপঙ্খী, সর্বশেষে ভড়। হাঙ্গরমুখী নৌকা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও লঘু, তাই আড়কাঠি তাহাতে থাকিয়া পথ দেখাইয়া চলিল। কখনো দক্ষিণ তীর ঘেঁষিয়া, কখনো উত্তর তীর চুম্বন করিয়া; কখনো দাঁড় টানিয়া, কখনো পাল তুলিয়া নৌকা তিনটি ভুজঙ্গপ্রয়াত গতিতে স্রোতের বিপরীত মুখে অগ্রসর হইল।

মধ্যাহ্নে আহারাদি সম্পন্ন হইলে চিপিটকমূর্তি আজ্ঞা দিলেন—'যে লোকটাকে কাল নদী থেকে তোলা হয়েছে, আমার সন্দেহ সে শত্রুর গুপ্তচর; তাকে এই নৌকায় নিয়ে এস। সঙ্গে যেন দু'জন সশস্ত্র রক্ষী থাকে।'

চিপিটকমূর্তি যদিও সাক্ষিগোপাল, তবু তিনি নামত এই অভিযানের নায়ক, তাই তাঁহার ছোটখাটো আদেশ সকলে মানিয়া চলিত।

মকরমুখী নৌকায় আদেশ পৌঁছিলে অর্জুনবর্মা লাঠি দু'টি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলরাম হাসিয়া বলিল—'লাঠি রেখে যাও। চিপিটক মামার কাছে লাঠি নিয়ে গেলে মামার নাভিশ্বাস উঠবে।'

অর্জুনবর্মা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলরামকে বলিল—'তুমি লাঠি দু'টি রাখ, আমি ফিরে এসে নেব।'

অর্জুন দুইজন সশস্ত্র প্রহরীসহ ডিঙিতে চড়িয়া ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চলিয়া গেল। বলরাম কৌতূহলের বশে লাঠি দু'টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। সে লাঠির দেশের লোক, যে-দেশে বাঁশের লাঠিই সাধারণ লোকের প্রধান অস্ত্র সেই দেশের মানুষ। সে দেখিল, বাঁশের লাঠি দু'টি বাংলা দেশের লাঠির মতই, বিশেষ পার্থক্য নাই ; ছয় হাত লম্বা, গাঁটগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, দুই প্রান্তে পিতলের তারের শক্ত বন্ধন ; যেমন দৃঢ় তেমনি লঘু। এরূপ একটি লাঠি হাতে থাকিলে পঞ্চাশজন শত্রুর মহড়া লওয়া যায়। কিন্তু দু'টি লাঠি কেন ? বলরাম লাঠি দু'টি হাতে তৌল করিয়া দেখিল ; তাহাদের গর্ভে সোনা-রূপা লুকানো থাকিলে এত লঘু হইত না, জলে পড়িলে ডুবিয়া যাইত। তবে অর্জুনবর্মা লাঠি দু'টি হাতছাড়া করিতে চায় না কেন ? ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে হইল, সে আবার লাঠি দু'টিকে ভালভাবে পরীক্ষা করিল। ও—এই ব্যাপার! তাহার ধারণা ছিল বাংলা দেশের বাহিরে এ কৌশল আর কেহ জানে না, তা নয়। বলরামের মুখে হাসি ফুটিল ; সে বুঝিল অর্জুনবর্মা বয়সে তরুণ হইলেও দূরদর্শী লোক।

ওদিকে অর্জুনবর্মা ময়ূরপঙ্খী নৌকায় পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে পাটাতনের উপর বা রইঘরের ছাদে প্রখর রৌদ্র ; চিপিটক তাহাকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন ; কক্ষটি দিবা দ্বিপ্রহরেও ছায়াচ্ছন্ন। দারুনির্মিত দেওয়ালগুলিতে জানালা নাই, জানালার পরিবর্তে তস্কার ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতি অনেকগুলি ছিদ্র প্রাচীরগাত্রে জাল রচনা করিয়াছে ; এইগুলি আলো এবং বাতাসের প্রবেশপথ। চিপিটক একটি মাদুরের উপর বালিশে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। এক কোণে বৃদ্ধ রসরাজ একখানি পুঁথি, বোধহয় সুশ্রুত-সংহিতা, চোখের নিকট ধরিয়া পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অর্জুনবর্মা ঘরে প্রবেশ করিয়া একবার দুই করতল যুক্ত করিয়া সম্ভাষণ জানাইল, তারপর আবার দ্বারের সন্নিকটে উপবিষ্ট হইল।

বলা বাহুল্য, অর্জুনবর্মাকে যখন নৌকায় ডাকা হইয়াছিল তখন রাজকন্যারা জানিতে পারিয়াছিলেন ; স্বভাবতই তাঁহাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছিল। অর্জুনবর্মা মামার কক্ষে প্রবেশ করিলে মণিকঙ্কণা চুপিচুপি বলিল—'মালা, চল্, ও-ঘরে কি কথাবার্তা হচ্ছে শুনি।'

বিদ্যুন্মালা ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন—'ও-ঘরে আমাদের যাওয়া উচিত হবে ?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'ও-ঘরে যাব কেন ? দেওয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মারব। আয়।'

দুই ভগিনী নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পাশের দিকে চলিলেন, সন্তর্পণে সচ্ছিদ্র গৃহ-প্রাচীরের কাছে গিয়া ছিদ্রপথে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। কক্ষের অভ্যন্তরে তখন পরম উপভোগ্য প্রহসন আরম্ভ হইয়াছে।

চিপিটক বালিশ ছাড়িয়া চিড়িক মারিয়া উঠিয়া বসিলেন, অর্জুনবর্মার দিকে অভিযোগী অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রমণীসুলভ কণ্ঠে তর্জন করিলেন—'তুমি ম্লেচ্ছ! তুমি মুসলমান!'

অর্জুনবর্মার মেরুদণ্ড কঠিন ও ঋজু হইয়া উঠিল, চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল ; সে মেঘমন্দ্র স্বরে বলিল—'না, আমি হিন্দু, ক্ষত্রিয়।'

চিপিটক তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—'বটে! বটে! তুমি কেমন ক্ষত্রিয় এখনি বোঝা যাবে।—ওরে, ওর গা শুঁকে দেখ তো, হিঙ্গু-পলাণ্ডু-রসুনের গন্ধ বেরুচ্ছে কি না।'

রক্ষিদ্বয় আদেশ পাইয়া অর্জুনবর্মার গা শুঁকিল, বলিল—'আজ্ঞা না, পেঁয়াজ-রসুন-হিঙের গন্ধ নেই।'

ঘরের কোণে বসিয়া রসরাজ শুনিতেছিলেন, তিনি বিরক্তিসূচক চট্‌কার শব্দ করিলেন। চিপিটক কিন্তু দমিলেন না, বলিলেন—'হুঁ, গায়ের গন্ধ নদীর জলে ধুয়ে গেছে। —তোমার নাম কি?'

অর্জুনবর্মা নাম বলিল। শুনিয়া চিপিটক বলিলেন—'বটে—অর্জুনবর্মা। একেবারে পৌরাণিক নাম! ভাল, বল দেখি, অর্জুন কে ছিল?'

অর্জুনবর্মা এতক্ষণে চিপিটক মামার বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিয়া লইয়াছে; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে রঙ্গকৌতুকে তাহার রুচি নাই। সে গম্ভীর মুখে বলিল—'পাণ্ডব।'

'হুঁ, অর্জুনের বাবার নাম কি ছিল?'

'শুনেছি দেবরাজ ইন্দ্র।'

চিপিটক অমনি কল-কোলাহল করিয়া উঠিলেন—'ধরেছি ধরেছি! আর যাবে কোথায়! যে অর্জুনের বাবার নাম জানে না সে কখনো হিন্দু হতে পারে না। নিশ্চয় যবনের গুপ্তচর। —রক্ষি, তোমরা ওকে বেঁধে নিয়ে যাও—'

রসরাজ রুক্ষস্বরে বাধা দিলেন, বলিলেন—'চিপিটক, তুমি থামো, চিৎকার করো না। অর্জুনের বাবার নাম ও ঠিক বলেছে। তুমিই অর্জুনের বাবার নাম জান না, সুতরাং বেঁধে রাখতে হলে তোমাকেই বেঁধে রাখতে হয়।'

চিপিটক থতমত খাইয়া গেলেন, ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—'কিন্তু অর্জুনের বাবার নাম তো পাণ্ডু!'

রসরাজ বলিলেন—'পাণ্ডু নামমাত্র বাবা, আসল বাবা ইন্দ্র।'

চিপিটক অগত্যা নীরব রহিলেন। রসরাজ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, বেদ-পুরাণে পারঙ্গম; তাঁহার কথার বিরুদ্ধে কথা বলা চলে না।

রসরাজ অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, তোমার শরীর কেমন? গায়ে ব্যথা হয়েছে?'

অর্জুন বলিল—'সামান্য। আপনার ঔষধের গুণে দেহের সমস্ত গ্লানি দূর হয়েছে।'

রসরাজ বলিলেন—'ভাল ভাল। তুমি যদি আত্মপরিচয় দিতে চাও, দিতে পার, না দিতে চাও দিও না। তুমি অতিথি, আমরা প্রশ্ন করব না।'

অর্জুন বলিল—'আমার পরিচয় সামান্যই।' সে বলরামকে যাহা বলিয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিল।

রসরাজ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'যবনের রাজ্যে হিন্দুর ধর্ম কৃষ্টি স্বাধীনতা সবই নির্মূল হয়েছে। তুমি পালিয়ে এসেছ ভালই করেছ। দক্ষিণ দেশে এখনো স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কতদিন থাকবে কে জানে। —আচ্ছা, আজ তোমরা এস বৎস।'

অর্জুনবর্মা উঠিয়া দাঁড়াইল। চিপিটক চোখ পাকাইয়া বলিলেন—'আজ ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পরে যদি জানতে পারি তুমি গুপ্তচর, তাহলে তোমার মুণ্ড কেটে নেব।'

রসরাজ বলিলেন—'চিপিটক, তোমার বায়ু বৃদ্ধি হয়েছে। এস, ঔষধ দিই।'

বাহিরে দাঁড়াইয়া দুই রাজকন্যা ছিদ্রপথে সবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পালা শেষ হইলে তাঁহারা পা টিপিয়া টিপিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং মুক্ত পটপত্তনে দাঁড়াইয়া অন্য নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে অর্জুনবর্মা রক্ষীদের সঙ্গে বাহিরে আসিল, তাহার মুখে একটা চাপা হাসি। রাজকুমারীদের দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে যুক্তপাণি হইয়া অভিবাদন করিল, তারপর ডিঙিতে নামিয়া বসিল। রক্ষী দুইজন দাঁড়

টানিয়া সম্মুখে হাঙ্গরমুখী নৌকার দিকে চলিল।

মণিকঙ্কণা সেই দিকে কটাক্ষপাত করিয়া লঘুস্বরে বলিল—'অর্জুনবর্মা! হ্যাঁ ভাই, সত্যিই ছদ্মবেশে দ্বাপরযুগের অর্জুন নয় তো!'

বিদ্যুন্মালা ঈষৎ ভর্ৎসনা-ভরা চক্ষে মণিকঙ্কণার পানে চাহিয়া তাহার লঘুতাকে তিরস্কৃত করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যাকালে নদীমধ্যস্থ একটি দ্বীপের প্রস্তরময় তীরে নৌকা বাঁধা হইল। দিনের গলদ্‌ঘর্ম প্রখরতার পর চন্দ্রমাশীতল রাত্রি পরম স্পৃহনীয়। নৈশাহারের পর দুই রাজকন্যা মাঝিদের আদেশ দিলেন, তাহারা পাটাতন দিয়া নৌকা হইতে দ্বীপ পর্যন্ত সেতু বাঁধিয়া দিল; রাজকন্যারা দ্বীপে অবতরণ করিলেন। জনশূন্য দ্বীপ, কঠিন কর্কশ ভূমি; তবু মাটি। অনেকদিন তাঁহারা মাটির স্পর্শ অনুভব করেন নাই; দুই ভগিনী হাত ধরাধরি করিয়া চন্দ্রালোকে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

নৌকা তিনটি পরস্পর শত হস্ত ব্যবধানে নিথর দাঁড়াইয়া আছে; যেন তিনটি অতিকায় চক্রবাক রাত্রিকালে দ্বীপপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছে, প্রভাত হইলে উড়িয়া যাইবে।

সহসা হাঙ্গরমুখী নৌকা হইতে মৃদঙ্গ মন্দিরার নিক্কণ ভাসিয়া আসিল। দুই রাজকন্যা চমকিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। শত হস্ত দূরে হাঙ্গরমুখী নৌকার পাটাতনের উপর কয়েকটি লোক গোল হইয়া বসিয়াছে, অস্পষ্ট আবছায়া কয়েকটি মূর্তি। তারপর মৃদঙ্গ মন্দিরার তালে তালে উদার পুরুষকণ্ঠে জয়দেব গোস্বামীর গান শোনা গেল—

মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে।

বলরাম জাতিতে কর্মকার হইলেও সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুকণ্ঠ। সে নৌকাযাত্রার সময় মৃদঙ্গ ও করতাল সঙ্গে আনিয়াছিল; তারপর নৌকায় আরো দু'চারজন সঙ্গীত-রসিক জুটিয়া গিয়াছিল। মন উচাটন হইলে তাহারা মৃদঙ্গ মন্দিরা লইয়া বসিত। পূর্ব ভারতে জয়দেব গোস্বামীর পদাবলী তখন সকলের মুখে মুখে ফিরিত; ভাষা সংস্কৃত হইলে কী হয়, এমন মধুর কোমলকান্ত পদাবলী আর নাই।

বলরামের দলের মধ্যে অর্জুনবর্মাও ছিল। সে গাহিতে বাজাইতে জানে না, কিন্তু সঙ্গীতরস উপভোগ করিতে পারে। তাই আজ বলরামের আহ্বানে সেও নৈশ কীর্তনে যোগ দিয়াছিল।

ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ বলরামের মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল; ধ্রুবপদ আর একবার আবৃত্তি করিয়া সে অন্তরা ধরিল—

তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্।
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে॥

নিস্তরঙ্গ বাতাসে রসের লহর তুলিয়া অপূর্ব সঙ্গীত প্রবাহিত হইল; দূরে দাঁড়াইয়া দুই রাজকন্যা মুগ্ধভাবে শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা কলিঙ্গের কন্যা, জয়দেবের পদ তাঁহাদের অপরিচিত নয়; কিন্তু এমনি নিরাবিল পরিবেশের মধ্যে এমন গান তাঁহারা পূর্বে কখনো শোনেন নাই। শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের দেহ রোমাঞ্চিত হইল, হৃদয় নিবিড় রসাবেশে আপ্লুত হইল।

মধ্যরাত্রে সঙ্গীত-সভা ভঙ্গ হইল। দুই রাজকন্যা নিঃশব্দে ময়ূরপঙ্খী নৌকায় উঠিয়া গেলেন, রইঘরে গিয়া শয্যায় পাশাপাশি শয়ন করিলেন। কথা হইল না, দুইজনে অর্ধনিমীলিত নেত্রে পরস্পর চাহিয়া একটু হাসিলেন; তারপর চক্ষু মুদিয়া সঙ্গীতের অনুরণন শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হৃদয়ে রসাবেশ লইয়া নিদ্রা যাইলে কখনো কখনো স্বপ্ন দেখিতে হয়। সকলে দেখে না, কেহ কেহ দেখে। দুই রাজকন্যার মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখিলেন—

স্বয়ংবর সভা। রাজকন্যা বীর্যশুল্কা হইবেন। তিনি মালা হাতে সভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন, চারিদিকে রাজন্যবর্গ। যিনি জলে ছায়া দেখিয়া শূন্যে মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করিতে পারিবেন তাঁহার গলায় রাজকন্যা মালা দিবেন। একে একে রাজারা শরক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কেহই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিলেন না। রাজকন্যার মনে অভিমান জন্মিল। অর্জুন কেন আসিতেছেন না! অন্য কেহ যদি পূর্বেই লক্ষ্যভেদ করেন তখন কী হইবে! অবশেষে ছদ্মবেশী অর্জুন আসিয়া ধনুর্বাণ তুলিয়া লইলেন, জলে ছায়া দেখিয়া উর্ধ্বে মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করিলেন। অভিমানের সঙ্গে আনন্দ মিশিয়া রাজকুমারীর চক্ষে জল আসিল, তিনি অর্জুনের গলায় মালা দিলেন। অর্জুন ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া রাজকন্যার সম্মুখে নতজানু হইলেন, বলিলেন—

মা কুরু মানিনি মানময়ে।

আট

নৌকা তিনটি চলিয়াছে।

ক্রমশ তীরে জনবসতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শুষ্ক উষরতার ফাঁকে ফাঁকে একটু হরিদাভা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রাম-শিশুরা বৃহৎ নৌকা দেখিয়া কলরব করিতে করিতে তীর ধরিয়া দৌড়ায়; যুবতীরা জল ভরিতে আসিয়া নৌকার পানে চাহিয়া থাকে, তাহাদের নিরাবরণ বক্ষের নির্লজ্জতা চোখের সলজ্জ সরল চাহনির দ্বারা নিরাকৃত হয়; গ্রাম-বৃদ্ধেরা দধি নবনী শাকপত্র ফলমূল লইয়া ডাকাডাকি করে, নৌকা হইতে ডিঙি গিয়া টাটকা খাদ্য ক্রয় করিয়া আনে।

নদীর উপর প্রভাত বেলাটি বেশ স্নিগ্ধ। কিন্তু যত বেলা বাড়িতে থাকে দুই তীরের পাথর তপ্ত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে দুঃসহ করিয়া তোলে। দ্বিপ্রহরে নৌকাগুলির নাবিক ও সৈনিকেরা জলে লাফাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটে, হুড়াহুড়ি করে। তাহাদের দেখিয়া রাজকুমারীদেরও লোভ হয় জলে পড়িয়া খেলা করেন, কিন্তু অশোভন দেখাইবে বলিয়া তাহা পারেন না; তোলা জলে স্নান করেন।

অপরাহ্নে সহসা বাতাস স্তব্ধ হইয়া যায়। মনে হয় বায়ুর অভাবে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। আড়কাঠি উদ্বিগ্ন চক্ষে আকাশের পানে চাহিয়া থাকে; কিন্তু নির্মেঘ আকাশে আশঙ্কাজনক কোনো লক্ষণ দেখিতে পায় না। তারপর অগ্নিবর্ণ সূর্য অস্ত যায়, সন্ধ্যা নামিয়া আসে। ধীরে ধীরে আবার বাতাস বহিতে আরম্ভ করে।

এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়াছে। পূর্ণিমা অতীত হইয়া কৃষ্ণপক্ষ চলিতেছে, আর দুই-এক দিনের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো যাইবে। পথশ্রান্ত যাত্রীদের মনে আবার নূতন ঔৎসুক্য জাগিয়াছে।

এই কয়দিনে বলরাম ও অর্জুনবর্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরো গাঢ় হইয়াছে। তাহারা ভিন্ন দেশের লোক, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মনের ঐক্য খুঁজিয়া পাইয়াছে; উপরন্তু অর্জুনবর্মার পক্ষে অনেকখানি কৃতজ্ঞতাও আছে। বিদেশ-বিভূঁই-এ মর্মজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু বড়ই বিরল, তাই তাহারা কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়ে না, একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে ঘুমায়, একসঙ্গে উঠে বসে। ইতিমধ্যে মনের অনেক গোপন কথা তাহারা বিনিময় করিয়াছে। দেশত্যাগের দুঃখ এবং তাহার পশ্চাতে গভীরতর আঘাতের দুঃখ তাহাদের হৃদয়কে এক করিয়া দিয়াছে।

বিজয়নগর যত কাছে আসিতেছে, দুই রাজকন্যার মনেও অলক্ষিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে। প্রথমে নৌকায় উঠিবার সময় তাঁহারা কাঁদিয়াছিলেন, শ্বশুরবাড়ি যাত্রাকালে সকল মেয়েই কাঁদে, তা রাজকন্যাই হোক আর সাধারণ গৃহস্থকন্যাই হোক। কিন্তু এখন তাঁহাদের মনে অজানিতের আতঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে। বিজয়নগর রাজ্যে সমস্তই অপরিচিত ; মানুষগুলা কি জানি কেমন, রাজা দেবরায় না জানি কেমন। মণিকঙ্কণার মুখে সদাস্ফুট হাসিটি ম্রিয়মাণ হইয়া আসিতেছে। বিদ্যুন্মালার ইন্দীবর নয়নে শুষ্ক উৎকণ্ঠা। জীবন এত জটিল কেন!

বিজয়নগরে পৌঁছিবার পূর্বরাত্রে দুই রাজকন্যা রইঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘুম সহজে আসিতেছিল না। কিছুক্ষণ শয্যায় ছট্‌ফট্ করিবার পর মণিকঙ্কণা উঠিয়া বসিল, বলিল—'চল্ মালা, ছাদে যাই। ঘরে গরম লাগছে।'

বিদ্যুন্মালাও উঠিয়া বসিলেন—'চল্।'

মন্দোদরী দ্বারের সম্মুখে আগড় হইয়া শুইয়া ছিল, তাহাকে ডিঙাইয়া দুই বোন রইঘরের ছাদে উঠিয়া গেলেন। নৌকার রক্ষী দুইজন রাজকন্যাদের বহিরাগমন জানিতে পারিলেও সাড়াশব্দ দিল না।

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত্রি, মধ্যযামে চাঁদ উঠিবে। নৌকা বাঁধা আছে, তাই বায়ুর প্রবাহ কম। তবু উন্মুক্ত ছাদ বেশ ঠাণ্ডা, অল্প বায়ু বহিতেছে। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ যেন সহস্র চক্ষু মেলিয়া ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করিতেছে। দুই ভগিনী দেহের অঞ্চল শিথিল করিয়া দিয়া ছাদের উপর বসিলেন।

নক্ষত্রখচিত ঝিকিমিকি অন্ধকারে দুইজনে নীরবে বসিয়া রহিলেন। একবার বিদ্যুন্মালার নিশ্বাস পড়িল। ক্লান্তি ও অবসাদের নিশ্বাস।

মণিকঙ্কণা জিজ্ঞাসা করিল—'কি ভাবছিস ?'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'ভাবছি শিরে সংক্রান্তি।'

'ভয় করছে ?'

'হ্যাঁ। তোর ভয় করছে না ?'

'একটু একটু। কিন্তু মিথ্যে ভয়, একবার গিয়ে পৌঁছলেই ভয় কেটে যাবে।'

'হয়তো ভয় আরো বাড়বে।'

'তুই কেবল মন্দ দিকটাই দেখিস।'

'মন্দকে যে বাদ দেওয়া যায় না।'

মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার ধরা-ধরা গলার আওয়াজ শুনিয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া দেখিল বিদ্যুন্মালার চোখে জল। সে হ্রস্বস্বরে বলিল—'তুই কাঁদছিস।'

বিদ্যুন্মালা তাহার কাঁধে মাথা রাখিলেন।

এখন, স্ত্রীজাতির স্বভাব এই যে, একজনকে কাঁদিতে দেখিলে অন্যজনেরও কান্না পায়। সুতরাং মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার কাঁধে মাথা রাখিয়া একটু কাঁদিল।

মন হালকা হইলে চক্ষু মুদিয়া আবার দুইজনে নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর হঠাৎ মণিকঙ্কণা ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—'মালা, পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখ—কিছু দেখতে পাচ্ছিস ?'

বিদ্যুন্মালা চকিতে পশ্চিম দিকে ঘাড় ফিরাইলেন। দূরে নদীর অন্ধকার যেখানে আকাশের অন্ধকারে মিশিয়াছে সেইখানে একটি অগ্নিপিণ্ড জ্বলিতেছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটা রক্তবর্ণ গ্রহ অস্ত যাইতেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দেখা যায়, আলোকপিণ্ডটি কখনো বাড়িতেছে কখনো কমিতেছে, কখনো ঊর্ধ্বে শিখা নিক্ষেপ করিতেছে। অনেকক্ষণ সেই দিকে

চাহিয়া থাকিয়া বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আগুনের পিণ্ড ! কোথায় আগুন জ্বলছে ?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'বিজয়নগর তো ওই দিকে। তাহলে নিশ্চয় বিজয়নগরের আলো। দাঁড়া, আমি খবর নিচ্ছি। —রক্ষি !'

দুইজনে বস্ত্র সংবরণ করিয়া বসিলেন ; একজন রক্ষী ছায়ামূর্তির ন্যায় কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—'আজ্ঞা করুন।'

মণিকঙ্কণা হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল—'ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে, ওটা কোথাকার আলো তুমি জানো ?'

রক্ষী বলিল—'জানি দেবী। আজই সন্ধ্যার পর আড়কাঠি মশায়ের মুখে শুনেছি। বিজয়নগরে হেমকূট নামে পাহাড়ের চূড়া আছে, সেই চূড়া পঞ্চাশ ক্রোশ দূর থেকে দেখা যায়। প্রত্যহ রাত্রে হেমকূট চূড়ায় ধুনী জ্বালা হয়, সারা রাত্রি ধুনী জ্বলে। সারা দেশের লোক জানতে পারে বিজয়নগর জেগে আছে। —আমরা কাল অপরাহ্ণে বিজয়নগরে পৌঁছব।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া মণিকঙ্কণা বলিল—'বুঝেছি। আচ্ছা, তুমি যাও।'

রক্ষী অপসৃত হইল। দুইজনে দূরাগত আলোকরশ্মির পানে চাহিয়া রহিলেন। উত্তর ভারতের দীপগুলি একে একে নিভিয়া গিয়াছে, নীরন্ধ্র অন্ধকারে অবসন্ন ভারতবাসী ঘুমাইতেছে ; কেবল দাক্ষিণাত্যের একটি হিন্দু রাজা ললাটে আগুন জ্বালিয়া জাগিয়া আছে।

নয়

পরদিন অপরাহ্ণে নৌকা তিনটি বিজয়নগরের নিকটবর্তী হইল। অর্ধক্রোশ দূর হইতে সূর্যের প্রখর আলোকে নগরের পরিদৃশ্যমান অংশ যেন পৌরুষ ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে ঝলমল করিতেছে।

নদীর উত্তর তীরে উগ্র তপস্বীর উৎক্ষিপ্ত ধূসর জটাজালের ন্যায় গিরিচক্রবেষ্টিত অনেগুন্দি দুর্গ। আদৌ এই দুর্গ বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী ছিল ; পরে রাজধানী নদীর দক্ষিণ তীরে সরিয়া আসিয়াছে। অনেগুন্দি দুর্গ বর্তমানে একটি নগররক্ষক সৈন্যাবাস।

নদীর দক্ষিণ-কূলে শতবর্ষ ধরিয়া যে মহানগরী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা যেমন শোভাময়ী তেমনি দুষ্প্রধর্ষা। সমকালীন বিদেশী পর্যটকের পাণ্ডুলিপিতে তাহার গৌরব-গরিমার বিবরণ ধৃত আছে। নগরীর বহিঃপ্রকাশের বেড় ছিল ত্রিশ ক্রোশ। তাহার ভিতর বহু ক্রোশ অন্দরে দ্বিতীয় প্রাকার। তাহার ভিতর তৃতীয় প্রাকার। এইভাবে একের পর এক সাতটি প্রাকার নগরীকে বেষ্টন করিয়া আছে। প্রাকারগুলির ব্যবধান-স্থলে অসংখ্য জলপ্রণালী তুঙ্গভদ্রা হইতে নগরীর মধ্যে জলধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। নগরীর ভূমি সর্বত্র সমতল নয় ; কোথাও ছোট ছোট পাহাড়, কোথাও সংকীর্ণ উপত্যকা। উপত্যকাগুলিতে মানুষের বাস, শস্যক্ষেত্র, ফল ও ফুলের বাগান, ধনী ব্যক্তিদের উদ্যান-বাটিকা। নগরবৃত্তের নেমি হইতে যতই নাভির দিকে যাওয়া যায়, জনবসতি ততই ঘনসংবদ্ধ হয়। অবশেষে সপ্তমচক্রের মধ্যে পৌঁছিলে দেখা যায়, রাজপুরীর বিচিত্র সুন্দর হর্ম্যগুলি সহস্রার পদ্মের মধ্যবর্তী স্বর্ণকেশরের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

নদীমধ্যস্থ নৌকা হইতে কিন্তু সমগ্র নগর দেখা যায় না, নগরের যে অংশ নদীর তটরেখা পর্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাই দৃশ্যমান। অনুমান দুই ক্রোশ দীর্ঘ এই তটরেখা মণিমেখলার ন্যায় বঙ্কিম, তাহাতে সারি সারি সৌধ উদ্যান ঘাট মন্দির হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে।

নগর-সংলগ্ন এই তটরেখার পূর্ব সীমান্তে বিস্তীর্ণ ঘাট। বড় বড় চতুষ্কোণ পাথর নির্মিত এই

ঘাটের নাম কিল্লাঘাট ; শুধু স্নানের ঘাট নয়, খেয়া ঘাটও। এই ঘাট হইতে সিধা উত্তরে অনেগুন্দি দুর্গে পারাপার হওয়া যায়। এই ঘাটে আজ বিপুল সমারোহ।

কলিঙ্গের রাজকুমারীদের লইয়া নৌ-বহর দেখা দিয়াছে, আজই অপরাহ্ণে আসিয়া পৌঁছিবে, এ সংবাদ মহারাজ দেবরায় প্রাতঃকালেই পাইয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক হস্তী অশ্ব দোলা ও পদাতি সৈন্য কিল্লাঘাটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য। কিল্লাঘাটে পাঠানোর কারণ, এই ঘাটের পর গ্রীষ্মের তুঙ্গভদ্রা আরো শীর্ণা হইয়াছে, বড় নৌকা চলে কি না চলে। কিল্লাঘাট রাজপ্রাসাদ হইতে মাত্র ক্রোশেক পথ দূরে, সুতরাং রাজকুমারীরা কিল্লাঘাটে অবতরণ করিয়া দোলায় বা হস্তিপৃষ্ঠে রাজভবনে যাইতে পারিবেন, কোনোই অসুবিধা নাই। উপরন্তু নগরবাসীরা বধূ-সমাগমের শোভাযাত্রা দেখিয়া আনন্দিত হইবে।

রাজা স্বয়ং কিল্লাঘাটে আসেন নাই, নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার কম্পনদেবকে প্রতিভূস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। কুমার কম্পন রাজা অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট, সবেমাত্র যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অতি সুন্দরকান্তি নবযুবক। রাজা এই ভ্রাতাটিকে অত্যধিক স্নেহ করেন, তাই তিনি বধূ-সম্ভাষণের জন্য নিজে না আসিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছেন।

কিল্লাঘাটের উচ্চতম সোপানে কুমার কম্পন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া নৌকার দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার পিছনে পাঁচটি চিত্রিতাঙ্গ হস্তী, হস্তীদের দুই পাশে ভল্লধারী অশ্বারোহীর সারি। তাহাদের পশ্চাতে নববেশপরিহিত ধনুর্ধর পদাতি সৈন্যের দল। সর্বশেষ ঘাটের প্রবেশমুখে নানা বর্ণাঢ্য বস্ত্রনির্মিত দ্বিভূমক তোরণ, তোরণের দুই স্তম্ভাগ্রে বসিয়া দুই দল যন্ত্রবাদক পালা করিয়া মুরজমুরলী বাজাইতেছে। বড় মিঠা মন-গলানো আগমনীর সুর।

ওদিকে অগ্রসারী নৌকা তিনটিতেও প্রবল ঔৎসুক্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। আরোহীরা নৌকার কিনারায় কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া ঘাটের দৃশ্য দেখিতেছিল। ময়ূরপঙ্খী নৌকার ছাদের উপর বিদ্যুন্মালা মণিকঙ্কণা মন্দোদরী ও মাতুল চিপিটকমূর্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলের দৃষ্টি ঘাটের দিকে। তোরণশীর্ষে নানা বর্ণের কেতন উড়িতেছে ; ঘাটের সম্মুখে জলের উপর কয়েকটি গোলাকৃতি ক্ষুদ্র নৌকা অকারণ আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছে। ঘাটের অস্ত্রধারী মানুষগুলা দাঁড়াইয়া আছে চিত্রার্পিতের ন্যায়। সর্বাগ্রে অশ্বারূঢ় পুরুষটি কে ? দূর হইতে মুখাবয়ব ভাল দেখা যায় না। উনিই কি মহারাজ দেবরায় ?

নৌকাগুলি যত কাছে যাইতেছে মুরজমুরলীর সুর ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দুই দলের দৃষ্টি পরস্পরের উপর। আকাশের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই।

নৌকা তিনটি ঘাটের দশ রজ্জুর মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখন মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালা ছাদ হইতে নামিয়া রইঘরে গেলেন। ঘাটে নামিবার পূর্বে বেশবাস পরিবর্তন, যথোপযুক্ত অলঙ্কার ধারণ ও প্রসাধন করিতে হইবে। মন্দোদরীকে ডাকিলে সে তাঁহাদের সাহায্য করিতে পারিত ; কিন্তু মন্দোদরী ঘাটের দৃশ্য দেখিতে মগ্ন, রাজকন্যারা তাহাকে ডাকিলেন না।

দুই ভগিনী গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে মহার্ঘ স্বর্ণতন্তুরচিত শাড়ি ও কঞ্চুলী পরিধান করিলেন, পরস্পরকে রত্নদ্যুতিখচিত অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন। তারপর বিদ্যুন্মালা গমনোন্মুখী হইলেন। মণিকঙ্কণা জিজ্ঞাসা করিল—'আলতা কাজল পরবি না ?'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'না, থাক।'

তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। মণিকঙ্কণা ক্ষণেক ইতস্তত করিল, তারপর কাজললতা লাক্ষারসের করঙ্ক ও সোনার দর্পণ লইয়া বসিল।

বিদ্যুন্মালা পটপত্তনের উপর আসিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই অল্পক্ষণের মধ্যে আকাশের আলো অনেক কমিয়া গিয়াছে। তিনি চকিতে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিলেন। দক্ষিণ হইতে একটা ধূম্রবর্ণ রাক্ষস ছুটিয়া আসিতেছিল, বিদ্যুন্মালার নেত্রাঘাতে যেন উন্মত্ত ক্রোধে বিকট চিৎকার করিয়া নদীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নিমেষমধ্যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।

দাক্ষিণাত্যের শৈলবন্ধুর মালভূমিতে গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে এমনি অতর্কিত ঝড় আসে। দিনের পর দিন তাপ সঞ্চিত হইতে হইতে একদিন হঠাৎ বিস্ফোরকের ন্যায় ফাটিয়া পড়ে। ঝড় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, বড় জোর দুই-তিন দণ্ড ; কিন্তু তাহার যাত্রাপথে যাহা কিছু পায় সমস্ত ছারখার করিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

এই ঝড়ের আবির্ভাব এতই আকস্মিক যে চিন্তা করিবার অবকাশ থাকে না, সতর্ক হইবার শক্তিও লুপ্ত হইয়া যায়। নৌকা তিনটি পরস্পরের কাছাকাছি চলিতেছিল, ঘাট হইতে তাহাদের দূরত্ব পাঁচ-ছয় রজ্জুর বেশি নয়, হঠাৎ ঝড়ের ধাক্কা খাইয়া তাহারা কাত হইয়া পড়িল। ময়ূরপঙ্খী নৌকার ছাদে মন্দোদরী ও চিপিটকমূর্তি ছিলেন, ছিট্‌কাইয়া নদীতে পড়িলেন। পাটাতনের উপর বিদ্যুন্মালা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মত্ত জলরাশির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মকরমুখী নৌকা হইতেও কয়েকজন নাবিক ও সৈনিক জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অর্জুনবর্মা একজন। যখন ঝড়ের ধাক্কা নৌকায় লাগিল তখন সে মকরমুখী নৌকার কিনারায় দাঁড়াইয়া ময়ূরপঙ্খী নৌকার দিকে চাহিয়া ছিল ; নিজে জলে পড়িতে পড়িতে দেখিল রাজকুমারী ডুবিয়া গেলেন। সে জলে পড়িবামাত্র তীরবেগে সাঁতার কাটিয়া চলিল।

আকাশের আলো নিভিয়া গিয়াছে, নৌকাগুলি ঝড়ের দাপটে কে কোথায় গিয়াছে কিছুই দেখা যায় না। কেবল নদীর উন্মত্ত তরঙ্গরাশি চারিদিকে উথল-পাথার হইতেছে। তারপর প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নামিল। চরাচর আকাশ-পাতাল একাকার হইয়া গেল।

বিদ্যুন্মালা তলাইয়া গিয়াছিলেন, জলতলে তরঙ্গের আকর্ষণ-বিকর্ষণে আবার ভাসিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ তরঙ্গশীর্ষে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইবার পর তাঁহার অর্ধচেতন দেহ আবার ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

নিকষ-কালো অন্ধকারের মধ্যে ঝড়ের মাতন চলিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক, মেঘের হুঙ্কার ; তারপর শোঁ শোঁ কল্‌কল্‌ শব্দ। জল ও বাতাসের মরণাত্মক সংগ্রাম।

বিদ্যুন্মালা জলতলে নামিয়া যাইতে যাইতে অস্পষ্টভাবে অনুভব করিলেন, কে যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া আবার উপর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন ; শরীর অবশ, বাঁচিয়া থাকার যে দুরন্ত প্রয়াস জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক তাহা আর নাই। জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাঁহার যেটুকু সংজ্ঞা অবশিষ্ট ছিল তাহাও লুপ্ত হইয়া গেল।

দশ

ঝড় থামিয়াছে।

মেঘের অন্ধকার অপসারিত হইবার পূর্বেই রাত্রির অন্ধকার নামিয়াছে। বর্ষণধৌত আকাশে তারাগুলি উজ্জ্বল ; তুঙ্গভদ্রার স্রোত আবার শান্ত হইয়াছে। তীরবর্তী প্রাসাদগুলির দীপরশ্মি নদীর জলে প্রতিফলিত হইয়া কাঁপিতেছে। কেবল হেমকূট শিখরে এখনও অগ্নিস্তম্ভ জ্বলে নাই।

এই অবকাশে ঝঞ্ঝাহত মানুষগুলির হিসাব লওয়া যাইতে পারে।

কিল্লাঘাটে যাহারা অতিথি সংবর্ধনার জন্য উপস্থিত ছিল তাহারাও ঝড়ের প্রকোপে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। বস্ত্রতোরণ উড়িয়া গিয়া নদীর জলে পড়িয়াছিল ; হাতিগুলা ভয় পাইয়া একটু দাপাদাপি করিয়াছিল, তাহার ফলে কয়েকজন সৈনিকের হাত-পা ভাঙ্গিয়াছিল ; আর বিশেষ কোনো অনিষ্ট হয় নাই। ঝড় অপগত হইলে কুমার কম্পন নৌকা তিনটির নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু রাত্রি অন্ধকার, তীরস্থ গোলাকৃতি ছোট নৌকাগুলি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। কুমার কম্পন কোনো সন্ধানই পাইলেন না। তখন তিনি সৈন্যদের ঘাটে রাখিয়া অশ্বপৃষ্ঠে রাজভবনে ফিরিয়া গেলেন। রাজাকে সংবাদ দিয়া কাল প্রত্যূষে তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন।

নৌকা তিনটি ঝড়ের আঘাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ডুবিয়া যায় নাই ; অগভীর জলে বা নদীমধ্যস্থ দ্বীপের শিলাসৈকতে আটকাইয়া গিয়াছিল। নাবিক ও সৈন্যদের মধ্যে যাহারা ছিটকাইয়া জলে পড়িয়াছিল তাহারাও কেহ ডুবিয়া মরে নাই, জল ও বাতাসের তাড়নে কোথাও না কোথাও ডাঙ্গার আশ্রয় পাইয়াছিল। ময়ূরপঙ্খী নৌকায় মণিকঙ্কণা ও বৃদ্ধ রসরাজ আটক পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণের আশঙ্কা আর ছিল না বটে, কিন্তু বিদ্যুন্মালা, চিপিটক এবং মন্দোদরীর জন্য তাঁহাদের প্রাণে নিদারুণ ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছিল। মণিকঙ্কণা ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতেছিল—কোথায় গেল বিদ্যুন্মালা ? মামা ও মন্দোদরীর কী হইল ? তাহারা কি সকলেই ডুবিয়া গিয়াছে ? রসরাজ মণিকঙ্কণাকে সান্ত্বনা দিবার ফাঁকে ফাঁকে প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন।

মামা ও মন্দোদরী ডুবিয়া যায় নাই। দুইজনে একসঙ্গে জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কেহই সাঁতার জানে না। মামার বকপক্ষীর ন্যায় শীর্ণ দেহটি ডুবিয়া যাইবার উপক্রম করিল ; মন্দোদরীর কিন্তু ডুবিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, তাহার বিপুল বপু তরঙ্গশীর্ষে শূন্য কলসের ন্যায় নাচিতে লাগিল। মামা ডুবিয়া যাইতে যাইতে মন্দোদরীর একটা পা নাগালের মধ্যে পাইলেন, তিনি মরীয়া হইয়া তাহা চাপিয়া ধরিলেন। ঝড়ের টানাটানি তাঁহার বজ্রমুষ্টিকে শিথিল করিতে পারিল না। কিন্তু চিপিটক ও মন্দোদরীর প্রসঙ্গ এখন থাক।

বিদ্যুন্মালা নদীমধ্যস্থ একটি দ্বীপের সিক্ত সৈকতে শুইয়া ছিলেন, চেতনা ফিরিয়া পাইয়া অনুভব করিলেন তাঁহার বসন আর্দ্র। মনে পড়িয়া গেল তিনি নদীতে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তারপর বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় পরিপূর্ণ স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুলিলেন।

চোখ খুলিয়া তিনি প্রথমে কিছু দেখিতে পাইলেন না, ভিতরের অন্ধকার ও বাহিরের অন্ধকার প্রায় সমান। ক্রমে সূচির ন্যায় সূক্ষ্ম আলোকের রশ্মি তাঁহার চক্ষুকে বিদ্ধ করিল। আকাশের তারা কি ? আশেপাশে আর কিছু দেখা যায় না। তখন তিনি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্তর্পণে উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিলেন।

কে যেন শিয়রে বসিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া ছিল, হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'এখন বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে ?'

বিদ্যুন্মালা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না ; অন্ধকারের মধ্যে গাঢ়তর অন্ধকারের একটা পিণ্ড রহিয়াছে মনে হইল। তিনি স্খলিত স্বরে বলিলেন—'কে ?'

শান্ত আশ্বাসভরা উত্তর হইল—'আমি—অর্জুনবর্মা।'

ক্ষণকাল উভয়ে নীরব। তারপর বিদ্যুন্মালা ক্ষীণ বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—'অর্জুনবর্মা—আমি ঝড়ের ধাক্কায় জলে পড়ে গিয়েছিলাম—কিছুক্ষণের জন্য নিশ্বাস রোধ হয়ে গিয়েছিল—তারপর কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলল—আর কিছু মনে নেই।—এ কোন্ স্থান ?'

অর্জুনবর্মা বলিল—'বোধহয় নদীর একটা দ্বীপ। আপনি শরীরে কোনো ব্যথা অনুভব করছেন কি ?'

বিদ্যুন্মালা নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। বলিলেন—'না। কিন্তু আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

অর্জুনবর্মা বলিল—'অন্ধকার রাত্রি, তাই কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। আকাশের পানে চোখ তুলুন, তারা দেখতে পাবেন।'

বিদ্যুন্মালা উর্ধ্বে চাহিলেন। হাঁ, ওই তারার পুঞ্জ! প্রথম চক্ষু মেলিয়া তাহাদের দেখিয়াছিলেন, এখন যেন তাহারা আরো উজ্জ্বল হইয়াছে।

অর্জুনবর্মা বলিল—'পিছন দিকে ফিরে দেখুন, হেমকূট চূড়ার ধুনী জ্বলছে।'

হেমকূট চূড়ায় প্রত্যহ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ধুনী জ্বলে ; আজ বৃষ্টির জলে ইন্ধন সিক্ত হইয়াছিল তাই ধুনী জ্বলিতে বিলম্ব হইয়াছে। বিদ্যুন্মালা দেখিলেন, দূরে গিরিচূড়ায় ধূম্রজাল ভেদ করিয়া অগ্নির শিখা উত্থিত হইতেছে।

সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মার দিকে চাহিলেন, মনে হইল যেন সুদূর ধুনীর আলোকে অর্জুনবর্মার আকৃতি ছায়ার ন্যায় দেখা যাইতেছে। এতক্ষণ বিদ্যুন্মালার অন্তরের সমস্ত আবেগ যেন মূর্ছিত হইয়া ছিল, এখন স্ফুলিঙ্গের ন্যায় একটু আনন্দ স্ফুরিত হইল—'অর্জুনবর্মা! আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি।' এই পর্যন্ত বলিয়াই তাঁহার আনন্দটুকু নিভিয়া গেল, তিনি উদ্বেগসংহত কণ্ঠে বলিলেন—'কিন্তু কঙ্কণা কোথায় ? মন্দোদরী কোথায় ?'

অর্জুন বলিল—'কে কোথায় আছে তা সূর্যোদয়ের আগে জানা যাবে না।'

'আজ কি চাঁদও উঠবে না ?'

'উঠবে, মধ্যরাত্রির পর।'

'এখন রাত্রি কত ?'

'বোধহয় প্রথম প্রহর শেষ হয়েছে।—রাজকুমারি, আপনার শরীর দুর্বল, আপনি শুয়ে থাকুন। বেশি চিন্তা করবেন না। দুর্বল শরীরে চিন্তা করলে দেহ আরো নিস্তেজ হয়ে পড়বে।'

'আর আপনি ?'

'আমি পাহারায় থাকব।'

এই অসহায় অবস্থাতেও বিদ্যুন্মালা পরম আশ্বাস পাইলেন। দুই-চারিটি কথা বলিয়াই তাঁহার শরীরের অবশিষ্ট শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছিল, তিনি আবার বালুশয্যায় শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া শুইয়া থাকিবার পর তাঁহার ক্লান্ত চেতনা আবার সুপ্তির অতলে ডুবিয়া গেল।

বিদ্যুন্মালার চেতনা সুষুপ্তির পাতাল স্পর্শ করিয়া আবার ধীরে ধীরে স্বপ্নলোকের অচ্ছাভ স্তরে উঠিয়া আসিল। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, সেই স্বপ্ন যাহা পূর্বে একবার দেখিয়াছিলেন। স্বয়ংবর সভায় অর্জুন মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করিয়া রাজকুমারীর সম্মুখে নতজানু হইলেন। বলিলেন—'রাজকুমারি, দেখুন চাঁদ উঠেছে।'

বিদ্যুন্মালা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন অর্জুনবর্মা তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিতেছে—'রাজকুমারি, দেখুন চাঁদ উঠেছে।' স্বপ্নের অর্জুন ও প্রত্যক্ষের অর্জুনবর্মায় আকৃতিগত কোনো প্রভেদ নাই।

চাঁদ অবশ্য অনেক আগেই উঠিয়াছিল, দিকচক্র হইতে প্রায় এক রাশি উর্ধ্বে আরোহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণ চন্দ্র, কিন্তু পরশু ফলকের ন্যায় উজ্জ্বল। তাহারই আলোকে বিদ্যুন্মালার ঘুমন্ত মুখখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তবেণী চুলগুলি বিস্রস্ত হইয়া মুখখানিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, মহার্ঘ বস্ত্রটি বালুকালিপ্ত অবস্থায় নিদ্রাশীতল দেহটিকে

অযত্নভরে আবৃত করিয়াছিল। সব মিলিয়া যেন একটি শৈবালবিদ্ধ কুমুদিনী, ঝড়ের আক্রোশে উন্মূলিত হইয়া তটপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

অর্জুনবর্মা মোহাচ্ছন্ন চোখে ওই মুখখানির পানে চাহিয়া ছিল। তাহার দৃষ্টিতে লুব্ধতা ছিল না, মনে কোনো চিন্তা ছিল না ; রম্যাণি বীক্ষ্য মানুষের মন যেমন অজ্ঞাতপূর্ব স্মৃতির জালে জড়াইয়া যায়, অর্জুনবর্মার মনও তেমনি নিগূঢ় স্বপ্নজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আলোড়িত জলরাশির মধ্য হইতে রাজকন্যার অচেতন দেহ টানিয়া তোলার স্মৃতিও অসংলগ্নভাবে মনের মধ্যে জাগিয়া ছিল।

অনেকক্ষণ বিদ্যুন্মালার মুখের পানে চাহিয়া থাকিবার পর তাহার চমক ভাঙ্গিল। ঘুমন্ত রাজকন্যার অনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া থাকার রূঢ় ধৃষ্টতায় সন্ত্রস্ত হইয়া সে চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্না কুহেলির ভিতর নিমগ্ন প্রকৃতি বাষ্পাচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টির ন্যায় অস্পষ্ট আবছা হইয়া আছে। অর্জুন চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল, তারপর নিঃশব্দে সরিয়া গিয়া দ্বীপের কিনারা ধরিয়া পরিক্রমণ আরম্ভ করিল। চিরসঙ্গী লাঠি দু'টি আজ তাহার সঙ্গে নাই, নৌকা হইতে পতনকালে নৌকাতেই রহিয়া গিয়াছিল। বলরাম যদি বাঁচিয়া থাকে হয়তো লাঠি দু'টিকে যত্ন করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বীপটি ক্ষুদ্র, প্রায় গোলাকৃতি ; তীরে নুড়ি-ছড়ানো বালুবেলা, মধ্যস্থলে বড় বড় পাথরের চ্যাঙড় উঁচু হইয়া আছে। অর্জুনবর্মা তীর ধরিয়া পরিক্রমণ করিতে করিতে নানা অসংলগ্ন কথা চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার উদ্বিগ্ন জল্পনার মধ্যে মনের নিভৃত একটা অংশ রাজকন্যার কাছে পড়িয়া রহিল। রাজকুমারী একাকিনী ঘুমাইতেছেন। যদি হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ভয় পান! যদি দ্বীপের মধ্যে শৃগাল বা বনবিড়াল জাতীয় হিংস্র জন্তু লুকাইয়া থাকে— !

দ্বীপে কিন্তু হিংস্র জন্তু ছিল না। অর্জুনবর্মা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল কয়েকটি তীরচর ক্ষুদ্র পাখি জলের ধারে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পদশব্দে টিটিহি টিটিহি শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। টিট্টিভ পাখি।

বিদ্যুন্মালার কাছে ফিরিয়া আসিয়া অর্জুনবর্মা দেখিল তিনি যেমন শুইয়া ছিলেন তেমনি শুইয়া আছেন, একটুও নড়েন নাই। অহেতুক উদ্বেগে অর্জুনের মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল, সে তাঁহার শিয়রে নতজানু হইয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া দেখিল।

না, আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। ক্লান্তির বিবশ জড়তা কাটিয়া গিয়াছে, রাজকুমারী স্বপ্ন দেখিতেছেন। স্বপ্নের ঘোরে তাঁহার ভ্রূ কখনো কুঞ্চিত হইতেছে, কখনো অধরে একটু হাসির আভাস দেখা দিয়াই মিলাইয়া যাইতেছে।

স্বপ্নলোকে কোন্ বিচিত্র দৃশ্যের অভিনয় হইতেছে কে জানে। অর্জুনবর্মা মনে মনে একটু ঔৎসুক্য অনুভব করিল ; সে একবার চাঁদের দিকে চাহিল, একবার বিদ্যুন্মালার স্বপ্নমুগ্ধ মুখখানি দেখিল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল—'রাজকুমারি, দেখুন চাঁদ উঠেছে।'

এগারো

বিদ্যুন্মালা জাগ্রতলোকে ফিরিয়া আসিয়া সিধা উঠিয়া বসিলেন, অর্জুনবর্মার পানে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। স্বপ্ন ও জাগরের জট ছাড়াইতে একটু সময় লাগিল। তারপর তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—'আপনি কথা বললেন ?'

অর্জুন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বলিল—'আপনি বোধহয় খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলেন। আমি ভেঙে দিলাম।'

বিদ্যুন্মালা চাঁদের পানে চাহিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, স্বপ্ন এখনও ভাঙে নাই।

অর্জুনবর্মা সঙ্কুচিতভাবে একটু দূরে বসিল, বলিল—'রাজকুমারি, আপনার শরীরের সব গ্লানি দূর হয়েছে ?'

চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'হাঁ, এখন বেশ স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছে। —রাত কত ?'

হেমকূট শিখরে অগ্নিস্তম্ভ নির্ধূম শিখায় জ্বলিতেছে, নদীতীরস্থ গৃহগুলিতে দীপ নিভিয়া গিয়াছে। অর্জুন বলিল—'তৃতীয় প্রহর।'

এখনো রাত্রি শেষ হইতে বিলম্ব আছে। যতক্ষণ সূর্যোদয় না হয় ততক্ষণ স্বপ্নকে বিদায় দিবার প্রয়োজন নাই।

রাজকুমারী মনে মনে যেন কিছু জল্পনা করিতেছেন। তারপর মন স্থির করিয়া তিনি অর্জুনবর্মার পানে ফিরিলেন, বলিলেন—'ভদ্র, আজ আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন।'

অর্জুন গলার মধ্যে একটু শব্দ করিল, উত্তর দিল না। বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আপনার পরিচয় আমি কিছুই জানি না, কিন্তু আমার প্রাণদাতার পরিচয় আমি জানতে চাই। আপনি সবিস্তারে আপনার জীবনকথা আমাকে বলুন, আমি শুনব।'

অর্জুন বিহ্বল হইয়া বলিল—'দেবি, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমার পরিচয় কিছু নেই।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আছে বৈকি। আপনি নিজের কার্যের দ্বারা খানিকটা আত্মপরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ নয়। আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় আমি জানতে চাই।'

অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। উত্তর না পাইয়া বিদ্যুন্মালা একটু হাসিলেন, বলিলেন—'অবশ্য আপনি ক্লান্ত, ওই দুর্যোগের পর ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম করেননি। আপনি যদি ক্লান্তিবশত কাহিনী বলতে না পারেন, তাহলে থাক, আপনি বরং নিদ্রা যান। আমি তো এখন সুস্থ হয়েছি, আমি জেগে থেকে পাহারা দেব।'

অর্জুন বলিল—'না না, আমার নিদ্রার প্রয়োজন নেই। আপনি যখন শুনতে চান, আমার জীবনকথা বলছি। রাত্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর তো কিছুই করবার নেই।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'তাহলে আরম্ভ করুন।'

অর্জুন কিছুক্ষণ হেঁট মুখে নীরব রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

'আমার পিতার নাম রামবর্মা। আমরা যাদববংশীয় ক্ষত্রিয়। আমার পূর্বপুরুষেরা বহু শতাব্দী আগে উত্তর দেশ থেকে এসে কৃষ্ণা নদীর তীরে বসতি করেছিলেন। উত্তর দেশে তখন যবনের আবির্ভাব হয়েছে, মানুষের প্রাণে সুখ-শান্তি নেই। দাক্ষিণাত্যে এসেও আমার পূর্বপুরুষেরা বেশি দিন সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারলেন না, পিছন পিছন যবনেরা এসে উপস্থিত হল। উত্তরাপথের যে দুরবস্থা হয়েছিল দক্ষিণাপথেরও সেই দুরবস্থা হল। তারপর আজ থেকে শত বর্ষ পূর্বে বিজয়নগরে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হল, যবনেরা কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ দিক থেকে বিতাড়িত হল। আমার পূর্বপুরুষেরা কৃষ্ণার উভয় তীরে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা যবনের অধীনেই রইলেন। দাক্ষিণাত্যের যবনেরা দিল্লীর শাসন ছিন্ন করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার নাম বহমনী রাজ্য ; গুলবর্গা তার রাজধানী।

আমার পূর্বপুরুষেরা যোদ্ধা ছিলেন, গুলবর্গার উপকণ্ঠে জমিজমা বাসগৃহ করেছিলেন। যখন যবন এসে গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করল তখন তাঁরা যুদ্ধব্যবসায় ত্যাগ করলেন ; কারণ যুদ্ধ করতে হলে যবনের পক্ষে স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। তাঁরা অস্ত্র ত্যাগ করে শাস্ত্রচর্চায়

নিযুক্ত হলেন।

এসব কথা আমি আমার পিতার মুখে শুনেছি।

সেই থেকে আমাদের বংশে বিদ্যার চর্চা প্রচলিত হয়েছে, কেবল আমি তার ব্যতিক্রম। কিন্তু নিজের কথা পরে বলব, আগে আমার পিতার কথা বলি।

আমার পিতা জীবিত আছেন, আমি দেখে এসেছি, কিন্তু এতদিনে তিনি বোধহয় আর জীবিত নেই। তিনি যুদ্ধবৃত্তি ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে তিনি যোদ্ধা ছিলেন। কোনো দিন যবনের কাছে মাথা নত করেননি। গৃহে বসে তিনি বিদ্যাচর্চা করতেন, জ্যোতিষ ও গণিত বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। বিশেষত হিসাব-নিকাশের কাজের জন্য তিনি গুলবর্গায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমি ছেলেবেলা থেকে দেখছি, গুলবর্গার বড় বড় ব্যবসায়ী তাঁর কাছে আসে নিজের ব্যবসায়ের হিসাবপত্র বুঝে নেবার জন্য। এ থেকে পিতার যথেষ্ট আয় ছিল।

আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান। পিতা আর বিবাহ করেননি। আমি এবং পিতা ছাড়া আমাদের গৃহে আর কেউ ছিল না।

আমার কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার দিকে মন ছিল না। বংশের সহজাত সংস্কার আমার রক্তে বেশি আছে ; ছেলেবেলা থেকে আমি খেলাধূলা অস্ত্রবিদ্যা সাঁতার মল্লযুদ্ধ এইসব নিয়ে মত্ত থাকতাম। একদল বেদিয়ার কাছে একটি গুপ্তবিদ্যা শিখেছিলাম, যার বলে এক দণ্ডে তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে পারি। পিতা আমার মনের প্রবণতা দেখে মাঝে মাঝে বলতেন—'অর্জুন, তোমার ধাতু-প্রকৃতিতে গোত্রপ্রভাব বড় প্রবল, তোমার কোষ্ঠীও যোদ্ধার কোষ্ঠী। তুমি বিজয়নগরে গিয়ে হিন্দু রাজার অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন কর।' আমি বলতাম—'পিতা, আপনিও চলুন।' তিনি বলতেন—'সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে আমি যাই কী করে ? গৃহে দীপ জ্বলবে না, যবনেরা সব লুটেপুটে নিয়ে যাবে। তুমি যাও, হিন্দু রাজ্যে নিঃশঙ্কে বাস করতে পারবে।' কিন্তু আমি যেতে পারতাম না, পিতাকে ছেড়ে একা চলে যেতে মন চাইত না।

এইভাবে জীবন কাটছিল ; জীবনে নিবিড় সুখও ছিল না, গভীর দুঃখও ছিল না। তারপর আজ থেকে দশ-বারো দিন আগে রাত্রি দ্বিপ্রহরে পিতার এক বন্ধু এলেন। মহাধনী বণিক, সুলতান আহমদ শাহের সভায় যাতায়াত আছে, তিনি চুপি চুপি এসে বলে গেলেন—'আহমদ শাহ স্থির করেছে তোমাকে আর তোমার ছেলেকে গরু খাইয়ে মুসলমান করবে, তারপর তোমাকে নিজের দপ্তরে বসাবে। কাল সকালেই সুলতানের সিপাহীরা আসবে তোমাদের ধরে নিয়ে যেতে।'

পিতার মাথায় বজ্রাঘাত। সংবাদদাতা যেমন গোপনে এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। আমরা দুই পিতা-পুত্র সারারাত পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে বসে রইলাম।

মুসলমানেরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তাদের প্রাণে ভয় নেই। কিন্তু তারা দস্যুরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল, সেই দস্যুবৃত্তি এখনো ত্যাগ করতে পারেনি। তারা লুঠ করতে জানে, কিন্তু রাজ্য চালাতে জানে না ; আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে জানে না। তাই তারা কর্মদক্ষ বুদ্ধিমান হিন্দু দেখলেই জোর করে তাদের মুসলমান বানিয়ে নিজেদের দলে টেনে নেয়। পিতাকেও তারা গরু খাইয়ে নিজের দলে টেনে নিতে চায়। সেই সঙ্গে আমাকেও।

রাত্রি যখন শেষ হয়ে আসছে তখন পিতা বললেন—'অর্জুন, আমার পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে, কোষ্ঠী গণনা করে দেখেছি আমার আয়ু শেষ হয়ে আসছে। ম্লেচ্ছরা যদি জোর করে আমার ধর্মনাশ করে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করব। কিন্তু তুমি পালিয়ে যাও, তোমার জীবনে এখনো সবই বাকি। নদী পার হয়ে তুমি হিন্দু রাজ্যে চলে যাও।'

আমি পিতার পা ধরে কাঁদতে লাগলাম। পিতা বললেন—'কেঁদো না। আমরা যাদববংশীয়

ক্ষত্রিয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পূর্বপুরুষ। তাঁকেও একদিন জরাসন্ধের অত্যাচারে মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় চলে যেতে হয়েছিল। তুমি বিজয়নগরে যাও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে রক্ষা করবেন।'

বাইরে তখন কাক কোকিল ডাকতে আরম্ভ করেছে। আমি গৃহ ছেড়ে যাত্রা করলাম। আমার সঙ্গে শুধু এক জোড়া লাঠি। বেদিয়ারা আমাকে যে লাঠিতে চড়ে হাঁটতে শিখিয়েছিল সেই লাঠি। এ লাঠি একাধারে অস্ত্র এবং যানবাহন।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই শুনতে পেলাম—অশ্বক্ষুরধ্বনি। চারজন অশ্বারোহী আমাদের ধরে নিয়ে যেতে আসছে। আমি আর বিলম্ব করলাম না, লাঠিতে চড়ে নদীর দিকে ছুটলাম। সওয়ারেরা আমাকে দেখতে পেয়েছিল, তারা আমাকে তাড়া করল। কিন্তু ধরতে পারল না। আমাদের গৃহ থেকে নদী প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূরে, আমি গিয়ে লাঠিসুদ্ধ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অশ্বারোহীরা আর আমাকে অনুসরণ করতে পারল না।

সারাদিন নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমে এসে পৌঁছুলাম। তারপর—তারপর যা হল সবই আপনি জানেন।'

অর্জুন নীরব হইল। বিদ্যুন্মালা নতমুখে শুনিতেছিলেন, চোখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিলেন। চন্দ্রের প্রভা ম্লান হইয়া গিয়াছে, পূর্বাকাশে শুকতারা দপদপ করিতেছে।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

দিনের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই কিল্লাঘাটে মহা হৈ-চৈ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কুমার কম্পন ফিরিয়া আসিয়াছেন। গোলাকৃতি খেয়ার তরীগুলি ঝড়ের তাড়নে ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ডুবিয়া যায় নাই; তাহারা ঘাটে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই বিচিত্র গঠনের ডিঙাগুলি তুঙ্গভদ্রার নিজস্ব নৌকা, ভারতের অন্য কোথাও দেখা যাইত না। বেতের চ্যাঙ্গারির গায়ে চামড়ার আবরণ পরাইয়া এই ডিঙাগুলি নির্মিত; তবে আয়তনে চ্যাঙ্গারির তুলনায় অনেক বড়, দশ-বারো জন মানুষ তল্পিতল্পা লইয়া স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। এই জাতীয় জলযান প্রাচীন কাল হইতে আরব দেশে প্রচলিত ছিল, দক্ষিণ ভারতে কেমন করিয়া উপনীত হইল বলা সহজ নয়। হয়তো মোপলারা যখন আরব দেশ হইতে আসিয়া দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন করে তখন তাহারাই এই জাতীয় নৌকার প্রবর্তন করিয়াছিল।

কুমার কম্পনদেব ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, কলিঙ্গের তিনটি বহিত্র নদীমধ্যস্থ বিভিন্ন চরে আটকাইয়া বেসামাল ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে; যদিও মানুষগুলাকে দেখা যাইতেছে না, তবু আশা করা যায় তাহারা বাঁচিয়া আছে। বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের উদ্ধার করা প্রয়োজন; সর্বাগ্রে কলিঙ্গের দুই রাজকন্যার সন্ধান লওয়া কর্তব্য। কম্পনদেব আদেশ দিলেন; চক্রাকৃতি ডিঙাগুলি লইয়া মাঝিরা অর্ধমজ্জিত বহিত্রগুলির দিকে চলিল। সর্বশেষ ডিঙাতে স্বয়ং কম্পনদেব উঠিলেন।

এখনও সূর্যোদয় হয় নাই, কিন্তু পূর্বদিগন্ত আসন্ন সূর্যের ছটায় স্বর্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে। ডিঙাগুলি ভাটির দিকে চলিল, কারণ বানচাল বহিত্র তিনটি ঐদিকেই পরস্পর হইতে দুই-তিন রজ্জু দূরে আটকাইয়া আছে।

সকলের পশ্চাতে কম্পনদেবের ডিঙা যাইতেছিল। তিনি ডিঙার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া

এদিক-ওদিক চাহিতেছিলেন ; সহসা তাঁহার চোখে পড়িল, পাশের দিকে দ্বীপাকৃতি একটি চরের উপর দুইটি মনুষ্যমূর্তি পড়িয়া আছে। তিনি আরো ভাল করিয়া দেখিলেন ঃ হাঁ, সৈকতলীন মনুষ্যদেহই বটে। কিন্তু জীবিত কি মৃত বলা যায় না। একটির দেহে বালু-কর্দমাক্ত রক্তাংশুক দেখিয়া মনে হয় সে নারী। কম্পনদেব মাঝিকে সেইদিকে ডিঙা ফিরাইতে বলিলেন।

দ্বীপে নামিয়া কম্পনদেব নিঃশব্দে ভূমিশয়ান মূর্তি দুইটির নিকটবর্তী হইলেন। একটি নারী, অন্যটি পুরুষ ; পরস্পর হইতে তিন-চারি হস্ত অন্তরে শুইয়া আছে। কিন্তু মৃত নয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দে দেহের সঞ্চালন লক্ষ্য করা যায়। হয় মূর্ছিত, নয় নিদ্রিত।

কম্পনদেবের চক্ষু যুবতীর মুখ হইতে পুরুষের মুখের দিকে কয়েকবার দ্রুত যাতায়াত করিল, তারপর যুবতীর মুখের উপর স্থির হইল। এই সময় সূর্যবিম্ব দিকচক্রের উপর মাথা তুলিয়া চারিদিকে অরুণচ্ছটা ছড়াইয়া দিল। যুবতীর মুখে বালার্ক-কুঙ্কুমের স্পর্শ লাগিল।

কম্পনদেব নিষ্পলক নেত্রে যুবতীর ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি রাজপুত্র, সুন্দরী যুবতী তাঁহার কাছে নূতন নয়। কিন্তু এই ভূমিশয়ান যুবতীর মুখে এমন একটি দুর্নিবার চৌম্বকশক্তি আছে যে বিমূঢ় হইয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। কম্পনদেব যুবতীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন—এ নিশ্চয় কলিঙ্গের প্রধানা রাজকন্যা, বিজয়নগরের ভাবী রাজবধূ। কম্পনদেব বোধকরি কলিঙ্গদেশীয়া বরাঙ্গনাদের কুহকভরা রূপলাবণ্যের সহিত ইতিপূর্বে পরিচিত ছিলেন না, তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া ঈর্ষামিশ্রিত অভীপ্সার শিহরণ বহিয়া গেল।

আরো কিছুক্ষণ নিদ্রিতাকে পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি গলার মধ্যে শব্দ করিলেন, অমনি বিদ্যুন্মালার চক্ষু দু'টি খুলিয়া গেল ; অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া তিনি বসন সংবরণপূর্বক উঠিয়া বসিলেন। উষাকালে তিনি আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্জুনও ঘুমাইয়াছিল। অর্জুনের ঘুম কিন্তু ভাঙ্গিল না, সারা রাত্রি জাগরণের পর সে গভীরভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বিদ্যুন্মালা একবার কুমার কম্পনদেবের দিকে চক্ষু তুলিয়াই আবার চক্ষু নত করিলেন। এই পরম কান্তিমান যুবকের চোখের দৃষ্টি ভাল নয়। বিদ্যুন্মালা ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কে ?'

কম্পনদেব বলিলেন—'আমি রাজভ্রাতা কুমার কম্পনদেব। ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্তদের খোঁজ নিতে বেরিয়েছি। আপনি— ?'

'আমি কলিঙ্গের রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা।'

কম্পনদেব অর্জুনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'এ ব্যক্তি কে ?'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আমি ঝড়ের আঘাতে নৌকা থেকে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, ডুবে যাচ্ছিলাম। উনি আমাকে উদ্ধার করেছেন। ওঁর নাম অর্জুনবর্মা।'

নিদ্রার মধ্যেও নিজের নাম অর্জুনের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সে এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল ; কম্পনদেবকে দেখিয়া বলিল—'কে ?'

কম্পনদেব কুঞ্চিতচক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, উত্তর দিলেন না ; তারপর বিদ্যুন্মালার দিকে ফিরিলেন—'সারা রাত্রি আপনি এবং এই ব্যক্তি দ্বীপেই ছিলেন ?'

'হাঁ।'

'ভাল। চলুন, এবার ডিঙায় উঠুন।'

বিদ্যুন্মালা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষে সহসা ব্যাকুলতার ছায়া পড়িল, তিনি বলিলেন—'কিন্তু—কঙ্কণা ? আমাদের নৌকা কি ডুবে গিয়েছে ?'

কম্পনদেব বলিলেন—'না, একটি নৌকাও ডোবেনি। —কঙ্কণা কে ?'

'আমার ভগিনী—মণিকঙ্কণা।'

'তিনি নিশ্চয় ময়ূরপঙ্খী নৌকাতেই আছেন। আসুন, প্রথমে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই।'

বিদ্যুন্মালা ডিঙায় উঠিলেন। কুমার কম্পন একটু চিন্তা করিয়া অর্জুনের দিকে শিরঃসঞ্চালন করিলেন। অর্জুন ডিঙায় উঠিল। তখন কম্পনদেব স্বয়ং ডিঙায় আরোহণ করিয়া স্রোতের মুখে নৌকা চালাইবার আদেশ দিলেন।

সূর্য আরো উপরে উঠিয়াছে। নদীর বুকে যে সামান্য বাষ্পাবরণ জমিয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে, নৌকা তিনটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রথমেই ময়ূরপঙ্খী নৌকা নিমজ্জিত চরে অবরুদ্ধ হইয়া উৎকণ্ঠ ময়ূরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে; চারিদিকে জল। ইতিমধ্যে একটি ডিঙা তাহার নিকট পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ময়ূরপঙ্খীর পাটাতনে মানুষ দেখা যাইতেছে না।

কুমার কম্পনের ডিঙা ময়ূরপঙ্খীর গায়ে গিয়া ভিড়িল। কুমারী বিদ্যুন্মালা শীর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন—'কঙ্কণা!'

খোলের ভিতর হইতে আলুথালু বেশে মণিকঙ্কণা বাহির হইয়া আসিল। বিদ্যুন্মালাকে দেখিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—'মালা! তুই বেঁচে আছিস!'

বিদ্যুন্মালা টলিতে টলিতে ময়ূরপঙ্খীর পাটাতনে উঠিলেন, দুই ভগিনী পরস্পর কণ্ঠলগ্না হইলেন। তারপর গলদশ্রু নেত্রে রইঘরে নামিয়া গেলেন। রাজপুরীতে যাইতে হইবে, আবার বেশবাস পরিবর্তন করিয়া রাজকন্যার উপযোগী সাজসজ্জা করা প্রয়োজন।

ডিঙাতে দাঁড়াইয়া কুমার কম্পন অঙ্গুলি দিয়া সূক্ষ্ম গুম্ফের প্রান্ত আমর্শন করিতে লাগিলেন। অর্জুন অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতেছিল, তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে কষ্ট হইল না। রাজপুত্র রূপ দেখিয়া মজিয়াছেন।

শোভাযাত্রা করিয়া রাজকন্যারা কিল্লাঘাট হইতে রাজভবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজকন্যাদের হাতির পিঠে উঠিবার অনুরোধ করা হইয়াছিল, তাঁহারা ওঠেন নাই। দুই বোন পাশাপাশি চতুর্দোলায় বসিয়াছেন। কুমার কম্পন অশ্বপৃষ্ঠে চতুর্দোলার পাশে চলিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি মুহুর্মুহু রাজকন্যাদের দিকে ফিরিতেছে; রহস্যময় দৃষ্টি, তাঁহার অন্তর্গূঢ় জল্পনা কেহ অনুমান করিতে পারে না।

চতুর্দোলার পশ্চাতে একটি দোলায় রাজবৈদ্য বৃদ্ধ রসরাজ ঔষধের পেটরা লইয়া উঠিয়াছেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার দেহ অনাহত আছে, কিন্তু অবস্থাগতিকে তিনি যেন একটু দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

রসরাজের পিছনে নৌকার নাবিক ও সৈনিকের দল পদব্রজে চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অর্জুনবর্মাও আছে। সে চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া এদিক-ওদিক দেখিতেছে; সবগুলি মুখই পরিচিত, কিন্তু বলরামকে দেখা যাইতেছে না। অর্জুনের পাশের লোকটি হাসিয়া বলিল—'বলরাম কর্মকারকে খুঁজছ? সে আসেনি। নৌকা জখম হয়েছে, তাই মেরামতির জন্য বলরাম আর কয়েকজন ছুতার নৌকাতেই আছে।' অর্জুন নিশ্চিন্ত হইল, বিচিত্র নগরশোভা দেখিতে দেখিতে চলিল।

শোভাযাত্রার গতি দ্রুত নয়; সম্মুখে পাঁচটি হাতি ও পশ্চাতে অশ্বারোহীর দল তাহার বেগমর্যাদা সংযত করিয়া রাখিয়াছে। আজ আর মুরজমুরলী বাজিতেছে না, থাকিয়া থাকিয়া বিপুল শব্দে তূরী ও পটহ ধ্বনিত হইতেছে; যেন বিজয়ী সৈন্যদল ডঙ্কা বাজাইয়া গৃহে ফিরিতেছে।

এই বিশাল নগরের আকৃতি প্রকৃতি সত্যই বিচিত্র। সাতটি প্রাকারবেষ্টনীর মধ্যে ছয়টি পিছনে পড়িয়া আছে, তবু নগর এখনো তাদৃশ জনাকীর্ণ নয়। ভূমি কোথাও সমতল নয়, কঙ্কারাবৃত পথ

কখনো উঠিতেছে কখনো নামিতেছে, কখনো মকরাকৃতি অনুচ্চ গিরিশ্রেণীকে পাশ কাটাইয়া যাইতেছে। কোথাও অগভীর সংকীর্ণ পয়োনালক পথকে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছে, হাঁটু পর্যন্ত জল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। যেখানে জমি একটু সমতল সেখানেই পথের পাশে পাথরের গৃহ, ফুলের বাগান, আম্রবাটিকা, ইক্ষুক্ষেত্র। শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য বহু নরনারী পথের ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাস্যমুখী যুবতীরা চতুর্দোলা লক্ষ্য করিয়া লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতেছে।

তারপর আবার অসমতল শিলাবন্ধুর ভূমি, স্বল্পসেচনতুষ্ট জোয়ার-বাজরার শূলকণ্টকিত ক্ষেত্র। ঊর্ধ্বে চাহিলে দেখা যায়, দূরে দূরে তিনটি স্তম্ভাকার গিরিশৃঙ্গ—হেমকূট মতঙ্গ ও মালয়বন্ত আকাশে মাথা তুলিয়া যেন দূরাগত শত্রুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে।

দিবা দ্বিতীয় প্রহরের আরম্ভে মিছিল এক উত্তুঙ্গ সিংহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহাই শেষ তোরণ, তোরণের দুই পাশ হইতে উচ্চ পাষাণ-প্রাকার নির্গত হইয়া অন্তর্ভুক্ত ভূমিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। বিস্তীর্ণ নগরচক্রের ইহা কেন্দ্রস্থিত নাভি।

তোরণের প্রহরীরা পথ ছাড়িয়া দিল, মিছিল সপ্তম পুরীতে প্রবেশ করিল। সাত কৌটার মধ্যে এক কৌটা। ইহার ব্যাস চারি ক্রোশ ; ইহার মধ্যে চৌত্রিশটি প্রশস্ত রাজপথ আছে, তন্মধ্যে প্রধান রাজপথের নাম পান-সুপারি রাস্তা। নাম পান-সুপারি রাস্তা হইলেও সোনা-রূপা হীরা-জহরতের বাজার। এই মণিমাণিক্যের হাটের মাঝখানে রাজভবনের অসংখ্য হর্ম্যরাজি।

মিছিল সেইদিকে চলিল। গভীর শব্দে ডঙ্কা ও তূরী বাজিতেছে। পথে লোকারণ্য ; পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকাগুলির অলিন্দে বাতায়নে চাঁদের হাট ; দুই সুন্দরী রাজকন্যাদের দেখিয়া সকলে জয়ধ্বনি করিতেছে। মণিকঙ্কণা ও বিদ্যুন্মালা চতুর্দোলায় পাশাপাশি বসিয়া আছেন। মণিকঙ্কণা সাহসিনী মেয়ে, কিন্তু তাহার বুকও মাঝে মাঝে দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছে। বিদ্যুন্মালার আয়ত চক্ষু সম্মুখ দিকে প্রসারিত, কিন্তু তাঁহার মন আপন অতল গভীরতায় ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন—জীবন এত জটিল কেন ?

বেলা দ্বিপ্রহরে মধ্যদিনের সূর্যকে মাথায় লইয়া শোভাযাত্রা রাজভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

দুই

রাজপুরীর সাত শত প্রতিহারিণী ও পরিচারিকা সভাগৃহের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের বাম হস্তে চর্ম, দক্ষিণ হস্তে মুক্ত তরবারি। সকলেই দৃঢ়াঙ্গী যুবতী, সুদর্শনা। তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক তাতারী যুবতী আছে, পিঙ্গল কেশ ও নীল চক্ষু দেখিয়া চেনা যায়। রাজপুরীতে, সভাগৃহ ব্যতীত অন্যত্র, পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, এই নারীবাহিনী পুরী রক্ষণ করে ও পৌরজনের সেবা করে।

চতুর্দোলা রাজসভার স্তম্ভশোভিত দ্বারের সম্মুখে থামিয়াছিল। কুমার কম্পন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। বাদ্যোদ্যম তুমুল হইয়া উঠিল। তারপর সভাগৃহ হইতে মহারাজ দেবরায় বাহির হইয়া আসিলেন। তপ্তকাঞ্চন দেহ, মুখে সৌম্য প্রশান্ত গাম্ভীর্য ; পরিধানে পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় ; কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, বাহুতে অঙ্গদ। যৌবনের মধ্যাহ্নে মহারাজ দেবরায়ের দেহ যেন লাবণ্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে।

তিনি একটি হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিলেন, অমনি বাদ্যোদ্যম নীরব হইল। কুমার কম্পন বলিলেন—'মহারাজ, এই নিন, কলিঙ্গর দুই দেবীকে নদী থেকে উদ্ধার করে এনেছি।'

দুই রাজকন্যা চতুর্দোলা হইতে নামিয়া রাজার সম্মুখে যুক্তহস্তা হইলেন। রাজাকে দেখিয়া মণিকঙ্কণার সমস্ত ভয় দূর হইয়াছিল, সে হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে চাহিল ; বিদ্যুন্মালার মুখ দেখিয়া কিন্তু মনের কথা বোঝা গেল না। রাজা পূর্বে কলিঙ্গ-কন্যাদের দেখেন নাই, ভাটের মুখে বিবাহ স্থির হইয়াছিল। তিনি একে একে দুই কন্যাকে দেখিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নতা আরো গভীর হইল। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে করতল তুলিয়া তিনি বলিলেন—'স্বস্তি।'

রসরাজও নিজের দোলা হইতে নামিয়াছিলেন, এই সময় তিনি আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'জয়োস্তু মহারাজ। আমি কলিঙ্গের রাজবৈদ্য রসরাজ, কুমারীদের সঙ্গে এসেছি। কুমারীদের মাতুল অভিভাবকরূপে ওদের সঙ্গে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমিই আপনাকে কন্যাদের পরিচয় দিচ্ছি। ইনি কুমারী-ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা, ভাবী রাজবধূ ; আর ইনি রাজকুমারী মণিকঙ্কণা, ভাবী রাজবধূর সঙ্গিনীরূপে এসেছেন।'

রাজা বলিলেন—'ধন্য। মাতুল মহাশয়কে নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে। আপাতত—'

রাজা পাশের দিকে ঘাড় ফিরাইলেন। ইতিমধ্যে ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ রাজার পাশে একটু পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ; ইনি একাধারে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ও মহাসচিব। পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক দৃঢ়শরীর পুরুষ ; অত্যন্ত সাদাসিধা বেশবাস, মুখ দেখিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও পদমর্যাদার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

রাজা তাঁহাকে বলিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ, মান্য অতিথিদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করুন। এঁরা আমাদের কুটুম্ব, অতিথি-ভবনে নিয়ে গিয়ে এঁদের সমুচিত পানাহার বিশ্রামের আয়োজন করুন।'

'যথা আজ্ঞা আর্য।' লক্ষ্মণ মল্লপ করজোড়ে অতিথিদের সম্বোধন করিলেন—'আমার সঙ্গে আসতে আজ্ঞা হোক। অতিথি-ভবন নিকটেই, সেখানে আপনাদের স্নান পান আহার বিশ্রামের আয়োজন করে রেখেছি।'

লক্ষ্মণ মল্লপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে রসরাজ চোখে ভাল দেখেন না, তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া আগে লইয়া চলিলেন, অতিথিবর্গ তাঁহাদের পিছনে চলিল। রাজসভা হইতে শত হস্ত দূরে রাজকীয় টঙ্কশালের পাশে প্রকাণ্ড দ্বিভূমক অতিথি-ভবন। সেখানে পাঁচ শত অতিথি এককালে বাস করিতে পারে।

ইত্যবসরে রাজপুরী হইতে একটি শক্তসমর্থা দাসী স্বর্ণকলসে জল আনিয়া রাজকুমারীদের পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়াছিল। এই দাসী বিপুল রাজপরিবারের গৃহিণী, সাত শত প্রতিহারিণীর প্রধানা নায়িকা ; নাম পিঙ্গলা। রাজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'পিঙ্গলে, কলিঙ্গ-কুমারীদের জন্য নূতন প্রাসাদ প্রস্তুত হচ্ছে, এখনো বাসের উপযোগী হয়নি। তুমি আপাতত এঁদের রাজ-সভাগৃহের দ্বিতলে নিয়ে যাও, উপস্থিত সেখানেই এঁরা থাকবেন।'

পিঙ্গলা একটু হাসিয়া বলিল—'যথা আজ্ঞা আর্য।'

পিঙ্গলাকে নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ইতিপূর্বে রাজার আদেশে সে সভাগৃহের দ্বিতলে রাজকুমারীদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিল ; রাজা বোধ করি কুমারীদের শুনাইবার জন্য একথা বলিয়াছিলেন। রাজকীয় সভাগৃহটি দ্বিভূমক ; নিম্নতলে সভা বসে, দ্বিতীয় তলে তিনটি মহল। একটিতে মহারাজ দিবাকালে বিশ্রাম করেন, দ্বিতীয়টি রাজার পাকশালা, সেখানে দশটি পাচিকা রাজার জন্য রন্ধন করে, নপুংসক কঞ্চুকী পাকশালার দ্বারের পাশে বসিয়া পাহারা দেয়। তৃতীয় মহলটি এতদিন শূন্য পড়িয়া ছিল। এখন সাময়িকভাবে নবাগতাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।

রাজা পুনশ্চ বলিলেন—'এঁদের নিয়ে যাও, যথোচিত সেবা কর। দেখো যেন সেবার ত্রুটি না হয়।'

পিঙ্গলা বলিল—'ত্রুটি হবে না মহারাজ। আমি নিজে এঁদের সেবা করব।'

'ভাল।'

পিঙ্গলা রাজকুমারীদের স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া লইয়া গেল। মহারাজ ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া সস্নেহে তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রাখিলেন—'কম্পন, কাল থেকে তোমার অনেক পরিশ্রম হয়েছে। যাও, নিজ গৃহে বিশ্রাম কর গিয়ে।'

কম্পনদেব হ্রস্বকণ্ঠে বলিলেন—'আমার কিছু নিবেদন আছে আর্য।'

রাজা সপ্রশ্ন নেত্রে ভ্রাতার পানে চাহিলেন, তারপর বলিলেন—'এস।'

দুই ভ্রাতা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

বহু স্তম্ভযুক্ত রাজসভার আকৃতি নাট্যমণ্ডপের ন্যায় ; তিন ভাগে সভাসদ্‌গণের আসন, চতুর্থ ভাগে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মঞ্চের উপর সিংহাসন। পাথরে গঠিত হর্ম্য, কিন্তু পাথর দেখা যায় না ; কুড্য ও স্তম্ভের গাত্র সোনার তবকে মোড়া। মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণ-সিংহাসনটি আয়তনে বৃহৎ, তিন চারি জন মানুষ স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি বসিতে পারে। সিংহাসনের পাশে সোনার দীপদণ্ড, সোনার পর্ণসম্পুট, সোনার ভৃঙ্গার। চারিদিকে সোনার ছড়াছড়ি। সেকালে এত সোনা বোধ করি ভারতের অন্যত্র কোথাও ছিল না।

দ্বিপ্রহরে সভাগৃহ শূন্য, সভাসদেরা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিয়াছেন। রাজা দেবরায় আসিয়া সিংহাসনের উপর কিংখাবের আসনে বসিলেন ; তাঁহার ইঙ্গিতে কুমার কম্পন তাঁহার পাশে বসিলেন। দুইজনে পাশাপাশি বসিলে দেখা গেল তাঁহাদের আকৃতি প্রায় সমান ; দশ বছর বয়সের পার্থক্যে যতটুকু প্রভেদ থাকে ততটুকুই আছে। এই সাদৃশ্যের সুযোগ লইয়া মহারাজ দেবরায় একটু কৌতুক করিতেন ; বিদেশ হইতে কোনো নবাগত রাষ্ট্রদূত আসিলে তিনি নিজে সভায় না আসিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। রাষ্ট্রদূতেরা চোখে না দেখিলেও রাজার কীর্তিকলাপের কথা জানিতেন। তাঁহারা কুমার কম্পনকে রাজা মনে করিয়া সবিস্ময়ে ভাবিতেন—এত অল্প বয়সে রাজা এমন কীর্তিমান ! রাজা এই তুচ্ছ কাপট্যে আমোদ অনুভব করিতেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট হইতেছিল ; কুমার কম্পনের মনে সিংহাসনের প্রতি লোভ জন্মিয়াছিল।

উভয়ে উপবিষ্ট হইলে রাজা ভ্রূ তুলিয়া ভ্রাতাকে প্রশ্ন করিলেন। কুমার কম্পন তখন ধীরে ধীরে বিদ্যুন্মালা ও অর্জুনবর্মার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জুনবর্মা নদী হইতে বিদ্যুন্মালাকে উদ্ধার করিয়াছিল, দুইজনে নির্জন দ্বীপে রাত্রি কাটাইয়াছে, পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইয়াছে। কুমার কম্পন একটু শ্লেষ দিয়া একটু রঙ চড়াইয়া সব কথা বলিতে লাগিলেন ; শুনিতে শুনিতে রাজার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল।

বিবৃতির মাঝখানে লক্ষ্মণ মল্লপ এক সময় আসিয়া সিংহাসনের পাদমূলে পারসীক গালিচার উপর বসিলেন এবং কোনো কথা না বলিয়া নতমস্তকে কুমার কম্পনের কথা শুনিতে লাগিলেন। কুমার কম্পন তাঁহার আবির্ভাবে একটু ইতস্তত করিয়া আবার বলিয়া চলিলেন। লক্ষ্মণ মল্লপ ও কুমার কম্পনের মধ্যে ভালবাসা নাই, দু'জনেই দু'জনকে আড়-চক্ষে দেখেন। কিন্তু লক্ষ্মণ মল্লপ রাজ্যের মহাসচিব, তাঁহার কাছে রাজকীয় কোনো কথাই গোপনীয় নয়।

কুমার কম্পন বিবৃতি শেষ করিয়া বলিলেন—'মহারাজ, আমার বার্তা নিবেদন করলাম, এখন আপনার অভিরুচি।' তারপর লক্ষ্মণ মল্লপের দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'আমার বিবেচনায় এ কন্যা বিজয়নগরের রাজবধূ হবার যোগ্যা নয়।'

রাজা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'তুমি যাও, বিশ্রাম কর গিয়ে।'

কুমার কম্পন অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। নিজের মনোগত অভিপ্রায় না জানাইয়া

যতটা বলা যায় তাহা বলা হইয়াছে। আপাতত এই পর্যন্ত থাক।

রাজা ও মন্ত্রী পরস্পরের চোখে চোখ রাখিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপর রাজা বলিলেন—'আপনি বোধহয় কম্পনের কথা সবটা শোনেননি—'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'না শুনলেও অনুমান করতে পেরেছি।'

'আপনার কি মনে হয়?'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'ঘটনা সত্য বলেই মনে হয়, কিন্তু ইঙ্গিতটা অমূলক। আমি রাজকন্যাকে দেখেছি, আমার মনে কোনো সংশয় নেই।'

'কিন্তু—' রাজা থামিলেন।

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'অর্জুনবর্মা নিশ্চয় দলের সঙ্গে এসেছে। তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে।'

রাজা বলিলেন—'সেই ভাল। তাকে ডেকে পাঠান। আমি তাকে প্রশ্ন করব। আপনি তার মুখ লক্ষ্য করবেন।'

লক্ষ্মণ মল্লপ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, তারপর বাম হস্ত দিয়া দক্ষিণ করতলে তালি বাজাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের পাশের দিক হইতে একজন চোবদার রক্ষী আসিয়া সিংহাসনের সম্মুখে রূপার ভল্ল নামাইয়া নতজানু হইল।

মন্ত্রী বলিলেন—'রাজকন্যাদের সঙ্গে যারা এসেছে তাদের মধ্যে একজনের নাম অর্জুনবর্মা। অতিথিশালা থেকে তাকে এখানে নিয়ে এস।'

রক্ষী ভল্ল হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্ত্রী পুনশ্চ বলিলেন—'বেঁধে আনতে হবে না। সমাদর করে নিয়ে আসবে।'

রক্ষী বলিল—'যথা আজ্ঞা আর্য।'

রাজা বলিলেন—'আমি বিরাম-গৃহে যাচ্ছি, সেখানে তাকে পাঠিয়ে দিও।

রক্ষী বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

তিন

অতিথি-ভবনে বহুসংখ্যক পরিচারক নবাগতদের সেবার ভার লইয়াছিল। প্রথমে অতিথিরা শীতল তক্র পান করিয়া পথশ্রম দূর করিলেন; তারপর স্নান ও আহার। অতিথিরা অধিকাংশই আমিশাষী, বহুবিধ মৎস্য ও মাংসাদি সহযোগে জবারের রোটিকা ও ঘৃতপক্ব তণ্ডুল গ্রহণ করিলেন। রসরাজ নিরামিষ খাইলেন। তাঁহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, দধিমণ্ড ক্ষীর ফলমূল ও মিষ্টান্নের ভাগই অধিক।

প্রচুর আহার করিয়া সুবাসিত তাম্বূল চর্বণ করিতে করিতে সকলে অতিথি-ভবনের দ্বিতলে উপনীত হইলেন। দ্বিতলে সারি সারি অসংখ্য প্রকোষ্ঠ, প্রকোষ্ঠগুলিতে শুভ্র শয্যা বিস্তৃত। অতিথিগণ পরম আরামে সুকোমল শয্যায় লম্বমান হইলেন।

অর্জুনবর্মা একটি প্রকোষ্ঠে উপাধান মাথায় দিয়া শয়ন করিয়াছিল। উপাধান হইতে স্নিগ্ধ-শীতল উশীরের গন্ধ নাকে আসিতেছে। উদর তৃপ্তিদায়ক খাদ্যপানীয়ে পূর্ণ, মস্তিষ্কে নূতন কোনো চিন্তা নাই; অর্জুনবর্মা চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল। ক্রমে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

সহসা তন্দ্রার মধ্যে নিজের নাম শুনিয়া অর্জুনবর্মার ঘুমের নেশা ছুটিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, প্রকোষ্ঠের দ্বারমুখে এক ভল্লধারী পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। অর্জুনবর্মা ত্বরিতে

উঠিয়া বসিল।

রক্ষী দোপাট্টা দাড়ির মধ্যে হাসিয়া প্রশ্ন করিল—'মহাশয়ের নাম কি অর্জুনবর্মা ?'

অর্জুন বলিল—'হাঁ, কী প্রয়োজন ?'

রক্ষী বলিল—'শ্রীমন্মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন। আসতে আজ্ঞা হোক।'

অর্জুন বিস্মিত হইল ; মহারাজ তাহার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে কেন স্মরণ করিলেন ভাবিয়া পাইল না। সে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল—'চল।'

অতিথিশালা হইতে নামিয়া অর্জুন রক্ষীর সঙ্গে রাজসভার দিকে চলিল। আকাশে এখন সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়াছে ; কিন্তু এখনো বাতাস উত্তপ্ত, পৌরজন গৃহচ্ছায়া ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। জনশূন্য পুরভূমি দিয়া যাইতে যাইতে রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল—'রাজাকে কিভাবে অভিবাদন করিতে হয় আপনি জানেন তো ?'

অর্জুন দাঁড়াইয়া পড়িল। সে কখনো রাজদরবারে যায় নাই, মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, জানি না।'

রক্ষী বলিল—'চিন্তা নেই, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।'

সে মাটিতে ভল্ল রাখিয়া রাজ-বন্দনার প্রক্রিয়া দেখাইল। দুই হাত জোড় করিয়া মাথার উর্ধ্বে তুলিল, কটি হইতে উধর্বাঙ্গ সম্মুখে অবনত করিল, তারপর খাড়া হইয়া হাত নামাইল। বলিল—'রাজাকে এইভাবে অভিবাদন করতে হয়। পারবেন ?'

অর্জুন অনুরূপ প্রক্রিয়া করিয়া দেখাইল। নূতনত্ব থাকিলেও এমন কিছু শক্ত নয়। রক্ষী তুষ্ট হইয়া বলিল—'ওতেই হবে।'

সভাগৃহের দ্বিতলে উঠিবার সোপান-মুখে শস্ত্র-হস্তা দুইটি তরুণী প্রহরিণী দাঁড়াইয়া আছে। পুরুষ প্রহরীর অধিকার শেষ হইয়া এখান হইতে স্ত্রী-প্রহরীর এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। প্রহরিণীদ্বয় অর্জুনবর্মাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল, রক্ষীকে প্রশ্ন করিল, তারপর পথ ছাড়িয়া দিল। রক্ষী নীচেই রহিল, অর্জুনবর্মা সঙ্কীর্ণ সোপান দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সোপান মধ্যপথে মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে, মোড়ের কোণে অন্য একজন প্রহরিণী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে অতিক্রম করিয়া অর্জুনবর্মা দ্বিতলে উঠিল। এখানে আরো দুইজন প্রহরিণী। তাহারা জানিত, অর্জুনবর্মা নামক এক ব্যক্তিকে রাজা আহ্বান করিয়াছেন ; তাহাদের মধ্যে একজন অর্জুনকে রাজ-সমীপে উপনীত করিল।

রাজকক্ষটি আকারে যেমন বৃহৎ, উচ্চ দিকে তেমনি গোলাকৃতি ছাদযুক্ত ; মুসলমান স্থাপত্যের প্রভাবে ভবনশীর্ষে গম্বুজ রচনার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। দেয়ালগুলি পুরু রেশমের কানাৎ দিয়া আবৃত ; তাহার ফলে কক্ষটি দ্বিপ্রহরেও ঈষৎ ছায়াচ্ছন্ন ও নিরুত্তাপ হইয়া আছে। কক্ষের মধ্যস্থলে মণিমুক্তাজড়িত মর্মর-পালঙ্কে মহারাজ দেবরায় অর্ধশয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার মাথার দিকে মসৃণ শিলাকুট্টিমের উপর বসিয়া মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপ কোনো দুরূহ চিন্তায় মগ্ন আছেন। পায়ের কাছে মেঝেয় বসিয়া পিঙ্গলা পান সাজিতেছে এবং মৃদুকণ্ঠে রাজাকে নবাগতা কলিঙ্গ-কুমারীদের কথা শুনাইতেছে।...রাজকুমারীরা স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন...কন্যা দু'টি যেমন সুন্দরী তেমনি শীলবতী...প্রথমটি একটু গম্ভীর প্রকৃতির, দ্বিতীয়টি সরলা হাস্যময়ী...

পিঙ্গলা সোনার তাম্বূলকরঙ্ক দুই হাতে রাজার সম্মুখে ধরিল। রাজা একটি পান তুলিয়া মুখে দিলেন, বলিলেন—'তুমি পান নাও, আর্য লক্ষ্মণকেও দাও।'

রাজার সম্মুখে তাম্বূল চর্বণ পুরুষের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, তবে অনুমতি দিলে খাওয়া চলিত। স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনো নিষেধ ছিল না, এমন কি নর্তকীরাও রাজার সম্মুখে পান খাইত।

লক্ষ্মণ মল্লপ পানের বাটা লইয়া নিজের সম্মুখে রাখিলেন, তারপর শঙ্কুলা লইয়া নিপুণ হস্তে সুপারি কাটিতে লাগিলেন। পিঙ্গলা বাটা হইতে একটি পান লইয়া মুখে পুরিল।

এই সময় অর্জুনবর্মা দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং শিক্ষানুযায়ী যুগ্মবাহু তুলিয়া রাজাকে বন্দনা করিল। রাজা তাহাকে কক্ষের মধ্যে আহ্বান করিলেন, সে আসিয়া পালঙ্কের সমীপে ভূমির উপর পা মুড়িয়া বসিল। তাহার মেরুদণ্ড ঋজু হইয়া রহিল, দেহভঙ্গিতে দীনতা নাই, আবার ঔদ্ধত্যও নাই।

রাজা পিঙ্গলাকে ইঙ্গিত করিলেন, সে পাশের একটি কানাৎ-ঢাকা দ্বার দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। কক্ষে রহিলেন রাজা, লক্ষ্মণ মল্লপ এবং অর্জুনবর্মা।

লক্ষ্মণ মল্লপ শঙ্কুলায় কুচকুচ শব্দ করিয়া সুপারি কাটিতেছেন, যেন অন্য কিছুতেই তাঁহার মন নাই। রাজা নিবিষ্ট চক্ষে অর্জুনকে দেখিলেন, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—'তোমার নাম অর্জুনবর্মা ?'

অর্জুন ইতিপূর্বে দূর হইতে মহারাজ দেবরায়কে একবার দেখিয়াছিল, এখন মুখোমুখি বসিয়া সে তাঁহার পরিপূর্ণ অনুভাব উপলব্ধি করিল। রাজা দেখিতে শান্তশিষ্ট, কিন্তু তাঁহার একটি বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্ব আছে যাহার সম্মুখীন হইলে অভিভূত হইতে হয়। অর্জুন যুক্তকরে বলিল—'আজ্ঞা, মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'তুমি ক্ষত্রিয়। রাজকন্যাদের নৌকায় যোদ্ধা রূপে এসেছ ?'

অর্জুন বলিল—'আমি রাজকন্যাদের সঙ্গে কলিঙ্গ থেকে আসিনি মহারাজ।'

রাজা ঈষৎ বিস্ময়ে বলিলেন—'সে কি রকম ?'

অর্জুন তখন গুলবর্গা ত্যাগের বিবরণ বলিল। রাজা শুনিলেন ; লক্ষ্মণ মল্লপ শঙ্কুলা থামাইয়া অর্জুনের মুখের উপর সন্ধানী চক্ষু স্থাপন করিলেন। বিবৃতি শেষ হইলে রাজা বলিলেন—'চমকপ্রদ কাহিনী ! তোমার পিতার নাম কি ?'

অর্জুনবর্মা বলিল—'আমার পিতার নাম রামবর্মা।'

রাজা একবার মন্ত্রীর দিকে অলসভাবে চক্ষু ফিরাইলেন, লক্ষ্মণ মল্লপের শঙ্কুলা আবার সচল হইল।

রাজা বলিলেন—'ভাল।—সংবাদ পেয়েছি কাল ঝড়ের সময় তুমি রাজকন্যাকে নদী থেকে উদ্ধার করেছিলে। তুমি উত্তম সন্তরক, কিভাবে রাজকুমারীকে উদ্ধার করলে আমাকে শোনাও।'

রাজার এই জিজ্ঞাসার মধ্যে অর্জুন কোনো কূট উদ্দেশ্য দেখিতে পাইল না, সে সরলভাবে রাজকন্যা উদ্ধারের বৃত্তান্ত বলিল। তাহার মনে পাপ ছিল না, তাই কোনো কথা গোপন করিল না ; নিজের কৃতিত্ব যথাসম্ভব লঘু করিয়া বলিল। রাজা ও মন্ত্রী তাহার মুখের উপর নিশ্চল চক্ষু স্থাপন করিয়া শুনিলেন।

বৃত্তান্ত শেষ হইলে রাজা কিছুক্ষণ প্রীতমুখে নিজ কর্ণের মণিকুণ্ডল লইয়া নাড়াচাড়া করিলেন, তারপর বলিলেন—'তোমার কাহিনী শুনে পরিতুষ্ট হয়েছি। তোমার সৎসাহস আছে, বিপদের সম্মুখীন হয়ে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয় না। তুমি বিজয়নগরে বাস করতে চাও, ভাল কথা। কোন্ কাজ করতে চাও ?'

অর্জুন জোড়হস্তে বলিল—'মহারাজ, আমি ক্ষত্রিয়, আমাকে আপনার বিপুল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নিন।'

রাজা বলিলেন—'সৈন্যদলে যোগ দিতে চাও ? ভাল ভাল।—কিন্তু বর্তমানে তুমি কলিঙ্গ-সমাগত অতিথিদের অন্যতম। আপাতত বিজয়নগরের রাজ-আতিথ্যে থেকে

আহার-বিহার কর। তারপর তোমার ব্যবস্থা হবে। এই স্বর্ণমুদ্রা নাও। তুমি রাজকুমারীর প্রাণরক্ষা করেছ, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি।'

রাজার পালঙ্কের উপর উপাধানের পাশে এক মুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা রাখা ছিল ; ছোট বড় অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা। রাজা একটি বড় মুদ্রা লইয়া অর্জুনকে দিলেন, অর্জুন কপোতহস্তে গ্রহণ করিল।

রাজা বলিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ, অর্জুনবর্মাকে পান দিন।'

লক্ষ্মণ মল্লপ বাটা হইতে অর্জুনকে পান দিলেন। অর্জুন জানে না যে পান দেওয়ার অর্থ বিদায় দেওয়া, সে পান মুখে দিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল ; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজসকাশ হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত হইবে কিনা ভাবিতে লাগিল। লক্ষ্মণ মল্লপ তাহা বুঝিয়া হাতে তালি বাজাইলেন। প্রহরিণী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মন্ত্রী বলিলেন—'অর্জুনবর্মাকে পথ দেখাও।'

অর্জুন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, পূর্বের ন্যায় উদ্বাহু প্রণাম করিয়া প্রহরিণীর সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল।

রাজা ও মন্ত্রী কিছুক্ষণ আত্মস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন ; কেবল মন্ত্রীর হাতের যন্ত্রিকা কুচকুচ শব্দ করিয়া চলিল।

অবশেষে রাজা লক্ষ্মণ মল্লপের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। লক্ষ্মণ মল্লপ মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'কুমার কম্পন তিলকে তাল করেছেন। অর্জুনবর্মার মন নিষ্পাপ, সুতরাং রাজকন্যাও নিষ্পাপ।'

রাজা কহিলেন—'আপনি যথার্থ বলেছেন, আমারও তাই মনে হয়। কম্পন ছেলেমানুষ, রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছে। কিন্তু তবু—বিবাহোন্মুখী কন্যাকে পরপুরুষ স্পর্শ করেছে, এ বিষয়ে শাস্ত্রের বিধান যদি কিছু থাকে—'

মন্ত্রী বলিলেন—'উত্তম কথা। গুরুদেবের উপদেশ নেওয়া যাক।'

অতএব রাজগুরু আর্য কূর্মদেবকে রাজার প্রণাম পাঠানো হইল। কূর্মদেব একটি তৃণাসন হস্তে উপস্থিত হইলেন। শীর্ণকায় পলিতশীর্ষ ব্রাহ্মণ, রাজা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ হইলেন। কূর্মদেব স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া শিলাকুট্টিমের উপর তৃণাসন পাতিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজাও ভূমিতে বসিলেন।

সমস্যার কথা শুনিয়া কূর্মদেব কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া মৌনভাবে রহিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি হইলেও তিনি শাস্ত্রকে শস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করেন না, লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন না। তিনি চক্ষু খুলিয়া বলিলেন—'দোষ হয়েছে, কিন্তু গুরুতর নয়। বিবাহোন্মুখী কন্যাকে সাধু উদ্দেশ্যে পরপুরুষ স্পর্শ করলে তাদৃশ দোষ হয় না। তবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বিবাহ তিন ঋতুকাল বন্ধ থাকবে। এই তিন মাস কন্যা প্রত্যহ প্রাতে অবগাহন স্নান করে পম্পাপতির মন্দিরে স্বহস্তে পূজা দেবেন। তাহলেই তাঁর পাপ-মুক্তি হবে। তখন বিবাহ হতে পারবে। শ্রাবণ মাসে আমি বিবাহের তিথি নক্ষত্র দেখে রাখব।'

গুরুর ব্যবস্থা রাজার মনঃপূত হইল। বিবাহ তিন মাস পরে হইলে ক্ষতি কি? বরং এই অবকাশে ভাবী বধূর সহিত মানসিক পরিচয়ের সুযোগ হইবে। ইতিমধ্যে কন্যার পিতা গজপতি ভানুদেবকে সংবাদটা জানাইয়া দিলেই চলিবে।

রাজা বলিলেন—'যথা আজ্ঞা গুরুদেব।'

দুই দণ্ড পরে গুরুদেব বিদায় লইলেন। তখন রাজা ও মন্ত্রী নিভৃতে মন্ত্রণা করিতে বসিলেন।

চার

অর্জুনবর্মা সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া অতিথি-ভবনে ফিরিয়া আসিল। রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ ; সে নিজ কক্ষে ফিরিয়া আবার শয্যায় শয়ন করিল। রাজদত্ত পানটি মুখে মিলাইয়া গিয়াছে, কেবল একটি অপূর্ব স্বাদ মুখে রাখিয়া গিয়াছে। মন নিরুদ্বেগ, রাজা তাহাকে সৈন্যদলে গ্রহণ করিবেন ; বিদেশে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা থাকিবে না। শুইয়া শুইয়া অর্জুনের দেহমন মধুর জড়িমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

দুই দণ্ড পরে তন্দ্রা-জড়িমা কাটিলে সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া আলস্য ত্যাগ করিল। দেখিল, পরিচারক কখন তাহার শয্যাপাশে এক প্রস্থ নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় রাখিয়া গিয়াছে। এদিকে দিনের তাপও অনেকটা কমিয়াছে, অপরাহ্ণ সমাগত। অর্জুন নববস্ত্র পরিধান করিয়া, রাজার উপহার স্বর্ণমুদ্রাটি উত্তরীয়প্রান্তে বাঁধিয়া উত্তরীয় স্কন্ধে নগর পরিভ্রমণে বাহির হইল।

রাজ-পুরভূমির উত্তর অংশে রাজকীয় টঙ্কশালার পাশ দিয়া পান-সুপারি রাস্তা আরম্ভ হইয়া সিধা পূর্বদিকে গিয়াছে ; এই পথ প্রস্থে চল্লিশ হস্ত, দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ শত হস্ত। ইহাই বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথ। পান-সুপারি রাস্তা নাম হইলেও পান-সুপারির দোকান এখানে অল্পই আছে। এই রাস্তার দুই পাশ জুড়িয়া আছে সোনা-রূপা হীরা-জহরতের দোকান। প্রধান রাজপুরুষদের অট্টালিকা, নগরবিলাসিনীদের রঙ্গ-ভবন। ছোটখাটোর মধ্যে আছে মিঠাই অঙ্গদি, ফুলের দোকান, শরবতের দোকান।

সায়ংকালে পান-সুপারি রাস্তায় উচ্চকোটির নাগরিক নাগরিকার সমাগম হইয়াছে। যানবাহন বেশি নাই, পদচারীই অধিক। সকলের পরিধানে বিচিত্র সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার। তাহাদের ত্বরা নাই, সকলে মন্থর চরণে চলিয়াছে। কেহ পানের দোকানে পান কিনিয়া খাইতেছে, কেহ পানশালায় শীতল শরবত পান করিতেছে ; মেয়েরা ফুল কিনিয়া কণ্ঠে কবরীতে পরিতেছে। বিলাসিনীদের গৃহের সম্মুখে যুবকদের যাতায়াত একটু বেশি। বিলাসিনীরা গৃহসম্মুখে উচ্চ চত্বরের উপর কাষ্ঠাসনে বসিয়াছে, তাহাদের দেহের উচ্ছলিত যৌবন সূক্ষ্ম অচ্ছাভ মল্লবস্ত্রে ঈষদাবৃত। কাহারো কবরীতে দাসী চাঁপা ফুলের মালা জড়াইয়া দিতেছে ; কেহ তাম্বূলরাগে অধর রঞ্জিত করিয়া পরিচারিকাদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করিতেছে। তাহাদের বিদ্যুৎবিলাসের ন্যায় হাস্যকটাক্ষ মুগ্ধ পথিকজনের চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে।

অর্জুনবর্মা অলসপদে চলিয়াছিল। চলিতে চলিতে সে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিল। বিজয়নগরের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মানুষ বড় কেহ নাই, সকলেরই গায়ের রঙ অরুণাভ গৌর হইতে কচি কলাপাতার মত কোমল হরিৎ পাণ্ডু, মেয়েরা সুগঠনা ও লাবণ্যবতী। এদেশের স্ত্রীপুরুষ কেহই পাদুকা পরিধান করে না ; এমন কি রাজা যতক্ষণ রাজপুরীর মধ্যে থাকেন তিনিও পাদুকা ধারণ করেন না। গুলবর্গায় মুসলমানেরা চামড়ার শুঁড়-তোলা নাগরা পরে ; দেখাদেখি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরাও নাগরা পরে। এদেশে কেবল তুরাণী তীরন্দাজেরা স্থূল বৃষচর্মের ফৌজী জুতা পরে। এখানে মাথায় টুপি বা পাগড়ি পরার রেওয়াজ নাই, তুরাণীরা ছাড়া সকলেই নগ্নশির। এখানে নারীদের পর্দা বা অবগুণ্ঠন নাই ; তাহারা সহজ স্বচ্ছন্দতার সহিত পথে বাহির হয়, তাহাদের চোখের দৃষ্টি নম্র অথচ নিঃসঙ্কোচ ; তাহারা পরপুরুষ দেখিয়া ভয় পায় না। অর্জুনের বড় ভাল লাগিল।

ফুলের মিশ্র সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অর্জুন এক ফুলের দোকানে উপস্থিত হইল। মালিনী একটি গৃহের সম্মুখভাগে প্রশস্ত বাতায়নের ন্যায় স্থানে বসিয়া ফুল বিক্রয় করিতেছে। গ্রীষ্মকালে রকমারি ফুলের অভাব। বিজয়নগর গোলাপ ফুলের জন্য বিখ্যাত ; সেই গোলাপ ফুলের মরশুম

শেষ হইয়াছে ; তবু দুই-চারিটা রক্তবর্ণ গোলাপ দোকানে আছে। স্তূপীকৃত সোনার বরণ চাঁপা ফুল আছে ; আর আছে জাতী যূথী কাঞ্চন অশোক। বাতায়নের তোরণ হইতে সারি সারি নবমল্লিকার মালা ঝুলিতেছে। মালিনী বসিয়া মাল্যরচনা করিতেছিল, অর্জুন বাতায়নের সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই মালিনী চোখ তুলিয়া চাহিল। অর্জুন বলিল—'মালা চাই।'

মালিনী একটু প্রগল্‌ভা, মুচকি হাসিয়া বলিল—'কার জন্যে মালা চাই ? নিজের জন্যে, না নাগরীর জন্যে।'

অর্জুনও হাসিল। বলিল—'আমি বিদেশী, নাগরী কোথায় পাব ! নিজের জন্যে মালা।'

মালিনী ঘাড় কাৎ করিয়া অর্জুনকে দেখিল—'বিজয়নগরে নাগরীর অভাব নেই। তোমার কোমরে টঙ্কা আছে তো ?'

উত্তরীয়ের খুঁট হইতে সোনার টঙ্কা খুলিয়া অর্জুন দেখাইল—'এই আছে।'

দেখিয়া মালিনীর চক্ষু একটু বিস্ফারিত হইল, সে বলিল—'তবে আর তোমার ভাবনা কি, ও দিয়ে সব কিনতে পার। কি চাই বল।'

অর্জুন বলিল—'আপাতত একটা মালা হলেই চলবে।'

মালিনী তখন দোদুল্যমান মাল্যশ্রেণী হইতে একটি মালা লইয়া অর্জুনকে দেখাইল। যূথী ও অশোক ফুলে গ্রথিত মালা ; মালিনী বলিল—'এটা হলে চলবে ? এর মূল্য তিন দ্রম্ম। এর চেয়ে ভাল মালা আমার দোকানে নেই।'

অর্জুন বলিল—'ওতেই হবে।'

মালিনী দীর্ঘ মালাটির দুই প্রান্ত হাতে ধরিয়া বলিল—'এস, গলায় পরিয়ে দিই।'

অর্জুন মালিনীর কাছে গিয়া গলা বাড়াইয়া দাঁড়াইল, মালিনী মালা গোল করিয়া তাহার গ্রীবার পিছনে বাঁধিয়া দিল। তারপর পিছনে সরিয়া গিয়া অর্জুনকে পরিদর্শনপূর্বক বলিল—'বেশ দেখাচ্ছে।'

অপরিচিতা যুবতীর সহিত এরূপ লঘু হাস্যালাপ অর্জুনের জীবনে এই প্রথম। সে হাসিমুখে মালিনীকে স্বর্ণমুদ্রা দিল। মালিনী তাহার আসনের তলদেশ হইতে এক মুঠি রূপা ও তামার মুদ্রা লইয়া হিসাব করিয়া অর্জুনকে ফেরত দিল, বলিল—'গুনে নাও।'

অর্জুন মাথা নাড়িল। এ দেশের মুদ্রামান সম্বন্ধে তাহার কোনোই ধারণা নাই। সে ক্ষুদ্র মুদ্রাগুলি চাদরের খুঁটে বাঁধিল। মালিনী মিষ্ট হাসিয়া বলিল—'আবার এস।'

অর্জুন পিছু ফিরিতেই একটি লোকের সঙ্গে তাহার মুখোমুখি হইয়া গেল। শীর্ণ আকৃতি, বৈশিষ্ট্যহীন মুখ ; বোধহয় ফুল কিনিতে আসিয়াছে। অর্জুন তাহাকে পাশ কাটাইয়া রাস্তায় উপনীত হইল এবং পূর্বমুখে চলিতে লাগিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অর্জুন দেখিল, রাস্তার ধারে একদল লোক জমা হইয়াছে, তাহাদের মাঝখানে কিরাতবেশী একজন লোক। কিরাতের মাথায় কড়ির টুপি, বাঁ হাতের মণিবন্ধে একটি উগ্রমূর্তি বাজপাখি বসিয়া আছে, ডান হাতে খাঁচার মধ্যে একটি ধূম্রবর্ণ পারাবত। লোকটি সুর করিয়া বলিতেছে—'আমার বাজপাখি আমার পায়রাকে খুব ভালবাসে, পায়রা বাজপাখির বৌ। কিন্তু বৌ-এর স্বভাব ভাল নয়, সে মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। বাজপাখি তখন বৌকে খুঁজতে বেরোয়। দেখবে ? দ্যাখো দ্যাখো, মজার খেলা দ্যাখো।'

ইতিমধ্যে আরো দু'চারজন দর্শক আসিয়া জুটিয়াছিল। কিরাত খাঁচা খুলিয়া পারাবতকে উড়াইয়া দিল, পারাবত ফট্‌ফট্‌ শব্দে আকাশে উঠিয়া পশ্চিমদিকে উড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন কিরাত বাজপাখির পায়ের শিকল খুলিয়া তাহাকেও ছাড়িয়া দিল। বাজপাখি আতসবাজির ন্যায় সিধা শূন্যে উঠিয়া গেল, রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া দূরে পলায়মান পারাবতকে দেখিল, তারপর ঝটিকার

বেগে তাহার অনুসরণ করিল।

দর্শকেরা ঘাড় তুলিয়া এই আকাশ-যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। পারাবত পলাইতেছে, কিন্তু বাজপাখির গতিবেগ তাহার চতুর্গুণ ; অচিরাৎ বাজপাখি পারাবতের নিকট উপস্থিত হইল। পারাবত আঁকিয়া বাঁকিয়া নানাভাবে উড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। বাজপাখি তাহার উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে দুই পা বাড়াইয়া তাহাকে নখে চাপিয়া ধরিল, তারপর অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে নির্জীব পারাবতকে কিরাতের কাছে ফিরাইয়া আনিল। কিরাত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—'দেখলে ? দেখলে ? আমার বাজপাখি নষ্ট-দুষ্ট বৌকে কত ভালবাসে ! দ্যাখো, বৌ-এর গায়ে নখের আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।'

সকলে হাসিয়া উঠিল। অর্জুন খেলা দেখিয়া প্রীত হইয়াছিল, সে কিরাতের সামনে একটি তাম্রমুদ্রা ফেলিয়া দিয়া পিছন ফিরিল।

এই সময় সেই শীর্ণ লোকটার সঙ্গে তাহার আবার মুখোমুখি হইয়া গেল। লোকটা অলক্ষিতে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্জুন মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। ফুলের দোকানে তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল, আবার এখানে দেখা। লোকটা কি তাহার মতই নিরুদ্দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অর্জুন আবার পূর্বদিকে চলিল। তাহার ইচ্ছা কিল্লাঘাটে গিয়া দেখিয়া আসে বলরাম কর্মকার ভাঙ্গা বহিত্র লইয়া কী করিতেছে। কিন্তু এদিকে দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, কিল্লাঘাটে পৌঁছিতেই রাত্রি হইয়া যাইবে। তখন আর ফিরিবার উপায় থাকিবে না। আহা, যদি লাঠি দু'টি থাকিত। যা হোক, কাল প্রভাতেই সে বলরামকে দেখিতে যাইবে।

ক্রমে অর্জুন পান-সুপারি রাস্তার পূর্ব সীমানায় আসিয়া পৌঁছিল। এখান হইতে সাধারণ লোকালয়ের আরম্ভ ; গৃহগুলি উত্তম বটে, কিন্তু পান-সুপারি রাস্তার মত নয়, পথও অপেক্ষাকৃত অপ্রসর। দক্ষিণদিক হইতে অন্য একটি পথ আসিয়া এইখানে তেমাথা রচনা করিয়াছে। তারপর কিল্লাঘাটের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

অর্জুন এই পথে কিছুদূর অগ্রসর হইল। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনীভূত হইতেছে, সে আর বেশি দূর না গিয়া সেখান হইতেই ফিরিল। অন্ধকার হইবার পূর্বেই অতিথি-ভবনে ফিরিতে হইবে।

এইখানে তৃতীয় বার সেই শীর্ণ লোকটির সঙ্গে তাহার দেখা হইল। লোকটি অর্জুনের পশ্চাতে কিয়দ্দূরে আসিতেছিল, অর্জুন ফিরিতেই সেও ফিরিয়া আগে আগে চলিতে আরম্ভ করিল। অর্জুন আশ্চর্য হইয়া ভাবিল, কী ব্যাপার ! এই লোকটিকেই বার বার দেখিতেছি কেন ! তবে কি লোকটি আমারই পিছনে লাগিয়াছে ? কিন্তু কেন ?

তেমাথার কাছাকাছি ফিরিয়া আসিয়া অর্জুন দেখিল, ইতিমধ্যে সেখানে প্রকাণ্ড একটা হাতিকে ঘিরিয়া ভিড় জমিয়াছে ; হাতির কাঁধে মাহুত বসিয়া আছে। লোকটি ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। অর্জুনও জনতার কিনারায় উপস্থিত হইয়াছে এমন সময় ভিতর হইতে চড়চড় শব্দে কাড়া বাজিয়া উঠিল। তারপর পরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'বিজয়নগরে শত্রুর গুপ্তচর ধরা পড়েছে—রাজাদেশে তার প্রাণদণ্ড হবে—বিজয়নগরে শত্রুর গুপ্তচরের কী দুর্দশা হয় তোমরা প্রত্যক্ষ কর।'

অর্জুন গলা বাড়াইয়া দেখিল। চক্রব্যূহের মাঝখানে হাত-পা বাঁধা একটা মানুষ চিৎ হইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। বাদ্যকর ঘোষক হাতির মাহুতকে ইশারা করিল, মাহুত হাতি চালাইল। হাতি আসিয়া ভূপতিত লোকটার বুকে পা চাপাইয়া দিল।

অর্জুন আর সেখানে দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিল। এরূপ দৃশ্য গুলবর্গায় সে অনেক দেখিয়াছে। বিজয়নগর ও বহমানী রাজ্যের মধ্যে বর্তমানে শান্তি চলিতেছে বটে, কিন্তু

উভয় পক্ষই শত্রু সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে তৎপর। গুপ্তচর যখন ধরা পড়ে তখন এই বিকট শাস্তিই তাহার প্রাপ্য।

রাজপুরীর কাছাকাছি আসিয়া অর্জুন একটু পিপাসা অনুভব করিল। পাশেই একটি পানশালা। সে সত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পালিকাকে বলিল—'শীতল তাক্ দাও, ক্ষার তক্র।'

সত্রপালিকাটি যুবতী। এখানে পানের দোকানে, ফুলের দোকানে, পানশালা ইত্যাদি ছোট ছোট দোকানে যুবতীরাই বেসাতি করে। এই যুবতীটি অর্জুনকে একটু ভাল করিয়া দেখিল, তারপর মৃৎপাত্রে লবণাক্ত কপিত্থ-সুরভিত তক্র পান করিতে দিল।

তক্র পান করিয়া অর্জুনের শরীর ও মন দুই-ই স্নিগ্ধ হইল। সে নিঃশেষিত মৃৎপাত্র ফেলিয়া দিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল—'মূল্য কত?'

যুবতী অর্জুনকে লক্ষ্য করিতেছিল। বোধহয় তাহার বেশবাসে কিছু বিশেষত্ব দেখিয়া থাকিবে। সে বলিল—'তুমি বিদেশী, আজ কি তুমি কলিঙ্গ-রাজকন্যাদের সঙ্গে এসেছ?'

অর্জুন বলিল—'হ্যাঁ।'

যুবতী মাথা নাড়িয়া বলিল—'তাহলে দাম নেব না। তুমি আজ আমাদের অতিথি।'

অর্জুন কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর স্মিতমুখে 'ধন্য' বলিয়া বাহির হইল।

আকাশে রাত্রির পক্ষচ্ছায়া পড়িয়াছে। পথের দুই পাশে ভবনগুলিতে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। চলিতে চলিতে অর্জুন চক্ষু তুলিয়া দেখিল, দূরে পশ্চিমদিকে হেমকূট পর্বতের মাথায় অগ্নিস্তম্ভ জ্বলিয়া উঠিল।

আরো কিছুদূর গিয়া সে সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল; তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এমন অনুভূতি সে পূর্বে কখনো পায় নাই। তাহার মনে হইল, এতদিনে সে নিজের দেশ খুঁজিয়া পাইয়াছে। এই বিজয়নগরই তাহার স্বদেশ, তাহার স্বর্গাদপি গরিয়সী মাতৃভূমি। অগ্নিশীর্ষ হেমকূটের পানে চাহিয়া তাহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

অর্জুন জানিত না যে, মাতৃভূমি বলিয়া কোনো বিশেষ ভূখণ্ড নাই। মানুষের সহজাত সংস্কৃতির কেন্দ্র যেখানে, মাতৃভূমিও সেইখানে।

পাঁচ

রাজপুরীতে বেলাশেষের প্রহর বাজিলে মহারাজ দেবরায় আপরাহ্ণিক সভা ভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সভায় পাত্র অমাত্য সভাসদ্ ছাড়াও ইরাণ দেশের রাজদূত আবদর রজ্জাক ছিলেন। আরো কয়েকটি রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কাজের কথা কিছু হইতেছিল না। রাজসভায় কেবল রাজনীতির আলোচনাই হয় না, হাস্য-পরিহাস গল্প-গুজবও হয়। সকলে রাজাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন।

দ্বিতলের বিরাম মন্দিরে গিয়া রাজা প্রথমে কেতকী-সুরভিত জলে স্নান করিলেন। তারপর আহারে বসিলেন। কিঙ্করীরা কক্ষে অসংখ্য ঘৃত-দীপ ও অগুরুবর্তি জ্বালিয়া দিল। দুই-হস্ত পরিমাণ চতুষ্কোণ একটি কাষ্ঠ-পীঠিকা তিনজন কিঙ্করী ধরাধরি করিয়া মহারাজের পালঙ্কের পাশে রাখিল। অনুচ্চ পীঠিকার উপর বৃহৎ সুবর্ণ থালি, থালির উপর অগণিত সোনার পাত্রে বিবিধ প্রকার অন্নব্যঞ্জন। মহারাজ আচমন করিয়া আহারে মন দিলেন। পিঙ্গলা ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কঞ্চুকী হেমবেত্র হস্তে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া পরিদর্শন করিতে

লাগিল।

আহার করিতে করিতে দেবরায় পিঙ্গলার দিকে চক্ষু তুলিলেন—'কলিঙ্গ-কুমারীদের খাওয়া হয়েছে ?'

পিঙ্গলা বীজন করিতে করিতে বলিল—'না, আর্য। তারা অন্য রানীদের মত মহারাজের আহার শেষ হলে আহারে বসবেন।'

মহারাজ আর কিছু বলিলেন না।

আহারান্তে একটি দাসী জলের ভৃঙ্গার হইতে মহারাজের হাতে জল ঢালিয়া দিল, মহারাজ হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলেন।

অতঃপর কঞ্চুকী ও দাসী কিঙ্করীরা রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। কেবল পিঙ্গলা রহিল।

পিঙ্গলার হাত হইতে পান লইয়া দেবরায় শয্যায় অর্ধশয়ান হইলেন, বলিলেন—'পিঙ্গলে, তুমি দেবীদের সংবাদ পাঠিয়ে দাও যে, আমার নৈশাহার শেষ হয়েছে—'

'আজ্ঞা মহারাজ।'

'আর দেবী পদ্মালয়াকে জানিয়ে দিও যে, আজ রাত্রে আমি তাঁর অতিথি হব।'

পিঙ্গলা অস্ফুট কণ্ঠে স্বীকৃতি জানাইল, তারপর মহারাজকে পদস্পর্শ প্রণাম করিয়া রাত্রির মত বিদায় লইল।

রাজা কবে কোন্ রানীর মহলে রাত্রিবাস করিবেন তাহা অতিশয় গোপনীয় কথা, পূর্বাহ্ণে কেহ জানিতে পারে না। শেষ মুহূর্তে রাজা অন্তরঙ্গকে জানাইয়া দিতেন। রাজাদের জীবন সর্বদাই বিপদসঙ্কুল, বিশেষত রাত্রিকালে গুপ্তঘাতকের আশঙ্কা অধিক, তাই রাজা কোথায় রাত্রি যাপন করিবেন তাহা যথাসম্ভব গোপন রাখিতে হয়।

রাজার মহল হইতে বাহির হইয়া পিঙ্গলা পাকশালা অতিক্রমপূর্বক কলিঙ্গ-কুমারীদের মহলে উপস্থিত হইল। এই মহলে গম্বুজশীর্ষ বৃহৎ একটি কক্ষ ঘিরিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কয়েকটি প্রকোষ্ঠ। একটি প্রকোষ্ঠে রাজকন্যাদের নৈশাহারের আয়োজন হইয়াছে। কয়েকজন দাসী কাষ্ঠ-পীঠিকায় অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে। রাজকুমারীরা বড় ঘরে আছেন। পিঙ্গলা সেখানে গিয়া যুক্তকরে বলিল—'মহারাজের নৈশাহার সম্পন্ন হয়েছে, এবার আপনারা বসুন।'

দুই রাজকন্যা ভোজনকক্ষে গমন করিলেন। কাষ্ঠ-পীঠিকার দুই পাশে রেশমের আসন পাতা। রাজকন্যারা তাহাতে বসিলেন। চারজন পরিচারিকা তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিল। পিঙ্গলা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল, তারপর বলিল—'অনুমতি করুন, আমি অন্য রানীদের সংবাদ দিতে যাই। সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা আহারে বসবেন না।'

বিদ্যুন্মালা উদাসমুখে নীরব রহিলেন, মণিকঙ্কণা মৃদু হাসিয়া বলিল—'এস।'

'এই দাসীরা আপনাদের সেবা করবে ; কাল প্রাতে আমি আবার আসব।' পিঙ্গলা যুক্তকরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

দুই ভগিনী নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। বিদ্যুন্মালা নামমাত্র আহার করিলেন, মণিকঙ্কণা প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনের স্বাদ লইয়া খাইল। দুইজনের মনের গতি ভিন্নমুখী। বিদ্যুন্মালার মনে সুখ নাই ; মহারাজ দেবরায়ের সুন্দর কান্তি এবং সদয় ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার মন আরো বিকল হইয়া গিয়াছে। ভাগ্যবিধাতা যেন এক হাতে সব দিয়া অন্য হাতে সব হরণ করিয়া লইতেছেন। মণিকঙ্কণার মনে কিন্তু বসন্তের বাতাস বহিতেছে। আশঙ্কার ঝড়-বাদল অপগত হইয়া হৃদয়াকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে।

দাসীদের সম্মুখে কোনো কথা হইল না, আহার সমাপন করিয়া রাজকন্যারা শয়নকক্ষে গেলেন। কক্ষের দুই পাশে প্রকাণ্ড দু'টি পালঙ্কের উপর শয্যা, শয্যার উপর জাতীপুষ্প বিকীর্ণ। মৃগমদ গন্ধে কক্ষ আমোদিত। মণিকঙ্কণা দাসীদের বলিল—'তোমরা যাও, আর তোমাদের প্রয়োজন হবে না।'

একটি দাসী বলিল—'যে আজ্ঞা, রাজকুমারী। দ্বারের বাইরে প্রতিহারিণীরা প্রহরায় রহিল, যদি প্রয়োজন হয়, হাততালি দেবেন।'

দাসীরা প্রস্থান করিলে মণিকঙ্কণা বলিল—'মালা, তুই কোন্ পালঙ্কে শুবি ?'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'দুই পালঙ্কই সমান, যেটাতে হয় শুলেই হল। আয়, দু'জনে এক পালঙ্কে শুই।'

'সেই ভাল। নৌকোতে একলা শোয়ার অভ্যাস ছেড়ে গেছে।'

দু'জনে একসঙ্গে শয়ন করিলেন। মণিকঙ্কণা ভগিনীর পানে চাহিয়া বলিল—'তোর কি এখানে কিছুই ভাল লাগছে না! অমন মনমরা হয়ে আছিস কেন ?'

আসল কথা মণিকঙ্কণাকেও বলিবার নয়, বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'মামা আর মন্দোদরীর কথা মনে হচ্ছে। কি জানি তারা বেঁচে আছে কিনা।'

চিপিটক ও মন্দোদরীর কথা মণিকঙ্কণা ভুলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ স্মরণ করাইয়া দিতে সে থতমত হইয়া চুপ করিল, তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—'সত্যিই কি আর ডুবে গেছে। হয়তো বেঁচে আছে, কাল খবর পাওয়া যাবে।'

চিপিটক ও মন্দোদরী বাঁচিয়া ছিলেন। কিন্তু রাজভৃত্যেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাঁহাদের পায় নাই। পাইবার কথাও নয়।

ঝড়ের প্রারম্ভে নৌকা হইতে জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া চিপিটক মন্দোদরীর পা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। তারপর ঝড়ের প্রমত্ত আস্ফালনে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল, কিন্তু চিপিটক মন্দোদরীর পা ছাড়িলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মন্দোদরীর চরণ ছাড়া তাঁহার গতি নাই। মন্দোদরী ডুবিল না, চিপিটকের নাকে মুখে জল ঢুকিলেও তিনি ভাসিয়া রহিলেন।

তারপর যুগান্ত কাটিয়া গেল, নিবিড় অন্ধকারে তাঁহারা কোথায় চলিয়াছেন কিছুই জ্ঞান নাই। ক্রমে ঝড়ের বেগ কমিতে লাগিল, বৃষ্টি থামিল। মেঘ কাটিয়া গেল। অবশেষে নদীর তরঙ্গভঙ্গও মন্দীভূত হইল, তুঙ্গভদ্রার স্রোত আবার স্বাভাবিক ধারায় বহিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকার দিগন্তব্যাপী ; চিপিটক মন্দোদরীর চরণ ধারণ করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন ; একটা হাত অবশ হইলে অন্য হাত দিয়া পা ধরিতেছেন। মন্দোদরীর সাড়াশব্দ নাই, সে কেবল ভাসিয়া যাইতেছে।

অনেকক্ষণ কাটিবার পর চিপিটকের একটু সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'মন্দোদরি, বেঁচে আছিস তো ?'

মন্দোদরী এক ঢোক জল খাইয়া বলিল—'আছি। জয় দারুব্রহ্ম!'

আর কথা হইল না, কথা কহিবার সামর্থ্য বেশি ছিল না। খড়কুটার মত তাঁহারা স্রোতের মুখে নিরুপায় ভাসিয়া চলিলেন।

কিন্তু তাহাদের এই ভাসিয়া চলার কাহিনী দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিতেছে তখন মন্দোদরীর দেহ মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। সে হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া কাদা ঘাঁটিয়া শুষ্ক ডাঙ্গায় উঠিল ; চিপিটক তাহার পিছে পিছে উঠিলেন। চোখে কেহ কিছু দেখিল না, অনুভবে বুঝিল নুড়ি-ছড়ানো স্থান ; নদীর তীরও হইতে পারে, আবার নদীমধ্যস্থ দ্বীপও হইতে

পারে।

কিন্তু এসব কথা বিবেচনা করিবার শক্তি তাহাদের ছিল না, মাটি পাইয়াছে ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। তাহারা যেমন ছিল সেই অবস্থায় নুড়ি বিছানো মাটির উপর শুইয়া অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রথমে ঘুম ভাঙ্গিল মন্দোদরীর। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল প্রভাত হইয়াছে, একদল স্ত্রীলোক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া খিলখিল হাসিতেছে। মন্দোদরীর সর্বাঙ্গে সোনার গহনা, কিন্তু বস্ত্র নামমাত্র। ভাগ্যে পরিধেয় শাড়িটি কোমরে গ্রন্থি দিয়া বাঁধা ছিল তাই সেটি অবশিষ্ট আছে, স্তনপট্ট উত্তরীয় প্রভৃতি সবই তুঙ্গভদ্রা কাড়িয়া লইয়াছে। শাড়িটিও তাহার দেহে নাই, ছিন্ন পতাকার মত মাটিতে লুটাইতেছে।

মন্দোদরী কোনো মতে লজ্জা নিবারণ করিয়া উঠিয়া বসিল, বিহ্বলনেত্রে স্ত্রীলোকদের পানে চাহিয়া বলিল—'তোমরা কে গা ?'

রমণীরা কলকণ্ঠে উত্তর দিল, কিন্তু মন্দোদরী কিছুই বুঝিল না। ইহাদের ভাষা গ্রাম্য ; মন্দোদরী এদেশের নাগরিক ভাষাই বোঝে না গ্রাম্য ভাষা বুঝিবে কি করিয়া।

এদিকে চিপিটক মাতুলের অবস্থাও অনুরূপ। তিনিও প্রায় দিগম্বর, কেবল কটিসংলগ্ন অন্তর্বাস কৌপীনটুকু আছে। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, লাঠি হাতে একদল ষণ্ডামার্ক পুরুষ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার ধারণা জন্মিল তিনি ডুবিয়া মরিয়াছেন, যমদূতেরা তাঁহাকে লইতে আসিয়াছে। তিনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—'আমি কিছু জানি না রে বাবা !'

যা হোক, অল্পকাল পরে তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। গ্রামীণ পুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা হইল। মামা দক্ষিণ দেশের মানুষ, ইহাদের ভাষা কোনোক্রমে বুঝিয়া লইলেন। —

নদী হইতে অনতিদূরে দক্ষিণে পাহাড়-ঘেরা একটিমাত্র গ্রাম আছে। আজ প্রাতে গ্রামের কয়েকটি মেয়ে নদীতে জল ভরিতে আসিয়াছিল। তাহারা দেখিল উপলবিকীর্ণ উপকূলে দুইটি নরনারী-মূর্তি পড়িয়া আছে। তাহারা ছুটিয়া গিয়া গ্রামে খবর দিল ; তখন গ্রাম হইতে অনেক লোক আসিয়া মূর্তি দু'টিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, গত রাত্রির ঝঞ্ঝাবাতে নদীতে পড়িয়া ইহারা ভাসিয়া আসিয়াছে।

মামা কাতর স্বরে বলিলেন—'এখন কি হবে !'

গ্রামের পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিল। তাহাদের জীবন বহির্জগৎ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন, নূতন মানুষ তাহারা দেখিতে পায় না, তাই এই দুইজনকে পাইয়া তাহারা পরম হৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন বয়স্ক ব্যক্তি চিপিটককে বলিল—'চল, আমাদের গ্রামে থাকবে।'

তাহারা মেয়ে-পুরুষে দুইজনকে ধরাধরি করিয়া গ্রামে লইয়া চলিল।

নদীর প্রস্তরময় তট হইতে সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মত পথ গিয়াছে, সেই পথে পাদক্রোশ যাইবার পর গ্রাম। হাজার হাজার বছর পূর্বে এই স্থানে বোধহয় একটি হ্রদ ছিল, ক্রমে হ্রদ শুকাইয়া পলিমাটির উপর গাছপালা গজাইয়াছিল, তারপর মানুষ আসিয়া এই পাহাড়ঘেরা স্থানটিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। ফল ফলাইয়াছে, ফসল তুলিয়াছে, গরু ছাগল পুষিয়া শান্তিতে বাস করিতেছে। ইহারা অধিকাংশ কুটিরে বাস করে, কিন্তু এখনো অল্পসংখ্যক লোক প্রাচীন অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই, তাহারা এখনো গুহাবাসী। এই পর্বতচক্রের বাহিরে বিস্তীর্ণ দেশের সহিত তাহাদের সম্পর্ক অতি অল্প ; কদাচিৎ নগর হইতে নৌকাযোগে বণিক আসিয়া কাপড় এবং মেয়েদের তামা ও লোহার গহনা বিক্রয় করিয়া যায়, বিনিময়ে নারিকেল সুপারি ছাগচর্ম প্রভৃতি লইয়া যায়।

দেখা গেল গ্রামের মানুষগুলা অর্ধ-বন্য হইলেও অতিশয় অতিথিবৎসল। তাহারা অতিথিদের

একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসাইয়া দুগ্ধ পিণ্ডক্ষীর খাইতে দিল, পাকা আম ও কদলী দিল। দুই বুভুক্ষু অতিথি পেট ভরিয়া খাইল। আহারের পর গ্রামবাসীরা তাহাদের পান সুপারি খাইতে দিল। ইহারা জোয়ার বাজরির সঙ্গে পান সুপারির চাষও করে; জঙ্গলে খদির বৃক্ষ আছে, নদীর তীর হইতে শামুক ঝিনুক কুড়াইয়া তাহা পুড়াইয়া ইহারা চুন তৈয়ার করে। পান পাইয়া মন্দোদরী ও চিপিটক আহ্লাদে আটখানা হইলেন।

ইতিমধ্যে গ্রামের সমস্ত স্ত্রীলোক আসিয়া মন্দোদরীকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল; মন্দোদরীকে দেখিবার জন্য নয়, তাহার গহনা দেখিবার জন্য। মন্দোদরীর গলায় ছিল সোনার হাঁসুলী, হাতে অঙ্গদ ও কঙ্কণ, কোমরে চন্দ্রহার, পায়ের আঙ্গুলে রূপার চুট্‌কি। গ্রামের মেয়েরা আগে কখনো এমন অপরূপ গহনা দেখে নাই। তাহারা কলকণ্ঠে নিজেদের মধ্যে কথা বলিতে বলিতে মন্দোদরীর গা খাব্‌লাইতে লাগিল।

ওদিকে চিপিটক পান চিবাইতে চিবাইতে প্রবীণ মোড়লকে বলিলেন—'তোমাদের আতিথ্যে সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন বিজয়নগরে ফেরবার উপায় কি?'

মোড়ল মাথা নাড়িয়া বলিল—'বিজয়নগরে যাবার রাস্তা নেই। চারিদিকে পাহাড়।'

'অ্যাঁ! সে কী! আমাকে যে বিজয়নগরে ফিরতেই হবে।'

'তুমি কি বিজয়নগরের মানুষ?'

'না, আমি কলিঙ্গ রাজ্যের একজন অমাত্য, গুরুতর রাজকার্যে বিজয়নগরে যাচ্ছিলাম।—তা নদীপথে বিজয়নগরে যাওয়া তো সম্ভব।'

'সম্ভব—কিন্তু আমাদের নৌকা নেই।'

চিপিটকের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—'তবে উপায়? আমরা যাব কি করে?'

মোড়ল হাসিয়া বলিল—'যাবার দরকার কি? আমাদের গ্রামে থাকো।'

কি সর্বনাশ! এই পাহাড়ের মাঝখানে জংলীদের মধ্যে সারা জীবন কাটাইতে হইবে। তাঁহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিল—'অ্যাঁ! না না, আমরা নগরবাসী এই জঙ্গলে থাকতে পারব না। পাহাড়ে জঙ্গলে বাঘ ভালুক আছে—ওরে বাবারে, আমাকে খেয়ে ফেলবে।'

মোড়ল সান্ত্বনা দিয়া বলিল—'কোনো ভয় নেই। বাঘ ভালুক আমাদের গ্রামে আসে না। মাঝে মধ্যে দু'চারটে হনুমান আসে, তারা মানুষ খায় না। তোমরা নির্ভয়ে থাক, আমরা তোমাদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করব, তোমরা পরম সুখে থাকবে।'

চিপিটক বিক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন—'কোথায় মনের সুখে থাকব? ঐ কুটিরে?'

মোড়ল মাথা নাড়িয়া বলিল—'কুটির একটিও খালি নেই। কিন্তু তোমরা যদি কুটিরে বাস করতে চাও, আমরা তোমাদের জন্যে কুটির তৈরি করে দেব। আপাতত একটি সুন্দর গুহা আছে, তাতেই তোমরা থাকবে।'

চিপিটকের চক্ষু কপালে উঠিল। শেষে গুহা! এও অদৃষ্টে ছিল! অতি কষ্টে জিহ্বার জড়ত্ব দূর করিয়া চিপিটক বলিলেন—'বণিকেরা আসে বলছিলে, তারা কি আসবে না?'

মোড়ল বলিল—'তারা দু'চার দিন আগে এসেছিল, আবার এক বছর পরে আসবে।'

চিপিটকের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ওদিকে গাঁয়ের মেয়েরা মন্দোদরীর সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছিল, ভাষা না বুঝিলেও ভাবের আদান-প্রদান চলিতেছিল। এই গ্রামের মেয়েরা কাছা দিয়া কটি হইতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরে, বক্ষ নিরাবরণ, তবু গহনার প্রতি তাহাদের যথেষ্ট আসক্তি আছে। মন্দোদরীর গহনা দেখিয়া তাহারা স্বভাবতই অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা মন্দোদরীকে দুই হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিল, বলিল—'চল। মোড়ল বলেছে তোমরা গুহায় থাকবে, তোমাকে গুহায় নিয়ে যাই। কী সুন্দর গুহা! তোমরা দু'জনে মনের আনন্দে থাকবে।'

মোড়ল চিপিটককে বলিল—'গুহা দেখবে এস। এত ভাল গুহা আর এখানে নেই। পুরনো মোড়ল এই গুহায় থাকত, তিরানব্বই বছর বয়সে মারা গেছে। তাই গুহাটা খালি হয়েছে। আমি এখন মোড়ল ; ভেবেছিলাম আমি গিয়ে থাকব, কিন্তু আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা অনেক, ও গুহায় আঁটবে না। তোমরা অতিথি এসেছ, তোমরাই থাক।'

সকলে গুহার নিকট উপস্থিত হইল। গ্রামের বাহিরে পর্বতচক্রের একস্থানে একটি গুহা। গুহার প্রবেশ-দ্বার অতি ক্ষুদ্র, হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। চিপিটকের পক্ষে প্রবেশ করা বিশেষ কষ্টকর নয়, কিন্তু মন্দোদরীকে টানা-হেঁচড়া করিয়া ঢুকিতে হয়। তবে গুহার অভ্যন্তর বেশ সুপরিসর। মন্দোদরীর গুহায় প্রবেশ করিতে কোনো আপত্তি দেখা গেল না। সে হামা দিয়া গুহায় প্রবেশ করিল। মোড়ল তখন চিপিটককে বলিল—'তুমি কিছুক্ষণ গুহায় গিয়ে বিশ্রাম কর। গুহায় বুড়ো মোড়লের বিছানা আছে, তাতেই তোমাদের দুই স্বামী-স্ত্রীর চলে যাবে।'

এতক্ষণে চিপিটকের হুঁশ হইল, ইহারা তাঁহাকে মন্দোদরীর স্বামী মনে করিয়াছে। তিনি ক্রোধে ছিটকাইয়া উঠিয়া প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গেলেন। ইহারা বন্য বর্বর লোক, মন্দোদরী তাঁহার স্ত্রী নয় জানিতে পারিলে কি করিবে কিছুই বলা যায় না। হয়তো আবার টানিয়া লইয়া গিয়া নদীতে ফেলিয়া দিবে। উহাদের ঘাঁটাইয়া কাজ নাই।

আত্মগ্লানি গলাধঃকরণ করিয়া চিপিটক জানুর সাহায্যে গুহায় প্রবেশ করিলেন।

ছয়

পরদিন প্রভাতে বিজয়নগরের রাজপুরী জাগিয়া উঠিল। রাজা জাগিলেন, রানীরা জাগিলেন, পৌর-পরিজন জাগিল। বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার ঘুম ভাঙ্গিল।

সূর্যোদয় হইতে না হইতে পিঙ্গলা সভাগৃহের দ্বিতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে রাত্রে রাজপুরীতেই কোথাও থাকে, তাহার স্বতন্ত্র গৃহ নাই। শুনা যায় তাহার একটি গুপ্ত নাগর আছে ; মাসের মধ্যে দুই-তিন বার গভীর রাত্রে সে চুপিচুপি নাগরের কাছে যায়। সেখানে রাত কাটাইয়া উষাকালে রাজপুরীতে ফিরিয়া আসে। অন্যথা সে রাজপুরী ছাড়িয়া কোথাও যায় না। রাজপুরীতে তাহার অহোরাত্রের কাজ।

রাজকুমারীদের কাছে উপস্থিত হইয়া পিঙ্গলা বলিল—'রাজগুরু কূর্মদেব সংবাদ পাঠিয়েছেন, তিনি এখনি আপনাদের আশীর্বাদ জানাতে আসবেন।'

রাজকুমারীরা প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। দুই দণ্ড পরে গুরুদেব আসিলেন, রাজকুমারীরা তাঁহার চরণে প্রণতা হইলেন। পিঙ্গলা উপস্থিত ছিল, সে বিদ্যুন্মালার পরিচয় দিল।

কূর্মদেব ভাবী রাজবধূকে স্বচক্ষে দেখিতে আসিয়াছিলেন, দেখিয়া তৃপ্ত হইলেন ; মনে মনে বলিলেন—'কন্যা সুলক্ষণা ও শুদ্ধচরিত্রা, অন্য কন্যাটিও তাই। দু'জনেই বিজয়নগরের রাজবধূ হইবার যোগ্যা।' তিনি বিদ্যুন্মালাকে বলিলেন—'কন্যা, শাস্ত্রীয় কারণে বিবাহ তিন মাস স্থগিত থাকবে। এই তিন মাস তোমাকে একটি ব্রত পালন করতে হবে। প্রত্যহ প্রভাতে তুমি পম্পাপতির মন্দিরে যাবে। পম্পাপতির মন্দির বেশি দূর নয়, তুমি পদব্রজে যাবে। সেখানে পম্পা সরোবরে অবগাহন স্নান করবে, সরোবরের পদ্ম তুলে পম্পাপতির পূজা করবে, তারপর ফিরে আসবে। তিন মাস এইভাবে কাটাবার পর বিবাহ হবে।'

বিদ্যুন্মালা মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করিলেন। শিরে সংক্রান্তি আসিয়া পড়িয়াছিল, এখন অন্তত তিন মাসের জন্য পরিত্রাণ। তিনি মস্তক অবনত করিয়া স্বীকৃতি জানাইলেন।

পিঙ্গলা বলিল—'গুরুদেব, কবে থেকে ব্রত আরম্ভ হবে ?'

কূর্মদেব বলিলেন—'আজ থেকেই আরম্ভ হোক-না। শুভস্য শীঘ্রম্।'

রাজগুরু প্রস্থান করিলে পম্পাপতির মন্দিরে যাইবার জন্য সাজ-সাজ পড়িয়া গেল। পিঙ্গলা নিজে সঙ্গে যাইবে না, কিন্তু সে সমস্ত ব্যবস্থা করিল। রাজার কাছে সংবাদ গেল, পম্পাপতির মন্দিরে অগ্রদূত পাঠানো হইল। তারপর পট্টবস্ত্র পরিহিতা দুই রাজকন্যা বাহির হইলেন। সম্মুখে অসি হস্তে দুইজন প্রতিহারিণী, পিছনে আরো দশজন। পথ আলো করিয়া সুন্দরীর ঝাঁক চলিল।

পম্পাপতির মন্দির রাজপুরীর বায়ুকোণে অনুমান পাদক্রোশ দূরে অবস্থিত। মন্দিরের উত্তরে তুঙ্গভদ্রা, দক্ষিণে-বামে পম্পা সরোবর ও হেমকূট পর্বত। ত্রেতাযুগে এ পম্পা সরোবরে সীতা স্নান করিয়াছিলেন, রাম-লক্ষ্মণ তাহার তীরে পরমধার্মিক বকপক্ষী দেখিয়া হাস্য-পরিহাস করিয়াছিলেন।

রাজকন্যারা সভাগৃহ হইতে মাত্র কিয়দ্দূর গিয়াছেন, পথের পাশেই অতিথি-ভবন। একটি যুবক অতিথি-ভবন হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে যুবতী-প্রবাহ দেখিয়া পথপার্শ্বে থামিয়া গেল। তারপর সে যুবতীদের মধ্যে রাজকন্যাদের দেখিতে পাইল।

রাজকন্যারা যুবককে দেখিয়াছিলেন এবং চিনিতে পারিয়াছিলেন। অর্জুনবর্মা। সে সসম্ভ্রমে দুই কর যুক্ত করিল। রাজকন্যাদের গতি স্থগিত হইল না, কিন্তু মণিকঙ্কণা চকিত হাস্যে দশনপ্রান্ত ঈষৎ উন্মোচিত করিল। বিদ্যুন্মালা হাসিলেন না, তাঁহার মুখখানি রক্ত সঞ্চারে একটু উত্তপ্ত হইল মাত্র। কেহ জানিল না যে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ক্ষণিকের জন্য দুরু দুরু করিয়া উঠিয়াছে।

অর্জুন দাঁড়াইয়া রহিল, স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেলেন। অর্জুন একটু ইতস্তত করিল ; একবার তাহার ইচ্ছা হইল রাজকুমারীর অনুসরণ করে, তিনি প্রতিহারিণী পরিবৃতা হইয়া কোথায় যাইতেছেন দেখিয়া আসে। কিন্তু না, তাহা শোভন হইবে না। সে দৃঢ়পদে অন্য পথে চলিল।

আজ সকালে সে বলরামকে দেখিতে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছিল। পথে নামিয়াই রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাহার মন ক্ষণেকের জন্য বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এখন সে আবার মন সংযত করিয়া কিল্লাঘাটের দিকে অগ্রসর হইল।

প্রভাতকালে নগরীর রূপ অন্য প্রকার ; যেন সদ্য ঘুম-ভাঙা আলস্য-নিমীল রূপ। পান-সুপারি রাস্তায় লোক চলাচল বেশি নাই। দোকানপাট ধীরমন্থর চালে খুলিতেছে।

কিছুদূর চলিবার পর অর্জুন অকারণেই একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল। সেই শীর্ণ লোকটা তাহার পিছনে আসিতেছে ; নিজের মুখাবয়ব ঢাকা দিবার জন্যই বোধহয় মাথায় একটি পাগড়ি পরিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহার স্বরূপ ঢাকা পড়ে নাই।

অর্জুনের একটু বিরক্তি বোধ হইল। কি চায় লোকটা ? তাহার একটা উদ্দেশ্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য ? একবার অর্জুনের ইচ্ছা হইল ফিরিয়া গিয়া লোকটাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে—কী চাও তুমি ? কিন্তু তাহাতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে ; অর্জুন এ দেশে নবাগত, কাহারো সহিত কলহ করিতে চায় না। সে লোকটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া অন্য কথা ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিল।

ভাবনার বিষয়বস্তুর অভাব ছিল না। পিতা সুদূর গুলবর্গায় কি করিতেছেন ; সত্যই কি সুলতান তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ; পিতা কি অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ?...এই দেশটা তাহার ভাল লাগিয়াছে ; এই দেশকে নিজের দেশ ভাবিয়া সে সুখী হইয়াছে ; সে কি দেশের সেবা করিতে পারিবে ? রাজা কি তাহাকে সৈনিকের কার্য দিবেন ?—এই সকল চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে রাজকুমারী বিদ্যুন্মালার স্নিগ্ধগম্ভীর মুখখানি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

রাজকুমারীর মনে গর্ব-অভিমান নাই, অর্জুনের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির জীবনকথা শুনিতেও তাঁহার আগ্রহ। ঈশ্বর কৃপায় তিনি রাজেন্দ্রাণী হইয়া সুখে থাকুন—

অর্জুন যখন কিল্লাঘাটে পৌঁছিল তখন দ্বিপ্রহরের বিলম্ব নাই। ঘাটে দুই তিনটি গোলাকৃতি খেয়া-তরী ছিল, সে একটি ভাড়া লইয়া বানচাল বহিত্রগুলির দিকে চলিল। বহিত্র যেমন ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমটির নিকট গিয়া অর্জুন তাহার ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ পাইল না। তখন সে দ্বিতীয়টির নিকটে গেল। এই বহিত্রটির খোলের ভিতর হইতে ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ আসিতেছে। সে বহিত্রের গায়ে নৌকা ভিড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—'বলরাম !'

ঠুক্‌ঠাক্ বন্ধ হইল। মুহূর্ত পরে খোলের ভিতর হইতে বলরাম কর্মকার পাটাতনে উঠিয়া আসিল, অর্জুনকে দেখিয়া একগাল হাসিল—'এস এস, বন্ধু, এস। রাজভোগ ছেড়ে পালিয়ে এলে যে !'

'তোমাকে দেখতে এলাম'—অর্জুন বহিত্রের গলুইয়ে ডিঙা বাঁধিয়া পাটাতনে উঠিল—'আমার লাঠি দু'টো আছে তো ?'

'আছে। আমি যত্ন করে রেখেছি। চল, ছায়ায় যাই, এখানে বড় রৌদ্র।'

দুইজনে চিপিটক মামার রইঘরে গিয়া বসিল। মামার তৈজসপত্র পড়িয়া আছে, কেবল মামা নাই। দু'জনে কিছুক্ষণ ঝড়ের সন্ধ্যার সংবাদ বিনিময় করিল, শেষে অর্জুন বলিল—'বহিত্র কি বেশি জখম হয়েছে ?'

বলরাম বলিল—'জখম বেশি হয়নি, যেটুকু হয়েছে তা সূত্রধরেরা মেরামত করতে পারবে। কিন্তু তিনটি বহিত্রই চড়ায় আটকে গিয়েছে, যতদিন না বর্ষায় নদীর জল বাড়ছে ততদিন ওরা ভাসবে না।'

'তোমার কাজ শেষ হয়েছে ?'

'আমার কাজ বেশি ছিল না। গোটা কয়েক লোহার কীলক তৈরি করে দিয়েছি, বাকি কাজ সূত্রধরেরা করবে।'

'তাহলে তুমি আমার সঙ্গে বিজয়নগরে চল না।'

'বেশ, চল। কিন্তু এখানে আহার তৈরি, খেয়ে নিয়ে বেরুনো যাবে। রান্না অবশ্য বেশি নয়, ভাত আর মাছের রাই-ঝোল।'

'মাছ কোথায় পেলে ?'

'তুঙ্গভদ্রায় মাছের অভাব ! বঁড়শি দিয়ে ধরেছি। মাছের স্বাদ কিন্তু ভাল নয়, বাংলা দেশের মত নয়। কাল খেয়েছিলাম।'

দু'জনে নৌকার খোলের মধ্যে গিয়া আহারে বসিল। খাইতে খাইতে কথা হইতে লাগিল—'রাজাকে দেখেছ ? কেমন রাজা ?'

'রাজা আমাকে ডেকেছিলেন, আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। রাজার মতন রাজা। আমাকে তাঁর সৈন্যদলে নেবেন বলেছেন।'

অর্জুন রাজদর্শনের আখ্যান বিস্তারিত করিয়া বলিল। শুনিয়া বলরাম বলিল—'তাই নাকি ! তোমার কপাল ভাল। আমিও রাজার শ্রীচরণ দর্শন করতে চাই, বিশেষ প্রয়োজন আছে। তুমি ভাই একটু চেষ্টা করো।'

'নিশ্চয় করব। আমার যথাসাধ্য করব।'

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দুই বন্ধু গাত্রোত্থান করিল। বলরাম একটি পাটের থলিতে কিছু লোহা-লক্কড় লইয়া থলি কাঁধে ফেলিল। অর্জুন নিজের লাঠি দু'টি হাতে লইল।

গোল নৌকায় চড়িয়া তাহারা ঘাটে নামিল। অর্জুন দেখিল, নির্জন ঘাটের এক কোণে

শীর্ণকায় লোকটি বসিয়া আছে। মাথায় পাগড়ি থাকা সত্ত্বেও রৌদ্রতাপে তাহার অবস্থা করুণ। অর্জুন ও বলরাম পথ চলিতে আরম্ভ করিলে সেও পিছে চলিল।

অর্জুন চলিতে চলিতে বলরামকে নিম্নস্বরে শীর্ণ লোকটির কথা বলিল। বলরাম একবার ঘাড় ফিরাইয়া পঞ্চাশ হস্ত দূরস্থ লোকটাকে দেখিল, তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—'রাজার গুপ্তচর হতে পারে।'

অর্জুন আশ্চর্য হইয়া বলিল—'রাজার গুপ্তচর— !'

বলরাম বলিল—'রাজারা কাউকে বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস করলে তাঁদের চলে না। তুমি নূতন লোক, গুলবর্গা থেকে এসেছ, তাই তোমার পিছনে গুপ্তচর লেগেছে। ভাল রাজা, বিচক্ষণ রাজা! কিন্তু তোমার মনে পাপ নেই, তোমার কিসের ভয়?'

অর্জুন অনেকক্ষণ হতবাক্ হইয়া রহিল। রাজনীতির সহিত তাহার পরিচয় নাই; যে-মানুষ প্রসন্ন মুখে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা দান করে, সে-ই আবার তাহার পিছনে গুপ্তচর লাগাইতে পারে ইহা যেন বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বলরামের কথাই সত্য, রাজাদের সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়।

পান-সুপারি রাস্তা দেখিয়া বলরামের চক্ষু গোল হইল। দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া তাহারা পিপাসার্ত হইয়াছিল, তক্রবতীর দোকানে গিয়া আকণ্ঠ শীতল তক্র পান করিল। আজ আর তক্রবতী যুবতী মূল্য লইতে অস্বীকার করিল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দু'জনে অতিথি-ভবনে উপনীত হইল। বলরামের পরিচয় শুনিয়া পরিচারকেরা তাহাকে অর্জুনের পাশের একটি প্রকোষ্ঠে থাকিতে দিল।

সাত

পরদিন প্রভাতে দুই বন্ধু নগর পরিদর্শনে বাহির হইল। বলরাম ইতিপূর্বে এমন বিস্তীর্ণ শোভাময় নগর দেখে নাই, বর্ধমান ইহার তুলনায় গণ্ডগ্রাম। অর্জুনও বিজয়নগরের সামান্য অংশই দেখিয়াছে। তাই তাহারা সাগ্রহে নগর দর্শনে বাহির হইল। আজ তাহারা সারাদিন নগরের যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইবে, হ্রদে স্নান করিবে, মিঠাই-অঙ্গদি হইতে দ্বিপ্রহরে আহার্য সংগ্রহ করিয়া লইবে। তারপর সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিবে।

অতিথি-ভবন হইতে বাহির হইয়া আজও রাজকন্যাদের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তাঁহারা প্রহরিণী পরিবৃতা হইয়া পম্পাপতির মন্দিরে চলিয়াছেন। অর্জুন ও বলরাম পথের ধারে দাঁড়াইয়া পড়িল। মণিকঙ্কণা আজও মিষ্ট হাসিল, বিদ্যুন্মালার গণ্ডে কাঁচা সিঁদুর ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহারা চলিয়া গেলে বলরাম অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিল—'এঁরা কোথায় যাচ্ছেন?'

অর্জুন বলিল—'জানি না। কালও গিয়েছিলেন।'

'চল, খোঁজ নিই।'

বেশি খোঁজ করিতে হইল না, একটি পানের দোকানে তাহারা প্রকৃত তথ্য অবগত হইল। সংবাদ ইতিমধ্যে নগরে রাষ্ট্র হইয়াছে। রাজগুরুর আদেশে কলিঙ্গ-কুমারী তিন মাস ব্রত পালন করিবেন, প্রত্যহ পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া মন্দিরে দেবার্চনা করিবেন। ব্রত উদ্‌যাপনের পর বিবাহ হইবে।

অতঃপর তাহারা নগরের চারিদিকে যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইল। বলা বাহুল্য, শীর্ণ গুপ্তচরটি তাহাদের পিছনে রহিল।

নগরে অগণিত তুঙ্গশীর্ষ দেবমন্দির ; কোনো মন্দির বীরভদ্রের, কোনো মন্দির রামস্বামীর, কোনো মন্দির মল্লিকার্জুনের। মন্দিরসংলগ্ন ভবনে বহুসংখ্যক দেবদাসীর বাস। চম্পকদামগৌরী এই সুন্দরীদের বিবাহ হয় না ; ইহারা নৃত্য-গীত দ্বারা দেবতার সেবা করিয়া যৌবনকাল যাপন করে। দেবতাই তাহাদের স্বামী।

নগর পরিধির মধ্যে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আছে ; পাহাড়ে কোথাও কোথাও গুহা আছে। এই সকল গুহায় কেহ বাস করে না, কদাচিৎ মন্মথ-পীড়িত নায়ক-নায়িকা এই প্রাকৃতিক সঙ্কেতগৃহে নৈশ-অভিসার করে, প্রণয়ের অপরিণামদর্শিতায় নিজেদের নাম গুহাগাত্রে লিখিয়া রাখিয়া যায়। দ্বিপ্রহরে এই গুহার ছায়ায় রাখাল বালক নিদ্রা যায়। পাহাড় ছাড়াও চারিদিকে বহু পয়ঃপ্রণালী আছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরোবর আছে। অর্জুন ও বলরাম সরোবরে স্নান করিল, সঙ্গে যে আহার্য আনিয়াছিল তাহা তরুচ্ছায়ায় বসিয়া ভোজন করিল, তারপর একটি গুহার স্নিগ্ধ অন্ধকার গর্ভে শুইয়া রহিল।

অপরাহ্নে সূর্যের তেজ কমিলে দুইজনে গুহা হইতে বাহির হইল। গুপ্তচর গুহামুখ হইতে কিয়দ্দূরে একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া ছোলাভাজা খাইতেছিল। সেও গাত্রোত্থান করিল।

বলরাম তাহাকে দেখিয়া অর্জুনকে বলিল—'এস, লোকটাকে নিয়ে একটু রঙ্গ করা যাক।'

দু'জনে নিম্নকণ্ঠে পরামর্শ করিল, তারপর বলরাম পুনশ্চ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল, অর্জুন নির্জন পথ ধরিয়া রাজপুরীর অভিমুখে চলিল। রাজপুরী এখান হইতে অনুমান ক্রোশেক পথ দূরে।

গুপ্তচর বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল ইতস্তত করিল, তারপর অর্জুনকে অনুসরণ করিল। স্পষ্টই বোঝা যায় অর্জুন তাহার প্রধান লক্ষ্য।

সে গুহার দিকে পিছন ফিরিলে বলরাম গুহা হইতে বাহির হইয়া তাহার পিছু লইল। ওদিকে অর্জুন কিছুদূর গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া আসিতে লাগিল। দুইজনের মাঝখানে পড়িয়া গুপ্তচরের আর পালাইবার পথ রহিল না। সে ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল।

বলরাম আসিয়া গুপ্তচরের কাঁধে হাত রাখিল, বলিল—'বাপু, তোমার নাম কি ?'

গুপ্তচর অন্যদিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, অর্জুন দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল, বোকাটে আধ-পাগলা গোছের মুখ করিয়া সে বলিল—'আমার নাম বেঙ্কটাপ্পা।'

বলরাম বলিল—'বাঃ ! খাসা নাম ! তুমি কী কাজ কর ?'

'কাজ !' বেঙ্কটাপ্পা ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া বলিল—'আমি কাজ করি না, কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়াই।'

'বটে ! কিন্তু পেট চলে কি করে ?'

'পেট ! পেট তো চলে না, আমি চলি।'

'বলি খাও কি ?'

'যা পাই তাই খাই।'

'পথে পথে ঘুরে বেড়াও, রোজগার কর না, তোমার খাবার ব্যবস্থা করে কে ?'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বেঙ্কটাপ্পা আকাশের দিকে তর্জনী তুলিয়া বলিল—'ঐখানে ভগবান আছেন, তিনি খাবার ব্যবস্থা করেন।'

'বৎস বেঙ্কটাপ্পা, তুমি তো ভারি চতুর লোক, ভগবানের ঘাড়ে খাবারের ভার তুলে দিয়েছ। কিন্তু আমাদের পিছনে লেগেছ কেন ?'

বেঙ্কটাপ্পা হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'পিছনে লাগা কাকে বলে ?'

'তাও জান না ? ভারি নেকা তুমি !' বলরাম তাহার বাহু ধরিয়া বলিল—'চল তুমি আমাদের সঙ্গে, পিছনে লাগা কাকে বলে বুঝিয়ে দেব।'

বেঙ্কটাপ্পা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—'না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।'

বলরাম বলিল—'বেশ, পিছনে থাকো ক্ষতি নেই, কিন্তু বেশি কাছে এস না। আমার বন্ধুর হাতে লাঠি দেখতে পাচ্ছ ?'

বেঙ্কটাপ্পা ইতিউতি চাহিয়া হঠাৎ পিছন দিকে ছুট মারিল। বলরাম উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল—'বেঙ্কটাপ্পাকে আজ আর দেখা যাবে না। চল, অতিথি-ভবনে ফেরা যাক।'

অর্জুন বলিল—'এখনো বেলা আছে। পম্পা সরোবর দেখতে যাবে ?'

'হাঁ হাঁ, তাই চল।'

সূর্যাস্তের সময় তাহারা পম্পার সন্নিধানে পৌঁছিল। স্থানটি শান্ত রসাস্পদ, পর্বত সরোবর ও মন্দির মিলিয়া তপোবনের পরিবেশ সৃজন করিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে বহুবিস্তৃত পাষাণ-চত্বর। পিছনে ও পাশে দেবদাসীদের বাসস্থান। চত্বরের উপর তিনজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। পূজার্থীর ভিড় নাই।

অর্জুন ও বলরাম দূর হইতে মন্দিরস্থ বিগ্রহকে প্রণাম করিল, তারপর সরোবরের দিকে চলিল।

মন্দির-সংলগ্ন ঘাট হইতে পম্পার দৃশ্য অতি মনোহর। দূরপ্রসারিত গোলাকৃতি হ্রদের তীর ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুশ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত। তাহার ফাঁকে জলের উপর সন্ধ্যাভ্র বর্ণমালা প্রতিফলিত হইয়াছে। নীলাভ জলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কমল ও কুমুদের গুচ্ছ। কমল মুদিত হইতেছে, কুমুদ ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইতেছে। এমনিভাবে যুগযুগান্ত ধরিয়া তাহারা পালা করিয়া দিবারাত্র জনক-তনয়ার স্নানপুণ্য সরোবর পাহারা দিতেছে।

দুই বন্ধু ঘাটের পৈঠায় বসিয়া পম্পার জল মাথায় ছিটাইল, তারপর মুগ্ধনেত্রে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। মৃদুমন্দ বায়ুভরে সরোবরের জল ঊর্মিল হইয়া উঠিতেছে, শুদ্ধ স্নিগ্ধ কমলগন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে। তীরের জলরেখা ধরিয়া বকপক্ষীরা সঞ্চরণ করিতেছে ; কয়েকটি বক উড়িয়া গিয়া রাত্রির জন্য বৃক্ষশাখায় বসিল। রামচন্দ্র যে বকপক্ষী দেখিয়াছিলেন ইহারা কি তাহারই বংশধর ?

অর্জুন ও বলরাম শান্ত তৃপ্ত মন লইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল ; তখন সহসা মন্দিরের চত্বরে মৃদঙ্গের রোল উত্থিত হইল। অর্জুন ও বলরাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে বহু দীপ জ্বলিয়াছে। একদল দেবদাসী অপূর্ব বেশে সজ্জিত হইয়া যুক্তকরে মন্দিরদ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তিনজন প্রৌঢ়ের মধ্যে একজন মন্দিরের পূজারী, তিনি মন্দিরের অভ্যন্তরে বিগ্রহের পুরোভাগে পঞ্চপ্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়াছেন। অন্য দুইজন প্রৌঢ় চত্বরে দাঁড়াইয়া মৃদঙ্গ ও মঞ্জীরা বাজাইতেছেন। দর্শকের সংখ্যা বেশি নয় ; অর্জুন ও বলরাম তাহাদের মধ্যে গিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে দণ্ডায়মান হইল।

আরতি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসীগণের সুঠাম দেহ নৃত্যের তালে ছন্দিত হইয়া উঠিল। মৃদঙ্গ মঞ্জীরার ধ্বনির সহিত নূপুর ও কঙ্কণকিঙ্কিণীর নিক্বণ মিশিল। দশটি দেহ একসঙ্গে লীলায়িত হইতেছে, দশজোড়া নূপুর একসঙ্গে ঝংকৃত হইতেছে, বিলোল বাহু-মৃণাল একসঙ্গে বিসর্পিত হইতেছে। নর্তকীদের মুখের ভাব তদ্‌গত, চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত ; তাহাদের অন্তশ্চেতনা যেন ঊর্ধ্বলোকে সাক্ষাৎ নটরাজের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছে।

তারপর নৃত্যের সহিত উদাত্ত কণ্ঠস্বর মিশিল। যিনি মঞ্জীরা বাজাইতেছিলেন, তিনি জয়মঙ্গল রাগে গান ধরিলেন। কণ্ঠস্বর গম্ভীর, কিন্তু তাল দ্রুত। এই গানের সুরে নর্তকীরা যেন মাতিয়া উঠিল। তাহাদের দেহ আলোড়িত করিয়া নৃত্যের ঘূর্ণাবর্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

দর্শকের ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর দিয়া যেন হর্ষের একটা ঝড় বহিয়া গেল।

চিরদিনই দাক্ষিণাত্য দেশ নৃত্যগীতাদি কলায় পারদর্শী। সেকালে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সহিত কর্ণাট রাগ দেশ রাগ গুর্জর রাগ এবং জয়মঙ্গল রাগের বিশেষ সমাদর ছিল।

দুই দণ্ড পরে আরতি শেষ হইল। দেবদাসীরা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া স্বপ্নদৃষ্টা অপ্সরার মত অদৃশ্য হইয়া গেল। পূজারী ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

রাত্রি হইয়াছে। অর্জুন ও বলরাম ফিরিয়া চলিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; তবু অদূরে হেমকূট চূড়ায় অগ্নিস্তম্ভ হইতে আলোকের প্রভা রাত্রির অন্ধকারকে ঈষৎ স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে। দুইজনে নীরবে পথ চলিয়াছে। তাহাদের মনে যে গভীর অনুভূতি জাগিয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা তাহাদের নাই। ইহা একদিকে যেমন নূতন, অন্যদিকে তেমনি চিরপুরাতন, তাহাদের রক্তের সহিত মিশিয়া আছে। তাহারা জানে না যে আজ তাহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিল তাহা তাহাদের অপৌরুষেয় সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

আট

তারপর একটি একটি করিয়া গ্রীষ্মের অলস মন্থর দিনগুলি কাটিতে লাগিল। কলিঙ্গ-সমাগত অতিথিবৃন্দ মনের আনন্দে আছে, তাহারা খায়-দায়, নগরে ঘুরিয়া বেড়ায়, গলায় ফুলের মালা পরিয়া, গোঁফে আতর মাখিয়া নগরবাসিনী যুবতীদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করে। কাহারো কোনো চিন্তা নাই, এইভাবে যতদিন চলে।

রাজবৈদ্য রসরাজ অতিথি-ভবনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমটা একটু সঙ্গিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; তারপর দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যাকালে বিজয়নগরের রাজবৈদ্য দামোদর স্বামী আসিলেন, প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সাদর সম্ভাষণের ভঙ্গিতে দুই বাহু তুলিয়া প্রচণ্ড একটি সংস্কৃত বচন ছাড়িলেন। রসরাজ নিঃঝুমভাবে একাকী বসিয়া ছিলেন; পুলকিত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ততোধিক প্রচণ্ড একটি শ্লোক ঝাড়িলেন। বয়সে এবং পাণ্ডিত্যে উভয়ে সমকক্ষ, সুতরাং অবিলম্বে ভাব হইয়া গেল। দুইজনে নিদান শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া পরমানন্দে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিলেন।

অতঃপর প্রত্যহ দুই রাজবৈদ্যের সভা বসিতে লাগিল। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা হয়; রাজ পরিবারের বিচিত্র রোগ চুপি-চুপি আলোচনা হয়। একজন বলেন, রাজাদের আসল রোগ মাথায়; মাথাটা ঠাণ্ডা রাখিতে পারিলে আর কোনো গণ্ডগোল থাকে না। অন্যজন বলেন, রাজাদের সব রোগের উৎপত্তি উদরে, যদি পরিপাকযন্ত্র সুচারুরূপে সচল থাকে তাহা হইলে মস্তিষ্ক আপনি ঠাণ্ডা হইয়া যায়, কোনো গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না। পরন্তু রানীদের সমস্যা অন্য প্রকার—

একদিন কথা প্রসঙ্গে রসরাজ বলিলেন—'আমার কাছে যে কোহল আছে তার তুল্য কোহল ভূ-ভারতে নেই।'

দামোদর স্বামী হটিবার পাত্র নন, তিনি বলিলেন—'আমার কাছে যে কোহল আছে তা এক চুম্ব পান করলে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতের পৃষ্ঠ থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়বেন।'

কিছুক্ষণ দুই পক্ষ নিজ নিজ কোহলের উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন। কিন্তু কেবল আত্মশ্লাঘায় তর্কের নিষ্পত্তি হয় না। রসরাজ বলিলেন—'আসুন, পরীক্ষা করে দেখা যাক। আপনি আমার কোহল দশ বিন্দু পান করুন, আমি আপনার কোহল দশ বিন্দু পান করি। ফলেন পরিচীয়তে।'

'উত্তম কথা।' দামোদর স্বামী গৃহে গিয়া নিজের কোহল লইয়া আসিলেন। দুই বৃদ্ধ পরস্পরের কোহল পান করিলেন। তারপর দণ্ডার্ধ অতীত হইতে না হইতে তাঁহারা শয্যার উপর হস্তপদ বিক্ষিপ্ত করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

গভীর রাত্রে দামোদর স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি উঠিয়া টলিতে টলিতে গৃহে গেলেন। রসরাজের ঘুম সে রাত্রে ভাঙ্গিল না।

বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা সভাগৃহের দ্বিতলে আছেন। তাঁহাদের জীবনধারা আবার স্বাভাবিক ছন্দে প্রবাহিত হইতেছে। পিত্রালয়ে তাঁহারা যেমন ছিলেন, এখানকার জীবনযাত্রা তাহা হইতে বিশেষ পৃথক নয়।

কিন্তু একই সরোবরে বাস করিলে দুইটি মীনের মতিগতি এক প্রকার হয় না। দুই রাজকুমারীর প্রকৃতি মূলত ভিন্ন, নূতন সংস্থিতির সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদের মন ভিন্ন পথে চলিয়াছে। কিন্তু সেজন্য তাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসার সম্বন্ধ তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

মণিকঙ্কণার মন স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, সেখানে জটিলতা কুটিলতা নাই, সামাজিক বিধিব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ নাই। সে মহারাজ দেবরায়কে দেখিয়া পলকের মধ্যে হৃদয় হারাইয়াছে এবং হৃদয় হারানোর আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া আছে। মহারাজের কয়টি মহিষী, তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন কিনা, এই সকল প্রশ্ন তাহার কাছে নিতান্তই অবান্তর। মহারাজ যদি তাহাকে বিবাহ না করেন, সে চিরজীবন কুমারী থাকিয়া তাঁহার কাছে কাছে ঘুরিবে, তাঁহার সেবা করিবে ; ইহার অধিক আর কিছু সে চাহে না। তাহার মনের এইরূপ আত্মভোলা অবস্থা।

বিদ্যুন্মালার মন কিন্তু শান্ত নয়, পাষাণ-বন্ধনে প্রতিহত জলপ্রবাহের ন্যায় সর্বদাই আলোড়িত হইতেছে। যাঁহার কাছে শ্রীরামচন্দ্রই একমাত্র আদর্শ স্বামী, বহুপত্নীক দেবরায়ের সহিত বিবাহ তাঁহার প্রীতিপদ হইতে পারে না। আদৌ তাঁহার মন এই বিবাহের প্রতি বিমুখ হইয়া ছিল। কিন্তু রাজকন্যাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর রাজনৈতিক কার্যকলাপ নির্ভর করে না ; বিদ্যুন্মালা বিরূপ মন লইয়া বিবাহ করিতে চলিয়াছিলেন।

তারপর নদীগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিল এক অজ্ঞাত অখ্যাতনামা যুবক। রাজকুমারীর মন স্বপ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। হয়তো স্বপ্ন একদিন অলীক কল্পনাবিলাসের মত মিলাইয়া যাইত, কিন্তু হঠাৎ ঝড় আসিয়া সব ওলট-পালট করিয়া দিল ; নদী হইতে উদ্ধার এবং দ্বীপের উপর সেই নিভৃত রাত্রিটি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। বিদ্যুন্মালা নিজ হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কথাটি জানিতে পারিলেন। রাজার মেয়ে এক অতি সামান্য যুবকের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন।

মহারাজ দেবরায়কে দেখিয়া বিদ্যুন্মালার হৃদয় বিচলিত হইল না ; কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী, বুঝিলেন রাজা নারীলোলুপ অগ্নিবর্ণ নয়, তিনি স্থিরবুদ্ধি অচলপ্রতিষ্ঠ রাজা। তাঁহার চিত্তলোকে নারীর স্থান অতি অল্প।

বিবাহ স্থগিত হইল, পম্পাপতিস্বামীর পূজা আরম্ভ হইল। প্রথম দিনই বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মাকে পথের ধারে দেখিলেন, তারপর প্রায় প্রত্যহ দেখা হইতে লাগিল। মাঝে একদিন ফাঁক পড়িলে বিদ্যুন্মালা সারাদিন উৎকণ্ঠায় ছটফট করেন। ভুলিয়া যাইবার পথ রহিল না।

একদিন পূর্বাহ্ণে পম্পাপতির মন্দির হইতে ফিরিবার পর মণিকঙ্কণা বলিল—'চল মালা, অন্য রানীদের সঙ্গে ভাব করে আসি।'

বিদ্যুন্মালার মন আজ বিক্ষিপ্ত, তিনি পথের ধারে অর্জুনকে দেখিতে পান নাই। উদাসভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া বলিলেন—'তুই যা কঙ্কা, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি একটু শুয়ে থাকি।'

মণিকঙ্কণা ইদানীং নিজের মন লইয়াই মাতিয়া ছিল, বিদ্যুন্মালার মনের গতি কোন্ দিকে তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে বলিল—'তা বেশ। তোকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি একাই যাই। মানুষগুলো কেমন, জানা দরকার।'

মণিকঙ্কণা পিঙ্গলাকে ডাকিয়া প্রয়োজন ব্যক্ত করিল। পিঙ্গলা বলিল—'যথা আজ্ঞা। মহারাজের আদেশ আছে, যেখানে যেতে চাইবেন সেখানে নিয়ে যাব। মধ্যমা দেবী শক্কটা কিন্তু কারুর সঙ্গে দেখা করেন না, তাঁর মহলে মহারাজ ছাড়া আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই।'

মণিকঙ্কণা বলিল—'তাই নাকি! দেখতে কুৎসিত বুঝি?'

পিঙ্গলা মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল—'মধ্যমা দেবীকে আমরা কেউ দেখিনি। তাঁর পিত্রালয় থেকে যেসব দাসী এসেছিল তারাই তাঁকে অষ্টপ্রহর ঘিরে থাকে। চলুন, আগে কনিষ্ঠা রানী বিলোলা দেবীর কাছে নিয়ে যাই; তারপর পাটরানী পদ্মালয়াম্বিকার ভবনে নিয়ে যাব।'

মণিকঙ্কণা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—'পাটরানীর কী নাম বললে? প-দ্মা-ল-য়া-ম্বি-কা!'

পিঙ্গলা বলিল—'তাঁর নাম পদ্মালয়া। কিন্তু তিনি যুবরাজ মল্লিকার্জুনকে গর্ভে ধারণ করেছেন। রাজবংশের নিয়ম, যে-রানী পুত্রবতী হবেন তাঁর নামের সঙ্গে 'অম্বিকা' শব্দ জুড়ে দেওয়া হবে।'

অতঃপর পিঙ্গলা ও আরো কয়েকজন রক্ষিণীকে সঙ্গে লইয়া মণিকঙ্কণা বাহির হইল।

সমুদ্রের বন্দরে যেমন অসংখ্য তরণী বাঁধা থাকে, রাজ পৌরভূমির বেষ্টনীর মধ্যে তেমনি অগণিত পৃথক প্রাসাদ। দ্বিভূমক ত্রিভূমক পঞ্চভূমক প্রাসাদ, অধিকাংশই আকারে বৃহৎ, দুই-একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাসাদও আছে। দুইটি নূতন প্রাসাদ নির্মাণ হইতেছে; একটি বিদ্যুন্মালার জন্য, অন্যটি কুমার কম্পনদেব নিজের জন্য প্রস্তুত করাইতেছেন। তিনি বর্তমানে তাঁহার দুই ভার্যা লইয়া যে-প্রাসাদে আছেন তাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়া তিনি তাঁহার মর্যাদার উপযোগী মনে করেন না, তাই উচ্চতর ও বৃহত্তর প্রাসাদ নির্মাণ করাইতেছেন। রাজসভা হইতে অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদে রাজ-পিতা বীরবিজয়দেব বাস করেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন।

মণিকঙ্কণা কনিষ্ঠা রানীর তোরণ মুখে পৌঁছিবার পূর্বেই সেখানে সংবাদ গিয়াছিল। মণিকঙ্কণা দেহলিতে পদার্পণ করিয়া দেখিল, দ্বিতল হইতে সোপানশ্রেণী বাহিয়া জলপ্রপাতের মত এক ঝাঁক যুবতী নামিয়া আসিতেছে। সর্বাগ্রে দেবী বিলোলা, পিছনে সখিবৃন্দ।

ছোট রানী বিলোলাকে দেখিলে মনে হয় পনেরো বছরের কিশোরী মেয়ে। ছোটখাটো নিটোল পরিপুষ্ট গড়ন, সদ্য ফোটা মল্লীফুলের মত হাসিভরা মুখ; সে আসিয়া মণিকঙ্কণার সম্মুখে দাঁড়াইল, খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—'তুমি বুঝি নতুন ছোট রানী হবে?'

বিলোলাকে মণিকঙ্কণার ভাল লাগিল। সে বুঝিল, বিলোলা তাহাকে বিদ্যুন্মালা বলিয়া ভুল করিয়াছে। সে ভ্রম সংশোধন করিল না, একটু ঘাড় বাঁকাইয়া হাসিল, বলিল—'তা কি জানি!'

বিলোলা বলিল—'শুনেছি বিয়ের দেরি আছে। তা সে থাক। আজ আমার পুতুলের বিয়ে, তোমাকে নিমন্ত্রণ করলাম। চল, বিয়ে দেখবে।'

মণিকঙ্কণার হাত ধরিয়া বিলোলা উপরে লইয়া চলিল। ত্রিতলের বিশাল কক্ষে বিবাহ-বাসর। সোনার বর ও রূপার বধূ পাশাপাশি সিংহাসনে বসিয়াছে, দুইটি ক্ষুদ্রকায়া বালিকা চামর ঢুলাইতেছে। বর-বধূর সম্মুখে শত শত সুসজ্জিত পুত্তলিকা নানা প্রকার উপঢৌকন লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চারিদিকে বিচিত্র কর্মরত বিতস্তি-প্রমাণ পুতুলের ভিড়।

বিলোলা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—'কই, বাজনা বাজছে না কেন?'

অমনি কক্ষের এক কোণ হইতে বেণু বীণা ও করতাল বাজিয়া উঠিল। কক্ষের মণ্ডপিত

কোণে কয়েকটি যন্ত্র-বাদিকা বসিয়া ছিল, তাহাদের বাদ্যযন্ত্রের মধুর স্বননে কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিলোলা প্রশ্ন করিল—'কেমন বর-বধূ?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'চমৎকার। যেমন বর তেমনি বধূ। কিন্তু আমি তো জানতাম না, ওদের জন্য যৌতুক আনিনি।'

বিলোলা বলিল—'পরে পাঠিয়ে দিও। এখন বোসো, মিষ্টিমুখ করতে হবে।—ওরে, অতিথির জন্যে মিষ্টান্ন নিয়ে আয়।'

দুই দণ্ড পরে মণিকঙ্কণা আনন্দিত মনে বিলোলার নিকট হইতে বিদায় লইল। বিলোলা বলিল—'আবার এস।'

অতঃপর মহাদেবী পদ্মালয়াম্বিকার ভবন।

ইনিই পট্টমহিষী, একমাত্র রাজপুত্র মল্লিকার্জুনের জননী। পদ্মালয়া প্রগাঢ়যৌবনা, বয়স পঁচিশ বছর; রূপ দেখিয়া কালসর্পও মাথা নীচু করে। তাঁহার প্রকৃতিতে কিন্তু চপলতা বা ছেলেমানুষী নাই; সকল অবস্থাতেই একটি অবিচল স্থৈর্য বিরাজ করিতেছে। চোখ দু'টিতে শান্ত মনস্বিতার প্রভা; গম্ভীর মুখমণ্ডলে সুদূর একটি প্রসন্নতার আভাস লাগিয়া আছে।

তাঁহাকে দেখিয়া মণিকঙ্কণার চক্ষু সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিল, সে নত হইয়া তাঁহাকে পদস্পর্শ প্রণাম করিল। পদ্মালয়া হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন, স্মিতমুখে বলিলেন—'এস ভগিনী।'

পালঙ্কের পাশে বসিয়া দুই-চারিটি কথা হইল; প্রীতি-কোমল প্রশ্ন, শ্রদ্ধাবিগলিত উত্তর। পদ্মালয়া মণিকঙ্কণার প্রকৃতি বুঝিয়া লইলেন, চেটীকে ডাকিয়া বলিলেন—'মধুরা, মল্লিকার্জুনকে নিয়ে আয়।'

অদূরে উন্মুক্ত অলিন্দে কয়েকটি চেটীর মাঝখানে চার বছরের একটি বালক তীর-ধনুক লইয়া খেলা করিতেছিল। বেত্রনির্মিত ক্ষুদ্র ধনু দিয়া হুলবিহীন তুচ্ছ বাণ এদিক-ওদিক নিক্ষেপ করিতেছিল। বনচারী রামচন্দ্রের ন্যায় বেশ, মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা। মাতার আহ্বান শুনিয়া মল্লিকার্জুন ধনুক স্কন্ধে লইল, তারপর সৈনিকের মত দৃঢ়পদে মাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পদ্মালয়া বলিলেন—'ইনি আমার ভগিনী, এঁকে নমস্কার কর।'

মল্লিকার্জুন অমনি করতল যুক্ত করিয়া মস্তক অবনত করিল।

বালক মল্লিকার্জুনের শিরীষ-কোমল কান্তি ও মধুর ভাবভঙ্গি দেখিয়া মণিকঙ্কণা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে মল্লিকার্জুনের সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহাকে দুই বাহু দিয়া আবেষ্টন করিয়া লইল, স্নেহ-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—'কী সুন্দর আমাদের পুত্র! দেবি, আমি যদি মাঝে মাঝে এসে ওকে দেখে যাই তাহলে আপনি রাগ করবেন কি?'

পদ্মালয়া দেখিলেন, মণিকঙ্কণার মন বাৎসল্য রসে আর্দ্র হইয়াছে। তিনি স্মিতমুখে বলিলেন—'যখন ইচ্ছা এস।'

মহারাজ দেবরায়ের হৃদয়ে প্রচুর স্নেহরস ছিল। তাঁহার কর্মবহুল ভাবনাবহুল জীবনের কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত ছিল এই স্নেহবস্তুটি।

তাঁহার সর্বপ্রধান প্রেমাস্পদ ছিল বিজয়নগর রাজ্য। তিনি যুদ্ধ করিতেও ভালবাসিতেন; কিন্তু কেবল যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ ভালবাসিতেন না, রাজ্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। প্রজাদের প্রতি আন্তরিক প্রীতি যাহার নাই সে কখনো আদর্শ রাজা হইতে পারে না। দেবরায় প্রজাদের প্রাণাধিক ভালবাসিতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার স্নেহের পাত্র-পাত্রী ছিল অসংখ্য। যে সকল নরনারী তাঁহার সেবা করিত তাহাদের তিনি সর্বদা স্নেহরসে সিঞ্চিত করিয়া রাখিতেন। লক্ষ্মণ মল্লপ প্রমুখ মন্ত্রিগণ একবার তাঁহার বিশ্বাস লাভ করিতে পারিলে আর কখনো তাঁহার স্নেহাশ্রয় হইতে চ্যুত হইতেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিকটতম পারিবারিক চক্রের মধ্যে ছিলেন তাঁহার পিতা বীরবিজয়রায়, দুই ভ্রাতা বিজয়রায় ও কম্পনরায়, তিনটি রানী এবং পুত্র মল্লিকার্জুন।

পিতার সহিত মহারাজ দেবরায়ের সম্বন্ধ ছিল বিচিত্র। বীরবিজয় নির্লিপ্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন ; তিনি নানা প্রকার অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি বিপত্নীক ; ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র বিলাস। ছয় মাস রাজত্ব করিবার পর তিনি দেখিলেন, রন্ধনকার্যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে ; তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবরায়কে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে রন্ধনকর্মে মনোনিবেশ করিলেন। দেবরায়কে তিনি ভালবাসিতেন ; দ্বিতীয় পুত্র বিজয়ের প্রতি তাঁহার মন ছিল নিরপেক্ষ, এবং কনিষ্ঠ পুত্র কম্পনকে তিনি গভীরভাবে বিদ্বেষ করিতেন। পৌরজন আড়ালে তাঁহাকে পাগলাপ্পা বা পাগলা-বাবা বলিত। মহারাজ দেবরায় পিতৃদেবকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন না বটে, কিন্তু ভালবাসিতেন। বীরবিজয় মাঝে মাঝে পুত্রের ভবনে আবির্ভূত হইয়া পুত্রকে স্বহস্তে প্রস্তুত মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন, কিছু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নানা দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেন। রাজা তদ্‌গতভাবে পিতৃবাক্য শ্রবণ করিতেন এবং মনে মনে হাসিতেন।

রাজার মধ্যম ভ্রাতা বিজয়রায় ছিলেন অবিমিশ্র যোদ্ধা। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বিজয়নগরের রাজপরিবারে নামের বৈচিত্র্য ছিল না ; একই নাম—হরিহর বুক্ক কম্পন বিজয় দেবরায়—বার বার ফিরিয়া আসিত। প্রভেদ দেখাইবার জন্য ঐতিহাসিকেরা 'প্রথম' 'দ্বিতীয়' প্রভৃতি উপসর্গের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজভ্রাতা বিজয় যুদ্ধ করিতে ভালবাসিতেন এবং নিপুণ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অবশ্য একটি পত্নী ছিলেন, কিন্তু পত্নীকে রাজ অবরোধে রাখিয়া তিনি দেশ হইতে দেশান্তরে সৈন্যদল লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; কদাচিৎ রাজধানীতে ফিরিয়া দু'চার দিন পত্নীর সহিত যাপন করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িতেন। মহারাজ দেবরায় এই ভ্রাতাটিকে কেবল ভালই বাসিতেন না, শ্রদ্ধাও করিতেন। এমন অনন্যমনা একনিষ্ঠ যোদ্ধাকে শ্রদ্ধা না করিয়া উপায় নাই।

বিজয়রায় বর্তমানে রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকজন বিদ্রোহী হিন্দু সামন্ত রাজাকে দমন করিতে ব্যস্ত আছেন। সপ্তাহের মধ্যে দুই-তিন বার অশ্বারোহী বার্তাবহ আসিয়া রাজাকে যুদ্ধের সংবাদ দিয়া যায়। রাজাও বার্তা প্রেরণ করেন। রাজধানী হইতে যুদ্ধক্ষেত্র অশ্বপৃষ্ঠে দুই দিনের পথ। যাইতে একদিন ও ফিরিতে একদিন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা কম্পনদেবের প্রতি মহারাজের প্রীতি সর্বজনবিদিত। তাঁহার স্নেহ প্রায় বাৎসল্য পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে। পিতার নিয়মিত সতর্কবাণী এবং মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপের নীরব অসমর্থন তাঁহার মোহভঙ্গ করিতে পারে নাই।

তিনটি রানীর প্রতি তাঁহার প্রেম সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য, হৃদয়াবেগের আধিক্য নাই। পুত্র মল্লিকার্জুন তাঁহার নয়নমণি।

এই স্নেহসর্বস্ব অপিচ বজ্রাদপি কঠোর রাজাটিকে প্রজারা যেমন ভালবাসিত, শত্রুরা তেমনি ভয় করিত।

বিজয়নগর রাজ্যে কেবল একজন মহারাজ দেবরায়কে ভালবাসিতেন না, তাঁহার নাম কুমার কম্পনদেব। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। দেবরায় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ভালবাসিতেন বলিয়া

কনিষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁহাকে ভালবাসিবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। বিশেষত স্নেহ স্বভাবতই নিম্নগামী, তাহাকে ঊর্ধ্বগামী হইতে বড় একটা দেখা যায় না।

কম্পনদেবের প্রকৃতি ছিল লোভী কুটিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ; তদুপরি রাজার কাছে অত্যধিক আদর পাইয়া তিনি অতিমাত্রায় অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অহঙ্কার বাক্যে বা ব্যবহারে প্রকাশ পাইত না ; রাজার প্রতি মিষ্ট ও সহৃদয় ব্যবহারে তিনি তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছিলেন। মনে মনে সিংহাসনের প্রতি তাঁহার লোভ ছিল, কিন্তু সে লোভ তিনি ইঙ্গিতেও প্রকাশ করিতেন না ; রাজ-সভাসদ্‌গণের মধ্যে তাঁহার অন্তরঙ্গ কেহ ছিল না। বয়সে তরুণ হইলে কি হয়, মনোগত অভীপ্সা গোপন করিবার দক্ষতা তাঁহার ছিল।

কম্পনদেবের দুইটি পত্নী—কৃষ্ণা দেবী ও গিরিজা দেবী ; দু'টিই সুন্দরী ও রাজকুলোদ্ভবা। কম্পনদেব ইচ্ছা করিলে আরো দশটা বিবাহ করিতে পারেন, কেহ বাধা দিবে না। রাজার অজস্র প্রসাদ তাঁহার মাথায় সর্বদা বর্ষিত হইতেছে। তবু তাঁহার মনে তৃপ্তি নাই। তাঁহার উচ্চাশা কোনো দিকে পথ না পাইয়া শেষে তাঁহাকে এক নূতন কার্যে প্রবৃত্ত করিল ; তিনি এমন এক গৃহ প্রস্তুত করিবেন যাহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় রাজভবন অপেক্ষাও গরীয়ান হইবে। রাজার অনুমতি পাইয়া কুমার কম্পন নূতন অট্টালিকা নির্মাণে মনঃসংযোগ করিলেন।

নূতন অট্টালিকায় গৃহপ্রবেশের দিন আসন্ন হইয়াছে, এমন সময় একটি ব্যাপার ঘটিল। কম্পনদেব বিদ্যুন্মালাকে দেখিলেন। তারপর মণিকঙ্কণাকে দেখিলেন। কলিঙ্গের রাজকন্যা দু'টি শুধু অনিন্দ্য রূপসী নয়, তাঁহাদের আকৃতিতে অপূর্ব সম্মোহন, দুর্নিবার অনঙ্গশ্রী। লোভে কম্পনদেবের অন্তর লালায়িত হইয়া উঠিল। বাহিরে তাঁহার বিবেকহীন লালসা অল্পই প্রকাশ পাইল, কিন্তু তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, যেমন করিয়া হোক ওই যুবতী দু'টিকে অঙ্কশায়িনী করিবেন। কিন্তু বলপ্রয়োগ চলিবে না, কূটকৌশল অবলম্বন আবশ্যক।

কম্পনদেবের কলাকৌশল কিন্তু সফল হইল না। বিদ্যুন্মালার চরিত্রে সন্দেহ আরোপের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কম্পনদেবের সহায়ক মিত্র কেহ ছিল না ; কেবল ছিল কয়েকটি অনুগত ভৃত্য এবং মুষ্টিমেয় চাটুকার বয়স্য ; তাই তাঁহার মাথায় বহু প্রকার কুবুদ্ধি খেলিলেও সেগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার উপযোগী লোক কেহ ছিল না। তিনি সংবাদ পাইলেন রাজা বিদ্যুন্মালাকেই রাজবধূ করিবেন ; সুতরাং সেদিকে কোনো আশা নাই। মণিকঙ্কণার জন্য রাজা উপযুক্ত পাত্রের চিন্তা করিতেছেন, মধ্যম ভ্রাতা বিজয়রায়ের কেবল একটি বধূ, মণিকঙ্কণা সম্ভবত তাঁহার ভাগেই পড়িবে। কম্পনদেবের অসন্তোষ এতদিন তুষানলের ন্যায় ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল, এখন দাবানলের মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাজা হইয়া বসিতে না পারিলে জীবনে সুখ নাই।

নয়

একে একে দশ দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু মহারাজের নিকট হইতে অর্জুনের আহ্বান আসিল না। যত দিন যাইতেছে অর্জুন ততই হতাশ হইয়া পড়িতেছে। রাজা কি তাহাকে মনে রাখিয়াছেন ! রাজার সহস্র কাজ, সহস্র ভাবনা ; তাহার মধ্যে সামান্য একজন সৈনিক পদপ্রার্থীর কথা তাঁহার মনে থাকিবে এরূপ আশা করাও অন্যায়। রাজাকে এই তুচ্ছ কথা স্মরণ করাইয়া দিতে যাওয়াও ধৃষ্টতা।

তবে এখন সে কী করিবে ? এই দেশ, এই দেশের মানুষ তাহার চোখে ভাল লাগিয়াছে ; এই

দেশকে সে মাতৃভূমি রূপে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছে। এখন সে কোথায় যাইবে ? কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিবে ?

গত দশ দিন সে বলরামকে সঙ্গে লইয়া বিজয়নগরের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এদেশের মানুষের স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার যে চিত্র দেখিয়াছে তাহাতে আনন্দ পাইয়াছে। কিন্তু যতই দিন কাটিতেছে, নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া ততই সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে। স্বর্গে যদি স্থায়িভাবে থাকিতে না পারিলাম, তবে দু'দিনের অতিথি হইয়া লাভ কি !

সেদিন তাহারা নগর ভ্রমণে বাহির হয় নাই, অতিথি-ভবনেই বিরস মন লইয়া বসিয়া ছিল। বাক্যালাপের স্রোতে মন্দা পড়িয়াছে ; বলরাম খুব কথা বলিতে পারে, কিন্তু আজ তাহার বাক্-যন্ত্র নিস্তেজ। মাঝে মাঝে দু'একটা অসংলগ্ন কথা বলিয়া সে চুপ করিয়া যাইতেছে।

আজ বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা কখন পম্পাপতির মন্দিরে গিয়াছেন, দেখা হয় নাই।

দ্বিপ্রহরে তাহারা স্নানাহার করিতে গেল। অন্য সহযাত্রী অতিথিদের মধ্যে বসিয়া আহার করিল। সকলেই নিজেদের মধ্যে নানা জল্পনা করিতে করিতে আহার করিতেছে, কেহ ঘোড়ার মত প্রকাণ্ড ছাগল দেখিয়াছে, তাহারই উত্তেজিত বর্ণনা দিতেছে ; কেহ তুরাণী সৈনিকদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, তাহাদের বিচিত্র ভাষা ও ভাবভঙ্গি অনুকরণ করিয়া দেখাইতেছে। সকলের মনই ভাবনাহীন, এদিকে রাজকীয় দাক্ষিণ্যের জোয়ার পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইতেছে, ভাটার কোনো লক্ষণ নাই। অর্জুন ও বলরাম নীরবে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া আসিল।

কক্ষে ফিরিয়া বলরাম শয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিল, অর্জুন দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

দণ্ড দুই এইভাবে কাটিবার পর বলরাম প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া বলিল—'ঘুম পাচ্ছে। দিবানিদ্রা ভাল নয়। চল, নৌকাগুলা দেখে আসি।'

গত দশ দিনের মধ্যে তাহারা একবার কিল্লাঘাটে গিয়া নৌকাগুলিকে পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছে। অর্জুন স্তিমিত স্বরে বলিল—'চল।'

বলরাম উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় দ্বারের কাছে একটি মূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া বলরাম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল—'একি, বেঙ্কটাপ্পা যে। তারপর, খবর কি ? অনেকদিন তোমাকে দেখিনি !'

দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বেঙ্কটাপ্পা সলজ্জ হাসিল। তাহার মুখের বোকাটে ভাব আর নাই, সে বলিল—'আমি আপনাদের পিছনেই ছিলাম, আপনারা দেখতে পাননি।' তারপর অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—'আপনাকে মহারাজ স্মরণ করেছেন।'

অর্জুন বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল—'মহারাজ আমাকে স্মরণ করেছেন !'

বেঙ্কটাপ্পা বলিল—'হ্যাঁ, মহারাজ বিরামকক্ষে আপনাকে দর্শন দেবেন। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

অতর্কিত পরিস্থিতিতে পড়িয়া অর্জুন হঠাৎ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল, বলরাম বেঙ্কটাপ্পাকে বলিল—'ভাল ভাল। আমরা যা অনুমান করেছিলাম তা মিথ্যা নয়। ভাই বেঙ্কটাপ্পা, তুমি সত্যিই একজন রাজপুরুষ, ভবঘুরে নয়।'

বেঙ্কটাপ্পা আবার সলজ্জ হাসিল। অর্জুন বলিল—'তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

বেঙ্কটাপ্পা দ্বারের পাশে সরিয়া গেল। অর্জুন ত্বরিতে বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া উত্তরীয় স্কন্ধে লইল। ঘরের কোণে লাঠি দু'টি দাঁড় করানো ছিল, সে-দু'টি হাতে লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলে বলরাম তাহার কাছে আসিয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'লাঠি নিয়ে যাচ্ছ যাও, কিন্তু রাজার কাছে

বোধহয় লাঠি নিয়ে যেতে দেবে না। —সে যা হোক, রাজার প্রসন্নতা যদি পাও, আমার কথা ভুলো না ভাই।'

অর্জুন বলিল—'ভুলব না। আগে দেখি রাজা কী জন্য ডেকেছেন।'

সভাগৃহের দ্বিতলে মহারাজ দেবরায় পালঙ্কে অর্ধশয়ান হইয়া মন্থরভাবে তাম্বুল চর্বণ করিতেছিলেন। পালঙ্কের পাশে ভূমিতলে আসন পাতিয়া বসিয়া লক্ষ্মণ মল্লপ নির্বিকার মুখে সুপারি কাটিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে এক টুকরা সুপারি মুখে ফেলিয়া চিবাইতেছিলেন। কক্ষটি শীতল ও ছায়াচ্ছন্ন, অন্য কেহ উপস্থিত নাই। তবে দ্বারের বাহিরে প্রতিহারিণী আছে।

রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ হইতেছিল।

রাজা বলিলেন—'আহমদ শা অনেকদিন চুপ করে আছে। আমার মন বলছে তার মতলব ভাল নয়। এতদিন চুপ করে বসে থাকার ছেলে সে নয়।'

লক্ষ্মণ মল্লপ পানের বাটা হইতে এক খণ্ড হরীতকী বাছিয়া লইয়া মুখে দিলেন, বলিলেন—'তা বটে। কিন্তু বহমনী রাজ্যে আমাদের যে গুপ্তচর আছে তারা জানাচ্ছে, ওখানে যুদ্ধের কোনো আয়োজন নেই। সিপাহীরা ছাউনিতে বসে গোস্ত-রুটি খাচ্ছে আর হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে।'

দেবরায় বলিলেন—'ওরা ধূর্ত এবং শঠ; কপটতাই ওদের প্রধান অস্ত্র। ওদের বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমাদেরও কপট এবং শঠ হতে হবে; ধর্মযুদ্ধ চলবে না। যুদ্ধে আবার ধর্ম কী? যুদ্ধ কর্মটাই তো অধর্ম। ধর্মযুদ্ধ করতে গিয়েই ভারতবর্ষ উৎসন্ন গেল।'

মন্ত্রী বলিলেন—'সত্য কথা। ছলে বলে কৌশলে বিজয় লাভ করাই যুদ্ধের ধর্ম, অন্য ধর্ম এখানে অচল। মুসলমানেরা এই মূল কথাটা জানে বলেই বার বার হিন্দুদের যুদ্ধে পরাজিত করেছে।'

রাজা বলিলেন—'আমার বিশ্বাস আহমদ শা আমাদের গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে চুপি চুপি গুপ্ত-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'আমরা প্রস্তুত আছি। আমাদের এগারো লক্ষ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য কুমার বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণে আছে, বাকি সব তুঙ্গভদ্রার শতক্রোশব্যাপী তীর সীমান্তে থানা দিয়ে বসে আছে। যবনের সাধ্য নেই তাদের ভেদ করে রাজ্য আক্রমণ করে।'

রাজা ঈষৎ হাসিলেন—'আমি জানি আমরা প্রস্তুত আছি। তবু সতর্কতা শিথিল করা চলবে না। প্রস্তুত থাকা অবস্থাতেও নিশ্চিন্ততা আসে। দু'এক দিনের মধ্যে আমি উত্তর সীমান্তে সেনা পরিদর্শনে যাব।'

এই সময় কক্ষদ্বারের প্রহরিণী দ্বারমুখে দাঁড়াইয়া জানাইল যে, অর্জুনবর্মা আসিয়াছে।

রাজা বলিলেন—'পাঠিয়ে দাও।'

অর্জুন প্রবেশ করিয়া যথারীতি ঊর্ধ্ববাহু হইয়া প্রণাম করিল। বলা বাহুল্য, লাঠি দু'টি তাহাকে বাহিরে রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল। রাজার সকাশে অস্ত্র লইয়া গমন নিষিদ্ধ।

দেবরায় অর্জুনকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, সে পালঙ্কের পায়ের দিকে ভূমিতে বসিল। রাজা স্নিগ্ধ হাসিয়া বলিলেন—'অতিথিশালায় সুখে আছ?'

অর্জুন বলিল—'আছি মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'নগর পরিভ্রমণ করেছ শুনলাম। কেমন দেখলে?'

অর্জুন উচ্ছ্বসিত হইয়া নগরের প্রশংসা করিতে চাহিল, কিন্তু উচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। সে ক্ষীণস্বরে বলিল—'ভাল মহারাজ।'

'যে লোকটি তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সে কে?'

অর্জুন দেখিল বেঙ্কটাপ্পার কৃপায় তাহার গতিবিধি কিছুই রাজার অগোচর নয়, সে বলিল—'তার নাম বলরাম কর্মকার, বাংলা দেশের মানুষ। রাজকুমারীদের সঙ্গে নৌকায় এসেছে। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে।'

রাজা তখন বলিলেন—'সে থাক। তুমি আমার সৈন্যদলে যোগ দিতে চাও। পূর্বে কখনো যুদ্ধ করেছ ?'

'না আর্য। কার পক্ষে যুদ্ধ করব ?'

'যবন সৈন্যদলে হিন্দু সৈনিকও আছে।—তুমি অবশ্য ভল্ল ও অসি চালনা জানো। আমার পদাতি এবং অশ্বারোহী দুই শ্রেণীর সৈন্যদল আছে। তুমি কোন্ দলে যোগ দিতে চাও ?'

অর্জুন যুক্তকরে বলিল—'মহারাজের যেরূপ ইচ্ছা। আমি অশ্ব চালাতে জানি, কিন্তু আমি আর একটি বিদ্যা জানি মহারাজ, যার বলে ঘোড়ার চেয়েও শীঘ্র যেতে পারি।'

লক্ষ্মণ মল্লপ মুখ তুলিলেন। রাজা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন—'সে কেমন ?'

অর্জুন বলিল—'দু'টি লাঠির উপর ভর দিয়ে আমি দ্রুততম অশ্বকেও পিছনে ফেলে যেতে পারি।'

রাজা উঠিয়া বসিলেন—'লাঠির উপর ভর দিয়ে ! এ কেমন বিদ্যা আমাকে দেখাতে পারো ?'

অর্জুন বলিল—'আজ্ঞা এখনি দেখাতে পারি। আমার লাঠি দু'টি সঙ্গে এনেছিলাম। কিন্তু প্রতিহারিণী কেড়ে নিয়েছে।'

রাজা করতালি বাজাইলেন, প্রহরিণী দ্বার-সম্মুখে আবির্ভূতা হইল।

রাজা বলিলেন—'অর্জুনবর্মার লাঠি নিয়ে এস।'

অবিলম্বে লাঠি লইয়া প্রহরিণী ফিরিয়া আসিল, অর্জুনের হাতে দিয়া প্রস্থান করিল।

রাজা বলিলেন—'এবার দেখাও।'

অর্জুন উত্তরীয়টি স্কন্ধ হইতে লইয়া কোমরে জড়াইল ; দৃঢ়বদ্ধ উন্নত বক্ষ অনাবৃত হইল। তারপর সে গ্রন্থিযুক্ত দীর্ঘ বংশযষ্টি দু'টি দুই হাতে ধরিয়া দুই পায়ের সম্মুখে দাঁড় করাইল। ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলি দিয়া বংশদণ্ডের একটি গ্রন্থি চাপিয়া ধরিয়া ক্ষিপ্রভাবে বংশের উপর উঠিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য বংশদণ্ডটি বাঁ পায়ে সংযুক্ত করিল। এইভাবে অর্জুন দুই বংশদণ্ড দ্বারা পদযুগলকে লম্বমান করিয়া দীর্ঘজঙ্ঘ সারস পক্ষীর ন্যায় বিশাল কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাজা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মণ মল্লপও হাসিলেন। ব্যাপারটি যুগপৎ হাস্য ও বিস্ময় উৎপাদক। অর্জুন যষ্টিদণ্ড হইতে অবতরণ করিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল।

রাজা বলিলেন—'তুমি এই লাঠিতে চড়ে ঘোড়ার চেয়ে জোরে ছুটতে পারো ?'

অর্জুন সবিনয়ে বলিল—'পারি মহারাজ।'

'চমৎকার !' মহারাজের চোখে চিন্তার ছায়া পড়িল ; তিনি কিয়ৎকাল অর্জুনের মুখের উপর চক্ষু রাখিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন—'পরীক্ষা করা প্রয়োজন। অর্জুনবর্মা, তুমি আজ যাও, কাল প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে এখানে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তোমাকে একটা বিশেষ কাজে পাঠাব।'

উল্লসিত মুখে অর্জুন বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

দুই পা গিয়া আবার রাজার দিকে ফিরিল, কুণ্ঠিত মুখে বলিল—'আর্য, ক্ষমা করবেন। আমাকে যখন অনুগ্রহ করেছেন তখন আমার বন্ধু বলরামের কথা বলতে সাহস পাচ্ছি। বলরামের কথা আগে বলেছি ; সে লৌহকর্মে নিপুণ। তারও কিছু গুপ্তবিদ্যা আছে, মহারাজকে নিবেদন করতে চায়।'

রাজা বলিলেন—'ভাল ভাল, তোমার বন্ধুর নিবেদন পরে শুনব। তুমি কাল প্রত্যূষে লাঠি নিয়ে আসবে।'

'আজ্ঞা আসব।'

অর্জুন প্রস্থান করিলে রাজা ও মন্ত্রী দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। রাজা বলিলেন—'অর্জুনবর্মা যদি লাঠিতে চড়ে ঘোড়ার চেয়ে দ্রুত যেতে পারে তাহলে ওকে দিয়ে দৌত্যের কাজ আরো ভালো হবে। এমন কি ওর দেখাদেখি দণ্ডারোহী দূতের দল তৈরি করা যেতে পারে।'

'আজ্ঞা আমিও তাই ভাবছিলাম।' লক্ষ্মণ মল্লপ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'গুলবর্গার সংবাদ অর্জুনবর্মাকে বলা হল না।'

দেবরায়ের মুখ গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন—'বলব স্থির করেই তাকে ডেকেছিলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না, মায়া হল। কাল ওকে দক্ষিণে বিজয়ের কাছে পাঠাব। সেখান থেকে ফিরে আসুক, তারপর গুলবর্গার খবর বলব।'

বলা বাহুল্য, এই দশ দিন দেবরায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, গুলবর্গায় গুপ্তচর পাঠাইয়া অর্জুন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তারপর তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অর্জুন যাহা বলিয়াছিল সমস্তই সত্য।

সেদিন সন্ধ্যাকালে দুই বন্ধু সাজসজ্জা করিয়া নগর পরিভ্রমণে বাহির হইল। একজন রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, অন্যজন শীঘ্রই করিবে। আহ্লাদে দু'জনের হৃদয়ই ডগমগ।

পান-সুপারি রাস্তা ছাড়াইয়া তাহারা নগর পট্টনে উপস্থিত হইল। এখানে ফুলের দোকানে মালা কিনিয়া গলায় পরিল, কপিত্থগন্ধী তক্র পান করিল, পানের দোকানে গিয়া পান চাহিল।

পানের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া তিনটি তরুণ যুবক নিজেদের মধ্যে হাস্য-পরিহাস করিতেছিল। ইহারা বিলাসী নাগরিক নয়, মধ্যম শ্রেণীর গৃহস্থ পর্যায়ের লোক। অর্জুন ও বলরাম দোকানে উপস্থিত হইবার পর আর একটি যুবক আসিয়া পূর্বতন যুবকদের সঙ্গে যোগ দিল। উত্তেজিত স্বরে বলিল—'শীঘ্র পান খাওয়াও। বড় বিপদে পড়েছি।'

তিনজনে সমস্বরে বলিল—'কি হয়েছে?'

নবাগত যুবক বলিল—'বামনদেব দৈবজ্ঞের কাছে হাত দেখাতে গিয়েছিলাম। হাত দেখে কি বলল, জানো? বলল, আমার সাতটা বিয়ে হবে আর পঁয়ত্রিশটা মেয়ে হবে। ছেলে একটাও হবে না। আমি এখন কী করি?'

সকলে হাসিয়া উঠিল। তাম্বূল-পসারিণী বিপন্ন যুবককে পান দিয়া হাসিমুখে বলিল—'শিখিধ্বজের মন্দিরে পূজা দাও, তা হলেই ছেলে হবে।'

যুবক পান মুখে পুরিয়া বলিল—'বাজে কথা বোলো না। আমার এখনো একটাও বিয়ে হয়নি, ছেলে হবে কোত্থেকে!'

হাস্য-কৌতুকের মধ্যে বলরাম জিজ্ঞাসা করিল—'বামনদেব দৈবজ্ঞ কোথায় থাকেন?'

যুবক অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল—'ওই যে রামস্বামীর মন্দির, ওর পাশেই পণ্ডিতের বাসা। আপনিও কি জানতে চান ক'টা মেয়ে হবে?'

'আগে দেখি ক'টা বিয়ে হয়।' বলরাম পান লইয়া অর্জুনকে টানিয়া লইয়া চলিল।

অর্জুন বলিল—'সত্যিই কি হাত দেখাবে নাকি!'

বলরাম বলিল—'দোষ কি। একটা নতুন কিছু করা যাক।'

বামন পণ্ডিত নিজ গৃহের বহিঃচত্বরে অজিনাসন পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি, স্কন্ধে উপবীত, মুণ্ডিত মুখে তীক্ষ্ণায়ত চক্ষু, মাথার চারিপাশ ক্ষৌরিত, মাঝখানে সমস্তটাই শিখা।

বলরাম অর্জুন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তপাণি হইল। পণ্ডিত একে একে তাহাদের পরিদর্শন করিয়া বলিলেন—'তোমারা দেখছি ভাগ্যান্বেষী বিদেশী। করকোষ্ঠী দেখাতে চাও ?'

'আজ্ঞা।'

দৈবজ্ঞ প্রথমে অর্জুনের হাত টানিয়া লইয়া কররেখা পরীক্ষা করিলেন, বেশ কিছুক্ষণ দেখিলেন, বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—'জলমজ্জন যোগ ছিল, কেটে গেছে। তোমার জীবন এখন এক সঙ্কটময় দশার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। পিছনে বিপদ, সামনে বিপদ, কি হয় বলা যায় না। তুমি আগামী শ্রাবণী অমাবস্যার পর আমার কাছে এস, তখন আবার হাত দেখব।'

অর্জুন বিমর্ষ মুখে বলরামের পানে চাহিল। বলরাম তাড়াতাড়ি দৈবজ্ঞের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—'আমার হাতটাও একবার দেখুন। আমরা দুই বন্ধু।'

বামনদেব হাত দেখিয়া বলিলেন—'তোমার হাত মন্দ নয়, দুঃখ কষ্ট অনেকটা কেটে এসেছে ; তবে স্বদেশে আর কখনো ফিরতে পারবে না, বিদেশে সুখ-সম্পদ দারা-পুত্র লাভ করবে। তোমরা দু'জনে বন্ধু ? তাহলে একটা কথা বলে রাখি।—তোমরা দু'জন যদি একসঙ্গে থাকো তাহলে তোমার বন্ধুর অনেক রিষ্টি কেটে যাবে। কিন্তু তোমার কিছু অনিষ্ট হতে পারে। এখন আর কিছু বলব না, শ্রাবণ মাসে আবার এস।'

বলরাম প্রণামী দিতে গেল, কিন্তু বামনদেব লইলেন না, বলিলেন—'শ্রাবণ মাসে প্রণামী দিও।'

দুই বন্ধু বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া চলিল। বলরামের মনে অনুতাপ হইতে লাগিল, লঘুচিত্ত লইয়া দৈবজ্ঞের কাছে না যাইলেই ভাল হইত। কিন্তু তাই বা কেন ? বিপদের কথা পূর্বাহ্ণে জানা থাকিলে সাবধান হওয়া যায়।

চলিতে চলিতে এক সময় অর্জুন বলিল—'আমার সঙ্গে থাকলে তোমার অনিষ্ট হতে পারে।'

বলরাম বলিল—'কিন্তু তোমার রিষ্টি কেটে যাবে। সুতরাং তোমার সঙ্গ ছাড়ছি না।'

তৃতীয় পর্ব

এক

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া অর্জুন ধড়াচূড়া বাঁধিল, লাঠি হাতে লইয়া বলরামকে বলিল—'আমি চললাম। কোথায় যাচ্ছি, কবে ফিরব কিছুই জানি না।'

বলরাম বলিল—'দুর্গা দুর্গা। আমি সঙ্গে যেতে পারলে ভাল হতো। যা হোক, সাবধানে থেকো। দুর্গা দুর্গা।'

বাহিরে তখনো রাত্রির ঘোর কাটে নাই। সভাগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অর্জুন দেখিল, সেখানে মানুষ কেহ উপস্থিত নাই, কেবল দু'টি ঘোড়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। রাজমন্দুরার তেজস্বী অশ্ব, পক্ক তিন্তিড়ী ফুলের ন্যায় বর্ণ, পিঠে কম্বলের আসন, মুখে বল্‌গা। ঘোড়া দু'টি নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে, কেবল তাহাদের কর্ণ সম্মুখে ও পিছনে নড়িতেছে। অর্জুনকে তাহারা চোখ বাঁকাইয়া দেখিল ও অল্প নাসাধ্বনি করিল।

অর্জুন দাঁড়াইয়া রহিল। সভাগৃহে সাড়াশব্দ নাই। কিছুক্ষণ পরে বাহিরের দিক হইতে এক মনুষ্যমূর্তি দেখা দিল। কৃশ খর্বাকৃতি মানুষটি, মাথায় বৃহৎ পাগড়ি, কোমরে তরবারি, বয়স অর্জুন

অপেক্ষা ছয়-সাত বছরের জ্যেষ্ঠ। সে কাছে আসিয়া অর্জুনকে সন্দিগ্ধ অপাঙ্গদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তারপর সভাগৃহের দ্বিতল হইতে পিঙ্গলা আসিয়া জানাইল, মহারাজ দু'জনকেই আহ্বান করিয়াছেন।

মহারাজ দেবরায় ইতিমধ্যে প্রাতঃস্নানপূর্বক দেবপূজা সমাপন করিয়াছেন ; সূর্যোদয়ের পূর্বেই রাজকার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

অর্জুন ও দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজার বিরামকক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহারাজ পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট ; তাঁহার সম্মুখে দুইটি কুণ্ডলিত জতুমুদ্রাঙ্কিত পত্র। দুইজনে যথারীতি প্রণাম করিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, অর্জুনের লাঠি ও দ্বিতীয় ব্যক্তির তরবারি প্রতিহারিণীর নিকট গচ্ছিত রাখিতে হইয়াছিল।

রাজা বলিলেন—'স্বস্তি। তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দূত করে পাঠাচ্ছি কুমার বিজয়রায়ের কাছে। অনিরুদ্ধ, তুমি পথ চেনো, তুমি অর্জুনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। পথে চটিতে ঘোড়া বদল করবে। এই নাও দু'জনে দুই পত্র, স্কন্ধাবারে পৌঁছে পত্র কুমার বিজয়ের হাতে দেবে। দুই পত্রের মর্ম যদিচ একই, তবু দু'জনেই কুমার বিজয়কে পত্র দেবে। উত্তরে তিনি তোমাদের পৃথক পত্র দেবেন। সেই পত্র নিয়ে তোমরা ফিরে আসবে। একত্র আসার প্রয়োজন নেই, যে যত শীঘ্র পারবে ফিরে আসবে। আশু কর্মে তোমাদের পাঠাচ্ছি। মনে রেখো বিলম্বে কর্মহানির সম্ভাবনা।'

অনিরুদ্ধ রাজার হাত হইতে লিপি লইয়া নিজের পাগড়িতে বাঁধিয়া লইল ; তাহার দেখাদেখি অর্জুনও লিপি পাগড়িতে বাঁধিল।

রাজা বলিলেন—'এই নাও, কিছু স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে রাখ, প্রয়োজন হতে পারে। দক্ষিণ দিকের তোরণ-রক্ষীদের বলা আছে, কেউ তোমাদের বাধা দেবে না। এখন যাত্রা কর। শুভমস্তু।'

রাজার নিকট বিদায় লইয়া দুইজনে অস্ত্রাদি উদ্ধার করিয়া নীচে নামিল। অশ্ব দু'টি পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

তাহারা লক্ষ্য করিল না, এই সময়ে সভাগৃহের দ্বিতলের একটি গবাক্ষ দিয়া একজোড়া সদ্য-ঘুম-ভাঙ্গা রমণীচক্ষু নীচের দিকে চাহিয়া ছিল। চোখ দু'টি বড় সুন্দর, মুখখানির তুলনা নাই। অশ্বারোহীরা অন্তর্হিত হইলে কুমারী বিদ্যুন্মালার দুই ভ্রূর মাঝখানে একটু ভ্রূকুটির চিহ্ন দেখা দিল। তিনি অর্জুনবর্মাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। ভাবিলেন, অর্জুনবর্মা! কোথায় চলেছেন!

আজ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বিদ্যুন্মালা অলস অর্ধ-প্রমীল মনে মহলের বাতায়নগুলির পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সহসা একটি বাতায়ন দিয়া নীচের দৃশ্য চোখে পড়িল। তাঁহার সমগ্র চেতনা সজাগ ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কাহাকেও কোনো প্রশ্ন করিতে পারিলেন না, প্রশ্নগুলি মনের মধ্যেই রহিল। তারপর যথাসময় তিনি পম্পাপতির মন্দিরে গেলেন। সারা দিন মনটা উদাস বিভ্রান্ত হইয়া রহিল।

বেলা প্রথম প্রহর অতীতপ্রায়। নগরের সপ্ত প্রাকার পার হইয়া অর্জুন ও অনিরুদ্ধ উন্মুক্ত পথ দিয়া চলিয়াছে। অশ্ব দু'টি যুগ্ম শরের ন্যায় পাশাপাশি ছুটিতেছে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছে না।

পথ অশ্মাচ্ছাদিত, শিলাবন্ধুর। নগর সীমানার বাহিরেও লোকালয় আছে, বিসর্পিল শৈলশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যায়। পথের দুই পাশে তাপ-কৃশ ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল ; যেন পাথরের রাজ্যে উদ্ভিদ অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে।

আকাশে প্রখর সূর্য সত্ত্বেও অশ্বারোহীরা তাপে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে না। মাথায় পাগড়ি আছে, উপরন্তু অশ্বের ধাবনজনিত বায়ুপ্রবাহ তাহাদের দেহ শীতল রাখিয়াছে।

দুইজনে পাশাপাশি চলিয়াছে বটে, কিন্তু বাক্যালাপ বেশি হইতেছে না। অনিরুদ্ধের মন খুব সরল নয়, তাহার সন্দেহ হইয়াছে রাজা তাহাকে সরাইয়া অর্জুনকে নিয়োগ করিতে চান ; তাই অর্জুনের প্রতি তাহার মন বিরূপ হইয়া বসিয়াছে। অর্জুন তাহা বুঝিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রচ্ছন্ন বিরোধ দেখা দিয়াছে।

এক সময় অনিরুদ্ধ বলিল—'তোমার নাম অর্জুন। তোমাকে আগে কখনো দেখিনি।'

অর্জুন আত্মপরিচয় দিয়া বলিল—'তোমাকেও আগে দেখিনি।'

অনিরুদ্ধ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—'তুমি নবাগত, তাই আমার নাম শোনোনি। আমি অনিরুদ্ধ, বিজয়নগরের প্রধান রাজদূত। দশ বছর এই কাজ করছি। আশু দৌত্যকার্যে আমার তুল্য আর কেউ নেই।'

বিরসভাবে অর্জুন বলিল—'ভাল। আমার সৌভাগ্য যে রাজা তোমাকে আমার সঙ্গে দিয়েছেন।'

কিন্তু বাক্যালাপে অর্জুনের মন নাই, তাহার মন ও চক্ষু পথের আশেপাশে চিহ্ন অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। ওখানে ওই গিরিচূড়া বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, এখানে পথের উপর দিয়া শীর্ণ জলধারা বহিয়া গিয়াছে। অদূরে ওই ভগ্নপ্রায় পাষাণমন্দিরের পাশ দিয়া পথ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। অর্জুন মনে মনে স্থানগুলিকে চিহ্নিত করিয়া রাখিতে লাগিল। এই পথেই তাহাকে ফিরিতে হইবে।

'তোমার হাতে লাঠি কেন?'

'যার যেমন অস্ত্র, তোমার তলোয়ার আমার লাঠি।'

'কিন্তু দু'টো লাঠির কী দরকার?'

অর্জুন একটু হাসিল—'একটা লাঠি দিয়ে লড়ব, সেটা ভেঙ্গে গেলে অন্য লাঠি দিয়ে লড়ব।'

অনিরুদ্ধের মন সন্তুষ্ট হইল না। তাহার সন্দেহ হইল, লাঠি দুইটির অন্য কোনো তাৎপর্য আছে।

দ্বিপ্রহরে তাহারা এক পান্থশালায় পৌঁছিল। পথের কিনারে ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্মিত গৃহ, তাহার পাশে ছায়াশীতল একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ। বৃক্ষতলে দুইটি অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে।

একজন মধ্যবয়স্ক শিখাধারী লোক গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল, বলিল—'অশ্ব প্রস্তুত, আহার প্রস্তুত। এস, বসে যাও।' লোকটি অনিরুদ্ধকে চেনে।

দুইজনে অশ্ব হইতে নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ঘরে পীঠিকার সম্মুখে আহার্যের থালি, জলের ঘটি ; ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত দুইজনে বিনা বাক্যব্যয়ে বসিয়া গেল।

অর্ধ দণ্ডের মধ্যে আহার সমাপ্ত করিয়া তাহারা নূতন ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিল—'সেনাদলের ছাউনি আরো পুব দিকে সরে গেছে। সন্ধ্যার আগে পৌঁছুলে দূর থেকে ধোঁয়া দেখতে পাবে, রাত্রে পৌঁছুলে আগুন দেখতে পাবে। এখনো ত্রিশ ক্রোশ বাকি।'

আবার তাহারা বাহির হইয়া পড়িল।

দুই অশ্বারোহী যখন কুমার বিজয়ের স্কন্ধাবারে পৌঁছিল তখন সূর্যাস্ত হইয়া গিয়াছে। গোধূলির আলোয় সৈন্যাবাসটি দেখাইতেছে একটি বিরাট গো-গৃহের মত। অসংখ্য গরুর গাড়ি পাশাপাশি সাজাইয়া বিপুলায়তন একটি চক্র-ব্যূহ রচিত হইয়াছে ; তাহার মধ্যে তালপত্রের ছত্রাকৃতি অগণিত ছাউনি। মধ্যস্থলে সেনাপতির জন্য বস্ত্রনির্মিত উচ্চ শিবির।

শকট-চক্রের একস্থানে একটু ফাঁক আছে ; এই প্রবেশদ্বারের মুখে সশস্ত্র রক্ষী পাহারা দিতেছে,

উপরন্তু একদল রক্ষী শকটবেষ্টনের বাহিরে পরিক্রমণ করিতেছে। পাছে শত্রুসৈন্য রাত্রিকালে আক্রমণ করে তাই সতর্কতা।

অনিরুদ্ধ ও অর্জুন স্কন্ধাবারে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতির নিকট নীত হইল। বিজয়রায় তখন আহারে বসিয়াছিলেন। কিন্তু রাজদূত যখনই আসুক তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, ইহাই রাজকীয় নিয়ম।

বস্ত্রাবাসের একটি বৃহৎ কক্ষে বিজয়রায় আহারে বসিয়াছিলেন। পীঠিকার সম্মুখে আট-দশটি থালিকা, থালিকাগুলিকে ঘিরিয়া দশ-বারোটি তৈলদীপ। ছয়জন পরিচারক পার্শ্বরক্ষী সম্মুখে ও পিছনে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে ; তাহাদের কটিতে ছুরিকা।

বিজয়রায়ের আহার্যবস্তুর পরিমাণ যেমন প্রচুর, তেমনি অধিকাংশই আমিষ। সেই সঙ্গে কিছু ঘৃতপক্ক অন্ন ও এক ভৃঙ্গার দ্রাক্ষাসার। বিজয়রায় ম্লেচ্ছ রন্ধনপদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তাঁহার ভোজনপাত্রগুলিতে শোভা পাইতেছিল মেষমাংসের শূল্যপক্ক গুটিকা, কালিয়া সেক্‌চী দোল্‌মা সমোসা ইত্যাদি। একটি স্ফটিকের পাত্রে স্তূপীকৃত আঙ্গুর ফল।

বিজয়রায়ের আকৃতি মধ্যম পাণ্ডবের মত ; বূঢ়োরস্ক গজস্কন্ধ। জ্যেষ্ঠ দেবরায় ও কনিষ্ঠ কম্পনের সহিত তাঁহার আকৃতির সাদৃশ্য অতি অল্প। সঙ্গম বংশের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুকরায় সকল বিষয়ে অভেদাত্মা ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের আকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ভীমার্জুনের আকৃতির যে তফাত, হরিহর ও বুকরায়ের আকৃতিতে সেইরূপ পার্থক্য ছিল ; একজন সিংহ, অন্যজন হস্তী। তারপর পুরুষানুক্রমে এই দ্বিবিধ আকৃতি বার বার এই বংশে দেখা দিয়াছে। দেশের লোক হরিহররায় ও বুকরায়কে স্নেহভরে হক্ক-বুক্ক বলিয়া উল্লেখ করিত। দেবরায় ও বিজয়রায়কে দেখিয়া তাহারা নিজেদের মধ্যে সগর্বে বলাবলি করিত—হক্ক-বুক্ক আবার ভ্রাতৃরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

অনিরুদ্ধ ও অর্জুন বিজয়রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি বিশাল চক্ষু তুলিয়া তাহাদের পরিদর্শন করিলেন, তারপর বাঁ হাত বাড়াইয়া পত্র দু'টি গ্রহণ করিলেন, পত্রের জতুমুদ্রা অভগ্ন আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া তিনি পত্র দু'টি মাথায় ঠেকাইলেন, তারপর একজন পরিচারকের দিকে চাহিলেন। পরিচারক আসিয়া একে একে পত্র দু'টির জতুমুদ্রা ভাঙ্গিয়া বিজয়রায়ের চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। তিনি আহার করিতে করিতে পাঠ করিলেন।

পত্রে দূতদের সম্বন্ধে বোধহয় কিছু লেখা ছিল। পত্র পাঠান্তে বিজয়রায় উভয়ের প্রতি আবার নেত্রপাত করিলেন, বিশেষভাবে অর্জুনকে লক্ষ্য করিলেন। তারপর জীমূতমন্দ্র স্বরে বলিলেন—'তোমরা পানাহার কর গিয়ে, দু'দণ্ডের মধ্যে পত্রের উত্তর পাবে। মহারাজের আজ্ঞা, যত শীঘ্র সম্ভব বার্তা নিয়ে ফিরে যাবে।'

অনিরুদ্ধ বলিল—'আর্য, আমি আজ রাত্রেই ফিরে যেতে পারতাম, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে ঘোড়া চলবে না। কাল প্রত্যূষে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করব।'

বিজয়রায় একটি সমোসা মুখে পুরিয়া ঘাড় নাড়িলেন। অনিরুদ্ধ ও অর্জুন শিবিরের বাহিরে আসিল।

বাহিরে তখন মশাল জ্বলিয়াছে। কোথাও সঞ্চরমাণ আলোকপিণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও স্থির হইয়া আছে। প্রান্তরে যেন ভৌতিক দীপোৎসব চলিতেছে।

রাজদূতেরা ছাউনিতে উত্তম পানাহার পাইল। একটি স্বতন্ত্র ছত্রতলে শুষ্ক তৃণশয্যায় শয়ন করিল। ছত্রাবাসগুলি রাত্রিবাসের জন্য নয়, অধিকাংশ সৈনিক মুক্ত আকাশের তলে খড় পাতিয়া শয়ন করে। দিবাকালে প্রচণ্ড সূর্যের দহন হইতে আত্মরক্ষার জন্য ছত্রগুলির প্রয়োজন হয়।

দু'জনে শয্যাশ্রয় করিয়াছে, এমন সময় সেনাপতির এক পরিচারক আসিয়া দুইজনকে দুইটি

পত্র দিয়া গেল। অর্জুন নিজের চিঠি কোমরে গুঁজিয়া লইল।

বাক্যালাপ বিশেষ হইল না। অনিরুদ্ধ একটি উদ্‌গার তুলিল, অর্জুন জৃম্ভণ ত্যাগ করিল। দু'জনের মাথায় একই চিন্তার ক্রিয়া চলিতেছে—কি করিয়া অন্যকে পিছনে ফেলিয়া আগে রাজার সমীপে পৌঁছিবে।

উভয়ের শরীর ক্লান্ত ছিল। অনিরুদ্ধ শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অর্জুন লাঠি দু'টিকে আলিঙ্গন করিয়া শুইয়া রহিল এবং অধিক চিন্তা করিবার পূর্বেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে স্কন্ধাবারে মশালগুলি একে একে নিভিয়া আসিতে লাগিল। তারপর রন্ধ্রহীন অন্ধকারে চরাচর ব্যাপ্ত হইল। এই অন্ধকারে ক্বচিৎ প্রহরীদের হাঁকডাক ও অস্ত্রের ঝনৎকার শুনা যাইতে লাগিল।

রাত্রির মধ্য যামে দূরাগত শৃগালের সমবেত ডাক শুনিয়া অর্জুনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু না খুলিয়াই সে অনুভব করিল তাহার দেহের ক্লান্তি দূর হইয়াছে। সে চক্ষু খুলিল।

ছত্রের বাহিরে তরল অস্ফুট আলো দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। তবে কি সকাল হইয়া গিয়াছে! সে চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, অনিরুদ্ধ এখনো ঘুমাইতেছে।

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সে আবার বাহিরের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিল। না, এ ভোরের আলো নয়, চাঁদের আলো। মধ্যরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিয়াছে। ছাউনি সুষুপ্ত। অর্জুন নিঃশব্দে উঠিয়া ব্যূহমুখে উপস্থিত হইল।

প্রধান প্রহরী হাঁকিল—'কে যায়?'

অর্জুন তাহার কাছে গিয়া বলিল—'চুপ চুপ। আমি রাজদূত। এখনি আমাকে রাজধানীতে ফিরতে হবে।'

প্রহরী বলিল—'তা ভাল। কিন্তু ঘোড়া চাই তো। তোমার ঘোড়া কোথায়?'

'ঘোড়ার দরকার নেই। এই আমার ঘোড়া—' বলিয়া অর্জুন লাফাইয়া লাঠিতে আরোহণ করিল, তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে উত্তরাভিমুখে চলিল। হতবুদ্ধি প্রহরীরা মুখব্যাদান করিয়া রহিল।

স্কন্ধাবারের কাছে সুচিহ্নিত পথ নাই, মাঠের মাঝখানে অস্থায়ী ছাউনির নিকট পথ কিজন্য থাকিবে! অর্জুন কৃষ্ণপক্ষের অর্ধভুক্ত চাঁদকে ডান দিকে রাখিয়া চলিল। ক্রোশেক দূর চলিবার পর পথ মিলিল। চন্দ্রালোকে অস্ফুট রেখা, তবু পথ বলিয়া চেনা যায়।

চেনা গেলেও সাবধানতার প্রয়োজন। পথ সিধা নয়, ঘুরিয়া ফিরিয়া ঢিবি-ঢাবা বাঁচাইয়া চলিয়াছে, কোথাও দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে; এইসব স্থানে আসল পথটি চিনিয়া লইতে হইবে। পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে চলিতে অর্জুনের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। স্কন্ধাবার কখন পিছন দিকে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কোথাও জনপ্রাণী নাই; ভাগ্যে এই সময় কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, দেখিলে ভাবিত, একটা দীর্ঘ শীর্ণ প্রেত চাঁদের আলোয় ছুটিয়া চলিয়াছে।

একটা শৈলখণ্ডের মোড় ঘুরিয়া অর্জুনের পথ হারাইবার আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হইল। সম্মুখে বহু দূরে একটি রক্তাভ আলোর বিন্দু দেখা দিয়াছে। হেমকূট পর্বতের আগুন! আর পথভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই, ওই আলোকবিন্দু সম্মুখে রাখিয়া চলিলেই বিজয়নগরে পৌঁছানো যাইবে। অর্জুন সহর্ষে দীর্ঘ পদদ্বয় ক্ষিপ্রতর বেগে চালিত করিয়া দিল।

ঊষার আলো ফুটিয়াছে কি ফোটে নাই, পশ্চিম আকাশে চাঁদ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। রাজসভা-গৃহের অন্ধকার মূর্তি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। দাসী পিঙ্গলা অভিসারে গিয়াছিল, বহির্দিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সভাগৃহের অগ্রপ্রাঙ্গণে হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া

একজন বসিয়া আছে। পিঙ্গলা কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল—অর্জুনবর্মা! বিস্ময়ে বিহ্বলভাবে ছুটিতে ছুটিতে সে রাজাকে সংবাদ দিতে গেল।

দুই

রাজা বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, আজ থেকে তুমি আমার অতিথি নও, তুমি আমার ভৃত্য। তোমাকে আশুগতি দূতের কাজ দিলাম ; এও সামরিক কাজ। তোমার গুপ্তবিদ্যা রাজনীতির ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান বিদ্যা ; এ বিদ্যা গুপ্ত রাখা প্রয়োজন। কেবল মুষ্টিমেয় লোককে তুমি এ বিদ্যা শেখাবে। কিন্তু সে পরের কথা।—আর্য লক্ষ্মণ, অর্জুনবর্মার বাসস্থান নির্দেশ করুন ; রাজপুরীর কাছে হবে অথচ গোপন স্থান হওয়া চাই। অর্জুনবর্মা রাজকার্যে নিযুক্ত হয়েছে একথা অপ্রকাশ থাকাই বাঞ্ছনীয়।'

লক্ষ্মণ মল্লপ কেবল ঘাড় নাড়িলেন। অর্জুন যুক্তকরে বলিল—'ধন্য মহারাজ। যেখানে আমার বাসস্থান নির্দেশ করবেন সেখানেই থাকব। যদি অনুমতি করেন, আমার বন্ধু বলরামও আমার সঙ্গে থাকবে। বলরামের কথা কি আপনার স্মরণ আছে মহারাজ ?'

রাজা বলিলেন—'আছে। আজ আমার সভারোহণের সময় হল, তুমি যাও। সারাদিন অতিথিশালায় বিশ্রাম করবে। সন্ধ্যার পর তোমার বন্ধুকে নিয়ে এস। দেখবো কেমন তার গূঢ়বিদ্যা।'

সূর্যোদয় হইয়াছে। মন্ত্রণাগৃহ হইতে বাহির হইয়া অর্জুন অতিথিশালার দিকে চলিল। দেহের স্নায়ুপেশী ক্লান্ত কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে অপূর্ব উল্লাস উচ্ছলিত হইতেছে।

দাসী পিঙ্গলা এই কয়দিনে বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে ; একটু অবকাশ পাইলেই তাঁহাদের কাছে আসিয়া বসে, রাজ্যের গল্প করে। রাজার ইঙ্গিতে রাজকুমারীদের মনোরঞ্জন করাও তাহার একটি কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই সেদিন কুমারীরা পম্পাপতির মন্দির হইতে ফিরিবার পর সে তাঁহাদের মহলে আসিয়া মেঝের উপর পা ছড়াইয়া বসিল। প্রকাণ্ড একটা হাঁফ ছাড়িয়া বলিল—'বাবাঃ! অর্জুনবর্মা মানুষ নয়, বাজপাখি।'

দুই রাজকন্যা চকিতে মুখ ফিরাইলেন। মণিকঙ্কণা বলিল—'কে বাজপাখি—অর্জুনবর্মা!'

পিঙ্গলা বলিল—হ্যাঁ গো, রাজকুমারি, যিনি তোমাদের সঙ্গে এসেছেন।'

বিদ্যুন্মালার হৃৎপিণ্ড দুলিয়া উঠিল। মণিকঙ্কণা বলিল—'ও মা, তিনি উড়তেও জানেন! আমরা তো জানি তিনি মাছের মত সাঁতার কাটতে পারেন। তা তিনি কোথায় উড়ে বেড়াচ্ছেন ?'

পিঙ্গলা গলা একটু হ্রস্ব করিয়া বলিল—'কি বলব রাজকুমারি, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! মহারাজ কাল সকালে তাঁকে দূতকর্মে পাঠিয়েছিলেন ষাট ক্রোশ দূরে। আজ সকালে তিনি কাজ সেরে ফিরে এসেছেন। বল দেখি রাজকন্যা, এ কি মানুষে পারে!'

মণিকঙ্কণা বলিল—'অমানুষিক কাজ বটে। তিনি কি একলা গিয়েছিলেন ?'

পিঙ্গলা হাসিয়া উঠিল—'একলা কেন, সঙ্গে অনিরুদ্ধ ছিল, রাজ্যের চঙ্গ দূত! অনিরুদ্ধ এখনো ফেরেনি। হয়তো সন্ধ্যেবেলায় ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরবে।'

বিদ্যুন্মালার হৃদ্‌যন্ত্র যে অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইতেছে, তিনি নিশ্বাস রোধ করিয়া আছেন তাহা কেহ জানিতে পারিল না। পিঙ্গলা আরো খানিকক্ষণ অর্জুনবর্মার পরাক্রমের

কথা আলোচনা করিয়া চলিয়া গেল।

মণিকঙ্কণাও কিয়ৎকাল পরে উঠিয়া গেল, রাজার বিরামকক্ষে উঁকি মারিয়া দেখিতে গেল রাজা সভা হইতে ফিরিয়াছেন কিনা। সে সুযোগ পাইলেই রাজার বিরামকক্ষের দিকে গিয়া আড়াল হইতে উঁকিঝুঁকি মারে। বিদ্যুন্মালা একাকিনী বসিয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয়ে আশা ও আকাঙ্ক্ষার জটিল গ্রন্থিরচনা চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর রাজার বিরামকক্ষে দীপাবলী জ্বলিতেছিল। মহারাজ পালঙ্কে সমাসীন, সম্মুখে ভূমির উপর অর্জুন ও বলরাম। আজ লক্ষ্মণ মল্লপ উপস্থিত নাই, সম্ভবত অন্য কোনো কাজে ব্যাপৃত আছেন। পিঙ্গলা এতক্ষণ ঘরে ছিল, রাজার ইঙ্গিতে সরিয়া গিয়াছে।

রাজা বলিলেন—'বলরাম, তুমি বাঙ্গলা দেশের মানুষ?'

বলরাম করজোড়ে বলিল—'আজ্ঞা, রাঢ় বাঙ্গলা—বর্ধমান ভুক্তি, নগর বর্ধমান।'

রাজা কহিলেন—'বাঙ্গলা দেশে মুসলমান রাজা। তারা অত্যাচার করে?'

বলরাম বলিল—'করে মহারাজ। যারা দুষ্ট তারা স্বভাবের বশে অত্যাচার করে, আর যারা শিষ্ট তারা অত্যাচার করে ভয়ে।'

'ভয়ে অত্যাচার করে!'

'হ্যাঁ মহারাজ। মুসলমানেরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, হিন্দুরা সংখ্যায় তাদের শতগুণ। তাই তারা মনে মনে ভয় পায় এবং সেই ভয় চাপা দেবার জন্য অত্যাচার করে।'

'তুমি যথার্থ বলেছ। সকল অত্যাচারের মূলে আছে ষড়রিপু এবং ভয়। তুমি দেখছি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তোমার গুপ্তবিদ্যা কিরূপ, আমাকে শোনাও।'

'মহারাজ, আমি কর্মকার, লোহার কাজ করি। সকল রকম লোহার কাজ জানি, এমন কি কামান পর্যন্ত ঢালাই করতে পারি।'

'সে আর নূতন কি! বিজয়নগরে শত শত কর্মকার কামান নির্মাণে নিযুক্ত আছে।'

'যথার্থ মহারাজ। কামান সর্বত্র তৈরি হয়, তাতে নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু এমন কামান যদি তৈরি করা যায় যা একজন মানুষ স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে বহন করে নিয়ে যেতে পারে?'

মহারাজ কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—'তা কি করে সম্ভব?'

বলরাম বলিল—'আর্য, যুদ্ধের জন্য যে কামান তৈরি হয় তা অতি গুরুভার, তাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া মহা শ্রমসাধ্য ব্যাপার; পঞ্চাশজন লোক মিলে গো-শকটে তুলে তাকে নিয়ে যেতে হয়। বিজয়নগরের মত পার্বত্য দেশে কামান যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া আরো কষ্টসাধ্য কার্য। তাই এমন কামান দরকার যা প্রত্যেক সৈনিক ভল্লের মত হাতে করে নিয়ে যেতে পারে।'

রাজা বলিলেন—'কিন্তু সেরূপ কামান কি তৈরি করা যায়! বড় কামান ঢালাই করা যায়, মাঝারি পিতলের কামানও ঢালাই হয়, কিন্তু একজন মানুষ বহন করে নিয়ে যেতে পারে এমন কামানের কথা শুনিনি।'

বলরাম বলিল—'আর্য, কামানের রহস্য তার নালিকার মধ্যে। বড় নালিকা ঢালাই করা সহজ কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং লঘু নালিকা তৈরি করা কঠিন। কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয় মহারাজ।'

'যদি সম্ভব হয় তাহলে আধুনিক যুদ্ধের ধারা একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, তীরন্দাজ সেনার আর প্রয়োজন হবে না।—তুমি দেখাতে পার?'

'পারি মহারাজ। দ্বারের প্রহরিণী আমার থলি কেড়ে নিয়েছে, আজ্ঞা দিন থলিটা নিয়ে আসুক।'

রাজার আদেশে প্রহরিণী বলরামের থলি দিয়া গেল। বলরাম থলি হইতে একটি লৌহযষ্টি বাহির করিয়া রাজার হাতে দিল। রাজা অভিনিবেশ সহকারে সেটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন ; এক বিতস্তি দীর্ঘ, বেণুবংশের ন্যায় গোলাকৃতি লৌহযষ্টি। কিন্তু দণ্ড নয়, নালিকা ; তাহার অন্তর্ভাগ শূন্য এবং মসৃণ। রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'এ তো দেখছি লৌহ নালিকা। এত সরু নালিকা তুমি নির্মাণ করলে কি করে?'

বলরাম স্মিতমুখে হাতজোড় করিয়া বলিল—'আর্য, ওইখানেই আমার গুপ্তবিদ্যা। আমি সরু নল তৈরি করার কৌশল উদ্ভাবন করেছি।'

রাজা নালিকাটিকে আরো খানিকক্ষণ দেখিলেন, বলিলেন—'তারপর বল।'

বলরাম বলিল—'শ্রীমন্, কামান নির্মাণের মূল রহস্য নালিকা নির্মাণ ; নালিকা তৈরি হলে বাকি সব উপসর্গ অতি সহজ। দেখুন, এই নালিকা দিয়ে অতি সহজেই ক্ষুদ্র কামান রচনা করা যায়। প্রথমে নলের এক প্রান্ত লোহার আবরণ দিয়ে বন্ধ করে দেব, তাতে কেবল একটি সূচিপ্রমাণ ছিদ্র থাকবে। তারপর নলের মধ্যে বারুদ ভরব, পিছনের ছিদ্রপথে বারুদ একটু বেরিয়ে আসবে। তখন সেই ছিদ্রের বেরিয়ে-আসা বারুদে আগুন দিলেই কামান ফুটবে। প্রক্রিয়া বোঝাতে পেরেছি কি মহারাজ?'

রাজা আরো কিছুক্ষণ নলটি নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিলেন—'বুঝেছি। কিন্তু পরিপূর্ণ যন্ত্রটি কেমন হবে এখনো ধারণা করতে পারছি না। তুমি তৈরি করে আমাকে দেখাতে পার?'

'পারি মহারাজ। দু'চার দিন সময় লাগবে।'

'তাতে ক্ষতি নেই। তুমি যন্ত্র প্রস্তুত কর। যদি সম্পূর্ণ যন্ত্রটি যুদ্ধে ব্যবহারের উপযোগী হয়—'

এই সময় ধন্নায়ক লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ, এদের বাসস্থান নির্দেশের কী ব্যবস্থা করলেন?'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'পুরভূমির মধ্যে বাড়ি হল না, ওদের গুহায় থাকার ব্যবস্থা করেছি।'

'গুহায়? কোন্ গুহায়?'

'রাজ-অবরোধের দক্ষিণ প্রান্তে কমলা সরোবরের অদূরে সঙ্কেত-গুহা নামে যে গুহা আছে তাতেই ওদের বাসস্থান নির্দেশ করেছি। গুহাটি নির্জন, ওদিকে লোক-চলাচল নেই ; ওরা আরামে থাকবে, রাজার হাতের কাছে থাকবে, অথচ বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।'

রাজা বলিলেন—'ভাল, আজ থেকে ওরা গুহাবাসী হোক, কিন্তু গৃহের আরাম থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। বলরামের বোধহয় কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে—'

বলরাম বলিল—'আর সব যন্ত্রপাতি আমার আছে মহারাজ, কেবল একটি ভস্ত্রা হলেই চলবে।'

লক্ষ্মণ মল্লপ সাম্প্রতিক ঘটনা জানেন না, তিনি বলরামের প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'ভস্ত্রা পাবে।—এখন অনুমতি করুন, মহারাজ, এদের গুহায় পৌঁছে দিই।'

রাজা লৌহ নালিকাটি বলরামকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—'আপনি বলরামকে নিয়ে যান, অর্জুনবর্মার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

বলরামকে লইয়া মন্ত্রী চলিয়া গেলেন। রাজা অর্জুনের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, একটা দুঃসংবাদ আছে। তোমার পিতার মৃত্যু হয়েছে।'

অর্জুন দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। সংবাদ কিছু অপ্রত্যাশিত নয়, এই আশঙ্কাই সে দিনের পর দিন মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিল ; তবু তাহার কণ্ঠের স্নায়ুপেশী সঙ্কুচিত হইয়া তাহার কণ্ঠরোধের উপক্রম করিল, হৃদ্‌যন্ত্র পঞ্জরের মধ্যে ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল। চিন্তা করিবার

শক্তি ক্ষণকালের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল, কেবল মস্তিষ্কের মধ্যে একটা আর্ত চিৎকার ধ্বনিত হইতে লাগল—পিতা ! পিতা !

রাজা তাহার অবস্থা দেখিয়া সদয়কণ্ঠে বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, তোমার পিতা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তিনি গৌরবময় মৃত্যু বরণ করেছেন, ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।'

এইবার অর্জুনের দুই চক্ষু ভরিয়া অশ্রুর ধারা নামিল, সে রুদ্ধকণ্ঠে কেবল একটি শব্দ উচ্চারণ করিল—'কবে— ?'

রাজা বলিলেন—'এগারো দিন আগে। ম্লেচ্ছরা তাঁকে গো-মাংস খাইয়ে ধর্মনাশের চেষ্টা করেছিল, তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেছেন।—তুমি এখন যাও, আজ রাত্রিটা অতিথিশালাতেই থেকো, রাত্রে পিতাকে প্রাণ ভরে স্মরণ কোরো। কাল তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন আমি করব। এস বৎস।'

অর্জুন যখন সভাগৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন চারিদিকে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়াছে, নগর প্রায় নিষ্প্রদীপ। বাষ্পাকুল চোখে আকাশের পানে চাহিয়া তাহার মনে হইল জগতে সে একা, নিঃসঙ্গ ; তাহার হৃদয়ও শূন্য হইয়া গিয়াছে।

তিন

দুই দিন পরে মহারাজ দেবরায় সীমান্ত-সেনা পরিদর্শনে বাহির হইলেন। সঙ্গে পিঙ্গলা এবং পাঁচজন পাচক। দেহরক্ষীরূপে চলিল এক সহস্র তুরাণী ধনুর্ধর। রাজা রাজ্যের উত্তর সীমান্তের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিদর্শন করিবেন, ন্যূনাধিক এক পক্ষকাল সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ একান্ত অনাড়ম্বরভাবে রাজ্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইয়াছেন।

কুমার কম্পনদেবের ইচ্ছা ছিল, রাজার অনুপস্থিতি কালে তিনিই রাজ-প্রতিভূ হইয়া রাজকার্য চালাইবেন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে ডাকিলেন না ; এত অল্প সময়ের জন্য শূন্যপাল নিয়োগের প্রয়োজন হয় না, মন্ত্রীই কাজ চালাইয়া লইতে পারেন। কুমার কম্পনের বিষয়-জর্জরিত মন আরো বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

কুমার কম্পনের নূতন গৃহ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে নানা প্রকার মহার্ঘ সাজসজ্জা বসিয়াছে। কিন্তু এখনো তিনি গৃহপ্রবেশ করেন নাই। তাঁহার প্রকাশ্য অভিপ্রায়, রাজা প্রত্যাগমন করিলে রাজাকে এবং রাজ্যের গণ্যমান্য রাজপুরুষদের প্রকাণ্ড ভোজ দিয়া গৃহপ্রবেশ করিবেন। এই অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যে কুটিল এবং দুঃসাহসিক অভিসন্ধি আছে তাহা তিনি হাস্যমুখে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

অর্জুন ও বলরাম গুহামধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। অতিথিশালা হইতে গুহায় স্থানান্তরিত হইয়া কিন্তু তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তিলমাত্র হানি হয় নাই।

বিজয়নগরের সর্বত্র, তথা রাজ-পুরভূমির মধ্যে ছোট ছোট পাহাড় আছে ; পাহাড় না বলিয়া তাহাদের শিলাস্তূপ বলিলেই ভাল হয়। সর্বত্র দেখা যায় বলিয়া কেহ এগুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে না। অনেক শিলাস্তূপের অভ্যন্তরে নৈসর্গিক কন্দর আছে। অর্জুন ও বলরাম যে গুহাতে আশ্রয় পাইয়াছিল তাহাও এইরূপ গুহা। ইতস্তত বিকীর্ণ বড় বড় শিলাখণ্ডের মাঝখানে ক্রমোচ্চ স্তনইব ভুবঃ একটি স্তূপ, এই শিলায়তনের মধ্যে গুহা। গুহাটি বেশ বিস্তীর্ণ, কিন্তু অধিক উচ্চ নয় ; এমন তাহার ত্রিভঙ্গ গঠন যে তাহাকে স্বচ্ছন্দে দুই ভাগ করিয়া দুইটি প্রকোষ্ঠে পরিণত

করা যায়। পিছন দিকে ছাদের এক অংশে কিছু পাথর খসিয়া গিয়া একটি নাতিবৃহৎ ছিদ্র হইয়াছে, সেই পথে প্রচুর আলো ও বায়ুর প্রবাহ প্রবেশ করে।

মন্ত্রী মহাশয় যত্নের ত্রুটি রাখেন নাই। কোমল শয্যা, উপবেশনের জন্য পীঠিকা, জলের কুণ্ড, দীপদণ্ড ও অন্যান্য তৈজস দিয়া গুহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। রাজপুরীর রন্ধনশালা হইতে প্রত্যহ দুইবার একটি দাসী আসিয়া রাজভোগ্য খাদ্য পানীয় দিয়া যায়। বলরাম ও অর্জুন একদিন বহিত্রে গিয়া বলরামের লোহা-লক্কড় ও যন্ত্রপাতি লইয়া আসিয়াছে, তাহার মৃদঙ্গাদি বাদ্যও আনিতে ভোলে নাই। দুই বন্ধু নিভৃতে নিরালায় সংসার পাতিয়া বসিয়াছে।

পিতার শ্রাদ্ধশান্তির পর অর্জুন ধীরে ধীরে আবার সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। তাহার অসহায় বিহ্বল ভাব কাটিয়া গিয়াছে ; বর্তমানে যে বৈরাগ্য ও নিস্পৃহতার ভাব তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে তাহাও ক্রমে কাটিয়া যাইবে। যৌবনের মনঃপীড়া বড় তীব্র হয়, কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ক্ষত শীঘ্র শুকায় এবং অচিরাৎ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

বলরাম হৃদয়ের প্রীতি ও সহানুভূতি দিয়া অর্জুনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সে নিজে জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, দুঃখের মূল্য বোঝে ; তাই তাড়াতাড়ি করিয়া অর্জুনের শোক ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করে না ; বরং শোকের ভাগ লইয়া শোক লাঘব করিবার চেষ্টা করে। কখনো নানা বিচিত্র কাহিনী বলে, কখনো সন্ধ্যার পর প্রদীপ জ্বলিলে মৃদঙ্গ লইয়া গান ধরে—শ্রিত-কমলাকুচ মণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিত বনমাল জয় জয় দেব হরে!

গুহার যে অংশে ছাদে ফুটা, আজ সেইখানে বলরাম হাপর বসাইয়াছে। সকালবেলা চুল্লীতে আগুন ধরাইয়া সে কাজ করিতে বসে ; অর্জুন তাহার হাপরের দড়ি টানে। লৌহখণ্ড তপ্ত হইয়া তরুণার্করাগ ধারণ করিলে বলরাম তাহা হাতুড়ি দিয়া পিটিয়া অভীষ্ট রূপ দান করে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে গল্প হয় ; বলরামই বেশি কথা বলে, অর্জুন কখনো ঘাড় নাড়ে কখনো দু'একটা কথা বলে। বলরাম বলে—'এ গুহাটি বেশ, এর সঙ্কেত-গুহা নাম সার্থক। আমরা এখানে আসার ফলে কিন্তু অনেক অভিসারিকার প্রাণে ব্যথা লেগেছে।'

অর্জুনের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বলরাম মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলে—'এ গুহাটি রাজপুরীর যুবতী দাসী-কিঙ্করীদের গুপ্ত বিহারগৃহ ; অভিসারিকারা কুহুরাত্রে চুপি-চুপি আসত, নাগরেরাও আসত। গুহার অন্ধকারে ক্ষীণ দীপশিখা জ্বলত। আর জ্বলত মদনানল।'

অর্জুন বলে—'তুমি কি করে জানলে?'

বলরাম বলে—'তুমি দেখনি! গুহার গায়ে জোড়া জোড়া নাম লেখা আছে। কোথাও খড়ি দিয়ে লেখা—রত্নমালা-দেবদত্ত ; কোথাও গিরিমাটি দিয়ে লেখা—চন্দ্রচূড়-বল্লভা। কতক নাম নূতন, কতক নাম অনেকদিনের পুরানো, প্রায় মিলিয়ে এসেছে, ভাল পড়া যায় না। এরা সব এখানে আসত। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় বাদ সাধলেন, আমাদের এনে এখানে বসিয়ে দিলেন। ওদের মনে কি দুঃখ বল দেখি! আবার নূতন গুহা খুঁজতে হবে।' বলিয়া বলরাম অনেকক্ষণ ধরিয়া হো হো শব্দে হাসিতে থাকে। অর্জুনের অধরেও একটু হাসি খেলিয়া যায়।

আবার কখনো বলরাম বলে—'আজ আর কামান তৈরি করতে ভাল লাগছে না। এস, তোমার লাঠির জন্যে দুটো হুল তৈরি করে দিই। লাঠির ডগায় বসিয়ে দিলেই লাঠি বল্লমে পরিণত হবে।'

অর্জুন বলে—'তাতে কী লাভ?'

বলরাম বলে—'লাভ হবে না! একাধারে ঘোড়া এবং বল্লম পাবে। ভেবে দেখ, তুমি রাজদূত, তোমাকে যখন-তখন পাহাড় জঙ্গল ভেঙ্গে দূর-দূরান্তরে যেতে হবে। হঠাৎ যদি অস্ত্রধারী আততায়ী আক্রমণ করে! তুমি তখন কী করবে? লাঠি দিয়ে কত লড়বে! তখন এই

অস্ত্রটি কাজে আসবে। তুমি টুক্‌ করে লাঠি থেকে নেমে বল্লম দিয়ে শত্রুর পেট ফুটো করে দেবে।'

'তা বটে।'

বলরাম দুইটি লোহার হুল তৈয়ার করিয়া লাঠির মাথায় আঁট করিয়া বসাইয়া দেয়। দুই বন্ধু দু'টি ভল্ল লইয়া কিছুক্ষণ ক্রীড়াযুদ্ধ করে। রঙ্গ-কৌতুকে অর্জুনের মন লঘু হয়।

দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে রাজপুরীর দাসী খাবার লইয়া আসে। দূর হইতে তাহাকে আসিতে দেখা যায়। মাথার উপর একটি প্রকাণ্ড থালা, তাহাতে অন্ন-ব্যঞ্জন। তার উপর আর একটি অন্ন-ব্যঞ্জনপূর্ণ থালা। সর্বোপরি একটি শূন্য থালা উপুড় করা। কোমরে ছোট একটি জলপূর্ণ কলসী। তাহার শাড়ির রঙ কোনো দিন চাঁপা ফুলের মত, কোনো দিন পলাশ ফুলের মত। গতিভঙ্গি রাজহংসীর মত। তাহাকে আসিতে দেখিলে মনে হয় মাথায় সোনার মুকুট পরা দিব্যাঙ্গনা আসিতেছে।

সে দৃষ্টিগোচর হইলেই বলরাম কাজ ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে, বলে—'অর্জুন ভাই, চল চল, স্নান করে আসি। মধ্যাহ্ন ভোজন আসছে।'

গুহা হইতে চার-পাঁচ রজ্জু দূরে পৌরভূমির দক্ষিণ কিনারে বিপুলপ্রসার কমলা সরোবর; দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় ক্রোশেক স্থান জুড়িয়া স্ফটিকের ন্যায় জল টলমল করিতেছে। দূরে পূর্বদিকে কমলাপুরমের ঘাট দেখা যায়। কিন্তু অর্জুন ও বলরাম ঘাটে স্নান করিতে যায় না। নিকটেই আঘাটায় স্নান করিয়া ফিরিয়া আসে।

গুহায় ফিরিয়া দেখে, দাসী পীঠিকার সম্মুখে আহার্য সাজাইয়া বসিয়া আছে। তাহারা আহারে বসিয়া যায়। আহার শেষ হইলে দাসী উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

প্রথম দুই-তিন দিন তাহারা দাসীকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই। একদিন খাইতে বসিয়া বলরামের জিজ্ঞাসু চক্ষু তাহার উপর পড়িল। মেয়েটি পা মুড়িয়া অদূরে বসিয়া আছে। তাহার বয়স অনুমান কুড়ি-একুশ; কচি কলাপাতার মত স্নিগ্ধ দেহের বর্ণ। উর্ধ্বাঙ্গে কাঁচুলি ও উত্তরীয়, নিম্নাঙ্গে উজ্জ্বল পীতবসন; মধ্যে ডমরুর ন্যায় কটি উন্মুক্ত। মুখখানি কমনীয়, টানা-টানা চোখ, অধর ঈষৎ স্ফুরিত। মুখের ভাব শান্ত এবং সংযত; যেন দর্শকের দৃষ্টি হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিতে চায়। লাজুক নয়, কিন্তু অপ্রগল্‌ভা। বলরাম তাহার প্রতি কয়েকবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া শেষে প্রশ্ন করিল—'তোমার নাম কি?'

যুবতীর চোখ দু'টি ভূমিসংলগ্ন হইল, সে সম্বৃত স্বরে বলিল—'মঞ্জিরা।'

কিছুক্ষণ নীরবে আহার করিয়া বলরাম বলিল—'তুমি রাজপুরীতেই থাকো?'

মঞ্জিরা বলিল—'হাঁ।'

'কতদিন আছ?'

'আট বছর।'

'তোমার পিতা-মাতা নেই?'

'আছেন। তাঁরা নগরে থাকেন।'

বলরাম আরো কিছুক্ষণ আহার করিয়া মুখ তুলিল; তাহার অধরকোণে একটু হাসি। বলিল—'তুমি আগে কখনো এ গুহায় এসেছ? অর্থাৎ আমরা আসার আগে কখনো এসেছ?'

মঞ্জিরা চোখ তুলিয়া বলরামের মুখের পানে চাহিল। চোখে ছল-কপট নাই, ঋজু দৃষ্টি। বলিল—'না।'

বলরাম বলিল—'কিন্তু অপবাদ শুনেছি, রাজপুরীর দাসী-কিঙ্করীরা মাঝে মাঝে রাত্রিকালে এই গুহায় আসে।'

মঞ্জিরার মুখের ভাব দৃঢ় হইল, সে বলরামের চোখে চোখ রাখিয়া বলিল—'যারা দুষ্ট মেয়ে তারা আসে। সকলে আসে না।'

তিরস্কৃত হইয়া বলরাম চুপ করিল। সেকালের কবিরা অভিসারিকাদের লইয়া যতই মাতামাতি করুন, সমাজে অভিসারিকাদের প্রশংসা ছিল না। বিকীর্ণকামা নারী সকল যুগে সকল সমাজেই নিন্দিত। তবে এ কথাও সত্য, সেকালে অভিসারের প্রচলন একটু বেশি ছিল।

বলরাম ও অর্জুন আহার শেষ করিয়া আচমন করিতে উঠিল। মঞ্জিরা উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর্জুন ও বলরাম ভ্রমণের জন্য বাহির হইল। রাজা রাজধানীতে নাই, সভা বসে না ; তবু অর্জুন দিনে একবার রাজসভার দিকে যায়, শূন্য সভাঙ্গনে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করিয়া ফিরিয়া আসে। আজ বলরামও তাহার সঙ্গে চলিল।

গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিছু দূর যাইবার পর বলরাম দেখিল, একটা উঁচু পাথরের চ্যাঙড়ের পাশে একজন অস্ত্রধারী লোক দাঁড়াইয়া আছে। মুখে প্রচুর গোঁফদাড়ি, মাথায় পাগড়ি, হাতে ভল্ল, কোমরে তরবারি। তাহাদের আসিতে দেখিয়া লোকটা পাথরের আড়ালে অপসৃত হইল।

বলরাম বলিল—'এস তো, দেখি কে লোকটা।'

অর্জুনের হাতে হুল-শীর্ষ লাঠি দু'টি ছিল, সুতরাং অস্ত্রধারী অজ্ঞাত পুরুষের সম্মুখীন হইতে ভয় নাই। অর্জুন একটি লাঠি বলরামকে দিল, তারপর দুইজনে দুই দিক হইতে চ্যাঙড় ঘুরিয়া অন্তরালস্থিত লোকটির নিকটবর্তী হইল।

তাহাদের দেখিয়া লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বলরাম বলিল—'বাপু, কে তুমি ? তোমার নাম কি ? এখানে কি চাও ?'

লোকটি বলিল—'আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। আমার নাম চতুর্ভুজ নায়ক।'

বলরাম বলিল—'কাকে পাহারা দিচ্ছ ?'

চতুর্ভুজ নায়কের গোঁফ এবং দাড়ির সঙ্গমস্থলে একটু শ্বেতাভা দেখা দিল—'তোমাদের পাহারা দিচ্ছি।'

বিস্মিত হইয়া বলরাম বলিল—'আমাদের পাহারা দিচ্ছ ! আমাদের অপরাধ ?'

'তোমরা গোপনীয় রাজকার্যে ব্যাপৃত আছ। পাছে বাইরের লোক কেউ আসে তাই মন্ত্রী মহাশয়ের হুকুমে পাহারা দিচ্ছি।'

'বুঝলাম। রাত্রেও কি পাহারা থাকে ?'

'থাকে।'

'তুমি একা পাহারা দাও, না তোমার মতন চতুর্ভুজ আরো আছে ?'

'আমরা তিনজন আছি, পালা করে পাহারা দিই।'

'নিশ্চিন্ত হলাম। অভিসারক আর অভিসারিকাদের ঠেকিয়ে রেখো। আমরা একটু ঘুরে আসি।'

সূর্যাস্তের অল্পকাল পরে অর্জুন ও বলরাম ফিরিয়া আসিল, দেখিল গুহায় দীপ জ্বলিতেছে, মঞ্জিরা খাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে। দুইজনে খাইতে বসিয়া গেল।

রাজবাটি হইতে রোজ নূতন নূতন অন্ন-ব্যঞ্জন আসে। আজ আসিয়াছে শর্করা-মধুর পিণ্ডক্ষীর, দুই প্রকার মৎস্য, শূল্য মাংস, উখ্য মাংস, দুগ্ধফেননিভ তণ্ডুল, ঘৃতলিপ্ত রোটিকা, সম্বর, অবদংশ ও পর্পটি। দক্ষিণ দেশে আহারের নিয়ম মধুরেণ সমাপয়েৎ নয়, মধুর খাদ্য দিয়া আহার আরম্ভ। অর্জুন ও বলরাম পিণ্ডক্ষীর মুখে দিয়া পরম তৃপ্তিভরে ভোজন আরম্ভ করিল।

পিণ্ডক্ষীরের আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে বলরাম অর্ধমুদিত নেত্রে মঞ্জিরাকে নিরীক্ষণ

করিল। মঞ্জিরা বাম করতল ভূমিতে রাখিয়া একটু হেলিয়া বসিয়া আছে, স্নেহদীপিকার নম্র আলোকে তাহার মুখখানি বড় মধুর দেখাইতেছে। কিছুক্ষণ দেখিয়া বলরাম বলিল—'তোমার নাম মঞ্জিরা। মঞ্জিরা মানে বাঁশি। তুমি বাঁশি বাজাতে জান?'

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে মঞ্জিরা আয়ত চক্ষু তুলিয়া চাহিল। একটু ঘাড় বাঁকাইল, বলিল—'জানি।'

বলরাম বলিল—'বাঃ বেশ। আমি গান গাইতে পারি, তোমাকে গান শোনাব। তুমি আমাকে বাঁশি শোনাবে?'

মঞ্জিরার অধরে চাপা কৌতুকের হাসি খেলিয়া গেল, সে একটু ঘাড় নাড়িল।

বলরাম উৎসাহভরে বলিল—'ভাল। কাল তাহলে তুমি তোমার বাঁশি এনো। কেমন?'

মঞ্জিরা আবার ঘাড় নাড়িল।

অর্জুন আড়চোখে বলরামের পানে চাহিল। গুহার ভিতর দুইটি নর-নারীর মধ্যে পূর্বরাগের অনুবন্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহার মন উৎসুক ও প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে মঞ্জিরা খাবার লইয়া আসিল। আজ বলরাম ও অর্জুন পূর্বাহ্ণেই স্নান করিয়া প্রস্তুত ছিল। আহারে বসিয়া বলরাম বলিল—'কই, বাঁশি আনোনি?'

মঞ্জিরা কোঁচড় হইতে বাঁশি বাহির করিয়া দেখাইল। বনবেতসের এড়ো বাঁশি। বলরাম হৃষ্ট হইয়া বলিল—'এই যে বাঁশি! তা—তুমি বাজাও, আমরা খেতে খেতে শুনি।'

মঞ্জিরা নতমুখে মাথা নাড়িয়া হাসিল। বলরাম বলিল—'ও—বুঝেছি, আমি গান না গাইলে তুমি বাঁশি বাজাবে না। ভাবছ, আমি গাইতে জানি না, ফাঁকি দিয়ে তোমার বাঁশি শুনে নিতে চাই।—আচ্ছা দাঁড়াও।'

আহারান্তে বলরাম মৃদঙ্গ কোলে লইয়া বসিল। বলিল—'জয়দেব গোস্বামীর পদ গাইছি—শ্রীরাধিকার বিরহ হয়েছে, তিনি চন্দন আর চন্দ্রকিরণের নিন্দা করছেন। কর্ণাট রাগ, যতি তাল। আমার সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে পারবে?'

মঞ্জিরা উত্তর দিল না, বাঁশিটি হাতে লইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। বলরাম কয়েকবার মৃদঙ্গে মৃদু আঘাত করিয়া কলিতকণ্ঠে গান ধরিল—

'নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।—'

মঞ্জিরা বাঁশিটি অধরে রাখিয়া ফুঁ দিল। বাঁশির ক্ষীণ-মধুর ধ্বনি বসন্তের প্রজাপতির মত জয়দেবের সুরের শীর্ষে শীর্ষে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। বলরাম গান গাহিতে গাহিতে মঞ্জিরার চোখে চোখ রাখিয়া চমৎকৃত হাসি হাসিল।

'সা বিরহে তব দীনা
মাধব মনসিজ-বিশিখভয়াদিব
ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা।'

দু'জনের চক্ষু পরস্পর নিবদ্ধ, কিন্তু মন নিবদ্ধ সুরের জালে। মোহময় সুর, কুহকময় শব্দ; সঙ্গীতের স্রোতে আশ্লিষ্ট হইয়া দু'জনে একসঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে।

দুই দণ্ড পরে গান শেষ হইল।

মৃদঙ্গ নামাইয়া রাখিয়া বলরাম গদ্‌গদ স্বরে বলিল—'ধন্য! তুমি এত ভাল বাঁশি বাজাও আমি ভাবতেই পারিনি।—আমার গান কেমন শুনলে?'

মঞ্জিরা সলজ্জ স্বরে বলিল—'ভাল।'

বলরাম হঠাৎ বলিল—'ভাল কথা, তোমার খাওয়া হয়েছে?'

মঞ্জিরা মাথা নাড়িয়া বলিল—'না।'

বলরাম বিব্রত হইয়া পড়িল—'অ্যাঁ—এখনো খাওনি! গান-বাজনা পেলে বুঝি খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকে না? এ কি অন্যায় কথা? যাও যাও, খাও গিয়ে। কাল যখন আসবে খাওয়া-দাওয়া সেরে আসবে। কেমন?'

মঞ্জিরা চলিয়া যাইবার পর বলরাম শয্যা পাতিয়া শয়ন করিল, অর্জুনও নিজের শয্যা পাতিল। বলরাম কিছুক্ষণ সুপারি চর্বণ করিয়া বলিল—'মঞ্জিরা মেয়েটা ভারি সুশীলা।'

অর্জুন হাসি দমন করিয়া বলিল—'তা তো বুঝতেই পারছি।'

বলরাম সন্দিগ্ধভাবে তাহার দিকে ঘাড় ফিরাইল, বলিল—'কি করে বুঝলে?'

অর্জুন বলিল—'বাঁশি বাজাতে পারে।'

বলরাম এবার হাসিয়া উঠিল—'সে জন্যে নয়। মেয়েটার শরীরে রাগ নেই, আর খুব কম কথা কয়। যে-মেয়ে কম কথা কয় সে তো রমণীরত্ন।'

অর্জুনের মনে পড়িল বলরামের পূর্বতন স্ত্রী মুখরা ও চণ্ডী ছিল। অর্জুন শয্যায় শয়ন করিয়া বলিল—'তা বটে।'

অতঃপর মঞ্জিরা আসে যায়। দ্বিপ্রহরে বলরামের সঙ্গে দু'দণ্ড বাঁশি বাজাইয়া তৃতীয় প্রহরে ফিরিয়া যায়। রাত্রে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না, আহার শেষ হইলে পাত্রগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়। বলরামের সহিত তাহার আন্তরিক বন্ধন ঘনিষ্ঠ হইতেছে। সঙ্গীতের বন্ধন নাগপাশের বন্ধন, দু'জনকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তবু, বলরাম সাবধানী লোক, সে জানিয়া লইয়াছে যে মঞ্জিরা অনূঢ়া; পরকীয়া প্রীতি যে অতি গর্হিত কার্য তাহা তাহার অবিদিত নাই।

এইভাবে দিন কাটিতেছে। বলরাম কামানটি সম্পূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু রাজা প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত কিছু করণীয় নাই। কৃষ্ণপক্ষ কাটিয়া শুক্লপক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যার পর দুই বন্ধু গুহার বাহিরে দাঁড়াইয়া তরুণী চন্দ্রলেখার পানে চাহিয়া থাকে। চন্দ্রলেখা দিনে দিনে পরিবর্ধমানা।

একদিন এই নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্যে এক বিচিত্র অপ্রাকৃত ব্যাপার ঘটিল। দিনটা ছিল শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী কি সপ্তমী তিথি। সন্ধ্যার পর যথারীতি আহার সমাপন করিয়া বলরাম ও অর্জুন শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। মঞ্জিরা চলিয়া গিয়াছে; দীপের শিখাটি তৈলাভাবে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হইয়া আসিতেছে।

বলরাম আলস্যভরে জৃম্ভণ ত্যাগ করিয়া বলিল—'কামানটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে ঠিক হল কিনা। কাল প্রত্যূষে বেরুব।'

অর্জুন বলিল—'বেশ তো! কোথায় যাবে?'

'কোনো নির্জন স্থানে। যাতে শব্দ শোনা না যায়। আজ ঘুমিয়ে পড়। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ।'

কিন্তু নিদ্রাকর্ষণের পূর্বেই বাধা পড়িল। গুহার মুখের কাছে ধাবমান পদশব্দ শুনিয়া দু'জনেই ত্বরিতে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

গুহার রন্ধ্রমুখে ধূম্রাকার ছায়া পড়িল, একটি কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'অর্জুন ভদ্র! বলরাম ভদ্র!'

অর্জুন গলা চড়াইয়া হাঁক দিল—'কে তুমি!'

'আমি চতুর্ভুজ নায়ক।'

দু'জনে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলরাম বলিল—'চতুর্ভুজ! ভিতরে এস। কী সমাচার?'

প্রহরী চতুর্ভুজ তখন গুহায় প্রবেশ করিয়া আলোকচক্রের মধ্যে দাঁড়াইল। দেখা গেল তাহার চক্ষু ভয়ে গোলাকৃতি হইয়াছে, দাড়িগোঁফ রোমাঞ্চিত। সে থরথর স্বরে বলিল—'হুক্ক-বুক্ক!'

'হুক্ক-বুক্ক ! সে কাকে বলে ?'

চতুর্ভুজ তখন স্খলিত স্বরে যথাসাধ্য বুঝাইয়া বলিল। রাজবংশের প্রবর্তক হরিহর ও বুক্কের প্রেতাত্মা দেখা দিয়াছেন। তাঁহারা গুহার বাহিরে অনতিদূরে পদচারণ করিতেছেন। চতুর্ভুজ প্রথমে তাঁহাদের মানুষ মনে করিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা মানুষ নয়, প্রেত ; চতুর্ভুজের সম্বোধন অগ্রাহ্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

শুনিয়া অর্জুন লাঠি দু'টি হাতে লইল, বলিল—'চল দেখি।'

চতুর্ভুজ মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—'আমি আর যাব না ! তোমরা যাও।'

দুই বন্ধু গুহা হইতে বাহির হইয়া এদিক-ওদিক চাহিল। চন্দ্র এখনো অস্ত যায় নাই, জ্যোৎস্না-বাষ্পে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। কিন্তু মানুষ কোথাও দেখা গেল না। তাহারা তখন আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের পাশে দাঁড়াইল।

হাঁ, সরোবরের দিক হইতে দুইজন লোক আসিতেছে। এখনো দর্শকদের নিকট হইতে প্রায় শত হস্ত দূরে আছে। একজন দীর্ঘকায় ও কৃশ, অন্য ব্যক্তি খর্ব ও গজস্কন্ধ ; জ্যোৎস্নালোকে তাহাদের মুখাবয়ব দেখা যাইতেছে না। তাহারা যেন প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত কোনো গোপনীয় কথা আলোচনা করিতেছে।

অর্জুন ও বলরামের মাথার উপর দিয়া একটা পেচক গম্ভীর শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। বলরাম নিঃশব্দে অর্জুনের হাত ধরিয়া প্রস্তরস্তূপের আড়ালে টানিয়া লইল।

দুই মূর্তি অগ্রসর হইতেছে। অর্জুন ও বলরাম পাথরের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, যুগলমূর্তি তাহাদের বিশ হাত দূর দিয়া রাজসভার দিকে চলিয়া যাইতেছে। এখনো তাহাদের অবয়ব অস্পষ্ট ; মানুষ বলিয়া চেনা যায় কিন্তু মুখ-চোখ দেখা যায় না।

অর্জুন বলরামকে ইঙ্গিত করিল, দুইজনে আড়াল হইতে বাহির হইয়া সমস্বরে তর্জন করিল—'কে যায় ? দাঁড়াও।'

মূর্তিযুগল দাঁড়াইল ; তাহাদের দেহভঙ্গিতে বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ পাইল। তারপর, বুদ্বুদ যেমন ফাটিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি তাহারা শূন্যে মিলাইয়া গেল।

অর্জুন ও বলরাম দৃষ্টি বিনিময় করিল। বলরাম অধর লেহন করিয়া বলিল—'যা দেখবার দেখেছি। চল, গুহায় ফিরি।'

গুহার ভিতরে চতুর্ভুজ জড়সড়ভাবে বসিয়া ছিল ; প্রদীপটি নিব-নিব হইয়াছিল। বলরাম প্রদীপে তৈল ঢালিল, প্রদীপ আবার উজ্জ্বল হইল।

চতুর্ভুজ বায়সের ন্যায় বিকৃত কণ্ঠে বলিল—'দেখলে ?'

বলরাম শয্যায় উপবেশন করিয়া বলিল—'দেখলাম। চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। —কিন্তু ওরা যে হুক্ক-বুক্কের প্রেতাত্মা তা তুমি জানলে কি করে ?'

চতুর্ভুজ শয্যার পাশে আসিয়া বসিল, বলিল—'গল্প শুনেছি। হরিহর ছিলেন লম্বা রোগা, আর বুক্ক ছিলেন বেঁটে মোটা। ওঁরা মাঝে মাঝে দেখা দেন, অনেকে দেখেছে। রাজ্যের যখন কোনো গুরুতর বিপদ উপস্থিত হয় তখন ওঁরা দেখা দেন।'

দুই বন্ধু উদ্বিগ্ন চক্ষে চাহিয়া রহিল। গুরুতর বিপদ ! কী বিপদ ! তুঙ্গভদ্রার পরপারে মূর্তিমান বিপদ বুভুক্ষু শার্দূলের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই বিপদ ! কিংবা অন্য কিছু ?

চতুর্ভুজের কথায় তাহাদের চিন্তাজাল ছিন্ন হইল—'আজ রাত্রে আমি গুহার মধ্যে থেকেই পাহারা দেব। কি বল ?'

বলরাম কহিল—'সেই ভাল। তুমি আমাদের পাহারা দেবে, আমরা তোমাকে পাহারা দেব।'

চার

মহারাজ দেবরায় সৈন্য পরিদর্শনে যাত্রা করিবার পর সভাগৃহের দ্বিতলের গৌরব গরিমা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। দুই রাজকন্যা পরিচারিকা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। পিঙ্গলা নাই, রাজার সঙ্গে গিয়াছে। বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার মানসিক অবস্থা খুবই করুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

দুই ভগিনীর মনঃকষ্টের কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মণিকঙ্কণা কাতর হইয়াছে রাজার বিরহে ; প্রভাতে উঠিয়া সে আর রাজার দর্শন পায় না, আড়াল হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায় না। সে ক্ষিণ্ণ মনে এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায় ; কখনো চুপি চুপি রাজার বিরামকক্ষে যায়, পালঙ্কের পাশে বসিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে। তারপর যখন গৃহ অসহ্য হইয়া ওঠে তখন দেবী পদ্মালয়ার ভবনে যায় ; সেখানে বালক মল্লিকার্জুনের সঙ্গে কিয়ৎকাল খেলা করিয়া ফিরিয়া আসে। সে লক্ষ্য করে রাজার অবর্তমানে পদ্মালয়ার অবিচল প্রসন্নতা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সে মনে মনে বিস্মিত হয়। এরা কেমন মানুষ !

বিদ্যুন্মালার সমস্যা অন্য প্রকার। বস্তুত তাঁহার সমস্যা একটা নয়, অনেকগুলা সমস্যার সূত্র একসঙ্গে জট পাকাইয়া গিয়াছে।

বিদ্যুন্মালা যাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য বিজয়নগরে আসিয়াছেন সেই দেবরায়ের প্রতি তিনি প্রীতিমতী নন ; যাহার প্রতি তাঁহার মন আসক্ত হইয়াছে সে রাজা নয়, রাজপুত্র নয়, অতি সামান্য যুবক। তাহার সহিত রাজপুত্রীর বিবাহের কথা কেহ ভাবিতেই পারে না।

পূর্বে অর্জুনের সহিত বিদ্যুন্মালার প্রায় প্রত্যহ দেখা হইত। দশ দিন আগে দ্বিতলের বাতায়নে দাঁড়াইয়া বিদ্যুন্মালা চকিতের ন্যায় অর্জুনকে অশ্বারোহণে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। তারপর আর তিনি অর্জুনকে দেখেন নাই; শুনিয়াছিলেন অর্জুন দৌত্যকার্যে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়াছে। তারপর সে কোথায় গেল ? বিদ্যুন্মালা প্রত্যহ অতিথিশালার সম্মুখ দিয়া পম্পাপতির মন্দিরে যান, কিন্তু অর্জুনের দেখা পান না। কি হইল তাহার ? দাসীদের প্রশ্ন করিতে শঙ্কা হয়, পাছে তাহারা সন্দেহ করে। তিনি অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছেন।

বিবাহ তিন মাস পিছাইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তিন মাস কতটুকু সময় ? একটি একটি করিয়া দিন যাইতেছে আর মেয়াদের কাল ফুরাইয়া আসিতেছে। সময় যে যুগপৎ এমন দ্রুত ও মন্থর হইতে পারে তাহা কে জানিত ? ভাবিয়া ভাবিয়া রাজকুমারীর দেহ কৃশ হইয়াছে, চোখে একটা অস্বাভাবিক প্রখর দৃষ্টি। জালবদ্ধা কুরঙ্গী বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

একদিন সূর্যাস্ত কালে বিদ্যুন্মালা নিজ শয্যায় অর্ধশয়ান হইয়া দুর্ভাবনার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। মণিকঙ্কণা কক্ষে নাই, বোধ করি নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাজার বিরামকক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটি দাসী ভূমিতলে বসিয়া কুমারীদের পরিধেয় বস্ত্র ঊর্মি করিতেছিল, কুমারীরা সান্ধ্য-স্নান করিয়া পরিধান করিবেন।

সূর্যাস্ত হইলে কক্ষের অভ্যন্তর ছায়াচ্ছন্ন হইল। বিদ্যুন্মালার দেহ সহসা অসহ্য অধীরতায় ছটফট করিয়া উঠিল। তিনি শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া ডাকিলেন—'ভদ্রা !'

দাসী কাপড় চুনট্ করিতে করিতে জিজ্ঞাসু মুখ তুলিল—'আজ্ঞা রাজকুমারি।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'ঘরে আর তিষ্ঠতে পারছি না। চল, নীচে খোলা জায়গায় বেড়িয়ে আসি।'

ভদ্রা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'তাহলে প্রতিহারিণীদের বলি। আপনি সন্ধ্যাস্নান সেরে বেশ পরিবর্তন করুন।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'না না, প্রতিহারিণীদের প্রয়োজন নেই, কেবল তুমি সঙ্গে থাকবে। ফিরে এসে বেশ পরিবর্তন করব।'

'যে আজ্ঞা রাজকুমারি।'

ভদ্রাকে লইয়া বিদ্যুন্মালা নীচে নামিলেন। সোপানের প্রতিহারিণীরা একবার সপ্রশ্ন ভ্রূ তুলিল, ভদ্রা দক্ষিণ হস্তের ঈষৎ ইঙ্গিত করিল। রাজকুমারীরা বন্দিনী নন, কেহ বাধা দিল না।

প্রাঙ্গণে নামিয়া বিদ্যুন্মালা এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কেবল উত্তরদিকে পম্পাপতির মন্দিরের পথ তাঁহার পরিচিত। তিনি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—'ওদিকে কী আছে?'

ভদ্রা বলিল—'ওদিকে কমলা সরোবর।'

'চল।'—বিদ্যুন্মালা সেই দিকে চলিলেন।

চলিতে চলিতে ভদ্রা বলিল—'কমলা সরোবর এখান থেকে অনেকটা দূর, প্রায় অর্ধ ক্রোশ। অত দূর কি যেতে পারবেন রাজকুমারি।'

বিদ্যুন্মালা উত্তর দিলেন না, ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে চলিলেন; কিন্তু তাঁহার মন অন্তর্নিহিত হইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় লোকজন বেশি নাই; যে দু'চারটি পৌরজন সম্মুখে পড়িল তাহারা কলিঙ্গ-কুমারীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া গেল।

খানিক দূর গিয়া রাজকুমারী অনুভব করিলেন, পথ কঙ্করময় হইয়াছে, অদূরে একটি নীচু পাহাড়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওটা কি?'

ভদ্রা বলিল—'ওটা একটা পাহাড় রাজকুমারি। ওর মধ্যে গুহা আছে। লোকে বলে—সঙ্কেত-গুহা।' ভদ্রার ঠোঁটের কোণে একটু চাপা হাসি দেখা দিল। সঙ্কেত-গুহার পরিচয় পুরস্ত্রীরা সকলেই জানে।

রাজকুমারী গুহা সম্বন্ধে আর কোনো ঔৎসুক্য দেখাইলেন না, আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কমলা সরোবর এখনও দূরে। তিনি ফিরিলেন। এই ভ্রমণের ফলে বিক্ষিপ্ত মন ঈষৎ শান্ত হইল।

পরদিন সায়ংকালে বিদ্যুন্মালা ভদ্রাকে বলিলেন—'আমি আজও একটু ঘুরে-ফিরে আসি। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে না।' ভদ্রার মুখে অব্যক্ত আপত্তি দেখিয়া বলিলেন—'ভয় নেই, আমি হারিয়ে যাব না, পথ চিনে আসতে পারব।'

ভদ্রা আর কিছু বলিতে পারিল না। বিদ্যুন্মালা নীচে নামিয়া কাল যেদিকে গিয়াছিলেন সেইদিকে চলিলেন। পরিচিত পথে চলাই ভাল; অপরিচিত পথ কিরূপ কণ্টকাকীর্ণ তাহা রাজকন্যা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আকাশে সূর্যাস্তের বর্ণলীলা শেষ হইয়াছে, চাঁদের কিরণ পরিস্ফুট হয় নাই। বিদ্যুন্মালা নীচু পাহাড়টা পাশে রাখিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ফিরি-ফিরি করিতেছেন, এমন সময় পিছন দিক হইতে কে বলিল—'রাজকুমারি! আপনি এখানে!'

বিদ্যুন্মালা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন গুহার দিক হইতে দ্রুতপদে আসিতেছে— অর্জুন। তাহার মুখে বিস্ময়বিমূঢ় হাসি।

অর্জুন বিদ্যুন্মালার সম্মুখে যুক্তকরে দাঁড়াইল, বলিল—'আপনি একা এতদূর এসেছেন!'

বিদ্যুন্মালা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর কোনো কথা না বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। উদ্বেগের সঞ্চিত বাষ্প অশ্রুর আকারে বাহির হইয়া আসিল।

অর্জুন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, নির্বাক সশঙ্ক মুখে বিদ্যুন্মালার পানে চাহিয়া রহিল।

বিদ্যুন্মালা চোখ মুছিলেন না, গলদশ্রু নেত্রে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিলেন—'আগে রোজ

সকালে আপনাকে দেখতাম, আজকাল দেখতে পাই না কেন ?'

অর্জুন হৃদয়ের মধ্যে একটা চমক অনুভব করিল। রাজকুমারী এ কী বলিতেছেন ! কিন্তু না, ইহা সাধারণ কুশলপ্রশ্ন মাত্র। অশ্রুজলেরও হয়তো একটা কারণ আছে ; রমণীর অশ্রুপাতের কারণ কে কবে নির্ণয় করিতে পারিয়াছে ? অর্জুন আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—'আমি এখন আর অতিথি-ভবনে থাকি না। রাজা আমাকে কাজ দিয়েছেন। আমি আমার বন্ধু বলরামের সঙ্গে ওই গুহায় থাকি।'

বিদ্যুন্মালা এবার চোখ মুছিলেন, ঘাড় ফিরাইয়া গুহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'গুহায় থাকেন ! গুহায় থাকেন কেন ?'

অর্জুন বলিল—'তা জানি না। রাজার আদেশ।—আপনি ভাল আছেন ?'

বিদ্যুন্মালার অধরে একটু ম্লান হাসি খেলিয়া গেল—'ভাল ! হাঁ, ভালই আছি। আপনি তো লাঠি চড়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

অর্জুন বিস্মিত হইয়া বলিল—'আপনি জানলেন কি করে ? ও—আমি বোধহয় আপনাকে লাঠি চড়ার কথা বলেছিলাম। হাঁ, রাজা আমাকে দূতকার্যে পাঠিয়েছিলেন।'

কিছুক্ষণ দু'জনে নীরব, যেন উভয়েরই কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। শেষে অর্জুন বলিল—'সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'না, আমি একা যেতে পারব। কাল এই সময় আপনি এখানে থাকবেন, আমি আসব।'

বিদ্যুন্মালা চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে কয়েকবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। অর্জুন দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর রাজকন্যা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলে অশান্ত শঙ্কিত মনে গুহায় ফিরিল।

বিদ্যুন্মালার একটি রাত্রি এবং একটি দিন দুঃসহ অধীরতার মধ্যে কাটিল। কিন্তু তিনি মন স্থির করিয়া লইয়াছেন : বায়ুতাড়িত হালভাঙ্গা নৌকায় ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইলে কোনো ফল হইবে না ; নৌকা ছাড়িয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তীরের দিকে যাইতে হইবে। এবার অগাধ জলে সাঁতার।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বিদ্যুন্মালা গুহার অভিমুখে গেলেন। মণিবন্ধে একটি মল্লীফুলের মালা জড়ানো। আজ আর কান্নাকাটি নয়, প্রগল্‌ভ চটুলতা। অর্জুনের হৃদয় এখনো প্রেমহীন ; নারীর তূণীরে যত বাণ আছে সমস্ত প্রয়োগ করিয়া অর্জুনের হৃদয় জয় করিয়া লইতে হইবে।

অর্জুন অপেক্ষা করিতেছিল, যে পাষাণস্তূপের পাশে দাঁড়াইয়া হুক্ক-বুক্কের প্রেতাত্মা দর্শন করিয়াছিল সেই পাষাণস্তূপে ঠেস দিয়া পথের দিকে চাহিয়া ছিল। বিদ্যুন্মালা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। অর্জুন খাড়া হইয়া দুই কর যুক্ত করিল।

বিদ্যুন্মালা হাসিলেন। গোধূলির আলোকে এই হাসির বিদ্যুদ্দীপ্তি যেন অর্জুনের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিল। সে দেখিতে পাইল না যে হাসির পিছনে অনেকখানি কান্না, অনেকখানি ভয় লাগিয়া আছে।

রাজকন্যা বলিলেন—'এদিকটা বেশ নিরিবিলি। তবু স্তম্ভের আড়ালে যাওয়াই ভাল।'

তিনি আগে আগে চলিলেন, অর্জুন নীরবে তাঁহার অনুগামী হইল। দু'জনে স্তম্ভপাষাণের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। এখানে কাহারো চোখে পড়িবার আশঙ্কা নাই।

বিদ্যুন্মালা অর্জুনের একটু কাছে সরিয়া আসিলেন, একটু ভঙ্গুর হাসিয়া বলিলেন—'অর্জুন ভদ্র, আবার আপনার বিপদ উপস্থিত হয়েছে।'

বিদ্যুন্মালার মুখে এমন কিছু ছিল যাহা দেখিয়া অর্জুনের বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল, সে

ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—'বিপদ !'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'হাঁ, গুরুতর বিপদ। একবার যাকে নদী থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তাকে আবার উদ্ধার করতে হবে।'

অর্জুন মূঢ়ের ন্যায় পুনরাবৃত্তি করিল—'উদ্ধার !'

বিদ্যুন্মালা অর্জুনের মুখ পর্যন্ত চক্ষু তুলিয়া আবার বক্ষ পর্যন্ত নত করিলেন ; অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'হাঁ, উদ্ধার। আমাকে উদ্ধার করতে হবে। এখনো বুঝতে পারছেন না ?'

অসহায়ভাবে মাথা নাড়িয়া অর্জুন বলিল—'না।'

'তবে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

বিদ্যুন্মালা মল্লীমালিকাটি মণিবন্ধ হইতে পাকে পাকে খুলিয়া দুই হাতে ধরিলেন, তারপর অর্জুন কিছু বুঝিবার পূর্বেই মালিকাটি তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন।

অর্জুন ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিল—'রাজকুমারি, এ কি করলেন ?'

থরথর কম্পিত অধরে হাসি আনিয়া বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'স্বয়ংবরা হলাম।'

তিনি একটি পাষাণ-পট্টের উপর বসিয়া পড়িলেন। প্রগল্‌ভতা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তাই এইটুকু অভিনয় করিয়া তাঁহার দেহমনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

অর্জুন আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল ; ব্যাকুল চক্ষে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অলক্ষিত আকাশে আলো মৃদু হইয়া আসিতেছে।

অর্জুন মিনতির স্বরে বলিল—'রাজকুমারি, আপনি ক্ষণিক বিভ্রমে ভুল করে ফেলেছেন। আপনার মালা ফিরিয়ে নিন। আমি প্রাণান্তেও কাউকে কিছু বলব না।'

বিদ্যুন্মালা আকাশের পানে চাহিলেন, মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'আর তা হয় না। কিন্তু আজ আমি যাই, অন্ধকার হয়ে গেছে। কাল আবার আসব। কাল কিন্তু আর তোমাকে 'আপনি' বলতে পারব না ; তুমিও আমাকে 'তুমি' বলবে।'

ছায়ার ন্যায় বিদ্যুন্মালা অন্তর্হিতা হইলেন।

অর্জুন গুহায় ফিরিল। মঞ্জিরা এখনো খাদ্য লইয়া আসে নাই। বলরাম প্রদীপ জ্বালিয়া মৃদঙ্গ লইয়া বসিয়াছে, আপন মনে গান ধরিয়াছে—

ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্।

অর্জুন গলা হইতে মালা খুলিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইয়াছিল ; বলরাম মালা দেখিয়া গান থামাইল ; বলিল—'মালা কোথায় পেলে ? পান-সুপারি বাজারে গিয়েছিলে নাকি ?'

অর্জুন একটু স্থির থাকিয়া বলিল—'না, একটি মেয়ে দিয়েছে।'

বলরাম উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল—'আরে বাঃ ! তুমিও একটি মেয়ে জুটিয়ে ফেলেছ ! বেশ বেশ। তা—কে মেয়েটি ? রাজপুরীর পুরন্ধ্রী নিশ্চয়।'

অর্জুন বলিল—'হাঁ, রাজপুরীর পুরন্ধ্রী। কিন্তু নাম বলতে নিষেধ আছে।'

এই সময় নৈশাহারের পাত্র মাথায় লইয়া মঞ্জিরা উপস্থিত হইল। মালার প্রসঙ্গ স্থগিত হইল।

সে-রাতে অর্জুন শয্যায় শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল। গভীর দুঃখ ও বিজয়োল্লাস একসঙ্গে অনুভব করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এরূপ অভাবনীয় ব্যাপার তাহার জীবনে কেন ঘটিল ! বিদ্যুন্মালাকে সে দেখিয়াছে শ্রদ্ধার চোখে, সম্ভ্রমের চোখে। কিন্তু তিনি মনে মনে

তাহাকে কামনা করিয়াছেন। তিনি রাজকন্যা, রাজার বাগ্‌দত্তা বধূ ; আর অর্জুন অতি সামান্য মানুষ। কী করিয়া ইহা সম্ভব হইল। তারপর—এখন কী হইবে ? ইহার পরিণাম কোথায় ? যেভাবে বলরাম মঞ্জিরাকে ভালবাসে সেভাবে অর্জুন বিদ্যুন্মালাকে ভালবাসে না। সম্ভ্রম ও পদমর্যাদার বিপুল ব্যবধান তাহাদের মাঝখানে। তাহাদের মধ্যে যে কোনপ্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিতে পারে ইহা তাহার কল্পনার অতীত। উপরন্তু সে রাজার ভৃত্য, রাজার বাগ্‌দত্তা বধূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে কোন্‌ স্পর্ধায় !

উত্তপ্ত মস্তিষ্কের অসংযত দিগ্‌ভ্রান্ত চিন্তা নিষ্পন্ন হইবার পূর্বেই অর্জুন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিল শেষ রাত্রে। মল্লীমালার ম্রিয়মাণ গন্ধ তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল।

মালাটি তাহার বুকের কাছে ছিল। সে তাহা মুষ্টিতে লইয়া একবার সজোরে পেষণ করিল, তারপর দূরে সরাইয়া রাখিল। যাহাতে ওই গন্ধ নাকে না আসে।

কিন্তু ঘুম আর আসিল না। মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তা-উর্ণনাভ জাল বুনিতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সন্ধ্যাকালে পাথরের আড়ালে অর্জুন ও বিদ্যুন্মালার নিম্নরূপ কথোপকথন হইল :

অর্জুন বলিল—'তুমি রাজকন্যা। আমি সামান্য মানুষ।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'তুমি সামান্য মানুষ নও। তুমি যদুকুলোদ্ভব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার পূর্বপুরুষ।'

বিদ্যুন্মালা বেদীর মত একটি প্রস্তরখণ্ডে রাজেন্দ্রাণীর ন্যায় বসিয়াছেন, অর্জুন তাঁহার সম্মুখে সমতল ভূমিতে পিছনে পা মুড়িয়া উপবিষ্ট। বিদ্যুন্মালার চক্ষু অর্জুনের মুখের উপর নিশ্চলভাবে নিবদ্ধ। তিনি যেন জীবন বাজি রাখিয়া পাশা খেলিতেছেন। অর্জুনের দৃষ্টি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত এদিক-ওদিক ছটফট করিয়া ফিরিতেছে।

অর্জুন বলিল—'তুমি মহারাজ দেবরায়ের বাগ্‌দত্তা।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আমি কাউকে বাগ্‌দান করিনি। রাজায় রাজায় রাজনৈতিক চুক্তি হয়েছে, আমি কেন তার দ্বারা আবদ্ধ হব ?'

'তোমার পিতা তোমাকে দান করেছেন।'

'আমি কি পিতার তৈজস ? আমার কি স্বতন্ত্র সত্তা নেই !'

'শাস্ত্রে বলে স্ত্রীজাতি কখনো স্বাতন্ত্র্য পায় না।'

'ও শাস্ত্র আমি মানি না। আমার হৃদয় আমি যাকে ইচ্ছা দান করব।'

'তুমি অপাত্রে হৃদয় দান করেছ।'

'ও কথা আগে হয়ে গেছে। তুমি অপাত্র নও।'

অর্জুন কিছুক্ষণ নতমুখে রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল—'আমার দিক থেকে কথাটা চিন্তা করে দেখেছ ?'

বিদ্যুন্মালার মুখে আষাঢ়ের মেঘ নামিয়া আসিল, চক্ষু বর্ষণ-শঙ্কিত হইল। তিনি বিদীর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—'তুমি কি আমাকে চাও না ?'

অর্জুন ক্লান্ত মস্তক বিদ্যুন্মালার জানুর উপর রাখিল, বিধুর কণ্ঠে বলিল—'চাওয়া না-চাওয়ার অবস্থা পার হয়ে গেছে। তিন দিন আগে আমি সজ্জন ছিলাম, আজ আমি কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক। রাজা আমাকে ভালবাসেন, আমাকে পরম বিশ্বাসের কাজ দিয়েছেন ; আর আমি প্রতি মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। তুমি আমার এ কী সর্বনাশ করলে ?'

বিদ্যুন্মালার মুখের মেঘ কাটিয়া গিয়া ভাস্বর আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। বিজয়িনীর আনন্দ। তিনি অর্জুনের মাথায় হাত রাখিয়া কোমল স্বরে বলিলেন—'কেন তুমি মিছে কষ্ট পাচ্ছ ! রাজা

হৃদয়বান লোক, তিনি তোমায় স্নেহ করেন, সবই সত্যি। কিন্তু তাঁর অনেক ভৃত্য-পরিচর আছে, তুমি না থাকলেও তাঁর চলবে। এবং তিনি না থাকলেও তোমার চলবে। তুমি এ দেশের অধিবাসী নও। তুমি রাজার কাজ ছেড়ে দাও। চল, আমরা চুপি চুপি এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই।'

অর্জুন চমকিয়া মুখ তুলিল, বিভ্রান্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'এ দেশ ছেড়ে চলে যাব! এই অমরাবতী ছেড়ে পালিয়ে যাব! কোথায় যাব? ম্লেচ্ছের দেশে? না, আমি পারব না।'

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুন্মালাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তাহার হাত ধরিলেন। তিনি কিছু বলিবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময় প্রস্তরস্তম্ভের অন্তরাল হইতে শব্দ শুনিয়া থমকিয়া গেলেন। অর্জুন শরীর শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শব্দটা আর কিছু নয়, মঞ্জিরা আপন মনে গানের কলি গুঞ্জরন করিতে করিতে খাবার লইয়া গুহার দিকে যাইতেছে। দুইজনে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মঞ্জিরা তাঁহাদের দেখিতে পাইল না, তাহার গানের গুঞ্জন দূরে মিলাইয়া গেল।

বিদ্যুন্মালা অর্জুনের কানে অধর স্পর্শ করিয়া চুপি চুপি বলিলেন—'আজ যাই। কাল আবার আসব।'

তিনি জ্যোৎস্না-কুহেলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অর্জুন হর্ষ-বিষাদ ভরা অন্তরে গুহায় ফিরিতে ফিরিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, কাল আর সে বিদ্যুন্মালার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রহিল না। পরদিন সে যথাকালে যথাস্থানে আবার উপস্থিত হইল। যৌবন ও বিবেকবুদ্ধির দড়ি-টানাটানি চলিতে লাগিল।

এইভাবে কয়েকদিন কাটিল। কিন্তু সমস্যার নিষ্পত্তি হইল না।

পাঁচ

মহারাজ দেবরায় সৈন্য পরিদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন কৃষ্ণ পক্ষের দশমী তিথিতে, শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে অগ্রদূত আসিয়া সংবাদ দিল, আগামী কল্য পূর্বাহ্ণে মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। রাজপুরী এই এক পক্ষকাল যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, আবার চন্‌মনে হইয়া উঠিল।

মণিকঙ্কণার হৃদয় আনন্দের হিন্দোলায় দুলিতেছে। কাল মহারাজ আসিবেন, কতদিন পরে তাঁহার দর্শন পাইব! প্রতীক্ষার উত্তেজনায় সে আত্মহারা। দিন কাটে তো রাত কাটে না।

বিদ্যুন্মালার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। রাজার অনুপস্থিতি কালে তিনি প্রবল হৃদয়বৃত্তির স্রোতে অবাধে ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, বাধাবিঘ্নগুলি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছিল; এখন বাধাবিঘ্নগুলি পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাঁহার বুক শুকাইয়া গেল। তাঁহার সঙ্কল্প তিলমাত্র বিচলিত হইল না, কিন্তু সঙ্কল্প সিদ্ধির সম্ভাবনা কঠিন নৈরাশ্যের আঘাতে ভূমিসাৎ হইল। কী হইবে! অর্জুন পলায়ন করিতে অসম্মত। তবে কি মৃত্যু ভিন্ন এ সঙ্কট হইতে উদ্ধারের অন্য পথ নাই? বিদ্যুন্মালা উপাধানে মুখ গুঁজিয়া নীরবে কাঁদিলেন, চোখের জলে উপাধান সিক্ত হইল। কিন্তু অন্ধকারে পথের দিশা মিলিল না।

অর্জুনের অবস্থা বিদ্যুন্মালার অনুরূপ হইলেও তাহার মনে অনেকখানি আত্মগ্লানি মিশ্রিত আছে। বিদ্যুন্মালাকে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু সমস্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়া

ভালবাসিয়াছে, মনের মধ্যে এমন নিবিড় প্রেমের অনুভূতি পূর্বে তাহার অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু প্রেম যত গভীরই হোক, তাহার দ্বারা অপরাধ-বোধ তো দূর হয় না। প্রেম যখন সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছে তখনো মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার ক্রিয়া চলিয়াছে—আমি রাজার সহিত কৃতঘ্নতা করিয়াছি ; যিনি আমার অন্নদাতা, যিনি আমার প্রভু, তাঁহারই সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। কেন বিদ্যুন্মালার প্রেম প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করি নাই, কেন বার বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি ? এখন কী হইবে ? রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব কেমন করিয়া ! তাঁহার চোখে চোখ রাখিয়া চাহিব কোন্ সাহসে ? তিনি যদি মুখ দেখিয়া মনের কথা বুঝিতে পারেন !...এ কথা কাহাকেও বলিবার নয়। বলরামকেও সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। বলরাম তাহার চিত্তবিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়াছে, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিয়াছে, কিন্তু সত্য উত্তর পায় নাই। সে ভাবিয়াছে অর্জুনের হৃদয় এখনো পিতৃশোকে মুহ্যমান।

এদিকের এই অবস্থা। ওদিকে কুমার কম্পন রাজার আশু প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া সর্বাঙ্গে উত্তেজনায় শিহরণ অনুভব করিলেন। সময় উপস্থিত ; আর বিলম্ব নয়। এবার গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ পাঠাইতে হইবে। যাহারা রাজার বিশ্বাসী প্রিয়পাত্র কেবল সেইসব মন্ত্রী সভাসদকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। তারপর সকলে একত্রিত হইলে রাজার সঙ্গে সকলকে একসঙ্গে নির্মূল করিতে হইবে। কবে নিমন্ত্রণ করিলে ভাল হয় ? কাল রাজা ফিরিবেন, হয়তো ক্লান্ত দেহে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিতে পারেন। সুতরাং পরশ্বই শুভদিন।

কুমার কম্পন বাছা বাছা রাজপুরুষদের নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন এবং নবনির্মিত গৃহে অতিথিসৎকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

পিতা বীরবিজয়ের কথাও কম্পন ভুলিলেন না। বুড়া তাঁহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। তাঁহার সদ্গতি করিতে হইবে।

পরদিন মধ্যাহ্নের দুই দণ্ড পূর্বে মহারাজ দেবরায় ডঙ্কা বাজাইয়া সদলবলে পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। সভাগৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে বৃহৎ জনতা অপেক্ষা করিতেছিল, তন্মধ্যে দুইজন প্রধান : কুমার কম্পন এবং ধন্নায়ক লক্ষ্মণ। সাত শত পুরপ্রহরিণী শঙ্খ বাজাইয়া তুমুল নির্ঘোষে রাজার সম্বর্ধনা করিল।

রাজা অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেই কুমার কম্পন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার জানু স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, বলিলেন—'আর্য, আপনি ছিলেন না, রাজপুরী অন্ধকার ছিল, আজ এক পক্ষ পরে আবার সূর্যোদয় হল।'

কুমার কম্পন অতিশয় মিষ্টভাষী, কিন্তু তাঁহার মুখেও কথাগুলি চাটুবাক্যের মত শুনাইল। রাজা একটু হাসিলেন, ভ্রাতার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'তোমার সংবাদ শুভ ? গৃহপ্রবেশের আর বিলম্ব কত ?'

কম্পন বলিলেন—'গৃহ প্রস্তুত ! কেবল আপনার জন্য গৃহপ্রবেশ স্থগিত রেখেছি। কাল সন্ধ্যার সময় আপনাকে আমার নূতন গৃহে পদার্পণ করতে হবে আর্য। কাল আমার গৃহপ্রবেশের শুভমুহূর্ত স্থির হয়েছে।'

রাজা বলিলেন—'তোমার নূতন গৃহে অবশ্য পদার্পণ করব।'

'ধন্য।' কম্পন আর দাঁড়াইলেন না, বেশি কথা বলিলে পাছে মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়া পড়ে তাই তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন।

রাজা তখন মন্ত্রী উপমন্ত্রী সভাসদ্ বিদেশীয় রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি সমবেত প্রধানদের দিকে ফিরিলেন। প্রত্যেককে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া কিছু সংবাদের আদান-প্রদান করিয়া বিরাম-ভবনে

প্রবেশ করিলেন।

ইতিমধ্যে পিঙ্গলা আসিয়া দ্বিতলের বিশ্রামকক্ষের তত্ত্বাবধান করিয়াছিল, পাচকেরা রান্না চড়াইয়াছিল। রাজা অত্বরিতভাবে স্নান করিলেন, তারপর ধীরে সুস্থে আহারে বসিলেন। আহার শেষ হইতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল।

রাজা পালঙ্কে অঙ্গ প্রসারিত করিলেন। পিঙ্গলা ভূমিতলে বসিয়া পান সাজিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজা অলসকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—'কলিঙ্গ-রাজকুমারীদের সংবাদ নিয়েছ?'

পিঙ্গলা বলিল—'তাঁহারা কুশলে আছেন আর্য।'

এই সময় নব জলধরে বিজুরিরেখার ন্যায় মণিকঙ্কণা কক্ষে প্রবেশ করিল; ছায়াচ্ছন্ন কক্ষটি তাহার রূপের প্রভায় প্রভাময় হইয়া উঠিল।

তাহাকে দেখিয়া মহারাজ সহাস্যমুখে শয্যায় উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিলেন; মণিকঙ্কণা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—'উঠবেন না মহারাজ, আপনি বিশ্রাম করুন। পিঙ্গলা, তুমি ওঠো, আজ আমি মহারাজকে পান সেজে দেব।'

পিঙ্গলা হাসিমুখে সরিয়া দাঁড়াইল। মণিকঙ্কণা তাহার স্থানে বসিয়া পান সাজিতে লাগিয়া গেল। রাজা পাশ ফিরিয়া অর্ধশয়ানভাবে তাহার তাম্বূল রচনা দেখিতে লাগিলেন। পিঙ্গলা স্মিতমুখে বলিল—'ধন্য রাজকুমারী! পান সাজতেও জানেন!'

মণিকঙ্কণা পর্ণপত্রে খদির লেপন করিতে করিতে বলিল—'কেন জানব না! কতবার মাতাদের পান সেজে দিয়েছি। কলিঙ্গ দেশে পানের খুব প্রচলন। তবে উপকরণে বিশেষ আছে। পানের সঙ্গে গুয়া খদির কর্পূর দারুচিনি তো থাকেই, চুয়া কেয়া-খদির নারঙ্গফুলের ত্বক্‌, কেশর প্রভৃতিও থাকে।—এই নিন মহারাজ।'

মণিকঙ্কণা উঠিয়া পানের তবক রাজার সম্মুখে ধরিল; তিনি সেটি মুখে দিয়া কিছুক্ষণ চিবাইলেন, তারপর বলিলেন—'চমৎকার পান! তুমি এত ভাল পান সাজতে পার জানলে আগেই তোমার শরণ নিতাম। কাল থেকে তুমি নিত্য দ্বিপ্রহরে এসে আমার পান সেজে দেবে।'

মণিকঙ্কণা কৃতার্থ হইয়া বলিল—'তাই দেব মহারাজ। আমাদের সঙ্গে কিছু কলিঙ্গদেশীয় পানের উপকরণ আছে, তাই দিয়ে পান সেজে দেব।'

সে আবার পানের বাটা লইয়া বসিতে যাইতেছিল, এমন সময় নিঃশব্দপদে ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ প্রবেশ করিলেন। মণিকঙ্কণা বলিল—'ওমা, মন্ত্রীমশায় এলেন! এবার বুঝি রাজকার্য হবে। আমি তাহলে যাই।' রাজার প্রতি দীর্ঘ বিলম্বিত দৃষ্টি সম্পাত করিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মন্ত্রী পালঙ্কের শিয়রের দিকে ভূমিতলে বসিলেন। পিঙ্গলা তাম্বূলকরঙ্ক তাঁহার দিকে আগাইয়া দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। রাজার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পর সে এখনো পলকের জন্য বিশ্রাম পায় নাই।

রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপ আরম্ভ হইল। মন্ত্রী মহাশয়ের নিবেদন করিবার বিশেষ কিছু ছিল না, তিনি সংক্ষেপে রাজ্য সম্বন্ধীয় বক্তব্য শেষ করিয়া বলিলেন—'একটা সংবাদ আছে; হুক্ক-বুক্কর প্রেতাত্মা দেখা দিয়েছে।'

রাজা শয্যায় উঠিয়া বসিলেন—'হুক্ক-বুক্ক দেখা দিয়েছেন? কে দেখেছে?'

মন্ত্রী বলিলেন—'অর্জুন ও বলরামের গুহা পাহারা দেবার জন্য যাদের নিয়োগ করেছিলাম, তাদের মধ্যে একজন দেখেছে। অর্জুন ও বলরামও দেখেছে।'

'হুঁ।' মহারাজ কর্ণের মণিকুণ্ডল অঙ্গুলিতে ধরিয়া একটু নাড়াচাড়া করিলেন—'অনেক দিন পরে হুক্ক-বুক্ক দেখা দিলেন। সেই আহমদ শা সুলতান হয়ে যখন বিজয়নগর আক্রমণ করেছিল

তার আগে দেখা দিয়েছিলেন ! আশঙ্কা হয়, দারুণ বিপদ আসন্ন। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসবে বুঝতে পারছি না।'

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—'সীমান্তের অবস্থা কেমন দেখলেন ?'

রাজা বলিলেন—'শত্রুর তৎপরতার কোনো চিহ্ন পেলাম না। আমার সীমান্তরক্ষী সেনাদল একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল, আমাকে দেখে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।'

মন্ত্রী কিছুক্ষণ কুচকুচ করিয়া সুপারি কাটিলেন, তারপর নিজের জন্য পান সাজিতে সাজিতে বলিলেন—'কুমার কম্পন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে বাছা বাছা কয়েকজন সদস্যকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছি। আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।'

'কী ভাল লাগছে না ?'

'এই নিমন্ত্রণের ভাবভঙ্গি। সন্দেহ হচ্ছে কুমার কম্পনের কোনো প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি আছে। যে দ্বাদশ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেছেন তাদের কারুর সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা নেই।'

'কিন্তু—প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি কী থাকতে পারে ?'

'তা জানি না। মহারাজ, আপনিও নিমন্ত্রিত, আমার মনে হয় আপনার না যাওয়াই ভাল।'

রাজার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল, তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—'কম্পন আমাকে ভালবাসে, সে আমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে, আমি ভাবতেও পারি না। তাছাড়া আমার অনিষ্ট করবার ক্ষমতা তার নেই।—আপনিও তো নিমন্ত্রিত হয়েছেন, আপনি কি যাবেন না ?'

মন্ত্রী পান মুখে দিয়া বলিলেন—'না মহারাজ, আমি যাব না। হুক্ক-বুক্ক দেখা দিয়েছেন, এ সময় আমাদের সকলেরই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই দ্বাররক্ষিণী আসিয়া জানাইল, অর্জুনবর্মা ও বলরাম রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রাজার অনুমতি পাইয়া দুইজনে আসিয়া পালঙ্কের পদপ্রান্তে বসিল। অর্জুন রাজার মুখের দিকে একবার চক্ষু তুলিয়াই চক্ষু নত করিল। বলরাম যুক্তকরে বলিল—'আর্য, কামান তৈরি হয়েছে। সঙ্গে এনেছিলাম, প্রহরিণীর কাছে গচ্ছিত আছে।'

রাজা প্রহরিণীকে ডাকিয়া কামান আনিতে বলিলেন। কামান আসিলে প্রহরিণীকে বলিলেন—'বলরাম বা অর্জুন যদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমার কাছে আসতে চায়, তাদের বাধা দিও না।'

প্রহরিণী প্রস্থান করিলে বলরাম উঠিয়া কামান রাজার হাতে দিল। একহস্ত পরিমাণ যন্ত্রটি, দেখিতে অনেকটা বক-যন্ত্রের মত। রাজা সেটিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া মন্ত্রীর হাতে দিলেন, বলিলেন—'যন্ত্রের প্রক্রিয়া বুঝেছি। যন্ত্র চালিয়ে দেখেছ ?'

বলরাম বলিল—'আজ্ঞা দেখেছি, ঠিক চলে। অর্জুন আর আমি একদিন বনের মধ্যে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। পঞ্চাশ হাত দূর পর্যন্ত প্রাণঘাতী লক্ষ্যভেদ করতে পারে।'

রাজা বলিলেন—'ভাল, আমিও পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কাল প্রত্যূষে তোমরা আসবে, দক্ষিণের জঙ্গলে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার জন্য কি কি বস্তু প্রয়োজন ?'

বলরাম বলিল—'বেশি কিছু নয় আর্য, গোটা তিনেক মাটির কলসী হলেই চলবে। বাকি যা কিছু—গুলি বারুদ কার্পাসবস্ত্র, নারিকেল-রজ্জু—আমি নিয়ে আসব।'

রাজা প্রশ্ন করিলেন—'লৌহ-নালিকা প্রস্তুতের কৌশল প্রকাশ করতে চাও না ?'

বলরাম আবার যুক্তপাণি হইল—'মহারাজ, এটি আমার নিজস্ব গুপ্তবিদ্যা। যদি উপযুক্ত শিষ্য পাই তাকে শেখাব।'

'ভাল। তুমি একা এই লঘু কামান কত তৈয়ার করতে পার ?'

'মাসে তিনটা তৈয়ার করতে পারব।'

রাজা ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'তবে তোমার গুপ্তবিদ্যা গুপ্তই থাক। অন্তত শত্রুপক্ষ জানতে পারবে না।'

পরদিন উষাকালে রাজা বলরাম ও অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণের জঙ্গলে উপস্থিত হইলেন। জঙ্গল নামমাত্র, রৌদ্রদগ্ধ শুষ্ক গাছপালার ফাঁকে শিলাকীর্ণ অসম ভূমি। তিনটি মৃৎকলস পাশাপাশি বসাইয়া বলরাম কলস হইতে পঞ্চাশ হাত দূরে সরিয়া আসিয়া লক্ষ্যভেদের জন্য প্রস্তুত হইল।

প্রথমে সে কামানটির নলের মুখ দিয়া অর্ধমুষ্টি বারুদ প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া ক্ষুদ্র একখণ্ড কার্পাস নলের মুখে ঠাসিয়া দিল; কামানের পশ্চাদ্ভাগে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে একটু বারুদের গুঁড়া দেখা গেল। তখন সে নলের মুখে মটরের মত কয়েকটি লৌহ-গুটিকা প্রবিষ্ট করাইয়া আবার কার্পাসখণ্ড দিয়া মুখ বন্ধ করিল। বলিল—'মহারাজ, কামান তৈরি। এখন আগুন দিলেই গুলি বেরুবে।'

রাজা বলিলেন—'দাও আগুন।'

বলরাম একটি অগ্নিমুখ নারিকেল-রজ্জু সঙ্গে আনিয়াছিল, সে কলসীর দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া কামানের পিছন দিকে অগ্নিস্পর্শ করিল। অমনি সশব্দে কামান হইতে গুলি বাহির হইয়া পঞ্চাশ হাত দূরের তিনটি কলস চূর্ণ করিয়া দিল।

রাজা সহর্ষে বলরামের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'ধন্য! আজ থেকে অর্জুনের মত তুমিও আমার ভৃত্য হলে।—এই লঘু কামান আমি নিলাম।'

ছয়

সন্ধ্যার পর কুমার কম্পনের নূতন প্রাসাদ দীপমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। প্রাসাদের তোরণশীর্ষে একদল বাদ্যকর মধুর বাদ্যধ্বনি করিতেছিল। গৃহপ্রবেশের শুভমুহূর্ত সমাগত।

প্রাসাদে এখনো পুরস্ত্রীগণের শুভাগমন হয় নাই। কেবল কয়েকজন ষণ্ডামার্ক ভৃত্য আছে; আর আছে স্বয়ং কুমার কম্পন।

অতিথিরা একে একে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় বেশি নয়, মাত্র দ্বাদশ জন।

কুমার কম্পন পরম সমাদরের সহিত সকলকে গোষ্ঠাগারে বসাইলেন। তাঁহার মুখের অম্লান হাসির উপর মনের আরক্ত ছায়া পড়িল না।

দ্বাদশজন সমবেত হইলে কুমার কম্পন বলিলেন—'আমি মানস করেছি আমার গৃহের প্রত্যেকটি কক্ষে একটি করে অতিথিকে ভোজন করাব। তাহলে আমার সমস্ত গৃহ পবিত্র হবে।'

অতিথিরা হর্ষ জ্ঞাপন করিলেন। কুমার কম্পন একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'জীমূতবাহন ভদ্র, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনি আগে আসুন।'

বয়োজ্যেষ্ঠ জীমূতবাহন ভদ্র গাত্রোত্থান করিয়া কুমার কম্পনের অনুসরণ করিলেন। বাকি সকলে বসিয়া নিজ নিজ বয়সের তুলনামূলক আলোচনা করিতে লাগিলেন।

কুমার কম্পন অতিথিকে একটি কক্ষে লইয়া গেলেন। বহু দীপের আলোকে কক্ষটি প্রভান্বিত, শঙ্খশুভ্র কুট্টিমের উপর শ্বেতপ্রস্তরের পীঠিকা, পীঠিকার সম্মুখে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনপরিপূর্ণ থালি। দুইজন ভৃত্য অদূরে দাঁড়াইয়া আছে, একজনের হাতে ভৃঙ্গার ও পানপাত্র, অন্য ভৃত্য চামর লইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

কুমার কম্পন অতিথিকে বলিলেন—'আসন গ্রহণ করুন ভদ্র।'

ভদ্র পীঠিকায় উপবিষ্ট হইলেন। কুমার কম্পন বলিলেন—'অগ্রে ফলাম্লরস পান করুন ভদ্র।'

ভৃত্য পানপাত্রে পানীয় ঢালিয়া ভদ্রের হাতে দিল, ভদ্র পানপাত্র মুখে দিয়া এক নিশ্বাসে পান করিলেন। পাত্র ভৃত্যের হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া তিনি ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে পাশের দিকে ঢলিয়া পড়িলেন।

কুমার কম্পন অপলক নেত্রে অতিথিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ; তাঁহার মুখে চকিত হাসি ফুটিল। অব্যর্থ বিষ, বিষবৈদ্য যাহা বলিয়াছিল তাহা মিথ্যা নয়। তিনি ভৃত্যদের ইঙ্গিত করিলেন, ভৃত্যেরা অতিথির মৃতদেহ ধরাধরি করিয়া পিছনের দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল।

কুমার কম্পনের মস্তকে ধীরে ধীরে হত্যার মাদকতা চড়িতেছে, চোখের দৃষ্টি ঈষৎ অরুণাভ হইয়াছে। তিনি অন্য অতিথিদের কাছে ফিরিয়া গেলেন, মধুর হাসিয়া বলিলেন—'ভদ্র কুমারাপ্পা, এবার আপনি আসুন।'

কুমারাপ্পা মহাশয় গাত্রোত্থান করিলেন।

এইভাবে কুমার কম্পন একটির পর একটি করিয়া দ্বাদশটি অতিথির সৎকার করিলেন। এই কার্য সমাপ্ত করিতে একদণ্ড সময়ও লাগিল না।

কুমার কম্পনের মাথায় রক্তের নেশা পাক খাইতেছে, তিনি চারিদিক রক্তবর্ণ দেখিতেছেন, সমস্ত দেহ থাকিয়া থাকিয়া অসহ্য অধীরতায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া উঠিতেছে। রাজা এখনো আসিতেছে না কেন ! তবে কি আসিবে না ! যদি না আসে ?

গৃহে ভৃত্যেরা ছাড়া অন্য কেহ নাই। অন্য কেহ আসিবে না। যাহারা আসিয়াছিল তাহারা নিঃশেষিত হইয়াছে। বাকি শুধু রাজা। রাজা যদি কিছু সন্দেহ করিয়া থাকে সে আসিবে না। লক্ষ্মণ মল্লপও আসে নাই, হয়তো লক্ষ্মণ মল্লপই রাজাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে— !

কুমার কম্পনের মাথার মধ্যে রক্তস্রোত তোলপাড় করিতেছিল, অধিক সূক্ষ্ম চিন্তা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। রাজা যদি না আসে আমিই তাহার কাছে যাইব। সে এই সময় একাকী বিরামকক্ষে থাকে। যদি বা লক্ষ্মণ মল্লপ সঙ্গে থাকে তবে একসঙ্গে দু'জনকেই বধ করিব।

ভৃত্যদের সাবধান করিয়া দিয়া কুমার কম্পন একটি ক্ষুদ্র ছুরিকা কটিবস্ত্রে বাঁধিয়া লইলেন ; তারপর গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তোরণশীর্ষে মধুর বাদ্যধ্বনি চলিতে লাগিল।

তোরণের বাহিরে আসিয়া একটা কথা কুমার কম্পনের মনে পড়িল, তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ পিতা বিজয়রায়। সে কনিষ্ঠ পুত্রকে দেখিতে পারে না, সে যদি বাঁচিয়া থাকে তবে নানা অনর্থ ঘটাইবে। সুতরাং তাহাকেই সর্বাগ্রে বিনাশ করা প্রয়োজন।

রাজ-পিতা বিজয়রায়ের ভবন অধিক দূর নয়, কুমার কম্পন সেইদিকে চলিলেন।

বিজয়রায়ের ভবন পাহারার ব্যবস্থা নামমাত্র, ভবন-দাসীর সংখ্যাও বেশি নয় ; বৃদ্ধ ঘটা-চটা ভালবাসেন না। তোরণদ্বারের কাছে দুইজন প্রহরী বসিয়া দুইজন ভবন-দাসীর সঙ্গে রসালাপ করিতেছিল ; কুমার কম্পনকে দেখিয়া তাহারা সন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। কুমার কম্পন পিতৃভবনে কখনো আসেন না।

তিনি কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুত্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইহাতে আশঙ্কার কথা কিছু নাই, তাহারা ভাবিতে লাগিল শিষ্টাচারের কোনো ত্রুটি হইল কিনা।

ভবনের দ্বিতলে বসিয়া বিজয়রায় তখন এক নূতন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছিলেন। যবচূর্ণ শক্তু তালের রসে মাখিয়া পিণ্ডক্ষীরের সহিত থাসিয়া পাক করিলে উত্তম নাড়ু হয় কিনা পরীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় কম্পন গিয়া দাঁড়াইলেন।

বিজয়রায় মুখ তুলিয়া ভ্রূকুটি করিলেন, বলিলেন—'কম্পন ! কী চাও ?'

কুমার কম্পন উত্তর দিলেন না, ক্ষিপ্রহস্তে কটি হইতে ছুরিকা লইয়া পিতার বক্ষে আঘাত করিলেন। ছুরিকা পঞ্জরের অন্তর দিয়া হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিল। বিজয়রায় চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কেবল একটি ত্রস্ত-বিস্মিত শব্দ বাহির হইল—'অধম— !' তারপর তাঁহার অক্ষিপটল উল্টাইয়া গেল।

কম্পন তাঁহার বক্ষ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া আবার কটিতে রাখিলেন। পিতার মুখের পানে আর চাহিলেন না, দ্রুত নামিয়া চলিলেন।

সূর্যাস্তকালে অর্জুন অভ্যাসমত সভাগৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়াছিল। অভ্যাসবশতই লাঠি দু'টি তাহার সঙ্গে ছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, মহারাজ সভাভঙ্গ করিয়া দ্বিতলে প্রস্থান করিলেন। তবু অর্জুন প্রাঙ্গণে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কোনো নিমিত্ত ছিল না, রাজা তাহাকে আহ্বান করেন নাই, কিন্তু তাহার মন তথাপি গুহায় ফিরিয়া যাইতে চাহিল না। এই গৃহে বিদ্যুন্মালা আছেন তাই কি সে নিজের অজ্ঞাতে এই গৃহের ছায়া ত্যাগ করিতে পারিতেছে না, অকারণে প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়ায় ? মানুষের মন দুর্জ্ঞেয়, মন কখন মানুষকে কোন দিকে টানিতেছে, কোন দিকে ঠেলিতেছে, কিছুই বোঝা যায় না।

চাঁদ উঠিয়াছে। প্রাঙ্গণ জনবিরল হইয়া গিয়াছে। সহসা অর্জুন দেখিল কুমার কম্পন আসিতেছেন। তাঁহার গতিভঙ্গিতে অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা পরিদৃষ্ট হইতেছে। তিনি অর্জুনের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন না, সভাগৃহের দ্বারের অভিমুখে চলিলেন। অর্জুন চকিত হইয়া লক্ষ্য করিল তাহার কটিতে একটি ছুরিকা আবদ্ধ রহিয়াছে। কম্পন অবশ্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, কিন্তু সঙ্গে ছুরি কেন ? অস্ত্র লইয়া রাজার সম্মুখীন হওয়া নিষিদ্ধ। বিদ্যুদ্বেগে কয়েকটি চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে খেলিয়া গেল।

কুমার কম্পন সোপান বাহিয়া দ্রুতপদে উঠিতে লাগিলেন। সোপানের প্রতিহারিণীরা বাধা দিল না, কারণ রাজসকাশে কম্পনের অবাধ গতি।

কম্পন রাজার বিরামকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন দীপান্বিত কক্ষে অন্য কেহ নাই, রাজা পালঙ্কে শুইয়া চক্ষু মুদিয়া আছেন। বোধহয় নিদ্রিত। কম্পন ক্ষিপ্রচরণে সেইদিকে চলিলেন।

রাজা কিন্তু নিদ্রা যান নাই, চক্ষু মুদিয়া রাজ্য-চিন্তা করিতেছিলেন। পদশব্দে চক্ষু মেলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। কম্পনের ভাবভঙ্গি স্বাভাবিক নয়। রাজা ঈষৎ বিস্মিত স্বরে বলিলেন—'কম্পন, কী চাও ?' তিনি গৃহপ্রবেশের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

কম্পনের হিংস্র মুখে হাসি ফুটিল। তিনি ছুরিকা হাতে লইয়া বলিলেন—'রাজ্য চাই।'

তারপর যাহা ঘটিল তাহা প্রায় নিঃশব্দে ঘটিল। রাজা নিরস্ত্র বসিয়া আছেন। কুমার কম্পন তাঁহার কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া ছুরি চালাইলেন। রাজা অবশে আত্মরক্ষার জন্য বাম বাহু তুলিলেন, ছুরি তাঁহার কফোণির নিম্নে বাহুর পশ্চাদ্দিকে বিদ্ধ হইল। প্রথমবার ব্যর্থ হইয়া কম্পন আবার ছুরি তুলিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁহাকে ছুরি চালাইতে হইল না, অকস্মাৎ পিছন হইতে তীক্ষ্ণাগ্র বংশ-ভল্ল আসিয়া তাঁহার গ্রীবামূলে বিদ্ধ হইল। কম্পন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া পালঙ্কের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন।

রাজাও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না, এক দৃষ্টে মৃত ভ্রাতার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বাহু হইতে গলগল ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

'মহারাজ, আপনি আহত !'

রাজা অর্জুনের পানে চক্ষু তুলিলেন। অর্জুন দেখিল, রাজার চক্ষু অশ্রুসিক্ত।

রাজা কণ্ঠস্বর সংযত করিতে করিতে বলিলেন—'অর্জুন, তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ।'

অর্জুন নীরব রহিল।

এই সময় পিঙ্গলা কক্ষে প্রবেশ করিল, রাজার রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল— 'এ কী, মহারাজ আহত! কে এ কাজ করল? ওরে তোরা কে কোথায় আছিস ছুটে আয়—'

বিভিন্ন দ্বার দিয়া কঞ্চুকী পাচক প্রহরিণী অনেকগুলি লোক কক্ষে প্রবেশ করিল এবং রাজার শোণিতলিপ্ত দেহ দেখিয়া স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাজা সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'কম্পন আমাকে হত্যা করতে এসেছিল, অর্জুন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমার আঘাত মারাত্মক নয়, তবে ছুরিকায় যদি বিষ থাকে—'

মণিকঙ্কণা পিঙ্গলার চিৎকার শুনিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, এখন ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া লইল. তারপর ত্বরিতে উঠিয়া নিজের বস্ত্র হইতে পট্টিকা ছিঁড়িয়া রাজার বাহুর ঊর্ধ্বভাগে শক্ত করিয়া তাগা বাঁধিয়া দিল। গলদশ্রু নেত্রে অস্ফুটব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিল—'দারুব্রহ্ম! এ কি হল—এ কি হল—'

ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ রাজার সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন, কক্ষে ভিড় দেখিয়া তিনি ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিলেন; রাজার অবস্থা এবং কুমার কম্পনের মৃতদেহ দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। রাজার সহিত তাঁহার একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল; রাজা করুণ হাসিয়া যেন তাঁহাকে জানাইলেন—তোমার সন্দেহই সত্য।

মুহূর্তমধ্যে লক্ষ্মণ মল্লপ সারথির বল্‌গা নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন; তাঁহার আকৃতি ভিন্নমূর্তি ধারণ করিল। তিনি সকলের দিকে আদেশের কণ্ঠে বলিলেন—'তোমরা এখানে কি করছ? যাও, নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাও।—পিঙ্গলা, তুমি ছুটে যাও, শীঘ্র বৈদ্যরাজকে ডেকে নিয়ে এস।—অর্জুন, তুমি যেও না, তোমাকে প্রয়োজন হবে।'

কক্ষ শূন্য হইয়া গেল। কেবল মণিকঙ্কণা ও অর্জুন রহিল। বিদ্যুন্মালাও একবার কক্ষে আসিয়াছিলেন, দৃশ্য দেখিয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া গিয়া দু' হাতে মুখ ঢাকিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ছিলেন।

লক্ষ্মণ মল্লপ মণিকঙ্কণাকে বলিলেন—'দেবিকা, আপনি এখন নিজ কক্ষে ফিরে যান, আর কোনো শঙ্কা নেই।'

মণিকঙ্কণা উঠিল না, রাজার পৃষ্ঠ বাহুবেষ্টিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—'আমি যাব না।'

ভয়ঙ্কর বার্তা মুখে মুখে পৌরভূমির সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। রানীদের কানে সংবাদ উঠিয়াছিল। তাঁহারা রাজাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজার অনুমতি ব্যতীত তাঁহাদের ভবন হইতে বাহিরে আসিবার অধিকার নাই। সকলে নিজ নিজ মহলে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। দেবী পদ্মালয়াম্বিকা দীপহীন কক্ষে পুত্র মল্লিকার্জুনকে কোলে লইয়া পাষাণমূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

বৈদ্যরাজ দামোদর স্বামীর গৃহ রাজ-পুরভূমির মধ্যেই। সেদিন সন্ধ্যার পর রসরাজ মহাশয় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুই বৃদ্ধের মধ্যে ইত্যবসরে প্রণয় অতিশয় গাঢ় হইয়াছিল। দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া দ্রাক্ষাসব পান করিতেছিলেন; মৃদুমন্দ বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল। এমন সময় পিঙ্গলা ঝটিকার ন্যায় আসিয়া দুঃসংবাদ দিল। দুই বৃদ্ধ পরস্পরের হাত ধরিয়া উঠি-পড়ি ভাবে রাজভবনের দিকে ছুটিলেন। পিঙ্গলা ঔষধের পেটরা লইয়া সঙ্গে ছুটিল।

রাজার বিরাম-ভবন হইতে তখন কম্পনের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে পিতার ও

দ্বাদশজন সভাসদের মৃত্যুসংবাদও রাজা পাইয়াছেন। তিনি অবসন্ন দেহভার মণিকঙ্কণার দেহে অর্পণ করিয়া মুহ্যমানভাবে বসিয়া আছেন। ক্ষত হইতে অল্প রক্ত ক্ষরিত হইতেছে।

দামোদর ও হ্রস্বদৃষ্টি রসরাজ দ্রুত স্খলিত পদে প্রবেশ করিলেন। দামোদর হাত তুলিয়া বলিলেন—'জয় ধন্বন্তরি! কোনো ভয় নেই। স্বস্তি স্বস্তি।'

তিনি পালঙ্কে রাজার পাশে বসিয়া ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিলেন, মুখে চট্‌কার শব্দ করিলেন, তারপর রাজার দক্ষিণ মণিবন্ধে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া নাড়ি পরীক্ষায় ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি মাথা নাড়িয়া চোখ খুলিলেন—'না, আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। নাড়ি ঈষৎ দমিত, কিন্তু বিষক্রিয়ার কোনো লক্ষণ নেই।—রসরাজ মহাশয়, আপনি দেখুন।'

রসরাজ রাজার নাড়ি দেখিলেন, তারপর সহর্ষে বলিলেন—'বৈদ্যরাজ যথার্থ বলেছেন। রাজদেহে কণামাত্র বিষের প্রকোপ নেই। স্বস্তি স্বস্তি। এখন ক্ষতস্থানে প্রলেপাদির ব্যবস্থা করলেই রাজা অচিরাৎ নিরাময় হবেন।'

তখন ক্ষত চিকিৎসার উপযোগ হইল। তাগা খুলিয়া দিয়া ক্ষতস্থান পরিষ্কৃত হইল; দামোদর স্বামী তাহাতে শতধৌত ঘৃতের প্রলেপ লাগাইলেন, ক্ষত বন্ধন করিলেন না। তারপর রাজাকে অরিষ্ট পান করাইয়া পুনরায় নাড়ি পরীক্ষাপূর্বক নাড়ির উন্নতি লক্ষ্য করিয়া সানন্দে বহু আশীর্বাদ আবৃত্তি করিতে করিতে রাত্রির জন্য প্রস্থান করিলেন।

লক্ষ্মণ মল্লপ অর্জুনের সঙ্গে কক্ষের এক কোণে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এখন রাজার পালঙ্কের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'অর্জুনকে মধ্যম কুমারের শিবিরে পাঠাচ্ছি। তিনি দূরে আছেন, হয়তো অন্যের মুখে বিকৃত সংবাদ শুনে বিচলিত হবেন।'

রাজা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'তাই করুন।—কী হয়ে গেল! কম্পন পিতাকে পর্যন্ত—। অর্জুন, তুমি কোথায় ছিলে? কেমন করে যথাসময়ে উপস্থিত হলে?'

অর্জুন বলিল—'আর্য, আমি প্রাঙ্গণে ছিলাম, কুমার কম্পনকে আসতে দেখলাম। তাঁর ভাবভঙ্গি ভাল লাগল না, তাঁর কটিতে ছুরিকা দেখে সন্দেহ হল। তাই তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। তাঁর অভিসন্ধি সঠিক বুঝতে পারিনি, বুঝতে পারলে মহারাজ অক্ষত থাকতেন।'

রাজা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'হুক্ক-বুক্কের আবির্ভাব মিথ্যা নয়, হয়তো এই জন্যই এসেছিলেন।—অর্জুন, তুমি আজ যে-কাজে যাচ্ছ যাও, এই মুদ্রাঙ্গুরীয় নাও, বিজয়কে দেখিও, তারপর তাকে সব কথা মুখে বোলো।—আর ফিরে এসে তুমি আমার দেহরক্ষীর কাজ করবে, প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার প্রাণরক্ষার ভার তোমার।'

অর্জুন নত হইয়া যুক্তকরে রাজাকে প্রণাম করিল। অল্পকাল পরে মন্ত্রী তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

মণিকঙ্কণা রাজাকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইল না। রাত্রে সে ও পিঙ্গলা রাজার কাছে রহিল।

চতুর্থ পর্ব

এক

রাজার প্রতি আক্রমণের সংবাদ প্রচারিত হইলে কিছুদিন খুব উত্তেজিত আলোড়ন চলিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইল। রাজার ক্ষত দু'চার দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইল, তিনি নিয়মিত সভায় আসিতে লাগিলেন। রাজ্যের লোক নিশ্চিন্ত হইল।

কুমার কম্পনের মৃতদেহ কোলে লইয়া তাঁহার দুই পত্নী কৃষ্ণা দেবী ও গিরিজা দেবী সহমৃতা হইয়াছেন। বিনা দোষে দুই অভাগিনীর অকালে জীবনান্ত হইল।

বিজয়নগরের জীবনযাত্রা আবার পুরাতন প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এদিকে আকাশে নববর্ষার সূচনা দেখা যাইতেছে। কুমারী বিদ্যুন্মালা যথারীতি পম্পাপতির মন্দিরে যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহার অন্তরে হরিষে বিষাদ। শ্রাবণ মাস দুর্বার গতিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু অর্জুনকে তিনি কাছে পাইয়াছেন। অর্জুন সারা দিন রাজার কাছে থাকে, রাজা সভায় যাইলে তাঁহার পিছনে যায়, সিংহাসনের পিছনে দাঁড়াইয়া থাকে। তিনি বিরাম-ভবনে আসিলে কখনো তাঁহার কক্ষে থাকে, কখনো কক্ষের আশেপাশে অলিন্দে চত্বরে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিদ্যুন্মালার মন সর্বদা সেই দিকে পড়িয়া থাকে। তিনি সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ান ; যখনি দেখেন অর্জুন অলিন্দে একাকী আছে তখনি লঘুপদে আসিয়া তাহার দেহে হাত রাখিয়া স্পর্শ করিয়া যান, অস্ফুট কণ্ঠে একটি-দুইটি কথা বলেন। কিন্তু এই সুখ ক্ষণিকের, ইহাতে ভবিষ্যতের আশ্বাস নাই। বিদ্যুন্মালার মন হর্ষ-বিষাদে দোল খাইতে থাকে।

মণিকঙ্কণার জীবনে নূতন এক আনন্দময় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বে সে চুরি করিয়া রাজাকে দেখিয়া যাইত, এখন রাজা যখনই বিরাম-ভবনে আসেন সে তাঁহার কাছে আসিয়া বসে। রাজার মনের উপর একটা দাগ পড়িয়াছে, প্রায়ই বিমনা হইয়া বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতার কথা চিন্তা করেন, লোভী কৃতঘ্ন ভ্রাতার জন্য প্রাণ কাঁদে। মণিকঙ্কণা পালঙ্কের পাশে বসিয়া নানাপ্রকার গল্প জুড়িয়া দেয়—কলিঙ্গ দেশের কথা, পিতামাতার কথা, আরো কত রকম কথা। তারপর পানের বাটা লইয়া পান সাজিতে বসে, নিজের দেশের খদিরাদি উপকরণ দিয়া পান সাজিয়া রাজাকে খাওয়ায়। পিঙ্গলা কখনো ঘরে আসিলে তাকে বলে—'তুই যা, আমি রাজার কাছে আছি।'

মণিকঙ্কণার সংসর্গে রাজার মন উৎফুল্ল হয়, তিনি কম্পনের কথা ভুলিয়া যান।

প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরের নিমগ্ন প্রদেশে একটি নিভৃত রস-সত্তা আছে, রাজার সেই রস-সত্তা মণিকঙ্কণার সান্নিধ্যে উন্মোচিত হয়। মণিকঙ্কণার সহিত রাজা একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতা অনুভব করেন। ইহা পতি-পত্নীর স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধ নয়, যেন তদপেক্ষাও নিগূঢ়-ঘনিষ্ঠ একটি রসোল্লাস।

একদিন রাজা রহস্য করিয়া বলিলেন—'কঙ্কণা, তোমার ভগিনীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার বিয়েটাও দেব স্থির করেছি, কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে দেব ভেবে পাচ্ছি না।'

মণিকঙ্কণা ক্ষণেক অবাক হইয়া চাহিল, তারপর বলিল—'আমি কাকে চাই আমি জানি।'

রাজা বুঝিলেন, গূঢ় হাস্য করিয়া বলিলেন—'কিন্তু তুমি যাকে চাও সে যদি তোমাকে না চায় ?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'তাহলে চিরজীবন কুমারী থাকব। দিনান্তে যদি একবার দেখতে পাই তাহলেই আমার যথেষ্ট।'

রাজার হৃদয় প্রগাঢ় রসমাধুর্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি মণিকঙ্কণার বেণীতে একটু টান দিয়া বলিলেন—'আচ্ছা সে দেখা যাবে।'—

আষাঢ়ের নীলাঞ্জন মেঘ একদিন অপরাহ্নে ঝড় লইয়া আসিল, প্রবলবেগে করকাপাত করিয়া চলিয়া গেল। দশদিক শীতল হইল।

দামোদর স্বামী নিজ গৃহের উঠান হইতে কিছু করকা-শিলা চয়ন করিয়া বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় লাঠি ধরিয়া রসরাজ আসিলেন। দামোদর স্বামী বলিলেন—'এস

বন্ধু, আজ করকা সহযোগে মাধ্বী পান করা যাক।'

দামোদরের স্ত্রী-পরিবার নাই, একটি যুবতী দাসী তাঁহার সেবা করে। দাসী আসিয়া ঘরে দীপ জ্বালিয়া মন্দুরা পাতিয়া দিয়া গেল। দুই বন্ধু মাধ্বীর ভাণ্ড লইয়া বসিলেন। দামোদর করকা শিলার পুঁটলি খুলিলেন ; করকাখণ্ডগুলি জমাট বাঁধিয়া শুভ্র বিম্বফলের আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি সন্তর্পণে শীতল পিণ্ডটি তুলিয়া মাধ্বীর ভাণ্ডে ছাড়িয়া দিলেন। মাধ্বী শীতল হইলে দুইজনে পাত্রে ঢালিয়া পান করিতে লাগিলেন।

দাসী আসিয়া থালিকায় ভর্জিত বেসনের ঝাল-বড়া রাখিয়া গেল।

পানাহারের সঙ্গে সঙ্গে জল্পনা চলিল। কেবল নিদান শাস্ত্রের আলোচনা নয়, মাধ্বীর মাদক প্রভাব যত বাড়িতে লাগিল, দুই বৃদ্ধের জিহ্বা ততই শিথিল হইল। রসের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। রসরাজ উৎকল-প্রেয়সীদের রতি-চাতুর্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিলেন ; প্রত্যুত্তরে দামোদর স্বামী কর্ণাটককামিনীদের বিলাসবিভ্রম ও রসনৈপুণ্যের আলোচনায় পঞ্চমুখ হইলেন।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল, সুধাভাণ্ড শেষ হইয়া আসিল। দু'জনেরই মাথায় রুমঝুম অপ্সরীর নুপুর বাজিতেছে, কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ। রাজা-রানীদের সম্বন্ধে গুপ্তকথার আদান-প্রদান আরম্ভ হইয়া গেল।

দামোদর স্বামী গলার মধ্যে সংহত গভীর হাস্য করিলেন, জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন—'বন্ধু, একটি গুপ্ত কথা আছে যা রাজা আর আমি জানি, আর কেউ জানে না।'

রসরাজ মধুভাণ্ডটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া শেষ করিলেন, বলিলেন—'তাই নাকি।'

দামোদর বলিলেন—'হুঁ। রাজার মধ্যমা রানী অসূর্যম্পশ্যা, শুনেছ কি ?'

রসরাজ আবার বলিলেন—'তাই নাকি ! কিন্তু অসূর্যম্পশ্যা কেন ? এ দেশে তো ও রীতি নেই।'

দামোদর বলিলেন—'না। প্রকৃত রহস্য কেউ জানে না। একবার মধ্যমার রোগ হয়েছিল, আমি চিকিৎসা করেছিলাম। তাই আমি জানি।'

'তাই নাকি। রহস্যটা কী ?'

'মধ্যমা অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু দাঁত নেই ; জন্মাবধি একটিও দাঁত গজায়নি। একেবারে ফোক্‌লা।'

'তাই নাকি ! এ রকম তো দেখা যায় না।' রসরাজ দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিলেন—'হুঁ হুঁ হুঁ। রানী ফোক্‌লা।'

দামোদর বলিলেন—'রাজা কিন্তু সেজন্য মধ্যমাকে কম স্নেহ করেন না। রাজাদের সব রকম চাই—খি খি খি—বুঝলে ?'

রসরাজ বলিলেন—'তা বটে। সব যদি এক রকম হয় তাহলে পাঁচটা বিয়ে করে লাভ কি !'

কিছুক্ষণ পরে হাসি থামিলে দামোদর ভাণ্ড পরীক্ষা করিলেন ; ভাণ্ড শূন্য দেখিয়া বলিলেন—'রাত হয়েছে, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তুমি কানা মানুষ, কোথায় যেতে কোথায় যাবে।'

দুই বন্ধু বাহির হইলেন। অতিথি-ভবন বেশি দূর নয়, সেখানে উপস্থিত হইয়া রসরাজ বলিলেন—'তুমি একলা ফিরবে, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

দু'জনে ফিরিলেন। দামোদর নিজ গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'তাই তো, তুমি এখন ফিরবে কি করে ? চল তোমাকে পৌঁছে দিই।'

এইভাবে পরস্পরকে পৌঁছাইয়া দেওয়া কতক্ষণ চলিল বলা যায় না। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল দুই বন্ধু দামোদর স্বামীর বহিঃকক্ষে মন্দুরার উপর শয়ন করিয়া পরম আরামে নিদ্রা যাইতেছেন।

গুহার মধ্যে বলরাম ও মঞ্জিরার প্রণয় ঘনাবর্ত দুগ্ধের ন্যায় যৌবনের তাপে ক্রমশ গাঢ় হইতেছে। অর্জুন আজকাল দিনের বেলা গুহায় থাকে না, রাজার সঙ্গে থাকে, তাই তাহাদের সমাগম নিরঙ্কুশ। মঞ্জিরা দ্বিপ্রহরে কেবল বলরামের খাবার লইয়া আসে। বলরামের আহার শেষ হইলে দু'জনে ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া গল্প করে। কখনো বলরাম চুল্লী জ্বালিয়া কাজ আরম্ভ করে, মঞ্জিরা হাপরের দড়ি টানে ; বায়ুর প্রবাহে অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, আগুনের মধ্যে লোহার পত্রিকা রক্তিমবর্ণ ধারণ করে। বলরাম আগুন হইতে পত্রিকা বাহির করিয়া এক লৌহদণ্ডের চারিপাশে ঠুকিয়া ঠুকিয়া পেঁচ দিয়া জড়ায় ; লোহা ঠাণ্ডা হইলে আবার আগুনে রক্তবর্ণ করিয়া লৌহদণ্ডের চারিপাশে জড়ায়। এইভাবে ধীরে ধীরে লোহার নল প্রস্তুত হইতে থাকে। ক্ষুদ্র কামানের অর্থাৎ বন্দুকের নল তৈরি করিবার ইহাই তাহার গুপ্ত কৌশল।

কখনো তাহারা মৃদঙ্গ ও বাঁশি লইয়া বসে। বলরাম মঞ্জিরার চোখে চোখ রাখিয়া গায়—

প্রিয়ে চারুশীলে প্রিয়ে চারুশীলে
মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।

মঞ্জিরা শান্ত ধীর প্রকৃতির মেয়ে, বলরামের একটু প্রগল্‌ভতা বেশি। কিন্তু তাহাদের আসক্তি শালীনতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যায় না।

এইভাবে চলিতেছে, হঠাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে মঞ্জিরা আসিল না। তাহার পরিবর্তে অন্য একটি মেয়ে খাবার লইয়া আসিল।

বলরাম চক্ষু পাকাইয়া বলিল—'তুমি কে ? মঞ্জিরা কোথায় ?'

নূতনা বলিল—'আমি সুভদ্রা। মঞ্জিরা বাপের বাড়ি গিয়েছে, তাই আমি খাবার নিয়ে এসেছি।'

'বাপের বাড়ি গিয়েছে !' মঞ্জিরার বাপের বাড়ি থাকিতে পারে একথা পূর্বে বলরামের মনে আসে নাই—'বাপের বাড়ি গিয়েছে কেন ?'

'তার আন্নার অসুখ, খবর পেয়ে কাল রাত্রেই সে চলে গেছে।'

'আন্না মানে তো দাদা ! দাদার অসুখ !—তা কবে ফিরবে ?'

'তা কি জানি !'

'হুঁ। মঞ্জিরার বাপের নাম কি ?'

'বীরভদ্র। তিনি রাজার হাতিশালে কাজ করেন।'

'হুঁ। বাড়ি কোথায় ?'

'নীচু নগরে। পান-সুপারি রাস্তার পুবে তুঙ্গভদ্রার তীরে তাঁর বাড়ি।'

'বটে।' বলরাম আহারে বসিল। নবাগতা সুভদ্রা মঞ্জিরার সখী, বলরামের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

আহারের পর সুভদ্রা পাত্রাদি লইয়া প্রস্থান করিবার পর বলরাম চিন্তা করিতে লাগিল। কি করা যায় ! মঞ্জিরা কবে আসিবে কিছুই ঠিক নাই। তাহার পিতা হস্তিপক বীরভদ্রকে হস্তিশালা হইতে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। কিন্তু তাহাতে লাভ কি ! মঞ্জিরার বাপকে দর্শন করিলে তো প্রাণ জুড়াইবে না। বরং তাঁহার গৃহ খুঁজিয়া বাহির করিলে কাজ হইবে।

তৃতীয় প্রহরে বলরাম পরিষ্কার বস্ত্র উত্তরীয় পরিধান করিয়া বাহির হইল। নীচু নগরে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত পল্লীতে তুঙ্গভদ্রার তীরে খোঁজাখুঁজি করিবার পর রাজ-হস্তিপক বীরভদ্রের গৃহ পাওয়া গেল।

প্রস্তরনির্মিত ক্ষুদ্র গৃহ। বলরাম দ্বারে করাঘাত করিলে মঞ্জিরা দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল।

বলরামকে দেখিয়া তাহার মুখে বিস্ময়ানন্দ ভরা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বলরাম মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—'খবর না দিয়ে পালিয়ে এসেছ যে!'

মঞ্জিরা থতমত হইয়া বলিল—'সময় পেলাম না। কাল রাত্রে বাবা ডাকতে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে চলে এলাম।'

'আন্না কেমন আছে?'

মঞ্জিরার মুখ মলিন হইল, সে ছলছল চক্ষে বলিল—'ভাল না। কাল খুব বাড়াবাড়ি গিয়েছে। বৈদ্য মহাশয় বলছেন, 'ত্রিদোষ'।'

দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আরো কিছুক্ষণ কথা হইল, তারপর বলরাম 'কাল আবার আসব' বলিয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর বলরাম প্রত্যহ আসে, দ্বারের কাছে দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া কথা বলিয়া যায়। মঞ্জিরার আন্না ক্রমশ আরোগ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রাণের আশঙ্কা আর নাই।

একদিন অনিবার্যভাবেই মঞ্জিরার পিতা বীরভদ্রের সহিত বলরামের দেখা হইয়া গেল। দীর্ঘায়ত গৌরবর্ণ মানুষ, বয়স অনুমান চল্লিশ; প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর। মঞ্জিরাকে অপরিচিত যুবার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিলেন। বলরাম বলিল—'আপনি মঞ্জিরার পিতা? নমস্কার। মঞ্জিরার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—তাই—'

বীরভদ্র শিষ্টতা সহকারে বলরামকে ভিতরে আসিয়া বসিতে বলিলেন। দুইজনে আস্তরণের উপর উপবিষ্ট হইলে বীরভদ্র বলরামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মঞ্জিরা একটু আড়ালে থাকিয়া তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিল।

বলরাম নিজের পরিচয় দিল, মঞ্জিরার সহিত কি করিয়া পরিচয় হইল তাহা জানাইল। শুনিয়া বীরভদ্র বলিলেন—'বাপু, তুমি দেখছি গুণবান ব্যক্তি। ভাগ্যবানও বটে, কারণ রাজার নজরে পড়েছ।'

বীরভদ্রকে প্রসন্ন দেখিয়া বলরাম ভাবিল, এই সুযোগ, এমন সুযোগ হয়তো আর আসিবে না। যা থাকে কপালে। সে হাত জোড় করিয়া সবিনয়ে বলিল—'মহাশয়, আপনার শ্রীচরণে আমার একটি নিবেদন আছে।'

বীরভদ্র একটু চকিত হইলেন, বলিলেন—'কী নিবেদন?'

বলরাম বলিল—'আপনার কন্যা মঞ্জিরাকে আমি বিবাহ করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।'

বীরভদ্র নূতন চক্ষে বলরামকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—'বাপু, তুমি যোগ্য পাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি বিদেশী, তোমার হাতে কন্যা দান করতে শঙ্কা হয়।'

বলরাম বলিল—'মহাশয়, আমি বিদেশ থেকে এসেছি বটে, কিন্তু কোনো দিন ফিরে যাব এমন সম্ভাবনা নেই। বিজয়নগরই আমার গৃহ, বিজয়নগরই আমার দেশ।'

বীরভদ্র বলিলেন—'তা ভাল। কিন্তু এ বিষয়ে মঞ্জিরার মন জানা প্রয়োজন। দ্বিতীয় কথা, মঞ্জিরা রাজপুরীতে কাজ করে, রাজাই তার প্রকৃত অভিভাবক। তিনি যদি অনুমতি দেন আমার আপত্তি হবে না।'

'যথা আজ্ঞা'—বলরাম আশান্বিত মনে গাত্রোত্থান করিল। রাজার অনুমতি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

মঞ্জিরা আড়াল হইতে সব শুনিয়াছিল। তাহার দেহ ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত হইল, মন আশার আনন্দে দুরু দুরু করিতে লাগিল।

বিজয়নগর হইতে বহু দূরে তুঙ্গভদ্রার গিরি-বলয়িত উপকূলের ক্ষুদ্র গ্রামটিতে চিপিটক ও মন্দোদরীর দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। একই গুহায় বাস করিয়া ছদ্ম দাম্পত্য বেশিদিন বজায় রাখা কঠিন। অগ্নি এবং ঘৃত যত পুরাতনই হোক, তাহাদের সান্নিধ্যের ফল অনিবার্য। চিপিটক ও মন্দোদরীর দাম্পত্য ব্যবহারে কপটতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

চিপিটক মনকে বুঝাইয়াছিলেন, ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। তিনি বিজয়নগরে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প ত্যাগ করেন নাই। মন্দোদরী কিন্তু পরমানন্দে ছিল। এখানে আসিবার পর দারুব্রহ্ম তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, সে একটি পুরুষ পাইয়াছে। আর কী চাই!

কিন্তু জনসমাজে বাস করিতে হইলে কিছু কাজ করিতে হয়, কেহ বসিয়া খাওয়ায় না। মন্দোদরী নিজের কাজ জুটাইয়া লইয়াছিল। সে অল্পকাল মধ্যে গ্রামের ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিল। তৃতীয় প্রহরে গ্রামের যুবতীরা গা ধুইতে নদীতে যাইত, মন্দোদরী তাহাদের সঙ্গে যাইত। সকলে মিলিয়া গা ধুইত, তারপর গ্রামের আম্রকুঞ্জের ছায়ায় গিয়া বসিত। মন্দোদরী নানা ছাঁদে চুল বাঁধিতে জানে, সে একে একে সকলের চুল বাঁধিয়া দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে গল্প বলিত। মেয়েরা চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অবহিত হইয়া রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিত। তারপর সূর্য পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হইলে যে যার কুটিরে ফিরিয়া যাইত। মন্দোদরীকে রাঁধিতে হইত না, গ্রামবধূরা পালা করিয়া তাহার গুহায় অন্নব্যঞ্জন দিয়া যাইত।

চিপিটকমূর্তি কিন্তু রাজশ্যালক, সুতরাং অকর্মার ধাড়ি। গ্রামে চিপিটক বিতরণের কাজ থাকিলে হয়তো করিতে পারিতেন, কিন্তু অন্য কোনো শ্রমসাধ্য কাজে তাঁহার রুচি নাই। দেখিয়া শুনিয়া মোড়ল বলিল—'কর্তা, তোমাকে দিয়ে অন্য কাজ হবে না, তুমি ছাগল চরাও।'

চিপিটক দেখিলেন, ছাগল চরানোতে কোনো পরিশ্রম নাই ; ছাগলেরা আপনিই চরিয়া খায়, তাহাদের মাঠে ছাড়িয়া দিয়া গাছতলায় বসিয়া থাকিলেই হইল। তিনি রাজী হইলেন।

অতঃপর চিপিটক ছাগল চরাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার চিত্তে সুখ নাই, মন পড়িয়া আছে বিজয়নগরে। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিয়া তিনি আকাশ-পাতাল চিন্তা করেন।

এদেশের ছাগলগুলি আকারে আয়তনে বেশ বৃহৎ, রামছাগলের চেয়েও বৃহৎ ও হৃষ্টপুষ্ট ; কাবুলী গর্দভের আকার। গাঁয়ের ছেলেরা তাহাদের পিঠে চড়িয়া ছুটাছুটি করে। দেখিয়া দেখিয়া একদিন তাঁহার মাথায় একটি বুদ্ধি গজাইল। ছাগলের পিঠে চড়িয়া তিনি যদি নদীর ধার দিয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন তবে অচিরাৎ বিজয়নগরে পৌঁছিতে পারিবেন।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। চিপিটক একটি বলিষ্ঠ পাঁঠা ধরিয়া তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিলেন এবং নদীর কিনার দিয়া তাহাকে উজানে চালিত করিলেন। চিপিটকের দেহ শীর্ণ ও লঘু, তাহাকে পৃষ্ঠে বহন করিতে অতিকায় পাঁঠার কোনোই কষ্ট হইল না।

কিন্তু নদীর তীর সর্বত্র সমতল নয়, তীরের পাহাড় মাঝে মাঝে নদী পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ একটি ক্রমোচ্চ পাহাড়ের সম্মুখীন হইয়া ছাগল স্থির হইয়া দাঁড়াইল ; সে গ্রাম হইতে অর্ধক্রোশ আসিয়াছে, এখন পর্বত ডিঙাইয়া আর অগ্রসর হইতে রাজী নয়। চিপিটক তাহাকে তাড়না করিলেন, মুখে নানাপ্রকার শব্দ করিলেন, কিন্তু ছাগল নড়িল না। চিপিটক তখন দুই পায়ের গোড়ালি দিয়া সবেগে ছাগলের পেটে গুঁতা মারিলেন। ছাগল হঠাৎ চার পায়ে শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া গা ঝাড়া দিল। চিপিটক তাহার পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িলেন। ছাগল লাফাইতে লাফাইতে গ্রামে ফিরিয়া গেল।

পতনের ফলে চিপিটকের অস্থি মচকাইয়া গিয়াছিল, তিনি লেংচাইতে লেংচাইতে গৃহে

ফিরিলেন।

অতঃপর কিছুদিন কাটিলে তাঁহার মাথায় আর একটি বুদ্ধি অবতীর্ণ হইল ; এটি তেমন মারাত্মক নয়, এমনকি সুবুদ্ধিও বলা যাইতে পারে। তিনি মন্দোদরীকে আদেশ করিলেন—'তুই রোজ দুপুরবেলা নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকবি। আমাদের নৌকো তিনটের ফেরার সময় হয়েছে, একদিন না একদিন এই পথে যেতেই হবে। তুই চোখ মেলে থাকবি, তাদের দেখতে পেলেই ডাকবি।'

মন্দোদরী বলিল—'আচ্ছা।'

চিপিটক দ্বিপ্রহরে ছাগল চরাইতে চরাইতে গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়েন। মন্দোদরী গজেন্দ্রগমনে নদীতীরে যায়, উঁচু পাথরের ছায়ায় শুইয়া ঘুমায়। নৌকা সম্বন্ধে তাহার মোটেই আগ্রহ নাই, সে পরম সুখে আছে। অপরাহ্ণে গাঁয়ের মেয়েরা গা ধুইতে আসিলে সে তাহাদের সঙ্গে গা ধুইয়া ফিরিয়া যায়। চিপিটককে বলে—'কোথায় নৌকা!'

এইভাবে দিন কাটিতেছে।

দুই

গ্রীষ্মকালীন ঝড়-ঝাপ্‌টা অপগত হইয়া বিজয়নগরে বর্ষা নামিয়াছে। রাজ-পৌরভূমির চারিদিকে ময়ূরের ষড়্‌জসংবাদিনী কেকাধ্বনি শুনা যাইতেছে। ময়ূরগুলি কোথা হইতে আসিয়া উচ্চভূমিতে অথবা শৈলশীর্ষে উঠিয়াছে এবং পেখম মেলিয়া মেঘের পানে উৎকণ্ঠ হইয়া ডাকিতেছে।

এদেশে বেশি বৃষ্টি হয় না ; কখনো রিম্‌ঝিম্ কখনো ঝিরিঝিরি। কিন্তু আকাশ সর্বদা মেঘ-মেদুর হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের কঠোর তাপ অপগত হইয়া মধুর শৈত্য মানুষের দেহে সুধা সিঞ্চন করিতে থাকে। দিবাভাগে সূর্যদেব যেন অঙ্গে ধূসর আস্তরণ টানিয়া ঘুমাইয়া পড়েন ; রাত্রিগুলি দেবভোগ্য স্বর্গের রাত্রি হইয়া দাঁড়ায়। পীতবর্ণ তৃণপাদপ ধীরে ধীরে হরিৎ বর্ণ ধারণ করে ; পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গাঢ় সবুজের রেখা। তুঙ্গভদ্রার শীর্ণ ধারা অলক্ষিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে।

বর্ষা সমাগমে অর্জুন ও বলরামকে গুহা ছাড়িতে হইয়াছিল। গুহার ছাদের ফুটা দিয়া জল পড়ে। মন্ত্রী মহাশয় তাহাদের বাসের অন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুমার কম্পনের নূতন প্রাসাদ শূন্য পড়িয়া ছিল, তাহারা প্রাসাদের নিম্নতলে আশ্রয় পাইয়াছিল। বলরাম গৃহের রন্ধনশালায় কামারশালা পাতিয়াছিল।

চাতুর্মাস্য ব্রতারম্ভের দিনটি আরম্ভ হইল টিপি টিপি বৃষ্টি লইয়া। অর্জুন প্রত্যূষে উঠিয়া রাজ সকাশে চলিল। চারিদিক অন্ধকার, মেঘের আড়ালে রাত্রি শেষ হইয়াছে কিনা বোঝা যায় না। হেমকূট পর্বতের শৃঙ্গে এখনো ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতেছে।

সভা-ভবনের নিকটে আসিয়া অর্জুন দ্বিতলের একটি বিশেষ গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত করিল। গবাক্ষে আবছায়া একটি মুখ দৃষ্টিগোচর হইল। বিদ্যুন্মালা দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি প্রত্যহ এই সময় অর্জুনের দর্শনাশায় গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।

অর্জুনের হৃদয় মথিত করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। ইহার শেষ কোথায়?

রাজার বিরাম-ভবনে সকলে জাগিয়া উঠিয়াছে। গতরাত্রে রাজা বিরাম-ভবনেই ছিলেন, তিনি স্নান সারিয়া পূজায় বসিয়াছেন। অর্জুন সোপান দিয়া উপরে আসিয়া রাজার কক্ষে দাঁড়াইল।

কক্ষে কেহ নাই, অর্জুন রাজার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। ছায়াচ্ছন্ন কক্ষ, বাতায়নগুলি অচ্ছাভ আলোর চতুষ্কোণ রচনা করিয়াছে।

সহসা পাশের একটি পর্দা-ঢাকা দ্বার দিয়া বিদ্যুন্মালা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চোখে বিভ্রান্ত ব্যাকুলতা। তিনি লঘু পদে অর্জুনের কাছে আসিয়া তাহার হাতে হাত রাখিলেন, সংহত স্বরে বলিলেন—'আজ কী দিন জানো ? চাতুর্মাস্য আরম্ভের দিন। কাল শ্রাবণ মাস পড়বে।'

অর্জুন নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিল। বিদ্যুন্মালা আরো কাছে আসিয়া অর্জুনের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'তুমি কি আমাকে সত্যিই চাও না ? আমি কি তবে আত্মহত্যা করব ? কী করব তুমি বলে দাও।'

এই সময় একটি দ্বারের পর্দা একটু নড়িল। পিঙ্গলা কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া থমকিয়া রহিল। দেখিল, বিদ্যুন্মালা অর্জুনের কাঁধে হাত রাখিয়া নিম্নস্বরে কথা বলিতেছেন। অর্জুন বা বিদ্যুন্মালা পিঙ্গলাকে দেখিতে পাইলেন না।

অর্জুন অতি কষ্টে কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির করিল—'আমি কি বলব ? তুমি যাও, এখনি রাজা আসবেন।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আমি যাচ্ছি। কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর আমি তোমার কাছে যাব।'

বিদ্যুন্মালা নিঃশব্দ পদে অন্তর্হিতা হইলেন।

অল্পক্ষণ পরে পিঙ্গলা অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল, অর্জুনের প্রতি একটি সুতীক্ষ্ণ বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'এই যে অর্জুন ভদ্র ! আপনি একলা রয়েছেন। মহারাজের পুজা শেষ হয়েছে, তিনি এখনি আসবেন।'

অর্জুন গলার মধ্যে শব্দ করিল ; কথা বলিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল।

দুই দণ্ড পরে মণিকঙ্কণা ও বিদ্যুন্মালা পম্পাপতির মন্দিরে চলিয়া গেলেন।

নিজ কক্ষে দেবরায় সভারোহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পালঙ্কের কাছে দাঁড়াইয়া পিঙ্গলা তাঁহার বাহুতে অঙ্গদ পরাইয়া দিতেছিল। অর্জুন দূরে দ্বারের নিকট প্রতীক্ষা করিতেছিল।

রাজার কপালে কুঙ্কুম তিলক পরাইতে পরাইতে পিঙ্গলা মৃদুস্বরে রাজাকে কিছু বলিল। রাজা পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলেন। পিঙ্গলা আবার কিছু বলিল। রাজা আরো কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া অর্জুনের দিকে মুখ ফিরাইলেন। স্বর ঈষৎ চড়াইয়া বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, তুমি সভায় গিয়ে বলো আজ আমি সভায় যাব না। তুমি সভা থেকে গৃহে ফিরে যাও, আজ আর তোমাকে প্রয়োজন হবে না।'

রাজাকে প্রণাম করিয়া অর্জুন চলিয়া গেল। সোপান দিয়া নামিতে নামিতে তাহার হৃৎপিণ্ড আশঙ্কায় ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল। রাজার কণ্ঠস্বরে আজ যেন অনভ্যস্ত কঠিনতা ছিল। তিনি কি কিছু জানিতে পারিয়াছেন ? পিঙ্গলা কি— ?

অপরাধ না করিয়াও যাহারা অপরাধীর অধিক মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে অর্জুনের অবস্থা তাহাদের মত।

বিরামকক্ষে দেবরায় পালঙ্কে বসিয়াছিলেন। তিনি পিঙ্গলার পানে গম্ভীর চক্ষু তুলিয়া বলিলেন—'অর্জুন সম্বন্ধে গোপন কথা কী আছে ?'

পিঙ্গলা রাজার পায়ের কাছে ভূমিতলে বসিল, করজোড়ে বলিল—'আর্য, অভয় দিন।'

রাজা বলিলেন—'নির্ভয়ে বল।'

পিঙ্গলা তখন ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—'কিছুদিন থেকে দাসীদের মধ্যে কানাকানি শুনছিলাম ; দেবী বিদ্যুন্মালা নাকি অন্তরালে অর্জুনবর্মার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন। আমি শুনেও গ্রাহ্য করিনি। অর্জুনবর্মা দেবী বিদ্যুন্মালার সঙ্গে নৌকোয় এসেছেন, তাঁকে নদী থেকে উদ্ধার করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের মধ্যে বাক্যালাপ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজ আমি নিজের চোখে দেখেছি মহারাজ।'

'কী দেখেছ?'

তখন পিঙ্গলা যাহা দেখিয়াছিল, শুনিয়াছিল, রাজাকে শুনাইল। বিদ্যুন্মালা অর্জুনের কাঁধে হাত রাখিয়া অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহার পুনরাবৃত্তি করিল। কিছু বাড়াইয়া বলিল না, কিছু কমাইয়াও বলিল না। রাজা শুনিয়া বজ্রগর্ভ মেঘের ন্যায় মুখ অন্ধকার করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বলরাম একটি নূতন কামান প্রস্তুত করিয়াছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা সেটি থলিতে ভরিয়া সে বাহির হইল। অর্জুনকে বলিয়া গেল—'রাজাকে কামান দিতে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে বিয়ের কথাটাও পাকা করে আসব। একটা বৌ না হলে ঘর-দোর আর মানাচ্ছে না।'

অর্জুন নিজ শয্যায় লম্বমান হইয়া ছাদের পানে চাহিয়া ছিল, উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল, তারপর ঘরময় পদচারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভালবাসা পাইয়াও সুখ নাই ; একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কা তাহার অন্তঃকরণকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে ; যেন মরণাধিক একটা মহাবিপদ অলক্ষ্যে ওত পাতিয়া আছে, কখন অকস্মাৎ ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে। এই শঙ্কার হাত হইতে পলকের জন্য নিস্তার নাই। মাঝে মাঝে তাহার ইচ্ছা হইয়াছে, চুপি চুপি কাহাকেও না বলিয়া বিজয়নগর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু কোথায় পলাইবে? বিজয়নগর তাহার হৃদয়কে লৌহজটিল বন্ধনে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। বিজয়নগর ছাড়িয়া আর সে মুসলমান রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। প্রাণ যায় সেও ভাল।

কঙ্কণ-কিঙ্কিণীর মৃদু শব্দে অর্জুন দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল বিদ্যুন্মালা দ্বারের সম্মুখে আসিয়া কক্ষের এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বলরাম নাই দেখিয়া তিনি অর্জুনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দীপের স্নিগ্ধ আলোকস্পর্শে তাঁহার সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার ঝলমল করিয়া উঠিল।

বিদ্যুন্মালা ভঙ্গুর হাসিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—'আমি মরতে চাই না, আমি তোমাকে চাই। আমার লজ্জা নেই, অভিমান নেই, আমি শুধু তোমাকে চাই।' দুই বাহু বাড়াইয়া তিনি অর্জুনের গলা জড়াইয়া লইলেন। একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিলেন।

অর্জুন জগৎ ভুলিয়া গেল। তাহার বাহু অবশে বিদ্যুন্মালার দেহ দৃঢ় বন্ধনে বেষ্টন করিয়া লইল।

হিয়ে হিয় রাখনু। যুগ কাটিল কি মুহূর্ত কাটিল ধারণা নাই। হৃদয় কোন্ অতলস্পর্শ অমৃতসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রতি অঙ্গে রোমহর্ষণ।

তারপর এই আত্মবিস্মৃত রসোল্লাসের অতল হইতে দুইজনে উঠিয়া আসিলেন। চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, কে একজন তাঁহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তবু সহজে মোহতন্দ্রা কাটিতে চায় না। ধীরে ধীরে তাঁহারা চেতনার বহির্লোকে ফিরিয়া আসিলেন। যিনি দাঁড়াইয়া আছেন তিনি—মহারাজ দেবরায়!

এই ভয়ঙ্কর সত্য সম্পূর্ণরূপে অন্তরে প্রবেশ করিলে দুইজনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বিদ্যুন্মালার দিকে তাকাইলেন না, অর্জুনের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ভয়াল

কণ্ঠে বলিলেন—'অর্জুনবর্মা !'

অর্জুন নতমুখে রহিল, মুখে কথা যোগাইল না। রাজা যে-দৃশ্য দেখিয়াছেন তাহার একমাত্র অর্থ হয়, দ্বিতীয় অর্থ হয় না ; সুতরাং বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

রাজার কটি হইতে তরবারি বিলম্বিত ছিল, রাজা তাহার মুষ্টিতে হাত রাখিলেন। বিদ্যুন্মালা ত্রাস-বিস্ফারিত নেত্রে রাজার পানে চাহিয়া ছিলেন। তিনি সহসা মুখে অব্যক্ত আকুতি করিয়া রাজার পদতলে পতিত হইলেন ; ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'রাজাধিরাজ, অর্জুনবর্মাকে ক্ষমা করুন। ওঁর কোনো দোষ নেই, আমি অপরাধিনী। হত্যা করতে হয় আমাকে হত্যা করুন।'

রাজা বিরাগপূর্ণ নেত্রে বিদ্যুন্মালার পানে চাহিলেন। বিদ্যুন্মালা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া বলিতে লাগিলেন—'রাজাধিরাজ, আমি অর্জুনবর্মাকে প্রলুব্ধ করেছিলাম, কিন্তু উনি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে সম্মত হননি। ওঁর অপরাধ নেই, আমি অপরাধিনী, আমাকে দণ্ড দিন।'

রাজার মুখের কোনো পরিবর্তন হইল না, তিনি আরো কিছুক্ষণ ঘৃণাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া দুই হাতে তালি বাজাইলেন। অমনি ছয়জন অসিধারিণী প্রতিহারিণী কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহাদের অগ্রে পিঙ্গলা।

রাজা বলিলেন—'রাজকুমারীকে মহলে নিয়ে যাও।'

পিঙ্গলা বিদ্যুন্মালার হাত ধরিয়া তুলিল, সহজ স্বরে বলিল—'আসুন দেবি।'

বিদ্যুন্মালা একবার রাজার দিকে একবার অর্জুনের দিকে চাহিলেন, তারপর অধর দংশন করিয়া গর্বিত পদক্ষেপে দাসীদের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। তিনি রাজকন্যা, দাসী-কিঙ্করীর সম্মুখে দীনতা প্রকাশ করা চলিবে না।

কক্ষে রহিলেন রাজা এবং অর্জুন। রাজা বহ্নিমান শৈলশৃঙ্গের ন্যায় জ্বলিতেছেন, অর্জুন তাঁহার সম্মুখে মুহ্যমান। রাজার হাত আবার তরবারির মুষ্টির উপর পড়িল ; তিনি বলিলেন—'রাজকন্যা যা বলে গেলেন তা সত্য ?'

অর্জুন জানে রাজকন্যার কথা সত্য, কিন্তু নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহার স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইতে পারিবে না। সে একবার মুখ তুলিয়া আবার মুখ নত করিল ; ধীরে ধীরে বলিল—'আমিও সমান অপরাধী মহারাজ।'

রাজা গর্জিয়া উঠিলেন—'কৃতঘ্ন ! বিশ্বাসঘাতক ! এ অপরাধের দণ্ড জানো ?'

অর্জুন মুখ তুলিল না, বলিল—'জানি মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'মৃত্যুদণ্ডই তোমার একমাত্র দণ্ড। কিন্তু তুমি একদিন আমার প্রাণরক্ষা করেছিলে, আমিও তোমার প্রাণদান করলাম। যাও, এই দণ্ডে আমার রাজ্য ত্যাগ কর। অহোরাত্র পরে যদি তোমাকে বিজয়নগর রাজ্যে পাওয়া যায় তোমার প্রাণদণ্ড হবে। বিজয়নগরে তোমার স্থান নেই।'

অর্জুনের কাছে ইহা প্রাণদণ্ডের চেয়েও কঠিন আজ্ঞা। কিন্তু সে নতজানু হইয়া যুক্তকরে বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

দু'দণ্ড পরে বলরাম গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল—'রাজার সাক্ষাৎ পেলাম না, তিনি বিরাম-ভবনে নেই। একি ! অর্জুন— ?'

অর্জুন ভূমির উপর জানু মুড়িয়া জানুর উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে, বলরামের কথায় পাংশু মুখ তুলিল। বলরাম কামানের থলি ফেলিয়া দ্রুত তাহার কাছে আসিয়া বসিল ; ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কী হয়েছে অর্জুন ?'

অর্জুন ভগ্নস্বরে বলিল—'রাজা আমাকে বিজয়নগর থেকে নির্বাসন দিয়েছেন।

'অ্যাঁ ! সে কী ! কেন ? কেন ?'

অর্জুন অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, তারপর নতমুখে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলরামকে সকল কথা বলিল, কিছু গোপন করিল না। শুনিয়া বলরাম কিছুক্ষণ মেঝের উপর আঙুল দিয়া আঁক-জোক কাটিল। শেষে উঠিয়া গিয়া নিজ শয্যায় শয়ন করিল।

রাজ রসবতীর দাসী রাত্রির খাবার লইয়া আসিল। মঞ্জিরা নয়, অন্য দাসী ; মঞ্জিরা এখনো পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসে নাই। দাসীকে কেহ লক্ষ্য করিল না দেখিয়া সে খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল। অবশেষে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অর্জুন উঠিল, লাঠি দু'টি হাতে লইয়া বলরামের শয্যার পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে বলিল—'বলরাম ভাই, এবার আমি যাই।'

বলরাম ধড়মড় করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল ; বলিল—'যাবে। দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও।'

সে উঠিয়া দ্রুতহস্তে নিজের জিনিসপত্র গুছাইল, নবনির্মিত কামান ইত্যাদি ছালার মধ্যে ভরিল। অর্জুন অবাক হইয়া দেখিতেছিল ; বলিল—'এ কী, তুমিও যাবে নাকি ?'

বলরাম বলিল—'হ্যাঁ, তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।'

অর্জুন কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—'কিন্তু—রাজার কামান তৈরি— !'

বলরাম বলিল—'কামান তৈরি রইল।'

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া অর্জুন বলিল—'আর—মঞ্জিরা ?'

বলরাম বলিল—'মঞ্জিরা রইল। যেখানে মেয়েমানুষ সেখানেই আপদ। চল, বেরিয়ে পড়া যাক—আরে, খাবার দিয়ে গেছে দেখছি। এস, খেয়ে নিই। আবার কবে রাজভোগ জুটবে কে জানে।'

অর্জুনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল না, তবু সে বলরামের সঙ্গে খাইতে বসিল। আহারান্তে দুই বন্ধু বাহিরে আসিল। বলরাম বলিল—'চল, আগে বাজারে যাই।'

পান-সুপারির বাজার তখনো সব বন্ধ হয় নাই ; বলরাম চিঁড়া ও গুড় কিনিয়া ঝোলায় রাখিল, ঝোলা কাঁধে ফেলিয়া বলিল—'পাথেয় সংগ্রহ হল। এবার চল।'

'কোন্ দিকে যাবে ?'

'পশ্চিম দিকে। পুব দিকের সীমান্ত অনেক দূরে, পশ্চিমের সীমান্ত কাছে। শুনেছি, পশ্চিম দিকে সমুদ্রতীরে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য আছে।'

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নগরের কর্ম-কলধ্বনি শান্ত হইয়া আসিতেছে। হেমকূট চূড়ায় অগ্নিস্তম্ভ অস্থির শিখায় জ্বলিতেছে। অর্জুন একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিল। তারপর হৃদয়ে অবরুদ্ধ আবেগ লইয়া অন্ধকার নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াইল। সহায়হীন যাত্রাপথে বন্ধু তাহার সঙ্গ লইয়াছে ইহাই তাহার একমাত্র ভরসা।

তিন

মহারাজ দেবরায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ন্যায়বুদ্ধি ক্রোধের অগ্নিবন্যায় ভাসিয়া যায় নাই। তিনি স্বভাবতই ধীর প্রকৃতির মানুষ, নচেৎ সেদিন অর্জুন প্রাণে বাঁচিত না।

কিন্তু মানুষ যতই ধীরপ্রকৃতির হোক, এমন একটা দৃশ্য চোখে দেখিবার পর সহজে মাথা ঠাণ্ডা হয় না। নিজের বাগ্‌দত্তা বধূ অন্য পুরুষের আলিঙ্গনবদ্ধ ! কয়জন রাজা রক্তদর্শন না করিয়া শান্ত হইতে পারেন ?

দেবরায় বিরাম-ভবনে ফিরিয়া আসিলেন, কটি হইতে তরবারি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া

পালঙ্কের পাশে বসিলেন। পিঙ্গলা বোধহয় শিলাকুট্টিমের উপর তরবারির ঝনৎকার শুনিতে পাইয়াছিল, দ্রুত আসিয়া রাজার পায়ের কাছে বসিল, জিজ্ঞাসু নেত্রে রাজার মুখের পানে চাহিল।

রাজা একবার কক্ষের চারিদিকে কষায়িত দৃষ্টি ফিরাইলেন, তারপর কঠিন স্বরে বলিলেন—'বিদ্যুন্মালাকে স্বতন্ত্র কক্ষে রাখো, দ্বারে প্রহরিণী থাকবে। আমার বিনা আদেশে কোথাও বেরুতে পাবে না।'

পিঙ্গলা বলিল—'ভাল মহারাজ। কিন্তু বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা প্রত্যহ প্রাতে পম্পাপতির মন্দিরে যান। তার কি হবে?'

দেবরায় বিবেচনা করিলেন। ক্রোধের যুক্তিহীনতা কিঞ্চিৎ উপশম হইল।—পরপুরুষ স্পর্শের দোষ ক্ষালনের জন্য পম্পাপতির পূজা, অথচ—। এ কী বিড়ম্বনা! যা হোক, হঠাৎ পম্পাপতির মন্দিরে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলে লোকে নানাপ্রকার সন্দেহ করিবে। তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। রাজ-অন্তঃপুরের কলঙ্ককথা যতক্ষণ চাপা থাকে ততক্ষণই ভাল। বিদ্যুন্মালা হাজার হোক রাজকন্যা, তাহার সম্বন্ধে সমুচিত চিন্তা করিয়া কাজ করিতে হইবে। রাজা বলিলেন—'আপাতত যেমন চলছে চলুক। ব্রত উদ্‌যাপনের আর বিলম্ব কত?'

'আর এক পক্ষ আছে আর্য।'

এক পক্ষ সময় আছে। রাজা পিঙ্গলাকে বিদায় করিয়া চিন্তা করিতে বসিলেন। রাজপরিবারে এমন উৎকট ব্যাপার বড় একটা ঘটে না। কিন্তু ঘটিলে বিষম সমস্যার উৎপত্তি হয়।

মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপ একবার আসিলেন। রাজা তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না। লক্ষ্মণ মল্লপ রাজার বিমনা ভাব ও বাক্যালাপে অনৌৎসুক্য দেখিয়া দুই-চারিটা কাজের কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

—স্ত্রীজাতির মন স্বভাবতই চঞ্চল। অধিকাংশ নারীই বিকীর্ণমন্মথা। কিন্তু বিদ্যুন্মালাকে দেখিয়া চপল-স্বভাব মনে হয় না। সে গম্ভীর প্রকৃতির নারী। রাজকুমারীসুলভ আত্মাভিমান তাহার মনে আছে। তবে সে এমন একটা কাজ করিয়া বসিল কেন!

অর্জুন তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, নদী হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। অঙ্গস্পর্শ না করিয়া নদী হইতে উদ্ধার করা যায় না, অনিবার্যভাবেই অঙ্গস্পর্শ ঘটিয়াছিল। কিসে কি হয় বলা যায় না, সম্ভবত অঙ্গস্পর্শের ফলেই বিদ্যুন্মালা অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। নারীর মন একবার যাহার প্রতি ধাবিত হয়, সহজে নিবৃত্ত হয় না।

আর অর্জুন! সে প্রভুর সহিত এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিল! অর্জুনের চরিত্র স্বভাবতই সৎ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; তাহার প্রত্যেক কার্যে তাহার সৎস্বভাব সুপরিস্ফুট। হয়তো বিদ্যুন্মালার কথাই সত্য, সে অর্জুনকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। রমণীর কুহক-ফাঁদে আবদ্ধ হইয়া কত সচ্চরিত্র যুবার সর্বনাশ হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

অর্জুন শাস্তি পাইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই: বিদ্যুন্মালাকে লইয়া কী করা যায়? জানিয়া শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করা অসম্ভব। অথচ বিবাহ না করিয়া তাহাকে পিতৃরাজ্যে ফিরাইয়া দেওয়াও যায় না। গজপতি ভানুদেব সামান্য ব্যক্তি নন, তিনি এই অপমান সহ্য করিবেন না। আবার যুদ্ধ বাধিবে, যে মিত্র হইয়াছে সে আবার শত্রু হইবে।...বিষ খাওয়াইয়া কিংবা অন্য কোনো উপায়ে বিদ্যুন্মালার প্রাণনাশ করিয়া অপঘাত বলিয়া রটনা করিয়া দিলে সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু—

মণিকঙ্কণা প্রবেশ করিল। তাহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু দু'টি আতঙ্কে বিস্ফারিত। দ্বিধাজড়িত পদে সে পালঙ্কের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, শঙ্কা-সংহত কণ্ঠে বলিল—'মহারাজ, কি হয়েছে? মালা কী করেছে?'

বিদ্যুন্মালা ভিতরে ভিতরে কী করিতেছে মণিকঙ্কণা কিছুই জানিতে পারে নাই। এখন

বিদ্যুন্মালাকে সহসা বন্দিনী অবস্থায় পৃথক কক্ষে রক্ষিত হইতে দেখিয়া মণিকঙ্কণা আশঙ্কায় একেবারে দিশাহারা হইয়া গিয়াছে।

দেবরায় অপলক নেত্রে কিয়ৎকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—'তুমি জানো না ?'

মণিকঙ্কণা পালঙ্কের পাশে বসিয়া পড়িল, রাজার পায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল—'না মহারাজ, আমি কিছু জানি না। কিন্তু আমার বড় ভয় করছে।'

সহসা মহারাজ দেবরায়ের মনের উষ্মা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। পৃথিবীতে বিদ্যুন্মালাও আছে, মণিকঙ্কণাও আছে ; সরলতা ও কপটতা পাশাপাশি বাস করিতেছে। তিনি মণিকঙ্কণাকে কাছে টানিয়া আনিয়া ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলিলেন—'তাহলে তোমার জেনে কাজ নেই। আজ থেকে তুমি আর বিদ্যুন্মালা পৃথক থাকবে।'

মণিকঙ্কণা আর প্রশ্ন করিল না, রাজার জানুর উপর মাথা রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

অর্জুন ও বলরাম চলিয়াছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে অস্পষ্ট পথরেখা ধরিয়া চলিয়াছিল। কেহ কথা বলিতেছিল না, বলিবার আছেই বা কি ?

একে একে নগরের সপ্ত তোরণ পার হইয়া মধ্যরাত্রে তাহারা নগরসীমানার বাহিরে উপস্থিত হইল। অতঃপর রাজপথের স্পষ্ট নির্দেশ আর পাওয়া যায় না ; নদী যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, রাজপথও তেমনি উন্মুক্ত শিলাতরঙ্গিত প্রান্তরে আসিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। পথ-বিপথ নির্ণয় করিয়া অগ্রসর হওয়া দুষ্কর।

চলিতে চলিতে টিপিটিপি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বলরাম এতক্ষণ নীরবে চলিয়াছিল, এখন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, বলিল—'আকাশের দেবরাজ আর বিজয়নগরের দেবরায়, দু'জনেই আমাদের প্রতি বিরূপ।'

কয়েক পা চলিবার পর অর্জুন বলিল—'বিজয়নগরের দেবরায়ের দোষ নেই। দোষ আমার।'

বলরাম বলিল—'কারুর দোষ নয়, দোষ ভাগ্যের। দৈবজ্ঞ ঠাকুর ঠিক বলেছিলেন।'

'হুঁ। আমার সঙ্গদোষে তোমারও সর্বনাশ হল।'

'সে আমার ভাগ্য।'

টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মৃদু স্ফুরণ অদৃশ্য প্রকৃতিকে পলকের জন্য দৃশ্যমান করিয়া লুপ্ত হইতেছে। থমকিয়া থমকিয়া বায়ুর একটা তরঙ্গ বহিতে আরম্ভ করিল। পথিক দু'জন এতক্ষণ বিশেষ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে নাই, এখন রোমাঞ্চকর শৈত্য অনুভব করিতে লাগিল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইবার পর বিদ্যুতের আলোকে অদূরে একটি দেউল চোখে পড়িল। দেউলটি ভগ্নপ্রায়, কিন্তু তাহার ছাদযুক্ত বহিরঙ্গন এখনো দাঁড়াইয়া আছে। পরিত্যক্ত দেবালয়। এখানে মানুষ কেহ থাকে বলিয়া মনে হয় না। বলরাম বলিল—'এস, খানিক বিশ্রাম করা যাক। দিনের আলো ফুটলে আবার বেরিয়ে পড়া যাবে।'

দুইজনে ছাদের নীচে গিয়া বসিল। এখানে বিরক্তিকর বৃষ্টি ও বাতাস নাই, ভূমিতলও শুষ্ক। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর বলরাম পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া শয়ন করিল। অর্জুনের দেহ অপেক্ষা মন অধিক ক্লান্ত, সে জানুর উপর মাথা রাখিয়া অবসন্ন মনে ভাবিতে লাগিল—বিদ্যুন্মালার ভাগ্যে কী আছে...

দু'জনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুম ভাঙ্গিল পাখির ডাকে। আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া দিনের আলো ফুটিয়াছে। কয়েকটা চটক পক্ষী মণ্ডপের তলে উড়িয়া কিচিরমিচির করিতেছে। আশেপাশে কোথাও মানুষের চিহ্ন নাই। দেউলে দেবতার বিগ্রহ নাই।

অর্জুন ও বলরাম আবার বাহির হইয়া পড়িল। বৃষ্টি থামিয়াছে, মেঘের গায়ে ফাটল ধরিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া নীল আকাশ দেখা যাইতেছে। বলরাম ঝুলি হইতে একমুঠি চিঁড়া বাহির করিয়া অর্জুনকে দিল, নিজে একমুঠি লইল, বলিল—'খেতে খেতে চল।'

বলরাম চিঁড়া চিবাইতে চিবাইতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিল। বলিল—'এখানে মানুষ-জন নেই বটে, কিন্তু আগে জনবসতি ছিল, হয়তো গ্রাম ছিল। এখনো তার চিহ্ন পড়ে রয়েছে চারিদিকে। কতদিন আগে গ্রাম ছিল কে জানে!'

অর্জুন একবার চক্ষু তুলিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গৃহের ভগ্নাবশেষগুলি দেখিল, বলিল—'পঞ্চাশ-ষাট বছরের বেশি নয়। হয়তো মুসলমানেরা এদিক থেকে বিজয়নগর আক্রমণ করেছিল, তারপর গ্রাম ছারখার করে দিয়ে চলে গেছে।'

'তাই হবে।'

ক্রমে সূর্যোদয় হইল, ছিন্ন মেঘের ফাঁকে কাঁচা রৌদ্র চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, পাশে তুঙ্গভদ্রার জল ঝলমল করিয়া উঠিল।

তাহারা পশ্চিমদিকে যাইতেছে, ডানদিকে তুঙ্গভদ্রা। কিন্তু তাহারা তুঙ্গভদ্রার বেশি কাছে যাইতেছে না, সাত-আট রজ্জু দূর দিয়া যাইতেছে ; তুঙ্গভদ্রার তীরে সেনা-গুল্ম আছে, সৈনিকদের হাতে পাড়লে হাঙ্গামা বাধিতে পারে।

পথে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পড়িল। বর্ষার জলে খরস্রোতা কিন্তু অগভীর, দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া তুঙ্গভদ্রায় মিলিয়াছে। অর্জুন ও বলরাম জলে নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিল। তারপর এক-হাঁটু জল পার হইয়া চলিতে লাগিল।

তরঙ্গায়িত ভূমি, শিলাখণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে তৃণোদ্‌গম হইয়াছে, পথের চিহ্ন নাই। আকাশে কখনো রৌদ্র কখনো ছায়া। দুই পান্থ চলিয়াছে। সূর্যাস্তের পূর্বে বিজয়নগর রাজ্যের সীমানা পার হইয়া যাইতে হইবে।

দ্বিপ্রহরে তাহারা একটি পয়োনালকের তীরে বসিয়া গুড় সহযোগে চিঁড়া ভক্ষণ করিল, তারপর পয়ঃপ্রণালীতে জল পান করিয়া আবার চলিতে লাগিল।

অপরাহ্নে তাহারা একটি বিস্তীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছিল। উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পর্বত প্রাকারের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। বোধহয় এই পর্বতই বিজয়নগর রাজ্যের অপরান্ত।

উপত্যকার উপর দিয়া যাইতে যাইতে দুই পান্থ লক্ষ্য করিল, আশেপাশে নিকটে দূরে বহু স্তূপ রহিয়াছে ; স্তূপগুলির অভ্যন্তরস্থ পাথর দেখা যায় না, বহু যুগের ধূলা ও বালুকায় ঢাকা পড়িয়াছে। মনে হয়, সুদূর অতীতকালে এই উপত্যকায় একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল ; তারপর কালের আগুনে পুড়িয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। মানুষের হস্তাবলেপের সব চিহ্ন নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে।

অর্জুন ও বলরাম প্রাকারসদৃশ পর্বতের পদমূলে যখন পৌঁছিল তখন সূর্যাস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু সূর্য পর্বতের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। পর্বতের পৃষ্ঠদেশে এক সারি উচ্চ পাষাণ-স্তম্ভ দেখিয়া বোঝা যায় ইহাই বিজয়নগর রাজ্যের পশ্চিম সীমানা।

বলরাম ঊর্ধ্বে চাহিয়া বলিল—'এই পাহাড়টা পার হলেই আমরা মুক্ত। চল, বেলা থাকতে থাকতে পার হয়ে যাই।'

পর্বতগাত্র পিচ্ছিল। সাবধানে উপরে উঠিতে উঠিতে বলরাম মন্তব্য করিল—'ওপারে কাদের

রাজ্য কে জানে।'

অর্জুন বলিল—'যদি মুসলমান রাজ্য হয়—'

বলরাম বলিল—'যদি মুসলমান রাজ্য হয়, অন্য রাজ্যে চলে যাব। দক্ষিণে সমুদ্রতীরে দু'একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য আছে।'

পাহাড়ে বেশি দূর উঠিতে হইল না, অল্প দূরে উঠিয়া তাহারা দেখিল সম্মুখেই একটি গুহার মুখ। বহুকাল পূর্বে এই গুহা মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হইত, গুহার মুখে উচ্চ খিলান দিয়া বাঁধানো ছিল। এখন খিলান ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গুহামুখে স্তূপীভূত হইয়াছে। কিন্তু গুহার মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই।

বলরাম গুহার মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিয়া বলিল—'আমাদের দেখছি গুহা-ভাগ্য প্রবল, যেখানে যাই সেখানেই গুহা।'

বলরাম একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিল, আকাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল—'রাত্রে বোধহয় আবার বৃষ্টি হবে। পাহাড়ের ওপারে আশ্রয় পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই।—কি বল? আজ রাত্রিটা গুহাতেই কাটাবে?'

অর্জুন নির্লিপ্ত স্বরে বলিল—'তোমার যেমন ইচ্ছা।'

'তবে এস, এই বেলা গুহায় ঢুকে পড়া যাক।' বলরাম উঠিয়া গুহায় প্রবেশের উপক্রম করিল।

এই সময় অর্জুনের দৃষ্টি পড়িল গুহামুখের একটি প্রস্তরফলকের উপর। অসমতল প্রস্তরফলকের গাত্রে প্রাচীন কণাটী লিপিতে কয়েকটি আঁকাবাঁকা শব্দ খোদিত রহিয়াছে।

অপটু হস্তে পাষাণ কাটিয়া কেহ এই শব্দগুলি খোদিত করিয়াছিল। বহুকালের রৌদ্রবৃষ্টির প্রকোপে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবু যত্ন করিলে পাঠোদ্ধার করা যায়—'দেবদাসী তনুশ্রী গৌড়নিবাসী শিল্পী মীনকেতুকে কামনা করিয়াছিল।'

অর্জুন কিছুক্ষণ এই শিলালেখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপর বাহিরে একটি শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। বলরাম বলিল—'কি হল?'

অর্জুন উত্তর দিল না, বহু দূর অতীতের এক পরিচয়হীনা নারীর কথা ভাবিতে লাগিল। কবে কে জানে, তনুশ্রী নামে এক দেবদাসী ছিল...সম্মুখের উপত্যকায় নগরী ছিল, নগরীর দেবমন্দিরে তনুশ্রী ছিল দেবদাসী...সেকালে দেবদাসীদের বিবাহ হইত না, তাহারা দেবভোগ্যা...তারপর কোথা হইতে আসিল মীনকেতু নামে এক শিল্পী...হয়তো সে পাষাণ-শিল্পে দক্ষ ছিল, যে মন্দিরে তনুশ্রী ছিল দেবদাসীদের অন্যতমা সেই মন্দিরের শিল্পশোভা রচনার জন্য শিল্পী মীনকেতু আসিয়াছিল...তারপর তনুশ্রী কামনা করিল শিল্পী মীনকেতুকে...অন্তর্গূঢ় তীব্র কামনা...দিন কাটিল মাস কাটিল, কিন্তু তনুশ্রীর কামনা পূর্ণ হইল না...শিল্পী মীনকেতু একদিন কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেল, হয়তো তনুশ্রীকে নিজের বজ্রসূচী উপহার দিয়া গেল...তারপর একদিন অন্তরের গোপন দাহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া তনুশ্রী চুপি চুপি গুহামুখে আসিয়া পাষাণ-গাত্রে নিজের মর্মজ্বালা খোদিত করিয়া রাখিল; অনিপুণ হস্তের স্বল্পাক্ষর ভাষায় তাহার হৃদয়ের ক্রন্দন প্রকাশ পাইল—দেবদাসী তনুশ্রী গৌড়নিবাসী শিল্পী মীনকেতুকে কামনা করিয়াছিল।—কামনা পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণ হইলে মর্মান্তিক গোপন কথা পাষাণে উৎকীর্ণ হইত না।

সামান্যা দেবদাসী তনুশ্রীকে কেহ মনে করিয়া রাখে নাই, কিন্তু তাহার ব্যর্থ কামনা পাষাণফলকে কালজয়ী হইয়া আছে। ইহাই কি সকল ব্যর্থ কামনার অন্তিম নিয়তি!

অর্জুন তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল, কয়েক বিন্দু বৃষ্টির জল তাহার মাথায় পড়িল। সে ঊর্ধ্বে একবার নেত্রপাত করিয়া দেখিল, সন্ধ্যার আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছে। ঝরিয়া-পড়া

বারিবিন্দু যেন দেবদাসী তনুশ্রীর অশ্রুজল।

অর্জুন উঠিয়া বলরামকে বলিল—'চল, গুহায় যাই।'

চার

গুহার প্রবেশ-মুখ বেশ প্রশস্ত, কিন্তু ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া ভিতর দিকের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ভূমিতলে শুষ্ক প্রস্তরপট্ট। এখানে শয়ন করিলে আর কোনো সুখ না থাক, বৃষ্টিতে ভিজিবার ভয় নাই।

দুইজনে প্রস্তরপট্টের খানিকটা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উপবেশন করিল। বলরাম বলিল—'মন্দ হল না। যদি বাঘ ভাল্লুক না থাকে আরামে রাত কাটবে। এস, এবার রাজভোগ সেবন করে শুয়ে পড়া যাক। অনেক হাঁটা হয়েছে।'

গুহার বাহিরে ধূসর আকাশ হইতে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হইতেছে। গুহার মধ্যে অন্ধকার ঘন হইতেছে। দুইজনে শুষ্ক চিঁড়া-গুড় সেবন করিয়া পাশাপাশি শয়ন করিল।

দু'জনেই পরিশ্রান্ত। বলরাম অচিরাৎ ঘুমাইয়া পড়িল। অর্জুনের কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘুম আসিল না। গুহার ভিতর ও বাহির অন্ধকারে ডুবিয়া গেল ; রাত্রি গভীর হইতে লাগিল।

ক্লান্ত চক্ষু অন্ধকারে মেলিয়া অর্জুন চিন্তা করিতে লাগিল দুইটি নারীর কথা ; এক, বহুযুগের পরপার হইতে আগতা তনুশ্রী, দ্বিতীয়—বিদ্যুন্মালা। একজন সামান্যা দেবদাসী, অন্যা রাজকুমারী। কিন্তু তাহাদের জীবনের এক স্থানে ঐক্য আছে ; তাহারা যাহা কামনা করিয়াছিল তাহা পায় নাই। নিয়তির পক্ষপাত নাই, নিয়তির কাছে রাজকন্যা এবং দেবদাসী সমান। —অর্জুনের মনের মধ্যে রাজকন্যা ও দেবদাসী একাকার হইয়া গেল।

গুহার মধ্যে শীতল জলসিক্ত বায়ুর মন্দ প্রবাহ রহিয়াছে। বায়ুপ্রবাহ গুহা-মুখের দিক হইতে আসিতেছে না, ভিতর দিক হইতে আসিতেছে। অর্জুন কিছুক্ষণ তাহা অনুভব করিয়া ভাবিল—গুহার মধ্যে তো বায়ু-চলাচল থাকে না, বদ্ধ বাতাস থাকে ; তবে কি এ-গুহা নয়, সুড়ঙ্গ ? পাহাড়ের পেট ফুঁড়িয়া অপর পাশে বাহির হইয়াছে ? তাহা যদি হয়, পর্বত লঙ্ঘনের ক্লেশ বাঁচিয়া যাইবে।

ক্রমে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু এই সময় একটি অতি ক্ষীণ শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া আবার তাহাকে সজাগ করিয়া তুলিল। শব্দ নয়, যেন বাতাসের মৃদু অথচ দ্রুত স্পন্দন ; বহুদূর হইতে আসিতেছে। বাদ্যভাণ্ডের শব্দ। কিছুক্ষণ শুনিবার পর অর্জুন উঠিয়া বসিল।

হ্যাঁ, তাই বটে। বহু দূরে কিড়ি কিড়ি নাকাড়া বাজিতেছে। কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া যাইতেছে, আবার বাজিতেছে। —কিন্তু এই জনপ্রাণীহীন গিরিপ্রান্তরে এত রাত্রে নাকাড়া বাজায় কে ? শব্দটা এতই ক্ষীণ যে, কোন্ দিক হইতে আসিতেছে অনুমান করা যায় না।

অর্জুন বলরামের গায়ে হাত রাখিতেই সে উঠিয়া বসিল। অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিল না, বলরাম বলিল—'কী ?'

অর্জুন বলিল—'কান পেতে শোনো। কিছু শুনতে পাচ্ছ ?'

বলরাম কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া শুনিল ; শেষে বলিল—'অনেক দূরে নাকাড়া বাজছে ! এ কি ভৌতিক কাণ্ড না কি ? কারা নাকাড়া বাজাচ্ছে ? হুক্ক-বুক্ক ?'

অর্জুন বলিল—'না, মুসলমান নাকাড়া বাজাচ্ছে। আমি ওদের বাজনা চিনি।'

'আমিও চিনি।' বলরাম আরও খানিকক্ষণ শুনিয়া বলিল—'তাই বটে। খিটি মিটি খিটি মিটি

খিট্ খিট্। কিন্তু মুসলমান এখানে এল কোথা থেকে?'

'পাহাড়ের ওপারে হয়তো বহমনী রাজ্য।'

'তা হতে পারে, কিন্তু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এতদূরে নাকাড়ার শব্দ আসবে?'

'কেন আসবে না। এই গুহা যদি সুড়ঙ্গ হয়, তাহলে আসতে পারে।'

'সুড়ঙ্গ!'

অর্জুন বায়ু-চলাচলের কথা বলিল। শুনিয়া বলরাম বলিল—'সম্ভব। উপত্যকায় যখন মানুষের বসতি ছিল, তখন তারা এই সুড়ঙ্গ দিয়ে পাহাড় পার হত। এখন মানুষ নেই, গুহাটা পড়ে আছে।—কিন্তু মুসলমানেরা গুহার ওপারে কী করছে? ওপারে কি নগর আছে?'

'জানি না। সম্ভব মনে হয় না।'

বলরাম একটু নীরব থাকিয়া বলিল—'আজ রাত্রে আর ভেবে কোনো লাভ নেই। শুয়ে পড়। কাল সকালে উঠে দেখা যাবে।'

বলরাম শয়ন করিল। অর্জুন উৎকর্ণভাবে বসিয়া রহিল, কিন্তু দূরাগত নাকাড়াধ্বনি আর শোনা গেল না। তখন সেও শয়ন করিল।

পরদিন প্রাতে যখন তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল তখন সূর্যোদয় হইয়াছে, মেঘভাঙ্গা সজল রৌদ্র গুহা-মুখে প্রবেশ করিয়াছে। বলরাম বলিল—'এস দেখা যাক, এটা গুহা কি সুড়ঙ্গ।'

দুইজনে গুহার অভ্যন্তরের দিকে চলিল। নবোদিত সূর্যের আলো অনেক দূর পর্যন্ত গিয়াছে, সেই আলোতে পথ দেখিয়া চলিল। গুহা ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, দুইজন পাশাপাশি চলা যায় না। অর্জুন আগে আগে চলিল।

অনুমান দুই রজ্জু সিধা গিয়া রন্ধ্র তেরছাভাবে মোড় ঘুরিল। এখানে আর সূর্যের আলো নাই; প্রথমটা ছায়া-ছায়া, তারপর সূচীভেদ্য অন্ধকার।

অর্জুন তাহার লাঠি দু'টি ভল্লের ন্যায় সম্মুখে বাড়াইয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইল। অনুমান আর দুই রজ্জু গিয়া লাঠি প্রাচীরে ঠেকিল। আবার একটা মোড়, এবার বাঁ দিকে।

মোড় ঘুরিয়া কয়েক পা গিয়া অর্জুন দাঁড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়াছে, বেশ খানিকটা দূরে চতুষ্কোণ রন্ধ্রের মুখে সবুজ আলোর ঝিলিমিলি।

অর্জুন বলিল—'সুড়ঙ্গই বটে।'

সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ ক্রমশ প্রশস্ত হইয়াছে, কিন্তু সুড়ঙ্গের শেষে নির্গমনের রন্ধ্রটি বৃহৎ নয়; প্রস্থ অনুমান দুই হস্ত, খাড়াই তিন হস্ত। একজন মানুষের বেশি একসঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে না।

অর্জুন ও বলরাম রন্ধ্রমুখ দিয়া বাহিরে উঁকি মারিল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের দেহ শক্ত হইয়া উঠিল।

রন্ধ্রমুখের চারিপাশে ও নিম্নে যে-সব ঝোপ-ঝাড় জন্মিয়াছিল তাহা কাটিয়া পরিষ্কৃত হইয়াছে; রন্ধ্রমুখ হইতে জমি ক্রমশ ঢালু হইয়া প্রায় বিশ হাত নীচে সমতল হইয়াছে। সমতল ভূমিতে বড় বড় গাছের বন। গাছগুলি কিন্তু ঘন-সন্নিবিষ্ট নয়, গাছের ফাঁকে ফাঁকে বহুদূর পর্যন্ত নিষ্পাদপ ভূমি দেখা যায়। উন্মুক্ত ভূমির উপর সারি সারি অসংখ্য তালপাতার ছাউনি। ছাউনিতে অগণিত মানুষ। মানুষগুলি মুসলমান সৈনিক, তাহাদের বেশভূষা ও অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া বোঝা যায়। মাটির উপর লম্বমান অনেকগুলি তালগাছের কাণ্ডের ন্যায় বৃহৎ কামান; সৈনিকেরা কামানের গায়ে দড়ি বাঁধিয়া সেগুলিকে পাহাড়ের দিকে টানিয়া আনিতেছে। বেশি চেঁচামেচি সোরগোল নাই, প্রায় নিঃশব্দে কাজ হইতেছে।

বলরাম কিছুক্ষণ এই দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া অর্জুনের হাত ধরিয়া ভিতর দিকে টানিয়া লইল। রন্ধ্রমুখ হইতে কিছু দূরে বসিয়া দুইজনে পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলরাম

হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনি হয়, আস্তে কথা বল। কী বুঝলে?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অর্জুন বলিল—'ওরা বহমনী রাজ্যের সৈন্য।'

বলরাম বলিল—'হুঁ। কত সৈন্য?'

'ছাউনি দেখে মনে হয় দশ হাজারের কম নয়। পিছনে আরো থাকতে পারে।'

'হুঁ। ওদের মতলব কি?'

'অতর্কিতে বিজয়নগর আক্রমণ করা ছাড়া আর কী মতলব থাকতে পারে? ওরা এই সুড়ঙ্গের সন্ধান জানে, তাই সুড়ঙ্গের মুখ থেকে ঝোপ-ঝাড় কেটে পরিষ্কার করে রেখেছে। এইদিক দিয়ে সৈন্যরা বিজয়নগরে প্রবেশ করবে।'

'আর কামানগুলো? সেগুলো তো সুড়ঙ্গ দিয়ে আনা যাবে না।'

'সেইজন্যেই বোধহয় ওদের দেরি হচ্ছে। কামানগুলোকে আগে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নিয়ে যাবে, তারপর নিজেরা সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকবে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' বলরাম থলি হইতে চিঁড়া-গুড় বাহির করিয়া অর্জুনকে দিল, নিজেও লইল। বলিল—'এখন আমাদের কর্তব্য কি?'

অর্জুন বলিল—'এদের কার্যকলাপ আরো কিছুক্ষণ লক্ষ্য করা দরকার। আমরা যা অনুমান করছি তা ভুলও হতে পারে।'

দু'জনে নির্জলা প্রাতরাশ শেষ করিল। বলরাম বলিল—'ইতিমধ্যে আমার ছোট্ট কামানে বারুদ গেদে তৈরি হয়ে থাকি। যদি কেউ সুড়ঙ্গে মাথা গলায় তাকে বধ করব।'

অর্জুন বলিল—'প্রস্তুত থাকা ভাল। আমারও ভল্ল আছে।'

বলরাম থলি হইতে কামান বাহির করিল। কামানে বারুদ ও গুলি ভরিয়া নারিকেল ছোবড়ার দড়ির মুখে চকমকি ঠুকিয়া আগুন ধরাইল। তারপর দুইজনে রন্ধ্রমুখের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সৈন্যদের কার্যবিধি দেখিতে লাগিল।

যত বেলা বাড়িতেছে সৈনিকদের কর্মতৎপরতাও তত বাড়িতেছে। কয়েকজন সেনানীপদস্থ ব্যক্তি সিপাহীদের কর্ম পরিদর্শন করিতেছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, কামানগুলিকে টানিয়া পাহাড়ে তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু কামানগুলি এতই গুরুভার যে, কার্য অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

দ্বিপ্রহরে কিটি কিটি নাকাড়া বাজিল। এই নাকাড়ার ক্ষীণ শব্দ কাল রাত্রে তাহারা শুনিয়াছিল। সৈনিকেরা কর্মে বিরাম দিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিল। বলরাম ও অর্জুন তখন রন্ধ্রমুখ হইতে সরিয়া আসিল। বলরাম বলিল—'আর সন্দেহ নেই। এখন কর্তব্য কী বল।'

অর্জুন বলিল—'কর্তব্য অবিলম্বে রাজাকে সংবাদ দেওয়া।'

বলরাম কিছুক্ষণ মাথা চুলকাইল। রাজা অর্জুনকে নির্বাসন দিয়াছেন, কিন্তু অর্জুন বিজয়নগরকে মাতৃভূমি জ্ঞান করে, বিজয়নগরকে সে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবে। বলরামেরও রক্ত তপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল—'ঠিক কথা। কিন্তু রাজাকে অবিলম্বে সংবাদ কি করে দেওয়া যায়! আমি যেতে পারি, কিন্তু পায়ে হেঁটে যেতে সময় লাগবে। ততক্ষণে—' বলরাম রন্ধ্রমুখের দিকে হস্ত সঞ্চালন করিল।

অর্জুন বলিল—'তুমি যাবে না, আমি যাব।'

বলরাম চমকিয়া বলিল—'তুমি যাবে! কিন্তু রাজ্যের মধ্যে ধরা পড়লেই তো তোমার মুণ্ড যাবে।'

অর্জুন বলিল—'যায় যাক। আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই। যদি বিজয়নগরকে রক্ষা করতে পারি—'

'অর্জুন, আমার কথা শোনো। তুমি থাকো, আমি যাচ্ছি। কাল এই সময় পৌঁছুতে পারব।'

'না। ততক্ষণে শত্রু কামান নিয়ে পাহাড় পার হবে। আমি লাঠিতে চড়ে শীঘ্র যাব, আজ রাত্রেই রাজাকে সংবাদ দিতে পারব।'

'কিন্তু—তুমি বিজয়নগরকে এত ভালবাসো ?'

'বিজয়নগরকে বেশি ভালবাসি, কি রাজাকে বেশি ভালবাসি, কি বিদ্যুন্মালাকে বেশি ভালবাসি, তা জানি না। কিন্তু আমি যাব।'

এই সময় বাধা পড়িল। রন্ধ্রমুখের বাহিরে মানুষের কণ্ঠস্বর। বলরাম ও অর্জুন দ্রুত উঠিয়া গুহামুখের পাশের দিকে সরিয়া গেল ; বলরাম একবার গলা বাড়াইয়া দেখিল, তারপর অর্জুনের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—'তিন-চারজন সেনানী এদিক পানে আসছে। তৈরি থাকো, ওরা গুহার মধ্যে পা বাড়ালেই কামান দাগব।' বলরাম ক্ষিপ্র হস্তে কামান ও আগুনের পলিতা হাতে লইয়া দাঁড়াইল।

সেনানীরা ঢালু জমি দিয়া উপরে উঠিতেছে, তাহাদের বাক্যাংশ বিচ্ছিন্নভাবে শোনা গেল—

'কামানগুলো আগে পাহাড়ের ওপারে নিয়ে যেতে হবে, তারপর...'

'সৈন্যরা যখন ইচ্ছা সুড়ঙ্গ পার হতে পারে...'

'তুমি সুড়ঙ্গে ঢুকে দেখেছ ?'

'দেখেছি। মাঝখানে অন্ধকার বটে, কিন্তু মশাল জ্বাললে...'

'এস দেখি।'

রন্ধ্রের মুখ সংকীর্ণ, একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারে না। বলরাম রন্ধ্রমুখের দিকে কামান লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইল।

একটা মানুষ রন্ধ্রমুখে দেখা গেল। সে রন্ধ্রে প্রবেশ করিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে অমনি বলরামের কামান ছুটিল। গুহামধ্যে বিকট প্রতিধ্বনি উঠিল।

প্রবেশোন্মুখ লোকটার বুকে গুলি লাগিয়াছিল, সে রন্ধ্রের বাহিরে পড়িয়া গেল, তারপর ঢালু জমির উপর গড়াইতে গড়াইতে নীচে নামিয়া গেল। অন্য যাহারা সঙ্গে ছিল তাহারা এই অভাবনীয় বিপর্যয়ে ভয় পাইয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল।

বলরাম উত্তেজিতভাবে অর্জুনের কানে কানে বলিল—'তুমি যাও, রাজাকে খবর দাও। আমি এখানে আছি। যতক্ষণ বারুদ আছে ততক্ষণ কাউকে গুহায় ঢুকতে দেব না।' সে আবার কামানে গুলি-বারুদ ভরিতে লাগিল।

'চললাম।' অর্জুন একবার বলরামকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল। হয়তো আর দেখা হইবে না।

পাঁচ

সুড়ঙ্গের পূর্ব প্রান্তে নির্গত হইয়া অর্জুন আকাশের পানে চাহিল। মেঘ-ঢাকা আকাশে ছাই-ঢাকা অঙ্গারের মত সূর্য একটু পশ্চিমে ঢলিয়াছে। এখনো দেড় প্রহর বেলা আছে। এই বেলা বাহির হইয়া পড়িলে সন্ধ্যার পর বিজয়নগরে পৌঁছানো যাইবে। অর্জুন উপত্যকায় নামিল, তারপর লাঠিতে চড়িয়া পূর্বমুখে দীর্ঘায়িত পদদ্বয় চালিত করিয়া দিল।

তেজস্বী অশ্ব যেরূপ শীঘ্র চলে, অর্জুন সেইরূপ শীঘ্র চলিয়াছে। তবু তাহার মনঃপূত হইতেছে না, আরো শীঘ্র চলিতে পারিলে ভাল হয়। তাহার আশঙ্কা, যদি ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়, যদি ঘন মেঘের অন্তরালে সূর্য আকাশে অস্তমিত হয়, তাহা হইলে পথ চিনিয়া বিজয়নগরে ফিরিয়া

যাওয়া সম্ভব হইবে না। পথের একমাত্র নির্দেশ দূরে বাম দিকে তুঙ্গভদ্রার উদ্বেল ধারা। তুঙ্গভদ্রার সমান্তরালে চলিলে পথ ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি প্রবল বারিধারায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তুঙ্গভদ্রাকে দেখা যাইবে না।

অর্জুন দুই দণ্ডে উপত্যকা পার হইল। তারপর উদ্‌ঘাতপূর্ণ শিলাবিকীর্ণ ভূমি, সাবধানে না চলিলে অপঘাতের সম্ভাবনা। অর্জুন সতর্কভাবে চলিতে লাগিল, তাহার গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর হইল। তবু এইভাবে চলিলে সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে পৌঁছানো যাইতে পারে। এখনো প্রায় বিশ ক্রোশ পথ বাকি।

সূর্য দিগন্তের দিকে আরো নামিয়া পড়িল। দিক্‌চক্রে গাঢ় মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাই সূর্যাস্তের পূর্বেই চতুর্দিক ছায়াচ্ছন্ন, দূরের দৃশ্য অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তারপর হঠাৎ একটি দুর্ঘটনা হইল। অর্জুনের একটি লাঠি পাথরের ফাটলের মধ্যে আটকাইয়া গিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অর্জুন প্রস্তুত ছিল না, হুমড়ি খাইয়া মাটিতে পড়িল।

ত্বরিতে উঠিয়া সে ভগ্ন লাঠি পরীক্ষা করিল। লাঠি ঠিক মাঝখানে ভাঙিয়াছে, ব্যবহারের উপায় নাই। অর্জুন কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইল, তারপর ভাঙ্গা লাঠি ফেলিয়া দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তর-কর্কশ ভূমির উপর দিয়া নগ্নপদে ছুটিয়া চলিল।

সূর্য অস্ত গেল। যেটুকু আলো ছিল তাহাও নিভিয়া গেল, আকাশের অষ্ট দিক হইতে যেন দলে দলে বাদুড় আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দিক্‌চিহ্নহীন ভূমিতলে আর কিছু দেখা যায় না।

অর্জুন তবু ছুটিয়া চলিয়াছে। শিলাঘাতে চরণ ক্ষতবিক্ষত, কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহার জ্ঞান নাই, তবু অন্তরের দুরন্ত প্রেরণায় ছুটিয়া চলিয়াছে।

রাত্রি কত ? প্রথম প্রহর কি অতীত হইয়া গিয়াছে ! তবে কি আজ রাত্রে রাজার কাছে পৌঁছানো যাইবে না ? অর্জুন থমকিয়া দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সহসা চোখে পড়িল বাম দিকে দিগন্তরেখার কাছে ক্ষুদ্র রক্তাভ একটি আলোকপিণ্ড। প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না ; তারপর মনে পড়িল—হেমকূট পর্বতের মাথায় অগ্নিস্তম্ভ। সে দিগ্‌ভ্রান্তভাবে দক্ষিণে চলিয়াছিল।

একটা নিশানা যখন পাওয়া গিয়াছে তখন আর ভাবনা নাই। বিজয়নগর এখনো অনেক দূরে, কিন্তু সেখান হইতে আলোর হাতছানি আসিয়াছে। অর্জুন অগ্নিবিন্দুটি সম্মুখে রাখিয়া আবার দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

মনে হইতেছে যেন অগ্নিবিন্দুটি আকারে বড় হইতেছে, শিখা দেখা যাইতেছে। বিজয়নগর আর বেশি দূর নয়।

তারপর হঠাৎ সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। অন্ধকারে ছুটিতে ছুটিতে সহসা তাহার পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল, ক্ষণকাল শূন্যে পড়িতে পড়িতে সে ঝপাং করিয়া জলে পড়িল, পতনের বেগে জলে ডুবিয়া গেল। তারপর যখন সে মাথা জাগাইল, তখন ভরা নদীর খরস্রোত তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে।

আবার তুঙ্গভদ্রার জলে অবগাহন। কিন্তু এবার ভয় নাই। তুঙ্গভদ্রা তাহাকে বিজয়নগর পৌঁছাইয়া দিবে।

অর্জুন চলিয়া যাইবার পর বলরাম কামানে গুলি-বারুদ ভরিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে বসিয়া রহিল। রন্ধ্রমুখের বাহির হইতে বহু কণ্ঠের উত্তেজিত কলরব আসিতেছে। কিন্তু রন্ধ্রমুখের কাছে কেহ আসিতেছে না। বলরাম দাঁত খিঁচাইয়া হিংস্র হাসি হাসিল, মনে মনে বলিল—'যিনি এদিকে

আসবেন তাঁকে শহীদী'র শরবৎ পান করাব।'*

দু'দণ্ড অপেক্ষা করিবার পর কেহ আসিতেছে না দেখিয়া বলরাম গুড়ি মারিয়া গুহামুখের নিকটে আসিল। বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দেখিল, পঞ্চাশ হাত দূরে হৈ হৈ কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। ভিমরুলের চাকে ঢিল মারিলে যেরূপ হয় পরিস্থিতি প্রায় সেইরূপ ; বিক্ষিপ্ত চঞ্চল পতঙ্গের মত অগণিত মুসলমান সৈনিক বিভ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, অধিকাংশ সৈনিক কটি হইতে তরবারি বাহির করিয়া আস্ফালন করিতেছে। কিন্তু মৃতদেহটা যেখানে গড়াইয়া পড়িয়াছিল সেখানেই পড়িয়া আছে, কেহ তাহার নিকটে আসিতে সাহস করে নাই। একদল সৈনিক অর্ধচন্দ্রাকারে কাতার দিয়া পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়াইয়া আছে এবং একদৃষ্টে মৃতদেহের পানে তাকাইয়া আছে।

তাহাদের ভীতি ও বিভ্রান্তির যথেষ্ট কারণ ছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল কাছাকাছি শত্রু নাই। তাহারা ইতিপূর্বে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সুড়ঙ্গের এপার ওপার দেখিয়া আসিয়াছে, জনমানবের দর্শন পায় নাই। হঠাৎ এ কী হইল ? গুহার মধ্য হইতে কাহারা অস্ত্র নিক্ষেপ করিল ! কেমন অস্ত্র ! তীর নয়, তীর হইলে দেহে বিঁধিয়া থাকিত। তবে কেমন অস্ত্র ? আততায়ী মানুষ না জিন্ ! ছোট কামান যে থাকিতে পারে ইহা তাহাদের বুদ্ধির অতীত।

সেনানীরা নিজেদের মধ্যে এই অভাবনীয় ঘটনার আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। সকলেরই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। পাহাড় ডিঙ্গাইয়া কামান লইয়া যাওয়ার কাজও স্থগিত হইল। মৃতদেহটা সারাদিন পড়িয়া রহিল।

সূর্যাস্তের পর অন্ধকার গাঢ় হইলে একদল সৈনিক চুপি চুপি আসিয়া ভীত-চকিত নেত্রে রন্ধ্রের পানে চাহিতে চাহিতে মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া গেল। তারপর দীর্ঘকাল কোনো পক্ষেরই আর সাড়াশব্দ নাই।

মধ্যরাত্রে বলরাম কামান কোলে বসিয়া বসিয়া একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ একটা জ্বলন্ত মশাল গুহার মধ্যে আসিয়া পড়িল। বলরাম চমকিয়া আরো কোণের দিকে সরিয়া গেল, যাহাতে মশালের আলোকে তাহাকে দেখা না যায়। কামান উদ্যত করিয়া সে বসিয়া রহিল।

কিন্তু কেহ গুহায় প্রবেশ করিল না। মশালটা প্রচুর ধূম বিকীর্ণ করিতে করিতে নিভিয়া গেল।

দণ্ড দুই পরে আর একটা জ্বলন্ত মশাল আসিয়া পড়িল। বলরাম শত্রুপক্ষের মতলব বুঝিল ; তাহারা আগুন ও ধোঁয়ার সাহায্যে লুক্কায়িত আততায়ীকে বাহিরে আনিতে চাহে। সে চুপটি করিয়া রহিল।

ওদিকে বহমনী সেনানীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। যদি গুহায় লুক্কায়িত জীব বা জীবগণ মানুষ হয় তবে তাহারা নিশ্চয় বিজয়নগরের মানুষ। যদি বিজয়নগরের মানুষ আক্রমণের কথা জানিতে পারিয়া থাকে তাহা হইলে অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। এখন কী কর্তব্য ? গুহানিবদ্ধ জীব সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত কিছু করা যায় না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আবার রন্ধ্রমুখের কাছে মশালের আলো দেখা গেল। এবার মশাল গুহামধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল না ; একজন কেহ গুহার বাহিরে অদৃশ্য থাকিয়া মশালটাকে ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া ঘুরাইতে লাগিল।

বলরাম চুপটি করিয়া রহিল।

* সেকালে মুসলমানদের মধ্যে প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত ছিল, হিন্দুকে মারিতে গিয়া যদি কোন মুসলমান মরে তবে সে শহীদী'র শরবৎ পান করে। অর্থাৎ স্বর্গে যায়।

লোকটা তখন সাহস পাইয়া গুহার মধ্যে পা বাড়াইল। সে গুহার মধ্যে পদার্পণ করিয়াছে অমনি ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলরামের কামান গর্জন করিয়া উঠিল। লোকটা গলার মধ্যে কাকুতির ন্যায় শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল, মশাল মাটিতে পড়িয়া দপ্‌দপ্‌ করিতে লাগিল।

লোকটা আর শব্দ করিল না, রন্ধ্রমুখের কাছে অনড় পড়িয়া রহিল। মশালের নিবন্ত আলোয় বলরাম আবার কামানে গুলি-বারুদ ভরিল। তাহার ইচ্ছা হইল উচ্চৈঃস্বরে গান ধরে—হরে মুরারে মধুকৈটভারে! কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করিল।

অতঃপর আর কেহ আসিল না। মশালও না।

মহারাজ দেবরায় সান্ধ্য আহার শেষ করিয়া বিরামকক্ষে আসিয়া বসিয়াছিলেন। মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপ পালঙ্কের সন্নিকটে হর্ম্যতলে বসিয়া কোলের কাছে পানের বাটা লইয়া সুপারি কাটিতেছিলেন। কক্ষে অন্য কেহ ছিল না; কক্ষের চারি কোণে দীপগুচ্ছ জ্বলিতেছিল। মন্ত্রী ও রাজা নিম্নস্বরে জল্পনা করিতেছিলেন।

মণিকঙ্কণা মাঝে মাঝে আসিয়া দ্বারের ফাঁকে উঁকি মারিতেছিল। মন্ত্রীটা এখনো বসিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিতেছে। সে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল।

রাজা শেষ পর্যন্ত বিদ্যুন্মালা সম্বন্ধে সকল কথা মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন। সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল, বিদ্যুন্মালাকে লইয়া কী করা যায়! অনেক আলোচনা করিয়াও সমস্যার নিষ্পত্তি হয় নাই।

সহসা বহির্দ্বারের ওপারে প্রতীহার-ভূমি হইতে উচ্চ বাক্যালাপের শব্দ শোনা গেল। মন্ত্রী ভ্রূ তুলিয়া দ্বারের পানে চাহিলেন, রাজা ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। তারপর একটি প্রতিহারিণী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—'অর্জুনবর্মা মহারাজের সাক্ষাৎ চান।'

রাজা ও মন্ত্রী সবিস্ময় দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। তারপর মন্ত্রী পানের বাটা সরাইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'আমি দেখছি।'

মন্ত্রী দ্রুতপদে দ্বারের বাহিরে চলিয়া গেলেন। রাজা কঠিন চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া ভ্রূবদ্ধ ললাটে বসিয়া রহিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মন্ত্রী অর্জুনকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অর্জুনের সর্বাঙ্গে জল ঝরিতেছে, বস্ত্র ও পদদ্বয় কর্দমাক্ত। সে টলিতে টলিতে আসিয়া রাজার সম্মুখে যুক্তকর ঊর্ধ্বে তুলিয়া অভিবাদন করিল, তারপর ছিন্নমূল বৃক্ষবৎ সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল।

মন্ত্রী ত্বরিতে তাহার বক্ষে হাত রাখিয়া দেখিলেন, বলিলেন—'অবসন্ন অবস্থায় মূর্ছা গিয়াছে। এখনি জ্ঞান হবে।' তিনি অর্জুনের মুখে যে দু'চার কথা শুনিয়াছিলেন তাহা রাজাকে নিবেদন করিলেন। রাজার মেরুদণ্ড ঋজু হইল।

'সত্য কথা?'

'সত্য বলেই মনে হয়। মিথ্যা সংবাদ দেবার জন্য ফিরে আসবে কেন?'

কিয়ৎকাল পরে অর্জুনের জ্ঞান হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, তারপর দণ্ডায়মান হইল; স্খলিত স্বরে বলিল—'মহারাজ, শত্রুসৈন্য পশ্চিম সীমান্তে রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করছে।'

রাজা বলিলেন—'বিশদভাবে বল।'

অর্জুন বিস্তারিতভাবে সকল কথা বলিল। শুনিয়া রাজা মন্ত্রীর দিকে ফিরিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ—'

কিন্তু মন্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন না। মন্ত্রী কখন অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

সহসা বাহিরে ঘোর রবে রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। আকাশ-বাতাস আলোড়িত করিয়া বাজিয়া চলিল, দূর দূরান্তরে নিনাদিত হইল। বহু দূরে অন্য দুন্দুভি রাজপুরীর দুন্দুভিধ্বনি তুলিয়া

লইয়া বাজিতে লাগিল। রাজ্যময় বার্তা ঘোষিত হইল—শত্রু রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে, সতর্ক হও, সকলে সতর্ক হও, সৈন্যগণ প্রস্তুত হও।

ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ কটিতে তরবারি বাঁধিতে বাঁধিতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা ও মন্ত্রীতে দ্রুত বাক্যালাপ হইল—

'সব প্রস্তুত।'

'রাজধানীতে কত সৈন্য আছে?'

'ত্রিশ হাজার।'

রাজা বলিলেন—'বহমনী যখন পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করেছে তখন পূর্বদিক থেকেও একসঙ্গে আক্রমণ করবে।'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'আমারও তাই মনে হয়। —এখন আদেশ?'

'রাজধানী রক্ষার জন্য নগরপাল নরসিংহ মল্লের অধীনে দশ হাজার সৈন্য থাক। আমি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে পশ্চিম সীমান্তে যাচ্ছি, আপনি দশ হাজার নিয়ে পূর্ব সীমান্তে যান।'

'ভাল। কখন যাত্রা করা যাবে?'

'মধ্য রাত্রি অতীত হবার পূর্বেই।'

'তবে মশালের ব্যবস্থা করি। জয়োস্তু মহারাজ।' মন্ত্রী চলিয়া গেলেন। অর্জুনের দিকে কেহ দৃক্‌পাত করিল না। দুন্দুভি বাজিয়া চলিল।

মণিকঙ্কণা এত রাত্রে দুন্দুভির শব্দ শুনিয়া হতচকিত হইয়া গিয়াছিল, সে রাজার কাছে ছুটিয়া আসিল। অর্জুনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—'এ কি!'

রাজা বলিলেন—'মণিকঙ্কণা! আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। পিঙ্গলাকে ডাকো, আমার রণসজ্জা নিয়ে আসুক।'

মণিকঙ্কণা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া পিছু হটিতে হটিতে চলিয়া গেল।

'মহারাজ—'

রাজা অর্জুনের দিকে চাহিলেন। অর্জুনের অস্তিত্ব তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অর্জুন বলিল—'মহারাজ, আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি, বিজয়নগরে ফিরে এসেছি, সেজন্য দণ্ডার্হ।'

রাজা বলিলেন—'তোমার দণ্ড আপাতত স্থগিত রইল। তুমি কারাগারে বন্দী থাকবে। আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তোমার বিচার করব। যদি তোমার সংবাদ মিথ্যা হয়—'

অর্জুন যুক্তকরে বলিল—'একটি ভিক্ষা আছে। আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। যদি আমার সংবাদ মিথ্যা হয়, তৎক্ষণাৎ আমার মুণ্ডচ্ছেদ করবেন।'

রাজা ক্ষণেক বিবেচনা করিলেন—'উত্তম। তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

'ধন্য মহারাজ।'

পিঙ্গলা রাজার বর্মচর্ম শিরস্ত্রাণ ও তরবারি লইয়া প্রবেশ করিল।

ছয়

সে-রাত্রে বিজয়নগর রাজ্যে কাহারো নিদ্রা আসিল না। রাত্রির আকাশ ভরিয়া রণদুন্দুভির নিনাদ স্পন্দিত হইতে লাগিল।

দুন্দুভিধ্বনির তাৎপর্য বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হয় নাই। যুদ্ধ! শত্রু আক্রমণ করিয়াছে। দূর গ্রামে গ্রামে গৃহস্থেরা দুন্দুভি শুনিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল, ঘরে অস্ত্রশস্ত্র যাহা ছিল তাহাতে শাণ দিতে লাগিল। নগরের সাধারণ জনগণ পরস্পরের গৃহে গিয়া উত্তেজিত জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিয়া দিল; ধনী ব্যক্তিরা সোনাদানা লুকাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। গণ্যমান্য রাজপুরুষেরা রাজসভার দিকে ছুটিলেন। সৈনিকেরা বর্মচর্ম পরিয়া প্রস্তুত হইল। অনেকদিন পরে যুদ্ধ। সৈনিকদের মনে হর্ষোদ্দীপনা, মুখে হাসি; সৈনিকবধূদের চোখে আশঙ্কার অশ্রুজল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে রাজা ও লক্ষ্মণ মল্লপ দুই দল সৈন্য লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমে যাত্রা করিলেন। অশ্বারোহী সৈনিকদের হস্তধৃত মশালশ্রেণী অন্ধকারে জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায় বিপরীত মুখে ছুটিয়া চলিল।

তিন রানী নিজ নিজ ভবনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্ধকার শয্যায় শয়ন করিলেন। পদ্মালয়াম্বিকা শিশুপুত্র মল্লিকার্জুনকে বুকে লইয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন; যুদ্ধ ব্যাপারে নারীর করণীয় কিছু নাই, তাহারা কেবল কাল্পনিক বিভীষিকার আগুনে দগ্ধ হইতে পারে।

বিদ্যুন্মালা নিজের স্বতন্ত্র কক্ষে ছিলেন। তিনি কক্ষের বাহিরে যাইতেন না, মণিকঙ্কণা মাঝে মাঝে দ্বারের নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিয়া যাইত। এক গৃহে থাকিয়াও দুই ভগিনীর মাঝখানে দূরত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। আজ বিদ্যুন্মালা নিজ শয্যায় জাগিয়া শুইয়াছিলেন, মণিকঙ্কণা আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিল, জলভরা চোখে বলিল—'রাজা যুদ্ধে চলে গেলেন।'

বিদ্যুন্মালা সবিশেষ কিছু জানিতেন না, কিন্তু রাজপুরীতে উত্তেজিত ছুটাছুটি দেখিয়া ও দুন্দুভিধ্বনি শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন, গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে। তিনি মণিকঙ্কণার হাতের উপর হাত রাখিলেন, কিছু বলিলেন না। মণিকঙ্কণা আবার বলিল—'অর্জুনবর্মা এসেছিলেন।'

বিদ্যুন্মালা উঠিয়া বসিলেন, মণিকঙ্কণার মুখের কাছে মুখ আনিয়া সংহত স্বরে বলিলেন—'কি বললি? কে এসেছিলেন?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'অর্জুনবর্মা এসেছিলেন। মাথার চুল থেকে জল ঝরে পড়ছে, কাপড় ভিজে; পাগলের মত চেহারা। রাজাকে কী বললেন, রাজা তাঁকে নিয়ে যুদ্ধে চলে গেলেন।'

বিদ্যুন্মালার দেহ কাঁপিতে লাগিল, তিনি চক্ষু মুদিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন, রাজা অর্জুনবর্মাকে নির্বাসন দিয়াছেন। তারপর হঠাৎ কী হইল! অর্জুনবর্মা ফিরিয়া আসিলেন কেন? অনিশ্চয়ের সংশয়ে তাঁহার অন্তর মথিত হইয়া উঠিল।

মণিকঙ্কণার অন্তরে অন্য প্রকার মন্থন চলিতেছে। রাজা যুদ্ধে গিয়াছেন। যাহারা যুদ্ধে যায় তাহারা সকলে ফিরিয়া আসে না। রাজা যদি ফিরিয়া না আসেন! সে অবসন্নভাবে বিদ্যুন্মালার পাশে শয়ন করিল, বাহু দিয়া তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া লইয়া ম্রিয়মাণ স্বরে বলিল—'মালা, কি হবে ভাই?'

বিদ্যুন্মালা উত্তর দিলেন না। সারা রাত্রি দুই ভগিনী পরস্পরের গলা জড়াইয়া জাগিয়া রহিলেন।

বলরাম রাত্রে ঘুমায় নাই, রন্ধ্রের মধ্যে একটি মৃতদেহকে সঙ্গী লইয়া জাগিয়া ছিল। আবার যদি কেহ আসে, তাহাকে শহীদী'র শরবৎ পান করাইতে হইবে।...অর্জুন কি বিজয়নগরে

পৌঁছিয়াছে ? রাজাকে সংবাদ দিতে পারিয়াছে ? সংবাদ পাইয়া রাজা কি তৎক্ষণাৎ সৈন্য সাজাইয়া বাহির হইবেন ! যদি বিলম্ব করেন—

সকাল হইল। রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাত, সাময়িকভাবে মেঘ সরিয়া গিয়াছে। বলরামের কৌতূহল হইল, দেখি তো মিঞা সাহেবেরা কি করিতেছে। সে পাশের দিক দিয়া রন্ধ্রমুখের কাছে গিয়া বাহিরে উঁকি মারিল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহার হৃৎপিণ্ড ধক্ করিয়া উঠিল।

মুসলমান সৈনিকেরা একটা প্রকাণ্ড কামান ঘুরাইয়া সুড়ঙ্গের দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়াছে এবং তাহাতে বারুদ ভরিতেছে। উদ্দেশ্য সহজেই অনুমান করা যায় ; কামান দাগিয়া তাহারা গুহামুখ ভাঙ্গিয়া দিবে, সেখানে যে অদৃশ্য শত্রু লুকাইয়া আছে তাহাকে বধ করিবে।

বলরাম দেখিল, কামানের গোলা রন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে জীবনের আশা নাই। সে আর বিলম্ব করিল না, ঝোলা লইয়া যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথে দ্রুত ফিরিয়া চলিল। প্রথম বাঁকের মুখে আসিয়া সে দেখিল এই স্থান বহুলাংশে নিরাপদ ; কামানের গোলা সিধা পথে চলে, মোড় ঘুরিয়া আসিতে পারিবে না। সে বাঁক অতিক্রম করিয়া সুড়ঙ্গমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বিকট শব্দ করিয়া কামানের গোলা রন্ধ্রমধ্যে আসিয়া পড়িল। বড় বড় পাথরের চাঁই ভাঙ্গিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ হইয়া গেল। ভাগ্যক্রমে ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলা বলরামের নিকট পৌঁছিল না।

এতক্ষণ যতটুকু আলো ছিল তাহাও আর রহিল না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে বলরাম হাত বাড়াইয়া গুহাপ্রাচীর অনুভব করিতে করিতে পূর্বমুখে চলিল। মুসলমানেরা যদি ইতিমধ্যে পাহাড় ডিঙ্গাইয়া সুড়ঙ্গের পূর্বদিকে পৌঁছিয়া থাকে, তাহা হইলে— !

অর্জুন রাজাকে লইয়া ফিরিবে কিনা, কখন ফিরিবে, কে জানে !

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর একটা ধ্বনির অনুরণন বলরামের কানে আসিল। মানুষের কণ্ঠস্বর, দূর হইতে আসিতেছে। কিন্তু পাষাণগাত্রে প্রতিহত হইয়া বিকৃত হইয়াছে। শব্দের অর্থবোধ হয় না।

বলরাম স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিল। ধ্বনি ক্রমশ কাছে আসিতেছে, স্পষ্ট হইতেছে। তারপর কণ্ঠস্বর পরিষ্কার হইল—'বলরাম ভাই !'

মহাবিস্ময়ে বলরাম চিৎকার করিয়া উঠিল—'অর্জুন ভাই !'

অন্ধকারে হাতে হাত ঠেকিল, দুই বন্ধু আলিঙ্গনবদ্ধ হইল।

'বলরাম ভাই, তুমি বেঁচে আছ !'

'আছি। তুমি রাজার দর্শন পেয়েছ ?'

'পেয়েছি। রাজা দশ হাজার সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কামানের শব্দ শুনলাম। ওরা কামান দাগছে ?'

'হ্যাঁ। কামান দেগে গুহার মুখ উড়িয়ে দিয়েছে।

'যাক, আর ভয় নেই। এস।'

বিজয়নগরের দশ হাজার সৈন্য পর্বতের পদমূলে সমবেত হইয়াছিল। রাজার আদেশে তাহারা ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পর্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করিল।

পর্বতের পরপারে বহমনী সৈন্যদল যখন দেখিল বিজয়নগরবাহিনী সত্যই উপস্থিত আছে তখন তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল না, কামান ও ছত্রাবাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সেকালের মুসলমানেরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল, সম্মুখ-যুদ্ধে কখনো পশ্চাৎপদ হইত না। কিন্তু গুলবর্গার বহমনী সুলতান আহমদ শা'র নিকট খবর পৌঁছিয়াছিল যে, তাঁহার অতর্কিত আক্রমণ

ব্যর্থ হইয়াছে।

বর্ষাকাল বিজয় অভিযানের উপযুক্ত কাল নয় ; অবশ্য অতর্কিত আক্রমণ করিয়া পররাজ্য খানিকটা দখল করিয়া বসিতে পারিলে লাভ আছে, কিন্তু সম্মুখ-যুদ্ধ অসমীচীন। তিনি তাই সৈন্যদলকে ফিরিয়া আসিবার আদেশ পাঠাইয়াছিলেন।

বহমনী সৈন্যদল যুদ্ধ-স্পৃহা দমন করিয়া চলিয়া গেল। বিজয়নগরের সৈন্যদলও নিজ রাজ্যের সীমানা লঙ্ঘন করিল না। অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

মহারাজ দেবরায় দুই হাজার সৈন্য পশ্চিম সীমান্তে রাখিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। অর্জুন ও বলরাম তাঁহার সঙ্গে আসিল।

ওদিকে পূর্ব-সীমানা হইতে ধন্নায়ক লক্ষ্মণও ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে শত্রুসৈন্য নদী পার হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, নদীর পরপারে বিজয়নগরের বাহিনী উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাহারা বিমর্ষভাবে প্রস্থান করিল।

অতঃপর রাজা ও মন্ত্রী বহিঃশত্রু সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া আভ্যন্তরিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছেন।

শ্রাবণ মাস সমাগত। রাজগুরু বিবাহের দিন স্থির করিয়াছেন ; শ্রাবণের শুক্লা ত্রয়োদশীতে বিবাহ। সুতরাং বিবাহের কথাই সর্বাগ্রে চিন্তনীয়।

রাজা ও মন্ত্রী মিলিয়া মতলব স্থির করিয়াছেন যাহাতে সব দিক রক্ষা হয়। মতলব স্থির করিয়া তাঁহারা রাজগুরুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছেন। রাজগুরু পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই সামান্য কৈতবে সম্মতি দিয়াছেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া মহারাজ বিরামকক্ষে আসিয়া বসিলেন। পিঙ্গলার হাত হইতে পান লইয়া বলিলেন—'বিদ্যুন্মালাকে পাঠিয়ে দাও। আর মণিকঙ্কণাকে আটকে রাখো। সে যেন এখন এখানে না আসে।'

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুন্মালা ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কয়দিনে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়াছে, মুখে রক্তহীন পাণ্ডুতা। গতিভঙ্গি ঈষৎ আড়ষ্ট। তিনি রাজার সম্মুখে আসিয়া নতমুখে দাঁড়াইলেন।

রাজা ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—'শেষবার প্রশ্ন করছি। তুমি আমাকে বিবাহ করতে চাও না ?'

বিদ্যুন্মালা নত নয়নে নির্বাক রহিলেন।

রাজা বলিলেন—'অর্জুনকেই তুমি আমার চেয়ে যোগ্যতর পাত্র মনে কর !'

এবারও বিদ্যুন্মালা নীরব, কেবল তাঁহার অধর ঈষৎ কম্পিত হইল।

রাজা একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন—'স্ত্রীজাতির চরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়। যা হোক, তুমি যখন পণ করেছ অর্জুনকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করবে না তখন তাই হবে, অর্জুনের সঙ্গেই তোমার বিবাহ দেব।'

বিদ্যুন্মালার মুখ অতর্কিত ভাবসংঘাতে অনির্বচনীয় হইয়া উঠিল, অধরোষ্ঠ বিবৃত হইয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। তিনি একবার ভয়সঙ্কুল চক্ষু রাজার দিকে তুলিয়া আবার নত করিয়া ফেলিলেন। তারপর কম্পিত দেহে ভূমির উপর রাজার পদমূলে বসিয়া পড়িলেন।

রাজা আঙ্গুল তুলিয়া বলিলেন—'কিন্তু একটি শর্ত আছে।'

বিদ্যুন্মালা ভয়ে ভয়ে আবার চক্ষু তুলিলেন। শর্ত ! কিরূপ শর্ত !

রাজা বলিলেন—'তোমার বিদ্যুন্মালা নাম আর চলবে না। আজ থেকে তোমার নাম—মণিকঙ্কণা। বুঝলে ?'

বিদ্যুন্মালা কিছুই বুঝিলেন না। কিন্তু ইহাই যদি শর্ত হয় তবে ভয়ের কী আছে? তিনি ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'যথা আজ্ঞা আর্য।'

রাজা তখন ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—'আমি গজপতি ভানুদেবের কন্যা বিদ্যুন্মালাকে বিবাহ করব বলে তাকে এখানে এনেছি। কিন্তু তুমি যদি অর্জুনকে বিবাহ কর, তাহলে আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়। সুতরাং আজ থেকে তোমার নাম মণিকঙ্কণা।—যাও, আসল মণিকঙ্কণাকে পাঠিয়ে দাও।'

বিদ্যুন্মালা নত হইয়া রাজার পায়ের উপর মাথা রাখিলেন; উদ্বেলিত অশ্রুধারায় রাজার চরণ নিষিক্ত হইল।

বিদ্যুন্মালা চলিয়া যাইবার পর মণিকঙ্কণা আসিল। তাহারও গতিভঙ্গি শঙ্কাজড়িত, চক্ষু সংশয়ে বিস্ফারিত। সে অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ করিল—'মহারাজ, আমাকে ডেকেছেন?'

রাজা বলিলেন—'হ্যাঁ। এস, আমার কাছে বোসো।'

মণিকঙ্কণা আসিয়া পালঙ্কের পাশে বসিল, বলিল—'মালা কাঁদছে কেন?'

রাজা বলিলেন—'আমি বকেছি। আমাকে বিয়ে করতে চায় না, তাই বকেছি।'

মণিকঙ্কণার মুখ ধীরে ধীরে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে একদৃষ্টে রাজার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

রাজা বলিলেন—'ও যখন আমাকে বিবাহ করতে চায় না তখন তোমাকেই আমি বিবাহ করব।—কেমন, রাজী?'

মণিকঙ্কণার মুখখানি আনন্দে উত্তেজনায় ভাস্বর হইয়া উঠিল। রাজা তর্জনী তুলিয়া বলিলেন—'কিন্তু একটি শর্ত আছে। আজ থেকে তোমার নাম—বিদ্যুন্মালা। মণিকঙ্কণা নামটা আমার মোটেই পছন্দ নয়।'

এই শর্ত! বিগলিত হাস্যে মণিকঙ্কণা মহারাজের কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পর মহারাজের বিরামকক্ষে দীপাবলী জ্বলিয়াছে। রাজা একটি কোষবদ্ধ তরবারি কোলের উপর লইয়া পালঙ্কে বসিয়া আছেন। পালঙ্কের পাশে ভূমিতে বসিয়া মন্ত্রী নির্লিপ্তভাবে কুচকুচ সুপারি কাটিতেছেন।

অর্জুনবর্মা আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। নাগরিকের ন্যায় পরিচ্ছন্ন বেশবাস; হাতে অস্ত্র নাই। রাজা তাহার আপাদমস্তক দেখিলেন। তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, আমার আদেশে তুমি বিজয়নগর থেকে নির্বাসিত হয়েছিলে। সে আদেশ আমি প্রত্যাহার করলাম। তুমি দেশভক্তির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছ। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে মাতৃভূমিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ। তোমাকে আমার তুরঙ্গ বাহিনীর সেনানী নিযুক্ত করলাম। এই নাও তরবারি।'

অর্জুন নতজানু হইয়া দুই হস্তে তরবারি গ্রহণ করিল। তারপর রাজা হাত নাড়িয়া তাহাকে বিদায় দিবার উপক্রম করিলে মন্ত্রী রাজার মুখের পানে চাহিয়া হাসিলেন; রাজা তখন বলিলেন—'হ্যাঁ, ভাল কথা। আগামী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কলিঙ্গ-রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ। প্রস্তুত থেকো।'

অর্জুন হতবুদ্ধিভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আভূমি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

অর্জুনের পর বলরাম আসিল। প্রণাম করিয়া রাজার পায়ের কাছে মাটিতে বসিল। রাজা কিছুক্ষণ কঠোর নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'তুমি আমার অজ্ঞাতসারে অর্জুনের সঙ্গে পালিয়েছিলে, সেজন্য দণ্ডার্হ।'

বলরাম হাত জোড় করিল—'মহারাজ, ছেলেটা বড় কাতর হয়ে পড়েছিল তাই সঙ্গে গিয়েছিলাম।'

মহারাজ বলিলেন—'হুঁ! তুমি ক'টা ম্লেচ্ছ মেরেছ?'

বলরাম বিরসমুখে বলিল—'আজ্ঞা, মাত্র দু'টি।'

'আনুপূর্বিক বল।'

বলরাম সেদিন বিজয়নগর ত্যাগের পর হইতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। শুনিয়া রাজা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'সমস্তই দৈবের লীলা। হয়তো এইজন্যই হুক্ক-বুক্ক এসেছিলেন। যা হোক, উপস্থিত তোমাদের ক্ষিপ্রবুদ্ধির জন্য বিপদ নিবারিত হয়েছে। তুমি যদিও দণ্ডনীয় তবু তোমাকে পুরস্কৃত করব।'—উপাধানের তলদেশ হইতে একটি সোনার অঙ্গদ বাহির করিয়া রাজা বলরামকে দিলেন—'এই নাও অঙ্গদ, পরিধান কর। এখন থেকে তুমি প্রধান রাজকর্মকার, অস্ত্রাগারের সমস্ত কর্মকার তোমার অধীনে কাজ করবে।'

বলরাম বাহুতে অঙ্গদ পরিল, মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তারপর আবার হাত জোড় করিল—'মহারাজ, দীনের একটি নিবেদন আছে।'

রাজা বলিলেন—'ভয় নেই, তোমার গুপ্তবিদ্যা প্রকাশ করতে হবে না।'

বলরাম বলিল—'ধন্য মহারাজ। আর একটি নিবেদন আছে।'

'আবার নিবেদন! কী নিবেদন?'

'মহারাজ, আমি বিবাহ করতে চাই।'

মহারাজের মুখে ধীরে ধীরে কৌতুকহাস্য ফুটিয়া উঠিল—'তুমিও বিবাহ করতে চাও! কাকে?'

'মহারাজ, তার নাম মঞ্জিরা। আপনার অন্তঃপুরে রন্ধনশালার দাসী।'

'তার পিতৃ-পরিচয় আছে?'

'আছে মহারাজ। মঞ্জিরার পিতার নাম বীরভদ্র, তিনি মহারাজের হাতিশালার একজন হস্তিপক। তাঁর অনুমতি চাইতে গিয়েছিলাম; তিনি বললেন, মহারাজ যদি অনুমতি দেন তাঁর আপত্তি নেই।'

রাজা কৌতূহল-ভরা চক্ষে কিছুক্ষণ বলরামকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'বীরভদ্রের যদি আপত্তি না থাকে আমারও আপত্তি নেই। তুমি ধূর্ত বাঙ্গালী, তোমাকে বেঁধে রাখবার জন্য কঠিন শৃঙ্খল চাই।—এখন যাও, আগামী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন তোমার বিবাহ হবে।'

বলরাম মহানন্দে প্রণাম করিতে করিতে পিছু হটিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজা মন্ত্রীর পানে চাহিয়া হাসিলেন—'মন্দ হল না। একসঙ্গে তিনটে বিবাহ। যত বেশি হয় ততই ভাল। বরযাত্রীদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ হবে।'

সাত

রাজা এবং রাজকুলোদ্ভব পাত্র-পাত্রীদের বিবাহ হইবে পম্পাপতির মন্দিরে, ইহাই চিরাচরিত বিধি। রাজার অনুমতি থাকিলে অন্য বিবাহও পম্পাপতির মন্দিরে সম্পাদিত হইতে পারে।

রাজার বিবাহের তিথি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার পর রাজ্যময় উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। রাজা ইতিপূর্বে তিনবার বিবাহ করিয়াছেন, চতুর্থ বারে বেশি ধূমধাম হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু সদ্য বিপন্মুক্তির পর রাজার বিবাহ, তাই উৎসব একটু বেশি জাঁকিয়া উঠিল। গৃহে গৃহে পুষ্পমালা দুলিল, নানা বর্ণের কেতন উড়িল। নাগরিকারা দলবদ্ধভাবে গীত গাহিতে গাহিতে নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। চতুষ্পথে চতুষ্পথে বাজীকরের খেলা ; মাঠে মাঠে মল্লযোদ্ধাদের বাহ্বাস্ফোট, হাতির লড়াই ; তুঙ্গভদ্রার বুকে বিচিত্র নৌকাপুঞ্জের সম্মিলিত জলকেলি। বিজয়নগরের প্রজাগণ রাজাকে ভালবাসে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উৎসবে গা ঢালিয়া দিয়াছে।

রাজসভার প্রাঙ্গণেও বিপুল মণ্ডপ রচিত হইয়াছে। সেখানে অহোরাত্র পান ভোজন, রঙ্গরস, নৃত্যগীত চলিয়াছে।

তারপর বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নগরে বিরাট হৈ হৈ পড়িয়া গেল। হাতি-ঘোড়ার শোভাযাত্রা ; সৈন্যবাহিনী বাজনা বাজাইয়া সদর্পে কুচকাওয়াজ করিতে লাগিল। দলে দলে নাগরিক নাগরিকা মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া পম্পাপতির মন্দিরের দিকে ধাবিত হইল ; তাহারা রাজার বিবাহ দেখিবে।

রাজবৈদ্য দামোদর স্বামী একটি ভৃঙ্গারে কোহল লইয়া অতিথি-ভবনে উপস্থিত হইলেন। রসরাজ সবেমাত্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া জলযোগে বসিয়াছিলেন ; দামোদর স্বামী দ্বারের নিকট হইতে ডাকিলেন—'বন্ধু, আমি এসেছি।'

ক্ষীণদৃষ্টি রসরাজ গলা শুনিয়া চিনিতে পারিলেন—'আরে বন্ধু, এস এস।'

দামোদর আসিয়া বসিলেন, ভৃঙ্গারটি সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—'আজ মহা আনন্দের দিন, তাই তোমার জন্য একটু কোহল এনেছি। সদ্য প্রস্তুত তাজা কোহল, তুমি একটু চেখে দেখ।'

'এ বড় উত্তম কথা। আমার কোহল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সুতরাং এস, তোমার কোহলই পান করা যাক।'

দুই বন্ধুর উৎসব আরম্ভ হইয়া গেল।

ওদিকে অন্যান্য কন্যাযাত্রীরাও উপেক্ষিত হয় নাই। এতদিন তাহারা রাজার আতিথ্যে পানাহার বিষয়ে পরম আনন্দেই ছিল, কিন্তু আজ তাহাদের সমাদর দশগুণ বাড়িয়া গেল। রাজপুরী হইতে ভারে ভারে মিষ্টান্ন পক্কান্ন পরমান্ন আসিল। সেই সঙ্গে কলস কলস সুরা। একদল রাজপুরুষ আসিয়া মিষ্টভাষায় সকলকে অনুরোধ উপরোধ নির্বন্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন ; একবার স্বয়ং রাজা আসিয়া সকলকে দর্শন দিয়া গেলেন। কন্যাযাত্রীরা মাতিয়া উঠিল ; অপর্যাপ্ত পানাহারের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্যগীত লম্ফঝম্প ক্রীড়াকৌতুক আরম্ভ করিয়া দিল।

ফলে, বিবাহের লগ্নকাল যখন উপস্থিত হইল তখন দেখা গেল অধিকাংশ কন্যাযাত্রীই ধরাশায়ী ; যাহাদের একটু সংজ্ঞা আছে তাহারা বিগলিত কণ্ঠে অশ্লীল গান গাহিতেছে এবং নিজ উরুদেশে মৃদঙ্গ বাজাইতেছে।

রসরাজের অবস্থাও অনুরূপ। বস্তুত গান না গাহিলেও তিনি মৃদুস্বরে কাব্যশাস্ত্রের রসালো স্থানগুলি আবৃত্তি করিতেছেন এবং মদাসক্ত মসৃণ হাস্য করিতেছেন। কয়েকজন রাজপুরুষ আসিয়া তাঁহাকে গরুর গাড়িতে তুলিয়া বিবাহস্থলে লইয়া গেল। কারণ, তিনি কন্যাকর্তা, বিবাহ-বাসরে তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

রাজপুরুষেরা রসরাজকে লইয়া বিবাহসভার পুরোভাগে বসাইয়া দিল। পাশাপাশি তিন জোড়া বর-কন্যা বসিয়া আছে ; রসরাজ দেখিলেন—ছয় জোড়া বর-কন্যা। তিনি পাত্র-পাত্রীর মুখ-চোখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার কী আছে ? তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি আনন্দাশ্রু মোচন করিলেন, হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন এবং অচিরাৎ উপবিষ্ট অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

যথাকালে বিবাহক্রিয়া শেষ হইল। সকলে জানিল, কলিঙ্গের রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার সঙ্গে রাজার বিবাহ হইয়াছে। সন্দেহের কোনো কারণ নাই, তাই কেহ কিছু সন্দেহ করিল না। দর্শকেরা আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সন্তুষ্টচিত্রে গৃহে ফিরিয়া গেল।

আট

তৃতীয় দিন প্রত্যূষে কন্যাযাত্রীর দল মহা বাদ্যোদ্যম করিয়া বহিত্রে উঠিল। শ্রাবণের ভরা তুঙ্গভদ্রা দুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে, বহিত্র তিনটি স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল। যাত্রীরা এই কয় মাস রাজ-সমাদরে খুবই সুখে ছিল, কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে গৃহের পানে মন টানিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সকলে বহিত্রের পাটাতনে বসিয়া জল্পনা করিতে লাগিল, বহিত্রগুলি দেড় মাসে কলিঙ্গপত্তনে ফিরিবে কিংবা দুই মাসে ফিরিবে। স্রোতের মুখে নৌকা শীঘ্র চলে। মন আরো শীঘ্র চলে।

বিজয়নগর হইতে দূরে তুঙ্গাভদ্রার শিলাবন্ধুর সৈকতে ছোট্ট গ্রামটির কথা ভুলিলে চলিবে না। সেখানে মন্দোদরীকে লইয়া চিপিটকমূর্তি আছেন। মন্দোদরীর মনে কোনো খেদ নাই। সে একটি স্বামী পাইয়াছে, গ্রামবধূরা তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়ায়; ইতিমধ্যে সে গ্রামের ভাষা আয়ত্ত করিয়াছে, সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারে। আর কী চাই? গ্রামে তাহার মন বসিয়া গিয়াছে, সারা জীবন এই গ্রামে কাটাইতে পারিলে সে আর কিছু চায় না।

চিপিটকের মনের অবস্থা কিন্তু মন্দোদরীর মত নয়। এই তিন মাসে গ্রামের পরিবেশ তাঁহার কাছে সহনীয় হইয়াছে, কিন্তু স্বদেশে ফিরিবার আশা তিনি ছাড়েন নাই। এখানে ছাগল চরানো বিশেষ কষ্টকর কর্ম নয়, কিন্তু আত্মমর্যাদার হানিকর। তিনি রাজ-শ্যালক—একথা কিছুতেই ভুলিতে পারেন না।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আকাশ লঘু মেঘে ঢাকা ছিল, সূর্য থাকিয়া থাকিয়া ঘোমটা সরাইয়া নববধূর মত সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। চিপিটক ভোজনান্তে ছাগলের পাল লইয়া বনের দিকে যাইবার পূর্বে মন্দোদরীকে বলিয়া গেলেন—'নদীর ধারে যাবি। যদি নৌকা আসে—'

মন্দোদরী বলিল—'আচ্ছা গো আচ্ছা। তিন মাস ধরে নদীর ধারে যাচ্ছি, আজও যাব। কিন্তু কোথায় নৌকা! তারা কি এখনো বসে আছে, কোন্‌কালে দেশে ফিরে গেছে।'

'তবু যাস্‌।' চিপিটক গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া ছাগল চরাইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার আশার প্রদীপ ক্রমেই নির্বাপিত হইয়া আসিতেছে।

তারপর গ্রামের মেয়েরা ঘরের কাজকর্ম সারিয়া নদীতে জল আনিতে গেল, তখন মন্দোদরীও কলস কাঁখে তাহাদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চলিল। মেয়েরা নদীর ঘাটে বেশিক্ষণ রহিল না, গা ধুইয়া নিজ নিজ কলসে জল ভরিয়া গ্রামে ফিরিয়া গেল। মন্দোদরী বালুর উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল।

স্নিগ্ধ পরিবেশ। আকাশে মেঘ ও সূর্যের লুকোচুরি খেলা, সম্মুখে খরস্রোতা নদীর কলধ্বনি। একাকিনী বসিয়া বসিয়া মন্দোদরীর ঘুম আসিতে লাগিল। বার দুই হাই তুলিয়া সে বালুর উপর কাত হইয়া শয়ন করিল, তারপর ঘুমাইয়া পড়িল। দিবানিদ্রার অভ্যাস তাহার এখনো যায় নাই।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইবার পর মুখে সূক্ষ্ম বৃষ্টির ছিটা লাগিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। সে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল। তারপর সম্মুখে নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে নিষ্পলক হইয়া গেল।

বৃষ্টির সূক্ষ্ম পর্দার ভিতর দিয়া দেখা গেল, আগে পিছে তিনটি বহিত্র নদীর মাঝখান দিয়া পূর্বমুখে চলিয়াছে। পাল-তোলা বহিত্র তিনটি মনে হয় কোন্ অচিন দেশের পাখি।

কিন্তু মন্দোদরীর প্রাণে বিন্দুমাত্র কবিত্ব নাই। সে দেখিল, অচিন দেশের পাখি নয়, তিনটি অত্যন্ত পরিচিত বহিত্র কলিঙ্গ দেশে ফিরিয়া চলিয়াছে।

মন্দোদরীর বুকের মধ্যে দুম্ দুম্ শব্দ হইতে লাগিল। সে ক্ষণকাল ব্যায়ত চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া মুখে আঁচল ঢাকা দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। কী আপদ! নৌকাগুলি এতদিন বিজয়নগরেই ছিল! এতদিন ধরিয়া কী করিতেছিল? ভাগ্যে গ্রামের অন্য কেহ দেখিয়া ফেলে নাই। জয় দারুব্রহ্ম!

তিন-চারি দণ্ড শুইয়া থাকিবার পর সে মুখের আঁচল সরাইয়া সন্তর্পণে উঁকি মারিল, তারপর গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল।

নৌকা তিনটি চলিয়া গিয়াছে, তুঙ্গভদ্রার বুক শূন্য।

সূর্য ডুবু ডুবু হইল। মন্দোদরী কলস কাঁখে লইয়া গজেন্দ্রগমনে ফিরিয়া চলিল।

চিপিটক গ্রামে গুহার সম্মুখে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, মন্দোদরীকে আসিতে দেখিয়া তাহার পানে সপ্রশ্ন ভ্রূভঙ্গি করিলেন। মন্দোদরী কলসটি গুহামুখের কাছে নামাইয়া হাত উল্টাইয়া বলিল—'কোথায় নৌকো! মিছিমিছি ভূতের বেগার। কাল থেকে আমি আর যেতে পারব না, যেতে হয় তুমি যেও।' বলিয়া মন্দোদরী গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

চিপিটক আকাশের পানে চোখ তুলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

প্রাচীন শব্দের অর্থ

অষ্টশীল—বৌদ্ধধর্মের গৃহীদের জন্য পালনীয় অষ্টবিধ নীতি। Eight Commandments : চুরি করিবে না ; জীবহত্যা করিবে না, ইত্যাদি।

অর্হৎ—যিনি বৌদ্ধ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ; সিদ্ধ পুরুষ।

ইন্দ্রকীলক—হুড়কা।

ইন্দ্রকোষ—দুর্গপ্রাকারের উপর একপ্রকারের স্তম্ভ। ভিতর হইতে তীর মারিবার জন্য ইহার গায়ে ছিদ্র থাকিত।

ঔদকদুর্গ—নদীর মোহানায় বা জলবেষ্টিত স্থানে নির্মিত পরিখাযুক্ত দুর্গ।

কঞ্চুকী—রাজ-অন্তঃপুরের রক্ষক।

কুলিক—শিল্পী বা শ্রমিকদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি (foreman)।

ক্ষত্রপ—রাজপ্রতিনিধি (satrap)।

গুল্ম—ছোট ছোট সেনানিবাস, ঘাঁটি।

গোষ্ঠীসমবায়—জ্ঞাতিদের সম্মেলন।

জয়স্কন্ধাবার—কোন দেশ জয় করিবার পর সেই দেশে স্থাপিত তাৎকালিক সামরিক রাজধানী।

ত্রি-শরণ—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' ইত্যাদি মন্ত্র।

ধর্মচক্র—বৌদ্ধ ধর্মারম্ভের চিহ্ন।

নবপত্রিকা—প্রস্তর শিল্প।

পট্টমহাদেবী—পাটরানী।

পত্রচ্ছেদ্য—দেহে চন্দন-কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্বারা চিত্র অঙ্কন ; প্রসাধনের অঙ্গ।

পরমভট্টারিকা—রানী বা রাজকুলোদ্ভবা মহিলার সম্ভ্রমসূচক আখ্যা।

পরিব্রাজিকা—রাজ-অবরোধের নারী অধ্যক্ষ।

মাৎস্যন্যায়—রাষ্ট্রবিপ্লব ; অরাজকতা।

লৌহজালিকা—লোহার জাল দিয়া তৈয়ারি অঙ্গত্রাণ (chainmail)।

শ্রেণী—কর্মিক-সমবায়।

সমাপানক—মজলিস, যেখানে বসিয়া সকলে সুরাপান করিত।

সংঘাটি—ভিক্ষুর পরিধেয় তিনটি বস্ত্রখণ্ডের একটি ; কটিবাস।

সংবাহক—যে ভৃত্য হাত-পা টিপিয়া দেয়।

সান্ধিবিগ্রহিক—সমরসচিব।

হস্তিনখ— বুরুজ (bastion)।

পরিশিষ্ট

[শরদিন্দু অম্‌নিবাস ষষ্ঠ খণ্ডে সুকুমার সেন-লিখিত ভূমিকায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গল্প সম্পর্কিত অংশটুকু এখানে প্রাসঙ্গিকতা সূত্রে পুনর্মুদ্রিত হল।]

গল্পের (এবং উপন্যাসের) প্রধান গুণ—একমাত্র গুণ হ'লেও ক্ষতি নেই—মনোহরণ-সামর্থ্য। যত বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন সমাজের ব্যক্তির এবং যত বেশি ব্যক্তির ভালো লাগবে গল্পের গুণ ততই স্বীকৃত হবে। এই মাপে বিচার করলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মান ও মর্যাদা উঁচুদরের। একদা গল্প লেখা হ'ত পদ্যে। তখন গল্পের কোনো পাঠক ছিল না, ছিল শ্রোতা, এবং শ্রোতাদের অবসর ও ধৈর্য এখনকার পাঠকের মতো পরিমিত ছিল না। তাই কথকের চেষ্টা ছিল গল্পের সূত্রকে পাকিয়ে পাকিয়ে যতদূর পারা যায় টেনে যাওয়া। এই কাজে সহায়ক ছিল ভাষা এবং সে ভাষার বাহন সঙ্গীত। একালের গল্প-কবিতা সঙ্গীতের নভোযানে আবির্ভূত হয় না, তাকে যেতে হয় ছাপা বইয়ের পৃষ্ঠায় প্রবহমান গদ্যের রাজপথে। সে পথ যতই অবক্কুর ও সরল হবে গল্পের গতি ও আকর্ষণ ততই বাড়বে। শরদিন্দুবাবুর গদ্যরীতির অনায়াস-সৌষম্যের কথা আগে বলেছি তাঁর ডিটেক্‌টিভ গল্পের প্রসঙ্গে। এখানে সে কথা তুলছি এইকারণে যে অত্র ষষ্ঠ খণ্ডে শরদিন্দুবাবুর প্রথম দিকের রচনা অনেকগুলিই আছে। সে সব রচনাতেও তাঁর প্রসন্ন-বাহিনী লেখনীর টানা স্রোত ব'য়ে চলেছে। এ গল্পগুলির অধিকাংশই ঐতিহাসিক-রঙা।

ইতিহাসের কাহিনী নিয়েই আমাদের দেশে গদ্য গল্পের সূত্রপাত। বিগত শতাব্দীর ঠিক মাঝখানে শশিচন্দ্র দত্ত ইংরেজীতে কিছু গল্প লিখেছিলেন ইতিহাস অবলম্বনে। শশিচন্দ্রের পথ অবলম্বন ক'রে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলায় দুটি গল্প লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে কিঞ্চিৎ ছায়া ফেলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে পশ্চাৎপট ক'রে তাঁর রোমান্সগুলির গল্প জমিয়েছেন। তার পর শশিচন্দ্রের স্নেহলালিত ভ্রাতুষ্পুত্র রমেশচন্দ্র দত্ত রীতিমত ইতিহাস-অনুগত উপন্যাস লিখলেন। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ঐতিহাসিক উপন্যাসেরই খণ্ড ছিন্ন রূপ দেখা গেল হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের গল্পে। তার পর এলেন যদুনাথ ভট্টাচার্য। ইনি বাংলার ইতিহাস থেকে কিছু বীর পুরুষ বেছে নিয়ে কল্পনা সংযোগে উপন্যাস লিখলেন। তা স্বদেশী এবং ঐতিহাসিকও হ'ল বটে কিন্তু ঠিক উপন্যাস হ'ল না, অর্থাৎ পাঠকের মন ভোলাতে পারে নি। তার পরে এলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় পূর্বগামীদের সঙ্গে এঁর কিছু পার্থক্য ছিল। রাখালদাস ইতিহাসের পাঠক ছিলেন না, ছিলেন ইতিহাসের গবেষক এবং ইতিহাসের লেখক। ইনি ইতিহাস বিদ্যাকে

অধিগত করেছিলেন, তাই তাঁর উপন্যাসের ঐতিহাসিক মালমশলা টাটকা সবজির মতো স্বাদু। রাখালদাসের উপন্যাস পড়লে ইতিহাস পড়ার ফল হয়। গল্পরসও আছে, কিন্তু সে রস খাঁটি হ'লেও নবীন নয়। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরই জের টেনেছিলেন। সাধারণ পাঠকের কাছে রাখালদাসের উপন্যাস—বোধ করি 'ময়ূখ' ছাড়া—যতটা সমাদর পাওয়া উচিত ছিল ততটা পায় নি। সে দোষ হয়ত সম্পূর্ণ সাধারণ পাঠকের নয়।

তার পরে এলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ঐতিহাসিক ছিলেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্ধারের কোন মহৎ ব্রত ইনি অবলম্বন করেন নি। শরদিন্দুবাবু ছিলেন ইতিহাস-পিপাসু পাঠক, ভক্ত। আগেকার লেখকদের মতো শরদিন্দুবাবু দূরবীনের চোঙার মধ্য দিয়ে কিংবা নাকে দূরদৃষ্টির চশমা এঁটে ইতিহাস হাতড়ান নি বা খোঁজ চালান নি। ইনি যেন চোখে কন্‌ট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে ইতিহাসকে হাতের নাগালে পেয়েছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত শরদিন্দুবাবুর ঐতিহাসিক গল্পের কালপ্রসার। এর মধ্যে কোথাও গল্পের পরিবেশ গল্পরসের তীক্ষ্ণতার হানি করে নি। দূরের দৃশ্যপটকে নিকটে এনে দূরের মানুষকে কাছের মানুষ করতে পেরেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এইখানেই ঐতিহাসিক গল্পলেখক রূপে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব।

আগেকার ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাসে মোগল-অন্তঃপুর, শাহী দরবার, আরাবল্লীর গিরিদুর্গ—এসব নিয়ে অনেক অনেক লেখা হ'য়েছে। শরদিন্দুবাবু তাই মুসলমান অধিকার কালে তিন-চারটির বেশি গল্প ফাঁদেন নি। দুটি গল্পের কাল আলাউদ্দিন খিলজির সময়ে ('শঙ্খ-কঙ্কণ' ও 'রেবা রোধসি'), একটি শিবাজীর বিষয়ে ('বাঘের বাচ্চা') আর একটির কাল শাহ্ সুজার সময়ে ('তক্ত্ মোবারক')। দুটি গল্পের কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী ('রক্ত-সন্ধ্যা' ও 'চুয়াচন্দন')। তিনটি গল্পের কাল চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে ('মৃৎপ্রদীপ', 'অষ্টম সর্গ' ও 'মরু ও সঙ্ঘ') এবং তিনটি খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে কল্পিত ('অমিতাভ', 'বিষকন্যা' ও 'সেতু')। একটির কাল হ'ল আর্যদের আগমনের গোড়ার দিকে ('প্রাগ্‌জ্যোতিষ'), একটির কাল তারও আগে ('ইন্দ্রতূলক')। একটির কাল প্রাচীন তবে অনির্দেশ্য ('রুমাহরণ')। আর একটির বীজ মিশরের প্রাচীন ইতিহাস থেকে নেওয়া ('আদিম')। বাকী ঐতিহাসিক গল্পটির কাল রচনার (১৯৩৬) প্রায় সমসাময়িক (১৯৩৪—'চন্দন-মূর্তি')।

দূর-কালের ইতিহাসকে বর্তমান কালের গোচরে আনবার যে অভিনব কৌশলটি শরদিন্দুবাবু অবলম্বন করেছেন তা হ'ল জাতিস্মর কল্পনা। শরদিন্দুবাবু জাতিস্মর ঘটনায় বিশ্বাসী ছিলেন কি না ঠিক জানি না—বোধ হয় ছিলেন। কিন্তু সে যাই হোক তিনি যে গল্প রচনায় স্বীয় জাতিস্মরতা প্রতিপন্ন করেছেন তা সহৃদয় পাঠক অবশ্যই স্বীকার করবেন। শরদিন্দুবাবুর জাতিস্মর সাহিত্যদৃষ্টিই ভূতকালের ভূতত্ত্বের সপিণ্ডীকরণ ক'রেছে।

অত্র খণ্ডে সঙ্কলিত ত্রিশটি গল্পের মধ্যে সতেরটি ঐতিহাসিক। তার মধ্যে পাঁচটি 'বৌদ্ধ' কালের। বৌদ্ধধর্মের ও 'বৌদ্ধ' যুগের ইতিহাসের উপর শরদিন্দুবাবুর টান একটু বেশি ছিল। তার কারণও আছে। এঁর জীবনের পূর্বাংশ কেটেছিল দক্ষিণ মগধ অঞ্চলে। পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী এঁর সবিশেষ পরিচিত ছিল। শরদিন্দুবাবুর আগে গুপ্ত যুগের আগেকার ইতিহাস নিয়ে কেউ গল্প-উপন্যাস লেখেন নি (অবশ্য নাটক লেখা হয়েছিল আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ ও তার পরবর্তী ঘটনা নিয়ে, বুদ্ধের জীবনী নিয়েও। কিন্তু সে-সবের কাহিনী চর্বিত চর্বণ ছাড়া কিছু নয়। রাখালদাসের 'হেম-কণা' বা 'পাষাণের কথা' ঠিক গল্প উপন্যাস নয়।) 'বৌদ্ধ' ইতিহাসে শরদিন্দুবাবুর আগ্রহ যে কতটা গভীর তার পরিচয় রয়েছে 'মরু ও সঙ্ঘ' গল্পে। চীনীয় তুর্কিস্থান একদা সরস উর্বর ভূখণ্ড ছিল। সেখানে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ চর্চা হ'ত।

কালক্রমে গোবি মরুভূমির বালিরাশি সে ভূখণ্ডকে গ্রাস ক'রে ফেলে এবং সব কিছুই বালিতে চাপা পড়ে যায়। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনীয় তুর্কিস্থানের মরুভূমি খুঁড়ে প্রাচীন শহরের ও বিহারের ভগ্নস্তূপ এবং বহু লেখ পাওয়া যায়। তাতে সে দেশের ইতিহাস, সে দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ এবং তত্র বৌদ্ধধর্মের পরিণতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য মিলেছে। চীনীয় তুর্কিস্থানের এই মরুগ্রাস ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে এই গল্পটি লেখা হয়েছে।

আমার সব চেয়ে বিস্ময় লেগেছে 'অষ্টম সর্গ' গল্পটির অসাধারণ কৌশলে ও দক্ষতায়। কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব কাব্য ক' সর্গ পর্যন্ত লিখেছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে দু-চার শ' বছর ধরে বিতণ্ডা চলে এসেছে। কতক পণ্ডিত বলেন কালিদাস সপ্তম সর্গে শিব-পার্বতীর বিবাহ ঘটিয়ে দিয়েই কাব্যটি শেষ করেছিলেন। কতক পণ্ডিত মনে করেন যে অষ্টম সর্গটিও কালিদাসের লেখা। এঁদের যুক্তি হ'ল, অষ্টম সর্গের রচনায় কালিদাসের লেখনীর স্পর্শ যেন বোঝা যায়, এবং মল্লিনাথও অষ্টম সর্গ পর্যন্ত ব্যাখ্যা লিখে গেছেন। নবম থেকে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত অংশটি যে কালিদাসের লেখা নয় তা বুঝদার পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করেন। কয়েকজন নেই-আঁকুড়ে অবশ্য এ নয় সর্গও কালিদাসের রচনা ব'লে মানেন। শরদিন্দুবাবু গল্পটির মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন যে কালিদাস সাত সর্গ পর্যন্ত লিখে থেমে গিয়েছিলেন। কারণ আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রমতে বিবাহঘটনার পরবর্তী দাম্পত্য সহবাস কাব্যে অথবা নাট্যে বর্ণনীয় বিষয় নয়। কাব্যনামটির কথা স্মরণ ক'রে কবির মন বাসরঘরের চৌকাট অবধি এসে থেমে যাওয়ায় মন সরছিল না। যেভাবে তাঁর কবিদৃষ্টি দেবদম্পতির দ্বারপ্রান্ত থেকে উঁকি দেবার ঔৎসুক্য পেয়েছিল তাই-ই রচনাটির গল্পসত্ত্ব।

—যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ননিমেষে
নামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবী-পানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে ॥

—রবীন্দ্রনাথের কবিতার এই ইঙ্গিতটুকু শরদিন্দুবাবু অত্যন্ত সহৃদয়তায় ও দক্ষতায় তাঁর গল্পে এঁকে দিয়েছেন।

একটি ঐতিহাসিক গল্পেও লেখকের নিপুণ কুশলতা দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। 'চন্দন-মূর্তি' গল্পটিতে 'বৌদ্ধ' যুগ প্রায় গল্প-রচনার কাল পর্যন্ত টেনে আনা হ'য়েছে। গল্প-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কালেরও পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন শরদিন্দুবাবু সমসাময়িক বিহার ভূমিকম্পকে উপলক্ষ্য ক'রে। লেখক নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

ঐতিহাসিক গল্পগুলির মধ্যে 'আদিম' একটু দুর্বল। তার কারণ এ গল্পের কাহিনীতে ইতিহাসের খেই ঠাসবুনোনি গাঁথতে পারে নি। ইতিহাস প্রাচীন মিশরের। সে ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক কিছু নেই। প্রাচীন মিশরের রাজ-সংসারে ভাইবোনের বিয়ে হ'ত প্রধানত রাজবংশের বিশুদ্ধি রাখবার জন্যে। সাধারণ সমাজে ভাইবোনের বিয়ে কতটা চলত তা জানি না, তবে কিছু হয়ত চলত। তবে আমাদের কাছে এ ব্যাপার অত্যন্ত ঘৃণ্য ঠেকে। শরদিন্দুবাবু গল্পটিতে দেখাতে চেয়েছেন, যে ভালোবাসা জন্মাবধি তা রক্তের মধ্যে রয়ে যায়। তাই সোমভদ্র শেষ পর্যন্ত শফরীকে পরিপূর্ণ ভালোবেসেই বিয়ে করলে।

বর্তমান মুহূর্তে রামায়ণের ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে যে পালি জাতকে রামের গল্পে সীতাকে তাঁর ভগিনী এবং ভার্যা বলা হয়েছে। এই সূত্রে কেউ কেউ বলছেন যে আমাদের দেশে সুপ্রাচীন কালে হয়ত ভাইবোনের বিয়ে অজ্ঞাত ছিল না। শরদিন্দুবাবুর গল্পটির প্রসঙ্গে এই

অনুমানের বিষয়ে আমার মন্তব্য এখানে উপস্থাপিত করলে আশা করি উৎকটরকম অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বৈদিক দেবতাদের কারো কারো আচরণে ভগিনীবিবাহের মতো অত্যন্ত অবৈধ প্রচেষ্টার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক মিথলজি এত প্রাচীন এবং এমন জটিল যে তার থেকে কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীর সামাজিক রীতিনীতির কোন নিষ্কর্ষ পাওয়া যায় না। ঋগ্‌বেদের অবচীন অংশে যে যম-যমী সূক্ত আছে তার থেকে উল্টা সিদ্ধান্তই করতে হয় যে ভাই-ভগিনীর বিবাহ আর্যসমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যাপার গণ্য হ'ত। যমী যমকে বিবাহ করতে চায়, যম কিন্তু কিছুতেই রাজি নয়, সে বলে সূর্যের চোখ মুহুর্মুহু উন্মীলিত হয়ে দিন রাত্রি করছে, স্বর্গ ও মর্ত্য মিথুন, আত্মীয়, আর যমী যমের সঙ্গে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করবে।

ভ্রাতা-ভগিনীর সংলাপের ফল যে কী হয়েছিল তার কোন হদিস নেই ঋগ্‌বেদে। তবে পরবর্তী বৈদিক ঐতিহ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে যমের মৃত্যু ঘটেছিল। এখনকার গল্প হ'লে যমীর আক্রমণ এড়াতে যম আত্মহত্যা করত।

মনে হয় পালি জাতকের গদ্য অংশে ভুল ক'রে সীতাকে রামের পত্নী করা হয়েছে। আসলে হয়ত সীতা ভগিনীই। তার কারণ বলছি। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চীনা ভাষায় অনুবাদ করা একটি জাতকে—এই জাতকের মূল পালিতে পাওয়া যায় নি—রাম-কথা আছে। সেখানে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা ভাইবোন। বনবাস অন্তে অযোধ্যায় ফিরে এসে রাম ও সীতা সিংহাসনে বসলেন এবং তাঁদের বিবাহ হ'ল। এইখানেই গোল বেধেছে। রাম-সীতা পতি-পত্নী হ'লে আগেই উল্লেখ থাকত। তা নেই। মনে হয় ভাইবোনে যুগপৎ রাজ্য করেছিল, তারা রাজা ও রানী। জাতকটি যিনি লিখেছিলেন তিনি রাজা ভাই ও রানী বোনকে প্রচলিত প্রথায় স্বামী-স্ত্রী ক'রে দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক গল্পগুলির অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ পাঠক স্বচ্ছন্দে 'ঐতিহাসিক' মন্তব্যটুকু বাদ দিতে পারেন। তাতে গল্পগুলির ঘটনার বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তার এবং বর্ণনার জাদুর কিছুমাত্র খর্বতা ঘটবে না। গল্পগুলি শিক্ষাগর্ভ নয়, গল্পগুলিতে পাণ্ডিত্যের কর্কশতা নেই, এগুলি বিশুদ্ধ রোমান্টিক এবং সহৃদয় ও উপাদেয় গল্প।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বগামী লেখকদের ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাসে 'জীবন্ত' ভূমিকা যে মেলে নি এমন নয়। কিন্তু সে-সব ভূমিকা জীবন্ত হয়েছে বাইরের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায়, অর্থাৎ লেখকের উজ্জ্বল বর্ণনায় উদ্ভাসিত হওয়ার ফলে। শরদিন্দুবাবুর গল্পের ভূমিকাগুলি জীবন্ত হয়েছে বাইরের থেকে আলোকসম্পাতে নয় তাদের অন্তরের জ্যোতি থেকেই। শরদিন্দুবাবুর বর্ণনা নয় তাঁর দৃষ্টিই ভূমিকাগুলিকে ইতিহাস-মঞ্চের পুতুলবাজি থেকে নামিয়ে এনে যেন সমসাময়িক জীবনে ভূমিষ্ঠ করিয়েছেন। ...(২৮.২.১৯৭৬)

গ্রন্থ-পরিচয়

ছেলেবেলা থেকেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে ইতিহাস সম্পর্কে একটা মোহ ছিল। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে এক সাক্ষাৎকারে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'ঐতিহাসিক গল্প লেখার প্রেরণা পাই বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছি ভাষার মধ্যেই বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায়—বিশেষ করে ঐতিহাসিক বাতাবরণ। ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো কেবল নিয়েছি ; কিন্তু গল্প আমার নিজের। সর্বদা লক্ষ্য রেখেছি কি করে সেই যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায়। যে সময়ের গল্প তখনকার রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, অস্ত্র, আহার, বাড়িঘর ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব না জানলে যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায় না। এরপর আছে ভাষা। ঐতিহাসিক গল্পের ভাষাও হবে যুগোপযোগী।'

তিনি স্বীকার করেছেন, 'ইতিহাসের গল্প লিখেই বেশি তৃপ্তি পেয়েছি। মনে কেমন একটা সেন্স অব ফুলফিলমেন্ট হয়। গৌড়মল্লার ও তুঙ্গভদ্রার তীরে লেখার পর খুব তৃপ্তি পেয়েছিলাম। চুয়াচন্দন লিখেও তাই হয়েছিল।' (জীবনকথা, শরদিন্দু অম্‌নিবাস, দ্বিতীয় খণ্ড)

শরদিন্দুবাবুর ইতিহাস-আশ্রিত গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা হল যথাক্রমে সতেরো এবং পাঁচ। এই কাহিনীগুলি বর্তমান গ্রন্থের দুই অংশে রচনাকাল অনুসারে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

শরদিন্দু অম্‌নিবাস ষষ্ঠ খণ্ডে সুকুমার সেন মহাশয়ের লেখা ভূমিকা থেকে শরদিন্দুবাবুর ঐতিহাসিক গল্পগুলি সম্পর্কে মন্তব্য বর্তমান সঙ্কলনের পরিশিষ্ট অংশে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

জাতিস্মর। রমেশ ঘোষাল। ৩৫ বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৫১। পৃ. [৪] + ১০৩। মূল্য দুই টাকা।

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৩৯।

সূচী ॥ অমিতাভ ; মৃৎপ্রদীপ; রুমাহরণ।

'তিনটি ইতিহাসগন্ধী গল্প এই গ্রন্থে স্থান পাইল। সবগুলিই ইতিপূর্বে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ; স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন করিয়াছি।

জাতিস্মর শ্রেণীর গল্প বাংলাভাষায় নূতন হইলেও বিদেশী সাহিত্যে নূতন নয়। আমি যতদূর জানি, বিখ্যাত মার্কিন গাল্পিক জ্যাক্ লণ্ডন্ ও সর্ববিদিত ইংরাজ সাহিত্যিক স্যার আর্থার কোনান্ ডয়েল্ এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক ; জাতিস্মরের মুখ দিয়া গল্প বলাইবার চেষ্টা তাঁহাদের পূর্বে আর কেহ করেন নাই। এই দুই স্বর্গীয় লেখকের নিকট আমার ঋণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি।

'অমিতাভ' গল্পের মূলে একটুখানি পৌরাণিক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নাই। 'মৃৎপ্রদীপ'-এর আখ্যান-বস্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক—কেবল কুমারদেবী, চন্দ্রগুপ্ত, চন্দ্রবর্মা, সমুদ্রগুপ্ত

এই নামগুলা ঐতিহাসিক। চন্দ্রবর্মার দিগ্বিজয় যাত্রাও সত্য ঘটনা। 'রুমাহরণ' গল্পে মানবসভ্যতার গোড়ার কথাটা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

ইতিহাসের ঘটনাকে যথাযথ বিবৃত করাই ঐতিহাসিক গল্পের উদ্দেশ্য বলিয়া আমার মনে হয় না। তাৎকালিক আবহাওয়া যদি কিছুও সৃষ্টি করিতে পারিয়া থাকি, তবেই উদ্যম সার্থক হইয়াছে জানিব। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামসূত্র হইতে এই বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।'—ভূমিকা

প্রচ্ছদপটের উপর পুষ্পপাত্র, শনিবারের চিঠি ও আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এবং ভিতরে ফরওয়ার্ড ও প্রবাসীতে প্রকাশিত সমালোচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত। গ্রন্থশেষে 'প্রাচীন শব্দের অর্থ' দেওয়া আছে।

নূতন সংস্করণ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত ; ৭ই আষাঢ় ১৩৬৩।

দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৪। পৃ. [১০] + ১১৭। মূল্য দু টাকা আট আনা। গ্রন্থারম্ভে 'প্রাচীন শব্দের অর্থ' দেওয়া আছে।

অমিতাভ গল্পটি 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'ও যুক্ত।

মৃৎপ্রদীপ গল্প সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য : 'কুমরাহারে প্রাচীন পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর সময় জঞ্জালস্তূপের মাঝে একটি মাটির প্রদীপ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। মুখের কাছে একটু যেন পোড়া দাগ লেগে রয়েছে। খননকারীরা হয়তো এটা ফেলে গেছেন কিম্বা তাঁদের নজরে আসেনি। সেটি কুড়িয়ে এনে বাড়িতে টেবিলের উপর রেখে দিলাম এবং রাত্রে সেটি জ্বাললাম। কয়েকদিন ওই জ্বলন্ত প্রদীপটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে 'মৃৎপ্রদীপ' গল্পটি মাথায় আসে।' (জীবনকথা, শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বিতীয় খণ্ড)

বাঘের বাচ্চা, রক্ত-সন্ধ্যা ও চুয়াচন্দন এই তিনটি গল্প অন্যান্য গল্পের সঙ্গে 'চুয়াচন্দন' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল।

চুয়াচন্দন। রমেশ ঘোষাল। দ্বিতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৫২। পৃ. [৪] + ১৫৮ + ৪। মূল্য তিন টাকা।

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ ১৩৪২।

"...'রক্ত-সন্ধ্যা'য় ভাস্কো-ডা-গামার চরিত্র সম্পূর্ণ ইতিহাসসম্মত, কোথাও রং চড়াইবার চেষ্টা করি নাই। যাঁহারা এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিটির সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে উৎসুক, তাঁহারা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের অমূল্য পুস্তক 'ফিরিঙ্গি-বণিক' পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

এই গল্পে 'ফিরিঙ্গি' শব্দ মূল্য অর্থে (Frank = ফিরিঙ্গি = য়ুরোপীয় যে কোন জাতি) ব্যবহৃত হইয়াছে ; বর্তমানের কোনও সম্প্রদায় বিশেষকে কটাক্ষ করা হয় নাই। বলা বাহুল্য, যে-সময়ের গল্প সে-সময়ে উক্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না।

'চুয়াচন্দনে'র একটি ঘটনার জন্য বিদ্যাপতি ঠাকুরের নিম্নোদ্ধৃত পদটির নিকট আমি ঋণী—

'তঁহি পুন মোতি-হার টুটি পেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি কেল'।..."—ভূমিকা

শেষের চারটি পৃষ্ঠায় প্রমথনাথ বিশীর লেখা 'চুয়াচন্দন' গ্রন্থের সমালোচনা (শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৪৩) মুদ্রিত।

তৃতীয় সংস্করণ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত ; অগ্রহায়ণ ১৩৬২। পৃ. [৮] + ১৬৯ + √·। মূল্য তিন টাকা।

চতুর্থ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮। পৃ. [৬] + ১৫৮। মূল্য তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

এই সংস্করণে প্রমথনাথ বিশীর সমালোচনা বাদ দেয়া হয়।

গল্প তিনটি সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য : "'বাঘের বাচ্চা'র মূল কথাটি Elphinstone-এর History of India-র একটি পংক্তিতে পাওয়া যায়। অন্য কোথাও উহার উল্লেখ আছে কিনা জানি না। স্যার যদুনাথের 'শিবাজী'তে কিছু নাই।' (লেখকের নোটস)।

"'চুয়াচন্দন' লিখে [খুব তৃপ্তি] হয়েছিল। মুঙ্গেরে স্কুলের টিচার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে একটি বই পড়তে দেন। সেটি পড়েই চৈতন্যের গোড়ার জীবন নিয়ে গল্প লেখার ইচ্ছা হয়। চুয়াচন্দন ছ'বার লিখেছিলাম। যতক্ষণ না লিখে তৃপ্তি হচ্ছে শান্তি নেই। (জীবনকথা, শরদিন্দু অম্নিবাস, দ্বিতীয় খণ্ড)

['রক্ত-সন্ধ্যা'] : 'আমি মুঙ্গেরে থাকি। সন ১৩৩৭ সাল। তখন সবে মাত্র গল্প লিখতে আরম্ভ করেছি, বড় জোর পাঁচ-ছটা লিখেছি। বেশীর ভাগই বর্তমান কালের গল্প, কেবল একটি জাতিস্মর জাতীয় প্রাচীনকালের কিংবদন্তী মূলক কাহিনী। তাতে ভগবান বুদ্ধ পলকের জন্য দেখা দিয়েছেন।

নতুন ধরণের কিছু লেখার ইচ্ছা, কিন্তু উপযুক্ত বিষয়বস্তু পাচ্ছি না। জাতিস্মরের আইডিয়া তখন মাথায় চেপে বসেছে। কিন্তু অভিনব উপকরণ না পেলে তো ও জাতীয় কাহিনী লেখা যায় না। মনটা ছটফট করছে।

"অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের ফিরিঙ্গি বণিক বইখানা কি করে আমার হাতে এল এতদিন পরে আজ আর তা মনে নেই। ইতিহাসের উপর আমার চিরদিনের ঝোঁক, বইখানা হাতে পেয়েই পড়তে শুরু করে দিলাম।

পড়তে পড়তে মনে হল জীবন্ত চিত্রের প্রবাহ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কালিকট নগর, সমুদ্রতীরের বন্দর, ভাস্কো-ডা-গামার প্রথম ভারতে পদার্পণ ; তারপর লোভী নিষ্ঠুর ফিরিঙ্গির সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান বণিকের সংঘাত। বই যখন শেষ হল তখন রক্ত-সন্ধ্যা গল্পটিও আমার মধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে।

লিখতে আরম্ভ করলাম। ঐতিহাসিক সত্যের ওপর কল্পনার প্রলেপ দিয়ে, নতুন চরিত্র ও ঘটনা তৈরি করে জাতিস্মরতার ফ্রেমে তাকে বসালাম। মনে আছে গল্পটা লিখতে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম, সহজে লেখা বেরোয়নি।

সে আজ চৌত্রিশ বছর আগেকার কথা। রক্ত-সন্ধ্যা প্রথম মাসিক বসুমতীতে বেরিয়েছিল। অবচীন লেখকের রচনা রসিকজনের কাছে আদর পেয়েছিল ভেবে আজও আনন্দ পাই।" (ডায়েরি, ২৫ জুন ১৯৬৪)

বিষকন্যা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৫২। পৃ. [৬] + ১৯৭। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

প্রথম প্রকাশ—১৩৪৭।

সূচী ॥ চন্দন-মূর্তি ; সেতু ; মরু ও সঙ্ঘ ; অষ্টম সর্গ ; বিষকন্যা ; প্রাগ্‌জ্যোতিষ।

'সাত বৎসর পূর্বে যখন আমার প্রথম পুস্তক 'জাতিস্মর' প্রকাশিত হইয়াছিল তখন কল্পনা করি নাই যে রসিক-সমাজে উহা সমাদৃত হইবে। তারপর মাঝে মাঝে প্রাচীনকালের যে গল্পগুলি লিখিয়াছি সেগুলি এতদিন মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ ছিল। এখন সেগুলি পুস্তকাকারে

সংগৃহীত হইবার মত কলেবর লাভ করিয়াছে দেখিয়া তাহাদের একযোগে বিদগ্ধ মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম।

ছয়টি গল্পের মধ্যে কেবল 'বিষকন্যা' গল্পটি জাতিস্মর জাতীয়। 'চন্দন-মূর্তি' ও 'সেতু' বর্তমান কালের গল্প। তবু যে এগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করিলাম তাহার কারণ সবগুলিতেই দূর অতীত কালের স্পর্শ কাছে। 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' গল্পের জাতি সম্পূর্ণ আলাদা হইলেও উহাকে এই পর্যায়ভুক্ত করিবার ইহাই কারণ।

'অষ্টম সর্গ' গল্পে যে-যুগের অবতারণা করিয়াছি সে যুগের কোনও স্পষ্ট ইতিহাস নাই, বিভিন্ন মতাবলম্বী অনুমান মাত্র আছে। যে মানুষগুলিকে এই গল্পে অবতারিত করা হইয়াছে তাঁহারা কোন্ শতকের লোক ছিলেন এবং একই কালে জীবিত ছিলেন কিনা, এই ক্ষুব্ধ প্রশ্নের মীমাংসা করা গল্পের বিষয়ীভূত নয়। ইতিহাসের অস্পষ্টতার সুযোগ লইয়া আমি তাঁহাদের সমসাময়িকরূপে কল্পনা করিয়াছি। কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গ যে স্বয়ং কালিদাসের রচনা তাহা এই কাহিনীর প্রতিপাদ্য না হইলেও মুখ্য বক্তব্য বটে।'—ভূমিকা (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭)

চতুর্থ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৩। পৃ. [৪] + ১৮৩। মূল্য তিন টাকা।

এই গ্রন্থটি পরে 'ধরণী যখন তরুণী ছিল' নামে আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত হয়। নূতন সংস্করণ, মে ১৯৬৪। পৃ. ১৮৩। মূল্য চার টাকা।

'এই গল্পগুলি ইতিপূর্বে 'বিষকন্যা' নামে প্রচারিত ছিল। এখন নূতন নামে প্রকাশিত হইল।'—ভূমিকা

তৃতীয় মুদ্রণ, অগস্ট ১৯৬৯। পৃ. ১৬৮। মূল্য চার টাকা।

'সেতু' ও 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' গল্প দুটি 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'ও যুক্ত।

তক্ত মোবারক ও ইন্দ্রতূলক গল্পটি অন্যান্য গল্পের সঙ্গে 'শাদা পৃথিবী' গ্রন্থে প্রকাশিত।

শাদা পৃথিবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৫। পৃ. [৮] + ১৬৬। মূল্য তিন টাকা।

"...'তক্ত মোবারক' ঐতিহাসিক কাহিনী। পূর্বে আমি যত ঐতিহাসিক কাহিনী লিখিয়াছি, রোমান্সই ছিল তাহাদের লক্ষ্য, 'তক্ত মোবারক' গল্পে ইতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছি।

'ইন্দ্রতূলক' রচনাটি কেহ গাম্ভীর্যের সহিত গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করি না। উহা 'হইলে হইতে পারিত' গোছের পরিকল্পনা। কিন্তু জ্ঞাত ইতিহাসের সহিত তাহার কোথাও বিরোধ নাই। আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল এই ঐতিহাসিক তর্কের এখনও মীমাংসা হয় নাই। আর্যগণ য়ুরোপের আদিম অধিবাসী ছিলেন ইহা যেমন সাহেবদের আষাঢ়ে গল্প, আমার গল্প হয়তো ততটাই আষাঢ়ে, তাহার বেশী নয়।'—গ্রন্থকারের নিবেদন

দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৬২। পৃ. [৮] + ১৬৬। মূল্য তিন টাকা।

মূল 'তক্ত মোবারক' গল্পের 'আলাবর্দি খাঁ' নামটি বদল করে বর্তমান সংকলনে, শরদিন্দু অম্‌নিবাস ষষ্ঠ খণ্ডের মতো, আলিবর্দি খাঁ রাখা হয়েছে। এই শব্দটি পাঠকদের কাছে বেশি পরিচিত।

'আদিম' গল্পটি 'এমন দিনে' গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত।

এমন দিনে। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। প্রথম সংস্করণ, ৭ই ফাল্গুন ১৮৮৩ শকাব্দ [১৩৬৯]। পৃ. [৮] + ১৮২। মূল্য তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

শঙ্খ-কঙ্কণ ও রেবা রোধসি গল্প দুটি 'শঙ্খ-কঙ্কণ' গ্রন্থে প্রকাশিত।

শঙ্খ-কঙ্কণ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩। পৃ. [৪] + ১১২। মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অন্যভাষায় অনূদিত শরদিন্দুবাবুর কয়েকটি ঐতিহাসিক গল্পের নাম উল্লেখ করা হল—

হিন্দি : চুয়াচন্দন ; মারাঠী : প্রাগ্‌জ্যোতিষ ; মলয়ালাম : বিষকন্যা ; কন্নড় : রক্ত-সন্ধ্যা, বিষকন্যা ; গুজরাতী : রক্ত-সন্ধ্যা ; চন্দন-মূর্তি, মরু ও সঙ্ঘ, অমিতাভ ; ইংরাজি : চন্দন-মূর্তি (The Divine Image—'Green and Gold', 1975), সেতু (Across—Indian Horizons, vol. XXXIII, No. 4, 1974); ফরাসি : সেতু (A Traves)।

কালের মন্দিরা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৬০। পৃ. ২+১৯৫। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৫৮।

"এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ পাওয়া যায়—

"মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্ত যৌবরাজ্যে পুষ্য মিত্রীয় ও হূণগণকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত পিতৃকুলের বিচলিতা রাজলক্ষ্মী স্থির করিবার জন্য রাত্রি ত্রয় ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রথমবার পরাজিত হইয়া হূণগণ উত্তরাপথ আক্রমণে বিরত হন নাই, প্রাচীন কপিশা ও গান্ধার অধিকার করিয়া হূণগণ একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।...৪৬৫ খৃষ্টাব্দের পর হূণগণ পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করে ও বারবার গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে।"

আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কেবল স্কন্দগুপ্তের চরিত্র ঐতিহাসিক।

এই আখ্যায়িকায় নিছক গল্প বলা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য যদি থাকে তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে—

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হূণ-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হ'ল লীন।

অতীতে যাহা বারবার ঘটিয়াছে ভবিষ্যতেও তাহা ঘটিবে, ইতিহাসের এই আত্মনিষ্ঠায় অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। যাহারা মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধি চিরস্থায়ী করিতে চাহে তাহারা ইতিহাসের অমোঘ ধর্ম লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করে, তাহারা শুধু বিচারমূঢ় নয়—মিথ্যাচারী।

সর্বশেষে এই কাহিনী সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি আছে, তাহা পাঠক-পাঠিকাকে নিবেদন করা প্রয়োজন মনে করি। ১৯৩৮ সালে মুঙ্গেরে থাকা কালে এই কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করি। কয়েক পরিচ্ছেদ লেখা হইবার পর সুদূর বোম্বাই হইতে আহ্বান আসিল, জীবনের সমস্ত কর্মসূচী ওলটপালট হইয়া গেল। তারপর দীর্ঘ দশ বৎসর এ কাহিনী আর লিখিতে পারি নাই। শুধু সময়ের অভাবেই নয়, এ আখ্যায়িকা লিখিবার পক্ষে মনের যে ঐকান্তিক অনন্যপরতা প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অতঃপর ১৯৪৮ সালে দৃঢ়ব্রত হইয়া আবার আখ্যায়িকার ছিন্নসূত্র তুলিয়া লইয়াছি এবং আরম্ভের ঠিক বারো বৎসর পরে শেষ করিয়াছি।

বারো বৎসরের ব্যবধানে মানুষের মন এক প্রকার থাকে না ; চরিত্র দৃষ্টিভঙ্গি রসবোধ সবই বদলাইয়া যাইতে পারে, সৃষ্টিশক্তিরও তারতম্য ঘটা সম্ভব। গল্পের যে স্থানটিতে বারো বছরের

ফাঁক পড়িয়াছে পাঠক-পাঠিকা হয়তো সহজেই তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন। যদি না পারেন, বুঝিব আমার অন্তর্লোকে মহাকালের মন্দিরা এখনও একই ছন্দে বাজিতেছে, তাহার তাল কাটে নাই।"—ভূমিকা (মালাড়, ৪-২-১৯৫০)

১৯৩৮ সালের ৮ই মার্চ মুঙ্গেরে এই কাহিনী লেখা আরম্ভ হয়। কয়েক পরিচ্ছেদ লেখার পর কর্মসূত্রে লেখক বোম্বাই-এ চলে আসেন ; তখন লেখা বন্ধ থাকে। দীর্ঘ দশ বৎসর পরে ১৯৪৮ সালে তিনি সেই অসমাপ্ত কাহিনীটি আবার লিখতে শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে শরদিন্দুবাবু ডায়েরিতে লিখেছেন : '...অনেকবার লিখিব মনে করিয়া নাড়াচাড়া করিয়াছি ; কিন্তু এ ধরনের উপন্যাস আধখানা মন দিয়া লেখা যায় না। তাই উহা নূতন করিয়া ধরিতে সাহস হয় নাই। ইতিমধ্যে এই এগারো বছরে কাহিনীর অনেক সূত্র মনের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়, এগারো বছর আগে আমার মন যেরূপ ছিল এখন যে ঠিক তাহাই আছে এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। 'আমার সে-মন গেছে বহুক্ষণ আমার এ-মন ফেলে'—একেবারে না হোক কিছুটা সত্য বটে। তাছাড়া শক্তিরও তারতম্য ঘটিয়া থাকিতে পারে। তখন আমার বয়স ছিল উনচল্লিশ, এখন পঞ্চাশ।

তবু আবার লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। গল্পের কাঠামোটা ভুলি নাই, তাহারই উপর নূতন করিয়া রঙ ফলাইতে আরম্ভ করিয়াছি। জানি না, রোমান্সের রঙ আগের মত ফলিবে কিনা। যদি শেষ করিতে পারি পাঠকেরা হয়তো বুঝিতে পারিবেন, গল্পের কোনখানে এগারো বছরের ব্যবধান।' (২২ মে ১৯৪৯)

১৯৫০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি (২২ মাঘ ১৩৫৬ সাল) উপন্যাসটি শেষ করার পর তিনি লিখেছেন : '...বারো বৎসর ধরিয়া মাছের কাঁটার মত গল্পটা আমার গলায় বিঁধিয়া ছিল, এতদিনে বাহির হইল। বেশ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছি ; আবার কেমন যেন একটু ফাঁক ফাঁক ঠেকিতেছে।

ভাবিতেছি...[মুঙ্গেরে থাকাকালে] একটানা ভাবে লিখিয়া যদি উহা শেষ করিতাম তাহা হইলে কেমন হইত ? এখন যেমন দাঁড়াইয়াছে তাহার চেয়ে ভাল হইত কি ?

এখন যে কী দাঁড়াইয়াছে তাহা আমি জানি না। হয়তো ভাল হইয়াছে ; হয়তো কিছুই হয় নাই। এইটুকু শুধু বলিতে পারি, আমি লিখিয়া আনন্দ পাইয়াছি ; রসজ্ঞ সমালোচকদের যদি ভাল নাও লাগে এই আনন্দটুকুই আমার পুরস্কার। এবং ভাবিয়া দেখিতে গেলে এর চেয়ে বড় পুরস্কার লেখকের আর নাই।

আমার মস্তিষ্কের মধ্যে যে পরম ছিদ্রান্বেষী সদা-জাগ্রত সমালোচকটি আছে সে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিতেছে—'সাবাস ! ভয় নাই।'

দেখা যাক। কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।' (ডায়েরি, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০)

গল্পের যে স্থানটিতে বারো বছরের ফাঁক পড়েছে সেদিকে লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের 'মুদিত চক্ষে চিত্রক নিজ জীবন-কথা চিন্তা করিতেছিল'—এই লাইন পর্যন্ত মুঙ্গেরে লেখা। এরপর ১৯৪৮ সালে লেখা শুরু হয়েছে—'চিন্তার সূত্র মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল...।'

গৌড়মল্লার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স। প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১। পৃ. ৩+[৩]+২৩৭। মূল্য চার টাকা।

"এই কাহিনী রচনা কালে কয়েকটি পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি। প্রথমেই আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়কে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করি। তাঁহার কাছে যে

আমি কত ভাবে ঋণী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বেতসকুঞ্জ হইতে ধনুর্বেদ পর্যন্ত সমস্তই তাঁহার অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়াছি। শ্রীনীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের বিরাট গ্রন্থ বাঙালীর ইতিহাসে সংগৃহীত উপাদান আমার কাহিনীর ভিত্তি। শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী নামক পুস্তিকা হইতে সাহায্য পাইয়াছি। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকটি প্রাচীন শব্দের সন্ধান দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়বঙ্গে শতবর্ষ ধরিয়া মাৎস্যন্যায় চলিয়াছিল, চারিদিক হইতে রাজ্যগৃধ্নু রাজারা আসিয়া দেশকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। একদিক হইতে আসিয়াছিলেন জয়নাগ ভাস্করবর্মা, অন্য দিক হইতে হর্ষবর্ধন। তারপর আরও অনেকে আসিয়াছিলেন, বাংলা দেশ লইয়া কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। শেষে শতবর্ষ পরে পাল বংশের গোপাল আসিয়া শান্তি শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

এই শতাব্দীব্যাপী মাৎস্যন্যায়ের মধ্যে বাংলা দেশে ইতিহাস ও সংস্কৃতির একটা যুগ শেষ হইয়াছিল। শশাঙ্কের জীবদ্দশা পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম পাশাপাশি শান্তিতে বাস করিতেছিল ; দুর্ধর্ষ বীর শশাঙ্ক অবশ্য শান্তিকামী অহিংস বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, অল্পবিস্তর উৎপীড়নও করিয়াছিলেন। তথাপি জনগণের মনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট হয় নাই। কিন্তু বিপ্লবের শতাব্দী শেষে দেখা গেল বৌদ্ধধর্মের স্বতন্ত্র সত্তা প্রায় লোপ পাইয়াছে ; বৌদ্ধ দেবদেবী হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া হিন্দুধর্মকে নব কলেবর দান করিয়াছে ; স্বয়ং বুদ্ধ হিন্দুর অবতার রূপে পূজা পাইতেছেন। পাল বংশীয় রাজারা অবশ্য বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু নামে মাত্র ; দুই ধর্মের মাঝখানে সুচিহ্নিত সীমারেখা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

এই শতবার্ষিক ক্রান্তিকালে বাঙালীর আধ্যাত্মিক বিবর্তন যেরূপই হোক, ঐহিক ব্যাপারে তাহার মারাত্মক অনিষ্ট হইয়াছিল ; তাহার সামুদ্রিক বাণিজ্য একেবারেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। শুধু অন্তর্বিপ্লবের জন্যই নয়, বাহির হইতেও প্রবল শত্রু দেখা দিয়াছিল। এ পর্যন্ত বাঙালীর জল-বাণিজ্য পূর্বে চীনদেশ হইতে পশ্চিমে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল ; এই সময় আরব দেশের মরুভূমিতে তাহার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মগ্রহণ করিল। নূতন ধর্মের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হইয়া আরবগণ দিকে দিকে প্রধাবিত হইল। ভারতসাগরের নৌ-বাণিজ্য তাহারা বাঙালীর হাত হইতে কাড়িয়া লইল। বাঙালীর তখন ঘরে আগুন লাগিয়াছে, বাহিরের শত্রুর কাছে সে পরাভূত হইল। বাঙালীর সাগরোদ্ভবা লক্ষ্মী আবার সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। বাঙালীর সৌভাগ্যের দিন ফুরাইল। দেশে সোনা-রূপার বদলে কড়ির মুদ্রা প্রচলিত হইল।

ইহার প্রায় সহস্র বৎসর পরে মোগল পাঠানের আমলে বাঙালীর নৌ-বাণিজ্য আর একবার মাথা তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। মগ ও পোর্তুগীজ জলদস্যু আসিয়া আবার ভরাডুবি করিয়াছিল।

আমার কাহিনী শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আরম্ভ হইয়া তাহার বিংশ বৎসর পরে শেষ হইয়াছে। এই সময়ে বাঙালীর চরিত্র সংস্কৃতি গ্রাম্য জীবন নাগরিক জীবন কিরূপ ছিল তাহা অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। পটভূমিকা জানা থাকিলে কাহিনী অনুসরণ করিবার সুবিধা হয় তাই এত কথা লিখিলাম।"—'পটভূমিকা' শীর্ষক ভূমিকা (পুণা, মাঘ ১৩৬০)

লেখকের ডায়েরিতে দেখা যায় ১৩৫৭ সালের ৩রা আষাঢ় (১৭ জুন, ১৯৫০) এই কাহিনী লেখা শুরু হয়, শেষ হয় ১৩৫৯ সালের ৪ঠা আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫২)। উপন্যাস আরম্ভ করার অল্পদিন পরে শরদিন্দুবাবু লিখেছেন ঃ 'ভাবিয়াছিলাম কালের মন্দিরার পর বড় আর কিছু লিখিব না, ইহাই বঙ্গ-বাণীর চরণে আমার শেষ অর্ঘ্য। বয়স বাড়িতেছে, জীবন জটিলতর হইয়া উঠিতেছে ; অতঃপর দীর্ঘ রচনা আর সম্ভব হইবে না। কিন্তু নীহাররঞ্জনের বাঙালীর

ইতিহাস পড়িয়া আবার মাথায় একটি উপন্যাস আসিয়াছে। লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।

প্রাচীন বাংলা দেশ লইয়া গল্প লিখিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে ছিল ; কিন্তু বাংলা দেশের বিশিষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার মত মালমশলা কোথাও পাই নাই। নীহাররঞ্জনের বইখানি পড়িয়া যে অপূর্ব উপাদান পাইয়াছি তাহাই অবলম্বন করিয়া উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাংলা দেশে যে শতাব্দীব্যাপী মাৎস্যন্যায় আরম্ভ হইয়াছিল তাহারই সূচনা আমার গল্পে আছে। বাঙালীর জীবনে ইহা এক মহা ক্রান্তিকাল। আধুনিক বাঙালীর জন্ম এই সময়।' (ডায়েরি, ২৭ জুলাই ১৯৫০)

বাংলা দেশের সমাজ ও অন্যান্য বহু বিষয়ে নানা খুঁটিনাটি তথ্য লেখক আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর এ নিয়ে দীর্ঘ পত্র-বিনিময় হয়। লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে সযত্নে রক্ষিত চিঠিপত্রের ফাইলে তার সাক্ষ্য রয়েছে।

প্রথমে এই উপন্যাসটির নাম ছিল 'মৌরী নদীর তীরে'। কয়েক পরিচ্ছেদ লেখার পর নতুন নাম হয়—গৌড়মল্লার।

তুমি সন্ধ্যার মেঘ। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৫, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। পৃ. [৬] + ২৪০। মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

তৃতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৮৩, আগস্ট ১৯৭৬।

উৎসর্গ ॥ যাঁহার প্ররোচনায় এই কাহিনী লিখিয়াছি/সেই পরম ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের করকমলে ইহা সাদরে অর্পণ করিলাম।

প্রচ্ছদ ॥ অজিত গুপ্ত

"এই কাহিনীতে দীপঙ্কর, রত্নাকর, শান্তি, নয়পাল, বিগ্রহপাল, লক্ষ্মীকর্ণদেব, বীরশ্রী, যৌবনশ্রী, জাতবর্মা, বজ্রবর্মা, যোগদেব ও তিব্বতীয় আচার্য বিনয়ধরের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। দীপঙ্করের শান্তি-প্রচেষ্টা এবং বিগ্রহপালের সহিত যৌবনশ্রীর বিবাহও ঐতিহাসিক ঘটনা।

এই কাহিনীর সংঘটন কাল হইতে শতাধিক বর্ষ পরে কান্যকুব্জের রাজা জয়চাঁদ তাঁহার কন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবর সভায় পৃথ্বীরাজকে অপদস্থ করিবার যে ফন্দি করিয়াছিলেন, এই কাহিনীর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাবলীর সহিত তাহার কিছু সাদৃশ্য আছে। জয়চাঁদের এই ফন্দি তাঁহার স্বকপোলকল্পিত এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। অনুমান হয়, তৎকালের রাজাদের এই ধরনের নষ্টামি একটা ব্যসন ছিল।

যে লঘুচিত্ততা অপরিণামদর্শিতা স্বজাতিদ্রোহিতা ও অন্তঃকলহের ফলে ভারতের সংস্কৃতি নয়শত বৎসরের জন্য অস্তমিত হইয়াছিল তাহারই চিত্র আমার কাহিনীর পটভূমিকা।"—ভূমিকা (ভাদ্র ১৩৬৫)

লেখকের ডায়েরি থেকে জানা যায় এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয় ২৬ অক্টোবর ১৯৫৬, শেষ হয় ১৯ আগস্ট ১৯৫৮।

শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরেই হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁকে চেদীরাজ কর্ণদেব ও বাংলার পাল সম্রাটদের নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার জন্য অনুরোধ করেন। শুধু অনুরোধ জানিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি ; লেখার উপকরণ হিসেবে নানা ঐতিহাসিক তথ্য এবং আকর গ্রন্থের কথা জানিয়ে তিনি উপন্যাসটি লেখার জন্য বারম্বার তাগিদ দিতে থাকেন ? হরেকৃষ্ণবাবুর লেখা কয়েকটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল ঃ

'বাঙ্গালার তথা ভারতের ইতিহাস আমার অন্যতম প্রিয় বস্তু। তুমি যেমন সেই ইতিহাসের

উপকরণ লইয়া গল্প-উপন্যাস লেখ, অতীতের সুন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি কর। সেকালের সম্রাট, সেনাপতি, সামন্ত, প্রজা—সেই নাম-ধাম। সেকালের উপযোগী কথোপকথন—সে এক অভিনব কল্পলোক। আমি সব চোখের সম্মুখে দেখি—একেবারে সেকালে গিয়া উপস্থিত হই। দুর্গেশনন্দিনীতে, রাজসিংহেও ইতিহাসের ছায়া আছে। কিন্তু কালের মন্দিরা ও গৌড়মল্লারের সঙ্গে তাহার পার্থক্য কত।

তুমি চেদীরাজ কর্ণদেব আর বাঙ্গালার পাল সম্রাটদের লইয়া একখানি উপন্যাস লেখ। কর্ণদেব আপন কন্যা যৌবনশ্রীকে বিগ্রহপালের হাতে দিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার সে এক গৌরবময় অধ্যায়। রাঢ়ের তখন বিপুল ঐশ্বর্য। ...' (চিঠি, ১৮ শ্রাবণ ১৩৬১)

'...৺রাখালদাস বন্দ্যোর বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খণ্ড ও ৺নগেন্দ্রনাথ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের রাজকাণ্ড গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে চেদীরাজ কর্ণদেব এবং নয়পাল ও বিগ্রহপালের কথা আছে। বাঙ্গালার মাৎস্যন্যায় প্রশমনের জন্য বাঙ্গালী প্রধানগণ গোপালদেবকে রাজা নির্বাচিত করেন। গোপালের ইতিহাস বিখ্যাত পুত্র ধর্মপাল। ইঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর নাম গর্গদেব। ইঁহারই মন্ত্রণা কৌশলে ধর্মপাল সমগ্র উত্তরাপথে রাজচক্রবর্তী পদবীতে আরূঢ় হন। এই বংশে নয়পালের উদ্ভব। নর্মদা নদীর তীরবর্তী জব্বলপুরের নিকটস্থিত ত্রিপুরীর অধীশ্বর গাঙ্গেয়দেবের পুত্র চেদী বংশীয় নরনাথ কর্ণদেব জীবনের অধিকাংশ দিন দিগ্বিজয়ে অতিবাহিত করেন। ষাট বৎসর এইরূপে ব্যয়িত হয়। তিনি নয়পালের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যুবরাজ বিগ্রহপালের করে কন্যা যৌবনশ্রীকে সমর্পণ করেন। কর্ণদেবের জ্যেষ্ঠাকন্যা বীরশ্রীকেও একজন রাজকুমার বিবাহ করেন, তাহার নাম জাতবর্মা। তোমার পক্ষে এই কাহিনীই তো যথেষ্ট। গৌড়মল্লারে তুমি ইতিহাস লিখিয়াছ কতটুকু ? উপাদান কিই বা পাইয়াছ ! তাহা অপেক্ষা এ উপকরণ তো যথেষ্ট বলিতে হয়। কর্ণদেব ও নয়পালের যুদ্ধে অতীশ দীপঙ্কর মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। ...

তুমি ৺রাখাল বন্দ্যোর 'ধর্মপাল' পড়িলে সেকালের বাঙ্গালার অবস্থার আভাস পাইবে। গৌড়মল্লারে বাঙ্গালার দুর্দিনের চিত্র আঁকিয়াছ। অধঃপতিত রাজবংশের এক কামোন্মাদিনী রাণীর ছবি দেখাইয়াছে। ইহারই পরবর্তী অধ্যায় লিখিতে অনুরোধ করিতেছি। স্বাধীন বাঙ্গালার শৌর্যে বীর্যে, মহিমান্বিত বাঙ্গালী, চাণক্যপ্রতিম ব্রাহ্মণ মন্ত্রী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইয়াও সর্বধর্মের উৎসাহদাতা বাঙ্গালী সম্রাট। ...ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাকের রাম-চরিত অনুবাদ পড়িলে আবার বাঙ্গালীর আর এক রূপের পরিচয় পাইবে। ...' (চিঠি, ১১ কার্তিক ১৩৬১)

'...১ম মহীপালের পুত্র নয়পাল। তার পুত্র ৩য় বিগ্রহপাল। জয়পাল নয়, নয়পালই প্রকৃত নাম।' ইহাদের রাজধানী ছিল গৌড়ে এবং মগধে। মালদহ এবং পাটনায়। ...নয়পাল এবং বিগ্রহপালের সঙ্গে চেদীরাজ কর্ণদেবের যুদ্ধ মগধে আরম্ভ হইয়া রাঢ় পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রাঢ়দেশের পাইকোড় (প্রাচীকোট) গ্রামে চেদীকর্ণের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণদেবের রাজধানী ছিল জব্বলপুরে নর্মদা তীরে ত্রিপুরী। মর্মর পাহাড়ের সৌন্দর্য লালিতা কর্ণদেবের দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠা বীরশ্রী, বঙ্গেশ্বর জাতবর্মা ইহাকে বিবাহ করেন। বঙ্গ বা সমতট ইহাদের রাজধানী। দ্বিতীয়া কন্যা যৌবনশ্রীকে বিবাহ করেন বিগ্রহপাল। বিবাহ বোধহয় রাঢ়দেশেই হইয়াছিল। পাইকোড়ের লিপি হইতে মনে হয় চেদীরাজ সেখানে কোন দেববিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগের ঘটনা।' (চিঠি, ২১ চৈত্র ১৯৬১)

'যৌবনশ্রী তো ক্ষত্রিয়ের মেয়ে। সে যদি বাপের কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়া থাকে এবং

পুরুষবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে বাপের সহযাত্রী হয়, দোষ হয় নাকি ? এই পরিবেশে বিগ্রহপালের সঙ্গে তাহার দেখাটা তুমি পছন্দ কর ? ভাই, 'যৌবনশ্রী' তুমি আরম্ভ কর... ।' (চিঠি, ৬ শ্রাবণ ১৩৬২)

হরেকৃষ্ণবাবু এমনকি গ্রন্থখানির নামকরণও করেছিলেন—যৌবনশ্রী ।

বলা বাহুল্য, উপন্যাসটি লেখক হরেকৃষ্ণবাবুকেই উৎসর্গ করেছেন । এই প্রসঙ্গে হরেকৃষ্ণবাবু লিখেছেন :

'...জীবনের এই উত্তীর্ণপ্রায় অপরাহ্নে আসন্ন সন্ধ্যার গোধূলি ধূসর পাণ্ডুর ছায়া যখন আমাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে অপসারিত করিবার সার্থক প্রযত্নে অগ্রসর হইতেছে, আমি যখন প্রসন্ন চিত্তে চির প্রস্থানের প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছি, এমনই দিনে তোমার অকপট আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্ভার আমি অঞ্জলি পাতিয়াই গ্রহণ করিলাম । ...তোমার কল্যাণ হউক । নিরাময় দীর্ঘজীবনে বাঙ্গালার যুবক যুবতীকে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের কাহিনী শুনাইয়া, বাঙ্গালীর দুর্বলতার, তাহার স্খলন ত্রুটির চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়া আত্মসচেতন করিবার চেষ্টা কর । বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি ।

সুন্দর পটভূমি, লোভনীয় বাতাবরণ, তৎকালোপযোগী পরিবেশ, সংঘাত সঙ্কুল ঘটনা, সার্থক চরিত্র, মনোহারী সংলাপ, কোনটা রাখিয়া কোনটার কথা বলিব । ...

যৌবনশ্রীকে আমার বড় ভাল লাগিয়াছে । ভারী সুন্দর যৌবনশ্রী । রূপে গুণে নারীরত্ন । হাজার কয়েক বছর আগে এক চতুর্দশবর্ষীয়া ক্ষত্রিয় কুমারী রাজাবরোধ হইতে ঠিক এই কথাই লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণকে । যৌবনশ্রী মুখে যাহা বলিয়াছেন, পত্রে সেই কথাই লেখা ছিল, তুমি এস, একাকী নয়, চতুরঙ্গ বাহিনীতে সজ্জিত হইয়া এস । প্রকাশ্য দিবালোকে সমাগত রাজন্যমণ্ডলীর সমক্ষে আমাকে রথে তুলিয়া লও । রাক্ষস বিবাহে আমায় গ্রহণ কর । সিংহের ভোগ্য যেন শৃগালে স্পর্শ না করে । ইহার সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা—চোরের মত আসিও না । আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইও না, ক্ষত্রিয় নন্দিনীর গৌরব বহন করিয়া আমি তোমার সঙ্গিনী হইব । ইনিই ভীষ্মক দুহিতা । দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্যে মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন । ভারতের ক্ষত্রিয় কুমারীর অন্তর্নিহিত এই কামনা ঐ কুসুমপেলব তন্বী যৌবনশ্রীর আলেখ্যকে মহিমান্বিত করিয়াছে । অম্বিকা দেবী মনে রাখিবার মত ।

বাঙ্গালী যুবক বিগ্রহপাল ও জাতবর্মা, তোমার বীরশ্রী ও বান্ধুলি, তোমার লম্বোদর, রন্তিদেব ও অনঙ্গপাল—যথাযথ চিত্র । কিন্তু চেদীরাজ কর্ণদেব কিছুটা অতিরঞ্জিত মনে হয় । ...' (চিঠি, ১৮ আশ্বিন ১৩৬৫)

পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত এই উপন্যাসটির নাম ছিল 'রেবা রোধসি' ; পরে নাম বদলে 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ' রাখা হয় ।

কুমারসম্ভবের কবি । বর্তিক । প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৭০ । পৃ. ১২০ । মূল্য তিন টাকা ।

"এই কাহিনী পূর্বে 'কালিদাস' নামে চিত্রনাট্যের আকারে প্রচলিত ছিল, এখন ইহা 'কুমারসম্ভবের কবি' নামে উপন্যাসের আঙ্গিকে পুনর্লিখিত হইয়া প্রচারিত হইল । "কালিদাস" আর ছাপা হইবে না ।"—ভূমিকা, (পুণা, বৈশাখ ১৩৭০)

চিত্রনাট্যের প্রারম্ভে লেখক বলেছেন—'মহাকবি কালিদাসের কোনও নির্ভরযোগ্য জীবনী নাই—আছে কেবল কতকগুলি রূপকথার মত কিম্বদন্তী । এই কিম্বদন্তীর সহিত অনুরূপ কল্পনা মিশাইয়া এই কাহিনী রচিত হইল ; ইহাকে বাস্তব জীবন-চিত্রণ মনে করিলে ভ্রম হইবে । কাহিনীর ঘটনা-কাল অনুমান খৃঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী ।'

তুঙ্গভদ্রার তীরে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৭২। পৃ. [৪]+২২৪। মূল্য ছয় টাকা।

একবিংশ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৩৯৭। পৃ [৪] + ১১৯। মূল্য ১৫.০০।

উৎসর্গ ॥ বাংলা সাহিত্যের বিক্রমশীল ধর্মপাল/শ্রীপ্রমথনাথ বিশী/সহৃদয়েষু

প্রচ্ছদ ॥ অজিত গুপ্ত

"এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell-এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত। Sewell-এর গ্রন্থখানি ৬৫ বছরের পুরাতন। তাই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ The Delhi Sultanate পাঠ করিয়া Sewell-এর তথ্যগুলি শোধন করিয়া লইয়াছি। আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিলেও কাহিনী মৌলিক ; ঘটনাকাল খৃ ১৪৩০-এর আশেপাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।

অনেকের ধারণা পোর্তুগীজদের ভারতে আগমনের (খৃ ১৪৯৮) পূর্বে ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল না। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ অনুমান করেন, সুলতান ইল্‌তুৎমিসের সময় ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে স্বয়ং বাবর শাহ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালী যোদ্ধারা আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় নিপুণ ছিল। এই কাহিনীতে আগ্নেয়াস্ত্রের অবতারণা অলীক কল্পনা নয়। তবে বাবর শাহের আমলেও ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে আবির্ভূত হয় নাই।

দেশ-মান সম্বন্ধে সেকালে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। চাণক্য এক কথা বলেন, অমরসিংহ অন্য কথা। আমি মোটামুটি ৬ ফুটে ১ দণ্ড, ২০ গজে ১ রজ্জু এবং ২ মাইলে ১ ক্রোশ ধরিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য, আমার কাহিনী Fictionised history নয়, Historical Fiction."—ভূমিকা

লেখকের ডায়েরিতে দেখা যায় এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয় ২১ জুলাই ১৯৬৩, শেষ হয় ১৭ এপ্রিল ১৯৬৫।

তুঙ্গভদ্রার তীরে সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করা হল—

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : 'তোমার লেখার একটা যাদু আছে, তুমি অনায়াসে এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি কর যে পলকে মনকে সুদূর অতীতে টানিয়া লও। তুঙ্গভদ্রার তীরে তোমার সে সুনাম রক্ষা করিয়াছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী—দুইই তোমার তুল্যমূল্য।...' (চিঠি, ৪ আষাঢ় ১৩৭৩)

সুকুমার সেন : 'অনেকদিন বাংলা বই পড়ে এমন তৃপ্তি পাইনি। আপনি গল্পের মধ্যে অনেক রস প্রবাহিত করেছেন।' (চিঠি, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৫)

প্রমথনাথ বিশী : 'আপনার গল্প পড়তে পড়তে বঙ্কিমবাবুকে মনে এনে দেয়—তিনি ছাড়া আপনার জুড়ি নেই। এর অধিক প্রশংসাবাক্য জানি না।' (চিঠি, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৫)

রমেশচন্দ্র মজুমদার : '...আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ—কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না—কিন্তু আপনার বই পড়িবে। Alexander Dumas যে উদ্দেশ্য নিয়া Three Muskateers প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন আপনার দুইখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়া তেমনি শশাঙ্কের পরবর্তী সময়কার বাংলা ও দেবরায়ের বিজয়নগর সম্বন্ধে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।' (চিঠি, ২৬ নভেম্বর ১৯৬৫)

তুঙ্গভদ্রার তীরে ১৩৭২ সালে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির জন্য ১৯৬৭ সালে লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করেন।

শরদিন্দুবাবুর ঐতিহাসিক গল্প সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচক এবং রসজ্ঞ পাঠকের অভিমতের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল—

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি : 'আমি গল্প প্রায় পড়িনা। বড় গল্প একেবারেই না। অবসর পাইনা, আর পড়িতে ভালও লাগে না। কিন্তু কৌতূহলবশে শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কয়েকখানি গল্পের বই পড়িয়াছি।

জাতিস্মর নামক পুস্তকে তিনটি গল্প আছে। তিনি 'অমিতাভ' ও 'মৃৎপ্রদীপ' নামক গল্প বৌদ্ধ কালের ছিন্নপত্র সংগ্রহ করিয়া রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, রচনা-চাতুর্য, ও ভাষার মাধুর্য ও ঔদার্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। দেশ ও কাল নির্দেশ করিয়া গল্প লিখিতে হইলে নানা বিষয়ে সাবধান হইতে হয়। নচেৎ, অনৌচিত্য ও অসঙ্গতি দোষ আসিয়া পড়ে। তিনি যথাসাধ্য পুরাতন কাল রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তদ্দ্বারা কাহিনীর অঙ্গহানি হয় নাই। বিষকন্যা নামক পুস্তকে 'চন্দনমূর্তি', 'সেতু', 'মরু ও সঙ্ঘ', ও 'বিষকন্যা' এই চারিটি গল্পে ভয়ানক রস প্রকট হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন কালের বর্ণনায় প্রাচীনতা অক্ষুণ্ণ আছে। এই দুইখানি বই লিখিতে লেখক যে কত পুস্তক পড়িয়াছেন ও আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে তাঁহাকে জল্পক আখ্যা দেওয়া চলিবে না, তাঁহাকে আমি বিদ্বান্ বলিয়া মনে করি। কালিদাস কুমারসম্ভবের কয়টি সর্গ লিখিয়াছিলেন, অষ্টম সর্গ লিখিয়াছিলেন কিনা, এই লইয়া বহুকাল হইতে একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে। সে তর্ক ধরিয়া 'অষ্টম সর্গ' গল্প রচিত হইয়াছে। গল্পটি ভাল, তর্কের মীমাংসাও ভাল, কিন্তু পাত্র নির্বাচনের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এই দুইখানি পুস্তকে সংস্কৃত শব্দ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, কিন্তু সে সকল শব্দ অজ্ঞাত নয় এবং তদ্দ্বারা বাংলার স্বরূপ উজ্জ্বল হইয়াছে। 'চুয়াচন্দন' নামক গল্প সমষ্টি লঘুপাঠ্য। ...' (লেখকের নিকট প্রেরিত অভিমত, তারিখ ১২ পৌষ, ১৩৫৫)

মোহিতলাল মজুমদার : 'আপনার সাহিত্যিক পাণ্ডিত্য এবং কল্পনা শক্তি দুইই আছে—এই দুয়ের সঙ্গে আপনার মনের যে একধরণের romantic প্রবৃত্তি আছে—ভারতের অতীতকে, হিন্দু ক্লাসিক্যাল বা বৌদ্ধ monastic ভাবরূপকে পুনরুদ্ধার করিবার যে কবিত্বময় স্পৃহা আছে, তার পরিচয় [পাওয়া যায়]। ... এপিক যুগের ভারতের চিত্র আমরা পুরাণ-সাহিত্যে কতগুলি পাইয়াছি। কিন্তু এই বৌদ্ধ-হিন্দু ক্লাসিক্যাল যুগের যে পূর্ণতর ভারতীয় সভ্যতা, তাহার জীবন্ত চিত্র কাব্যগত হয় নাই। আপনার গল্পগুলি পড়িলে মনে হয়, আপনি এ যুগের সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষার্থীর মত অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন—তাহার উপর আপনার রোমান্স রচনা করিবার শক্তি আছে।' ('বিষকন্যা' গ্রন্থ সম্পর্কে চিঠি, তারিখ ১০-৮-১৯৪০)

"মরু ও সঙ্ঘ' আপনার একটি উৎকৃষ্ট রচনা। বোধ হয় এ লেখা—অন্যগুলির তুলনায় পরিণততর রচনা। আপনার রচনায় যে ধরণের কবিত্বময় কুশলী কল্পনার অবাধসুন্দর গতি আছে—যৌবনদীপ্ত প্রাণবন্ততার সঙ্গে যে বৈদগ্ধ্য ও রসদৃষ্টি আছে তাহা...বড়ই উপাদেয়।' (চিঠি, তারিখ ৩০-৮-১৯৪০)

[চুয়াচন্দনের] 'গল্পগুলির সবগুলিই আনন্দদায়ক—যে আনন্দকে ত্বরিতানন্দও বলিতে পারি, অবশ্য রূঢ় অর্থে নয়। ইংরাজীতে যাহাকে entertaining বলে—আপনার প্রায় সকল গল্পেই তাই। গল্পগুলির অধিকাংশই গল্প এবং সে-গল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি—অর্থাৎ পাঠকের মনোহরণ। আপনার গল্পগুলিতে কবিমানসের সকল বৃত্তিই অল্পাধিক পরিমাণে আছে— fancy,

imagination, invention-এর চপল চটুল ক্রিয়া রহিয়াছে, সেই সঙ্গে সাহিত্যিক শক্তি অর্জনের জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, সেই সাধনার পরিচয় সর্বত্র রহিয়াছে।...

রোমান্সই আপনার কবিত্বের মূল প্রেরণা...। আপনি বাস্তবের বাস্তবতা খুঁড়িয়া দেখিতে চান না, জীবনের কোন ব্যাখ্যা বা philosophy আপনার মনকে চাপিয়া ধরে না—সে পিপাসা আপনার নাই; অর্থাৎ আপনি Keats-এর Nightingle-এর মত ভাগ্যবান—মানবমনের বা প্রকৃতির চিরবসন্তের দেশে পলাইয়া বাঁচিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। আপনি passion ও emotion গুলিকে পাক করিয়া একটু রস তৈয়ার করিয়া দেন এবং ইহার জন্য situation, incident ও character নিজের মত করিয়া গড়িয়া লন।...ইহাই আপনার বাহাদুরী।...

আপনার রচনায় যে রসিকতা আছে, তাহা স্বাভাবিক ক্ষুধা তৃষ্ণার মতই মানুষ মাত্রেই তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে। প্রকাশ্যে না করিলেও গোপনে করিবে।...

'চুয়াচন্দনে'র গল্পগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে 'বাঘের বাচ্চা'—একেবারে প্রথম শ্রেণীর। ইহাকেই বলে 'reconquest of antiquity'। ইহা আপনার ঐতিহাসিক কল্পনার একটি চূড়ান্ত নিদর্শন।' (চিঠি, তারিখ, ৮-৯-১৯৪০)

চিঠিতে উল্লিখিত অভিমতই সমালোচকের সাহিত্য-বিতান গ্রন্থে 'বর্তমান বাংলাসাহিত্য' নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে— '...অতীতের রোমান্সকে তিনি ['মরু ও সঙ্ঘ'] গল্পে যে রস-রূপ দান করিয়াছেন, তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই। এ গল্পের কল্পনা ও পরিকল্পনায় তিনি যে ভাবুকতা ও দার্শনিক রসদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মানব-জীবনের শাশ্বত সমস্যাই তাঁহার জীবন-দর্শনকে যেমন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, তেমনই তাহাতে যে একটি সুকর্ষিত সুমার্জিত বিদ্বান-সুলভ মনোভঙ্গি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাও অনন্যসুলভ। এই কাহিনীতে রোমান্স-রস বা ইতিহাসের যাদু যেমন চরমে উঠিয়াছে, তেমনই ইহার ভাববস্তু হইয়াছে—মানুষের সহিত প্রকৃতির দ্বন্দ্ব, ভিতরে ও বাহিরে সেই এক শত্রুর সহিত প্রাণান্তিক সংগ্রাম, এবং পরিণামে সেই চিরন্তন হাহাকার।....'

রাজশেখর বসু : 'আজকাল শুদ্ধ বাংলা দুর্লভ হয়েছে, খ্যাত লেখকেরাও বিস্তর ভুল করেন। যে অল্প ক'জন শুদ্ধি বজায় রেখেছেন তাঁদের পুরোভাগে আপনার স্থান। সংস্কৃত শব্দ, বিশেষত সেকেলে শব্দ দেখলে আধুনিক পাঠক ভড়কে যায়। আশ্চর্য এই—আপনার লেখায় এ রকম শব্দ প্রচুর থাকলেও পাঠক ভড়কায় না। বোধহয় তার কারণ আপনার প্লটের বা বর্ণনার দুর্নিবার আকর্ষণ।' (চিঠি, তারিখ ২-৩-১৯৫৩)

'আপনার সকল রচনার মধ্যেই একটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, যা আর কারও লেখায় নেই—বর্ণনার মাঝে মাঝে আপনার সরস obiter dictum. সেখানে পাঠককে থেমে থেমে উপভোগ করতে হয়, যেমন পোলাও খেতে খেতে পেস্তা বাদাম পেলে।' (চিঠি, তারিখ ১৩-২-১৯৫৩)

'জাতিস্মর পূর্বেই পড়েছি। ১০ বছর আগে দিল্লীর নার্সিং হোমে শয্যাশায়ী ছিলাম তখন ওই বইটি পড়ে রোগযন্ত্রণা ভুলতাম।' (চিঠি, তারিখ ১৯-৭-১৯৫৬)

'আপনার কাছ থেকে আরও...বিষকন্যা জাতীয় গল্প আশা করি।' (চিঠি, তারিখ ২৮-৭-১৯৫৬)।

'প্রাচীন ভারতের জীবিতবৎ চিত্র অঙ্কনে আপনি অদ্বিতীয়। রোমাঞ্চ গল্পেও আপনার স্থান সকলের উপরে। আর একটি কথা -আপনার পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ ভাষা।' (চিঠি, তারিখ ২৯-৩-১৯৫৭)

রমেশচন্দ্র মজুমদার : 'শঙ্খকঙ্কণের [পুস্তক] মধ্যে ইতিহাসের ছাপ প্রথমটাতে খুবই আছে এবং

বিশেষ উপভোগ্য। দ্বিতীয়টিতে [রেবা রোধসি] খুব বেশী না থাকিলেও একটি জাতীয় আদর্শের পটভূমিকায় কাহিনীটি খুবই উপভোগ্য। ...

[চুয়াচন্দন] গল্পটি খুবই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইয়াছিল। নবদ্বীপের ও তান্ত্রিকতার পটভূমিতে লেখা—এবং বিস্মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর সুদূর দেশে বাণিজ্যযাত্রার কাহিনী—এই উভয়ে মিলিয়া যে একটি সুপরিকল্পিত কাহিনীকে খাড়া করিয়াছেন তাহা বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচায়ক।' (চিঠি, তারিখ ১৮-১২-১৯৬৫)

প্রমথনাথ বিশী : 'শরদিন্দুবাবুর প্রধান গুণ ঐতিহাসিক কল্পনা। বহু দূরকালের সামান্য কয়খানা ঘটনার কঙ্কালের মধ্যে তিনি প্রতিভার মন্ত্রবলে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন। এ শক্তি প্রচুর পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের ও কিয়ৎ পরিমাণে রমেশচন্দ্রের ছিল।... প্রাণীতত্ত্ববিদেরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ারের এক-আধখানা অস্থির ভগ্নাংশ পাইলে সমগ্র জন্তুটির আকৃতি সংগঠন করিতে পারেন ; কিন্তু ঐতিহাসিক কল্পনা তার চেয়েও বিস্ময়কর শক্তি। ইহার বলে ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করা যায়। শরদিন্দুবাবুর এই শক্তি আছে।

'বাঘের বাচ্চা' গল্পে কিশোর শিবাজীর চিত্র পাওয়া যায়। কিশোর শিবাজীকে আমরা কোথাও দেখি নাই। শিবাজীর শরীরের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য রকমে বস্তুগত। শিবাজীর দেহের ঊর্ধ্বার্ধ যে নিম্নার্ধের অপেক্ষা সবল ও পুষ্ট ছিল, ইহা শরদিন্দুবাবু কোথাও পড়িয়াছেন কিনা জানি না ; কিন্তু শিবাজীর অশ্বারূঢ় চিত্র দেখিলেই এই কথাটি মনে হয়। বোধ হয় ইহা শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্র রাজ্যেরও প্রতীক। শিবাজীর মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যেই মহারাষ্ট্র রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া পড়িল ; তাহার নিম্নার্ধ বা ভিত্তি অস্পষ্ট ছিল, ইহাই বোধ করি তাহার সবচেয়ে বড় কারণ। এই গল্পে আমরা দেখিতে পাই শিবাজীর human জ্ঞান ছিল। বোধকরি অধিক বয়সেও তিনি এ শক্তি হারান নাই। নতুবা আওরঙ্গজেবের কয়েদ হইতে সন্দেশের ঝুড়ি করিয়া পালাইবার বুদ্ধি তাঁহার মনে আসিত না।

'রক্ত-সন্ধ্যা' ও 'চুয়াচন্দন' গল্প দুইটি আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে। ভাস্কো-ডা-গামার আমলের গোয়া নগর এবং তথাকার লোকজন এমন জীবন্তভাবে লেখক আঁকিয়াছেন যে তাঁহাকে প্রশংসার ভাষা খুঁজিয়া পাই না। হয়তো এ সব তথ্য তিনি ইতিহাস হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু এ প্রাণ তো ইতিহাসের গ্রন্থে ছিল না।

কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়ের, গল্পের যে ফ্রেমটির মধ্যে এই গোয়া নগরের কাহিনীকে তিনি আঁটিয়া দিয়াছেন। কলিকাতার এক মাংস বিক্রেতা ও গোয়া নগর হইতে আগত এক পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গীর মধ্যে খুনোখুনিকে লেখক অপূর্ব প্রতিভাবলে বহু শতাব্দীর পূর্বেকার ভাস্কো-ডা-গামা ও মির্জা দাউদের সঙ্গে জড়িত করিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধি বলে, ইহা অসম্ভব ; সংস্কার বলে—সম্ভব হইতেও পারে। বিজ্ঞান বলে, ইহা মিথ্যা ; আর্ট বলে, ইহা সত্য। লেখক গল্প লেখায় আর্টের সাহায্যেই ইহা সত্য করিয়া তুলিয়াছেন ; পড়িবার সময়ে ইহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই।

'চুয়াচন্দন' চৈতন্যদেবের আমলের নদীয়ার একটি কাহিনী। যেমন রোমান্টিক তেমনি বাস্তব ; কিন্তু ইহার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগিয়াছে কিশোর চৈতন্যের চিত্রটি, চৈতন্যদেবের যে মুণ্ডিতমস্তক কৌপীন সম্বল মূর্তির সঙ্গে আমরা সচরাচর পরিচিত, এ চিত্র সে চিত্র নয়। এ সেই দুর্দান্ত বিদ্বান, মূর্খ পণ্ডিতদের মূর্তিমান ভয় স্বরূপ, দৈব প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, এক ডুবে গঙ্গাগর্ভ-নিমজ্জিত-পণ্ডিতদের টিকি ধরিয়া টানিয়া তোলা, প্রচুর হাস্যে প্রগল্ভ সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী চৈতন্যদেবের চিত্র। চৈতন্যদেব যে এমন ছিলেন তাহা কোন কোন বৈষ্ণব লেখকের জীবনী হইতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্টভাবে সে ছবি দেখি নাই। যে চৈতন্য একদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, তিনি আবার একদিন অন্ধকার রাত্রে মাঝগঙ্গায় চন্দনের সহিত

চুয়ার রাক্ষস-বিবাহ দিয়াছিলেন এমনতর মিথ্যা-সত্য ইহার আগে পড়ি নাই। যাঁহারা চৈতন্যদেবের গতানুগতিক চিত্র দেখিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা এ দৃশ্য দেখিলে চৈতন্যদেবের ভক্ত হইয়া উঠিবেন, আশা করিতেছি।' ('চুয়াচন্দন' পুস্তকের আলোচনা। শনিবারের চিঠি, আষাঢ় ১৩৪৩)

'শঙ্খকঙ্কণে'র narrative চমৎকার। এমন মধুর প্রাঞ্জল narrative শক্তি বর্তমানে আর কোন লেখকের নাই—কাহারো নাই—এই কাহারোর মধ্যে জীবিত সমস্ত লেখকই পড়েন। এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে তুলনীয় প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তবে তিনি ইতিহাসে পদক্ষেপ করেন নাই। ইতিহাসকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে আপনার জুড়ি নাই।' (চিঠি, তারিখ ১৯-৩-১৯৬৩)

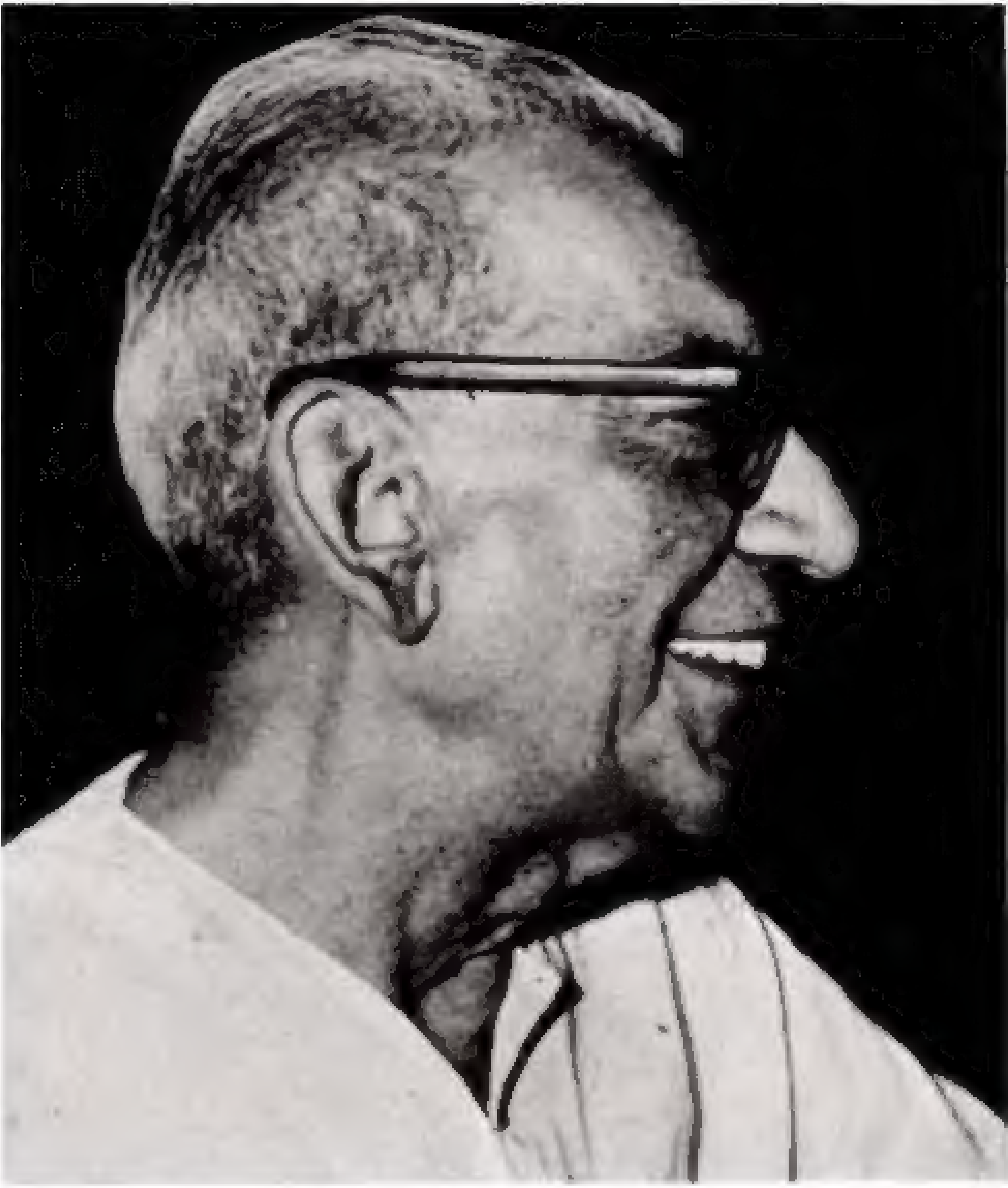
জিজ্ঞাসু পাঠক এই প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্যের লেখা 'শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থের ভূমিকাটি পড়ে দেখতে পারেন।

পরিশেষে নিজের ঐতিহাসিক গল্প সম্পর্কে ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ (তারিখ ২৩-২-১৯৫১) শরদিন্দুবাবুর মন্তব্যটির উদ্ধৃতি বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

'ইতিহাস অবলম্বন করিয়া কাহিনী লেখা বঙ্গভাষায় প্রচলিত নয়। বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র উহার সূত্রপাত করিয়া ছিলেন, কিন্তু সে সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে। প্রাক্-মুসলমান যুগের ঐতিহ্য বাঙ্গালী যেন ভুলিয়া গিয়াছে। রাখালদাস স্মরণ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইতিহাসবিৎ ছিলেন, গল্পলেখক ছিলেন না, তাঁহার চেষ্টা সার্থক হয় নাই। বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে 'শশাঙ্ক' 'ধর্মপাল' স্থান করিয়া লইতে পারে নাই।

আমি আমার অনেকগুলি গল্পে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন এইগুলি আমার শ্রেষ্ঠ রচনা। শ্রেষ্ঠ হোক বা না হোক, আমি বাঙ্গালীকে তাহার প্রাচীন tradition-এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ চেষ্টা আর কেহ করেনা কেন ? বাঙ্গালী যতদিন না নিজের বংশগরিমার কথা জানিতে পারিবে ততদিন তাহার চরিত্র গঠিত হইবে না ; ততদিন তাহার কোনও আশা নাই। যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই।'

১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭ শোভন বসু



শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৭ চৈত্র, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ (৩০ মার্চ, ১৮৯৯) উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর শহরে, মাতুলালয়ে।
পিতা : তারাভূষণ। মাতা : বিজলীপ্রভা। আদি নিবাস উত্তর কলকাতার বরানগর কুঠিঘাট অঞ্চলে। পড়াশোনা মুঙ্গেরে ও কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে। বি-এ পাশ করে ল কলেজে ভর্তি হন। শেষ পর্যন্ত পাটনা থেকে আইন পাশ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই বিবাহ। স্ত্রী : পারুল।
সাহিত্যরচনার শুরু কবিতা দিয়ে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'যৌবনস্মৃতি' (১৩২৫ বঙ্গাব্দ)। এরপর দুটি-একটি গল্প। সাহিত্যকে জীবিকা করে তোলা ১৯২৯ সাল থেকে।
১৯৩৮ সাল থেকে বোম্বাইয়ে। চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্য লেখার কাজে। প্রথমে বোম্বে টকিজ, পরে অন্যত্র ও ফ্রিল্যান্স। সিনেমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৯৫২ সাল থেকে পুণাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস।
জ্যোতিষচর্চায় আগ্রহ ছিল গভীর।
ছদ্মনাম : চন্দ্রহাস।
পুরস্কার : রবীন্দ্র পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎস্মৃতি পুরস্কার, মতিলাল পুরস্কার ও অন্যান্য।
মৃত্যু : ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০।

প্রচ্ছদ □ সুব্রত চৌধুরী

"তাঁহার বিদ্যাবত্তা, রচনাচাতুর্য ও ভাষার মাধুর্য ও ঔদার্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। ...তিনি যথাসাধ্য পুরাতন কাল রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তদ্দ্বারা কাহিনীর অঙ্গহানি হয় নাই। তাঁহাকে গল্পক আখ্যা দেওয়া চলিবে না, তাঁহাকে আমি বিদ্বান্ বলিয়া মনে করি।"

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

"প্রাচীন ভারতের জীবিতবৎ চিত্র অঙ্কনে আপনি অদ্বিতীয়। রোমাঞ্চ গল্পেও আপনার স্থান সবার উপরে। আর একটি কথা—আপনার পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ ভাষা।"

রাজশেখর বসু

"দূরের দৃশ্যপটকে নিকটে এনে দূরের মানুষকে কাছের মানুষ করতে পেরেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এইখানেই ঐতিহাসিক গল্পলেখকরূপে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব।"

সুকুমার সেন

"শরদিন্দুবাবুর প্রধান গুণ ঐতিহাসিক কল্পনা। বহু দূরকালের সামান্য কয়খানা ঘটনার কঙ্কালের মধ্যে তিনি প্রতিভার মন্ত্রবলে প্রাণসঞ্চার করিতে পারেন। ...ঐতিহাসিক কল্পনা...বিস্ময়কর শক্তি। ইহার বলে ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে প্রাণসঞ্চার হয়। শরদিন্দুবাবুর এই শক্তি আছে।"

প্রমথনাথ বিশী

"আপনার সাহিত্যিক পাণ্ডিত্য ও কল্পনা শক্তি দুইই আছে—এই দুয়ের সঙ্গে আপনার মনের যে একধরনের romantic প্রবৃত্তি আছে—ভারতের অতীতকে, হিন্দু ক্লাসিক্যাল বা বৌদ্ধ monastic ভাবরূপকে পুনরুদ্ধার করিবার যে কবিত্বময় স্পৃহা আছে তার পরিচয়...পাইয়াছি।"

মোহিতলাল মজুমদার

